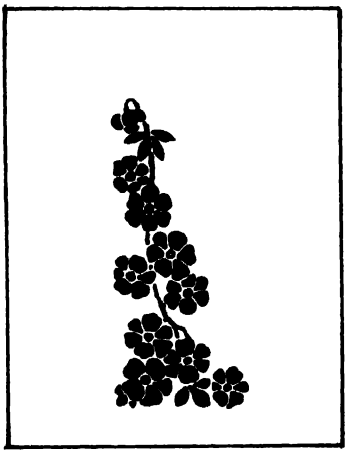
মপাসাঁ রচনাবলী

প্রথম খণ্ড



অনুবাদ :

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

শেখর সেনগুপ্ত

সুনীলকুমার ঘোষ

সম্পাদনা :

তীর্থপতি দত্ত

ভূমিকা :

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

সূচীপত্র

ভূমিকা ১১

উপন্যাস

জোয়েত ২৫১

গল্প

জুলি রোমেন ২১
চিতা ২৮
আমার স্ত্রী ৩৩
প্রেমাসক্তি ৪০
পিশাচ ৪৪
হোরলা ৫০
কোকো ৭৩
গহ্বর ৭৭
ইঙ্গিতি ৮৪
কাপুরুষ ৯০
একটি সত্যি কাহিনী ৯৮
জনক ১০৩
ভয় ১১১
অনুতাপ ১১৭
আলেকজান্দ্র ১২৩
গুপ্তজ্ঞান ১২৮
নববর্ষের উপহার ১৩৫
প্রহরী কুকুর ১৪১
হাত ১৪৩
রহস্য ১৪৯
পাগল ১৫৪
বিক্রয়যোগ্য ১৫৮
অন্তিম ভ্রমণ ১৬৪
ক্ষমা ১৬৯
মুসাফিরের কাহিনী ১৭৫
আসন বুনতো যে নারী ১৮১
মারোকা ১৯০
দামী গহনাগুলি ১৯৭

পরিত্রাণ	☐	☐	☐	৪০১
বানিজার ভেনাস	☐	☐	☐	৪০৩
লা মোরিলান	☐	☐	☐	৪০৫
একপাত্র মদ দাও	☐	☐	☐	৪০৭
বিবাহবিচ্ছেদের অজুহাত	☐	☐	☐	৪০৯
খৃস্টোৎসব	☐	☐	☐	৪১২
বিদূষক	☐	☐	☐	৪১৪
প্রেমের জাগরণ	☐	☐	☐	৪১৬
বেড নম্বর ২৯	☐	☐	☐	৪১৭
স্ত্রীর স্বীকারোক্তি	☐	☐	☐	৪২১
কোন এক মৃত নারীর গোপন কথা	☐	☐	☐	৪২৩
হিপ্পোলিটের দাবি	☐	☐	☐	৪২৫
তামাকের দোকান	☐	☐	☐	৪২৬
একটি গরীব মেয়ে	☐	☐	☐	৪২৯
ধরাপড়া	☐	☐	☐	৪৩১
আর্দালি	☐	☐	☐	৪৩২
কালা-বোবা	☐	☐	☐	৪৩৪
মন্ত্রশক্তি	☐	☐	☐	৪৩৭
বহুরূপে	☐	☐	☐	৪৩৯
শয়তান কাউন্টপত্নী	☐	☐	☐	৪৪২
দরকারী বাড়ি	☐	☐	☐	৪৪৩
দুটি তরুণ সৈনিক	☐	☐	☐	৪৪৫
প্রেত	☐	☐	☐	৪৪৭
এক অভিনব সংবেদন	☐	☐	☐	৪৪৯
থিয়োদুল স্যাবোতের স্বীকারোক্তি	☐	☐	☐	৪৫১
পরিত্যক্ত	☐	☐	☐	৪৫৭
মোহাম্মেদ ফ্রিপুইল	☐	☐	☐	৪৬৪
বার্থা	☐	☐	☐	৪৭১
ওই শুয়োরের বাচ্চা, মোরিঁ	☐	☐	☐	৪৭৯
একটি নরম্যান	☐	☐	☐	৪৮৯
মিথ্যা ভয়	☐	☐	☐	৪৯৪
প্রেমের একটি দিক	☐	☐	☐	৪৯৬
মাদাম ব্যাপটিস্ট	☐	☐	☐	৪৯৯
মাষ্টার বেলহোম-এর জানোয়ার	☐	☐	☐	৫০৩
কাঠের গুঁড়ি	☐	☐	☐	৫১০

অস্থি	□	□	□	৫১৫
বিছানা	□	□	□	৫১৯
জাগরণ	□	□	□	৫২২
সিঁদেল চোর	□	□	□	৫২৬
ঘোড়ার পিঠে	□	□	□	৫৩০
সহানুভূতি	□	□	□	৫৩৫
একটি অদ্ভুত ভোজনোৎসব	□	□	□	৫৩৮
মঁসিয়ে জোকাস্তে	□	□	□	৫৪১
বিধবা	□	□	□	৫৪৬
ছায়াময়ী	□	□	□	৫৫১
আমাদের চিঠি	□	□	□	৫৫৭
রাত্রি	□	□	□	৫৬২
জলাতঙ্ক	□	□	□	৫৬৭
মার্টিনের মেয়েটি	□	□	□	৫৭৪
এক রাত্রির আনন্দ	□	□	□	৫৭৯
স্বীকারোক্তি	□	□	□	৫৮৫
জানালা	□	□	□	৫৯২
মোচি	□	□	□	৫৯৭
মুখোশ	□	□	□	৬০৫
মাদার সুপিরিয়র-এর পঁচিশটি ফ্রাঁ	□	□	□	৬১৩
খোঁড়া	□	□	□	৬১৮
প্রতিদ্বন্দ্বী পিন	□	□	□	৬২২
দুচো	□	□	□	৬২৮
রাঁদিভূ	□	□	□	৬৩৪
বন্দরে	□	□	□	৬৩৯
ব্যাবেতী	□	□	□	৬৪৭
লিলি লালা	□	□	□	৬৫২
একটি ভবঘুরে	□	□	□	৬৫৫
ভাঁড়	□	□	□	৬৬৩
কুৎসিত	□	□	□	৬৬৭
গুণ	□	□	□	৬৭০
চোর	□	□	□	৬৭১
শোচনীয় সাদৃশ্য	□	□	□	৬৭৩
সাদা গীর্জায় এক রাত্রি	□	□	□	৬৭৪
শেষ চিহ্ন	□	□	□	৬৭৬

একটি বিচ্ছেদ	☐	☐	☐	৬৭৮
প্রমোদ ভ্রমণ	☐	☐	☐	৬৭৯
প্রিয়তমার তকমায়	☐	☐	☐	৬৮২
মার্গটের বাতি	☐	☐	☐	৬৮৫
মা স্যাভেজ	☐	☐	☐	৬৮৬
খেতাব	☐	☐	☐	৬৯০
সম্পদ লাভের উপায়	☐	☐	☐	৬৯৪
জেরোবোয়াম	☐	☐	☐	৬৯৬
নর্তকীর প্রেম	☐	☐	☐	৬৯৮
রোজালি প্রুডেন্ট	☐	☐	☐	৬৯৯
কয়েকটি সুযুক্তি	☐	☐	☐	৭০২
গিলেমত পাহাড়	☐	☐	☐	৭০৪
স্বীকারোক্তি	☐	☐	☐	৭০৭
একটি সামান্য নাটক	☐	☐	☐	৭১০
প্রস্বর	☐	☐	☐	৭১৫
খৃস্টোৎসবের সন্ধ্যা	☐	☐	☐	৭১৭
মৃতদেহের কাছে পাওয়া চিঠি	☐	☐	☐	৭১৮
কাঠের জুতো	☐	☐	☐	৭২২
আত্মহত্যা	☐	☐	☐	৭২৪
অভিশপ্ত রুটি	☐	☐	☐	৭২৬
নদীবক্ষে	☐	☐	☐	৭২৮
আমার পঁচিশ দিন	☐	☐	☐	৭৩০
হটট ও তার পুত্র	☐	☐	☐	৭৩৩
আলুমা	☐	☐	☐	৭৩৯
কুমারী লুসি রক	☐	☐	☐	৭৪৫
আমার বাড়িওয়ালী	☐	☐	☐	৭৫২
ঘণ্টা	☐	☐	☐	৭৫৪
রাজার ছেলে	☐	☐	☐	৭৫৬
সারমেয় পরিবৃত মানুষ	☐	☐	☐	৭৫৯
স্নায়বিক উত্তেজনা	☐	☐	☐	৭৬১
ভয়ঙ্কর	☐	☐	☐	৭৬৩
প্রথম তুষারপাত	☐	☐	☐	৭৬৫
সব শেষ	☐	☐	☐	৭৬৮
একটি সন্ধ্যা	☐	☐	☐	৭৭০
মাদাম হারমেত	☐	☐	☐	৭৮১

চিরনিদ্রার ঠিকানা	৭৮৭
কে জানে ?	৭৯৩
শশক	৮০৩
দেনা	৮০৮
একটি নরম্যানডি মস্করা	৮১২
আর্টিস্ট	৮১৬
কনসারভেটরী	৮১৯
একটি বৃদ্ধ	৮২৪
প্রবঞ্চনা	৮২৭
মরচে	৮৩২
দুই বন্ধু	৮৩৭
কবরখানার বান্ধবী	৮৪২
আমার কাকা জুলে	৮৪৭
আঁদ্রের কি হ'ল	৮৫১
অজ্ঞাত রমণী	৮৫৫
একটি ঠাকুমার উপদেশ	৮৫৯
কাদা-খোঁচা পাখি	৮৬২

ভূমিকা

বিশাল ও বিচিত্র ফরাসী সাহিত্যের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দু'জন লেখক অনুবাদের মারফতে সারা বিশ্বের বিস্ময়, প্রীতি ও অভিনন্দন লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন ভিক্টর হুগো (১৮০২-৮৫) এবং আঁরি রেনি আলবেয়র গী দ্য মপাসাঁ, সংক্ষেপে গী দ্য মপাসাঁ (১৮৫০-৯৩)। আমাদের বাংলাদেশেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এঁদের রচনা ইংরেজী অনুবাদের দ্বারা শিক্ষিত বাঙালীসমাজে প্রচার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে প্রায় তাবৎ বাঙালী গল্পলেখকের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মপাসাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। যাকে ছোটগল্প বলে, অর্থাৎ এক বিশেষ ধরনের আঙ্গিকের আধারে মানুষের জীবন, কাহিনী, চরিত্র ও চিন্তার একাংশ লেখকের মায়ামুকুরে যে বিচিত্র বর্ণালী সৃষ্টি করে, তার জট বহু দূরে ব্যাপ্ত হলেও য়্যুরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে তার কলারূপ পূর্ণতা লাভ করেনি। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকেও ও-দেশের লেখক ও সমালোচকেরা ছোটগল্পের ধরনধারণ, আঙ্গিক ও কলারূপ নিয়ে মতামতের ঝড় তুলেছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ ছোটগল্পের নব পরিপ্রেক্ষিত ও কলাকৌশল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র বা আরও দু'একজন লেখক য়্যুরোপ আমেরিকার ছোটগল্পের ধারা সম্বন্ধে কৌতূহলী হলে ছোটগল্পের জন্য আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না।

গী দ্য মপাসাঁর জীবনকথা বিচিত্র কিন্তু বিশাল নয়, আনন্দোজ্জ্বল হলেও বিষণ্নতা ও নৈরাশ্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। মানসিক সংবেগের দিক থেকে তিনি অতিশয় হৃদ্য ও বলিষ্ঠ, যা অনেক সময় বেপরোয়া ধৃষ্টতা বলেই মনে হবে। আবার অপরদিকে তিনি মনের সুস্থতা ও ভারসাম্য হারিয়ে বেশ কিছুদিন পাগলাগারদে অবস্থান করেছিলেন। এইভাবে বিপরীতে, বিষমে, কান্না-হাসিতে তাঁর সমগ্র চেতনা আবিষ্ট।

১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের ৫ই আগষ্ট ফরাসী দেশের নর্মাণ্ডিতে মপাসাঁর জন্ম হয়। জন্মসূত্রে তাঁরা নর্মান। এত খ্যাতিমান লেখক হওয়া সত্ত্বেও ঠিক কোথায় তাঁর জন্ম হয়েছিল তা নিয়ে তাঁর জীবনীকারদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। Chateau de

Miromesnil Fecamp, Sotteville, Yvetot—নানা অঞ্চলের নাম পাওয়া যাচ্ছে। পিতা মাতা যথাক্রমে গুস্তাভ দ্য মপাসাঁ এবং লরা। তাঁর বারো বছর বয়সের সময়ে পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাল্য-কৈশোরের এই দুর্ঘটনা কি তাঁর সাহিত্যজীবনে বিষণ্নতার ছাপ ফেলেছিল? মায়ের কাছেই তাঁর বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাঁর মা বিদূষীই ছিলেন। মায়ের কাছে তিনি শেকস্‌পীয়রের অনুবাদ পড়েছিলেন। উত্তরকালে শেকস্‌পীয়রের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণ তাঁর মায়ের প্রভাব। Yvetot-এর বিদ্যায়তনে কিছুকাল লেখাপড়ার পর স্কুল-কর্তৃপক্ষ এই উদ্ধত ছাত্রটিকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করলেন। তখন তিনি Rouen-এর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের এক সাহিত্যরসিক শিক্ষক বোলহেতের কাছে মপাসাঁ সাহিত্যরসভোগে দীক্ষিত হন।

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ার যুদ্ধে তরুণ মপাসাঁ যোগদান করেন এবং যুদ্ধান্তে প্যারিসে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা গল্প ও উপন্যাস রচনায় তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সামরিক বিভাগে কর্মরত ছোট-বড়-মাঝারি অফিসার, তাদের জীবন ও চরিত্র তাঁর লেখনীর মুখে যে এতটা জীবন্ত হয়েছে, এর কারণ, এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। প্যারিসে ফিরে তিনি সরকারী নৌবিভাগে কেরাণীগিরি করতে থাকেন, পরে শিক্ষাবিভাগে বদলি হন। ১৮৭২ থেকে ১৮৮০—আট বছর এইভাবে কাটল। এই ধরনের কলমপেশা কেরাণীর কাজ তাঁর আদৌ ভালো লাগত না। তাঁর গল্পেও দেখা যাচ্ছে এই বৃত্তির প্রতি তাঁর বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম যৌবন পর্যন্ত তিনি বন্ধুবৎসল, খোসমেজাজি ও বেপরোয়া ধরনের ছিলেন। নীরস কেরাণীগিরির অবসরে তিনি ঘরছাড়া বাউন্ডুলে বন্ধুদের জুটিয়ে প্যারিসের উপকণ্ঠে সেন নদীতে নৌকা করে ঘুরে বেড়াতেন। এই নৌভ্রমণ তাঁর অতিশয় প্রিয় ছিল। গল্প লিখে বেশকিছু অর্থ সঞ্চিত হলে তিনি ছোট বোটে করে ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগ পাড়ি দিয়ে মানসিক বিষণ্নতা ও অতি পরিশ্রমের শারীরিক ক্লান্তি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতেন। স্বনামে গল্প লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার আগেও তিনি বেনামে বা ছদ্মনামে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রায় দু'শোর মতো নানা জাতের লেখা প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী—সবরকম লেখাই ছিল, যার অধিকাংশই এখনও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি, পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রয়ে গেছে। বোধহয় তিনি এগুলিকে যথেষ্ট পরিণত, পরিপক্ক ও রসোত্তীর্ণ মনে করেননি।

মপাসাঁর স্বনামে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ একখানি কাব্য Des Vers, ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুচ্ছে জীবনের অনাবৃত নগ্ন দিকটি অতি তীব্রভাবে বর্ণিত হয়েছিল—বোধহয় প্রকৃতিবাদী (naturalistic) কবি সাহিত্যিকদের প্রভাবে। এই কবিতাগুচ্ছে জীবনের কদর্য, অশালীন ও অবক্ষয়ী রূপের নির্ভেজাল বর্ণনা দেখে ফরাসী সরকার শঙ্কিত হয়ে এটি বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখালেন। অবশ্য কবিতাগুলির ঝাঁঝালো ও নিষিদ্ধ বর্ণনার তীব্রতা বাদ দিলে সাহিত্যের উৎকর্ষের দিক থেকে এই

কবিতাগুচ্ছকে বোদলেয়রের (১৮২১-৬৭)* Les fleurs du mal এর সমতুল্য বলা যায় না।

এই ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দেই মপাসাঁর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। আজ যে তিনি ছোটগল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে পরিগণিত, চেখভকেও যে মাথায় ছাড়িয়ে গেছেন, তার প্রথম সূচনা এই বছর থেকেই শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লোবেয়রের (১৮২১-৮০) কথাও উল্লেখযোগ্য। Madame Bovary-এর লেখক ফ্লোবেয়র ফরাসী সাহিত্যে বাস্তব জীবনের চিত্রাঙ্কনে অসাধারণ কুশলতা অর্জন করেছিলেন, এবং যাঁর শিল্পরীতি হেনরি জেমস তুর্গেনিভ প্রভৃতি সাহিত্যজগতের দিকপালেরা অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর লেখার রীতি বা le mot juste অর্থাৎ যথার্থ শব্দপ্রয়োগকৌশল পাঠক ও লেখকদের চমৎকৃত করেছিল, মপাসাঁ প্রথম যৌবনে সেই ফ্লোবেয়রের গভীরতম সান্নিধ্যে আসেন— এ তাঁর পরম সৌভাগ্য। বাল্য-কৈশোরে শেকস্‌পীয়র-প্রীতি ও সাহিত্যরসিক শিক্ষকের সাহচর্য এবং পরিণত বয়সে ফ্লোবেয়রের আদর্শ ও উপদেশ তাঁকে লেখক থেকে শিল্পীতে রূপান্তরিত করেছিল। ফ্লোবেয়রের সঙ্গে তাঁর মাতুলবংশের পরিচয় ছিল, সেই সূত্রে তিনি এই বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে পরিচিত হন। শুধু পরিচয় নয়, ছ'-সাত বছর ধরে তিনি ফ্লোবেয়রের কাছে নিত্য যাতায়াত করতেন, গল্প রচনায় শিক্ষানবিশি করতেন— এককথায় ফ্লোবেয়র ছিলেন মপাসাঁর একমাত্র আদর্শ। ফ্লোবেয়রের সঙ্গীসাথী তুর্গেনিভ, দোদে, জোলা প্রভৃতি লেখকদের সঙ্গেও যুবক মপাসাঁ পরিচিত হলেন। এই নবীন লেখক প্রবীণ ফ্লোবেয়রের কাছ থেকে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন— জীবন সম্বন্ধে নিস্পৃহ বাস্তব দৃষ্টি এবং সংযত পরিমিত মাপাজোখা বাক্‌রীতি।

১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) আরও কয়েকজন তরুণ লেখকের গল্পসহ একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। জোলা নিজের সাহিত্য দৃষ্টিতে ফ্লোবেয়রের বাস্তব ভঙ্গীতেই সন্তুষ্ট হলেন না বা সেখানেই থেমে থাকলেন না, তাকে অতিক্রম করে প্রকৃতিবাদে (Naturalism) পৌঁছাতে চেষ্টা করলেন এবং জীবনকে বৈজ্ঞানিকের মতো তন্ন তন্ন করে ছিঁড়ে খুঁড়ে তার আসল স্বরূপ উপলব্ধি করার দিকেই ঝুঁকলেন। সমকালীন মানুষকে তিনি সমাজ-পেরিপ্রেক্ষিতে-আবির্ভূত দ্বিপদ জীবনের আধুনিক সংস্করণ বলে মনে করলেন। যে-সমস্ত তরুণ লেখক এই ধরনের মনোভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন জোলা স্বভাবতই তাঁদের উৎসাহ দিতেন। তাঁরই উৎসাহে ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের দিকে তাঁর একটি গল্পসহ কয়েকজন তরুণ লেখকের গল্প নিয়ে যে সঙ্কলন প্রকাশের চেষ্টা করতে লাগল, মপাসাঁকে তিনি তাতে একটি

---

* চার্লস পিয়ের বোদলেয়র (১৮২১-৬৭)-এর ব্যক্তিগত জীবন খানিকটা মপাসাঁর মতো। তিনি মপাসাঁর মতো অল্প বয়সে রোগে ভুগে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে প্রায় পাগল হয়ে যান। এমন কি শেষ জীবনে নিজের নামটাও মনে করতে পারতেন না, আর্শিতে দেখে নিজের মুখও চিনতে পারতেন না।

গল্প দিতে বললেন। এই সঙ্কলনটি ঐ ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দেই Les Soire'es de Me'dan নামে প্রকাশিত হল। এর লেখক হলেন স্বয়ং জোলা, মপাসাঁ এবং আরও চারজন তরুণ লেখক।* জোলা একটি গল্প (Attaqua du Moulin) দিলেন তরুণ লেখকদের উৎসাহ দেবার জন্য। তাঁরই অনুরোধে মপাসাঁ উক্ত সঙ্কলনে লিখলেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থ— 'চর্বির তাল' (Boule de Suif) এটি তাঁর স্বনামে-লেখা প্রথম গল্প—প্রথম গল্প, কিন্তু প্রাথমিক ত্রুটিবিচ্যুতি, দুর্বলতা, বিহ্বলতা নেই। এর পূর্বেও তিনি অনেক গল্প লিখেছিলেন, অবশ্য নাম গোপন করে। কোন কোন সাময়িকপত্রে এগুলি প্রকাশিতও হয়েছিল। তবে তাঁর 'চর্বির তাল' গল্পটিকেই স্বনামে লেখা প্রথম মুদ্রিত গল্প বলে ধরতে হবে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, তারও আগে নাকি 'সাইমনের বাবা' গল্পটি লেখা হয়েছিল।

তাঁর প্রথম গল্প তাঁকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দিল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখায় মেতে উঠলেন। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ও গ্রন্থ—ব্যবসায়ীরা তাঁর দুয়ারে ধর্ণা দিতে লাগল— গল্প চাই, আরও গল্প। কারণ প্যারিস তখন তাঁর গল্পের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে, সালোঁতে সালোঁতে তার গল্প নিয়ে আলোচনা চলেছে। অবশ্য শিষ্যের এই গৌরব ফ্লোবেয়র দেখে যেতে পারেননি, মপাসাঁর 'চর্বির তাল' প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্লোবেয়রের মৃত্যু হয়।

মপাসাঁ ক্রমাগত লিখে চলেছেন—তিনশ' গল্প, ছ'টি উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী—কী নয়? সব লেখা একসঙ্গে প্রকাশ করলে ত্রিশখানি মোটা মোটা খন্ড হতে পারে। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে ছদ্মনামে লেখা তাঁর রচনাগুলিকে না হয় হিসেব থেকে বাদ দেওয়াই গেল। ছোটগল্পে তিনি ফরাসী জাতির বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজকে অসীম কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুললেন, যেন তাদের নতুন করে সৃষ্টি করলেন। নর্মান্ডির কৃষক, অভিজাত সমাজ, প্যারিসের উঠতি বড়লোক, পড়্তি ধনী, দরিদ্র কেরাণী, নানা জাতের স্ত্রীচরিত্র—সমস্ত কিছুকে আশ্চর্য নিস্পৃহতা অথচ সহৃদয়তার সঙ্গে ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর ফলপ্রসূ গৌরবোজ্জ্বল সাহিত্যজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, বড় জোর দশ-এগারো বছর এর পরমায়ু। ১৮৮০ থেকে ১৮৯১ সাল— এই ক'বছরেই তিনি বিশ্বের ছোটগল্পকে একশ' বছর এগিয়ে দিয়ে গেলেন। জীবিতকালেই তাঁর গল্প বিদ্বম্মলীতে স্বীকৃত হয়েছে, লেখকরা তাঁর রীতি ও আঙ্গিক অনুসরণ করেছেন, এমন কি ক্লাসিক লেখকের মতো তাঁর গল্প শিক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে।

সরস্বতীর কৃপায় মপাসাঁ লক্ষ্মীর কৃপাও লাভ করেছেন, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গল্প লিখে বিপুল অর্থোপার্জনের আদর্শ পৃথিবীতে তিনিই স্থাপন করেছেন। প্রকাশকদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট পারিশ্রমিক পেয়েছেন, দরিদ্র কেরাণী এবার ধনী মতো

* এই চারজন হলেন Huysmans, Ceard, Hennique এবং Alexis। পরে এঁরা সাহিত্যজগতে সুপরিচিত হয়েছিলেন, কেউ কেউ শেষে জোলার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র ধারায় চলতে আরম্ভ করেন। হুসমান শেষজীবনে পুরোপুরি অধ্যাত্মবাদী ক্যাথলিক মতে প্রবেশ করেন।

আরামবহুল জীবনের মুখ দেখলেন, একাধিক ভিলা ক্রয় করলেন, মা ও ছোট ভাইকে প্রচুর অর্থসাহায্য করতে লাগলেন। দুঃস্থ সাহিত্যিকেরাও তাঁর উদার অকৃপণ হৃদয়ের স্পর্শ পেলেন, অনেককেই তিনি আর্থিক সাহায্য করতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মপাসাঁ বেপরোয়া হলেও শেষদিকে শারীরিক ব্যাধি এবং তাঁর ফলস্বরূপ মানসিক বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হলেন—সে কাহিনী বড় বেদনাদায়ক! কেরাণীজীবনে এবং প্রথম দিকের সাহিত্যে শিক্ষানবিশিকালে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। স্বাস্থ্যহানি হওয়ার অন্য কারণও ছিল। অতিপরিশ্রমে ক্ষয়ব্যাধিতে তাঁর মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু তা হল না। প্রথম যৌবনের অনাচার ও লাম্পট্যের ফলে তিনি দুরারোগ্য উপদংশ ব্যাধির দ্বারা ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হলেন। তখন য়ুরোপে সিফিলিস ও গণোরিয়ার ভালো চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেওয়ার ফলে তাঁর শরীরের উপর ব্যাধির চাবুক পড়ল। অনুমান করতে বাধা নেই, নারীঘটিত ব্যাপারে তিনি ছিলেন বোহেমিয়ান— ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন্ ফরাসী সাহিত্যিকই বা ছিলেন না? তাঁর বহু রচনায় নরনারীর যৌনজীবন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে বেআব্রু বর্ণনা আছে, যার কিছুটা পর্নোগ্রাফির ধার ঘেঁষে যায়, এবং যার ফলে, টলস্টয় তাঁর প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়েও, এই বিরংসাতপ্ত লোল বর্ণনার জন্য তাঁকে নানা প্রসঙ্গে ভর্ৎসনা করেছেন— সে সমস্ত গল্পকাহিনীর কাল্পনিক ব্যাপারের মূলে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, নৈরাশ্য ও অশান্তির করাল অঙ্গুলিপেষণ আছে কিনা মনোবৈজ্ঞানিকেরা বিবেচনা করবেন। সে যাই হোক, সিফিলিসের বিষ প্রথমে তাঁর দেহকে নিস্তেজ করে আনল; বিশাল, দীর্ঘ, ঋজুদেহী এই নর্মান ক্রমেই নুব্জ হয়ে পড়লেন। বহু ডাক্তার বৈদ্যের শরণাপন্ন হলেন কিন্তু এই নির্মম, 'ফেরঙ্গ ব্যাধি' থেকে তাঁকে কেউ মুক্ত করতে পারল না। ক্রমে দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হল, শরীরের সামর্থ্য চলে গেল— তবু তিনি লিখে চললেন। অবশেষে সিফিলিস দানব তাঁর মনের উপর প্রখর নখরাঘাত করল। ইতিমধ্যে আবার তাঁর ছোট ভাই উন্মত্ততারোগে আক্রান্ত হয়ে পাগলাগারদে আশ্রয় নিলেন, পরে সেই অবস্থায় মারা গেলেন। কনিষ্ঠের এই শোচনীয় পরিণাম দেখে তিনি ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরও কি ঐ একই পরিণাম নাকি? ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রথম বুঝতে পারলেন, তাঁর মানসিক সুস্থতা বিদায় নিতে চলেছে। বোধহয় তিনিও কনিষ্ঠের মতো পাগল হয়ে যাবেন। ভাবলেন, পাগল হওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

মপাসাঁ দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর অনুরাগী ও বিশ্বস্ত পরিচালক ফ্রাঁসয় দু'বারই তাঁকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করলেও পাগলাগারদের লৌহবেষ্টনী থেকে তাঁকে আর রক্ষা করা গেল না। উন্মাদ মপাসাঁ কনিষ্ঠের মতোই পাগলাগারদে অবরুদ্ধ হলেন। মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হল, সেই বিকল মানসিক অবস্থায় দেহেমনে জীর্ণ হয়ে মপাসাঁ মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে (১৮৯৩) কবরের হিমস্তব্ধ অন্তরালে শেষ শয্যা নিলেন।

স্ফূর্তিবাজ মপাসাঁ হয়তো তন্ন তন্ন করে নারীদেহ খুঁজেছেন, কোথায় তাঁর সেই হারানো আধখানা, প্লেটো তাঁর Symposium-এ যার কথা বলেছেন। তাই উত্তরজীবনে

মপাসাঁ বিষণ্ন, নিরুৎসুক ও একাকী। কি ভয়াবহ সেই নির্জন একাকীত্ব। 'নিঃসঙ্গতা' (Solitude) গল্পটি কি তাঁরই আত্মজীবনীর ছিন্নপত্র?

একদিন রাত্রে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে নৈশাহার সেরে খুশি-খুশি মনে লেখক ও তাঁর এক পুরাতন বন্ধু রাস্তায় পদচারণা করছেন। প্যারিসের গভীর রাত্রি। জনকোলাহল নেই, শান্ত নীরব ছায়াচ্ছন্ন তরুবীথিকায় দু' বন্ধু হেঁটে চলেছেন। বন্ধুটি মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন: আমরা কেউ কাউকে চিনি না, বুঝি না, মরুপ্রান্তরের মধ্যে আমরা যেন একাকী হেঁটে চলেছি। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, কাছে আসি, কিন্তু অপরিচয়ের দেওয়াল কিছুতে অতিক্রম করতে পারি না। নারীসাহচর্যে আমরা আরও বেশী করে বুঝি যে, আমরা কত একা-একা, একের সঙ্গে অপরে কত অপরিচিত। যখন মিলনমুহূর্তে আমাদের দ্বৈতসত্তা এক হয়ে যায়, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করি, কত একা আমি—পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে আমার দুস্তর ব্যবধান। দে মুসে তাই বুঝি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন—

Who comes? Who calls me? No one—
I am alone. One O'clock strikes
O Solitude! O Misery!

রাত্রি গভীর। বিদায় নেবার সময়ে বন্ধুটি লেখককে বললেন: "As to myself, now I have closed my soul. I tell no more to any body what I believe. what I think or what I love knowing myself condemned to this horrible solitude. I look upon things without expressing my opinion. What matter to me opinions, quarrels pleasures or beliefs! Being unable to participate with any one. I have withdrawn myself from all."

এই যে জগৎ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা, মপাসাঁ কি শেষজীবনে এই একাকীত্ববোধের দ্বারা অধিকতর পীড়িত হয়েছিলেন? তাঁর গল্প-কাহিনীতে অনেক হাল্‌কা ছবি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, নৈরাশ্য, পীড়ন, নির্মমতা, ভন্ডামি ও অনাবৃত যৌনজীবনের বাস্তব চিত্র আছে। দুঃখী নরনারীর প্রতি আছে অন্তহীন সহানুভূতি, অভিজাত সমাজের ভন্ডামির প্রতি তীব্র-তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাস্ত্র বর্ষণ। তবু মনে হয় জনারণ্যের মধ্যে মপাসাঁ যেন একাকী, নিঃসঙ্গ, উদাসীন।

মাঝে মাঝে তিনিও কি মেতরলিংক্‌-এর নাটকের মতো মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেতেন? তাঁর Bel-Ami উপন্যাসে জীবনের গভীর প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। তাতে এক বৃদ্ধ কবি একজন তরুণকে বলেছেন 'সেই বুড়িটা আমাকে ধরে ফেলেছে, আমার দাঁত কেড়ে নিয়েছে, চুল তুলে ফেলেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেঁকেচুরে অবশ হয়ে আসছে, এবার আমাকে সে গিলে খাবে। এখন আমি পুরোপুরি তার কব্জার মধ্যে চলে গেছি। বিড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে, সেও আমাকে নিয়ে সেইভাবে খেলা করছে। কারণ সে জানে আমি পালাতে পারব না। খ্যাতি, ঐশ্বর্য—এসবে কি হবে?

এই নিরন্তর মৃত্যুভীতির মধ্যে একমাত্র নারীর প্রেমই সান্ত্বনা—কিন্তু তাও ভাগ্যে জোটে না, অথবা মৃত্যু এসে প্রিয়াকেও গ্রাস করে। পরে স্বাস্থ্য হরণ করে, শক্তি কেড়ে নেয়— অবশেষে জীবনটাকে গ্রাস করে। সকলের ভাগ্যই এইরকম, তার হাত থেকে কেউ বাঁচবে না।'

হয়তো মপাসাঁ নিজের বিষণ্ণ অস্তিত্ব থেকে জীবনের নিদারুণ পরিণাম বুঝতে পেরেছিলেন। সারাজীবন তিনি কি খুঁজেছেন? নারীর দেহ, না দেহাতিরিক্ত প্রেম। অবহেলিতকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেওয়া, অভিজাত সমাজের নষ্টামিকে আঘাত করা—এসব কি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল? টলস্টয় যাকে বলেছেন "Painful condition of isolation, spiritual isolation of man." তিনি কি সেই "isolation"-এর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন? প্রত্যক্ষতঃ তিনি এর জবাব দেননি। কিন্তু তাঁর রচনা থেকে মাঝে-মাঝে মনে হয়, তিনি বোধহয় মৃত্যুবৃদ্ধার পদধ্বনি শুনেছিলেন, জীবনে একা থাকার ব্যথা, নির্জনতার যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও তখন তাঁর চারিদিকে অসংখ্য মুগ্ধ ভক্তের আনাগোনা চলেছে। সেই যাই হোক, মপাসাঁ এখনও পর্যন্ত অসাধারণ জনপ্রিয় লেখক। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ সভ্য ভাষায় তাঁর বহু গল্পের অনুবাদ হয়েছে, দেশে দেশে গল্পলেখকরা তাঁকে শিরোধার্য করেছেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের Illustrated London News পত্রিকায় জর্জ ম্যুর বলেছিলেন, জনপ্রিয় লেখকদের আয়ু বড়জোর পঞ্চাশ বছর। মপাসাঁর ছোটগল্প তা মিথ্যা প্রমাণ করেছে। তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু পাঠকমহলে সঞ্চারিত হয়নি, লেখক সমাজেও তিনি সমভাবে বল্লভতা লাভ করেছেন। একালের পাশ্চাত্য জগতের খ্যাত-অখ্যাত সাহিত্যিকেরা সকলেই অল্পাধিক মপাসাঁর মানস-সন্তান। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুর প্রতি কেউ আকৃষ্ট, কেউ তাঁর রচনার "simplicity, lucidity, restraint and remorseless insight"-এর জন্য যে-কোন গল্প লেখকের তুলনায় তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চান। শুধু তাঁর সাহিত্যাদর্শ নয়, কেউ কেউ তাঁর জীবনযাপনের প্রণালীকেও নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে উৎসুক।

অবশ্য কেউ কেউ *বলবেন, তাঁর প্রতিভা বিচিত্র হলেও বিশাল নয়, ব্যাপক হলেওগভীর নয়, চিত্তহারী হলেও হৃদয়বিদারী নয়। তার কারণ মুখ্যতঃ মপাসাঁ ছোটগল্প লেখক। মহাকাব্য, নাটক, এমন কি উপন্যাসেও যে ধরনের বিশালতা ও গভীরতা সৃষ্টি করা যায়, ছোটগল্পে বোধ হয় ততটা সম্ভব নয়। মপাসাঁ ছ'খানি উপন্যাস

---

* Yet if technical Perfection is a great asset for a writer, it does not include all other virtues; the art of Maupassant is admirable, but one can admire without loving it supremely. His poignant sense of life leaves out too much of life's poetry, of its finer shades, and of what is unutterable in both its sweetness and its misery: one may prefer Chekhov or Katherine Mansfield." (A History of Frence Literature—Kazamian)

লিখেছিলেন। তার দু'একটিতে প্রতিভার স্বাক্ষর থাকলেও ছোটগল্প না লিখে শুধু উপন্যাস লিখলে তিনি তাঁর নিজের দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর প্রতিভার যা কিছু শ্রেষ্ঠ বিকাশ তা হচ্ছে ছোটগল্প। এই ছোটগল্পের মায়ামুকুরে তিনি জীবনের অযুত রূপ প্রতিফলিত করেছেন। তার অনেক পরিচয় এই খন্ডের বাংলা অনুবাদে পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করতে পারবেন।

মপাসাঁ হয়তো প্রথমে মনে করেছিলেন, সুন্দর কিছু পরিবেশন করাই তাঁর প্রধান কাজ ('faire quelque chose de beau')। Pierre et Jean উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন— "Consolez moi, amusezmoi, attristez-moi, attendrissez-moi, faites moi rever, faites mio rire, faites-moi fre'mir faites-moi pleurer, faites-moi penser. Seuls quelques esprits d'e'lite demandent a'l'artiste: faites-moi quelque chose de beaula forme que vous conviendra le mieux d'apres votre temperament." লেখকের কাছে পাঠক প্রত্যাশা করে— লেখক তাকে দুঃখে সান্ত্বনা দেবেন, পুলকিত করবেন, বিষণ্ণ করবেন, পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করবেন, তাকে স্বপ্ন দেখাবেন, হাসাবেন, ভয়ে কাঁপাবেন, কাঁদাবেন, তাকে ভাবিয়ে তুলবেন। কেবল দু'-একজন মরমী পাঠক চাইবে—লেখক যেন নিজের মতো করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন।

পাঠকের হুকুম মেনে নিজের সাহিত্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার পাত্র তিনি ছিলেন না। প্রকৃতিবাদী জোলার দলে কিছুকাল থাকলেও, কোন সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর মানসিক সংযোগ দৃঢ় ছিল না। শিল্প-সাহিত্যগত কোন dogma তাঁকে বেশীদিন পরিচালিত করেনি। এদিক দিয়ে তিনি অতিশয় স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। বিত্তের প্রলোভন বা দলগত ব্যবহার দ্বারা নিজের সাহিত্যরুচিকে কদাচিৎ তিনি প্ররোচিত করেছেন। অথচ তখন একদিকে হুগো এবং অপরদিকে জোলা, ফ্লোবেয়র প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত সাহিত্যগোষ্ঠী ফরাসী সাহিত্যিক ও পাঠকসমাজকে ইচ্ছামতো ঘোরাচ্ছিল, ফেরাচ্ছিল। সেই দলে পুরোপুরি ভিড়ে গেলে তাঁকে দোষ দেওয়া যেত না। কিন্তু মপাসাঁ তাঁর গল্পে বিশেষ দলের মত প্রচার করতে চাননি, বা কোন চিহ্নিত সামাজিক বা দার্শনিক আদর্শকেই গল্পে তুলে ধরবার জন্যে সাহিত্যে অবতীর্ণ হননি। তিনি ধাবমান মিছিল থেকে দুটি-একটি নরনারীকে তুলে নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন। ফ্লোবেয়র-জোলার মতো সাহিত্যের আদর্শগত বা নীতিঘটিত তাঁর কোন জিজ্ঞাসাও ছিল না। তিনি প্রথমতঃ ছিলেন শিল্পী, এবং শেষতও তাই।

মপাসাঁর গল্পের রস কখনও পানকরসের মতো স্বাদু স্নিগ্ধ; কখনও তা তীব্র উত্তেজক গৌড়ী সুরা। কখনও কটু-তিক্ত-কষায়, কখনও সুমিষ্ট মোদকখন্ড, কখনও তিনি চঞ্চল কৌতুকপ্রবণ; নারীদেহের অকারণ অনাবৃত বর্ণনায় উল্লসিত, কখনও নিরুৎসুক, বিষণ্ণ, আত্মলীন— জীবনের অনিবার্য অন্তিম নিয়তির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি। তাই তাঁর গল্পের আবেদন এক-এক জনের মনের কাছে এক-এক রকম। মার্কিনী লেখক ও সমালোচকেরা তাঁকে মাথায় তুলে নৃত্য করেছেন, য়্যুরোপের অনেক লেখকও

তাঁর কাছ থেকে গল্প লেখার আর্ট শিক্ষা করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তিনি জীবন যবনিকা তুলে তার নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে সক্ষম হননি, বা ইচ্ছা করেননি। জোহান বয়ার (Johan Boyer) বলেছেন, "As far as I am concerned, he is the greatest writer France has produced." তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন, তাঁর যা কিছু সাহিত্যকর্ম, সবই মপাসাঁর কাছ থেকে পাওয়া। অপরদিকে সমালোচক লুকাস (F. L. Lucas) মপাসাঁ ও চেখভের তুলনা করে বলেছেন যে, মপাসাঁ চেখভের মতো হৃদয়ের গভীরে নামতে পারেননি, জীবনরহস্যও ততটা উদ্ঘাটিত করতে পারেননি। তাঁর রচনায় কোন রহস্যকুহেলিকা বা অস্পষ্টতা সন্ধ্যার ধূসরধূমল ছায়াপটও নেই। "He is the clear French sunlight with no mists"। টলস্টয় মপাসাঁর রচনাকার্যের প্রচুর প্রশংসা করেছেন. কিন্তু লেখকের অকারণ কামচিত্রাঙ্কন এবং নরনারীর যৌন সম্পর্কের খোলাখুলি বিবরণ আদৌ বরদাস্ত করতে পারেননি। সর্বোপরি এই ফরাসী লেখকের জীবননীতি সম্পর্কে অবহেলা ও উদাসীনতা শ্রেষ্ঠ রুশ মনিষীকে তাঁর প্রতিভার প্রতি প্রতিকূল করে তুলেছিল। বিশেষ ধরনের ধর্ম, নীতি ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য থাকলে রসবোধ যে কি পরিমাণে বিপর্যস্ত হয় টলস্টয়ই তার বড় দৃষ্টান্ত। সেকালের দু' একজন নীতিবাগীশ ফরাসী সমালোচকও মপাসাঁর যৌনবোধের বাড়াবাড়িকে পছন্দ করতেন না। তিনি যে বিচিত্র প্রতিভাধর লেখক, তা পাঠক পাঠিকারা তাঁর গল্প-উপন্যাস থেকেই তাঁর কিছু পরিচয় পাবেন। 'কিছু' এই জন্য বলছি যে, অনুবাদে আসলের পুরো রস পাওয়া যায় না. দুধের স্বাদ আর কবে ঘোলে মেটানো যায়? পরের মুখে ঝাল খাওয়া যেতে পারে. কিন্তু সাহিত্যপাঠে পুরো আনন্দ অনুবাদে নয়, মূল থেকে নিয়ে ভোগ করতে হয়। কিন্তু আয়ু যখন স্বল্প এবং শাস্ত্র যখন বহু, তখন অনুবাদ ছাড়া সাধারণ পাঠকের গত্যন্তর নেই। বলাবাহুল্য এই বইটির বাংলা অনুবাদ বেশ স্বচ্ছন্দ হয়েছে, পড়বার সময়ে কোথাও কোন বাধা উপস্থিত হয় না, খট্‌কা লাগে না। অনুবাদকের এর চেয়ে বড় গৌরব আর কী হতে পারে? বিশেষতঃ এ যখন অনুবাদের অনুবাদ. অর্থাৎ ফরাসীগল্পের ইংরেজী অনুবাদ থেকেই এগুলি বাংলায় অনূদিত হয়েছে—তবু আমার দিক থেকে বলতে পারি লেখকের অনুবাদ বেশ স্বচ্ছন্দ ও আনন্দপ্রদ। পাঠক-পাঠিকা মপাসাঁর এই অনুবাদ থেকে নিজেরাই আনন্দ উপভোগ করুন এবং মপাসাঁ সম্পর্কে মতামত গড়ে তুলুন, অনুবাদকের সঙ্গে আমিও তাই কামনা করি।

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলা বিভাগ,
১৯৬৪

জুলি রোমেন

Julie Romain

দু'বছর আগের এক বসন্তকালে আমি ভূমধ্যসাগর-উপকূল বরাবর হেঁটে চলেছি। স্বপ্নের জগতে বিলুপ্ত ঐ পথে লম্বালম্বি পায়চারি করার চেয়ে সুখকর অনুভূতি কি আর হতে পারে? আপনি হাঁটছেন এক জ্যোতির্ময় ভুবনে সোহাগী বাতাসের মধ্য দিয়ে, কখনো পাহাড়ের ঢালু জায়গায়, কখনো বা সমুদ্র-কিনারে। এবং আপনি স্বপ্ন দেখছেন! কী অতীন্দ্রিয় প্রেম ও দুঃসাহস ঐ ঘন্টা দু'য়েকের পদচারণাকালে ভবঘুরে কল্পনাকে উজ্জীবিত করে রাখে! হাজারো আনন্দঘন প্রত্যাশা মৃদু উষ্ণ বাতাসের মধ্য দিয়ে আপনার মনের তন্ত্রীতে আঘাত করে যায়। মৃদু বাতাসের সঙ্গেই আপনি তাদের গ্রহণ করেন, আপনার অন্তরে তারা সৃষ্টি করে সুখের জন্য স্পৃহা—যে স্পৃহার উৎস ঐ দীর্ঘ পদযাত্রা। সুখময় ভাবনাগুলি ডানা মেলে দেয় এবং পাখির মতন গেয়ে ওঠে।

সেন্ট র‍্যাফেল থেকে ইতালী পর্যন্ত দীর্ঘপথ আমি অতিক্রম করছি। এতো শুধু পথ নয়, যেন চলমান দৃশ্যাবলী,—যে প্রাকৃতিক দৃশ্য পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমের কবিতার প্রেরণাস্থল।

এ রকম একটা ভাবনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি ক্যানানে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা স্থিরপ্রতিজ্ঞ অর্থসন্ধানীদের স্বর্গ, যেখানে এসে জড়ো হয় যত রাজ্যের জুয়ারীরা, এই মনোরম উলঙ্গ আকাশের নীচে উড়ন্ত-টাকা পাকড়াতে তারা মত্ত। এখানকার গোলাপ-বাগিচায়, লেবু-বনে যতরকমের ক্ষুদ্র অহঙ্কার, কাণ্ডজ্ঞানহীন ছলচাতুরি, নোংরা ধন-লিপ্সা স্ফীত হ'য়ে ওঠে; মানুষের আত্মাকে তারা পরিণত করে স্থূল কামনাময়, বুদ্ধিহীন, গর্বিত ও লোভী।

হঠাৎ পাহাড় ও পথের হালকা রঙ একটি বাঁক-মুখে আমি গুটিকয়েক বাগান-বাড়িকে দেখতে পেলাম। সংখ্যায় তারা চার-পাঁচটির বেশী নয় এবং সব কয়টিই পাহাড়ের সানুদেশে, দুই বিশাল উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র ও গহন পাইন বনের মধ্যবর্তী স্থানে। উপত্যকার মাঝ বরাবর কোন পথ-রেখা দৃষ্ট হয় না; সম্ভবত ওখান থেকে আগমন ও নির্গমনের কোন দুয়ারই খোলা নেই।

কাঠের তৈরি কুটিরগুলির মধ্যে একটি এমন শোভা আছে যে আমি তার দরজার সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ি। তামাটে রঙের কিছু কাঠ থাকে থাকে সাজিয়ে এটি একটি ছোট্ট সাদা বাড়ি, যার গোটা ছাদটা লতিয়ে-ওঠা গোলাপ গাছ ও গোলাপ ফুলে আচ্ছাদিত।

এবং লক্ষণীয় এর বাগানখানা—বিবিধ চেহারার হরেক রঙের খাপছাড়া ভাবে ছড়ানো ছিটনো অজস্র ফুটন্ত গোলাপের বিশৃঙ্খল, বুনো অথচ যেন এক প্রকৃত গালিচা পাতা। এগিয়ে এসে তারা লনটুকুও দখল করে বসে আছে। ছাদের প্রতিটি

খাঁজের মধ্যে গোলাপেরা উঁকিঝুঁকি মারে। গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ অথবা হলুদ রঙ যেন জানালা বেয়ে ঝরে পড়ছে অস্পষ্ট দেয়ালের ওপর। ফোঁটা ফোঁটা রক্তের মতন লতানো ফুলগুলি ঝুলছে এই আশ্চর্য বাড়ির বারান্দার প্রতিটি পাথরের পিলারে।

বাড়ির পিছনে দেখছি, লেবু-বন আচ্ছাদিত দীর্ঘ ও সংকীর্ণ পথের ফালি পৌঁছে গেছে সোজা পাহাড়ের পায়ের কাছে।

দরজায় ছোট ছোট সোনালী হরফে লেখা: "ভিলা দ্যঁ এন্‌তান্‌।"

বিস্মিত হয়ে ভাবি, কোন কবি বা পরীর নিবাস এটি! কোন সংসার ত্যাগী প্রাণ এমন নন্দন-কাননের আবিষ্কারক এবং কোন প্রেরণায় তিনি অমন একটি স্বপ্নিল আবাস গড়ে তুলেছিলেন। ফুলের স্তবকে স্তবকে আজও সেই অনুভূতি যেন সঞ্চারিত।

অদূরে রাস্তার পাশে বসে একজন মজুর পাথর ভাঙছিল। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, এই রত্নময় আবাসের মালিক কে?

'জুলি রোমেন।—' সে জবাব দেয়।

জুলি রোমেন!

আমি যে নামের সঙ্গে সুদূর শৈশবে পরিচিত হয়েছিলাম! রেচিলের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সুখ্যাতা অবিসংবাদী অভিনেত্রী!

কোন নারীর উদ্দেশ্যেই আজ পর্যন্ত অত সোচ্চার প্রশংসা-বাণী উচ্চারিত হয়নি। তাঁর মতন প্রেম ও অনুরাগ আর কোন মহিলার ভাগ্যেই বা জুটেছে? বিশেষতঃ তাঁর মতন প্রেম-ধন্যা রমণী দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর কৃপাদৃষ্টির জন্য কত না ডুয়েল লড়া হয়েছিল, কতজন করেছিল আত্মহত্যা!

কত বয়স এখন এই 'সারসী'র* ?

ষাট, সত্তর, পঁচাত্তর? জুলি রোমেন! এখানে, এই বাড়িতে!

এই সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও শ্রেষ্ঠতম কবি।

এখনো মনে আছে, কি দারুণ উত্তেজনায় সেদিন (আমার বয়স তখন বছর বারো) তামাম ফ্রান্স কেঁপে উঠেছিল, যখন দেশময় রটে গেল-গায়কের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে কবিকে নিয়ে সিসিলির পথে পাড়ি জমিয়েছেন জুলি রোমেন।

সেই সন্ধ্যায় তিনি অপেরার দর্শকদের সামনে মাত্র আধঘন্টার জন্য উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু এরপর এগারোবার পর্দা ওঠা বা নামার সময় দর্শকরা আকুল হয়ে তাঁকে দেখতে চেয়েছে।

কবির সঙ্গে দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তিনি মিলিয়ে গেলেন। দুই বা ততোধিক ঘোড়ায় টানা গাড়ি ব্যবহৃত হতো সেই যুগে। তাঁরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করতে গেলেন প্রাচীন সুসভ্য দ্বীপ, গ্রীসের মানস-কন্যা—সিসিলিতে। সিসিলির বিশাল ছায়াঘন কমলালেবুবীথি ঘিরে আছে পেলারমোকে, যার নতুন নামকরণ—'কংক দ্যঁ অর'।

কিভাবে তাঁরা অতিক্রম করলেন এটানের সোপানশ্রেণী, কিভাবে ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর ঝুলতে ঝুলতে পার হয়ে গেলেন, কিভাবে বাহুতে বাহু বদ্ধ রেখে গালে গাল ঠেকিয়ে তারা হয়েছিলেন অপরূপ, গভীরতায়—ইত্যাকার গাথাগুলি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

*হোমার রচিত 'ওডিসি'র এক মায়াবিনী নারী চরিত্রের নাম সারসী।

যিনি এই আলোড়নকারী কবিতা লিখেছিলেন, তিনি আজ মৃত। কিন্তু তাঁর কবিতার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে গোটা সমকালীন যুগই বুঝি ছিল দিশাহারা। এর অন্তর্দর্শী আবেদন, রহস্যময়তা নতুন যুগের কবিদের কাছে অন্যভুবনের সন্ধান দিয়েছিল।

আর দ্বিতীয়জন, যাঁকে এই মহিলা ত্যাগ করেছিলেন, তিনিও আজ জীবিত নেই। তিনি প্রেয়সীর জন্য সৃষ্টি করেছিলেন এমন সব স্বরমধুর সংগীত যা প্রত্যেক জীবিত মানুষের স্মৃতিতে আজও অম্লান। যুগপৎ উল্লাস ও নৈরাশ্যের সুর-ঝংকার মানুষের শরীর থেকে যেন তার হৃৎপিণ্ডকে তুলে আনতো।

এবং সেই মহিলা রয়েছেন এখানে,—এই পুষ্পিত কুটিরে!

মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে আমি বেল বাজালাম।

বছর আঠারোর ছোটখাটো চেহারার অপরিচ্ছন্ন একটি চাকর নোংরা হাতে দরজা খুলে দাঁড়ায়। আমি আমার কার্ডে বৃদ্ধা অভিনেত্রীর প্রতি শুভেচ্ছাস্তুতি লিখে একান্ত আগ্রহ জানাই, তিনি যেন আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেন।

হয়তো উনি আমার নাম জানেন: আমার জন্য দরজা খুলে দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না।

বার্তাবাহক ছোকরাটি চলে যায়, তারপর আবার ফিরে আসে; আমাকে অনুসরণ করতে বলে।...সে আমাকে লুই ফিলীপীর কায়দায় কঠিন ও সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো একখানা ঘরে প্রবেশ করতে ইঙ্গিত করে। ঐ ঘরে দেখতে পাচ্ছি, পুরাকালীন বড় বড় আসবাবপত্র; ষোলো বছরের বেশ রুগ্ন কিন্তু সুন্দর মুখশ্রীর পরিচারিকা আমার সম্মানেই ঘর-দোর আরও ফিটফাট করতে থাকে।

আমি এখন এই ঘরে একমাত্র অনুপ্রবেশকারী।

দেয়ালে ঝুলছে তিনজনের প্রতিমূর্তি। একটি অভিনয়রত অভিনেত্রীর; দ্বিতীয়টি ফ্রক-কোট ও শীতের জামা পরিহিত কবির; অন্যটি গায়কের—বাজনার সামনে বসে আছেন।

ছবিতে অভিনেত্রী রূপসী, আকর্ষণীয়া, নীলাক্ষি,; সেই যুগ-অনুযায়ী তাঁর পারিপাট্য, মুখাবয়বে মোহিনী হাসি। ছবি তিনটি আঁকা হয়েছিল ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঁকা সুচারু ও প্রাণহীন ছবি। তাঁরা যেন তখনও তাঁদের উত্তমপুরুষদের উপর নিজেদের প্রভাব লক্ষ্য করছেন!

যে দিনগুলি হারিয়ে গেছে, যা আজ নিছকই অতীত, ছবি তিনটি তাদের কথাই বলছে।

দরজা খুলে গেল। প্রবেশ করলেন—ছোটখাটো চেহারার এক মহিলা; বয়স অনেক, অতি বৃদ্ধা, খুবই ছোট্ট দেহখানা তাঁর। সাদা চুল, সাদা ভুরু, দেখে মনে হয়, যেন একটি প্রকৃতই সাদা ইঁদুর নিঃশব্দ ও দ্রুতপায়ে এ ঘরে এসে ঢুকছে।

তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, সুন্দর স্পষ্ট গলায় বললেন, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। তোমার মতন একজন যুবক আমার মতন এক বৃদ্ধাকে তবু দয়া করে মনে রেখেছে! বসো।'

আমি একে একে বর্ণনা করি,—তাঁর বাড়িখানা দেখে আমি কত মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং যখন মালকিনীর নাম জানতে পারলাম তখন আর দরজায় ধাক্কা না দিয়ে পারিনি!

'আমার আনন্দ আরো গভীর,' তিনি বললেন, 'কারণ, এখানে এই প্রথম এমন একটি ঘটনা ঘটলো। যখন তোমার সুন্দর লেখা সহ কার্ডখানা আমার হাতে এসে পৌঁছলো, আমি এতটা কেঁপে উঠেছিলাম যেন কুড়ি বছর পর পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মুলাকাৎ হতে চলেছে।

দেখছ তো, আমি আজ মৃত! কেউ আর আমার খোঁজ রাখে না। মৃত্যুর শেষ দিনটি অব্দি কেউ আমাকে নিয়ে ভাববেও না। শুধু মারা যাবার পর দিন তিনেক ধরে সংবাদপত্রগুলি ব্যস্ত থাকবে জুলি রোমেনের জন্য। তখন তারা আমার জীবনের বিশেষ ঘটনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করবে, প্রশংসা করবে। তারপর আমার সব শেষ।'

তিনি থামলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার বলতে আরম্ভ করেন, 'এবং সেই পরিণতি ঘনায়মান। মাত্র কয়েক মাস অথবা কয়েকদিন পর এই সাধারণ জীবিত মহিলার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না, শুধুমাত্র ছোট্ট একটা কঙ্কাল ছাড়া!'

তিনি চোখের পাতা মেলে তাকালেন নিজের ছবির দিকে। ছবিটা যেন হাসছে এই বৃদ্ধাকে দেখে। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তিনি অপর দুই প্রতিকৃতির দিকে তাকান—গর্বিত কবি ও উৎসাহী সংগীতজ্ঞ; ওঁরাও যেন বলছেন: "ওহে বিগত-যৌবনা, আমাদের কাছে তোমার আর কি করার আছে!"

বিজাতীয় তীব্র দুঃখবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভারাক্রান্ত মনে অনুশোচনা হয় তাঁদের জন্য, যাঁরা জীবিত থেকেও মৃত, যাঁরা গভীর জলে ডুবন্ত মানুষের মতন নিছক অতীত-স্মৃতিকে পাথেয় ক'রে বেঁচে থাকবার সংগ্রামে রত।

আমি আমার আসনে বসে বাইরের একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম,—নিস্ থেকে মোনাকোর পথে তীরগতিতে ছুটে চলেছে কয়েকটি শকট। গাড়ির ভেতরে বসে আছে সুশ্রী, সুখী, উজ্জ্বল শুচিস্মিতা যুবতীরা এবং খুশি খুশি মুখে যুবকরা।

জুলি রোমেন আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ধারণা করতে পারলেন, আমি কি ভাবছি। মৃদু-নরম হাসির সঙ্গে বিষণ্ন সুরে বললেন, 'কেউ চিরদিন বাঁচে না, বেঁচে থাকে না।'

'তবু আপনার জীবন কত আশ্চর্য!' আমি মন্তব্য করি।

গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করেন, 'আশ্চর্য এবং মধুর। সেই জন্যই বর্তমানকে আমি এত এড়িয়ে চলি।'

আমি দেখছি তিনি তাঁর বর্ণময় অতীত নিয়ে কিছু বলতে চাইছেন। আমিও যথেষ্ট সাবধানে কথা বলছি, পাছে কোন কারণে তিনি আঘাত পান।

তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করি।

তিনিও বলে চললেন তাঁর সাফল্য, বাঁধনহারা আনন্দ, বন্ধুদের সাহচর্য—তাঁর বিপুল বিজয়জ্ঞাপক ইতিকথা।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কি থিয়েটারেই প্রকৃত সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন?'

'আরে না, না,'—তিনি জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেন।

আমি হাসি। তিনি আবার বিষন্ন চোখে সেই দুই পুরুষের ছবির দিকে তাকান, বলেন, 'সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম, ওঁদের দু'জনের মধ্যে।'

আমি না বলে পারি না, 'দু'জনের মধ্যে কে আপনার বেশী প্রিয় ছিলেন ?'

'দু'জনই। কখনো কখনো অতীতের কথা ভাবতে গিয়ে দু'জনকেই একে অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। অবশ্য ওঁদের একজনের কথা ভাবলে আজও আমার খুব অনুতাপ হয়।...'

'তা হলে মাদাম, আপনি মানুষের প্রেমের প্রতিই কৃতজ্ঞ। এঁরা দু'জন সেই প্রেমেরই প্রতিভূ।'

'হয়তো তাই। কিন্তু কি বিস্ময়কর এই প্রতিভূরা।'

'কিন্তু এমনও তো হতে পারে, কোন একজন সাধারণ অখ্যাত মানুষ আপনাকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসতেন, যিনি তাঁর সমস্ত জীবন, সমস্ত ধারণা, ভাবনা, তাঁর প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত আপনাকেই নীরবে নিবেদন ক'রে গেছেন। আর সেই সময় এই প্রেমিকদ্বয় আপনাকে দিয়েছেন দুই প্রবল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী—সংগীত এবং কবিতা ?'

তাঁর বিচিত্র স্বর অস্থিরভাবে ধ্বনিত হয়, 'না তুমি যা বলছো, তা নয়। অন্য কোন লোক আমাকে আরো গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু এই দু'জনের প্রেম-পদ্ধতির সঙ্গে দুনিয়ার কোন কিছুরই তুলনা হয় না। তাঁরা দু'জনে আমাকে গান গেয়ে শোনাতো ; পৃথিবীর আর কেউ কোনদিন সেই অলৌকিক গান ঐভাবে গাইতে পারবে না। কি সুখ পেতাম আমি তাদের সাহচর্যে! শব্দ এবং স্বর সাজিয়ে পৃথিবীর আর কোন মানুষ কি অমন মহৎ সৃষ্টির অধিকারী হতে পারবে ? তুমি যদি তোমার প্রেমে স্বর্গীয় সংগীতের মূর্চ্ছনা আনতে পারো, তবে সেই শুষ্ক প্রেমের মূল্য কি ?...তারা জানতো, কিভাবে শব্দের লালিত্যে ও সংগীতের মাধুর্যে একজন রমণীকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হয়। হ্যাঁ, হয়তো আমাদের আবেগে বাস্তবের চেয়ে কল্পনার প্রাধান্য ছিল অধিক। কিন্তু কল্পনা তোমায় নিয়ে যায় মেঘের জগতে, আর বাস্তব সর্বদাই তোমাকে আটকে রাখে শক্ত মাটির সঙ্গে।

আরো অনেকে আমাকে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু একমাত্র ঐ দু'জনের মাধ্যমেই আমি বুঝেছিলাম, প্রেম কি বস্তু। তারাই আমাকে শিখিয়েছিল প্রেমকে মর্যাদা দিতে।'

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি কেঁদে ফেলেন।

তাঁর নিরুচ্চার কান্না অশ্রুবিন্দুতে ঝরে পড়ে।

আমি তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারছি না, তাকিয়ে আছি দূরের আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ পর আবার তাঁকে বলতে শুনি—'তুমি জানো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও বুড়িয়ে যায়। আমি কিন্তু এর ব্যতিক্রম। আমার এই শীর্ণ দেহের বয়স উনসত্তর এবং আমার এই নরম মনের বয়স মাত্র কুড়ি। এবং সেই কারণেই তো ফুল ও স্বপ্নঘেরা পরিবেশে আমি একা থাকি।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা। তিনি ইতিমধ্যে আবেগের রাশ টেনে ধরেছেন, সামান্য হেসে বলেন, 'তুমি হয়তো হেসে উঠবে, যদি জানতে পারো...তুমি যদি দেখো,

কিভাবে আমি আমার সন্ধ্যাগুলি অতিবাহিত করি...সেই মুহূর্তগুলি আমার কাছে অপূর্ব!...পরে আমি নিজের কাছেই লজ্জিত হই, দুঃখবোধ করি!'

তাঁর এই উক্তির তাৎপর্য বুঝবার জন্য বৃথাই বার বার অনুরোধ করি; তিনি আমাকে কিছুতেই ব্যাপারটা খুলে বলতে রাজি হলেন না। তখন আমি ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াই।

'এখনই চলে যাবে?'—তিনি আহত স্বরে বলেন।

জানালাম, 'আমি আজ অবশ্যই মন্টিকার্লোতে ডিনার খাবো।'

তিনি সলজ্জভাবে প্রস্তাব রাখেন, 'আমার সঙ্গে খাবার টেবিলে বসতে তোমার কি আপত্তি আছে? আমি খুব খুশি হবো, যদি মত দাও!'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হ'য়ে গেলাম। তিনি সানন্দে বেল বাজালেন। পরিচারিকাকে প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলে তিনি আমাকে নিয়ে চললেন বাড়ির অপর দিকটাতে।

খাবার ঘর লতানো পাতায় সজ্জিত কাঁচের বারান্দায় ঘেরা। ঐ কাঁচের মধ্য দিয়ে আমি পাহাড়ের সানুদেশ অব্দি বিস্তৃত লেবু-বন আচ্ছাদিত পথরেখা দেখতে পাচ্ছি। একটি ছোট্ট চারা গাছের নীচে নীচু আসন দেখতে পাচ্ছি, সম্ভবতঃ ওখানেই বৃদ্ধা অভিনেত্রী কখনো সখনো বসে থাকেন।

তারপর আমরা নেমে এলাম ফুলের বাগানে। ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনায়মান। উষ্ণ নিরুত্তর সন্ধ্যা মাটির ঘ্রাণ বয়ে আনে।

আমরা যখন টেবিলের সামনে বসেছি, তখন অন্ধকার রীতিমত জমাট বেঁধেছে। খাবার পরিমাণ যেমন প্রচুর, স্বাদও তেমনি অপূর্ব। আমরা এখন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছি,—তিনি এবং আমি। তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁর প্রতি আমার সহানুভূতি কত অকৃত্রিম ও গভীর।

মাত্র দু' আঙুল পরিমাণ মদ তিনি পান করলেন; ফলতঃ তিনি আমার আরো ঘনিষ্ঠ, আরো অকপট।

'এসো আমরা ঐ চাঁদের পানে চেয়ে থাকি'; তিনি বললেন, 'দয়ালু চাঁদ আমায় টানে; ও আমার গোটা আনন্দঘন অতীতের সাক্ষী। মনে হয়, আমার যাবতীয় স্মৃতি লুকিয়ে আছে ওর বুকে; তাই যখনই চাঁদের দিকে তাকাই, স্মৃতিময় দিনগুলি যেন তৎক্ষণাৎ আমার কাছে ফিরে আসে। উপরন্তু...কখনো কখনো অন্ধকারে...দেখতে পাই কি মনোরম দৃশ্য...সুন্দর...রমণীয়...তুমি কল্পনা করতে পারো?...কিন্তু না, আমাকে নির্ঘাৎ ঠাট্টা করবে, উপহাস করবে...আমি পারবো না...আমার সাহস হচ্ছে না...না...না...সত্যি, আমি সাহস পাচ্ছি না।'

আমি মিনতি করি, 'আমাকে দেখান না...কি জিনিস? আমাকে নির্দ্বিধায় বলুন। প্রতিজ্ঞা করছি, হাসবো না...প্রতিজ্ঞা করছি...আমাকে দেখতে দিন।'

তিনি দ্বিধা করছেন। আমি তাঁর শীর্ণ প্রাচীন হিম হাতদুটি নিজের হাতে তুলে নিই; তারপর দুই হাতেই বেশ কয়েকবার চুমু খেলাম, যেমনটি অতীতে তাঁর প্রেমিকেরা করতেন। তিনি কেঁপে উঠলেন। দারুণ সংকোচ তাঁর ভেতরে।

'তুমি প্রতিজ্ঞা করছো,—হাসবে না?'

'হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি।'

'তা হলে এসো।'

উঠে দাঁড়ালেন অভিনেত্রী।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই তাঁর নোংরা চেহারার চাকরটি চেয়ারখানা তুলতে যায়; তিনি নীচু হ'য়ে ওর কানে কানে কি যেন বললেন।

'হ্যাঁ মাদাম,' সে জবাব দেয়, 'এখুনি ব্যবস্থা করছি।'

তিনি আমার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেলেন।

কমলালেবু কুঞ্জে এখন এক অপূর্ব দৃশ্য! আকাশের ভরাট চাঁদ ঐ বনভূমিতে পাতলা রূপালি পথ বিছিয়ে দিয়েছে, হলুদ বালুভূমি ও ঘোর অন্ধকার বনভূমির মধ্যবর্তী এলাকায় আলোর একটি দীর্ঘরেখা। সুফলা গাছগুলি থেকে ভেসে আসা মিষ্টি সুবাস রাতকে আরো রমণীয় ক'রে তুলেছে। কালো ও সবুজবর্ণ ছায়ায় অজস্র মিটি মিটি নক্ষত্রের মতন জ্বলছে নিভছে জোনাকির ঝাঁক।

আমি জোরে বলে উঠি, 'আহ্! এই তো প্রেমের পরিবেশ।'

তিনি হাসলেন, 'সত্যি কি তাই নয়? তাই নয় কি? দাঁড়াও, আরো দেখবে।'

আমাকে পাশে নিয়ে তিনি বসলেন।

'ঠিক এই জন্যই আমি বর্তমানকে উপেক্ষা করি। কিন্তু তোমরা, আধুনিক যুগের লোকেরা হয়তো এর মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারবে না। তোমরা সব দালাল, ব্যবসায়ী, কাজের মানুষ। তোমরা আমাদের কথা বুঝতেও পারো না। এখনকার প্রেম কোন দর্জির প্রাপ্য-না-মিটিয়ে-দেওয়া বিলের সামিল। যদি তুমি মনে করো, ঐ বিলটা তোমার প্রেয়সীর চেয়ে বেশী দামী, তবে সরে দাঁড়াও। কিন্তু তুমি যদি প্রেয়সীর জন্য ঐ সামান্য বিলের টাকাকে উপেক্ষা করতে পারো, তবে অবশ্যই বিল তার প্রাপ্য পেয়ে যাবে—তুমি হবে যথার্থ প্রেমিক। কত মধুর পথ...প্রেম কী রমণীয়।'

তিনি আমার হাত আকর্ষণ করেন।

'দেখো।'

আমি বিস্ময়ে ও পুলকে রোমাঞ্চিত। উপত্যকার প্রত্যন্তে চন্দ্রালোকিত পথের ওপর একজোড়া যুবক-যুবতী পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে তারা আমাদের কাছে চলে আসে, আমাদের সামনেই তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়; গভীর সুখে ছোট ছোট গর্বিত পদক্ষেপে তারা আবার ফিরে যায়। ছেলেটির পরনে গত শতকের উটপাখির পালকে ঢাকা রেশমী কোট। আর মেয়েটি পরেছে ফাঁপানো গাউন, ঝুরঝুরে চুলগুলি সাজানো রয়েছে রাজপরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মতন।

আমাদের থেকে একশ' পা দূরে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে; সংকীর্ণ পথের মধ্যস্থানে দাঁড়িয়ে যেন কোন উৎসবের মৌতাতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে।

সহসা আমি তাদের চিনতে পারি—আরে, এরা তো এই বাড়িরই বেটে-খাটো পরিচারিকা!...এরপরই আমার যা অবস্থা, তাতে হয়তো কৌতুকে-হাসিতে আপনার খিঁচুনি ধরে যেত; আমি শুধু আরো জোরে নিজেকে চেয়ারের সঙ্গে আটকে রাখি। আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়িনি, আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত রেখেছি। অথচ

আমার ভেতর রুদ্ধ হাস্যাবেগ এমন এক অনুরণন তুললো, যেন মনে হচ্ছে যুদ্ধে আমার একখানা পা কাটা পড়েছে এবং আমার গলা ও চোয়াল কাঁপিয়ে একটা শব্দ ঠেলে বের হ'য়ে আসতে চাইছে।

ততক্ষণে কিন্তু ঐ যুগ্মমূর্তি রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন একটি স্বপ্ন ধীরে ধীরে লীন হ'য়ে গেল আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে।

এখন তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। গোটা বাগানটাই বিরাট শূন্যতায় বিষাদমগ্ন।

আমিও ফিরে চলি। ফিরে যাচ্ছি এই কারণে যে, যাতে ঐ দৃশ্য আর আমাকে দেখতে না হয়। আমি বুঝেছি, ঐ অভিনয় চলবে বহুক্ষণ ধরে। ঐ দৃশ্যগুলিই জুলি রোমেনের অতীতকে জাগিয়ে তুলবে—সেই প্রেম, অভিনয়, সৌজন্য,—মনোমুগ্ধকর অতীত আর সত্য-মিথ্যা নিয়ে বাস্তব হ'য়ে উঠবে তার কাছে, যিনি স্বয়ং শক্তিময়ী ও সার্থক প্রেমিকা ছিলেন!

চিতা

The Funeral pile

গত সোমবার এতারতাতে বাপুসাহেব ঘান্তোরাও ঘাটগাও নামক জনৈক ভারতীয় রাজপুরুষ দেহ রেখেছেন। তিনি বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের এক দেশীয় রাজ্য বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের আত্মীয়।

ঘটনাটি ঘটবার দশ দিন আগে থেকেই দশজন ভারতীয় তরুণকে এখানকার রাস্তায় ইতস্তত ভ্রাম্যমান অবস্থায় দেখা গেছে! আকৃতিতে তাঁরা ছোটখাটো, চেহারায় কমনীয় ভাব, গায়ের রঙ রীতিমত কালো,পরনে ধূসর বর্ণের স্যুট এবং মাথায় কাপড়ের টুপি। তাঁরা বিশিষ্ট রাজবংশের, য়ুরোপে এসেছেন এখানকার উন্নত জাতিগুলির কাছ থেকে সামরিক শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। ঐ দলে ছিলেন তিনজন প্রিন্স, একজন তাঁদের সম্ভ্রান্ত বন্ধু, একজন দোভাষী এবং তিনটি চাকর।

এই মিশনের যিনি প্রধান, তিনিই মারা গেছেন। বিয়াল্লিশ বছরের ঐ বৃদ্ধ বরোদার মহামান্য মহারাজা গাইকোয়াড়ের ভাই সম্পৎরাও শোভনরাও গাইকোয়াড়ের শ্বশুর। তাঁর জামাতাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রাজা খেশরাও গাধবের মাসতুতো ভাই গণপৎরাও শোভনরাও গাইকোয়াড়, দোভাষীও সেক্রেটারী বাসুদেবমাধব সমর্থ এবং তিন পরিচারক—রামচন্দ্র বাজাজি, গনুবিন পুকারাম খোটে, রামভাজিবিন চোবজি।

ভদ্রলোক স্বদেশত্যাগ কালেই বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছিলেন ; তাঁর তখন মনে হয়েছিল, এই তাঁর অন্তিমযাত্রা। তাঁর আসবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মাননীয় আত্মীয় বরোদার প্রিন্সের ইচ্ছাতেই দেশত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে।

গ্রীষ্মের শেষ সপ্তাহগুলি কাটাবার জন্য এতারতাতে তাঁদের আগমন। উৎসাহী লোকেরা প্রতিদিন সকালে রোচেস ব্লাঙ্কেস্-স্নানাগারে তাদের স্নান করতে দেখতে পেত।

দিন পাঁচ-ছয় আগে বাপুসাহেব ঘাভোরাও ঘাটগাও প্রথম তাঁর মাড়িতে যন্ত্রণা অনুভব করেন; ক্রমশ মাড়ির ব্যথা সঞ্চারিত হয় কণ্ঠ-নালীতে; কর্কট রোগ—পচন শুরু হয়। সোমবার নাগাদ চিকিৎসকরা তাঁর তরুণ বন্ধুদের জানিয়ে দিলেন, এ রুগীর বাঁচার কোন আশা নেই। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। শেষে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁর সাথীরা তাঁকে ধরাধরি করে বিছানা থেকে তুলে এনে মেঝের ওপর শুইয়ে দেন,—যেন ঈশ্বর ব্রহ্মার বিধানে ধরিত্রী মাতা তাঁর সন্তানকে আশ্রয় দেন।

ঐদিনই তাঁরা মেয়র মঁসিয়ে বুঁসির কাছে মৃতদেহ সৎকারের অনুমতি চেয়ে পাঠান। এটা তাঁদের ধর্মেরই অনুশাসন। মেয়র সামান্য ইতস্তত করে তাঁর ওপরমহলকে এই মর্মে টেলিগ্রাম করলেন যে, যদি সময়মত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না পাওয়া যায় তবে তিনি দাহের অনুমতি দেবেন। যেহেতু রাত ন'টার মধ্যেও কোন উত্তর এলো না, তিনি ওঁদের সৎকারের অনুমতি দিলেন।

তাঁর এই অনুমতির বিরুদ্ধে বলার কিছুই ছিল না। কারণ, তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং দাহ করাই যুক্তিযুক্ত। বুদ্ধিমান ও বিবেচক পৌরপিতা ডাক্তারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটও যোগাড় করে নিয়েছিলেন।

সেই রাতেই এক নাচের আসরে জমাটি পরিবেশ। শরৎ আসবার আগেই শারদীয় আমেজ, ঈষৎ হিমহিমও বটে। সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসে প্রবল বাতাস, যদিও সমুদ্র তরঙ্গসঙ্কুল নয়; ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। মেঘেরা আসছে দূর দিগন্ত থেকে, চাঁদের কাছাকাছি আসবার পর তাদের রং হয় সাদা। মেঘেরা চাঁদকে দ্রুত ঢেকে ফেলে এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য চাঁদ প্রায় অদৃশ্য। এতারতাতে সাগরবেলা ঘিরে আছে যে উত্তুঙ্গ দুই পাহাড়, যাদের বলা হয় 'প্রবেশ পথ' তখন যেন অন্ধকারে ডুব দিয়েছে; চাঁদের আলোতে ঐ পাহাড়দ্বয়ের বিশাল কালো ছায়া বালুবেলার ওপর প্রতিবিম্বিত।

সারাটা দিন ধরে সেদিন বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

নাচের আসরে অর্কেষ্ট্রার তালে তালে চলেছে দ্বৈত ও পুরাকালীন চারিযুগলের নৃত্য।

হঠাৎ সমবেত দর্শকদের মধ্যে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা বলাবলি করছে, হোটেল দ্যঁ বেনসে এইমাত্র একজন ভারতীয় রাজপুরুষ নাকি মারা গেছেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে নাকি শবদাহের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। গল্পটা কারুর কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না; অথবা কেউ কল্পনাও করতে পারলো না, এরকম একটি ঘটনা শীঘ্র ঘটতেও পারে। কারণ, এটা আমাদের সামাজিক নিয়মের বাইরে এবং রাত আরো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যার আবাসে ফিরে যায়।

মধ্যরাতে একে একে পথের হলুদ গ্যাস-বাতিগুলিকে নিভিয়ে দেবার জন্য নির্দিষ্ট লোকটি এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় চক্কর দিতে থাকে। এতক্ষণ ঐ বাতিগুলিই

পাহারা দিচ্ছিলো নিদ্রিত বাড়িগুলিকে, কাদা ও জলাকে। সে একটু থমকে দাঁড়ায়,—তার সামনে তখন শহর শূন্য ও নিরন্ধকার।

বায়না পেয়ে দুপুর থেকে এক ছুতোর সমানে কাঠের টুকরো কেটে চলেছে। অবাক হয়ে সে ভাবে, কি হবে এত কাঠ দিয়ে এবং কেনই বা মূল্যবান কাঠগুলিকে এভাবে নষ্ট করা হলো। একটা দু'চাকার গাড়িতে কাঠগুলিকে বোঝাই করা হলো। এবং যখন সেই বোঝাই গাড়ি ধীরে ধীরে সমুদ্রবেলার দিকে চলেছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন পথচারির কেউ কোন সন্দেহ করেনি।

কাঠ নিয়ে গাড়ি পৌঁছায় পাহাড়ের সানুদেশে। তিন ভারতীয় নফর তখন চিতা প্রস্তুতে লেগে যায়। চিতার পরিমাপ একমানুষের চেয়ে বড়। তারা কাজ করে চলেছে নীরবে,—এই কাজে তাদের সাহায্য করার আর কেউ নেই।

দুপুর একটা নাগাদ মৃতের আত্মীয়দের কাছে খবর গেল, তাঁদের ইচ্ছাপূরণে কোন বাধা নেই। তাঁরা যে ছোট্ট বাড়িতে বাস করতেন, তার দরজা খোলা হলো। সংকীর্ণ স্বল্পালোকিত ঘরের মেঝেতে আমরা দেখতে পেলাম সিল্কের কাপড়ে মোড়া শায়িত ভারতীয় প্রিন্সকে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম।

ভারতীয়রা উঠে দাঁড়ালেন, তাঁরা স্তব্ধ ও পবিত্র। মৃতের পায়ের কাছে বসে তাঁদের একজন একটানা একঘেঁয়ে বিলাপের সুরে দুর্বোধ্য মন্ত্র পাঠ করছেন। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে তিনি মৃত রাজপুরুষকে প্রদক্ষিণ করেন, ওকে স্পর্শ করেন; তারপর তিনটি শিকলে জড়ানো দুটি নলবিশিষ্ট একটি পাত্র থেকে পবিত্র গঙ্গাজল ছিটোতে থাকেন। হিন্দুরা যেখানেই যাক্ সঙ্গে গঙ্গাজল নেবেই।

তাঁদের মধ্যে চারজন শবের মাচা কাঁধে তুলে নেন এবং শ্লথ গতিতে বাড়ির বাইরে চলে আসেন। আকাশে চাঁদ ঢাকা পড়ায় পথ-ঘাট অন্ধকার, জনশূন্য, কর্দমাক্ত। কেবলমাত্র চলমান মাচাটাকেই সজীব বলে মনে হয়। কারণ, মৃতের সিল্কের কাপড়ের দারুণ চাকচিক্য। অন্ধকার রাত্রে ওরকম একটা চকচকে বস্তু পার হয়ে যাওয়া—এ এক অভাবনীয় দৃশ্য।

শববাহকদের গায়ের রং এত কালো যে এই অন্ধকারে তাদের সনাক্ত করাই দুঃসাধ্য। তিনজন ভারতীয় শবযাত্রী, তাঁদের পিছন পিছন চলেছে তাঁদের য়ুরোপীয় বন্ধু দীর্ঘদেহী এক ইংরাজ, যিনি মাথা ও কাঁধের উচ্চতায় এঁদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন।

হিমেল কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের নীচে উত্তরমুখী ভেজা মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি যেন কোন প্রতীকী দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি: মনে হলো, যেন এক বিজিত ভারতীয় প্রতিভার শবযাত্রায় যোগ দিয়েছেন ধূসরবর্ণের দীর্ঘ কোট পরা এক বিজয়ী ইংরাজ প্রতিভা।

চারজন শব-বাহক ঢালুতে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নেন, তারপর আবার পা-পা হাঁটতে থাকেন, রীতিমত হাঁপ ধরে গেছে তাঁদের।

অবশেষে তাঁরা চিতার কাছে পৌঁছে গেলেন। চিতা প্রস্তুত হয়েছে তিনশ' ফিট উঁচু পাহাড়ের গোড়ায় এক গুহার সামনে। চিতার উচ্চতা প্রায় ফুট তিনেক। শব নামানো হলো; একজন ভারতীয় জানতে চাইলেন, ধ্রুবতারা কোন দিকে? তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই মত রাজার পা রাখা হলো তাঁর জন্মভূমির দিকে।

বারো বোতল পেট্রোলিয়ম উপুর করা হয়েছে চিতার ওপর। শব ঢাকা হলো ফার-গাছের তক্তা দিয়ে। এক ঘণ্টা ধরে মৃতের আত্মীয়রা ঐ টুকরো টুকরো কাঠের খন্ড দিয়ে চিতা সাজিয়েছেন।

আরো কুড়ি বোতল তেল ঢালা হল ঐ কাঠের স্তূপে। কয়েক হাত দূরে একটা ব্রোঞ্জের স্পিরিট ল্যাম্প জ্বলছে শব আনার পর থেকেই।

অতঃপর লগ্ন উপস্থিত। আত্মীয়েরা চিতায় আগুন ধরাতে এগিয়েও এলেন। যেহেতু বাতিটা ভালোভাবে জ্বলছিল না, তাঁদের একজন ওতে কিছুটা তেল ঢেলে দেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সহসা আগুনের শিখা দপ্ করে জ্বলে ওঠে, গোটা বিশাল পর্বতগাত্র উজ্জ্বল হয়। যে ভারতীয়টি ল্যাম্পে তেল দিয়েছিলেন, তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তিনি তাঁর দুই বাহু উপরের দিকে তুলে কনুই জোড়া আড়াআড়ি রাখেন, তখনই তাঁর বিরাট কালো ছায়া পাহাড়ের গায়ে এমন এক মূর্তির সৃষ্টি করে, যেন ভগবান বুদ্ধ তাঁর পরিচিত অবয়বে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভারতীয়টির ছোট টুপি যেন ভগবান তথাগতের চুলের ঝুঁটি। দৃশ্যটি এমন আকস্মিক ও তাৎপর্যময় যে, চকিতে আমার মনে এক অলৌকিক প্রতীত এসে ভর করে। এই প্রাচীন পবিত্র দেবমূর্তি বুঝি পূর্বদেশের অন্তঃস্থল হতে ছুটে এসে য়ুরোপে তাঁর সন্তানের অন্তর্জলি-যাত্রা অবলোকন করছেন!

ছায়া অপসারিত হয়।

তাঁরা বাতি হাতে আগুয়ান। সমাধি-স্তূপের ওপর আগুন লাগানো হলো...দ্রুত আগুনের লেলিহান শিখা বিস্তারিত হয় সমস্ত কাঠগুলিতে; গোটা উপকূলভাগ আলোকিত, জলস্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত নুড়িসমূহ ও বালুবেলায় ভেঙ্গে পড়া সাদা ঢেউগুলির মাথায় মাথায় সেই একই ঔজ্জ্বল্য প্রতিফলিত। প্রতি মুহূর্তে আগুনের প্রসার ভয়াল, ক্রমে দূরসমুদ্রেও সেই আগুনের রেখাগুলিকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। প্রচণ্ড জোরে সামুদ্রিক বাতাস ঝাপটা মারে, আগুনের শিখা সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ লেলিহান,—কাঁপা কাঁপা শিখাগুলি কখনো নেমে আসে, কখনো এঁকে বেঁকে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, হাজার হাজার ফুলকি ছিটকে পাহাড়ের গা বেয়ে আলোর গতিতে ছুটে হারিয়ে যাচ্ছে আকাশে—মিশে যাচ্ছে নক্ষত্রের দেশে।

কিছুসংখ্যক সামুদ্রিক পাখির ঘুম ভেঙ্গে যায়; তারা বিলাপ করতে করতে সেই উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ডের ওপর দিয়ে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পাহাড় ও বাঁকগুলি পার হয়ে আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধি-স্তূপটি জ্বলন্ত কাঠের স্তূপে পরিণত হলো। আগুনের রং লাল নয়, সামান্য হলুদ, মৃত্যুর মত হলুদবর্ণ বাতাসের স্পর্শে উজ্জীবিত। হঠাৎ এক দমকা বাতাসের সজোর ঝাপটায় চিতার একাংশ সমুদ্রে ভেঙ্গে পড়ে। মৃতদেহের কিছুটা অংশ আবরণহীন হয়ে পড়ে, স্পষ্ট দেখা যায়—কালো মতন কি একটা কদর্য বস্তু যেন আছে অগ্নি-শয্যায়, পুড়ছে দীর্ঘ নীলাভ শিখায়।

যখন ডান দিক থেকে চিতার একাংশ ভেঙ্গে পড়ে, শবটিকে তখন মানুষের বলে চেনা যায়। অবশ্য খুবই তৎপরতায় নতুন কাঠ সাজিয়ে ভাঙ্গা চিতা জোড়া লাগানো হলো।

আবার পূর্ণ তেজে আগুন জ্বলে উঠলো।

সময়ের স্রোত বেয়ে রাত শেষ হয়, ভোরের আলো ফুটতে থাকে। সকাল পাঁচটা নাগাদ কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না,—শুধু ভস্মের একটি স্তূপ ছাড়া। আত্মীয়রা ঐ চিতাভস্ম কিছুটা তুলে নেন, কিছুটা উড়িয়ে দেন বাতাসে, খানিকটা ভাসিয়ে দেন সমুদ্রে এবং কিছুটা ভস্ম রেখে দেন একটি পাত্রে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবেন বলে। তারপর তাঁরা ফিরে চললেন মৃতের জন্য শেষ বিলাপ করতে করতে।

এইভাবেই এই সব তরুণ ভারতীয় প্রিন্স ও তাঁদের পরিচারকরা খুব সামান্য রসদ দিয়েই বিরল দক্ষতায় ও যথাযথ পবিত্রতায় শবদাহ করলেন। সমস্ত কিছুই সুসম্পন্ন হলো তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে। মৃত পুরুষ এখন পরম শান্তিতে নিদ্রামগ্ন।

পরের দিন এতারতাত শহরে দারুণ চাঞ্চল্য। কেউ কেউ বলছে, একজন জীবন্ত লোককে নাকি পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অন্য অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছে, কোন এক গুরুতর অপরাধ ঢাকা দেওয়া হয়েছে। এ রকমও বলা হলো,—মেয়রের জেল হতে পারে।

আবার অনেকের ধারণা, ভারতীয় রাজপুত্র কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। পুরুষরা হলো বিস্মিত এবং মেয়েরা প্রকাশ করে তাদের ঘৃণা।

সারাটা দিন ধরে পরিত্যক্ত চিতার ধারে জনতার ভিড়,—তারা তখনো উষ্ণ পোড়া কাঠের গাদায় মানুষের হাড় খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেক হাড়ের টুকরোই খুঁজে পাওয়া গেল, যা দিয়ে অন্ততঃ দশটা কঙ্কাল দাঁড় করানো যায়; কারণ, স্থানীয় গ্রামের লোকেরা তাদের মৃত ভেড়াগুলিকে ঐ সমুদ্রচরাতেই ফেলতো। জুয়ারীরা সাবধানে কয়েক টুকরো হাড় তাদের ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেলে; কিন্তু তাদের কেউই মৃত ভারতীয় প্রিন্সের একটুকরো হাড়ও পায়নি।

সেই সন্ধ্যায় একজন সরকারী প্রতিনিধি এলেন ব্যাপারটা তদন্ত করতে। তিনি মোটামুটি ধীর স্থির ও বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু রিপোর্টে কি লিখবেন তিনি? ভারতীয়রা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, যদি ফ্রান্সে তাঁদের শবদাহের অনুমতি না মেলে, তবে তাঁরা ঐ শব বয়ে নিয়ে যাবেন অপেক্ষাকৃত উদার কোন রাষ্ট্রে, যেখানে তাঁরা পারলৌকিক কাজ যথাযথভাবে শেষ করতে পারবেন।

এই ভাবেই আমি এক মৃতজনকে চিতায় ভস্মীভূত হতে দেখলাম। দেখে আমার মনেও বাসনা জাগে, মৃত্যুর পর আমাকেও যেন ঐভাবে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সব কিছুই কত চকিতে শেষ হয়ে গেল! মাসের পর মাস মাটির নীচে পোতা কফিনে না পচার চেয়ে মুহূর্তে মানুষের হাতে ভস্মীভূত হওয়া শ্রেয়তর। দেহ মৃত এবং আত্মা মুক্তিপ্রাপ্ত। পবিত্র আগুন বাতাসে ছড়িয়ে দেয় সেই বস্তু যা একদিন মানুষের আকৃতিতে ছিল; এখন নিছক ভস্ম। অসহনীয় পচন ধরার চেয়ে এই ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া স্বস্তিদায়ক। এটাই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়। স্যাঁতসেঁতে আবদ্ধ কফিনের মধ্যে নিহিত দেহ কালো পূতিগন্ধময় একটা মণ্ডে পরিণত হয়,—কফিনের আধারে ঐভাবে মড়া পচানো দারুণ অপ্রীতিকর ও অত্যাচারের নামান্তর। কর্দমাক্ত গহ্বরে স্থাপিত অন্ধকার কফিন আত্মাকে বিরামহীন যন্ত্রণা দেয়, আর স্বর্গমুখী উড্ডীন চিতার আগুনে খুঁজে পাই মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা।

আমার স্ত্রী

My wife

প্রীতিভোজের শেষে উপস্থিত সকলে—বিবাহিত লোকেরা, পুরনো বন্ধুরা, যাঁরা অতীতে কখনো অবিবাহিতদের মতন স্ত্রীদের সঙ্গে না নিয়ে জমায়েত হতেন, আলোচনায় রত। অনেকক্ষণ ধরে খানাপিনা হয়েছে তাঁদের, প্রচুর মদ্যপানও করেছেন, হরেক বিষয় নিয়ে বাক্যালাপ করছেন নিজেদের মধ্যে, টেনে আনছেন তাঁদের অতীতের মধুময় স্মৃতিকে; আবেগঘন সুখস্মৃতি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তোলে স্মিত হাসি, কম্পন তোলে বুকে।

কে একজন বললেন:

'মনে আছে জর্জ, সেবার মন্টামার্ট্রির দুটি যুবতীসহ কেমন সেন্ট-জর্মনে বেড়াতে গিয়েছিলাম?'

'নিশ্চয়। আছে বৈকি!'

এবং তাঁরা খুটিনাটি হাজার রকমের ব্যাপার দিয়ে স্মৃতিচারণ শুরু করে দেন। আজও সেই অতীত তাঁদের সুখ দেয়।

একসময় তাঁরা বিয়ে নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেকেই যথেষ্ট আন্তরিকতার সুরে বলেন: 'আহা যদি আবার সেই সুযোগ আসতো...।'

জর্জ দ্যু পরদিন বললেন, 'এটা কি আশ্চর্য ব্যাপার নয় যে, তোমরা সব কত সহজেই এতে জড়িয়ে পড়ো! তুমি হয়তো মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতই ছিলে না; তারপর এক বসন্তে বেড়াতে গেলে গ্রামাঞ্চলে, যেখানকার জলবায়ু মনোরম, উষ্ণ-আগুনে গ্রীষ্মকে টের পাওয়া যায়। সমস্ত কিছু প্রস্ফুটিত। সেই সময় এক বন্ধুর বাড়িতে তুমি পরিচিত হলে এক যুবতীর সঙ্গে ...ব্যস, তারপর আর তর সয় না! যা হবার হয়ে গেল। বিবাহিত পুরুষটি হয়ে ফিরে এলে ঘরে।'

পেঁরী লিজেলী উঁচু গলায় বলে ওঠেন: 'ঠিক তাই। কেবল আমার বেলাতেই ঘটনাটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল...'

কথা শেষ হবার আগেই তাঁর বন্ধু বাধা দেন, 'থাক, তোমার অন্ততঃ এ ব্যাপারে অভিযোগের কিছু থাকতে পারে না। তুমি নিশ্চয় এই দুনিয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয়া মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে পেয়েছ। তিনি অপরূপা, নম্র, নিষ্কলঙ্ক। আলবাৎ তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী লোক!'

আগের লোকটি বললেন, 'তার জন্য আমি তো দায়ী নই।'

'কি দায়ী নও?'

'এটা সত্যি যে, আমার স্ত্রীর কোন খুঁত নেই। কিন্তু আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বিয়ে করেছিলাম।'

'কি বাজে বকছো।'

'হ্যাঁ; গল্পটা তবে শোন;—আমি তখন ত্রিশ বছরের যুবক, বিয়ের চাইতে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাই আমার কাছে তখন বেশী সহজ ছিল। যুবতী মেয়েদের মনে হয় নীরস, হৈ-হুল্লোড় করে সময় কাটাতেই ভাল লাগতো।

মে মাসে খুড়তুতো ভাই সাইমন দ্য এরাবেলের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে গেলাম নর্মান্ডিতে। সেটা বাস্তবিক এক নরম্যান বিয়েই বটে। বিকেল পাঁচটায় সকলে টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো এবং এগারোটা পর্যন্ত সমানে চললো তাদের খানাপিনা। আমার পাশটিতে জায়গা নিয়েছিল এক অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের মেয়ে, মিস্ ডুমৌলিন। সামরিক পরিবারে লালিত এক দারুণ চন্‌মনে মেয়ে, নিটোল স্বাস্থ্য, প্রগল্‌ভা। সারাটা দিন সে আমার পিছু ছাড়েনি, কখনো আমাকে নিয়ে পার্কে পায়চারি করেছে, কখনো আমাকে তার নাচের জুটি করেছে; আমি পছন্দ করি বা না করি তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ফলতঃ তার সঙ্গ আমার কাছে একঘেঁয়ে মনে হচ্ছিলো।

আমি নিজেকেই নিজে বললাম: অন্ততঃ আজকের দিনটির জন্য আমাকে এ সব সহ্য করতে হবে। কিন্তু আগামীকাল আমি বরদাস্ত করবো না। অনেক হয়েছে।

রাত প্রায় এগারোটার সময় মেয়েরা যে যার ঘরে শুতে গেল; আর পুরুষরা তখনো বসে রইল ধূমপান করতে, মদ খেতে অথবা মদ খেতে খেতে ধূমপান করতে।

খোলা জানালার মধ্য দিয়ে গ্রাম্য নাচ নজরে আসছিল। গ্রামের ছোকরা-ছুকরীরা গোল হ'য়ে হেঁড়ে গলায় গাইছে আর ধেই ধেই করে নাচছে, ওদের এই বন্য উল্লাসের সঙ্গে বৃথাই তাল মেলাবার চেষ্টা করছে কিচেনটেবিলের ওপর দাঁড়ানো এক বেহালাবাদক ও এক বংশীবাদক। হরেক গলার রৈ রৈ এলোপাথাড়ি চীৎকারে বাজনাগুলি সময় সময় একেবারে তলিয়ে যায়; বাজনার দুর্বল শব্দ গ্রাম্যদের বল্লাহারা কণ্ঠস্বরে যেন আকাশ থেকে টুকরো টুকরো হয়ে আছড়ে পড়ছিল। মশাল দিয়ে ঘিরে রাখা দুটো বিশাল পিঁপেতে মজুত রয়েছে অঢেল মদ। দুটো লোক গ্লাসে তুলে তুলে সেই মদ বিলি করতে দারুণ ব্যস্ত, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব পানার্থীদের পানপাত্র তারা পূর্ণ করে দিচ্ছে, তাদের গ্লাস থেকে প্রতিমুহূর্তে মদের অথবা খাঁটি আপেল থেকে তৈরী পানীয়র রক্তাভ অথবা সোনালী বর্ণ যেন ছুটে বেড়াচ্ছিল।

এবং তৃষ্ণার্ত নাচিয়েরা, প্রশান্তমুখ প্রবীণরা, ঘর্মাক্ত যুবতীরা যে কোন ধরনের পাত্র নিয়েই দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে উত্তেজক পানীয় নিতে, আকণ্ঠ পান করে পিছন দিকে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ফিরে যাচ্ছে তারা।

একটা উন্মুক্ত টেবিলে থরে থরে সাজানো অঢেল রুটি, মাখন, পনির ও মাংসের কাবাব। থেকে থেকে আনন্দ-উৎসারিত প্রত্যেকেই ঐ টেবিল থেকে খাবার তুলে মুখ ভর্তি করে। নক্ষত্রালোকিত আকাশের নীচে এই যে নির্ঝর ধারার উত্তেজক উৎসব, ক্রমশঃ আমার রক্তেও অনুরণন সৃষ্টি করে; ইচ্ছা হয়, স্বয়ং ওদের দলে যোগ দিই, বিশাল পিঁপে থেকে আকণ্ঠ মদ পান করি, মাখন ও কাঁচা পেঁয়াজের সঙ্গে শক্ত রুটি চিবুই।

এমনই এক স্বার্থসত্বহীন উদগ্র বাসনার তাগিদে আমি আমার সঙ্গীদের ছেড়ে ওদের দলে ঝাঁপিয়ে পড়ি, ওদের অনন্ত উৎসবের সামিল হই।

অস্বীকার করছি না, ইতিমধ্যেই নেশায় আমি বেসামাল এবং বর্তমানে ঐ বেসামাল অবস্থাতেই আরো —আরো পানোন্মত্ত।

আমি এক শক্তিময়ী সংঘাতজর্জ্জরা কৃষককন্যার হাত ধরে আমার সান্নিধ্যে টেনে আনি। মদির রোমাঞ্চে ওকে জাপটে ধরে পাগলের মত নাচতে থাকি। নাচতে নাচতে হাঁপ ধরে যায়।

তখন ঐ পিঁপের সামনে দাঁড়িয়ে আরেক প্রস্থ মদ পান হলো আমার। এবার অন্য একটি রসবতী যুবতীকে জাপটে ধরে নিজেকে নতুন করে মাতিয়ে তুলি...আবার এক পাত্র সুরা পান হলো এবং শুরু হ'য়ে গেল আমার এমন দাপাদাপি যেন কেউ বুঝি আমাকে বেঁধে রেখেছে।

আমি বেঁকে-চুরে ত্রিভঙ্গ মূর্তি। ছোকরারা আহ্লাদে আটখানা। তারা আমার ভাব-ভঙ্গী অনুকরণের চেষ্টা করছে। সব মেয়েদেরই বাসনা, রতিরোল্লাসে নাচবে আমার সঙ্গে, গরুর খাদ্য ঘাসের মতন কাঁপতে কাঁপতে দুলতে দুলতে তারা আগুয়ান আমার দিকে।

অবশেষে ভীষণ নাচানাচির পর, গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাবার পর, রাত দুটোয় আমি ক্লান্ত, জড়জঙ্গম—দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্টকর।

আমি কিন্তু আমার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং আমি চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের বিছানায় ফিরে যেতে। গোটা সম্ভ্রান্ত পল্লীনিবাসটিই এখন ঘুমে অচৈতন্য, নিশ্চুপ অন্ধকারময়।

আমার কাছে কোন আলো নেই। যে যার বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। যে মুহূর্তে আমি এ বাড়ির প্রথম ঘরে ঢুকেছি, আমার মাথা ঘুরে যায়। আমি সহজে উপরে উঠবার সিঁড়িই খুঁজে পাচ্ছি না ; হাতড়াতে হাতড়াতে দৈবাৎ রেলিংটা খুঁজে পেলাম, টলতে টলতে ওটাকে খামচে ধরি, প্রথম সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে বুদ্ধির গোড়ায় কিছুটা ধোঁয়া দেবার চেষ্টা করি—আমি এখন কোথায় যাবো ও কি করবো!

হুঁ, মনে পড়েছে, আমার শোবার ঘরটা হচ্ছে দোতলায়, বাঁ দিক থেকে তিন নম্বর দরজা। আমার যে একেবারে বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি, এ মস্ত বড় স্বস্তি। নিজের স্মৃতি ও চেতনা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হয়ে যথেষ্ট মেহনতের সঙ্গে উঠে দাঁড়াই, একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে থাকি,—লোহার রেলিংটা শক্ত হাতেই চেপে ধরে আছি যাতে টলে না পড়ে যাই! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, যাতে কোন শব্দে ঘুমন্ত পুরী সন্ত্রস্ত না হয়।

তিন-চারবার বিপথগামিতায় আমার পা ফস্কে গিয়েছিল এবং প্রতিবারই আমি হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়েছিলাম। শুধুমাত্র হাতের শক্তি ও অঢেল মনোবলে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছি।

অবশেষে দোতলায় উঠে এসেছি। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে কড়িডোর বরাবর হেঁটে চলেছি। এখানে একটা দরজা! আমি গণনা করি, "এক"। কিন্তু ঠিক তখনই আমার চোখে ভয়াবহ অন্ধকার, মাথা ভয়ানক ঘুরতে থাকে এবং সেই ঘূর্ণনের ধাক্কাতে

আমি অপর ধারের দেয়ালের সঙ্গে ঠোক্কর খাই! তবু আমি সন্ধানী মন নিয়ে সমান্তরাল হেঁটে যাবার প্রয়াসী। প্যাসেজটা দীর্ঘ ও দুর্গম বোধ হয়। আমি দুর্গমতা অতিক্রম করছি। সাবধানে অন্ধকারে সাঁতরাতে সাঁতরাতে অনুধাবনের চেষ্টা করি, আমার ঘরটা আর কতদূরে! এমন সময় আমি আমার নাগালের মধ্যে আর এক জোড়া কপাট খুঁজে পেলাম। নিজের প্রত্যয়কেই জোরদার করবার জন্য উচ্চারণ করি, "দুই"। তারপর আবার এগিয়ে চলা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই খুঁজে পেলাম তিন নম্বরকে। যথারীতি নিজেকেই নিজে শোনাই, "তিন"। অর্থাৎ, এটাই আমার ঘর।

দরজায় চাবির ধাক্কা লাগাতেই কপাট খুলে গেল। মনে খটকা লাগলেও ভাবছি, দরজা যখন খুলে গেল তখন ও ঘরটা আমার না হয়ে যায় না! আস্তে কপাট ভেজিয়ে অন্ধকার ঘরে সামনের দিকে আসতে থাকি।

নরম মতন কি যেন ঠেকলো—হ্যাঁ, আমার কাউচ; আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ঐ অবস্থাতে আর আমি আমার রাত্রিকালীন ব্যবহার্য টেবিলটা কোথায়, খুঁজে দেখিনা; মোমবাতি বা দেয়াশলাইও খুঁজে বের করবার চেষ্টা করি না। ওসব খুঁজতে গেলে আরো ঘন্টা দু'য়েক লেগে যেত। তারপর শরীর থেকে একে একে পোশাকগুলিও খুলে ফেলতে ঐ রকমই সময় লাগতো, হয়তো তাও সম্ভব হতো না। সুতরাং, আমি আর চেষ্টাও করলাম না।

জুতো জোড়া খুলে ফেলি, হাতকাটা জামার বিশ্রীভাবে আটকে থাকা বোতামগুলি খুলি; তারপর প্যান্টটাও আলগা করে ঘুমের অতলান্তে তলিয়ে যাই।

নিশ্চয় বহুক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠি বেশ কাছাকাছি কোন কণ্ঠস্বরে: এইঅলস মেয়ে, এখনও ঘুম। জানো, এখন দশটা বাজে?

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটি স্ত্রীকণ্ঠ উত্তর দেয়: এর মধ্যেই! গতকাল যা ধকল গেছে।

আধো ঘুম আধো জাগরণে অর্ধচেতন আমার অনুভূতি। ওদের বাক্যালাপের তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করছি।

আমি কোথায়? এ আমি কি করেছি?

আমার মন যেন মেঘে আচ্ছন্ন—রহস্য ভেদ করতে পারছি না।

প্রথম কণ্ঠস্বর বলে: আমি কিন্তু পর্দা সরিয়ে ঢুকছি।

তারপরই শুনতে পাই কার আগুয়ান পদশব্দ। উঠে বসি, হতবুদ্ধি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।...এক সময় একখানা হাত আমার মাথা ছুঁয়ে যায়। আমি চকিতে নড়েচড়ে উঠি।

অস্থির গলায় সেই স্বর ধ্বনিত হয়: কে এখানে?

আমি একেবারে নির্বাক।

একজোড়া ক্রুদ্ধ হাত আমাকে ঠেসে ধরে। পাল্টা আমিও সেই অদৃশ্যজনকে জাপটে ধরি। শুরু হয়ে গেল সেই অন্ধকার পরিশরে এক দারুণ শক্তির পরীক্ষা! খুব লড়ছি আমরা! আসবাবপত্র উল্টে-পাল্টে, দেয়ালে টক্কর খেতে খেতে-সে এক ভয়ানক মল্লযুদ্ধ!

আমরা যখন শক্তি পরীক্ষায় মত্ত, এ ঘরের বামাকণ্ঠ তখন সমানে আর্তনাদ ছাড়তে থাকে : বাঁচাও! কে আছো, বাঁচাও!

সেই চীৎকারে বাড়ির চাকর-বাকর, প্রতিবেশীরা, ভয়ার্ত মেয়েরা সকলে দুপ্দাপ্ শব্দে ছুটে আসতে থাকে এ ঘরের দিকে। ঘরের খড়খড়ি ঝিলিমিলি দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে অনেকে; কেউ কেউ সাহস করে এগিয়ে এসে পর্দাটাও খুলে ফেলে।

তখনই পরিষ্কার আলোতে আমি আবিষ্কার করি,—আমি এতক্ষণ তবে কর্নেল ডুমৌলিনের সঙ্গে হাতাহাতি করছিলাম। এবং এও বুঝতে পারি, কাল সারাটা রাত আমি তাঁর মেয়ের পাশেই শুয়েছিলাম।

যে মুহূর্তে আমরা দু'জন আলাদা হয়ে গেছি, আমি ভয়ে আতঙ্কে সটান ছুটে পালাই নিজের ঘরে। ঘরের কপাট বন্ধ করে দিই এবং একটা চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে গুম মেরে বসে থাকি। আমার জুতোজোড়া পড়ে আছে ঐ যুবতীর ঘরে।

শুনতে পাচ্ছি, গোটা বাড়িময় উত্তেজনার হিল্লোল—উত্তপ্ত আলোচনা, উত্তেজিত দাপাদাপি। দুম্দাম্ দরজা-জানালা খুলছে, বন্ধ করছে; ফিস্-ফাস্ কথা বলছে যেন কারা; দ্রুত পদক্ষেপে ছোটাছুটি করছে অনেকে।

আধঘণ্টা পরে কে যেন আমার দরজায় ধাক্কা মারে।

আমি চীৎকার করে উঠি, 'কে?'

দরজা ধাক্কাচ্ছেন আমার কাকা অর্থাৎ গত সন্ধ্যায় আমার যে খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে তার বাবা।

আমি দরজা খুলে দিই।

রাগে-ক্ষোভে তাঁর মুখের রঙ রক্তবর্ণ, আমার ওপর হাড়ে হাড়ে চটেছেন তিনি।

'শুনছো হে। তুমি একটি ইতর। এ বাড়ির সুনাম তুমি নষ্ট করেছ।'

তারপরই অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় আমাকে বলেন, 'কি গাধার মতন ধরা পড়লে বলো তো! করেছ, করেছ,—কিন্তু সকাল দশটা পর্যন্ত মড়া কাঠের গুঁড়ির মতন শুয়ে রইলে কেন? তোমার উচিত ছিল কাজ হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ ঘর ছেড়ে চলে আসা।'

আমি হাত পা নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করি, 'কিন্তু কাকা, আমি শপথ করে বলছি, রাত্রে খারাপ কিছু আমরা করে ফেলিনি। আসলে ব্যাপারটা হলো, খুব মাল খেয়েছিলাম তো। নেশার ঘোরে ঘর চিনতে আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

তিনি তাঁর কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেন, 'খুব হয়েছে হে। ও সব ভাঁওতা আমাকে দিতে এসো না।'

মরীয়া হয়ে হাত তুলে বলি, 'আমি নিজের নামে দিব্যি কাটছি—'

কাকা ব্যঙ্গ করেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে—তুমি যে ওরকম কথাই বলবে, আমার তা জানা ছিল।'

কাকার বিদ্রূপে এবার আমি যথার্থ রেগে উঠি এবং গড় গড় করে গত রাত্রের বিভ্রান্তিকর গল্পটি বলে গেলাম। তিনি আমার দিকে এমন অবাক চোখে চেয়ে রইলেন যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, তাঁর এই ভাইপোটিকে বিশ্বাস করা উচিত কি না।

তারপর আবার তিনি চলে গেলেন কর্নেলের সঙ্গে ফয়সালা করতে। আমিও এখানে বসে শুনতে পাচ্ছি, এ বাড়ির মেয়েরা এক বিচারসভা বসিয়েছেন এবং এই ঘটনা নানা রঙে সাজিয়ে তাঁদের দরবারে পেশ করা হচ্ছে।

ঘন্টাখানেক বাদে কাকা ফিরে এলেন। এবার তিনি বিচারকের ভঙ্গীতে দম নিয়ে বসেন। বলেন,'ঘটনা যাই ঘটে থাকুক, আমি দেখছি তোমার নিস্তার পাবার মাত্র একটাই উপায় আছে এবং তা হচ্ছে কুমারী ডুমৌলিনকে বিয়ে করা।'

শুনে তো আমি আঁতকে উঠি।

'বটে। কোনদিন তা হতে পারে না।'

কাকা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করেন,'তোমার উদ্দেশ্যখানা কি ?'

আমি সাফ বলে দিলাম, 'জুতোজোড়া ফেরৎ পেলেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।'

কাকা দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, 'ইয়ার্কি, না! কর্ণেল ঠিক করেছেন, তোমাকে দেখলেই একগুলিতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবেন ; এবং জেনে রেখো, ফাঁকা আওয়াজ দেবার মানুষ তিনি নন। আমি 'ডুয়েল' লড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম; তিনি জবাবে বললেন—আমি এখন একটা কথাই বুঝি এবং তা হলো নচ্ছারের খুলিটা পিস্তলের মুখে উড়িয়ে দেওয়া...

তাছাড়া এই ঘটনাটাকে অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা উচিত আমাদের। হয়তো তুমি ঐ মেয়েটার বারোটা বাজিয়েছ অথবা তোমার গল্পানুসারে মাতাল অবস্থায় তোমার একটা বিষম বিভ্রম ঘটেছিল মাত্র। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই তোমার অপরাধটা খুব বেশী। এতবড় একটা অন্যায় করে ন্যাকা সেজে বসে থাকবে তা তো হয় না। ঘটনা যেভাবেই ঘটে থাকুক, মোদ্দা কথা হলো—ঐ মেয়েটার মুখে চূণকালি পড়েছে; কারণ, মাতালকে আবার কে কবে বিশ্বাস করে? যত দুর্ভোগ ওকেই ভোগ করতে হবে। ভেবে দেখো।'

এই পর্যন্ত বলে তিনি আবার উঠলেন। আমি তাঁর পিছনে চীৎকার করে বলি, 'যা ইচ্ছে আপনারা আমাকে বলতে পারেন, কিন্তু বিয়ে আমি ওকে করছি না।'

এরপর আরো ঘন্টাখানেক আমি একা।

তারপর এলেন আমার কাকিমা। তিনি আবার চোখের জল ফেলছিলেন। সজল চোখে আর্দ্র গলায় তিনিও অনেক রকম চেষ্টা করলেন আমাকে তাঁর স্বমতে আনতে। —কেউই নাকি আমার ভুলকে মেনে নেবে না; কেউ নাকি বিশ্বাসই করবে না, একটি যুবতী মেয়ে কোন বদ উদ্দেশ্য ছাড়াই বাড়ি ভর্তি মানুষ থাকা সত্ত্বেও রাত্রে তার ঘরের দরজা খুলে রেখেছে। কর্ণেল নাকি তাঁর মেয়েকে যথেষ্ট মারধোর করেছেন এবং সে সারাটা সকাল ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এ একটা ভয়ানক কেচ্ছা, যাকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না।

এবং আমার করুণাময়ী কাকিমা অবশেষে পরামর্শ দিলেন, 'যাই হোক, তুমি ওকে বিয়ের প্রস্তাব দাও। আমার মনে হয়, এই বিয়ের কথাবার্তা চালাচালি করতেই অনেকদিন সময় লেগে যাবে এবং ততদিনে নানা রকম ফন্দি-ফিকির বের করে রেহাই পেয়ে যাবে। আপাততঃ মত দিয়ে দাও।'

কাকিমার এই যুক্তিটাকে বেশ বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হলো। এবং আমি আমার প্রস্তাব লিখিতভাবে জানাতে রাজি হ'য়ে গেলাম।

আরো ঘন্টাখানেক বাদে আমি রওনা হলাম প্যারিসের পথে।

পরের দিনই জানতে পারলাম, আমার আবেদন নাকি মঞ্জুর করা হয়েছে।

অতঃপর সপ্তাহ তিনেক ধরে হরেক রকম কৌশল করেও আমি সেই অনিবার্য পরিণতিকে এড়াতে পারলাম না। যথারীতি গীর্জায় প্রস্তাবিত বিবাহের বিজ্ঞপ্তি ছাপানো হলো। এক সোমবারের সকালে আমাকে দেখা গেল একটি আলোকিত চার্চের ভেতরে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার পাশে ক্রন্দনরতা এক যুবতী এবং মেয়রের কাছে আমাদের যৌথ শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছে। আমৃত্যু আমরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না।

সেই সন্ধ্যা থেকেই আমি একবারও ওর মুখের দিকে তাকাইনি। এখন মাঝে মাঝে রাগ ও বিরক্তির সঙ্গে আড়চোখে তাকাচ্ছি।

নিজেকেই নিজে বলি : এই একটা মেয়েমানুষ, যে আমার দিনগুলিকে একঘেয়ে করে তুলবে।

সেও কিন্তু উৎসবের সন্ধ্যা না আসা পর্যন্ত একবারও আমার মুখের দিকে তাকায়নি। একটা কথাও বলেনি।

রাতগভীরে বাসর ঘরে ঢুকলাম। আমি মনে মনে স্থির করে নিয়েছি, আমার কঠিন সিদ্ধান্ত আজই ওকে জানিয়ে দেবো। কারণ, এখন তো আমিই ওর প্রভু।

দেখতে পাচ্ছি, সে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছে, দিনের পোশাকও বদলায়নি।

ওর দুই চোখ রক্তবর্ণ, মুখের রঙ ফ্যাকাশে।

আমি ঘরে ঢোকা মাত্রই সে উঠে দাঁড়ায় এবং অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

'দেখুন', সে আমাকে সরাসরি বলে, 'আপনি যা বলবেন, তাই আমি করতে রাজী আছি। যদি চান তো আত্মহত্যাও করতে পারি।'

কর্ণেলের মেয়ে এমন সুন্দরভাবে এই সাহসিক শব্দগুলি উচ্চারণ করলো যে আমি মুগ্ধ না হ'য়ে পারিনি। নিজের অধিকারবলেই তৎক্ষণাৎ আমি তাকে আমার বুকের সঙ্গে লেপ্টে ধরি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমাণ পেয়ে গেলাম—না, আমি ঠকিনি।

আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ পাঁচ বছর এবং আজ পর্যন্ত কখনো কোন পারিবারিক হতাশা আমাকে গ্রাস করেনি।

পৈরী লিজেলী তাঁর গল্প বলা শেষ করেন।

তাঁর বন্ধুরা হেসে ওঠেন। একজন মন্তব্য করেন : বিয়ে হচ্ছে লটারী খেলার সামিল। বেশী সংখ্যায় মেয়ে পছন্দ করে বেড়ানো উচিত নয়। দৈবাৎ বা বিশৃঙ্খলভাবে যে এসে গেল কাছে, তাকেই ধরে নিতে হবে সর্বোত্তমা।

অন্য আর একজন উপসংহার টানেন : হ্যাঁ, কিন্তু মনে রেখো বন্ধু, ঈশ্বরের নেকনজর মাতালদের দিকেই থাকে এবং সেই কারণেই পৈরীর জিত হয়েছে।

প্রেমাসক্তি

Caresses

না বন্ধু, আর এ ধরনের কথা ভাববে না।

তুমি আমার কাছে যা চেয়েছ, তা আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে, বিরক্ত করেছে।

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি; আর ঈশ্বর তাঁর প্রতিটি সুন্দর সৃষ্টির সঙ্গে এমন এক একটি ভয়ানক জিনিস জুড়ে দেন যা পরিণামে সমস্ত সৌন্দর্যকে হত্যা করে।

তিনি এই পৃথিবীর পবিত্রতম বস্তু প্রেম দিয়েছেন। কিন্তু যখনই তিনি দেখলেন, প্রেম আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সুকুমার ও প্রীতিকর, তখনই তিনি আমাদের ভিতরে সেই অনুভূতির জন্ম দিলেন, যা অত্যন্ত লজ্জাষ্কর, বিষাক্ত, বিক্ষোভপূর্ণ, পাশবিক—যা আমাদের শরীরকে উত্তেজিত করে, স্নায়ুমণ্ডলীকে করে তোলে হিংস্র।

তিনি এই ভয়ানক জিনিসটি এমন এক গোপন জায়গায় এনে রাখলেন যে, ওর কথা ভাবতেই গভীর লজ্জা আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে।

খুব চাপা ও প্রায়শ নীরব ভাষাতেই আমরা এর সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। এটি যে লজ্জার মোড়কে ঢাকা। এটা লুকিয়ে থেকেও আত্মাকে ক্ষুব্ধ করে, চক্ষুকে বিরক্ত করে। নৈতিকভাবে পরিত্যক্ত, আইন কর্তৃক সতর্কিত এই জিনিসটা অপরাধীর মতন অন্ধকারেই লুকিয়ে থাকে।

তুমি আমার কাছে ও সম্পর্কে আর কখনো প্রস্তাব রেখো না, কখনো না।

আমি জানিনা, তোমাকে আমি ভালোবাসি কিনা। কিন্তু আমি জানি, তোমার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয়। তোমার দৃষ্টি আমার কাছে খুব মিষ্টি; এবং তোমার কণ্ঠস্বর আমাকে তৃপ্ত করে।

কিন্তু যেদিন থেকে তুমি আমার দুর্বলতাকে তোমার বাসনার কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে, সেদিন থেকে তুমি আমার ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়াবে।

যে সুকুমার বন্ধনে আমরা উভয়ে আবদ্ধ, তা ভেঙে যাবে।

তোমার আর আমার মধ্যে বিরাজ করবে কলঙ্কের এক অতলস্পর্শী নরক।

আমরা যেখানে আছি, সেখানেই থাকতে দাও। ...এবং ...যদি তুমি এ ভাবেই ভালোবাসতে পারো, আমিও বাসবো। ইতি—

তোমার বান্ধবী
জেনিভিভি

মাদাম, তুমি আমাকে কঠিন অকপটতার সঙ্গে, একঘেঁয়ে নিয়মকে বাদ দিয়ে, এমন এক বান্ধবীর কাছে নিজের বক্তব্য রাখতে দেবে, যে সারা জীবন ধরে একটা বিশেষ শপথকে বুকে বয়ে বেড়াতে ইচ্ছুক?

আমিও জানিনা, তোমাকে আমি ভালোবাসি কিনা। যে বস্তুর জন্য তোমার এত ক্ষোভ, সেই বস্তুটি না পাওয়া পর্যন্ত এই ভালোবাসা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তও নিতে পারছি না। তুমি কি মুসেড়ের কবিতা ভুলে গেছ:

ভয়ঙ্কর যা বস্তু তুমি ভাবো,
ভয়ঙ্কর সে নয়।
দেহ! সে তো প্রেমেরই আধার,
দেহকে কেন ভয় ?

আমরা ভয় পাই, আমাদের অপ্রবৃত্তি জাগে তখনই, যখন আমাদের রক্তের উন্মাদনা কোন দুঃসাহসিক ঘটনার মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়।

কিন্তু যখন কোন রমণীকে পছন্দ করতে শুরু করি, যখন তাকে অসাধারণ রূপসী মনে হয়, যখন তার সঙ্গ কখনো পুরনো হয় না,—যেমনটি তোমাকে মনে হয় আমার,—তখনই প্রেম ও সোহাগ শানিত হয়ে ওঠে, প্রেম তার পূর্ণতা লাভ করে এবং দেয় সীমাহীন আনন্দ।

এই যে মোহাকর্ষণ, মাদাম, এটাই কিন্তু প্রেমের প্রমাণ।

যদি তীব্র আলিঙ্গনের পরই আমাদের আবেগ মরে যায়, তবে আমরা নিজেদেরই বঞ্চিত করবো।

আর যদি আবেগ আরো স্ফীত হ'য়ে ওঠে, তবে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবো।

একজন দার্শনিক, যিনি তাঁর মতবাদ প্রচারে উদ্যোগী হননি, প্রকৃতির এই ফাঁদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। 'প্রকৃতি চায় নতুন জীবন', তিনি বলেছেন, 'এবং সে বাধ্য করছে নতুন জীবনের জন্ম দিতে। এই জন্য যে ফাঁদের সৃষ্টি, তারই চারদিকে টোপ হিসেবে প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছে যুগপৎ প্রেম ও সুখ।'

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ক্ষণে আমরা আমাদের জোর করে সরিয়ে নেবো, যে মুহূর্তে ঐ ক্ষণিক উন্মাদনা আমাদের ত্যাগ করবে, আমাদের অন্তঃকরণ এক গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। বঞ্চনা করবার কৌশল ধরতে পারবো, জানতে পারবো সেই গুপ্ত রহস্য, যা আমাদের উৎক্ষিপ্ত করে; এই গোপনতাকে প্রত্যক্ষ করে অনুভব করে ও স্পর্শ করে আমাদের হতাশা গভীরতর হবে।'

এই ব্যাখ্যা প্রায়শই সত্যি। এইভাবেই আমরা অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্যে গিয়ে পড়ি।

প্রকৃতি আমাদের জয় করেছে; আমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রকৃতির বাসনায় উন্মুক্ত বাহুর মধ্যে নিজেদের সমর্পণ করি।

হ্যাঁ, আমি জানি, বিচিত্র ওষ্ঠদ্বয়ের ওপর হিম ও বন্য চুম্বন কেমন চাপ সৃষ্টি করে। চক্ষুতে ফুটে ওঠে এমন নিবদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি, যা বুঝি আগে কখনো দেখা যায়নি এবং ভবিষ্যতেও দেখা যাবে না। অতঃপর, আমি বলতে পারি, ঐ বিশেষ মুহূর্তটি পার হয়ে যাবার পর আমাদের মন কত তিক্ত বিস্বাদে ভরে ওঠে।

কিন্তু এই স্নেহের মেঘ, যাকে আমরা নাম দিয়েছি প্রেম, যদি একজোড়া নর-নারীকে দীর্ঘকাল অধিকার করে থাকে, ফলতঃ এই সম্পর্ক যদি আরো নিবিড় হয়, প্রেমময় স্মৃতিগুলি তখন অহরহ জীবন্ত হ'য়ে উঠবে, একে অপরের স্বর শুনবার জন্যও ব্যগ্র হ'য়ে থাকবে, তারা পরস্পরকে নয়নে হারাবে....এবং এরই পরিণামে এমন

একটি মুহূর্ত কি অনিবার্য হয়ে উঠবে না, যখন তারা দু'জনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, চুম্বনের উষ্ণতায় দুটি ঠোঁট ঘনিষ্ঠ সংবদ্ধ এবং চূড়ান্ত সুখের নেশায় দুটি দেহও এক হতে চাইছে?

তুমি কি কখনো চুম্বনের প্রত্যাশী হওনি?

বলো, ওষ্ঠ কি কখনো ওষ্ঠকে কাছে ডাকে না? হৃদয়বিদ্ধকারী উজ্জ্বল কটাক্ষ কি দুর্দ্দমনীয় ও ব্যাপক কামনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় না?

তুমি হয়তো জবাব দেবে: এটাই তো ফাঁদ, এখানেই তো লজ্জা।

কিন্তু তাতে কি এমন আসে যায়? আমি ঐ ফাঁদকে চিনি, ঐ রহস্যময়তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি ও তাকে ভালোও বেসে ফেলেছি। প্রকৃতি আমাদের ভেতরে যে প্রেমজ মোহ ও কাম দিয়েছে, তা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে।

এখন এসো, আমরা ঐ মোহ ও আসক্তিকে চুরি করি। তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী ওকে পরিবর্তিত করবে, বিশুদ্ধতর করবে। ঐ ভাবে আমরা প্রকৃতিকেও ফাঁকি দেবো। প্রকৃতি যা চেয়েছিল, আমরা তার চেয়ে ভিন্ন ধরনের কিছু তৈরী করলাম; প্রকৃতি যা আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, আমরা তার চেয়েও কিছু বেশী শিখে ফেললাম। আমাদের এই প্রেমাসক্তি যেন মাটি থেকে তুলে আনা একটুকরো কাঁচা মূল্যবান ধাতু, যাকে আমরা মনের মতন করে গড়ে তুলতে পারি, কাজে লাগাতে পারি। প্রেমাসক্তি মূলতঃ মানুষের অন্তরের এক আকুতি, যে চেতনাকে আমরা ঈশ্বরও বলতে পারি। আর আমরা যেহেতু সমস্ত কিছুকেই আদর্শ করে গড়তে চাই, এই আসক্তিকেও তার ভয়াবহ পাশবিক সংঘাত সত্ত্বেও আদর্শ করে নেবো।

এসো, আমরা যেমন বিবেকহীন মদ্যপানে আনন্দিত হই, যেমন প্লেটের ওপর সাজানো রসালো ফলের টুকরোগুলি দেখে লালায়িত হই, যেমন শরীরে আনন্দ ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি হলে আমরা আপ্লুত হই, তেমনি যেন এই অন্তঃসংজ্ঞায় উৎসারিত কামাবেগকেও সানন্দে স্বীকৃতি দিতে পারি।

আমাদের ভালোবাসতে দাও রমণীদেহের সেই মাংসল অংশ, যা সুন্দর, শুভ্র ও বর্তুলাকার, যা চুম্বন করতে অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে অনাবিল সুখ আর সুখ।

যখন কোন শিল্পী তাঁর শৈল্পিক উম্মাদনায় বিরলতম ও পবিত্রতম কোন ছবি আঁকতে মনস্থ করবেন, তখন প্রথমেই ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত করবেন গোলাপসম মুকুর বিশিষ্ট রেখাবদ্ধ স্তন।

আমি "চিকিৎসাবিদ্যার অভিধান" নামক একখানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে নারীর বক্ষ সম্পর্কে একটা চমৎকার উক্তি পড়েছিলাম, যাকে এম. যোশেফ প্রুধমের ভাষায় বলা যায়:

"নারীর বক্ষ একাধারে প্রয়োজনীয় বস্তু, অন্যধারে সুখের উৎস।"

যদি তোমার অমত না থাকে, এসো আমরা ঐ 'প্রয়োজনীয়' কথাটা উহ্য রেখে শুধু 'সুখ' টুকুই বজায় রাখি। নারীর স্তন কি শুধু শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য?

হ্যাঁ, মাদাম, ঐ সব নীতিবিশারদদের বাদ দাও, মাত্রাতিরিক্ত বিনয় এবং ডাক্তারী সতর্কতাও ভুলে যাও, চুলোয় যাক সেই সব কবিরা, যাঁরা দেহহীন প্রেমের মধ্যে আত্মার মিলন কল্পনা করেন। কু-দর্শনা মেয়েরা নিজেদের কর্তব্য নিয়েই ব্যস্ত থাকুক

এবং যুক্তিবাদী লোকেরা নিছক নিজেদের স্বার্থ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করুক। সমাজপতিরা তাদের নিয়ম আঁকড়ে পড়ে থাকুক। পুরোহিতরা ব্যস্ত থাকুক তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে। আর আমরা? আমরা তখন গ্রহণ করি সেই প্রচণ্ড কামাবেগ, যা আমাদের উত্তেজিত ও মাতাল করে রাখবে, অথচ যার শিহরণ পাতলা বাতাসের চেয়েও হাল্কা, যা শানিত তলোয়ারের চেয়েও তীক্ষ্ণমুখ, দ্রুত ও হৃদয়বিদ্ধকারী, যার প্রভাবে মানুষ কখনো প্রার্থনায় বসে, কখনো যে কোন ধরনের অপরাধ করে বসে এবং যার প্রভাবে সাধারণ জনও অতি সাহসের পরিচয় দেয়।

আমাদের প্রেম হবে এই রকম: অধীর, স্বাভাবিক, আইনানুগ,—অথচ ভয়াল, উন্মাদ এবং বন্ধনহীন। মানুষ যেমন সোনা ও হীরের জন্য লালায়িত, আমরাও তেমনি এই প্রেমের জন্য প্রত্যাশী হ'য়ে থাকবো। আমাদের প্রেম সোনা ও হীরের চেয়েও দামী,—আদতে কোন মূল্যান্তর দিয়ে এর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। কোন তোষামোদ ছাড়াই আমরা যেন এই আবেগকে স্থায়ী করতে পারি। এই অস্থির সুখের মধ্য দিয়েই যেন আমাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

মাদাম, তোমাকে আমি এমন এক সত্যের সন্ধান দিচ্ছি, কোন বইতে যার ব্যাখ্যা পাবে না। এই পৃথিবীতে সেই সব মেয়েরাই সুখী, যাদের প্রতি আসক্তি ও সোহাগের কখনো অভাব ঘটে না। তারা দুশ্চিন্তাহীন জীবন কাটায়, মানসিক গ্লানিতে কখনো ভেঙ্গে পড়ে না, পরবর্তী প্রেম-চুম্বন ছাড়া তাদের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই এবং প্রতিটি চুম্বনই পূর্বতন চুম্বনের মতন আনন্দ পূর্ণ।

আর যে সমস্ত মেয়েদের কাছে প্রেমাসক্তি ক্ষণায়ু, অথবা বিরক্তিকর, অথবা বিরল, তারা হাজার রকমের দুশ্চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়ে ভারাক্রান্ত, তাদের মন প্রায়ই অধিকার করে রাখে ধনলিপ্সা অথবা অহঙ্কার-পরিণতি যাদের বাস্তবিক দুঃখময়।

কিন্তু প্রেমাসক্তিতে সমর্পিতা নারীর আর কিছুরই দরকার নেই, তারা কিছু প্রার্থনাও করে না, পার্থিব বস্তুর প্রতি তাদের অনীহা।

তারা স্বপ্ন, সুখ ও মৃদু হাস্যময় এক অন্যভুবনে বাস করে। খুব কদাচিৎই তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে, কারণ প্রেমাবেগ তো তাদের সবই দিয়েছে—আনন্দ ও মুক্তি দুই-ই।

আরো অনেক কিছু আমি এখনো বলতে পারি....

ইতি—

হেনরী

গতকাল, রবিবার, বেলা একটার পর ওর একটি ছোট্ট রুশ চামড়ায় মোড়া পকেট বুকে জাপানী রাইস-কাগজে লেখা এই দু'খানি চিঠি পাওয়া গিয়েছে।

পিশাচ

Devil

মুমূর্ষু মহিলার বিছানার ধারে ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে চাষী লোকটি। বৃদ্ধার মুখাবয়ব প্রশান্ত, সম্পূর্ণ সজ্ঞানতায় শুনছেন এদের কথোপকথন। মৃত্যুর জন্য তাঁর কোন অভিযোগ নেই, তিনি প্রস্তুত—বয়স যে বিরানব্বুই।

জুলাইয়ের সূর্যালোক খোলা জানালা ও দরজার মধ্য দিয়ে এসে পড়েছে, চারপুরুষ ধরে ব্যবহৃত বাদামী মাটির বুকে সেই আলোর চাকচিক্য। তপ্ত বাতাসে ভাসে মাটির গন্ধ, ঘাসের ঘ্রাণ, দুপুরের রোদে পোড়া পাতার সুবাস। ভেসে আসে গঙ্গা-ফড়িংদের অবিরাম ঝিম্ ঝিম্ রব।

ডাক্তার চড়া গলায় বললেন, 'হোনোর, তুমি তোমার মাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যেওনা। যে কোন মুহূর্তে উনি মারা যেতে পারেন।'

চাষী মাথা নাড়ে, 'কিন্তু আমার ফসলগুলি অনেকক্ষণ ধরে মাঠে পড়ে আছে। এই বেলা তুলে না আনলে অনেক ক্ষতি হবে। তুমি কি বলো, মা ?'

মৃতপ্রায় বৃদ্ধার এখনো নর্মাণসুলভ ধনলিপ্সা, চোখ ও মুখের অভিব্যক্তিতে যেন সম্মতি জানালেন—হ্যাঁ, যাও।

কিন্তু রেগে উঠলেন ডাক্তার, পা ঠুকে বললেন, 'বুঝলে, তুমি খুব নিষ্ঠুর। আমি তোমাকে যেতে বলতে পারি না। মাঠের ফসল কাটা যদি তোমার এখন এতই জরুরী হয়, যেতে পারো। কিন্তু খেয়াল রেখো, দিন একদিন তোমারও ঘনাবে; সেদিন কিন্তু তোমার কাছে এসে আমি দাঁড়াবো না—কুকুরের মতো মারা যাবে তুমি, বুঝলে ?'

রোগা লম্বা লোকটা ডাক্তারের কথায় দ্বিধান্বিত—একদিকে তার ভবিষ্যতের ভয়, অন্যদিকে বৈষয়িক ভাবনা। বললো,'কতক্ষণ আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলছেন ?'

'তা আমি কি করে জানবো।' কড়া গলায় ধমকালেন ডাক্তার, 'সেটা বরং ওঁর সঙ্গে ঠিক করে নাও। ডাক্তার হিসাবে আমি তাঁর আরো কয়েক ঘণ্টা পরমায়ু চাই। বুঝলে ?'

লোকটি তার মনস্থির করে ফেললো, 'আমি যাচ্ছি, আমায় যেতেই হবে। রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু।'

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও হাত গুটিয়ে নিলেন। গলায় তাঁর হুঁশিয়ারি, 'ঠিক আছে, যা ইচ্ছে করো। আমিও আর এই বিরক্তিকর পরিবেশে থাকতে পারছি না।'

ডাক্তারবাবু রেগেমেগে চলে গেলেন।

হোনোর কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়ে আবার ফিরে আসে, মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে,'তুমি একটু একা থাকো। আমি চট্ করে র‍্যাপেট বুড়িকে ডেকে আনছি।'

র‍্যাপেট এক বয়স্কা ধোপানী। কাপড় কাচা ছাড়া তার আরো একটা ভূমিকা আছে—ঐ গ্রামসহ্ জেলার বহু পরিবারে মৃত বা মৃতকল্প জনের পরিচর্যা সে করতো উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বদলে। তারও অন্তঃকরণে ছিল যত রাজ্যের লোভ ও লালসা। তার আলোচ্য বিষয় একমাত্র মৃত্যু,আজীবন সে কত রকমের মরণ দেখেছে, খুব উৎসাহের সঙ্গে সে সব ব্যাখ্যা করতো।

হোনোর তার বাড়িতে ঢুকে দেখতে পায়, ধোপানী জলে নীল গোলাচ্ছে মেয়েদের রুমাল কাচবার জন্য।

হোনোর বললো, 'কেমন আছ র‍্যাপেট বুড়ি?'

সে ঘুরে তাকালো, 'গতানুগতিক চলছে। তোমার খবর কি?'

'নিজে তো বহালতবিয়ত্। তবে মার অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়।'

'তোমার মা?'

'হ্যাঁ, আমার মা।'

'কি হয়েছে?'

'এখন যায় তখন যায় অবস্থা।'

বুড়ি শুনেই নীল গোলা জল থেকে হাত তুলে নিলো; তার আঙুলের ডগা থেকে ফোঁটা ফোঁটা নীল জল গড়াতে থাকে। গলার স্বরেও হঠাৎ সহানুভূতির প্রলেপ, 'সত্যি এ রকম তাঁর অবস্থা?'

'ডাক্তার তো রায় দিয়েছেন, আজকের বিকেলটাও নাকি পার হবে না।'

'তা হলে তো খুব খারাপ অবস্থা।'

হোনোর এবার আসল কথা পাড়তে দ্বিধা করে। কি ভাবে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা যায়, এ সম্পর্কে অনেক ভাবনা তার মগজে পাক খেতে থাকে। কিন্তু কোন কিছুই ঠিক না করতে পেরে আচমকা বলে বসে, 'মা মারা না যাওয়া পর্যন্ত দেখাশুনা করতে কত নেবে তুমি? ...জানোই তো, আমার অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়। একজন চাকরকেও যা দেওয়া উচিত, তা দেবার সামর্থ্যও আমার নেই। আমার দারিদ্র্যের জন্যই মার আজ এই দুরবস্থা! বিরানব্বুই বছর বয়সেও কী হাড়ভাঙ্গা খাটুনি না তাকে খাটতে হয়েছে—দশজন লোকের পরিশ্রম সে এই বয়সে একাই করেছে।'

লা র‍্যাপেটের গম্ভীর গলা, 'আমি লোক বুঝে দু'ধরনের মজুরি নিয়ে থাকি। ধনীদের কাছে দাবী করি দিনপ্রতি চল্লিশ সাউচ্ ও রাতপ্রতি তিন ফ্রাঙ্ক হিসাবে। আর সাধারণ লোকদের কাছে আমার রেট হলো, দিনে কুড়ি সাউচ্ ও রাতে চল্লিশ সাউচ্। তোমার বেলায় এই দ্বিতীয় রেটটাই প্রযোজ্য হতে পারে।'

কিন্তু এই রেট চাষী লোকটার মনঃপুত হয় না। সে তার মাকে ভালোই জানে। জানে, তার মার জীবনীশক্তি কত বেশী—সহজে টেঁসে যাবার পাত্রী তিনি নন। ডাক্তার যাই বলুন, সপ্তাহখানেকের আগে তিনি চোখ বুজছেন না।

হোনোর তাই দৃঢ়স্বরে বলে, 'না। আমি বরং চুক্তিবদ্ধভাবে তোমাকে এককালীন কিছু থোক টাকা দিতে পারি, যার পরিবর্তে গোটা কাজটা তুমি করবে। ঝুঁকি এখানে

দু'জনেরই। ডাক্তারের রায়, যে কোন মুহূর্তে রোগিনী মারা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তুমি জিতবে এবং আমি হারবো। আর যদি মা কাল, পরশু বা আরো কয়েকদিন টিঁকে যায়, জিত হবে আমার, হার হবে তোমার।'

বুড়ি সেবিকা অবাক হ'য়ে চাষীটার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মানুষের মৃত্যু নিয়ে কখনো এ ভাবে জুয়া খেলতে সে দেখেনি কাউকে। মনে তার সংশয়। অবার হঠাৎ কিছু পেয়ে যাবার লোভটাও জেগে থাকে। তখন তার মনে হলো, লোকটা তো তাকে ঠকাবারও মতলব করতে পারে।

'তোমার মাকে না দেখা পর্যন্ত আমি কথা দিতে পারছি না।'

'বেশ, তা হলে চলো, তাকে দেখবে।'

ধোপানী হাত মুছে তার সঙ্গে রওনা দেয়। সারাটা পথ দু'জনের মুখে কোন কথা নেই। ধোপানীর হাঁটার গতি অতি দ্রুত। গুটিকয়েক গরু প্রচণ্ড দাবদাহে ক্লান্ত হ'য়ে মাটিতে শুয়ে ছিল। এদের পায়ের দপ্‌দপানিতে মাথা তুলে এমনভাবে তাকায় যেন তারা নতুন ঘাসের আর্জি পেশ করছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে হোনোর করুণ স্বরে বললো, 'বোধ হয় এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেছে।'

তার অবচেতন মনের আশঙ্কা ধ্বনিত হয় সেই স্বরে।

কিন্তু তার মা তখনো মৃত্যুর ধারে-কাছে পৌঁছাননি। পিঠ ঘুরিয়ে শুয়ে আছেন, অদ্ভুত শীর্ণ দুই হাত যেন কোন জন্তুর থাবার মত দেখায়।

সেবিকা র‍্যাপেট পায়ে পায়ে বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বুঝবার চেষ্টা করে রোগিনীর অবস্থাটা। সে তাঁর নাড়ি টেপে, বুক পরীক্ষা করে, শুনবার চেষ্টা করে হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌পুকুনি। এক-আধটা কথা বলে বোঝার চেষ্টা করে রোগিনীর কথা বলবার ক্ষমতা এখনো কতখানি। তারপর দীর্ঘক্ষণ রোগিনীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বাইরে চলে আসে। তার পিছন পিছন হোনোরও।

হোনোরের সন্দেহ হলো, বুড়ি মা বুঝি আজকের রাতেই টেঁসে যাবে।

সে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখলে?'

সেবিকা জবাব দেয়, 'হুম, এখনো দু'দিন পরমায়ু, তিন দিনও হতে পারে, তুমি এককালীন ছয় ফ্রাঙ্ক দিলে বিবেচনা করতে পারি।'

হোনোর রীতিমত চেঁচিয়ে ওঠে: 'আরে বাস্‌। ছয় ফ্রাঙ্ক? ছ-য় ফ্রাঙ্ক! তোমার কি মাথা খারাপ? আমি বলছি, ও পাঁচ-ছয় ঘন্টার বেশী বাঁচবে না। বাঁচতে পারে না।'

চললো দু'জনের মধ্যে দর-কষাকষি। দু'জনেই অনমনীয়। রফায় আসতে পারছে না।

'ঠিক আছে।' শেষ মুহূর্তে হোনোরই যেন হার মানে, 'ছয় ফ্রাঙ্কই দেবো, দেখাশোনা থেকে আরম্ভ করে শবের জামা-কাপড় কাচা পর্যন্ত সব কিছুই করতে হবে তোমাকে।'

'করবো। ছয় ফ্রাঙ্ক পারিশ্রমিক পেলে সবই করবো।'

হোনোর তাড়াতাড়ি তার জমিতে ফিরে যায়। ওখানে প্রচণ্ড রোদ্দুরে পেকে ঝুনো হ'য়ে যাচ্ছে তার ফসলগুলি।

সেবিকা এসে ঢোকে রোগিনীর ঘরে। সঙ্গে তার সেলাই করার জিনিসপত্তরও রয়েছে। কারণ, যখনই সে কোন মৃত বা মৃতপ্রায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে, তখন সে নিজের ও ঐ পরিবারের সকলের জন্যই অতিরিক্ত কিছু কাজ করে থাকে বাড়তি পয়সার বদলে।

হঠাৎ সে রোগিনীকে জিজ্ঞেস করে, 'মাদাম বনতেম্পস, আশা করি পুরোহিতকে আপনার কাছে আনা হয়েছিল?'

মাদাম বনতেম্পস মাথা নাড়লেন। ধর্মপ্রাণা র‍্যাপেট সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে: 'হাঁ ভগবান! এমনও হয়! আমিই তবে যাই পাদরী ডাকতে।'

বলতে বলতে সে একরকম ছুটতে থাকে বাজারের মধ্য দিয়ে। তার হাবভাব ও চলায় ঝড়ের গতি দেখে বাজারের লোকেরা ভাবে, নির্ঘাৎ কোথাও দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পাদরীও দেরী না করে রওনা দিলেন। তাঁর পিছন পিছন গির্জার এক বালক-গায়ক ঘন্টা বাজাতে বাজাতে চলেছে, যেন সে গ্রামবাসীর কাছে ঈশ্বরের আগমনবার্তা ঘোষণা করছে। অনেক দূরে যে সমস্ত লোকেরা কাজ করছিল, ঐ ঘন্টাধ্বনি শুনে মাথার টুপি খুলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখে, পাদরীর সাদা দাড়ি ধীরে ধীরে একটি খামার বাড়ির আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।

যে সব মেয়েরা ফসলের আঁটিগুলিকে জড়ো করছিল, তারা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায় ও ক্রশ আঁকে। একদল কালো মুরগি ভয় পেয়ে তাদের পরিচিত গর্তে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। দড়িতে বাঁধা একটা ঘোড়া আঁতকে উঠে বোঁ বোঁ চক্কর খেতে থাকে, শূন্যে আতাসে পা ছুঁড়তে থাকে। লাল ঘাগড়া পরা গির্জার বালক-গায়ক চলেছে ছুটে ছুটে, আর পুরোহিতও একদিকে ঘাড় কাৎ করে টুপি দুলিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় মন্ত্র পড়ছেন ও ছুটছেন। সবশেষে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছে র‍্যাপেট বুড়ি।

হোনোর কিছুটা ব্যবধানে থেকে সবই খেয়াল করেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'ফাদার কোথায় যাচ্ছেন?'

জবাব আসে, 'তোমার মার অন্তিমকাল উপস্থিত। তাই প্রার্থনা হবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

হোনোর কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। বরং আপন মনেই ভাবে, 'ব্যাপারটা তবে বেশ জমেছে।' সে আবার মাঠের কাজে মন দেয়। মাদার বনতেম্পসের 'স্বীকারোক্তি'র পর পাদরী দলবল নিয়ে গির্জায় ফিরে যান। ঘরে তখন শুধু দুই বুড়ি।

র‍্যাপেট রোগিনীর সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। আর কত সময় বেঁচে থাকবে ও?

দিন ফুরিয়ে রাত ঘনালো। ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস বইতে থাকে। জানালার পর্দা, যা দিনের বেলায় ছিল সাদা, এখন দেখাচ্ছে হলুদ-হলুদ। বাতাসের আনাগোনায় ঐ পর্দা যেন এই রোগিনীর প্রাণবায়ুরই মতন মুক্তিসন্ধানী।

তিনি শুয়ে আছেন, নিশ্চল, দুই চোখের পাতা খোলা, যেন পরম নির্বিকারে প্রতীক্ষা করছেন অনিবার্য অথচ মন্থর মৃত্যুর জন্য। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর, গলার ভিতর থেকে ঠেলে আসছে শিঁসের মতন আওয়াজ। মনে তো হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবেন এবং এই পৃথিবী এমন একজন মহিলাকে হারাবে, যাঁর বিরুদ্ধে বলবার কিছুই থাকবে না।

রাতের বয়স বাড়ে। হোনোর ফিরে এলো। বিছানার কাছে গিয়ে দেখলো, তার মা তখনো বেঁচে আছে। সে চিরাচরিত অভ্যাসবশতঃ জিজ্ঞেসও করলো, 'কেমন আছো ?' তারপর সে বুড়ি র‍্যাপেটকে বাড়ি পাঠাবার সময় স্মরণ করিয়ে দেয়, 'কাল আসবে—ঠিক সকাল পাঁচটায়।'

সত্যি, পরদিন দিনের শুরুতেই বুড়ি র‍্যাপেট এসে হাজির। হোনোর তখন নিজের হাতে তৈরী সুপ্ চাখছিলো। একটু পরেই আবার তাকে মাঠে যেতে হবে।

সেবিকা জিজ্ঞেস করে, 'মা এখনও বেঁচে আছে ?'

হোনোর মুচকি হাসে, 'অবস্থা একটু ভালোর দিকেই মনে হচ্ছে।' বলেই সে চলে গেল।

বুড়ি র‍্যাপেটকে হঠাৎ এক অস্বস্তিকর ভাবনায় পেয়ে বসে। সে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে রোগিনীর মুখের ওপর । ঠিক তখনই প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টের মধ্যে চোখ মেলে তাকায় মুমূর্ষু মহিলা।

সেবিকার মনে হলো, এ দু'দিন বাঁচতে পারে, চারদিনও বেঁচে থাকতে পারে...এমন কি, আট দিনেরও পরমায়ু থাকা আশ্চর্যের নয়। ...এবং ভয় এসে বিষণ্ন মনকে জাপটে ধরে। ভীষণ ক্ষোভে সে কেঁপে ওঠে—হোনোর তাকে ঠকিয়েছে! খুব রাগ হয় ঐ বুড়ির ওপর—সহজে মরবার পাত্রী এ নয়।

তবু সে কাজ করে, প্রতীক্ষা করে মৃত্যুর সেই মাহেন্দ্রক্ষণের। তার দুই চোখ স্থির হয়ে আছে মাদার বনতেম্পসের অসংখ্য রেখাময় কোঁচকানো মুখের ওপর।

সকালে প্রাতরাশ সারতে আসে হোনোর। তাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। খুব মজাদার অনুভূতি নিয়েই সে মাঠে যায়, কাজ করে,—তার ফসলগুলিকে সে যথেষ্ট ভালো অবস্থাতেই তুলতে পারছে।

বুড়ি র‍্যাপেট রাগে জ্বলে। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সময় বয়ে যায় আর তার আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সে চাইছে, ভীষণভাবে চাইছে, এখনই ঐ বদ শক্তপ্রাণ বুড়িটার ঘাড় ধরে এক ঝাঁকানিতে খেল্ খতম করে দিতে; এক ঝাঁকানিতেই অক্কা পেয়ে যাবে, সময় বাঁচবে, যন্ত্রণার লাঘব হবে, তারও আর্থিক লোকসান হবে না।

যত সব ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা র‍্যাপেটের মাথায় জটলা পাঁকাতে থাকে। বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই যে, শয়তানের দেখা এখনো পেয়েছেন?'

মাদার বনতেম্পস ক্ষীণ স্বরে উত্তর দেয়: 'না।'

সেবিকা তখন এমন এক ভয়াল গল্প বলতে আরম্ভ করে, যা মুমূর্ষু মহিলার স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সে ব্যাখ্যা করে, মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে মানুষ কি ভাবে শয়তানের দেখা পায়। শয়তানের এক হাতে থাকে ঝাঁটা, অন্য হাতে সস্‌প্যান। শয়তান এক বিচিত্র শব্দ তুলে এগিয়ে আসে।...আপনি যদি তাকে কখনো দেখতে পান, তবে জানবেন ঐখানেই আপনার ইতি,—মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আপনার হৃদ্‌যন্ত্র অচল হ'য়ে যাবেই।

র‍্যাপেট বুড়ি শয়তান—দর্শনের গল্প বলতে গিয়ে অনেক মৃত মানুষের উপমাও টেনে আনে,...যোসেফাইন লয়সেল, এউলেই রেঁতার, সোফিয়া পঁগনান, সরফাইন গ্রসপিড ইত্যাদি প্রত্যেকেই মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে পিশাচকে দেখতে পেয়েছিল।

বুড়ি র‍্যাপেটের গল্প শুনতে শুনতে মাদার বনতেম্পসের অসুস্থতা বেড়ে যায়। রোমাঞ্চিত তিনি বিছানা কুঁচকে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে দেখতে চাইলেন, এই ঘরের প্রত্যন্তে কোথাও পিশাচের আবির্ভাব ঘটেছে কিনা।

মওকা বুঝে র‍্যাপেট চকিতে ঘর ছেড়ে চলে যায়। আলমারি খুলে একখানা চাদর বের করে এবং তা দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখে। তারপর ঐ চাদরের নিচে জলসেদ্ধ করার একটা পাত্রকে এনে এমন ভাবে মাথা ও মুখে চেপে রাখে যে মনে হয়, বুঝি তার তিনটে শিং গজিয়েছে। তারপর ডান হাতে ঝাঁটা ধরে বাঁ হাতের জলের জগটাকে সপাটে এমন ঝাঁপটা মারে যে উৎকট শব্দ তুলে জগটা আছড়ে পড়ে মাটিতে।

সেই শব্দে ঘরের মেঝে অব্দি কেঁপে ওঠে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের ওপর পা দিয়ে রোগিনীর ঘরের ঝুলন্ত পর্দাটাকে টেনে নামায় র‍্যাপেট। মাথা ও মুখ আটকানো পাত্রে এক ধরনের বিচিত্র আওয়াজ করতে করতে সে এগিয়ে আসে রোগিনীর দিকে, ঠিক যেমন পুতুল-খেলায় শয়তানের মূর্তি নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে।

অভাবনীয় আতঙ্কে মুমূর্ষু মহিলা বুঝি উন্মাদিনী। তাঁর ঠেলে বেরিয়ে আসা দুই চোখে বুনো দৃষ্টি। অমানুষিক দিশেহারা উত্তেজনায় তিনি উঠে বসেন ও পিশাচের হাত থেকে রেহাই পাবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন। সেই ব্যর্থ প্রয়াসে তাঁর কাঁধ ও বুক বিছানার বাইরে ঝুলতে থাকে। তারপরই একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন এবং সেটাই তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস।

বুড়ি র‍্যাপেট আবার সব জিনিস-পত্রাদি যথাস্থানে ঠিকঠাক করে রাখে। ঝাঁটা রাখে আলমারির এক কোণে, চাদরটা আলমারির ভেতরে, সেদ্ধ করার প্যানটা স্টোভের ওপর, জলের জগটা শেলফের ওপর এবং চেয়ারটা দেয়ালের বিপরীত দিকে। এরপর পেশাদারী নিপুণতায় সে মৃতার বিস্ফারিত চোখের দুই পাতা বুজিয়ে দেয়, পবিত্র

পাত্র থেকে জল ঢেলে একটা ডিম এনে রাখে বিছানার ওপর। সব শেষে প্রথাসিদ্ধ কায়দায় মৃতার আত্মার জন্য হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসে যায় সে।

রাতে ঘরে ঢুকেই হোনোর বুড়ো ম্যাপেটকে ঐ ভাবে প্রার্থনা করতে দেখে। দেখে তার মনে প্রথমেই যে ভাবনা আসে, তা হলো—ইস্, বুড়িটা আমায় কুড়ি সাউচ্ ঠকালো! ও এখানে আছে মাত্র তিন দিন ও এক রাত, যার পারিশ্রমিক হওয়া উচিত পাঁচ ফ্রাঙ্ক, ছয় ফ্রাঙ্ক নয়!

হোরলা

The Horla

৮ই মে :

কী চমৎকার একটা দিন! সারাটাক্ষণ বাড়ির সামনে তৃণশয্যায় আমি শায়িত। মাথার ওপর অসংখ্য গাছ-গাছালির জমাট সমতল আচ্ছাদন, রয়েছি ছায়াঘন নিরাপদ আশ্রয়ে।

এই জায়গাকে ভালোবাসি, এখানেই থাকতে ইচ্ছুক; কারণ, এই জমিতেই আমার যাবতীয় সত্ত্বা, আত্মোপলব্ধি শিকড় গেড়ে আছে; এখানেই আমার পূর্বপুরুষরা জন্মেছিলেন, মারাও গিয়েছিলেন—এর আকাশে বাতাসে তাঁদের স্মৃতি, তাঁদের প্রাত্যহিক দিনাতিপাত, কি ভাবে তাঁরা খেতেন, কি ভাবে চলাফেরা করতেন, স্থানীয় কোন্ বিশেষ ঢঙে তাঁরা বাক্যালাপ করতেন...।

আমি আমার এই আবাসটিকে ভালোবাসি। আমি এখানেই জন্মেছিলাম। জানালা খুললেই দেখা যায় আমাদের বাগানের গা ঘেঁষে উঁচু রাস্তার ওপিঠে যেন প্রায় এ বাড়ির দরজা ছুঁয়ে প্রশান্ত হৃদয় নদী সীন, প্রবহমান রুয়েন থেকে হ্যাভরের দিকে, যে বহমান নদীর বুকে প্রতিনিয়ত চলমান নৌকাশ্রেণীও কম লক্ষণীয় নয়। বাঁ দিক ধরে অগ্রসর হলে বিশাল শহর রুয়েন, সেখানকার গথিক রীতির বহু ঘন্টাঘরের মধুর ঘন্টাধ্বনি প্রতিদিন সকালে আমার মনে আনন্দের স্বগত স্বাদ বয়ে আনে।

এই সকাল কী মনোরম!

বেলা এগারোটা নাগাদ মাছির মতন ছোট্ট বিন্দুপ্রায় একটা পিঠউঁচু বোট সাঁ সাঁ কষ্টকর প্রশ্বাসে ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে করতে চলে গেল। ঐ বোটটারই পিছনে একটার পর একটা নৌকা শ্রেণীবদ্ধভাবে যেন আমাদের দরজার পাশ দিয়ে স্রোতের অনুকূলে হারিয়ে যেতে থাকে। এরপর ভেসে আসে দুটি পালতোলা ইংরেজ নৌকা, যাদের রক্তাভ পতাকা বুঝি আকাশকে স্পর্শ করেছে; তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ব্রাজিল থেকে আগত একটি 'সি মাষ্টার' জাহাজের ওপর—শ্বেতবর্ণ অপূর্ব তার চাকচিক্য।

ঐ জাহাজের দিকে চেয়ে মুগ্ধ না হ'য়ে পারি না। এবং কেন জানিনা, কোন আবেগ ও আনন্দের বশবর্তী হ'য়ে আমি সহসা সেই জাহাজকে অভিবাদন করে বসলাম!

১১ই মে:

গত কয়েকদিন যাবৎ জ্বর-জ্বর ভাব। শরীর অসুস্থ। তার চেয়েও বড় কথা, মনের দিক থেকে অসুখী বোধ করছি।

জানিনা, কখন কোন্ রহস্যজনক শক্তি আমাদের মনকে আনন্দ থেকে টেনে নিয়ে যায় বিষণ্নতার দিকে, আত্মবিশ্বাস থেকে হতাশার কোলে। মনে হয় বুঝি অদৃশ্য বাতাসে রয়েছে সেই অজানা ক্ষমতা, যার নৈকট্য আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি।

আমি আনন্দে জেগে উঠেছিলাম; আমার গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল গানের সুর। কেন? আমি নেমে গিয়েছিলাম জলের কিনারা অব্দি; এবং তারপর সামান্য পায়চারির পর ঘরে ফিরবার সময় এই দুর্বলতা আমাকে পেয়ে বসে—যেন কি এক ভয়ানক ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

কেন এমন হলো? কেন একটা হিমেল কম্পন আমার ত্বকের ওপর দিয়ে আলতোভাবে বয়ে গেল, কেন স্নায়ুরা কেঁপে উঠলো এবং কেন আমার উৎসাহ নিভে গেল অন্ধকারে? মেঘের আকৃতি, দিনের আলো, পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর নিয়ত পরিবর্তনশীল রঙের বাহার কি চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় আমার ভেতরে এক মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়ে গেছে? কেউ কি ব্যাখ্যা করতে পারে এই রহস্যের কারণ? যে সব বস্তু আমাদের ঘিরে আছে, যাদের আমরা খোলা চোখে দেখতে পাই না, যারা আমাদের অজ্ঞাতে সঞ্চরণশীল, যাদের স্পর্শ আমরা সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ধরতে পারি, আকস্মিকভাবে যাদের প্রভাবে আমরা প্রভাবান্বিত—তারাই রয়েছে এই শরীরের প্রতিটি অংশে, ওদেরই মাধ্যমে চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।

অদৃশ্য এই শক্তির রহস্যময়তা কী গভীর!

মানুষের দুর্বল স্নায়ু এমন গভীরতা পরিমাপ করতে পারে না। আমাদের চোখ খুব বড় বা খুব ছোট, বা অনেক দূরের, বা অনেক কাছের জিনিসকে সনাক্ত করতে পারে না। চিনতে পারে না নক্ষত্রের বাসিন্দাদের; দেখতে পায় না, একবিন্দু জলের মধ্যে বাস করছে যে সমস্ত জীবরা আমাদের কর্ণকুহর শুধু জানিয়ে দেয় বাতাসের অনুরণন, যা এক বিশেষ ধ্বনিময় রূপে প্রতিভাত। ঐ অনুরণিত ধ্বনিই প্রকৃতির সংগীত...আমাদের ঘ্রাণ শক্তি কুকুরের চেয়েও দুর্বল...আর আমাদের স্বাদ বড়জোর মদের বয়স পরিমাপ করতে পারে।

তবু যদি আমাদের অন্যান্য অঙ্গগুলি এদেরই মতন কর্মক্ষম হতো, তবে হয়তো আমরা আবিষ্কার করে ফেলতাম, কারা আমাদের ঘিরে রেখেছে।

১৬ই মে:

আমি নির্ঘাৎ অসুস্থ। গত মাসেও কত সুস্থ ছিলাম! জ্বর হয়েছে, ভয়াক্রান্ত জ্বর অথবা, বলা যায় এক ধরনের জ্বরাক্রান্ত বিহ্বলতা আমার মনকে ও দেহকে পীড়ন করছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অজানা কোন বিপদের আশঙ্কা করছি—অসুস্থতার

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুভয়ও অনিবার্যভাবে আমার রক্তে ও মাংসে বীজাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে।

১৮ই মে :

ঘুম নেই। ডাক্তার ডেকেছিলাম। তিনি দেখলেন, নাড়ি চঞ্চল, চক্ষু বিস্ফারিত, স্নায়ু উত্তেজিত অথচ কোন বিশেষ রোগের লক্ষণ নেই। আমাকে 'ডুশ' নিতে হবে এবং স্নায়ু ঠাণ্ডা রাখার জন্য পটাশিয়াম জাতীয় ব্রোমাইড পান করতে হবে।

২৫শে মে :

কোন পরিবর্তন তো দেখছি না। আমার অসুখটা সত্যি অদ্ভুত। রাত ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গে অদম্য এক অস্বস্তি আমাকে গ্রাস করে,—মনে হয়, রাত বুঝি কোন ভয়াবহ পরিণতি গোপন করে রেখেছে আমার জন্য। আমি খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই; তারপর আমি পড়বার চেষ্টা করি। কিন্তু কোন শব্দের অর্থই বুঝতে পারি না; শুধুমাত্র অর্থহীনভাবে কতকগুলি অক্ষরকে চিনতে পারি মাত্র। সেই হেতু, বৈঠকখানায় আগু-পিছু পায়চারি করতে থাকি; মনের মধ্যে এমন এক বিচিত্র ভয়, যার হাত থেকে কোনক্রমেই রেহাই নেই। ঘুমিয়ে পড়তে ভয় পাই, বিছানা আমার কাছে এক আতঙ্ক।

ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা তখন আমার ঘরে ঢুকি।

ঘরে ঢুকেই দরজায় দুটো তালা লাগাই, জানালাগুলি বন্ধ করি। আমি তখন ভয় পাচ্ছি...কিন্তু কাকে? আগে কখনো এত আতঙ্কগ্রস্ত হইনি...আলমারিটা খুলে দেখি...বিছানার নীচে উঁকি মারি, কান পেতে থাকি...শুনতে পাই... কি শুনতে পাই?

এ এমন এক বিচিত্র শরীরকে বিকল করা অসুস্থতা, এমনভাবে স্নায়ুর ওপর চেপে বসা উত্তেজনা, এমনভাবে শরীরের কোন কোন অংশে অস্বাভাবিক রক্তসঞ্চার, যা পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষকেও বিষণ্ণ করে তোলে, সবচেয়ে সাহসী লোকটিও পরিণত হয় ভীরুতে।

তখন আমি শুয়ে আছি, প্রতীক্ষা করছি মৃত্যুর মতন ঘুমের। অপেক্ষা করি, ভয় পাই। আমার বুক কাঁপে, পা কাঁপে। বিছানা ঢাকা গোটা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। তারপর হঠাৎ একসময় ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে পড়ি গভীর ও নিশ্চল জলে ডুবন্ত মানুষের মতন। আমি কখনো অনুভব করতে পারিনি, এই বিশ্বাসঘাতক ঘুম একসময় আমাকে অধিকার করবে, কাছাকাছি এসে ওৎ পেতে থাকবে, আমার ওপর নজর রাখবে, মাথাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, চোখের পাতা বুজিয়ে দেবে, আমার শক্তি হরণ করবে!...

আমি ঘুমিয়ে থাকি—দীর্ঘ সময় ধরে—দু-তিন ঘন্টা ধরে—তারপর এক স্বপ্ন—না,—এক দুঃস্বপ্ন আমার ওপর চেপে বসে। অনুভব করতে পারি, শুয়ে আছি ও ঘুমিয়ে আছি...এবং আমি এ-ও অনুভব করি, কে যেন আমার ঘনিষ্ঠ হয়েছে, বিছানায় উঠে বসেছে, হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারছে আমার বুকে, দু'হাতে আমার ঘাড় পাকড়ে চাপ দিচ্ছে...সমানে চাপ দিচ্ছে...তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিষ্পেষিত করছে আমাকে।

পাগলের মতন চেষ্টা করি নিজেকে মুক্ত করতে, এক ভয়ানক অসহায়তায় আমি অসাড়। চীৎকার করে উঠতে চাই—পারি না; নড়াচড়ার চেষ্টা করি—সম্ভব হয়

না; প্রচণ্ড আতঙ্কে সর্বশক্তি দিয়ে পাল্টা চাপ দিয়ে এই আক্রমণকারী জীবটাকে কাবু করে ফেলতে চাই—সক্ষম হই না।

তারপর সহসা আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আতঙ্কে ঘামে একেবারে জবজবে। একটা মোমবাতি ধরাই। আমি একা।

প্রতি রাত্রির অভিশাপ এ ভাবেই শেষ হয়। এরপর আমি গভীর ঘুমে ডুবে যাই এবং ভোর না হওয়া পর্যন্ত সেই ঘুম ভাঙ্গে না।

২রা জুন :

অবস্থা এখনো পূর্ববৎ। কি হয়েছে আমার? ব্রোমাইড সেবন বৃথা। 'ডুশ' নিয়ে কোন ফল পাইনি।

শারীরিক দিক থেকে প্রায়-ভেঙ্গে পড়া আমি কিছুক্ষণের জন্য রেহাই পাবার জন্য রুমেয়ারের বনে প্রবেশ করি। প্রথমে ভেবেছিলাম, ঘাস ও বনের সতেজ সুবাসবাহী মুক্ত অমল মিষ্টি বাতাস আমার ধমনিতে নতুন রক্তের স্রোত বইয়ে দেবে, মনে আসবে নতুন বল। বনের মধ্যবর্তী অনেকটা ফাঁকা জায়গা সেই আশায় পার হয়ে আসি, তারপর হাঁটতে শুরু করি বভিলির দিকে। দু'ধারে ঘন সংবদ্ধ বিরাট বিরাট গাছ, তাদের সবুজ ও ঘোর কালো আচ্ছাদন যেন আমার ও আকাশের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে আছে।

হঠাৎ আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে,—হিমেল কম্পন নয়, তীব্র শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে ভয়জনিত শিহরণ। এই বিশাল বনভূমিতে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠি অহেতুক ভয়ে। নিজের একাকীত্ব বড় প্রকট! সহসা মনে হলো, কে বুঝি খুব ঘনিষ্ঠ থেকে আমাকে অনুসরণ করছে; সে যেন এত কাছে যে, যে কোন মুহূর্তে আমাকে ছুঁয়ে দেবে!

চারদিকে চোখ বোলাই। আমি একা। পিছনে অভাবনীয় শূন্যতা। যতদূর নজর যায়, সেই বিরাট শূন্যতা! আমি চোখ বুজি। কিন্তু কে? চোখ বুজে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে লাট্টুর মতন পাঁক খেতে থাকি। প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম আর কি। আবার চোখের পাতা খুলে তাকাই। গাছগাছালি নর্তনরত। আন্দোলিত পৃথিবী। আমি বাধ্য হলাম বসে পড়তে। তারপর—ওহ্। আমি যে খেয়ালই করিনি, এতক্ষণ কোন্ পথ ধরে হেঁটেছি। অদ্ভুত চিন্তা! আশ্চর্য! বিচিত্র ভাবনার গতি! এই মুহূর্তে কিছুই স্থির করতে পারছি না। ডান-হাত বরাবর চলতে শুরু করি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করি, আমি আবার সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখান থেকে চলা শুরু করে বনের একেবারে মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

৩রা জুন :

রাত ভয়াল।

কয়েক সপ্তাহের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছি। এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ নিশ্চয় আমাকে স্বাভাবিক করে তুলবে।

২রা জুলাই :

আবার ফিরে এসেছি নিজের আবাসে। আমি সুস্থ। বিরামের দিনগুলি ছিল আনন্দঘন। গিয়েছিলাম এক অচেনা জায়গায়—মন্ট-সেন্ট-মিচেল। গোধূলি লগ্নে ওখানে গেলে

এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। শহরটা ঢালু জমির বুকে শুয়ে আছে। আমি প্রথমেই গিয়েছিলাম শহরের প্রান্তে এক বাগানে, যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সবিস্ময়ে শব্দ করে উঠেছিলাম।

সামনে বিশাল বিস্তৃত উপসাগর—দৃষ্টির বাইরে লীন হয়ে গেছে। সোনালী আকাশের নীচে এই সীমাহীন হলুদ বর্ণ সাগরের বুক চিরে মাথা উঁচিয়ে আছে এক অদ্ভুত পাহাড়, যার দেহ অন্ধকার এবং চূড়া যেন আকাশস্পর্শী। সবে সূর্য অস্ত গেছে, দিগন্ত জুড়ে স্বর্ণাভ আলোর রেশ। এ বড় আশ্চর্য মুহূর্ত!

দিনের শুরুতে ঐ ছোট ছোট ঢেউয়ে হিল্লোলিত সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলাম। ওখানে যাবার পর দেখতে পেলাম, দূরে এক মস্ত উঁচু মঠ দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে আমি সেই পাথুরে প্রাসাদের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই বিশাল গির্জা যেন এই ছোট্ট শহরটাকে পরিচালনা করে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভাঙতে থাকি। ঘুরতে থাকি গথিক রীতির বিচিত্র এক ঐশ্বরিক প্রাসাদে, আয়তনে যা বুঝি একটা শহরের সমান, অসংখ্য ঘর, থাক থাক উঠে গেছে বহু দীর্ঘ গ্যালারি। গ্রানাইট পাথরে তৈরী রত্নখচিত ফিতের মতন চক্চকে সেই সব চত্বরে আমি ঘুরে বেড়াই; দিনের নীল আকাশ ও রাতের কালো আকাশ যেন একাকার হয়ে স্তম্ভগুলির সঙ্গে যুক্ত, যে স্তম্ভগুলির নল-মুখে হরেক রকম প্রতিমূর্তি—কোনটা শয়তানের মুখ, কোনটা বা বিচিত্র-দর্শন পশুর।

গির্জার শীর্ষে দাঁড়িয়ে পাদরীকে বললাম, 'ফাদার, কী চমৎকার জায়গায় আপনি থাকেন!'

'এখানে সব সময়ই খুব হাওয়া'—তিনি জানালেন।

আমরা কথা বলছি। তখন সমুদ্র ছুটে এসে বালুবেলা ভিজিয়ে দিল, যেন বালিয়াড়ি ঢেকে গেল এক স্টিলের বর্মে। পাদরী এই জায়গার অনেক পুরনো গল্প শোনালেন, যেগুলি সর্বার্থেই লৌকিক উপাখ্যান। গল্পগুলির মধ্যে একটিকে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়। স্থানীয় উঁচু এলাকার বাসিন্দারা বলে থাকে, তারা নাকি রাত্রে ঐ বালুবেলা থেকে ভেসে আসা একজোড়া ছাগলের ভ্যা ভ্যা ডাক শুনতে পায়! প্রথম ছাগলের ডাকটা বেশ জোরে, দ্বিতীয়টির স্বর কিছুটা ক্ষীণ। অবিশ্বাসীদের অভিমত, ঐ ডাক সামুদ্রিক পাখির, কখনো কখনো আওয়াজ ছাগলের চীৎকার বলে মনে হয়, কখনো বা মনে হয় মানুষের বিলাপ। কিন্তু রাত্রে মাছ মারতে যাওয়া জেলেরা গল্প করে, তারা নাকি বালিয়াড়িতে এক বৃদ্ধ পশুচারককে দেখেছে দুই স্রোতের মধ্যবর্তী এলাকা ধরে ছোট্ট শহরকে প্রদক্ষিণ করতে। তারা কেউ কোনদিন ওর মাথা দেখতে পায়নি, মাথাটা নাকি ঢাকা থাকে ঢিলে পোশাকে; পশুচারকের পিছন পিছন চলেছে দুটো অদ্ভুত ছাগল,—যাদের একটার মুখ মানুষের, অপরটার মানবীর; দুটোরই সর্বাঙ্গ ঢাকা সাদা লোমে, বিজাতীয় ভাষায় তারা দুটিতে কথা বলে; আচমকা আচমকা সজোরে ডেকে ওঠে।

'আপনি এই গল্প বিশ্বাস করেন?' আমি পাদরীকে জিজ্ঞেস করি।

ক্ষীণ স্বরে বলেন, 'জানি না।'

'যদি তাই হয়', আমি বলতে থাকি, 'তা হলে পৃথিবীতে ঐ জাতীয় বিচিত্র জীবের অস্তিত্বও আমাদের মেনে নিতে হয়। অথচ, কেন তবে এতকাল আমরা তাদের সন্ধান পাইনি? আপনি নিজে কেন তাদের দেখেননি? কেন আমি নিজে আজ অব্দি তাদের আবিষ্কার করিনি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আপনি কি দুনিয়ার শত-শত হাজার-হাজার সব বস্তুকেই চেনেন? ধরুন, এই বাতাসের কথাই,—প্রকৃতির সবচেয়ে বড় শক্তি এই বাতাস, যা মানুষকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়, গাছগুলিকে মূলসমেত উপড়ে ফেলে, সমুদ্রকে ঠেলে তুলে দেয় পাহাড়ের ওপরে, পাহাড়কে গুঁড়িয়ে দেয়, বড় বড় জাহাজগুলিকে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেয় তীরভূমিতে—বাতাস, যা হত্যা করে, যা শিস দেয়, আর্তনাদ ছাড়ে, গর্জন করে—আপনি কি সেই পরম শক্তিমান বস্তুকে কখনো দেখেছেন, নিজের চোখে দেখতে পান? অথচ তার অস্তিত্ব বাস্তব।'

এই সরল যুক্তির সামনে আমি নীরব। এই মানুষটি হয় সত্যভ্রষ্ট নচেৎ, উন্মাদ। তাঁর কথায় খুব একটা নাড়া আমি খাইনি; আমি আমার মানসিক স্থৈর্যকে ধরে রেখেছি; কিন্তু এখন তাঁর কথা থেকে থেকে মনে আসছে।

৩রা জুলাই :

ঘুম গভীরই হলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য—এ বাড়ির কোচোয়ানকেও আমার মতন জ্বর জ্বর অসুস্থতায় পেয়ে বসেছে! গতকাল এখানে এসেই আমি ওর অদ্ভুত পাণ্ডুরতা লক্ষ্য করেছি।

'কি হয়েছে তোমার?' —আমি জানতে চেয়েছি।

'এই ক'দিন আমি একদম শান্তি পাইনি, স্যার। দেখুন, আমি ঘরের দু'দিকেই মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছি। আপনি চলে যাবার পর আমি ঐ আলো সরিয়ে নিতে সাহস পাইনি।' আর সমস্ত চাকর-বাকররা বহালতবিয়তেই রয়েছে। কিন্তু আবার আমাকে সেই আতঙ্ক এসে গ্রাস করছে।

৪ঠা জুলাই :

নিশ্চিতভাবেই আবার আক্রান্ত আমি। পুরনো দুঃস্বপ্নগুলি ফিরে আসছে। গত রাত্রিতে মনে হয়েছিল, কোন এক পাশবশক্তি বুকের ওপর চেপে বসেছে; আমার মুখ দিয়েই সে তার কাজ করছে। আমারই ঠোঁট দিয়ে জোঁকের মতন সে আমার জীবনীশক্তি, রক্ত শুষে নিচ্ছে। একসময় সে উঠে দাঁড়ায়, আমি নিজেকে পূর্ণভাবে ফিরে পাই। শরীরটা খণ্ড-খণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে, নড়তে চড়তে পারছি না। এমন অবস্থা যদি আরো কিছুদিন চলে, আবার পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর থাকবে না।

৫ই জুলাই :

আমি কি আমার বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়ে ফেলেছি? গত রাত্রির বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনে করলে মাথা ঘোরে। প্রতি সন্ধ্যার মতন কালও আমি আমার ঘরের দরজা

বন্ধ করেছিলাম; তারপর তেষ্টা পাওয়ায় এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেলাম। মনে আছে, স্ফটিক কাঁচের পাত্রে তখন অনেকখানি জলই বর্তমান ছিল। ...এরপর শোবার পর যথারীতি সেই ভয়ানক দুঃস্বপ্ন এবং ঘন্টা দুইয়েক সেই দুঃস্বপ্নের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসি, আমার তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছে। একবার কল্পনা করুন, একটি লোক ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হচ্ছে এবং সে বিছানায় উঠে বসেছে বুকে আমূলবিদ্ধ ছুরি নিয়ে, গলায় মৃত্যুকালীন ঘড়ঘড় শব্দ, সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত, শ্বাস নিতে অপারগ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত, বোধশক্তি নেই—ঠিক এমন এক অনুভূতি!

এই অবস্থার ঘোর কাটিয়ে উঠবার পরই আবার আমার পিপাসা পায়। একটা মোমবাতি ধরিয়ে টেবিলের ওপর রাখা জলের পাত্রটার দিকে অগ্রসর হই। ওটা তুলে গেলাসের ওপর উবুড় করি; এক ফোঁটা জলও গেলাসে গড়িয়ে পড়ে না! এটা শূন্য! একেবারে শূন্য! প্রথমে আমার কিছুই মনে হয়নি; তারপরই চকিতে প্রচণ্ড আতঙ্কে এমন শিউরে উঠি যে বসে পড়তে বাধ্য হই; অথবা, বলতে পারি, আমি যেন একটা চেয়ারের ওপর পড়ে গেলাম। তারপরই আবার উঠে দাঁড়াই, চারদিকে দৃষ্টি বোলাতে থাকি। আবার বসে পড়ি, বিস্ময়ে আতঙ্কে ঐ জলের স্ফটিক পাত্রটার দিকে চেয়ে আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছি। স্থির চোখে ওটার দিকে চেয়ে এই রহস্যের উত্তর খুঁজছি। হাত কাঁপছে। কেউ কি আমার জলটা খেয়ে গেছে? কে? আমি? নিশ্চয় আমি। আমি ছাড়া আর কে হবে? তাহলে আমি এক স্বপ্নচারী। কেউ জানে না, কী রহস্যময় দ্বৈত জীবন নিয়ে আমি বেঁচে আছি। তবে কি আমার সত্তাও দুটো? অথবা এই অবচেতন মনকে অধিকার করে নিয়েছে অন্য এক অদৃশ্য শক্তি, যার নির্দেশে এই দেহ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও অনেক বেশী তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে! হায় রে, কে আর বুঝবে আমার এই ভয়ানক দুরবস্থার কথা? কে বুঝবে আমার মতন প্রকৃতিস্থ, সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছে তার জলের পাত্রের দিকে চেয়ে, যে পাত্রের জল তার ঘুমিয়ে থাকার কালে অদৃশ্য হয়ে গেছে?

আমি বিছানায় ফিরে যেতে ভয় পেলাম। দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত ঠায় বসে রইলাম ঐ চেয়ারে।

৬ই জুলাই:

আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি।

গত রাত্রে আবার জলের পাত্র শূন্য। অথবা, আমিই ওটাকে শূন্য করেছি। কিন্তু সত্যি কি তাই? সত্যি কি আমি-ই করেছি? কে করতে পারে? কে? ওহ্, ঈশ্বর! আমি সত্যি সত্যি পাগল হ'য়ে যাবো? কে আমায় বাঁচাবে?

১০ই জুলাই:

অদ্ভুতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শুনুন।

৬ই জুলাই শুয়ে পড়বার আগে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছিলাম মদ, দুধ, জল, রুটি এবং কতকগুলি স্ট্রবেরি ফল।

তারপর মাঝ রাত্তিরে কেউ একজন অথবা, আমার ভোগেই লেগেছে ঐ জল ও দুধ। মদ, রুটি বা স্ট্রবেরিগুলিতে একটুকু ছোঁয়া লাগেনি।

৭ই জুলাই ঐ একই পরীক্ষা চালিয়ে এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি।

৮ই জুলাই জল ও দুধ রাখিনি। অন্য কোন কিছুতেই সেদিন ছোঁয়া লাগেনি।

শেষে ৯ই জুলাই জল ও দুধ রেখে পাত্র দু'টিকে সাদা মসলিনের টুকরোয় শক্ত করে বেঁধে ফেললাম। তারপর নিজের ঠোঁট ও দাঁড়িতে রঙ মাখালাম, হাতেও মাখলাম

কাঠকয়লার কালি। এসব করে শুয়ে পড়ি বিছানায়। যথারীতি শক্তিমান ঘুম আমাকে হরণ করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হয় সেই অনিবার্য ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। ...ঘুম ভাঙবার পর খেয়াল করি, আমার বিছানায় কোন ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই, তেমনিই পরিপাটি করে পাতা বিছানা। ছুটে গেলাম টেবিলটার দিকে। ঠিক তেমনি ঢাকা রয়েছে জল ও দুধের পাত্র, সাদা কাপড়ে কোন দাগ নেই। আমি বাঁধনটা খুলে ফেলি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আতঙ্ক। সবটুকু জল, সবটুকু দুধ নিঃশেষ। হা ভগবান!

আমি এখনই চলে যাচ্ছি প্যারিসে।

১৩ই জুলাই:

প্যারিস!

গত কয়েকদিনের ধকলে আমার চিন্তাশক্তি বিকল। নিশ্চয় আমি এলোপাথাড়ি কল্পনার শিকার হ'য়ে গেছি; আমি সত্যিই স্বপ্নে চলাফেরা করি অথবা প্রায়শ্চিত্তের অতীত কোন মারাত্মক মানসিক অসুস্থতা গ্রাস করে ফেলেছে আমাকে।

যাই হোক, বদ্ধ পাগল হতে বেশী দেরী ছিল না। এখন প্যারিসে একটি দিন কাটাবার পর মানসিক স্থৈর্য অনেকটা ফিরে পেয়েছি।

গত সন্ধ্যায় ইতি-উতি ঘুরবার পর 'থিয়েটার ফ্রান্‌সাইসে' গিয়েছিলাম ছোট ডুমার লেখা একটি নাটক দেখতে। নাটকের বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ বক্তব্য আমার যুক্তি ও ভাবনাকে আবার সতেজ ও শানিত করে। সন্দেহ নেই, একাকীত্ব যে কোন কর্মক্ষম মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমরা আমাদের চারপাশে মানুষেরই সঙ্গ চাই—যে মানুষরা চিন্তা করে ও কথা বলে। দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ থাকবার ফলেই মনের ওপর ভৌতিক প্রতীতি জাল বিছাবার সুযোগ পায়। দু'পাশে সারি সারি গাছের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত রাস্তা বেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সদা তৎপর মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে নিজের ভয়ের কথা ভাবতে বেশ মজাই লাগছিল। সত্যি, আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু কত সহজেই পরিবেশের চাপে বেসামাল হয়ে পড়ে!...

১৪ই জুলাই:

আজ জাতীয় মুক্তি দিবস।

আমি চলেছি রাস্তা দিয়ে। উৎসবমুখর জনতার বাজি পোড়ানো ও পতাকা নাড়ানো আমার ভেতরে শিশুসুলভ উল্লাসের সঞ্চার করে। জনতার মানসিকতা বড় বিচিত্র—তারা কখনো অহেতুক সংযত, কখনো বা হিংস্র বিপ্লবী। আপনি ওদের বুঝিয়ে বলুন: আনন্দ করো। ওরা উল্লাসে ফেটে পড়বে।

আপনি তাদের উত্তেজিত করুন: প্রতিবেশীকে আক্রমণ করো। ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রতিবেশীর ওপর।

আপনি তাদের রাজি করান: রাজাকে ভোট দাও। তারা রাজাকেই ভোট দেবে।

আবার উল্টোটি বোঝান: রিপাব্লিককে ভোট দাও। ওরা নির্ঘাৎ রিপাব্লিককে সমর্থন জানাবে।

জনতার শাসকরা প্রায়শই মদ্যপ, পশুবৎ; তারা মানুষকে মানার চেয়ে মানে কতকগুলি নীতিকে—যে নীতি বহুলাংশে ভুল ও ভাওতা। এই দুনিয়ায় কিছুই যখন

স্থির ও নিশ্চিত নয়, এমন কি আলো ও শব্দও যখন মায়া, তখন তথাকথিত প্রশংসিত ও প্রতিষ্ঠিত নীতির কি মূল্য থাকতে পারে?

১৬ই জুলাই:

গতকাল আমার জীবনে এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, যার প্রভাবে আমি এখনো বিভ্রান্ত। কাল ডিনার সারতে গিয়েছিলাম খুড়তুতো বোন মঁ সেলবের বাড়িতে। সেলবের স্বামী লিমোজ ৭৬তম 'নাইট হর্স' বাহিনীর সেনাপতি।

ঐ বাড়িতেই দু'জন যুবতীকেও দেখতে পেলাম। তাদের একজনের স্বামী ডঃ পেরেন্ট, যিনি চিকিৎসা ও গবেষণা করছেন স্নায়ুর রোগ ও সংবেদন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আশ্চর্য আবিষ্কারের ওপর। ভদ্রলোক এ ব্যাপারে ইংরেজ বিজ্ঞানী ও নান্‌কি স্কুলের ডাক্তারদের বিচিত্র সমস্ত গল্প শোনাচ্ছিলেন।

গল্পগুলি আকর্ষণীয় নিঃসন্দেহে; আমি আমার নিজের উপলব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা করছিলাম।

'আমরা এখন' তিনি ঘোষণা করলেন, 'প্রকৃতির গূঢ়তম রহস্য আবিষ্কার করতে চলেছি। এটাকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রহস্যও বলা চলে। যতদিন থেকে মানুষ ভাবতে শিখেছে, মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারছে, ততদিন থেকেই সে এক অতি সূক্ষ্ম রহস্যের সন্ধান পেয়েছে, যাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে সে আজো ব্যর্থ। মানুষ তার শারীরিক অক্ষমতা পূরণ করার চেষ্টা করে বুদ্ধি দিয়ে। কিন্তু যতদিন এই বুদ্ধিও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, ঐ অজানা রহস্য তাকে দারুণ ভয় দেখাবে। এইভাবেই ভৌতিক ব্যাপার-ট্যাপার, পরী-টরীর গল্পগুলি লোকসমাজে এত প্রাধান্য পেয়ে আসছে। আমি আরো বলছি, এই যে আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস, এটাও আমাদের দুর্বল মানসিকতা, অপরিপক্ক বুদ্ধি ও ভয়াচ্ছন্ন অসহায়তার ফলশ্রুতি! এ ব্যাপারে ভলতেয়ারই হক কথা বলে গেছেন: ঈশ্বর তাঁর নিজের মূর্তিতে মানুষকে গড়েছেন; আবার মানুষও এর প্রত্যুত্তর দিচ্ছে ঈশ্বরকে নিজেদের ইচ্ছামতন রূপ দিয়ে।'

'কিন্তু গত এক শতাব্দীরও কিছু বেশী কাল যাবৎ আমাদের সামনে নতুন জ্ঞানের এক ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। বিশেষতঃ চার-পাঁচ বছরের মধ্যে এই গবেষণায় অনেক আশ্চর্য ফল আমরা পেয়েছি।'

ডাক্তারের কথায় আমার মতন আমার খুড়তুতো বোনেরও বিশ্বাস নেই। সে মুচকি মুচকি হাসছে। ডঃ পেরেন্ট তার দিকে চেয়ে বলেন, 'কি মাদাম, দেবো নাকি আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে?'

'দেখুন চেষ্টা করে।'

বোন উঠে গিয়ে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে, ডাক্তার একদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে সম্মোহিত করার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ কেমন এক অস্বস্তিবোধ আমাকে পেয়ে বসে; বুক কাঁপে, গলা শুকিয়ে যায়। চোখের সামনে মঁ সেলবের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করছি—তার চোখের পাতা ক্রমশ ভারী ও মুখের ভেতর থেকে হেঁচকি উঠছে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হচ্ছে।

দশ মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

'আপনি ওর পিছনে গিয়ে বসুন।' ডাক্তার আমাকে বললেন।

আমি সম্মোহিত নারীর পিছনে গিয়ে বসি।

ডাক্তার ওর হাতে পিস্‌বোর্ডের একখানা ভিজিটিং কার্ড গুঁজে দিয়ে বলেন, 'আপনার হাতে আমি একখানা আয়না দিলাম। এর মধ্য দিয়েই আপনি সব দেখতে পাবেন। বলুন তো, এখন কি দেখতে পাচ্ছেন?' ঘুমন্ত সেলব জবাব দেয়, 'আমি আমার দাদাকে দেখতে পাচ্ছি!'

'কি করছেন তিনি?'

'গোঁফে তা দিচ্ছেন।'

'এখন?'

'পকেট থেকে একখানা ফটো বের করছেন।'

'কার ফটো?'

'তাঁর নিজের।'

ঠিক ঠিক বলে যাচ্ছে সে। এই ফটোখানা আজই সকালে আমি পেয়েছি।

আবার ডাক্তারের প্রশ্ন, 'ফটোতে উনি কি করছেন?'

'টুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।'

সামান্য একখণ্ড পিস্‌বোর্ড কি আয়না হ'য়ে গেল! আশ্চর্য! যা বলছে, হুবহু সত্যি!

অন্য দুই যুবতী ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ভয় পেয়েছে, তারা সমস্বরে বাধা দেয়, 'বন্ধ করুন, এ খেলা বন্ধ করুন!'

কিন্তু ডাক্তারের ভ্রূক্ষেপ নেই, অবিচল তাঁর নির্দেশ উচ্চারিত হয়, 'কাল সকাল আটটায় আপনার একবার ঘুম ভাঙবে। তখন আপনি আপনার দাদার হোটেলে গিয়ে তাঁর কাছে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার চাইবেন। টাকাটা আপনার স্বামীর খুব দরকার।'

এরপর ডাক্তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন।

হোটেলে ফিরবার সময় ঘটনাটাকে মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখি। একবার মনে হলো, ব্যাপারটা চালাকি। যদিও আমি আমার বোনকে ছোটবেলা থেকে চিনি, মনে হয়, ডাক্তারের সঙ্গে চুক্তি করে সে আমাকে বেওকুফ বানাবার তালে আছে। ডাক্তার ঐ ভিজিটিং কার্ডটা দেবার সময় হয়তো একখণ্ড আয়নাও সেলবের হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন এবং তাতেই বাজি মাৎ। পেশাদার যাদুকররা যা করে, আপাতভাবে সবই তো অদ্ভুত মনে হয়।

হোটেলে ফিরে বিছানা নিলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় হোটেলের লোক আমাকে ডেকে তোলে।

'স্যর, মঁ সেলব নামক এক মহিলা আপনার সাথে এখনই দেখা করতে চান।'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে সেলবের সঙ্গে দেখা করি। তার চোখে মুখে উদ্বেগ আর উত্তেজনা, দৃষ্টি আনত; অবগুণ্ঠন না তুলে বলে, 'তোমার কাছে খুব জরুরী দরকারে এলাম।'

'কি দরকার?'

'তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। দরকার—খুব দরকার, পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক আমাকে ধার দাও।'

'তোমার দরকার?'

'হ্যাঁ; আমার অথবা আমার স্বামীর। উনিই তো এই টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন!'

বিস্ময়ে ও সংশয়ে আমি বিভ্রান্ত। ডঃ পেরেন্ট আর আমার খুড়তুতো বোন নিখুঁত অভিনয় করে আমাকে বোকা বানাচ্ছে না তো!

কিন্তু ওকে আরো গভীর দৃষ্টিতে দেখবার পর আমার মন থেকে সংশয় দূর হয়। পরিষ্কার বুঝতে পারি, ওর এই দুশ্চিন্তা ও আকুলতা অকৃত্রিম।

অথচ, সেলব যথেষ্ট স্বচ্ছল পরিবারের গৃহিণী। বললাম, 'কি বলছো! তোমার স্বামী মাত্র পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক জোগাড় করতে পারলেন না? ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো—সত্যি কি তিনি ধার চেয়েছেন?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য তার ভেতরে দ্বিধা ও সংশয় দোলা দিয়ে যায়, সে যেন প্রচণ্ড চেষ্টা করছে তার স্মৃতিকে ফিরে পাবার জন্য; তারপর বলে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ...আমি নিশ্চিত।'

'তিনি কি তোমাকে লিখে পাঠিয়েছেন?'

আবার তার দ্বিধা। আমি দেখছি, দারুণ মানসিক কষ্ট হচ্ছে যেন তার। সে যথার্থই কিছু মনে করতে পারছে না। সে শুধু জানে, তাকে তার স্বামীর জন্য পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার করতেই হবে।

শেষে মরীয়া হ'য়ে মিথ্যাই বলে বসে, 'হ্যাঁ, তাঁর চিঠি আমি পেয়েছি।'

'কিন্তু কখন? তুমি তো কাল এ সম্পর্কে কিছু বলোনি।'

'আজ সকালেই চিঠি পেলাম।'

'আমাকে দেখাতে পারো?'

'না-না-না;...এটা খুবই গোপনীয়...একান্ত ব্যক্তিগত...আমি...আমি ঐ চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'তা হলে তোমার স্বামী নিশ্চয় বাজারে ধার দেনা করে ফেলেছেন।'

'আমি জানি না।'

হঠাৎ আমি কঠিন গলায় বলে উঠি, 'এই মুহূর্তে তোমাকে আমি পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার দিতে পারছি না।'

আমার কথায় অস্থির বিলাপে কঁকিয়ে ওঠে সে, 'ও, দোহাই তোমার, টাকাটা যে করে হোক আমাকে দিতেই হবে।'

উত্তেজনায় কাঁপছে, করুণ আর্তিতে দুই হাত তুলে যেন ভিক্ষা চাইছে সে।

আমার দয়া হয়।

'আচ্ছা আমি দেবো, কথা দিচ্ছি।'

'কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো তোমায়,' দারুণ স্বস্তিতে চীৎকার করে ওঠে সে, 'কত দয়া তোমার!'

'তুমি কি মনে করতে পারছো', আমি বলি, 'গত সন্ধ্যায় তোমার বাড়িতে কি ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কি মনে আছে, ডঃ পেরেন্ট তোমাকে ঘুম পাড়িয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। তবে শোন, ঐ ডাক্তারই তোমাকে হুকুম করেছিলেন, আজ সকালে আমার কাছে এসে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার চাইতে। এবং এখন তুমি সেই নির্দেশই পালন করতে এসেছো।'

সে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলে, 'ওসব বুঝি না। আসল কারণ হলো টাকাটা আমার স্বামীর দরকার।'

এক ঘন্টা ধরে তাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করি; পারি না।

সে চলে যাবার পরই আমি সোজা ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হই।

তিনি সেইমাত্র বাইরে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন।

বললেন, 'এখন নিশ্চয় বিশ্বাস করছেন?'

'অবিশ্বাসের উপায় নেই।'

'চলুন, আপনার বোনকে দেখে আসি।'

দু'জনে গিয়ে দেখি মঁ সেলব গভীর ঘুমে ডুবে আছে। সারা শরীরে তার ক্লান্তি।

ডাক্তার ওর নাড়ির গতি দেখলেন, কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে সম্মোহন-শক্তিত চোখের পাতা এক হাতে মেলে ধরে ঘুমন্ত যুবতীকেই বলতে থাকেন, 'শুনুন, আপনার স্বামীর আর পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন নেই। আপনি ভুলে যান যে আপনার দাদার কাছে টাকাটা ধার চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে উনি যদি কোন কথা বলেন, আপনি ঘটনাটা মনেই করতে পারবেন না।'

এরপর ডাক্তার মঁ সেলবের ঘুম ভাঙ্গালেন।

আমি আমার পকেট থেকে একটা নোট বুক বের করে ওকে বলি, 'দেখো আজ সকালে তুমি আমাকে কি সব বলে এসেছো।'

সেলব এমন অবাক হ'য়ে যায় যে আমি নিজে অপ্রতিভ বোধ করি। আমি অবশ্য ওর স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও দারুণভাবে অস্বীকার করলো ঘটনাটা। ভাবলো, আমি বুঝি ওর সঙ্গে ইয়ার্কি মারছি। শেষে রেগে গিয়েছিল পর্যন্ত।

হোটেলে ফিরে এসেছি এরপর।

গোটা ব্যাপারটা আমার মনে এমন ঝড় তুললো যে, আমি দুপুরের খাবার পর্যন্ত খেতে পারিনি।

১৯শে জুলাই:

বহু লোককে আমি এই অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছি। তাঁরা আমার বিহ্বলতাকে উপহাস করেছেন। জানিনা, এর সম্পর্কে আর কি ভাববার আছে। বিজ্ঞ মানুষ রায় দেবেন: হতেও পারে!

২১শে জুলাই:

বুগিভেলে ডিনার সেরেছি। স্থানীয় এক ক্লাবে সন্ধ্যাটা কাটালাম। সব কিছুই স্থান ও ব্যক্তিনির্ভর। গ্রেনৌলির দ্বীপে বসে ভূতে বিশ্বাস করা বিরাট মূর্খতার সামিল।

...কিন্তু মণ্ট-সেন্ট-মিচেলের চূড়ায় বসে? ...অথবা, ইণ্ডিসের দ্বীপমালায়? ...পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাদের ভয়ানকভাবে প্রভাবিত করে।

সামনের সপ্তাহে বাড়ি ফিরে যাবো।

৩০শে জুলাই:

বাড়ি ফিরেছি গতকাল। সব কিছুই যথাযথ।

২রা আগস্ট:

কিছুই অবিস্মৃত নয়। চমৎকার আবহাওয়া। সারাটা দিন বহমান নদী সীনের দিকে চেয়ে আছি।

৪ঠা আগস্ট:

বাড়ির চাকর-বাকরদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। কে নাকি রাত্রে আলমারিতে রাখা গ্লাসগুলিকে ভেঙ্গেছে। আমার নিজস্ব পরিচারক দোষ দিচ্ছে বাবুর্চিকে; বাবুর্চি দুষছে ঝিকে; আর ঝি অপরাধের বোঝা চাপাচ্ছে অপর দু'জনের ঘাড়ে। অপরাধী কে? খুব শক্তিশালী বুদ্ধিমান লোকের পক্ষেই সে অপরাধীকে খুঁজে বের করা সম্ভব।

৬ই আগস্ট:

এবার কিন্তু আমি প্রকৃতিস্থ।

কিন্তু আমি দেখেছি...আমি দেখেছি...দেখেছি...আর কোন সন্দেহ নেই...আমি দেখেছি...এখনো আমার হাড়গুলি হিম হ'য়ে আছে—এখনো মজ্জায় মজ্জায় ভীতি...আমি দেখেছি।

দুপুর দুটোর সময় গোলাপ-বাগানের পরিচর্যা করছিলাম। চারদিকে ঝক্‌ঝকে দিনের আলো।...শারদীয় আমেজে গোলাপগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত। বিশেষতঃ তিনটে পাশাপাশি অপূর্ব ফুটন্ত গোলাপ সহজেই নজর কাড়ে। আমি ওদের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। সহসা পরিষ্কার দেখতে পেলাম ঐ গোলাপ তিনটের একটার ডাঁটা ধরে কোন এক অদৃশ্য হাত নাড়াচ্ছে। পরক্ষণে ফুলটি বৃন্তচ্যুত হল। এর পরের দৃশ্য আরো অবিশ্বাস্য। গোলাপটি শূন্যে দুলতে দুলতে যেন কোন অদৃশ্য মুখগহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে। মৃদু বাতাসে হেলছে-দুলছে ফুলটি, অথচ এটি বৃন্তচ্যুত,—আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরত্বে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, রক্তে মরীয়া ভাব, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ি শূন্যে দোদুল্যমান ফুলটাকে লক্ষ্য করে। অথচ কোন কিছুর সঙ্গেই আমার ছোঁয়া লাগলো না। ফুলটা অদৃশ্য।

ঠিক এই মুহূর্তে আতঙ্কের বদলে নিজের ওপর রাগে জ্বলে উঠি। নিজেরই ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। কোন যুক্তিবাদী মানুষের কখনো এ রকম মতিভ্রম হয় না।

কিন্তু এটা কি সত্যিই মতিভ্রম?

চকিতে ঘুরে আবার ফুল-বাগানের দিকে তাকাই। বিস্ময়ের অন্ত নেই। বৃন্তচ্যুত গোলাপটি আর দুটি গোলাপ চারার পাশে ঝোঁপের ওপর পড়ে আছে।

তখন আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে ঘরে ফিরে আসি; ঠিক বুঝতে পারছি, কিবা দিন, কিবা রাত—আমার পাশে পাশে এক অদৃশ্য জীব চলেছে। সে দুধ ও জল খেয়ে বেঁচে থাকে, সে যে কোন বস্তুকে স্পর্শ করতে পারে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে।

৭ই আগস্ট :

নির্বিঘ্নে ঘুমিয়েছি। সে আমার পাত্র থেকে জল পান করেছে, কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়নি। ভাবছি, সত্যি কি পাগল হয়ে গেলাম?

কখনো কখনো খোলামেলা ফুটফুটে দিনের আলোয় ইতস্ততঃ পায়চারি করতে করতে নিজের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে গভীর সংশয় জাগে।

জীবনে রকমারি পাগল দেখেছি। দেখেছি অনেক বুদ্ধিমান, স্বচ্ছ ধারণার মানুষ, যাদের আপাতভাবে স্বাভাবিক মনে হলেও, কোন কোন ব্যাপারে তাদের অস্বাভাবিকতা প্রকট হ'য়ে ওঠে। তারা স্বাভাবিক ও সতেজ স্বরে কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ খেই হারিয়ে ফেলে, মানসিক অসুস্থতার কঠিন স্তরের দিকে ধেয়ে যায়; তাদের মগজ তখন এলোমেলো বাতাসে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র যেন, কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতায় তাদের বোধশক্তি আর্তনাদ করে—যে অবস্থাকে আমরা এককথায় বলি পাগলামি।

যদি আমি আমার এই সাম্প্রতিক মানসিক বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন না থাকতাম, তা হলে আমাকেও ঐ পাগলদেরই পর্যায়ভুক্ত করা যেত। নিজের মন ও ভাবনাকে এই যে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছি, এটাই তো প্রমাণ করে—আমি এখনো উন্মাদ হইনি।

কিন্তু মস্তিষ্কে নির্ঘাৎ কোন অজানা অস্বাভাবিকতা এসে ভর করেছে, যে সম্পর্কে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। এই অস্বাভাবিকতা আমার মনের যুক্তিনিষ্ঠ-ভাবনায় এক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে।...আমার মগজ-নিয়ন্ত্রণকারী কোন স্নায়ু কি হঠাৎ বিকল হ'য়ে গেল?

কখনো কখনো দুর্ঘটনার পর মানুষের স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। আমার বেলায় সে রকম তো কিছু ঘটেনি। তবে কি মানসিক বৈকল্য?

নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে ইস্তক ভাবনায় ভাবিত। সূর্যের পর্যাপ্ত আলোতে নদীর জল ঝিকিমিকি; পৃথিবী এখন বড় সুন্দর; পৃথিবীর সৌন্দর্য জীবনের প্রতি আমার ভালোবাসাকে গভীরতর করছে। যেদিকেই তাকাই, সেই আনন্দের উৎস...নদী তীরবর্তী তৃণভূমির শন্ শন্ শব্দ আমার কানে শ্রুতিমধুর লাগে।

কিন্তু এই স্বস্তি ক্ষণিকের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাই, উত্তেজনা বাড়ছে, অস্বস্তি ও বিকার ফেনিয়ে উঠছে, সেই গূঢ় শক্তি বিকল করে দিচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নিশ্চল পদযুগল।...

এখন আমি বড় অসুখী, ...যেন কোন প্রিয়জনকে অসুস্থ অবস্থায় একলা ঘরে ফেলে রেখে এসেছি এবং সেই অসুস্থতা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

সুতরাং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ফিরে চলি ঘরের দিকে। আশঙ্কা, ওখানে হয়তো অশুভ বার্তাবাহী কোন চিঠি বা তারবার্তা দেখতে পাবো। বাস্তবে অবশ্য সে রকম কিছুই হলো না। এই মুহূর্তে অত্যাশ্চর্য কিছু না ঘটলেও আমার বিস্ময় ও বিভ্রান্তি বেড়েই চলে।

৮ই আগস্ট :

গত রাতটিও ছিল শঙ্কাপূর্ণ।

যদিও 'সে' আত্মপ্রকাশ করেনি, তার নৈকট্য অনুভব করেছি। টের পেয়েছি, সে আমাকে গুপ্তচরের মতন অনুসরণ করছে, আমার মনে অনুপ্রবেশ করে খুশিমতো আমাকে পরিচালনা করতে চাইছে। নিজেকে লুকিয়ে রেখে এই অলৌকিক প্রভাব বিস্তার কী ভয়ঙ্কর!

যাই হোক, ঘুম হয়েছিল।

৯ই আগস্ট :

ঘটনা কিছুই ঘটেনি। তবু ভয়ের হাত থেকে রেহাই নেই।

১০ই আগস্ট :

কিছু হয়নি। কালকের দিনটা কেমন যাবে ?

১১ই আগস্ট :

এখনো কোন ব্যাপার ঘটেনি। কিন্তু এত ভয় আর দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে এই বাড়িতে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব: আমি চলে যাবো।

১২ই আগস্ট :

রাত দশটা।

সারাটা দিন কেবল ভেবেছি চলে যাবো, চলে যাবো। অথচ যেতে পারিনি। মুক্তি পাবার এই সহজ উপায়, পালিয়ে যাবার অদম্য ইচ্ছা আমার ছিল। অথচ তা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। কিন্তু কেন ?

১৩ই আগস্ট :

এরকম মানসিক ও শারীরিক অবসাদে যে কোন মানুষের শরীর ভেঙ্গে পড়বে, উৎসাহ নিভে যাবে, পেশী শিথিল হ'য়ে পড়বে, হাড়গুলি নরম হতে হতে মাংসে পরিণত হবে এবং মাংস গলতে গলতে জল হয়ে যাবে।

আর আমার এখন ঐ রকমই বিপর্যয়কর অবস্থা। আমার আর শক্তি নেই, সাহস নেই, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই-এমন কি, স্ব-ইচ্ছারও মৃত্যু ঘটেছে। নিজের নয়, অপরের ইচ্ছাতেই কাজ করে যাচ্ছি।

১৪ই আগস্ট :

আমি শেষ হয়ে গিয়েছি।

আমার আত্মা দখল করে নিয়েছে অন্য কেউ একজন এবং আমি তার আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র। আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করছে সে। আমিত্ব হারিয়ে নিছক দর্শকে পরিণত হয়েছি। নিজেরই কাজ দেখে শিউরে উঠি। ইচ্ছে হয়, বাইরে যাই। পারি না। কারণ, 'সে' তা চায় না। এবং আমি বুঝি তারই নির্দেশে হাতল-ওয়ালা এক চেয়ারে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছি।

আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার চেষ্টা করি, উঠে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু পারি না। এমনভাবে নিথর হ'য়ে বসে থাকি, যেন দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাকে ধরতে পারে না।

তারপর হঠাৎই, যেন আমাকে যেতেই হবে, এমন এক উদগ্র তাগিদে বাগানে ছুটে যাই এবং কতকগুলি স্ট্রবেরি ফল তুলে খেতে শুরু করি। হা ঈশ্বর! ঈশ্বর! কোথায় তুমি ঠাকুর! সত্যিই কি তুমি আছো? যদি থেকে থাকো, আমাকে সাহস দাও, আমাকে রক্ষা করো, আমাকে সাহায্য করো। ক্ষমা করো। দয়া করো। করুণা করো।

কী দারুণ কষ্ট পাচ্ছি। আমার ওপর কী অত্যাচার চলছে। কী ভয়াবহ অত্যাচার।

১৫ই আগস্ট:

ভাবুন, আমার খুড়তুতো বোন কেমন অপরের ইচ্ছার খপ্পরে পড়েছিল, যখন সে আমার কাছে ছুটে এসেছিল পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক ধার চাইতে। সে তখন অপরের ইচ্ছা, অপরের অভ্যাস ও অপরের আত্মার কাছে সমর্পিত। পৃথিবীর আয়ু কি এ ভাবেই ফুরিয়ে আসছে?

কিন্তু আমি এখন কোন্ অদৃশ্য শক্তির দাস? এই অজানা জীব, এই আগন্তুক এসেছে নিশ্চয় কোন অতিপ্রাকৃত সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে।

তার অর্থ, অদৃশ্য জীবরা বর্তমান। কিন্তু তাই যদি হয়, সৃষ্টির প্রথম থেকেই তারা কেন নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, যেমন আজ পারছে তাদের একজন আমাকে কব্জা করে ফেলতে?

এ বাড়িতে ছাদের নীচে যা সব ঘটছে, আমি কোনদিন কোন বইতে তার হদিশ পাইনি। একমাত্র যদি এই আবাস ত্যাগ করি, বহুদূরে কোথাও পালিয়ে যাই এবং কোনদিন আর ফিরে না আসি, তবেই রেহাই পেতে পারি। কিন্তু আমি তা পারছি না।

১৬ই আগস্ট:

আজ ঘন্টা দু'য়েকের জন্য মহার্ঘ মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছি। আমার তখন এমন অবস্থা, যেন কোন বন্দী হঠাৎ কয়েদখানার দরজা খোলা পেয়ে পালিয়ে এসেছে। সহসাপ্রাপ্ত এই সৌভাগ্য অতুলনীয়। নিরন্ধ্র অসহায়তা অতিক্রম করে এখন আমি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি।

সহিসকে হুকুম করি: গাড়ির সাথে ঘোড়া যুতে দাও। আমি রুয়েন যাবো।

আহা! দুঃখের কুম্ভীপাক থেকে মুক্ত আমি পূর্বতন মেজাজে হুকুম করতে পারছি: রুয়েন চলো। আরো উল্লাস, আমার হুকুম সঙ্গে সঙ্গে তামিল হলো।

গাড়ি উড়িয়ে হাজির হলাম রুয়েনে। রুয়েনের পাঠাগারে ঢুকে ডঃ হারমেন হেরেস্টাসের অদৃশ্য জীবের ওপর লিখিত গবেষণামূলক বইখানা সংগ্রহ করি।

তারপর গাড়িতে উঠে আমি নিজস্ব মেজাজেই বলতে গেলাম: চলো স্টেশান।

কিন্তু সেই হুকুমের বদলে বুকের ভিতরে এক অসহায় আর্তনাদ কেঁপে কেঁপে ওঠে, আমি কঁকিয়ে উঠি: বাড়ি চলো।

সেই মুহূর্তে আমি আবার ভূতাবিষ্ট। গভীর হতাশার সঙ্গে টের পাই, আবার সেই অমোঘ অদৃশ্য শক্তি আমাকে দখল করে নিচ্ছে।

১৭ই আগস্ট :

আহ্, কী নিঃঝুম বিচিত্র রাত।...রাত একটা পর্যন্ত পড়ে উঠলাম। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের গবেষক ডঃ হারমেন হেরেস্টাস্ অদৃশ্য এমন সব জীবের কথা এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন, যারা মানুষের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে অথবা বেঁচে আছে মানুষেরই মনে। হারমেন এদের উৎপত্তি, অবস্থান ও ক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন।

কিন্তু এদের কেউই আমার ওপর চেপে বসা অদৃশ্য জীবটার মতন নয়। এই বিশেষ জীবটি মানুষের চেয়েও শক্তিমান এবং মানুষকে হটিয়ে তারাই এই পৃথিবীতে রাজত্ব কায়েম করবে। যেহেতু তাকে দেখা যায় না, সুতরাং সে একের পর এক ভয়াবহ কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে মানুষের আত্মরক্ষার শক্তিকে নিঃশেষ করে দেবে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম-রাত একটা অব্দি চললো আমার পড়াশুনা। তারপর খোলা জানালার সামনে বসে থাকি নিজের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ও চিন্তাকে শীতল করবার জন্য।

মনোরম উষ্ণ পরিবেশ। অন্যদিন হলে এমন একটি রাতের জন্য আমার আবেগ উজাড় করে দিতাম।

চাঁদ নেই। ছায়াবগুণ্ঠিত কালো আকাশের বুকে তারার দল কাঁপে ও ঝিকিমিকি করে। কারা থাকে ঐ তারাদের জগতে ? ঐ সব সজীব গ্রহ-পিণ্ডের ভেতরে জৈব-অজৈব বিবর্তন সম্ভব ? ওখানে কি জীবন্ত প্রাণীদের অস্তিত্ব আছে ? গাছ-পালা জন্মায় ? ওদের জ্ঞানের পরিধি কতদূর ?

হয়তো এমন একদিন আসবে যখন কোন নক্ষত্রের অভিনব বাসিন্দারা মহাকাশ পাড়ি দিয়ে হাজির হবে পৃথিবীকে জয় করতে, যেমন দূর অতীতে নর্মানরা সমুদ্র অতিক্রম করে দুর্বল দেশগুলিকে অধিকার করে নিতো।

এই রকমই ভাবতে ভাবতে গরমে-ঠাণ্ডায় মেশা রাত্রির মনোরম বাতাসে মাথা পেতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম হলো প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে। তারপর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে, চোখ মেলে আমি নিশ্চল। ভাবছি, এই চল্লিশ মিনিটের মধ্যে কোন কি অদ্ভুত ঘটনা এ ঘরে ঘটে গেছে ?

প্রথমে কিছুই নজরে আসে না।

তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো, টেবিলের ওপর রাখা বইখানার পাতা আপনা থেকেই ওল্টানো রয়েছে। জানালা থেকে আসা বাতাসের পক্ষে ঐ ভাবে পাতা উল্টে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকি, আরো কিছু প্রত্যক্ষ করবার প্রত্যাশা করি।

প্রায় চার মিনিট পর দেখলাম, আমি দেখলাম, হ্যাঁ আমি স্বচক্ষে দেখলাম, বইটার আর একটি পাতা এমনভাবে ওল্টানো হলো যেন কোন অদৃশ্য আঙুল পাতাকে এখানো ধরে আছে।

টেবিলের সামনে চেয়ারটা শূন্য, কেউ বসে নেই।

কিন্তু আমি বিলক্ষণ টের পাই, 'সে' ওখানে রয়েছে, বসে আছে আমার জায়গায়, ও বইখানা পড়ছে।

ঠিক তখনই আমার ভেতরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক হিংস্র বন্য পশু জেগে ওঠে, বেপরোয়া আমি দুই হাত বাড়িয়ে ধেয়ে যাই ঐ টেবিল-চেয়ারের দিকে। অদৃশ্য 'তাকে' আমি চেপে ধরবো নখর আঙ্গুলে, খতম করবো, খুন করবো।

কিন্তু আমি ওখানে পৌঁছে যাবার আগেই চেয়ারটা ডান দিকে সামান্য নড়ে ওঠে; অর্থাৎ সে পালিয়ে যাচ্ছে। ...দপ্ করে নিভে গেল মোমবাতিটা, দুম করে বন্ধ হ'য়ে গেল জানালার কপাট। পালিয়েছে। এই অন্ধকারের সুযোগে শয়তানটা নির্ঘাৎ পালিয়ে গেল।

সে ভয় পেয়েছে। ভয় পেয়েছে আমাকে। হ্যাঁ, আমাকেই।

তা হলে...তা হলে...আগামীকাল....অথবা, তার পরদিন...অথবা, যে কোন একদিন আমি তাকে ঠিকই পাকড়াতে পারবো, আছড়ে মারবো মাটিতে।

সময় সময় কুকুর কি তার প্রভুকেও কামড়ায় না এবং তখন ভয়ে প্রভু কি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন না?

১৮ই আগস্ট:

সারাটা দিন ধরে ভেবেছি।

হ্যাঁ, আমি তাকে মেনে চলবো, তার ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী কাজ করবো, নিজেকে আরো অসহায় ও সমর্পিত করে তুলবো। সে অধিকতর বলশালী। কিন্তু তারপর এমন একটা সময় ও সুযোগ আসবে...

১৯শে আগস্ট:

বুঝেছি....এতদিন যা ছিল অনায়ত্ত, তাকে এনেছি আয়ত্তে...সব কিছু জেনেছি।

সদ্য 'রিভ্যু দ্য মণ্ড সায়েন্টিফিক' পত্রিকায় খবরটা পড়লাম:

"রিও-ডি-জেনিরো থেকে অদ্ভুত এক সংবাদ আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। একধরনের উন্মাদ রোগের মড়ক লেগেছে ব্রাজিলের স্যানপোলো জেলায়। ভীতত্রস্ত নর-নারীরা, আক্রান্তজনরা দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের এতদিনকার ক্ষেত-খামার, গ্রাম, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি ছেড়ে।

আক্রান্তরা কবুল করেছে, কি এক অদৃশ্য জীব এসে নাকি চড়াও হচ্ছে তাদের ওপর; অধিকার করছে মন ও শরীর দুই-ই। অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে রোগীরা। তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, অদৃশ্য জীবরা তখন মানুষের শরীর থেকেই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে। দুধ ও জলের প্রতি এই জীবদের একমাত্র আসক্তি, অন্য কোন ধরনের খাবার তারা স্পর্শও করে না।

"প্রফেসর ডন পেড্রো হেনরিকুইজ কয়েকজন চিকিৎসক-সহকারী সহ স্যানপোলোর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে রোগের রহস্য উদ্ধার করতে..."

বটে। এই ব্যাপার!

হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে,—গত মে মাসের আট তারিখে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে সীন্ নদী বেয়ে একখানা অপূর্ব ব্রাজেলিয়ান থ্রি মাষ্টার্স সাদা রঙের জাহাজকে পাড়ি জমাতে দেখেছিলাম। আমি ঐ জাহাজের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ না হ'য়ে পারিনি।

কিন্তু তখন নিশ্চয় এই অদৃশ্য দুশমনটা দাঁড়িয়েছিল থ্রি মাষ্টার্সের পাটাতনে। সেও আমাকে *দেখেছিল; দেখেছিল ঐ জাহাজেরই* মতন মনোরম সাদা রঙের আমার বাড়িখানাকে। দেখে ওর লোভ হয়েছিল এবং চক্ষের নিমেষে জাহাজ ছেড়ে লাফিয়ে পড়েছে মাটিতে, হিংস্র উল্লাসে এগিয়ে এসেছে আমার দিকে।

হা ঈশ্বর!

এখন আমি বুঝেছি। রত্ন-সমুজ্জ্বল মানুষের রাজত্বকাল শেষ হ'য়ে এলো। আমাদের আজ ঘোর বিপদ। সর্বনাশ উপস্থিত মানব জাতির। জীবিত মানুষের আত্মা হরণ. করবে অন্যজন, অন্য এক অজানা অদেখা জীব। ..সে এখানে।...এই বাড়িতে।—আমার শরীরের আশ্রয়ে...কি নাম? মনে হলো, সে যেন আমার কাছে চীৎকার করে উঠলো, শুনতে পেলাম না...হ্যাঁ...সে আবার চীৎকার করছে...আমি শুনতে পাচ্ছি...বুঝতে পারছি না..আবার সে আমাকে বললো....এবার স্পষ্ট...হোরলা...আমি শুনতে পেয়েছি, অনুধাবন করতে পারছি...নাম তার হোরলা...এই সে..ভয়ঙ্কর হোরলা-সে এখানে।

এ হে! পৃথিবী জুড়ে হিংস্রতা ও বশ্যতার অর্ন্তমুখী স্রোত বয়ে চলেছে। শকুন মেরে খায় পায়রাকে, চিতা শিকার করে ভেড়াকে, সিংহ খাদ্য বানায় তীক্ষ্ণ শিং মোষকে; মানুষ তীর-ধনুক, শাবল এবং বন্দুকের সাহায্যে খতম করে সেই সিংহকে; আর হোরলা সেই অমিত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষকে পোষ মানাবে গৃহপালিত ঘোড়া ও গরুর মতন।.প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে মানুষকে সে করবে তার দাস, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তার খাদ্য...বড় দুর্দিন আমাদের!

কিন্তু কখনো কখনো পশুরাও বিদ্রোহী হয় এবং তাদের পালককে হত্যা করে...আমিও তাই চাই-আমাকে সেই রকমই কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে, 'সে' কে? তাকে আমায় স্পর্শ করতে হবে, একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। বিজ্ঞানীরা বলেন, পশুদের চোখ ও দৃষ্টিশক্তি আমাদের মতন—এবং আমার চোখ এই অত্যাচারী আগন্তুককে সনাক্ত করতে পারছে না।

কেন?

মনে পড়ছে মন্ট-সেন্ট-মিচেলের পুরোহিতের কথা:—'আপনি কি দুনিয়ার শত শত হাজার হাজার সব বস্তুকেই চেনেন? ধরুন, এই বাতাসের কথাই, প্রকৃতির সবচেয়ে বড় শক্তি এই বাতাস, যা মানুষকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়, গাছগুলিকে মূল সমেত উপড়ে ফেলে, সমুদ্রকে ঠেলে তুলে দেয় পাহাড়ের ওপারে, পাহাড়কে গুঁড়িয়ে দেয়, বড় বড় জাহাজগুলিকে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেয় তীরভূমিতে,—বাতাস যা হত্যা করে, শিস দেয়, আর্তনাদ ছাড়ে, গর্জন করে, আপনি কি সেই পরম শক্তিমান বস্তুকে কখনো দেখেছেন, নিজের চোখে দেখতে পান? অথচ তার অস্তিত্ব বাস্তব।'

অতএব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি-আমার চোখ দুর্বল, দৃষ্টি অস্বচ্ছ, বহু বস্তুকেই দেখতে পাই না। দুনিয়ার গহনে সাঁতরাতে সাঁতরাতে আপাত অদৃশ্য কত কি যে আমাদের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই।

এটি একটি নতুন ধরনের জীব। নিজেদের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় তারা নিশ্চয় আরো সক্রিয় হয়ে উঠবে। কেন আমরাই পৃথিবীর শেষ অধিবাসী হবো? আমাদের চেয়ে শক্তিমান যারা, তাদেরই যুগ এবার শুরু হবে।

কেন এই জীব আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না? কারণ, তার শারীরিক গঠন অনেক সূক্ষ্ম। আর আমাদের নার্ভগুলি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কার্যতঃ দুর্বল, বিভ্রান্ত, যান্ত্রিক। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা সীমিত। বাতাস ছাড়া আমাদের প্রাণশক্তি টিকে থাকতে পারে না, খাদ্যের অভাবে অকেজো হ'য়ে যেতে পারে, প্রায়শঃই ভঙ্গুর, যে কোন মুহূর্তে যে কোন ধরনের আঘাতে টেঁসে যেতে পারে-মানুষের শারীরিক গঠন অতি পলকা। সহজেই রোগ, বিকলতা ও কু-বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। শুধুমাত্র কিছুটা মগজের জোরেই মানুষ এতকাল নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে।

সেই প্রাধান্যের কালও আজ সমাপ্তির পথে। তার সম্প্রসারিত চৈতন্য অর্থহীন প্রতিপন্ন হতে চলেছে। কারণ, পৃথিবীর বুকে ক্রমশঃ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হচ্ছে অধিকতর বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী জীবরা।

কেনই বা হবে না? এটাই তো বিবর্তনগত ইতিহাস। কেন নতুন ধরনের ফল-ফুলে সজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী শোভিত হবে না পৃথিবীতে? আগুন, বাতাস, মাটি ও জল ছাড়া আরো অন্য ধরনের উপাদানও কেন দেখা যাবে না পৃথিবীতে? আমরা তো মোটে এই চারটি উৎসকেই চিনি—আগুন, বাতাস, মাটি ও জল। আরো চল্লিশ বা চারশ' বা চার হাজার রকম উৎসও তো থাকতে পারে। আমাদের বিভ্রান্তিনিমগ্ন জ্ঞান তাদের সনাক্ত করতে পারেনি।

ব্যাপারখানা কি আমার?

এই তো সে—হোরলা—বুকের ওপর চেপে বসেছে এবং আমার মগজে চালান দিচ্ছে ইত্যাকার আবোল-তাবোল ভাবনা। সে আমারই মধ্যে, আমারই আত্মায় তার অধিবাস। আমি তাকে খুন করবো।

১৯শে আগস্ট:

আমি তাকে হত্যা করবো। তার দেখা পেয়েছি।

লেখার উদ্দেশ্যে গত রাতে টেবিলের সামনে ঘাড় গুঁজে বসে ছিলাম। ঠিক লেখা নয়, লেখার ভান করা; কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সে আসবে এবং চারদিকে ঘুর ঘুর করতে করতে এক সময় আমার খুব ঘনিষ্ঠও হবে; সম্ভব হলে আমি তখন তাকে স্পর্শও করতে পারবো। আর তারপর...তারপর তো আমার ভেতরে জেগে উঠবে এক প্রচণ্ড হননস্পৃহা। আমি আমার হাত, হাঁটু, দাঁত দিয়ে তার ওপর আক্রমণ শানাবো, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।

খুব সতর্ক থেকে আমি তার প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম।

দুটো বাতি ও আটটা মোমবাতি জ্বলছিল ঘরে। এতো আলোয় তাকে আবিষ্কার করা আমার সহজতর হবে।

সামনে ওক গাছের কাঠ দিয়ে তৈরী পালঙ্ক; ডান দিকে অগ্নি-আধার; বাঁ দিকে সাবধানে বন্ধ করা কপাট; বহুক্ষণ ঐ দরজা খুলে রেখেছিলাম তাকে প্রবেশ করতে উৎসাহ দেবার জন্য। আমার পিছনে আয়না বসানো একটি বৃহৎ আলমারি। ঐ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায়শই দাড়ি কামাই অথবা পোশাক বদলাই। এবং যতবারই ঐ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই নিজের পূর্ণাবয়বের মুখোমুখি হই।

হুঁ, আমি লিখবার ভান করে তাকে ঠকাবার চেষ্টা করছিলাম। কারণ জানি, সে আমার ওপর নজর ঠিকই রেখেছে।

হঠাৎ টের পেলাম, সে এসেছে—আমার পিছনে দাঁড়িয়ে লেখা পড়বার চেষ্টা করছে, এমন কি তার নিঃশ্বাসও এসে লাগছে আমার কানে।

চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটোকে পিছনে এনে এমন ঘোরাবার চেষ্টা করি যে নিজেই আর একটু হলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতাম।

ঘরে দিনের মতো আলো।

অথচ আয়নায় নিজের প্রতিরূপ দেখতে পাচ্ছি না। কাঁচে কোন ছায়াপাতও ঘটে নি, শূন্য, আলোয় ঝক্ঝক্ করছে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওটার দিকে চেয়ে থাকি। আর এক পাও এগিয়ে যেতে সাহস হচ্ছিলো না। বিলক্ষণ টের পাচ্ছি, সে এখানেই রয়েছে এবং তার বস্তুনিরপেক্ষ শরীর আমার প্রতিচ্ছবিকে ঢেকে রেখেছে; যে কারণে আয়নার কাঁচে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না।

কী মর্মান্তিক আতঙ্ক তখন আমার!

এক মুহূর্ত পরে আয়নার বুকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে থাকে আমার প্রতিচ্ছবি। যেন কোন প্রবহমান জলের বুকে দেখতে পাচ্ছি নিজেকে। এই জল যেন সরে যাচ্ছে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এবং ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছি কাঁচের মধ্যে।

অবশেষে রোজ যেমনটি দেখে থাকি, নিজের আপাদমস্তক দেখতে পেলাম আয়নায়।

এইভাবেই আমি তার আবার প্রমাণ পেলাম।

ভয় বহুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমায়। মুক্তি নেই।

২০শে আগস্ট :

খুনের পরিকল্পনা রয়েছে, অথচ উপায়টা জানা নেই। যতদিন না আমি তাকে স্পর্শ করতে পারছি, তার কোন ক্ষতি করা আমার সাধ্যাতীত। বিষ খাইয়ে মারবো? কিন্তু সে তো আমাকে জলে বিষ মেশাতে দেখে ফেলবে। তা ছাড়া ঐ বিষ কি তার অশরীরী কাঠামোয় কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম? না...না, কখনোই করবো না...তা হলে কি ভাবে?...কি উপায়ে?

২১ই আগস্ট :

রুয়েন থেকে একজন তালা-চাবি প্রস্তুতকারককে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। প্যারিসের গুটিকয়েক হোটেলের কায়দায় আমারও দরজায় বিশেষ ধরনের তালা লাগাতে

হবে। সকলেই ভাবছে, লোকটা মহা ভীতু! ভাবুক, ও নিয়ে মাথা ঘামালে আমার চলবে না।

১০ই সেপ্টেম্বর :

দরজায় লাগানো হয়েছে নতুন ধরনের তালা।

মধ্য রাত অবধি সেই দরজা খোলা রেখেছি, যদিও অবারিত বাতাসের আনাগোনায় ঘরের ভেতরকার সবকিছু হিম বরফ।

বহুক্ষণ বাইরের বিষাদঘন তমসার দিকে চেয়ে তার প্রতীক্ষায় থাকার পর সহসা তার উপস্থিতি টের পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মত্ত উল্লাসে আমার মন রোমাঞ্চিত। জড়জঙ্গমতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াই, মনের গুঞ্জন ভাবে প্রকাশ করি না।

দীর্ঘ সময় ধরে অনন্ত প্রশান্তিতে এমন পায়চারি করতে থাকি, যেন কেউ আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ না পায়। ঐ নিরালম্ব গতিময়তার মধ্যেই একসময় টুক্ করে পায়ের বুটজোড়া খুলে তাচ্ছিল্যভরে সরিয়ে রাখি এবং একজোড়া স্যাণ্ডেল পায়ে লাগাই।

তারপর যেন প্রাত্যহিক অপরাভূত নিস্পৃহতায় দরজায় নতুন কায়দায় তালাটি এঁটে দিই। দরজার পর জানালাটাতেও তালা লাগানো হলো। চাবি রইলো আমার পকেটে।

এরপর মায়াতরঙ্গে বিচিত্র অনুরণন। মনে হলো, অশরীরী জীবটা সত্তার নিশ্চলতা কাটিয়ে এখন ভীষণ উদ্বিগ্ন, এই পার্থিব ব্যবস্থায় নিজের সমূহ বিপদ টের পেয়ে আমার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ক্রমশ আমার মনের দিকে হাত বাড়ায় সে, আবার আমার মনে বিষাদক্লিষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করছে সে, উপলব্ধির রন্ধ্রে রন্ধ্রে একই ঝঙ্কার—দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও!

এই চাপের সামনে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখা দুরূহ, নিজের সত্তা যেন সহস্র ফুটোয় ঝাঁঝরা হ'য়ে যায়। তবু এইবার আমি ভেঙ্গে পড়িনি, প্রলয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষের মানসিকতায় নিজেকে ঋজু ও স্থির রেখেছি।....

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কুণ্ডলী পাকানো আধো-আলো আধো-অন্ধকারের ফাঁদে আমি তাকে পাকড়েছি। যেন আবহমানকালের কোন প্রতিশোধস্পৃহা আজ তৃপ্ত হবে।

ছুটে গেলাম এই ঘর সংলগ্ন বৈঠকখানায়। পাশবিক দৃঢ়তায় ওখান থেকে তুলে আনি দুটো জ্বলন্ত ল্যাম্প। হৃদয়হীন কঠোরতায় আমি সেই ল্যাম্প দুটো থেকে তেল ছড়াতে থাকি কার্পেটের ওপর। কার্পেট ভিজিয়ে শ্বাসরোধী·হিংস্রতায় তেল ঢালতে থাকি ফার্নিচারগুলির ওপর, তারপর বিছানার চাদরে, দরজায়-জানালায়, সর্বত্র।

তেল ঢালা শেষ হলে পরে আগুনের সঙ্গে চুক্তি হলো যেন। আমি নির্মম হাতে আলেয়া-চমকানো দ্রুততায় কার্পেটের এক কোণে আগুন ধরিয়ে দিলাম। তারপর আরো চকিতে বিশেষ কায়দায় দরজা খুলে লাফ মেরে চলে আসি বাইরে, বাইরে থেকে সপাটে দরজা বন্ধ করে দিই।

তখন বেমালুম ছুট-ছুট, কয়েক লাফে এ বাড়ির বাগানে। একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে থাকি নিজের ঘরের দিকে। বড় নিঃসঙ্গ নির্মম সেই

প্রতীক্ষা-কতক্ষণে আগুন-সম্পাতে এই চরাচর ঝলসে যাবে। বাতাস বয় না; বিশাল আকাশে একটিও নক্ষত্র নেই, পাহাড়প্রমাণ মেঘবাষ্পোজ্জ্বল স্তম্ভগুলি পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি, গাছের পাতায় পাতায়, ঘাসের ডগায় ডগায় অন্তর্মুখী শব্দহীনতা। রুদ্ধশ্বাস রুদ্ধবাক আমি সামনের দিকে চেয়ে আছি। বুঝি হৃৎপিণ্ডের ঘড়ি চলছে কাঁটায় কাঁটায়। কতক্ষণে এই নিরন্ধ্র তিমির ভেদ করে দেখবো আগুনের শিখা?

কতক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলির এই অন্তরঙ্গ বাসনা চাপা থাকবে?

ভাবলাম, হয়তো 'সে' স্বয়ং ঐ আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আমি নির্ঘাৎ দুর্ভোগের বলি।

না, না, ঐ তো আগুন! দাউ দাউ লেলিহান শিখা মুহূর্তে ঘূর্ণায়মান ঝড়ের সংকেত বয়ে আনে।

আমার ঘরের একটা জানালা ভেদ করে রক্তাভ ও গাঢ় হলুদ দাউ দাউ আগুন হাজারটা মুখ বের করে ধেয়ে আসছে। মুহূর্তে বহ্নিমান ব্যাপ্তিতে ধরা দিতে থাকে সকলেই। আগুনের প্রদীপ্ত দাপটে সাদা দেওয়ালের রং বদলে যায়, শিখাগুলি বাড়তে বাড়তে এ বাড়ির ছাদেও পৌঁছে যায়। আগুনের সহবাসে দর্প চূর্ণ হয়, আত্মমুখী বিষণ্নতায় সকলেই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে।

গাছ-পালা, প্রবেশ-পথ, সিঁড়ির-ঘর, খামার...সর্বত্র ভয়াবহ আগুনের মেলা। আতঙ্কে কারা যেন দাপাদাপি করছে। পাখিরা জেগে উঠে বিলাপ শুরু করে। কুকুরটা একটানা ডেকে চলে। বুঝতে পারছি, যে কোন মুহূর্তে গোটা বাড়িটাই ধসে পড়তে পারে।

কিছুক্ষণ পর অন্য সব জানালার মধ্যে দিয়েও আগুন উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। আমার বাড়ির নীচতলাটা এখন প্রকৃতই অগ্নিকুণ্ড।....কাদের যেন চীৎকার শুনতে পেলাম। কোন স্ত্রীলোকেরও আর্তনাদ ভেসে এলো!...হায়! আমি একদম ভুলে গিয়েছি বাড়ির চাকর-বাকরদের কথা। ওরা জীবন্ত পুড়ে মরছে! আমি যেন তাদের অর্ধদগ্ধ শরীর ও যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হাতগুলিকে ভেসে বেড়াতে দেখছি।

তখনই আমি উঠে দাঁড়িয়ে স্থানীয় গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করি। আমার চীৎকারে ঘুমন্ত রাত কেঁপে কেঁপে ওঠে: বাঁচাও। বাঁচাও। আগুন! আগুন!...

পথেই আগুয়ান গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদের সঙ্গেই ফিরে আসতে থাকি।...ততক্ষণে আমার অপূর্ব শুভ্র প্রাসাদের কোন অস্তিত্বই নেই। তার বদলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ও কুৎসিত এক অর্ধদগ্ধ চিতা। ঐ চিতা কার? ঐ চিতা 'তার'—সেই নতুন জীব, নতুন প্রভু, হোরলা!!

গোটা ছাদটা বিকট আওয়াজে ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। যেন একটা বিরাট আগ্নেয়গিরির বিপুল অগ্ন্যুৎপাত, ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হ'য়ে গেল।...পোড়া জানালাগুলির মধ্য দিয়ে আমার সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরতে থাকে। নিশ্চয় সে খতম হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়।

কিন্তু-কিন্তু সত্যি কি সে মারা গিয়েছে?

সম্ভবত।...

কোথায় তার শরীর?...হয়তো সেও আমাদেরই মতন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।...

কিন্তু যদি এমন হয়, —আগুন তাকে মারতে পারে না?....হয়তো একমাত্র সময়ই তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। কিন্তু কিছু নয়। হয়তো তার অকালমৃত্যু ঘটাবার মতন শক্তি অন্য কিছুরই নেই।

অকাল মৃত্যু? মানুষের কোন আয়ুধই কি তবে তার উপর কার্যকর হবে না? কারণ, মানুষের পরে আসছে হোরলা। মানুষের আয়ু ভঙ্গুর, যে কোন সময়ে সে মারা যেতে পারে, যে কোন ঘটনায় বা দুর্ঘটনায়। কিন্তু হোরলা মারা যাবে নির্দিষ্ট দিন ক্ষণে, তার আগে কেউ তার মৃত্যু ঘটাতে পরবে না।

না, না....আমি জানি, আমি জানি....সে মরে নি...তাই, তাই...এবার আমি নিজেকেই খুন করবো, এখনই।

কোকো

Coco

এ তল্লাটে সকলের কাছেই লুকাসের জোতের জমির একটা বিশেষ নাম আছে—'মেতারি'। এ রকম একটা নামকরণের রহস্যটা অবশ্য কেউ বলতে পারে না; তবে মনে হয়, 'মেতারি' বলতে স্থানীয় চাষীরা বোঝাতে চায়, লুকাসের ফার্মের বিশালতা ও সমৃদ্ধি। সত্যি বলতে কি তামাম জেলায় অতবড় সুপরিচালিত সমৃদ্ধ জোতের জমি আর দ্বিতীয়টি নেই।

বিশাল খামারের চারদিকে পাঁচ সারি মস্ত মস্ত গাছ; এই পাঁচ সারি বেষ্টনির মধ্যে লালিত হচ্ছে ছোট ছোট নয়ন-শোভন আপেল গাছ, রক্ষা পাচ্ছে তারা ঝড়ের দাপট থেকে। লাল টালির ছাদওয়ালা লম্বা একটি ঘরও দৃষ্টি এড়ায় না। ঐ ঘরে মজুত থাকে পাকা ফসল, শুকনো খড়। গোয়াল ঘরে জাবর কাটে গরুরা। আস্তাবলে লেজ ছুঁড়ছে ঘোড়ারা। গোয়াল ঘর ও আস্তাবল পেরিয়ে খামারবাসীদের বিরাম-ঘর লাল ইঁটের তৈরী ছিমছাম চমৎকার একখানা ছোট্ট বাড়ি।

গোবরগুলি স্তূপাকৃতি। শিকারী কুকুররা ওৎ পেতে আছে তাদের আস্তানায়, মোরগ-মুরগীর দল ছোটাছুটি করে উঁচু ঘাসের বনে।

প্রতিদিন দুপুরে লালবাড়ির রান্নাঘরে লম্বা টেবিলের সামনে খেতে বসে পনেরোজন লোক, —ফার্মের মালিক, তার পরিজন, পরিচারক পরিচারিকারা।

খামারের পশুগুলি-ঘোড়ারা, গরুর পাল, শূকরের পাল, ভেড়ার পাল —হৃষ্টপুষ্ট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সযত্নে লালিত। দীর্ঘদেহী বিপুল উদর লুকাস দিনের মধ্যে তিনবার

তার খামারকে ঘুরে ঘুরে দেখে যায়, সব কিছুর তদারকি করে, প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার জন্য তার অনেক ভাবনা।

আস্তাবলের বাইরে একফালি ফাঁকা জায়গায় একটা বুড়ো ঘোড়াকে রোজই বাঁধা অবস্থায় দেখা যায়। লুকাসের বউ ঘোড়াটার প্রতি বিশেষ দয়ালু—যতদিন ওর স্বাভাবিক মৃত্যু না ঘটে, যত্ন-আত্তির যেন কোন ত্রুটি না হয়। ঐ বুড়ো ঘোড়াটি এই বর্ধিষ্ণু খামারের বহু অতীত স্মৃতির প্রাচীন সাক্ষী।

বছর পনেরোর একটি ছেলেকেও রাখা হয়েছে ঐ অবসরপ্রাপ্ত পশুটাকে দেখাশুনা করবার জন্য। ছোকরার নাম ইসিডোর দ্যুঁভাল, লোকে সংক্ষেপে ডাকে—জিডোর। শীতের মরশুমে ঘোড়াকে সে খেতে দেয় জই, খড়বিচালি এবং গ্রীষ্মে দিনের মধ্যে চারবার চার জায়গায় ওকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবুজ ঘাস খাইয়ে আনে।

বুড়ো ঘোড়া বয়সের ভারে অথর্ব, চলাফেরায় আর পারঙ্গম নয়, অতিকষ্টে পা তুলে তুলে চলে। গায়ে চাপানো কাপড়টাকে মনে হয় সাদা লোমের আস্তরণ। লোমশ চোখের পাতায় ঢাকা তার দৃষ্টি করুণ।

বয়সের মন্থরতা ও ক্লান্তিতে বুড়ো ঘোড়া স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারে না; তাই ঘাসজমিতে নিয়ে যাবার সময় জিডোর ওর দড়ি ধরে সবেগে টানতে থাকে। তবু মাঝে মাঝে থামতে হয়, অথর্ব পশুর অসহায়তা দেখে করুণার বদলে জিডোর মাথায় রাগ চড়ে যায়, লাঠি দিয়ে খোঁচাতে থাকে। ঘোড়াটার ওপর তার যেন জাতক্রোধ।

খামারের আর সকলে কিন্তু জিডোর এই ক্ষোভ নিয়ে হাসাহাসি করে; তারা সুযোগ পেলেই ওর কানের কাছে গিয়ে বুড়ো ঘোড়ার গল্প জুড়ে দেয়। ফলতঃ ছোকরার মাথায় খুন চাপবার উপক্রম। রাগে তার সর্বাঙ্গ রি-রি করে।

জিডোর বন্ধুরাও এ নিয়ে বিদ্রূপ-মস্করা কম করে না। এই এলাকায় তার নামই হয়ে গেল কোকো-জিডোর।

জিডোর ক্ষোভে দুঃখে তেতে আগুন। ভেতরে তার প্রচণ্ড প্রতিহিংসা দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হতে থাকে। চেহারায় সে রুগ্ন, লম্বা সরু সরু হাত-পা, খুব নোংরা, লালচে ঘন এলোমেলো চুল একফালি কাপড়ে বাঁধা। আচরণে বোকা বোকা, কথা বলতে গেলেই তোতলামিতে পেয়ে বসে, অসম্ভব শারীরিক পরিশ্রমে মগজে দেখা দিয়েছে বিশেষ ঘাটতি, সব সময় মেজাজে খিচ্ ধরে আছে।

তার বিস্ময় ও রাগ হয় এখনো ঐ বুড়ো ঘোড়া কোকোটাকে বহালতবিয়তে বাঁচিয়ে রাখার জন্য! কত খাবার নষ্ট হচ্ছে এই অকেজো জন্তুটার জন্য। যেদিন থেকে ঘোড়াটা তার কর্মক্ষমতা হারিয়েছে, সেদিন থেকে নিশ্চয় ওর বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই। অথচ, ওকে দেওয়া হচ্ছে মহার্ঘ খড়-বিচালি, জই, টাটকা ঘাস, আরও কত কি।

অনেক সময় সে তাই লুকাসের নির্দেশ অমান্য করে কোকোকে পেট ভরে খেতে দেয় না। বরাদ্দ খাবারের অর্ধেকটা মাত্র দেয়। মূক প্রাণীটার ওপর তার মনোভাব আদিম ও হিংস্র। দুর্দমনীয় প্রতিহিংসায় সে জ্বলছে।

গ্রীষ্ম আসে।

এ সময় তাকে ঘোড়া নিয়ে এক ময়দান থেকে অন্য ময়দানে ঘুরে বেড়াতে হয় ঘাসের সন্ধানে। ময়দানগুলি খামার থেকে অনেক দূরত্বে। প্রতিটি দিনের শুরুতে তার মন বিষিয়ে থাকে। কোকোর দড়ি টানতে টানতে সে সুফলা সবুজ জমিগুলি পার হয়। মাঠে কর্মরত লোকেরা সকৌতুকে তার উদ্দেশ্যে চীৎকার করে: এই যে জিডোর, তোমার কোকোকে আমাদের সশ্রদ্ধ সেলাম দিও।

জিডোর কখনো ওদের কথার জবাব দেয় না। কিন্তু যাবার পথে নিরালায় জঙ্গল থেকে একটা লাঠি ভেঙ্গে আনে। তারপর নতুন কোন ঘাসজমিতে কোকো আহারে মন দেবার পূর্বমুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকের মতন সেই ভারী লাঠি হাতে তেড়ে আসে জিডোর, পশুটার পায়ে জোড়ে সপাং সপাং মারতে থাকে।

পশুটা চেষ্টা করে আত্মরক্ষার, চেষ্টা করে নাগালের বাইরে সরে যেতে, পারে না; দড়িতে বাঁধা অবস্থায় সার্কাসের রিং-এ ঘুরন্ত ঘোড়ার মতন ছুটতে থাকে মাত্র। বন্য উল্লাসে ছেলেটাও ওর পিছন পিছন তাড়া করে, দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে, সপাং সপাং চাবুক চালায়।

তারপর একসময় জিডোর নিজেরই ক্লান্তি আসে। হাতের লাঠি ছুঁড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়। পিছনপানে ফিরেও চায় না। ঘোড়াটা তার করুণ চোখে ওকে মিলিয়ে যেতে দেখে। যতক্ষণ না জিডোর দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে যাচ্ছে, কোকো ঘাসের দিকে তার সাদা ঘাড় ও গলা নামায় না।

গরমের রাতগুলিতে কোকোকে আস্তাবলের ভিড় থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। উপত্যকার প্রান্তে, গাছ-পালার পিছনে জিডোর তখন কোকোকে নিয়ে যায়। তখন সেই রাতে জিডোর ভেতরে আবার হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহা জ্বলে ওঠে; সে উল্লাসে পাথর ছুঁড়তে থাকে ওকে লক্ষ্য করে। বুড়ো ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে মার খায়, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার শত্রুর দিকে, এবং জিডোর চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঘাসে সে মুখ নামায় না।

ছেলেটার মনে একটাই তিক্ত ব্যাধিসম জিজ্ঞাসা: এই অথর্ব ঘোড়াটাকে কেন খেতে দেওয়া হবে? অপরের আহার, করুণাময় ঈশ্বরের সীমিত দানের এমন অপব্যবহার কে সহ্য করতে পারে? জিডোর স্বয়ং নিজের পেটের সংস্থান করার জন্য উদয়াস্ত নিদারুণ পরিশ্রম করছে না?

ক্রমশ সে কোকোকে নিয়ে নিত্য-নতুন ঘাসজমিতে যাওয়া বন্ধ করে দিল। পুরনো মরা ঘাসের এলাকাতেই বেঁধে রাখে ক্ষুধার্ত বুড়ো ঘোড়াটাকে।

খাদ্যের অভাবে কোকোর শরীর আরও ভেঙ্গে পড়ে, বুকের হাড়গুলি জিল জিল করছে। দড়ি ছিঁড়বার শক্তি তার নেই। অথচ, মাত্র কয়েক হাত ব্যবধানে টাটকা সবুজ ঘাসের হিল্লোল। সে ঘাড় নামিয়ে জিভ বের করে বৃথাই চেষ্টা করে ঐ ঘাসগুলিকে নাগালের মধ্যে পেতে।

তারপর আর এক সকালে জিডোর মাথায় নতুন এক পরিকল্পনা এসে স্থান পায়। ঠিক করলো, কোকোকে নিয়ে সে আর ঘুরবে না। অনেক ঘোরা হয়েছে এতকাল ওটার জন্য।

প্রতিশোধের চাপা বাসনা নিয়ে সে এসে দাঁড়ায় বুড়ো জন্তুটার সামনে। শঙ্কিত কোকো তাকে দেখে যেন কেঁপে ওঠে—জিডোর কিন্তু সেদিন ওটার ওপর লাঠি চালায় না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কোকোর চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে। এক সময় এমন ভাব দেখায়, বুঝি সে কোকোকে নিয়ে কোন ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। আসলে কিন্তু পুরনো গর্তেই খুঁটোটা আরো শক্ত করে পুতে মনের আনন্দে আপন পরিকল্পনাকে তারিফ জানাতে জানাতে ফিরে যায়। বুড়ো ঘোড়া বিস্মিত বেদনায় লক্ষ্য করে, তার নাগালের মধ্যে কোন ঘাসের অস্তিত্ব না রেখেই এই উপত্যকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে জিডোর।

কোকো নিজের হাঁটু মুড়ে ঘাড় নাড়ে, প্রাণপণে চেষ্টা করে এগিয়ে যাবার। তার জিভ লক্ লক্ করতে থাকে অদূরে ঘাসগুলিকে গ্রাসের মধ্যে পাবার আশায়। কিন্তু সেটা কখনোই সম্ভব হয় না।

সারাটা দিন ধরে চললো অসহায় মূক পশুর সেই প্রাণান্তকর সংগ্রাম। ক্ষুধা তাকে পাগল করে তোলে। চোখের সামনে অঢেল সবুজ খাদ্যভাণ্ডার অথচ সে তাদের স্পর্শ করতে পারছে না। ক্ষুধার যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়। সে সাধ্যাতীত নানারকম প্রয়াসে দ্রুত নিজের প্রাণশক্তি ক্ষয় করতে থাকে।

সেদিন আর ছোকরাটি এলো না। সারাটা দিন বনের মধ্যে পাখির বাসা ভেঙে বেড়ালো। এলো তার পরদিন। কোকো তখন নির্জিব ভঙ্গীতে শুয়ে আছে, গভীর অবসাদে ঘন ঘন দম নেয়। তবু জিডোরকে দেখে অনেক প্রত্যাশায় সে উঠে দাঁড়ায়, ভাবে, হয়তো এবার তাকে ঘাসের কাছে পৌঁছে দেবে।

কিন্তু জিডোর ওর দড়িটা ছুঁয়েও দেখে না। একদলা মাটি ছুঁড়ে মারে কোকোর সাদা শরীরে। তারপর শিস্ দিতে দিতে চলে যায়।

যতক্ষণ ওকে দেখা যায় এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বুড়ো ঘোড়াটা। তারপর সে বুঝতে পারে, নতুন ঘাসের স্বাদ সে আর এ জীবনে পাবে না। সে আবার শুয়ে পড়ে, চোখ দুটো বুজে আসে।

পরের দিন জিডোর একটিবারের জন্যও এলো না।

তার পরদিন এসে সে দেখে, কোকো তখনো মাটিতে শুয়ে আছে। শুধু শুয়ে থাকা নয়, বুড়োটা মারাও গেছে!

খুশি খুশি দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ঐ স্পন্দনহীন প্রাচীন দেহটার দিকে। একটু যেন অবাকও হয়,—কত তাড়াতাড়ি খতম হয়ে গেল জীবটা!

সে নিজের পা দিয়ে ওর একটা পা তুলে দেখে। কিছুক্ষণ ওর নিথর দেহের পাশে বসে থাকে; ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে থাকে, অদূরে হিল্লোলিত সবুজে সবুজ ঘাসগুলির দিকে।

সে ফিরে আসে খামারে। কিন্তু তখনই কোকোর মৃত্যু-সংবাদ সে ঘোষণা করে না।...পরদিন আবার সেই উপত্যকায় গিয়ে দেখে, কাকেরা ইতিমধ্যেই ভোজ বসিয়েছে কোকোর পচনশীল দেহে, অসংখ্য মাছি উড়ছে ভনভনিয়ে।

তখন সে ফিরে এসে ঘোষণা করলো কোকোর মৃত্যু-সংবাদ। জন্তুটা এত বুড়ো হয়েছিল যে কেউই এতে অবাক হলো না। খামারের মালিক তাঁর দুজন কর্মচারীকে ডেকে বললেন, 'দেখো, ঘোড়াটা যেখানে মরেছে সেখানেই ওকে কবর দেবার ব্যবস্থা করো।'

ঠিক যেখানে বুড়ো ঘোড়াটা ক্ষিধের জ্বালায় মারা গিয়েছে, সেখানেই প্রস্তুত হলো তার কবর। ক্রমে কোকোর শরীর ঐ জমিতে সৃষ্টি করলো চমৎকার সার এবং সেই নতুন প্রাণশক্তিতে ঐ জমিতে গজিয়ে উঠতে থাকে অঢেল সতেজ সবুজ প্রাণবন্ত ঘাস আর ঘাস।

গহ্বর

Hole

'এলোপাথাড়ি ঘুষি ও আঘাতই মৃত্যুর কারণ।'

—আদালতে আসবাবপত্রের সরবরাহকারী মাষ্টার লিওপোল্ড রেনার্ডের বিরুদ্ধে এই ভাষাতেই অভিযোগ আনা হয়েছে।

শমন পেয়ে আদালতে উপস্থিত রেনার্ড। উপস্থিত প্রধান সাক্ষীরাও—কাঠ ব্যবসায়ী লুইস্ লেডুর, নিহতের বিধবা স্ত্রী লেডি ফ্লেমেচ্ এবং লোহার মিস্ত্রী জাঁ ডুরডেন্ট।

বিবাদীর কাছাকাছি বসে আছে তার স্ত্রী; পরনে কালো পোশাক, কুরূপা, মনে হয় যেন মেয়েমানুষের বেশে এক বানরী বসে রয়েছে।

এবং বেনার্ড (লিও পোল্ড) গোটা নাটকীয় ঘটনাটাকে এইভাবে বলে চলে:

"হুজুর আপনাদের কাছে কবুল করছি, এটা একটা দুর্ঘটনা, যার দায় বহন করতে হচ্ছে আমাকে, যদিও এতে আমার সামান্যতম অপরাধও নেই।

ধর্মাবতার, গোটা ঘটনাটা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন, আমি নির্দোষ। মানুষ হিসাবে আমি চমৎকার, খুব পরিশ্রমী। ষোল বছর ধরে আসবাবপত্রের কারবার করে আসছি। সকলেই আমাকে চেনে, পছন্দ করে, মান্য করে, সম্মান করে। কোন অকাজে থাকি না। মিতব্যয়ী। ভদ্র সজ্জন লোকদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করি এবং নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করে থাকি। আর এই অভ্যাসগুলিই শেষ পর্যন্ত হলো কিনা আমার দুর্ভাগ্য ও পতনের কারণ! যেহেতু অপরাধ করিনি, এখনো তাই নিজেকে আমি সম্মান করি।

গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আমি ও আমার স্ত্রী মিলি পঁয়েজিতে যাই রবিবার দিনটা কাটাতে। এটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। পঁয়েজিতে অঢেল খোলামেলা বাতাস। উপরন্তু, ওখানে দারুণ আগ্রহে নদীতে মাছও ধরি আমরা। এই মাছ ধরার নেশা আমাদের মাতাল করে দেয়। মিলিই আমাকে এই নেশার সন্ধান দিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে তার উৎসাহ ও তৎপরতা আমার চেয়েও বেশী। শুধু তাই নয়, যে অঘটনের জন্য আজ আমি কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি, তারও মূলে ঐ মিলি। আমি শুধু একটা বোকা জন্তুর মতন ওর ইচ্ছার দাস হয়েছি মাত্র। এক মিনিট ধৈর্য ধরুন, আমি সব বলছি।

আমি বলবান ও ভদ্র। আমার ভেতরে ছিঁটে ফোঁটাও শয়তানি নেই। কিন্তু আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন,—কেমন দুধের মতন নরম, শীর্ণা; আদতে কিন্তু খাটাশের মতন ভয়ঙ্কর! অবশ্য একথা বলছি না যে, মিলির কোন গুণ নেই। ওর এমন কতকগুলি গুণ আছে, যা ব্যবসায়ের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু সর্বনাশা তার মেজাজ! প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করুন, এমনকি ফরিয়াদীকেও জিজ্ঞেস করুন—তারা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবে। আমার নির্বিরোধ শান্ত স্বভাব মিলির কাছে অসহ্য। প্রায় প্রতিদিনই এর জন্য তার তর্জন-গর্জন, এরকম স্বভাব আমি সহ্য করতে পারি না। সহ্য হয় না।

ধর্মাবতার, আমি যদি এতকাল এই স্ত্রীর কথায় নাচতাম, তা হলে মাসের মধ্যে অন্ততঃ তিনবার আমাকে লড়াইতে নামতে হতো।

মাদাম রেনার্ড এবার তার স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে বললো, 'বলে যাচ্ছো, বলে যাও। সব ভাল যার শেষ ভাল।'

রেনার্ড স্ত্রীর দিকে ফিরে চড়া গলায় বলে, 'আলবাৎ। আমি তোমায় রেহাই দিয়ে গেলাম। না হলে এই বিচার হতো তোমার।'

তারপর আবার বিচারকের দিকে ফিরে বলতে থাকে:

"তা হলে আমার যা বলবার বলে যাই! প্রতি শনিবার রাতেই আমরা দু'জনে পৌঁছে যেতাম পঁয়েজিতে। উদ্দেশ্য—যাতে রবিবার দিন খুব সকালেই মাছ ধরতে বসে যেতে পারি। লোকেরা যেমন বলে থাকে, 'অভ্যাসই মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব', আমার বেলাতে তা-ই হয়েছে।

বছর তিনেক আগে মাছ ধরবার জন্য পঁয়েজিতে নদীর ধারে আমি একটা বিশেষ জায়গা আবিষ্কার করেছিলাম। হ্যাঁ, জায়গার মতন জায়গাই বটে!

আপনার একবার সেই জায়গাটা দেখে আসা উচিত। কী চমৎকার ছায়া, কম-সে-কম আট ফিট গভীর জল, দশ ফিটও হতে পারে, নদীর পাড় ঘেঁষে অপূর্ব এক গহ্বর, যেখানে মাছের ঝাঁক ছুটে ছুটে আসে, আশ্রয় নেয় এবং মৎস্য শিকারীদের জন্য গড়ে তোলে এক স্বর্গভূমি।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি ঐ গহ্বরটাকে আবিষ্কার করার জন্য নিজেকে ক্রিস্টোফার কলম্বস বলে মনে করি। এই জেলার প্রত্যেকে এটা জানে এবং ঐ খাঁড়িতে মাছ

ধরবার আমার একচেটিয়া অধিকারকে তারা স্বীকারও করে নিয়েছে। তারা তো এক কথাতেই বলে দেয়, 'ও জায়গাটা রেনার্ডের।'

অন্য কেউ সেখানে নাক গলাতে আসেনি; এমন কি, অপরের জমির দিকে হাত বাড়ানো যার স্বভাব, সেই মঁ প্লুমিউও জায়গাটার ওপর আমার অধিকার নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি।

নিজের অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত থেকেই সদর্পে সেখানে মাছ-শিকারে যেতাম। ...সেই শনিবার পঁয়েজিতে পৌঁছেই 'ডেলিলা'য় চেপে আমি ও আমার স্ত্রী নদীপথে অনেকটা পাড়ি জমালাম। 'ডেলিলা' আমার নিজস্ব বোট যেমন হালকা তেমনি নিরাপদ। কখনো ঐ বোটে চেপে আমি বঁড়শিতে টোপ গাঁথতাম। আমি জানি, আমার মতন টোপ গাঁথতে আর কেউ জানে না। যদিও টোপ গাঁথার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই, তবু যদি আপনি জানতে চান, আমি কি দিয়ে ঐ টোপ গেঁথে থাকি, আমি কিছুতেই বলবো না। কারণ ওটা আমার একান্ত রহস্য। আবিষ্কারও বলতে পারেন। আজ অব্দি কম-সে-কম শ' দুই লোক তেল দিয়েছে ঐ টোপের রহস্য জানবার জন্য। তারা আমায় মদ খাইয়েছে, মাছ ভাজা খাইয়েছে, আমার সঙ্গে হাজারো বাত্ জুড়ে দিয়েছে শুধু ঐ টোপের মালমশলাগুলি জানবার জন্য। কিন্তু এ শর্মা বলবার পাত্র নয়। একমাত্র আমার স্ত্রী জানতো ঐ টোপের রহস্য.....এবং সেও প্রাণ গেলেও ঐ কথা ফাঁস করবে না। কি মিলি, মিথ্যা বলছি?"

বিচারক বাধা দিলেন, 'বাজে কথা ছেড়ে আসল কথায় আসুন।'

আসামী আবার বলে চলে :

"হ্যাঁ, হুজুর, বলছি। ৮ই জুলাই, শনিবার বিকেল পাঁচটা পঁচিশের ট্রেনে আমরা তো রওনা দিলাম পঁয়েজির উদ্দেশ্যে। এবং সেখানে পৌঁছে ডিনার খাবার আগেই যথারীতি চলে গেলাম আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় সেই বিশেষ ধরনের 'চার' করে আসতে। শনিবার 'চার' করে এসে রবিবার সেখানে ছিপ ফেলি। ঐ 'চার'ই হলো আমার আশ্চর্য টোপ, যার গন্ধে যত রাজ্যের মাছেরা এসে গহ্বরে আশ্রয় নেয়।

আবহাওয়া মনোরম হবে বলেই মনে হচ্ছিলো।

মিলিকে বললাম, 'কালকের দিনটা ভালোই যাবে মনে হচ্ছে।'

সেও সায় দেয়, 'মনে তো তাই হয়।'

আর কোন কথা তখন হয়নি আমাদের দু'জনের মধ্যে।

তারপর আমরা ফিরে এলাম। ডিনার খেলাম। নিজেকে বেশ তরতাজা মনে হচ্ছিলো, পান করার বাসনাও জাগছিল মনে। আর স্যর, এই বাসনাটাই কিন্তু অনেক অনর্থের মূল।

আমি মিলিকে বললাম, 'মিলি, এখন এক বোতল 'নাইট-লাইট' পেলে মন্দ হয় না। মেজাজ আসতো!'

'নাইট-লাইট' এক ধরনের পাতলা সাদা মদ, যা অল্প পান করলে ক্ষতি নেই; কিন্তু বেশী টানলেই নানা উপসর্গ—রাতে ঘুমের বারোটা বাজবে।

মিলি জবাব দিলো, 'ইচ্ছে হলে খেতে পারো। তবে অসুস্থ হ'য়ে পড়বে, কাল সকালে উঠতেই পারবে না।'

মাইরি, মিলি যা বলেছিল, একেবারে বেদবাক্য! আমার স্ত্রীর যে দূরদৃষ্টি আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। তবু, নিজের রসনাকে সামলাতে পারলাম না। পুরো এক বোতল 'নাইট-লাইট' উড়িয়ে দিলাম। ফলে যা হবার তাই হলো। সারারাত ঘুম নেই, মগজের ভেতরে যতসব উদ্ভট যন্ত্রণার দাপাদাপি।

ঘুম আর আসে না। রাত দুটো পর্যন্ত ভগবান আমাকে জাগিয়ে রাখলেন। আর তারপরই দুম্ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। সে ঘুম যে কী ভয়ানক! টেরই পেলাম না, কখন দেবদূত তাঁর বিচারের শেষ রায় দিয়ে গেছেন।

সংক্ষেপে বলছি হুজুর।

সকাল ছ'টায় স্ত্রী আমাকে ডেকে তুললো। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠি; তড়িঘড়ি প্যান্ট গেঞ্জি পরে নিই। ঝাঁপিয়ে উঠে বসি আমার 'ডেলিলায়'।

ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

নির্দিষ্ট খাড়ির কাছে এসে অবাক হয়ে দেখছি, কে একজন আমার জায়গায় জাঁকিয়ে বসে আছে ছিপ্ ফেলে।

ধর্মাবতার, এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। গত তিন বছরের মধ্যে কখনো ঘটেনি। মনে হলো, যেন নিজের নাকের গোড়াতেই কে বুঝি আমার পকেটটা কেটে নিলো!

বললাম: যাচ্ছেতাই! একেবারে যাচ্ছেতাই!

জ্বলে উঠলো আমার স্ত্রী: 'আরো মাল টানো। 'নাইট-লাইট' 'নাইট-লাইট' করে একেবারে তো পাগল হয়ে গিয়েছিলে। মাতাল, লম্পট কোথাকার! তুমি একটি আস্ত গর্দভ। এখন খুশি হয়েছো তো?'

আমার বলার কিছুই ছিল না। মিলিতো আর মিথ্যা কিছু বলছে না।

ব্যাপার যাই হোক, আমি ঐ গহ্বরের কাছাকাছিই ছিপ ফেলতে মনস্থ করি। যদি এক আধটা মাছ ছিটকে আসে তো নির্ঘাৎ আমার টোপ গিলবে। হয়তো আমার জায়গায় বসে থাকা লোকটার কপাল আজ নাও খুলতে পারে এবং তখন সে নিশ্চয় ঐ জায়গা ছেড়ে সরে যাবে।

লোকটা মাথায় মস্ত খড়ের টুপি চাপিয়ে ঘাড় নীচু করে বসে আছে। ছোটখাটো দেহ, হাড়সর্বস্ব শরীর। ওরও সঙ্গে নিজের স্ত্রী রয়েছে। স্ত্রীটি আবার বিশালকায়, চর্বিবহুল, স্বামীর পিছনে বসে সেলাই করছে।

মেয়েমানুষটা খেয়াল করে, আমরা ঐ গহ্বরের কাছাকাছিই ছিপ ফেলবার তোড়জোড় করছি। সে তিক্ত স্বরে বলে ওঠে, 'নদীতে কি মাছ ধরবার আর কোন জায়গা নেই?'

আমার স্ত্রীও ক্ষিপ্ত হ'য়ে জবাব দেয়,'হ্যাঁ, সুবিধাভোগীরা অপরের সম্পত্তিতে হাতও দেবে, আবার পোদ্দারিও করবে!'

যেহেতু আমি ঝগড়া-ঝাটি পছন্দ করি না, মিলিকে বললাম, 'চুপ করো মিলি, বসতে দাও ওদের। আমরাও দেখি, কি হয়।'

উইলো গাছের ছায়ায় 'ডেলিলা'কে রেখে মাটিতে নেমে এলাম আমরা। বসে পড়লাম ছিপ্ হাতে ওদের থেকে কিছুটা দূরত্বে, কিন্তু একই রেখা বরাবর।

হুজুর, এবার একটু বিস্তৃতভাবেই আমাকে সব বলতে হবে। বোধহয় পাঁচ মিনিটও কাটেনি, এমন সময় আমাদের প্রতিবেশীর 'ফতনা' দু'বার তিনবার নড়ে ওঠে। তারপরই সে গেঁথে তুললো আমার উরুর মাপের বিশাল একটা রুই মাছ। হয়তো যতটা বড় বলছি, ততটা নয়; তবে মাছটার আকৃতি বেশ দশাসই ছিল।

আমার বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে, সারা শরীরে ঘাম দেখা দেয়।

মিলি দাঁতে দাঁত ঘষে; 'দেখো—দেখো, হাঁদারাম, দেখতে পাচ্ছো তো ব্যাপারখানা?'

ঠিক সেই সময় পঁয়েজির মুদী ব্যবসায়ী মঁসিয়ে ব্রু নৌকায় করে নদী পার হচ্ছিলেন। আমার উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললেন, 'মঁসিয়ে রেনার্ড, আপনার এতদিনকার জায়গা কি অপরে দখল করে নিলো?'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে ব্রু'; আমিও চড়া গলায় জবাব দিলাম, 'পৃথিবীতে অনেক ইতরজনও তো আছে, যারা কোনটা কার সে খবর রাখে না, অপরের জিনিসে ভাগ বসায়।'

বললাম বটে কিন্তু ঐ মাছ-শিকারীর কানে ঢুকেছে বলে মনে হলো না। গরুর মতন মুটকী বৌ-টাও নির্বিকার, কান পেতেছে বলে তো মনে হয় না।

আর একবার বাধা দিলেন বিচারক, 'সংযত হ'য়ে কথা বলুন। বিধবা মাদাম ফ্লেমেচ্ স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন। আর আপনি তাঁকে অপমানসূচক কথা বলছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ রেনার্ড ক্ষমা চেয়ে নেয়, 'আমাকে মাপ করবেন স্যর। অত্যধিক উত্তেজনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম!'

প্রথম মাছটা মারবার পর পনেরো মিনিটও পার হয়নি, ক্ষুদে লোকটা আবার তার বঁড়শিতে গেঁথে তুললো পেল্লায় চেহারার এক রুই—তারপর, কি আর বলবো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর একটা। তারপর আর একটা... আমি চোখের জল আটকে রাখতে পারছি না। আমার স্ত্রী তো রাগে ফুটছে টগ্ বগ্ করে; থেকে থেকে সে তেড়ে আসছে আমার দিকে, প্রচণ্ড অভিমানে গালি দিচ্ছে, 'বোকারাম, দেখো, ঐ লোকটা তোমার সব মাছ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছো? তোমার শরীরে কি মানুষের চামড়া? আজ কপালে কিচ্ছু জুটবে না, একটা ব্যাঙও পাবে না। ইস্, রাগে আমার আঙ্গুল চুলকাচ্ছে।'

তখনো আমি তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করছি, 'দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তখন চোরটা লাঞ্চ খেতে গেলে আমরা আমাদের জায়গায় উঠে যাবো।' ধর্মাবতার, আমি আমাদের মাছ মারার জায়গাতে বসেই লাঞ্চ করতাম। ডেলিলায় খাবার-দাবার মজুত থাকতো। অপর কোন মৎস্যশিকারীর এই অভ্যাসটি দেখিনি। তাই নিশ্চিত ছিলাম, ওরা নিশ্চয় যথাসময়ে লাঞ্চ খেতে উঠে যাবে।

কিন্তু কী ভয়ানক!

ঘড়িতে বারোটা বাজলো।

আর ঐ বদমাইশটা আমাদের দেখাদেখি কাগজের মোড়ক খুলে তাদের লাঞ্চের খাবার বের করে—একটি আস্ত পাখির মাংস। খেতে খেতেই অবার বঁড়শিতে একটা কাতলা গাঁথল সে। দিব্যি গেঁথে তুললো!

মিলি আর আমি তখন সবে লাঞ্চ করতে বসেছি। ঐ দৃশ্য দেখে আমাদের আর খাবার স্পৃহা থাকে না।

আমি তখন খাবার হজম করার জন্য খবরের কাগজ পড়তে আরম্ভ করি। প্রতি রবিবার নদীর ধারে ছায়ায় বসে ঐ সময় আমি 'গিলব্লাস' পত্রিকাখানা পাঠ করে থাকি। কারণ, একমাত্র এই রবিবারেই গিলব্লাসে লেখিকা কলমবাইন লিখে থাকেন। প্রায়ই আমার স্ত্রীকে রাগিয়ে দি এই বলে যে, আমি কলমবাইনকে চিনি। আসলে এটা সত্য নয়। ঐ লেখিকাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, কোনদিন তাঁকে চাক্ষুষও দেখিনি; কিন্তু তিনি জানেন, কি করে লিখতে হয়; বিশেষতঃ মেয়েদের কথা ভারী জমিয়ে লিখতে পারেন। তাঁর লেখা আমার ভালো লাগে, তাঁর মতন লেখা খুব কম লেখক-লেখিকাই লিখতে পারেন।

যাই হোক, আমার স্ত্রী রেগেই ছিল; এবার রাগের মাত্রাটা আরো বাড়লো।

ঠিক এই সময় দু'জন লোক নদীর অপর পারে এসে উপস্থিত হলেন—তাঁদের একজন মঁসিয়ে লুইস্ লেডুর, অপরজন মঁসিয়ে জাঁ ডুরডেন্ট। আমি তাঁদের এখানে অনায়াসে সনাক্ত করতে পারি।

বেঁটে লোকটি আবার মাছ-শিকারে মন দেয়। খুব কম সময়ের মধ্যেই প্রচুর মাছ সে তুলতে থাকে এবং প্রতিবারই আমার ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মিলি আমার কানের কাছে বলতে থাকে, 'আমাদের জায়গা। রোজ আসছি, মাছ ধরছি। অথচ...কল্পনা করা যায় না।...'

আমার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে যেন একটা হিমেল স্রোত নামতে থাকে। মিলির একটানা গঞ্জনা, 'তুমি মানুষ নও। মানুষ কখনো এরকম হয় না । একটা মুরগীর কলিজাতেও এর চেয়ে বেশী সাহস থাকে।'

'দেখো,' আমি বলে উঠি, 'বরং চলো, এখান থেকে উঠে যাই।'

আমার কথা শুনে সে ফোঁস করে ওঠে, 'ছিঃ ছিঃ! পুরুষ নামেরও তুমি অযোগ্য। অপরের হাতে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে পালাতে চাইছো? তা হলে যাও, কাপুরুষের মতন লেজ গুটিয়ে পালাও!'

মিলি একেবারে আমাকে চেপে ধরেছে! সমানে শানাচ্ছে তার আক্রমণ। অবশ্য তখনো আমি যথাসাধ্য সংযত, নির্বিকার।

কিন্তু ঠিক তখনই, হায়, ঠিক তখনই ঐ নচ্ছার লোকটা আর একটা মাছকে তার বঁড়শিতে গেঁথে তুললো। আহা! ঐ রকম বিশাল লোভনীয় মাছ আমি জীবনে দেখিনি। কখনো দেখিনি।

আমার স্ত্রীও ঘুরে তাকিয়ে আর স্থির থাকতে পারে না। সে তার গলা সপ্তমে তুলে দেয়। ওদের শুনিয়ে শুনিয়েই হল্লা করে, 'আমাদের মাছ চুরি করে পালাচ্ছে। চোর। 'চার' ফেললাম আমরা, আর মাছ পাকড়াচ্ছে ওরা। ওদের অন্তত আমাদের চারের পয়সা দিয়ে দেওয়া উচিৎ।'

মিলির চীৎকার শুনে বেটেখাটো শিকারীর দশাসই স্ত্রীও সোচ্চার হয়ে ওঠে, 'মাদাম কি আমাদের বলছেন ?'

'আমি বলছি মাছ-চোরদের। জায়গাটায় চার ফেললাম আমরা আর আমাদের মাছ মারছে অন্যরা।'

'আপনি কি আমাদের মাছ-চোর বলছেন ?'

এবং শুরু হলো তাদের যুক্তি, তারপর তর্কাতর্কি, তারপর গালিগালাজ। হা ঈশ্বর, তারা যে কী অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করলে! ওদের এই গালি শুনে বেশ আমোদ পাচ্ছিলেন আজকের মামলার দুই সাক্ষী; রগড় করে বলেওছিলেন তাঁরা 'আপনারা একটু চুপ করুন। মাছরা যে সব পালিয়ে যাচ্ছে।'

অথচ ঘটনা এই যে, আমি ও সেই ছোট শিকারী তখনো চুপচাপ জলের দিকে মাছের আশায় চেয়ে আছি। এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন আমরা ঐ দুই মহিলার ঝগড়া-ঝাটি শুনতেই পাচ্ছি না।

কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে শেষ রক্ষা হলো না। ওরা সমানে চীৎকার করছে।

'তুই মিথ্যাবাদী।'

'তুই নষ্টা মাগী।'

'তুই বেশ্যা।'

'তুই কুক্কুরী।'

চললো,—চললো এমন অশ্রাব্য বাদানুবাদ।

তারপর হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ শব্দে আমি চমকে উঠে ঘুরে তাকাই। দেখতে পেলাম, মুটকী মেয়েছেলেটা ছাতা হাতে আমার স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আঘাত করছে। দু'জনেই দু'জনকে আঘাত করছে। মিলির হাতিয়ার তার দুই ধারালো চট্‌পটে হাত, যা দিয়ে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। সে এক হাতে ওর চুল ধরে অন্য হাতে সমানে চড় কষাচ্ছে। আঁচড়ে খামচে নাকাল করে দিচ্ছে। বুলেটের মতন এসে পড়ছে তার হাতের চড়গুলি।

আমি কিন্তু সত্যি ঐ মারামারিতে সক্রিয় অংশ নিতাম না। মেয়েদের লড়াইয়ের ফয়সলা মেয়েরাই করবে। আমরা পুরুষমানুষরা কেন সামিল হবো ?

কিন্তু ঐ বেঁটে লোকটার মাথায় কী যে শয়তান এসে ভর করলো। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তেড়ে এলো আমার স্ত্রীর দিকে। 'না, না, বন্ধু এ অত্যন্ত অন্যায়।' আমি আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। লোকটার একটা হাত চেপে ধরি এবং অন্য হাতে পরপর দুটো ঘুষি চালাই। প্রথমটা লাগলো তার নাকে, দ্বিতীয়টা বেরিয়ে গেল বাতাস কেটে। ওর শরীরটা ঝাঁকানি খায়, পা দুটো টলমলিয়ে ওঠে এবং সে টলে পড়ে যায় নদীতে—একেবারে সেই গহ্বরে।

হুজুর, আমি তাকে জলে ফেলে দিতে চাইনি। যত নষ্টের গোড়া দুই রণচণ্ডী মেয়েমানুষ; আমি তখন ওদের ছাড়াতে চেষ্টা করছি। ভাবতেও পারিনি, লোকটা পড়ে গিয়েই ভক ভক করে জল গিলবে আর তলিয়ে যাবে। বরং আমি নিজেকেই বোঝালাম: লোকটা একটু ঠাণ্ডা হোক।

আর ঐ দুই মেয়েমানুষকে আলগা করা যে কী দুঃসাধ্য কাজ। কী ভয়ানক মেয়েমানুষ তারা!

যাক্, আমার গল্প প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। আরো সংক্ষেপে শেষটুকু বলছি। পাঁচ থেকে দশ মিনিট লেগেছিল মেয়েছেলে দুটোকে পৃথক করতে।

ফিরে তাকালাম। জলে কিন্তু কোন চাঞ্চল্য নেই। হিম নিথর। নদীর অপর পার থেকে লোকেরা চীৎকার করে বলে: জল থেকে ওকে তোলো। ডুবে গেল যে লোকটা!

কিন্তু ঐ গহ্বর থেকে তাকে তুলে আনা আমার সাধ্যাতীত।

অবশেষে, মিনিট পনেরো বাদে 'লক-কিপার' এলো, তার সঙ্গে এলেন আরো দু'জন ভদ্রলোক লোহার আঁকড়া নিয়ে। তারা ওকে উদ্ধার করলেন সেই আট ফিট গভীর জলের তলা থেকে।

হুজুর, অকপটে জানালাম—এই হলো ঘটনা। আমি নিরপরাধ।"

সাক্ষীরা আসামীর কথা সমর্থন করলেন। বিচারে রেনার্ড নিরপরাধ সাব্যস্ত হলো।

ইঙ্গিতি

The Sign

ছোট্ট চেহারার যুবতী মারকিউস্ দ্য রেনিডন এখনো ঘুমিয়ে আছে। শোবার ঘরটি গরম, সুবাসিত; নীচু পালঙ্কের উপর বিস্তৃত ছিমছাম নরম বিছানা। এতবড় বিছানায় সে একা। আসলে বিবাহ বিচ্ছেদের পর নিরুদ্বেগে দীর্ঘ ও গভীর ঘুমের অতলান্তে ডুবে যেতে পারছে মারকিউস্।

এ ঘর সংলগ্ন নাতিদীর্ঘ নীলাভ বৈঠকখানায় কে যেন তীক্ষ্নস্বরে কথা বলছে। ঘুম ভেঙ্গে যায় মারকিউসের। আওয়াজ শুনে সে বুঝতে পারে, কথা বলছে তার প্রিয়তমা বান্ধবী বেরোনেস্ দ্য গ্রাঞ্জারি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পরিচারিকাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, তার এখনই মারকিউসের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

মারকিউস্ চট করে উঠে বসে। এগিয়ে গিয়ে দরজার খিল খোলে। দু'হাতে পর্দা সরায় এবং বাইরের লোকের দৃষ্টির সামনে প্রথমেই ভেসে ওঠে তার সুন্দর ছোট্ট মাথা, অজস্র মেঘের মতন চুল ফুলে ফেঁপে আছে।

'কি ব্যাপার এই সাত সকালে?' মারকিউস্ বলে, 'এখনো তো ন'টা বাজেনি।'

বেরোনেসের মুখের রং ফ্যাকাশে, যেন ভয়াক্রান্ত বিবর্ণ।

'খুব জরুরি কথা। তোকে বলতেই তো এলাম। আমার খুব বিপদ রে।'

'ভেতরে আয়।'

বেরোনেস্ ঘরের মধ্যে ঢোকে। তারা পরস্পরকে চুমু খায়। মারকিউস্ আবার খাটের উপর উঠে বসে। বাড়ির ঝি জানালাগুলি খুলতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এবং আলো একযোগে লুটিয়ে পরে ঘরের সর্বত্র।

ঝি চলে যাবার পর মারকিউস্ বান্ধবীকে বলে, 'বল এবার, কি ব্যাপার ?'

মাদাম দ্য গ্রাগ্রারি কাঁদছে। স্ফটিকের মতন অশ্রুর বিন্দুতে তার রমণীমুখ আরো রমণীয়। চোখ না মুছেই সে বলে, 'বন্ধু, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার ভীষণ ক্ষতি হয়েছে...সারাটা রাত ঘুমাইনি, এক মিনিটও দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। সব বলছি। আমার বুকে হাত রেখে দেখ, হৃৎপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করছে।'

বলেই বেরোনেস্ মারকিউসের একখানা হাত এনে তার বুকের ওপর চেপে ধরে। যুবতীর সুরক্ষিত পুরুষ্টু পরিপূর্ণ বুক, যা অধিকাংশ পুরুষ শুধু কামনাই করে থাকে, একবার ভাবেও না— ঐ বুকের তলায় কি লুকিয়ে আছে। বেরোনেসের হৃৎপিণ্ড সত্যি চঞ্চল, অতি দ্রুত ওঠা নামা করছে।

সে বলতে থাকে :

ঘটনাটা ঘটেছিল গতকাল দিনের বেলায়...তখন চারটে হবে...অথবা সাড়ে চারটে। নির্ভুলভাবে সময়টা বলতে পারছি না। তুই তো আমার ফ্ল্যাট-বাড়িটা দেখেছিস, আমাদের ছোট্ট ড্রয়িংরুমটার কথা নিশ্চয় মনে আছে। আমি ঐ ঘরের জানালার ধারে বসে রোজ চলমান জনতাকে দেখি। স্টেশান বরাবর ঐ পথে সর্বদাই একটা প্রাণচাঞ্চল্য, অতি-ব্যস্ততা এবং লোকে লোকারণ্য। আমার এসব দেখতে ভালো লাগে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, গতকাল জানালার ধারে একটা নীচু চেয়ারে বসেছিলাম। জানালাটা খোলা, মন চিন্তাশূন্য, মুক্ত বায়ু সেবন করছিলাম। তুই নিশ্চয় মনে করতে পারছিস, কালকের দিনটা কী চমৎকার ছিল।

হঠাৎ আমার নজরে এলো, রাস্তার অপর ধারের একটা বাড়ির জানালার সামনেও একটি মেয়ে বসে আছে, পরনে তার লাল পোশাক; আমিও সেই সময় পরেছিলাম ফিকে লাল রঙের একটা ফ্রক। তুই হয়তো সেই ফ্রকটা দেখিসনি।

আমি মেয়েটাকে চিনি না। হয়তো কোন নতুন ভাড়াটে এসেছে মাস খানেকের মধ্যে। এবং যে কারণেই হোক, গত একমাসের মধ্যে একবারও তাকে আবিষ্কার করতে পারিনি।

কিন্তু এখন কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটা সুবিধের নয়। প্রথম দর্শনেই আমি বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম—ও ঠিক আমারই ভঙ্গীতে জানালার ধারে বসে আছে। তারপর, ক্রমশঃ কৌতুক বেড়েছে ওর কাণ্ডকারখানা দেখে। সে কনুইতে ভর দিয়ে নীচু হয়ে আছে এবং রাস্তায় চলমান কোন কোন মানুষের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি

হাসছে; প্রায় অধিকাংশ লোকই সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছে তার প্রত্যুত্তর। অনেকেই ঐ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে মেয়েটার দিকে তাকায় যেন কোন কুকুর খাবারের ঘ্রাণ নিচ্ছে। বাতৃচিংও হয় চোখের আভাসে ইঙ্গিতে।

মেয়েটা আহ্বান জানায় : হবে নাকি ?

তাদের তরফ থেকে জবাব আসে, 'সময় নেই' অথবা, 'আর একদিন হবে' অথবা, 'পয়সার টানাটানি' অথবা 'সরে যা অসভ্য মেয়ে।' এই শেষ কথাটা প্রায়শই বয়স্ক সংসারী কর্তাদের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।

তুই কল্পনাও করতে পারবি না, কী বিশ্রী লাগে ওকে ঐভাবে নোংরা ব্যবসা চালাতে দেখে।

কখনো কখনো তাকে দেখা যায় জানালার কপাটগুলি বন্ধ করে দিতে। নিবিষ্ট কৌতুকে চেয়ে দেখি, কোন একজন লোক ধীরে ধীরে তার ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে! দক্ষ মৎস্য-শিকারী যেমন চকিতে বঁড়শিতে মাছ গেঁথে তোলে, সেও ঠিক তেমনি নিপুণ তৎপরতায় ঐ লোকটাকে যেন নিজের শরীরের সঙ্গে গেঁথে ফেলে। সেই মুহূর্তে স্বাভাবিক লজ্জায় আমি চোখের পাতা বন্ধ করি। অপর পক্ষের জানালাও বন্ধ হয়ে যায়। দশ অথবা বিশ মিনিট ধরে চলে তাদের কাজ-কারবার, এর বেশী কখনো নয়।

সত্যি বলছি, এই স্ত্রী মাকড়সার নিপুণতা দেখে আমার ভেতরে ক্রমশঃ ঘৃণার চেয়ে মুগ্ধতা বাড়ে। ও কত চটপটে, আদৌ অপটু গ্রাম্য যুবতী নয়!

আমার অবাক জিজ্ঞাসা : কি করে এত চকিতে সে তার আবেদন রাস্তার লোকদের কাছে পৌঁছে দেয় ? সে কি তার মাথা নাচিয়ে বিশেষ ইঙ্গিত জানায় ? অথবা, লোকেরা তার দিকে তাকানো মাত্র কি সে হাতছানি দেয় ?

উদগ্র কৌতূহলে চোখে একটা ছোট্ট দূরবীণ লাগিয়ে ওর সূক্ষ্ম কায়দাগুলি লক্ষ্য করি। বাঃ, ব্যাপারটা তো বেশ সহজ, : প্রথমে কটাক্ষ, তারপর মুচকি হাসি, তারপর মাথা হেলিয়ে যেন ইঙ্গিতে বলা, 'উপরে আসবে ?'

কিন্তু গোটা কাজটাই অতি সূক্ষ্ম, চমকপ্রদ এবং আপাতভাবে স্বাভাবিক। সত্যি এর জন্য বিশেষ দক্ষতা ও অনুশীলনের দরকার।

আমার মনে আরো একটা জিজ্ঞাসা প্রবল হ'য়ে ওঠে: আচ্ছা আমি কি পারি না ওর মতন নিপুণতায় ইঙ্গিত করতে, রাস্তার লোকদের আকর্ষণ করতে ? ব্যাপারটাতে সত্যি শিল্পসম্মত সৌন্দর্য আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করি। বান্ধবী, কি বলবো,ঐ মেয়েটার চেয়েও অনেক বেশী দক্ষতায় পারলাম। আমার অঙ্গ-ভঙ্গী যেন আরো সূক্ষ্ম ও কার্যকরী। বেশ ফূর্তি হলো ; তাড়াতাড়ি ফিরে যাই জানালার ধারে নিজের আসনে।

তার তখন কোন খদ্দের নেই, সময় খারাপ—কেউ আসছে না পরিস্থিতিটা ওর পক্ষে নিশ্চয় খুব বিপজ্জনক ; কারণ, খদ্দের না আসা মানেই তার রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তা ছাড়া, যারা আনন্দ লুটতে আসে, তারা কিন্তু সকলেই খারাপ নয় ; কিছু কিছু ভালো মানুষও গণিকাদের সংস্পর্শে এসে থাকে।

ইতিমধ্যে দৃশ্যপটের আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষণীয়। লোকেরা আর তার বাড়ির সামনে সঞ্চরণশীল নয়। তারা হেঁটে পার হচ্ছে আমাদের বাড়ির নীচ দিয়ে। সূর্য ক্রমশঃ পশ্চিমে। একের পর এক অপরিচিত মানুষ আসে যায়। কেউ যুবা, কেউ বা বৃদ্ধ; কুৎসিত লোকও আছে, আবার সুপুরুষরাও নজর কাড়ে। কারুর চুল ধূসর, কারুর বা মাথা একেবারে সাদা।

চলমান জনস্রোতে এমন কয়েকজনকে দেখলাম, যাদের চেহারা অপলকে চেয়ে দেখার মতন। সত্যি, সুন্দর পুরুষ। আমার স্বামী বা তোর প্রাক্তন স্বামী ওদের পাশে দাঁড়াতেই পারবে না। এই সব রূপবানদের একজনের উপর তো আমার পরীক্ষা চালাতে পারি।

আমার স্বগত-ভাষণ শুরু হয়: আমি একজন আদর্শ নারী। কিন্তু যদি নিছক মজা করবার জন্যই ওদের কাউকে ঐ গণিকাটির মতোই ইঙ্গিত করি, তবে কি লোকটা আমার ইঙ্গিতের তাৎপর্য বুঝতে পারবে? আমি কি সত্যি ঐ ধরনের ছলা-কলা প্রয়োগ করতে সমর্থ?... এই কথাগুলি ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আমার মানসিক জগতে যেন এক বিরাট বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা ঘনিয়ে এলো। প্রচণ্ড এক বাসনার তাগিদে অস্থির হয়ে উঠি। এমন এক ধরনের গোপন ইচ্ছা যে চকিতে এত বিরাট ও ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে, কোনদিন কল্পনা করিনি। এই অস্থিরতার সঙ্গে একমাত্র সন্তানাকাঙ্খী নারীরই তুলনা করা চলে।

ভেতরে কামনার, কৌতুকের, জিজ্ঞাসার অনুরণন; নিজেকে সংযত রাখা দুরূহ! তুই কি আমাকে খুব নির্বোধ ভাবছিস? আসলে আমরা, মেয়েরাই এমন নির্বোধ। আমার ধারণা, প্রতিটি মেয়ের অন্তঃস্থলে এক-একটি বানর লুকিয়ে আছে। আমি শুনেছি [একজন ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন] আমাদের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে নাকি বানরদের মানসিকতার অনেক সাদৃশ্য আছে। আমরা বানরদেরই মতন চিন্তা করি, সেই ঢঙে কথা বলি, বা বলতে চাই। কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার।

আমি তখন নিজের এক্তিয়ারের বাইরে। অদমনীয় কৌতুকের শিকার।

আবার নিজেকেই নিজে যুক্তি-জালে আবদ্ধ রাখবার প্রয়াসে বলি: ওদের যে কোন একজনের ওপর নিজের অধিগত বিদ্যা প্রয়োগ করে দেখবো। কেবলমাত্র একজনের ওপর। শুধু দেখবো, প্রতিক্রিয়াটা কি দাঁড়ায়! কি আর হবে আমার? কিছুই হবে না। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে একটুখানি হাসবো মাত্র। ব্যস্, আর কিছু নয়। তারপর আর কোন দিন তার দিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করবো না। আমি তাকে চিনতেই পারবো না। আর সে যদি আমাকে চিনতে পারে, আমি অস্বীকার করবো। চুকে যাবে ব্যাপারটা।

সুতরাং শুরু হলো বাছাইপর্ব! স্বভাবতই আমি বেছে নিতে চাই কোন সুদর্শন যুবককে। হঠাৎই দৃষ্টি আটকে গেল একজনের ওপর—জনৈক দীর্ঘকায় সুপুরুষ রাস্তা পার হচ্ছে। ভারী সুন্দর যুবক। তুই হয়তো জানিস না, সুন্দর লোকদের প্রতি বরাবরই আমার একটা দুর্বলতা আছে।

কাছাকাছি আসতেই চোখাচোখি হলো। আমি সরাসরি তাকাই। সেও তাকায়; আমি ঠোঁট টিপে হাসি। সেও হাসে। আমি ইঙ্গিত করলাম—হ্যাঁ—চকিতে ইঙ্গিতটুকু জানালাম। আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে সেও ইঙ্গিতে জানায়: যাচ্ছি।

তারপর—তারপর—কি মনে হয় তোর?

সে আসছে, বিশ্বাস কর, সে এই বাড়ির দিকে আসতে থাকে। পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

নিশ্চয় সেই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে পারছিস। মনে হলো, এখনই কোথাও লুকিয়ে পড়ি। ইস্, কী যে আতঙ্ক তখন আমার। ভেবে দেখ, সে নিশ্চয় আমার স্বামীর বিশ্বস্ত চাকর যোশেফের সঙ্গে কথা বলবে। আর যোশেফ ভাববে, লোকটার সঙ্গে নিশ্চয় আমার অনেক দিনের পরিচয়।

কি করবো? কি বলবো? কি করতে পারি?

আর কয়েক মুহূর্ত বাদেই সে এই ঘরের বেল টিপবে। আমার তখন কি করার বা বলার থাকতে পারে?

ভাবলাম, ছুটে গিয়ে তাকে বলবো: দেখুন, আপনি ভুল করছেন, দয়া করে চলে যান। সে নিশ্চয় একজন অসহায়া নারীকে রেহাই দেবে।

এই রকম ভেবেই ত্রস্তে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই এবং কাঁপা হাতে দরজা খুলি। এবং দরজা খুলতেই ভীষণ চমক—সে এসে দাঁড়িয়েছে, বেল টিপতে উদ্যত।

ভয়ানক আতঙ্কে বিড় বিড় করতে থাকি: স্যর, চলে যান, আপনার ভুল হয়েছে। আমি বিবাহিতা, স্বামী নিয়ে ঘর করি। আমারই খুব বড় ভুল হ'য়ে গেছে। দূর থেকে চিনতে পারিনি; আপনাকে দেখতে অনেকটা আমার এক পরিচিত জনের মতন। ক্ষমা করবেন...

আমি তো একটানা বলে গেলাম। কিন্তু তারপর? তারপর কি হলো বলতে পারিস?

সে হো হো করে হেসে উঠলো, শাণিত গলায় বললো, 'সুন্দরী, আমার সেলাম নাও। তোমার বক্তব্য আমার জানা। আমি তোমার সব জানি। জানি তুমি বিবাহিতা এবং এখন থেকে একটি লুইস স্বামীর বদলে দুটি লুইসকে স্বামী হিসেবে পাবে। দু'জনকেই পাবে গো। দাও, এবার ভেতরে ঢুকবার পথ দাও।'

বলতে বলতে সে আমায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। নিজের হাতে কপাট বন্ধ করে। আমি তার সামনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপছি।

সে আমায় জাপটে ধরে চুমু খায়; আমার ঘাড় ও বুক সম্পূর্ণভাবে আঁকড়ে রেখে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ড্রয়িংরুমের দিকে। ড্রয়িংরুমের দরজা খোলা।

তারপর সে ঐ অবস্থাতেই ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়, যেন এই ঘরটার মূল্যায়ন করে, বলে, 'তুমি তো বেশ ভালো জায়গাতেই আছো হে। তবে কেন 'জানালার খেলা' খেলে যাচ্ছো, রূপসী?'

আমি আবার তাকে যথাসাধ্য অনুনয়-বিনয় করতে থাকি, 'সত্যি, আমি সংসারী, দেহ নিয়ে ব্যবসা আমি করি না, দয়া করে আমাকে রেহাই দিন, চলে যান। আমার স্বামী চলে আসবেন। যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারেন। তাঁর আসার সময় হয়ে এলো। আমি শপথ করে বলছি, আপনার ভুল হয়েছে।'

সে নির্বিকার গলায় মজা করে, 'আসতে দাও, ঘাবড়াবার কি আছে। এলে তার হাতে পাঁচটা ফ্রাঙ্ক দিয়ে পাঠাব রাস্তার ওপাশে গিয়ে মাল খেয়ে আসতে।'

অগ্নিকুণ্ডের উপরিস্থিত কারুকাজ করা তাকের উপর রাখা আমার স্বামীর ছবিটার দিকে চেয়ে সে বলে, 'কার ফটো?....তোমার স্বামীর?'

'হ্যাঁ, তাঁর।

'বিলকুল বোকা বোকা চেহারা। আর ওটি কার ছবি? তোমার কোন বান্ধবীর বুঝি?'

ঐ ছবিটা ছিল তোর।—সান্ধ্য পোশাকে দাঁড়িয়ে আছিস। আমি ভাঙ্গা গলায় বললাম, 'হ্যাঁ, আমার এক বান্ধবী।'

'চেহারায় বেশ চটক আছে। নিশ্চয় আমার সঙ্গে মুলাকাৎ করিয়ে দেবে?'

ঘড়িতে তখন প্রায় পাঁচটা বাজতে চলেছে। বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করছে, যদি এই লোকটা বিদায় নেবার আগেই স্বামী চলে আসেন! তা হলে...তা হলে...আমার সর্বনাশ হবে...আমার মাথা কাটা যাবে...চোখে সর্ষেফুল দেখছি...ঐ অবস্থাতেই ভাবতে থাকি...মরিয়া হ'য়ে উপায় উদ্ভাবন করছি....সবচেয়ে ভালো হয় যদি.......যদি......যদি লোকটার হাত থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়া যায়...এবং রেহাই পাবার জন্য এখনই ঐ বস্তুটা আমাকে দিতেই হবে...নিশ্চয় বুঝতে পারছিস, আমি কি বলছি—আমাকে আজ ও না নিয়ে তো ছাড়বে না—কাজেই কালহরণ না করে যত তাড়াতাড়ি দেওয়া যায়, ততই নিরাপদ—সুতরাং, আমি তখন লোকটাকে নিয়ে স্বেচ্ছায় ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম, নিজে হাতে দরজা বন্ধ করলাম—এবং সেখানে যা হবার হলো।'

মারকিউস্ হাসতে থাকে, হাসি থামতেই চায় না; হাসির দমকে তার ছোট্ট শরীর কাঁপে, মাথাটা নুয়ে পড়ে বালিশের ওপর। হাসির বেগ একটু কমলে বলে:

'তারপর?—সে তো নিশ্চয় এক বিশাল সুপুরুষ?'

'তা ঠিক!'

'তাহলে, সুখ তো ঠিকই পেয়েছিস?'

'কিন্তু—আসল ব্যাপারটা যে অনেক ভয়ানক—লোকটা যাবার সময় কি বলে গেল জানিস? বললো, আগামী কাল আবার আসছি, ঠিক এই সময়—আমার—আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে—তুই কল্পনাও করতে পারবি না, লোকটা কি রকম নাছোড়বান্দা—দেহের মতই মজবুত তার মনটাও।—আমি কি করবো? অথবা, কি বলবো? —আমি এখন কি করতে পারি, বল?'

মারকিউস্ উঠে বসে, চিন্তা করে। তারপর সিদ্ধান্ত দেয়:

'ওকে পুলিশে ধরিয়ে দে।'

বেরোনেস্ যেন ঝড়ের মুখে কেঁপে ওঠে, 'কি বলছিস তুই! পুলিশে ধরিয়ে দেবো? কোন্ অভিযোগে?'

'এর জন্য আবার এত ভাবতে হয়! সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে বলবি, একটা লোক তিন মাস ধরে তোর পিছু লেগেছে; গতকাল সে জোর করে তোর ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল; আবার আজ আসবে বলে শাসিয়েও গেছে। এই অবস্থায়

আইনের সাহায্য ভিক্ষা করা ছাড়া তোর যেন আর গত্যন্তর নেই। দেখবি, তারা নিশ্চয় তোর সঙ্গে দু'জন অফিসারকে দিয়ে দেবে। ঐ অফিসার দু'জনই সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করবে।'

'কিন্তু সে যদি তখন সব বলে দেয়—'

'ধ্যাৎ বোকা। কে আর বিশ্বাস করবে ওর কথা? তুই একটা মেয়েমানুষ, আর এ সব ক্ষেত্রে মেয়েদের এজাহারেরই মূল্য বেশী।'

'আমার কখনই এত সাহস হবে না।'

'এ ছাড়া বাঁচবার দ্বিতীয় পথ নেই। হয় এটা করবি, না হলে মরবি!'

'কিন্তু সে তো ধরা পড়বার সময় আমাকে বিদ্রূপ করবে। আমার পক্ষে সেটা সহ্য করা কঠিন।'

'বটে। তা হলে একটা কথাই বলতে হয়।'

'কি কথা?'

'এক-আধজন লোককে সাক্ষী রেখে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করবি।'

'ক্ষতিপূরণ! তাও সাক্ষী-সাবুদ রেখে...আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন...তোর কথা শুনে আমার সেই 'দু'জন লুইস'-এর কথাই মনে আসছে, আমার স্বামীর ছবি দেখে লোকটা যা বলেছিল।'

'দু' জন লুইস?'

'হ্যাঁ।'

'দু' জনের বেশী জোটেনি?'

'না।'

'তা হলে আর কি করলি। আমি হলে অপমানিত বোধ করতাম। ভালো।'

'কি ভালো? আমি যদি এভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায়ও করি, তা হলেও সেই টাকা নিয়ে আমি কি করবো?'

মারকিউস্ মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করে গম্ভীরস্বরে বলে, 'টাকাটা দিয়ে তোর স্বামীকে কিছু একটা উপহার দিবি। এর চেয়ে চমৎকার সমাধান আর হয় না।'

কাপুরুষ

A Coward

সম্ভ্রান্ত মহলে তার পরিচিতি ছিল "সদাশয় সিগনলস্" নামে, যদিও তার সম্পূর্ণ নাম ভাইকাউন্ট গোনত্রান-যোশেফ দ্যঁ সিগনলস্। তার মা-বাবা বেঁচে নেই, পর্যাপ্ত আয়। লোকে বলে সে নাকি খুব চালাক-চতুর ও সাহসী।

চেহারাখানা চমৎকার। সুন্দর একখানা গাড়ি আছে। রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলার সময় তার আভিজাত্য ও অহঙ্কার ফুটে ওঠে। তার বিশাল গোঁফ ও ইঙ্গিতময় চোখ স্বাভাবিক কারণেই মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয়।

লোকের ধারণা, তার নিশ্চয় যুবকসুলভ প্রেম-ভালোবাসার একাধিক অভিজ্ঞতা আছে। সুদেহ ও মুক্ত মানসিকতা নিয়ে সিগনলসের প্রাত্যহিক সুখী উদ্দাম জীবনযাত্রা। সকলেরই ধারণা, সে তলোয়ার চালাতে নিপুণ এবং নিপুণতর পিস্তলের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করতে।

ডুয়েল লড়ার সময়, সে বলে থাকে, 'আমি পিস্তলকেই বেছে নিতে চাই। কারণ, পিস্তলের সাহায্যে আমি অনেক সহজে প্রতিপক্ষকে খতম করে ফেলি।'

এক সন্ধ্যায় সে তার দুই বান্ধবী সহ থিয়েটার দেখতে গেল। সঙ্গে বান্ধবীদের স্বামীরাও ছিলেন। থিয়েটার শেষ হবার পর সে ওদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় টরটনির কাফেতে। কিছুক্ষণ ঐ কাফেতে বসে থাকবার পর একটা দৃশ্য তাকে সচেতন করে তোলে। সে দেখে, একটি লোক খানিকটা ব্যবধানে বসে তার এক বান্ধবীর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে; সেই দৃষ্টি একগুঁয়ে ও অভব্য। বান্ধবীটি ঐ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মাথা নীচু করে, তার স্বামীকে চাপা গলায় বলে, 'দেখো, ঐ লোকটা কী বিশ্রীভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি চিনিনা। তুমি চেনো নাকি?'

স্বামীটি অবশ্য কিছুই দেখতে পেলেন না; তবু চোখ তুলে বললেন, 'না, চিনিনা তো!'

মুখের রেখায় কিছুটা হাসি বজায় রেখেই রাগতঃ স্বরে বান্ধবী মন্তব্য করে, 'রাগে গা জ্বলে যায়। আমার সরবৎ খাবার মেজাজটাই নষ্ট করে দিলো।'

তার স্বামী কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন, 'পাত্তা দিওনা, ওর দিকে তাকিও না। ওসব নোংরা লোকের সঙ্গে ঝামেলা করতে গেলে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াতে পারে।'

কিন্তু ঠিক তখনই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ভাইকাউন্ট। তার চোয়াল কঠিন,—বেয়াদপের বেয়াদপি আর যে-ই সহ্য করুক, সে করবে না। পার্টিটাকে এ ভাবে নষ্ট হতে সে দিতে পারে না। তার মনে হলো অপমানটা তার গায়েই লাগছে; যেহেতু সে-ই আমন্ত্রণ করে এনেছে এই দুই মহিলা ও তাদের স্বামীকে। এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করার দায়িত্ব তারই, আর কারুর নয়।

পায়ে পায়ে সে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে, 'দেখুন মশাই, ঐ মহিলাদের দিকে আপনার দৃষ্টিকে একটু সংযত রাখুন। ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছি এবং আমার পক্ষে সত্যি হজম করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুপচাপ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকুন।'

'থামুন।' লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁজিয়ে ওঠে।

'সাবধান,' দাঁতে দাঁত চেপে ভাইকাউন্ট হুঁশিয়ার করে দেয়, 'আমাকে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করতে উত্তেজিত করবেন না। পরিণামটা সুখকর হবে না।'

লোকটি এর জবাবে এমন একটি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে, যা কোন রুচিশীল মানুষ সহ্য করতে পারবে না। আর সেই শব্দটা কাফের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনুরণন তোলে এবং এর অশালীন প্রভাবে সকলেই স্তম্ভিত ও কম্পিত।

যারা তাদের দিকে পিঠ দিয়ে ছিল, ঘুরে তাকায়, মাথা তুলে দেখে ঐ রকম একটা অভব্য মন্তব্যের উৎসকে।

তিনজন ওয়েটার যেতে যেতে ঐ খিস্তি শুনে লাট্টুর মতন পাক খায় ও ঘুরে তাকায়। কাউন্টারের পিছনে বসে থাকা দু'জন মহিলা শিউরে ওঠেন এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতন তাদের শরীরের ঊর্দ্ধাংশ কিছুক্ষণ দুলতে থাকে!

মুহূর্তের জন্য অখন্ড নীরবতা।

তারপরই বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয় একটা তীব্র আওয়াজ।

ভাইকাউন্ট প্রচণ্ড জোরে ঘুষি কষিয়েছে লোকটার কানে।—মারামারি থামাতে সকলেই ছুটে আসে। ভবিষ্যতের এক 'ডুয়েল' লড়াইয়ের সম্ভাবনা জন্ম নেয়। তারা দু'জনই পরস্পরের নাম-ঠিকানাসহ পরিচয়পত্র বিনিময় করে। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে মুলাকাৎ হবে।

ঘরে ফিরে স্নায়ু-জর্জর ভাইকাউন্ট কয়েক মিনিট উপর-নীচ কেবল পায়চারি করে বেড়ায়। রীতিমত উত্তেজনায় তার ভাবনার পরিধি কেবল একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত : 'ডুয়েল লড়তে হবে। ডুয়েল—'

নিজের স্বপক্ষে সে যেন শক্তি খুঁজে বেড়ায়। তার ভুলটা কোথায়? তার মতন লোক ঐটুকু সাহস দেখাবেই। লোকেরা এই নিয়ে বলাবলি করবে, তার প্রতি সমর্থন জানাবে, অভিনন্দিত করবে।

মানসিক রোগীর মতন চড়া গলায় আচমকা সে বলে ওঠে :

'শালা শিকারী কুকুর।'

কথাটা বলার পর সে বসে পড়ে এবং ঘটনাগুলিকে আবার মনে মনে পর্যালোচনার প্রয়াস পায়। আগামীকাল সকালে সে নিশ্চয় সম্ভাব্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাহায্যকারীদের নির্বাচিত করবে। কিন্তু কাদের উপর নির্ভর করা উচিত? 'ডুয়েল' এ সাহায্যকারী হিসেবে সবচেয়ে নির্ভরশীল ও খ্যাতিমানদের নাম সে একে একে মনে করতে থাকে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর দুটো নাম তার পছন্দ হয়,—মারকিউস্ দ্য লা তুর-নোর এবং কর্ণেল বুঁরদিন। প্রথমজন অভিজাত পরিবারের লোক, দ্বিতীয়জন সৈনিক। এ কাজে তাঁদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তাঁদের নামগুলি কাগজে দেখলে লোকেরাও নিশ্চিন্ত বোধ করবে।

ভাইকাউন্টের তেষ্টা পায়। পর পর তিন গেলাস জল সে পান করে। তারপর আবার উপর-নীচ পায়চারি। অসীম উৎসাহে বুক ভরে উঠেছে। যদি সে এই সাহসিকতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে, যদি সে তার মন স্থির-নিবিষ্ট রাখতে পারে, যদি সবচেয়ে ভয়াবহ ও কঠিন ডুয়েল লড়ার সময়ও এই মানসিক স্থৈর্যটুকু বজায় থাকে, তবে তার সাফল্য অনিবার্য এবং তা আরো সুদূর বিস্তৃত হবে।

লোকটার দেওয়া পরিচিতি-পত্রখানা সে তার পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখে। ঝুঁকে সেই নাম ও ঠিকানার উপর চোখ বুলিয়ে নেয়। কাফেতে দাঁড়িয়েই এক ঝলক দেখে নিয়েছিল, বাড়িতে ফিরবার পথে গাড়িতে বসে গ্যাসের আলোতে দ্বিতীয়বার পড়েছিল, এখন দেখছে তৃতীয়বার তার নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে।—

'জর্জ লা মিল, ৫১ রু মনসি।'

আর কিছু লেখা নেই।

সে ঐ ভাগ ভাগ করা অক্ষরগুলি পরীক্ষা করে। প্রতিটি অক্ষরের পিছনে বুঝি কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে আছে যেন কোন অর্থবহ ইঙ্গিত।

জর্জ লা মিল?

কে এই লোকটি? কি সে করে? কেন সে ঐ মহিলার দিকে অমন দৃষ্টিতে চেয়েছিল? কোন অজানা অচেনা লোক কি কখনো কোন ভদ্রমহিলাকে ঐভাবে চোখ মারে? ভাবনাটা বুকের মধ্যে কুরে কুরে খায়। আবার ভাইকাউন্ট চীৎকার করে ওঠে:

'শালা শিকারী কুকুর।'

আওয়াজ তুলেই তার যাবতীয় সক্রিয়তা পাথরের মতন কঠিন রূপ নেয়। মগজে শূন্যতা, দৃষ্টি নিবদ্ধ কার্ডখানার উপর। ক্রমশ তার স্নায়ুর ভাঁজে ভাঁজে এক প্রচণ্ড অস্বস্তির স্রোত বইতে থাকে। চিন্তাশক্তি একান্তই ভোঁতা। অদূরে পড়ে থাকা একটা খোলা ছুরি সে তুলে নেয় এবং অভাবনীয় হিংস্রতায় প্রতিপক্ষের পরিচিতি পত্রখানাকে সেই ছুরিতে বিদ্ধ করে।

অর্থাৎ, লড়াই হবেই।

কি সে বেছে নেবে—তলোয়ার না পিস্তল? কারণ, সে মনে করে, অপমানিত পক্ষ হিসেবে আয়ুধ বেছে নেবার হক তার আছে। তলোয়ারের লড়াইয়ে ঝুঁকি কম; কিন্তু পিস্তল বেছে নিলে হয়তো তার প্রতিপক্ষ ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে যাবে। তলোয়ার হাতে লড়াই হলে সাধারণতঃ মৃত্যু-ভয় বড় একটা থাকে না। অপর ধারে পিস্তল হাতে ডুয়েল লড়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নেওয়া।

কিন্তু এই মুহূর্তে সে পিস্তলকেই বেছে নিচ্ছে। তার এই সাহসিক সিদ্ধান্ত তাকে বিপুল সম্মান এনে দেবে; অথচ প্রতিপক্ষ হয়তো ভয়ে লড়াইয়ে সামিল হতে চাইবে না।

'আমার এই সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না,' সে উচ্চারণ করে, 'লোকটা ভয় পাবে।'

নিজের কণ্ঠস্বরেই কেমন যেন আঁতকে ওঠে সিগনলস্, তার গোটা শরীর বারেকের জন্য কেঁপে ওঠে, চারিদিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকায়। স্নায়ুর ওপর অস্বাভাবিক চাপ অনুভব করে। আর এক গ্লাস জল খায়। বিছানায় শুয়ে পড়বার আগে শরীর থেকে পোশাকগুলি খুলতে থাকে। বিছানায় শুয়েই বাতি নিভিয়ে দেয় এবং চোখ বন্ধ করে।

'কালকে গোটা দিনটাই আমি পাবো,' শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করে, 'তখন সবকিছু ঠিক করা যাবে। এখন আমার ঘুমের দরকার। ঘুম ছাড়া এই উত্তেজনার হাত থেকে রেহাই নেই।'

গরম কম্বলের তলায় শায়িত সে ; অথচ, ঘুম আসে না। কেবল এ-পাশ ও-পাশ করছে। পাঁচ মিনিট চিৎ হয়ে থাকবার পর বাঁকাথে শুয়েছে, তারপর ডানদিকে।

তখনো তার তৃষ্ণা মেটেনি। বিছানা ছেড়ে উঠে যায় জলের খোঁজে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে :

'আমি কি ভয় পেয়ে গেলাম ?'

কেন এই ঘরের প্রতিটি পরিচিত শব্দে তার হৃৎস্পন্দন কয়েক গুণ বেড়ে যায় ? ঘড়িতে শব্দ হওয়া মাত্র সে এমন আঁতকে ওঠে যে কিছুক্ষণ তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসই বন্ধ হয়ে যায়! এই অকল্পনীয় অসহায়তাকে সে যুক্তি দিয়ে অনুধাবনের প্রয়াস করে :

'আমি কি ভয় পাবো ?'

না, ভয় সে পাবে না। যেহেতু এই লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হয়েছে এবং ডুয়েল লড়তে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে লড়বে, ভয়ে কাঁপবে না। কিন্তু যত রাজ্যের বিহ্বলতা এসে চাপছে তার উপর। আবার সে ভাবে :

'ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একজন মানুষ কি এভাবে ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে ?'

সন্দেহ, অস্বস্তি ও ভয় সমবেতভাবে তার উপর আক্রমণ শানাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন কোন বিশাল শক্তি তার উপর কর্তৃত্ব করছে। সে নিজে অসহায়। কি করতে পারে ? অবশ্যই লড়াইয়ের ময়দানে যাবে। কিন্তু তখনও যদি এমন কম্পন না থামে ? যদি সে অজ্ঞান হয়ে যায় ?

সে একবার ঐ দৃশ্যের কথা ভাবছে, আর একবার ভাবছে তার এতদিনের সুনাম ও প্রতিষ্ঠার কথা।

বিচিত্র আচ্ছন্নতায় ধুঁকতে ধুঁকতে সে গিয়ে দাঁড়ায় আয়নার সামনে। মোমবাতি ধরায়। আয়নার দিকে চেয়ে আছে। আশ্চর্য! কাঁচের বুকে প্রতিবিম্বিত নিজেকে যেন সনাক্ত করতে কষ্ট হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে, ও বুঝি কোন অজানা লোকের প্রতিচ্ছবি।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে নিজের প্রতিরূপ দেখছে। চোখ-মুখ ফ্যাকাসে, অত্যন্ত পান্ডুর। আয়নার সামনে বহুক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। গলা চিরে কোন আওয়াজ বের হয় না। হঠাৎ বুলেটের মতন একটা চিন্তা ছুটে এসে তাকে আঘাত করে।

'কাল, ঠিক এই সময়, হয়তো আমি বেঁচে থাকবো না!'

ভীষণভাবে তার বুক কাঁপতে থাকে।

'কাল, ঠিক এই সময়, হয়তো আমি বেঁচে থাকবো না!' এই যে লোকটি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, আয়নার ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে, আগামীকাল চিরদিনের মতন হারিয়ে যাবে।

কেন আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি? কেন নিজের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছি ? কারণ, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার প্রাণশূন্য দেহটা ঐ বিছানার উপর লুটিয়ে থাকবে, চোখের পাতা নিশ্চল, সমস্ত শরীর হবে হিম ও কঠিন।

ইস্তক ভাবনায় দুলতে দুলতে ভয়াল দৃষ্টিতে সে তার বিছানার দিকে তাকায়। সেখানে যেন দিব্যদৃষ্টিতে নিজের প্রাণহীন দেহটাকে পড়ে থাকতে দেখে। অসহ্য

মানসিক যন্ত্রণায় তার মুখ ঝুলে পড়ে, হাত দুটো আলগা আলগা,—যেন এই হাত দিয়ে কোনদিন কোন কাজ সে আর করতে পারবে না।

তখন সে তার বিছানাকে ভয় করতে শুরু করেছে। বিছানার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। ত্রস্তে এ ঘর ছেড়ে অন্য এক ঘরে ঢোকে। সেখানে গিয়ে একটা সিগ্রেট ধরায়। পায়চারি করে। শীত শীত অনুভূতি। একবার ভাবে বেল বাজিয়ে তার খানসামাকে ডেকে তুলবে। কিন্তু বেল বাজাতে গিয়েই নিরস্ত হয়—'না,থাক, জেগে উঠবে সে, দেখবে, আমি কত ভীরু।'

ফায়ার-প্লেসের সামনে বসে কিছুক্ষণ তার হাত গরম করে। কোন কিছু স্পর্শ করলেই মাথার ভেতরটা এলোমেলো হ'য়ে যায়! নিজেকে মনে হয়, মাতাল-মাতাল, যদিও সে এখন নেশা করেনি।

বার বার একই দুশ্চিন্তা মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে:

'আমি কি করবো? আমার কি হবে?'

টলতে টলতে সে জানালার কাছে গিয়ে পর্দাগুলি সরিয়ে দেয়।

তখন উষা-লগ্ন। রক্তাভ আকাশ ছুঁয়ে আছে শহরকে, শহরের প্রতিটি বাড়ির ছাদ ও প্রাচীরকে। সূর্যের সেই ক্রমঃপ্রস্ফুটিত কিরণ-আভা ঘুম ভাঙাচ্ছে পৃথিবীর।

প্রথম বেলার সেই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ভাইকাউন্ট। সে অনুভব করে, তার বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছে সাহস ও প্রত্যয়ে। অথচ, একটু আগে তার ভেতরে অমন পাগলামি প্রশ্রয় পাচ্ছিলো কেন। কোন কিছু স্থির করার আগেই, জর্জ লা মিল আদৌ লড়তে রাজি আছে কিনা জানবার আগেই, সে এমন ভেঙ্গে পড়েছিল কেন?

ভাইকাউন্ট মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড়ে ফিটফাট হয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। তখন সে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকেই বলে: 'আমাকে সাহসী হতে হবে, উৎসাহী হতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, ভীরু আমি নই।'

ডুয়েল লড়ার দুই সাহায্যকারী মারকিউস এবং কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করলো সে, ডুয়েল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনাও হলো। কোন্ কোন্ শর্তের উপর এই লড়াই হবে, সে সম্পর্কে ভাইকাউন্টের অভিমত তাঁরা সংগ্রহ করেন।

কর্ণেল জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এমন একটা ভয়াবহ ডুয়েলে আগ্রহী?'

ভাইকাউন্ট জবাব দেন, 'নিশ্চয়, খুবই আগ্রহী।'

মারকিউস বলেন, 'পিস্তলকেই বেছে নিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'অন্য কি সব শর্ত রয়েছে?'

শুকনো কাঁপা গলায় ভাইকাউন্ট ব্যাখ্যা করে, 'দু'জনের মধ্যে ব্যবধান থাকবে কুড়ি পা। হাত তুলে সিগন্যাল দেওয়া হবে এবং হাত নামানো চলবে না। যে কোন একজন গুরুতরভাবে আহত না হওয়া পর্যন্ত গুলি বিনিময় চলবে।'

'নিখুঁত নিয়ম,' প্রশান্ত গলায় কর্ণেল মন্তব্য করেন, 'এই লড়াইতে আপনার জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশী। কারণ, গুলি চালাতে আপনার পটুত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

তাঁরা দু'জন চলে গেলেন।

ভাইকাউন্ট বাড়ি ফিরে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

এই সময় ধীরে ধীরে আবার তাকে বিহ্বলতা পেয়ে বসে। সে এক অদ্ভুত অবিরাম কম্পন অনুভব করে তার হাতে, পায়ে, বুকে। কোন জায়গাতেই সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে পারছে না।...

প্রাতরাশের ইচ্ছা সত্ত্বেও সে কিছু খেতে পারে না। তখন সে মনে মনে পরিকল্পনা আঁটছে, মদ খেলে হয়তো সে তার সাহস খুঁজে পাবে। সেইমত এক ডিকেন্টার রাম আনিয়ে নেয়। এক গেলাস, দু' গেলাস করে করে সে দু'বোতল রাম খেয়ে ফেলে। এ্যালকহলের প্রভাবে তখন দ্রুত তার শরীরে উত্তেজনার সঞ্চার হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন আগুনের স্রোত নামতে থাকে অকস্মাৎ উৎসাহের ঘূর্ণিতে সে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

'এখন জানি, আমার কী করণীয়', সে চিন্তা করে 'আমার আর কোন দুর্বলতা নেই।' কিন্তু এই উৎসাহের পরমায়ু মাত্র এক ঘন্টা। এক ঘন্টা পরে ডিকেন্টারটা শূন্য, আবার সেই অসহনীয় ভয় ও অস্থিরতা। সে কিন্তু বুঝতে পারছে, এ সময় তার কতখানি বন্য সাহসিক মানসিকতা দরকার। কিন্তু কিছুতেই সেই দৃঢ়তাকে সে ধরে রাখতে পারছে না। কিছুতেই নয়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনায়।

এমন সময় বাইরে বেল বেজে উঠলো। সেই শব্দে দারুণ চমকে ওঠে ভাইকাউন্ট। চমকের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক—কিছুক্ষণ তো সে চুপচাপ বসেই থাকে, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেবার শক্তিও যেন তার নেই।...

এসেছেন তার দুই সাহায্যকারী—মারকিউস ও কর্ণেল।

ভাইকাউন্টের বিহ্বল দৃষ্টি তাঁদের মুখের উপর। সৌজন্যসূচক 'শুভ সন্ধ্যা' সম্ভাষণটুকু জানাতেও সে যেন অপারগ।

'আপনার শর্তানুযায়ী সব ঠিক করে এলাম', কর্ণেল বললেন, 'প্রথমে আপনার প্রতিপক্ষ নিজেকে 'অপমানিত পক্ষ' হিসেবে দাবী করেছিল। অবশ্য পরক্ষণেই আমাদের যুক্তি সে মেনে নেয়। আপনার প্রতিটি শর্ত সে মেনে নিয়েছে। তার সাহায্যকারী হবেন দু'জন সামরিক বিভাগের লোক।'

'আপনাদের ধন্যবাদ।'—ভাইকাউন্ট উচ্চারণ করে।

'মাপ করবেন,' মারকিউস বলতে শুরু করেন, 'আমরা শুধু এলাম আর ব্যাপারটা দেখে চলে গেলাম—তা করলে তো চলবে না। আরো অনেক কিছু করার আছে। যেমন ধরুন, আমাদের একজন খুব ভালো ডাক্তারকে নিয়ে যেতে হবে! কারণ, পিস্তলের বুলেট তো আর হাসির বস্তু নয়, যে কোন একজন গুরুতর আহত হবেই। দ্বিতীয়তঃ, লড়াইয়ের ময়দানের কাছাকাছি যেন কোন বাড়ি থাকে। আমরা যেন চট করে আহত লোকটিকে ঐ বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি।

আরো টুকিটাকি অনেক কিছু দেখার ও করার আছে। ঐ সব সারতে দু'তিন ঘন্টা সময় তো লাগবেই।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।' —ভাইকাউন্ট দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' কর্ণেল জিজ্ঞেস করেন, 'কোন অস্থিরতা নেই তো?'

'ভালোই আছি। ধন্যবাদ।'

তাঁরা দু'জনে বিদায় নেন।

আবার একাকীত্ব। সে তার সুস্থতা হারাচ্ছে। বাড়ির চাকর বাতি ধরিয়ে দিয়ে গেছে। টেবিলের সামনে ভাইকাউন্ট চিঠি লিখতে বসে। দু'চারবার কলমটা নাড়া-চাড়া করার পর কাগজ খণ্ডের মাথায় লিখে ফেলে:

'এই আমার দলিল।'

অক্ষর ক'টা লিখবার পরই স্নায়ুর চাপে তার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সরে আসে অনেকটা দূরত্বে। সে কিছুতেই তার দুশ্চিন্তাকে বাগে আনতে পারছে না। নিতে পারছে না কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

সুতরাং ডুয়েল লড়তেই সে চলেছে। এই সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় তার হাতে নেই। ...আসলে তার ইচ্ছেটা কি? লোকেরা তো বলবে, সে লড়তেই চেয়েছিল। কারণ, ভাইকাউন্টই প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্বে আহ্বান জানিয়েছে, এমন কি, লড়াইয়ের শর্তগুলিও সে স্থির করেছে। এখন তো কোনরকম মানসিক ভারসাম্য হারালে চলবে না। সে ডুয়েলের ছবিটাকে মনে মনে আঁকবার চেষ্টা করে, ভাববার চেষ্টা করে, তার প্রতিপক্ষ কিভাবে আক্রমণ শানাতে পারে?

যত চিন্তা করে, ততই অস্থিরতা বাড়ে। দাঁতে দাঁত ঘর্ষণের শব্দ হয়।

এরপর সে চেতুভিলার্ডের ডুয়েল সম্পর্কীয় গাইড বুকখানার পাতা ওল্টাতে থাকে। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে: আমার প্রতিপক্ষ কি নিয়মিত শুটিং গ্যালারিতে যায়?

সে কি বেশ পরিচিত লক্ষ্যবিদ? আমি কি ওর নামটা খুঁজে দেখবো?

কথাটা মনে আসা মাত্র সে ব্যারণ ভ্যাক্সের বইখানার কথা স্মরণ করে। কিন্তু ঐ বইটার প্রতিটি পাতা ঘেঁটেও জর্জ লা মিলের নাম খুঁজে পেল না। কিন্তু লোকটা যদি যথেষ্ট দক্ষ পিস্তলচালক না হতো, তবে এই ডুয়েলে কখনোই রাজি হতো না।

বইটা বন্ধ করে ভাইকাউন্ট একটি পিস্তল তুলে নেয়।দৈবের বিচিত্র বিধান অথবা তার অন্যমনস্কতায় পিস্তলটাতে গুলি লোড করা হয়েছে। সে ঐ পিস্তলটা তুলে লক্ষ্যভেদের নানারকম মক্সো করে। কিন্তু তার শরীর কাঁপছে, হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে...। বিরক্তি ও ভয়ের সঙ্গে সে বলে:

'না, এ অবস্থায় ডুয়েল লড়া যায় না।'

সে পিস্তলের নলের মধ্য দিয়ে তাকায়—সংকীর্ণ ও গভীর পথ, যা মৃত্যুর সংকেত জানায়।.... সে ঐ নলের মধ্য দিয়ে চেয়ে আছে, চেয়েই আছে। শরীর রোমাঞ্চিত, কি এক ধরনের বন্য উল্লাসে মন নাচে।....

মগজ যদি ঠাণ্ডা না থাকে, ডুয়েল লড়া যায় না। যতই অভিজ্ঞতা থাকুক দক্ষতা থাকুক, সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো মানসিক স্থৈর্য। এবং সে সেই স্থৈর্য হারিয়ে

ফেলেছে। সে এটা জানে। বুঝতে পারছে। অথচ, উপায় নেই। তারই প্রস্তাবে ডুয়েল। লোকচক্ষে সে বীর, যেহেতু....।

পিস্তলটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে সে। বিজাতীয় হিংস্রতায় সে মুখব্যাদান করে এবং ব্যারেলের উপর চোখ রেখেই অকস্মাৎ ট্রিগারে আঙুলের চাপ দেয়।

আওয়াজ শুনে খানসামা ছুটে আসে। তার দৃষ্টির সামনে উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে ভাইকাউন্টের প্রাণহীন দেহটা। রক্তের ধারা বইছে একখণ্ড সাদা কাগজের উপর, যেখানে লেখা রয়েছে:

'এই আমার দলিল।'

একটি সত্যি কাহিনী

A true Story

মাঝামাঝি রকমের ঝড় কপাটে ধাক্কা দিয়ে বয়ে গেল। শারদীয় বাতাস বিলাপ করে. বাড়ির চারপাশে তা নর্তনরত। গাছের শেষ পাতাগুলিও ঝরছে এবং দমকা বাতাস সেই ঝরাপাতাগুলিকে ঠেলে নিয়ে যায় মেঘের দিকে।

শিকারীর দল তাঁদের ডিনার প্রায় শেষ করে এনেছেন। তখনো তাঁরা তাঁদের রঙদার মেজাজ নিয়ে প্রাণবন্ত, আনন্দে উত্তেজিত।

ওঁরা জাতিতে নর্মাণ; জমিদার ও জোতদারের মাঝামাঝি সম্প্রদায়ের লোক; গাঁয়ে মোড়লিও করেন, চাষবাসও করেন; আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল, দেহে বলও যথেষ্ট-প্রতিযোগিতায় নেমে ষাঁড়ের শিং ভাঙ্গতে পারেন।

সারাটা দিন ধরে তাঁরা এপারভিলার মেয়র মৈত্রি ব্লন্দেলের জমিতে গুলি ছুঁড়েছেন। এখন আমন্ত্রণকারী মেয়রের খামার বাড়িতে খাবার টেবিলকে ঘিরে বসে আছেন।

সাধারণ লোকের মতনই চড়া গলায় তাঁরা কথা বলছেন; তাদের হাসি বন্যজন্তুর গর্জনের মতন; মাল টেনে টেনে এক একজন তাঁর পেটটাকে চৌবাচ্চা বানিয়ে ফেলেছেন। টেবিল-ক্লথের উপর কনুই ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। আলোতে চকচক করছে তাঁদের চোখ। বিশাল অগ্নিকুণ্ড গরম রাখছে তাঁদের শরীর এবং ঐ অগ্নিকুণ্ডের রক্তাভ আভা ঘরের ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যাবৎ তাঁদের গল্পের বিষয়বস্তু হলো লক্ষ্যভেদ ও কুকুর; কিন্তু তারা বর্তমানে এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছেন, যখন অন্য আরো অনেক ভাবনা তাঁদের অর্ধমাতাল মগজে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি এসে এখন পড়েছে মস্ত থালা হাতে পরিবেশনরত স্বাস্থ্যবতী যুবতী পরিচারিকাটির উপর।

হঠাৎ পশুর ডাক্তার সমর্থদেহী সেঁজুর, যিনি একসময় ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছিলেন, উঠে দাঁড়ান এবং বলেন:

'হা ভগবান! ব্লেন্দলের মালটি তো খাসা! মনে হচ্ছে, ঐ চঞ্চলা বালিকার উপর এখনো কোন মধুমক্ষিকা বসেনি।'

সেঁজুরের মন্তব্যে সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। সেই হট্টগোলের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় একজন বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত লোকের দিকে। নাম—মঁসিয়ে দ্য ভারনেট। মদ্য পান না করা হেতু তিনি এখন অন্য সকলের থেকে পৃথক । সকল আওয়াজকে স্তিমিত করে তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়:

একসময় আমি ঐ রকম একটি মেয়ের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম। গল্পটা আজ তোমাদের অবশ্যই বলবো। সে কথা ভাবলে প্রথমেই মনে পড়ে যায় আমার পোষা মাদিকুকুর মির্জার কথা। মির্জাকে আমি বেচে দিয়েছিলাম কমট দ্য হঁসোনেলের কাছে। প্রতিদিন চেন খোলা পেলেই সে ছুটে চলে আসতো আমার কাছে। আমাকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে খুব কষ্টকর ছিল। শেষ পর্যন্ত আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। হঁসোনেলকে বললাম, সব সময় কুকুরটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে। তার পরিণামটা কি হলো জানো? দুঃখে মারা গেল কুকুরটা।

কিন্তু আমার আসল গল্প এটি নয়। আসল গল্প হলো আমার যুবতী ঝিকে নিয়ে।

তখন আমার বয়স বছর পঁচিশ। অবিবাহিত জীবন কাটাচ্ছি আমাদের জমিদারী সম্পত্তি ভিলিবনে। তোমরা নিশ্চয় বোঝ,—যে যুবকের পয়সা আছে এবং একা থাকে, প্রতি রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সে কেমন বিষণ্ণ বোধ করে। তার চোখ স্বভাবতই চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেললাম, ক্যানভিলির দেব্যুলতের বাড়িতে একটি কমবয়সী ঝি কাজ করছে। নাম রোজ। ব্লন্দেল, তুমি নিশ্চয় দেব্যুলতকে চেনো, তাই নয়?...আসল কথা, মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হ'য়ে গেল। একদিন ওর মনিবের সঙ্গে দেখা করে নিজের বাসনার কথা জানালাম। তিনি রাজী হলেন, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। শর্তানুযায়ী তিনি তাঁর পরিচারিকাটিকে পাঠিয়ে দিলেন আমার বাড়িতে, আর গত দু'বছর ধরে দেব্যুলতের লোভ ছিল যে প্রাণীটির উপর, আমার সেই কালো ঘোটকীটাকে তাঁর কাছে বেচে দিলাম তিনশ'টি ক্রাউনের বদলে।

প্রথম প্রথম খুবই মজাতে ছিলাম। কেউ কিছু সন্দেহই করতে পারেনি। শুধু একটা কথা ...রোজের সোহাগ জানানোটা সময় সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। আমি জানি, ও ঠিক নীচু ঘরের সাধারণ মেয়ে ছিল না। ওর মার সঙ্গে কোন এক সম্ভ্রান্ত মনিবের অবৈধ মেলামেশার ফলশ্রুতি সে।

মোদ্দা কথা রোজ তখন আমাতে খুব মজেছে, একেবারে চোখে হারায়। সে আমাকে আদর করে, খোশামোদ করে, এবং সময় সময় ভাবাবেগে উথলে এমন সব কান্ড করে যেন আমি তার ছোট্ট পোষা কুকুরটি। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অনেকদূর গড়াতে পারে ভেবে প্রায়ই আমার ভয় হতো।

নিজেকেই নিজে বলি, 'এভাবে বেশীদিন চলতে থাকলে নির্ঘাৎ ফাঁদে জড়িয়ে পড়বো!' কিন্তু সহজে জড়িয়ে পড়ার পাত্র আমি কোনদিনই নই। গোটাকতক চুমু

খেয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে রসাতলে ঠেলবো, এমন মূর্খ আমি নই। আসলে সে যতই ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করুক না কেন, আমার দৃষ্টি সব সময় সজাগ।

দুম্‌দাম্ শব্দ করে সে আসে। তখন আমার মনে হয়, কে বুঝি আমার বুক লক্ষ্য করে পর পর গুলি বর্ষণ করে চলেছে। এবং সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে চুমু খেতে থাকে; সে খিল খিল করে হাসছে, নাচছে, উল্লাসে সুন্দর মাথা দোলাতে থাকে। এমনটিই সে করে থাকে প্রতিদিন।

রাতে আমি ভাবি, 'ওর সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয়। কিন্তু চূড়ান্ত খারাপ কিছু হবার আগেই আমি অবশ্য তাকে এড়িয়ে যাবো। এবং সেই এড়িয়ে যাবার এই তো উপযুক্ত সময়।'

আমার বাবা ও মা তখন বাস করছেন বার্গেভিলিতে, আমার বোন তাঁর স্বামীসহ বাস করছে রোলিবিতে; আমি ওঁদের কাছে এভাবে ছোট হতে পারি না।

কিন্তু কিভাবে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি? যদি সে আমার ঘর ছেড়ে চলে যায়, লোকের মনে সন্দেহ দানা বাঁধবে এবং তারা আমার সম্পর্কে নানা রকম মুখরোচক আলোচনাও করবে। আর যদি আমি তাকে এই বাড়িতেই ধরে রাখি, তবে একদিন ঝোলা থেকে বিড়াল লাফিয়ে পড়বে। অথচ এভাবেও তো তাকে চলতে দিতে পারি না।

আমি আমার কাকা ব্যারণ দ্য ক্লিটুঁইলের সঙ্গে দেখা করে এই ব্যাপারে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করলাম। কাকা অভিজ্ঞ লোক, জীবনে এই জাতীয় একাধিক সমস্যা তিনি অনায়াসে অতিক্রম করে এসেছেন।

আমার কথা শুনে নির্বিকার গলায় বললেন:

'ঝিনিকে বিয়ে দিয়ে দাও।'

আমি লাফিয়ে উঠি।

'বিয়ে দেবো, কাকা! কিন্তু কার সঙ্গে?'

কাকা কিন্তু নিশ্চিন্তে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'যাকে তোমার ইচ্ছে। সেটা তো তোমার ব্যাপার, আমার নয়। যদি তুমি বোকা না হও, খুঁজে একজনকে পাবেই।'

আমি সপ্তাহখানেক ধরে তাঁর উপদেশ নিয়ে ভাবলাম। তারপর আপন মনেই বলে উঠি: 'কাকা ঠিকই বলেছেন!'

সুতরাং, শুরু হলো আমার পাত্রের সন্ধান। সন্ধান দিলেন স্থানীয় এক বিচারক। মাদার পাওমেলির ছেলেই হতে পারে সেই পাত্র। বদ ছেলে, টাকার জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি হবে।

মাদার পাওমেলিও ধূর্ত ও লোভী বৃদ্ধা। একটি ক্রাউনের জন্য সে নিজের আত্মাকেও বিক্রি করতে পারে। এখন ছেলের বিয়ের সুবাদে মোটা কিছু কামিয়ে নেবার তালে আছে।

আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু বললাম এবং প্রস্তাবটিও রাখলাম।

আমার কথা শেষে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে: 'তা মেয়েটাকে বিয়ের সময় দেবেটা কি?'

খুব সেয়ানা বুড়ি। কিন্তু আমিও তো বোকা নই। প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম।

আমার তখনকার আবাস থেকে অনেকটা দূরত্বে ছয় একর জমির তিনটি প্লট ছিল: চাষীরা আগে ঐ জমির দূরত্বের জন্য অভিযোগ করতো। সম্প্রতি আমি সেখানে ছোট্ট একটি ঘর তৈরী করেছি খামার বানাবো বলে। এখন বিপাকে পড়ে স্থির করলাম, যৌতুক হিসেবে রোজকে আমি খামারটা দিয়ে দেবো।

বুড়ি কিন্তু খুশি হলো না। যেন যৌতুক হিসেবে খামারটা যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমিও এর চেয়ে বেশী কিছু দিতে রাজি নই। এবং কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে সেই রাত্রির মতন আমি বিদায় নিলাম।

তার পরদিন খুব ভোরে ছোকরাটি স্বয়ং এসে হাজির। আমার ঠিক মনে নেই, তাকে তখন কেমন দেখাচ্ছিলো। তাকে দেখেই বুঝলাম, মন গলেছে। চাষীর মতনই চেহারা। কিন্তু স্বভাবটা খুব নোংরা।

সে গোটা ব্যাপারটাকেই ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছে। প্রথমেই এমন একটা ভাব দেখালো, যেন সে গরু কিনতে এসেছে!

আমার সম্পত্তি দেখতে চাইলো। আমি তাকে জমি দেখাতে নিয়ে গেলাম। হারামজাদাটা আমাকে সেখানে পুরো তিনটে ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলো; পকেট থেকে ফিতে বের করে গোটা জমিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাপলো।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ফার্নিচার কি দেবেন? দিচ্ছেন নিশ্চয়।'

'মোটেই নয়', আমি প্রতিবাদ জানাই, 'এই ফার্মটা যে দিচ্ছি তাই যথেষ্ট।'

'যথেষ্ট নয়,' তার স্বর বিদ্রূপে শানিত, 'শুধু তো ফার্ম দিচ্ছেন না, হয়তো মেয়ের পেটে একটা বাচ্চাও দিচ্ছেন।'

লজ্জায় আমি লাল হ'য়ে উঠি। কিন্তু নিরুত্তর থাকি।

'শুনুন'। সে বলতে থাকে, 'আপনাকে দিতে হবে বিছানা-পত্তর, একটা টেবিল, একটা ড্রেসিং টেবিল, তিনটে চেয়ার, আর বাসন-কোসন!'

রাজি হ'য়ে গেলাম।

ফেরার পথে আর একটিবারও পাত্রী সম্পর্কে কিছু বললো না। কিন্তু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা ধরুন, পাত্রী মারা গেল। তখন ঐ সম্পত্তি কে পাবে?'

'কেন তুমি পাবে'—আমি জবাব দেই।

এটাই হয়তো সে এতক্ষণ ধরে জানতে চাইছিলো। এই মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হ'য়ে খুশিতে হাত বাড়িয়ে সে আমার সঙ্গে করমর্দন করে। আমরা এখন একমত।

কিন্তু হায়! রোজকে ঐ বিয়েতে মত করানো যে কি ঝকমারি ব্যাপার! সে আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে, বার বার করুণ স্বরে বলে, 'তুমি একথা বলছো! তুমি!'

এক সপ্তাহ ধরে সে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। বিয়ে সে করবে না। আমি তাকে বোঝাবার কম চেষ্টা করিনি। মেয়েরা বড় বিচিত্র জীব। একবার মগজে প্রেম

ঢুকলে, দুনিয়ার আর কিছুই তারা ভাবতে পারে না। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। সব কিছুর আগে প্রেম অথবা প্রেমের জন্যই সব।

শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তাকে বাড়ির বাইরে বের ক'রে দেবো বলে শাসাই। শেষ পর্যন্ত সে রাজি হলো বটে, কিন্তু শর্ত দিলো—বিয়ের পর সুযোগ পেলেই সে যেন আমার কাছে আসতে পারে। এ বাড়ির দরজা তার জন্য খোলা রাখতেই হবে।

আমি নিজে তাকে গির্জায় নিয়ে গেলাম। বিয়ের খরচ আমিই বহন করলাম, বিয়ের পর ভোজও হলো আমার পয়সায়। সমস্ত কিছুই হলো প্রথানুযায়ী। তারপর সেই কথা: বিদায়, বাছারা! সুখী হও।

রোজকে বিয়ে দিয়েই দু'টি মাসের জন্য আমি ঐ বাড়িতে ছিলাম না। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে অন্যত্র ছিলাম।

তারপর দু'মাস বাদে ফিরে এসে শুনি, রোজ নাকি প্রতি রবিবার এই বাড়িতে এসেছে এবং আকুল হ'য়ে আমার কথা জানতে চেয়েছে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে এলো। তার কোলে একটি রুগ্ন বাচ্চা। তোমরা বিশ্বাস করো বা না করো, ঐ শিশুটিকে দেখেই আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এবং শিশুটিকে আমি 'সেই বিশ্বাস ও মমত্বে' চুম্বন করলাম।

মা হবার পর রোজের চেহারা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে—হাড়সর্বস্ব শরীর, আগের জলুস নেই, এখন সে একটা ছায়া মাত্র। বিবাহিত জীবনে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

'তুমি সুখী?'—যান্ত্রিক গলায় আমি জিজ্ঞেস করি।

এই কথায় সে ঝর্ণা-স্রোতের মতন কেঁদে ওঠে। 'আমি মারা যাবো। আর পারছি না।'

চীৎকার করে পরিবেশটাকে সে ঘোরালো করে তুললো। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম তাকে শান্ত করতে। তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

দেখলাম, তার স্বামী তাকে নিয়মিত প্রহার করে থাকে এবং তার বুড়ি শ্বাশুড়ি জীবনটাকে আরো দুর্বিসহ ক'রে তুলেছে।

দু'দিন পর আবার সে এলো। আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় মাটিতে শুইয়ে দেয়, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তোলে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমাকে মেরে ফেলো! মেরে ফেলো! আমি আর ওখানে যাবো না!'

আমি তার করুণ বিলাপের মধ্যে যেন আমার কুকুর মির্জার আর্তি শুনতে পেলাম।

ঘাবড়ে গিয়ে আরো দু'মাসের জন্য ডুব দিলাম। তারপর যখন ফিরে এলাম—ততক্ষণে সব শেষ। আমি আসবার তিন সপ্তাহ আগে সে মারা গেছে। মারা যাবার আগে প্রতি রবিবার সে আমার শূন্য বাড়িতে একবার করে আসতো আমাকে দেখতে পাবার আশায়।...ঠিক মির্জার মতো। ...সে মারা যাবার আটদিনের মাথায় তার বাচ্চাটাও মারা গেছে।

আর তার বদমাইশ স্বামীটি যথারীতি সমস্ত সম্পত্তিটাই গ্রাস করেছে। তবে, হ্যাঁ, সে কিন্তু ঐ ফার্মটাকে কাজে লাগিয়েছে, তার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এবং আমার

ঐ দানকে কাজে লাগিয়েই আজ সে একজন গণ্যমান্য পৌরসদস্য। এইটুকুই আমার পুরস্কার।

গল্প শেষ হতেই মেয়র হেসে উঠলেন, 'সে যাই হোক, ওর এই বর্তমান সৌভাগ্যের মূলে আমারও অবদান আছে।'

এবং পশুর ডাক্তার সেঁজুর ব্র্যাণ্ডির গেলাসে চুমুক দিয়ে গম্ভীর গলায় উপসংহার টানলেন, 'যে যা খুশি বলতে পারো ; আদতে এই পৃথিবীতে ঐ ধরনের মেয়েমানুষের কোন স্থান নেই!'

জনক

The father

শিক্ষামন্ত্রকের চাকুরে ফ্রানসোস্ তেঁসার প্রতিদিন সকালে বেটিগনোলেস্ থেকে বাসে চেপে অফিস করতে যেত। যাবার পথে প্রতিদিনই সে একটি যুবতীকে দেখতে পায় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সে ঐ যুবতীর প্রেমে পড়ে যায়।

মেয়েটিও প্রতিদিন ঐ সময় একই বাসে চেপে একটি দোকানে কাজ করতে রওনা দেয়। তার ছোটখাটো শরীর, রং কালো ; চোখের মণি দুটো এমন কালো যে মনে হয় বুঝি দুটো পিচের বল সেখানে বসানো রয়েছে। রাস্তার এক কিনারে সে দাঁড়িয়ে থাকে। বাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট পা ফেলে সে ছুটে যায়, শূন্য আসন পেলে বসে পড়ে এবং চার দিকে আলতো দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। ফ্রানসোস্ মুগ্ধদৃষ্টিতে সব লক্ষ্য করে। সে প্রথম দর্শনেই ওর প্রেমে মজেছিল। এক একটা মেয়ের শরীরে এমন মাদকতা থাকে যে, দেখলেই মনে হয় জড়িয়ে ধরি। এই মেয়েটির শরীরে সেই হাতছানি, সেই স্বপ্নঘন আবেদন।

নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করেও ফ্রানসোস্ ওর দিকে না তাকিয়ে পারে না। তার দৃষ্টির তীব্রতায় মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ফ্রানসোস্ চেষ্টা করে, চোখ তুলে নিতে পারে না।

কিছুদিনের মধ্যেই তারা আর পরস্পরের কাছে অপরিচিত থাকে না। অবশ্য কোনরকম বাক্যালাপ তখনো হয়নি তাদের মধ্যে। যখন অস্বাভাবিক ভিড়ের জন্য মেয়েটি বাসে বসবার সিট পায় না, ফ্রানসোস্ নিজের আসন তাকে ছেড়ে দিয়ে ভিড়ের চাপ সহ্য করে। যুবতী স্মিত হেসে কৃতজ্ঞতা জানায়। ফ্রানসোসের দৃষ্টির তীব্রতায় সে লজ্জা পায়, কিন্তু বিরক্ত হয় না।

অবশেষে তাদের বাক্যালাপ শুরু হয়। প্রতিদিন আধঘন্টার ঘনিষ্ঠতায়, ভাবের আদান-প্রদানে বন্ধুত্ব তাদের রীতিমত প্রগাঢ়। সেই আধঘন্টা দিনের মধ্যে সবচেয়ে সুখকর সময়। বাকি সারাটা দিন সে শুধু ঐ সুন্দরীর কথাই ভাবে, অফিসে কাজের

চাপের মধ্যেও সে তার অনুপম সৌন্দর্য ও সাহচর্যের স্মৃতিকে বুকে জড়িয়ে রাখে। সে মনে করে, ঐ মেয়েটিকে লাভ করলে সে এক অপার্থিব সুখের জগতে প্রবেশ করবে।

যুবতী যখন প্রতিদিন করমর্দন করে, তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে; সেই স্পর্শসুখটুকু সারাটা দিন তাকে যেন সম্মোহিত করে রাখে। সে কল্পনা করে, সুন্দরীর ছোট ছোট আঙুলগুলির ছাপ যেন এখনো তার চামড়ায় আঁকা রয়েছে। বাসে উঠবার মুহূর্তটির জন্য তার ব্যাকুল প্রতীক্ষা। তাই ছুটির দিন রবিবার তার কাছে অসহ্য মনে হয়।

মেয়েটিও নিশ্চয় তার প্রেমে পড়েছে। কারণ, এক শনিবার সে কথা দিল, পরের দিন ফ্রানসোসের সঙ্গে সে ডিনার খেতে যাবে 'ম্যাসনস্-লাফিত্তি'তে।

তার পরদিন রবিবার, ফ্রানসোস্ স্টেশনে পৌঁছে দেখে মেয়েটি তার আগেই সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে। সে অবাক হয়।

কিন্তু মেয়েটি বলে, 'দেখুন যাবার আগে আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। আমাদের হাতে কুড়ি মিনিট সময় আছে। কম নয়।'

বলতে গিয়ে মেয়েটি কেঁপে ওঠে, তার হাত দোলে, দৃষ্টি নত এবং চিবুক লাল।

'আপনি কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না,' সে বলতে থাকে, 'আমি নষ্ট চরিত্রের মেয়ে নই। আগে কথা দিন, আপনি আমার এমন কিছু করবেন না, যাতে আমি বিব্রত বোধ করতে পারি। যদি কথা দেন, তবেই যাবো।'

কথাটা বলেই সে নীরব। ফ্রানসোস্ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, এই মুহূর্তে তার কি জবাব দেওয়া উচিৎ। সে খুশি বোধ করছে, আবার হতাশও হচ্ছে। এমনটিই তো আশা করা যায়।...কিন্তু সেই সঙ্গে দুরন্ত স্বপ্নভঙ্গের হতাশা।...এ কথা তো ঠিক, মেয়েটি সহজলভ্যা নয় বলেই এত আকর্ষণীয়া। অথচ, তার মনের নিভৃতে প্রতিপালিত হচ্ছে সেই সমস্ত কামনা, যা প্রেমের সুযোগে পুরুষরা আদায় করে নেবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

ফ্রানসোস্‌কে নিশ্চুপ দেখে যুবতীর ভয় হয়, ছলছল চোখে আবেগে সে বলে, 'আপনি যদি আমার সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দেন, আমাকে তবে ফিরে যেতে হবে।'

ফ্রানসোস্ সস্নেহে তার হাত ধরে, 'আমি কথা দিচ্ছি। আপনার অমত থাকবে এমন কিছুই আমি করবো না।'

সে যেন নিশ্চিন্ত হয়, মৃদু হেসে বলে, 'ঠিক তো?'

ফ্রানসোস্ তার চোখের গভীরে ডুব দিয়ে বলে, 'প্রতিজ্ঞা করছি।'

'তা হলে চলুন, টিকিট কাটা যাক।'

ট্রেনের কামরা লোকজনে ঠাসা। সেখানে তাদের বিশেষ কোন কথাবার্তা হয় না। ম্যাসনস্-লাফিত্তিতে পৌঁছে তারা হাঁটতে থাকে সেন নদীর তীর বরাবর। নদীর ধার এখন নির্জন। উষ্ণ বাতাস তাদের ভাবনা ও স্নায়ুকে শান্ত করে। সূর্যের পরিপূর্ণ

আলো নদীর জলে বিচ্ছুরিত। চার পাশে সবুজের হাট। সবুজ পাতা, সবুজ ঘাস, আনন্দের হাজারো প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের দেহ ও মনকে দ্রুত সতেজ করে। হাতে হাত ধরাধরি করে নদীর তীর ধরে তারা অনেক দূর হেঁটে গেল। এখন একে অপরের নৈকট্য বিশেষভাবে অনুভব করে। স্বচ্ছ জলের তলায় সঞ্চরণশীল মাছ ও বড় বড় ঝিনুক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আনন্দে, গভীর তৃপ্তিতে তারা আপ্লুত। তারা অহরহ পায়চারিরত।

একসময় যুবতীটি বলে ওঠে, 'আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, মেয়েটার মাথায় গণ্ডগোল আছে।'

'কেন?'

'আমি আপনার সঙ্গে এভাবে নির্জনে ঘুরে বেড়াচ্ছি বলে। এটা কি একধরনের পাগলামির লক্ষণ নয়?'

'কেন? এটা তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।'

'না, না! স্বাভাবিক নয়—আমার পক্ষে এ রকম কিছু করাটা স্বাভাবিক নয়—আমি কখনো এমন বোকামি করতে ইনি। অথচ, তাই করতে হলো। আসল কারণটা হয়তো আপনি অনুমান করতে পারেন। বড় নির্মম একঘেঁয়ে প্রাত্যহিক জীবন আমার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই বাঁধাধরা নিয়মে ঘুরছি তো ঘুরছিই!....আমি আমার মার সঙ্গে একা থাকি। আমার মা সারাটা জীবন নানা রকম দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন। তাই তাঁর মেজাজটাও খিটখিটে । আর আমি আমার পক্ষে যা সম্ভব, তাই করছি। আমি চাকরি করছি। হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু সব সময় পারি না। তা সত্ত্বেও আমার এখানে আসাটা ভুল হয়েছে। কিন্তু আপনি অন্তত এর জন্য আমাকে দায়ী করবেন না! আমি কি দায়ী?'

এই প্রশ্নের জবাব মুখের কথায় না দিয়ে ফ্রানসোস্ আচমকা ওর কানের লতিতে চুমু খেয়ে বসে! সঙ্গে সঙ্গে সে আঁতকে সরে যায়, ফোঁস করে ওঠে, 'মঁসিয়ে ফ্রানসোস্! এটাই কি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার নমুনা?'

এরপর বিরস বদনে ওরা ফিরে আসে ম্যাসনস্-লাফিতিতে। সেখানে নদীর ধারে চারটি বড় বড় গাছের নীচে অপূর্ব নাতিদীর্ঘ কাফে পেটিট-হ্যাভরেতে তারা খাবার খেতে বসে । তাজা উষ্ণ বাতাস, পাতলা সাদা মদ, এবং পরস্পরের শারীরিক নৈকট্য তাদের দু'জনকে আড়ষ্ট, বিব্রত ও লজ্জিত করে রেখেছে। খেতে বসে একটা কথাও হয় না। কিন্তু কফি পান করার পর দু'জনের মধ্যেই হঠাৎ এক পরিবর্তনের জোয়ার নেমে আসে! দেহ ও মনে দেখা দেয় একটা চন্মনে ভাব, আনন্দ ও উৎসাহের হিল্লোলে তারা দুলে ওঠে।

প্রকৃতি আবার তাদের হাতছানি দেয়।

কাফে থেকে বেরিয়ে আবার তারা নদীর তীর বরাবর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে লাফ্রেতি গ্রামের দিকে।

এই সময় ফ্রানসোস্ সঙ্গিনীকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার নামটা কি?'

'লুসি।'

'লুসি!'—নামটা আপন মনে দু'বার উচ্চারণ করে ফ্রানসোস্। আর কোন কথা হয় না। মাথার উপর নীল আকাশ, পায়ের তলায় ঘাসের মখমল, পাশে নদী, সামনে বাঁকমুখে সাদা সাদা বাড়ির সারি যাদের ছায়া নদীর বুকে দোলে। লুসি গুচ্ছ গুচ্ছ তারা ফুল তুলতে থাকে, ফুলগুলি সাজিয়ে একটা মস্ত তোড়া বানায়। ফ্রানসোস্ গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করে।

বাঁ দিকে নদীর বাঁকমুখে অপূর্ব দ্রাক্ষাকুঞ্জ। থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে। হঠাৎ ফ্রানসোস্ দাঁড়িয়ে পড়ে এবং সবিস্ময়ে আঙুল তুলে দেখায়, 'আহ্! দেখুন।'

দু'জনে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখে, দ্রাক্ষাকুঞ্জের যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু লিলাক ফুলের মেলা—গোটা পাহাড়ী অঞ্চলটাই ঐ ফুলে সজ্জিত। লতানো বন, সবুজ গালিচা পাতা রয়েছে পৃথিবীর বুকে—এমন দৃশ্য দু-তিন কিলোমিটার জুড়ে, তারপর গ্রাম।

লুসিরও দুই চোখে বিস্ময় ও পুলক।

কী সুন্দর! কী অপূর্ব—সে গুঞ্জন করে ওঠে।

তারা দ্রুত পায়ে ঐ পুষ্পশোভিত টিলাটার দিকে ছুটতে থাকে। একটা সরু পথ ঝোঁপের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। তারা ঐ পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে যায়। একসময় সবুজ আচ্ছাদনের নীচে বসে পড়ে।

মাথার উপর মৌমাছির গুনগুনানি। সুধা মৌ মৌ বন। কী অপূর্ব মাদকতা, কী বিচিত্র অনুরণন। বাতাস নেই। তেজী সূর্যের প্রভাব বনভূমির মাথার উপরে। রঙ বদলায়, সাত রঙের আনাগোনা।

অনেক দূরে কোন গির্জায় ঘন্টা বেজে চলেছে।

এই সময় তাদের মধ্যে কি যে হলো। তারা জাগতিক বাধা নিষেধ, সংস্কার ভুলে যাচ্ছে। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হতে হতে একসময় ওরা একে অপরকে স্পর্শ করে, তারপরই আলিঙ্গন....সেই বাঁধন ক্রমেই নিবিড় হয়, দৃঢ় হয়, দুটি দেহ সমান্তরাল হ'য়ে ঘাসের বুকে আশ্রয় নেয়, ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে অজস্র চুম্বন...আর কিছু চিন্তা করবার শক্তিও তাদের নেই। এখন সমর্পণের অপ্রতিরোধ্য লগ্ন। লুসি নিজেই ফ্রানসোস্‌কে বুকের উপর টেনে এনেছে তার অনাবৃত বুকের মধুর স্বাদ মেলে ধরেছে। কোথায় উবে গেল লুসির সেই ভয়, যুক্তি ও সতর্কতা। উত্তপ্ত কামনার দাবদাহে জ্বলে-পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে সে। ফ্রানসোস্ তাকে নিঃশেষে উপভোগ করছে। সেই চরম উত্তেজক মুহূর্তে লুসি ভাবতেও পারছে না, তার কি হতে চলেছে। অসহ্য সুখে সে স্বয়ং সক্রিয়, বাধা দেওয়া দূরের কথা।

চূড়ান্ত ঘটনাটি ঘটে যাবার পর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয় লুসি। তখন ক্ষোভে, লজ্জায়, বিষণ্ণতায় তার বুক ভেঙ্গে যায়। সে কাঁদতে শুরু করে। দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

ফ্রানসোস্ তাকে আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন আর সেই আশ্বাসবাক্য শুনবার মতন পরিস্থিতি নয় লুসির। সে বিধ্বস্ত, কোনরকমে রেহাই পেতে চায়—এখনই

বাড়ি ফিরে যেতে পারলে বাঁচে। উঠে একরকম ছুটতে আরম্ভ করে, উঁচু নীচু পথে এলোমেলো পদক্ষেপ এবং প্রতিটি ক্ষণে একই হাহাশ্বাসের পুনরাবৃত্তি:

"হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!"

"লুসি," ফ্রানসোস্ পিছন থেকে অনুনয় করে, "লক্ষ্মি, শোনো, দাঁড়াও একটিবার।"

গালে গাল ঘর্ষণে তখনো লুসির মুখের চামড়া জ্বলছে, চোখ কোটরগত।

প্যারিস স্টেশনে পৌঁছেই লুসি ফ্রানসোস্‌কে ছেড়ে চলে যায়; এমন কি যাবার সময় সৌজন্যমূলক 'বিদায়-বাণী'ও উচ্চারণ করে না।

পরদিন আবার বাসে লুসির দেখা পেল ফ্রানসোস্। একদিনেই অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে মেয়েটার। ওকে অনেক শুকনো ও রোগা দেখাচ্ছে।

"তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে," লুসি ফ্রানসোস্‌কে বলে, "সদর রাস্তায় অপেক্ষা করো।"

সদর প্রশস্ত রাস্তার ফুটপাথে তারা দু'জনে হাঁটতে থাকে। লুসি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, "আমাদের আর কখনোই দেখা হওয়াটা উচিত নয়। যা ঘটে গেছে এরপর আমার পক্ষে সম্ভব নয় তোমার সঙ্গে দেখা করা।"

"কিন্তু কেন?"—ফ্রানসোস্ বিস্ময় প্রকাশ করে।

"কারণ, আমি আর তা পারবো না। আমাকে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। এরপর আর দ্বিতীয়বার সেই সর্বনাশা ফাঁদে পা দিতে আমি রাজী নই!"

ফ্রানসোসের বাসনা কিন্তু তখন আরো তুঙ্গে। আরো—আরো—অনেকবার পেতে চায় সে লুসিকে! লুসিকে সে অনেকক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করে, অনুনয় করে সম্পর্ক বজায় রাখবার জন্য।

কিন্তু লুসির তিক্ত স্বরে সেই একই প্রতিবাদ, "না, আমি পারবো না। যা হবার হ'য়ে গেছে। সম্পর্ক আমাদের এখানেই ইতি।"

উত্তেজনায় উদ্বেল ফ্রানসোস্ তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব পর্যন্ত দেয়।

কিন্তু এবারও লুসির জবাব, "না। আমি রাজী নই।"

লুসি ফ্রানসোস্‌কে ছেড়ে চলে যায়।

এরপর আট দিন ফ্রানসোস্ লুসির কোন পাত্তা পায়নি। লুসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কোন সুযোগই সে পাচ্ছে না; কারণ, সে লুসির ঠিকানাটাও জানে না। একসময় ফ্রানসোস্ গভীর বিষণ্নতায় অনুধাবন করে, লুসি হারিয়ে গেছে, সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

কিন্তু নবম দিনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। তার ঘরের দরজার বেল বেজে উঠলো। সে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং কপাট খুলতেই প্রচণ্ড বিস্ময় ও উল্লাস—দাঁড়িয়ে আছে সে। লুসি!

লুসি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ফ্রানসোসের দুই প্রসারিত বাহুর বন্ধনে। সম্পূর্ণ সমর্পণে কোন বাধা দেয় না।...চললো এমনি তিনটি মাস ধরে। তারপর একদিন লুসি জানালো, সে মা হতে চলেছে। শুনে বিবর্ণ হ'য়ে গেল ফ্রানসোস্, একধরনের মানসিক যন্ত্রণা

ও অস্থিরতা তাকে গ্রাস করে। ইতিমধ্যে লুসির বহু-ব্যবহৃত দেহটাকেও বিস্বাদ লাগছে। ফ্রানসোস্ ঐ অনাগত শিশু সমেত লুসিকে যেন সহ্য করতে পারছে না। অথচ, লুসিকে একথা সরাসরি বলবার সাহসও নেই তার। এক রাতে ফ্রানসোস্ বাড়ির বাইরে চলে গেল এবং আর ফিরে এলো না।

আঘাতটা এতটা মর্মান্তিক হ'য়ে বুকে বাজলো যে অভিমানে লুসি ফ্রানসোস্কে খুঁজে বের করবারও চেষ্টা করলো না। সে তার মার হাঁটু জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে, নিজের দুর্দশা ও সর্বনাশের কথা জানায়।

কয়েক মাস পর লুসির একটা ছেলে হলো।

সময়ের স্রোত প্রবাহিত। অনেকগুলি বৎসর অতিক্রান্ত। ফ্রানসোস্ এখন বৃদ্ধ। অবশ্য তার জীবন-যাপনের ধরণ-ধারণে কোন পরিবর্তন হয়নি। আশা ও প্রত্যাশাশূন্য এক আমলার মতনই দিন কাটাচ্ছে সে। প্রতিদিন সে ঠিক একই সময়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে, একই রাস্তায় পায়চারি করে, একই দরজার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে, একই অফিসে একই সময়ে যায়, একই চেয়ারে বসে একই ধরনের কাজ মুখ বুজে করে চলে। এই বিশাল পৃথিবীতে সে একা। নিস্পৃহ সহকর্মীদের কাছ থেকে কোন আন্তরিকতা পায় না। ঘরে ফিরে সঙ্গিনীহীন মস্ত বিছানায় শুয়ে বিরাট শূন্যতায় সে প্রতি রাতে ডুবে যায়। শেষ বয়সের জন্য প্রতি মাসে সে একশ'টি করে ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় করে রাখে।

প্রতি রবিবার ফ্রানসোস্ চ্যাম্পস্-ইলিসিসের পার্কে বেড়াতে যায়। সেখানে বসে বসে চলমান দুনিয়ার কেতা-দুরস্ত নর-নারীদের দেখতে পায়। দেখে ধাবমান গাড়ি ও সুন্দরী মহিলাদের।

আর এক রবিবার সে ঐ পার্ক ছাড়িয়ে নতুন এক পথ ধরে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে পার্ক মনসিউতে উপস্থিত হয়। উজ্জ্বল রবিবারের সকাল। পার্কের সবুজ ময়দানে শিশুরা খেলা করছে। আর তাদের মা ও আয়ারা মাঠের ধারে বসে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছে।

সহসা ফ্রানসোস্ তেঁসার কেঁপে ওঠে। একজন স্ত্রীলোক তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে দুটি বাচ্চা। একটি ছেলে—বয়স বছর দশেক, অন্যটি মেয়ে—বয়স বছর চারেক। মহিলাটি আর কেউ নয়, সে লুসি।

ফ্রানসোস্ প্রায় একশ' গজের মত ছুটে যায়। দারুণ উত্তেজনায় তার হাঁপ ধরে যায়, হাত পা কাঁপতে থাকে, একটা খালি আসনে বসে পড়ে। লুসি তাকে চিনতে পারেনি। ফ্রানসোস্ আবার উঠে দাঁড়ায়, ইতিউতি খুঁজতে থাকে লুসিকে।

হ্যাঁ, ঐ তো সে বসে রয়েছে। ছেলেটি তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। ভারি সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে। মেয়েটি মার পাশে বসে বসে খেলা করছে। হ্যাঁ, লুসিই। নিশ্চয় ও লুসি। আজ ওকে দেখলে মনে হয়, বয়স্কা গম্ভীর স্বভাবের এক মহিলা। পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ, কিন্তু মর্যাদাসম্মত।

কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে লুসিকে দেখছে ফ্রানসোস্; কিন্তু এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ছেলেটি মাথা তুলতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ফ্রানসোসের বুকের ভেতরে যেন চকিতে ঝড় বয়ে যায়। ঐটি তার ছেলে! সন্দেহ নেই, ঐ তার ঔরসজাত সন্তান। সে তার দিকে চেয়ে থাকে। যেন কোন পুরনো ছবিতে নিজের বাল্যকালের চেহারা দেখছে।

সে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। লুসি যখন এখান থেকে যাবে, তখন সে তাকে অনুসরণ করে তার আবাসটি চিনে আসবে।

সেই রাতে তার চোখে ঘুম নেই। থেকে থেকে শুধু তার ছেলের কথা মনে পড়ছে। তার ছেলে। ইস্।....

সে লুসির বর্তমান আবাস দেখে এসেছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেও এসেছে অনেক কিছু। এক সৎ ও দৃঢ়চেতা মানুষ তার স্বামী। লুসির দুর্দশা দেখে তার করুণা হয়েছিল। এমন কি ফ্রানসোস্ তেঁসারের ঔরসজাত সন্তানকে নিজের ছেলে হিসাবেও স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি।

গভীর শূন্যতায় ফ্রানসোসের বুক যেন ভেঙে পড়ছে। এই বুড়ো বয়সে সে মর্মান্তিকভাবে নিঃসঙ্গ। তার কোন স্নেহের পাত্র নেই। অথচ, পুত্রক্ষুধা অহরহ তাকে যন্ত্রণা দেয়। সে কাতর হ'য়ে পড়ে, ঈর্ষা বোধ করে। প্রতি রবিবার সে পার্ক মনসিঁউতে যায়, দু'চোখ ভরে দেখে তার ছেলেকে। ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে, চুমোয় চুমোয় ছোট্ট মুখখানা ভরে তুলতে। ইচ্ছা হয়, ওকে জোর করে টেনে আনতে, চুরি করে পালাতে।

শেষ অব্দি সে মরিয়া হ'য়ে ওঠে। সোজা গিয়ে দাঁড়ায় লুসির সামনে। বিবর্ণ মুখ ও পান্ডুর কাঁপা ঠোঁটে কোনরকমে উচ্চারণ করে: 'তুমি আমাকে চিনতে পারছো?'

লুসি চোখ তুলে তাকায়, কিছুক্ষণ বিহ্বল হ'য়ে চেয়ে থাকে; তারপর ভয়ে ও আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করে ওঠে। দুটি সন্তানকে একরকম টানতে টানতে প্রায় দৌড়ে পালায়।

ফ্রানসোস্ ঘরে ফিরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কয়েকটা মাস অতীত হয়। ফ্রানসোস্ আর তাদের দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ফ্রানসোসের যন্ত্রণা এতটুকু কমেনি। পিতৃত্বের বুভূক্ষায় সে জ্বলছে।

ঐ ছেলেটিকে একটিবার কোলে করবার জন্য সে যে কোন মূল্য দিতে রাজি আছে। সে এর জন্য আত্মহত্যা করতে পারে, খুন করতে পারে, যে কোন ভয়ানক ও দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি সে নিতে পারে।

ফ্রানসোস্ লুসিকে চিঠির পর চিঠি লেখে। কোন জবাব আসে না। এ রকম কুড়িখানা নিস্ফল চিঠি লিখবার পর সে বুঝতে পারে লুসি আর কোনদিনই তার কোন আবেদনে কর্ণপাত করবে না; তখন সে আরো ঝুঁকিবহুল এক সিদ্ধান্ত নেয়; বুকের কাছে পিস্তল রেখে [ব্যর্থ হলে আত্মহত্যা করবে] লুসির স্বামীর কাছে লেখে:

"সবিনয় নিবেদন—

আমার নাম নিশ্চয় আপনার কাছে ঘৃণ্য। কিন্তু বর্তমানে আমি এমন আহত ও দুঃখ-ক্লান্ত যে, একমাত্র আপনিই পারেন আমাকে শান্তি দিতে।

মাত্র দশ মিনিটের জন্য আপনার সাথে কথা বলতে চাই।

ইতি—অনুগত...।"

পরদিন জবাব এলো :

"মাননীয় মহাশয়—

বুধবার বিকেল পাঁচটায় আপনার জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করবো।"

বুধবার দুরু দুরু বুকে ফ্রানসোস্ লুসির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। এক একটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে, আর তার বুকে যেন ভূমিকম্প হয়। শ্বাস নিতেও দারুণ কষ্ট, সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে উঠছে, যে কোন মুহূর্তে টলে পড়তে পারে সে। একেবারে চারতলায় উঠে সে নির্দিষ্ট ঘরের সামনে দাঁড়ায়। কলিংবেল বাজায়। বাড়ির চাকর দরজা খুলে দেয়।

"মঁসিয়ে ফ্লেমেল রয়েছেন?"—ফ্রানসোস্ জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ। ভেতরে আসুন।"

ফ্রানসোস্ প্রবেশ করে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মোটামুটি সাজানো-গুছানো ড্রয়িংরুম। সে কিছুক্ষণ একাকী বুক-কাঁপা মানসিকতা নিয়ে ঐ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভেতর দিকের দরজা খুলে একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। তিনি দীর্ঘকায়, গম্ভীর এবং বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ; পরনে কালো রংয়ের ফ্রককোট। তিনি ফ্রানসোস্কে বসতে ইঙ্গিত করেন।

ফ্রানসোস্ একটা চেয়ারে বসে পড়ে। তারপর শ্বাসহীন স্বরে বলে, "মঁসিয়ে...মঁসিয়ে...আমি জানিনা, আপনি আমার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা.....যদি জানেন...."

মঁসিয়ে ফ্লেমেল তাকে মধ্যপথেই থামিয়ে দেন।

"আপনাকে অত কষ্ট করে বলতে হবে না! আমি আমার স্ত্রীর মুখ থেকেই সব শুনেছি।"

একজন দয়ালু লোকের ক্রমশঃ নিষ্ঠুর হবার ভঙ্গী ফুটে উঠতে থাকে তাঁর মুখে। তবু তিনি নরম স্বভাবের মানুষ, সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক।

"মঁসিয়ে আসল ব্যাপার হলো" ফ্রানসোস্ বলতে থাকে, "আমি লজ্জায় গ্লানিতে ও নিসঃঙ্গতায় মারা যাচ্ছি। আমি আপনার কাছে চাইছি মাত্র একটা জিনিস—ছেলেটিকে মাত্র একটি চুম্বন করবার সুযোগ।"

মঁসিয়ে ফ্লেমেল উঠে দাঁড়িয়ে অগ্নি-আধারের সামনে গিয়ে বেল বাজান।

পরিচারিকা আসে।

"লুইসকে নিয়ে এসো।"

পরিচারিকা চলে যায়। তাঁরা একে অপরের মুখোমুখি। নিঃশব্দ। যেন আর বলার বা শোনার কিছুই নেই তাঁদের।

হঠাৎ বছর দশেকের ফুটফুটে ছেলেটি ছুটে এ ঘরে ঢোকে এবং এতকাল সে যাকে বাবা হিসেবে জানে, তাকে চুমু খাবার উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। কিন্তু যেতে যেতে সে থমকে দাঁড়ায়—তার বিস্ময় এই আগন্তুক লোকটিকে দেখে।

মঁসিয়ে ফ্লেমেল ছেলেটির কপালে চুমু খেয়ে বললেন:

"এই ভদ্রলোকটি তোমার জন্য বসে আছেন। ওঁকে একটিবার চুমু খেয়ে এসো।"

ছেলেটি কথার বাধ্য, ধীরে ধীরে ফ্রানসোসের দিকে এগিয়ে যায়। দৃষ্টি তার আগন্তুকের মুখের উপর।

ফ্রানসোস্ তেঁসার উঠে দাঁড়ায়; তার মাথা থেকে টুপিটা খসে পড়ে, মনে হয় সে বুঝি নিজেও পড়ে যাবে।

মঁসিয়ে ফ্লেমেল কায়দা করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। জানালার ভেতর দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন তিনি।

ছেলেটি দারুণ বিস্ময়ে অপেক্ষা করছে। একসময় সে টুপিটি মাটি থেকে কুড়িয়ে নেয় এবং অচেনা লোকটির মাথায় বসিয়ে দেয়। তখনই ফ্রানসোস্ হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে বুকের কাছে টেনে আনে এবং উন্মত্তের মতন চুমু খেতে শুরু করে—বৃষ্টির ধারার মতন নেমে আসছে তার চুম্বন, মুখে, চোখে, গালে, চিবুকে, মুখের ভেতরে, চুলের ভেতরে...

এই চুম্বনের ঝড়ে ভীত ও বিব্রত হয়ে ওঠে ছেলেটি। সে চেষ্টা করে আত্মরক্ষার, মুখ সরিয়ে নেয়, মাথা সরিয়ে নেয়, নিজেকে মুক্ত করবার আপ্রাণ প্রয়াসে তার ছোট ছোট দুটি হাত দিয়ে আঘাত করে ফ্রানসোসের ব্যগ্র ঠোঁটের উপর।

সেই আঘাতে সম্বিত ফিরে পায় ফ্রানসোস্। চীৎকার করে ওঠে, "বিদায়। আমি চলে যাচ্ছি।"

সে এক পলায়নপর চোরের মতন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

ভয়

Fear

ছায়া-ছায়া অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছে ট্রেনটা।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসে আছি। তিনি ধাবমান ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। এই পি-এল-এম কামরায় জীবাণু-নাশক ওষুধের তীব্র গন্ধ। ট্রেনটা নিশ্চয় মার্সাই থেকে আসছে।

আকাশে চাঁদ নেই, বাতাসের দাপট নেই, অথচ জ্বলন্ত রাত্রি। নক্ষত্ররাও নজরে আসে না। ট্রেনের গতিময়তায় বাতাস সরাসরি আমাদের মুখের উপর ঝাপটা মেরে

চলেছে।...তিন ঘন্টা আগে আমরা প্যারিস ছেড়ে এসেছি এবং এখন প্রবেশ করছি ফ্রান্সের হৃৎপিণ্ডে। যাত্রাপথে কিছুই প্রায় আমরা দেখবার চেষ্টা করিনি।

হঠাৎ এক অদ্ভুত ভীতিসঞ্চারক দৃশ্য দেখতে পেলাম। বনে দাউ দাউ আগুন জ্বালিয়ে দুটি লোক সেই অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। চকিতের জন্য দেখতে পেলাম, ভবঘুরের মতন কম্বল গায়ে তারা ঘুরছে, আগুনের আভায় রক্তাভ তাদের অবয়ব, শ্মশ্রুবহুল মুখ নিয়ে তারা আমাদের দিকে ঘুরে তাকায় এবং তাদের চারদিকে আপনা থেকে গজিয়ে উঠছে চকচকে সবুজ সব গাছপালা।

পরমুহূর্তে আগুন হারিয়ে গেল। আবার অন্ধকার।

ভারী অদ্ভুত তো! ঐ দুই ভবঘুরে কি করছিল বনে? কেন এই গুমোট রাতে ঐ আগুনের ব্যবস্থা?

আমার সহযাত্রী তাঁর ঘড়ি বের করে দেখলেন এবং বললেন, "এখন ঠিক মধ্যরাত্রি; আমরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।"

আমিও একমত। আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিই। কল্পনা করবার চেষ্টা করি, লোকগুলি ওখানে কি করছিল। ওরা কি ওখানে ওদের কোন পাপের সাক্ষীকে খতম করছিল। অথবা, প্রস্তুত করছিল কোন কামোদ্দীপক ওষুধ? তুমি নিশ্চয় মধ্যরাতে বনে আগুন ধরাতে যাবে না অথবা, এই দারুণ গরমের রাতে ওখানে ঝোল জ্বাল দেবে না। তা হলে কি করছিল তারা? এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।

সহযাত্রী কথা বলতে শুরু করেছেন। বৃদ্ধ লোকটির পেশা অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে নিশ্চয় সুশিক্ষিত এবং ঈষৎ পাগলাটে ভাবও রয়েছে।

কিন্তু এই দুনিয়ায় কি কাউকে বুদ্ধিমান বা বোকা রূপে চিহ্নিত করা সব সময় সম্ভব? বিশেষতঃ যুক্তি যেখানে অনেকক্ষেত্রে মার খায়।

তিনি বললেন, 'আমি দৃশ্যটি দেখে সুখী হয়েছি। মুহূর্তের জন্য আমি আমার ভুলে যাওয়া এক অনুভূতিকে লাভ করলাম যেন।'

ভাবুন তো, অতীতে এই পৃথিবী কী বিস্ময়কর ছিল!

রহস্যের এক একটি অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়েছে, আর মানুষের কল্পনাপ্রবণতা আহত হয়েছে। এই রাত আর এই অন্ধকারকে সাধারণ মনে করবেন না, যদিও তাদের রহস্যময়তা অপহৃত হয়েছে।

আমাদের অতীন্দ্রিয় কল্পনার আর অবকাশ নেই, লোকে বলে থাকে, আর কোন বিস্ময় নেই। সমস্ত কিছুই আমাদের বুদ্ধির নাগালের মধ্যে। আধিভৌতিক বিশ্বাস জমা হয়েছিল যে হ্রদে, যুক্তির প্রবহমান খাল তাকে প্রায় শূন্য করে এনেছে। দিনের পর দিন বিজ্ঞান মানুষের বিস্ময়ের পরিধিকে সীমিত করে ফেলেছে।

আমি কিন্তু মশাই পুরনো জগতের লোক। আমাদের মতন মানুষের চিরন্তন প্রতীতি এখনো লোপ পায়নি। আমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি। আমাদের ঠকানো চিরদিনই

সহজ, কারণ অনুসন্ধান বা যুক্তির রাজ্যে না গিয়ে রহস্যময়তায় ডুবে থাকতে, বিশ্বাস করতে বিচিত্র আনন্দ উপভোগ করি। সহজ ও নিষ্ঠুর সত্য থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার এই এক অভ্যাস।

হ্যাঁ মশাই, অদৃশ্য বস্তুদের ক্রমশই যুক্তি ও বুদ্ধির নাগালের মধ্যে এনে আমরা আমাদের কল্পনাকে হত্যা করেছি। আমি এখন এই বিশ্বকে নিরেট বস্তুপিণ্ড রূপে দেখছি; কবিত্বের আর কোন স্থান নেই।

রাত্রিকালে কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বৃদ্ধা মহিলারা যেভাবে ক্রশ করেন, আমরা আর কি ভাবে তাকে মেনে নিতে পারি? কি ভাবে আর স্বীকৃতি দিতে পারি—অন্ধকারে একাকী অবস্থানকালে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর কোন বস্তু আমাদের অবচেতন মনে দোলা দিয়ে যায়?

দূর অতীতে রাত্রির অন্ধকারে ভয় ও বিস্ময় ডেকে আনতো। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে অদৃশ্য শক্তিরা সক্রিয় হয়ে উঠতো, সময় সময় আকার নিতো এবং প্রতিটি মানুষ সেই অদৃশ্য বস্তুর অপ্রতিরোধ্য আবির্ভাবকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য ছিল।

এই সমস্ত আধিভৌতিক প্রতীতি যখন রইলো না, প্রকৃত ভয় বলতেও তখন কিছুই রইলো না। কারণ, আমরা তো তাকেই ভয় পাই, যাকে বুঝি না। চর্মচক্ষুতে পরিদৃশ্যমান বিপদ চলাফেরা করতে পারে, বিরক্ত করে এবং ভয় দেখায়। কিন্তু সেই আতঙ্কের সাথে আর কিসের তুলনা করা চলে, যখন আপনি কোন ভূতের মুখোমুখি হবার আশঙ্কা করেন? অথবা, আচমকা কোন শবকে জড়িয়ে ধরেন? ...যুক্তির যুগে অন্ধকারই আমাদের কাছে আলো, আমাদের আর আধিদৈবিক ব্যাপারে আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই।

ধরুন আমরা দু'জনই যদি ঐ নির্জন বনে আগুন ধরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তবে আমাদের দেখেও অন্যরা এই রকম ভাবতেন। আদতে ভয়ের কিছুই থাকতো না।

"আমরা তাকেই ভয় পাই," বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার বললেন, "যার সম্পর্কে আমাদের কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই।"

এই রকম আলোচনা চলাকালে হঠাৎ আমার মনে এক স্মৃতি উদিত হয়। গত রবিবার গুস্তভ ফ্লেবার্টয়ের বাড়িতে বসে তুর্গেনিভ গল্প করেছিলেন। জানিনা, গল্পটি তিনি তাঁর কোন বইতে স্থান দিয়েছেন কিনা।

এই মহান রুশ ঔপন্যাসিক তাঁর বিরল দক্ষতায় গল্পের নিপুণ বুনোটে আমাদের কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন—আমরা এই অজানা, অনিশ্চিত আশঙ্কাজনক দুনিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছিলাম যেন।

*তুর্গেনিভের বইতে আমরা এই সমস্ত অতীন্দ্রিয় শক্তিদের সন্ধান পাই। অদৃশ্য বস্তুর প্রভাব সম্পর্কে আমাদের মনে তিনি বিচিত্র ভয়ের সঞ্চার করেন। দেয়াল, দরজা, মুক্ত বহিঃবিশ্বের আড়ালে এই সমস্ত অজানা অদৃশ্য শক্তিরা নাকি বর্তমান, সুযোগ পেলেই ভয় দেখায়।

*প্রখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক তুর্গেনিভের সঙ্গে মপাসাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল।

তুর্গেনিভের গল্প আমাদের হঠাৎ নিয়ে গেল এক আবছা আলোময় অজানা ভুবনে, যেখানকার পরিবেশ আমাদের অন্তঃকরণে ভয়ের উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট।...অদৃশ্য এক শক্তি সম্পর্কে তিনি আমাদের কল্পনাপ্রবণ করে তুললেন, আমরা এমন এক স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করতে থাকি, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম না।

তুর্গেনিভ কিন্তু এডগার এ্যালান পো বা হফম্যানের মতন সাহসিক গতিতে আধিভৌতিক জগতে প্রবেশ করেননি, তিনি শুধু নির্বিকারে আমাদের এমন সমস্ত গল্প শুনিয়েছেন, যা খুব ধীরে ধীরে আমাদের মানসিক স্তরে অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা জাগিয়ে তুলেছে।

ঐদিন তিনিও আমাদের বলেছিলেন,"আমরা যা বুঝিনা, একমাত্র তাকেই ভয় পাই।"

তিনি তখন আর্মচেয়ারে বসে ছিলেন, হাত দুটি ঝুলছে, পাদুটো ছড়িয়ে দিয়েছেন আয়াসে, একমাথা সাদা চুল, একমুখ সাদা দাড়ি চাকচিক্যময়, তাঁকে মনে হচ্ছিলো কোন স্বর্গীয় পুরুষ বা ওভিড নদী থেকে উত্থিত এক জলদেবতা!

তিনি কথা বলছিলেন ধীরে ধীরে। আলস্যে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ নির্বাচিত ও শ্রুতিমধুর; গল্প বলবার সময় এমন এক ধরনের সংকোচ ও মননশীলতা তাঁর ভেতরে লক্ষণীয়, যা তাঁর বক্তব্যকে অনেক বেশী তাৎপর্যময় ক'রে তুলছে। তাঁর বিশাল ঈষৎ রক্তাভ চোখে শিশুসুলভ দৃষ্টি, মনের ভাবাবেগ প্রতিফলিত। গল্পটি তাঁর নিম্নরূপ:

তখন তিনি যুবক। শিকারের সন্ধানে ঘুরছেন রাশিয়ার এক বনাঞ্চলে। সারাটা দিন বনে বনে চক্কর লাগাবার পর পড়ন্ত বেলায় উপস্থিত হলেন এক শান্ত নদীর ধারে।

নদীটি প্রবাহিত গাছ-পালার মধ্য দিয়ে, গাছ-গাছালি ও ঘাস জড়িয়ে, জল গভীর, ঠাণ্ডা ও টলটলে।

শিকারীর বাসনা, ঐ কাকচক্ষু জলে তিনি স্নান করবেন। ভাবা মাত্র জামা-কাপড় খুলে বিবস্ত্র হয়ে তিনি নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘদেহী, সমর্থ ও চমৎকার সাঁতারু স্রোতের টানে আপন শরীর ভাসিয়ে দিলেন। নদীর তল থেকে উত্থিত ঘাস ও শিকড়গুলি তাঁর চামড়ার ওপর আলতো স্পর্শ বুলিয়ে যায়, তিনি রোমাঞ্চিত হন।

হঠাৎ একখানা হাত তাঁর কাঁধের উপর এসে পড়ে।

চমকে তিনি ঘুরে তাকান এবং দেখতে পান, একটা ভয়ঙ্কর জীব হিংস্র ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। আকারে স্ত্রীলোক বা অনেকটা বানরের মতন। বিরাট বিকটদর্শন মুখ সামান্য হেসেও ওঠে। দুটো অজানা জন্তু ওর মুখের চারপাশে চক্কর কাটছে, ওর রোদে-পোড়া চুলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ওর পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তুর্গেনিভ আধিভৌতিক ঐ দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে ভয়ে-বিস্ময়ে নিশ্চল। কোন কিছু না করে বা না ভেবে তিনি আপ্রাণ সাঁতার কাটতে থাকেন তীরে পৌঁছে যাবার জন্য। কিন্তু ঐ দৈত্যাকার বিচিত্র জন্তুটার গতি আরো বেশী। সে যেন বেশী করেই কখনো তুর্গেনিভের ঘাড়ে হাত দিচ্ছে, পিঠে আঙুল বোলাচ্ছে, পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

আতঙ্কে দিশাহারা শিকারী তবু একসময় তীরে পৌঁছে গেলেন। জল থেকে উঠেই সাঁ সাঁ ছুটতে থাকেন বনের দিকে। তিনি তখন উলঙ্গ। নদীর তীরে খুলে রাখা পোশাক ও বন্দুকটার কথা তিনি যেন বিলকুল ভুলেই গেছেন।

কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুটাও জল থেকে উঠে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে, যত দ্রুততায় সম্ভব ছুটছে। মুখ দিয়ে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজও করছে।

ভয়ে বিস্ময়ে ক্লান্ত তুর্গেনিভ ছুটতে ছুটতে একসময় তাঁর শক্তি হারিয়ে ফেললেন। তিনি তখন আর একটু হলেই মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন; কিন্তু ঠিক তখনই ছাগল চরাচ্ছিলো এমন একটি ছেলে, লাঠি হাতে তেড়ে আসে। জন্তুটা গোঁ গোঁ করতে করতে মহিলা-গরিলার মতন ঘন বনের আড়ালে হারিয়ে গেল।

জানা গেল ধেয়ে আসা ঐ জীবটা জন্তু নয়, এক পাগলী—তিরিশ বছর যাবৎ মেষপালকদের দয়ার উপর নির্ভর করে এই বনে বাস করছে, দিনের অর্ধেক সময়ই কাটায় নদীতে সাঁতার কেটে।

মহান রুশ লেখক বললেন, "জীবনে কখনো আমি অত ভয় পাইনি। ধারণাই করতে পারিনি, জীবটা কি হতে পারে!"

আমি আমার ট্রেন-যাত্রীকে এই গল্পটা শোনালাম। তিনি বললেন, "তা হলেই দেখুন, আমরা যাকে চিনি, না, তাকেই সাধারণতঃ ভয় পাই।...জীবনে এমন ভয় পাবার অভিজ্ঞতা আমারও আছে। অথচ, ব্যাপারটা এত সাধারণ এবং আমি এমন বোকা বনে গিয়েছিলাম যে, এখন আপনার কাছে সেই গল্প বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

আমি সে সময় ব্রিটানিতে পায়ে হেঁটে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছি। হাঁটতে হাঁটতে পার হলাম বন্ধুর প্রস্তরময় ফিনিস্ত্রি এলাকা। এর আগের সন্ধ্যায় দুই সাগরের সঙ্গমস্থল র‍্যাজে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। অতি পুরনো জায়গা, আমার মন অধিকার করে আছে তাই অতীতের সব গাথা-কাহিনী এবং কিছু কুসংস্কারমণ্ডিত গ্রাম্য প্রবাদ।

রাতে আমি পায়ে হেঁটে পাড়ি জমিয়েছি অনেকটা পথ—পেনমার্চ থেকে পন্ট-লাঁ এ্যাবি অব্দি। পেনমার্চে কখনো গেছেন? কী ঢালু তীরভূমি—যেন সমুদ্রতল থেকেও নীচু। যখনই তাকাবেন, দেখবেন হিংস্র জন্তুর মতন ধেয়েআসা সমুদ্র। প্রায়শই ধূসর বর্ণ, সাদা ফেনা তুলে শিলাস্তরের উপর আছড়ে পড়ে বার বার।

এক জেলের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার সোজা পথে আমার যাত্রা শুরু হয়। তখন রাত ঘনিয়েছে, ঘন অন্ধকার।

সময় সময় অতীতে কেল্ট পুরোহিতদের দ্বারা পূজিত বড় বড় পাথর খণ্ডগুলিকে ভূতুড়ে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। আমার মনে হয়, ওরা যেন চোখ মেলে আমাকে দেখছে। ভয় পাই। অথচ, ভয়টা যে কিসের বুঝতে পারি না। অনেক

নির্জন সন্ধ্যায় হঠাৎ মুখের উপর বুলিয়ে যাওয়া বাতাসে আমাদের ভেতরটা কি অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে না? কিন্তু কেন?

পথটা আমার কাছে অতি দীর্ঘ মনে হচ্ছিলো। শুধু দীর্ঘ নয়, শূন্যও বটে।

সেখানে সমুদ্র গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এবং সেই গর্জন ভেসে আসছে নীচ থেকে, আমার পিছন থেকে। কখনো কখনো সেই একঘেঁয়ে শব্দ আমার এত কাছাকাছি এসে যায় যে মনে হয়, ঢেউগুলি বুঝি আমার পায়ের নীচে এখনই ভেঙ্গে পড়বে এবং আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তখন ছুটে পালিয়ে যাবার জন্য একটা বন্য তাগিদ অনুভব করি আমি।

বাতাসে কার যেন শিঁস বাজে। সেই শিঁস আমার চারপাশে নর্তনরত। খুব তাড়াতাড়ি পথটুকু পার হবার চেষ্টা করলেও আমার হাত-পা ক্রমশঃ হিম হয়ে আসছে, ভয়ে বিকল হচ্ছে মন।

ইস্! কতক্ষণে যে এই পথে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হবে।

অন্ধকার এত গভীরতর যে আমি পথ চিনতে পারছি না।

হঠাৎ গড়িয়ে গড়িয়ে আসা কোন বস্তুর শব্দ আমি শুনতে পেলাম। শব্দটা আসছে আমার অনেকটা সামনে থেকে। ভাবলাম, 'বোধহয় কোন গাড়ি আসছে!' কিন্তু আর কোন শব্দ নেই।

এক মুহূর্ত পরে আবার সেই শব্দ; এবার আরো কাছে।

আমি কোন আলো দেখছি না। তাই ভাবলাম: ওদের কাছে কোন লণ্ঠন নেই। এই বুনো দেশে এটা আশ্চর্যের কিছুই নয়।

শব্দটা একবার বন্ধ হয়, আবার শোনা যায়। এখন মনে হচ্ছে শব্দটা যেন কোন ওয়াগনের, অশ্বক্ষুরের নয়। আশ্চর্য!

শব্দটা কিসের হতে পারে? নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করি।

শব্দটা এগিয়ে আসছে, দ্রুত, দ্রুততর। অশ্বক্ষুর বা পদধ্বনি নয়, শুধু একটা চাকা গড়িয়ে আসার শব্দ। বস্তুটা কি?

অবশেষে এটা আমার খুবই কাছাকাছি চলে এলো। আমি চকিতে একটা গর্তে লুকিয়ে পড়ি এবং আমার পাশ দিয়ে এক-চাকার একটা হাতগাড়ি গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে গেল—হ্যাঁ, একটা হাত-গাড়ি, অথচ কোন মানুষ হাত দিয়ে ওটাকে ঠেলছে না!

আমার বুক আতঙ্কে এমন কাঁপতে থাকে যে, ঘাসের উপর অসহায়ভাবে শুয়ে পড়ি। কানে এসে বাজছে ঘুরন্ত চাকার ঝম্‌ঝমানি,—শব্দটা ক্রমশঃই দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। আমি না পারছি উঠে বসতে, না পারছি দাঁড়াতে, হাত ও পা অসাড়। কারণ উঠে দাঁড়ালে হয়তো ওটা আবার তেড়ে আসবে এবং আমার পিছনে ছুটতে থাকবে; তখন ভয়ে আমি নির্ঘাৎ মারা যাবো।

দীর্ঘ—দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর আমি নিজেকে কিছুটা সুস্থ বোধ করি। কিন্তু ঐ বাকি পথটুকু পার হবার সময় বুক আমার দুরদুর করছিল, সামান্য কোন শব্দে আঁতকে উঠেছি, দম বন্ধ হয়ে এসেছে।

নিশ্চয় আমার এই ভয়কে বোকামি ভাবছেন? কিন্তু সেই মুহূর্তগুলি অসম্ভব আতঙ্কজনক! পরে ব্যাপারটা চিন্তা করবার পর রহস্যটা বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয় কোন খালি পা বালক ঐ চাকাটাকে ঠেলছিল এবং তখন ঐ অবস্থায় আমার প্রত্যাশা ছিল, কোন সাধারণ উচ্চতার লোককে আমি দেখতে পাবো।

"ঘটনাটা আপনি বুঝতে পারছেন....আতঙ্কটা আমার মনে আগে থেকেই জাঁকিয়ে বসেছিল! দেখলাম, একটা হাত-গাড়ি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে। কী ভয়, কী ভয়!"

এই পর্যন্ত বলে এক মুহূর্তের জন্য তিনি থামলেন। তারপর বললেন:

"আর দেখুন আমরা এখানে বসে টের পাচ্ছি একটা আশ্চর্য ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার—কলেরা রোগের আক্রমণ।"

আপনি নিশ্চয় বাতাসে সেই ওষুধের গন্ধ পাচ্ছেন। এর অর্থ, এই গাড়িতে কলেরা রোগী রয়েছে।

তুঁলাতে যান, সেখানেও এর প্রাদুর্ভাব অনুভব করবেন। শুধু মাত্র রোগের ভয়ে ঐ শহরের লোকেরা এতটা বিভ্রান্ত নয়। আসল কারণ, কলেরার বীজাণুকে মানুষ এখনো দেখেনি, এটা একটা অদৃশ্য ভয়ঙ্কর শক্তিরূপে কাজ করছে।

ডাক্তারদের প্রয়াস দেখে হাসি পায়। পূর্বদিক থেকে আগত কলেরা এক অপ্রতিরোধ্য বিধ্বংসী শক্তি।

তুঁলার রাস্তা ধরে চলুন। দেখবেন, নাচতে নাচতে মানুষের দল ছুটছে। কেন এই মৃত্যুময় দিনগুলিতে মানুষরা নর্তনরত? তারা আগুন জ্বালিয়ে নাচছে, গাইছে। কিসের জন্য এই উন্মাদনা? কারণ, 'সর্বশক্তিমান তিনি' উপস্থিত রয়েছেন।

ধ্বংসের দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মানুষ আগুন জ্বালিয়ে এমন ওয়ালেচ নাচ নেচে চলেছে। কলেরাই তাদের কাছে সেই দেবতা।

সেই অদৃশ্য ভয়ঙ্কর 'অতীতের শয়তান' জমা হচ্ছে এখানে-সেখানে, ডেকে আনছে অসহায় মানুষের মৃত্যু। ভীত মানুষ 'পুরাকালীন' অভ্যাসকে ফিরে পাচ্ছে, ডাক্তারদের বদলে পুরোহিতদের দিয়ে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছে কলেরা নামক অদৃশ্য দেবতাকে।

অনুতাপ

Repentance

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিঝরা শরতের এক বিমর্ষ দিন, গাছ-গাছালির পাতা চুঁইয়ে জল ঝরছে টুপ টাপ টুপ-টাপ। এই এক ধরনের অলস মন্থর জল ঝরার গান, প্রকৃতির মৃদু জবানবন্দী!

মঁসিয়ে সেভেল ঠিক তখনই ঘুম থেকে উঠে বসলেন, বিষণ্ণ ও খুঁতখুঁতে মুখ-চোখ। ভারাক্রান্ত মন, মুখে কুলুপ, কিন্তু চোখ বেয়ে টস টস করে জল গড়াচ্ছে। বিছানায় এলিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত তিনি ক্লান্তিতে ও ব্যর্থতায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন—একবার আগুনের কাছে, আর একবার জানালায়। আলো ও অন্ধকার নিয়েই তো মানুষের জীবন। কিন্তু তাঁর জীবনে সবটাই অমাবস্যা, আলোর ঝলকানি এখানে কখনো নেই। বাষট্টি বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি যেন কোন পৌরাণিক পুরুষ। স্থানীয় সকলে তাঁকে ডাকে 'ফাদার সে ভল' বলে, যদিও তিনি অবিবাহিত, এমন কোন আপনজন নেই, যার কাছে মনের রাশ আলগা ক'রে দিতে পারেন। দ্যুতিহীন চোখের কোণে কালি দিনের পর দিন গভীর হয়। আহঃ! এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যু কত না মর্মান্তিক। এই একাকীত্বের অন্তিম পরিণতির কথা ভাবতে গেলে সমস্ত মানসিকবৃত্তি অচল হ'য়ে যায়। অথচ মন স্নেহকাতর দয়া ও মায়ার মহিমান্বিত সমন্বয়—এমন স্পর্শকাতর মানুষটার কী করুণ পরিণতি।

নিজের মরুপ্রায় নিস্ফল অতীত জীবনের কথা ভাবছিলেন সেভেল। কোন দিনই স্বার্থকেন্দ্রিক নন। অথচ কোন মধুময় স্মৃতি তাঁর পাথেয় হয়ে নেই। মনে পড়ছে নেহাৎ প্রথম বয়সের ছবিগুলি, সেই মা-বাবার ঘরে দিন-রাত্তির কাটানো, তারপর যৌবন এলো, এলো কলেজ জীবন, এক-আধটা ভুল-চুকও হলো জীবনে, প্যারিসে শিক্ষালাভ, তারপর একদিন বাবার অসুখ বাড়লো এবং মারাও গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর এলেন মায়ের আশ্রয়ে। সংসারে তখন মোটে দু'টি প্রাণী, একজন বৃদ্ধা, একজন তরুণ। নিস্তরঙ্গ অনাড়ম্বর জীবন। একদিন মারও জীবনীশক্তি স্তিমিত হয়ে এলো, তিনি মারা গেলেন। গোটা পৃথিবীর সতেজ রঙটাই মুছে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল ছন্দ, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই দুঃসাধ্য। এরপর সারাটা জীবন তিনি একলা পথিক, কেউ নেই তাঁর পাশে। ঠিক এভাবেই একদিন সমাপ্তি টানবেন সেভেল। দুনিয়ার লোক ভুলে যাবে, সেভেল নামক একটি লোক একদিন বেঁচে ছিল। কী মর্মান্তিক নিষ্ঠুর সত্যি। প্রত্যাশায় যতই আবেগসিক্ত হওয়া যাক না কেন, এ পরিণতি অনিবার্য। সকলেই বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে, সুখে হাসবে, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় আনন্দে মশগুল হ'য়ে উঠবে; ব্যতিক্রম কেবল সেভেল, যাঁর অবস্থিতির কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কী বিচিত্র! মানুষ তো জানে, মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নয়। তবু পার্থিব সুখে তারা উল্লসিত হয়, পার্থিব বেদনায় তারা জর্জরিত হয়ে পড়ে। মৃত্যুর সম্ভাবনা যদি বিন্দুমাত্রও অনিশ্চিত হতো, মানুষের এই সুখ-দুঃখের তবু একটা বুনিয়াদ খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। দিনের পর যেমন রাত আসে, মৃত্যুও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। স্বাদহীন বর্ণহীন শুধু কতকগুলি সময়ের সমষ্টি ছাড়া তাঁর জীবনকালে কি বা আর উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে? প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর কিছু একটাও যদি তিনি করে উঠতে পারতেন। কোন দুঃসাহসের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাঁর নেই, কোন রূঢ় প্রত্যক্ষ প্রত্যাঘাতের সক্ষমতাও তিনি

কখনো অর্জন করেননি, উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্যের দুয়ারে কখনো তাঁর পদার্পণ ঘটেনি, ফললাভের প্রত্যাশায় তাঁকে কখনো উদ্বিগ্ন অস্থির হতে দেখা যায়নি। শুধু এক অদ্ভুত ক্লান্তির সুরে ভরা নিস্তরঙ্গ জীবন। তিনি যেন একটা নিরেট ধাতবখণ্ড, একই স্থানে বহুকাল অনড়। এই ধরনের রুটি ' মাপা জীবন, প্রকৃতার্থে যার মধ্যে ভারসাম্যহীনতাই খুঁজে পাওয়া যায়। দুনিয়ার আর পাঁচজনের মতো তিনি বিয়েটা অব্দি করে উঠতে পারেননি। কিন্তু কেন? কি এমন প্যাঁচে পড়েছিলেন যার জন্য সারাটা জীবন নারীসঙ্গহীনভাবে কাটাতে হলো তাঁকে? অবস্থা তো খারাপ ছিল না। পয়সা ছড়ালে ফরমাশ মতো কি না পাওয়া যায়? তবে কি বলতে হবে, বিয়ের আসনে বসবার মতো ফুরসৎ তাঁর হয়নি? হতেও পারে বা। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। মানুষ সাধারণতঃ নিজের চেষ্টাতেই সুযোগ করে নেয়। না, কোন দেমাকের কথা নয়, এটাই সত্যি। আসলে তিনি বরাবরই খুব উদাসী। নির্বিকারত্বই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এর জন্যই তাঁর জীবন এত শূন্যতাময়, এর জন্যই তিনি সমীহ আদায় করতে পারেননি। বিচিত্র মেজাজী মানুষ। বিছানা ছেড়ে ঘর ছেড়ে ইতি-উতি ঘুরে বেড়ানো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, কারুর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে তাঁর রুচিতে বেঁধেছে, পরিচিতজনের সঙ্গে একটিও অপ্রয়োজনীয় কথা তিনি বলতে চাননি, কোন সমস্যা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি,—এমন ধরনেরই মানুষ তিনি।

সেভেলের অভিজ্ঞতায় প্রেমের কোন ভূমিকা নেই। নারীর ভালোবাসার আবেগ, আবেশ ও জটিলতা তাঁর অজ্ঞাত। ব্যগ্র মিলন-প্রতীক্ষায় যে মধুর ক্রোধ ও অস্থিরতা সঞ্চারিত হয়, সেভেল কোনদিন তা অনুভব করেননি। এ ব্যাপারে যে মানসিক বিকলতা ও পারিপার্শ্বিক ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়, সেভেল তাদের কখনো মুখোমুখি হননি। পুরুষ ও নারী উভয়ে উভয়কে শারীরিকভাবে নিষ্পেষিত করতে করতে যে অপূর্ব পুলক অনুভূত হয়, অদ্যাবধি তা অনাস্বাদিত। নারীকে জয় করায় যে আনন্দ, তিনি তা থেকে বঞ্চিত। চুম্বনের রসাস্বাদন থেকে তিনি বহু দূরত্বে। এই সব বৈচিত্র্যের ভুবন থেকে নির্বাসিত থেকে বুঝি তাঁর আজ হাঁপ ধরে গেছে।

উষ্ণ ফেণ্ডারের উপর পা রেখে বসলেন মঁসিয়ে সেভেল। পরনে সাধারণ পোশাক, আগুনের সান্নিধ্যে তাপিত শরীর। কোন রকম হেঁয়ালি না করেই বলা যায়, তাঁর গোটা জীবনটাই ব্যর্থ। তবু—তবু, জীবনে তাঁর একদা ভালোবাসা এসেছিল। কিন্তু সেই ভালোবাসা ছিল অতি সঙ্গোপনে, বিশ্রীভাবে যন্ত্রণাদায়ক, উদাসীন। কূলকিনারা ভেবে সংযমী থাকবার তাঁর যে স্বভাব, তাই শেষঅব্দি অঘটন কিছু ঘটতে দেয়নি। তিনি প্রেমে পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গী সাভারের স্ত্রী মাদাম সাভারের। হ্যাঁ; এ রকমই নীরব মতিভ্রম ঘটেছিল তাঁর। আক্ষেপ হয়, কিশোর বয়স থেকে কেন ঐ মহিলার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ তিনি পাননি। জীবনের অনেকটা পথ সফর করে আসবার পর ওর সঙ্গে তাঁর প্রথম মুলাকাৎ। তখন সে এক বিবাহিতা নারী। যদি উপায় থাকতো, সেভেল নিশ্চয় তাঁর পাণিপ্রার্থী হতেন।

যদিও অশোভন ও অবৈধ, সেভেলের প্রেম ছিল অত্যন্ত গভীর। প্রথম দর্শনেই প্রেম এবং সেই অনুচ্চার প্রেম দীর্ঘকাল তাঁর সহচরী। আজ মোহ ও আবেগমুক্ত অবস্থাতেও তিনি সব কিছু স্পষ্ট স্মরণ করতে পারছেন। যতবার ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, ততবারই বিদায়-লগ্নে অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁর বুক ভরে গেছে। বহু বিনিদ্র রাতে সেই রমণীর কথাই তিনি শুধু চিন্তা করেছেন। আবার রাত যখন ভোর হয়, তাঁর ক্লান্ত মন বাস্তবকে মেনে নেয়।

মাদাম সাডারের স্বর্ণাভ রঙ, অটুট স্বাস্থ্য বাহান্ন বছর বয়সেও, দেখেই মনে হয় সে খুব সুখী। ইস, ও কি কোনদিন সেভেলের মনের ভাব বুঝতে পারেনি? অনুভব করেনি, এই পুরুষটি তারই ভালোবাসা পাবার জন্য পুড়ে ছাই হয়ে গেল? আচ্ছা, সেভেল যদি কখনো তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলতেন, তবে কি ভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করতো সে?

নিজেকে এরকম অজস্র প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে সদুত্তর খোঁজেন সেভেল। ফেলে আসা দিনগুলির যাবতীয় ছবি তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। মাদাম সাডার যখন পরিপূর্ণ যুবতী, তখন কত সময় না তাঁর ব্যয়িত হয়েছে ওর সঙ্গে কথা বলার আনন্দ পেতে? মাদাম সাডারের সুরেলা গলা ও উজ্জ্বল হাসি হয়তো অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল, সেভেলই যথালগ্নে সাড়া দিতে পারেননি।

সাডার এক ডেপুটি কালেক্টরের অফিসে কাজ করতেন। প্রতি রবিবার সেভেল ঐ পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে বের হতেন। মনে আছে, সেন নদীর তীরে সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। আশ্চর্য একটি বিকেল; মাদাম সাডারের খুব ঘনিষ্ঠ হবার সেদিন সুযোগ পেয়েছিলেন সেভেল। তাঁরা তিনজনে এসে পড়েছিলেন প্রথম বেলাতেই। পিকনিকের যাবতীয় সরঞ্জাম বয়ে এনেছিলেন। বাতাসে তখন বিচিত্র সুবাস, সর্বত্র এক আনন্দময় পরিবেশ। পাখিরা ডানা ঝাপটায়, গান গায়। সূর্যের অকৃপণ আলোতে নদীর জল ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি। এমন প্রাকৃতিক প্রভাবে মন স্বভাবতই অস্থির।

নদীর ধারে উইলো গাছের নীচে তাঁরা পিকনিক করেছিলেন। খেতে খেতে ভর দুপুর, মৃদুমন্দ বাতাস পরশ বুলিয়ে যায়। মদ তাঁরা একটু বেশীই পান করে ফেলেছিলেন। ফলে স্নায়ু আরো উত্তেজিত ও উন্মুখ।

খাওয়া-দাওয়ার পর সাডার তাঁর বিশাল পিঠ বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম, অত আরামপ্রদ দিবানিদ্রা তাঁর নাকি আর কখনো হয়নি।

তখন এরা দু'জনে—সেভেল এবং মাদাম সাডার—সেন নদীর তীর বরাবর হেঁটে চলেছেন। কখন যেন তাঁরা একে অপরের হাত আঁকড়ে ধরেছেন: মাদাম ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে সেভেলের। একসময় সে নিজের দেহভারই সঁপে দিয়েছে সেভেলের ওপর, আবেশে খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'আমি বিলকুল মাতাল হয়ে গেছি বন্ধু—আমি এখন একেবারে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।'

মাদামের প্রত্যাশাঘন চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে, উষ্ণ শরীরের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়ে সেভেল দিশেহারা, অবিবেচক শরীরে জ্বালা, হৃৎপিণ্ডটা অসম্ভব চঞ্চল।

তবু সময়টাকে বৃথাই হারালেন সেভেল। তাঁর হাত কাঁপলো, তালু ঘামলো, চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না—অপ্রতিরোধ্য সংস্কারে ও নীতিবোধের চাপে বিবর্ণ পাণ্ডুর হ'য়ে গেলেন তিনি।

মাদাম সাডার তখনো সুযোগ দিচ্ছে। ছুটে গিয়ে মাথায় গুঁজলো বুনোফুল ও পদ্ম; তারপর সেভেলের দিকে ঘুরে মিষ্টি হেসে অর্থপূর্ণ গলায় বললো, 'দেখতো এখন আমায় তোমার ভালো লাগে কি না!'

কোন জবাব দিতে পারেননি সেভেল।

কোন যুৎসই শব্দ সেই মুহূর্তে তিনি খুঁজে পেলেন না। মনে হচ্ছিলো, প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে তিনি শেষ হ'য়ে যাচ্ছেন, এখনই হয়তো পা দুমড়ে বসে পড়বেন।

মাদার হেসে উঠলো। অতৃপ্তির শানিত হাসি, 'বোকা রাজা, এমন করছো কেন? অন্ততঃ মুখে তো কিছু বলতে পারো।'

সেভেলের বুক ফেটে যাচ্ছে, কান্না ঠেলে উঠছে গলা বেয়ে, তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না।

সব মনে আছে। যেন এই সেদিনের কথা। আচ্ছা, সেদিন মাদাম সাডার কি বলতে চেয়েছিল? কিসের ইঙ্গিত জানিয়েছিল? দু'জনে এত ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ছিলেন যে, একে অপরের উত্তাপ টের পাচ্ছিলেন। মাদামের কান তাঁর গাল স্পর্শ করেছিল বেশ কয়েকবার। সেভেল প্রতিবারই সংকোচ ও ভয়ে মুখ সরিয়ে নিচ্ছিলেন। শেষে একসময় বলে উঠেছিলেন, 'আমাদের কি এখন ফেরা উচিত নয়?'

মাদাম কটাক্ষ করলেন, তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'নিশ্চয়।'

সেভেল সেই মুহূর্তে কিছু ভেবে উঠতে পারেননি। আজ সবটাই জলের মতো পরিষ্কার।

মনে আছে, সে তখনো বলেছিল, 'আমি আজ তোমারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করেছিলাম। এখন তোমার যদি ক্লান্তি এসে থাকে, তবে ফিরে চলো।

সেভেল বলেছিলেন, 'না, আমি ক্লান্ত নই। তবে এতক্ষণে হয়তো সাডার ঘুম থেকে উঠে পড়েছে।'

'ও! তুমি আমার স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয় করছো? বেশ, তবে চলো।'

ফিরবার পথে মাদাম আর তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়নি। এমন কি, সারাটা পথ নিঃশব্দ, একটা কথাও বলেনি। কেন? তখন এই প্রশ্ন তাঁর মাথায় ঘুরপাক খায়নি। কিন্তু আজ সেই রহস্য সমাধানে তিনি সমর্থ। কি হতে পারতো সেদিন সেই বিরল নির্জনতায়?

ভাবতে গিয়ে উত্তেজিত হন সেভেল। তাঁর মুখ রক্তাভ হ'য়ে ওঠে। এক লাফে তিনি উঠে পড়লেন। দেহ-মনে তিনি যেন এখন মাত্র তিরিশ বছরের যুবক। এখন

বুঝতে পারছেন, সেদিন তাঁর উচিত ছিল মাদাম সাভারকে সরাসরি প্রস্তাব রাখা, 'আমি তোমার প্রেমে পড়েছি।'

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যই সেরকম ছিল? আবার এক পাল্টা সন্দেহে তিনি পুড়তে থাকেন। তাঁর তো কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, সবটাই অনুমান। আহ! অভিজ্ঞতা না থাকলেও তিনি যদি সুযোগটা নিতে কিঞ্চিৎ সক্রিয় হতেন!

আপন মনে উচ্চারণ করেন সেভেল: আমি এই রহস্যের জবাব চাই। আমাকে আজ জানতেই হবে। তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে তৈরী হ'য়ে নিলেন তিনি। ভাবলেন: আমি তো আজ বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ, আর সেদিনের সেই রূপসী আজ আটান্ন বছরের প্রৌঢ়া। এখন আমরা অকপটে সব জানাতে পারি, জানতে পারি।

পথে নেমে চলতে শুরু করলেন সেভেল। হাঁটতে হাঁটতে সাভারের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। কমবয়সী ঝি দরজা খুলে দিলো।

'মঁসিয়ে সেভেল, আপনি এখন? কোন বিপদ হয়নি তো?'

'না, তেমন কিছু নয়। আমি শুধু একটা দরকারী কথা বলার জন্য তোমার কর্তামার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মুশকিল তো। তিনি যে এখন রান্নাঘরে নাসপাতির জেলি তৈরী করছেন। পোশাক যা পরেছেন, তা নিয়ে কোন ভদ্রলোকের সামনে বের হওয়া যায় না!'

'ঠিক আছে। তুমি গিয়ে বলো আমার কথা । ঠিকই বের হতে পারবেন।'

ঝিটি বিদায় নেবার পর সেভেল অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন।...দরজা খুলে মাদাম ঢুকলেন ঘরে। কপালের চামড়ায় ঈষৎ কুঞ্চন, দারুণ স্বাস্থ্য এবং হাসি হাসি মুখ—দেখলেই মনে হয় জীবনে তার সুখের অন্ত নেই। হাত দুটো থেকে টপ টপ করে জেলির রস গড়াচ্ছে।

'ব্যাপার কিগো, শরীর-টরির খারাপ নাকি?'

'না বান্ধবী। তবে আজ তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। উত্তরটা পাবার জন্য আমি আজ খুব অস্থির। জবাবটা কিন্তু সত্যি ও স্পষ্ট দেবে।'

মাদাম বললো, 'কথা আমি সব সময়ই স্পষ্ট করে বলে থাকি।'

'উত্তম। প্রথম দর্শনেই আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম। তুমি কি সেটা টের পেয়েছিলে?'

প্রথম বয়সী যুবতীর মতো খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো মাদাম, 'এতো দিনে মাথার পোকাটা জেগে উঠলো বুঝি? তবে জেনে রেখো, আমার প্রতি তোমার দুর্বলতা সম্পর্কে আমি প্রথম থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলাম।'

সেভেল কেঁপে ওঠেন, তোতলাতে থাকেন, 'তুমি জানতে! তবে...'

'তবে কি?'

'তুমি তো কখনো প্রকাশ করোনি।'

আবার মাদামের খিলখিল হাসি, 'আমি বলবো কেন? তুমিও তো কোনদিন আমাকে জানালে না।'

সেভেল ওর দিকে দু'পা এগিয়ে আসেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো, 'এবার বলো—বলো, সেই দিনটার কথা—সেই সেন নদীর পাড়ে নির্জন দুপুর—সাডার ঘুমিয়ে পড়েছে—আর আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছি। মনে আছে?'

মাদাম সাডার হাসি চেপে বললো, 'মনে আছে বৈকি।'

কাঁপতে কাঁপতে সেভেল বললেন, 'সেদিন—সেদিন যদি আমি দুঃসাহসী হয়ে তোমাকে লুঠ করতে চাইতাম?'

বিচিত্র সুখের হাসি হাসতে লাগলো মাদাম সাডার। তারপর স্বরে ঈষৎ বিদ্রূপ মিশিয়ে বললো, 'আমি বিনা বাধায় নিজেকে তোমার কাছে সঁপে দিতাম।'

—বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল মাদাম সাডার।

মাথা হেঁট সেভেল ছিটকে বেরিয়ে এলেন পথে। তিনি যেন কোন বিরাট বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত। বাইরে শুরু হ'য়ে গেছে বৃষ্টি। ভিজতে ভিজতেই ছুটছেন সেভেল। সোজা এসে দাঁড়ালেন সেই নদীর ধারে। হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হলেন স্মৃতিবিজড়িত সেই বিশেষ স্থানটিতে যেখানে একদা তিনি ও মাদাম সাডার অনেকটা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বুকের ভেতরে যন্ত্রণা। বিরলপত্র উইলো গাছটার নীচে বসে বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন সেভেল।

আলেকজাঁদ্র

Aleczard

প্রাত্যহিক নিয়ম মেনে সেদিনও ঠিক চারটের সময় আলেকজাঁদ্র তিন চাকার গাড়িটি ঠেলতে ঠেলতে এনে লাগালো মেরাম্বেলের ছোট-খাটো বাড়িটার সামনে। ডাক্তারের বিধান অনুযায়ী তার এই কর্তব্য—প্রতিদিন সে তার পঙ্গুত্বে অষ্টবক্র বৃদ্ধা প্রভুপত্নীকে ঐ ঠেলায় চাপিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে এবং ঘুরবে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত।

হাল্কা গাড়ি, এমনভাবে এনে রাখা হয়েছে যাতে বিশালবপু পঙ্গু রমণীকে সহজেই ওর ওপর তোলা যায়। বাড়িতে ঢুকতেই কানে এলো, বৃদ্ধ প্রভু প্রাক্তন সৈনিক সুগঠিত চোয়াল গৃহকর্তার গালিগালাজ, হম্বিতম্বি। কর্তা পদাতিক বাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি; মঁসিয়ে মেরাম্বেলের শুধু গলার আওয়াজ নয়, সেই সঙ্গে কপাটে-কপাটে ঠোকাঠুকির দড়াম-দড়াম শব্দ, চেয়ার টেবিল উল্টে পড়ার কর্কশ ধ্বনি-তরঙ্গ, ধুপধাপ পা ফেলার শাব্দিক মহড়া, যা শুনলে যে-কোন নতুন লোকের আত্মভ্রান্তি ঘটতে পারে। ছত্রখানকারে অগোছালো করা হচ্ছে গোটা বাড়িটাকেই যেন। তারপর হঠাৎ সব নিঝুম। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবার পর আলেকজাঁদ্র ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে এবং নিয়মের অনুবর্তী নিপুণতায় মেরাম্বেলের স্ত্রীকে দুই হাতে তুলে নিয়ে একটার পর একটা সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। অথচ এই পথটুকু পার

হতে হাঁপ ধরলো আলেকজাঁদ্রের নয় তার প্রভুপত্নীর। গাড়িতে উঠতে গিয়ে ক্লান্তিতে প্রায় ভেঙ্গে পড়লেন মহিলা। আলেকজাঁদ্র গাড়ির হাতল ধরে ঠেলতে শুরু করে। শুরু হয় তাদের পরিভ্রমণ।

এই একই পথ ধরে প্রতিদিন তারা ছোট্ট শহরটিকে পরিক্রমণ করে; পথের দু'ধারে দেখা হয় যত লোকের সঙ্গে, প্রত্যেকেই সসম্মানে অভিবাদন জানায়। যেন কোন মঞ্চে দাঁড়ানো যাদুকর তাঁর বুজরুকি ও ভেল্কি দেখিয়ে সকলের অভিনন্দন কুড়াচ্ছেন। সেই অভিনন্দনের অংশ পাচ্ছে আলেকজাঁদ্র নিজেও। আসলে এই বৃদ্ধা শহরের সকলেরই সম্মান ও ভালোবাসার পাত্রী। তাঁর সৎ প্রবৃত্তি এদের কাছে আদর্শ। আর এই প্রাক্তন অশ্বারোহী সৈনিক আলেকজাঁদ্র প্রত্যেকের কাছে আদর্শ একনিষ্ঠ পরিচারক। তার সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে রয়েছে ক্যাকটাস ও অর্কিডের মতো থোকা থোকা সাদা দাড়ি, যা তার বয়স ও ঐতিহ্যকে সমানভাবে প্রকাশ করে।

জুলাই মাসে সূর্যের অসম্ভব ঔজ্জ্বল্য ও দাবদাহে পথঘাট তেতে আছে, ঘরবাড়িগুলি ঝিমিয়ে পড়েছে। নেই কোন চাঞ্চল্য, প্রাণস্পন্দন বা উচ্ছল বালখিল্যতা। দেয়াল সংলগ্ন ছায়ায় শরীরটাকে গাঢ় ভাঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে কুকুরের দল ঝিমুচ্ছে। দৃশ্যত ও অদৃশ্যত এই প্রতিকূলতায় বেদম হ'য়ে পড়ছে আলেকজাঁদ্র, হাঁ করে দম নিতে হচ্ছে তাকে। লালিত্যময় ছায়া পাবার আশায় সে যত দ্রুত সম্ভব ঠেলাটা ঠেলতে থাকে নদীর দিকে, যেখানে একাধিক তরুবীথির সমাবেশে পরিবেশ মনোরম। পরিশ্রান্ত আলেকজাঁদ্রের প্রাচীন পেশীগুলি ফুলে ফুলে উঠছে এবং তখন শ্বেতবর্ণ আচ্ছাদনের নীচে মাদাম মেরাম্বেলের দুই চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু। ঠেলাগাড়ির রোখাচোখা গতি, মাদামের ছাতার প্রান্তভাগ দুলছে আলেকজাঁদ্রের মুখের ওপর, মাদাম ঘুমের আবেশে, পারিপার্শ্বিকতায় আর কোন চৈতন্য নেই।

নদী তীরে গাছের ছায়ায় পৌঁছেই মাদামের আরাম ও স্বস্তি বৃদ্ধি পেলো। নরম গলায় বললেন, 'অত জোরে চালিও না। গরমে যে মারা যাবার যোগাড়।'

যদিও তাঁর স্বর নরম ও সিক্ত, একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, মাদাম আলেকজাঁদ্রের পরিশ্রম দেখে করুণা করছেন; বরং এমন গাছগাছালির জমায়েতে মৌতাতটুকু উপভোগ করবার স্বার্থপরতায় তিনি পরিচারককে ধীরগতিতে গাড়ি ঠেলতে বললেন।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লেবুগাছের ছায়ায় এখানে চন্দ্রাতপ, উইলো ঝোপ দুটিকে দুলিয়ে দুলিয়ে চঞ্চল নদী তাভেৎ বয়ে চলেছে যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। নদীর জল পাক খেতে খেতে ছলকে উঠে আছড়ে পড়ে পাথরের গায়ে। জায়গায় জায়গায় বাঁক একটানা প্রবাহকে ভণ্ডুল ক'রে দেয়। নদীর কলতান তথা সিক্ততা আগে বাতাসের হাত ধরে ভেসে, ভ্রমণের এই চমৎকার স্থানটিকে সম্যক মনোরম করে তোলে।

পরিবেশের রমণীয়তায় উৎফুল্ল মাদাম মেরাম্বেল মন্তব্য করলেন, 'খুব ভালো লাগছে তো এখানটা। কিন্তু আজ একটা ব্যাপার ঘটেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই উনি খাটের উল্টোদিক দিয়ে নামলেন।'

আলেকজাঁদ্র বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'তাই নাকি মাদাম!'

গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আলেকজাঁদ্র এই পরিবারটির সেবা করে এসেছে নিজের বিপদ আপদ বা ওঁদের রুচি তথা খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে বাছবিচার তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। প্রথম জীবনে ছিল সেনাপতি মেরাম্বেলের অধীনস্ত একজন কর্মচারী, পরে পরিণত হয় তাঁর বাড়ির খানসামায়। এই পরিবারটিকে ছেড়ে দিতে কখনোই আলেকজাঁদ্র রাজী নয়, দারুণ মায়ায় আবদ্ধ সে, এঁদের সুখ সুবিধার প্রতি তার সতর্ক উজ্জ্বল দৃষ্টি। প্রভুপত্নী শারীরিক দিক থেকে বিকল হয়ে পড়বার পর, গত দু'বছরে তার কাজের বহর আরো বেড়েছে—রোজ বিকেল থেকে সন্ধ্যা অব্দি এই পঙ্গু রমণীকে ঠেলায় নিয়ে চক্কর কাটা। দীর্ঘদিনের আনুগত্যে ও নিরলস সেবায় বৃদ্ধ ভৃত্যের সঙ্গে প্রভুপত্নীর এক প্রীতিকর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এমন আত্মবিস্মৃত সেবা দুনিয়ায় বিরল। স্বভাবতই প্রভুপত্নী এই ভৃত্যের প্রতি মমত্ব অনুভব করেন।

নির্জনে, যেখানে নাগরিক জীবনের হাঙ্গামা হুজ্জুত অনুপস্থিত, তারা সাংসারিক বিষয়গুলি নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করে যে মনে হয় বুঝি পদমর্যাদায় তারা সমান-সমান। কখনো গভীর, কখনো কৌতুকোচ্ছল নির্ভীক আলোচনা। তবে বেশীর ভাগ সময়ই তারা আলোচনা করে কাপ্তেনের মানসিকতা নিয়ে—দিনে দিনে মানুষটা বড় বদরাগী ও খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠছেন। এক বিরাট হতাশার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন কাপ্তেন; বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু চাকুরি জীবনে যথেষ্ট দক্ষতা দেখানো সত্ত্বেও যথাযথ পদোন্নতি ও সম্মান তিনি পেলেন না। সামগ্রিকভাবে এই পৃথিবীর প্রতিই তাঁর তাই ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

মাদাম মেরাম্বেল তাঁর আগের কথার জের টেনেই বললেন, 'সকালে ঘুম থেকে উঠেই উনি খাটের উল্টোদিক দিয়ে নামলেন।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, অবসর নেবার পর থেকে এ রকম প্রায়ই তাঁর হয়। মনে হয়, গভীর বিতৃষ্ণায় তাঁর সচেতনতা লোপ পেয়ে যাচ্ছে!'

আলেকজাঁদ্র দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'ঠিক তা নয় মাদাম। এ ভুল তাঁর আরো পুরনো, কাজ ছাড়বার অনেক আগে থেকেই তাঁর এমন ভুল-ভ্রান্তি হতে শুরু করেছিল।'

'ঠিকই বলছো। ভাগ্য বরাবর তাঁকে ঠকিয়েছে। তখন তো মাত্র কুড়ি বছর বয়স, অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে পুরস্কার পেলেন। তাঁর আপাদমস্তকে তখন সৌভাগ্যের দ্যুতি, গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গেই আশা করেছিলেন—অবসর নেবার আগে অন্ততঃ কর্ণেল হতে পারবেন। কিন্তু বিভাগীয় একদেশদর্শিতা তাঁর গুণগুলিকে রেয়াত করলো না। কুড়ি বছরের যুবক পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ হ'য়ে গেলেন, তবু কাপ্তেনের ওপর আর উঠতে পারলেন না।'

নিরীহ আলেকজাঁদ্র কঠিন মন্তব্য করলো, 'কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য তিনিই দায়ী, তাঁর স্বভাবই দায়ী। অত রোখাচোখা লোককে উপরওয়ালারা কখনো পছন্দ করেন না। তাঁরা চান, অধস্তন কর্মচারীরা হবে ঘোড়ার চাবুকের মতো অনুগত ও সত্তাহীন;

স্পষ্টবাদী ও আত্মসম্মানসচেতন মেজাজী মানুষ কখনো উপরওয়ালার অনুগ্রহ পায় না।'

মাদাম মেরাম্বেলের মুখে অন্যমনস্কতার ছাপ। বিষণ্ণ দুশ্চিন্তায় ডুবে যাচ্ছেন তিনি। বছরের পর বছর স্বামীর নির্মম ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে আসছেন তিনি। সে কতকাল আগের কথা—তিনি এই মানুষটিকে বিয়ে করেছিলেন। তখন এক তরুণ সুদর্শন ভালো চাকুরে, দেখলেই ঝটিতি মুগ্ধ হতে হয়। সকলেই একবাক্যে সায় দিয়েছিল—এ ছেলের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। অথচ, ঐ বিয়েটাই প্রমাণিত হলো কত বড় অনর্থ, কী বিরাট ভুল! মেজাজ ও স্বভাবের দৌলতে সব নষ্ট হ'য়ে গেল।

মাদাম মেরাম্বেল নরম স্বরে বললেন, 'একটুখানি থামো না আলেকজাঁদ্র। তুমিও একটু বিশ্রাম করে নাও।'

বসে পড়ে আলেকজাঁদ্র অযৌক্তিক গর্বে ধবধবে মোলায়েম দাড়িতে হাত বোলাতে থাকে। মুঠো করে দাড়ি পাকিয়ে পেট অব্দি টেনে নামায় এক একবার, যেন তার দাড়ির দৈর্ঘ্য মাপছে।

মাদাম মেরাম্বেল আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, 'আমি না হয় ওকে বিয়ে করে সারাটা জীবন অত্যাচার ভোগ করে আসছি। কিন্তু তুমি কেন তা বছরের পর বছর সহ্য করে যাচ্ছ আলেকজাঁদ্র?'

গ্লানিহীন তৎপরতায় মাথা ঝাঁকিয়ে আলেকজাঁদ্র বললো, 'আমার কথা বাদ দিন মাদাম। আমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনবেন না।'

'সত্যি বলছি, ব্যাপারটা আমার কাছে বিস্ময়কর। আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন তুমি ওঁর আর্দালি ছিলে। কানুন অনুযায়ী ওঁকে তখন তুমি মানতে বাধ্য ছিলে। কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবনেও নিজেকে গেঁথে রাখলে কেন? কত সামান্য মাইনে পাও, কুৎসিত ব্যবহার, তবু তুমি মুখ বুজে নিশ্চল থেকে গেলে? তোমারও তো জীবনে সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে, আর সকলের মতো তুমিও তো বিয়ে-থা করে ছেলে-পুলে নিয়ে সংসারী হতে পারতে।'

আলেকজাঁদ্র আবার বললো, 'আমার কথা বাদ দিন মাদাম। আমি এ সব নিয়মের মধ্যে পড়িনা।'

কথাটা বলেই কেমন যেন সে অস্থির হ'য়ে ওঠে, নিজের লম্বা দাড়ি ধরে জোরে জোরে টানতে থাকে, তার বুকের কোন যন্ত্রণাঘন স্থানে যেন সে হাতুড়ি পিটছে। সে যেন চাইছে, এই মুহূর্তে নিজের হাতে দাড়িগুলিকে উপড়ে ফেলতে। ক্রমশঃ তার দৃষ্টি ব্যথিত, বিব্রত, সজল।

মাদাম মেরাম্বেল আপন মনেই বলে চলেছেন, 'তুমি তো নেহাৎ অশিক্ষিত গ্রাম্য নও, তুমি একজন লেখাপড়া জানা লোক—'

আলেকজাঁদ্র হঠাৎ সগর্বে বলে ওঠে, 'আমি আমিনের কাজ জানি।'

'অথচ, আমাদের কাছে থেকে জীবনটাকেই বরবাদ করে দিলে; কিন্তু কেন?'

সে তোতলাতে শুরু করে, 'এ-এ আর কি বলবো! কেন—এটা আমার স্বভাবের দোষ বলতে পারেন, মাদাম।'

'স্বভাবের দোষ! সে আবার কি?'

'মানে যদি কারও প্রতি অনুরক্ত হই, তবে সেই অনুরাগ চিরদিন অটুট থাকে। ব্যস, ঠিক এই কারণেই।'

মাদাম অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন,—'মেরাম্বেলের দয়া আর সৌজন্যে মুগ্ধ হ'য়ে সারাটা জীবন তাঁর কাছে রয়ে গেলে, আমাকে কি এটাই বিশ্বাস করতে বলছো?'

আলেকজাঁদ্র এবার দারুণ বিভ্রান্ত ও বিচলিত বোধ করে। ভাঙ্গা আসনটির ওপর তার শরীরটা নড়ে ওঠে। কোন রকমে বিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'আমি তাঁর জন্য নই, আমি আপনার জন্যই—'

মাদামের সুন্দর মুখে চমকের ছায়া। বিস্মিত বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তিনি তাঁর ভৃত্যকে দেখতে থাকেন। তাঁর মাথার তুষারশুভ্র কেশদাম রাজহংসের ডানার মতো শোভিত।

'আমার জন্য? হায় ভাগ্য! তুমি এ কি বলছো আলেকজাঁদ্র?'

স্বল্পভাষী লাজুক লোকটির অবস্থা এখন অবর্ণনীয়, গোপন কথা বলে ফেলে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, দৃষ্টি নামায় এবং ডাইনে-বাঁয়ে সুদূর প্রকৃতির রাজ্যে কি যেন সে খুঁজে বেড়ায়। তারপর একসময় মরিয়া হ'য়ে বলে ওঠে, 'আমি যখন প্রথম লেফ্‌টেন্যান্টের একটি চিঠি নিয়ে আপনার কাছে গিয়েছিলাম, আপনি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসেছিলেন এবং এক ফ্রাঁ পুরস্কার দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তেই যা হবার হ'য়ে গেল।'

মাদাম ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হ'য়ে গেল?'

ভয়ে বিবশ আলেকজাঁদ্র বলতে থাকে, 'তখন থেকেই আমি আমার প্রভুপত্নীর প্রতি আকৃষ্ট। তখন থেকেই।'

মাদাম নিরুত্তর। ওর দিকে তাকাচ্ছেন না। দয়া ও সহানুভূতিসম্পন্ন তিনি ভেবে দেখছেন গোটা ঘটনাটা। তিনি অনুভব করতে পারছেন, এই হতভাগ্য লোকটির প্রেমে কী গভীর নিষ্ঠা! সারাটা জীবন নিজের যন্ত্রণাকে গোপন রেখেছে সে।

কোন রকম বিদ্বেষ না রেখেই তিনি বললেন, 'চলো, ফেরা যাক।'

আবার তারা ফিরে চললো। পথে কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা। মারমুখি কাপ্তেনের প্রথম জিজ্ঞাসাই হলো, 'আজ রাতে খাওয়াটা কি হবে?'

'মুরগী আর ফ্লেজোলেতস্।'

খেঁকিয়ে উঠলেন কর্তা, 'শুধু মুরগী আর মুরগী। চুলোয় যাক তোমার এই মুরগীপ্রীতি! তুমি কি আমাকে এই সব অখাদ্য খাইয়ে মারবে নাকি?'

মাদামের হতাশ স্বর, 'ডাক্তারের যে তাই নির্দেশ, লক্ষ্মীটি!'

ক্রুদ্ধ কাপ্তেন যেন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন আলেকজাঁদ্রর ওপর, 'আমার অসুস্থতার জন্য এই হারামজাদাই দায়ী! পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কুৎসিত সব রান্না খাইয়ে আমার পেটের বারোটা বাজিয়েছে।'

মাদাম চকিতে মুখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ ভৃত্যের দিকে। চার চক্ষুর মিলন হলো। উভয়ের দৃষ্টিতে অকৃপণ, অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সান্ত্বনা।

গুপ্তজ্ঞান

Conceallеd Conception

প্রাক্ বিবাহিত জীবনে প্রেমের যে রীতি, তারা তখন যেন ছিল সৌর জগতে ভাসমান দুটি আত্মা, সম্পূর্ণ শুচিতা বজায় রেখে উভয়ের বিচরণ।

সমুদ্রের ধারে প্রথম তাদের সাক্ষাৎ। ঘটনাটা পূর্বরাগের সমার্থসূচক। কিশোরীর হাতে ঘোরতর ঘূর্ণায়মান রঙিন ছাতা এবং পরনে ঝকমকে পোশাক, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অনুকৃতিতে যুবকটির সে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। রূপের বাহারে সে যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ।

সামনে ঐ বিশাল সমুদ্রের পটভূমি, স্বভাবতই যুবক আন্তরিকভাবে পুলকিত হয়েছিল যৌবনের এমন বাহার দেখে। সামুদ্রিক বাতাসের অনর্গল ঝাপটায় সুন্দরীর সোনালী চুল নর্তনরত, গাত্রবর্ণও স্বর্ণাভ, চমৎকৃত না হ'য়ে উপায় কি? বাতাসে লবণাক্ত স্বাদ, রৌদ্রেও তরঙ্গায়িত হিল্লোল,—এমন পরিবেশে প্রেমের সংকল্প অবধারিত। তার ঈষৎ শিথিল শিরা-উপশিরাও চনমনে হ'য়ে ওঠে, সে ওর ভালোবাসা পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

মেয়েটির পক্ষেও প্রেমের সামিল হওয়া অনিবার্য, যেহেতু সে লক্ষ্য করেছিল, যুবকটি তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। তদুপরি, এর বয়স কম, পারিবারিক সুনাম ও স্বচ্ছলতা পর্যাপ্ত, রুচিবানদের মতো নিখুঁত আচার-ব্যবহার; সর্বোপরি, মেয়ে-ভুলানো মিষ্টি স্বরে সে কথা বলে থাকে। এই জাতের পুরুষ যে-কোন অবস্থায় যে-কোন মেয়েকে বশে আনতে পারে।

তারপর গুণে গুণে তিনটি মাস ধরে তারা পাঠ নিলো প্রেমের বর্ণপরিচয়ের, চোখে চোখ, হাতে হাত, অতি সরলমতি যুবক-যুবতী যেন, প্রায়শঃই দেখা যায় ইতি-উতি চক্কর কাটছে, যেন আকাশে যৌথ বলাকার বিহার। স্বভাবতই সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে, ভালোবাসার বেসাতিতে এরা বুজরুক নয়, একধরনের সাবেকি নিষ্ঠা লক্ষণীয়। প্রতিদিন স্নানের আগে এমন প্রেমলীলার উদ্যোগপর্ব, তারা তখন উভয়ে উভয়কে শুভেচ্ছা জানায় নতুন দিনটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে; আর তারা যখন পরস্পরকে বিদায় জানায়, তখন রাত্রির উষ্ণ হৃদয় প্রসারিত। যদিও পাত্র-পাত্রী হিসেবে তারা অতি উত্তম রাজযোটক, কিন্তু প্রাকবিবাহিত কালে তাদের সংযম বড় কঠিন, তারা কখনো অধরে অধর মেলায়নি; তারকা খচিত আকাশের নীচে, বালুময় ভূমির ওপর আচ্ছন্ন অবস্থায় তারা বহুক্ষণ পায়চারিরত, তাদের মৃদু কণ্ঠস্বরই সপ্রেম চুম্বনের স্বাদ বহন করে যেত বা। বিরাগ থেকে শত যোজন দূরত্বে অনুরাগে টইটম্বুর ওরা দু'জন পরস্পরকে শুধু মনে নয়, দেহেও কামনা করে, স্বপ্নে উত্তেজিত হয়,

জাগরণে আচ্ছন্ন থাকে, আর পাঁচজন প্রেম-মুগ্ধ নর-নারীর ব্যতিক্রম নয় তারা। সেই কারণে বেশ কিছুকাল সংযমী মুহূর্ত কাটাবার পর যখনই তারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করলো, তখন অসহনীয় নিরুত্তপ্ত বাঁধ ভেঙ্গে কামনার জোয়ার এলো যেন, নিষ্ঠার বর্মগুলি একে একে খুলে রেখে চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়সুখে তারা বার বার মগ্ন হয়, তখন এই অসহ্য সুখকর দৈহিক মিলনকেই তারা মনে করে প্রেমের পরম ফলশ্রুতি, কিছুই আর গোপনীয় নেই, সূক্ষ্ম রসবোধটুকুও মুছে যায় স্থূল দেহজ কামনায়। ক্রমে তাদের কাছে জান-খুশ্ ব্যাপার বলতে একটা জিনিসই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, —সেটা হলো দৈহিক মিলনের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করা। পঞ্চ ম'কারের সবচেয়ে উত্তেজক 'ম' নিয়ে রাতে তারা মেতে থাকে। এমনকি দিনের বেলাতেও তারা এমন সব ইঙ্গিত করে যা কেবলমাত্র কামনাজ্ঞাপক। কামের দুনিয়ার তারা দুই জবরদস্ত অতিথি।

কিন্তু এমন উত্তেজনা কোথাও কস্মিনকালেও স্থায়ী হয় না, এদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কিছুদিনের মধ্যেই জমাট ক্লান্তি এসে গ্রাস করে, কামপূর্ণ নেকনজরে আর আগের মতো চাকচিক্য নেই; অবিশ্যি কথা-বার্তায় তারা দু'জনেই এই স্বতঃসিদ্ধ ক্লান্তি প্রকাশে কুণ্ঠিত, কিছুতেই বলতে চায় না—আমাদের স্বয়ম্ভু ছলাকলাগুলি আর আগের মতো সাড়া জাগায় না। এর অর্থ অবিশ্যি এই নয় যে, তাদের মনোরঞ্জনী প্রেমে কোন খাদ ছিল। আসল কথা হলো, যতই চিত্তহারিণী হোক না কেন, সব কিছুরই একটা সীমা আছে! এই মুহূর্তে যৌথ জীবন আকর্ষণহীন, পুরনো মরচে ধরা, নারীর কাছে পুরুষটি আর ইস্পাত নয় এবং পুরুষটির কাছে এই নারীও আর বিদ্যুল্লেখা নয়। প্রেমযুক্ত কথাকে মনে হয় বস্তাপচা কপচানো বুলি, নতুন কিছু চাওয়ার নেই যেন!

এইভাবেই অতিক্রান্ত তাদের প্রেম আগাপাস্তলা বিবর্ণ, দেদার কসরতেও সে তার বিগত জৌলুস ফিরে পাবে বলে মনে হয় না, যদিও উদয়াস্ত তারা দুটিতে প্রেম-পুলক সঞ্চারের অভিনব পন্থা আবিষ্কারে ব্যস্ত, জটিল সব ছলাকলায় এক ধরনের হামাগুড়ি দেওয়া আর কি!

এখন আর মজা আসে না; বরং, কখনো কখনো মনে হয়, এ ধরনের উন্মত্ততা অসমীচীন। সদ্য বিবাহিতের সেই উল্লাস ক্রমশঃই কথঞ্চিৎ, শিরায় শিরায় আদৌ আর আগুনের দাপাদাপি নেই। একধরনের শিথিলতা ও অনুত্তেজক হাবিজাবি ভাবনা।

দেহের চাহিদা মেটাতে এখনো অবশ্য তারা প্রায়শঃই সঙ্গমরত, কিন্তু সেই প্রাণবন্ত মুহূর্তগুলির আয়ু অতি সীমিত, একটু পরেই নিশ্চল নিষ্কম্প ক্লান্তি নামে, নির্ঝরিণী আকর্ষণের পরিবর্তে বিতৃষ্ণাই প্রবলতর হ'য়ে ওঠে।

দৈনন্দিন জীবনে নেমে আসা এই অনভিপ্রেত বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে তারা নানা রকম ফন্দি আঁটে, বৈচিত্র্যের সন্ধান করে। চাঁদনি রাতে পাতাঘন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে

তারা মৌতাতের প্রতীক্ষা করে, কুয়াশাঢাকা পাহাড়ের দিকে চেয়ে অযাচিত কাব্যরসে নিজেদের আপ্লুত করতে চায়, আবার কখনো বা সামাজিক জমায়েতে খানিকটা হৈ চৈ করে আত্মপ্রসাদের সন্ধান করে।

ইত্যাকার ব্যর্থ উচাটন-নৃত্যে সুখ খুঁজবার কালে মাদাম আঁরিয়েতের মাথায় আচমকা একটা পরিকল্পনা এসে দানা বাঁধে; পলকে ডেকে সে বলে, 'চলো না গো, কোন হোটেলে। আমাকে তুমি খাওয়াবে।'

'বেশ তো, খাওয়া যাবে।'

'খুব নামী হোটেল হবে তো?'

'আলবাৎ।'

এক লহমায় পল বুঝলো, স্ত্রীর মনে নিশ্চয় কোন গোপন রহস্য রয়েছে, নচেৎ হঠাৎ হোটেলে খানাপিনার বায়না ধরবে কেন?

আঁরিয়েত একটু খুলেই বলে, 'হোটেল মানে আমি বোঝাতে চাইছি—কি যে বলি—মানে সেই রকম একটা রেঁস্তরা, যেখানে পুরুষরা তাদের বান্ধবীদের নিয়ে ফুরসৎ মতো এসে হাজির হয়, খানাপিনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ —এইসব আর কি!'

পল হাসে, 'বুঝেছি। বড় বড় কাফেতে এ রকম ঘর পাওয়া যায়, যেখানে ঢুকলে প্রেমিক প্রেমিকার রক্তে রিণিরিণি বেজে ওঠে।'

'ঠিকই বুঝতে পেরেছো তুমি, পল। কিন্তু সেই অভিজাত কাফে, যেখানে সদাচার সুন্দরীদের সমাবেশ ঘটে, তোমার যেন পূর্ব পরিচিত হয়। অর্থাৎ ওখানে তুমি এর আগেও দুপুরে—বা রাত্রে খানাপিনা করেছো এবং তোমার চিত্তরাজ্যে—না, থাক, আমি বলতে সাহস পাচ্ছি না।'

'ধ্যাৎ, বলেই ফেলো না প্রিয়া! আমার কাছে খুলে বলতে লজ্জায় এমন বে-এক্তেয়ার হয়ে যাচ্ছো কেন? আমাদের মধ্যে তো লুকোচুরির কোন ব্যাপারই নেই।'

'সাহস পাচ্ছি না।'

'আহা! একটিবার আমার কাছে সরে এসে নির্ভয়ে বলো। আমার পৌরুষসত্তা আদৌ আহত হবে না। বলো।'

'বলছি। বলছিলাম—আমি ওখানে তোমার প্রেমিকাটি সেজে যাবো, এবং তুমি ব্যবহার করবে মোহাতুর যুবকের মতো। কাফের লোকজনেরা, যারা অষ্টপ্রহর অমন ঝাঁঝালো ব্যাপার দেখছে, বুঝতেই পারবে না, আমরা স্বামী-স্ত্রী। আমরা গিয়ে বসবো সেই জায়গাতেই, যেখানকার সম্পর্কে তোমার কিছু পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে। মন চাইছে, ওখানে গিয়ে আমরা কুকর্ম করবো, যেন আমি তোমাকে প্রতারণা করছি।...না, না আর বলতে পারছি না। বড্ড লজ্জা করছে। এ রকম করে চেয়ে থেকো না,—দেখছো না, আমি কেমন পিয়নিফুলের মতো রাঙা হ'য়ে উঠছি।'

মজার স্বাদ পেয়ে পল হো হো ক'রে হেসে ওঠে, 'বহুত আচ্ছা। বান্ধবীকে নিয়ে পার্টিপরব সারবার অমন একটি জায়গা আমার জানা আছে বটে। আজ সন্ধ্যাতেই তোমাকে নিয়ে সেখানে আসর জমাবো।'

বাগান ঘেরা উঁচু কাঁটাতারের এমন এক রেঁস্তরায় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওদের দেখা গেল তরতরিয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গতে, ইতি-উতি যুবক-যুবতীর চাপা প্রেমালাপ, অনুচ্চ হাসি ও সরস টিপ্পনী। হলের মুখে গর্বিত হাসি, কিন্তু তার সুন্দরী গরবিণী স্ত্রী সেই মুহূর্তে ঈষৎ জড়সড়, মুখে লজ্জারুণ হাসি, সুডৌল ঘাড় ঘুরিয়ে পরিবেশের তাৎপর্য যাচাই করছে।

অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়েছে তারা। এটা ঠিক সেই ঘরগুলিরই একটি, যেখানে বহুধরনের দৃষ্টিকটু দৃশ্য অভিনীত হ'য়ে গেছে। এই নাতিদীর্ঘ পরিসরে চার চারটে ইজিচেয়ার, মস্ত একটা সোফা, আগাগোড়া যা অনিন্দ্যসুন্দর রক্তাভ ভেলভেটে মোড়া। আসবাবপত্র বলতে এইগুলিই, সামঞ্জস্যভাবে সাজানো।

ওরা ঢুকতেই কালো উর্দিপরা স্টুয়ার্ড মেনু-লিস্ট নিয়ে হাজির হয়। পল ও তার স্ত্রী পাশাপাশি এমনভাবে বসেছে যেন এখনই তারা একে অপরের সঙ্গসুখ পাবার জন্য উন্মুখ।

পল মেনু-লিস্টটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেয়, 'বলো, কি খাবে?'

'আমি জানি না। এখানকার সেরা জিনিস কি?'

পল ওভারকোটটা খুলে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর লিস্টের দিকে চোখ রেখে বেয়ারাকে বললো, 'আমাদের জন্য এই সব খাবারগুলি আনো, বিস্ক সুপ, ডেভিল চিকেন, সবজির স্যালাড, ফল ও মিষ্টি! এ সব খাওয়ার পর আমরা শ্যাম্পেন নেবো।'

বেয়ারা তেরচা চোখে পলের সঙ্গিনীকে দেখে মুচকি হাসে; মেনুটা তুলে নিয়ে সম্ভ্রম জানানো গলায় বলে, 'আপনি কি ধরনের শ্যাম্পেন পছন্দ করেন মঁসিয়ে পল, কড়া না, মোলায়েম?'

'খুব কড়া।'

এরা সব তার স্বামীর নাম জানে দেখে আঁরিয়েত্তের বেশ ভালো লাগছে। পলের আরো ঘনিষ্ঠতর হলো সে এবং আদর করে পল ওর গালে একটা মোলায়েম টোকা মারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোজনপর্ব শেষ। দশ-দশটা মোমবাতির কৃপায় তমোনাশ, পরিবেশজনিত জড়ত্ব কেটে যাচ্ছে, সামনে একখানা মস্ত বড় আয়না, যার বুকে দৃষ্টিশক্তি সুতীক্ষ্ণ এবং মনে হয় ওখানে যেন বহু মুক্তোখচিত মাকড়সার জাল ঝুলছে, দুলছে; দেয়ালে বিবিধ রঙের বর্ণচ্ছটা, যাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুন্দরী আঁরিয়েত তার পাত্রটি শূন্য করে ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বশরীর পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার অভাবে গুলিয়ে উঠলো। তবু পানে ক্লান্তি নেই, যেহেতু সে চাইছে—প্রচুর পরিমাণে এ্যালকোহল খেয়ে শরীরটাকে গরম করে তুলতে; শরীর গরম হলে আড়ষ্টতা থাকবে না, ফূর্তিটাকে পুরোমাত্রায় চাগিয়ে তুলতে পারবে। অপরপক্ষে, পলেরও দিকনির্দেশে ভুল নেই, ঢকঢক করে মদ গিলছে এবং মনের পর্দায় অতীতের সুখ-স্মৃতিগুলিকে ফিরে পাচ্ছে; হাত বাড়িয়ে সঙ্গিনীর হাত খুঁজে পায় ও ঘন ঘন চুমু খায়।

আঁরিয়েতের চোখ দীপ্তিময়, পরিবেশের সম্পূর্ণ শিকার হয়ে তার আসঙ্গ লিপ্সা ক্রমশই তুঙ্গে, স্বগ্নোক্তির মধ্যে এমন সব ইঙ্গিত করছে, যা নির্লজ্জ, অসহ্য সুখ সন্ধানে সে তার খনির দ্বার এখনই খুলে দিতে পারলে যেন বাঁচে!

বেয়ারা দু'জনের মুখে হাসি নেই, কারণ ওরা জানে—এ সময় তাদের নির্বিকার ও নিঃশব্দ থাকতে হবে, প্রতিদিন এমন বহুদৃশ্যের তারা নীরব সাক্ষী; ওরা তখন নিঃশব্দে প্রবেশ করে, টেবিলে খাবার সাজায় অথবা টেবিল পরিষ্কার করে এবং খরিদ্দাররা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করবার আগেই চলে যায়।

আঁরিয়েত একেবারে বেসামাল, রক্তআঁখি; পল ওর জানুতে থাবা বসিয়েছে, বার বার নুয়ে পড়ছে আঁরিয়েত; কামের প্রাবল্যে উদ্ভট সব কথা বলতে থাকে...এক সময় সে বলে, '......পল, আমাকে বলো! আমি সব জানতে চাই।'

'সোহাগিনী, কি জানতে চাও, বলো?'

'আমার যে বলতে বুক কাঁপছে—'

'নির্ভয়ে অবশ্যই তুমি আমার সঙ্গে—'

'আচ্ছা, আমার আগে তোমার কি অনেক প্রেমিকা ছিল?'

পল যেন দ্বিধায় পড়ে গেল। শত হলেও আঁরিয়েত তার স্ত্রী, তার কাছে নিজের এমন সৌভাগ্যের ইতিকথা খুলে বলা কি উচিত হবে?

আঁরিয়েত কিন্তু সমানে বকে চলেছে, 'ও, পল! বলো না, তোমার কি অনেক ছিল?'

'কেন এমন প্রশ্ন করছো? অনেক নয় কয়েকজন ছিল।'

'ক'জন?'

'জানিনা। সেসব কি আমার মনে আছে?'

'ঠিক কতজন বলতে পারছো না?'

'না, পারছি না।'

'তার মানে তাদের সংখ্যা ছিল অগুণতি।'

'তবে তাই।'

'একটু গুণে বলোনা, আমার জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।'

'লক্ষীটি, আমার একদম মনে নেই। এক একটা বছরে অনেক মেয়ে এসেছে আমার কাছে, আবার এমন এক একটা বছরও গেছে, যখন একটি সঙ্গিনীও আমার ছিল না।'

'তবু, আন্দাজ বছরে কতজন যুবতীকে পেতে?'

'কোন বছর কুড়ি থেকে ত্রিশ। আবার কোন বছর বড় জোর চার-পাঁচ জন।'

'ইস! তার মানে শ'খানেকের ওপর মেয়েকে তুমি—'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়।'

'ছ্যাঃ! নোংরা!'

'নোংরা, কেন?'

'কেন, নয়? ঐ সব মেয়ের গুষ্টি বেহায়া—সকলেই নিজের ঐ জিনিসটা চাখাতে পারলে যেন বর্তে যায়! ঘেন্নায় আমার গা গোলাচ্ছে! একশ'র ওপর!'

আঁরিয়েতের ঘৃণাসূচক ভাবান্তর দেখে পল ঈষৎ আহত হলো। পুরুষসুলভ বিজ্ঞতার ভান করে সে বললো, 'যার কাছে একশটা যুবতী বিরক্তিকর, তার কাছে একটি যুবতীর সঙ্গও অসহ্য মনে হবে।'

'না, তা কখনোই নয়।'

'কেন নয়, শুনি?'

'কারণ প্রেম একজনের সঙ্গেই সম্ভব। সেটা তো আসল কথা এবং প্রকৃত আনন্দের উৎস। একশ'টা যুবতীর সঙ্গে যে রঙ্গরস চলে তার নাম ব্যভিচার। বুঝে পাইনা, তুমি কি করে ঐসব নোংরা মেয়ের—'

'না, তারা নোংরা নয়। যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন।'

'মানতে পারলাম না। ওদের ওটা ব্যবসা।'

'বেশ; তবে ঐ ব্যবসার খাতিরেই নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখে।'

'ছ্যাঃ! ওরা যে নিত্য নতুন পুরুষের সঙ্গে বিছানায় যায়! এটা কি কোন রুচিবান পুরুষের ভেবে ঘেন্না পায় না? ইতরামি!'

'এই গেলাসে মদ খেতে তোমার ঘেন্না হচ্ছে না? সকাল থেকে কত খদ্দের তো এই গেলাসে চুমুক দিয়েছে! এবং এটাও ঠিক, গেলাসগুলি যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে ধোয়া হয় না।'

'চুপ করো! বড্ড বাড়াবাড়ি করছো!'

'তুমিই তো এ ধরনের প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলে।'

'আচ্ছা, এবার বলো তো,—ঐ একশ'জনই কি একজাতের মেয়ে?'

'তা কি করে হবে?'

'কি রকম তবে?'

'ওদের কেউ অপেরায় অভিনয় করে, কেউ অফিসে কাজ্ করে, কেউ আবার নিছক গৃহস্থ ঘরের মেয়ে।'

'গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ক'জন ছিল?'

'জনা দুয়েক।'

'রূপসী?'

'নিশ্চয়।'

'গণিকাদের চেয়েও?'

'না।'

'তুমি কাদের পছন্দ করতে? গণিকাদের, না ঐ সব সাধারণ মেয়েদের?'

'ঐ সব গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের নয়। বাজারের মেয়েদেরই আমার পছন্দ।'

'হা ঈশ্বর কি রুচি! কেন তোমার এই মত?'

'কেন না, সখের খাতিরে যারা দেহ বিলায়, তাদের আমার পছন্দ নয়।'

'কি সাংঘাতিক! তোমার সুরুচি বলতে কিছু নেই! নিত্য-নতুন ঐ জাতের মেয়েদের সঙ্গ তোমার ভালো লাগতো?'

'লাগতো।'

'খুব আনন্দ পেতে?'

'খুব।'

'ওরা কি সব একই রকম?'

'না।'

'মেয়েরা সব একই রকম হয় না?'

'মোটেই না।'

'কোন কিছুই কি এক রকম নয়?'

'কোন কিছুই এক রকম নয়।'

'আশ্চর্য! পার্থক্যটা কিসের?'

'সর্বত্র।'

'দেহেতেও?'

'নিশ্চয়।'

'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ?'

'অনেক তফাৎ।'

'আর কিসে তফাৎ?'

'কথা বলার কায়দায়, জড়িয়ে ধরবার নিয়মে, চুমু খাবার প্রক্রিয়ায়, ইত্যাদি সব কিছুতেই?'

'এই পার্থক্যগুলি বুঝি আসল আনন্দের উৎস?'

'ঠিক!'

'আচ্ছা, পুরুষে পুরুষে তফাৎ হয় না?'

'আমি বলতে পারবো না।'

'তুমি জানো না?'

'না।'

'নিশ্চয় তাদের মধ্যেও এরকম পার্থক্য রয়েছে।'

'নিশ্চয়।'

আঁরিয়েত গম্ভীর। তারপরই হঠাৎ কি ভেবে জড়িয়ে ধরলো পলকে, অশ্লেষে বললো, 'আমি তোমায় কত ভালোবাসি!'

পলও সাড়া দিলো। আঁরিয়েতকে কোলের উপর বসিয়ে নিলো সে। ঠিক তখনই একটা বেয়ারা এ ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেয়ে ফিরে গেলো। যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল সে, অন্তত মিনিট পাঁচেক ধরে পল ও আঁরিয়েত ব্যস্ত রইলো।

পাঁচ মিনিট পর আবার দেখা গেল আঁরিয়েতের হাতে পানপাত্র এবং সে আপন মনেই বিড়বিড় করে: হুঁ, ব্যাপারটা সত্যিই উপাদেয়!

নববর্ষের উপহার

For the New Year

নির্জন ঘরে একাকী ভোজনপর্ব সমাধা করলেন জ্যাক্ দ্যঁ বাঁদাল। তারপর বাবুর্চিকে ছুটি দিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন। বছরের এই শেষ দিনটিতে তিনি শুধু ব্যস্ত থাকেন রঙিন কল্পনা ও চিঠি লেখা নিয়ে। পিছনে ফেলে আসা বছরে যে সমস্ত বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেগুলিকে একে একে মনে করবার চেষ্টা করেন। অনেক ঘটনাই স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে, আবার অনেক বন্ধুর মুখ এই মুহূর্তে ভেসে আসছে এবং তাঁদেরই উদ্দেশ্যে চিঠির প্রথম ছত্রটি আন্তরিক প্রীতিতে তিনি লিখে ফেললেন:

'বন্ধু, নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও।'

দেরাজ খুলে তিনি একটি ছবি বের করলেন, এক মহিলার মুখাবয়ব, কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে ছবির ওপর চুমু খেলেন, ছবিটাকে প্যাডের ওপর রেখে নববর্ষের চিঠি লেখা শুরু করে দিলেন:

'আমার প্রিয়া ইরাণী,

আমি যে উপহারটি পাঠিয়েছি, নিশ্চয় তা তোমার হস্তগত হয়েছে। আজ, এই সন্ধ্যায় আমি একাকী ঘরবন্দী—'

এই পর্যন্ত লিখেই কলম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জ্যাক্, ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। ঠিক ছ'মাস আগে তাঁর জীবনে এই নারীর আবির্ভাব ঘটেছে, অন্যান্য প্রেমিকাদের চেয়ে সে অবশ্যই স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র ক্ষণায়ু দেহজ কামনায় যে সমস্ত নারীর সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা করা চলে, সেই সমস্ত পতিতা-চরিত্র নারীদের থেকে ইরাণী একেবারেই আলাদা। এই নারীকে তিনি নিখাঁদ প্রেমের মাধ্যমেই জয় করেছেন।

বয়সের মাপকাঠিতে জ্যাককে ঠিক তরুণ বলা চলে না, যদিও তাঁর নিটোল স্বাস্থ্য যৌবনদীপ্ত। অভিজ্ঞ বাস্তববাদী পুরুষ, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর মাপা ও হিসেবী, এমনকি কখনো উদ্দীপ্ত আবেগকেও তিনি যুক্তির মারফৎ যাচাই করে নেন। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাঁর এই হিসেবী চরিত্র লক্ষণীয়। বর্তমানে তাঁর চিত্তে ইরাণীর আবির্ভাব ঘটেছে, তার ভবিষ্যৎ কতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে, সে সম্পর্কে একজন ব্যবসায়ীর মতোই তিনি সতর্ক। তিনি জানেন, স্নেহ, প্রীতি ইত্যাদি মানবিক কারণে লালিত প্রেম স্বভাবতই মহৎ ও দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য!...

হঠাৎ দরজায় কলিংবেল বেজে ওঠে। পায়চারি থামিয়ে চিন্তা করলেন জ্যাক্, এখন তাঁর পক্ষে দরজা খুলে দেওয়াটা উচিত হবে কিনা। পরক্ষণেই ভাবলেন, হয়তো

কোন পথিক নববর্ষের রাত্রিতে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী এবং সৌজন্যের খাতিরেই তাকে আসতে দেওয়া উচিত।

কিন্তু দরজা খুলতেই প্রায় আঁতকে উঠলেন জ্যাক্। তার প্রেয়সী ফ্যাকাসে শবদেহের মতো দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার?'—বিস্মিত জ্যাক্ জিজ্ঞেস করেন।

'তুমি কি এখন একা?'—সে বলে।

'হ্যাঁ।'

'চাকর-বাকর কেউ নেই তো?'

'না।'

'তোমার এখন বাইরে যাবার মতো কোন কাজ আছে কি?'

'না।'

সে শ্লথগতিতে ভেতরে এলো, এ ঘরের সবকিছুই তার পরিচিত বলে মনে হয়, প্রথমেই একটা সোফার ওপর নিজেকে এলিয়ে দেয়, বিধ্বস্ত অবসন্নতায় দু'হাতে মুখ ঢেকে নিদারুণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বিচক্ষণ জ্যাক্ ওর পায়ের কাছে বসলেন, ওর দুটি নরম হাতকে মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে গলার স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'কাঁদছো কেন ইরাণী? তোমার কি হয়েছে খুলে বলো আমাকে।'

ইরাণী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'এ ভাবে আর আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।'

'কি ভাবে? একটু খুলে বলো।'

'বলছি, আমার পক্ষে বেঁচে থাকাটাই শক্ত। অনেক অত্যাচার আমি এতদিন সহ্য করে এসেছি। কিন্তু আজ বিকালে যা হলো—তারপর আর নয়। সে আমার গায়ে হাত দিয়েছে!'

'কে? তোমার স্বামী!'

'হ্যাঁ, আমার স্বামী!'

'বলো কি!'

জ্যাক এবার সত্যি অবাক হলেন। ইরাণীর স্বামী ওর গায়ে হাত তুলতে পারে—এতটা তিনি আশা করেননি। এ বড় বর্বরতা। জ্যাকের হিসেব যেন ঠিক মতো মিললো না। ইরাণীর স্বামী তো খুব একটা নীচুস্তরের লোক নন, রীতিমত ভারিক্কী, অভিজাত পরিবারের সন্তান এবং বহু সভাসমিতির সক্রিয় সদস্য। তিনি ঘোড়ায় চড়ে সখ মেটান, থিয়েটার দেখতে যান, অসিযুদ্ধে পারঙ্গম। গণ্যমান্যদের শিবিরে তাঁর যাতায়াত আছে, লোকে একডাকে চেনে, অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী, অনেক লোকই তাঁর ব্যবহারের প্রশংসা করে। শিক্ষাগত মান তাঁর খুব বেশী না হলেও তিনি নম্র ও সামাজিক—এমন একজন লোক, সামাজিক সংস্কারগুলিকে যিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর

আনুগত্য যে কোন সম্ভ্রান্ত রুচিশীল লোকেরই মতন, স্ত্রীর পোশাক স্বাস্থ্য সুখ ইত্যাদির প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল নজর। সর্বোপরি, স্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অদ্যাবধি তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। জ্যাক্ ইরাণীর বন্ধু হিসাবে তাঁর কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা এতকাল পেয়ে এসেছেন। জ্যাক্ ইরাণীর প্রেমিক হবার পর থেকে যেন ঐ সম্পর্ক আরো মধুর করে তুলেছেন ভদ্রলোক।

সুতরাং, জ্যাক্ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেননি, পরিবারটির ভেতরে এতখানি ঝড় বয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে তিনি তাই রীতিমত শঙ্কিত।

'কেন এমন ঘটলো?'

ইরাণী তার দুঃখের দীর্ঘ ইতিহাস জানায়।

বিয়ের পর থেকেই ইরাণী ও তার স্বামী বুঝতে পারেন, চারিত্রিক দিক থেকে তাঁরা দু'জনে দুই বিপরীত মেরুর। দিনের পর দিন সেই ব্যবধান বেড়েই চলেছে। লোকচক্ষুর আড়ালে তাঁদের ঝগড়া-ঝাটি চলেছে; স্বামী পরিণত হয়েছেন খিটখিটে মেজাজের, স্ত্রীর ওপর সব সময় সন্দেহের দৃষ্টি রাখেন, স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করে আনন্দ পান। গোপনে তিনি জ্যাক্‌কে দারুণ ঈর্ষা করেন। এরই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে আজ ইরাণীর গায়ে হাত পর্যন্ত তুললেন তিনি।

ইরাণী তার সিদ্ধান্ত জানায়, 'এখন আর আমি ওর কাছে ফিরে যাবো না। তুমি এখন আমাকে নিয়ে যা করবার করো।'

জ্যাক্ ওর মুখোমুখি বসে নিজের হাঁটু দিয়ে ওর জানুদ্বয় ঈষৎ প্রসারিত করে দিলেন, ওর হাত ধরে বিনীত স্বরে বললেন, 'তুমি নিজের সর্বনাশ করতে যাচ্ছো সোনা। স্বামীকে ত্যাগ করবার আগে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ আনতে হবে। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে নিজের মান রাখতে হবে তো!'

অস্থিরতার সঙ্গে ইরাণী বললো, 'তোমার কি পরামর্শ?'

'আমি বলছি, আজ বাড়ি ফিরে যাও। যতদিন না আইন অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তোমাকে এই সব সহ্য করতে হবে।'

'তোমার পরামর্শটা কি খুব নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে না?'

'না, এটাই যথার্থ বাস্তব যুক্তি, পরামর্শ। নিজের মর্যাদা, সম্মান রেখে এইভাবেই এগোতে হবে। বন্ধুরা তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে, আত্মীয় স্বজনরা তোমার স্বপক্ষে এসে দাঁড়াবেন। ঝোঁকের বশে এই সব সুবিধাগুলি হারানো বোকামি হবে।'

ইরাণী উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে বলতে থাকে, 'না, না। আমি আর ঐ নোংরামির মুখোমুখি হতে পারবো না। সেই জীবন আমি শেষ করেই এসেছি। খতম হয়ে গেছে সেই খেলা।'

ইরাণী জ্যাকের কাঁধে হাত রেখে তাকে আকর্ষণ করে, বড় বড় চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে, 'জ্যাক্, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ।'

'নিখাদ প্রেম?'

'আলবাৎ।'

'তাহলে আজ থেকেই আমাকে তোমার কাছে রেখে দাও।'

বিস্মিত বিব্রত জ্যাক্ বললেন, 'আজ থেকেই রেখে দেবো? আমার এই বাড়িতে? তোমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে? এর মানে কি জানো? এর মানে তোমাকে আমি চিরদিনের মতোই হারাবো! কোনদিনই আর আমাদের মিলন সম্ভব হবে না। পাগলামি ছাড়ো।'

ইরাণী ধমকায়, অভিজ্ঞা মহিলার মতো গম্ভীর স্বরে থেমে থেমে উচ্চারণ করে, 'জ্যাক্, তুমি তবে এবার আমার কথা শোন। আমার স্বামী আমাকে বারণ করেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি আর এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে তোমাকে সঙ্গ দিয়ে যেতে পারবো না। হয় আমাকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করো, না হলে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও।'

'ও ইরাণী, প্রিয়তমা! তুমি বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাও, আমি নিশ্চয়ই বিয়ে করবো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—তুমি আমাকে বিয়ে করবে! অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি করলেও ব্যাপারটা চুকতে বছর দু'য়েক তো বটেই! হুঁ, তোমার প্রেমে স্থৈর্য আছে বটে!'

'মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাপারটা ভেবে দেখো। আজ যদি তোমাকে আমি এখানে রেখে দিই, কাল সকালেই তোমার স্বামী এখানে এসে হানা দেবেন। নিজের স্বামীত্বের জোরে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন। যেহেতু আইন তাঁকেই সমর্থন জানাবে।'

'আমি তো এমন কথা বলিনি যে, আমাকে তোমার নিজের বাড়িতে রাখতে হবে। আমাকে তোমার পছন্দমতো অন্য কোন জায়গায় রাখতে পারো। আশা করেছিলাম, এতটুকু ভালোবাসা তোমার কাছ থেকে আমি পেতে পারি। আমারই ভুল। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমি চলি।'

চটপট দরজার দিকে এগিয়ে যায় ইরাণী। জ্যাক্ একরকম ছুটে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনেন।

'ইরাণী, শোন।'

সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে, বিড়বিড়িয়ে কোন রকমে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দাও জ্যাক্। আমি একাই ফিরে যেতে চাই। আমাকে একা যেতে দাও।'

জ্যাক্ কিন্তু জোর করে তাকে বসিয়ে দিলেন, নিজে বসলেন ওর হাঁটুর সামনে, নানা রকম যুক্তিতে শান্ত করবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু ইরাণী নিরুত্তর, কঠিন।

জ্যাকের যাবতীয় বক্তব্য শেষ হবার পর সে নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'এবার দয়া করে আমার যাবার পথ ছেড়ে দেবে কি? হাতটাও সরিয়ে নাও। আমি উঠবো।'

'ইরাণী!'

'যেতে দেবে কি?'

'তোমার প্রতিজ্ঞা কি অপরিবর্তনীয়?'

'আমাকে যেতে দাও।'

'এ ভাবেই ব্যবধানে সরে যাবে? নিজের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য একদিন তোমায় পরিতাপ করতেই হবে, আমি বলে দিলাম। যাবার আগে একবার সত্যি করে বলো—তোমার শপথের কি কোন খেলাপ হতে পারে না?'

'পথ ছাড়ো।'

'তবে থেকেই যাও। কাল ভোরে আমরা বেরিয়ে যাবো।'

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ইরাণী, 'দয়া দেখিও না জ্যাক্, আমি আর এখন মোহাবিষ্ট নই। আমি তোমার কাছে প্রেম চেয়েছিলাম, মর্যাদাপূর্ণ ভালোবাসা; নিষ্ঠুর করুণা নয়।'

'দাঁড়াও। দয়া বা করুণার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমার কাছে যা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল, তাই বলেছিলাম। এতে যদি তুমি এতই হতাশ বা ব্যথাতুর হয়ে পড়ো, আমার আর বলার কিছু থাকে না। এখন আমার বিবেক শান্ত। যা বলবে, তাই করবার জন্য আমি প্রস্তুত।'

জ্যাকের কথা শুনে আবার ফিরলো ইরাণী। অনেক কষ্টে তছনছ হয়ে যাওয়া মন যেন পেলব হয়ে উঠলো, পুরনো জায়গায় বসে শান্ত স্বরে বললো, 'তোমার যা বলবার গুছিয়ে বলো।'

জ্যাক্ অবাক, 'আমি আবার কি বলবো? কসম কেটেছো তুমি, আর বুঝিয়ে বলবো আমি?'

'হ্যাঁ, এই শেষ সিদ্ধান্তে আসার আগে তোমার যা যা মনে হয়েছে, আমাকে বলবে। তারপর আমি আর একবার চিন্তা করে দেখবো। আমার কি করা উচিত।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই ভেবে রাখিনি। মনে হয়েছিল, তুমি একটা বিরাট ভুল করতে যাচ্ছো; একজন দরদী মরমী বন্ধু ও প্রেমিক হিসেবেই তোমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার জেদ অনেক বড়। এবং তোমার এই জেদ বোকামি জেনেও আমি অসহায়, এতে সামিল না হয়েও আমার উপায় নেই। গত্যন্তর না থাকায় তোমাকেই সমর্থন জানাচ্ছি।'

'এত তাড়াতাড়ি যে মত বদলে ফেললে সেটাও স্বাভাবিক নয়।'

'শোন প্রিয়া, অজান্তেও কখনো আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাই না। আত্মত্যাগের কথাই ওঠে না। যেদিন থেকে অনুভব করলাম আমি তোমার প্রেমে পড়েছি—একেবারে একাত্ম হয়ে গেলাম, তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল, তোমার দুঃখে আমার বুক ফাটে। নর-নারীর প্রকৃত প্রেম পবিত্র, সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গীকার। সেই কারণেই তো তোমার সঙ্গে আমার ব্যবহার উচ্ছ্বাসপ্রবণ নয়, এতটা যুক্তিনিষ্ঠ।

বিবাহ জিনিসটা ঠুনকো নয়, এটা একটা বোঝার স্তূপ বয়ে বেড়ানো নয়। এর সামাজিক মূল্য যতটা আইনগত বাধ্য-বাধকতাও ততটা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রায়শঃই এতে নৈতিক সামর্থ্য যৎকিঞ্চিৎ। যে কারণে, মতের মিল না হলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, তাদের সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়ায় একটা

জগদ্দল পাথর মাত্র। তখন যদি সেই বঞ্চিতা নারী তার মনমতো পুরুষ খুঁজে পায়, তখন তার কাছে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে না। ঐ পুরুষটিও যদি বন্ধনহীন হয়, তবে নিশ্চয় তার বুকের মণিকোঠায় প্রেমিকাকে ঠাঁই দেবে। আমার মতে, তাদের তখন যে মিলন হবে, তা বিবাহের চেয়ে কম পবিত্র নয়, যদিও এক্ষেত্রে কোন বিচারককে সাক্ষী রাখা হয় না।'

'আমার বক্তব্য হলো, তারা উভয়েই যদি সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হয়, যদি তাদের আত্মসম্মানবোধ থাকে, তবে তাদের চূড়ান্ত মিলন ধর্মসাক্ষী রেখে সামাজিক বিয়ের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর, গভীর ও স্বাস্থ্যকর।'

যে নারী এতটা পথ অতিক্রম করে তার বিচার বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখা উচিত। সে যে এতটা ঝুঁকি নিয়েছে, তা অনেক ভেবে-চিন্তেই। এটা নেহাৎ কৌতূহলবশত সম্ভব নয়। এ সমর্পণ ব্যাপক— মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহ, সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সমর্পণ। তার মানসিক স্থৈর্য তখন অসাধারণ, স্বভাবে স্থিতপ্রজ্ঞ, সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকিবহাল। যে কোন রকম দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিতে সে তখন পিছু-পাও হবে না। যে স্বামী ও সমাজ তার সঙ্গে তঞ্চকতা করেছে, সে তাদের বিরুদ্ধে কার্যত এক জেহাদ ঘোষণা করবে। তাই দাম্পত্যশুচিতা রক্ষা না করেও সে দর্পিতা, সাহসিক। সেই কারণেই তার প্রেমিকও তাকে নিঃশর্তে সমর্থন জানিয়ে যাবে, তা সে যতই ভুল ও ঝুঁকিবহুল সিদ্ধান্ত হোক না কেন।'

'শুরুতে আমি ছিলাম অত্যন্ত হিসেবী ও সতর্ক। তাই তোমার সিদ্ধান্তের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আমার মধ্যে একটি লোকই বেঁচে রয়েছে, যে তোমায় ভালোবাসে। এবার জানাও, আমার কী করণীয়?'

আহ্লাদে আনন্দে উজ্জ্বল ইরাণী জ্যাককে জড়িয়ে ধরে প্রগাঢ় চুম্বন করে, আদুরে গলায় বলে, 'প্রিয়, আমি এতক্ষণ যা তোমায় বলেছি, তার একটিও সত্যি নয়। আমার স্বামী মোটেই সন্দেহ করেনি, অত্যাচার তো দূরের কথা। আমি শুধু তোমাকে একটু বাজিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। এটাই আমার আকাঙ্খিত নববর্ষের উপহার—তোমার সদ্য পাঠানো নেকলেসটির পাশে এই উপহারটি অদ্ভুত উদ্দীপক হয়ে থাকবে নতুন বছরে। অনেক—অনেক ধন্যবাদ। ঈশ্বরের অসীম করুণা, তাই তোমার কাছ থেকে এতবড় জিনিসটি আজ পেলাম।'

প্রহরী কুকুর

The watch dog

সংসারে লোক বলতে মাত্র দু'জন। মাদাম লেফেবার আর তার চাকরাণী রোজ। নরম্যাণ্ডির একটি সদর রাস্তার পাশেই বাড়িটি। সামনে কিছু খোলা জমিও আছে—সেখানে চাষ হয় নানা রকম সবজি। সরল গ্রাম্য মেয়ে রোজ। কিন্তু তার মালিক ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বিধবা মাদাম লেফেবার ছিল খুব চটপটে। যাই হোক, একভাবে কেটে যাচ্ছিল ছোট্ট সংসারটা। একদিন রোজের খেয়াল হলো ওদের কিছু পেঁয়াজ চুরি হয়েছে। এই ঘটনা জানার পর দু'জনেই চিন্তায় পড়ল। তারা ভাবল, চোর যখন একবার এসেছে তখন আবারও আসবে। এ অবস্থায় কি করা যায়! মাদাম দেখলো চোরের স্পষ্ট পায়ের ছাপ রয়েছে। মাদাম রোজকে বলল, 'রোজ, দেখ দেখ, চোর এই পথ দিয়ে ফুলবাগানের মধ্যে দিয়ে দেয়াল টপকেছে।'

এই ঘটনায় দু'জনেই দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুমুতে পারল না। চোরের আলোচনায়ই রাত কাবার।

খবর শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলো মাদামের বাড়িতে। সকলেই পরামর্শ দিল, একটা শিকারী কুকুর রাখবার জন্য। মাত্র দু'জন মেয়েছেলে বাড়িতে থাকা ঠিক নয়। একটা কুকুর থাকলে তবু কিছুটা ভরসা তো অন্তত পাওয়া যাবে। আর চোর ঢুকলে কুকুরের চীৎকারে আমরা প্রতিবেশীরাও আসতে পারবো। এই পরামর্শ দিয়ে তারা যার যার কাজে চলে গেল।

এই চিন্তা মাদামকে ঘিরে রাখলো অনেকক্ষণ। তার বড় চিন্তা, কুকুর পুষলে তো তাকে খাওয়াতে হবে, এতে তার উৎসাহে ভাঁটা পড়লো।

রোজ কিন্তু নাছোড়বান্দা, কুকুর একটা সে রাখবেই। তখন ঠিক হলো কুকুর একটা রাখা হবে তবে মূল্যের বিনিময়ে নয়, যদি এমনি পাওয়া যায় আর কুকুরটিও ছোট জাতের হয়।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ছুটে এসে দরজা খুলে দিয়ে রোজ তো বিস্ময়ে বিমূঢ়, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক রুটিওয়ালা! তার কোলে ছোট্ট একটি কুকুরের বাচ্চা। হলুদ রঙের বড় বড় লোমে ঢাকা কুকুরটি দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

মাদামেরও কুকুরটি দেখে খুবই পছন্দ হল। তার আরো আনন্দ হল রুটিওয়ালা যখন বলল, পীয়েরোর জন্য কোন মূল্য দিতে হবে না।

কিন্তু কোন আগন্তুক বাড়ির সীমানায় এলে চীৎকার করা তো দূরে থাক বরং কুকুরটি গিয়ে তার পা চাটতে আরম্ভ করতো।

যা হোক, মাদাম কিন্তু কুকুরটিকে খুব ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিল। নিজে হাতে মাংসের ঝোল মাখা রুটি খেতে দিত তাকে।

হঠাৎ মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আট ফ্রাঁ দাবীর এক নোটিশ এলো মাদামের নামে। কুকুর রাখার জন্য এই দাবী।

পীয়েরোকে এইবার বিদায় করতেই হবে। যে কুকুর ভুলেও একবার ডাকে না তার জন্য আট ফ্রাঁ ট্যাক্স! হা ঈশ্বর! এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে। কিন্তু কে নেবে তার পীয়েরোকে? ধারেকাছে কেউ এমন একজনও নেই! অগত্যা ঠিক হলো গ্রামের লোকেরা অবাঞ্ছিত কুকুরদের যে চক খনিতে ফেলে দেয়, সেখানেই পীয়েরোকে ফেলে দেওয়া হোক। ওখানকার কাণ্ডকারখানা খুবই ভয়ানক। পূর্বের ফেলে দেওয়া কোন কুকুর হয়তো তার পূর্বের ফেলে দেওয়া কুকুরের মাংস খেয়ে শেষ করে ক্ষুধায় ছটফট করতো। তখন আর একটি সতেজ কুকুরকে এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন সেই সতেজ কুকুরটি ও পূর্বের ফেলে দেওয়া কুকুরটি জ্বলন্ত চোখে ঝাঁপিয়ে পড়তো পরস্পরের প্রতি। এ অবস্থায় ধরে নেওয়া যায় নতুন কুকুরটি জয়ী হয়ে বিজিত কুকুরটিকে খেয়ে ফেলতো।

মাদাম লেফেবার ও রোজ নিজেরাই পীয়েরোকে চক খনিতে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। লোক নিয়োগ করলে আবার খরচ করতে হবে। সন্ধ্যা হতেই পীয়েরোকে জন্মের মত বেশ ভালভাবে খাইয়ে রোজ কোলে তুলে নিলো তাকে এবং মাদামকে সঙ্গে নিয়ে চক খনিতে গিয়ে উপস্থিত হলো।

জায়গাটা খুবই অন্ধকার এবং শুনশান। একদম নিস্তব্ধ। রোজের মন কিন্তু দুঃখে ভারাক্রান্ত। তবু উপায় নেই। উঁচু করে তুলে গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললো কুকুরটাকে। ভিতরে কি হয় শুনবার জন্য গর্তের পাশে বসে রইলো উদ্‌গ্রীব হয়ে। একটা শব্দ মাত্র। তারপরই আহত কুকুরের আর্তনাদে চক খনির আকাশ বাতাস ভরে উঠলো।

ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে। সূর্যের ঝলমলে সোনালী আলো এসে পড়েছে তার গায়ে।

চোখ খুলতেই মনে পড়লো গত রাত্রির ঘটনা। ছুটলো চক খনির দিকে। পীয়েরো তখনো চীৎকার করছে। মাদাম চিন্তায় পড়লো। ভাবলো পীয়েরোকে ফিরিয়ে নিতে হবে। খনির মালিকের কাছে গিয়ে বললো সমস্ত ঘটনা।

মালিক শুনে কুকুরকে তুলে দেবার জন্য চার ফ্রাঁ দাবি করলো।

শুনে আঁতকে উঠলো মাদাম, চার ফ্রাঁ! অসম্ভব।

মালিক বললো, ঐ কুকুর যদি পাগলা হয়ে আমাকে কামড়ে দেয় তখন কি হবে? কুকুরটাকে গর্তের মধ্যে ফেলবার কি দরকার ছিল।

মাদাম বিমর্ষ হয়ে ফিরে এলো।

সবিস্তারে বললো সব রোজকে।

রোজ পরামর্শ দিলো, চলুন, বরং পীয়েরোকে কিছু খেতে দিয়ে আসি, তাহলে তো আর সে না খেতে পেয়ে মরবে না।

যুক্তিটা মাদামের খুব মনে ধরলো।

দু'জনে মিলে রুটি নিয়ে ছুটলো গর্তের ধারে।

পীয়েরোকে ডেকে টুকরো রুটি ছুঁড়ে খাওয়াতে লাগলো তারা। পীয়েরোও আনন্দের সঙ্গে খেতে লাগলো। প্রতিদিন এই চলতে লাগলো।

কিন্তু একদিন পীয়েরোর নাম ডেকে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিতেই অন্য কুকুরের ডাক শুনতে পেলো। গর্তের মধ্যে আর একটি বড় কুকুরকে ফেলা হয়েছে। যতবার ওরা রুটির টুকরো ছোঁড়ে ততবারই সেই বড় কুকুরটা খেয়ে নেয় আর পীয়েরো কুঁই কুঁই করতে থাকে কিন্তু কিছুই খেতে পায় না।

মাদাম ও রোজ স্তম্ভিত। মাদাম খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললো, আমি তো আর সব কুকুরকে খাওয়াতে পারি না। এ অসম্ভব। চল রোজ, এবার ফেরা যাক।

মাদাম ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ির পথে ফিরলো। মেজাজ এত খারাপ ছিল যে মাদাম পীয়েরোকে খাওয়াবার রুটির টুকরো হাতে নিয়েই ফিরলো। অগত্যা রোজও চোখের জল মুছতে মুছতে মাদামকে অনুসরণ করলো।

হাত

The Hand

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট মঁসিয়ে বারমিউতুঁর সেন্ট ক্লাউডের রহস্যময় ঘটনা সম্পর্কে নিজের অভিমত জানাচ্ছেন; তাঁকে গোল ক'রে ঘিরে আছে অনেকে। গত একমাস ধরে এই দুর্বোধ্য অপরাধকে কেন্দ্র ক'রে তামাম প্যারিস উত্তাল। কেউই এর মাথামুণ্ডু কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারছে না।

মঁসিয়ে বারমিউতুঁর ফায়ার প্লেসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, সমস্ত তথ্যগুলিকে একত্রিত ক'রে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু কোন উপসংহার টানতে পারছেন না।

একদল মেয়েমানুষ তখনো দাঁড়িয়ে আছে, চেষ্টা করছে তাঁর কাছাকাছি যাবার, তাঁদের দৃষ্টি আটকে আছে ম্যাজিস্ট্রেটের চক্চকে মুখের ঠোঁটের ওপর; যখনই তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, এরা কেঁপে উঠছে, রোমাঞ্চিত হচ্ছে। তারা ভয়, লোভ ও বাসনার কামড়ে স্নায়ুজর্জর।

তাদের মধ্যে একজন সবচেয়ে বিবর্ণ। ম্যাজিস্ট্রেট বলতে বলতে বারেকের জন্য থামলে সে মন্তব্য করে, 'এ বড় ভয়ানক। অলৌকিক ব্যাপার। কেউই এ রহস্য ভেদ করতে পারবে না।'

ম্যাজিস্ট্রেট তার দিকে ঘুরে তাকালেন। বললেন, 'হ্যাঁ, মাদাম। সম্ভবত কেউই পারবে না। যেহেতু, আপনি যে 'অলৌকিক' শব্দটি ব্যবহার করলেন, তার সঙ্গে বর্তমান ঘটনাব কোন সম্পর্ক নেই। আমরা একটা সুপরিকল্পিত ও দক্ষতার সঙ্গে সংঘটিত এক অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করছি। আপাতঃভাবে ঘটনাটা এমন রহস্যময়

যে, আমরা সঠিক আলো দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার জীবনে একবার এমন ঘটনাও ঘটেছে, যার অলৌকিকত্বকে আমি অস্বীকার করতে পারিনি। আমি ও ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি, সেটা চিরকালই রহস্যাবৃত হয়ে রইলো।'

কয়েকজন মেয়েমানুষ সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে, 'গল্পটা আমাদের শোনান না!'

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের মতনই মৃদু গম্ভীর হাসি হাসলেন মঁসিয়ে বারমিউতুঁর। 'কিন্তু দয়া করে মনে করবেন না,' তিনি বলতে শুরু করেন, 'যে আমি একমুহূর্তের জন্যও সেই রোমাঞ্চকর ঘটনার পিছনে অলৌকিক কোন কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। আমি যা স্বাভাবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য, একমাত্র তাতেই আস্থাশীল। আসলে 'অলৌকিক' শব্দের চেয়ে 'দুর্বোধ্য' শব্দটিই আমার পছন্দ। যাক, যে গল্প বলতে যাচ্ছিলাম, শুনুন:

তখন আমি এ্যাজাকিওর তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট। ছোট্ট সুন্দর শহর—সমুদ্রতীরে পাহাড়বেষ্টিত তার সৌন্দর্য অনুপম।

ঐ শহরে শরিকী নাটকীয়, সাংঘাতিক ও সাহসিকতাপূর্ণ বংশগত বিবাদ ও সংঘর্ষ সবসময় লেগেই থাকতো। ওখানে গিয়ে আমি এই ব্যাপারে কত যে ভয়ানক রোমাঞ্চকর গল্প শুনেছি এবং প্রত্যক্ষ ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই! দু'বছর ধরে আমি কেবল খুনকা-বদলা-খুন-এর গল্পই শুনে এসেছি, এখানকার মানুষগুলি স্বভাবে এখনও আদিম, আইন-কানুন যে যার নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে। স্বচক্ষে দেখেছি একাধিক বৃদ্ধের কাটা মাথা, সপরিবারে নিহত হয়েছে এক একজন। আমার মাথা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো শুধু ঐ সব খুন-খারাপির গল্পে।

একদিন শুনলাম, একজন ইংরেজ ভদ্রলোক কয়েক বৎসর যাবৎ উপসাগরের তীরে একটি ছোট্ট ভিলা ভাড়া নিয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে ভার্সাই থেকে সংগ্রহ করে আনা একটি ফরাসী চাকরও আছে।

শীঘ্রই প্রত্যেকের কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হয় এই অজানা বিদেশীর ওপর, যিনি বড় একটা বাড়ি থেকে বের হতেন না, একমাত্র শিকার বা মাছ ধরতে না গেলে। কারুর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না, কোনদিন শহরের দিকে যাননি। প্রতিদিন সকালে দু-এক ঘন্টা করে পিস্তল ও হাল্কা বন্দুক নিয়ে নিশানায় অভ্যস্ত হতেন।

তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন উপকথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের ধারণা, লোকটি বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব—রাজনৈতিক কারণে জন্মভূমি ছেড়ে চলে এসেছেন এখানে। এরপর আবার শোনা গেল, সাংঘাতিক এক অপরাধ করে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন মানুষটি। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে নানান সব ভয়ংকর কথা ভেসে বেড়াতে থাকে।

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আমিও ঐ লোকটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী হই। কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব। তিনি নিজের নাম দিয়েছিলেন জন রাওয়েল বলে।

আমি তাঁর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখলাম; কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলাম না।

কিন্তু গুজব ক্রমশঃ তুঙ্গে ওঠায় আমি স্বয়ং ঐ বিদেশীর সঙ্গে মুলাকাতে উৎসাহী হলাম। আমি তাঁর ভিলার সম্পত্তির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন গুলিতে লক্ষ্যভেদের মহড়া শুরু করে দিলাম। দীর্ঘদিন ধরে আমি সুযোগ খুঁজছিলাম। অবশেষে সুযোগ মিললো। আমার গুলিতে বিদ্ধ একটি পাখি গিয়ে পড়লো তাঁর বাগানে। আমার কুকুরটা মুখে ক'রে নিয়ে এলো সেই আহত পাখিটাকে। আমি এই সুযোগে চললাম স্যার জন রাওয়েলের কাছে নিজের এই কাজের জন্য ক্ষমা চাইতে ও পাখিটাকে তাঁরই হাতে তুলে দেবার জন্য।

তিনি বিশালদেহী, মাথার চুল লাল, দাড়ি লাল, যেমন লজ্জায় তেমনি চামড়ায়—এ যুগের এক ভদ্র ও আকর্ষণীয় হারকিউলিস! সেই মুহূর্তে বৃটিশ সুলভ কোন কাঠিন্য আমি তাঁর ভেতরে দেখতে পাইনি, সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন; তাঁর ফরাসী উচ্চারণে ইংলিশ চ্যানেলের অন্য পাড়ের টান নিশ্চয় ছিল।

ঐ মাসের মধ্যেই আমাদের আরো পাঁচ-ছ'বার মুলাকাৎ হয়েছিল।

এক সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় নজরে এলো, ভদ্রলোক বাগানের চেয়ারে দোল খেতে খেতে পাইপ টানছেন। আমি তাঁকে নমস্কার জানাতেই তিনি আমাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ করলেন। এক গ্লাস বিয়ারও পান করালেন।

তিনি আমার সঙ্গে ব্যবহারে ইংরেজসুলভ সমস্ত সৌজন্যবোধই মেনে চলছিলেন। কর্সিকা ও ফ্রান্সের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করলেন।

তারপর যথেষ্ট সাবধানে ও হাস্যকৌতুকের মধ্যে আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে দু-একটি প্রশ্ন করতে শুরু করি। তিনি উত্তর দিচ্ছেন এতটুকুও বিব্রতবোধ না করে; বললেন, ভ্রমণে তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতা আছে,—আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও অ্যামেরিকা চষে বেড়িয়েছেন তিনি। হেসে মন্তব্য করলেন, 'হ্যাঁ, জীবনে আমার অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আছে।'

নিজের মন্তব্যের সমর্থনে তিনি একের পর এক শিকারের গল্প বলে চললেন। তিনি জলহস্তী শিকার করেছেন, বাঘ মেরেছেন, এমন কি গরিলাও খতম করেছেন।

'এরা তো সব ভয়াবহ জন্তু'—আমি অনুধাবন করি।

'না, এরা তেমন ভয়াবহ নয়,' তিনি সামান্য হেসে বলেন, 'সবচেয়ে ভয়ানক হলো মানুষ।' বলেই তাঁর স্মিত হাসি সরব হাসিতে রূপান্তরিত হয়, একজন দিলখোলা ইংরেজ যেভাবে হেসে থাকে।

'জীবনে আমি মানুষ শিকারও প্রচুর করেছি।'

তারপর তিনি অস্ত্র সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। এবং আমাকে আহ্বান করে নিয়ে গেলেন বিভিন্ন ধরনের বন্দুক দেখাতে।

তাঁর ড্রয়িংরুমখানা সোনার কারুকার্যময় কালো সিল্কের কাপড়ে ঢাকা। বিরাট বিরাট হলুদ ফুল যেন আগুনের শিখার মত কম্পমান কালো ধাতুর পাত্রে।

'এটা জাপানী ধাতু।'—তিনি বললেন।

হঠাৎ কপাটের খোপে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে থমকে দাঁড়াই। লাল ভেলভেটে মোড়া কালো রঙের একটা বস্তু। আমি ওটার কাছে এগিয়ে যাই। একখানা হাত! মানুষের হাত! কোনো কঙ্কালের সাদা পরিষ্কার হাত নয়, চামড়া শুকিয়ে যাওয়া কালো একখানা হাত! হলুদ নখগুলি ঝুলছে, অনাবৃত পেশী স্পষ্ট, বাসি রক্তের দাগ আবিষ্কার করা কঠিন নয়। বেশ নিখুঁতভাবে কেটে রাখা হয়েছে হাতটাকে, মনে হয় যেন কোন ধারালো কুঠারের এক কোপে কনুই থেকে কব্জি অব্দি হাতের মধ্যাংশ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

একটা মোটা সমর্থ শিকল, যা দিয়ে হাতী বেঁধে রাখা যায়, ঐ হাতখানাকে ঘিরে রয়েছে এবং ঐ শিকলের সাহায্যেই ঝুলন্ত রয়েছে হাতটা।

'এটা কি ?'—আমি জিজ্ঞেস করি।

'এ আমার শ্রেষ্ঠ শত্রু,' শান্তভাবে ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন, 'এটা এসেছিল অ্যামেরিকা থেকে। এক ধারালা অস্ত্রের সাহায্যে কাটা, তীক্ষ্মমুখ পাথর দিয়ে চামড়া সরিয়ে আটদিন ধরে সূর্যের আলোতে শুকোনো হয়েছিল। আহ্, বস্তুটা আমার সৌভাগ্যের উৎস!'

আমি সেই বিচ্ছিন্ন অঙ্গটিকে ছুঁয়ে দেখলাম। এটা নিশ্চয় কোন বিশাল চেহারার মানুষের। আঙুলগুলি অসম্ভব লম্বা, সমর্থ পাকানো পেশীগুলির জায়গায় জায়গায় তখনো মাংস লেগে রয়েছে। হাতটাকে দেখলে সত্যি ভয় হয়; ওটার দিকে তাকালেই মনে হয় এক বন্য প্রতিহিংসা এসে বাসা বেঁধেছে।

'এই হাতটা যার সে নিশ্চয় খুব বলবান ছিল'—আমি বললাম।

'ঠিকই বলেছেন,' মিষ্টি গলায় ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন, 'কিন্তু আমি তার চেয়েও বলবান। তাইতো কেমন শিকলে বেঁধে ফেলেছি!'

আমার মনে হলো তিনি যেন তামাশা করছেন এবং তাই বললাম, 'এখন তো আর ঐ শিকলের দরকার নেই। কাটা হাত নিশ্চয় পালিয়ে যাবে না।'

স্যার জন রাওয়েল কিন্তু এর জবাবে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'ওটা সব সময়ই চেষ্টা করছে পালিয়ে যাবার জন্য। শিকল খুবই দরকার।'

চকিতে আমি তাঁর মুখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করি; নিজেকেই প্রশ্ন করি: মানুষটা পাগল ? অথবা খুব হাল্কা রসিকতায় অভ্যস্ত ?

কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দুরূহ,—শান্ত ও দয়ার ছাপ তাতে। আমি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করি, তাঁর বন্দুকগুলির প্রশংসা করি।

লক্ষ্য করলাম, গুলিভর্তি তিনটে পিস্তল রয়েছে আসবাবপত্রের ওপর। ঐগুলি দেখলে মনে হয়, তিনি যেন সবসময়ই এক আক্রমণের আশঙ্কা করছেন।

আমি এরপরও বারকয়েক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তারপর আর যাইনি। সাধারণ লোকেরাও ক্রমশঃ তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে।

একটি বছর অতীত হয়ে গেল। তারপর নভেম্বরের শেষে এক সকালে আমার চাকর আমাকে খুব ভোরে ডেকে তুলে খবরটা দেয়,—স্যার জন রাওয়েল নাকি গত রাতে খুন হয়েছেন!

আধঘন্টার মধ্যে আমি সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন কমিশনার-জেনারেল এবং পুলিশের বড়কর্তা। বাড়ির চাকরটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি প্রথমে তাকেই সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু লোকটা নিরপরাধ।

অপরাধীকে খুঁজে বের করা কখনোই সম্ভব হয়নি।

স্যার জনের ড্রয়িংরুমে ঢুকে প্রথমেই দেখতে পেলাম, তাঁর নিথর প্রাণহীন দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঘরের মাঝখানে।

তাঁর ফতুয়াটা ছিঁড়ে ফালা ফালা, জামার একটা আস্তিন ছিঁড়ে ঝুলছে। সবকিছু মিলে এটাই প্রমাণ করে যে, কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেছে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ। মুখ কালচে ও ফুলে উঠেছে। চোখ দুটো আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। দাঁত দিয়ে কি যেন কামড়ে ধরে আছেন। তাঁর ঘাড়ে পাঁচ জায়গায় পাঁচটি গভীর গর্ত, দেখে মনে হয় লোহার কোন ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে করা হয়েছে ওগুলো। গর্তগুলি চাপ চাপ রক্তে ঢাকা।

আমাদের সঙ্গে একজন ডাক্তার এসে যোগ দিলেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি খুনীর আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, 'আশ্চর্য! এ যে এক কঙ্কালের আঙুলের ছাপ!'

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত নেমে যায়। আমি ঘুরে তাকাই সেই দেওয়ালের দিকে, যেখানে একদিন কাটা হাতটা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছিলাম। ওটা আর সেখানে নেই। শিকলটা টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে আছে।

আমি মৃতের দিকে গভীর অনুসন্ধিৎসায় ঝুঁকে পড়ি। এবং তখনই আবিষ্কার করি, অদৃশ্য হাতের একটা আঙুল তাঁর কঠিন দাঁতে আটকে আছে। তিনি ওটাকে ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রাথমিক তদন্ত অনুসন্ধান সমাপ্ত। কিছুই ধরা গেল না। কোন দরজায় হাত পড়েনি, জানালাগুলি যথাযথ, আসবাবপত্র যেমনটি ছিল তেমনটিই রয়েছে। বাড়ির কুকুরদুটোও কিছুই টের পায়নি। আর তাঁর চাকর এ ব্যাপারে যা বক্তব্য রাখলো, তার সংক্ষিপ্ত বয়ান নিম্নরূপ:

গত একমাস ধরে তার প্রভুকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো। তিনি অনেক চিঠি পেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলিকে পুড়িয়েও ফেলেছেন। ঘোড়া মারবার চাবুকটাকে নিয়ে যখন তখন তিনি দেয়ালে লটকানো কাটা হাতটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন, সপাং সপাং চাবুক চালাতেন ওর ওপর।...তাঁর অভ্যাস ছিল অনেক রাত করে শুতে

যাবার। বিছানায় যাবার আগে তিনি যথেষ্ট সাবধানে ঘরের দরজা ও জানলাগুলি বন্ধ করতেন। সব সময়ই নিজের নাগালের মধ্যে অস্ত্র রাখতেন। অনেক সময় মধ্যরাতে তাঁকে চড়া গলায় কথা বলতে শোনা যেত, যেন কারুর সঙ্গে দারুণ ঝগড়া করছেন।...

সেই বিশেষ রাতে তাঁকে কোনরকম শব্দ করতে শোনা যায়নি। পরদিন চাকরটি জানালা খুলেই তাঁর মৃতদেহ দেখতে পায়। আর কিছুই সে জানে না।

এই ঘটনার তিন মাস বাদে এক রাতে আমি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, সেই কাটা হাতটা, সেই ভয়ঙ্কর হাতটা একটা কাঁকড়াবিছা বা মাকড়সার মতন ঘুরঘুর করছে আমার ঘড়ের পর্দায় ও দেওয়ালে। তিনবার আমি জেগে উঠি, তিনবার আবার ঘুমিয়ে পড়ি এবং তিনবারই আমি স্বপ্নে সেই কাটা হাত ও থাবার মতন তার আঙুলগুলিও নড়তে চড়তে দেখি।

পরের দিন কাটা হাতখানাকে আমার কাছে আনা হলো। এটাকে পাওয়া গেছে স্যার জন রাওয়েলের কবরের ওপর। স্যার রাওয়েলের কোন আত্মীয় পরিজনের সন্ধান না পাওয়ায় আমরাই তাঁকে কবরস্থ করেছিলাম।

হাতটির একটি আঙুল ছিল না।

অতএব মহিলারা, আমার গল্প এখানেই শেষ। এর বেশী কিছু আমি জানি না।'

মেয়েরা ভয়ে আতঙ্কে বিবর্ণ, কেঁপে ওঠে।

'কিন্তু এটা কেমন আধাখাঁমচা গল্প হলো, প্রকৃত সত্যটা কি বুঝতে পারলাম না!' তাদের একজন বলে, 'আপনি যদি রহস্যটা একটু খুলে না বলেন, ভাবতে ভাবতে আমরা হয়তো রাতে ঘুমোতেই পারবো না।'

'ইস, আমি তাহলে আপনাদের ঘুম হরণ করলাম?' তিনি বললেন, 'আমার অভিমত হলো, ঐ কাটা হাতখানা যার, সে তখনো জীবিত ছিল। সে একদিন সুযোগ বুঝে অবশিষ্ট হাতখানা দিয়েই চরম প্রতিশোধ নেয়। অবশ্যই আমি বলতে পারবো না, কি ভাবে সেটা সম্ভব হলো! নির্ঘাৎ শরিকী সংঘর্ষের পরিণতি।'

'না', মেয়েরা একযোগে প্রতিবাদ জানায়, 'এটা কোন যুক্তিই হলো না।'

এবং বিচারক তখনো স্মিতমুখ, উপসংহার টানলেন :

'আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি, আমার যুক্তি আপনাদের মনঃপূত হবে না।'

রহস্য

The Secret

ব্যারোনেস্ দ্যঁ গ্রানজির তাঁর ছোট্ট শরীরখানা নিয়ে নরম সোফায় আস্তে আস্তে যেন তলিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনি রেনিডনের মারকিউস্-পত্নীর সেখানে হঠাৎ আবির্ভাব। তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, তাঁর কাঁচুলি ঈষৎ কুঁচকে গেছে, টুপিটা একদিকে সামান্য কাৎ হয়ে আছে, ধপ্ ক'রে একটা চেয়ারে বসে পড়েই আবেগে বললেন :

"উফ্! কাজটা ক'রে ফেললাম!"

তাঁর বান্ধবী, যিনি তাঁকে কখনো এমন বেসামাল অবস্থায় দেখেননি, বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসেন; জানতে চাইলেন :

"ব্যাপারটা কি? কি করে এলে?"

মারকিউস্-পত্নীর পক্ষে আর একজায়গায় যেন বসে থাকা সম্ভব নয়, মানসিক অস্থিরতায় উঠে দাঁড়ান, গোটা ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। তারপর একসময় সোফার কাছে বসে বান্ধবীর একখানা হাত তুলে নিয়ে বলেন :

"এইবার শোন, আমি তোমাকে সব বলছি! কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, এ কথা তুমি কাউকে ফাঁস করে দেবে না।"

"প্রতিজ্ঞা করছি।"

"নিজের অমর আত্মার নামে শপথ করো।"

"নিজের অমর আত্মার নামে দিব্যি কাটছি।"

"বেশ, তা হলে শোন,—আমি নিজে সাইমনের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি।"

দ্বিতীয় মহিলা সোল্লাসে বলে ওঠেন, "তাই নাকি? বেশ করেছো, বেশ করেছো!"

"হ্যাঁ, উচিত কাজ করিনি? চিন্তা করে দেখো, গত ছ'মাস ধরে মানুষটাকে কেমন অসহ্য মনে হয়েছে; এত অসহ্য যে ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি যখন তাকে বিয়ে করি, তখনই জানতাম লোকটা কত বিশ্রী; কিন্তু আমার ধারণা ছিল, মানুষটা দয়ালু। কী ভুল যে করেছি! সে নিশ্চয়ই ভেবেছিলো, আমি তারই জন্য তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। বিরাট চর্বিবহুল উদর ও লাল নাক নিয়ে তাই সে কি যে প্রেমের প্যানপ্যানানি শুরু করে দিলো! সামুদ্রিক কচ্ছপ অথবা ঘুঘুর মতন তার প্রেম নিবেদন। নিশ্চয় কল্পনা করতে পারো, ওর ওই ন্যাকামি দেখে আমার হাসি পেতো; এর জন্য আমি ওকে একটা আদুরে নামও দিয়েছিলাম—'নির্বোধ ঘুঘু।' মানুষ তার কুৎসিত ধারণাগুলিকে নিজেরাই মনে মনে তৈরী করে নেয়।

যখন আমার স্বামী উপলব্ধি করতে পারলো, বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী কিছু সে আমার কাছ থেকে আশা করতে পারে না, সে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। মেজাজটা হয়ে ওঠে দিন-কে-দিন তিরিক্ষি, কথা বলে তিক্তস্বরে; এমন ব্যবহার শুরু করে যেন

আমি কোন ছিনাল মেয়ে, অথবা আমি যেন কোন হা-ভাতে ঘরের মেয়ে অথবা আমি যেন কিছুই বুঝি না! এবং ক্রমে ক্রমে এটা আরো ভয়ানক হয়ে উঠলো, কারণ...কারণ, কারণটা ঠিক সহজ কথায় আমি ব্যক্ত করতে পারছি না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, সে আমাকে ভালোবেসেছিল, দারুণ ভালোবেসে ফেলেছিল।...তার সেই অদম্য ভালোবাসা প্রায়ই প্রকাশ পেয়ে যেত, প্রায়ই। ওহ্ বান্ধবী, সে যে কী শাস্তি আমার...জোকারের উদ্ভট প্রেম নিবেদন আর কি!...না, সত্যি এ ধরনের ব্যাপার আমি বেশীদিন সহ্য করতে পারিনি...আদৌ নয়। প্রত্যেক রাতে যেন আমার শরীরে ওর দাঁত বসে যেত...তারচেয়েও খারাপ তারচেয়েও নোংরা। ...আচ্ছা, তোমার পরিচিতজনের মধ্যে এমন কাউকে কল্পনা করতে পারো, যে দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, ব্যবহারে হাস্যাস্পদ, অত্যন্ত বিতৃষ্ণাজনক, সঙ্গে ইয়া ভুঁড়ি, দেখলে মনে হয় যেন একটি লোমশ গোবৎস। কল্পনা করতে পারো এমন এক অসহ্য লোককে? এখন ধরো, এমনই একজন তোমার স্বামী...এবং সেই অপদার্থ প্রত্যেক রাতে ...নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমি কি ইঙ্গিত করছি! না, এ সহ্যের বাইরে!—একেবারে অসহ্য! এমন লোকের প্রাত্যহিক সঙ্গ আমাকে অসুস্থ করে তোলে, বড়ই অসুস্থ বোধ করি নিজেকে—সত্যি বলছি, আমি আর পারছি না! এদেশে এমন আইন থাকা দরকার, যার সাহায্যে আমার মতন বিপদাপন্ন স্ত্রীরা যেন তাদের স্বামীর হাত থেকে রেহাই পায়। নিজেকে তুমি আমার জায়গায় বসিয়ে একবার ভেবে দেখ, অমন একটা ভয়ংকর লোক প্রতিটি রাতে!...ধ্যাৎ, এর চেয়ে পাশবজীবন আর কি হতে পারে!

তাই বলে ভেবো না, আমি খুব প্রেম-মধুর স্বপ্ন-টপ্ন দেখে থাকি—সে রকম মোটেই নয়। এই পৃথিবীর সব পুরুষরাই হলো হয় অশ্বপালক, নয়তো ব্যাঙ্কের মালিক। ওরা ঘোড়া অথবা টাকা ছাড়া আর কিছুকেই গুরুত্ব দিতে চায় না। যদি তারা কখনো মেয়েদের ভালোবেসে ফেলে, তবে ঐ ভালোবাসাটাও হবে অশ্ব-প্রেমের সামিল। ঘোড়াকে যেমন সে খুশিমতন খেলায়, ব্যবহার করে, নিজের প্রেমিকাকেও সে তা করতে চাইবে। এর বাইরে কিছু নেই। আধুনিক জীবনে রোমাঞ্চের কোন স্থান নেই।

আমাদের এর পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। এমন ভাব দেখাতে হবে, যেন আমরা আদৌ ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর নই। আর যৌন-সংযোগ? ওটা এখন দাঁড়িয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেহে-দেহে মিলন মাত্র—একই জিনিস একই সময়ে রোজ রোজ পুনরাবৃত্তি! এই যুগে কেউ কি কারুর জন্য দয়া ও আসক্তি বোধ করতে পারে? আমি তামাম প্যারিসের উত্তমর্ণ সমাজে একজন প্রকৃত আদর্শ পুরুষের সন্ধানে আছি; কিন্তু আমি জানি, সেরকম কাউকে আমি কোনদিনই খুঁজে পাবো না। আমি এখন আমার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার শুরু করে দিয়েছি, যাতে সে লোকটা নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়...এবং আমার উপর বিরক্ত হয়। প্রথমে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তারপর তার মন অধিকার করে ঈর্ষায়; তার তখন ভাবনা হয়, আমার দ্বারা সে বুঝি প্রতারিত হচ্ছে! প্রথম প্রথম কয়েকদিন সে আমাকে চোখে চোখে রেখে

নিজেকে প্রবোধ দেয়। শিকারী বাঘ যেমন মানুষের পিছন পিছন তক্কে তক্কে ঘুরে বেড়ায়, সেও ঠিক তেমনি সব সময় যেন আমার পিছনে থাবা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কারুর সঙ্গে আমাকে কথা পর্যন্ত বলতে দেয় না। কোন প্রীতিসম্মেলনে আমি যে খোলামেলা মন নিয়ে সামাজিকতা করবো, তারও উপায় নেই; সে আমাকে কারুর সঙ্গে নাচতে দেবে না; কোন পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হলে আমি বাধ্য হয়ে এমন ভাব দেখাই, যেন আমি তাকে চিনিই না। সব সময় একটা বোকা বোকা ভাবের অভিনয় আমাকে ক'রে যেতে হয়েছে। বিরক্ত হ'য়ে শেষ পর্যন্ত আমি সভাসমিতিতে যাওয়াই বন্ধ করে দিলাম।

তবু পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গেল....বললে বিশ্বাস করবে না শয়তানটা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যে বলতে লজ্জা হচ্ছে...আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে, যেন আমি একটা বেশ্যা।

বান্ধবী!...এক রাতে সে আমাকে বলে বসলো, 'কি, আজ কার সঙ্গে শুয়েছো?' আমি কেঁদে ফেললাম, আর আমার কান্না দেখে সে উল্লসিত হলো।

দিনের পর দিন সে আরো ভয়ঙ্কর হচ্ছে। গত সপ্তাহে সে আমাকে ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গেল চ্যাম্পস এলিসিস রেঁস্তরায়। ভাগ্যক্রমে আমার টেবিলের মুখোমুখি আর এক ভদ্রলোকের আসন নির্দিষ্ট হয়েছিল। ব্যস, আর যায় কোথায়! সাইমন পাগলের মতন আমার পা দুটোকে নিজের পা দিয়ে চেপে রাখলো, তরমুজের থালার উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে বদমেজাজী কুকুরের মতন গরগর করতে থাকে, 'নষ্ট মাগী কোথাকার! নিশ্চয় এর আগে থেকেই ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল তোর, এখানে এই টেবিলে বসবার! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!' তারপর—তারপর সে যা করলো, তা তোমার কাছে অকল্পনীয়—কী দুঃসাহস ওর! আমার মাথা থেকে একটা কাঁটা তুলে নিয়ে সজোরে আমার হাতে ফুটিয়ে দিল।

আমি জোরে চীৎকার করে উঠলাম। সকলে ছুটে এলো আমার কাছে। তারপর নিশ্চয় কল্পনা করতে পারছো, সকলের সামনে কেমন ঘৃণ্য বিরক্তিকর মজাদার অভিনয় সে করলো! কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি শপথ গ্রহণ করি: 'এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে' এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব! তুমি হলে এ অবস্থায় কি করতে?"

"আমি! আমি নিজে বদলা নিতাম।"

"খুব ভাল, আমিও তাই নিয়েছি।"

"কি ভাবে?"

"কি! বুঝতে পারছো না?"

"কিন্তু, বন্ধু..এখনো...বেশ, হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ, কি? দয়াময়ী, একবার তার মাথাটার কথা চিন্তা করে দেখো! সেই চর্বি থলথলে মুখ, মোটা লাল নাক এবং কুকুরের কানের মত ঝুলন্ত গালের দু'পাশে দাড়ি।"

"যথার্থ।"

"হ্যাঁ, আমি নিজেকেই নিজে বলেছিলাম, নিজের সুখের জন্যই আমি এই প্রতিশোধ নেবো। আর আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম, ঘটনাটা আমি শুধু তোমাকেই বলবো, আর কাউকে নয়। একবার শুধু ওর মুখটার কথা চিন্তা করে দেখ...সে ...সে..."

"কি...ঘটালে..."

"ও বান্ধবী, বলছি। কিন্তু আমার দিব্যি রইলো, কারুর কাছে একথা ফাঁস করে দেবে না! কি মজার ব্যাপার ভেবে দেখো...সে এখন আমার মুখের দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকায়, আর আমি তাকে দেখলেই হাসিতে ফেটে পড়ি...এ হাসি চেপে রাখা যায় না...একবার তার মাথার কথা চিন্তা করে দেখো।"

ব্যারোনেস তাঁর বান্ধবীর মুখের দিকে তাকান। বান্ধবী বাতিকগ্রস্ত রুগীর মতন অফুরাণ বুনো হাসিতে ফুলে ফুলে উঠছেন, হাসির দমকে তাঁর পাতলা ঠোঁটদুটো সমানে কাঁপতে থাকে। হাসতে হাসতে নিজের বুক নিজে খামচে ধরেন, মুখে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, কণ্ঠনালীতে যেন শ্বাসরোধ ঘটে, হাসির দমকে এখনই বুঝি মুখ থুবড়ে পড়বেন।

আবার মারকিউস-পত্নী বলতে থাকেন, "চিন্তা করো...ভেবে দেখো...এটা কি খুব মজার ব্যাপার হয়নি ? বলো আমাকে...ওর মাথার কথাটা চিন্তা করে দেখো...ভাবো তার গালপাট্টার কথা ! ...কল্পনা করো তার নাকের বাহার..একটিবার ভাবো...মজা লাগছে না ? কিন্তু ভাই, একথা যেন গোপন থাকে...কাউকে বলবে না..ফাঁস করে দিও না!"

দু'জনেরই উত্তেজনায় এমন অবস্থা, যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কথা বলতে পারছেন না। চোখ বেয়ে আনন্দের অশ্রু গড়াচ্ছে।

ব্যারোনেসই প্রথমে নিজেকে অনেকখানি সংযত করে ফেলেন, তবে তখনো তাঁর গলা কাঁপছে, "কিভাবে কি করলে, বলো না!...আমার জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে!"

কিন্তু অন্যজন কথাই বলতে পারছেন না...কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন :

"যখন আমি মনস্থির করে ফেললাম, নিজেকে বললাম :...'এই সেই সময় ...আর দেরী করো না...এখনই তোমাকে তা ঘটাতে হবে'...এবং আমি...তা ঘটিয়েছি...আজই।"

"আজই!"

"হ্যাঁ...এই কিছুক্ষণ আগে...আমি সাইমনকে বলে এসেছি, তোমার এখানে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে। আমরা ওর দিকে চেয়ে খুব আমোদ পাবো। সে আসছে...এখনই...সে আসছে...চিন্তা করো...চিন্তা করো, তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার মাথাটা..."

ব্যারোনেস্, যিনি অপেক্ষাকৃত নম্র, এমন একটা ভাব দেখালেন যেন এই মাত্র দীর্ঘ এক দৌড়যাত্রা শেষ ক'রে এসেছেন। বললেন :

"আহ্য, বলো না, কি করলে...বলো আমাকে।"

"খুব সহজ। আমি নিজেকে বললাম: 'সে তো আমার পরিচিত লোক বউগিবাগকে ঈর্ষা করে; খুব ভালো, তবে আমার নতুন নাগর হবে বউগিবাগই। লোকটা অবশ্য তার পা দুটোর মতনই খুব কদাকার, তবে যথেষ্ট সম্মানীয় লোক; মিথ্যা গল্প মারে না।' চটপট প্রাতরাশ সেরেই আমি চললুম তার বাড়ির উদ্দেশ্যে।"

"তুমি তার বাড়িতে গেলে! কিন্তু উপলক্ষ্যটা কি?"

"চাঁদা আদায়...অনাথ শিশুদের জন্য..."

"গোটা গল্পটা খুলে বলো...তাড়াতাড়ি....সবটা আমি খোলাখুলি শুনতে চাই।..."

"লোকটা তো আমাকে দেখে এত অবাক যে, কথাই বলতে পারছে না। দুই লুইস চাঁদাও দিল। আমি উঠে দাঁড়াবার পরই মুখ খুললো সে, আমার স্বামীর খবরাখবর জানতে চাইলো; সেই সুযোগে এমন ভাব দেখালাম, যেন নিজের বেদনাদায়ক আবেগ আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারছি না, এতক্ষণ মনে যে কথা লুকিয়েছিল ইনিয়ে বিনিয়ে বলে ফেলি। স্বামীকে এই লোকটার চেয়েও কালো ও কুৎসিত বলে বর্ণনা করলাম...বউগিবাগ ক্রমশঃ বিচলিত, স্পর্শকাতর। সে ভাবতে শুরু করে দেয়, কিভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারে।...আর আমি তো কাঁদছি, যেভাবে একজন নারী কেঁদে থাকে ...যেভাবে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে একজন যুবতী কান্নার ভান করে থাকে, সে আমাকে সান্ত্বনা দেয়..আমাকে ধরে আবার বসিয়ে দেয়....এবং তারপর, আমি থামছি না দেখে সে আমাকে শান্ত করতেই হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরে...আমি সেই অবস্থাতে উচ্চারণ করি: 'আমার বন্ধু!...আমার হতভাগ্য বন্ধু!' তারও কণ্ঠস্বরে সেই একই বাণী ধ্বনিত হয়: 'আমার বান্ধবী!...আমার ভাগ্যহীনা বান্ধবী!' তার আলিঙ্গন ক্রমশই নিবিড় হতে থাকে...নিবিড়তর...একসময় আমরা দু'জনে ভীষণভাবে জড়াজড়ি করতে শুরু করে দিই, তারপর...তারপর সেই কাজটি শেষ হতেই আমার ভিন্নমূর্তি। সমানে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে হলো। ইস, সে সময় তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলুম যেন তার মতন হীন নীচ লোক আর হয় না!... কিন্তু আসলে তখন যে আমার কী হাসি পাচ্ছিলো! শুধু ভাবছিলাম সাইমনটার কথা, তার মাথার কথা, তার দাড়ির কথা। কল্পনা করো...কল্পনা করে দেখো একবার! আমি তার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি। সে সব সময় যা আশঙ্কা করছিল, নীরবে নিরাপদে তাই করে ফেললাম। লাগুক যুদ্ধ, কেঁপে উঠুক পৃথিবী ভূমিকম্পে, মহামারীতে দুনিয়া জুড়ে শুরু হোক হাহাকার, মারা যাই আমরা সকলে...আমি তো সাইমনের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি! দুনিয়ার কোন কিছুই আর ব্যতিক্রম ঘটাতে পারবে না! আর ফিরে আসবে না সেই পূর্বাবস্থা। ভেবে দেখো তার মাথাটার কথা—আর মনে মনে বলো, আমি তা করতে পেরেছি!"

ব্যারোনেস্ যিনি এতক্ষণ বান্ধবীর বর্ণনা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে পুলকে মৃতপ্রায়, জানতে চান: "তুমি কি আবার বউগিবাগের কাছে যাবে?"

"না, আদৌ নয়। কখনোই নয়....ওর সঙ্গে যা হবার, তা যথেষ্টই হয়েছে...ওকে এখন আমার স্বামীর চাইতেও খারাপ লাগছে।"

আবার তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে হাসতে আরম্ভ করেন। হাসতে হাসতে একে অপরের গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়েন। ঠিক তখনই দরজায় বেল বেজে ওঠে এবং কিছুক্ষণের জন্য তাঁদের হাসিও থেমে যায়।

দরজা খুলে প্রবেশ করলেন একজন শক্ত সমর্থ চেহারার লোক, লাল মুখ, পুরু ঠোঁট, দু'গাল বেয়ে দাড়ি ঝুলছে, রক্তবর্ণ চক্ষু তাঁর চারদিকে ঘুরতে থাকে।

দুই যুবতী ক্ষণিকের জন্য নির্নিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন; তারপরই উৎকট হাসির ফোয়ারায় এমনভাবে সোফার ওপর গড়িয়ে পড়েন, যেন কি ভয়ঙ্কর ঘটনা এইমাত্র ঘটে গেল।

"এই কি ব্যাপার! তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে! পাগলের মতন হাসছো কেন?...তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

পাগল?

Mad?

আমি পাগল, না ঈর্ষাকাতর?

ঠিক ত্রুটিহীনভাবে বলতে পারবো না কি আমার হয়েছে, কিন্তু কষ্ট পাচ্ছি খুব। আমি একটা অপরাধ করেছি, এটা ঠিক, একটা উন্মাদ অপরাধ! কিন্তু দিশেহারা অসহ্য ঈর্ষা, আবেগতপ্ত প্রেম, প্রতারিত হবার জ্বালা, হেরে যাবার যন্ত্রণা—এ সব কি কারুর পক্ষে অপরাধ করে ফেলার যথেষ্ট কারণ নয়, যদিও সে স্বভাবে অপরাধী নয়? এ অবস্থায় কোন মানুষ কি নিজের কর্তৃত্বে থাকে?

ওহ্! আমি কত কষ্ট পেয়েছি, অবিরত দগ্ধ হয়েছি, নিরবিচ্ছিন্ন তীব্র যন্ত্রণা! আমি এই মেয়েটিকে পাগলের মত ভালোবেসেছিলাম,—কিন্তু এখন মনে হয়, সত্যি কি আমার প্রেম এত গভীর ছিল? আমি কি ওকে ভালোবাসতাম? না, না! সে আমার দেহ ও মন অধিকার ক'রে নিয়েছিল; আমি যেন ছিলাম এবং আছি তার হাতের খেলার পুতুলটি হয়ে; তার স্মিতহাসি, তার দৃষ্টি, তার দেহের স্বর্গীয় মাধুরী আমার ওপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আমি তার অভাবনীয় শারীরিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করেছি; ওর দেহগত বস্তুগুলিকে আমি ঘৃণা করার চেষ্টা করতাম, চাইতাম এড়িয়ে যেতে। কারণ, সে ছিল অপবিত্র, অবিশ্বাসী, পশুবৎ নোংরা স্বভাবের মেয়ে, যার ভেতরে মন বলে কোন পদার্থ ছিল না; সে ছিল মানুষ-পশু, তার নরম মাংসল শরীর ছিল অপযশের উৎস।

আমাদের মিলনের প্রথম কয়েকমাস ছিল অদ্ভুত তৃপ্তিকর। আমি তার সাময়িক উন্মত্ত কামনার বাহুপীড়নে হাঁপিয়ে উঠতাম। চোখ দিয়েই সে আমার ঠোঁট দুটিকে মেলে ধরতো, আমার তৃষ্ণা নির্বাপিত হতো। তার ঐ চোখের রঙ নিয়ত পরিবর্তনশীল—দুপুরে ধূসর, গোধূলিলগ্নে ঈষৎ সবুজ, এবং সূর্যোদয়কালে নীলাভ। আমি পাগল নই। শপথ করে বলছি, ওর ভেতর এই তিন রঙের খেলা আমি প্রত্যক্ষ করতাম। প্রেম-নিবেদনের সময়গুলিতে তার দৃষ্টি তীব্র নীল হয়, দৃষ্টি যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে; চোখের তারা বিস্ফারিত ও দিশেহারা। তার ঠোঁট কাঁপে, কখনো কখনো তার পাটলবর্ণ জিহ্বার অগ্রভাগ দেখতে পাই, যা সাপের মতন লকলকিয়ে ওঠে এবং যেন এক ধরনের শিস্ আমি শুনতে পাই। তার ভারী চোখের পাতা আস্তে আস্তে উন্মুক্ত হয়, তার কামনামদির দৃষ্টি আমাকে পাগল ক'রে তোলে। যখনই আমি ওকে আমার হাতের বেষ্টনিতে আঁকড়ে ধরেছি, আমি তার চোখের দিকে চেয়েছি, শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে; তখনই মনে হয়েছে, আমি যে শুধু ওকে লাভ করতে চাই তা নয়, আমি পশুটাকে খুনও করতে চাই।

পায়চারির সময় তার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার বুকের ভিতরে প্রতিধ্বনি তুলতো; তারপর যখন সে উলঙ্গ হতো, আমার চোখের সামনে তার পোশাকগুলি খুলে খুলে পড়তো এবং যখন সেই কুখ্যাত অথচ বন্যসুন্দর শ্বেতশুভ্র দেহখানা দেখতে পেতাম, কাঁপতে কাঁপতে আমার হাঁটু ভেঙ্গে পড়তো, আমার পা ও হাতগুলি তখন অবশ, অসীম ভয়জনিত দুর্বলতা আমার বুকখানা অধিকার করে নিতো।

একদিন দেখলাম, সে আর আমাকে বরদাস্ত করতে পারছে না। তার চোখের দিকে চেয়েই এটা বুঝতে পারলাম। আমি তার কাছ থেকে সেই কামনাতুর বন্যদৃষ্টির প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু পরিবর্তে দেখলাম, তার নীল চোখ হিম, সেখানে ক্লান্তি ও বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। চকিতে আমার বুকে আগুন ধরে যায়, বাসনার তাগিদে আমি মরিয়া হয়ে উঠি।

যখন সে তার চোখের তারা মেললো, আমি দেখলাম এক ভাবলেশহীন উদাসী দৃষ্টি; ঐ চাউনিতে কামনা নেই, সমর্পণের কামনীয় উষ্ণ তাগিদ নেই; বুঝতে পারি, আমাকে আর তার ভালো লাগছে না। মানুষের সাধারণ অনুভূতির সাহায্যে আমি ওর এই নির্বিকারত্ব বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি—সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে, এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত নিরুত্তাপ। যখন আমি আমার হাত ও ঠোঁট দিয়ে তার ভেতর উত্তেজনা সঞ্চারের প্রয়াস করি সে বিব্রত হ'য়ে ব্যবধানে সরে যায়। "আমাকে একা থাকতে দাও," সে বলে ওঠে, "তুমি ভয়ানক! তুমি কি কখনো আমাকে একা থাকতে দেবে না?" আমার ভেতরে কুকুরসুলভ এক ধরনের গোপন ঈর্ষা ও সন্দেহ প্রবল হ'য়ে ওঠে। আমি বুঝতে পারছিলাম, ওর ভেতরকার সেই দুর্নিবার কামনা আবার জেগে উঠবে এবং অন্য কোন লোক সেই সুযোগে তাকে কব্জা করবে, যেহেতু আমি নেহাৎই অপাংক্তেয়। আমি ঈর্ষায় পাগল হয়ে উঠলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাগল আমি হইনি! ওকে নজরে রাখি এবং অপেক্ষা করতে থাকি—দেখতে

হবে ওর এই নির্বিকারত্ব, কাম-শীতলতা না, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা? কিন্তু ওর নির্বিকার শীতলতাই সত্যি!

সে তখন কখনো কখনো বলে উঠেছে, "মানুষ আমাকে ঘৃণা করে!"

হায়! কথাটা মর্মান্তিকভাবে সত্যি।

তখন আমার জ্বালাময় ঈর্ষা কেন্দ্রীভূত হয় তার অস্তিত্বেরই ওপর; তার নির্বিকারত্ব, তার নির্জন একাকীত্বপূর্ণ রাত্রিগুলি, তার কার্যকলাপ, তার চিন্তাধারা—সবকিছুই কুরুচিপূর্ণ, শয়তানিতে ভরা। সময় সময় তার ভেতরে পুরনো কামনা-বাসনা জেগে উঠতো, ফুটে উঠতো চোখে সেই ইশারা। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ভিন্নতর মানুষ, প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা আমাকে অধিকার ক'রে নিয়েছে, ইচ্ছে হয়, ওকে হাঁটুর গুঁতোয় দু'টুকরো করে ফেলি, গলা টিপে ধরে ওর মনের সমস্ত গোপন লজ্জাকর কথাগুলি আদায় করে নিই। আমি কি উন্মাদ? না।

এক রাতে দেখলাম, সে বেশ খুশি খুশি। অনুভব করলাম, স্থির প্রত্যয় জন্মালো—নিশ্চয় ওর ভেতরে নতুন কামনার জন্ম নিয়েছে। আমার উষ্ণ আলিঙ্গন ও চূড়ান্ত সঙ্গ পাবার উদগ্র বাসনায় তার শরীর রোমাঞ্চিত, দেহের ত্বক তপ্ত, চোখ মুখ রক্তাভ—এই সেই সব লক্ষণ, যা একদিন আমায় দিশেহারা করে তুলতো।

আমি না জানার ভান করলুম, কিন্তু ঘনিষ্ঠ থেকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করছি তার ভাবান্তর। কিছুই অবশ্য আবিস্কার করতে পারলাম না। দেখতে দেখতে একটি সপ্তাহ কেটে যায়, একটি মাস পেরিয়ে যায়, প্রায় একটি বৎসর অতীত হয়। সময় সময় তার চোখে সেই খুশির ঝিলিক দেখতে পাই, সেই কামনা-তৃপ্তির পরিষ্কার ছাপ তার মুখাবয়বে। কারণ কি?

অবশেষে অনুমান করতে পারলাম।

না, আমি পাগল নই। শপথ ক'রে বলছি, মাথার গণ্ডগোল আমার হয়নি। কিভাবে আমি এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারলাম? কিভাবে বুঝতে পারলাম? এখানে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

এক রাতে প্রথম ব্যাপারটা আমার নজরে এলো। সেই রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে সে এলো আমার ঘরে, এসেই আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে যেন ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে থাকে। মুখে-চোখে তার সুখকর ক্লান্তি। মুখে চিবুকে অস্বাভাবিক রক্তসঞ্চালন, পুরুষ্টু বুকের দ্রুত ওঠা নামা, পা কাঁপছে, দুই চোখে অভাবনীয় উল্লাস। ভুল আমার হয়নি। এরকম রূপান্তর এর আগেও ওর দেখেছি। সে প্রেমে পড়েছে! আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। আমি আর ওর দিকে না তাকিয়ে চলে গেলাম জানালার কাছে। দেখলাম, এ বাড়ির খানসামা ওর মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছে আস্তাবলের দিকে। ক্লান্ত সুন্দরীও আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়, মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে সুন্দর পশুটাকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে; তারপরই খুব দ্রুত সে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

সারাটা রাত ধরে কেবলই ভেবেছি। আমার মন রহস্যের অতলান্তে ডুব দিয়ে প্রকৃত সত্যের সন্ধান করেছে। ইন্দ্রিয়াসক্ত নারীর বিকৃত কাম ও উৎকল্পনার পরিমাপ

কে করতে পারে? কে এই বিচিত্র চরিত্রের উদ্ভট কল্পনা ও অস্বাভাবিক সুখের কারণকে খুঁজে পাবে?

প্রতিদিন সকালে সে ঘোড়ায় চেপে পূর্ণ গতিতে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে বনে ঢুকতো এবং যখন ফিরে আসতো, তখন তার মুখাবয়বে সেই রক্তাভ ভাবান্তর, প্রেমবিদুর ক্লান্তি! অবশেষে রহস্যভেদ করলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন মানুষ নয়। আমার ঈর্ষার পাত্র ঐ তেজী ঘোড়াটা, যে তাকে চড়া দুলকি চালে নিয়ে বেড়ায়; আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে বাতাস, যে তার সর্বাঙ্গে সোহাগ পরশ বুলিয়ে যায়; আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সূর্যের আলোয় পরিপুষ্ট সবুজ গাছের পাতারা, যারা তাদের নীচু নীচু ডালগুলি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় ওকে বার বার ছুঁতে পারে। এরা সকলে মিলেই তো তাকে অমন সুখ দিচ্ছে এবং এদের জন্যই সে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এরাই তাকে সুখকর ক্লান্তি দেয়, তার চোখে গভীর ঘুম ডেকে আনে! আমি এর প্রতিশোধ নেবো! আমি খুব সজাগ হ'য়ে উঠি! যখনই সে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, আমি এগিয়ে যাই তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করতে। সেই মুহূর্তে ঘোড়াটা আমাকে দেখে কেমন যেন হিংস্র হয়ে ওঠে, তেড়ে আসে আমার দিকে। আর সোহাগিনী তখন সেই ক্ষ্যাপা ঘোড়ার কেশর ধরে আদর করে, তার পিঠে চুমু খায়, তার লতানো দেহ দেখলে তখন মনে হয়, সে যেন কোন প্রেমিককে আঁকড়ে ধরে বিছানায় আবেশে শুয়ে আছে, তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তেজী ঘোড়ার বিচিত্র ঘ্রাণ।

আমি সুযোগের প্রতীক্ষায়।

একই পথ ধরে সে প্রত্যেকদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যায়,—যে পথের দু'ধারে সারি সারি সংঘবদ্ধ বার্চগাছ এবং যে পথ শেষ হয়েছে এক বনভূমির গায়ে। আমি সেদিন সূর্য ওঠবার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। একখণ্ড দড়ি হাতে নিই, বুকের তলায় পিস্তলটা লুকিয়ে রাখি; আমাকে দেখে মনে হতে পারে, যেন চলেছি কোন ডুয়েল লড়তে।

তারপর তার সেই প্রিয় পথ ধরে ছুটতে আরম্ভ করি। একসময় থমকে দাঁড়াই, দুটি গাছকে ঘিরে সেই দড়িতে প্যাঁচ কষি, পথ বন্ধ হ'য়ে যায়, আমি ঘন ঘাসের আড়ালে আত্মগোপন করি। মাটির বুকে কান পেতে শুনতে পাই, সে আসছে! তার তেজী ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ বাজছে কানে! মুখ তুলে দেখতে পেলাম, প্রচণ্ড গতিতে সে ছুটে আসছে! হ্যাঁ, উল্লাসে তার মুখ লাল, চোখের দৃষ্টিতে অজস্র পরিতৃপ্তি। হুঁ, এখনই তো তার পরম সুখের লগ্ন! ভুল আমি করিনি! ঐ অভাবনীয় দ্রুত অশ্বগতি তার যাবতীয় গর্জন বন্য-আনন্দের কারণ।

ছুটতে ছুটতে ঘোড়াটা মুহূর্তে ঐ দড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আচমকা এই বাধায় হতচকিত তেজী জানোয়ারটার সামনের দু'পা মুড়ে যায় এবং সে আর টাল সামলাতে পারে না। ঠিক তখনই আমি ছুটে গিয়ে যুবতীকে অনায়াসে টেনে তুলি, আমি যে একটা ষাঁড় তুলে ধরবার ক্ষমতা রাখি! যুবতীকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে এবার এগিয়ে যাই দুশমনের দিকে—ঘোড়াটা! ও এতক্ষণ তাকিয়ে দেখছিল আমাদের।

এখন আমাকে এগিয়ে আসতে দেখেই সে তেড়ে আসে, আমাকে কামড়াবার চেষ্টা করে। তার কানের কাছাকাছি পিস্তলটা তাক করি। গুলি করি,—যেভাবে ডুয়েলে একজন অপরজনকে গুলি করে থাকে।

প্রেয়সী রাগে ক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর, হাতের ঘোড়া ছোটানো চাবুক দিয়ে দু'বার সপাং সপাং প্রচণ্ড আঘাত করে আমার মুখের ওপর। আমি একটু সরে যাই, সে দ্বিগুণ তেজে আবার আমার দিকে ছুটে আসতে থাকে। তখন—

তখন আমার পিস্তল দ্বিতীয়বার গর্জন করে।

এখন বলুন, আমি কি পাগল ?

বিক্রয়যোগ্য

For sale

যখন সবে সূর্য উঠছে, তখন শিশির-ভেজা মাঠে অথবা শান্ত সমুদ্রের তীরে পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়াতে কি অভাবনীয় আনন্দ! অনাস্বাদিত সুখ! সমুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত দৃশ্য নয়নকে তৃপ্তি দেয়, তীক্ষ্ণ বায়ুতাড়িত সুগন্ধ প্রবেশ করে নাশারন্ধ্রে এবং ত্বকে প্রেমপূর্ণ স্পর্শ বুলিয়ে যায় বাতাস। কেন তখন পৃথিবীর সঙ্গে এমন আবেগপূর্ণ আত্মীয়তা করি ? দ্রুত, পবিত্র, স্নেহাতুর কোন গ্রাম, কোন গ্রামীণ পথ, কোন উপত্যকার প্রবেশমুখ বা কোন নদীর প্রান্তরেখা ইস্তক দৃশ্যাবলীর স্মৃতিরা কেন তখন মনকে পুলকিত রাখে ? মনে হয়, যেন কোন সুন্দরী আকর্ষণীয়া যুবতীর অন্তরঙ্গ হচ্ছি বুঝি!

অনেক দিনের মধ্যে এরকম একটি দিনের স্মৃতি আজ আমার মনে আসছে। ব্রিটানির উপকূল বরাবর হেঁটে চলেছি ফিনিস্ত্রির দিকে। হাঁটছি দ্রুততর লয়ে, মন একেবার চিন্তাশূন্য। জায়গাটা হচ্ছে ব্রিটানির সুন্দরতম আদরণীয় স্থান কুইমপার্ল।

বসন্তের সকাল,—এমনি একটি সকাল, যা আমাকে আবার কুড়ি বছরের যুবকে পরিণত করছে,—এমন একটি সকাল, যা আমার মনে অতীত প্রত্যাশাগুলিকে আবার জীবন্ত ক'রে তোলে এবং প্রথম যৌবনের স্বপ্নগুলি আবার আমাকে পেয়ে বসে।

হাঁটছি ; একপাশে শস্যক্ষেত্র, অন্যদিকে সমুদ্র ; পথের অবস্থা গ্রামীণ কোন রাস্তার চেয়ে ভাল নয়। শস্যগুলি স্থির এবং সমুদ্রের ঢেউগুলি মৃদু ও শান্ত। বাতাসে পাকা ফসলের গন্ধ, আবার সামুদ্রিকভূমির লবণাক্ত ঘ্রাণও রয়েছে।

আমি চিন্তামুক্ত মগজ নিয়ে সোজা হেঁটে চলেছি। পনেরো দিন আগে আমার এই যাত্রা শুরু হয়েছিল। ব্রিটানির গোটা উপকূলভাগকে পরিক্রমণ ক'রে চলেছে একটানা পদযাত্রা। নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হচ্ছে, কোন যন্ত্রণা নেই। হালকা পা, হালকা মন। আমি শুধু হাঁটছিই।

দুশ্চিন্তাহীন সময়। বহুদূর থেকে ভেসে আসা ধর্ম-সংকীর্তন শুনতে পাচ্ছি। সম্ভবত দলবেঁধে কারা চলেছে চার্চের দিকে, কারণ আজ রবিবার।

তারপর আমি একটি ছোট অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে নিথর হ'য়ে দাঁড়াই, বিস্ময় ও পুলকে নীরব। দৃষ্টির সামনে ভাসমান পাঁচটি বিশাল মাছ ধরার নৌকা; নৌকাগুলিতে হরেক জনের জটলা—পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুর দল; চলেছে তারা প্লাউনেভেনের দিকে।

নৌকাগুলি চলেছে তীর ঘেঁষে, গতি মন্থর, মৃদু নরম বাতাসে পাল তেমন জোরদার নয়। নৌকাগুলির যাত্রীরা সমস্বরে গান গাইছে; নৌকার একধারে দণ্ডায়মান পুরুষদের মাথায় মস্ত বড় টুপি, চড়া গলায় তারা বাতাস কাঁপায়; মেয়েদের কণ্ঠস্বর তীব্র তীক্ষ্ণ, তারপর শিশুদের গান পবিত্র ভাবনাকে পরিস্ফুট করে।

একই সুরে পাঁচটি নৌকা যাত্রীরা গান গাইছে; সেই একঘেয়ে ধ্বনিতরঙ্গ যেন আকাশস্পর্শী। পাঁচটি নৌকা চলেছে একের পিছনে অপরে, ব্যবধান সামান্যই।

ওরা আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তাদের গান শুনছি, যে গান ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

আমি সুখ-স্বপ্নে তলিয়ে যাচ্ছি, যৌবন যে স্বপ্নগুলিকে ডেকে আনে, অবাস্তব মনোহর কল্পনা সব। কত দ্রুত আমরা আমাদের স্বপ্নময় সময়টা পার হয়ে যাই, অথচ ওটাই তো একটা গোটা জীবনের একমাত্র সুসময়। এই দুনিয়ায় যে লোকের ভ্রমণের প্রবল ক্ষমতা রয়েছে, সে কখনো নিজেকে একাকী বোধ করে না, কখনো দুঃখী হয় না, কখনো তার মাথা হেঁট হয় না, সে যখন একান্ত আত্মগত, তখন সুখময় স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে। গুঁড়ো গুঁড়ো সোনার স্বপ্নে মোড়া জীবন কী সুন্দর!

হায়, সেই দিনগুলি আজ গত!

আমি স্বপ্ন দেখছি। কিসের স্বপ্ন? মানুষের চিরন্তন আশার, প্রত্যাশার, সম্মানের এবং নারীর। হাঁটছি, হাঁটতে-হাঁটতে পাকা ফসলগুলিকে স্পর্শ করি; ফসলগুলি সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেঁট করে, আমি শিহরিত হই, মনে হয় আমি যেন কোন জীবন্ত প্রাণীর নরম চুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছি। এক শৈলান্তরীপ অতিক্রম করে একসময় দেখতে পেলাম, সংকীর্ণ বালুবেলার প্রান্তে সাদা-দেয়াল একটি বাড়ি, সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে থাকা তিনখণ্ড ছাদের মতন সমতল ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কেন ঐ বাড়িটার দিকে চেয়ে মন আমার নেচে ওঠে? আমি তা জানি। দীর্ঘ ভ্রমণের মাঝে-মাঝে আমরা সময় সময় এমন এক একটা জায়গায় চলে আসি, যাদের দেখলে মনে হয় বুঝি আমাদের কতকালের পরিচিত, বুকের ভিতরে সাড়া পড়ে যায়! এটা কি সম্ভব যে এর আগে আমরা কখনো তাদের দেখিনি এবং আমাদের অতীত জীবনে কখনো এখানে কিছুদিনের জন্যও বসবাস করিনি? ওদের সব কিছুই কিন্তু আমাদের মনে অনুরণন তোলে,

মন আনন্দে নেচে ওঠে, শান্ত দিগন্ত চোখের সামনে ভাসে, শ্রেণীবদ্ধ গাছগাছালি ও মাটির রং খুব আপনার মনে হয়!

সুউচ্চ সোপানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর বাড়িটা। বিশাল বিশাল ফলবতী গাছগুলি ঘিরে আছে, দৈত্যের মতন তারা ঝুঁকে আছে জলের দিকে। তিনখণ্ড উঁচু সমতল ভূমিরই কিনারে কিনারে সোনার মুকুটের মতন ঘিরে আছে অজস্র প্রস্ফুটিত ফুল সহ স্প্যানিশ মাঁচা।

আমি থমকে দাঁড়াই। হঠাৎ ঐ বসতবাড়ির প্রেমে পড়ে যাই। কেন যেন আমার মনে হলো, ঐ বাড়িটা আমার চাই, আমি ওখানে বাস করবো, চিরটাকাল ওখানেই থাকবো!

ধীরে ধীরে বাড়ির দরজার কাছাকাছি এগিয়ে আসি। বাসনার তাগিদে বুক কাঁপে। সোল্লাসে দেখলাম, বাড়ির একটা স্তম্ভে বিশাল একখণ্ড কাগজ ঝুলছে, যাতে লেখা : "বিক্রয় হবে।"

এমন এক উত্তেজনা আমাকে অধিকার করে বসে, যেন মনে হয়—বসত-বাড়িখানা আমাকেই দেওয়া হচ্ছে, আমি এটা পেয়ে গেছি। কেন, হ্যাঁ, কেন? আমি জানি না।

"বিক্রয় হবে!"

অর্থাৎ, এই মুহূর্তে এটা আর কারুর বিশেষ এক্তিয়ারে নেই, এই পৃথিবীর যে-কোন লোক ওটার মালিক হতে পারে। মালিক হতে পারি আমি, হ্যাঁ আমি-ই! কেন এই আনন্দ, এমন দৃঢ় কেন প্রত্যয়যুক্ত উল্লাস? অথচ, একথা আমার ভালোই জানা ছিল, এ বাড়ি কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কি করে এর দাম দেবো? যাই হোক, বাড়িটা বিক্রয়যোগ্য। এই বাড়ির মালিকের কাছে খাঁচায় আবদ্ধ পাখি, আর স্বাধীন বিচরণকারী পাখিটি হচ্ছে আমার, কোন স্বাধীন পাখি তার নয়।

আমি বাগানে প্রবেশ করি। আহ্! কী চমৎকার বাগান। ...একেবারে শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। নাতিদীর্ঘ উপসাগরের তীরভূমি আমার পায়ের কাছে; তীরভূমি বালুময় ও বক্র, তিনটি বিশাল প্রস্তরময় পাহাড় সমুদ্র থেকে এই অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ...ঠিক বিপরীতে দুটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড প্রতিমূর্তির মতন, এত দূর থেকে মনে হয়—ওরা বুঝি নর ও নারী, স্বামী ও স্ত্রী, যেন একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাদেরই তৈরী এই আবাসের দিকে—তারা জানে, তারা প্রত্যক্ষ করছে, দিনের পর দিন ক্ষয় পেতে পেতে একদিন এই ছোট্ট বাড়িটি হেলে পড়বে, ভাঙন শুরু হবে, তারপর একদিন একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে! বোধ হয় সেইজন্যই আবাসটি বিক্রয়যোগ্য।

আমি দরজার কড়া নাড়তে থাকি, যেন নিজের বাড়ির কপাটে ধাক্কা দিচ্ছি। বাড়ির চাকরাণী দরজা খুলে দেয়। তার বয়স হয়েছে, চেহারার মাপ ছোট্ট, পরনে সাদা বোতাম লাগানো কালো গাউন; দেখাচ্ছে অনেকটা কর্মরতা সন্ন্যাসিনীর মতন।

তাকে বললাম :

"আপনি ব্রিটনের মেয়ে নন?"

সে জবাব দেয় :

"না, মশাই; আমার আদি নিবাস ছিল লোরেনে।"

সে আরো বলে :

"আপনি কি বাড়ি দেখতে এসেছেন ?"

"ও, হ্যাঁ, তাই।"

আমি তাকে অনুসরণ করি।

মনে হলো, এখানকার সব কিছুই আমার পরিচিত—দেয়াল, আসবাবপত্র, ...শুধুমাত্র যেন অবাক হচ্ছি আমার হাঁটবার লাঠিটাকে না দেখে।

ড্রয়িংরুমের মধ্য দিয়ে চলেছি। চমৎকার কার্পেট বিছানো ঘর, বড় বড় তিনটে জানালার মধ্য দিয়ে সমুদ্রকে দেখা যায়। ধাতু নির্মিত তাকের ওপর চৈনিক কারুকাজ করা পাত্র এবং এক মহিলার একখানা বড় ছবি। আমি তৎক্ষণাৎ ঐদিকে এগিয়ে যাই! মনে হলো, এই মহিলাকে যেন আমি চিনি। এবং তাঁকে চিনতে পারলাম, যদিও নিশ্চিত জানা ছিল, এঁর সঙ্গে কোনদিনই আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি! ইনিই তো সেই আকাঙ্খিতা যার জন্য আমি এতকাল প্রতীক্ষা করে আছি, যাঁকে আমি চাই, ভীষণভাবে চাই, যাঁর মুখশ্রী স্বপ্নে দেখতে পাই! তিনিই সেই নারী, যাঁকে সব সময় খোঁজা হয়, প্রত্যেক স্থানে যাঁর উপস্থিতি কাম্য ; তাঁরই সন্ধানে পথ-পরিক্রমা, রক্তমুখী সূর্যে তাঁর অবয়ব দেখা যায়, শস্যক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি ; নিশ্চয় ভ্রমণ প্রাক্কালে হোটেলে তাঁকে আমি দেখেছিলাম, রেলের কামরায় উঠবার মুহূর্তে নিশ্চয় একটিবার তাঁকে আমি দেখেছিলাম, দরজা খোলামাত্র এই বৈঠকখানাতেও চকিতে যাঁকে আমি দেখেছিলাম—তিনি সর্বত্র!

কোন ভুল নেই,—এই সেই মহিলা!

আমারই দিকে চেয়ে-থাকা তাঁর চোখ দেখে চিনতে পারছি। চিনতে পারছি, ইংরেজদের কায়দায় সাজানো চুলের বাহার দেখে, সর্বোপরি তাঁর মুখ ও স্মিত হাসি আমার স্মৃতিকে সজাগ করে দিচ্ছে।

আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করি :

"কে এই মহিলা ?"

সন্ন্যাসিনী চেহারার চাকরাণী জবাব দেয় :

"তিনি মাদাম।"

আমি বলি :

"আপনার মালকিনী ?"

সে মাথা নাড়ে :

"না, না।"

আমি বসে পড়লাম এবং জোর দিয়ে বলি :

"তাঁর সম্পর্কে আমায় কিছু বলুন।"

সে বিস্মিত, হতবুদ্ধি, নিথর।

আমি জিজ্ঞেস করি:

"তা হলে কি এই বাড়িটা ওঁরই ছিল?"

"না, না।"

"তাহলে বাড়িটা কার?"

"এটি আমার প্রভু মঁসিয়ে তুঁরনেলের।"

আমি আঙ্গুল তুলে ছবিটাকে দেখাই:

"তাহলে এই মহিলা, ইনি কে?"

"উনি মাদাম।"

"আপনার প্রভুর স্ত্রী?"

"না, না।"

"তাহলে তাঁর কর্ত্রী?"

কোন জবাব নেই। আমার মন এক অদ্ভুত ঈর্ষায় ভরে ওঠে। আমি ঈর্ষা করছি সেই লোকটিকে, যে প্রথম ঐ নারীকে দেখেছিল।

"তারা এখন কোথায়?"

পরিচারিকা করুণস্বরে বলে:

"মঁসিয়ে, ভদ্রলোক রয়েছেন এখন প্যারিসে, মাদাম সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।"

আমি কেঁপে উঠি।

"ও! তাঁরা তবে আর একসঙ্গে নেই?"

"না।"

অদম্য কৌতূহল আমায় পেয়ে বসে:

"আমাকে বলুন না, কি ঘটেছিল। হয়তো আমি আপনার মালিকের কাজেও লেগে যেতে পারি। আমি এই স্ত্রীলোকটিকে চিনতে পেরেছি, তাঁর ভাগ্য ছিল খারাপ।"

বৃদ্ধা আমার মুখের দিকে তাকায়, আমার অভিব্যক্তিতে সততা খুঁজে পায়, আমাকে বিশ্বাস করে।

"আঃ, কি বলবো, ঐ মেয়েমানুষটি আমার মালিকের জীবনে দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছিল। প্রভু ওর সঙ্গে পরিচিত হন ইতালীতে এবং এমন ঘটা করে নিয়ে আসেন যেন ওকে বিয়ে করেছেন। মাদাম গান গাইতো চমৎকার। প্রভু ওর প্রেমে এমন মজে গিয়েছিলেন যে দেখলে করুণা হতো। গত বছর তাঁরা এই জেলায় বেড়াতে আসেন। এবং এই বাড়িটা আবিষ্কার করেন; বাড়িটা তৈরী করেছিল এক মহা বোকা লোক, যে চেয়েছিল মানুষের বসতি আছে এমন শেষ গ্রামটি থেকেও অন্ততঃ মাইল পাঁচেক দূরত্বে থাকতে। মাদাম দেখেই বাড়িটা কিনতে চাইলো, উদ্দেশ্য, আমার মালিকের সঙ্গে এখানে বসবাস করা। এবং ওকে খুশি করবার জন্য তিনি বাড়িটা কিনলেন।

গত গ্রীষ্মে তাঁরা এখানে ছিলেন; গোটা শীতটাও এখানে কাটিয়েছেন। তারপর একদিন সকালে প্রাতরাশের সময় মঁসিয়ে আমাকে ডাকলেন।'

'সেসার, তোমার মাদাম ফিরে এসেছেন?'

'না, স্যর।'

'সারাটা দিন ধরে আমরা তার প্রতীক্ষায় রইলাম। মালিকের অবস্থা পাগলের মতন। সর্বত্র পাতি-পাতি ক'রে খোঁজা হলো। কোথাও তার দেখা পেলাম না। সে হারিয়ে গেছে স্যর, জানি না—কোথায় ও কিভাবে!"

ওহ্, এই গল্প শুনে কী এক উল্লাস আমাকে পেয়ে বসলো! আমার ইচ্ছা হলো, এই সন্ন্যাসিনীপ্রতিম বৃদ্ধাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ড্রয়িংরুমে নাচতে শুরু করে দিই।

ওহ্, তিনি চলে গেছেন, রেহাই পেয়েছেন, লোকটাকে ত্যাগ করেছেন, ওর ওপর ক্লান্ত হয়েছিলেন, বিরক্ত হয়েছিলেন। আমি খুব সুখী।

বৃদ্ধা বলে চলেছে:

"মঁসিয়ে দুঃখে একেবার ভেঙ্গে পড়লেন, আবার ফিরে গেলেন প্যারিসে, শুধু আমি এখানে আমার স্বামীর সঙ্গে রয়ে গেলাম বাড়িটা বিক্রি করে দেবার জন্য। এর দাম ধার্য হয়েছে বিশ হাজার ফ্রাঁ।"

কিন্তু আমি তার কথা শুনছি না। আমি তাঁর কথাই ভাবছি। সহসা মনে হলো, তাঁর দেখা পাবো, এই মনোহর বসন্তকালে তিনি নিশ্চয় ফিরে আসবেন এই চমৎকার আবাসে; তিনি যে আবাসটিকে বড় ভালোবাসেন, এই কর্তাহীন বাড়িটিতে আবার তিনি ফিরে আসবেন।

আমি বৃদ্ধার হাতে জোর করে দশটি ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে একরকম জোর করে ছবিটা তুলে নিই এবং তাঁর মুখমণ্ডলে অজস্র চুমু খেতে থাকি। চুমু খাচ্ছি সেই চোখের পাতায়—যে চোখের মোহময় দৃষ্টি ছবির মধ্যেও জীবন্ত, অন্তর্ভেদী।

আমি তাঁর দিকে চেয়ে চেয়েই আবার পথে নেমে আসি। তিনি মুক্তি পেয়েছেন, তিনি বন্ধনের মায়া কাটিয়েছেন। সন্দেহ নেই, আজ অথবা কাল দেখা তাঁর পাবোই, এই সপ্তাহে অথবা তার পরের সপ্তাহে; তিনি বাড়ির মালিককে ছেড়েছিলেন, কারণ এবার আমার সঙ্গে তাঁর মিলনের লগ্ন উপস্থিত।

এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তিনি স্বাধীন। আমি শুধু তাঁকে খুঁজে বের করবো এবং বলবো, 'আমি তোমাকে চিনি।'

ভীষণ উত্তেজনায় দুলতে দুলতে হঠাৎ পাকা শস্যের মাথাগুলি স্পর্শ করি, বুক ভরে সামুদ্রিক বাতাস নিই, আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ, প্রত্যাশার নেশায় বুঁদ। হাঁটছি; বড় আশা, শীঘ্রই তাঁর দেখা পাবো, তাঁকে নিয়ে আমার দিনগুলি মধুময় হ'য়ে উঠবে সেই আবাসে, যার দেয়ালে ঝুলছে বিজ্ঞাপন: "বিক্রয়যোগ্য।" তিনি কেমন আমোদ-উল্লাসে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠবেন, এই লগ্নে!

অন্তিম ভ্রমণ

Last Excursion

মেসার্স লাবুজ এণ্ড কোম্পানীর হিসেব আজীবন রাখতে রাখতে ক্যাশিয়ার লেভা এখন বয়স-প্রাচীন। দোকান থেকে পথে নামামাত্র আজ পশ্চিমে ঢলেপড়া বর্ণালী সূর্যের ঝলকানি এসে আঘাত করে তাঁর দৃষ্টিকে। তিনি থমকে দাঁড়ান। সারাটা দিন তাঁকে এক হলুদ বাতির সামনে প্রায়ান্ধকার এক ছোট্ট ঘরে বসে কাজ করতে হয়। ঐ দোকানের পেছনে সংকীর্ণ এক ঢালু জমির ওপর তাঁর কুঁড়েঘর। দরজায় এসে দাঁড়ালে গ্রামের অবারিত মাঠ নজরে আসে। গত চল্লিশ বছর ধরে একটানা তিনি এই অন্ধনিবাসেরই নিবাসী। গ্রীষ্মের খটখটে রোদ্দুর সত্ত্বেও তাঁকে অন্ধকারে বাতি জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়।

ঘরের ভেতরটা হিম হিম, স্যাঁতসেঁতে সোঁদা সোঁদা গন্ধ। ঘরের বাইরে জানালার ঠিক নিচে নর্দমার পচা কাদা ডাঁই হয়ে আছে, সব সময় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রতিদিন সকাল আটটায় এই নরক-কুণ্ডে তাঁর প্রবেশ। আর গোটা দিনের হিসেব মিলিয়ে এখন বেরিয়েছে এই সন্ধ্যা সাতটায়। চল্লিশ বছর ধরে চলেছে এমন ধারাবাহিকতা।

চাকুরি শুরু করেছিলেন বার্ষিক দেড় হাজার ফ্রাঁ মাইনেতে; এখন তাঁর বেতন দাঁড়িয়েছে বার্ষিক তিন হাজার ফ্রাঁতে। এই সামান্য আয়ে তো সংসার চলে না, তাই তিনি অকৃতদার। নিঃসঙ্গ নিঃস্ব জীবনে চাহিদাও খুব সীমিত। সময় সময় একটানা একঘেয়েমিতে বিরক্তি আসে, মন উদাসী হয়। কখনো কখনো পরমপুরুষের দরবারে তিনি নিজের ব্যথা প্রতিবেদন করেন:

"ঈশ্বর, আজ যদি আমার বার্ষিক আয় পাঁচ হাজার ফ্রাঁ হতো, তবে আমার জীবনে সুখের বান ডাকতো!"

কিন্তু আয়বৃদ্ধির কোন উপায় নেই। কোন উপরি আয় তাঁর নেই। জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ তিনি দেখলেন না। নির্বিকার দিনগত পাপক্ষয়ে কোন রোমাঞ্চ নেই। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেনি। অতি অক্ষম অলস মানুষও বৃহৎ সুখের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তাঁর ভেতর তেমন কোন স্বপ্নেরও অবকাশ নেই। সেই কোন কালে কুড়ি বছর বয়সে মেসার্স লাবুজ এণ্ড কোম্পানীতে ঢুকেছিলেন, তারপর থেকে বৈচিত্র্যহীন সময় বয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু পারিবারিক চিরাচরিত ঘটনা ঘটে গেছে। আঠারো শো ছাপ্পান্ন সালে দেহ রাখলেন বাবা, আর মা বিদায় নিলেন আঠারো শো উনষাটে। এরপর একদিন বাড়িওয়ালা আরো ভাড়া বাড়াবার নোটিশ দিলেন, বাধ্য হয়ে আঠারো শো আটষট্টিতে পুরনো বাড়ি ছেড়ে এই এঁদো বাড়িতে উঠে এলেন তিনি।

এই তো মোটামুটি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রতিদিন সকাল ছ'টায় কামানের গোলা ফাটার মতন বিকট হুঁশিয়ারী তুলেছে

ঘড়িটা। সেই শব্দে তড়াক্ ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছেন। কেবলমাত্র দু'বার—একবার আঠারো শো ছেষট্টিতে, আর একবার আঠারো শো চুয়াত্তরে ঐ ঘড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সকালে উঠে গায়ে জামা গলান, বিছানা তোলেন, ঘরদোর পরিষ্কার করেন, চেয়ার-টেবিল মোছেন—এই তো তাঁর প্রাত্যহিক সাংসারিক কাজ। এই কাজগুলি করতে তাঁর ঘন্টাদেড়েক সময় লাগে। এরপর লাম্বুর রুটির দোকান থেকে রুটি কিনে খান। ঐ রুটির দোকানটির এগারোবার মালিকানা বদল হয়েছে, কিন্তু নাম ঠিক একই আছে। দিনের বাকি সময়টা কাটে অন্ধকার অফিস-ঘরে, যেখানকার দেয়ালে সাঁটা কাগজগুলিকে আজ পর্যন্ত বদলানো হয়নি। মঁসিয়ে ব্রুঁ সতেঁর সহকারী হয়ে কাজে যেদিন ঢুকেছিলেন, সেদিন তাঁর মনে একটি উচ্চাশা ছিল,—একদিন তিনি এই মঁসিয়ের চেয়ারে বসবেন; ব্যস্, এর বাইরে আর কোন প্রত্যাশা তার ছিল না।

প্রবাহমান জীবনে মানুষ কত রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তার স্মৃতির ভাণ্ডার জমে ওঠে হরেক রকম সুখ দুঃখের স্মৃতি, একাধিক দৈব ঘটনা, কখনো কখনো সাহসিক কাজের অভিজ্ঞতা, প্রেম ও প্রেম-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ইত্যাদি। অথচ তাঁর নিথর জীবন-দর্পণে এরা কোনদিনই ছায়া ফেলেনি। তাঁর কাছে এখন সময়ের বিবর্তন অর্থহীন, নিস্তরঙ্গ। প্রতিদিনের বৈচিত্র্যহীন কাজ তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে,–সেই ঘড়ির ডাকে তড়াক্ করে লাফিয়ে ওঠা, বিছানাপত্র গুটিয়ে রাখা, লাঞ্চ খাওয়া, অফিসে যাওয়া, অফিস থেকে ফিরে ডিনার খাওয়া, ডিনার খেয়ে শূন্য বিছানায় ফিরে যাওয়া। এর কোন ছেদ নেই, ব্যতিক্রম নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তার ঠাকুর্দার আমলের একখানা আয়না আছে ঘরে। যৌবনে তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চটকদার গোঁফ ও কোঁকড়ানো বাহার দেখতেন। এখনো বাড়ির বাইরে যাবার সময় সেই একই আয়নার সামনে দাঁড়ান, কিন্তু এখন তার গোঁফ পেকে সাদা এবং কোঁকড়ানো চুলের বদলে বিশাল টাক সহ প্রশস্ত কপাল—ক্ষণিকের জন্য তিনি নিজের এই রূপান্তর উপলব্ধি করেন। দীর্ঘ চল্লিশটা বছর একটা দুঃস্বপ্নময় রাত্রির মতন কত দ্রুত শেষ হয়ে গেল! বাপ-মায়ের মৃত্যু ছাড়া এই দীর্ঘ সময়ে আর কোন উল্লেখযোগ্য স্মৃতি তাঁর ভাণ্ডারে নেই। এই দিক থেকেও তিনি অত্যন্ত রিক্ত।

কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, দোকানের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মঁসিয়ে লেভা ঈষৎ পুলকিত, তাঁর দু'চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের উৎসব। সেই উৎসবের ছন্দ যেন তাঁকেও এসে স্পর্শ করে। এই প্রথম তাঁর মনে হলো, এখন ঘরে ফিরে গিয়ে কাজ নেই; তার চেয়ে ডিনারের আগে আমি একটু পায়চারি করবো।

খুশি খুশি মনে হাঁটতে হাঁটতে এসে গেলেন বুলভার্দে। গাছে গাছে থোকা থোকা ফুলের অপূর্ব বাহার, নিচে বয়ে চলেছে জনতার স্রোত। নতুন বসন্তের সন্ধ্যা, মন-প্রাণ সোহাগে-উল্লাসে উন্মাদ।

মঁসিয়ে লেভার হাঁটার ভঙ্গীতে নির্ঘাৎ বয়সের ক্লান্তি। কিন্তু দৃষ্টিতে সবুজ সতেজতা। মন আনন্দে ভরপুর–উষ্ণ বাতাস, প্রকৃতির স্নেহ তাঁর যাবতীয় অবসাদকে মুছে দিচ্ছে!

তাঁর মনে কোথা থেকে আসছে যেন যুবকসুলভ রোমাঞ্চ, তিনি এগিয়ে চলেছেন সাঁজেলিজির মধ্য দিয়ে।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বর্ণময় আগুনের ছটা যেন দিগন্তে 'আর্ক দ্য ট্রায়াম্ফি' দৈত্যের মতন ঝুঁকে আছে। অতিকায় সেই স্তম্ভের পাদদেশে পৌঁছে প্রবীণ হিসাবরক্ষকের মনে হলো, তাঁর ক্ষিদে পেয়েছে। দ্রুত ঢুকে পড়লেন রেঁস্তরায়।

খেতে বসে তিনি পেলেন ভেড়ার পালের খুরের শব্দ। ঐ শব্দ তাঁর কাছে এখন খুবই শ্রুতিমধুর। শাক-সব্জির সঙ্গে চাটনি দিয়ে খেতে লাগছেও চমৎকার। এরপর খানিকটা ক্লারেতও* পান করলেন। এরপর অভ্যাস মতন এক কাপ কফি ও এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি।

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। নিজেকে বেশ হালকা ঝরঝরে মনে হচ্ছে। নিজেকেই নিজে বলেন, "কি সুন্দর রাত একটা। বয় দ্য বুলন পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমার আদৌ কষ্ট হবে না।"

হাঁটতে শুরু করলেন। অনেক দিন আগে তিনি এক প্রতিবেশিনীর মুখে গান শুনেছিলেন, এখন আবছা আবছা তা মনে আসছে, আপন মনে গুনগুনিয়ে উঠলেন :

"গাছেরা সব সবুজ সবুজ
প্রিয়া আমায় হাতছানি দেয়,
মিলনে মোরা উষ্ণ হবো
চলো গো ঐ বনের ছায়ায়।"

এই দুটি মাত্র কলি বারবার ভাঁজতে থাকেন। ক্রমশঃ নামছে আঁধার, নিরঙ্কুশ নিথর রাত।

তিনি বয় দ্য বুলনের মোড় পার হচ্ছেন। সারি সারি চলন্ত গাড়ির আলো তাঁকে আকর্ষণ করছে। হঠাৎ চোখে পড়লো, একটা গাড়ির মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী জড়াজাড় করছে। পুরুষটির পরনে কালো পোশাক, আর নারীর দেহে পোশাকের স্বল্পতা। আহ্, এই রাতে অসংখ্য তারকাদের নিচে যুগলবন্দী প্রেমিকেরা সব চলেছে পর পর। একজন অপরজনকে জড়িয়ে ধরে স্বপ্ন দেখে। চুম্বনে-চুম্বনে রাতের পরিবেশ গরম করে তোলে। ওদের শরীর ছুঁয়ে আসছে বলে বাতাস এত উষ্ণ। সেই উষ্ণ বাতাস আর সব মানুষের মনে রঙ ধরাচ্ছে।....

সুখকর শ্রান্তি এসে অধিকার করে লেভাকে। তিনি পথের পাশে একটি বেঞ্চে বসে পড়েন; বসে বসে ভালোবাসার গাড়িগুলিকে লক্ষ্য করেন। ঠিক তখন, হঠাৎ কোথা থেকে এক মহিলা এসে তাঁর পাশে বসে পড়ে।

বসেই সেই মহিলা সোহাগপূর্ণ গলায় ডাকে, "হ্যালো, ডার্লিং।"

লেভা বিস্ময়ে হতবাক, মুখে রা-টি নেই।

---

*ক্লারেত=এক ধরনের ফরাসী মদ।

মেয়েটি গলার স্বর অপরিবর্তিত রেখে বলে, "এসো, আমি তোমাকে একটু আদর করি। দেখবে, এতে কত সুখ!"

তিনি বিব্রত গলায় বলেন, "মাদাম, আপনি লোক চিনতে ভুল করেছেন!"

মেয়েটা কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর একখানা হাত ধরে ফেলেছে, হাতের তারায় আঙ্গুলের বিলি কাটতে কাটতে বলে, "বাধা দিয়ো না শোন, আমি তোমায় অঢেল আনন্দ দেবো, এসো, কাছে এসো..."

আপ্রাণ চেষ্টায় মন শক্ত করে লেভা উঠে দাঁড়ান, হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু একশ' গজ যেতে না যেতেই আর একটি মেয়ের পাল্লায় পড়েন।

"হ্যালো. এসো আমাব সঙ্গে বসবে চলো।"

মেয়েটি আবেদন জানায়।

তিনি এবার থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, তোমরা এ ধরনের জীবিকাকে বেছে নিয়েছো কেন?"

মেয়েটি কিন্তু তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়ায় না, কর্কশ স্বরে বলে, "নিশ্চয় নিছক ফূর্তি করবার জন্য নয়।"

লেভার স্বর শান্ত, "তবে কেন?"

"তাও বলে দিতে হবে? পেটের জন্য, বুঝলে?"

ঠোঁট বাঁকিয়ে গানের একটি কলি ভাঁজতে ভাঁজতে মেয়েটি চলে যায়।

মঁসিয়ে লেভা স্তম্ভিত। যেতে যেতে আরও কয়েকটি মেয়ের ইশারা পেলেন তিনি। মনে হচ্ছে, মাথার মধ্যে অসম্ভব ভারী কি একটা বস্তু বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। আবার একটি বেঞ্চে বসে পড়লেন। গাড়ির স্রোত এখনো সমানে প্রবাহমান। তিনি ভাবলেন,—আমার এখানে আসাটা ঠিক হয়নি। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করছে।

কিন্তু থেকে থেকে প্রেমের ছবিগুলি তার মগজে হাতুড়ি পিটতে থাকে। বৈধ অথবা অবৈধ ভালোবাসা, স্বতঃস্ফূর্ত অথবা পয়সার বিনিময়ে পাওয়া শরীরে শরীরে মাখামাখি ও চুম্বন-বৃষ্টি,—তাঁর চোখের সামনে কেবলই ভেসে ভেসে আসছে।

প্রেম, ভালোবাসা!

না, এদের সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই। তাঁর কাছে নারীর প্রেম তো এক ধরনের বিলাসিতা এবং সেই বিলাসিতা উপভোগ করবার মতন সঙ্গতি তাঁর কোন কালেই ছিল না। সারা জীবনে দৈবাৎ দু' চারজন মহিলার সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন মাত্র, অন্তরঙ্গ হতে সাহসী হননি। সমাজের আর পাঁচজন লোকের মতন স্বাভাবিক সুখের জীবন তো তাঁর নয়। তাঁর দিনগুলি একঘেয়ে, বিষাদময় ও নিস্তরঙ্গ।

তাঁর মতন হতভাগ্য লোক এই পৃথিবীতে কিছু কিছু আছে। মঁসিয়ে লেভা এখন এখানে বসে বসে তাঁর মরুপ্রায় জীবনের মূল্যায়ণ করছেন। শুধুই শূন্যতা, নিঃসীম শূন্যতা। জীবনের শেষ দিনটিও তাঁর কাছে প্রথম দিনটিরই মতন অর্থহীন বিষাদ বয়ে আনবে—এটা অনিবার্য, এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এখনো গাড়িগুলি ছুটছে। ছুটবেও গোটা রাত ধরে। ঐ তো দেখা যায়, পুরুষ ও নারী কেমন নিবিড় সুখে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে। আহ্, কী গভীর সুখ ওদের,—সুখ—সুখ—অঢেল সুখে দুনিয়াটা মাতাল। একমাত্র তিনিই এখানে নিঃস্ব, লোভী উপবাসী চোখে চেয়ে আছেন। এই একাকীত্ব অসহ্য। আগামী দিনগুলিতে, যতদিন তিনি বাঁচবেন এই নিঃসঙ্গতা ও বিষাদ তাঁকে ত্যাগ করবে না। পৃথিবীতে তাঁর মতন হতভাগ্য আর কে আছে? আর কেন এখানে বসে থাকা?

কেন? তাঁর তো আপনজন বলতে কেউ নেই। এই পড়তি বয়সে মানুষ ঘরে ফিরে কচি-কাঁচা বাচ্চা-কাচ্চাদের কলকলানি শুনতে কত না ভালোবাসে! সন্তান-সন্ততিরা ঘিরে আছে, আর বুড়োর চুলগুলি দিনের পর দিন সাদা হয়ে যাচ্ছে,—কি চমৎকার অনুভূতি! মন সেই রকম পরিবেশ চায়, ভালবাসা চায়, বাচ্চাদের আবোল তাবোল প্রশ্ন শুনতে চায়....।

আর তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করছে? অপেক্ষা করছে এক ভয়াবহ নির্জন কুঠুরি, জীবনের অধিকাংশ রাত যেখানে তিনি শূন্য বিছানায় ছটফটিয়ে কাটিয়েছেন! অফিস ঘরটার চেয়েও তাঁর ঐ আবাস-ঘরটি বেশী খারাপ ও মর্মান্তিক। ও ঘরে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন লোকের আবির্ভাব ঘটে না।

কারুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় না। সেখানে মৃত্যুর থমথমানি। যেন একটা নোংরা জলে পূর্ণ ডোবা, যার কোন স্মৃতি নেই।

সেই মৃত্যুপুরীতেই তাকে ফিরে যেতে হবে, প্রাত্যহিক কাজগুলি সারতে হবে, সেই বিছানা পাতা, শুয়ে পড়া, ঘড়ির বিকট হুঁশিয়ারী...ইত্যাদি ইত্যাদি সব সরল, অথচ অতি ভয়ঙ্কর কার্যকলাপ।

মুক্তি চাই! এর হাত থেকে মুক্তি চাই!! ছটফটিয়ে উঠলেন লেভা। বয়-এর এক নম্বর পথ ধরে হনহনিয়ে এগিয়ে চললেন একটা ছোট্ট ঝোপের দিকে। সেখানে পৌঁছে ঘাসের ওপর পা বিছিয়ে বসলেন।

মাথার ওপর বিশাল আকাশ। বাতাসে ভেসে আসছে হাজার জনের কলকলানি। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি যেন শুনছেন, কার হৃদয়বিদারক হাহাশ্বাস!

আবার সূর্য পশ্চিমে। অদ্ভুত আলো চরাচরে। আবার শুরু হয়েছে দুটি একটি গাড়ির আনাগোনা। একদল অশ্বারোহী মনের আনন্দে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

নববিবাহিত একজোড়া স্বামী-স্ত্রী রাস্তার জনবিরল দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলো। হঠাৎ একটা ঝোপের ওপর গাছের ডালে নজর পড়তেই যুবতীর সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে, 'ওকি! ওটা কি গো?'

বলেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যায় তার স্বামীর গায়ের ওপর। লোকটা তার হতচেতন দেহ ধীরে ধীরে শুইয়ে দেয় মাটির ওপর।

খবর পেয়ে পুলিশের দল আসে। গাছের ওপর থেকে নামিয়ে আনা হলো এক বৃদ্ধের জীর্ণ দেহ। প্যান্ট ছিঁড়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন!

মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানা গেল, গত রাত্রে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তাঁর পকেটে পাওয়া কাগজপত্রগুলি সনাক্ত করলো—এই ভদ্রলোক ছিলেন মেসার্স লাবুজ এণ্ড কোম্পানীর হিসাবরক্ষক। নাম লেভা।

মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা। কিন্তু কেন এই আত্মহনন? সাময়িক মানসিক বৈকল্য?

ক্ষমা

Forgiveness

পৃথিবীর তাবৎ উত্তেজনায় আগুন থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী এক পরিবারের সদস্যা সে।

রাজনীতি-টাজনীতি নিয়ে তারা কখনো হৈ-হুল্লোড় করে না। তবে খাবার টেবিলে বসলে কিছু না কিছু নিয়ে আলোচনা হবেই। কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু বেশীরভাগই অতীত নিয়ে, ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে,—সুদূর অতীতে কি ভাবে এক রাজশক্তির পতন হয়েছিল, কেমন করে বিপ্লবের কালে সম্রাট ষোড়শ লুই নিহত হলেন, কিংবা ভুবন বিখ্যাত নেপোলিয়ন কি ভাবে একটির পর একটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন ইত্যাদি।

অথচ, আধুনিক সমাজে যে দ্রুত বিবর্তন চলেছে, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা আঁকড়ে ধরে আছে অতীতকে, অতি পুরাতন ঐতিহ্যকে। তাদেরই এলাকাতে যদি কখনো অঘটন ঘটে, তারা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বর্তমানের কেলেঙ্কারিকে তারা সযত্নে এড়িয়ে চলে।

কখনো কখনো সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির কর্তা ও কর্ত্রী এক থাকলে নিজেদের মধ্যে এরকম দু'চারটে সাম্প্রতিক ঘটনার আলোচনা করে থাকে। তখন তাদের স্বর খুব চাপা। যেন কি ভয়ে ভয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে!

কর্তার স্বর হয়তো তখন খুব চিন্তান্বিত, "বিভোল পরিবারে কি ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে, জানো?"

গিন্নির জবাব, "জানি। বিশ্বাস করা কষ্টকর। কী সাংঘাতিক!"

ছেলে মেয়েরা নির্বিকার। তাদের মনে ভাবনা-সন্দেহ নেই। তাদের জগৎ সীমিত। শুধু নিজেদের নিয়েই তারা ব্যস্ত, দুনিয়ার আর কিছু নিয়েই তারা ভাবিত নয়। মানুষ নামক জীবটি যে অতি জটিল এবং সবসময়ই যে তারা যা বলে, তাই করে, তা নয়—এ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে যে লড়াই করতে হয়, এমনকি আত্মরক্ষার জন্য কখনো কখনো সশস্ত্র থাকাও দরকার,—এ জ্ঞান তাদের হয়নি। তারা জানতো না যে, সোজা সরল মানুষরা এই পৃথিবীতে পদেপদে ঠকে, প্রতারিত হয়; নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বদলে তাচ্ছিল্য লাভ আশ্চর্যের নয়; সৎ ও ভালো লোকের প্রায়শই ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে থাকে।

অথচ এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য অতিমাত্রায় ভালোমানুষ, সৎ, স্পষ্টবাদী, অর্থাৎ বর্তমান যুগ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণই অন্ধ। আর কোন দিনই হয়তো তাদের চোখ ফুটবে না।

এমনই এক পরিবারের অষ্টাদশী সুন্দরী বার্থের বিয়ে হলো প্যারিসের ছেলে জর্জ ব্যারণ সেভি জোঁলসের সঙ্গে; জর্জ স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবসায়ী। বয়সে তরুণ, আচার ব্যবহারে রীতিমত আকর্ষণীয়। ভদ্র মিষ্টি ভাষায় কথা বলে সে সকলকে মুগ্ধ করতে পারে। সামাজিক আদব-কায়দায় সে কেতাদুরস্ত কিন্তু মনে মনে সে তার সরল শ্বশুর শাশুড়িকে বোকা ও অপাংক্তেয় ভাবে। ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে আড্ডায় বসে সে তাদের সম্পর্কে টিপ্পনী কাটে, "ওরা হলো একজোড়া অতীতকালের ভূত, অবশ্য আমার প্রিয়।"

ব্যারণের পারিবারিক সুনাম আছে, তার চেয়েও বড় কথা,—ওদের পয়সার অভাব নেই।

বিয়ের পর ঘটা করে নববধূকে নিয়ে ফিরলো প্যারিসে। সেখানে অজস্র মানুষের ভিড়ে হতচকিত বার্থে, স্বভাব অনুযায়ী সে নিজেকে এক কোণে গুটিয়ে রাখে। জীবনের রহস্য, প্রতারণা সে বোঝে না; জানে না নাগরিক জীবনের আদব কায়দা, হৈ-হুল্লোড়, আমোদ-স্ফূর্তি।

তার পরিচিত জগতের পরিধি ছিল মাত্র তাদের বাড়িটি, বাড়ির সামনে নির্জনপ্রায় পথটি। সেই বাড়ি ছেড়ে সে যখন রওনা দিয়েছিল, তখন তার মনে হচ্ছিলো—সে কোন সুদূর, অজ্ঞাত, বিচিত্র এক দুনিয়ায় পাড়ি জমাচ্ছে।

বছরে দু-তিন দিনের বেশী স্বামী তাকে থিয়েটারে নিয়ে যেত না। কিন্তু ঐ দু-তিন দিনের স্মৃতিই ছিল তার কাছে অবিস্মরণীয়। এ যেন রূপকথা! ঐ নাটকের স্মৃতি তার মনকে বিভোর করে রাখতো। হয়তো নাটক দেখার তিন মাস পরে খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ সে স্বামীর দিকে চেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠেছে, "মনে আছে সেই অদ্ভুত অভিনেতার কথা, যে মুরগীর ডাক নকল করেছিল?"

বাইরের জগতের লোক বলতে সে চিনতো প্রতিবেশী দু'চার জনকেই, যাদের প্রতি তার সম্ভ্রমের অন্ত ছিল না, যাদের নাম প্রতিবার উচ্চারণ করবার সময় সে 'মাননীয়' বা 'মাননীয়া' বিশেষণটি জুড়ে দিত; যেমন, 'মাননীয় মারতিনেতম্' কিংবা 'মাননীয়া মিকেলিতস্'।

স্বামীটি কিন্তু স্বাধীন, চলেছে প্রাক-বিবাহিত জীবনের জের টেনেই। যখন ইচ্ছে বাড়ি থেকে বের হতো, যখন ইচ্ছে ফিরে আসতো; কখনো কখনো ব্যবসায়িক কাজকর্মের দোহাই দিয়ে রাত কাটাতো বাইরে। স্ত্রীর মতামতের আদৌ পরোয়া করতো না সে। স্ত্রীর সরল মানসিকতার পূর্ণ সুযোগ নিতে কসুর করেনি সে।

এমন সময় বার্থের নামে একটা উড়ো চিঠি এলো। কে একজন লিখেছে, বার্থে নাকি তার স্বামীর দ্বারা সাংঘাতিকভাবে প্রতারিত! চিঠিটা পড়ে বার্থের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

সে ঐ পত্রলেখককে ঘৃণা করছে, আবার স্বামীর প্রতি সন্দেহে মন ও শরীরও ভেঙ্গে পড়ছে। সে অনুধাবন করতে পারলো, গত দু'বছর ধরে তার স্বামী মাদাম রোসেত নামে এক কমবয়সী বিধবার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। ওর বাড়িতেই মাঝে-মধ্যে রাত কাটাতে যায় সে!

বার্থে স্ত্রীসুলভ ছলাকলায় অভ্যস্ত নয়। স্বামীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করার প্রবৃত্তি তার নেই। সরাসরি খাবার টেবিলে বসা স্বামীর দিকে চিঠিটা ছুঁড়ে মারে। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যারণের কিছুক্ষণ সময় লাগলো। মনে মনে স্ত্রী-ভোলানো পরিকল্পনা এঁটে স্ত্রীর ঘরের দরজায় গিয়ে ঘা দিতে শুরু করে। বার্থে দরজা খুলে দেয়, অভিমানী দৃষ্টি তার অন্যদিকে। ব্যারণ হাসতে থাকে, হাসতে হাসতে বার্থেকে জড়িয়ে ধরে, একরকম জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যায় বিছানায়, মোলায়েম পরিহাসের গলায় বলে, "লক্ষ্মী প্রিয়া আমার, তুমি এত অল্পেতেই আমাকে ভুল বুঝলে? হ্যাঁ, একথা সত্যি, মাদাম রোসেতের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পুরনো বন্ধুত্ব, আমাদের পরিচয় দশ বছরের ওপর। কিন্তু এই অন্তরঙ্গতা অত্যন্ত নির্দোষ। আর দেখ, এরকম আরো অন্তত গোটা কুড়ি পরিবারের সঙ্গে আমার দহরম মহরম আছে। ওদের কথা তোমাকে কোনদিন বলিনি; কারণ আমি জানতাম, এসব সম্পর্কে তোমার কোনদিনই আগ্রহ নেই। কিন্তু তাই বলে, এই ধরনের কুৎসা! ছিঃ ছিঃ! না, না, এরকম ভুল বোঝাবুঝি চলতে দিতে পারি না। খাওয়া-দাওয়া সেরে তুমি তৈরী হয়ে নাও, আজই আমি মাদাম রোসেতের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো। তোমার নিজেরও ভালো লাগবে, তুমি একজন মনমতো নতুন বান্ধবী পেয়ে যাবে।"

স্বামীর স্তোকবাক্যে বার্থের মন গলে যায়; গভীর আবেগে স্বামীকে আঁকড়ে ধরে চুমু খায়। মাদাম রোসেতের সঙ্গে পরিচিত হতে তার তখন অদম্য কৌতূহল। স্বামীর মুখে সব শুনবার পরও বুকের মধ্যে একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করছে; মাদামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে সেই কাঁটাটাকে চিরদিনের মতন তুলে ফেলতে চায়।...

চৈনিক সজ্জায় সজ্জিত সুন্দর একটা বাড়ির তিনতলার একটি ঘরে তারা প্রবেশ করে। সেই ড্রয়িংরুমের জানালায় ঝুলছে অপূর্ব সব পর্দা, সূর্যের আলো যেন রঙিন হয়ে আছড়ে পড়ে এ ঘরের মেঝেতে। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর সে এলো। বয়সে যুবতী, গায়ের রং অভাবনীয় কালো, ছোটখাটো দেহের গড়ন। হাসি হাসি মুখ, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিস্ময়।

জর্জ পরিচয় করিয়ে দেয়, "এ হচ্ছে আমার স্ত্রী, আর উনি মাদাম জুলি রোসেত।"

আনন্দে-উল্লাসে রোসেত শব্দ করে ওঠে, বার্থের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। সেই আনন্দ স্পর্শ করে বার্থেকেও। জর্জ একে বোনের মত ভালোবাসে। আর সে জর্জের স্ত্রী বলেই তো তার এত কদর! বার্থের খুব ভালো লাগছে! খুব!

মাসখানেকের মধ্যেই দুই যুবতীর মধ্যে প্রগাঢ় হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। দিনে অন্তত: দু'বার তাদের মুলাকাৎ হবেই। প্রায়ই রাতে তারা একসঙ্গে খানা-পিনা করে। দু'

তরফ থেকে আমন্ত্রণ লেগেই আছে। জর্জ আজকাল আর বাইরে বিশেষ রাত কাটায় না। বান্ধবীটি তো এখন তার হাতের কাছেই। এখন তার বক্তব্য,—বাড়িতেই ভালো। চুল্লির ধারে বসে থাকতে আরাম তো খুব।"

এমন সময় মাদাম রোসেতের আবাস-সংলগ্ন একটি ফ্ল্যাট বাড়ি খালি হলো। ব্যারণ-গিন্নী নিজের উৎসাহে এ ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে বসে; উদ্দেশ্য, তার প্রাণের বান্ধবীর সাহচর্য লাভ।

দু'বছর চললো তাদের দহরম-মহরম। এমন বন্ধুত্ব যেন আর হয় না। বার্থে কথা বলতে গেলেই জুলির কথা উল্লেখ করে,—জুলির মতন মেয়ে আর হয় না, ফুলের মতন পবিত্র মেয়ে। কোন দুশ্চিন্তা নেই, উদ্বেগহীন জীবনপ্রবাহে তারা সকলেই সুখী।

কিন্তু এমন দিন বেশীদিন রইলো না।

মাদাম রোসেত হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লো। অজানা রোগ। বার্থের চোখে ঘুম নেই, সব সময় বসে আছে বান্ধবীর শিয়রে। দুশ্চিন্তা ও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছে সে। জর্জ নিজেও কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়। ডাক্তার এলেন। রোগিনীর অবস্থা দেখে মুখ তাঁর গম্ভীর। জর্জ আর বার্থেকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "দেখুন, ভদ্রমহিলার অবস্থা আমার খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

ডাক্তার চলে গেলেন। বেদনাহত, স্তম্ভিত স্বামী ও স্ত্রী কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। তারপর উদ্গত বেদনা আর চেপে না রাখতে পেরে দু'জনেই ডুকরে কেঁদে ওঠে। রোসেতের শিয়রে বসে রাত জাগলো দু'জনেই।

বার্থে আপ্রাণ ব্যাকুলতায় আদর করছে তার মরণাপন্ন বান্ধবীকে। জর্জ রোগিনীর পায়ের কাছে নিথর হয়ে বসে লক্ষ্য করছে এই দুই বান্ধবীকে। পরের দিন মাদাম রোসেতের অবস্থার আরো অবনতি হলো।

কিন্তু সন্ধ্যার দিকে মাদাম রোসেতই জানালো অন্যান্য দিনের তুলনায় সে নাকি আজ অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। একরকম জোর করে সে এই দম্পতিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল সেদিন।

ঘরে ফিরে খাবার টেবিলের সামনে বসে তারা দু'জনে। ভীষণ অবসাদ ও বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন দু'জন। খাবারে তাদের অরুচি। প্রায় কিছুই মুখে তুললো না। ঠিক সেই সময় বাড়ির ঝি জর্জের হাতে একখানা চিঠি এনে দেয়। চিঠি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ জর্জের মুখ আরো কালো ও ফ্যাকাশে হ'য়ে ওঠে।

কোন রকমে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ভাঙা স্বরে বলে বার্থে, "কিছু মনে করো না, তোমায় কিছুক্ষণ একা রেখে আমাকে বের হতে হচ্ছে। দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবো। তুমি কিন্তু লক্ষ্মীটি কোথাও যেও না।"

বলেই টুপি আনবার জন্য ঘরে চলে গেল জর্জ।

বার্থে প্রতীক্ষা করছে। তার স্বামী দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবে। এই সময়টুকু সে নিশ্চয় এখানে নিশ্চল হয়ে বসে বসে অপেক্ষা করবে। —কিন্তু স্বামী তো আসছে না। সময়সীমা পেরিয়ে গেল। বার্থে কৌতূহলবশতঃ তার স্বামীর ঘরে প্রবেশ

করে। আশ্চর্য, জর্জ তো তার দস্তানা জোড়া নিয়ে যায়নি; অথচ কোথাও বাইরে গেলে সে ঐ দস্তানা জোড়া সঙ্গে নেবেই। হঠাৎ নজরে এল একটা দলাপাকানো কাগজ পড়ে আছে বিছানার ওপর। কাগজটা দেখেই বার্থে চিনতে পারলো, একটু আগে বাড়ির ঝি এটাই তার স্বামীর হাতে দিয়ে গিয়েছিল। জীবনে এই প্রথম বার্থের মানসিকতা কিছুটা জটিল হয়ে ওঠে। এই প্রথম গোপনে অপরের চিঠি পড়তে উৎসাহী হ'য়ে উঠলো সে। বিবেক অবশ্য বাধা দিচ্ছে, নিজের সঙ্গে যেন রীতিমত লড়াই করছে বার্থে। শেষ পর্যন্ত তার হাত এগিয়ে এল, খামচে ধরলো কাগজখণ্ডকে, চোখের সামনে মেলে ধরতেই দেখলো, পেন্সিলে জুলির আঁকা বাঁকা লেখা:

"প্রিয়তম, একটিবার এসো; এসে আদরে আদরে আমায় ভরিয়ে তোল। আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এল।"

চিঠি হাতে বার্থে নিথর। তার মুখ চোখ ভাবলেশহীন। কিছুক্ষণ তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন ঐ চিঠির মর্মান্তিক সম্পর্ক তার মগজে আঘাত হানে। সে বুঝতে পারছে। সমস্ত রহস্য এই মুহূর্তে তার কাছে জলের মতন স্বচ্ছ। দিনের পর দিন তার সরলতার সুযোগে কী জঘন্য চক্রান্ত, কী ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতাই না গড়ে উঠেছে। সে বড় সাংঘাতিকভাবে প্রতারিত। তাকে কেমন ফাঁকি দিয়ে জুলি আর জর্জ তাদের অবৈধ মেলামেশাকে বজায় রেখেছে। বার্থে যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে,— দিনের পর দিন নিরালায় জুলি আর জর্জ কেমন একে অপরের ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করেছে। আজ মনে পড়ছে, বই পড়তে পড়তে জর্জ কেমন মোহমদির দৃষ্টিতে একে অপরকে লক্ষ্য করতো।

অভিমানে, ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় বার্থে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। অসহ্য যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে সে। অতলস্পর্শী হতাশায় ডুবে যাচ্ছে সে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ ভেসে আসতেই বার্থে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে খিল তুলে দিল।

দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে ব্যস্ত গলায় জর্জ বলতে তাকে, "বার্থে, শিগগির এসো, মাদাম রোসেতের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে।"

বার্থে দরজা খুললো ঠিকই, কাঁপা গলায় বললো, "তুমিই যাও। আমার যাবার কি দরকার?"

জর্জ চমকে ওঠে। বিস্মিত চোখে সে বার্থের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর আবার উচ্চারণ করে, "একটুও দেরী করো না। ও মারা যাচ্ছে।"

বার্থে বলল, "যদি ওর বদলে আমি মারা যেতাম, নিশ্চয় খুব খুশী হতে।"

তার এই কথায় জর্জ বুঝতে পারে, এই অন্তিম মুহূর্তে সমস্ত রহস্যই ফাঁস হয়ে গেছে। জর্জ তখন একাই গেল জুলিকে দেখতে।

মাদাম রোসেতের দিকে চেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে জর্জ। আজ থেকে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। ঘরে-বাইরে তার জন্য কেউ রইলো না। তার স্ত্রী তো আর কোনদিনই তাকে আপন ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে না।

আবার মাদাম রোসেতের মতনও কেউ রইলো না, যে তাকে দু'দণ্ড শান্তি দিতে পারে।

তবু তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবেই একসঙ্গে ঘর করতে থাকে। প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের যে আপাত ছন্দ, তা থেকে তারা বিচ্যুত হলো না। কিন্তু মনের দিক থেকে তারা এখন দুই পৃথক মেরুর বাসিন্দা। একটা বছর এমনি তিক্ততার মধ্যে কেটে গেল। তারা দু'জন দু'জনের প্রতি এখন এমন ভাব দেখায়, যেন কেউ কাউকে চেনে না। নিঃসঙ্গতার অমানুষিক জ্বালায় বার্থে প্রায়-ক্ষিপ্ত। এই দুর্বিসহ জীবনের জোয়াল সে আর টেনে বেড়াতে পারছে না।

একদিন খুব সকালে বার্থে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে যখন এল, দেখা গেল তার হাতে একটি মস্ত শ্বেত গোলাপের তোড়া।

অনেককাল পর আজ সে স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে কথা বললো। তার স্বরে দুঃখ আছে, উদ্বেগ আছে, সহানুভূতি আছে।

বার্থে বললো, "চলো, আজ আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যাই।"

জর্জ ব্যারণ হতবাক।

বার্থে আবার বলে, "তুমি এই ফুলের তোড়াটা আমার হাত থেকে নাও। অত ভারি আমি বইতে পারছি না।" তোড়াটা নিয়ে জর্জ তার স্ত্রীকে অনুসরণ করে। অপেক্ষমান একটা ঘোড়ার গাড়িতে তারা চেপে বসে। গাড়ি ছুটতে থাকে।

গাড়ি থামলো এসে এক সমাধিক্ষেত্রে।

ভেজা চোখে কাঁপা গলায় বার্থে তার স্বামীকে বলে, "আমাকে তার কবরের কাছে নিয়ে চলো।" জর্জের শরীর রোমাঞ্চিত। সে বুঝতে পারছে না, তার হাত পা কেন কাঁপছে। কোন রকমে ফুলগুলি আঁকড়ে ধরে সে এক মার্বেল পাথরে গড়া সমাধির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখে কোন কথা না বলে শুধু আঙুল তুলে দেখায়।

বার্থে স্বামীর হাত থেকে তোড়াটা নেয়, সেটা সযত্নে সাজিয়ে রাখে সমাধির ওপর, তারপর নতজানু হয়ে ধ্যানের অতলান্তে তলিয়ে যায়।

পিছনে দাঁড়ানো জর্জের দু'চোখে তখন জল।

বার্থে উঠে দাঁড়ায়; ঘুরে তাকায় তার স্বামীর মুখের দিকে; প্রীতিকর উষ্ণতায় দুই হাত বাড়িয়ে উচ্চারণ করে:

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু!"

মুসাফিরের কাহিনী

Traveller's tale

এক

ক্যানাস থেকে মাল-পত্তরে, যাত্রী-সাধারণে গাড়ি একেবারে ঠাসা। গাড়িতে যারা উঠেছে, তারা একে অপরকে চেনে, গল্প গুজবে মেতে উঠতে তাই তাদের কোন বাধা নেই। গাড়ি যখন তারাসকন এলাকা পার হচ্ছে, হঠাৎ একজন বলে ওঠে, "এই জায়গাতেই সেই বিখ্যাত খুনটা হয়েছিল।"

সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা তার গতি বদলায়,—সকলেই এখন সেই খুনের প্রসঙ্গে আলোচনায় রত।

জায়গাটা ভয়ানক। গত দু'বছর ধরে এই জায়গায় অনেক ভ্রমণকারী প্রাণ হারিয়েছেন। অথচ, তাঁদের একটি খুনেরও আজ পর্যন্ত কিনারা হয়নি। খুবই রহস্যময়।...

যে যার মতামত বলে যাচ্ছে, খুনগুলি সম্পর্কে নিজের নিজের সিদ্ধান্ত জানাচ্ছে। মেয়েদের আতঙ্ক স্বভাবতই বেশী, জানালার মধ্য দিয়ে অন্তহীন অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে; প্রতিক্ষণ তাদের ভয়, এখনই বুঝি কোন কিম্ভূতকিমাকার মুখ উঁকি মারে দরজা দিয়ে। আর পুরুষরা সমানে বকর বকর করে চলেছে। কে কবে একদল ডাকাতের মুখোমুখি হয়েছিল, চলন্ত ট্রেনে কবে এক ভয়ানক পাগলের আবির্ভাব ঘটেছিল, ছুটন্ত গাড়িতে রহস্যময় পুরুষের মুখোমুখি বসে থাকার অস্বস্তি ইত্যাদি সব গল্প। সকলেই চায়, তার গল্পটি যেন অন্য সকলের গল্পকে টেক্কা দিতে পারে! গল্পের কারিকুরিতে নিজের নিজের সাহস ও বুদ্ধির কথাই জাহির করতে চাইছে তারা।

এই গাড়িতে একজন ডাক্তার আছেন; প্রত্যেক শীতে তিনি দক্ষিণে বেড়াতে আসেন; তিনিও এবার তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প বলতে শুরু করেন:

"আমি যে আমার জীবনে সাহসিকতার খুব একটা বড় পরীক্ষা দিয়েছি তা নয়। কিন্তু আমার চিকিৎসাধীনে ছিলেন, এমন এক রমণীর জীবনে অদ্ভুত বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল, যাকে পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না! তিনি আজ বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর মর্মান্তিক গল্প আজও আমি বয়ে বেড়াচ্ছি।

তিনি এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া রুশ মহিলা, কাউন্টেস্ মেরী বারণো; অসাধারণ রূপবতী। নিশ্চয় স্বীকার করবেন, রুশ মেয়েরা দেখতে সুন্দরী হয়; অন্ততঃ আমাদের চোখে তারা প্রায় ডানাকাটা পরী। সুগঠিত নাসিকা, চকচকে কপাল, ঈষৎ নীলাভ অথবা বাদামী চোখ, নমনীয় তনুতে কিছুটা কাঠিন্য,—তাদের এই রূপ মাতাল করে দেয়

যে-কোন পুরুষকে, সে নিজের সর্বনাশ হবে জেনেও ঝাঁপিয়ে পড়ে ; ঐ অহঙ্কারীও স্নিগ্ধ, কোমল অথচ কঠিন রূপের দুর্নিবার আকর্ষণকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না। ফরাসী পুরুষরা তাই রুশ মেয়ে দেখলে পাগল হ'য়ে ওঠে। আসল ব্যাপার কিন্তু এই,—ওরা বিদেশিনী এবং বিদেশিনীদের প্রতি চিরদিনই আমাদের আকর্ষণ তুঙ্গে।

আমার এই রোগিনী বহুকাল যাবৎ তাঁর শাসযন্ত্রের অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর বাড়ির ডাক্তার তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন বায়ুপরিবর্তনের —দক্ষিণ ফ্রান্সের আবহাওয়া তাঁকে অনেকটা চাঙ্গা করে তুলবে। কিন্তু ভদ্রমহিলা কিছুতেই সেন্ট পিটার্সবার্গ ছাড়তে রাজি নন।

কিন্তু দিনের পর দিন তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটায়, ডাক্তার ও স্বামীর যৌথ পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি রাজি হলেন সেন্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে অন্য কোথাও জলবায়ু পরিবর্তনে যেতে। স্বামীরই পছন্দ করা জায়গা মেতোঁনের উদ্দেশ্যে একদিন রওনা দিলেন তিনি।

প্রায় একাই চলেছেন তিনি। সঙ্গে একজন ভৃত্য মাত্র। প্রথমে ঘোড়ার গাড়ি, তারপর ট্রেন। কামরাটায় তিনি একেবারে একা। ভৃত্যটি অন্য এক তৃতীয় শ্রেণীতে। ধাবমান ট্রেনের দরজার সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর বিষণ্ণ চোখের সামনে ঘূর্ণায়মান গ্রাম ও উপত্যকা। অনুভব করছেন, জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ, বৈচিত্র্যহীন! স্বামীর অকুণ্ঠ ভালোবাসাও তো তিনি পাননি! স্বামীর নিশ্চয় উচিত ছিল নিজে অনেকদূর এগিয়ে এসে তাঁকে বিদায় জানানো। কিন্তু তিনি তা না করে এমন একটা ভাব দেখালেন যেন, এই পৃথিবীর শেষ প্রান্তে তিনি তাঁর বুড়ো খানসামাকে এক হাসপাতালে পাঠাচ্ছেন। হৃদয়হীন কর্তব্যপালন মাত্র।

এক একটা স্টেশনে গাড়ি থামে, আর ভৃত্য আইভান এসে তাঁর খবরাখবর নিয়ে যায়। আইভানের বয়স অনেক, খুব অনুগত, কর্ত্রীর হুকুমে যে-কোন কাজ সে করতে রাজি।

রাত ঘনায়মান। অন্ধকার ঝুপ ক'রে নেমেছে চরাচরের বুকে। ট্রেন ছুটছে পূর্ণ গতিতে। এই নিঃসঙ্গতায় তাঁর স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়ছে। তিনি ভয় পাচ্ছেন, কিভাবে সময় কাটাবেন? হঠাৎ তাঁর মনে হলো, আসবার সময় তাঁর স্বামী তাঁকে যে কতকগুলি ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন, সেগুলি এখন নেড়েচেড়ে দেখলে মন্দ হয় না। ছোট্ট ব্যাগটা পেড়ে ফেললেন তিনি। কোলের ওপর বিছিয়ে দিলেন বিচিত্র চাকচিক্যময় কয়েকমুঠো স্বর্ণমুদ্রা। হঠাৎ—

হঠাৎ তাঁর মুখের ওপর কার হিমেল নিঃশ্বাস। বিস্ময়ে মাথা তুললেন। তখনই কামরার দরজাটা খুলে গেল। কেমন এক অজানা শিহরণে বিভ্রান্ত হচ্ছেন কাউন্টেস্ মেরী; চটপট নিজের শাল দিয়ে টাকাগুলো ঢেকে ফেললেন। বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইলেন দরজার দিকে।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই দ্বারপথে একজনের আবির্ভাব। সান্ধ্য পোশাক, মাথায় টুপি নেই, জখমী একখানা হাত থেকে সমানে রক্ত গড়াচ্ছে, অতি পরিশ্রান্তের মতন হাঁপাচ্ছে সে।

লোকটা দরজা বন্ধ করে দেয়, সহযাত্রিনীর দিকে এক পলক চেয়ে হাতের জখমে রুমাল জড়ায়, তারপর নীরবে একটা আসন গ্রহণ করে।

আতঙ্কে মেরীর মূর্ছা যাবার উপক্রম। এই লোকটা—এই লোকটা নিশ্চয় গুণ্ডা, বদমাইশ, ডাকাত। তাঁকে সোনার টাকা গুণতে দেখে ছিনতাই করতে এসে ঢুকেছে। হয়তো প্রয়োজন হলে তাঁকে খুনও ক'রে পালাতে পারে। আর কেমন তীব্র চাউনি লোকটার চোখে, নিশ্চয় এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে।...

কিন্তু মেরীর সন্দেহ বাস্তবায়িত হলো না।

লোকটা হঠাৎ দরদী গলায় বললো, "ভয় পাবেন না।"

মেরীর তো প্রত্যুত্তর দেবার শক্তিও ততক্ষণে নিঃশেষ। দুই কানের মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ রব, শুধুই নিজের হৃৎপিণ্ডের দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। বিশ্বচরাচর, এমন কি এই ধাবমান ট্রেনটাও নিঃশব্দ।

লোকটা আবার বললো, 'মাদাম আমি ক্রিমিন্যাল নই।'

মেরী তবুও নিশ্চুপ। কিন্তু এমন সময় তিনি ঈষৎ কেঁপে ওঠায়, হাঁটু দুটো ফাঁক হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা ঝন্‌ঝনিয়ে কামরার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ঝর্ণার উৎসারিত জলধারার মতন উজ্জ্বল মুদ্রাগুলি। চমকপ্রদ ওদের চাকচিক্য। আগন্তুক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর হেঁট হয়ে কুড়োতে শুরু করে।

আর কোন সন্দেহ নেই মেরীর। লোকটা ডাকাত, খুনীও হতে পারে! তাঁর শেষ সম্বলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তারপর তাঁকে খতম করে চলে যাবে! ভয়াবহ আতঙ্কে মেরী দরজার দিকে ছুটে যান; এখনই এই চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে চান! কিন্তু—

কিন্তু লোকটি তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিলো না। তাঁর মনোভাব আগেই টের পেয়ে দৌড়ে মেরীকে জাপটে ধরে ভেতরে টেনে আনে, সবেগে আসনে বসিয়ে দেয়, কঠিন হাতে চেপে রাখে মেরীর বাঁ হাতের কব্জিকে।

অত্যন্ত বিব্রত স্বরে সে বলতে থাকে: 'মাদাম, আপনি যা আশঙ্কা করছেন, তা নয়। আমি গুণ্ডা-বদমাইশ নই। এটা প্রমাণ করবার জন্যই তো আপনার টাকাগুলোকে কুড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

কিন্তু মাদাম, আপনার কাছে আমার প্রয়োজন একটা আছে। আপনি আমাকে সীমান্ত পার ক'রে দেবেন। পার হতে না পারলে আমার মৃত্যু অবধারিত! এর বেশী আর কিছু বলতে পারছি না। আর মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই রাশিয়ার প্রান্তিক রেল স্টেশনটি আমরা পার হয়ে যাবো। বড় জোর আর এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট—এরই মধ্যে আমরা চলে যাবো রাশিয়ার বাইরে। এই ভয়ানক মুহূর্তগুলিতে আপনার সাহায্য

আমি চাই। আপনিই আমার রক্ষাকবচ। বিশ্বাস করুন, আমি খুনী নই, ডাকাত নই, এমনকি জীবনে কোন অশালীন কাজও আজ পর্যন্ত করিনি শপথ করে বলছি, আমাকে ঐসব বিষয়ে সন্দেহ করবেন না। আর আমার বলার কিছু নেই। দোহাই—'

কথাগলি একদমে শেষ করেই হাঁটু মুড়ে বসে, একটা একটা করে প্রত্যেকটি টাকা তুলে সে মেরীর ব্যাগে রাখতে থাকে, এমন কি অনেক দূরে গড়িয়ে যাওয়া মুদ্রাটি পর্যন্ত তুলে এনে দেয়। মুদ্রাভর্তি চামড়ার ব্যাগটা আবার মেরীর হাতে নিরাপদে ফিরে আসে। কামরার আর এক কিনারে বসে পড়ে সে। কিছুক্ষণ কারুর মুখে রা নেই। ভুরু কুঁচকে আছে নিশ্চল মাদামের। তখনো ভয়ের দৈত্যটা তাঁর বুকে ঘাঁপটি মেরে আছে; অবশ্য আতঙ্কের বহরটা আর আগের মতন তীব্র নয়। লোকটার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকান। বিবর্ণ ভাবলেশহীন একখানা মুখ—যেন প্রাণহীন! মাদাম তাঁর দৃষ্টি নত করতে বাধ্য হন। সুপুরুষ। লোকটির চেহারায় এক ধরনের মাদকতা আছে, বয়স ত্রিশের মধ্যে, শান্ত ও ভদ্র।

গাড়ি সা সা শব্দে ছুটে চলেছে অন্ধকারের বুক চিরে। কখনো গতির মত্ততা তুঙ্গে ওঠে, কখনো অপেক্ষাকৃত মন্থর। এদের শরীর দুলছে, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে সময় সময়। অদূরে স্টেশন, তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার ট্রেনের। ক্রমশ গতি মন্থর হয়। রাশিয়ার প্রান্তিকতম রেল স্টেশনে গাড়ি এসে থামে।

যথারীতি খোঁজ খবর নেবার জন্য ঠিক তখনই বুড়ো আইভান এসে কামরার দরজায় দাঁড়ালো।

কাউন্টেস মেরী চকিতে তাঁর সহযাত্রীর দিকে এক পলক তাকিয়ে ঢোঁক গিলে কাঁপা কাঁপা গলায় আইভানকে বললেন: 'আইভান, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও; তোমার আর যাবার দরকার নেই।'

আইভান অবাক। বড় বড় চোখ মেলে কিছুক্ষণ চেয়েই থাকে শুধু মেরীর মুখের দিকে। কোন রকমে বলে 'কিন্তু মা...'

ওরা কথা শেষ হবার আগেই মেরী বলে ওঠেন: 'না, তোমার আর সঙ্গে যেয়ে কাজ নেই। আমি মত বদলে ফেলেছি। তুমি কাউন্টের সঙ্গে রাশিয়াতেই থেকো। এই নাও ফিরে যাওয়ার টাকা। তবে তোমার টুপি আর জোব্বাটা আমার দরকার। ঐ দুটি জিনিস আমাকে দিয়ে যাও।'

বুড়ো আইভান রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। তবু কোন প্রশ্ন না তুলেই টুপি আর জোব্বাটা তার প্রভু-পত্নীর হাতে তুলে দেয়। সে জানে, সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের পুরুষ বা মহিলারা এ রকম স্বভাবেরই হন বটে। কখন যে কি মর্জি, খোদায় মালুম। অগত্যা চোখের জল মুছতে মুছতে বিশ্বাসী ভৃত্য বিদায় নেয়।

আবার ট্রেন চলতে শুরু করে। হু হু করে ছুটে চলেছে সীমান্তের দিকে।

কাউন্টেস্ মেরী এবার আগন্তুকের দিকে ফিরে তাকান: 'মঁসিয়ে, এই পোশাক দুটো আপনার ছদ্মবেশের জন্য রাখলাম। আপনাকে এখন আমার ভৃত্য আইভানের

ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আর একটা শর্ত আছে,—আপনি এখন থেকে আমার সঙ্গে একদম বাক্যালাপ করবেন না, এমনকি মৌখিক ধন্যবাদ জানানোও নয়।'

আগন্তুক নীরবে কৃতজ্ঞতায় মেরীকে অভিবাদন করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চেকপোস্টে গাড়ি থামে। সরকারি লোকেরা কামরার ভেতরে প্রবেশ করে।

কাউন্টেস্ স্বাভাবিক সপ্রতিভতায় নিজের পাশপোর্ট দেখালেন ; এক কোণে বসেথাকা মানুষটার দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, 'ঐ যে আমার চাকর, আইভান। এই যে ওর পাশপোর্ট।'

সরকারি লোকেরা সন্দেহমুক্ত মন নিয়ে বিদায় নিলো।

আবার ছুটলো ট্রেন। সারাটা রাত এরা দু'জন মুখোমুখি। সাড়া নেই, শব্দ নেই—যেন মূক।

পরদিন সকালবেলা জার্মানীর একটা স্টেশনে গাড়ি থামে। এতক্ষণে মুখ খোলে লোকটি, 'আমাকে মাফ করবেন মাদাম ; আমি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না। শুধু একটি কথা বলতে চাই, আপনাকে আমি আপনার ভৃত্যের সেবা থেকে বঞ্চিত করেছি। প্রতিদানে আমি কি আপনার কোন কাজেই লাগতে পারি না?'

তিনি নিরাসক্ত গলায় বলেন, 'আপনি আমার জন্য একটি পরিচারিকা খুঁজে দিন।'

লোকটি মাদামের জন্য একটি পরিচারিকা যোগাড় করে দেয়। এরপর থেকেই তারা বিচ্ছিন্ন। একবার শুধু মেরী দুপুরে অন্য এক স্টেশনে নেমে দেখেছিলেন বহুদূরে দাঁড়িয়ে লোকটি একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

অবশেষে গাড়ি মেতোঁনে পৌঁছলো।

দুই

এই পর্যন্ত বলে ডাক্তার কিছুক্ষণ নীরব থাকেন।

তারপর আবার তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় :

একদিন চেম্বারে বসে রুগী দেখছি, এমন সময় একজন দীর্ঘদেহী যুবক আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'ডাক্তারবাবু, আমি কাউন্টেস্ মেরী বারনোর খোঁজ করছি। আমি তার স্বামীর বন্ধু ; অবশ্য মেরী আমাকে চেনেন না।'

আমি বললাম, 'আপনি যাঁর কথা জানতে চাইছেন, তাঁর সম্পর্কে আমি কোন সুখবর আপনাকে দিতে পারছি না। তাঁর পক্ষে রুশদেশে আর ফিরে যাওয়াও সম্ভব হবে না।'

আমার উত্তর শুনে হঠাৎ ভদ্রলোক ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন। চলে গেলেন মাতালের মতন টলতে টলতে।

আমি ঘটনাটা জানাতেই কাউন্টেস্ দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে শুনলাম সমস্ত ঘটনা। আরো বললেন : 'জানেন, সেই অজানা অপরিচিত লোকটি

আমাকে ছায়ার মতন অনুসরণ করে চলেছে। আমি কখনো পথে বের হলেই তাকে দেখতে পাই। সে মর্মভেদী দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে, কিন্তু কোন কথা বলে না!'

একটু থেমে মাদাম বললেন: '...আমি হলপ্ করে বলছি, সে এখনো এই জায়গা ছেড়ে যায়নি। চলুন, দেখবেন,—ঠিক জানালার নীচে দাঁড়িয়ে আছে!'

বলতে বলতে উঠে গিয়ে তিনি জানালার পর্দা তুলে দেখালেন। দেখলাম, সত্যি সেই যুবক আগন্তুক এখন নার্সিংহোমের দেয়ালের কাছে একটা বেঞ্চে বসে আছে! একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে এই জানালার দিকে। আমাদের দেখতে পেয়েই সে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়, বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, সোজা চলতে থাকে সামনে, একবারও পিছনে ঘুরে তাকায় না।

সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, একজোড়া বিষণ্ণ হৃদয়ের আশ্চর্য মূক ভালোবাসা! কাউন্টেসের প্রতি ঐ যুবকের যে প্রেম, তাতে কোন কামনাবাসনার স্পর্শ নেই, আছে শুধু আত্মত্যাগের ব্যাকুলতা। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেলে কোন লোক যেমন পরিত্রাণকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, এই লোকটিও তেমনি মেরীর প্রতি তার জীবন-মন সঁপে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মেরীর প্রতি জন্মেছে তার এক অদ্ভুত অনুরাগ, যার তাড়নায় সে ছুটে এসে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল: 'ওর অবস্থা কেমন বুঝছেন ডাক্তারবাবু? ও কি সুস্থ হ'য়ে উঠবে না?' প্রত্যুত্তরে নিরেট বাস্তবের আঘাতে সে ভেঙ্গে পড়েছে, একজন বলিষ্ঠ যুবক হয়েও ডুকরে কেঁদে উঠেছে।

এর আরো কিছুদিন পর দুর্বল, ফ্যাকাশে মেরী আমাকে বললেন, 'জানেন, আমি ঐ অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে জীবনে একবারের বেশী কথাই বলিনি। অথচ, আজ আমার মনে হচ্ছে, ওর সঙ্গে যেন আমার বিশ বছরের ঘনিষ্ঠতা।'

এরপর চোখাচোখি হলেই মেরী স্মিত হেসে তাকে যেন নীরবে অভয় দিতে শুরু করলেন। তিনি জানেন,—'দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন', তবু জীবনের সেই শেষ প্রান্তে তিনি যেন প্রকৃত প্রেমের সংস্পর্শ লাভে অদ্ভুত সুখী, পরিতৃপ্ত।

কিন্তু মাদামের বিচিত্র খেয়াল। কিছুতেই তিনি তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না, এমনকি ওর নাম-ধাম জানতেও চান না। এ ব্যাপারে কিছু বলতে গেলেই তিনি বলেন, 'না-না, তা হয়না। তা হলে আমাদের এই বন্ধুত্বের মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা চিরকাল পরস্পরের অচেনা থেকে যাবো।'

আর তাঁর প্রেমিকটিকেও বলিহারি, কল্পনায় একটি আস্ত ডন কুইক্সোট! প্রেমিকার সঙ্গে বাস্তব ঘনিষ্ঠতা অর্জনে তার কোন উদ্যমই নেই। গাড়িতে বসে সেই যে কথা না বলার শপথ নিয়েছিল তারা, আজও সেই পাথর বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

মেরীর দিন ঘনিয়ে এসেছে। রক্তশূন্যতায় তিনি বিবর্ণ। তবু মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে জানালার পর্দা ফাঁক করে দেখেন,—সে ঠিক বেঞ্চের ওপর নিথর অবস্থায়

বসে আছে। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে হাঁপাতে থাকে মেরী। কিন্তু তাঁর সমস্ত মুখময় প্রশান্ত তৃপ্তি, ঠোঁটে ফুলের মতন ফুটে থাকে একচিলতে হাসি।

তারপর একদিন বেলা দশটায় কাউন্টেস্ মেরী এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

শোকাচ্ছন্ন মনে রাস্তায় পা রাখতেই মুখোমুখি হলাম সেই প্রেমান্ধ যুবকের। তাকে দেখেই বুঝতে পারলাম, খবর সে পেয়ে গেছে। অবরুদ্ধ আবেগে সে বললো, 'আমি তাকে দেখতে চাই! মাত্র একটিবার দু'চোখ মেলে তাকে দেখতে চাই! ডাক্তারবাবু—!'

আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। বুকে আগলে নিয়ে যাই মেরীর শোবার ঘরে।

দু'জনে গিয়ে দাঁড়ালাম মৃতার শয্যাপার্শ্বে। সে কাঁপতে কাঁপতে মেরীর হাত দু'খানা তুলে নেয়, গভীর বিশালব্যাপ্ত প্রেমের অভিপ্রকাশে সুদীর্ঘ চুম্বন করে সেই দুই হিম, নিথর হাতে; তারপর হতচেতন মানুষের মতন টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ডাক্তার থামলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর উপসংহার টানলেন:

দীর্ঘ রেলপথযাত্রার এইটাই হলো আমার জানা সেরা প্রেমের ইতিকথা। সত্যি, ওরা দু'জনে বড় অদ্ভুত চরিত্রের ছিল।'

একজন স্ত্রীলোক আপন মনে বিড় বিড় করে উঠলেন:

'না, ডাক্তারবাবু, তাঁরা পাগল ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন—তাঁরা ছিলেন—'

কথা শেষ করতে পারলেন না, কান্নায় তাঁর স্বর বুজে আসে। তাঁকে স্থির করবার জন্যই অন্য প্রসঙ্গে সকলে আলোচনা করতে শুরু করে দেয় অথচ তিনি কি যে বলতে চেয়েছিলেন, সেটা আর জানা গেল না।

আসন বুনতো যে নারী

The chair mender

শিকারের মরশুম যখন আরম্ভ হলো, মারকুঁ দ্য বারট্রাসেঁর বাড়িতে খানাপিনার জোর আসর জমে উঠেছে। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন এগারোজন শিকারী, আটজন যুবতী এবং এক প্রতিবেশী ডাক্তার। থরে থরে ফুল ও ফল দিয়ে সাজানো আলোকিত একটা টেবিলকে ঘিরে আলোচনারত তাঁরা। খাওয়া-দাওয়া শেষ। মনের আনন্দে গল্প-গুজবে মেতে উঠেছেন। গল্পের গতি এঁকে বেঁকে যেতে যেতে যে মুহূর্তে প্রেমের প্রসঙ্গে এলো, এঁরা একেবারে তর্কের উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। বিষয়বস্তু: নিখাঁদ প্রেম একজনের জীবনে ক'বার সম্ভব? একবার না, একাধিকবার?

জীবনে একটি মাত্র প্রেমে একনিষ্ঠ আছেন, এমন ব্যক্তির উদাহরণ অনেকেই দিলেন। আবার এমন তথ্যও পাওয়া গেল, একজন তাঁর জীবিতকালে বহু নারীর

প্রেমে সমআগ্রহে ডুব দিয়েছেন! পুরুষরা বললেন,—এই জাতীয় বহুবিধ প্রেমে যারা রপ্ত, মানসিক দিক থেকে তারা এক ধরনের পাগলমাত্র। এবং এই রোগ থেকে রেহাই পাওয়া তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, নিজেদের স্নায়ুকে হয়রাণ করতেই তাদের আনন্দ। শুধু তাই নয়, প্রেমের পথে তারা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারে না, ইপ্সিত নারীকে লাভ করতে এরা খুন করতেও পিছপা হয় না।

এ সবই পুরুষদের ভাষ্য।

মেয়েরা কিন্তু তাদের স্পর্শকাতর মন নিয়ে প্রেমকে বর্ণনা করেছেন স্বর্গীয় বস্তু হিসেবে। স্বর্গ থেকে হতভাগ্য মানুষ কেবল এই একটি বস্তুই ছিনিয়ে আনতে পেরেছে—অমর্ত্য প্রেম। বলাবাহুল্য, এমন প্রেম মানুষের জীবনে একবারই আসে, অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতন তার আবির্ভাব হয়। যার হৃদয় একবার সেই বজ্রপাতের মুখোমুখি হয়েছে, জীবনের গতিই তার পরিবর্তিত হয়ে যাবে,—বিকট মরুপ্রায় শূন্যতায় সে কষ্ট পাবে আজীবন। এর কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু মহিলাদের এই মন্তব্যে সায় দিতে পারছেন না মারকুঁ, যাঁর নিজের জীবনে প্রেমের অভিজ্ঞতা অজস্র; তিনি তাই প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একজন মানুষ জীবনে বহুবার প্রেমে পড়তে পারে এবং প্রতিবারই তার প্রেম সমান গভীর ও অকৃত্রিম হতে পারে। প্রেম একবারই সম্ভব, এর স্বপক্ষে যুক্তিটা কোথায়? আপনারা কি এমন লোক দেখতে পারেন, যিনি তাঁর সারাটা জীবন শুধু প্রেমের জন্যই উৎসর্গ করে গেছেন? প্রেমের জন্য যারা আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তারা মূর্খ। ভেঙ্গে না পড়ে তার উচিত প্রতীক্ষা করা—প্রেম দ্বিতীয় দফায় তার কাছে আসবে, দ্বিতীয় দফার পর তৃতীয় দফা, এমনি করে আমৃত্যু সে নতুন নারীর প্রেম আস্বাদন করবে। প্রেমিক আর মাতালে তফাৎ নেই।

মদ যে খায়, সে তো আর মদ ছাড়া বাঁচতে পারে না; তেমনি প্রেমে যে একবার মজেছে, সে নেশা তার হাড়ে হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় গেঁথে যাবে। আরো সহজ কথায় বলতে পারি, প্রেম হচ্ছে এক ধরনের ঝোঁক ও প্রবৃত্তি, যে একবার তার স্বাদ পেয়েছে, সে নিত্য নতুনের দিকে হাত বাড়াবেই!'

অর্থাৎ প্রেমের ব্যাখ্যায় এরা কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। তখন মধ্যস্থ হলো ডাক্তারের, যাঁর প্যারির-জীবন অভিজ্ঞতায় ভরপুর এবং বিশাল অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি এখন তাঁর অবসরজীবন কাটাচ্ছেন। অগত্যা সকলেই ঘিরে ধরলেন তাঁকে: ডাক্তারবাবু, আপনি কিছু বলুন।

ডাক্তারের জীবনবোধ যদিও গভীর, মারকুঁর মতন সোচ্চার তিনি নন। নিজেকে কেন্দ্র করে প্রেম সম্পর্কে বক্তব্য রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তবু তিনি মুখ খুললেন, 'প্রেম সম্পর্কে কোন আলোচনা উঠলেই আমি আমার স্মৃতি-ভাণ্ডার থেকে একটিমাত্র ঘটনাকে খুঁজে পাই। এটি এমন এক একনিষ্ঠ প্রেম, যা পঞ্চান্ন বছর টিঁকে ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও এ প্রেমে মালিন্যের ছাপ লাগেনি, একটি দিনের জন্যও ছেদ পড়েনি: একেবারে মৃত্যুতেই ঘটেছিল এর পরিসমাপ্তি।'

মারকুঁ টেবিল চাপড়ে বাহ্বা জানালেন।

এক ভদ্রমহিলা বলে উঠেলেন, 'অপূর্ব দৃষ্টান্ত তো! এরকম ভালোবাসা পাওয়া আমাদের সুন্দরতম স্বপ্ন। পঞ্চান্ন বছর যে প্রেমের আয়ু, না জানি তা কত সুখের, কত অতলস্পর্শী! এমন প্রেম যে উপভোগ করেছে, সেই নারীর মতন সৌভাগ্যবতী আর কে! তিনি ধন্য।'

ডাক্তার স্মিত হাসলেন, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'না, মাদাম, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। শুনলে আপনি হয়তো নিরাশই হবেন। কারণ, এমন বিরল ভালোবাসা যিনি পেয়েছিলেন, তিনি নারী নন, একজন পুরুষ!

এবার হয়তো আপনি আরো চমকে উঠবেন শুনলে যে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি আপনার পরিচিত। রসায়নে সুপণ্ডিত মঁসিয়ে ককেত। আর মেয়েটি? সেও আপনার অপরিচিতা নয়! সেই বুড়ি মেয়েমানুষটি, প্রতি বছর বেত দিয়ে আসন বুনে দিতে এ বাড়িতে যার আগমন ঘটতো। কিন্তু এই দু'জন বিপরীতধর্মীকে নিয়ে যে ভালোবাসার ইতিকথা, কি করে যে আমি আপনাদের তা বোঝাবো, ভেবে উঠতে পারছি না!'

ডাক্তারের কথা শুনে মেয়েমহলের উৎসাহে ভাঁটা পড়লো, তারা প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর হতাশ, কারুর কারুর ঠোঁট বেঁকেছে, কেউ কেউ আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে। এখানে সমবেত উচ্চবংশীয় নারী-পুরুষ সকলেরই ধারণা, প্রেম করবার অধিকার সকলের নেই। সমাজের আর পাঁচটা সুবিধাও যেমন তাঁরা একচেটিয়াভাবে ভোগ করেন, তেমনি প্রেমটাও থাকবে একমাত্র তাঁদেরই কুক্ষিগত। যে মেয়েমানুষ বেত দিয়ে কুসন বোনে, তার জীবনের প্রেম নিয়ে আবার গল্প হয় নাকি? ফুঃ!

ডাক্তার কিন্তু বলে চলেছেন:

'তিন মাস আগে ঐ বৃদ্ধার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তখন তার অন্তিমকাল। ঘোড়ায় টানা নড়বড়ে জীর্ণ একটা এক্কাতে বিছানা পেতে শুয়ে ছিল সে। আপনারা হয়তো অনেকেই সেই গাড়িটা দেখে থাকবেন। আদতে ঐ ঘোড়ায় টানা গাড়িটাই ছিল তার বাড়ি। আর ছিল দুটো বিশাল কালো কুকুর, যারা তার বিশ্বাসী বন্ধু এবং অতন্দ্র পাহারাদার।

মরণাপন্ন বৃদ্ধার শিয়রে উপস্থিত ছিলাম আমরা দু'জন,—আমি ও গ্রামের গির্জার যাজক। আমাকে আর যাজককে সে তার উইলের অছি করেছিল। বড় বিচিত্র ও রহস্যময় সেই দলিল; এবং সেই দলিলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়েই সে তার জীবননাট্যের আশ্চর্য ঘটনা শোনালো। এর চেয়ে করুণ, সত্যনিষ্ঠ, মর্মস্পর্শী গল্প আমি আর কখনো শুনিনি।

বেত দিয়ে চেয়ার বোনা তাদের পারিবারিক পেশা। তার বাপ-মাও ঐ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। কিন্তু দারিদ্র্য কোনদিন ঘোচেনি। এই বিশাল পৃথিবীতে মাথা গুঁজবার মত আস্তানাও তারা গড়তে পারেনি। সে যখন ছোট্ট মেয়েটি ছিল, ভালো

বা চলনসই পোশাক একটাও তার ছিল না—শতছিন্ন ময়লা জামা-প্যান্ট পরে সে ইতিউতি ঘুরে বেড়াতো।

ঘোড়ায় টানা গাড়িতে মেহনতী পরিবারটি আজ এখানে, কাল সেখানে। শহরে ঢুকেই পথের পাশে তারা এসে থামতো, ঘোড়াটাকে খুলে দেওয়া হতো চরে বেড়াবার জন্য, দানা-পানি খাবার জন্য। কুকুর দুটো লাফিয়ে নামতো গাড়ি থেকে, এদিক-ওদিক ঘুর ঘুর করে একসময় থাবার মধ্যে নাক গুঁজে ঘুমিয়ে পড়তো। আর সে তখন ছোট্ট মেয়েটি—সবুজে সবুজ ঘাসের রাজত্বে হাঁটি হাঁটি হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার বাপ-মা রাস্তার ধারে এল্‌ম্ গাছের ছায়ার নিচে তাদের পশরা সাজিয়ে বসেছে,—সেই শহরের যত ভাঙ্গা ছেঁড়া-খোঁড়া চেয়ার, সব তারা চটপট নিপুণ হাতে মেরামত করে চলেছে।

তাদের ঐ ঘোড়ায় টানা চলমান বাড়িটি যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাত্রা শুরু করে, তারা সকলেই নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। দরকারী কথা ছাড়া একটি শব্দও তারা ব্যয় করে না। সামান্য নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ঠিক করে নেয়, আজ কে রাস্তায় নেমে হাঁক ছাড়বে: চেয়ার সারাবেন নাকি? চেয়ার...

দুলতে দুলতে গাড়ি ছুটছে। তাদের শরীরগুলি ঘনিষ্ঠ, নীরবে খড়গুলিকে পুরু ক'রে বিছিয়ে রাখছে বিশ্রামের সময় শুয়ে পড়বে বলে।

ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি হয়তো কখনো হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে, হয়তো গ্রামের দু' চারটে বখাটে ছোকরা এগিয়ে আসছে ওর সঙ্গে একটু ভাব জমাতে, কিন্তু ঠিক তখনই ছুটে এসেছে তার বাবা, রাগে হুঙ্কার ছেড়েছে, 'হারামজাদি, চলে আয় বলছি।'

জীবনে এর চেয়ে বেশী স্নেহ মাখানো ডাক সে কখনো শুনতে পায়নি।

ক্রমশ তার বয়স বাড়লো। বাপ-মার জীবিকা-অর্জনে সেও তখন অংশ নিতে শুরু করেছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে ভাঙা চেয়ার সংগ্রহ করে আনা তার কাজ। তখন তার মনে এক ব্যাকুল প্রত্যাশা,—রাস্তায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঐ যে সব ছেলে-মেয়ে, সে তাদের সঙ্গে পরিচিত হবে। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওদের অভিভাবকরা তাকে হেয় নজরে দেখেন। নিজেদের ছেলে-মেয়েদের ডেকে সাবধান করে দেন, 'খবর্দার, ঐ ছোট ঘরের মেয়েটার সঙ্গে একদম কথা বলতে যাবি না।'

সে শুধু উপহাসের পাত্রী নয়; মানুষ হিসেবে সামান্যতম মর্যাদাও সে পায় না। তাকে দেখলে অনেক ছেলে-ছোকরার মনে বন্য উল্লাস জেগে ওঠে। তারা ওকে তাক্ করে ঢিল ছোঁড়ে। সে পালিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে।

কোন কোন মহিলা আবার তাকে মনে করে ভিখারিণী মেয়ে। দয়া করে দু-এক পেনি তার দিকে ছুঁড়ে দেয়।

তখন তার বয়স এগারো। একদিন তারা এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলো এবং এই পথেই প্রথম সে পরিচিত হয় ফুটফুটে বাচ্চা ককেতের সঙ্গে, যে সেই সময় দাঁড়িয়ে

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল; কান্নার কারণ, তার দুষ্টু খেলার সাথীরা তার হাত থেকে দুটি সুঁ* কেড়ে নিয়েছে। এই সম্ভ্রান্ত ছোট্ট খোকনের কান্নায় সে বিচলিত বোধ করে। তার মনে হলো, ছেলেটি সুখী পরিবারের, ওর প্রতিটি অশ্রুবিন্দুতে সেই বিশেষ অভিমান ঝরে পড়েছে। তবু সেই অভিমান মেয়েটির বুকে বাজে, মন তার সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ওর কষ্টের কারণ বুঝতে পেরে সে তার অনেকদিনের সঞ্চয় সাতটি 'সুঁ'ই ছেলেটির দু'হাতে গুঁজে দিল। ছেলেটির সঙ্কোচ নেই, মনের আনন্দে নেচে ওঠে সে, তার কান্না থেমে যায়। ওর সেই হাসি হাসি উজ্জ্বল মুখ দেখে মেয়েটির মনেও খুশির বান ডাকে, অনেক সাহসে সে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, গভীর সোহাগে চুমু খায়। ছেলেটি তখন পয়সাগুলি গুণতেই ব্যস্ত, ওর চুমু খাওয়া না-খাওয়ায় তার কিছু আসে যায় না। ছেলেটি বাধা না দেওয়ায় মেয়েটির সাহস ও ভরসা আরো বেড়ে যায়; সে ওকে আবার জড়িয়ে চুমু খায়। বহুক্ষণ ধরে বুকের উষ্ণতায় ওকে আঁকড়ে রাখার বিচিত্র সুখ তাকে রোমাঞ্চিত করে রাখে। তারপর হঠাৎ একসময় সে ওকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাতে থাকে।

এরপর তার বিড়ম্বিত অসহায় দিনাতিপাতে কোন তরঙ্গের অনুরণন? কি তার মনের ভাব? কেন সে হঠাৎ ঐ রকম একটা শিশুর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেললো? জীবনে প্রথম বালকের কোমল অধরের স্পর্শ তাকে কি উন্মাদ করে তুলেছিল? ছোট হোক, বড় হোক, নারী-মনের এই রোমাঞ্চ বড় রহস্যময়!

ঐ ঘটনার পর থেকে সে প্রতিনিয়ত আনমনা। তার চোখের সামনে ভাসছে সেই ছবি—নির্জন পথ, ভাঙ্গা কবরখানা এবং একটি বালকের উজ্জ্বল মুখ। আবার হয়তো ঐ বালকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, এমন আশায় সে মা-বাবার কাছ থেকে নিয়মিত পয়সা চুরি করতে শুরু করে। চেয়ার সারাবার জিনিসপত্র কিনতে দিলেই সে তা থেকে পয়সা সরিয়ে রাখে।

কিছুদিন পর আবার সে ছেলেটিকে দেখতে পেলো তার বাবার মদের দোকানে একটা লাল জারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে। রঙিন কাঁচ ও মদের রঙের ভেতর দিয়ে আশ্চর্য বর্ণালী সেই মুখ, যেন কোন দেবশিশু। বিস্মিত আনন্দে আরো গভীর স্নেহে আচ্ছন্ন তার মন।

এই ছবি আজীবন তার হৃদয়ে গেঁথে রইলো। স্মৃতি আরো উজ্জ্বল হলো পরের বছর, যখন তৃতীয়বার ছেলেটির চাক্ষুস সাক্ষাৎ পেলো সে। ছেলেটি তার সহপাঠিদের সঙ্গে মার্বেল খেলছিল। ওকে দেখেই সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না; দিশেহারা হ'য়ে ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে, এলোপাথাড়ি চুমু খেতে থাকে। এই আকস্মিক ঘটনায় দারুণ ঘাবড়ে গেল ছেলেটি। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। স্নেহের পাত্রটির কান্না থামাতে সে তার সমস্ত সঞ্চয় পুরো সত্তরটি 'সেঁত'* দিয়ে বসলো।

*সু একপ্রকার ফরাসী মুদ্রা। পাঁচ সেঁতে এক সু।
১ সেঁত=১ ফ্রাঁর শতাংশ

এবার ছেলেটির কান্না থামে, লোভাতুর চকচকে চোখে সে দেখে অতগুলি পয়সাকে। এবার তার আদর খেতে আর আপত্তি নেই।

আরো চারটি বছর অতীত হলো। এই সময়ের মধ্যে যতবার সে ছেলেটির দেখা পেয়েছে, নিজের সব সঞ্চয় উজার করে দিয়েছে। পরিবর্তে সে ওকে খুশিমত আদর করতে পারতো, চুমু খেতো। এক একবার দেখা হয়, আর মেয়েটি কখনও পনের, কখনও চল্লিশ 'সেঁত' তাকে দিয়ে দেয়। একবার অর্থনৈতিক দুরবস্থায় মাত্র সাড়ে পাঁচ সেঁত-এর বেশী দিতে পারেনি এবং নিজের এই দারিদ্র্যে সে কেঁদে ফেলেছিল। আর একবার এসেছিল খুব সুদিন; সেদিন তার সঞ্চয়-ভাণ্ডারে ছিল পাঁচটি ফ্রাঁ—ভারী সুন্দর চকচকে গোলগোল মুদ্রাগুলি! আনন্দে নেচে উঠেছিল তার মন।

এই ভাবেই নিজের মজুরী সে একটি ছেলেকে খুশী করবার জন্য উজার করে দিচ্ছিলো। ঐ ছেলেটিই তার স্বপ্ন, যেন তার ভবিতব্যও বটে। ছেলেটিও আজকাল তার প্রতীক্ষায় অধীর; দূরে দেখতে পেলেই ছুটে এসে হাত ধরে। মেয়েটি গভীর সুখে রোমাঞ্চিত হয়।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘ বিচ্ছেদ।

ছেলেটির আর সে দেখা পায় না। ও নাকি উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য পড়তে গেছে দূর কোন শহরের কলেজে; খবরটা অনেক কষ্টেই সে যোগাড় করেছিল। একদিন কলেজ ছুটি থাকায় ছেলেটি তার বাড়িতে ফিরে এসেছে, মেয়েটিও তখন অসামান্য আগ্রহে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সময়ের বিবর্তন অপ্রতিরোধ্য, দু'বছরে ছেলেটির চেহারায় কী বিরাট পরিবর্তন, তাকে আর চেনাই যায় না! বালকত্ব অতিক্রম করে সে এখন যুবক! দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, গর্বিত যুবক, ব্যক্তিত্বের ঝলকে আকর্ষণীয়! পরনে সুন্দর মানানসই জামা-প্যান্ট, বিশেষ করে কোটের চাকচিক্যময় পেতলের বোতামগুলি সহজেই নজর কাড়ে! এক লহমায় অনাথা যুবতীটির দিকে তাকিয়েই না চেনার ভান ক'রে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

শেলবিদ্ধ বুক নিয়ে নির্জনে যুবতীটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দু'দিন ধরে সমানে চোখের জল ফেললো সে। মানসিক কষ্টে বেশ কিছুদিন রোগভোগ করেও উঠলো। আর তারপরই নিজের বুককে শক্ত করে বাঁধলো সে। এরপর যতবারই যুবকটি মুখোমুখি হয়েছে, সেও তাকে না চেনার ভান করেছে, এমন ভাব দেখিয়েছে যেন সে কারুর পরোয়া করে না। যুবকটিও নির্বিকার, মুখ তুলেও তাকায় না সে যুবতীটির দিকে। অথচ, অন্ধ ভালোবাসায় বুক যেন তার ফেটে যায়।

অনেক দিন পরে সে আমার কাছে কবুল করেছিল, 'ডাক্তারবাবু, পৃথিবীতে ওকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষকে জানতাম না। আমার সমস্ত সত্তা ওর কাছেই নীরবে উৎসর্গীত হয়েছিল!'

পৃথিবীর অবধারিত নির্মম নিয়মে সে পিতৃ-মাতৃহীনা হলো; জীবিকার জন্য পারিবারিক ব্যবসাটাই সে চালিয়ে যেতে থাকে—সেই চেয়ার বোনার কাজ। কিন্তু

তার যৌবন লোভনীয়, শয়তানরা সেদিকে হাত বাড়াতে পারে—এই আশঙ্কায় সে দুটো ভয়ঙ্কর শিকারী কুকুর পুষতে শুরু করে দিল। ওরাই তার একমাত্র সাথী, বিশ্বাসী প্রহরী।

একদিন আরো মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো, দেখলো, ককেতের দোকান থেকে এক সুবেশা সুন্দরী তার প্রেমিকের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আসছে। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না—সুন্দরীটি কে? ও তার প্রিয়র প্রিয়া। স্ত্রী! সে তবে ইতিমধ্যে বিয়েও করেছে!

সেই সন্ধ্যাতেই সে আত্মহত্যা করতে গেল। মেয়রের পুকুরে ঝাঁপ দিল। কিন্তু মরা তার হলো না। একজন মাতাল তাকে উদ্ধার করে তুলে নিয়ে গেল সেই যুবকের কাছেই, যে তার যাবতীয় স্বপ্নের কেন্দ্রমণি—সেই ককেত! ককেত কিন্তু ওকে চিনতে ঠিকই পেরেছিল, কিন্তু ভান করলো না চেনার; সাধারণ পোশাক পরে সে নেমে এলো ক্লান্ত শায়িতা যুবতীটির কাছে, প্রাথমিক শুশ্রুষা সে নিজের হাতেই করতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করবার জন্য সে যুবতীর বুকের বাঁধন আলগা করে দেয়, কাপড়ের গিট ঢিলে করে দেয়; তারপর গোটা শরীরে মালিশ করতে করতে ক্ষোভের সঙ্গে বলে, 'কেন এমন করতে গেলে? বোকা মেয়ে! এমনভাবে জলে ঝাপ দেবার কি দরকার পড়েছিল তোমার?'

গভীর সুখে সে তখন তার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গেছে। তার প্রিয় তার শরীরে হাত বোলাচ্ছে, কথা বলছে! বহুকাল ধরে ঐ একটি দিনের স্মৃতি তার জীবনের সবচেয়ে সুখময় অভিজ্ঞতা হয়ে বেঁচে রইলো।

...সারাটা জীবন তার এমন করেই নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেল। দিনে-রাতে কুসন দিয়ে চেয়ার বুনতো এবং কেবলি ককেতের কথা ভাবতো। চলমান আস্তানার বিশাল জানালার মধ্য দিয়ে প্রতি বৎসর ওকে দেখতে পেতো। ওষুধপত্র কিছু কিনতে হলেই সে ছুটে যেত ককেতের দোকানে: ওর সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, দু'একটি ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করা, ওষুধের দাম দিয়ে আসা—এই মুহূর্তগুলি তার কাছে যেন স্বর্গীয় সুখের উৎস!

আগেই আপনাদের বলেছি, গত বছর বসন্তকালে সে মারা গেছে। মৃত্যুর আগে সে তার জীবনের এই মর্মব্যথা আমাকে বলে গিয়েছিল: আর আমাকে অনুরোধ করেছিল, তার জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় যেন ঐ ককেতকে দেওয়া হয়। কারণ, ওর কথা চিন্তা করেই সে প্রতিটি পয়সা জমিয়ে গেছে। এই সঞ্চয়ের জন্য তার কৃচ্ছ্রতার অন্ত ছিল না: অনেকদিন খরচের ভয়ে উপোসও করেছে। সে চায় অন্ততঃ মৃত্যুর পরও যেন তার প্রিয় তাকে মনে রাখে।

তার সারা জীবনের সঞ্চয় দু'হাজার তিনশো সাতাশ ফ্রাঁ আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল। এর মধ্যে সাতাশ ফ্রাঁ পাদরী মারফৎ খরচ হয়েছিল তাকে কবরস্থ করতে!...পরদিনই আমি গেলাম ককেতের সঙ্গে দেখা করতে; দেখলাম, খাবার

টেবিলে সে ও তার স্ত্রী পরম তৃপ্তিতে একটি বড়সড় মদের বোতল থেকে উত্তেজক পানীয় পান করছে। আমাকেও তারা আপ্যায়িত করলো এক গ্লাস কার্শ* দিয়ে। গেলাসে চুমুক দিতে দিতে গোটা ঘটনাটা আমি ওদের বললাম. আমার গলায় আবেগের অভাব ছিল না; আমার বড় প্রত্যাশা ছিল. ওদের চোখ ক্রমশ সজল হ'য়ে উঠবে।

কিন্তু পরিবর্তে দেখলাম. ককেতের অভিব্যক্তিতে এক ধরনের ঘৃণা ও অপমানবোধ! একটা হা-ভাত নোংরা চেয়ার মিস্ত্রীণীর নীরব প্রেমেও তাঁর ঘৃণা ও ক্ষোভ! রাগে সে চেয়ারটাকে ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। যেন ঐ মেয়েটা তার প্রচণ্ড ক্ষতি করে গেছে! যেন তার সামাজিক সম্মান. সুখ. পারিবারিক ইজ্জৎ সব কিছুই অনাথা মেয়েটি কেড়ে নিয়ে গেছে।

তার স্ত্রীও সমান ঘৃণায় বিকৃত মুখে বলতে থাকে: 'ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! একটা ভিখারিণী! শেষকালে একটা ভিখারিণী!'...রাগে উত্তেজনায় আর কোন বিশেষণ সে খুঁজে পাচ্ছে না!

উত্তেজিত ককেত দুম্‌দাম্ পা ফেলতে ফেলতে টেবিলটার চারপাশে চক্কর কাটছে. তার গ্রীক টুপিটা একদিকে হেলে কানের ওপর ঝুলছে. দাঁতে দাঁত চেপে সে আমাকে বলছে. 'ডাক্তারবাবু. একটিবার ভেবে দেখুন—কি সাংঘাতিক অপমানটা করে গেছে আমাকে! কি করে আর এখন এর বদলা নেবো? ইস্. মাগীটা বেঁচে থাকতে যদি সব জানতে পারতাম. ওকে আমি জেলে পুরে রাখবার ব্যবস্থা করতাম! নিশ্চয় তাই করতাম এবং আপনি জেনে রাখুন. কিছুতেই ও সেখান থেকে ছাড়া পেত না!'

আমি ওদের এই পশুবৎ প্রতিক্রিয়া দেখে স্তম্ভিত। নীচতার যে কি জবাব দেবো. ভেবে উঠতে পারছি না। তবু আমার কর্তব্য তো আমাকে পালন করতেই হবে! বুকের বাষ্প চেপে রেখে তাই শুকনো গলায় বললাম. 'দেখুন. মৃত্যুর আগে সেই নারী আমার কাছে তার সারা জীবনের সঞ্চয় দু'হাজার তিনশ' ফ্রাঁ জমা রেখে গেছে আপনাকে দেবার জন্য। আপনাদের যখন তার প্রতি এত ঘৃণা. তখন বোধ হয় টাকাটা গ্রহণ করতে আপনাদের বিবেকে লাগবে। আমার মতে, টাকাটা তবে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াটাই শ্রেয়।'

আমার বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝে উঠবার আগে, তাদের ঐ ঘৃণামিশ্রিত অভিব্যক্তিতে লোভের ছুরি ঝলকে উঠবার আগেই. আমি আমার পকেট থেকে টাকাগুলি বের করে ফেললাম। স্বামী-স্ত্রীর চোখগুলো সেই মুহূর্তে বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে। অনেকগুলি টাকা! তিল তিল সঞ্চয় করা হরেক রকমের মুদ্রা—সুঁ. সেঁত, ফ্রাঁ থেকে আরম্ভ করে স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত। ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো তারা একসঙ্গে।

মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলাম. 'বলুন. আপনারা কি স্থির করলেন?'

মাদাম ককেতই প্রথম মুখ খুললো। ওর স্বরে লোভ ঝরে পড়ে, 'তা, মেয়েটার অন্তিম ইচ্ছা বলে কথা। আমার মনে হয়. এ দান ফিরিয়ে দিলে ওর আত্মার প্রতি

*কার্শ=একপ্রকার দামী ফরাসী মদ।

আমাদের নিষ্ঠুরতা হবে।' হকচকিয়ে ককেতও আমতা আমতা করে, 'টাকাগুলিকে সংকাজে লাগানো দরকার বটে। আমাদের ছোট ছেলেমেয়ের জন্য টুকি-টাকি জিনিসও তো কিনতে পারি।'

আমি তেতো গলায় মন্তব্য করি, 'যেমন আপনাদের ইচ্ছা।'

ককেত এবার অনেক জোর গলায় বললো, 'হ্যাঁ, তার ইচ্ছানুযায়ী টাকাটা অবশ্যই আপনি আমাদের দিয়ে যাবেন। কোন না কোন সৎ কাজে ব্যয় করবো।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সব টাকা ওদের টেবিলের ওপর ঢেলে দিয়ে এলাম। তারপর নমস্কার জানিয়ে ফিরে এলাম।

কিন্তু ব্যাপারটার এখানেই ইতি হলো না। পরদিন সকালে লোভী ককেত আমার বাড়িতে এসে হাজির, অত্যন্ত নীচু স্বভাবের দৃষ্টান্ত রেখে সে বললো, 'তার তো একটা গাড়ি ছিল, স্যার। সেটাও নিশ্চয় আপনারই কাছে—। কি আর আপনি করবেন ওটা দিয়ে ?'

'কিছুই না,' কঠিন গলায় বললাম, 'দরকার হলে আপনি নিয়ে যেতে পারেন।'

'আজ্ঞে ওটা দরকার হবে ঠিকই। ওটা দিয়ে আমার রান্নাঘরে উনুনের ওপর একটা ছাউনি দেবো।'

সে চলে যাচ্ছিলো। আমি ডাকলাম, 'শুনুন।' সে ফিরে তাকায়। বললাম, 'একটা বুড়ো ঘোড়া, আর একজোড়া কুকুর রেখে গেছে। দরকার ?'

সে হতবাক হ'য়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর সেই আমতা আমতা জবাব, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ. না—না, ওদের নিয়ে আমি আর কি করবো ? আপনি বরং ইচ্ছামত ওগুলিকে বিলিয়ে দিতে পারেন।'

বলেই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। চাপা ঘৃণা নিয়েও আমি তার সঙ্গে দেঁতো হাসি হেসে করমর্দন করি। উপায় কি, বলুন ? এ দেশে ডাক্তার হয়ে ওষুধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শত্রুতা করাটা বিধেয় নয়।

কুকুর দুটো আমার বাড়িতেই আছে। ঘোড়াটা পাদরীর জমিতে চাষ করে। গাড়িটা এখন ককেতের আর একটি ছোট ঘরের কাজ করছে। এবং সেই আজীবন কষ্টের টাকায় ককেত পাঁচখানা রেল কোম্পানীর ঋণপত্র কিনে রেখেছে।

'প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার নজীর আমি আমার জীবনে এই একটাই দেখেছি।' ডাক্তার থামলেন।

অভিভূত মারকুর চোখে জল. দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মন্তব্য শোনা যায়: 'এতে এই প্রমাণিত হলো. ভালোবাসতে জানে শুধু মেয়েরাই!'

মারোকা

Marocca

বন্ধুবরেষু,

যে মহাদেশের গহনে আমার অভিযান, সেই মহাদেশ আফ্রিকা সম্পর্কে তুমি আমার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চেয়েছ; প্রকৃতি যেখানে বৈষম্যহীন, সেই মনলোভা দেশে প্রেমের কতখানি ঝাপটা বুক পেতে গ্রহণ করছি। আমার এই প্রেমিকারা, যাদের তুমি নাম দিয়েছো কৃষ্ণাঙ্গী রূপসী, হয়তো তোমার পরিহাস ও উপহাসের পাত্রী হতে পারে, কিন্তু আমার অনুরাগকে সংশোধন করতে মোটেই রাজি নই।

তুমি তো দেখেছো, এই রকমই এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে সেবার আমি ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। দীর্ঘাঙ্গী, গায়ের রং যেন নিকষ আবলুস কাঠের, মাথায় হলুদবর্ণের রিবন, পরনে ঝকমকে বর্ণালী ট্রাউজার; স্পর্শদোষ বাঁচাবে, এমন পুরুষ ক'জন?

আমার স্থির প্রত্যয়, মরোক্কোর ঐ মূর-রূপসীরা একদিন তাদের নিশ্ছিদ্র রূপ নিয়ে দুনিয়া জয় করবে। ব্যবহারগত প্রকরণে যৌবনের উদ্দাম অভিপ্রকাশ বহু রূপসী এখানে আমাকে আকর্ষণ করেছে, অবসরবিনোদনের মুহূর্তগুলিতেও ওদের সঙ্গ লাভের কামনায় আমি মূঢ়, মাতাল!

কিন্তু সুপ্রসন্ন অদৃষ্টের বরাভয়ে আমি এখানে সূচনাতেই এমন এক 'বস্তু'র সন্ধান পেয়েছি, যার উৎকর্ষতা ও আকর্ষণ সম্পর্কে পুলকিত না হয়ে পারছি না। নিরবকাশ শিহরণে দুলতে দুলতে বলতে পারি—সে যে অতুলনীয়া!

এর আগের চিঠিতে তুমি লিখেছিলে, 'একটি জাতির ধাত বোঝা যায়, যদি ঐ জাতির প্রেম করার নিয়মগুলি জানতে পারি।' তাই যদি হয়, তবে বলছি—এখানকার মানুষরা সব প্রেম-পাগল, প্রেমের তাগিদে তারা পরস্পরকে প্রচণ্ড টানা-হেঁচড়া করে।

আদতে ওদের সংস্পর্শে এলেই শরীরের রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে, আমাদের চাপা ভদ্রতার মুখোশটা খসে পড়ে, তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই তিনেরই সমাবেশে মন তখন আসঙ্গ লিপ্সায় দিশেহারা। স্পর্শসুখ পাবার জন্য আঙ্গুলগুলি লকলকিয়ে ওঠে, ইন্দ্রিয়-তাড়নায় দেহে তখন আসুরিক শক্তি, মুখে কখনো অসম্বদ্ধ প্রলাপ। সামান্য হাতের স্পর্শ ঘটলেই দেহে-মনে এমন রূপান্তর অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, ফলে অনেক সময়ই আমরা ভীষণ ভুল করে বসি!

আমায় ভুল বুঝো না বন্ধু, তোমরা যাকে বলো হৃদয়মথিত করা প্রেম, আত্মার মিলন-আকুতি, আদর্শ একনিষ্ঠ প্রেম, স্বর্গীয় দেহাতীত ভালোবাসা, আমার সে সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই, এদের আদৌ অস্তিত্ব সম্ভব কি না সন্দেহ। আমি ঐ সব উদার মনোযোগের প্রেম বুঝি না। আমি প্রেম বলতে বুঝি নর ও নারীর ইন্দ্রিয়সুখ। এই প্রেমের ভালো দিকও একটা আছে, যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় এদেশের যন্তন ভয়ঙ্কর তপ্ত জলবায়তে।

প্রচণ্ড দাবদাহে দেহ সর্বদাই উত্তপ্ত, দক্ষিণ কোণ থেকে অহরহ মরু-ঝড় ছুটে আসে, কখনো কখনো উত্তর-মরু থেকেও ঝঞ্ঝা এসে আক্রমণ করে, যার তপ্ততা ধ্বংসাত্মক বললেও অত্যুক্তি হয় না, সব কিছু যেন জ্বলছে, এমনকী ঐ পাথরগুলিও বুঝি জ্বলছে, জ্বলুনি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—তখন একটি নারীদেহকে হাতের কাছে না পেলে পঙ্গু হ'য়ে উঠবো!

যাক, এবার আমার গল্পের প্রসঙ্গে আসা যাক। আফ্রিকার কোথাও স্থায়ীভাবে ডেরা বাঁধবো, এমন ইচ্ছা আমার কখনোই ছিল না, প্রথম থেকেই আমি স্থান থেকে স্থানান্তরে উৎক্ষিপ্ত—বন্, কন্স্তান্তাইন, বিস্কারা, স্তেফ ইত্যাদি অঞ্চল ঘুরতে ঘুরতে আমি একদিন চাবেতের সঙ্কীর্ণ মরুপথে উপস্থিত হলাম, তারপর সেখান থেকে বোগীতে।

এই ভ্রমণ-পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতুলনীয়; বোগীর মরুপথ এক বিশাল আরণ্যক ভূমির বুক চিরে ছ'শ' ফুটেরও বেশী ঢালু অধিত্যকা বেয়ে সোজা এসে নেমেছে বোগীর ঝকঝকে বিচিত্র উপসাগরে। আমি আমার ভ্রাম্যমান জীবনে নেপলস্, এ্যাজাকিও, জেনিজ ইত্যাদি ভুবনবিখ্যাত অপূর্ব সব উপসাগরের রূপ আস্বাদন করেছি; বোগী উপসাগর তাদের চেয়ে কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয়।

নিশ্চল সমুদ্র-খাঁড়ি অতিক্রম করবার অনেক আগেই বোগী দৃষ্টি কাড়ে, গাছ-গাছালিতে শ্যামলবর্ণ পাহাড়গাত্র দ্বারাই তো বোগীর সৌন্দর্য অনুপম, মনে হয়—সে যেন ঐ সবুজের রাজত্বে একটি শ্বেতবিন্দু, ঠিক যেন সমুদ্রের বুকে আছড়েপড়া কোন জলপ্রপাতের ফেনায়িত শুভ্রতা।

এই ছোট্ট অতুলনীয় মন-জয়করা দেশে যেদিন এলাম, সেদিনই আমার মনে হয়েছিল—এখানে আমি অনেকদিন থাকবো, এর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আমাকে এখানে আটকে রাখবে। যেদিকেই তাকাই, বিচিত্র চেহারার সমস্ত পাহাড়, ওরা যেন একটি আর একটিকে জড়িয়ে ধরে আছে। পাহাড়গুলিই সমুদ্রের প্রবেশমুখে দ্বাররক্ষীর কাজ করছে, সমুদ্রের খুব কাছাকাছি থেকেও কেউ চট্ ক'রে সমুদ্রকে খুঁজে পাচ্ছে না।

এবং সেই সাগরের জল—স্ফটিকদীপ্ত নীলবর্ণ; যে বর্ণ আকাশের গায়ে, সেই বর্ণই সাগরের বুকে। মনে হয় আকাশ যেন সাগর-আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।

আদতে বোগী একটা প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু সমুদ্রের তীরে এই বিধ্বস্ত স্মৃতিনিদর্শন থিয়েটারের দৃশ্যপটের মতন। রাজকীয় সারাসেনদের* তৈরী প্রকাণ্ড সিংহদরজাটা আজও লক্ষণীয়। এখন ওটার সর্বাঙ্গ আইভিলতায় আচ্ছাদিত। সবকিছুই কালের বিবর্তনে ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে, এমন কি পাহাড়গুলিও। ভাগ্যিস মানুষ এখনো এখানকার স্মৃতিস্তম্ভগুলির খোল নলচে বদলে ফেলেনি।

---

*সারাসেন—আরবীয় যোদ্ধাদের মধ্যযুগে এই নামে ডাকা হতো। সারাসেনরাই তলোয়ার ঘুরিয়ে জেরুজালেম অধিকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধেই খ্রীস্টসমাজের একটির পর একটি ক্রুসেড, তারাই পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল অধিকার করে নিয়েছিল এবং ফলতঃ শুরু হয়েছিল য়ুরোপীয় রেনসাঁস।

এখনো দেখতে পাচ্ছি তাই, রোমানদের তৈরী প্রাচীরের ভগ্নাংশ আরবীয়দের চূর্ণ বিজয়স্তম্ভ, সারাসেনদের বিধ্বস্ত প্রাসাদ।

শহরের ওপরের দিকটায় আমি এক মরোক্কো প্যাটার্ণের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম; এই জাতীয় বাড়ির বৈশিষ্ট্য হয়তো তোমার জানা আছে, কারণ, বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তোমরা এদের সম্পর্কে অল্প-বিস্তর ওয়াকিবহাল। তবু জানাচ্ছি—এই সব বাড়ির ঘরগুলিতে কোন জানালা নেই, কোন খোলামেলা উঠোন থেকে আলোবাতাস যথেষ্টই আসে। আমার বাড়িটা দোতলা; দোতলার ঘরটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হওয়ায় দুপুর বেলাটি আমি ওখানেই কাটাই। আর রাতে শুয়ে থাকি সমতল ছাদে। আমি তখন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদের মতন দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত। আফ্রিকায় গ্রীষ্ম—সে যে কী ভয়ানক! কাঠফাটা রোদ্দুরে পথ-ঘাট খা খা করছে অদ্ভুত নির্জনতায়, এমন কি ঝকঝকে প্রশস্ত রাজপথও জনশূন্য, শ্বাস নিতে মানুষের রীতিমত কষ্ট হয়। এ সময় মানুষ চায় দেহকে যতটা সম্ভব অনাবৃত রেখে ঘুমিয়ে পড়তে অথবা ঘুমের চেষ্টা করতে।

আমার বসবার ঘরটি সবদিক থেকেই বনেদী, আরবী ভাস্কর্যে এটি নির্মিত, মস্ত সেকেলে সৌখিন পালঙ্কটা দৃষ্টি কাড়ে, পালঙ্কের ওপর বিছিয়ে দিয়েছি দিজবেলআমের থেকে আনা কোমল কার্পেট। সেখানে আমি আদিম মানুষের মতন স্বল্পবেশ পরে বিশ্রামের আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বাইরের ঐ দাবদাহের মতন আমার স্নায়ুতেও কামনার জ্বর আমাকে উত্যক্ত ক'রে রাখছে। বাসনার এই কামড়ে আমি সত্যি অত্যাচারিত।

পৃথিবীতে দু'রকমের অত্যাচার আছে, যাদের সম্পর্কে তোমার কোন বাস্তবজ্ঞান আছে বলে আমার মনে হয় না। এক নম্বর অত্যাচার জলের অভাব, দু'নম্বর অত্যাচার নারীর অভাব। জানি না, এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বেশী মর্মান্তিক। মরুভূমিতে এক গেলাস ঠাণ্ডা পরিষ্কার জলের জন্য মানুষ তার অনেক মানবিক গুণকে খুন করতে পারে; আর এই রকম একটা উপকূল শহরে সুন্দরী নারীকে পাবার জন্য মানুষ কী মরিয়া হ'য়ে উঠতে পারে!

আফ্রিকায় মেয়েমানুষের অভাব নেই; বস্তু হিসেবে তারা যে খুব একটা অপছন্দের, তা নয়। কিন্তু আমার মতে, ওরা হচ্ছে সাহারার বুকে কর্দমাক্ত অপরিষ্কার জলাশয়, স্বাস্থ্যকর টলটলে পরিষ্কার জল নয়। ঐ জল অস্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদুও নয়।

এক দুপুরে আমার ঐ পিপাসা চূড়ান্ত। কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারছি না—ঘুম নেই। প্রবৃত্তির তাড়নায় দুই পায়ে খুব যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে কে যেন সূঁচ ফোটাচ্ছে আমার শরীরে। ছটফটিয়ে পালঙ্কের একদিক থেকে অন্যদিকে গড়াগড়ি দিচ্ছি। শেষে আর সহ্য না করতে পেরে বেরিয়েপড়লাম ঘর ছেড়ে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি মধ্যাহ্ন সূর্যের কী প্রচণ্ড দাপট! রাস্তা ঘাট এত তেতে আছে যে তাতে যেন রুটি সেঁকা যায়, আমার জামা ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে, চতুর্দিক থেকে ভাপ বের হচ্ছে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন স্পর্শ করা যায় এই উত্তাপ।

চললাম সমুদ্রের দিকে হাঁটতে হাঁটতে, উপস্থিত হলাম প্রকৃতি নির্মিত স্নানের ঘাটের কাছে। ধারে কাছে কেউ নেই, নিঝুম, নিথর, একটা পাখির কিংবা পশুর ডাকও শোনা যায় না। সমুদ্রের ঢেউগুলি পর্যন্ত আশ্চর্য শান্ত ও শব্দহীন, সমুদ্র বুঝি ঘুমিয়ে আছে সূর্যের চাদর গায়ে চাপিয়ে। ঠিক তখনই—ঠিক তখনই একটি দৃশ্য দেখে ফেললাম।

দেখলাম, শিলাখণ্ডের আড়ালে একটি সজীব দেহ নড়েচড়ে উঠলো। বুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে স্নান করছে এক নগ্ন দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী। এই আলাময় নির্জন সময়ে ঐ দৃশ্য! সুন্দরীর সামনেটা সমুদ্রের দিকে, আমাকে সে এখনো দেখতে পায়নি, গোটা দেহটাকে ঢেউয়ের তালে তালে দোলাচ্ছে, স্বচ্ছ জলের নীচে তার হিল্লোলিত নগ্ন দেহ—পুলকে রোমাঞ্চিত আমি উপভোগ করছি এই বিরল দৃশ্য। পাথরে ক্ষোদিত এ এক অনুপম দেহলতা।

হঠাৎ সে ঘুরে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, ত্রস্তে জল কেটে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে; আমি আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু প্রতীক্ষা করছি, কারণ জানি বেরিয়ে সে আসবেই। তপ্ত বালুর ওপর বসে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছি ঐ পাথরটার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলাম তার মাথার ভগ্নাংশ—কোঁকড়ানো ভেজা চুল কাঁপছে।

ক্রমশ ভেসে উঠলো তার মুখখানা, পুরু ঠোঁট, বড় বড় চোখ দুটোতে উত্তেজনা ও ক্ষোভ, জলের তলায় হাতির দাঁতের মতন রঙ তার ত্বকের।

চীৎকার করে সে বলে, “সরে যান বলছি।”

তার ঐ কণ্ঠস্বরই প্রমাণ করে কতখানি স্বাস্থ্যবতী যুবতী সে। আমি নড়ছি না দেখে আবার সে চড়া গলায় বলে, “দেখুন মশাই, ওভাবে বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।”

তবু আমি অনড়, আবার সে অদৃশ্য। কিছুক্ষণ পর আবার লুকোচুরি খেলার মতনই ধীরে ধীরে ভেসে উঠলো তার মাথা, চুল, কপাল এবং চোখ। এবার সে রীতিমত ক্রুদ্ধ, “আপনি দেখছি আমার বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ছাড়বেন। আপনি যতক্ষণ ওখানে থাকবেন, আমি কিছুতেই জল থেকে উঠবো না।”

অগত্যা আমি উঠে চলে গেলাম, কিন্তু থেকে থেকে পিছন ফিরে না তাকিয়ে পারছি না।

যখন আমি অনেক দূরে, সে জল ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আমার দিকে পিছন দিয়ে সে তার পোশাক পরে নেয়।

পরদিন আবার আমি সেখানে। আবার তাকে দেখলাম স্নানরতা অবস্থায়, এবার অবশ্য পোশাক পরা।

আজ আমাকে দেখেই হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে, ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলি অপূর্ব। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা একে অপরের অন্তরঙ্গ। আরো এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমরা

পরস্পর প্রিয়া ও প্রিয়। তার নাম মারোকা। শরীরে স্প্যানিশ ঔপনিবেশিকদের রক্ত বইছে। বিবাহিতা। স্বামী ফরাসী, নাম পেনতাবেজ। সরকারী অফিসে কাজ করেন, ঠিক কোন্ অফিসে আমার জানা নেই, তবে সব সময়ই খুব ব্যস্ত, আর তাকে নিয়ে মাথা ঘামানো আমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ।

মারোকা তার স্নানের সময় বদলে প্রতি দুপুরে দিবানিদ্রার সময় আমার আস্তানায় আসতে শুরু করে দিল। সেও নাকি এখানে ঘুমোবে! আর সেই ঘুমের কী বাহার! বড্ড ছটফটে মেয়ে, কামের তাগিদে পশুপ্রায়। চোখ দুটো কামনায় জ্বল জ্বল করে, ঈষৎ উন্মুক্ত মুখগহ্বর, তীক্ষ্ণ দাঁত, শাণিত হাসি, প্রেমে সর্বদা ডগমগ। স্তনযুগল অতুলনীয়, শঙ্খের মতন তীক্ষ্ণমুখ, কামনায় পাশবিক শক্তির অভিপ্রকাশ, মিলন পদ্ধতিতে অনেকটা নিকৃষ্ট রুচির, কিন্তু বড় আনন্দদায়ক, স্বৈরিণী কার্যকলাপের জন্যই বুঝি ওর এমন অটুট যৌবন। ওর সঙ্গে তুলনা করা চলে কামনার দেবীদের। মনে কোন জটিলতা নেই, সরল অঙ্কের মতন মানসিকতা, প্রাণ খুলে হাসতে পারে, অবলীলায় চোখের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়ায়, নিজের গর্বের যৌবন দেখিয়ে তার উল্লাস। আমাকে নিয়ে সে ঘরময় গড়াগড়ি খায়, লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে, তারপর একসময় শ্রান্তি এলে ঘুমের অতলান্তে নিশ্চিন্তে তলিয়ে যায়। তার বাদামী চামড়ার ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘামের দিকে আমি একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।

কোন কোন সন্ধ্যায় তার স্বামী বাড়ি থাকতো না, সেই সুযোগে সে ছুটে আসতো আমার কাছে, ন্যাড়া ছাদে আমরা শয্যা পাততাম। আমরা দু'জনেই তখন পোশাকে আদম ও ইভ। রাত যদি হতো পূর্ণিমা, আমরা চাঁদের থৈ থৈ আলোতে ভাসতাম; দেখতে পেতাম অন্যান্য বাড়িগুলির ছাদেও দলে দলে লোক উঠে আসছে, শুয়ে পড়েছে আকাশ ও চাঁদের দিকে চেয়ে।

চাঁদের আলো স্পষ্ট। আফ্রিকার পূর্ণিমারাত অত্যন্ত উজ্জ্বল। অথচ, সেই উজ্জ্বল আলোকে মারোকার বিচিত্র বায়না, আমি তাকে নিজের হাতে ধীরে ধীরে বিবস্ত্র করি। অথচ, এ কাজ ঐ ছাদে শুয়ে করতে গেলে ভয়ের কারণ ছিল,—চাঁদের আলোতে যে-কেউ আমাদের ঐ নগ্নরূপ ও স্বৈরাচার আবিষ্কার করে ফেলতে পারতো।

আমি তাকে ভয় দেখাতাম, সংযত থাকতে অনুরোধ করতাম, কিন্তু সে কামের তাড়নায় এমন শব্দ করে উঠতো যে, রাস্তার কুকুরটা অব্দি চমকে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠতো।

সেদিন রাতে আমি একা ছাদে শুয়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় সে এলো, এসেই আমার পাশে হাঁটুমুড়ে বসে তার বাঁকা ঠোঁটে আমাকে এক গভীর চুম্বন উপহার দেয়, ফিসফিসিয়ে বলে: "এই, তোমাকে আজ আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে!"

আমি অবাক: "কি বলছো তুমি!"

"হ্যাঁ, আজ রাতে আমার স্বামী থাকবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে আমারই বিছানায় রাত কাটাতে হবে।"

আমি হেসে বললাম, "তার কি দরকার সুন্দরী? তুমিই তো চলে এসেছো আমার কাছে।"

সে কামড়ে আমার গোঁফ ভিজিয়ে দেয়, আমার মুখের ভেতর তার জিভ, সে বলছে, "চলো আমার ঘরে। আমার কাছে রাতটা স্মৃতি হয়ে থাকবে চিরকাল।"

আমি এখনো তার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারছি না। তখন সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "যখন তুমি আর এখানে থাকবে না, নিজের ঐ শোবার ঘরে ঢুকে আমি তোমাকে মনে করতে পারবো।"

আমি অভিভূত হলেও কঠিন স্বরে বললাম, "না, এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।"

আসলে আমি ওদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহৃত ঘরে গিয়ে হাজির হতে চাইছিলাম না। এসব অভিসার অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল—প্রায় ইঁদুর ধরার ফাঁদ। কত অবৈধ প্রেম যে এভাবে ফাঁস হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

মারোকা কিন্তু তবু বার বার অনুনয় বিনয় করছে আমাকে, ভেজা গলায় বলছে, "আমার এই অনুরোধটা তুমি রাখবে না? আমি তোমায় কত ভালোবাসি!"

আমার মনে হলো, মারোকা নিশ্চয় তার স্বামীকে শুধু অপছন্দ করে না, তীব্র ঘৃণাও করে। তাই গোপন প্রতিশোধের বাসনায় স্বামীরই ব্যবহৃত বিছানায় পরপুরুষ নিয়ে হুল্লোড় করতে চাইছে।

প্রশ্ন করলাম, "তোমার স্বামী কি তোমার ওপর খুব অত্যাচার করে?"

প্রশ্ন শুনে সে বিরক্ত, চোখ কুঁচকে সে বলে, "মোটেই না, তিনি যথেষ্ট সহৃদয় পুরুষ।"

"তুমি কি তাকে পছন্দ করো না?"

তার দৃষ্টিতে বিস্ময়, "নিশ্চয়। আমি তাকে পছন্দ করি। খুব ভালোবাসি। তবে তোমাকে যতখানি, অতটা নয়!"

আমি ওর এই মানসিকতার রহস্য ধরতে পারছি না, এদিকে সে আমাকে সমানে চুম্বন-বৃষ্টি করে চলেছে, কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, "চললাম। তুমি কিন্তু অবশ্যই আসবে।"

তবু আমি অস্বীকার করলাম যেতে।

দারুণ অভিমানে সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়, হন্‌হনিয়ে চলে যায় বাইরে।

এক সপ্তাহ আমাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আট দিনের দিন সে আমার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো, "আজ রাতেও আমি নিঃসঙ্গ। তুমি কি আমার কাছে আসবে? যদি না আসো, আমিও আর কোন দিন আসবো না।"

বন্ধুবর, আট দিনের অদর্শনে আমি তো তখন দিশেহারা। ওর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে কি পারি!

দু'হাত বাড়িয়ে ওকে লুফে নিয়ে আসি বিছানায়। সেও বাধা দেয় না।

রাতে রাস্তার একপাশে সে অপেক্ষা করছিল। আমি যেতেই বেরিয়ে এসে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। বাড়িটা জেটির কাছাকাছি। রান্নাঘরে তখনো খাবারের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। নতুন রঙ করা দেয়াল, শোবার ঘরটি পরিপাটি, বহু ছবি ঝুলছে দেয়ালে, ফুলদানীতে কাগজের ফুল। আনন্দে আত্মহারা মারোকা নাচতে শুরু করেছে, বার বার বলছে, "তা হলে তুমি এলে! তুমি এলে!"

আমি বিচলিত, খানিকটা অস্বস্তিও হচ্ছে, যদিও ব্যবহারে তা বুঝতে দিচ্ছি না। এই অজানা ঘরে ঢুকে উলঙ্গ হতে কোথায় যেন একটা সংকোচ ও ভয়, কিছুতেই উত্তেজনায় পৌরুষ আমার জেগে উঠতে পারছে না। কিন্তু মারোকা তাকে না জাগিয়ে ছাড়বেই না, আমাকে একরকম জোর করে নগ্ন করে, নিজেও বিবস্ত্র হয়, তারপর পোশাকগুলি দলা পাকিয়ে পাশের ঘরে রেখে আসে। ক্রমশ সাহস ও উত্তেজনা ফিরে পেলাম। বহুক্ষণ ধরে আমার বলিষ্ঠ পৌরুষ মারোকার ওপর নিজের সক্ষমতা প্রমাণ করলো। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চললো আমাদের দৈহিক উল্লাস। আশ্চর্য এই যে, এরপরও কিন্তু আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম না।

হঠাৎ দরজায় জোর করাঘাত, আমরা ভীষণ চমকে উঠি, শোনা গেল পুরুষ কণ্ঠ, "মারোকা, দরজা খোলো।"

সেও আঁতকে ওঠে, ফিসফিসিয়ে বলে, "আমার স্বামী, যাও—খাটের নীচে লুকিয়ে পড়। যাও তাড়াতাড়ি।"

হতবুদ্ধি আমি আমার বিবস্ত্র শরীরটাকে কোন রকমে তালগোল পাকিয়ে খাটের তলায় উপুড় করে রাখলাম।

মারোকা রান্নঘরে গেল; শব্দ পেলাম সে আলমারি খুলছে, কি যেন একটা হাতে করে এনে এ ঘরে রাখলো—জিনিসটা আমি দেখতে পেলাম না। তার স্বামী বাইরে অস্থির, বার বার দরজায় ঘা মারছে। মারোকা বললো, "দাঁড়াও দেশলাইটা খুঁজে পাচ্ছি না।" তারপর হঠাৎ সে বলে উঠলো, "এই তো পেয়েছি। আসছি।"

দরজা খুলতেই সে ভেতরে এলো। আমি তার পা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু বিরাট চরণজোড়াই প্রমাণ করে, লোকটি নিশ্চয় দৈত্যাকৃতি।

চুমু খাচ্ছে ওরা বুঝতে পারলাম। মারোকার নগ্ন দেহটাকে খুব চটকাচ্ছে, তাও বুঝতে পারছি।

জাতীয় সঙ্গীত গাইবার গলায় যেন সে বলে ওঠে, "আমি ম্যানিব্যাগটা ফেলে গিয়েছিলাম তাই আসতে হলো। খুব ঘুমোচ্ছিলে!"

লোকটা নানান অছিলায় মারোকাকে নিয়ে একবার বিছানায় যেতে চাইছে। কিন্তু মারোকা নারাজ। কিছুতেই এখন স্বামীর সঙ্গে শোবে না সে। লোকটি শেষে হতাশ স্বরে বলে, "আজ রাতে তুমি মোটেই ভালো মেয়ে নও। চললাম।"

সে চলে যেতেই আমি খাটের তলা থেকে অপমানিত অন্তরে বের হয়ে আসি। মারোকার উল্লাস আর ধরে না। সে ঘরময় ধেই ধেই করে নাচছে। হঠাৎ আমি

আঁতকে উঠি—একটা কাঠ কাটা দা এনে রাখা হয়েছে চেয়ারের ওপর, ভীষণ ধারালো। আমার সর্বাঙ্গ আতঙ্কে কেঁপে ওঠে।

বললাম, "তোমার স্বামী যদি আমায় দেখতে পেতো?"

সে জবাব দিলো, "কুছ পরোয়া ছিল না।"

"রসিকতা করো না। মাথা হেঁট করলেই সে আমায় দেখতে পেতো।"

এবার তার মুখে হাসি নেই, চোখ দুটো আরো চকচকে, "উঁকি মারলে মজাটা টের পেতো।"

"মানে?"

"তা হলে তাকে আর মাথা তুলতে হতো না।"

"মানে?"

মারোকা চকিতে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলো ধারালো অস্ত্রটা। তারপর কায়দা করে দেখালো, কি ভাবে সেই চরম বিপদের সময় সে তার স্বামীকে খতম করে ফেলতো।

বুঝলে বন্ধু, এই হচ্ছে এখানকার প্রেমের রীতি। এভাবেই এখানকার নর-নারীরা তাদের দাম্পত্য জীবন, প্রেম, কর্তব্য ইত্যাদির মূল্যায়ন করে থাকে।

দামী গহনাগুলি

Precious Ornaments

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বড়বাবু মঁসিয়ে লাঁতিন ছোট সাহেবের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় সান্ধ্যচায়ের আসরে প্রথম পরিচিত হয় মেয়েটির সঙ্গে এবং প্রথম দর্শনেই পূর্বরাগ। মেয়েটির বাবা, যিনি ছিলেন গ্রামের কালেক্টর, বছর কয়েক আগে মারা গেছেন, ফলতঃ মায়ের সঙ্গেই মেয়েটি এখন প্যারিসে আছে; অর্থনৈতিক অবস্থা সুবিধের নয়, কিন্তু ব্যবহারে সম্ভ্রমতা জাগায়—মিষ্টি ভদ্র ব্যবহার! ধর্মভীরু মেয়েটির বেশ কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুখে হাসি লেগেই আছে, হৃদয়ের কোমলতা সেখানে প্রস্ফুটিত, স্বর্গীয় আভা সেখানে আঁকা। এমন একটি মেয়ের কাছে সেই পুরুষই তো নিজেকে উৎসর্গ করে, যার নজর আছে, রুচি আছে, এমন লোক নেই, যে তার প্রশংসা না করে। সকলেরই এক কথা, "যে ওকে বিয়ে করবে, সে বড় ভাগ্যবান। এমন সুলক্ষণা কন্যা হাজারে একটি মেলে কিনা সন্দেহ!"

লাঁতিন আর বেশীদিন দেরী না ক'রে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলো। বলাবাহুল্য প্রস্তাবটি মঞ্জুরও হলো এবং পরম এক শুভদিনে তাদের পরিণয় সুসম্পন্ন হলো।

সুখের স্বচ্ছ যৌথ জীবন, যদিও লাঁতিনের আয় সামান্য—বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার পাঁচশ' ফ্রাঁ। কিন্তু হিসেবি বউ ঐ টাকাতেই সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে সংসার চালাচ্ছে, অভাবের তাড়না অনুভূত হয় না, বরং মনে হয় ওরা বুঝি স্বচ্ছল পরিবারের সদস্য-সদস্যা। প্রেমের স্রোতেও মোটেই ভাটা পড়েনি; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খুব টান, যত্ন-আত্তি করে, নিজের কোমল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্বামীকে সম্মোহিত করে রাখে যেন।

বিয়ের পর দুটি বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও লাঁতিনের মনে হয়, এখনও বুঝি তার স্ত্রী নবপরিণীতা, প্রেম ও আকর্ষণের গভীরতা এতটুকুও হ্রাস পায়নি, বরং দিন দিন যেন বাড়ছে।

এমন এক গুণসম্পন্না গৃহিণীর কিন্তু বদদোষ আছে দুটো। এক নম্বর, থিয়েটারের নামে সে পাগল; দুই নম্বর, নকল মুক্তোর প্রতি লোভ।

তার এমন কয়েকজন বান্ধবী জুটেছিল, যাদের স্বামীরা পদমর্যাদায় ছোটখাটো অফিসার। ওরা প্রায়ই নামী অপেরার দামী টিকিট কিনে এনে তাকে ডাকতো থিয়েটারে যাবার জন্য। কোন নতুন বই শুরু হলে মাঝে-মধ্যে প্রথম রজনীতেই সে হাজির হতো থিয়েটার হলে। এ ব্যাপারটায় স্বামী বেচারির পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা সে রাখতো না। লাঁতিন সারাদিন অফিসে খেটেখুটে আসবার পর এই ধরনের হুল্লোড় পছন্দ করতো না, তখন তার দরকার নিভৃতে বিশ্রামের, স্ত্রীর তাড়নায় সে হাঁপিয়ে উঠতো। বলতো, "তুমি তোমার কোন বান্ধবীকে নিয়ে থিয়েটারে যাও। তার সঙ্গেই ফিরে এসো।"

কিন্তু স্ত্রী রাজি হতো না। স্বামীর সঙ্গে অপেরায় না গেলে মেয়েদের নাকি মান থাকে না। লাঁতিনের রাগ চড়তো। অগত্যা তার স্ত্রী একাই যেত থিয়েটারে, শূন্য ঘরে একাকী বসে থাকতো লাঁতিন। অতিরিক্ত নাটক দেখার কতকগুলি কুফল আছে, যা ক্রমশ লাঁতিনের স্ত্রীর ওপর বিষক্রিয়া শুরু করে দেয়। সাজগোজের প্রতি তার আসক্তি বাড়ে, অবশ্য বেশী জামাকাপড় কেনা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে পুরনো পোশাকই নতুন কায়দায় সাজিয়ে গুছিয়ে পরতে থাকে সে। কিন্তু পোশাকের সঙ্গে দরকার গহনা। তাই ক্রমশ দেখা গেল তার কানে ঝিলিক দিচ্ছে নকল হীরের মস্ত দুল, গলায় ঝুলছে নকল মুক্তোর মালা, নকল সোনার ব্রেসলেট, হালকা কাঁচ বসানো চটকদার চিরুনি,—সর্বাঙ্গ ঠুনকো গহনায় তার ঝলমল করছে। স্ত্রীর এই মনোবিকার দেখে কষ্ট পেতো লাঁতিন, মাঝে মধ্যেই কাছে ডেকে বলতো, "ডার্লিং, ঈশ্বর তোমায় অঢেল রূপ দিয়েছে, সেটাই তো তোমার গহনা! নকল মুক্তোর প্রতি তোমার এই আসক্তি বেমানান, বিশেষত সত্যিকারের মুক্তো কিনে দেবার ক্ষমতা যখন আমার নেই।"

মৃদু মিষ্টি হেসে স্ত্রী জবাব দিতো, "এই একটা ব্যাপারে আমার মাত্র দুর্বলতা। আমার ভালো লাগে যে! এ স্বভাব, ভালোই হোক মন্দই হোক, বদলাবার সাধ্যি আমার নেই। গয়না পরে সেজে থাকতে খুব ভালো লাগে।"

এরপর হীরের নেকলেসটি আঙুলে জড়াতে জড়াতে সে আরো বলতো, "দেখো, চেয়ে দেখো—কী সুন্দর এই হারটি, তাই নয়? লোকে সাদা চোখে দেখে বুঝতেই পারবে না, এটি আসল না, নকল।"

লাঁতিনের চোখের সামনে নকল হীরের দ্যুতি ঝকমকিয়ে উঠতো।

আত্মগ্লানি চেপে রেখে মুখে হাসির রেখা টেনে লাঁতিন বলতো, "যাই বলো, তোমার রুচি কিন্তু এ ব্যাপারে যে কোন জিপসী মেয়ের মত।"

কোন কোন দিন তারা স্বামী-স্ত্রী ফায়ার প্লেসের সামনে বসে হয়তো আলাপরত, স্ত্রী তার গহনাভর্তি ব্যাগটি রেখেছে ঐ ফায়ার প্লেসের ওপরই, লাঁতিনের ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি ঐ ব্যাগটার ওপর—গহনাগুলিকে সে বলে থাকে ছাইভস্ম। অথচ মহিলাটি সেই সব ঝুটো গহনাগুলিকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরখ করছে, কি এক গভীর আনন্দে সে অভিভূত। আনন্দে উল্লাসে কখনো কখনো সে একটা নেকলেস তার স্বামীর গলায় পরিয়ে দেয়, খিল খিল করে হেসে ওঠে, "তোমায় কি চমৎকার দেখাচ্ছে গো!" বলেই লাঁতিনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তোলে বেচারিকে।

অতঃপর এক সন্ধ্যায় থিয়েটার দেখে ফিরবার পথে প্রবল হিমেল বাতাসে আক্রান্ত হলো লাঁতিনের স্ত্রী। তার বুকে ঠাণ্ডা বসে গেছে। পরদিন সকাল থেকে তার সেই যে শুরু হলো কাশি, তা আর থামে না। ক্রমশই কাহিল হয়ে পড়লো সে। নিমুনিয়ার মরণ-কামড় থেকে রেহাই পেলো না লাঁতিনপ্রিয়া। আটদিনের দিন এই পৃথিবী থেকেই বিদায় নিলো সে।

স্ত্রীবিয়োগের এত বড় আঘাত লাঁতিনের পক্ষে সহ্য করাই দুরূহ হ'য়ে উঠলো। তামাম দুনিয়াটাই তার চোখের সামনে অন্ধকার, অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তায় মাত্র এক মাসের মধ্যে তার মাথার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেল, ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে দিনরাত কেবলই চোখের জল ফেলছে। মৃতা স্ত্রীর প্রতিটি স্মৃতি, তার হাসি, কণ্ঠস্বর, বায়না, ভালোবাসা সর্বক্ষণ মনের দুয়ারে এসে আঘাত করে যাচ্ছে।

সময় বয়ে যায়। কিন্তু বেদনার্ত স্মৃতি মন থেকে মুছে যায় না। অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে সাময়িক প্রসঙ্গে উত্তেজিত আলোচনার সময়েও হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার চোখ নোনা জলে টস টস করতে থাকে, সারা মুখময় বিষাদের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কণ্ঠনালী ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় চাপা কান্না।

স্ত্রীর ব্যবহৃত ঘরটিকে সে অবিকৃত রেখেছে। আজ মনে পড়ে, তার অতি সামান্য আয়ে কত হিসেব করে স্ত্রী সংসার চালাতো, ওরই মধ্যে বাঁচিয়ে বুচিয়ে টুকিটাকি জিনিস কিনতো, দামী মদ কিনতো, এক আধটা বিলাসসামগ্রী এনেও ঘর সাজাতো —কি করে যে এতো করতো, লাঁতিন ভেবে পায় না।

আজ সেই মহিয়সী ইহজগতে নেই। লাঁতিন বেহিসেবী, দিশেহারা। সামান্য আয়ে তার ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটে না; ক্রমে লাঁতিন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লো, ঋণ যত বাড়ে, টাকার সন্ধানে সে ততই মরীয়া হ'য়ে ওঠে; মাস শেষ হবার সাতদিন আগেই পকেট তার ঢুঁ-ঢুঁ। ভাবলো, মৃতা স্ত্রীর নকল গহনাগুলি বেচে দিলে ক্ষতি কি?

ওগুলির প্রতি বরাবরই তার একটা ঘৃণা ও বিরক্তি ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ গহনাগুলিই তাঁর স্ত্রীর সৌন্দর্যমহিমাকে ছোট করে রেখেছিল।

উজ্জ্বল গহনাগুলির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লাঁতিন। তার স্ত্রীর বড় সোহাগের ধন—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওগুলিকে সে সঞ্চয় করে গেছে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই তো সে একটি করে নূতন অলঙ্কার এনে জমিয়ে রেখেছে।

গহনাগুলির মধ্যে একটি ওজনদার নেকলেস লাঁতিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; বেচে দিলে নিদেনপক্ষে ছ' সাত ফ্রাঁ তো পাওয়া যাবেই, কারণ নকল হীরে হলেও এর চাকচিক্যময় কারুকার্য মোহাবেশের সৃষ্টি করে।

নেকলেসটিকে বেচে দেবার বাসনায় পকেটে পুরে অফিসের দিকে চলতে শুরু করে লাঁতিন; চলতে চলতে বুলভার্দের গহনাপট্টিতে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রথম দোকানটাতে সে ঢুকেও পড়ে; ঢুকেই কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচ—একটা নকল বাজে জিনিস বিক্রি করতে এসেছে সে। তার দারিদ্র্য নগ্ন হয়ে পড়বে এখানে!

তবু কোন রকমে দোকানদারের সামনে দাঁড়িয়ে বলে বসে: "আচ্ছা, দেখুন তো এটার দাম কত হতে পারে?"

নেকলেসটিকে দোকানদার উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করে নিক্তিতে ওজন করে, তারপর আবার আতস কাঁচের মধ্য দিয়ে যাচাই করে এর সম্ভাব্য মূল্যমান। তার মুখের চেহারা পরিবর্তিত হয়, একজন কর্মচারীকে ডেকে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলাবলি করে।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে লাঁতিন সবই খেয়াল করছে, একটা দারুণ অস্বস্তি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে; কেমন এক ধরনের হীনমন্যতায় কেঁপে ওঠে সে; ইচ্ছে হলো, এখনই বলে ওঠে: আমি জানি, ওর দাম উল্লেখযোগ্য কিছু হবে না।

এমন সময় দোকানদার তাকে বললো, "দেখুন নেকলেসটার দাম পনেরো হাজার ফ্রাঁর মতন হবে। কিন্তু আপনি এটি কোত্থেকে পেলেন, না জানা পর্যন্ত আমাদের পক্ষে ক্রয় করা উচিত হবে না।"

বিস্ময়ে লাঁতিন হতবাক, চোখ চড়ক গাছ, দোকানদারের কথা যেন তার কানে ঢুকছে না, কোন রকমে স্খলিত স্বরে বলে, "কি বলছেন, যথার্থই বলছেন তো?"

দোকানদার আহতস্বরে বলে, "আপনি অন্য কোথাও যাচাই করে দেখতে পারেন; মনে হয়, এর বেশী দাম পাবেন না। যদি না পান এখানে কিন্তু আসবেন।"

এই মুহূর্তে লাঁতিনের মনে হলো, তার এখন নির্জনতার প্রয়োজন; নির্জনে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে সে গভীরভাবে ভাববে। বিস্ময়তাড়িত মনে নেকলেসটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে লাঁতিন।

বাইরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে তার ইচ্ছে হলো হা-হা অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে: কি বোকা—কি বোকা এই লোকগুলি। নকল হারের নেকলেসের দাম বলছে পনেরো হাজার ফ্রাঁ! আচ্ছা আহাম্মক তো স্বর্ণকার! বেচে দিয়ে এলে মন্দ হতো না। এখনো বেচারি আসল ও নকলের পার্থক্য বুঝতে শেখেনি।

ভাবতে ভাবতেই লাঁতিন রুঁ দ্য পাইয়ের আর একটি দোকানে প্রবেশ করে,এখানে তার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষমান। এখানকার স্বর্ণকার নেকলেসটি দেখেই সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে: "আরে ব্বাস! এ যে আমার খুব পরিচিত নেকলেস, এই দোকান থেকেই কেনা হয়েছিলো।"

অস্বস্তি ও আতঙ্কে লাঁতিন কোনক্রমে জিজ্ঞেস করে: "দাম কতো?"

"বিক্রি তো করেছিলাম পঁচিশ হাজার ফ্রাঁতে। এখন আপনার কাছে এটা কি করে এলো জানতে পারলে আঠারো হাজার ফ্রাঁ দাম দিতে পারি। এর সঙ্গে আইনগত ঝামেলাও তো জড়িয়ে থাকতে পারে।"

বিস্ময়ে লাঁতিনের হাত-পা যেন হিম কঠিন হ'য়ে আসছে, দুই পায়ের ওপর ভর ক'রে যেন দাঁড়াতে পারছে না। কোনক্রমে উচ্চারণ করে:

"মালটা একটু ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন। এই কিছুক্ষণ আগেও আমার ধারণা ছিল নেকলেসটা নকল।"

গহনা ব্যবসায়ী কৌতূহলী হয়। "আপনার নামটা কি জানতে পারি?"

"নাম লাঁতিন, স্বরাষ্ট্র বিভাগের কেরাণী; বর্তমান ঠিকানা—১৬নং রুঁ দ্য মারতারস্!"

দোকানী একটা বিরাট খাতা উল্টে দেখতে দেখতে স্বীকৃতিসূচক গলায় বলে ওঠে: "হুঁ, এই তো পাওয়া গেছে ১৮৭৬ সনের ২০শে জুলাই এই নেকলেসটি পাঠানো হয়েছিল ১৬নং রুঁ দ্য মারতারসের মাদাম লাঁতিনের ঠিকানায়।"

দু'জন দু'জনের মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ; বিপত্নীক লোকটি বিস্ময়ের সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে; আর স্বর্ণকারের চোখে সন্দেহের ভ্রূকুটি।

দোকানদার আবার বলে, "নেকলেসটা পরীক্ষার জন্য আমার কাছে চব্বিশ ঘন্টার জন্য রেখে যান; আপনাকে রসিদ দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে," অনেকটা স্বস্তির সঙ্গে বলে লাঁতিন এবং দোকানদারের দেওয়া রসিদটি পকেটস্থ করে রওনা দেয়।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় তার খেয়াল হলো সে পথ ভুল করেছে। কিছুতেই মাথাটাকে হাল্কা রাখতে পারছে না,—একবার গেল তুলারি গার্ডেনের দিকে, অতিক্রম করলো সীন নদী। আবার পথ ভুল হলো তার।

অবশেষে যখন ফিরে এলো সাঁজে লিজিতে, মন তখন ভাবলেশহীন। গোটা ঘটনার পিছনে সে কোন যুক্তিকে দাঁড় করাতে পারছে না। তার স্ত্রীর তো এত দামী গহনা কিনবার মতন সামর্থ্য ছিল না। কোথা থেকে, কোন্ রসদ থেকে সে এই রাজকীয় ঠাট-বাট বজায় রেখেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে লাঁতিনের বিক্ষত হৃদয় একটি উত্তরই খুঁজে পায়: উপহার।

কিন্তু কে দিয়েছিল এমন মহার্ঘ উপহার? এবং কেন?

ভাবতে গিয়ে লাঁতিন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। অনিবার্যভাবেই এক কুটিল সন্দেহ

ছায়া ফেলে তার মনে। নিশ্চয় তার স্ত্রীর সঙ্গে এমন কারুর গোপন ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল, যে তাকে ঐ সমস্ত অত্যন্ত মূল্যবান গহনাগুলি উপহার দিয়েছে। তার স্ত্রী! লাঁতিনের মনে হলো, পৃথিবী কাঁপছে, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটা ভেঙ্গে পড়ছে তার ঘাড়ের ওপর। জ্ঞান হারিয়ে পথের মধ্যে চিৎ হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো সে।

জ্ঞান হতে দেখলো, সে এক চিকিৎসালয়ে শুয়ে আছে। পথের লোকেরা তাকে এখানেই নিয়ে এসেছিল।

কয়েকজন লোক লাঁতিনকে তার বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে খিল তুলে দেয় লাঁতিন। মুখে রুমাল পুরে অঝোরে বহুক্ষণ ধরে কাঁদলো। সন্ধ্যা ঘনাতে ক্লান্ত শরীরে বিছানা আঁকড়ে ধরে, গভীর সুপ্তি নেমে আসে তার ওপর।

সূর্যের আলো মুখের ওপর এসে পড়াতে পরদিন ঘুম ভাঙলো লাঁতিনের; যদিও অফিস যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, এই বিধ্বস্ত মানসিকতা নিয়ে কিছুই করতে ইচ্ছে হচ্ছে না তার। অফিসের বড়কর্তার কাছে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল সে। এখন তার একবার সেই গহনার দোকানে যাওয়া দরকার; কিন্তু গভীর আত্মগ্লানিতে মাথা হেঁট হ'য়ে আছে তার, এখনো কেবল ভাবছেই এবং ভাবতে ভাবতে সময়টা হারিয়ে যাচ্ছে তার কাছ থেকে।

কিন্তু দোকানদারের সঙ্গে নেকলেসটার ব্যাপারে একটা রফা ক'রে ফেলা এখন উচিত। পোশাক পরে লাঁতিন বেরিয়ে পড়ে।

সুন্দর ফুটফুটে রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল, মাথার ওপর অমল নীল আকাশ, পথে নিরুদ্বেগ জনতার স্রোত। এদের দেখে লাঁতিন সিদ্ধান্ত নেয়: এই পৃথিবীতে ধনীরাই একমাত্র সুখী। টাকার কাছে দুনিয়া বশ, টাকা দিয়ে দুঃখকে মুছে ফেলা যায়; পকেটে অঢেল টাকা থাকলে পৃথিবীর দূরত্ব সীমিত হয়ে যায়, অনায়াসে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো যায়। আহ্! আমার যদি অমন প্রচুর টাকা থাকতো!

ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, অথচ পকেট ঢুঁ ঢুঁ। তখনই মনে পড়ে গেল নেকলেসটার কথা। আ-ঠা-রো হাজার ফ্রাঁ। এত টাকা!

দ্রুত পা চালিয়ে লাঁতিন রুঁ দ্য লা পাইয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো। মগজের মধ্যে কেবল আঠারো হাজার ফ্রাঁ হাতুড়ি পিটছে, যদিও মনের গহনে লজ্জা ও ভয় দলা পাকিয়ে আছে। সর্বোপরি, তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, পকেটে একটি সেঁতও নেই। মানসিক গ্লানিকে চাপা দিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ে লাঁতিন।

দোকানের মালিক সাদরে আহ্বান জানায় তাকে, বসবার জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়; অন্যান্য কর্মচারীদের চোখে-মুখে বিনীত হাসি।

দোকানদার বলে: "নেকলেসটা সম্পর্কে আমি এখন নিশ্চিন্ত। আমার দামে যদি রাজি থাকেন, এখনই কিনে নিতে পারি।"

লাঁতিন কোন রকমে বলে: "নিশ্চয়।"

কাঁপা হাতে রসিদে সই করে আঠারো হাজার ফ্রাঁ পকেটে নিয়ে বেরিয়ে এলো লাঁতিন। বেরিয়ে আসার আগে বললো "দেখুন, আরো কিছু গহনা আমার অধিকারে এসেছে। কিনবেন?"

"নিয়ে আসবেন।"

কৌতুকে একজন কর্মচারি হাসি চাপতে পারে না; আর একজন নাক ঝাড়ার শব্দ করে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই অভুক্ত লাঁতিন গাড়ি ভাড়া করে বাকি গহনাগুলি নিয়ে হাজির হয় ঐ দোকানে।

এবার কিন্তু লাঁতিন বাকি গহনাগুলি বিক্রির সময় রীতিমত দরাদরি করতে থাকে, তর্ক জুড়ে দেয়, মেজাজও তুলে ধরে সপ্তমে।

হীরের দুটি দুলের দাম পেলো বিশ হাজার ফ্রাঁ, ব্রেসলেটের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার; আংটি, ব্রোচ ও নক্সা আঁকা হীরের লকেটগুলির জন্য ষোল হাজার ফ্রাঁ। এ ছাড়া এক সেট পান্না-নীলার দাম পেলো চৌদ্দ হাজার ফ্রাঁ, একটি সোনা ও মুক্তো খচিত নেকলেসের জন্য পাওয়া গেল চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। সব মিলিয়ে লাঁতিনের পকেটে ঢুকলো একশ' ছিয়ানব্বই হাজার ফ্রাঁ।...

লাঁতিনের স্ফূর্তি আর ধরে না। আকাঙ্ক্ষা হলো, কর্ণেল ভেদমের বিশাল মূর্তিটাকে জড়িয়ে গড়াগড়ি খায় শিশুর মতন। বাসনা হলো, ফরাসী সম্রাটের প্রতিমূর্তিটাকে ব্যাঙের মতন লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে। দামী মদ সহযোগে লাঞ্চ সারলো বনেদী ভোয়াসিনে, একটা গাড়ি ভাড়া করে শহরময় চক্কর কাটলো কয়েকবার, পথচারিদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে সে যেন চীৎকার করে উঠতে চাইছে:

দেখো, এই একজন ধনী লোক চলেছে, যার দাম দু'শো হাজার ফ্রাঁ!

অফিসে গিয়ে সে গটমট করে সরাসরি বড়কর্তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো, বলদর্পী গলায় বললো:

"উত্তরাধিকারসূত্রে এইমাত্র লাখ তিনেক ফ্রাঁ আমি পেয়ে গেছি। আর এই চাকরিতে আমার দরকার নেই।"

পুরনো সহকর্মীদেব সঙ্গে বড় বড় কথা বলে কাফে অঁগলাইতে ডিনার খেলো। জীবনে এই প্রথম সে থিয়েটার দেখে আনন্দ পেলো। তারপর একসঙ্গে জনাকয়েক মেয়েমানুষের সঙ্গে মহড়া দিয়ে রাত কাবার করে ফেললো।

অতঃপর দু'মাসের মধ্যেই লাঁতিনের দ্বিতীয় বিবাহ। তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটির চরিত্র নির্মল, কিন্তু বড় মুখরা, এবং ঐ খিটমিটে মেজাজের জন্য লাঁতিনের দুর্ভোগের অন্ত নেই।

বিপদ

Danger

উনোনে আগুন গনগনে, টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম দু'জনের। কাউন্ট দ্য সালু নিজের টুপি, দস্তানা, উলের কোট ইত্যাদি খুলে চেয়ারের ওপর রাখলো। কাউন্টেস্ এর আগেই তার ভালো পোশাকটি ছেড়ে রেখে এসেছে। তবু তার আঙ্গুলগুলিতে চিক্‌চিক্ করছে মণিমুক্তো, ঐ আঙুল দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চুল বিন্যস্ত করছে। আয়নার বুকে তার রূপ প্রতিবিম্বিত, নিজের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো কাউন্টেস্। পিছনে তার স্বামী স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তার স্ত্রীকে। কি যেন সে বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না কোন অজানা সঙ্কোচে। অবশেষে অবশ্য বলেই ফেলে: "আজকে রাতে তুমি যে ভাবে খেলায় মেতে উঠেছিলে!" স্বামীর মন্তব্যে স্ত্রীর মুখে বিজয়িনীর হাসি, বেপরোয়াভাবে গ্রীবা বাঁকায়, স্বামীর চোখে চোখ রেখে বলে, "সত্যি তাই?"

তারপর মহিলা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কাপে চা ঢালতে থাকে। কিছুক্ষণ তাদের পারিবারিক আলাপ ও লোক-ভাষা অনুচ্চার থাকে। স্বামী এগিয়ে এসে তার মুখোমুখি বসে। অভিযোগের স্বরে বলে, "দেখো, তোমার সব কাণ্ডকারখানায় আমি বেশ অপদস্থ হয়েছি।" কাউন্টের কথায় কাউন্টেসের ভ্রূভঙ্গ ঘটে, "কেন, আমি কি অন্যায়টা করেছি? তুমি কোথায় আমাকে বেচাল হতে দেখলে?"

"না, ঠিক তা আমি বলছি না। তবে অনেকরকম ঘটনা ও ইঙ্গিতের সমন্বয়ে একটা ব্যাপারে আমার আর কোন সন্দেহই নেই। সেটা হলো এই যে মঁসিয়ে বুবেল ইদানীং তোমার প্রতি অতিমাত্রায় নেক নজর দিচ্ছে। এগুলি এক ধরনের অসভ্যতামি। আমার উপায় থাকলে বরদাস্ত করতাম না।"

"ও আমার সোনামণি, তোমার মানসিক অবস্থা আবার এ রকম হলো কবে থেকে? এক বছর আগেও তো তোমায় এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। মনে আছে নিশ্চয়, তুমিই বরং একবার একজন প্রণয়িনী জুটিয়েছিলে এবং আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম (অথচ, আমার বেলায় সেরকম প্রেমিকের অস্তিত্ব আমি খুঁজে পাচ্ছি না।) তখন আমি তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম,—মাদাম দ্য সারভির সঙ্গে তুমি খুব মাখামাখি করছো আজকাল। বলেছিলাম, তোমার এই মতিচ্ছন্নতা আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, আমি মরমে মরে যাচ্ছি!

তুমি সেদিন আমাকে কি জবাবটা দিয়েছিলে, মনে আছে?

বলেছিলে—বিয়ে জিনিসটা হলো দু'জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত একটা চুক্তি, যার সামাজিক বন্ধন স্বীকৃত, কিন্তু নৈতিক বাধ্যবাধকতা বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ মনের বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই স্বাধীন। কি মনে আছে সে সব কথা? সেই সব দিনে আমি তো তোমার কাছে পোড়োজমি ছিলাম

মাত্র। তুমি কেমন নির্মমভাবে আমাকে শুনিয়েছিলে, তোমার প্রণয়িনী নাকি আমার চেয়ে অনেক বেশী মনোমুগ্ধকর ও কোমল! অবশ্য তখন তোমার স্বরে কোন রকম উপেক্ষা বা উষ্মা ধরা যাচ্ছিলো না। তুমি বেশ সুন্দর সাজিয়ে-গুছিয়ে কথাগুলি বলতে পারছিলে আমাকে। আমাকে সরাসরি আহত করবার বাসনা যে তোমার ছিল না, তার জন্য আজও আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু মানুষ হিসেবে তুমি যে কি, তোমার মনের পরিসীমা কতদূর, আমার কাছে আর অজ্ঞাত নয়।

সেই থেকে আমাদের পারস্পরিক বন্ধন শিথিল, অনিবার্যভাবেই সেখানে কোন নিশ্চয়তা নেই। আমরা একই ঘরের ছাদের নীচে বাস করেও একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তোমার ও আমার মধ্যে ছিল আমাদের একমাত্র সন্তান, যার মুখের দিকে চেয়ে অপরাধপ্রবণতাকে গোপন রেখে অভিনয় করে আসতে হয়েছে দু'জনকে।

তুমি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে, আমার বিপথগামিতায় তোমার কোন মাথাব্যথা থাকবে না, শুধু এই নিয়ে একটা সামাজিক কেচ্ছা ছড়িয়ে না পড়লেই হলো! পরকীয়া প্রেমে অভ্যস্তা নারী কেমন চতুরতার সঙ্গে নিজের গোপন প্রেম গোপনই রাখে, তুমি বেশ চটকদার বক্তৃতার সাহায্যে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে।

আমার আহত অন্তঃস্থল তোমার মানসিকতাকে ঠিকই ধরতে পেরেছিল। তুমি তো তখন মাদাম দ্য সারভির উচ্ছ্বসিত প্রেম ও কামনায় আকণ্ঠ ডুব দিয়েছো! ঐ অবস্থায় আমাদের আইনসিদ্ধ সরল ভালোবাসা কি আর তোমার ভালো লাগে? দাম্পত্য প্রেম তোমার কাছে তখন অর্থহীন, তোমার সুখের পথের কাঁটা।

ফলতঃ আমাদের মধ্যে গড়ে উঠলো একটা বিচিত্র সম্পর্ক, যা যে কোন কৌতুকপ্রিয় মানুষের কাছে আকর্ষক মনে হবে। আমরা বাইরে পাঁচজনের সামনে পরস্পর প্রণয়-নির্ভর স্বামী-স্ত্রী; আর ঘরে ফিরে আমরা একে অপরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ, গত এক দু'মাসের মধ্যে দেখা দিয়েছে তোমার এই মানসিক পরিবর্তন—তুমি কেমন ঈর্ষাকাতর হ'য়ে উঠছো।"

"ডার্লিং, ঈর্ষা করবার মতো কোন ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতা আমার নেই। তবে আশঙ্কা হয় তুমি যুবতী, তদুপরি অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ—বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে নিজেকে গোপন রাখতে পারবে না, পাঁচজনের মুখরোচক আলোচনার পাত্রী হয়ে দাঁড়াবে।"

"তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। মুখরোচক আলোচনা ও সমালোচনার কথা বলছো? সজ্ঞানে জীবনে তুমি কি এর বাইরে? উপদেশ না দিয়ে স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্থাপন করো।"

"আমার অনুরোধ, অমন করে হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিও না। গত্যন্তর ছিল না বলেই বলছি। একজন যথার্থ বন্ধুর মতোই তোমাকে এই পরামর্শটা দিচ্ছি। আর তুমি অতিরিক্ত অপেক্ষায় নিমেষে তাকে উড়িয়ে দিচ্ছো।"

"আদৌ তা নয়। যেদিন নিজের মুখে মাদাম দ্য সারভির সঙ্গে তোমার পরকীয়া প্রেম কবুল করলে, আমি তো সেদিন থেকেই অনুরূপ কোন ঘটনার নায়িকা হবার

অধিকার লাভ করেছি। অথচ, বাস্তবে আজ পর্যন্ত আমি তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি।"

"আমার আরো কিছু বলবার আছে—"

"দাঁড়াও, আগে আমাকে বলতে দাও। হ্যাঁ, তোমার মতো কোন ঘটনা এখনো ঘটাতে পারিনি। এখনো কোন মনমতো পুরুষ আমার জোটেনি ; তবে সন্ধানে আছি। পেলেই ঠিক খেলিয়ে তুলবো। আহ ! আমার সেই প্রেমিক হবে সুন্দর বলিষ্ঠ—তোমার চেয়েও সুন্দর—আমার পছন্দ ও রুচিকে তখন তুমি প্রশংসা করবে নিশ্চয়। কি ব্যাপার, মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে কেন ?"

"তোমার কাছ থেকে এ ধরনের রসিকতা আমি আশা করিনি।"

"যা বাবাঃ। আমি মোটেই রসিকতা করছি না। এটা আমার অন্তরের কথা। তোমার এক বছর আগের একটি কথাও আমি ভুলে যাইনি। কাজেই আজ বা আগামী কাল তুমি কি ভাববে বা বলবে, তা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই না। ইচ্ছে যখন হয়েছে, প্রেমিক একজন জোটাবোই। এ ময়দানে তোমার চেয়ে আমি যে কম কুশলী খেলোয়াড় নই, তার প্রমাণ আমি রাখবো।"

"তুমি এসব কথা কি করে মুখে আনছো, ভেবে পাই না।"

"ভেবে পাও না ? তাজ্জব ! বেচারা মঁসিয়ে দ্য সারভিকে নিয়ে মাদাম দ্য জারস্ যখন সেদিন ঠাট্টা করেছিল, তুমিই তো সেই লোক, যে তখন সোল্লাসে হেসে উঠেছিলে। মনে নেই ?"

"তা হতে পারে। কিন্তু তোমার মুখে এ সব উক্তি শোভন নয়।"

"তাই নাকি ! উর্দিপরা পরিচারক পরিবৃত কাউন্ট বলে নাকি তোমার এই বিশেষ একপেশে সম্মানবোধ ? নতুবা, মঁসিয়ে দ্য সারভির বেলায় যা ঠাট্টা, তোমার বেলায় তা অন্যায় ঠেকবে কেন ? একেই বলে মানুষের বিধিলিপি ! যাক, এ সব নিয়ে বকবকানি বা স্বগতোক্তি করতেও আমার ভালো লাগে না। আসলে আমি দেখতে চেয়েছিলাম, অনাগত পরিণতির জন্য মানসিক দিক থেকে তুমি প্রস্তুত আছো কিনা!"

"প্রস্তুত ? কিসের প্রস্তুতি ?"

"বঞ্চিত হবার প্রস্তুতি। ইয়ার্কি নয়, মানসিক দিক থেকে তৈরী না থাকলে কোন মানুষই তখন ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। এসব কথা শুনলেই মানুষের মাথায় খুন চড়ে।..."

"তুমি এই রাতে আমার সঙ্গে খুব নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করছো। তোমার এ রকম রূঢ় ব্যবহারের আমি কোন হদিশ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি দারুণ বদলে গেছো।"

"ঠিক বলেছো। সত্যি আমি দারুণ বদলে গেছি। আমার ভেতরে এখন পাপের বনিয়াদ মজবুত। নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার স্বাভাবিক সরল সহজ বৃত্তিগুলির এই যে বিরাট পরিবর্তন, এর জন্য দায়ী কে ? তুমি।"

"প্রিয়া লক্ষ্মীটি, এসো, আমরা সদ্ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে পরস্পরকে গ্রহণ করি। তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আমার সকাতর ভিক্ষা—মঁসিয়ে বুরেলেকে তুমি আর প্রশ্রয় দিও না।"

"বুঝতে পারছি, তুমি একেবারে হিংসুটের বেহদ্দ। ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরছো।"

"না, হিংসা নয়, ঈর্ষা নয়। আসলে আমি কারুর করুণার ও উপহাসের পাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে পারি না। আর যদি কোন দিন দেখি, আমারই চোখের সামনে লোকটা তোমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, আমি ওকে গুঁড়িয়ে দেবো।"

"তাহলেই কি তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারবে?"

"পারবো না কেন? তোমার জন্য আমি আরো সাংঘাতিক কিছু করে বসতে পারি। নিজের ওপর এ আস্থা আমার আছে।"

"ধন্যবাদ। তোমার ঐ শূন্যীভূত মনের জন্য আজ আমার করুণা হচ্ছে। আমি তোমার জন্য দুঃখ করছি, কারণ তোমাকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

কাউন্ট উঠে দাঁড়ালো। এই মর্মান্তিক জিজ্ঞাসার সে একটা হিল্লে করতে চায়। টেবিলটাকে একচক্কর পাক খেয়ে তার স্ত্রীর পিছনে এসে দাঁড়ালো, নতুন করে সে আবিষ্কার করলো—তার স্ত্রী অপূর্ব রূপসী, ডানা-কাটা পরী যেন। অন্তঃস্থলের সমস্ত আবেগ নিয়ে চকিতে সে স্ত্রীর ঘাড়ে চুমু খেয়ে বসে।

এই আচমকা ব্যাপারটা মোটেই সাধারণ সোহাগ বা রসিকতার ব্যাপার হিসেবে নিলো না কাউন্টেস্, সটান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, কুঁদুলি মেয়ের গলায় কলকলিয়ে ওঠে:

"তোমার সাহস তো কম নয়! প্রকৃতপক্ষে যার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই, তাকে ছুঁতে চাইছো কোন্ অধিকারে?"

"রাগ করো না সুন্দরী। তোমায় আজ কী চমৎকার দেখাচ্ছে, আদর না করে থাকতে পারছি না!"

"তাহলে হালফিল আমার চেহারায় বেশ চটক এসেছে, বলতে হবে।"

"তোমাকে দেখছি, আর আমার ভেতরে লোভের পোকাটা সুড়সুড়ি দিয়ে উঠছে। এমন বাহু, গ্রীবা, মসৃণ ত্বক...রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়—"

"আশা করি, আমার এই সব নিজস্ব বস্তু সহজেই মঁসিয়ে বুরেলকে আকর্ষণ করতে পারবে—"

"ছিঃ! এরকম নোংরা ভাবনা তোমার! সত্যি বলছি, এখন আমার মনে হচ্ছে—তোমার মতো সুন্দরী যৌবনবতী নারী এর আগে কখনো আমার নজরে পড়েনি।"

"কয়েকদিন কি খাদ্য পাচ্ছো না?"

"মানে?"

"মানে, বর্তমানে তোমার শরীর নিশ্চয় উপোসী রয়েছে।"

"যা বলতে চাইছো, স্পষ্ট করে বলো।"

"যা বলছি, না বুঝবার কারণ তো তোমার নয়। নিশ্চয় তুমি বেশ কিছু দিন উপোস করে এখন রীতিমত বুভুক্ষু। ফলে হাতের কাছে যা পাচ্ছো, তাই সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে ছিনিয়ে নিতে চাইছো। না হলে, আমি তো এতকাল তোমার কাছে অখাদ্যই ছিলাম। আজ রাতে সেই অখাদ্যের প্রতিই তোমার এত আসক্তি!"

"মার্গারেত, এমন কুৎসিত কথাবার্তা কার কাছ থেকে শিখেছো?"

"তোমার ভাঁড়ার থেকেই তো যোগাড় করেছি এই সমস্ত চোখা চোখা শব্দ। যতদূর জানি, বাজারে তোমার চারজন নর্মসহচরী রয়েছে,—তাদের একজন অভিনেত্রী, একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া, একজন নেহাতই বাজারের সস্তা মেয়ে, অন্যজন—! কাজেই আজ যে হঠাৎ তোমার আমার প্রতি প্রেম উথলে উঠছে, এর ব্যাখ্যা তো একটাই হতে পারে—অনেকদিন তোমার শরীর খাদ্য পায়নি।"

"তুমি ভাবতে পারো, এটা আমার অভ্যাসগত ব্যাপার। ভাবতে পারো, আমি নিষ্ঠুর ও বর্বর। আদতে আমি কিন্তু দ্বিতীয়বার তোমার প্রেমে পড়েছি। তোমার প্রেমে আজ আমি উন্মাদ।"

"দারুণ খুশির খবর। আমি বিলকুল নিঃশব্দ। অর্থাৎ তোমার বাসনা—"

"ঠিক ধরেছো, ঠিক ধরেছো।"

"আজ রাতেই হবে!"

"আহ, মার্গারেত।"

"এই খবরদার, দূরে দাঁড়িয়ে যা বলবার বলো। আবার অসভ্যতামি। গা আমার গুলিয়ে ওঠে এ সব অনধিকার জুলুম দেখলে। শান্ত ভদ্র হ'য়ে কথা বলো এবং বলতে দাও। তোমার ব্যবহার হওয়া উচিৎ নৈর্ব্যক্তিক; কারণ আমি তোমার কেউ নই, তুমিও আমার কেউ নও। এটা সত্যি বটে, আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু আমরা পরস্পর স্বাধীন। আজ হোক, কাল হোক, আমি কাউকে না কাউকে প্রেম নিবেদন করবোই। তবে যদি উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজি থাকো, আমি তোমাকেই প্রথম সুযোগ দেবো।"

"কি যে ছাই বলছো, কিছুই বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট করে বলো।"

"বেশ, খুলেই বলছি। আমি কি তোমার নর্মসহচরীদের মতো সুন্দরী?"

"আলবাৎ। হাজার গুণ বেশী সুন্দরী।"

"সবচেয়ে সুন্দরীদের সঙ্গে আমার কোন তুলনা হয়?"

"তুমি সুন্দরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা।"

"আচ্ছা, গত তিনমাসে তুমি তোমার সবচেয়ে আকর্ষণীয়া প্রণয়ীকে মাসিক কত করে দিয়েছো?"

"ধ্যাৎ, কি তুমি বলতে চাও?"

"বলছি, তোমার সেরা প্রেমিকাকে খুশি করতে মাসিক কত ব্যয় করতে হতো? দামী গহনা কিনে দিতে, গাড়ি ভাড়া করে চক্কর খেতে, যখন তখন ডিনার পার্টিতে কি পরিমাণ খরচটা হয়েছে তোমার?"

"কি যন্ত্রণা! কি করে আমি তা এখন বলবো?"

"তোমার বলা উচিত। তা আন্দাজে বলতে পারি, মাসে হাজার পাঁচেক ফ্রাঁ। তাই নয়?"

"তা প্রায় তাই।"

"বেশ, আমারও দাবি ঐ—মাসিক পাঁচ হাজার ফ্রাঁ। আজ রাত থেকে পাক্কা একটি মাস তুমি আমাকে উপভোগ করতে পারবে।"

"মার্গারেত, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

"মাথা আমার ঠিকই আছে। দরে না পোষালে বলো, আমি এখন নিজের ঘরে ঢুকি।"

কাউন্টেস্ নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। গোটা ঘরময় কাউন্টেসের শারীরিক সুগন্ধ ম'-ম'। দিশেহারা কাউন্ট তার স্ত্রীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললো:

"কি সুন্দর তোমার দেহের গন্ধ।"

"ভালো লাগছে বুঝি? আমি সব সময়ই পয় দ্য এস্পেন দিয়ে প্রসাধন সেরে থাকি। অন্য কোন সুগন্ধি আমার পছন্দ নয়।"

"আমি তো এতকাল খেয়াল করিনি—চমৎকার জিনিস।"

"বেশ। দয়া করে এবার তুমি আমার ঘরের সামনে থেকে সরো। আমি শুয়ে পড়বো।"

"মার্গারেত!"

"অনুগ্রহ করে যাবে কি?"

কাউন্ট কিন্তু যায় না। উল্টে ঘরে ঢুকে একটা আসন টেনে নিয়ে বসে।

কাউন্টেস্ বলে:

"ও, তুমি তবে সরছো না? বেশ, তবে তোমার চোখের সামনেই আমাকে পোশাক বদলাতে হচ্ছে।"

আস্তে আস্তে কাউন্টেস্ তার শরীর থেকে একে একে পোশাকগুলিকে মুক্তি দিতে থাকে। দেখা গেল অনাবৃত তার দীর্ঘ বাহু ও মসৃণ কাঁধ; তারপর চুল খুলবার জন্য মাথায় হাত দিতেই লোভনীয় একজোড়া স্তন-বৃন্ত দৃষ্ট হয়। তপ্ত শরীর নিয়ে কাউন্ট তার দিকে এগিয়ে এলো এক পা।

সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টেস্ হুঁশিয়ার করে দেয়, "আবার বর্বরতা করতে এসো না। আমি বরদাস্ত করবো না মোটেই।"

কাউন্ট ওর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে চুমু খাবার প্রাণান্ত প্রয়াস করে। কাউন্টেস্ ঝটিতি নিজেকে মুক্ত করে নেয়, ড্রেসিং টেবিল থেকে একটা সেন্টের শিশি তুলে স্বামীর মুখের উপর ছুঁড়ে মারে। আঘাত পেয়ে কাউন্ট তেতে লাল। দাঁতে দাঁত ঘঁষে উচ্চারণ করে:

"শয়তানী। নচ্ছার।"

"হ্যাঁ, আমি শয়তানী নচ্ছারই বটে। তুমি তো আমার শর্ত জানোই—মাসিক পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।"

"অসম্ভব।"

"কারণ ?"

"কারণ, কোন স্বামী তার স্ত্রীর বিছানায় যাবার জন্য টাকা ঘুষ দেয় না।"

"টাকা না দিলে তুমি আমার কাছে জুলুমবাজ লোক হিসাবেই অভ্যর্থনা পাবে।"

"হ্যাঁ, আমি জুলুমবাজই। তাই বলে টাকা দিয়ে স্ত্রীকে কেনার মতো কুৎসিত কাজ করতে আমি রাজি নই।"

"অথচ বাজারে একটা মেয়ের পায়ে টাকা ঢেলে দিতে তোমার রুচিতে বাধে না। বাড়িতে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এরকম মেয়েবাজি করে যাওয়াটা কি কুৎসিত নোংরা কাজ নয় ?"

"কুৎসিত নোংরা কাজ হলেও সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু স্ত্রীকে সম্ভোগ করবার জন্য টাকা ঢালতে হচ্ছে—এর চেয়ে অপমানকর ঘটনা কি আর হতে পারে ?"

কাউন্টেস্ বিছানায় উঠে তার মোজা খুলতে থাকে। ক্রমশ দেখা যায় তার অনুপম পদযুগল, নরম পায়ের ডিম, মাখন-রং জানু....।

কাউন্টের গলার স্বর ধরে আসে :

"মার্গারেত, তোমার অসংগত বাসনা ত্যাগ করো।"

"কোন্‌টা অসংগত ?"

"ঐ পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।"

"অসংগত মোটেই নয়। তুমি আমার সঙ্গে প্রেম-প্রেম ফষ্টি-নষ্টি করতে চাইছো। অথচ, কার্যত আমরা একে অপরের কাছে অপরিচিত। তুমি তো আমাকে আবার বিয়ে করতে পারো না, কারণ সে পর্বটি অনেকদিন আগেই সম্পন্ন করা হয়েছে। এখন কেবল মাত্র তুমি আমাকে কিনে নিতে পারো। আমার যা দাম, তাই দেবে। হা ঈশ্বর! তুমি কি এর আগে টাকার বিনিময়ে নারী-সম্ভোগ করোনি ? তুমি যদি বাজারে বহুভোগ্যা মেয়েদের পিছনে জলের কতো টাকা ব্যয় করতে পারো, আমার মতো প্রায়-পবিত্র স্ত্রীর জন্য কেন খরচ করবে না ? বরং সেটাই কি চমৎকার হবে না ? একটা নতুন দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে পারবে। তোমার মজা আসবে। আমি জানি, টাকা খরচ করতে পারলে পুরুষদের পৌরুষ তৃপ্ত হয়। দেখবে, ঐ সব অবৈধ প্রেমের চেয়ে এ দাম্পত্য চুক্তিতে স্ফূর্তি অনেক বেশী পাবে। কি ?"

কথা শেষ করে কাউন্টেস্ কলিংবেল টেপে, বলে : "এখনো যদি সসম্মানে বিদায় না হও, আমি আমার পরিচারিকাকে ডাকতে বাধ্য হবো।"

উপায়হীন দুঃখিত কাউন্ট পকেট হাতড়ে একতাড়া নোট বের করে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দেয় :

"এই নাও ডাইনি ছ'হাজার ফ্রাঁ আছে। কিন্তু মনে রাখো—"

হাসি হাসি মুখে টাকাটা গুণে কাউন্টেস্ জিজ্ঞাসা করে, "কি মনে রাখতে হবে?"

"এ টাকা তুমি খরচ করতে পারবে না।"

"প্রতি মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ যখনই দিতে পারবে না আমিও তোমাকে কিছু দিতে পারবো না, সোজা ঠেলে দেবো আবার ঐ সব নাটুকে মেয়েদের কাছে। আর যদি তোমার সব তৃপ্তিই আমি মেটাতে পারি, তবে আরো বেশী টাকা কিন্তু দাবি করবো।"

সংসার

A family

গত পনেরো বছর যাবৎ যাকে দেখিনা আমার সেই বন্ধু সাইমন র‍্যাডিভিনের সঙ্গে আবার দেখা করতে চলেছি।

একসময় সে ছিল আমার সেরা বন্ধু। ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ। কত দীর্ঘ, শান্ত ও উৎফুল্ল সন্ধ্যা তার সঙ্গে কাটিয়েছি! মনের কত সংগোপন রহস্য সে অকপটে আমাকে বলেছে। তার স্বরে ফুটে উঠতো অকৃত্রিমতা, সহানুভূতি, সৌজন্যবোধ, যা সহজেই মনের ভার লাঘব করে। অনেকগুলি বছর ধরে আমরা সত্যি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছি। একসঙ্গে খেলেছি, ঘুরেছি, চিন্তা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি; একই ধরনের বস্তুতে আমাদের আসক্তি ছিল, আমরা একই ধরনের বই পড়েছি, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের অভিমত ছিল অভিন্ন। আমরা একে অপরের মনের কথা বুঝে নিতাম একপলক দৃষ্টিপাতেই।

সেই বন্ধু হঠাৎ প্যারিসের এক বিবাহে-ইচ্ছুক মেয়েকে একদিন বিয়ে করে বসলো। এক নাতিদীর্ঘ চেহারার পরিপাটি চুল, ঝকঝকে চোখ, শূন্যদৃষ্টি, খাটো খাটো হাত, বোকার মতন কথাবার্তা, আরো হাজারটা সাধারণ মেয়ের সমগোত্রীয়—কোন্ কৌশলে আমার বন্ধুর মতন একজন শানিত-বুদ্ধি, পরিশীলিত যুবককে দিব্যি তুলে নিয়ে চম্পট দিলো? এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না। নিশ্চয় আমার বন্ধু আশা করেছিল, বিশ্বস্ত সুগৃহিণীর প্রেমপূর্ণ বাহুবন্ধনে সে জীবনের সুখ খুঁজে পাবে। সে হয়তো সেই প্রতিশ্রুতি দেখতে পেয়েছিল মেয়েটির দুই চোখে।

বন্ধুবর সে সময় বুঝবার চেষ্টা করেনি—একজন কর্মক্ষম, উৎসাহী ও সংবেদনশীল মানুষ কোন বস্তুর স্থূলতা বেশীদিন সহ্য করতে পারে না। অবশ্য এর মধ্যে যদি সে নিজের স্বকীয় বুদ্ধি ও রুচি বিসর্জন না দিয়ে থাকে।

আজ আমি সেই বন্ধুকে কি অবস্থায় দেখবো? সে কি এখনো প্রাণপূর্ণ, রহস্যপ্রিয়, সদালাপী ও উৎসাহী? অথবা, প্রাত্যহিক স্থূল একঘেঁয়েমিতে এখন নিছক ঘুম-কাতুরে? পনেরো বছরে একটি মানুষের অনেক পরিবর্তনই সম্ভব।

ছোট একটা স্টেশনে ট্রেন থামলো।

যে মুহূর্তে কামরা থেকে নামতে যাবো, জনৈক লাল চোয়াল, পেট মোটা সমর্থ চেহারার লোক দু'হাত বাড়িয়ে আমার দিকে ছুটে আসতে আসতে চীৎকার করে ডাকে, "জর্জ!"

যদিও প্রথমে আমি তাকে চিনতেই পারিনি, তবু সেই আলিঙ্গনে ধরা দিই।

"অদ্ভুত লাগছে! তুই আর এখন সে রকম রোগাটে নস।"

—বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে বলি।

"তুই কি আশা করেছিলি?" উচ্ছল হাসির সঙ্গে সে জবাব দেয়, "মোটা হবো না? পরম সুখে আছি। বহাল তবিয়তে দিন কাটাচ্ছি! রাতগুলি মনোরম! ভালো ভালো খাবার খাই, নিশ্চিন্তে ঘুমাই। এই আমার জীবন।"

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে তখনো খুঁজছি সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলি, যাদের এককালে ভালোবাসতাম।

একমাত্র চোখদুটোর মধ্যে অতীতের ছায়া দেখছি, তাও সেই পরিচিত চাকচিক্য আর সেখানে নেই।

আপন মনে ভাবি, দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য যদি বুদ্ধির অভিপ্রকাশ হয়, তবে আমার বন্ধুটি আর আগের মতো বুদ্ধিদীপ্ত নয়। অবশ্য চোখ তার জ্বলছে, আনন্দ ও বন্ধুত্বের প্রভাবে চক্ চক্ করছে, শুধু প্রার্থিত বুদ্ধির ছাপ নেই।

"এই দেখ আমার দুটি সন্তান।"

—সাইমন হঠাৎ বলে ওঠে।

বছর চৌদ্দর একটি মেয়ে চেহারায় প্রায় মহিলা এবং বছর তেরোর একটি ছেলে স্কুলের পোশাক পরে, ঢিমে-তালে এগিয়ে আসছে।

"তোর ছেলে-মেয়ে?"

—আমি অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ!"

—হেসে জবাব দেয় সে।

"ছেলে-মেয়ে ক'টি তোর?"

"পাঁচটি। বাকি তিনটি বাড়িতে আছে।"

সে বেশ অহঙ্কারে খুশি খুশি গলায় বিজয়ীর দর্পে কথা বলছে যেন। আমার মুখ বিকৃত হয়; মনে মনে আমি সাইমনকে করুণা করতে শুরু করেছি। রাতে ঘুমের আচ্ছন্নতায় স্থূল সুখে খরগোশের মতন খালি বাচ্চা পয়দা করা আর সেই সৃষ্টি-গর্বে বন্ধুটি আমার কেমন অকপট ও ডগমগ।

গাড়িতে উঠে বসি। সে নিজেই গাড়ি চালায়। চলেছি শহরের মধ্য দিয়ে। শহরের পরিধি প্রশস্ত নয়, কেমন একটা বিমর্ষ, ঘুমন্ত ও অলস পরিবেশ। রাস্তায় দ্রষ্টব্য বলতে কিছুই নেই; মাত্র কয়েকটা কুকুর ও চাকর শ্রেণীর কয়েকজন লোক নজরে আসে।

যেতে যেতে একাধিক দোকানদারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়, তারা সাইমনকে দেখে টুপি হেলায়, সাইমনও প্রতিঅভিবাদন জানায়। প্রতিটি দোকানদারের নাম-ধাম গড়গড়িয়ে বলে চলে; যেন প্রমাণ করতে চাইছে, এই অঞ্চলের সকলের সঙ্গেই তার দহরম মহরম। আমি ভাবছি, সাইমন হয়তো আগামী নির্বাচনে ডেপুটি হবার স্বপ্ন দেখছে। এই সব অজ্ঞ মফঃস্বলবাসীর ওটাই তো মোক্ষম বাসনা।

পার্কের মতন একটা জায়গায় পাক খেয়ে গাড়িটা এসে যে বাড়ির সামনে দাঁড়ায়, তাকে পাড়া-গাঁ এলাকার প্রাসাদ বলা চলে।

"এই আমার দীন কুটির।"

—আমার দিকে চেয়ে সাইমন স্বীকৃতি চায়।

"খুব সুন্দর।"

—আমি বলি।

সিঁড়ির সামনেই গৃহকর্ত্রী। অতিথি অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের লোক আসছে বলেই চুলগুলি পরিপাটি ক'রে বেঁধেছে, অভ্যর্থনাও জানাচ্ছে যেন মুখস্তকরা বুলিতে। পনেরো বছর আগে গির্জায় আমি যে চমৎকার চুল ও বর্ণহীন যুবতীকে দেখেছিলাম, এ যেন সে নয়! এখন সে অনেক শক্ত সমর্থ চেহারার, অস্বাভাবিক প্রসাধন করেছে। এই মহিলাকে তাদেরই একজন মনে হয়, যাদের কোন বয়স নেই, চরিত্র নেই, রুচি নেই, সলজ্জ সৌন্দর্য নেই—অর্থাৎ, নেই সেই সমস্ত গুণ, যা একজন রমণীকে পূর্ণতা দান করে। এ শুধু সন্তানের জন্ম দেয়, থাক থাক চর্বিবহুল দেহ নিয়ে যান্ত্রিক নিয়মে শয্যা-সঙ্গিনী হয় এবং নতুন নতুন প্রাণীকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। এর যাবতীয় উৎসাহ ও তৎপরতা নিজের সন্তান ও রান্নার বই নিয়ে।

তার স্বাগত আহ্বান পেয়ে আমি ঘরটায় প্রবেশ করি। সেখানে পর পর তিনটে শিশু তাদের উচ্চতা অনুযায়ী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ভঙ্গীটা এমন যেন কোন মেয়রের সামনে তিনজন তটস্থ প্রহরী একেবারে নিশ্চল।

"বাঃ। এরাই বুঝি বাকি তিনজন?"

—আমি বলি।

সাইমন প্রায় লাফিয়ে এসে ওদের পরিচয় দিতে থাকে, "জাঁ, সঁফি এবং গণত্রঁন।"

ড্রয়িংরুমের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখতে পাই, ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসে এক পঙ্গু বুড়ো থরথরিয়ে কাঁপছে।

মাদাম র‍্যাডিভিন পরিচয় করিয়ে দেয়, "উনি আমার ঠাকুর্দা। সাতাশি বছর বয়স।" তারপর বুড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার করে বলে, "দাদু, সাইমনের বন্ধু।" ঠাকুর্দার প্রাচীন মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে, শুভেচ্ছা জানাবার চেষ্টা করে, কিন্তু গলা চিরে শুধু একটা গর্ গর্ আওয়াজ বের হ'য়ে আসে, কোন রকমে হাত নাড়ায়।

আসন নিতে নিতে প্রথাসিদ্ধভাবে বলি, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

এই সময় সাইমন আবার আমাদের সামনে এসে হাজির হয়।

খুব উৎসাহের সঙ্গে সে বলে, "ঠাকুর্দার সঙ্গে তবে পরিচয় হ'য়ে গেল! ঠাকুর্দা একটি রত্নখনি মাইরি। বাচ্চা-কাচ্চাদের সব সময় একেবারে জমিয়ে রাখে। বুড়ো বয়সে লোভটা বেড়ে গেছে খুব; সুযোগ পেলে এতটা খাবে যে দম বন্ধ হ'য়ে যাবার যোগাড়। তুই কল্পনা করতে পারবি না, ওঁর ওপর নজর না রাখলে গাদা গাদা খেয়ে কী কাণ্ড যে করে বসবে! তুই নিজেই পরীক্ষা করে দেখিস। খাবারের থালায় মিষ্টিগুলির দিকে এমন চোখে তাকাবে যেন মেয়েমানুষ দেখছে। এমন মজা, ভাবতেও পারবি না! দেখবি কিছুক্ষণ বাদেই।"

আমাকে আমার থাকবার ঘরটা দেখানো হলো। হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। কারণ, খাবারের সময় প্রায়-উপস্থিত। সিঁড়ির ওপর দুপ্-দাপ্ দুপ্-দাপ্ পায়ের শব্দ শুনতে পাই। বাচ্চারা সব মিছিল করে তাদের বাবার সঙ্গে এইদিকেই আসছে। নিঃসন্দেহে আমাকে সম্মান জানাবার জন্য ওদের এই প্রয়াস।

আমার ঘরখানা মসৃণ আর বেশ বড়সড়, জানালা দিয়ে দেখা যায় আদিগন্ত সবুজের হাট, ঘাসের সমুদ্র, গম ও যবের দীর্ঘ ক্ষেত। বড় গাছ একটিও নেই, কোন পাহাড় বা টিলার চিহ্নমাত্রও নেই। এখানে জীবন নিশ্চয় বৈচিত্র্যহীন ও বিষণ্ণ।

বেল বেজে উঠলো। খাবারের টেবিলে যেতে হবে। আমি নামতে থাকি।

মাদাম র‍্যাডিভিন আমার হাত ধরতে শরীরটা শির শির করে ওঠে। ডাইনিংরুমে এলাম দু'জনে। বাড়ির একটি চাকর ঠাকুর্দার চেয়ারটা টানতে টানতে এ ঘরে নিয়ে আসে। এবং টেবিলের সামনে এগিয়ে আসা মাত্রই বুড়োর লোভি চোখ দুটো চক্ চক্ করতে থাকে, তার দৃষ্টি ঝলকাচ্ছে পুডিং-এর ডিশ থেকে আর এক ডিশে।

সাইমন তখন হাত পুঁচছে। হঠাৎ তার এবং এ ঘরের সমস্ত শিশুদের খেয়াল হলো, আমি অবাক হয়ে লোভী বুড়োর কাণ্ডটা দেখছি। আমার এই বিস্ময় দেখে তারা সমস্বরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। সবাই হাসছে হো-হো-হা-হা। শুধু বাচ্চাদের মার হাসি স্মিত এবং সে তার ঘাড় ঝাঁকায়।

র‍্যাডিভিন মুখে চোঙ লাগিয়ে বুড়োকে শোনায়: "আজকের ডিনার—মিষ্টি, ভাত, আরো অনেক কিছু।"

বুড়োর হিজিবিজিকাটা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মাথা থেকে পা অব্দি গোটা শরীরটা ভয়ানক কাঁপতে থাকে। ঐ কম্পন বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে খাবারের তালিকা শুনে খুব খুশি।

ডিনার শুরু হয়।

"দেখ", চাপাস্বরে সাইমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দাদু কিছুতেই ঝোল খেতে চাইছে না, অথচ তাকে জোর করে ঝোল খাওয়ানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যের কারণেই ঝোল নিয়ে দাদুর ওপর এত জোরাজুরি। একজন চাকর জোর করে তার মুখের গহ্বরে এক চামচ ঝোল ঢেলে দেয়। কিন্তু দাদুর আর সহ্য হয় না, আচমকা ফোয়ারার মতন সে সেই জলীয় খাদ্য চারদিকে ছড়াতে থাকে; অত্যন্ত কুৎসিতভাবে তার মুখনির্গত সেই

খাবার টেবিলটাকে নষ্ট করে, তার কাছাকাছি যারা বসে আছে তাদেরও জামা-কাপড় নোংরা করে।

বাচ্চাগুলি খিল খিল করে হেসে ওঠে, আর তাদের বাপ খুব মজাতে গদগদ হ'য়ে বলে, "ভারী অদ্ভুত এই বুড়োমানুষটি, তাই নয়?"

খাবার টেবিলের গোটা সময়টা দাদু যেন অধিকার করে নিলো। সবাই যেন তাকে নিয়েই ব্যস্ত। বুড়োর গোল গোল লোভাতুর দৃষ্টি এ পাত্র থেকে সে পাত্রে ঘুরছে, কখনো কখনো কাঁপা হাতে চেষ্টা করছে থালা থেকে খাবার কেড়ে নিতে। এক আধবার ইচ্ছে করেই লোভনীয় খাবারের থালাটা তার নাগালের মধ্যে আনা হয়, বুড়োর তখনকার প্রাণান্ত প্রয়াস ও পরিণামে গভীর হতাশা উপস্থিত সকলকে দারুণ আনন্দ দেয়।

তারপর ছোট্ট একটুকরো খাবার তার পাতে দেওয়া হলো। সে এমন গোগ্রাসে তা গিলে খায়, যেন এখনই অন্যান্য উপাদেয় খাবার পাবার জন্য পাত পরিষ্কার রাখা দরকার। পায়েসের পাত্র যখন এলো, বুড়োর অবস্থা তখন শোচনীয়। পাগলের মতন আকুপাকু করছে। গণত্রঁন কিন্তু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাকে বলে, "দাদু তোমার খাওয়া অনেক হয়েছে। আর নয়।" নাতির কথায় বুড়ো কাঁদতে শুরু করে। শোকের উচ্ছ্বাসে সে যত কাঁপে, খুশির জোয়ারে বাচ্চারা ততই হাসিতে ফেটে পড়ে।

অবশেষে তার ভাগের অংশ, খুব সামান্য পরিমাণ পায়েস তাকে দেওয়া হলো। আর সেই মিষ্টি মুখে দিয়ে বুড়োর কত রকমের অঙ্গভঙ্গী, গলা ও জিভের শব্দ।

ঐটুকু খাওয়া হ'য়ে যাবার পর পা নাচিয়ে নাচিয়ে সে আবার বায়না ধরে। বুড়োর এই করুণ আর্তিতে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। বন্ধুকে না বলে পারি না, "ওঁকে আর একটু পায়েস দিলে হয় না?"

"এ্যাঁ! না বন্ধু, না" সাইমন বলে, "এই বয়সে বেশী খাওয়াটা ক্ষতিকারক।"

বন্ধুর যুক্তি শুনে আমি থ! যুক্তি, নৈতিকতা, সদিচ্ছা—সমস্তই বিসর্জিত হলো বয়সের দোহাই দিয়ে। বয়স ও স্বাস্থ্যের যুক্তিতে এরা একজন মানুষকে তার একমাত্র আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছে।

কি আর ক্ষতি হতো তাকে ইচ্ছামতন খেতে দিলে? ক'দিন আর আয়ু আছে তার? ক'দিন? দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ অথবা, এক শ'? শুধু কি বুড়োর আয়ু ও স্বাস্থ্যের কারণেই এই ধরনের ব্যবস্থা? না, এই পরিবারের সদস্যদের সামনে এক উৎকট আনন্দের উৎস হিসেবে বুড়োকে এভাবে খাবারের টেবিলে ব্যবহার করা হচ্ছে? কোন্‌টা সত্যি?

এ জীবনে তার আর কিছুই করণীয় নেই, কিছুই নেই। মাত্র একটিই আনন্দ, একটিই বাসনা অবশিষ্ট আছে তার। কেন মৃত্যুর আগে তাকে সেই আনন্দের পূর্ণ-স্বাদ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না?

অবশেষে, অনেকক্ষণ ধরে এই রকম অসহ্য এক খেলা দেখবার পর আমি নিজের ঘরে ফিরে আসি, শুয়ে পড়ি। আমি তখন দুঃখিত, ভীষণ দুঃখিত, দারুণ বিমর্ষ! .

একসময় জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বাইরে নিস্তব্ধ প্রকৃতি; শুধু কাছাকাছি কোথায় যেন একটা পাখি মিষ্টি সুরে ডেকে চলেছে। নিশ্চয় পাখিটা রাতভোর ডিম-এ তাঁ-দেওয়া তার সঙ্গিনীকে চাপা গলায় ডাকছে।

আর আমি ভাবছি পাঁচ-সন্তানের জনক আমার সেই হতভাগ্য বন্ধুর কথা, যে এতক্ষণে নিশ্চয় তার কুরূপা স্ত্রীকে পাশে নিয়ে মেতে উঠেছে।

ডট এ্যাণ্ড ক্যারি

Dot and carry

কী অদ্ভুত অতীতের সেই সমস্ত স্মৃতিগুলি, যা আমাদের মনকে বরাবর অধিকার করে রাখে এবং আমরা কখনো ভুলতে পারি না।

বর্তমান গল্পটি এত পুরনো, এত সুন্দর অতীতের যে, কেন এখনো আমি তাকে মনে গেঁথে রেখেছি, বুঝতে পারি না! জীবনে এরপর অনেক উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা ঘটতে দেখেছি, কিন্তু একটি দিনের জন্যও বৃদ্ধা ডট এ্যাণ্ড ক্যারির মুখাবয়বকে ভুলতে পারিনি; দূর অতীতে, যখন আমার বয়স ছিল দশ বারো বছর, তাকে যেমনটি দেখেছিলাম, আজও মনের পর্দায় তাকে ঠিক তেমনটিই দেখতে পাই।

সে ছিল বয়স-প্রাচীন মহিলা দর্জি; প্রতি মঙ্গলবার আমাদের বাড়িতে আসতো জামা-কাপড় সেলাই করতে। আমাদের বাড়িটা পুরনো হলেও চমৎকার ও বিশাল ছাদবিশিষ্ট, চারদিকে চার-পাঁচটি নির্ভরশীল খামার। স্থানীয় এলাকায় ছোট বড় গ্রাম ও শহর বেষ্টিত একটি গির্জাও আছে, সময়ের বিবর্তনে যার লাল ইঁটগুলি ক্রমশঃ কালচে বর্ণ ধারণ করেছে।

প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে ডট এ্যাণ্ড ক্যারি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হতো এবং সরাসরি উঠে যেত সেলাই-ঘরে তার কাজ শুরু করবার জন্য।

দীর্ঘাঙ্গি ও শীর্ণ এই মেয়েমানুষটির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বস্তু তার চুল, যা উপচে পড়তো তার কপালে, নাকে, মুখে। ঐ রকম এলোমেলো চুল তাকে যেন অনেকটা কোন পাগল অথবা পেটিকোট পরিহিত পুলিশের মতন দেখাতো; তার দীর্ঘ ও ঘন ভুরু দেখলে মনে হতো, বুঝি একজোড়া ধূসর-বর্ণ ইঁদুর বসে আছে।

সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতো ঠিকই, কিন্তু তার খোঁড়ানোটা ঠিক সাধারণ ছিল না; চলার ভঙ্গী দেখলে মনে হতো যেন একটা জাহাজ নোঙর করছে।...

বৃদ্ধা ডট এ্যাণ্ড ক্যারি আমাকে আকর্ষণ করতো। ঘুম থেকে উঠেই আমি বেয়ে নেমে তার ঘরে যেতাম। দেখতাম, বুড়ি মাথা হেঁট করে সেলাই করছে, পায়ের কাছে তার শরীর গরম রাখার জন্য গরম জলের পাত্র। আমাকে সে ঐ পাত্রের কাছেই বসাতো যাতে ঐ ঘরের অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা আমার কোন ক্ষতি না করতে পারে।

সরু লম্বা লম্বা আঙ্গুলে সেলাই করতে করতে সে আমাকে নানা রকম গল্প শোনাতো। চোখে তার বেশী পাওয়ারের চশমা, বয়সের বিবর্তনে দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ। যতদূর মনে পড়ে, সে আমাকে বাচ্চাদের উপযোগী সহজ-সরল গল্প শোনাতো। শহরে আজ কি ঘটেছে, বা কোন গরু অথবা কুকুরের মজাদার গল্প। কিন্তু সে এই সব সহজ গল্পগুলিই এমনভাবে বলতো যে আমার বুকের ভেতর আজও তারা সমানে বেজে চলেছে. অদ্ভুত এক কাব্যপ্রতীম পবিত্রতা ও রহস্যময়তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো।...

এই রকমই এক মঙ্গলবারের সারাটা সকাল আমি ডট এ্যাণ্ড ক্যারির গল্প শুনে কাটালাম।

তারপর সারাটা দিন ধরে মগজে সেই গল্পের অনুরণন। প্রতিটি গল্পকে মনে গেঁথে রেখে পরদিন আবার সিঁড়ি বেয়ে সেলাই-ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হই।

কিন্তু দরজা খোলা মাত্র একটা অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে পেলাম। বৃদ্ধা দর্জি তার চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে মেঝের ওপর. মুখ থুবড়ে আছে. এক হাতে তখনো আছে সূঁচ, অন্য হাতে আমার একটি জামা। নীল মোজা পরা তার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পাখানা চেয়ারের নীচে সেঁধিয়ে গেছে; এবং তার চশমাটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে দেয়ালের এক কোণে, সেখান থেকে চিক্ চিক্ করছে তার কাঁচ।

দারুন ভয় পেয়ে আমি ছুটে পালাই। ক্রমে দৌড়ে এলো অনেকেই এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি জানতে পারলাম. আমার প্রিয় গাল্পিক ডট এ্যাণ্ড ক্যারি আর জীবিত নেই!

আজ আমি ঠিক মতন ব্যাখ্যাও করতে পারবো না. কী দারুণ মানসিক বিপর্যয় ঘটেছিল আমার ঐ আকস্মিক দুর্ঘটনায়। এক বিশাল শোক ও শূন্যতা আমার ছোট বুকখানা অধিকার করে নেয়। ধীরে ধীরে আমি এক নিঃসঙ্গ অন্ধকার ঘরে ঢুকে একটি নরম সোফার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিই, দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলি। কাঁদতে থাকি বহুক্ষণ ধরে।

ক্রমে ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। কারা যেন ল্যাম্প হাতে এখানে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউই আমাকে লক্ষ্য করে না। হ্যাঁ. আমার বাবা ও মা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন। আলোচনা করছেন ডট এ্যাণ্ড ক্যারির মৃত্যু নিয়ে। আমি দমবন্ধ করে মৃতের মতন নিশ্চল, কান পেতে শুনছি ওদের প্রতিটি কথা। আজও আমি হুবহু তাদের কথা পর পর মনে করতে পারি।

"বড় ভাগ্যহীনা," ডাক্তার বললেন, "আমার প্রথম পেসেন্ট ছিল সে। আমি যেদিন এই শহরে পা দিলাম, সেই দিনই দুর্ঘটনায় তার একটা পা ভাঙে। হাত মুখ ধোবারও সময় ছিল না আমার। গিয়ে দেখলাম, সত্যিই অবস্থা গুরুতর।"

তার তখন বয়স হবে সতেরো। সত্যিকারের সুন্দরী যুবতী ছিল সে।...আমি এ গল্প এর আগে কাউকে বলিনি। আমি ছাড়া কেউ জানে না। আজ সে আর বেঁচে নেই। কাজেই কি হবে আর সেই গল্প চেপে রেখে?

সেই সময় এই শহরে একজন সহকারী স্কুল শিক্ষক এসেছিল। তার বয়স কম, চেহারাখানাও চমৎকার, মনে হয় যেন কোন সার্জেন্ট মেজর। দেখতে দেখতে শহরের সব মেয়েরা পিছু নিলো তার। কিন্তু বেচারি বেশী মাখামাখি করতে সাহস পেতো না, কারণ তার স্কুলের হেডমাষ্টার গ্রেবু এতটুকু বেচাল বরদাস্ত করতে পারতেন না। চরিত্রস্খলন হলে চাকুরি যাবে অনিবার্য।

গ্রেবুই কিন্তু তাঁর স্কুলে সেলাইয়ের কাজ শেখাবার জন্য সুন্দরী হরটেনস্কে নিযুক্ত করেছিলেন। এই হরটেনস্কেই সকলে আদর করে ডাকতো ডট এ্যাণ্ড ক্যারি বলে, যে এইমাত্র আপনাদের ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

তরুণ সহকারী স্কুল শিক্ষকটির নজর এসে পড়লো তরুণী হরটেনসের ওপর। দেখে মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না সে। পারস্পরিক মন দেওয়া-নেওয়ার পর্যায়ে তারা একদিন ঠিক করে, দিনের শেষে অন্ধকার ঘনালে তারা দু'জনে স্কুলের চিলে-কোঠায় গোপনে দেখা করবে।

সেই অনুযায়ী বাড়ি যাবার ভান দেখালেও ডট এ্যাণ্ড ক্যারি সেদিন স্কুলে থেকে যায় এবং সন্ধ্যা ঘনাতেই গুটি গুটি গিয়ে হাজির হয় স্কুল-বাড়ির চিলে-কোঠায়। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে তার প্রেমিকের। অল্প সময়ের মধ্যেই সে এলো এবং ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে, সে তাকে কত ভালোবাসে...হঠাৎ সেই চিলে-কোঠার দরজা খুলে যায় এবং অন্ধকারে এসে দাঁড়ায় স্বয়ং হেডমাষ্টার। জিজ্ঞেস করেন: 'এই অন্ধকারে কি করছো সিগিস্বার্ট?'

তরুণ শিক্ষক মনে করলো, আর বাঁচার কোন উপায় নেই, সে ধরা পড়ে গেছে। ভয়ে সে বোকার মতন বলে বসে: 'বিশ্রাম নিচ্ছিলাম মঁসিয়ে গ্রেবু।'

চিলে-কোঠাটি অনেক উঁচুতে, আয়তনে খুব বড় এবং ভীষণ অন্ধকার। আতঙ্কে সিগিস্বার্ট ধাক্কা দিয়ে মেয়েটিকে ঘরের কোণে সরিয়ে দেয়। চাপা স্বরে বলে, 'লুকিয়ে পড়ো, লুকোতে পারছো না?'

হেডমাষ্টার তার চাপা ফিস্ফিসানি শুনতে পেলেন এবং বললেন, 'তা হলে তুমি এখানে একা নও?'

'আমি এখানে একাই স্যার।'

'না তুমি একা নও। কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলে?"

'আমি শপথ করে বলছি মঁসিয়ে গ্রেবু।'

'ঠিক আছে, আমি এখনই খুঁজে বের ক'রছি' বলে হেডমাষ্টার দরজায় তালা এঁটে নীচে নেমে গেলেন মোমবাতি ধরিয়ে আনতে।

যুবকটি তখন ভয়ে কাঁপতে থাকে। সে দিশেহারা। ছুটে গেল যুবতীর কাছে, 'যেখানেই হোক লুকিয়ে থাকো, না হলে উনি আমাদের দেখে ফেলবেন আর তোমার জন্য সারাজীবন আমাকে উপবাসে কাটাতে হবে। তুমি আমার জীবনটাই নষ্ট করে দেবে...লুকিয়ে পড়ো।'

তারা শুনতে পেলো, দরজার তালা খুলছেন হেডমাষ্টার।

হরটেনস্ ছুটে গিয়ে ঐ ঘরের রাস্তার দিকে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ঘরে তার প্রেমিককে বলে, 'আমি ঝাঁপ দিচ্ছি। তিনি চলে যাবার পর অন্ততঃ আমাকে তুলে নিয়ে যেও।'

এবং একথা বলেই সে ঝাঁপ দিলো।

বৃদ্ধ গ্রেবু সেই ঘরে ঢুকে দ্বিতীয় কোন প্রাণীকে না দেখে খুবই অবাক হলেন।

এই ঘটনা ঘটবার পনেরো মিনিট বাদে সিগিস্‌বার্ট আমার কাছে আসে এবং ঘটনাটা খুলে বলে।

গিয়ে দেখি মেয়েটি তখনো আহত অবস্থায় দেয়ালের ধারে পড়ে আছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই, দো-তালা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়াতে তার পায়ের হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ। ডান পাখানাই জখম হয়েছে, তিন জায়গায় ভাঙা হাড় চামড়া ও মাংস ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কাপড়ে সাবধানে জড়িয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসা হলো। আশ্চর্য, কোন অভিযোগ নেই তার, অদ্ভুত সাহসিক সহনশীলতায় কেবল উচ্চারণ করছে: 'এই আমার শাস্তি। আমি আমার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছি।'

আমি তার বাপ-মাকে ডেকে পাঠালাম এবং মিথ্যা এক গল্প ফেঁদে বললাম, 'আমার বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এই মেয়েটিকে চাপা দিয়ে যায়।'

গল্পটি সকলেই বিশ্বাস করলো। গোটা মাস ধরে স্থানীয় পুলিশ মিথ্যাই খুঁজে বেড়ালো দুর্ঘটনার কারণ সেই গাড়িটিকে।

এই হচ্ছে সদ্যমৃতা মহিলার গোপন ইতিকথা। আমার ধারণা, ইতিহাসের নায়িকা হবার মতন যথেষ্ট গুণ তার ভেতরে ছিল।

এইটাই তার জীবনের একমাত্র প্রেমের ঘটনা। অত্যন্ত পবিত্রভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে। সে বীরাঙ্গনা, মহিয়সী, ভক্তিমতী নারী। এবং আমি যদি তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি না করতাম তবে এই গল্প কখনোই আপনাদের কাছে বলতাম না। তার জীবিতকালে যা চেপে রেখেছি, আজ তা প্রকাশ না করে পারলাম না।"

ডাক্তার থামলেন। মা যেন ককিয়ে উঠলেন। বাবা বিড় বিড় করে কি বললেন শুনতে পেলাম না। তাঁরা চলে গেলেন।

আমি তখন ঘাড় গুঁজে পড়ে আছি। একসময় শুনতে পেলাম অনেকের ভারি পদশব্দ এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

ওরা ডট এ্যাণ্ড ক্যারির প্রাণহীন দেহটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বিদায়

Farewell

দুই বন্ধু ডিনার খাচ্ছে। কাফের জানালা দিয়ে তারা দেখছে, পথের ধারে ধারে জনসমাগম। গ্রীষ্মের রাতে প্রবাহিত বাতাস ছুটে আসছে প্যারিসের বুক বেয়ে, আলতো পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর। এসময় মানুষের দৃষ্টি হয় উদাস, মন হয় যাযাবরী, বাসনা জাগে বহুদূরে চলে যেতে; নিজেকে বিছিয়ে দিতে সবুজ গাছের নীচে; কল্পনাবিলাসী মন এখন চন্দ্রালোকিত নদীকে স্বপ্নে পেতে চায়, কানে যেন বাজে নাইটিঙ্গেল পাখির গান।

দুই বন্ধুর একজন হেনরী সাইমন গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "হায়! আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! কষ্ট হয়। একসময়, এই রকম রাতে আমি অনুভব করতাম, আমার হাড়ে যেন শয়তানের বাস। আর আজ কেবলই হতাশা। আয়ু কত দ্রুত ছুটে চলে!"

তার শরীরে ইতিমধ্যেই চর্বি জমেছে, বয়স সম্ভবতঃ পঁয়তাল্লিশ, মাথায় বিশাল টাক।

অপর সঙ্গী পেরী কারনীর বয়সে আরো বড়, কিন্তু রোগা এবং হাসিখুশি; সে জবাব দেয়, "আমি কিন্তু বন্ধু খেয়ালই করিনি, কবে যৌবন হারিয়ে গেল! সব সময় দিল খোলা মেজাজে ছিলাম, সব কিছুই হাল্কাভাবে নিয়েছি। কিন্তু একটি লোক যদি রোজ আয়নায় নিজেকে দেখে, সে নিজের বয়সজনিত বিবর্তন ধরতেই পারবে না। বয়স তার ছাপ রাখে খুব ধীরে ধীরে ও ধারাবাহিকভাবে। এই জন্যই দু'-তিন বৎসরের ভয়াবহ পরিবর্তন সত্ত্বেও মানুষ শোকে মরা যায় না। এটা তার অনুভবের বাইরে। পরিবর্তনটুকু বুঝতে হলে তাকে অন্তত ছ' মাস নিজের মুখ দেখলে চলবে না—তারপর হঠাৎ একদিন নিজের প্রতিবিম্ব দেখে স্বয়ং আঁতকে উঠবে।

আর মেয়েদের কথা? এ ব্যাপারে ওদের কথা চিন্তা করলে আমার কষ্ট হয়! মেয়েদের যাবতীয় সুখ, শান্তি ও জীবন একান্তই নির্ভরশীল তাদের সৌন্দর্যের ওপর—যে সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব মাত্র দশ বৎসর।

যাক, আমি পঞ্চাশ বছর বয়স অব্দি এই পরিবর্তন নিয়ে এতটুকুও মাথা ঘামাইনি। নষ্ট যৌবনের জন্য আদৌ দুশ্চিন্তা ছিল না আমার। জীবন ছিল বেপরোয়া ও সুখপূর্ণ।

তারপর একদিন স্বাভাবিক অথচ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই পরিবর্তন আমি ধরতে পারলাম...আমি আমার সৌভাগ্যের দুয়ার থেকে বিদায় নিলাম সেদিন থেকেই।

সকলের মতন আমার জীবনেও প্রেম প্রায়শই এসেছে; কিন্তু একবারের অভিজ্ঞতা কিছুটা ভিন্নধর্মী।

যুদ্ধের কিছুকাল পর তার সঙ্গে আমার প্রথম মুলাকাৎ এতারতাতে সমুদ্র তীরে। আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে। সকালে স্নানের সময় ঐ সামুদ্রিক তীরভূমি আশ্চর্য সুন্দর। ঘোড়ার খুরের মতন বাঁকা সেই বেলাভূমি, সাদা ধবধবে পাহাড়ে সমুদ্রের কি বিশাল এক প্রবেশ পথের সৃষ্টি করেছে... মেয়েরা এই পাহাড়ের গা বেয়ে স্নানের পোশাক পরে সমুদ্রের জলে নেমে আসে। সূর্যের আলো পাথরের বুকে বিচ্ছুরিত, সবুজ নীল ঢেউয়ের মাথায় উজ্জ্বল ঝলকানি। চতুর্দিকে আনন্দ ও উল্লাস, প্রকৃতি যেন হাসছে। জলের ধারে গিয়ে বসলে সুন্দরীদের স্নান দেখা যায়। কিন্তু ঐ ঢালু জায়গায় নেমে স্নান করা বেশ দুরূহ। এর জন্য আলাদা এলেম থাকা দরকার। ঢেউয়ের উত্থান পতনে সুন্দরীদের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভীষণ ঠাণ্ডা লোনা জলের তলায় তাদের পায়ের ডিম থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত দেখা যায়।

আমি প্রথম ঐ জলের মধ্যে যুবতীটিকে আবিষ্কার করেছিলাম এবং তার শারীরিক লালিত্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। সে দাঁড়িয়েছিল বিজয়িনীর ভঙ্গীতে। এই এক নারী, যার জন্মই বুঝি ভালোবাসা আদায়ের জন্য। মুহূর্তে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে, আমি আবেগে আপ্লুত।

তার সঙ্গে পরিচিত হলাম। এতখানি অভিভূত এর আগে কখনো হইনি। আমার সমস্ত মন জুড়ে রইল সে। একজন নারীর কাছে এভাবে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে ভয়ঙ্কর ও গৌরবপূর্ণ অভিজ্ঞতা হলো আমার! এটা এক ধরনের কষ্ট, আবার উত্তেজনাপূর্ণ সুখও বটে, তার চাউনি, তার চাপা হাসি, তার বাতাস-কাঁপা চুলের গুচ্ছ, তার মুখের প্রতিটি সূক্ষ্ম কারুকার্য সব সময় আমার মনকে অধিকার করে থাকে, আমাকে পাগল করে।...কোন আসবাবপত্রের ওপর রাখা তার অবগুণ্ঠনটি দেখলে আমার বুকের রক্ত উত্তাল হ'য়ে ওঠে, হাতলওয়ালা চেয়ারের ওপর তার দস্তানাজোড়া নজরে এলে আমি স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকি। মনে হয়, তার পোশাক-আশাকও যেন অনুকরণীয়। কোন স্ত্রীলোকের টুপি দেখে আমি কখনো অতখানি উল্লসিত হই না।

সে বিবাহিতা। কিন্তু তার স্বামী প্রতি শনিবার আসেন এবং সোমবার ফিরে যান। আমি ঐ ভদ্রলোক সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার। আদৌ ঈর্ষান্বিত নই; ঠিক বলতে পারবো না কেন। কোন মানুষকে আমার কখনো অত কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

আর আমি কী প্রেমেই না পড়েছিলাম! সে যে অপূর্ব সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না যুবতী! তার অঢেল যৌবন, লালিত্য এবং পরিচ্ছন্ন স্বকীয়তা! তার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে আমি কখনো ভাবিনি, নারী এতখানি আকর্ষণীয়া ও আনন্দদায়িনী হতে পারে।...

আমার এমন অবস্থা মাস তিনেক স্থায়ী হয়েছিল। তারপর চলে গেলাম অ্যামেরিকায়। মন দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে। তাকে আমি ভুলতে পারিনি, শয়নে-স্বপনে সে তখনো আমার ওপর রাজত্ব করছে। বছরের পর বছর কেটে যায়। আমি কিন্তু তাকে ভুলিনি। তার সেই প্রতিমূর্তি তখনো অম্লান। নীরব প্রেমে আমি সমান বিশ্বস্ত।

বারোটা বছর একটি মানুষের জীবনে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। সে তাদের পা'র হয়ে যাওয়াটা অনুভবই করতে পারে না। একের পর এক তারা অতীত হয়ে যায়,—ধীরে ও দ্রুততায়, নীরবে ও সোচ্চারে, সুদীর্ঘ ও খুবই হ্রস্ব!...

মনে হলো, যেন মাত্র কয়েক মাস যাবৎ আমরা একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে আছি। এতারতাতের সমুদ্রের তীর যেন এই সেদিনের ঘটনা!

গত বসন্তে জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে ম্যাস্‌নস্‌ লাফিত্তিতে খানা-পিনা করতে গিয়েছিলাম।

ট্রেন চলতে শুরু করা মাত্র একজন স্বাস্থ্যবতী মহিলা আমার কামরায় চারটি ছোট ছোট মেয়ে সহ্ উঠে পড়লেন। আমি ঐ ছানাপোনা সহ 'মুরগীমাতা'র দিকে ভ্রূক্ষেপও করিনি।

এস্‌নিরসের মধ্য দিয়ে গাড়িটা ছুটে চলার সময় আমার সেই সঙ্গিনী প্রথম মুখ খুললেন, 'মাপ্ করবেন, আপনিই কি মঁসিয়ে কারনীর নন?'

'হ্যাঁ, মাদাম।'

শুনে তিনি হেসে উঠলেন। সামান্য বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগা খুশির হাসি।

'আমাকে চিনতে পারছো না?'

আমাকে দ্বিধায় পেয়ে বসে। নিশ্চিত একে কোথাও দেখেছি; কিন্তু কোথায়? কখন?

'হ্যাঁ...কিন্তু না...', আমি আমতা আগতা করতে থাকি, 'দেখেছি ঠিকই, কিন্তু নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না।'

সে সামান্য লজ্জারুণ হয়; বলে, 'মাদাম জুলি লেফেব্রিকে মনে আছে?'

কখনো জীবনে অতবড় আঘাত আমি পাইনি। একলহমায় মনে হলো, আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। মনে হলো, যেন একখণ্ড অবগুণ্ঠন আমার চোখের সামনে ছিঁড়ে ফেলা হলো। আমি আবিষ্কার করছি কোন ভয়াবহ ও মর্মান্তিক সত্যকে।

এই সে! এই চর্বিবহুল সাধারণ মহিলা সে? এবং এরই মধ্যে সে চারটি কন্যার জন্ম দিয়েছে? তারই শরীর থেকে বেরিয়ে-আসা চারটি মেয়ে, যারা ইতিমধ্যেই বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। অথচ, এখনো মনে হচ্ছে, আমি যেন তাকে গতকালও দেখেছি। এমন বিরাট পরিবর্তন কি ভাবে সম্ভব! বিশাল দুঃখময় শূন্যতা আমাকে কুরে কুরে খায়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিমান পুঞ্জিভূত হ'য়ে ওঠে।

হতবাক হ'য়ে তার দিকে চেয়ে থাকি। তারপর তার হাত ধরি এবং আমার চোখ সজল হ'য়ে'ওঠে। আমি তার নিহত যৌবনের বেদনায় মুহ্যমান। আমি যে এই চর্বিসার মহিলাকে চিনি।

সেও যথেষ্ট অভিভূত, 'আমি অনেক বদলে গেছি, তাই নয়? কিন্তু সময় বয়ে যায়, তাই নয়? দেখছো তো, আমি কেমন মা হয়েছি, শুধুমাত্র মা, যথার্থ জননী। আর কিছুই সত্যি নয়, সবকিছুই ফুরিয়ে গেছে। ইস্! আমি ভেবেছিলাম, কোনদিন দেখা হলে তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আর তোমারও তো অনেক পরিবর্তন

হয়েছে। তোমাকে ঠিক মতন চিনতে অনেকটা সময় লেগেছিল! তোমার চুল একদম সাদা হ'য়ে গেছে। কম কথা! বারো বছর আগের কথা। বারোটা বছর! আমার বড় মেয়ের বয়সই হ'ল দশ বছর।'

আমি তার বড় মেয়েটির দিকে তাকাই। তার মার যৌবনকালীন সৌন্দর্য যেন কিছুটা পেয়েছে সে, যদিও সেই রূপ এখনো অপরিণত। জীবন যেন এই ধাবমান ট্রেনের মতন দ্রুতগামী।

ম্যাস্‌নস্‌ লাফিতিতে নামলাম আমরা। বিদায় লগ্নে পুরনো বান্ধবীর হাতে চুম্বন করি। কোন কথা নেই মুখে। আমার গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না।

তারপর রাত্রে নিজের ঘরে একাকী আয়নার সামনে দাঁড়াই। দীর্ঘ—দীর্ঘক্ষণ নিজের বর্তমান প্রতিরূপের দিকে চেয়ে থাকি। এখন বুঝতে পারছি, আমি কি ছিলাম, আর এখন কি হয়েছি। কোথায় গেল আমার ধূসর রঙ গোঁফ ও কালো চুল এবং আমার যৌবনদীপ্ত মুখমণ্ডল। এখন আমি প্রকৃতই বৃদ্ধ। বিদায়।

স্মৃতি

A memory

সূর্যের কচি আলোর নীচে দাঁড়িয়ে যৌবনের কত কথাই না মনে পড়ে। যৌবন এমন একটা সময়, যখন সব কিছুকেই সুন্দর, সুখকর, আনন্দদায়ক ও উত্তেজনাপূর্ণ মনে হয়। বিগত বসন্তের ইত্যাকার স্মৃতিগুলি কী বিস্ময়কর!

হে আমার পুরনো বন্ধুরা, ভাইয়েরা, তোমরা কি অতীতের সেইসব বিজয়ী ও উজ্জ্বল দিনগুলিকে মনে করো না? তোমাদের মনে আসে না, কি ভাবে আমরা প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম? স্মরণ নেই আমাদের অভাবের কথা? মনে কি পড়ে না, আমরা কেমন ভেজা বন-পথে ঘুরতাম, কেমন মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দম নিতাম অথবা কেমন সীন্‌ নদীর ধারে পায়চারি করতাম? এবং আমাদের বিচিত্র উজ্জ্বল প্রেমের জন্য দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানা?

আমি সেই সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার একটিকে আজ বর্ণনা করবো। বারো বছর আগের কথা।

কিন্তু এরই মধ্যে ব্যাপারটা এত সুদূর অতীতের মনে হচ্ছে যেন তা ঘটেছিল আমার জীবনের আর এক প্রান্তে এবং জীবনের যাত্রাপথে কত দ্রুত শেষ হ'য়ে গেল!

বয়স তখন পঁচিশ। সবে প্যারিসে এসেছি। কাজ করি এক সরকারী অফিসে। রবিবারগুলিকে অসাধারণ উৎসবের দিন বলে অনুভব করি। সেই দিনগুলি আমার উদ্দাম আনন্দের লগ্ন, যদিও উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা কদাচিৎই ঘটে।

ঐ বিশেষ দিনে আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে আসি, আর পাঁচজন কেরাণীর মতন মন তখন মুক্তির স্বাদ নিচ্ছে। জানালা খুলে প্রত্যক্ষ করি মনোরম আবহাওয়াকে। পরিষ্কার নীল আকাশ শহরের মাথার ওপর বিছিয়ে রয়েছে, সর্বত্র রৌদ্রের ঝিকিমিকি।

খুব তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বেরিয়ে আসি বাইরে; বনভূমিতে দিনটা কাটাতে উৎসুক, সবুজ পাতার ঘ্রাণ নেবার জন্য মন ব্যাকুল; কারণ আমার জন্ম গ্রামে এবং শৈশব কাটিয়েছি ঘাসের ওপর সবুজ ঘাসের নীচে।

আলো ও উষ্ণতায় মাখামাখি প্যারিস জেগে উঠছে খুশিতে। প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি লোকের চোখে-মুখে উৎসবের, ব্যস্ততার আনন্দ।

আমি 'সোয়ালো' বোটে চেপে সেন্ট-ক্লাউড যাবো বলে সীন্ নদীর ধারে পৌঁছে যাই। তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে বোটের জন্য প্রতীক্ষা করা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মনে হয়, আমি বুঝি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এক নতুন দেশে দাঁড়িয়ে আছি। ক্রমশ দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে একটি ছোট্ট বোট, দ্বিতীয় ব্রিজটা পার হচ্ছে ভক্ ভক্ ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করে, যত কাছে এগিয়ে আসে ততই তার অবয়ব বৃদ্ধি পায়।

আমি ওর দিকে এগিয়ে আসি।

ইতিমধ্যেই বোটের পাটাতনে রবিবাসরীয় পোশাক পরে একদল নর-নারী খুশিতে ডগমগ। আমি বোটের এক কিনারে গিয়ে দাঁড়াই, চোখ মেলে দেখতে থাকি—তীরে বৃক্ষের শ্রেণী, বহুদূরে সারি সারি বাড়ি এবং নদীর ওপর দাঁড়ানো পুল।

দুটি দ্বীপের মধ্য দিয়ে 'সোয়ালো' পার হ'য়ে যাবার পর ঢালু বাঁক-মুখ দেখতে পেলাম, যার সবুজ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলি সাদা বাড়ি। কে একজন ঘোষণা করে: "বাস-মিউডন"; তারপর আবার শোনা যায়, "সেভ্‌রেস্" এবং তারপর উচ্চারিত হয় "সেন্ট-ক্লাউড।"

বোট থেকে নেমে পরি। চটপট ছোট্ট শহরটার পথ ধরে বনভূমিতে প্রবেশ করি। আমার সঙ্গে প্যারিসের আশ-পাশ অঞ্চলের একখানা মানচিত্র রয়েছে। পথ হারিয়ে যাবার উপায় নেই। এই বনাঞ্চলেই প্যারির লোকেরা আনন্দ অভিযান করতে আসে।

ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে পথটাকে পরখ করি। মানচিত্র মিলিয়ে ভাবলাম, সহজ পথ। আমাকে প্রথমে যেতে হবে ডান দিকে, তারপর বাঁ দিকে, তারপর আমার বাঁ দিকে এবং এইভাবে ভার্সাইতে রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবো, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করবো।

খুব আস্তে আস্তে পা চালাচ্ছি, পায়ের তলায় তাজা সবুজ পাতা, বুক ভরে নিই বিশুদ্ধ বাতাস, বাতাসে ফুলের গন্ধ। ছোট ছোট পা ফেলে চলেছি, মন ভাবনাশূন্য—পুরনো কাগজে কি লিখেছিল, এখন ভাবি না; ভাবি না আমার অফিসের কথা। অফিসের বড়কর্তা সহকর্মীদের বিলকুল ভুলে গেছি। লাল ফিতায় বাঁধা ফাইল-পত্তরের জন্য এখন আমার আদৌ মাথাব্যথা নেই। মনে আমার ঘুরপাক খায় যতসব রোমাঞ্চকর সুখস্বপ্ন, যা নিশ্চয় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে নিকট ভবিষ্যতে। আমার ভেতরে জেগে উঠছে ছেলেবেলার হাজারো স্মৃতি। সেই স্মৃতি ও স্বপ্ন বুকে

নিয়ে আমি হাঁটছি—হাঁটছি, সুন্দর আরণ্যক রাজ্যের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সর্বাঙ্গে মেখে নিয়ে চলছে আমার মন্থর পদচারণা। গাছ-গাছালির মাথায় জুন মাসের তেজী সূর্যের অকৃপণ আলো।

কখনো কখনো বসে পড়ি এবং চারদিকে ফুটে-থাকা নানা জাতের ছোট ছোট ফুলগুলিকে দেখি। ওদের নাম আমি অনেক আগে জানতাম। আজ আবার সহসা তাদের নামগুলি মনে করতে পারছি, যেন আমি আমার ছেলেবেলা ফিরে পেয়েছি এবং বুঝি আমাদের গ্রামে বসে আছি। কত রকমের রঙ ওদের—হলুদ, লাল, বেগনী, গোলাপী, সাদা!...কোন কোনটি মাথা উঁচু করে আছে, কোন কোনটি আবার প্রায় মাটির বুকেই ফুটে রয়েছে...

আমি কিছুক্ষণ ঐ প্রকৃতির রাজ্যে একটি ঝোপের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙলে আবার চলতে শুরু করি। ঘুম আমার শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছে।...

আমার দৃষ্টির সামনে শূন্য দীর্ঘ পথ। পথের দু'ধারে এই একই বন্য শোভা।...হঠাৎ দেখলাম, পথের প্রান্তে দুটি প্রাণী নড়ে-চড়ে উঠলো,—একজন পুরুষ, অপরজন নারী; ওরা আসছে আমারই দিকে। এতক্ষণ বেশ ছিলাম নির্জনতায়। মানুষ দেখে মেজাজে খিচ্ ধরে গেল। আমি ওদের দৃষ্টির বাইরে সরে যেতে চাইলাম। কিন্তু তার আগেই মনে হলো, ওরা যেন আমায় ডাকছে।

নারী তার ছাতা নাড়ায় এবং পুরুষটি একহাতে তাঁর কোট নাড়িয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি তাদের কাছাকাছি চলে আসি। তাদের হাঁটা-চলায় পরিষ্কার অসন্তোষ, মুখ-চোখ লাল, যুবতী হাঁটছে ছোট ছোট পদক্ষেপে, আর লোকটি হাঁটছে বড় বড় পা ফেলে।

মহিলাটি আমাকে জিজ্ঞেস করে, "মশাই, বলতে পারেন, আমরা এখন কোথায় আছি? আমার মাথামোটা স্বামীটি পথ ভুল করেছেন, যদিও আগে দাবী করেছিলেন, এই জেলাটি নাকি ওর নখ-দর্পণে।"

"মাদাম" আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, "আপনারা যাচ্ছেন সেন্ট ক্লাউডের দিকে। আর আমাদেব পিছনে রয়েছে ভার্সাই।"

"এ্যা।" রাগে-দুঃখে মহিলাটি তার স্বামীর ওপর খড়্গহস্ত হ'য়ে ওঠে, "ভার্সাই আমাদের পিছনে? অথচ আমরা ওখানেই ডিনার খাবার পরিকল্পনা করছিলাম।"

"মাদাম, আমিও তো ওখানেই যাচ্ছি।"

"তাই নাকি? বড় ভালো হলো, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার যে কী ভালো হলো!"—সে বার বার আবেগমধুর গলায় উচ্চারণ করে।

আমি দেখছি, তার যৌবন ভরন্ত, যথেষ্ট সুন্দরী, চোখের তারা কালো, চুল কালো, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের জন্য ঠোঁটের উপর একটা কালো গোঁফের রেখা লক্ষণীয়।

লোকটি বিব্রত, মোটা ভুরু চুলকাচ্ছে। নিঃসন্দেহে প্যারিসে তাদের ব্যবসা আছে।...লোকটি ইতি উতি তাকায়, তাকে ক্লান্ত ও করুণ দেখাচ্ছে।

"কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো তুমি—" কাঁপা স্বরে স্বামী বেচারি স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওকে কথা শেষ করার সুযোগ দেয় না মহিলা, কলকলিয়ে ওঠে, "হ্যাঁ, আমি!...হ্যাঁ, এখন আমার ওপর দোষ চাপানো হচ্ছে! না জেনে শুনে নিজেকে সবজান্তা বলে জাহির করা! আমি কি ঐ পাহাড়টার দিকে যেতে যেতে বলেছিলাম, এই পথ-ঘাট আমার চেনা? আমিই কি বলেছিলাম—"

মেয়েমানুষটাও তার কথা শেষ করতে পারে না, ওর বকবকানিতে স্বামীর চূড়ান্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, আচমকা সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে—এমন এক বন্য, হিংস্র চীৎকার, যাকে কোন ভাষায় লেখা যায় না, শব্দটা হয়েছিল অনেকটা এই রকম—"তো-তো-কে—"

চীৎকার, গর্জন, হুমকি যত জোরেই উঠুক না কেন যুবতীটি কিন্তু বিন্দুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত বোধ করে না। সে সমানে আক্রমণ করে চলে, "হ্যাঁ, কিছু বাক্যবাগিশ ফাজিল লোক এই দুনিয়ায় আছে, যারা সব সময়ই সবজান্তার ভান করে। গত বছর কি আমি হ্যাভার ট্রেনের বদলে ডেপ্পির ট্রেনে উঠে বসেছিলাম? কি বলো, আমিই কি সেই ভুল করেছিলাম?... আমিই কি বিশ্বাস করিনি, সেলিস্ত একজন চোর?..."

মহিলা ক্ষিপ্ত হ'য়ে সমানে বক বক করতে থাকে, কথা বলার তোড়ও অসাধারণ, অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত আক্রমণ শানাতে থাকে সে; স্বামীর প্রতিটি কাজের সে খুঁত খুঁজে পাচ্ছে—সে যেন এ যাবৎ যা করেছে, সবই ভুল ও বোকামিতে পরিপূর্ণ। বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত স্ত্রীর জীবন তার প্রতিটি কাজে ও সিদ্ধান্তে যেন বিষময় হয়ে উঠেছে।

ভদ্রলোক আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার স্ত্রীকে সামলাতে, অনেকটা তোষামোদের স্বরে বলে, "এই শোন, লক্ষ্মীটি ও সব কথা এখন বলে কি লাভ...বিশেষতঃ একজন ভদ্রলোকের সামনে—আমাদের এভাবে আচরণ করা উচিত নয়। ভদ্রলোক আসলে এ সবে মাথা ঘামাবেন কেন?"

লোকটি তার করুণ চোখ তুলে চারদিকের সবুজ প্রকৃতির দিকে তাকায়; যেন ঐ শান্ত সমাহিত-গাম্ভীর্য সে প্রার্থনা করছে নিজের প্রগল্‌ভা স্ত্রীর জন্য। অথবা সে বুঝি এই লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেতে আশ্রয় চায় ঐ আরণ্যক গভীরতায়। কিন্তু তার স্ত্রী এতটুকুও সংযত হয় না। ফলে লোকটার গলা চিরে ঠেলে বের হ'য়ে আসে আবার সেই বন্য চীৎকার: 'তো-তো-কে...' একবার নয়, বেশ কয়েকবার থেকে থেকে ধ্বনিত হয় এই চীৎকার।

বুঝতে পারি, এটা তার ভয় ও স্নায়ুজর্জরতার ফলশ্রুতি মাত্র। বর্তমানে অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। যুবতী মহিলাটি হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে চকিতে স্বর মোলায়েম করে বলে, "আমাদের যদি আপনার সঙ্গে যাবার অনুমতি দেন, তবে বড় ভালো হয়

তা হলে আর পথ ভুল হবে না, আমাদেরও বনে রাত কাটাবার ঝুঁকি নিতে হয় না।”

আমি মাথা হেঁট করে সম্মতি জানাই।

যুবতী খুশিতে আমার হাত ধরে এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে হাজারটা প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে—তার নিজের প্রসঙ্গ, তার জীবন, কেমন তার পরিবার, কেমন চলছে তার ব্যবসা ইত্যাদি।

স্বামী বেচারি আসছে গুটি গুটি আমাদের পিছন পিছন, বুনো চোখে তাকাতে থাকে ঘন বনের দিকে এবং মানসিক অস্থিরতায় থেকে থেকে উচ্চারণ করছে সেই অস্বাভাবিক শব্দ: “তো-তো-কে—”

অবশেষে আমি তাকে না জিজ্ঞেস করে পারি না, “ও রকম শব্দ করছেন কেন?”

সে চমকে জবাব দেয়, “আমার হারিয়ে যাওয়া কুকুরটিকে ঐভাবে ডাকতাম।”

“তার মানে? আপনার কুকুর হারিয়েছে নাকি?”

“হ্যাঁ। কুকুরটার বয়স ছিল বড় জোর এক বছর। সে কখনো দোকানের বাইরে বের হতো না। আমি তাকে বনে বেড়াতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। সে এর আগে কখনো ঘাস বা পাতা দেখেনি, এখন দেখে তার মাথা বিগড়ে যায়। সে ছুটতে শুরু করে, ডাকতে থাকে এবং ডাকতে ডাকতে বনে হারিয়ে যায়। আমার মনে হয় আসবার সময় রেলগাড়ি দেখেও সে খুব ভয় পেয়েছিল। এটাও তাকে বিভ্রান্ত করে। আমি তাকে ডাকছি, বৃথাই ডাকছি। সে এলো না। না খেয়ে মরবে কুকুরটা।”

স্বামীর দিকে না ফিরে মেয়েটি বলে, “কুকুরটাকে একটু স্বাধীনতা দিয়ে পুষলে ওটা এভাবে হারিয়ে যেত না। তোমার মতন অকর্মণ্য লোকরাই এমন করে কুকুর আলগায়।”

“কিন্তু লক্ষ্মীটি, এ ব্যাপারে তুমি—”

কথা শেষ হয় না। যুবতীটি দাঁড়িয়ে এমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার স্বামীর দিকে ঘুরে তাকায়, যেন সে তাকে গিলে খাবে। আবার শুরু হয় ওর অবিশ্রান্ত আক্রমণ।

রাত ঘনিয়ে আসছে। যামিনী তার পর্দা সরিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। কেমন একধরনের পুলক ও রোমাঞ্চ চারপাশে পাক খায়; গোটা বনভূমির ওপর নেমে এসেছে মধুর হিম।

হঠাৎ লোকটা থমকে দাঁড়ায়, কেঁপে ওঠে তার শরীর। বলে, “ওহ! আমার বিশ্বাস, আমি পেয়েছি...”

স্ত্রীলোকটি তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, “বটে, কি পেয়েছো?”

“আমার এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না, আমারই হাতে ঝুলছে আমার ফ্রককোটটা।”

“তাই নাকি?”

“আমি আমার খামটা হারিয়ে ফেলেছি...টাকা রয়েছে ওতে।”

ভদ্রমহিলার শরীর রাগে রি-রি করে ওঠে।

"কি বোকা! মাথায় যদি একবিন্দু ঘিলু থাকতো। আমি কি করে এমন একটি গর্দভচন্দ্রকে বিয়ে করেছিলাম? আচ্ছা যাও, ওটা খুঁজে বের করো; আর যদি পাও তো যত্ন করে রেখো। আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই ভার্সাই যেতে পারবো। এই বনে রাত কাটাতে পারবো না।"

"তাই হোক সোনা" মিনমিনে গলায় লোকটা বলে, "কোথায় তোমার সাথে দেখা হবে?"

আমি একটা রেস্টুরেন্টের নাম জানতাম। লোকটিকে তারই নাম বলে দিলাম।

স্বামীটি ঘুরে উল্টো মুখে চলতে থাকে। তার মাথা হেঁট। অনবরত বিচিত্র আওয়াজ, "তো-তো-কে...।" চলবার গতি শ্লথ। দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে যেতে অনেকটা সময় নেয়।

আমরা দেখতে পাই, রাতের অন্ধকারে পথের প্রান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে লোকটির দেহ। তার কোন চিহ্নই আর নেই। কিন্তু বহুক্ষণ ধরে বাতাসে ভেসে আসতে থাকে করুণ সেই আওয়াজ "তো-তো-কে...।" আমি বেশ তাজা ও খুশি। আবছা অন্ধকারে অপূর্ব মাধুর্য তথা উন্মাদনা; উন্মাদনার আরো কারণ, একটি অজানা যুবতীর হাত আমার হাতে। আমি আমার মগজকে শান্ত রাখবার চেষ্টা করছি। পারছি না। আমি চুপচাপ, উত্তেজিত ও প্রত্যাশায় উন্মুখ।

কিন্তু হঠাৎ একটা উঁচু পথ দেখতে পেলাম আমাদের রাস্তাকে চিরে অন্য ধারে বেরিয়ে যেতে। এরই দক্ষিণদিকে উপত্যকায় গড়ে উঠেছে একটি শহর।

"এই শহরটার নাম কি?"

একটি লোক আমাদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে এই শহরের নাম জিজ্ঞেস করলাম।

"বুগিভ্যাল'—সে উত্তর দেয়।

আমি নামটা শুনে বজ্রাহত।

"বুগিভ্যাল! ঠিক বলছেন তো?"

"ধ্যাৎ মশাই! আমি এখানে বাস করি।"

যুবতীটি খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আমি তখন বললাম, "একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে ভার্সাইতে আপনাকে পৌঁছে দেবো।"

"না মোটেই না।" সে বলে ওঠে, "ব্যাপারটা খুব মজার মনে হচ্ছে। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। আমি আদৌ চিন্তিত নই। আর আমার স্বামী নিজের পথ ঠিকই খুঁজে নেবে। বরং আমি যদি ঘণ্টা কয়েকের জন্য ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে পারি, হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো।"

সুতরাং আমরা নদীর ধারে একটি রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলাম। সাহস পেয়ে আমি একটি আলাদা ঘরেরও বন্দোবস্ত করেছিলাম।

আজও আমি বলতে পারি, সেদিন ঐ ঘরে ঢুকে মেয়েটি আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিল। মদের ঘোরে নাচলো, গাইলো, শ্যাম্পেনে হাবুডুবু খেলো। নেশার তাগিদে শুরু হলো তার বেলেল্লাপনা। বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত হলো সেই রাত্রে।

জীবনে আমি সেই প্রথম যৌবনের তাড়নায় নষ্ট হ'য়ে গেলাম!

সন্তান

The Little one

মঁসিয়ে লেঁমোনীর একটি সন্তান সহ বিপত্নীক রয়ে গেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বড় ভালোবাসতেন। তাঁর সেই ভালোবাসায় ছিল আভিজাত্যবোধ, ছিল রঙিন মাধুরী, যা কখনো পুরনো হয়নি, ব্যর্থ হয়নি। তিক্ততাহীন প্রেমপূর্ণ জীবন কাটিয়ে দিলেন তাঁরা একসঙ্গে। মানুষ হিসেবে মঁসিয়ে লেঁমোনীর শান্ত, সৎ, সহজ, অত্যন্ত সরল—সাতে নেই পাঁচে নেই, পেটে নেই কোন জটিল প্যাঁচ।

যৌবনে গরীব প্রতিবেশী-কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন, বিয়েও করেছিলেন। তার তখন ব্যবসায় উঠতির মুখ, বৃহস্পতি তুঙ্গে, কাড়ি কাড়ি টাকা আসছে। কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে সন্দেহ দোলা দেয়নি,—মেয়েটি তাকে ভালোবাসে, না ভালোবাসে এই টাকার স্তূপকে?

স্ত্রী তাঁকে সব সময় খুশি রেখেছে। তিনিও স্ত্রী বলতে অজ্ঞান, আর কারুর দিকে নজর দেবার সময় নেই তাঁর। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে তখন বসন্ত-উৎসব। স্ত্রীর মুখপানে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, চোখে চোখ, প্রেম-পূজারীর চোখের পলক পড়ে না। এমন কি, খাবার টেবিলে বসেও সেই বিহ্বলতা কমে না, সেখানে তাঁর হাজারটা ভুল হয়, তবু প্রিয়ার মুখ-চন্দ্রিমা দর্শন থেকে বিরত হন না। একভাবে চেয়ে থাকার দরুণ প্রায়ই খাবার ডিশে মদ ঢেলে ফেলেন এবং নুনের পাত্রে ঢেলে দেন জল; তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজেই শিশুর মতো হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়েন:

"তোমার প্রতি আমার অস্বাভাবিক প্রেমের পরিণতি কি দেখো; কত রকমের ভুল যে করছি!"

স্ত্রীর মুখে স্মিত হাসি, এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে নেয় যেন স্বামীর এরকম প্রেম-নিবেদনে সে বিশেষ বিব্রত; স্বামীকে অন্য প্রসঙ্গে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভদ্রলোক তাকে ছাড়েন না, হাত ধরে কাছে টেনে আনেন। আবেগ আশ্লেষে বলেন, "আমার ছোট্ট জেনী, আমার ছোট্ট জেনী!"

জেনী তাকে সংযত করবার চেষ্টা করে, "ইস্, এখন এ সবের সময় নয়। তুমি নিজের খাবার খাও, আমাকেও আমার খাবারের থালা নিয়ে বসতে দাও।"

লেঁমোনীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, রুটির টুকরো ছিঁড়ে মুখে পোরেন।

পাঁচটি বছর তাঁদের কোন সন্তান ছিল না। তারপর একদিন জানা গেল, জেনী মা হতে চলেছে। আনন্দে আপ্লুত হলেন দম্পতি। অন্তসত্ত্বাকালে লেঁমোনীর এক মুহূর্তের জন্য তার স্ত্রীকে ছেড়ে থাকতে চাইতেন না, সব সময় কাছে কাছে ঘুর ঘুর করতেন; শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হলো যে, সময় সময় জেনীর বুড়ি নার্স একরকম জোর করে ভদ্রলোককে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিতেন।

লেঁমোনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এক যুবক, নাম মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুর। জেনীর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল। প্রিফেকচারের এক অফিসের দ্বিতীয় বড়বাবু ছিলেন তিনি। লেঁমোনীর বাড়িতে সপ্তাহে অন্ততঃ তিনবার ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ থাকতো তাঁর, যখনই যেতেন মাদামের জন্য ফুল থাকতো তাঁর সঙ্গে, কখনো কখনো থিয়েটারের টিকিট কেটেও নিয়ে যেতেন; লেঁমোনীর প্রায়ই আবেগে তাঁর স্ত্রীকে বলতেন, "তোমার মতো স্ত্রী আর ডুরেঁট্যুরের মতো বন্ধু যার আছে, সেই তো এই পৃথিবীর প্রকৃত সুখীজন।"

সেই জেনী বাচ্চার জন্ম দিয়েই মারা গেল। শোকে লেঁমোনীরও মারা যেতেন হয়তো। শুধু নবজাতকের মুখের দিকে চেয়ে বুক বাঁধলেন। ছোট্ট শিশুর মায়া তাঁকে এই পৃথিবীতে আটকে রাখলো। অদ্ভুত এক আবেগ ও বিষণ্ন ভালোবাসা তাঁকে অধিকার করে। ঐ শিশু একদিকে যেমন তাঁর প্রিয়ার মৃত্যুকে স্মরণ করায়, অন্যদিকে তার জীবন্ত স্মৃতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই শিশুটি তারই স্ত্রীর শরীর দিয়ে গঠিত, তারই রক্ত-মাংস-মেদের বুঝি জীবন্ত প্রতিভূ। যেন জেনীর প্রাণ অন্য একটি দেহে সঞ্চারিত হয়েছে মাত্র। জেনী মরেনি, বেঁচে রয়েছে এই শিশুর মধ্যে...ভাবতে ভাবতে আবেগে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন লেঁমোনীর।

কিন্তু—কিন্তু এ কথাও সত্যি, এই শিশু তার মাকে খুন করেছে, তার প্রাণ চুরি করেছে। মঁসিয়ে লেঁমোনীর তাঁর ছেলেকে সামনে বসিয়ে তাকিয়ে থাকেন, এই সব ভাবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন চলে, কখনো তাঁর মন বিষাদপূর্ণ। কখনো মধুর স্বপ্নময়। তারপর শিশু ঘুমিয়ে পড়লে তিনি নীচু হয়ে ওর গণ্ডদেশ স্পর্শ করেন, ওর শরীর ঢেকে দেন।..

শিশুটি বড় হয়। তার বাবা এক ঘণ্টার জন্যও দূরে থাকতে পারেন না। নার্স থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের হাতে ওর যত্ন করেন, বেড়াতে নিয়ে যান, পোশাক পরিয়ে দেন, স্নান করান, স্বয়ং খাইয়ে দেন।

তাঁর বন্ধু মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুরও বাচ্চাটিকে খুব ভালোবাসেন, প্রায় যেন অপত্য স্নেহে ওকে বুকে আঁকড়ে রাখেন। কখনো কখনো হাতের ওপর বসিয়ে নাচান, কখনো নিজে ঘোড়া সেজে ওকে নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ান, তারপর হঠাৎ অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দেন শিশুটিকে—ওর কপাল থেকে শুরু করে মোটাসোটা উরু অব্দি।

"ঠিক জেনীর মতো দেখতে হয়েছে, তাই না?"—মঁসিয়ে লেঁমোনীর আনন্দে ফিসফিসিয়ে ওঠেন। মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুর সমানে নাচানাচি করছেন বাচ্চাটিকে নিয়ে,—কখনো বুকের ওপর, কখনো ঘাড়ের ওপর, কখনো দাঁড়ি গোঁফ ঘষতে থাকেন শিশুর নরম গালে।...

একমাত্র বুড়ি আয়া সেলিস্তের যেন কোন মায়া-মমতা নেই শিশুটির প্রতি. মুখে তাঁর বিরক্তির চিহ্নগুলি স্পষ্ট. শিশুটিকে নিয়ে দুই বয়স্কলোকের আদিখ্যেতা তার যেন আদৌ পছন্দ নয়।

"এভাবে কি কেউ বাচ্চা মানুষ করে?" তিনি ব্যাখ্যা করেন. "আপনারা আদর দিয়ে ওকে একটি বানর বানাবেন।"

বেশ কয়েক বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। জাঁর [ছেলেটার নাম] বয়স ন'বছর। একটি অক্ষরও সে পড়তে পারে না। আদর পেয়ে গোল্লায় গেছে—যখন যা বায়না ধরবে. তা আদায় না করে ছাড়বে না। ভীষণ একগুঁয়ে. বদরাগী. অপরিণত মস্তিষ্কের ছেলে। আর তার বাবা তখনো সমানে তাকে আস্কারা দিয়ে চলেছেন. ছেলের জন্য বুঝি তিনি চাঁদ পেড়ে আনতে পারেন! মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুরও তাই.—নিত্য-নতুন খেলনা কিনে এনে দেন. রাশি রাশি কেক আর মিষ্টি কিনে এনে ওকে খাওয়ান।

এই সব ব্যাপার দেখে সেলিস্তের মেজাজ আর ঠিক থাকে না. ওদের সে সাবধান করে দেয়. "দেখুন মঁসিয়ে. এটা কোন গৌরবের কথা নয়. লজ্জার কথা। বাচ্চাটাকে আপনারাই শেষ করবেন! বুঝলেন? আপনারাই ওর ইহকাল পরকাল ঝরঝরে করে তুলছেন। এ সব থামান. আমি দিব্যি দিয়ে বলছি. এ সব থামান।"

"বেশ. তবে আমাকে কি করতে বলছেন?" মৃদু হেসে মঁসিয়ে লেঁমোনীর জবাব দেন. "আমি যে ওকে অত্যন্ত ভালোবাসি. ওর কোন ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। ওকে যেটুকু মানুষ করবার আপনিই করবেন।"

জাঁ বেশ দুর্বল এবং রিকেটি চেহারা! ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিয়ে গেছেন. ওর রক্তাল্পতা, শরীরে আয়রণের দরকার, লাল মাংস খাবে, শাকসব্জির সুপ্ খাবে. মিষ্টি খাওয়া দারুণ ক্ষতিকর। অথচ. ছেলেটা কেক ছাড়া কিছুই খাবে না। যা কিছু পুষ্টিকর খাবার, সে ও সব খেতে রাজি নয়। আর ওর বাবা সেই সব ভয়ানক বায়নাই মেনে নিচ্ছেন. পকেট ভর্তি করে নিয়ে আসছেন ক্রীম মাখানো কেক চকলেট ইত্যাদি।

এক সন্ধ্যায় খাবার-টেবিলে ছেলেকে নিয়ে বসেছেন লেঁমোনীর। দৃঢ়চেতা সেলিস্ত সুপের বাটিটা নিয়ে এসে রাখলেন টেবিলের ওপর। ঢাকনা তুলে ঘোষণা করলেন. "চমৎকার সুপ্! এত ভালো রান্না এর আগে আমি কখনো রাঁধিনি। জাঁ নিশ্চয় এর খানিকটা আরাম করে খাবে।"

মঁসিয়ে লেঁমোনীর আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন, মাথা হেঁট করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন, কেলেঙ্কারী একটা কিছু এখনই ঘটবে।

সেলিস্ত লেঁমোনীরের থালাটা টেনে নিয়ে ওতে অনেকটা সুপ্ ঢেলে দিলেন। লেঁমোনীরও সেই সুপ্ চাখতে চাখতে কৃত্রিম উল্লাসে বললেন, "বাঃ! চমৎকার হয়েছে! চমৎকার হয়েছে!"

সেলিস্ত এরপর ছেলেটির থালাতে বেশ কয়েক চামচ ঐ ঝোল ঢাললেন এবং থালাটা এগিয়ে দিয়ে নিজের পা পিছিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জাঁ একটু জিভে ছুঁইয়েই মুখ বিকৃত করে, থালাটাকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দেয়, কুৎসিত এক আওয়াজ করে ওঠে "বাজে!"

সেলিস্তের মুখ লাল, একরকম ছুটে এগিয়ে এলেন তিনি, থালা থেকে চামচে করে সুপ্ তুলে জোর করে ছেলেটার মুখে তা ঢালতে থাকেন। জাঁ ছটফট করে, মাথা ঝাঁকায়, থুতু ছিটায়।...সেলিস্তের সর্বাঙ্গে সুপ্ পড়তে থাকে। শেষে মরীয়া হ'য়ে তিনি জাঁর মাথাটা চেপে ধরেন, জোর করে হা করান, সুপ্ ঢালতে থাকেন ওর গলা দিয়ে। জাঁও সঙ্গে সঙ্গে বমি করে দেয় এবং এমন ছটফট করতে থাকে যেন তার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

ছেলের বাবা এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক নিথর হ'য়ে বসেছিলেন। তারপর হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ান, হিংস্র তৎপরতায় ছুটে গিয়ে বুড়ি আয়াকে এক হেঁচকা টানে ছুঁড়ে মারেন দেওয়ালের দিকে।

"বেরিয়ে যা! বেরিয়ে যা! ডাইনি!"—লেঁমোনীর চীৎকার করতে থাকেন।

আচমকা আঘাত সামলে পাল্টা ফুঁসে উঠলেন সেলিস্ত, তাঁর একমাথা চুল ফুলে ফেঁপে ওঠে, মাথা থেকে ক্যাপটা ছিটকে পড়ে মাটিতে, দুই চোখ ঝলসাতে থাকে। চীৎকার করে বলেন, "কি এত বড় সাহস আপনার! বাচ্ছাটাকে স্বাস্থ্যের কারণে সুপ্ খাওয়াচ্ছিলাম বলে আপনি আমার গায়ে হাত তুলতে উদ্যত হলেন! আপনিই ওকে খুন করবেন, আপনার এই আস্কারাই ওর মৃত্যুর কারণ হবে!"

"বেরিয়ে যা!...আমি তোকে বরখাস্ত করছি নিষ্ঠুর!" —তিনি তখনো হুঙ্কার ছাড়ছেন, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে থর থর করে।

"এ্যাঁ! ...এই তবে আপনার ব্যবহার...না কখনো নয়...কার, কার জন্য আপনার এমন চণ্ডাল রাগ? ...তাও যদি নিজের ছেলে হতো! না...জেনে রাখুন ঐ ছেলে আপনার ঔরসজাত নয়...সবাই জানে, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আপনি ছাড়া এ কথা সকলেরই জানা...শহরের মুদি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করুন, মাংস-বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করুন, যাকে ইচ্ছে ডেকে জেনে নিন—সকলেই আঙুল তুলে ঐ এক জবাব দেবে..."

বলতে বলতে আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, রাগে জ্বলছেন তিনি।...তারপর একসময় চুপ হ'য়ে যান, মনিবের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

এই প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতে লেঁমোনীর আর যেন মানুষ নন, দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে আসেন "কি বলছিস?...কি বলছিস তুই?"

আয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলেন, "আমি যা জানি তাই বললাম। এ কথা সকলেরই জানা।"

লেঁমোনীর বন্য পশুর মতো সেলিস্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। কিন্তু বয়স সত্ত্বেও সেলিস্তের শরীরে জোর কম নয়, লেঁমোনীরের হিংস্র আক্রমণ এড়িয়ে টেবিলের অন্যধারে গিয়ে দাঁড়ান, আবার সেই রাগে ক্ষোভে চীৎকার করে বলেন, "তাকিয়ে দেখুন, ওর দিকে চেয়ে দেখুন। আপনি মহা মূর্খ। চোখ মেলে তাকালেই বুঝতে পারবেন, জাঁ কি মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুরের জীবন্ত প্রতিভূ নয়? মিলিয়ে দেখুন ওর নাক, চোখ—ও সব কি আপনার মতো? আপনার চোখ? আপনার নাক? আপনার চুল? আমি যা বললাম, সকলেই তা জানে। সকলেই, শুধু আপনি বাদে। এই নিয়ে শহরে কম হাসাহাসি হয়? তাকিয়ে দেখুন ওর দিকে।..."

বলতে বলতে দরজা খুলে সেলিস্ত মিলিয়ে গেলেন।

দৃশ্য দেখে জাঁ ভয়ে নিশ্চল।

ঘণ্টাখানেক বাদে আয়া ফিরে এলেন ধীর পদক্ষেপে। ইতিমধ্যে ছেলেটি এক ডিশ কেক, পায়েস, ক্রীম ইত্যাদি নীরবে সাবাড় করেছে। ওর বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন।

সেলিস্ত ওকে কোলে তুলে নিলেন, নীরবে ওর ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর আবার ফিরে এলেন খাবার ঘরে। টেবিল পরিষ্কার করলেন, সবকিছু গুছিয়ে রাখলেন। মনে তাঁর গভীর অস্বস্তি। গোটা বাড়িতে কোন শব্দ নেই। কান পেতে শোনেন, গৃহস্বামীর ঘর থেকে কোন আওয়াজ আসে কিনা। ভদ্রলোক তাঁর ঘরে পায়চারি করছেন না। সেলিস্ত দরজার চাবির ফুটোতে চোখ রেখে লক্ষ্য করছেন। লেঁমোনীর টেবিলের সামনে বসে কি যেন লিখছেন, তাঁকে বেশ প্রশান্ত দেখাচ্ছে।

সেলিস্ত রান্না ঘরে গিয়ে বসলেন। টের পান, কিছু যেন একটা ঘটতে চলেছে। এ বাড়ির বাতাসে ভাসছে কোন অঘটন বার্তা।

বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়লেন সেলিস্ত এবং সেই ঘুম যখন ভাঙ্গলো, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। ...রাত্রি প্রায় আটটা নাগাদ বাড়ির কর্তার জন্য কফি প্রস্তুত করলেন তিনি। কিন্তু তাঁর ঘরে ঢুকতেই সাহস হচ্ছে না তাঁর, অপেক্ষা করছেন—কতক্ষণে বেল বাজাবেন। কিন্তু বেল আর বাজলো না। রাত ন'টা বাজলো, দশটা বাজলো।

সচেতন সেলিস্ত এবার নিজেই দুরু দুরু বুকে কফির ট্রে নিয়ে লেঁমোনীরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান। কান পাতেন। শব্দ নেই। দরজায় টোকা দিলেন। জবাব এলো না। সমস্ত সাহস একত্রিত করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠেন, হাত থেকে ট্রেটা পড়ে যায় মাটিতে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে মঁসিয়ে লেঁমোনীরের প্রাণহীন দেহটা ঝুলছে। গলায় দড়ি দিয়েছেন। শক্ত ঘাড় বেঁকে আছে, জিভ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, পা থেকে একপাটি

জুতো খুলে পড়েছে, অন্যটি তখনো লটকে আছে আর এক পায়ে, একটা চেয়ার উল্টে আছে বিছানার গায়ে।

কাঁপতে কাঁপতে ছুটে বেরিয়ে আসেন সেলিস্ত। তাঁর চীৎকারে প্রাতিবেশীরা ছুটে আসে। ডাক্তার এসে বললেন, এই রাত্রেই মৃত্যু ঘটেছে লেঁমোনীরের।

টেবিলের ওপর আবিষ্কৃত হলো মঁসিয়ে ডুরেঁট্যুরকে উদ্দেশ্য করে লেখা একখণ্ড চিঠি:

"আমি বিদায় নিচ্ছি এবং ছেলেটির দায়িত্ব রইলো তোমার ওপর।"

যোশেফ

Joseph

তাঁরা দু'জনেই মাতাল, আকণ্ঠ মাল টেনে বেসামাল অবস্থা—ছোটখাটো চেহারার ব্যারোনেস্ এণ্ডি-দ্যঁ ফ্রেইসিরস্ এবং অনুরূপ চেহারার কমটেস্ নমি দ্যঁ পার্ডেনস্।

সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরানো বহু জানালাবিশিষ্ট একটি প্রাতঃকালীন ঘরে বসে তাঁরা তাঁদের খানা-পিনা সারছেন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় নরম বাতাস হু হু করে ঢুকছে জানালাগুলি দিয়ে, ঈষৎ উষ্ণ,—ঈষৎ শীতল, বাতাসের সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে সমুদ্রের প্রভাব। দীর্ঘ আরাম কেদারায় শায়িতা দুই যুবতী মাঝে মধ্যে পেয়ালায় চুমুক দেন, সিগ্রেট টানেন, এ্যালকহলিক্ আবেশে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতায় তাঁরা ঘনিষ্ঠ, আলাপরত।

তাদের স্বামীরা অপরাহ্নে ফিরে গেছেন প্যারিসে, আর এরা দু'জনে এই নির্জন সমুদ্র-আবাসে সময় কাটাচ্ছেন, এখানে গুণমুগ্ধ যুবকদের ভিড় ও হৈ-হল্লা নেই। সপ্তাহের পাঁচটি দিন ধরে যে হারে পিক্‌নিক্, ভ্রমণ, হৈ-হুল্লোড় করতে হয় তাঁদের, তা প্রায় অসহ্য। সেই জমাটি পরিবেশ থেকে রেহাই পাবার জন্যই সমুদ্রতীরে এই বিরাম-গৃহটি নির্মাণ করেছেন তাঁরা, গ্রীষ্মের দিনগুলি এখানে অতিবাহিত করা এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা।

নেশার ঘোরে তাঁদের চিন্তাশক্তি এলোমেলো। আনন্দের বিশেষ কোন উৎস খুঁজে না পেয়ে ব্যারোনেস্ কাউন্টেসের কাছে বিশেষ ডিনার ও শ্যাম্পেনের প্রস্তাব রেখেছিলেন। নিজের হাতে খানা প্রস্তুত করতে গিয়ে তাঁরা দারুণ আমোদ পাচ্ছিলেন; খেলেনও খুব, মদ্যপানেরও আর সীমা রইল না। তারপর টানটান হ'য়ে শুয়ে বিবিধ উদ্ভট শব্দ করতে থাকেন, সিগ্রেট টেনে মুখভর্তি ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন। তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারছেন না, কি তাঁরা বলছেন!

কাউণ্টেস্ তো এক পা তুলে এমন সব কথা বলছেন, যা তাঁর বান্ধবীকেও হার মানায়।

"এই রাতটা কাটাবার জন্য" তিনি বলতে থাকেন, "আমাদের দু'জনেরই প্রেমিক দরকার। যদি এটা আগে মাথায় আসতো, আমি নির্ঘাৎ প্যারিস থেকে একজোড়া যুবককে আমদানী করতাম। তুমি ওদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে।"

"সে আর এমন কি কঠিন কাজ! আমি যে-কোন সময় একজনকে যোগাড় করে আনতে পারি", অপরজন জবাব দিলেন, "এমন কি এই সন্ধ্যাতেও যদি বাসনা জাগে, একজনকে ঠিক ডেকে আনতে পারবো!"

"বলছো কি! রকুভেলিতে, সত্যি? তা হলে নিশ্চয় কোন চাষা।"

"আদৌ নয়।"

"ব্যাপারটা খুলে বলো।"

"কি খুলে বলবো?"

"তোমার ঐ প্রেমিক সম্পর্কে।"

"ও বান্ধবী, প্রেম ছাড়া আমি বেঁচেই থাকতে পারি না। যেদিন দেখবো আমাকে কেউ প্রেম নিবেদন করার নেই, আমি মারা যাবো।

"আমারও সে রকম অবস্থা।"

"হ্যাঁ, তাই নয় কি?"

"সত্যি তাই। অথচ, পুরুষরা তা বোঝে না; আমাদের স্বামীরা তো কিছুতেই নয়।"

"বাস্তবিক ওদের যদি এতটুকু বোঝবার ক্ষমতা থাকতো। অথচ তুমি আর কি আশা করতে পারো? আমাদের কাছে ভালোবাসা হচ্ছে রোমাঞ্চকর আনন্দদায়ক সব ঘটনা; আমাদের প্রেমিকরা হবে দারুণ অনুগত অথচ সাহসী। তারাই হবে আমাদের হৃদয়ের খোরাক, তাদের ঐ আনুগত্য ও সাহস আমাদের পক্ষে ভীষণ প্রয়োজনীয়।

"হ্যাঁ ভীষণ প্রয়োজনীয়।"

"আমি নিশ্চয় অনুভব করবো, কেউ সর্বক্ষণ আমাকে নিয়ে ভাবছে। আমি শুতে যাই বা উঠে বসি, নিশ্চয় টের পাবো কেউ একজন কোথাও না কোথাও আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, আমাকে স্বপ্নে দেখছে, কামনা করছে। এ ছাড়া আমার অবস্থা তো করুণ, অস্তিত্বই অর্থহীন—সেই শূন্যতায় কান্নাকাটি ছাড়া আমার গত্যন্তর থাকতো না।"

"ঠিক বলেছো, আমারও সেই অবস্থা!"

"এর অন্যথা হবার নয়। একজন স্বামী আর কতদিন দয়ালু থাকতে পারে? ছ'মাস অথবা এক বছর বা দু'বছর; তারপর শেষ পর্যন্ত ঠিক মতের পরিবর্তন ঘটবে, শুরু হবে তার অত্যাচার। তার ভেতরে লজ্জা বলতে কিছু থাকবে না, সব কিছুতেই খুঁত ধরে বেড়াবে, তার আসল রূপটি প্রকাশ পাবে। শুরু হবে তার কঞ্জুসীপনা, তোমার সাধ আহ্লাদ বলতে আর কিছুই থাকবে না। যার সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে, তাকে ভালোবাসা যায় না।"

"খুব সত্যি কথা।"

"ঠিক বলছি না? হ্যাঁ, আমি যেন কি বলছিলাম? কিছু মনে করতে পারছি না।"

"তুমি বলছিলে, সব স্বামীরাই নিষ্ঠুর।"

"আলবাৎ, ওরা সব পাষাণ...সব সমান।"

"ঠিক।"

"তা হলে কি দাঁড়ালো?"

"কি দাঁড়ালো?"

"বলো তো কি হতে পারে?"

"আমি কি করে বলবো? তুমি তো কথা শেষ করোনি।"

"আমার নয়, এবার তোমাকে কিছু বলতে হবে।"

"দাঁড়াও, হুঁ, মনে পড়েছে—"

"বলে যাও; আমি শুনছি।"

"বলছিলাম, যে কোন জায়গাতেই মনমতো পুরুষ আমি খুঁজে নিতে পারি।"

"কি ভাবে?"

"বলছি। মন দিয়ে শোন। যখনই কোন নতুন জায়গায় যাই আমি সেখানকার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিই; তারপর পছন্দ করে নিই উপযুক্ত জনকে।"

"পছন্দ করে নাও!"

"হ্যাঁ নিশ্চয়। আগে সব খবরাখবর যোগাড় করি; নিশ্চয় ঐ এলাকায় ধনী সুপুরুষ উদারস্বভাব প্রেমিক কেউ না কেউ থাকবেই!"

"খুব সম্ভব।"

"তা হলে সে নিশ্চয় আমার পছন্দসই পুরুষ হবে।"

"নিশ্চয়।"

"তখন আমি তাঁক করবো।"

"তাঁক?"

"হ্যাঁ, ঠিক যেন মাছ ধরার মতো। তুমি কখনো মাছ ধরোনি?"

"না, কোনদিন নয়।"

"দুর্ভাগ্য তোমার। এ অভিজ্ঞতা তোমার থাকা উচিত ছিল। খুব মজার ব্যাপার, এবং শিক্ষনীয়ও বটে! হ্যাঁ, আমি তার দিকে তাঁক করবো।"

"কি উপায়ে?"

"বোকার মতো কথা বলো না। মেয়েরা তাদের মনমতন লোককে কি ভাবে পাকড়াও করে? এতে আবার ঘটা করে বলবার কি আছে? অবশ্যি লোকটির এ ব্যাপারে উৎসাহ থাকা দরকার। পুরুষরা বোকার মতো ভাবে, তারাই বুঝি মেয়েদের মন জয় করছে; আসলে তো আমরা মেয়েরাই ওঁৎ পেতে থাকি...সব সময়ই তাই...। আমাদের মতো বুদ্ধিমতী সুন্দরী মেয়েরা অনায়াসে যে কোন লোককে গোপনে নিজের ঘরে তুলে আনতে পারে, এখানে ব্যর্থতার নজীর কদাচিৎ। সকাল থেকে সন্ধ্যা

পর্যন্ত আমরা শুধু ওদের যাচাই করি, তারপর রাত ঘনালে ঠিক উপযুক্ত পুরুষটিকে বিদ্ধ করে ফেলি।"

"তুমি কিন্তু এখনো কায়দাটা ঠিকমতো খুলে বলছো না।"

"এর আবার কায়দা কানুন কি? জলবৎ তরলং। বেশ কয়েকবার লোকটার দৃষ্টির সামনে ঘুর ঘুর করতে হবে, বারকতক দেখতে পেলেই মানুষটার মাথা যাবে ঘুরে। সে তখন তোমাকে সবচেয়ে সুন্দরী বলে ধরে নেবে এবং ভাববে তুমিই বুঝি এই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয়া রমণীরত্ন। ফলতঃ শুরু হ'য়ে যাবে তার অনুরাগ-জ্ঞাপন। আমিও তখন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবো পাত্র হিসাবে সেও খুব একটা বেমানান নয়; অবশ্য মুখে কিছুই বলবো না। একসময় সে আমার পায়ে এসে পড়বে। আমি তাকে পেয়ে যাবো। অবশ্য এই সাফল্যলাভে কতটা সময় লাগবে সেটা নির্ভর করছে পুরুষটির চারিত্রিক দৃঢ়তার ওপর।"

"যাদের চাও, তাদেরই কি তুমি পাও?"

"প্রায় সকলকেই।"

"তা হলে এমন দু'একজনও আছে, যারা তোমার আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে।"

"কখনো কখনো।"

"কারণ?"

"কারণ? তিনটি কারণে একটি মানুষ এ ক্ষেত্রে যোশেফের মতো ব্যবহার করে! প্রথম কারণ, সে অন্য কোন যুবতীর গভীর প্রেমে আবদ্ধ; দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, সে খুব নির্বিরোধ ও ভীরু স্বভাবের; আর তৃতীয় কারণটি হলো...কি ভাবে এটা ব্যাখ্যা করি...একটি যুবতীকে জয় করেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত স্তর পর্যন্ত ব্যাপারটাকে সে আর টেনে নিয়ে যেতে পারে না।..."

"আহ, বান্ধবী!...ঠিক বলছো?..."

"হ্যাঁ...আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত।...এই শেষোক্ত দলের লোকদের সংখ্যাই প্রচুর। প্রচুর, তোমার ধারণারও বাইরে। ওহ্! তাদের দেখতে আর সকলেরই মতন...অন্য লোকদের মতোই বেশভূষা...ময়ূরের মতো তাদের চাল-চলন...আমি ওদের ময়ূরের সঙ্গে তুলনা করছি...এটা ভুল...কারণ, সময়কালে তারা তাদের লেজটাকে বড় করে তুলতে পারে না।"

"তাই নাকি, সত্যি!..."

"ভীরু স্বভাবের মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। এমন লোক এই পৃথিবীতে বিরল নয়, যারা শোবার ঘরে আয়না থাকলে নগ্ন হ'য়ে বিছানায় যেতে অপারগ। এই ধরনের লোকদের সঙ্গে মহড়া দিতে হলে তোমাকে অনেক কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে, তোমাকে শক্ত হতে হবে, ওর লজ্জা ও ভয় দূর করতে তুমি তোমার চোখ ও হাত দুটোই প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করবে। এমনকি, এতেও কাজ হয় না। ওরা যে জানেই না, কখন ও কিভাবে 'কম্ম'টা আরম্ভ করা উচিৎ! তারপর তুমি যদি

ছলা-কলা দেখিয়ে তার সামনে মূর্ছা যাও, যেটা তোমার শেষ উপায়...সে ব্যস্ত হ'য়ে তোমার জ্ঞান ফেরাতেই চেষ্টা করবে এবং যদি তোমার জ্ঞান ফিরে না আসে...সে সাহায্যের জন্য বাইরে ছুটবে!"

"আমি আবার সেই সমস্ত পুরুষকেই পছন্দ করি, যাদের অন্য প্রেমিকা আছে। আমি তাদের ঠিক টেনে আনবো...ঠিক যেন বেয়নেটের মুখে তাদের বিদ্ধ করে রাখবো, বুঝলে বান্ধবী?"

"সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু ধরো এমন এক জায়গায় গেলে যেখানে হাতের কাছে কোন পুরুষ নেই, সেখানে কি করবে?"

"খুঁজে নেবো।"

"কিন্তু কি ভাবে কোথায়?"

"আহা, যে-কোন জায়গায়। এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে। গল্পটা বলছি। দু'বছর আগের কথা। আমার স্বামী তাঁর জমিদারী বোগ্রোলসে আমাকে পাঠালো গ্রীষ্মকালটা কাটাতে। জায়গাটা বিলকুল রসকষহীন, কিচ্ছু নেই। আছে শুধু কয়েক ঘর অশিক্ষিত চাষাভূষা লোক, শিকার-টিকার করে, এমন ঘরে বাস করে, যেখানে কোন বাথরুম নেই। হাজার চেষ্টা করেও তুমি তাদের উন্নত করতে পারবে না, কারণ, তারা ঐ নোংরা পরিবেশেই অভ্যস্ত। ভাব তো ঐ রকম একটা জায়গায় গিয়ে আমি কি করেছিলাম?"

"ভাবতে পারছি না।"

"হা, হা! আমি শুধু জর্জ স্যাণ্ডের একখানা উপন্যাস পড়লাম। লেখক তাঁর বইতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সমস্ত গ্রাম্য চাষা ও শ্রমিকরা পবিত্র স্বভাবের এবং সব ভদ্রলোকেরাই অপরাধী। এ ছাড়া শীতকালে আমি "রে বেলাস" বইখানাও পড়েছিলাম, যা আমাকে দারুণ প্রভাবিত করেছিল।

যাই হোক, আমাদের কৃষক-প্রজাদের একজনের একটি চমৎকার যুবক পুত্র ছিল; বয়স হবে তার বছর বাইশ, তাকে চার্চে পাঠানো হয়েছিল ধর্মগুরু হবার জন্য, কিন্তু বিরক্ত হ'য়ে সে গির্জা ছেড়ে চলে আসে। আমি বেছে-বুছে তাকেই আমার পরিচারক হিসেবে নিযুক্ত করলাম।"

"বাঃ. তারপর?"

"তারপর...তারপর তার সাথে শুরু হলো আমার চটকদার ব্যবহার। তার দৃষ্টির সামনে নিজেকে বিরাট করে বিছিয়ে দিলাম বলতে পারো। আমি কিন্তু ঐ গেঁয়ো যুবকটিকে ঠিক তাঁক করিনি, একটুখানি খেলাচ্ছিলাম মাত্র, ঝলসে দিচ্ছিলাম ওকে।"

"ওহ্! এণ্ড্রি!"

"হ্যাঁ, দারুণ মজার খেলা এটি, দারুণ মজা! লোকেরা বলে থাকে, চাকরবাকররা এসব দেখে না। সেও দেখতো না। কিন্তু আমি তাকে রেহাই দেইনি। প্রত্যেকদিন সকালে আমার চাকরাণী যখন আমাকে কাপড় পরাতো আমি বেল বাজিয়ে তাকে সেখানে হাজির করতাম, কিছু নির্দেশ দিতাম। আবার প্রতি রাতে যখন চাকরাণী

একে একে আমার শরীর থেকে জামাকাপড়গুলি খুলে ফেলতো, আমি ওকে আমার ঘরে ডেকে এনে নিজের নগ্নরূপ দেখাতাম।"

"ওহ্! এণ্ড্রি!"

"বান্ধবী, কি আর বলবো, লোকটা উত্তেজনায় কেঁপে উঠতো। তারপর খাবার টেবিলে বসে আমি ওকে শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখবার হরেক রকম উপদেশ দিতাম। পনেরো দিনের মধ্যেই সে সকালে ও সন্ধ্যায় নদীতে স্নান করতে শুরু করলো। শুরু করলো উগ্র গন্ধের সেন্ট মাখতেও। আমি তাকে উগ্র সেন্টের বদলে ওডি-কলন ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলাম।"

"উঃ! এণ্ড্রি।"

"তারপর আমি সেখানে একটি ছোটখাটো গ্রন্থাগার গড়ে তুললাম। কয়েকশ' নৈতিক উপন্যাস এনে আমাদের চাষীদের ও সেই ছেলেটিকে পড়তে দিলাম। এই সমস্ত বইয়ের ভিড়ে দু'একটি ভিন্ন জাতের রচনাও চলে যেত...কিছু কবিতার বই...এমন বই, যা চিত্তকে উদ্বেলিত করে...স্কুলের ছাত্র বা আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের পক্ষে যে বইগুলি সত্যি চাঞ্চল্যকর। আমি ঐ রকম বই-ই বিশেষ পরিচারকটিকে দিতে শুরু করি। ঐ বইগুলিই তাকে জীবন চেনালো... জীবনের একটা বিচিত্র দিক।"

"ইস্...এণ্ড্রি!"

"তারপর আমি আস্তে আস্তে ওর ঘনিষ্ঠ হতে আরম্ভ করি, অন্তরঙ্গ স্বরে কথা বলি। তার নাম দিলাম যোশেফ। বান্ধবী, তার যে তখন কী অবস্থা— কি ভয়ানক অবস্থা—দিনের পর দিন সে রোগা হতে থাকে—মুরগীর মতো শীর্ণ, চোখের দৃষ্টি বন্য। ওর এই ভাবান্তর দেখে আমার দারুণ উল্লাস! অত সুন্দর মজাদার গ্রীষ্ম আমার জীবনে খুব কমই এসেছে—"

"তারপর?"

"তারপর—হ্যাঁ, তারপর একদিন আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে আমি তাকে তলব করি এবং বলি, এই দারুণ গরমে সে যেন আমাকে বনে নিয়ে যায়। ব্যস্!"

"বাঃ! এণ্ড্রি! বলো, তারপর কি হলো—আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে শুনতে।"

"আমি তাকে খতম করে দেবার মুহূর্তে এনে দাঁড় করালাম। বনে যাবার পথে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লাম!"

"কি ভাবে?"

"তুমি কি বোকা! আমি খালি তাকে বললাম, আমি অসুস্থ বোধ করছি এবং সে যেন আমাকে কোলে করে নিয়ে গিয়ে ঘাসের উপর শুইয়ে দেয়। সে শুইয়ে দেবার পর শ্বাসকষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাকে বললাম, আমার পোশাকের ফিতেটা আলাগা করে দিতে। ফিতেটা আলগা হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম আমি।"

"সত্যি জ্ঞান হারালে?"

"ও, না, না, আদৌ তা নয়।"

"বটে?"

"হুঁ, আমি ঘন্টাখানেক ধরে ঐ রকম অজ্ঞানের ভান করে পড়ে রইলাম। সে কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু আমারও তো ধৈর্য খুব, এবং সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত চোখের পাতা মেলিনি।"

"ও! এণ্ড্রি....এরপর তুমি তাকে কি বললে?"

"আমি? কিছুই না। আমি তো সংজ্ঞাহীন! কি ঘটে গেল আমার ওপর দিয়ে জানবো কি ভাবে? তাকে ধন্যবাদ জানালাম। আমি শুধু তাকে বললাম ঘরে নিয়ে যেতে।..."

"ও! এণ্ড্রি! এই কি সব?..."

"এই সব!"

"তুমি শুধু ঐ রকম একবারই অজ্ঞান হয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, মাত্র একবার! আমি আমার প্রেমিককে আর দ্বিতীয়বার ওরকম ঠকাতে চাইনি।"

"তারপরও দীর্ঘকাল তাকে কাজে বহাল রেখেছো?"

"নিশ্চয়। সে এখনো আমার কাছে আছে। কেন আমি তাকে বরখাস্ত করবো? তার বিরুদ্ধে আমার তো কোন অভিযোগ নেই।"

"ও, এণ্ড্রি! সে কি এখনও তোমায় ভালোবাসে?"

"নিশ্চয়।"

"সে এখন কোথায়?"

ব্যারোনেস্ হাত বাড়িয়ে বৈদ্যুতিক বেল বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল এবং এক দীর্ঘদেহী পরিচারক এ ঘরে প্রবেশ করে, তার শরীর থেকে ভেসে আসছে ওডি-কলনের কড়া গন্ধ। "যোশেফ, মাই বয়," ব্যারোনেস্ বললেন, "আমার শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না; যাও, আমার ঝিকে খবব দাও।"

লোকটি ঊর্ধতনের সামনে দাঁড়ানো নিশ্চল সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তার দৃষ্টি জ্বলছে তার কর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। ব্যারোনেস্ আবার বলেন, "তাড়াতাড়ি করো হে ধেড়ে খোকা; আমরা এখন আর বনে শুয়ে নেই এবং রোসেলি তোমার চেয়ে অনেক বেশী যত্ন নিতে পারবে আমার।"

সে গোড়ালি ঘুরিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

"এখন তুমি তোমার চাকরাণীকে কি বলবে?"—বিস্মিত কাউণ্টেস প্রশ্ন করেন।

"বলবো, আমি ভালো আছি। কিন্তু না, আমি যেন কেমন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। আমি একটু বিশ্রাম চাইছি, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি মাতাল...বান্ধবী...এমন মাল টেনেছি যে দু'পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবো না, নির্ঘাৎ পড়ে যাবো।"

সুখ

Happiness

এখন চায়ের সময়; এই কিছুক্ষণ আগে বাতি এনে বসানো হয়েছে। সমুদ্রের বিপরীতে ভিলা, অস্তমিত সূর্যের গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়ছে, যেন সোনার গুঁড়োয় মুড়ে আছে আকাশ। এবং ভূমধ্যসাগর এই পড়তি বেলার আভায় এখনো চকচকে, নিথর, শান্ত, ছোট ছোট ঢেউও ওঠে না, যেন একেবারে গতিহীন—সামগ্রিক অবয়ব একটি বিশাল ঝক্‌মকে ধাতব পাতের মতন।

দূর দক্ষিণে পাহাড়শ্রেণী তাদের কালো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমের ফ্যাকাশে নীল লোহিত বর্ণের বিরুদ্ধে।

তাদের গল্পের বিষয়বস্তু প্রেম। এক পুরনো প্রেমের উপাখ্যানকে নতুন করে বলা, এ গল্প এর আগে অনেক অনেকবার বলা হয়েছে, তবু সেই চর্বিত চর্বন। কেমন এক ধরনের নরম বিষণ্নতা তাদের স্বরে, অন্তঃকরণে এক করুণ কোমল ভাব। একজন মানুষের সতেজ স্বরে কয়েকবার ধ্বনিত হলো একটি বিশেষ শব্দ—"প্রেম"; তারপর শোনা গেল এক রমণীরও পরিষ্কার উচ্চারণ—"প্রেম"। এই একটি মাত্র শব্দ ছোট্ট ঘরখানাকে যেন ভরিয়ে তুলছে, পাখির ডাকের মতন সে সুমধুর এবং প্রত্যেকে তার প্রভাবে সম্মোহিত।

কোন লোক কি বছরের পর বছর সীমাহীন ভালোবাসায় ডুবে থাকতে পারে?

হ্যাঁ, কেউ কেউ দাবী করে।

না, অনেকেই সায় দেয় না।

বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তারা; উল্লেখ করে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য, যা একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করে রাখে; অনেক উদাহরণও টানে। মেয়েরা ও পুরুষরা—সকলেই তাদের প্রায়-মুছে যাওয়া স্মৃতিগুলোকে হাতড়াতে থাকে, অনেক সময় ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না, যদিও তখন তাদের আবেগ এসে জড়ো হয় ঠোঁটের ওপর। তারা এই সাধারণ, অথচ সবচেয়ে রহস্যময় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে থাকে; নর ও নারীর মধ্যে এই যে চিরন্তন আকর্ষক রহস্যময়তা ও আবেগ, সেটাই তাদের যাবতীয় উৎসাহকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে।

হঠাৎ তাঁদের মধ্যে একজন, যার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বহুদূরে, সবিস্ময়ে বলে ওঠে, "আরে! দেখুন! ওখানে ওটা কি।"

সমুদ্র পার হয়ে যেন দিগন্তরেখায় জেগে উঠেছে এক বিশাল ধূসর বিকৃত পিণ্ড।

মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ঐ বিচিত্র ভূখণ্ডের দিকে চেয়ে থাকে, তাদের কেউ কখনো এর আগে ওটাকে দেখেনি।

"এ হলো কর্সিকা", কে একজন বলতে থাকে, বিশেষ আবহাওয়াজনিত পরিবেশ থাকলে বছরের মধ্যে এটা দু'বার বা তিনবার দেখা যায়। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলে দূরের বস্তু স্বভাবতই নজরে আসে।"

ঐ দূরের বিরাট বস্তুপিণ্ডের দিকে চেয়ে এদের মনে কল্পনা-বিলাস জমাট বাঁধে। অনেকেই আঙুল তুলে দেখায়, তারা যেন ওখানে পাহাড়ের শ্রেণী দেখতে পাচ্ছে! অনেকে আবার আরো এক কদম এগিয়ে বলে, পাহাড়ের শীর্ষে বরফ জমেছে। অথচ, অতখানি দেখা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, সকলেরই বিস্ময় তুঙ্গে, হতচকিত, কিছুটা ভীতও বটে,—হঠাৎ সমুদ্রের বুক চিরে জেগে-ওঠা ঐ ভৌতিক জগৎ অকল্পনীয়। এই বিচিত্র সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ঐ অজানা দুনিয়ায় পা রাখা কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের সামিল বুঝি!

অতঃপর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যিনি এতক্ষণ মুখ খোলেননি, মন্তব্য করলেন, "এটা ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমরা যখন নিখাদ প্রেমের কথা আলোচনা করছিলাম, ঠিক তখনই ঐ ভয়াল দ্বীপটা আমাদের দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠলো। প্রকৃত প্রেম যে কি, তার নজির আমি দেখে এসেছি ঐ ভয়ঙ্কর দ্বীপেই। এই মুহূর্তে আমার মনে আবার সেই বিচিত্র ঘটনার স্মৃতি জেগে উঠছে।

পাঁচ বছর আগে আমি কার্সিকাতে গিয়েছিলাম। ঐ বুনো দ্বীপ আমাদের কাছে যেন আমেরিকার চেয়েও দূরত্বে, যেন আরো অজানা ; যদিও কখনো-সখনো ফ্রান্সের উপকূল থেকে ওকে দেখা যায়, যেমন আজ দেখছি।

চিন্তা করুন এক বিশৃঙ্খল জগতের কথা, যা সর্বার্থেই আদিম। ইতস্তত পাহাড় ছড়ানো, মাঝে মাঝে সংকীর্ণ উপত্যকা। সমতলভূমি বলতে কিছুই নেই। শুধু গ্রানাইট পাথরের তরঙ্গ এবং গভীর খাদ। সব ঢেকে আছে ঝোপ ঝাড়ে অথবা বিশাল বিশাল কাজুবাদাম ও পাইন গাছে। কুমারী মৃত্তিকা অকর্ষিত, পরিত্যক্ত, যদিও কদাচিৎ দুটি একটি গ্রাম নজরে আসতে পারে। এখানে কোন সংস্কৃতি নেই, কল-কারখানা, শিল্প নেই। এখানে কেউ কখনো কারুকার্যমণ্ডিত কাঠ দেখতে পাবে না, ভাস্কর্যের সুষমাচিহ্নিত কোন পাথর এখানে আবিষ্কৃত হবে না। সুন্দর মহৎ জিনিসের জন্য এখানকার কোন পরিবারের রুচিশীল বাসনা দেখা যায় না। এটাই হচ্ছে এই কঠিন দেশের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতি তাদের সম্পূর্ণ অনীহা!

অথচ ইতালীর কথা ভাবুন। সেখানকার প্রতিটি প্রাসাদ কী অসাধারণ সৃষ্টি। মার্বেল, কাঠ, ব্রোঞ্জ, লোহা, বস্তুতপক্ষে সমস্ত রকম ধাতু ও পাথর ব্যবহার করে মানুষ তার প্রতিভার অবিস্মরণীয় সাক্ষ্য রেখেছে। মানুষের আবেগ, উল্লাস, শক্তি ও জাঁকজমক তার সৃষ্টিশীল বুদ্ধিমত্তাকে এখানে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পেরেছে।

আর সেই ইতালীরই মুখোমুখি কর্সিকা আদিতে যেমনটি ছিল, আজও তেমনটি রয়ে গেছে। লোকেরা বাস করে পুরনো ধাঁচের কঠিন আবাসে, যেখানে নিছক অস্তিত্ব রক্ষাই কষ্টকর। মানুষ সেখানে অসভ্য জাতির দোষ ও গুণ নিয়ে টিকে আছে। হিংস্র ঘৃণা প্রকাশের কঠিন মানসিকতা, ভয়ানক রক্তপিপাসু ; কিন্তু আবার সেই সঙ্গে

অতিথিপরায়ণ, উদার প্রকৃতি, সহানুভূতিসম্পন্ন এবং যথার্থ সরল। অতিথিদের জন্য তাদের বাড়ির দরজা সব সময় খোলা আছে, সামান্য সহানুভূতি দেখালে তারা প্রতিদানে দেবে বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব।

এক মাস ধরে আমি সেই বিচিত্র দ্বীপে ঘুরে বেড়ালাম। মনে হচ্ছিলো, যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। নেই কোন সরাইখানা, কোন বিরামগৃহ, কোন প্রশস্ত পথ। একরোখা বুনো রাস্তা কখনো চলে গেছে গ্রামের মধ্য দিয়ে, কখনো শেষ হয়েছে কোন পাহাড়ের গায়ে অথবা উপসাগরের তীরে, যার প্রচণ্ড গর্জনে কর্সিকার সান্ধ্যকালীন নির্জনতা ছত্রাক্কাণ হ'য়ে যায়। ভ্রমণকারীরা গ্রামবাসীর দরজায় ধাক্কা দেয়, রাতের মতন আশ্রয় ও খাদ্য প্রার্থনা করে। নড়বড়ে টেবিলের সামনে তাকে বসতে হয়, অবনত ছাদের নীচে তার শোবার ব্যবস্থা করা হয়, পরদিন সকালে গৃহস্বামী তাকে গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে, প্রথাসিদ্ধভাবে পর্যটক তার প্রসারিত হাতে ঝাঁকানি দেয়।

এক সন্ধ্যায়, একটানা দশ ঘণ্টা হাঁটবার পর আমি একটি ছোট্ট বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাড়িটি একটি সংকীর্ণ উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যে উপত্যকা ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। পাশাপাশি দুটি পাহাড়ের ঢালু শরীর আগাগোড়া ঘন বন-জঙ্গল, ক্ষয়িষ্ণু পাথর, বিরাট বিরাট গাছ-গাছালি আচ্ছাদিত; তাদের দেখে মনে হয়, যেন দুই বিষণ্ণ প্রাচীর এক নীরব শোকার্ত গহ্বরকে পাহারা দিচ্ছে।

ভাঙ্গা বাড়িটাকে ঘিরে লতিয়ে উঠেছে দ্রাক্ষালতা, ঘিরে আছে নাতিদীর্ঘ একটি বাগান, এবং আরো কিছু দূরে, এই দরিদ্র দেশের পক্ষে অতি মহার্ঘ গুটিকয়েক দীর্ঘ বাদাম গাছ।

এক বৃদ্ধ মহিলা দরজা খুলে দাঁড়ালেন; তাঁর পরিচ্ছন্ন সমর্থ শরীর এই দেশের পক্ষে কিছুটা অস্বাভাবিক। মোড়াতে বসে থাকা গৃহস্বামী উঠে দাঁড়ালেন আমাকে স্বাগত জানাতে এবং কিছু না বলেই আবার বসে পড়লেন।

'ক্ষমা করবেন', তাঁর স্ত্রী বললেন, 'উনি এখন কানে কালা। বিরাশি বছর বয়স হোল।'

নিখুঁত ফরাসী ভাষায় কথা বলছেন ভদ্রমহিলা। আমি বিস্মিত।

'আপনারা কর্সিকান নন?'—আমি জিজ্ঞেস করি।

'না' তিনি জবাব দেন, 'আমরা এসেছি মূল ভূখণ্ড থেকে। পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে আছি।'

পঞ্চাশ বছর ধরে এরা এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে বাস করছেন। ভাবতে গিয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি আঁতকে উঠি। শহর থেকে বহুদূরে, লোকালয় থেকে নির্বাসিত হ'য়ে কি ভাবে তারা দিন কাটাচ্ছেন এই অন্ধকারের গহ্বরে!...একজন বয়স-প্রাচীন মেষপালক খাবার নিয়ে এলো, আমরা 'ডিনার' খেতে শুরু করি। আলু, শূকরের পিঠের ও পার্শ্বদেশের লবণাক্ত মাংস এবং বাঁধাকপি একসঙ্গে সিদ্ধ করে ঘন 'সুপ' বানানো হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আহারের পর আমি ঐ ঘর ছেড়ে দরজার সামনে গিয়ে বসি। চোখের সামনে বিষণ্ন প্রকৃতি আমাকে বেদনার্ত করে। এই সব নির্জন করুণ সন্ধ্যাগুলি ভ্রমণকারীদের সহজেই বিচলিত করে থাকে। মনে হয়, সমস্ত কিছুই যেন শেষ হ'য়ে আসছে, এমন কি জীবন ও বিশাল চরাচরও।

বৃদ্ধা আমার পাশে এসে বসলেন। প্রবাসীজনের স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করেন:

'তাহলে, আপনি ফ্রান্স থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ, ভ্রমণ-সুখে আমি বুঁদ।'

'খুব সম্ভব প্যারিসে বাড়ি?'

'না, বাড়ি আমার নানসিতে!'

আমার কথা শুনে তিনি যেন দারুণ চমকে উঠলেন। আমি বলতে পারছি না, কি ভাবে তার এই কম্পন আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

'নানসি থেকে আসছেন?' তিনি কয়েকবার আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেন।

ঠিক তখনই ভাবলেশহীন তাঁর স্বামী এসে দাঁড়ালেন আর পাঁচজন কানে-খাটো মানুষের মতন।

'উনি এসে দাঁড়াতে বিব্রত হবেন না'; বৃদ্ধা বললেন, 'আমার স্বামী একদমই শুনতে পান না।'

আরো কয়েক মুহূর্ত পরে জিজ্ঞেস করেন:

'হ্যাঁ, কেন, ওদের প্রায় সকলকেই চিনি।'

'নানসির লোকদের নিশ্চয় চেনেন?'

'সেন্ট-এ্যালিজ পরিবারকে?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো চিনি; তাঁরা আমার বাবার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।'

'আপনার নাম?'

আমি তাঁকে নাম বললাম। তিনি আবার কেঁপে উঠলেন; স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে মৃদুস্বরে বললেন:

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ মনে পড়েছে। আর ব্রিসেনভদের খবর কী?'

'তাঁরা সকলেই মারা গেছেন।'

'আহা। আর সারমন্তরা, চেনেন তাঁদের?'

'হ্যাঁ। ঐ পরিবারের ছোট ছেলেটি এখন একজন জেনারেল।'

অবরুদ্ধ আবেগে তিনি কেঁপে ওঠেন, এতক্ষণে তাঁর অন্তঃস্থলে যেন লুকোনো ছিল কোন রহস্য, এই মুহূর্তে বুক কাঁপিয়ে তিনি উচ্চারণ করেন:

'হ্যাঁ, হেনরী দ্য সারমন্ত। আমি তাঁকে খুব ভালোই চিনি। তিনি আমার ভাই।

আমি চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাই, এতক্ষণে স্বয়ং বিস্ময়ে হতবাক। এবং সহসা আমার সব মনে পড়ে গেল।

বহুদিন আগের কথা। গোটা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল সেই কেচ্ছা। অভিজাত লোরেন অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফিরছিল সেই কথা। হুসার রেজিমেন্টের কমাণ্ডারের রূপসী সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতীকন্যা একজন সাধারণ নন-কমিশনড অফিসারের সঙ্গে পালিয়েছে!

লোকটি অবশ্য সুদর্শন যুবক। চাষী পরিবারের ছেলে হ'য়েও গায়ে সামরিক পোশাক চরিয়ে বীরত্ব কম দেখায়নি। শেষ পর্যন্ত তারই কর্ণেলের মেয়েকে নিয়ে চম্পট! সন্দেহ নেই, মেয়েটি তাকে দেখেছিল, একাগ্রতার সঙ্গে লক্ষ্য করতো; যখন সৈনিকরা নাচ করতে করতে বেরিয়ে যেত, সে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তারই দিকে চেয়ে থাকতো। কিন্তু কি ভাবে সে তাঁর মনের কথা ওকে বলেছিল, কি ভাবে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটতো এবং কি ভাবে তাদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? কি ভাবে সে ঐ লোকটিকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিল, সে তাকে ভালোবাসে? এর জবাব কারুর জানা নেই।

কাক পক্ষিতেও টের পায়নি। এক সন্ধ্যায়, যুবক সৈনিক চাকুরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হতেই উর্ধতনের মেয়েকে নিয়ে চুপিসাড়ে পালালো। খোঁজা হলো অনেক কিন্তু তাঁদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাদের কোন খবরও শোনা গেল না, মেয়েটি মারা গেছে বলেই ধরে নেওয়া হলো।

এবং এতকাল পরে আমি তাঁকে এই বন্ধ্যা উপত্যকায় আবিষ্কার করছি।

আমি বললাম:

'হ্যাঁ, আমি স্পষ্টই সব মনে করতে পারছি। আপনিই সেই মঁ দ্য মোসিলি সুজান।'

তিনি সামান্য মাথা হেলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।' তাঁর চোখ ছাপিয়ে জল নামছে। তারপর ঘুরে তাকালেন সেই বৃদ্ধ লোকটির দিকে, যিনি তখনো নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন: 'ঐ যে সেই মানুষ।'

এবং আমি অনুভব করলাম, আজও ওঁর প্রতি তাঁর প্রেম বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি; এখনো সমান প্রেমান্ধ দৃষ্টিতে পুরুষটির দিকে তিনি তাকান।

'কিন্তু আপনি কি যথার্থ সুখী হয়েছেন?' আমি হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসি।

হৃদয়ের গভীর হতে উত্থিত হয় তাঁর জবাব:

'ও, নিশ্চয়, আমি অত্যন্ত সুখী। উনি আমাকে যথার্থই সুখী করেছেন। আমার কোন অভিযোগ নেই।'

আমি সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাই। প্রেমের শক্তিতে উদ্ভাসিত ছোট্ট বিস্মিত বিষণ্ণ মুখ। এই ধনী মহিলা ঐ চাষী পরিবারের লোকটিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এমন এক জীবন-প্রবাহে, যার কোন আকর্ষণ নেই, বৈচিত্র্য বা বিলাস নেই, কোন ধরনের উৎসব নেই; এক অতি সাধারণ একঘেয়ে পারিবারিক জীবনের সামিল হলেন তিনি। এবং তিনি আজও তাঁকে সমান আবেগে ভালোবাসেন। আজ তিনি মাথায় মেয়েদের ক্যাপ চাপিয়ে সাধারণ ক্যাম্বিসের স্কার্ট পরে এক গ্রাম্য

চাষীর স্ত্রী হয়েছেন। বসে থাকেন বেতের মোড়ায়, আলু-বাঁধাকপি-শূকরের মাংসের কাদা কাদা সুপ গেলেন একটা নড়বড়ে টেবিলের সামনে বসে। এবং রাতে খর বিছানো শয্যায় ঐ লোকটিকে পাশে নিয়ে শুয়ে থাকেন।

তাঁর একমাত্র চিন্তা স্বামীকে নিয়ে। জীবনে তিনি কখনো দামী হীরে জহরতের গহনা বা দামী জামা-কাপড় বা কোন আধুনিক জিনিস বা একটি হাতল-ওয়ালা চেয়ারের আরাম বা সুগন্ধযুক্ত সুসজ্জিত ঘর বা এমন কোন নরম গদি যেখানে তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন—কিছুরই প্রত্যাশা করেননি। ঐ মানুষটিকে ছাড়া তাঁর আর কিছুই চাইবার ছিল না ; এবং যেহেতু তিনি তাঁকে পেয়েছেন, আর কিছুই চান না।

সেই প্রথম যৌবনে তিনি তাঁর বিলাসবহুল জীবন এবং স্নেহপ্রবণ পরিজনদের ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছেন। একাকী প্রিয়র সঙ্গে পালিয়ে এসেছেন এই নির্জন বন্য এলাকায়। তখন থেকে স্বামীই তাঁর কাছে যাবতীয় আনন্দ ও বাসনার উৎস। এবং সেই ভাগ্যবান লোকটিও তাঁকে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সুখী রাখতে পেরেছেন।

এর চেয়ে সুখ তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

গোটা রাত ধরে আমি বিদায়ী বৃদ্ধ সৈনিকের ঘোড়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন নাসিকা গর্জন শুনতে থাকি। ওঁরই পাশে শুয়ে আছেন সেই মহিলা। ভাবছি, সুখের জন্য তাঁর কি বিস্ময়কর অভিযান! এই সুখ পরিপূর্ণ, অথচ বস্তুত কত সামান্য।

পরদিন সকালে অতিথিবৎসল দম্পতির সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলাম।

গল্প শেষ। একজন স্ত্রীলোক মন্তব্য করলেন, "যাই হোক, ঐ মহিলার আদর্শ বড় সহজ, সরল, তাঁর প্রয়োজনটাও বড় সেকেলে ও আদিম, জীবনে তাঁর চাহিদা অতিমাত্রায় সামান্য। খুব বোকা মেয়ে।"

আর একজন মহিলা ধীর স্বরে বললেন, "তাতে কি হয়েছে? তিনি তো সুখী।"

দূরে রাত ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গে কর্সিকাও তার বিশাল ছায়া সহ ধীরে ধীরে আবার হারিয়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক গহনে এবং বিদায়ক্ষণে আমাদের মনে করিয়ে দিল, একজোড়া অকৃত্রিম প্রেমিক দম্পতি তারই বুকে আশ্রয় নিয়ে আছে আজ বহু বছর।

মাতাল

The drankard

উত্তরমুখী প্রবল ঝড় তখন বয়ে চলেছে। তারই দাপটে উড়ে এসেছে এক বিশাল কালো ও ভারী ঝোড়ো মেঘ। শুরু হ'য়ে গেছে পৃথিবীর বুকে দারুণ বৃষ্টি।

ক্রুদ্ধ সমুদ্রের গর্জন তীব্র। উপকূলভাগ কেঁপে উঠছে। তীরের দিকে ছুটে আসা বিশাল শ্লথ-গতি ফেনিল ঢেউগুলি যেন সমানে কামান দাগছে। তারা আসছে বেশ

ধীরে-সুস্থে, একের পর এক, আয়তনে পর্বত-প্রমাণ; বালুবেলায় ভেঙ্গে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সফেদ ফেনা বাতাসে ছিটকে আসে, যেন কোন ক্লান্ত দৈত্যের মাথা বেয়ে নেমে আসছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

ইপোর্টের ছোট্ট উপত্যকায় চলেছে এই ঝড়ের তাণ্ডব; বাতাসে শিস ও গর্জন; কত বাড়ির ছাদ থেকে উড়ে গিয়ে পড়ছে টালি, খড়খড়ি ভেঙে চুড়মার, চিমনীগুলি উপড়ে পড়ে মাটিতে, দমকা বাতাসের এমনই দাপট যে দেয়াল না চেপে ধরে রাস্তা পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়; এই ঝড়ের মুখে পড়লে শিশুরা ঝরা পাতার মতন উড়ে যাবে এবং বাড়ি টপকে আছড়ে পড়বে মাঠের ওপর।

তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ হবার ভয়ে জেলে-ডিঙ্গিগুলিকে টেনে তুলে আনা হয়েছে জল থেকে অনেক দূরে শুকনো মাটিতে। অনেক নাবিক ডাঙ্গায় তোলা নাওয়ের পেটে আশ্রয় নিয়ে দেখছে আকাশ ও সমুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপ। ক্রমশঃ রাত ঘনিয়ে আসায় তারা প্রায় সকলেই নিজ নিজ আবাসে ফিরে আসে।

শুধু রয়ে গেল দু'জন। পকেটে হাত ঢোকানো, প্রবল বাত্যায় তাদের পিঠ বেঁকে আছে, উলের টুপিতে ঢাকা পড়ে আছে তাদের চোখ,—তারা দুই নর্মাণ জেলে। ঘন-সন্নিবিষ্ট চুল-দাড়ি-গোঁফ-ঘাড় ও গ্রীবা অব্দি ঝালরের মতন নেমে এসেছে, লবণাক্ত সামুদ্রিক বাতাসে পোড়া তাদের চামড়া, নীল চক্ষুর মাঝখানে কালো তিলক, শিকারী পাখির জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তারা দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে।

"এসো, জেরিমি" তাদের একজন বললো, "আমরা ডমিনোজ খেলে সময়টা কাটাই। আমি টাকা দেবো।"

কিন্তু অপরজনের মনে দ্বিধা; সে জানে ঐ খেলায় মেতে ওঠার পরবর্তী পর্যায়ে তারা আকণ্ঠ ব্র্যাণ্ডি খাবে, মাতামাতি করবে, তরতরিয়ে সময় বয়ে যাবে; কিন্তু চিন্তা হয়, তার বউ একা ঘরে পড়ে আছে।

"সবাই জানে প্রতি রাতে তুমি আমায় বাজি ধরে মদ খাওয়াও। কিন্তু বলো তো এত খরচা করে তোমার কি উপকারটা হয়?"—সে জিজ্ঞেস করে।

উত্তরে সে এমন দিলখোলা মেজাজে হেসে উঠলো যেন সে নিজেই অপরের পয়সায় নেশা করে থাকে; নর্মাণসুলভ উচ্ছল হাসিতে সে সামান্য খরচার প্রশ্নটিকে যেন ফুঁৎকারে উড়িয়ে দেয়। তখনো খুশ মেজাজে মাথুরিন দ্বিধাগ্রস্ত জেরিমির হাত ধরে আছে।

"আরে দোস্ত, এমন একটা রাতে পেটে কিছু গরম বস্তু না নিয়ে বাড়ি যেতে নেই। ভয়টা কিসের? তোমার বুড়ি মেয়েমানুষটা কি তোমার জন্য বিছানা গরম করে রাখবে না?"

"আর একদিন রাতে আমি আমার বাড়ির দরজাই খুঁজে পাইনি," জেরিমি উত্তর দেয়, "ওরা শেষ পর্যন্ত এক নালা থেকে আমাকে উদ্ধার করে।"

বুড়ো বদমাশটা ঐ দৃশ্যের কথা চিন্তা করে আর একবার হো-হো করে হেসে ওঠে, তারপর শান্তভাবে হেঁটে যায় পারমেলির কাফের দিকে, যার আলোকিত জানালা

থেকে থেকে দীপ্তিমান। জেরিমিকে একরকম বগলদাবা করেই নিয়ে যাচ্ছে মাথুরিন,—পিছন থেকে বাতাসের ধাক্কা এবং সামনে থেকে মাথুরিনের টান, জেরিমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না।

নীচু ঘরটায় নাবিকদের জটলা, ধোঁয়া উড়ছে, হরেক গলায় হৈ-হৈ-রৈ-রৈ। উলের জার্সি পরা লোকগুলি টেবিলের উপর কনুই রেখে চড়া গলায় নিজেদের কথা শোনাচ্ছে। যে যত মাতাল তার তত সোচ্চারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস, সেইহেতু গমগমানি ক্রমশঃই তুঙ্গে ওঠে।

মাথুরিন ও জেরিমি ভেতরে ঢুকে এক কোণে বসে পড়ে এবং খেলা শুরু করে; গ্লাসের পর গ্লাস ব্র্যাণ্ডি তাদের গলার ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হতে থাকে। খেলা আরো জমে, মাল টানার বহরও বেড়ে চলে।

মাথুরিন কিন্তু ঠিক মতন মাল গিলছে না, অনেক সময়ই ঢেলে ফেলে দিচ্ছে বাইরে এবং মুচকি হেসে ইশারা করছে দোকানের মালিককে, যে লোকটি খুব আমোদ পাচ্ছে ব্যাপারটা দেখে।

আর জেরিমি তো গিলেই চলেছে, মাথা দোলাচ্ছে, বন্য পশুর ডাকের মতন ফ্যা ফ্যা করে হাসছে, রীতিমত কৃতজ্ঞ ও খুশি খুশি চোখে দেখছে তার সঙ্গীকে।

সকলেই যে যার বাড়িতে ফিরে গেল। এক একজন বাইরে যাবার জন্য দরজা খোলে আর দমকা জলীয় বাষ্প এসে ঢোকে কাফের ভেতরে। সেই বাতাসে জমাট পাইপের ধোঁয়া চঞ্চল ও পাতলা হয়, মোমবাতির আলো নিভে যাবার উপক্রম হয়; এবং ঠিক তখনই তারা শুনতে পায় বাইরে প্রচণ্ডভাবে ভেঙ্গেপড়া সামুদ্রিক ঢেউয়ের গর্জন, বাতাসের হাহাশ্বাস।

জেরিমির জামার বোতাম খোলা, মদের ঘোরে দুলছে, একটা পা দুমড়ে বেঁকে যাচ্ছে, একটা হাত অবশভাবে ঝুলছে, অন্য হাতে খেলার তাস।

এই ঘরে এখন তারা দু'জন ও মালিক ছাড়া আর কেউ নেই। দোকানের মালিক খুব আগ্রহ নিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়।

"কি জেরিমি" সে জিজ্ঞেস করে, "ভেতরটা ভালো বোধ করছো তো? এতক্ষণ ধরে যা সব পেটে ঢোকালে তাতে বেশ তাজা বোধ করছো তো নিজেকে, এ্যাঁ?"

"আরো দরকার" থুতু ছিটিয়ে জেরিমি বলে, "ভেতরটা এখনও শুকিয়ে আছে।" মাথুরিনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

"আর তোমার ভাই মাথুরিনের অবস্থাটা কি?" সে আবার বলে, "এই মুহূর্তে সে কোথায়?"

"ব্যস্ত হবে না সে এখন যথেষ্ট গরম।"—হাসির সঙ্গে নাবিক জেরিমি জবাব দেয়।

দু'জনে মিলে জেরিমিকে নিয়ে আরো কিছুক্ষণ মস্করা করে। তারপর খেলা শেষ হলে কাফের মালিক বলে, "শোন, আমি এখন এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি এই বাতিটা আর কিছু মাল সমেত একটা বোতল। মাল খাওয়া

শেষ হলে রোজের মতন আজও মাথুরিন দরজায় তালা দেবে এবং চাবিটা খড়খড়ির মধ্য দিয়ে ভেতরে ফেলে দেবে। কেমন?"

মাথুরিন জবাব দেয়, "ঠিক আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই।"

কাফের মালিক দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করে অন্য এক ঘরে গিয়ে ঢোকে। কিছুক্ষণ তার ভারী পায়ের শব্দ শোনা যায়। তারপর সে এমন একটা আওয়াজ তোলে যাতে বোঝা যায় সে এখন বিছানায় শুয়ে পড়লো।

আর এরা দু'জন তখনো খেলে চলেছে; সময় সময় বাতাসের গর্জন ভয়ানক হ'য়ে ওঠে; দরজায় সেই বাতাস ধাক্কা মারে এবং চারদিকটা যেন কাঁপতে থাকে। দুই মাতাল এমন চোখে তাকায় যেন কেউ তাদের দিকে আসছে; তারপর মাথুরিন বোতল তুলে আবার জেরিমির গ্লাসে মাল ঢালে। হঠাৎ ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। সেই আওয়াজের অনুরণন বহুক্ষণ ধরে টিকে থাকে।

চকিতে কাজ শেষ করে ওঠা নাবিকের মতন উঠে দাঁড়ায় মাথুরিন: "চলো জেরিমি; আমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত।"

জেরিমি খুব কষ্টে টাল সামলে উঠে দাঁড়ায়, টেবিলটাকে চেপে ধরে কোন রকমে পতনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে; টলতে টলতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, ওটা খুলে ফেলে এবং ঠিক তখনই তার বন্ধু বাতিটা দেয় নিবিয়ে।

মাথুরিন দরজায় তালা দেয়। দু'জনে এসে পথে দাঁড়ায়।

"তোমার রাত্রি শুভ হোক; আবার কাল দেখা হবে।"

বলেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল মাথুরিন।

জেরিমি তিন পা এগোয়, টলমল করতে থাকে, শূন্যে হাত ছোঁড়ে, তারপর কপালগুণে একটা দেয়ালের সন্ধান পায়, দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে স্খলিত পায়ে এগিয়ে চলে। ঐ সংকীর্ণ রাস্তায় কোথায় যেন একটা আর্তনাদ থেকে থেকে শোনা যায়। ভয় পেয়ে সে অনেকটা পথ এলোপাথাড়ি পা ছুঁড়ে পালিয়ে আসে। তারপর সেই শব্দ থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে থমকে দাঁড়ায়, আবেগ হারিয়ে আবার তার পা বেসামাল।

দিনের শেষে পাখি যেমন নীড়ে ফিরে আসে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে জেরিমিও তেমনি তার ঘরের দিকে গুটি গুটি ফিরে চলেছে। সে তার বাড়ির দরজা চিনতে পারে। কপাটের ওপর হাতড়াতে থাকে দরজার তালা খুঁজতে। কিন্তু অনেক খুঁজেও সেই ফুটো খুঁজে পায় না। নীচু গলায় শব্দ করতে থাকে সে। তারপর দরজার ওপর ঘুষি মারতে মারতে তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে থাকে: "মেলিনা! এই শুনছো! মেলিনা!"

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে আছে সে। হঠাৎ সেই দরজা খুলে যায়, এবং টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে ভেতরে পড়ে যায় জেরিমি, মেঝেতে ঠুকে যায়

তার নাক মুখ। ঠিক সেই মুহূর্তে সে অনুভব করে, ভারী চেহারার কে একজন দ্রুত তার শরীরের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

জেরিমি নিথর, ভয়ে আতঙ্কে পাথর, শিউরে উঠছে। কে ছুটে গেল তার শরীরের ওপর দিয়ে? শয়তান অথবা ভূত? এই ঘোর ঘন অন্ধকারে ওদেরই তো রহস্যময় রাজত্ব! অনেক সময় ধরে সে ঐ ভাবেই পড়ে থাকে, উঠে দাঁড়াতেও ভয় পায়। কিন্তু যখন সে দেখলো, কোন সচল প্রাণীর অস্তিত্ব আর সেখানে নেই, তার সাধারণ বুদ্ধি ও বোধ ফিরে আসে—সেই বুদ্ধি ও বোধ, যা একজন পাঁড় মাতালেরই থেকে থাকে।

আস্তে আস্তে উঠে বসে সে। ঐ বসা অবস্থাতেই বহুক্ষণ তার কেটে যায়; অবশেষে একটু একটু করে তার সাহসও ফিরে আসে। ভাঙ্গা গলায় হাঁক ছাড়ে:

"মেলিনা!"

তার স্ত্রীর কোন জবাব আসে না।

হঠাৎ তার অন্ধ মস্তিষ্কে এক উষ্ণতার সঞ্চার হয়—এক ভয়ঙ্কর শয়তান সন্দেহ সেখানে ঘোঁট পাকায়। সে নড়ে না চড়ে না, মেঝেতেই ঠায় বসে থাকে, চারদিকে অন্ধকার, তার মনেও সেই আঁধি, সন্দেহ তীব্র, কিন্তু বোধশক্তি তার দুই পায়ের মতনই এলোমেলো বেসামাল।

আবার তীক্ষ্ণ স্বর ধ্বনিত হয়:

"মেলিনা, লোকটা কে, বলো। বলো, সে কে। আমি তোমাকে কিছু করবো না!"

সে প্রতীক্ষা করে। অন্ধকারে কোন প্রত্যুত্তর ভেসে আসে না। তার মাথা এখন গরম, খুব গরম।...

"আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবো। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবো। আমার সঙ্গে ওরা শয়তানি করেছে, যাতে সময়মতো বাড়ি না পৌঁছুতে পারি। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেবো।"

—বিড় বিড় করতে করতে জেরিমি আবার আগের মতন জ্বলে ওঠে:

"মেলিনা, শালী! বল, লোকটা কে ছিল! না বললে তোর আমি বারোটা বাজাবো!"

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ধীর পায়ে সে এগিয়ে যেতে থাকে।

"এই জন্যই আমাকে কাফেতে ঢোকানো হয়েছিল; এই জন্যই আমাকে এত ঘটা করে মদ খাওয়ানো। আরো অনেক রাত্রে আমাকে এভাবে বুরবক বানানো হয়েছে, মদ খেয়ে যেন আমি ঘরে না ফিরতে পারি। কারো সঙ্গে চুক্তি করে মাথুরিন দিনের পর দিন এটা করে যাচ্ছে। ওহ্, শালা, শুয়ার কা বাচ্চা!"

অন্ধ রাগে মাতাল লোকটা এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

"মেলিনা, লোকটা কে ছিল?" সে আবার হুঙ্কার ছাড়ে, "না বললে আমি তোর মাথা গুঁড়িয়ে দেবো। হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এখনো বল!"

এ্যালকহলিক তপ্ততায় উত্তেজিত শিরা-উপশিরায় যেন আগুন ধরে যায়। সে আরো কয়েক পা এগিয়ে একটা গোটা চেয়ার দু'হাতে তুলে নেয়। ওটা নিয়েই ঘরে বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়; তারপর সবেগে ঐ চেয়ারটা আছাড় মারে বিছানার ওপর। সে টের পায়, এইখানে তার বউয়ের তাতানো শরীরটা পড়ে আছে। পাগলের মতন চীৎকার করে বলে, "আচ্ছা, আমি গলা ফাটিয়ে মরছি, আর হারামজাদি এখানে মটকা মেরে শুয়ে আছে।"

প্রচণ্ড জোরে আবার সে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে এক মর্মান্তিক আর্তনাদ ওঠে ঐ বিছানা থেকে। আরো খুন চেপে যায় জেরিমির মাথায়। চেয়ারটার একটা হাতল খুলে যায় এবং সেই হাতল নিয়ে সমানে মারতে থাকে। একসময় সেই মর্মান্তিক আর্তনাদ থেমে যায়।

জেরিমিও হঠাৎ তার মার থামায়। জিজ্ঞেস করে:

"কি এবার বলবি, কে এসেছিল?"

মেলিনার জবাব আসে না।

অতঃপর অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও ক্লান্তিতে মাতাল নাবিক অবশ হ'য়ে পড়ে, মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমের অতলান্তে ডুবে যায়।

পরদিন সকালে ঐ বাড়ির দরজা খোলা দেখে একজন প্রতিবেশী এসে হাজির হয়। সে দেখতে পায়, মেঝেতে শুয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে জেরিমি, তার চারপাশে ভাঙ্গা চেয়ারের টুকরোগুলি ছড়ানো-ছিটনো এবং বিছানার ওপর চাপ চাপ রক্ত ও থেত্‌লানো মাংস!

জোয়েত

Joyett

।। এক ।।

কাফে রিচি থেকে তখন ওরা নেমে এসেছে পথে। জাঁ দ্য সারভিনি ও লিয়ঁ সেভেল। সারভিনি সেভেলকে বললো, "এখন একা থাকলেই ক্লান্তি আসবে। তার চেয়ে চলো, আমরা দু'জন হেঁটে হেঁটে যাই।

সেভেল সায় দিলো, "সেটাই ভালো। হাঁটতে আমার ভালোই লাগে।"

"এখন মাত্র এগারোটা" সারভিনি বললো, "রাত গভীর হবার অনেক আগেই আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবো। ধীরে-সুস্থেই হাঁটা যাক।"

দু'পাশে ঘন গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায় চলমান জনতার গুঞ্জন, হাসি-ঠাট্টা হৈ-হুল্লোড়। গ্রীষ্মের প্রতিটি রাতে এই এক জমাটি পরিবেশ। ইতিউতি দু'দশজন

দল পাকিয়ে মদ্যপানের আসর গড়ে তুলেছে, দৈনন্দিন কাজ-কর্মের পর মেরামত করছে শরীর ও মনকে, এক একটা গোল টেবিল ঘিরে তাদের আসর, টেবিলের উপর ইতস্তত ছড়ানো বোতল ও পানপাত্রগুলি। কাফের উজ্জ্বল আলো এতদূরে এসেও বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওদের ওপর। কখনো সাঁ সাঁ থেয়ে যায় এক্কাগাড়ি, যার লাল-নীল-সবুজ আলো চকিতে এক রঙদার পটভূমি তৈরী করে। খটা-খট ছুটন্ত ঘোড়ার অপসৃয়মান ছায়া, সহিসের মুখের ভগ্নাংশ এবং চৌকো গাড়ি—ছায়াছবির মতো দেখা দিয়েই অদৃশ্য।

দুই বন্ধু হাঁটছে যেন পা গুণে গুণে। পরনে সান্ধ্য পোশাক, হাতে ঝুলছে ওভারকোট, বোতামে লটকানো ফুল, একদিকে হেলানো টুপি ; তারা দুই ভোজনতৃপ্ত যুবক আয়াসে ধূমপান করে এবং অনায়াস-লঘুতায় জনতার ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে চলে হেলতে-দুলতে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য-জীবন থেকেই তারা একে অপরের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ, পারস্পরিক বিশ্বস্ততায় নিশ্চিন্ত। জাঁ দ্য সারভিনির দৈহিক গড়ন নাতিদীর্ঘ, ছিপ্‌ছিপে, মাথায় ঈষৎ টাকের আবির্ভাব, পাতলা ঠোঁট, চোখের দৃষ্টি জোরদার, রাতজাগা পাখিদের মতো লঘু চটপটে। আবাস প্যারিসে, দেহ ছিপ্‌ছিপে হলেও নিয়মিত শরীরচর্চায় মজবুত, অসিচালনায় এলেম্ আছে, হাড়কাঁপা শীতে স্বচ্ছন্দে ঘোরা-ফেরা করতে পারে, প্রতিদিন তুর্কী রীতিতে স্নান সারে এবং ইত্যাকার নিয়মসিদ্ধ তত্ত্বাবধানে তার কোন স্নায়বিক দুর্বলতা নেই। কখনো কখনো বিমর্ষ হ'য়ে পড়লেও ক্লান্তি তাকে গ্রাস করে না, অবয়বে পাণ্ডুরতা এলেও শারীরিক সক্ষমতা তার হ্রাস পায় না। স্বভাবতই সে খুব বেপরোয়া, যদিও মন সহানুভূতিপূর্ণ। বন্ধু মহলে তার এই হাসি-খুশি মেজাজ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অর্থকৌলীন্যের সুনাম আছে। সামগ্রিকভাবে সে জনপ্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন। তার চরিত্রে শহুরে আধুনিকতা লক্ষণীয়। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কিন্তু মন সন্দেহপরায়ণ ; অস্থির কিন্তু সাহস অঢেল ; বিবেচনাশক্তি আছে, যদিও খেয়ালী ; সে সব কিছুই করতে পারে, আবার পারেও না ; সংস্কারবাদী হ'য়েও বিশ্বপ্রেমিক। আয় বুঝেই সে ব্যয় করে। শরীর বাঁচিয়ে তবে ফূর্তি করে। কখনো সে অস্থির, কখনো শান্ত হিম। সুখের খোঁজে সে প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় : আবার জোর করে নিজের উপর কোন কিছুকে সে আরোপ করে না। তার বন্ধু লিয়ঁ সেভেলও যথেষ্ট পয়সার মালিক, দারুণ পৌরুষদীপ্ত চেহারা, পথে বের হলে মেয়েরা মুখ তুলে তাকে দেখবেই। এমন একখানা বিশাল সুদেহ যেন প্রদর্শনীর মডেল হতে পারে। সে আবেগপ্রবণ এবং তার আবেগপ্রবণতার বহু গল্প প্রচলিত আছে। অনেক সুন্দরীর স্বপ্নভঙ্গের গৌরব সে অর্জন করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে বঁদেভিলে পৌঁছে যাবার পর সেভেল জিজ্ঞেস করে, "মহিলাটি কি জানে, আমিও তার কাছে যাচ্ছি ?"

সারভিনি হেসে বললো, "মারসিঅনেস ওবারদিকে সেটা পূর্বাহ্নেই জানাবার কোন দরকার নেই। সে নিজেই জেনে নেবে, তুমি কে। গাড়ির একটা বিশেষ কোণে বসবার আগে তুমি কি কখনো ড্রাইভারের অনুমতি চেয়ে নাও ?"

বিস্মিত সেভেল বললো, "মেয়েটার আসল পরিচয়টা এবার দেবে কি ?"

"হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া এক রমণী," বন্ধু জবাব দেয়, "স্বভাবে ভীষণ চালাক, প্রায় বর্ষীয়সী শয়তানী অথচ ওর প্রতি লোভ জাগবেই। ঈশ্বর জানেন, কবে ও এই পৃথিবীতে এসেছিল এবং কি ভাবে নিজেকে এমন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। অবশ্য এসব নিয়ে আমাদের মর্মপীড়ার কোন মানে হয় না। দৈহিক সেই ব্যাপারটা বাদ দিলে এখনো সে যেন ষোল আনা কুমারী। লোকমুখে শুনেছি, তার বালিকা বয়সে নাম ছিল ওকতেভি বারদিন, বর্তমানে যার সংক্ষিপ্তকরণ দাঁড়িয়েছে—ওবারদি। কামনা চরিতার্থ করবার মতো মহিলা বটে। মনে হয় তুমি তোমার জাঁদরেল স্বাস্থ্য নিয়ে সহজেই তাকে আকর্ষণ করতে পারবে। ব্যাপারটা হবে হারকিউলিসের সঙ্গে মোনালিসার যোগাযোগের মতো তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য তোমাকে যে সেখানে খদ্দেরের ভূমিকা নিয়েই যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। প্রবেশদ্বার সেখানে সকলের কাছে অবারিত, কিন্তু ভোগ বা ভালোবাসায় মেতে ওঠা-না-ওঠা নিজের ইচ্ছা ও রুচির ব্যাপার।

আজ ঠিক মনে নেই, কবে প্রথম তার সঙ্গে আমার মুলাকাৎ হয়েছিল। হয়তো সেখানকার জুয়ার আড্ডা আমাকে আকর্ষণ করে থাকবে। জানোই তো, পুরুষরা স্বভাবতই বদচরিত্রের হয় এবং মেয়েরা তাদের কাছে নিজেদের সহজলভ্য করে তোলে। ওখানে যে সব ডাকসাইটের মানুষের সমাগম হয়, তাদের আমার ভালো লাগে। তারা কারুর তদ্বির-তদারকের ধার ধারে না, এক একজন স্বয়ং সম্রাট; প্রায়শই তারা বিদেশী, অভিজাত পরিবারের, অবশ্য তাদের ভিড়ে জনাকয়েক ছদ্মবেশী বিদেশী গুপ্তচরও ঘুরে বেড়াচ্ছে। মামুলি উস্কানিতেই তারা নিজেদের বংশকৌলীন্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে শুরু করে, বুক চিতিয়ে নিজেদের পদমর্যাদা ঘোষণা করে—ওরা ধুরন্ধর দুঃসাহসী ইস্কাবনের টেক্কা, মিথ্যার তুবড়ি ফাটাতে ওস্তাদ।...

আমার যে শুধু ওদের ভালো লাগে, তা নয়; আমি ওদের রীতিমত সমীহ করি। ওদের সঙ্গিনী ও অর্ধাঙ্গিনীরাও এক একটি ডানাকাটা পরী, যাদের মুখে-চোখে বিজাতীয় অসংযমের ছাপ, অজ্ঞাত অতীতের হাতছানি, জীবনের অর্ধেকটাই হয়তো কেটেছে চরিত্র-সংশোধনী বিদ্যালয়ে। রূপসীদের চোখগুলি অসাধারণ, চুলের ব্যবহার অকল্পনীয়, লীলায়িত যৌবন মনঃপূত হবেই, চাকচিক্যের ঝল্‌কানিতে মাথা ঘুরে যায়, বুকে বাজে ঝড়ের সংকেত!

মারসিঅনেস ওবারদি এই সব শ্রীমতীদেরই একজন। অবশ্য বয়স পড়তির দিকে, যৌবনে ধরেছে ভাটার টান, তবু যা আছে মাথা চিবিয়ে খাবার পক্ষে যথেষ্ট—মক্ষীরাণীর মতো শুষে খাবে। ওর আবাসে ফূর্তি করবার মতো অজস্র উপাদান। বসেছে সেখানে জুয়ার আড্ডা, চলছে নাচ গান, সান্ধ্য ভোজের অহরহ জমাটি আসর।"

"মনে হচ্ছে তুমি যেন ওর প্রেমে পড়েছো!"—সেভেল মন্তব্য করলো।

সারভিনি বললো, "মোটেই না। তেমন সম্ভাবনাও নেই। আমি যাই তার মেয়ের আকর্ষণে।"

"ও, তাহলে তার একটি মেয়েও আছে?"

"আরে সে-ই তো মুখ্য আকর্ষণীয়া! কি যে তার রূপ, ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না! দীর্ঘাঙ্গী কিশোরী—মাত্র আঠারোতে পা দিয়েছে। তার মা ঈষৎ শ্যামলী হলেও সে কিন্তু দারুণ অগ্নিবর্ণা। হাসিতে উচ্ছলা, প্রাণময়ী, নাচের আসরে অনন্যা। কোন্ ভাগ্যবান যে তাকে প্রথম পূর্ণভাবে উপভোগ করবে, ভগবান জানেন। আমার মতো আরো অন্ততঃ দশজন প্রার্থী ঘুর ঘুর করছে তার পিছনে।

ওবারদি জানে তার মেয়েই এখন আসল মূলধন। সামনে মেয়েকে রেখে ধনাঢ্য খদ্দেরদের পাকড়াচ্ছে সে। কিন্তু আসল বেলা টুঁ টুঁ—মেয়েকে কারুর দিকে পুরোপুরি ঠেলে দিচ্ছে না সে। মনে হয়, মস্ত দাঁও মারার মতলবে আছে—হয়তো আমার চেয়েও পয়সাওয়ালা ছোকরাকে পাকড়াবার স্বপ্ন দেখছে! তবে আমি তোমাকে বলে রাখছি, সুযোগ যদি একবার পাই ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই।

রূপসী কন্যাটির নাম জোয়েত। দেখলেই আমার মাথা ঘুরে যায়। বিচিত্র রহস্যময়ী। আজও ওকে চিনতে পারলাম না। কখনো মনে হয় ওর মতো নিষ্পাপ অনাঘ্রাত কুমারী আর হয় না। আবার কখনো মনে হয় ওর মতো ছেনাল মেয়েমানুষ দুটি নেই!

নিশ্চয় কোন রাজপুরুষ একদা ওর মায়ের শয্যাসঙ্গী হয়েছিল এবং তারই ফলশ্রুতি ঐ অনুপমা! চলো দেখবে।"

সেভেল হো-হো করে হেসে ওঠে, "তুমি দেখছি মেয়েটার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছো।"

"না তেমন দুরবস্থা আমার হয়নি। তবে ওর যৌবন আমাকে প্রলুব্ধ করে, নিছক কামনার তাড়নায় আমি অস্থির হ'য়ে উঠি। কিন্তু এটাও বুঝি—ও একটি মারাত্মক ফাঁদ মাত্র! তৃষ্ণার্ত মানুষের কাছে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল যেমন রমণীয়, আমার কাছেও জোয়েত ঠিক তাই। মোহাবিষ্ট অন্তরে ওর দিকে গুটি গুটি এগিয়ে যাই কিন্তু মন সর্বদা সন্দিগ্ধ—মেয়েটা আমাকে লেজে খেলাচ্ছে না তো? ওর সান্নিধ্যে এলে মন গলে যায়, আবার সময় সময় নিজেকে প্রতারিত বোধ করে খুব বিরক্ত হই। কখনো মনে হয়, সুন্দরী বড় সরলা, আবার পরক্ষণেই মন সন্দেহে দুলে ওঠে। এ এক অস্বাভাবিক চরিত্র, কিছুতেই মুঠোর মধ্যে আটকাতে পারছি না।"

সেভেল তৃতীয়বার তার মন্তব্য জানায়, "তুমি মজেছো দোস্ত, তোমার আর উদ্ধার নেই! জোয়েতের কথা বলতে গিয়ে একেবারে যে ক্রবাদ্রের চারণ গান গাইতে শুরু করলে! আত্মানুসন্ধান করো, ঠিক বুঝতে পারবে, মন তোমার প্রেমে কানায় কানায় পূর্ণ।"

"বেশ তবে তাই। ওকে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা যদি প্রেমের লক্ষণ হয়, আমি প্রেমে পড়েছি। অহরহ জোয়েত আমাকে ঘিরে রেখেছে। সময় সময় আমার ভেতরে যে ক্লান্তি নেমে আসে, তার কারণ ঐ কন্যাটি। কিন্তু একটা কথা সত্যি—আমি ওকে কখনো বিয়ে করবার স্বপ্ন দেখি না।...ব্যবহার তার প্রায়ই গণিকাসুলভ, কিন্তু ধরা দিতে রাজি নয়। দশজনের সামনে এমন ব্যবহার করবে

যেন সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী। অথচ নির্জনে যখন আমরা মুখোমুখি হই, যখন আমি তাকে অধিকার করতে উন্মুখ হই তখন সে এমন উপেক্ষার ভাব দেখাবে যেন আমি তার অনুজ অথবা অনুগত নফর।

আমি জ্বলে উঠি। ধারণা করি মায়ের মতো জোয়েতেরও অসংখ্য নাগর জুটে গেছে ইতিমধ্যেই। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে নিজেকে প্রবোধ দিই, সংসার সম্পর্কে মেয়েটি বড় অনভিজ্ঞা।

খুব গল্পের বই পড়ে। আমি আপাতত ওকে শুধু বই যুগিয়ে যাচ্ছি, আমাকে ডাকে 'লাইব্রেরীয়ান' বলে। প্যারীর প্রকাশকরা যত নতুন বই ছাড়েন বাজারে, তার প্রত্যেকটিকে আমার সংগ্রহ করতে হয় নিছক ওকে খুশি করবার জন্য। মনে হয়, যত রাজ্যের আবোল-তাবোল বই পড়েই মানসিকতাটা তার এমন উদ্ভট হ'য়ে উঠেছে। হাজার পনেরো উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবনদর্শন গঠন করতে গেলে এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হবেই।

তবু ধৈর্য ধরে আছি। বিয়ে করবো না নির্ঘাৎ। অসংখ্য গুণমুগ্ধদের একজন হ'য়ে থাকবো। যদি বুঝি এ মেয়ের কাছে থাকা আর উচিত নয়, সবচেয়ে আগে আমি কেটে পড়বো। বিবাহিত জীবন তার নসীবে নেই। ওবারদি ওরফে ওকতেভি বারদিনের মেয়েকে আবার বিয়ে করতে যাবে কোন্ আহাম্মক? কেউ করবে না। প্রথমতঃ, ওর কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। বনেদী গণিকার ঘরে জামাই হতে কেউ রাজি হবে না। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত পরিবারের কেউই এগিয়ে আসবে না ঐ উপরচাকচিক্য কন্যাকে উদ্ধার করতে! তৃতীয়তঃ, জোয়েতের মার নজরটি উঁচু। সে খুঁজবে ধনী পাত্র, যা তার মেয়ের কপালে কোন দিনই জুটবে না।

একেবারে গরীব লোকদের কথা বলছো? তারা আরো বেশী জন্মগত ও ঐতিহ্যগত পরিচয়টা খুঁটিয়ে দেখে। বারবণিতার মেয়েকে কখনোই স্ত্রীর মর্যাদা দেবে না।

তাই জোয়েতের পক্ষে সম্ভব একমাত্র সন্ন্যাসিনী হওয়া। কিন্তু মঠবাসিনী হবার মতো মানসিকতা তার নয়। অতএব পথ তাকে একটাই বেছে নিতে হবে এবং তা হলো পুরুষদের নিয়ে প্রেম-প্রেম খেলা। আজ না হলেও একদিন না একদিন তাকে সেখানে নেমে আসতে হবেই। এটাই তার নিয়তি। রূপসী কিশোরী একদিন ভরা যৌবন পাবে এবং তার শরীরে সেই যৌবনের ঢল নামাবো আমি।

আমি একা নই, আরো কয়েকজন সেই বাসনায় ঘুর ঘুর করছে। একজনের নাম মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো, জাতে ফরাসী; একজন রাশিয়ান, যে নিজেকে প্রিন্স ক্রাভালো বলে জাহির করে; অপর এক প্রণয়প্রার্থী কাভেলিয়ার ভলরেলি, ইতালিয়ান। প্রত্যেকেই প্রেমে পাগল হ'য়ে ছুটছে—ছুটছে, কে যে জিতবে, দৈব জানে! এরা ছাড়াও আরো কয়েকজন অপটু খেলোয়াড়ও রয়েছে এই আসরে।

মারসিঅনেস্ কিন্তু খুব সতর্ক—সর্বদা চোখে চোখে রাখে মেয়েকে। তবু ওরই মধ্যে মনে হয়, আমাকে যেন সে একটু বেশী প্রশ্রয় দেয়! কেন না, সে জানে আমি ধনী; অন্যদের সম্পর্কে তার সে রকম কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

আর তাদের আবাসটি অপূর্ব। বিনা নিমন্ত্রণে যাচ্ছি বলে এতটুকু অসুবিধে হবে না। যতরাজ্যের অপ্সরারা নিজেদের রূপের ডালি মেলে আছে চড়া দাম পাবার আশায়। পরিবেশে কিন্তু দারুণ সম্ভ্রান্ত এবং অনভিজ্ঞ লোকেরা ঐ স্থানের মাহাত্ম্য ধরতেই পারবে না।"

বলতে বলতে ওরা এসে গেল সাঁজেলিজির মোড়ে। মৃদু বাতাস আলতো পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়। আবছা আবছা অন্ধকারে কারা যেন সব আলাপরত।

সারভিনি বললো, "শোন, তোমাকে কিন্তু ওখানে আমি কাউন্ট সেভেল বলে পরিচয় দেবো। নতুবা নিছক সেভেলকে কেউ পাত্তাই দেবে না।"

সেভেল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে, "না কখনো নয়। আমি ওসব ফালতু উপাধি বয়ে বেড়াতে পারবো না, একটি দিনের জন্যও নয়। দোহাই, এরকম কিছু বলে বসো না।"

সারভিনি হাসে, "ভয়ের কি আছে? আমারও তো একটা মিথ্যা পরিচয় আছে ওখানে—ডিউক দ্য সারভিনি। এ উপাধি দিব্যি বয়ে বেড়াচ্ছি সেখানে, কোনদিন তো বেকায়দায় পড়তে হয়নি। বরং এরকম একটা পরিচয়পত্র না থাকলে ঐ আসরে স্থান লাভ করা সহজ নয়।"

তবু সেভেল খুঁত খুঁত করে, "বাপু, তুমি বড়লোকের ছেলে, তোমার ওসব ভড়ং মানায়। আমার কাছে আমার সাদামাটা পরিচয়টাই সর্বোত্তম।"

সারভিনি তখনো যুক্তি দেখাচ্ছে, "সাদামাটা মানুষটি সেজে গেলে সেখানে চলে না। ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। তোমাকে আমি বানিয়ে দেবো উত্তর মিসিসিপির জাঁদরেল কাউন্ট। কেউ সন্দেহ করবে না। খাতির বেড়ে যাবে শতগুণ।"

"না ভাই, আমাকে এসব যাত্রাদলের রাজা হওয়ার হাত থেকে রেহাই দাও।"

"ধ্যাৎ, তোমাকে আর বোঝানো গেল না। জান তো, এমন অনেক দোকান আছে, যেখানে মেয়েরা ঢুকলেই একগুচ্ছ ভায়োলেট উপহার দেওয়া হয়? এখানেও সেটাই রেওয়াজ, তবে একটু অন্যভাবে। ঘোষণা না করলেও ওখানকারই কেউ তোমায় কাউন্ট উপাধি দিয়ে বসবে।"

ইত্যাকার আলোচনায় রত তারা দু'জনে একসময় সেই সুন্দর বিশাল দ্বিতল অট্টালিকায় গিয়ে উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনাকয়েক উর্দিপরা পরিচারক ছুটে এসে তাদের অভিবাদন জানায়, হাতের ছড়ি ও কোটগুলি তুলে রাখে। সেভেল মুগ্ধ না হয়ে পারে না। রাশি রাশি ফুল আর সুন্দরীদের হাট বসেছে যেন। সুগন্ধে বাতাস ম ম।

বাহারে দাড়িসমেত সৌম্যদর্শন বিপুলদেহী একটি লোক এগিয়ে আসে, ঈষৎ ঝুঁকে সেভেলের পরিচয় জানতে চায়, "আপনার নাম?"

জবাব দিলো সারভিনি, "মঁসিয়ে সেভেল।"

মুহূর্তে উচ্চকিত স্বরে ঘোষিত হলো: আমাদের নতুন বন্ধু মঁসিয়ে ব্যারণ সেভেল এসেছেন মঁসিয়ে ডিউক সারভিনির সঙ্গে।

একনম্বর ঘরটিতে হরেক সুন্দরীর সমাবেশ। প্রত্যেকেই যতটা সম্ভব বুকের বাঁধন খুলে নিজের যৌবন জাহির করছে, স্বচ্ছ বসন ভেদ করে শরীরের তরঙ্গায়িত খাঁজগুলি অতিমাত্রায় স্পষ্ট।

গৃহকর্ত্রী তার মুখের সুন্দর হাসিটি ফুটিয়ে এগিয়ে এলো। চমকে দেবার মতো রূপ বটে। রাশি রাশি মেঘবরণ কুন্তল, ছোট্ট কপালে তারই কয়েকগাছি হিল্লোলিত, অটুট স্বাস্থ্য, বয়সের সামান্য ছাপ পড়লেও মাদকতা অটুট, শিল্পীর তুলিতে আঁকা যেন দুটি চোখ, বাঁশির মতো নাক, কণ্ঠস্বরে বুঝি মধু নামে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। স্বর তো নয় যেন প্রবহমান নদীর কুলু কুলু রব, শ্রোতাকে মোহাবিষ্ট করে রাখে।

সারভিনি তার হস্ত চুম্বন করে। সোনার শিকল জড়ানো পাখা সমেত সুন্দরী তার হাতখানা বাড়িয়ে দেয় সেভেলের দিকে। বললো, "ব্যারণ স্বাগত। আমার প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ডিউকের বন্ধুদের জন্য এ ঘরের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে।"

বিশালদেহী স্বাস্থ্যবান যুবক সেভেলের দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে; তার রাঙা ঠোঁটের উপর খুব সূক্ষ্ম একটি কালো দাগ—সরু গোঁফের ছায়া। সম্ভবত কোন আমেরিকান অথবা ভারতীয় প্রসাধনী ব্যবহারের ফলে একটি বিজাতীয় সুগন্ধ বাতাসকে আমোদিত করে রাখছে।

বহু অভিজাত চেহারার লোকেরা ক্রমশই এসে জটলা পাকাচ্ছে। ওবারদি গলার স্বরে মাতৃসুলভ গাম্ভীর্য এনে সারভিনিকে বললো, "পাশের ঘরে আমার মেয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি তার সঙ্গে দেখা করো।"

বলেই সে অন্যান্য অভ্যাগতদের দিকে এগিয়ে যায় এবং যাবার আগে মর্মান্তিক কটাক্ষ ও চোরা হাসি উপহার দিয়ে যায় সেভেলকে।

সারভিনি তার বন্ধুর হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়, "তুমি এখানে নবাগত। দেখতেই পাচ্ছো, চারদিকে মালে মালময়—কোনটা বাসি, কোনটা একেবারে তাজা টাটকা। তবে হ্যাঁ, এখানে সব মেয়েদেরই দর এক। উনিশ বিশ নেই। বাঁ দিকে বসেছে জুয়ার আড্ডা। পয়সার হরিরলুট।

আর ঐ কোণের ঘরটিতো নাচের আসর। ওখানে কোন সামাজিক বন্ধনটন্ধনের মূল্য দেওয়া হয় না; এমন কি, বিবাহিতদেরও বিবাহিত বলে গণ্য করা হয় না। ওখানেই লালিত হচ্ছে আমাদের আশা। বাৎসল্যরসের আদিখ্যেতাও দেখতে পাবে। দেখবে, মেয়ের জন্য মায়ের কত দরদ। সব ন্যাকামি। চলো, দেখবে।"

তারা তরতরিয়ে এগিয়ে চলে, সুন্দরীদের অভিবাদন জানায়। প্রায় পনেরো জোড়া নারী পুরুষ জোড় বেঁধে নেচে চলেছে...অনাবৃত দেহ-প্রদর্শনে মাতা ও কন্যাদের প্রতিযোগিতা চলেছে।

হঠাৎ এক দীর্ঘাঙ্গী রূপসী ভিড় ঠেলে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, গলার সুর ভুঙ্গে তুলে বলে, "এই যে মাস্কেদ! কেমন আছো প্রিয়?"

সর্বাঙ্গে তার অপূর্ব দ্যুতি, গাত্রবর্ণ স্বর্ণসমান, ঈষৎ রোমশ আবরণ কামনার বহ্নিকে দ্বিগুণ করে। সহজ, স্বচ্ছন্দ তার চলার গতি, গলার স্বর মায়েরই মতো মাদকতাপূর্ণ। প্রথম দর্শনেই যেন এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা স্মৃতির দর্পণে ছাপ রেখে যায়।

"মাস্কেদ মাস্কেদ," আবেগে সে বলে, "কি খবর তোমার?"

অপ্রতিরোধ্য আবেগে সারভিনি তার করমর্দন করে, "মাদময়জেল জোয়েত, এসো পরিচয় করিয়ে দিই—এ আমার দোস্ত, ব্যারণ সেভেল।"

অপাঙ্গদৃষ্টি হেনে নবাগতকে সে অভ্যর্থনা জানায়, বলে, "খবর শুভ তো? আচ্ছা, আপনি কি বরাবরই এমন লম্বা?"

এই অভদ্র উক্তিতে বিরক্ত হয় সারভিনি, ঝাঁঝালো গলায় বলে, "না, না, তোমার মাকে খুশি করবার জন্য ও আজ এতটা লম্বা হ'য়ে এখানে ঢুকেছে।"

কিশোরী মিষ্টি গলায় কিন্তু উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করে, "খুব ভালো কথা। তবে আমার কাছে যখন আসবেন, তখন একটু ছোটখাটো চেহারা নিয়েই আসবেন। আমি আবার মাঝারি চেহারার লোকদেরই পছন্দ করি কিনা! যেমন ধরুন, এই মাস্কেদ—মাথায় প্রায় আমারই সমান।" তারপর সারভিনির দিকে চেয়ে বলে, "চলো, আমরা দু'জন জুড়ি বেঁধে নাচি।"

সারভিনি নিঃশব্দে ওর কোমর জাপটে ধরে ঝড়ের বেগে নাচের আসরে প্রবেশ করে। শুরু হলো তাদের বন্য নাচ, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, ঐ নাচে কামনা—রক্তে আগুন ধরায়, দুটি দেহ ঘনিষ্ঠ...ঘনিষ্ঠতর, দারুণ শক্তিতে সারভিনি রূপসীকে জাপটে ধরে আছে তার বুকের ওপর, কিন্তু তাদের সচল পদযুগল কখনো ছন্দচ্যুত হয় না। এ নাচ যেন চলবে অনন্তকাল ধরে, ওদের ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। অন্য সকলে নাচ থামিয়ে নিথর, সবিস্ময়ে দেখছে তাদের যুগলনৃত্য। একসময় ওরা থেমে যায়। গোটা হলঘর ফেটে পড়ে সমবেত করতালিতে।

দেখা গেল, জোয়েত যেন লজ্জায় ফাগরক্তিম, তার নীল চোখ দুটিতে সংকোচ। আর সারভিনির রীতিমত হাঁপ ধরে গেছে, একটা কপাট চেপে ধরে দম নিচ্ছে।

প্রথম মুখ খুললো জোয়েত, "তোমার শক্তি সীমিত মাস্কেদ।"

সারভিনি হাসে, তার দৃষ্টিতে লোভ ও কামনা।

জোয়েত বললো, "পারো আবার ধূর্ত বেড়ালের মতো লাফিয়ে পড়তে?... চলো, দেখি কোথায় রয়েছে তোমার বন্ধু।"

সারভিনি তার হাত ধরে হলঘর পার হয়।

সেভেলের সময়টাও খারাপ যাচ্ছে না। সে উত্তাপ সংগ্রহ করছে অভিজ্ঞ মারসিঅনেস ওবারদির কাছ থেকে। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতায় উভয়ের মাদকতা অনস্বীকার্য। যদিও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা, সেভেল মুগ্ধ হ'য়ে শুনছে ওবারদির প্রতিটি কথা। কোন নারীর কণ্ঠস্বর যে এত তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, তার ধারণা ছিল না।

সারভিনিকে দেখে ওবারদি উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, "এই যে ডিউক, শোন। আমি কয়েক মাসের জন্য বোগিভাঁতে একটা বাড়ি ভাড়া নিচ্ছি। তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে

ওখানে যাবে, তোমার বন্ধুটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। আগামী সোমবার আমরা যাচ্ছি, তোমাদের নিমন্ত্রণ রইলো শনিবার। কেমন ? দারুণ আনন্দ করে ছুটির দিনটা কাটানো যাবে। আসছো তো ?

সারভিনি আবেগে জোয়েতের মুখের দিকে তাকায়। জোয়েত সহজ প্রত্যয়ে হেসে ওঠে, "নিশ্চয় আসবে, এ আবার মতামতের কি আছে ? গাঁয়ে যাবো, দারুণ হল্লা করে সময়টা কাটিয়ে দেবো।"

মারসিঅনেস সেভেলের দিকে তাকায়, "আপনারও কিন্তু আসা চাই।"

সেভেল সম্মতি জানায়, "আমি খুশিই হবো !"

জোয়েত কলকলিয়ে ওঠে, "স্থানীয় লোকদের একেবারে হতবাক করে দেবো আমরা আর আমার অন্য সব গুণমুগ্ধরা ঈর্ষায় জ্বলবে।"

সারভিনি বললো, "সে আর বলতে !"

সেভেল জোয়েতকে প্রশ্ন করে, "আপনি আমার বন্ধুকে সব সময় মাস্কেদ বলে ডাকেন কেন ?"

সরলতার ভান করে জোয়েত, "যারা ম্যাজিক দেখায়, তারা ছোট ছোট মটর দানাকে বলে মাস্কেদ। ও ঠিক সেই মাস্কেদ। মনে হয়, এই তো হাতের মুঠোয় রয়েছে। অথচ, কোন ফাঁকে হাত থেকে টুপ্‌ করে গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।"

সেভেলের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে ঈষৎ অন্যমনস্ক মারসিঅনেস বলে উঠলো, "ছেলেরা কি সত্যি তাই নয় ?"

জোয়েত আব্দারের সুরে বলে, "এবার কিন্তু চট্ করে পালিয়ে যেতে পারবে না মাস্কেদ !"

সারভিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "না, অমন ভুল আর হবে না। তোমার সঙ্গে দিনরাত কাটাবো।"

সঙ্গে সঙ্গে জোয়েতের সুরে কৃত্রিম ত্রাস, "না মশাই, সেটি হচ্ছে না। দিনের বেলা যেমন-তেমন ; রাতে আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবো না।"

"কারণ ?"

অকুতোভয় জবাব, "কারণ, কোন পুরুষের নগ্ন দেহ একখানা দর্শনীয় বস্তু হিসাবে গণ্য হতে পারে না।"

মারসিঅনেস ক্ষোভের সঙ্গে ধমক দেয়, "এ আবার কি ধরনের কথা ! সংযত হ'য়ে কথা বলতে শেখো।"

সারভিনিও সায় দেয়, "ঠিক বলেছেন।"

জোয়েত যেন সামান্য ভেঙ্গে পড়ে, চড়া স্বরে বলে, "ব্যাপারটা আমার সঙ্গেও রীতিমত অপমানকর হ'য়ে যাচ্ছে কিন্তু।" তারপরই সমবেত লোকদের দিকে চেয়ে চীৎকার করে বলে, "কাভেলিয়ার, একবার এদিকে এসো তো—আমাকে এরা অপমান করছে।"

কালো মতো ছিপ্‌ছিপে চেহারার একটি লোক এগিয়ে আসে, বোকা বোকা হাসি নিয়ে বলে, "অপরাধি কে?"

সারভিনির দিকে আঙ্গুল তুলে বলে জোয়েত, "এই্‌ সেই্‌ লোক। অবশ্য আমি ওকে একটু বেশীই্‌ ভালোবাসি, কারণ লোক হিসেবে সারভিনি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয়!"

কাভেলিয়ার বললো, "আমরা অবশ্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি তোমাকে তুষ্ট করতে। হয়তো দক্ষতায় ঘাটতি আছে, কিন্তু আন্তরিকতা সন্দেহাতীত।"

মোটা ধোঁয়াটে গোঁফ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অন্য কে একজন এই্‌ সময় গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে, "অনুগতের অভিবাদন নাও মাদময়জেল জোয়েত।"

উৎসাহের প্রাবল্যে চেঁচিয়ে ওঠে জোয়েত, "আরে, মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো যে!"

সেভেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, "এ আমার অন্যতম অনুরাগী বন্ধু; যেমন চেহারার বহর, তেমনি বুদ্ধি। রীতিমত একজন ফিল্ডমার্শাল, দড়াম ক'রে রেঁস্তরার দরজা খুলে ফেলতে ওস্তাদ।

কিন্তু মাথায় আপনি ওর চাইতেও উঁচুতে। সুতরাং আপনাকে আমি কি নামে ডাকবো? হুঁ, মনে পড়েছে—আপনার নাম দেওয়া হলো জুনিয়র রোদস্‌। দেবতা রোদস্‌ নিশ্চয় আপনার জনক ছিলেন। যাক, করুন আপনাদের সব গুরুগম্ভীর আলোচনা। আমি চললাম। গুড নাইট।" জোয়েত ছুটে গেল বাজনার দিকে।

ওবারদি ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, "তোমরা ওকে সব সময় বড় জ্বালাও। মেয়েটার মেজাজও তাই হ'য়ে উঠেছে খিটখিটে, কতকগুলো বদ অভ্যাসও গড়ে উঠেছে।"

সারভিনি মন্তব্য করে, "তার মানে ও এখনো যথাযথ শিক্ষা পায়নি?"

জবাবে মাদাম উদাসী হাসি হাসলো।

বুকে অনেকগুলি সম্মানের চাকতি ঝুলিয়ে গম্ভীরমুখ একজন লোক এই্‌ সময় এই্‌দিকে এগিয়ে এলো।

তাকে দেখেই্‌ মাদাম স্বাগত জানায়, "এই্‌ যে প্রিন্স, আজ আমার ভাগ্য সত্যি প্রসন্ন!"

সারভিনি লোকটিকে দেখিয়ে সেভেলকে বলে, "প্রকৃতপক্ষে এই্‌ লোকটাই্‌ আমার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী! নাম ক্রাভালো। আর যাই্‌ হোক, জোয়েত দেখতে তো বড় খাসা।"

সেভেলের জবাব—"রূপের দিক থেকে মা ও মেয়ে দু'জনেই্‌ সমান। মা-টির নেকনজর লাভে ইতিমধ্যেই্‌ আমি সফল হয়েছি।"

সারভিনি বলে, "বোকা। মাদাম আগেই্‌ তোমার সম্পর্কে সব জেনে নিয়ে তবে এগিয়েছে।"

এবপর দুই্‌ বন্ধু গেল জুয়ার আসরে। সেখানে টেবিলে টেবিলে দারুণ ভিড়। খেলা জমে উঠেছে। ঝনাৎ ঝনাৎ পয়সা ছুঁড়ে দেবার আওয়াজ শোন যাচ্ছে।...হরেক দেশের হরেক জাতের জুয়াড়ী এসে আসর জমিয়েছে। ফরাসী, আমেরিকান, স্প্যানিশ—এক একজনের মুখাবয়বে এক এক ধরনের অভিব্যক্তি।

সারভিনি সেভেলকে জিজ্ঞেস করলো, "দেখবে নাকি এক দান?"

"এমন ভিড়ে কোন দিন খেলিনি। সুবিধে করতে পারবো না। অন্য একদিন বরং দেখা যাবে।"

"তাই ভালো, চলো, এবার ফেরা যাক।"

দু'জনে সেই জমকালো বাড়ি ছেড়ে নেমে এলো পথে।

সেভেল জিজ্ঞেস করলো, "এই চিত্তাকর্ষক প্রাসাদটির মালিকানা কার?"

সারভিনি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলো, "আমি ঠিক বলতে পারবো না। আগে এক ইংরেজ জমিদারের মালিকানায় ছিল। মাস তিনেক হলো তিনি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। মারসিঅনেস অস্থির স্বভাবের। কখনো অভিজাত লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতায়, কখনো আবার নীচ ও হিংস্র জুয়াড়ীদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে। কিন্তু আগামী শনিবার বগিভাঁতে আমন্ত্রিত হয়েছি শুধু আমরা দু'জনে। শহরের চেয়ে ঐ ফাঁকা গ্রামাঞ্চলে সুযোগ অনেক বেশী পাওয়া যাবে। যাচাই করা যাবে জোয়েতের মানসিকতাটা।"

"আমার অবশ্য আশা কম," সেভেল মন্তব্য করে, "আমি নির্বিকার হ'য়েই থাকবো।"

আবার তারা ফিরে এলো সাঁজেলিজিতে; মাথার উপর বিশাল আকাশে তারারা করছে মিটি মিটি। অদূরে আবছা অন্ধকারে বেঞ্চের উপর তখনো বসে আছে একজোড়া যুবক-যুবতী।

সারভিনি বিড় বিড় করতে থাকে, "যদিও আমাদের জীবনে প্রেম অপরিহার্য, তবু এর চেয়ে জঘন্য বস্তু আর হয় না। এ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, যদিও একঘেঁয়ে নয়। নেহাৎ সাদামাটা ব্যাপার, তবু মানুষের কল্পনা একে করে তোলে দূর নক্ষত্রলোকের স্বপ্ন!...."

একটু থেমে সে আবার বললো, "....তবে জোয়েতের প্রথম প্রেমিক হবার সৌভাগ্যটা বড় কম নয়। একজন প্রেমিকের পক্ষে তা এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা! ...সেই সৌভাগ্যের অধিকারী আমাকে হতেই হবে... জোয়েতকে প্রথম ভোগের সক্ষমতা আমি অর্জন করবোই!"

রয়েল রোডের মোড়ে তারা বিচ্ছিন্ন হলো। বন্ধুকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলো সেভেল।

।। দুই ।।

ওবারদির নতুন বাংলোর নাম ভিলা প্রিতেমস্। এক পাহাড়ী অধিত্যকায় অনুপম অবস্থান। বাংলোর চারদিকে বাগান, বাগানের চারদিকে প্রাচীর এবং যেন প্রায় প্রাচীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রবহমান নদী সেন এঁকে বেঁকে হারিয়ে গেছে মার্লির দিকে। বাংলোর

বিপরীতে গাছ-গাছালিতে ঢাকা সবুজ দ্বীপ ক্রেসি স্বপ্নময়। বাগানে পাতা চেয়ার-টেবিল নদীর দিকে ঘোরানো, যেখানে বসলে দ্বীপ ও ভাসমান কাফে লা গ্রেনোইল নজর কাড়ে।

এখন পরিবেশ সুনসান, বিচিত্র নীরবতা নেমে এসেছে মাটির বুক পর্যন্ত। ঝুপ্ ক'রে ডুব দিলো সূর্য, নদীর জল এখনো রক্তগোলা। সূর্য হয়তো এখন অন্য কোথাও উদিত হবে। এখানে ঘুমের লগ্ন।

খাবার টেবিলে জড়ো যারা তারা খুশিতে ডগমগ। কোন দুশ্চিন্তা নেই, বুক ভরে দম নেয়—মিষ্টি সুবাস। এমন গ্রামীণ পরিবেশে স্বাধীনতার সুখ পরিমাপের বাইরে। সংখ্যায় তারা চারজন; মারসিঅনেসের হাত সেভেলের মুঠোয় এবং জোয়েতের হাত ধরা পড়েছে সারভিনির হাতে।

মেয়েদের সেই শহুরে কৃত্রিমতা এখানে লক্ষণীয় নয়। বিশেষত, জোয়েত যেন এখানে এসেই বদলে গেছে,—তার উপর ছায়া ফেলেছে অদ্ভুত বিষণ্নতা ও গাম্ভীর্য।

সেভেল ওকে প্রশ্ন করে, "আগের চেয়ে তুমি যেন অনেক গম্ভীর?"

জোয়েত বললো, "পরিবেশের গুণ বলতে পারেন। সত্যি, আমার ভেতরে একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে, আমি আর আগের মতনটি নেই। ঋতু বদলের মতো আমিও কি বদলে যাচ্ছি? আমি কখনো পাগলের মতো ব্যবহার করি, কখনো আবার শববাহীর মতো নিশ্চুপ হ'য়ে থাকি। সময়ের তাগিদে আমি যে-কোন কাজ করতে পারি। হয়তো আমি খুনও করতে পারি।...

সকালে উঠেই আমি বুঝতে পারি, সারাটা দিন কেমন কাটবে। পরপর কি করবো, সব আমার মনে গাঁথা। মনে হয়, স্বপ্নে বুঝি আমি নির্দেশ পেয়েছি। কিন্তু আসলে সদ্যপঠিত কোন বইয়ের ভাব আমার উপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলে।"

জোয়েত থামে। আজ তার রূপে আরো মাদকতা। সাদা উলের পোশাক, কত রকম অলঙ্কারে দেহ মোড়া। বক্ষআবরণীর কায়দায় স্তনযুগলের দৃঢ়তা পরিস্ফুট, ঘাড়ের মসৃণ ত্বক চিক্ চিক্ করছে; পোশাকের চেয়েও শুভ্র তার গাত্রবর্ণ, স্বর্ণাভ কেশরাশি তরঙ্গায়িত।

সারভিনি মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বলে, "দিনের চেয়ে রাতে তুমি আরো সুরূপা। প্রতিদিন তোমার এই রূপ যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাই!"

জোয়েত বললো, "তাই বলে চূড়ান্ত কিছু চেয়ে বসো না মাস্কেদ। দুর্বল মুহূর্তে হয়তো রাজিও হ'য়ে যেতে পারি।"

মারসিঅনেসের আনন্দ আর ধরে না। স্বচ্ছ কালো পোশাকের অন্তরাল থেকে পরিস্ফুট তার শরীরের প্রতিটি লোভনীয় খাঁজ। ভরাট স্তনের ওপর দৃঢ়বদ্ধ কাঁচুলিতে রক্তাভ আভাস, এলায়িত কৃষ্ণকুন্তলে একটি রক্তগোলাপ।

তার যত আগ্রহ সেভেলকে নিয়ে। আর সেভেলও পুলকিত এই মূল্যবান নারীর সঙ্গ পেয়ে। রক্তে তার অসংখ্য, অগুণতি আগুনের আবর্ত। চিন্তিত ব্যক্তির মতো সেভেল তার ধূসর দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে সময় সময়।

খাবার টেবিলে মাছ আসবার পর সারভিনি বহুক্ষণ পর মুখ খুললো, "এই যে নির্জনতা, এর একটা স্বকীয় মাহাত্ম্য আছে। আমার তো মনে হয়, কথা বলার চেয়ে না বলে মানুষ মানুষের বেশী অন্তরঙ্গ হতে পারে। তাই নয় মাদাম ?"

মারসিঅনেস বললো, "ঠিক বলেছো। সকলে মিলে একই সুখের কথা ভাবছি। খুব ভালো লাগে।"

কামার্ত দৃষ্টিতে মারসিঅনেস আবার সেভেলের দিকে তাকায়। সেভেলও তার চোখে চোখ রাখে। টেবিলের নীচে অলক্ষ্যে তাদের দৈহিক সংস্পর্শও ঘটে যাচ্ছে সময় সময়।

সারভিনি আবার সোচ্চার হলো, "মাদময়জেল জোয়েত, তোমার খুশি খুশি ব্যবহার দেখে সন্দেহ হচ্ছে, তুমি কারুর প্রেমে পড়েছো। কে সেই বিরল ভাগ্যবান ? প্রিন্স ক্রাভালো ?"

নামটা শুনতেই জোয়েত যেন রেগে লাল, "মাস্কেদ, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো ? প্রিন্স ! ব্যাটা রাশিয়ার মোমে তৈরী একটা প্রাণহীন পুতুল। জীবনে ওটার একমাত্র কৃতিত্ব হচ্ছে—একবার চুল ছাঁটার প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছিল।"

"উত্তম। তা হলে লিস্ট থেকে প্রিন্সের নাম কাটা গেল। এবার আসছে ভাইকোৎ পিয়ারো। সেই কি তোমার স্বপ্নের পুরুষ ?"

খিল-খিল হাসিতে যেন ফেটে পড়ে জোয়েত, "কেন, আমাকে কি কখনো ওর কানে কানে মধু-বর্ষণ করতে দেখেছো ?"

সারভিনি বললো, "তা হলে দু'নম্বর লোকটিও বাদ গেল। বাকি থাকে ক্যাভেলিয়ার ভলরেলি, যাকে স্বয়ং মাদাম একটু নেকনজরেদেখে থাকেন।'

জোয়েত এবারও হাসির ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিলো, "লাসরিমোস্! হা ঈশ্বর! ও তো একজন ভাড়াটে শবযাত্রী। বিখ্যাত কোন লোক মারা গেলেই তার কফিন বইবার জন্য ছুটে যায়। ও যখন আমার দিকে তাকায়, আমি নিজেই যেন শব হ'য়ে যাই।"

"তিনজনই বাতিল হ'য়ে গেলো। তবে কি তুমি এই ব্যারণ সেভেলের প্রেমে মজেছো ?"

"জুনিয়র রোদস্ ? অতবড় একটা পালোয়ানের সঙ্গে কখনো আমার খাপ খায় ?"

"তা হলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, তুমি এই অধমের প্রতি কৃপা বর্ষণ করেছো। কারণ, একমাত্র আমিই বাকি থাকছি। তোমায় যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো!"

"আহ্, মাস্কেদ" উচ্ছ্বসিত জোয়েত বললো, "তোমাকে আমার খুবই পছন্দ প্রিয়। কিন্তু তার অর্থ প্রেম নয়।—তবে বন্ধু হতাশ হ'য়ো না...অপেক্ষা করো, আরও আগ্রহ দেখাও, সবুরে ঠিক মেওয়া ধরবে গাছে।...আরো আনুগত্য চাই তোমার।"

"আমিও তো তোমাকে সবই নিবেদন করতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে—"

"কি তার আগে ?"

"তার আগে চাই তোমার প্রেম।"

"ধরেই নাও, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"কিন্তু—"

"থাক, আজ আর এ প্রসঙ্গ নয়।"

"তথাস্তু।"

অস্তমিত সূর্যের আভায় নদী তখনো রক্তাভ। মারসিঅনেসের মাথায় গোঁজা গোলাপটা যেন আরো লাল। জোয়েতের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে দূরদিগন্তে। মারসিঅনেস সেভেলের হাতে হাত রেখে উত্তাপ উপভোগ করছে। হঠাৎ মেয়ের দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নেয়। সারভিনি সবই খেয়াল করছে। সে প্রস্তাব রাখে, "জোয়েত, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা দু'জনে ঐ দ্বীপে বেড়াতে যাবো।"

জোয়েতের খুশভরা সম্মতি, "চমৎকার প্রস্তাব। শুধু আমরা দু'জনে যাবো, আর কেউ নয়।"

"হ্যাঁ, শুধু আমরা দু'জনে।"

আবার জমাট নির্জনতা। সন্ধ্যার গাম্ভীর্য তাদের দেহে, মনে। জীবনের এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে তাদের মুখে ভাষা নেই। পরিচারকের দলও অদ্ভুত নির্বাক। যে যার কাজ নিঃশব্দে করে যাচ্ছে। ক্রমশঃ আকাশের লালিমা মুছে গেল, কালিগোলা রাত্রি নেমে এলো চরাচরের বুকে।

বহুক্ষণ পরে কথা বললো, "আপনারা কি এখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন?"

মারসিঅনেস জোরের সঙ্গে বললো, "থাকবো, যতদিন ভালো লাগে।"

ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে বাতি। আলোর রঙ শিথিল, বিষণ্ণ। টেবিলের বাতি লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে থাকে পতঙ্গের দল। ওদের জ্বালায় আর ধীরে-সুস্থে খাওয়া গেল না, মদের গেলাসে পোকা পড়ার ভয়। তাড়াতাড়ি তাই খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলতে হলো।

জোয়েত সারভিনিকে বললো, "চলো, এবার আমরা দ্বীপে যাই।"

মারসিঅনেস শান্ত গলায় বললো, "আমরা যাবো তোমাদের সঙ্গে ফেরী ঘাট অব্দি। বেশী রাত করবে না কিন্তু।"

ওরা চলেছে অন্ধকার চিরে। অপ্রশস্ত পথ, হাঁটছে দু'জন দু'জন করে। সামনে সদ্যযৌবনপ্রাপ্তা জোয়েত ও তার সঙ্গী; পিছনে অভিজ্ঞা মারসিঅনেস ও বিশালদেহী সেভেল। মারসিঅনেস আর সেভেলের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট ভেসে আসছে। অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশ নদীর জলে প্রতিবিম্বিত। গোটা নদীতট জুড়ে ব্যাঙের ডাক এবং আকাশে নাইটিঙ্গেল পাখির মধুর সুরতান।

হঠাৎ জোয়েতের খেয়াল হলো, "আরে! মা আর সেই লোকটি তো আসছে না! কোথায় গেল ওরা?"

সারভিনি বললো, "তারা নিশ্চয় ফিরে গেছে। বোধহয় তোমার মার ঠাণ্ডা লাগছিল।"

তারা আবার হাঁটতে শুরু করে।

অদূরে সরাইখানার আলো। মারতিনেত নামে এক জেলে এই সরাইখানার মালিক। ঘাটে একটা বড়সড় নৌকা বাঁধা ছিল। ওরা তাতে চেপে বসে, হাঁক ডাক শুরু করে দেয়। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মাঝি। লগির এক ঠেলায় নৌকা একেবারে মাঝ-নদীতে। জলের ছলাৎ-ছলাৎ রব। আকাশের নক্ষত্র নদীর বুকে চিক চিক করে, তলিয়ে যায়।

দ্বীপে নেমে পড়ে তারা। কী বিশাল বিশাল গাছ। গাছগাছালির মধ্য দিয়ে তারা হাঁটতে থাকে। অজস্র পাখিরা এসে বিশ্রাম নিচ্ছে ঐসব গাছের আশ্রয়ে। পায়ের তলায় হিমেল মাটি। এখানে অপার শান্তি—শান্তি! অনেক দূরে কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে। আশ্চর্য অর্থবহ সেই সুর-তরঙ্গ।

সারভিনি জোয়েতের একখানা হাত ধরলো, তারপর আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরলো ওর কোমর, মৃদু মৃদু চাপ দিতে থাকে নরম মাংসে, ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি ভাবছো, জোয়েত?"

জোয়েত যেন ঈষৎ চমকে ওঠে, "কৈ! কিছু না তো! আমার খুব ভালো লাগছে।"

"তুমি কি আমার কথা একদম ভাবো না?"

"ভাবি মাস্কেদ, একটু বেশীই ভাবি। থাক না এখন ওসব কথা। এই বিচিত্র আরণ্যক রাজ্যে ওসব প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।"

সারভিনি কিন্তু নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না। জোয়েতের উপর ক্রমশই তার চাপ বাড়ছে।

জোয়েতকে প্রবলভাবে নিজের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রাখতে চাইছে। জোয়েত বাধা দিচ্ছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। সারভিনির তপ্ত হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মোলায়েম মসৃণ শরীরের নানা জায়গায়।

আবার সারভিনি কাঁপা গলায় ডাকে, "জোয়েত।"

"বলো।"

"আমি তোমায় ভালোবাসি, জোয়েত। আমি তোমায়—"

"ওরকম করে বলো না মাস্কেদ—"

"কবে থেকে আমি তোমার প্রেমের প্রতীক্ষায় রয়েছি!"

জোয়েত আলাদা হ'য়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সারভিনির বন্ধন কঠিনতর! কামনাতপ্ত পুরুষের বন্ধন থেকে নারীর মুক্তি পাওয়া সহজসাধ্য নয়। দু'জনে মাতালের মতো টলছে।

সারভিনি ঠিক সাহস পাচ্ছে না। এমন একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় সে বহুদিন ধরেই ছিল।

কিন্তু জোয়েতের সম্মতি আছে কিনা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সে বাতুলের মতো ক্রমাগত বলছে, "কথা বলো জোয়েত, কিছু বলো।"

তারপর হঠাৎ তার ধৈর্য হারিয়ে যা[illegible] ঝাপটে ধরে, জোয়েতের মুখখানাকে টেনে আনে নিজের মুখের কাছে, ওর [illegible] চুমু খায়। জোয়েত ছটফটিয়ে ওঠে, "এই! কি অসভ্যতামি করছো!"

সারভিনি টের পায়, জোয়েত রাগ করেনি। তার সাহস ও উৎসাহ প্রবল হ'য়ে ওঠে, সে দু'হাতে জোয়েতের ঘাড় আঁকড়ে ধরে গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল সরিয়ে দিয়ে মসৃণ ঘাড়ে এঁকে দেয় চুম্বন।

এবারে কিন্তু স্পষ্ট প্রতিবাদ। এক ঝটকায় জোয়েত নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করলো।

সারভিনি তবু তাকে ছাড়লো না। তার রক্তে দাবানল! জোয়েতকে একেবারে টেনে আনলো বুকের ওপর, জোয়েতের মুখের ওপর নামিয়ে আনলো নিজের মুখ, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট—দীর্ঘ বলিষ্ঠ চুম্বন।

আনন্দে মাথা ঘুরে গেল সারভিনির। আর সেই সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে পালালো জোয়েত। মুহূর্তে সে অনেক দূরে, চকিতে হারিয়ে গেল তার অপসৃয়মান ছায়া। ঘটনার আকস্মিকতায় দিশেহারা সারভিনি। কিছুক্ষণ সে ওখানে অপেক্ষা করে। কিন্তু জোয়েত ফিরে এলো না দেখে হালকা স্বরে ডাকে: জোয়েত।

কোন সাড়া নেই। নিরেট জমাট অন্ধকার। দৃষ্টির গতি সীমিত। চিন্তিত সারভিনি ঝোপঝাড় সড়িয়ে সড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারে। কোথাও জোয়েত নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?

সারভিনি এবার স্বর সপ্তমে তুলে হাঁক ছাড়ে: জোয়েত! মাদময়জেল জোয়েত!

কোন প্রত্যুত্তর নেই। ভয়ঙ্কর নীরবতা। এমন কি পাখীরাও ডাকে না। অন্ধকারে চলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছে সারভিনি। সমানে ডাকছে: জোয়েত! মাদময়জেল।

মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। না, কোথাও কোন সাড়া নেই। অদ্ভুত নিস্তব্ধ ভূতুড়ে দ্বীপ। হাঁটতে হাঁটতে সে নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ায়। এখানে সে দাদুরী পাখীর করুণ কান্না শুনতে পায়! গোটা বনজ দ্বীপ সে পাতি পাতি করে খুঁজেছে। কোথাও সে জোয়েতের সন্ধান পেলো না। অন্ধকারকে সাক্ষী রেখে প্রায় বিলাপ করে ওঠে সে, "জোয়েত, সাড়া দাও। আমি আর পারছি না। আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম মাত্র। জোয়েত, সাড়া দাও।"

হতাশ, ম্রিয়মান, ঈষৎ শঙ্কিত সারভিনি নদী পেরিয়ে এপারে চলে এলো। চোখের সামনে কাফে লা গ্রেনোইলের আলো। ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। রাতের বয়স এখন মধ্যযৌবন।

প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক সে জোয়েতের সন্ধানে ঐ জঙ্গলময় দ্বীপে চক্কর কেটেছে। নিশ্চয় জোয়েত তাকে ফাঁকি দিয়ে ফিরে এসেছে ঘরে। ভয়কম্পিত অন্তরে ভিলায় প্রবেশ করে সারভিনি।

হল ঘরে একটি চাকর টেবিলের উপর মাথা রেখে ঝিমুচ্ছিলো। সারভিনি তাকে ঠেলে তুলে জিজ্ঞেস করে, "জোয়েত কি ফিরে এসেছে?"

"হ্যাঁ, স্যার। রাত দশটার আগেই তো তিনি ফিরে এসেছেন।"

নিজের ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লো সারভিনি। কিন্তু বিনিদ্র রজনী। সেই একটা তপ্ত চুম্বন সব কেমন ওলোট পালোট করে দিলো। আচ্ছা, জোয়েত কি চায়? বড় রহস্যময়ী! কিন্তু তার জ্বালাময় যৌবন যে সারভিনিকে পাগল করে দিচ্ছে! জীবনে নারী-অভিজ্ঞতা সারভিনির এই নতুন নয়। এর আগে বিভিন্ন ধরনের বহু নারীর সংস্পর্শে সে এসেছে। কিন্তু জোয়েত তাদের মতো নয়, সে অনন্যা।

এমন একটি মেয়ের ভালোবাসা পাবার জন্য পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায়।

রাত একটা!...

রাত দুটো!...

ঘুম নেই। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে কে! গুমোট গরম আর লোনা ঘাম। সারভিনি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালা খুলে দেয়। আঃ! এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস! সে বুক ভরে দম নেয়। নিঝুম কালো রাত!

হঠাৎ সারভিনি খেয়াল করলো, বাগানে এক বিন্দু জোনাকি-আলো জ্বলছে। নির্ঘাৎ এই রাতে ওখানে বসে বসে কেউ সিগ্রেট টানছে। সেভেলই হবে।

আস্তে ডাকে সারভিনি, "লিঁয়।"

জবাব ভেসে আসে, "জাঁ?"

"দাঁড়াও, আমি আসছি।"

শরীরে একটা আবরণ চাপিয়ে বেরিয়ে এলো সারভিনি। বাগানে একটা লোহার চেয়ারে গা এলিয়ে সেগ্রেট টানছে সেভেল।

"এত রাতে এখানে?"

"বিশ্রাম নিচ্ছি"—সেভেলের মুচকি হাসি।

"তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান। আমি এতক্ষণ হতাশার দেয়ালে কপাল ঠুকছিলাম।"

"কি বলছো তুমি?"

"ঠিক বলছি বন্ধু...জোয়েত অন্য জাতের মেয়ে, ওর মায়ের মতো নয়।"

"কি হয়েছে, খুলে বলো।"

সারভিনি তার অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলে। "ঐ মেয়ে আমাকে নাকাল করে ছাড়ছে। আমার চোখ থেকে ঘুম চলে গেল! নারী কী রহস্যময়ী! অথচ, দেখো—সাধারণভাবে জোয়েত কত সাদাসিদে, কিন্তু আসলে মনের তল খুঁজে পাবে না। ও আমার বুদ্ধিনাশ ঘটাবে।"

সেভেল একটু নড়েচড়ে বসে, "সাবধান বন্ধু। ও তোমাকে ঠিক বিয়ের ফাঁদে জড়াবে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে। পড়োনি, সাধারণ ঘরের মেয়ে মাদময়জেল দ্য মাঁতিজেল একদিন এই কৌশলেই সম্রাজ্ঞী হ'য়ে বসেছিলেন? তুমি আবার দ্বিতীয় নেপোলিয়ন না হ'য়ে যাও।"

সারভিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, "না, তার ভয় নেই। আমি সম্রাটও নই, নির্বোধও নই। গণিকার মেয়েকে নিয়ে যৌবনকে তৃপ্ত করা যায়, ঘর বাঁধা যায় না; যাক, তোমার কি ঘুমপেয়েছে?"

"আদৌ নয়।"

"তবে চলো, নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"চলো।"

দুই বন্ধু নদীতট বরাবর মার্লির দিকে এগিয়ে চললো।

তখন গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত। প্রকৃতি ঘুমের অতলান্তে। নাইটিঙ্গেল আর ব্যাঙেরাও ঘুমিয়ে আছে। সারভিনি এখন দার্শনিকসুলভ ভাবনায় ভাবিত। বলতে থাকে, "এই উঠতি কিশোরী আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মে প্রেম চলে না। অঙ্কশাস্ত্রে একের সঙ্গে এক যোগ করলে দুই হয়; আর প্রেমশাস্ত্রে একের সঙ্গে এক যোগ করলে একই হয়।

কিন্তু আমার ও জোয়েতের বেলায় উত্তর 'এক' হচ্ছে না, হচ্ছে 'দুই।' কোন এক রমণীর সত্তার সঙ্গে এক হ'য়ে যাবার অনবদ্য অভিজ্ঞতা কি তোমার আছে? এ শুধু দৈহিক সঙ্গম নয়, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। নর ও নারীর সেই সর্বাত্মক মিলনই বিধাতা পুরুষের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। তবু চূড়ান্ত মিলন বুঝি কখনোই সম্ভব নয়! কি এক সূক্ষ্ম বেদনাময় ব্যবধান থেকেই যাবে! আকাশের তারাদের কাছে হয়তো বা পৌঁছে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু ঐ ব্যবধান অতিক্রম করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।"

"আমার মাথায় ওসব গভীরতা ঢোকে না," সেভেল বললো, "নারীর মনে বা চোখে কি আছে আমি তা বুঝবার চেষ্টাই করি না। তার বাইরেরটুকুতেই আমি খুশি।"

সারভিনি কিন্তু আপন মনেই বলে চলেছে, "জোয়েত—এক বিরাট প্রহেলিকা! জানি না, কাল সকালে আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে!"

আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে আসছে। ঊষালগ্নে প্রকৃতি স্মিত। খামারবাড়ি থেকে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। শুরু হয়েছে পাখীদের একটানা কাকলি।

সেভেল বললো, "এবার আমাদের ফেরা উচিত।"

সারভিনি যখন তার ঘরে ফিরে এলো, পূর্বাকাশে তখন গোলাপী আভা। কপাট বন্ধ করে বিছানায় নিজের শ্রান্ত শরীর এলিয়ে দেয়। মুহূর্তে অপ্রতিরোধ্য ঘুম তাকে অধিকার করে।

ঘুম ভাঙ্গলো যেন কিসের শব্দে। শব্দটা হচ্ছে জানালায়। জানালা খুলতেই হতবাক,—

হলুদ পোশাক পরে জোয়েত সমানে ঢিল ছুঁড়ছে তার জানালাকে তাক করে। সারভিনিকে জানালার কাছে দেখতে পেয়েই নেচে ওঠে, "এই যে মাস্কেদ, এত

বেলা পর্যন্ত ঘুম? কাল সারারাত ধরে কি কম্ম হয়েছে? কোন এ্যাডভেঞ্চার ক'রে এসেছো নাকি?"

"দাঁড়াও আসছি। মুখ-চোখে জল দিয়ে আসছি।"

"তাড়াতাড়ি। দশটা বাজে। এগারোটায় ব্রেকফাস্ট সারবে নাকি?"

বাগানে নেমেই সারভিনি ছুটে এলো জোয়েতের কাছে। ততক্ষণে জোয়েত তার হাঁটুর ওপর একখানা বই খুলে পড়তে বসেছে। সারভিনি তার পাশে গিয়ে বসতেই এমন সহজ সরল ভাব দেখাতে শুরু করলো, যেন গত রাতে অনভিপ্রেত কিছুই ঘটেনি। বললো, "শোন মাস্কেদ, আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে। মা প্রায়ই বলেন, গ্রেনোইলে নাকি ভদ্রঘরের মেয়েরা যায় না। কিন্তু আজ ওখানেই যেতে চাই। তুমি আমায় নিয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে নদীতে হুল্লোড় করবো।"

জোয়েতের প্রসাধনী গন্ধ, যা তার মায়ের মতো উগ্র নয়, আবিষ্ট করে রাখে সারভিনিকে। ওর নির্মল মুখখানা এখন সারভিনির ঠোঁটের নাগালের মধ্যে, আবার নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখা কষ্টকর।

"তুমি আমাকে নিয়ে যাবে তো মাস্কেদ?" জোয়েত বললো, "মা আবার গরম একদম সহ্য করতে পারে না। আর আজ যা উত্তাপ, মনে হয় না দুপুরে উনি ঘর ছেড়ে বেরুবেন। তোমার বন্ধুকে মার প্রহরায় রেখে আমরা দু'জনে বন দেখার ছল করে সোজা চলে যাবো গ্রেনোইলে। কি মজা যে হবে!"

ওরা হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে প্রাচীরের প্রান্তে, সেন নদীর কিনারা অব্দি। এখন নদীর বুকে প্রখর আলোর ঝলকানি। দূরে ঝুল ঝুল কুয়াশাও লক্ষণীয়। কয়েকটি হাল্কা ও মালবোঝাই বোট জল কেটে পার হচ্ছে। স্টিমবোটগুলির সাইরেন বেজে ওঠে থেকে থেকে। ছুটির দিন রবিবার দূর-দূরাঞ্চল থেকে রেলগাড়িতে চেপে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে এই প্রাকৃতিক রাজ্যে খুশির মৌতাত ভোগ করতে।

ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা শুনে ওরা আবার ফিরে এলো। খাবার টেবিলে সকলেই কেমন নিশ্চুপ।

জুলাই মাস। নিদাঘের তপ্ততা সত্যি অসহনীয়। শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বাক্যালাপেও অনীহা। একমাত্র জোয়েতই ছটফটে। দীর্ঘ নীরবতা তার ধাতে সয় না। খাবার-টেবিল থেকে উঠেই নাটকীয় গলায় সে বললো, "এই গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো গাছের ছায়ায় ছায়ায় চরে বেড়ানো।"

মারসিঅনেস বিরক্ত হলো, "কি যা তা বলছো?"

সত্যি, মহিলার মুখে-চোখে গভীর অবসাদ।

জোয়েত বললো, "তোমার আপত্তি থাকলে ঘরে বসে থাকো। ব্যারণও থাকবে। মাস্কেদ আর আমি যাবো পাহাড়ী বনে। ওখানে গিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে বই পড়বো।" তারপর সারভিনির দিকে চেয়ে বললো, "কি, সাড়া দিচ্ছো না যে?"

"আমি তো তোমার ইচ্ছার দাস।"

ছুটে গেল জোয়েত তার টুপিটা আনতে।

"মেয়েটার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে"—অবসাদে শিথিল অঙ্গ ছড়িয়ে দিলো মারসিঅনেস, তার ধবধবে ফর্সা হাতখানা সেভেলের শরীরের খুব কাছাকাছি। সেভেল নীচু হ'য়ে সেই হাতে আলতো চুমু খায়।

জোয়েত আর সারভিনি আবার পাশাপাশি। হাঁটছে খা খা রোদ্দুর পেরিয়ে গাছের ছায়ার দিকে। কিন্তু এখনো সময় হয়নি গ্রেনোইলে যাবার। নদীর পুল পেরিয়ে তারা তাই এলো একটি দ্বীপের অন্তরে, ঝর্ণার ধারে বেড়েওঠা উইলো গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলো আয়াস করে। জোয়েতের হাতে একটা বই। মাস্কেদের দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "তুমি পড়ো মাস্কেদ, আমি শুনি।"

গভীর হতাশার সঙ্গে সারভিনি বললো, "আমি পড়তে জানি না।"

"তুমি তো আদর্শ প্রেমিক মাস্কেদ, যে তার প্রেমের কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। সুতরাং তুমি পড়ে যাও, আমি কান পেতে তার মর্মার্থ উদ্ধার করি।"

বইয়ের নাম দেখেই সারভিনির চোখ চড়কগাছ। নাটক নয়, নভেল নয় এক ইংরেজ বিজ্ঞানীর লেখা কীটতত্ত্বের বই—"পিপীলিকার ইতিবৃত্ত।" সারভিনি হাসবে না কাঁদবে, ভেবে উঠতে পারে না।

জোয়েত তাগাদা দেয়, "কি হলো, শুরু করো।"

সারভিনি বললো, "তুমি কি বাজি ধরেছো, না নিছক আমোদ করছো?"

"সে আবার কি? আমি দোকানে গিয়ে পিঁপড়ের ওপর সবচেয়ে দামী বইখানা নিয়ে এলাম। ভাবলাম, এই দুপুরে ঘাসের ওপর শুয়ে ঐ ক্ষুদে বুদ্ধিমান জীবদের কথা শুনবো এবং এখানে তাদের চলাফেরাও প্রত্যক্ষ করবো। ব্যাপারটা কি মজার নয়?"

অগত্যা সারভিনি পড়তে শুরু করে:

"দৈহিক সাদৃশ্যের দিক থেকে বানরজাতীয় প্রাণীরাই হচ্ছে মানুষের নিকট আত্মীয়। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা ও প্রাত্যহিক জীবন-শৃঙ্খলার দিক থেকে পিপীলিকাদের স্থান মানুষের পরেই। মনুষ্যসুলভ নিপুণতায় তারা তাদের আবাস তৈরী করে, চলন-উপযোগী পথ প্রস্তুত করে, সুবিধার্থে দাস প্রথাকে মদত দেয়..."

একটানা পড়তে পড়তে বিরক্ত সারভিনি জিজ্ঞেস করে, "অনেকখানি তো পড়লাম, এবার ক্ষান্তি দাও।"

ইতিমধ্যে জোয়েত একটি ঘাসের ডগায় সঞ্চরণমান একটি পিঁপড়েকে নিবিষ্ট একাগ্রতায় দেখতে শুরু করেছে। তার ব্যবহারে বিস্ময়ের সঙ্গে অদ্ভুত মমত্ববোধও লক্ষণীয়। জোয়েত নীচু হ'য়ে ছোট্ট কীটটিকে চুমু খেতে যায়। কিন্তু পিঁপড়েটি মুহূর্তে তার গাল বেয়ে চুলের মধ্যে ঢুকে যায়। বিব্রত জোয়েত লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে একশেষ। সারভিনি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে জোয়েতের থোকা থোকা চুল সরিয়ে সেই কীটটাকে উদ্ধার করে এবং জোয়েতের মাথায় আবেগভরে চুমু খায়। বাধা দেয় না জোয়েত।

উঠে দাঁড়িয়ে জোয়েত বলে, "উপন্যাসের চেয়েও উপাদেয় এই পিঁপড়ে উপাখ্যান। চলো এবার গ্রেনোইলের দিকে।"

সেই বিশেষ উদ্যানে গিয়ে দেখলো, ইতিমধ্যেই সেখানে বহু প্রেমিক-প্রেমিকার সমাবেশ ঘটেছে। সব জোড়ায় জোড়ায় জড়াজড়ি করে বসে আছে, কেউ কেউ শুয়ে পড়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরের ঠোঁটে ডুব দিয়েছে, পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে বিলকুল দেহের সঙ্গে দেহ লেপ্টে রেখেছে। নদীতে একাধিক পালতোলা সৌখিন নৌকা বিচরণ করছে। যৌবন ডগমগ যুবক-যুবতীরা হাঁটছে পাশাপাশি, মন উজার করে প্রেমালাপ চলেছে তাদের। একটা প্রকাণ্ড নৌকা ভিড়লো দ্বীপে। বজরা বোঝাই অসংখ্য নারী-পুরুষ, কলকলিয়ে তারা নেমে এলো দ্বীপের মাটিতে। ইতি উতি সুরা পানের আসর, পুরুষ ও নারী সমানে মদ্য পান করছে, হৈ-হুল্লোড়ে মাটি ও আকাশ কম্পমান; কে একজন ওরই মধ্যে বেহালা বাজাচ্ছে, আর একজন ক্যানেস্তারা পিটিয়ে সৃষ্টি করছে বিকট আওয়াজ। সুন্দরীরা আকণ্ঠ নেশা করে দিশেহারা,—বুকের বাঁধন আলগা করে পুরুষদের দেখায় নিজেদের পুরুষ্টু স্তন। নিতম্ব দুলিয়ে দুলিয়ে পাছার বিশালতায় তাক লাগিয়ে দেয়। মাথায় জোকারের টুপি, পরনে সামান্য নেংটি—অর্ধউলঙ্গ এক যুবক একরাশ চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান যুবতীর সঙ্গে মহড়া দিচ্ছে। তাদের হো-হো খিল-খিল হাসিতে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। আর কি সব অশ্লীল খিস্তি! সাঁতারের পোশাক পরে নর-নারীর উদ্দাম জলকেলি, জাপটা-জাপটি এবং খিস্তি-খেউড়!

সারভিনির কিন্তু ভালো লাগছে না। তার গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। কিন্তু সে অবাক হচ্ছে এই পরিবেশে জোয়েতের স্ফূর্তি দেখে। মনে মনে সে জোয়েতের রুচির নিন্দা না করে পারছে না। জোয়েত ঐ সমস্ত মেয়ের দেহ, যৌবন ও চুলের প্রশংসা করছে। মদ্যপায়ীদের বেলেল্লাপনা, গেলাস ভাঙা, তার ভিতর খুশির শিহরণ জাগাচ্ছে। অদ্ভুত!

আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো জোয়েত, "মাস্কেদ, আমার যে কী মজাই লাগছে!"

সারভিনি নির্বিকার, গম্ভীর।

জোয়েত বললো, "মাস্কেদ, আমরা নদীতে স্নান করবো।"

"যেমন তোমার অভিরুচি!"

স্নানের পোশাক পরে তারা নদীতে নেমে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করে। জলে যেন জোয়েত সত্যি জলকন্যা, দু'হাতে জল কেটে তরতরিয়ে এগিয়ে যায়, কখনো চিৎ সাঁতারে ভাসমান রাখে তার গোটা শরীরটাই, কখনো বা গভীর জলের মাছের মতো দেয় ডুব। ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বেদম সারভিনি, নিজের অক্ষমতায় রাগ হচ্ছে তার। জলের বুকে পদ্মের মতো দেহ ভাসিয়ে জোয়েত তাকিয়ে আছে নীল আকাশের দিকে। সারভিনি লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে ওর সিক্ত চিক্কণ তনু, জলের

উপর ওর দেহের প্রতিটি রেখা এখন দৃষ্টিপাত হয়। অনিবার্য কামনায় ছটফটিয়ে ওঠে সারভিনি, যদিও করণীয় কি ভেবে উঠতে পারছে না।

সেই সময় জোয়েত বলে উঠলো, "ও প্রিয়! তোমার মাথাটি তো চমৎকার!"

বিদ্রূপে অপমানিত সারভিনি জ্বলে ওঠে, "এই জীবনটাই বুঝি তোমার পছন্দ?"

"কোন্ জীবনের কথা বলছো?"— জোয়েতের সরল জিজ্ঞাসা।

"ন্যাকামি করো না। আমার কথা বুঝবার মতো বুদ্ধি তোমার যথেষ্ট আছে। ... ঢের হয়েছে, এবার ফিরে চলো।"

"বিশ্বাস করো, আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনি।"

অনেক ফূর্তি তো হলো, এবার ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে চলো।"

"কিছুই বুঝছি না ছাই!"

"বোকার ভান করো না জোয়েত। কাল রাতেই তো টের পেয়ে গেছো, আমি কি চাই।"

"কি টের পাবো? এ মা, আমি একদম ভুলে গেছি!'

"ভুলে গেছো? ঘটনার সারার্থ হলো, আমি তোমাকে প্রেম জানাবো।"

"তুমি?"

"বিলকুল আমিই!"

"মিথ্যে কথা!"

"ভগবানের দিব্যি।"

"প্রমাণ দাও!"

"এর চেয়ে বড় প্রমাণ দিতে আমি চাই না।"

"দাও প্রমাণ।"

"কাল রাতে তো তোমার বাসনা আমি জানিনি।"

"কাল রাতে সেই সময় প্রমাণ চাইলেই তো পারতে।"

"যত সব বাজে কথা।"

"তা ছাড়া এসব কথা তো শুধু আমাকে বললেই চলবে না।"

"আর কাকে জানাতে হবে?"

"অবশ্যই আমার মাকে!"

সারভিনি বাঁকা হাসি হাসে, " তোমার মাকে! খুব এক বড় শর্ত হ'য়ে যাচ্ছে নাকি?"

সারভিনির কথা শুনে বিবর্ণ হ'য়ে যায় জোয়েত। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সারভিনির মুখের দিকে চেয়ে বলে, "মাস্কেদ, তুমি যদি ভালবেসে আমাকে বিয়ে করতে চাও, অবশ্যই আমার মায়ের অনুমতি তোমার চাই।"

মেজাজ হারিয়ে গেল সারভিনির, "তুমি কি আমাকে তোমার আর সব চাটুকারদের মতো গর্দভ মনে করো নাকি? তোমার চালাকি আমি ঠিক বুঝি।"

"এতে তুমি চালাকির খোঁজ কোথায় পেলে ?"

তেতে লাল সারভিনি। গলার স্বর আরো উঁচু পর্দায় তোলে, " জোয়েত, আর ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করো না। যতই সরল কিশোরীটি সাজবার চেষ্টা করো না কেন, ও সব আর তোমায় মানায় না! আমি তো এককথাতেই বলে দিয়েছি,—তোমার প্রতি আমার প্রেম অটুট। এ কথাটা তুমি বোঝ না? এও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ?"

তারা কথাগুলি বলছিল মুখোমুখি সাঁতার কাটতে কাটতে। সারভিনির শেষ কথাগুলির মর্মার্থ বুঝবার চেষ্টা করে জোয়েত। মুহূর্তে সে লজ্জায় লাল হ'য়ে যায়—,গাল থেকে কান পর্যন্ত রক্তের ধারা যেন ছলকে যায়। দ্রুত সাঁতার কেটে ছুটে গেল সে তীরের দিকে। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হাঁপ ধরে যায় সারভিনির। তার অসহায় দৃষ্টির সামনে জোয়েত জল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা চলে গেল পোশাক বদলাবার ঘরে, একবারও পিছন ফিরে তাকায় না।...

সারভিনি ভেবে পায় না, তার এখন কি করা উচিত। জোয়েত রাগ করেছে নির্ঘাৎ। সে কি গিয়ে ক্ষমা চাইবে ? না, রাগ না পড়া অবধি অপেক্ষা করবে ?...আশ্চর্য! জোয়েত পোশাক বদলে একাই ফিরে যাচ্ছে। ক্লান্ত সারভিনিও ব্যবধানে থেকে ফিরে চললো ভিলার দিকে।...

ভিলার গোলাকার বাগানে পায়চারীরত ওরা দু'জনে— সেভেল ও মারসিঅনেস, হাতে-হাত, মুখে মধুর আলাপ। গত রাত থেকেই তারা দু'জনে ক্রমশ সাহস সংগ্রহ করছে ঘনিষ্ঠতর-ঘনিষ্ঠতম হবার উদগ্র বাসনায়। সারভিনিকে আসতে দেখেও সেভেলের সংস্পর্শ থেকে সরে গেল না মারসিঅনেস। বললো, "কি ব্যাপার ? রোদে ঘোরাঘুরি করে জোয়েত তো অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে! মুখচোখ লাল। বিছানায় পড়ে আছে। একটু দেখে এসো। তখনই বারণ করেছিলাম, রোদে টো টো করিস না। কে কার কথা শোনে! আর তোমারও বাপু বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পাচ্ছে!"

জোয়েত ডিনার খেতেও এলো না। জানিয়ে দিলো, তার খিদে নেই এবং সে একটু একা থাকতে চায়।

রাত দশটার ট্রেনে সেভেল ও সারভিনি ফিরে গেল। যাবার আগে জানিয়ে গেল, আগামী বৃহস্পতিবার তারা আবার আসবে। শিথিল দেহ এলিয়ে খোলা জানালার সামনে একাকী বসে রইলো মারসিঅনেস। বিচিত্র হিম-নির্জন এই রাত ক্রমশঃ গভীরতর। যে কোন মনকে বিষণ্ণ করে দেয়। গ্রেনোইলের নাচ-গানের হিল্লোলিত শব্দ-তরঙ্গ বাতাসের হাত ধরে ভেসে আসছে এতদূর পর্যন্ত।

সারাটা জীবন ধরে প্রেম আর শরীর বিলিয়ে এসেছে যে অশ্বশক্তিসম্পন্না নারী সেই বহুবল্লভা মারসিঅনেসের মনেও এখন একটা বিষণ্ণ শূন্যতা পাক খায়; এই মুহূর্তে সে ভয়ঙ্করভাবে কামনা করছে শক্তিমান পুরুষ সেভেলকে। এই রকম কামনায় যখন সে জর্জরিত হয়, মারসিঅনেস তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না,—তখন তার পুরুষ চাই-ই!

সে জন্ম-গণিকা। নিজের অফুরাণ কাম-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে; শুরু করেছিল সমাজের নিম্নতলের লোকদের নিয়ে, ক্রমশঃ আকর্ষণ করতে পেরেছে সমাজের ধনী-মানী-সম্ভ্রান্তদের। এ ব্যাপারে *সে পশুসুলভ শক্তি ও বুদ্ধির* অধিকারিণী, বিবিধ প্রকার চুম্বন ও সঙ্গম-রীতিতে যে কোন পুরুষকে পাগল করে দিতে পারে। অজস্র পুরুষ আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে দৈহিক মিলনে তৃপ্ত হয়েছে, অজস্র পুরুষ! কিন্তু মারসিঅনেস কখনো কারুর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েনি, আবার কারুর ওপর বিরক্তও হয়নি। ওই সহজাত নির্বিকারত্ব শ্রেষ্ঠ গণিকার মানসিকতা। মুসাফির যেমন সরাইখানায় ঢুকে খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার করে না, মারসিঅনেসও তেমনি সঙ্গী নির্বাচনে কখনো খুঁতখুঁতে নয়; সে জানে, এটাই তার জীবিকা এবং জীবিকার জন্য বিভিন্ন রুচির মানুষকে সম সঙ্গম-তৎপরতার সঙ্গেই গ্রহণ করতে হবে। তার চিত্ত সদাই প্রসন্ন, অসীম তার ধৈর্য।

তবু ব্যতিক্রম আছে বৈ কি! কোন কোন অতিকায় পুরুষ সময় সময় তার নিস্তরঙ্গ রক্তেও তুফানের বার্তা বয়ে আনে। সে সত্যি তখন জ্বলে ওঠে, অসহ্য সুখে সে জ্বলতে থাকে এবং কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে স্বর্গীয় বিরহে কষ্ট পায়। তার ঐ নিরেট ব্যবসায়িক মনেও স্বপ্ন ও কল্পনার জাল বিস্তারিত হয়। তখন সে মনে মনে নিজের মৃত্যু কামনা করে, আকাশভরা নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে সারাটা রাত জেগে বসে থাকে, তার প্রাজ্ঞ মনেও রং লাগে।

তেমনি একপোচ রং লাগিয়ে দিয়ে গেল সেভেল। সেভেল এখনো তাকে বিছানার ওপর তুলে নেয়নি। কিন্তু ওর মধুর আচরণ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষালী চেহারা মারসিঅনেসের মনে যুগপৎ প্রেম ও কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সেভেলের ভাবনায় মারসিঅনেস এখনো বিভোর।...

পেছনে কার পায়ের শব্দ। চমকে ঘুরে তাকিয়ে মা দেখলো মেয়েকে। ঠিক যেন তারই মতো বিষণ্ণ শিথিলযৌবনা জোয়েত জানালায় ভর দিয়ে উদাসী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের পানে। ওর পোশাকগুলি কেমন যেন বহু ব্যবহারে নোংরা, দুই চোখ ক্লান্তিতে রক্তাভ।

জোয়েত তার মার কাছে এসে দাঁড়ালো, গম্ভীর গলায় বললো, "তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে মা।"

মারসিঅনেস অবাক। এই কন্যা তার বড় গর্বের বস্তু। কিন্তু কন্যার প্রতি তার স্নেহ তো নিঃস্বার্থ নয়। জোয়েত যে ক্রমশই তার ব্যবসায়ের মূলধন হ'য়ে উঠছে। এই রূপসী মেয়েকে সামনে রেখে চলছে তার নিজের পড়তি যৌবনের ছলা-কলা।

মারসিঅনেস বললো, "বলো।"

"আজ কিছুক্ষণ আগে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে।"

"কি রকম?"

"মঁসিয়ে দ্য সারভিনি বললো, সে নাকি আমার প্রেমে পড়েছে।"

মারসিঅনেসের বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে, "কথাটা সে কি ভাবে পাড়লে?"

জোয়েত মার পায়ের কাছে বসে নরম আদুরে গলায় বললো, "ও আমাকে বিয়ে *করতে চায়।"*

বিস্ময়ে টান টান মারসিঅনেস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "সারভিনি! সারভিনি এ কথা বলেছে? তোমার মাথা খারাপ হয়নি তো?"

জোয়েতের দৃষ্টি কঠিন হ'য়ে আসে, গভীর অনুসন্ধিৎসায় সে তার মায়ের মুখের ভাষা পড়তে থাকে অসহনীয় তীব্রতায়! তারপর ভীষণ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, "আমার মাথা খারাপের কি লক্ষণ তুমি দেখলে? মঁসিয়ে দ্য সারভিনি কি আমার পাণিপ্রার্থী হতে পারে না?"

প্রশ্নের তীব্রতায় ঈষৎ হকচকিয়ে গেলো মারসিঅনেস, " তোমার কোথাও ভুল হয়েছে জোয়েত। হয়তো তুমি শুনতে ভুল করেছো অথবা, সারভিনির বক্তব্য ধরতে পারোনি। শোন, মঁসিয়ে দ্য সারভিনি বনেদী বড়লোকের ছেলে, প্যারিসের গোঁড়া পরিবারভুক্ত। সে কখনো তোমায় বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে পারে না।"

জোয়েত কোন রকমে উঠে দাঁড়ায়, উচ্চারণ করে, "কিন্তু ও যে বললো আমাকে ভালোবাসে।"

মারসিঅনেসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, "এ ধরনের অলীক রূপকথাকে বুকে পুষে রাখবার মতো অপরিণত বয়স ও বুদ্ধি নিশ্চয় তোমার নয়। সারভিনি নিজেব সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তার বিয়ে হবে সেই রকম মেয়ের সঙ্গেই যার পরিবারিক সুনাম ও অর্থপ্রাচুর্য যথেষ্ট। আর সে যদি তোমাকে ভালোবাসার কথা বলে থাকে, তবে তার অর্থ বিয়ে নয়, তার অর্থ—"

মেয়েকে আর কিছু খোলাখুলিভাবে বলতে পারলো না মারসিঅনেস। একটু থেমে বললো, "মাথা গরম না করে এখন শুতে যাও। আমি একটু একলা থাকতে চাই।"

জোয়েত তার জবাব পেয়ে গেছে। সে শান্তভাবে তার মার কপালে চুমু খেয়ে বিদায় নেয়। মারসিঅনেস কিন্তু মেয়ের পিছন পিছন তার শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, " তোমার শরীর এখন ভালো লাগছে তো?"

ভেতর থেকে জবাব এলো, "শরীর আমার সব সময়ই ভালো আছে। শুধু ঐ জিজ্ঞাসাটার কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

"ঐ সম্পর্কে পরে তোমাকে আরো কিছু বলবো। কিন্তু এখন থেকে আর সারভিনির সঙ্গে নির্জনে একাকী বেড়াতে যেও না।...একটা কথা নিশ্চিত জেনে রেখো, ও তোমাকে কোন দিনই স্ত্রীর মর্যাদা দেবে না...ও যা চায়, তার তাৎপর্য ভিন্নতর।"

মেয়েকে আকারে-ইঙ্গিতে সারভিনির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বস্থানে ফিরে এলো মাদাম মারসিঅনেস।

জীবনে সব রকম দুঃখবোধকে সে দু'হাতে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে, আজও চাইছে। এই কারণেই তার অপরূপা মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো মন ভারাক্রান্ত করেনি। সে জানে, যতবড় রূপসীই হোক না কেন, জোয়েতের কোন সামাজিক

স্বীকৃতি নেই— সে গণিকার মেয়ে। খুব বরাতজোর না থাকলে এই ধরনের মেয়ের কখনো ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে হতে পারে না। এবং মারসিঅনেস এই ধরনের স্বপ্নবিলাসকে প্রশ্রয় দিতে ভালোবাসে না। তার কাছে সত্য অতি নির্মম। সে জানে, একদিন জোয়েতও তার মার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। জ্বালাময়ী রূপ নিয়ে সে তার খদ্দেরদের উন্মাদ করে দেবে!

তবু—তবু মারসিঅনেস সরাসরি তার মেয়েকে এই কথাগুলি বলতে পারেনি। লজ্জা ও দ্বিধায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল। শত হলেও সে যে মা!

জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সারভিনির মতো পুরুষকে চিনতে তার মোটেই অসুবিধে হয় না।

মধুলোভী মক্ষিকাদের চিনতে তার ভুল হবে কেন? শয়তান! বিয়ে করবে। সেই পুরনো শহুরে চাল!

কিন্তু তার সরল মেয়েকে কি ভাবে সাবধান করে দেওয়া যায়? মনের দিক থেকে ও এখনো শিশু!

ভাবতে ভাবতে মারসিঅনেস ছটফটিয়ে উঠলো। ঠিক করলো, এদের গতিবিধির ওপর এবার থেকে সে কড়া দৃষ্টি রাখবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। দরকার হলে সারভিনিকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতেও সে দ্বিধা করবে না।

কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কিছুই স্পষ্ট ভাবতে পারলো না মারসিঅনেস। তার ক্লান্তিবোধ হচ্ছে। আবার সে ডুবে গেল সেভেলের ভাবনায়। আহ্! কি সুন্দর যুবক! কবে তাকে একান্তকরে পাবে সে? তারকাখচিত আকাশের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে মারসিঅনেস উচ্চারণ করে: আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি!

॥ তিন ॥

সেই রাতে জোয়েতের চোখেও ঘুম নেই।

তার মায়ের মতো সেও খোলা জানালার সামনে উবু হ'য়ে বসে আছে। দু'চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল গড়াচ্ছে। জীবনে এই প্রথম মানসিক কষ্টে চোখের জল ফেলছে সে। দুঃখ কাকে বলে এযাবৎ সে জানতো না। আজ আত্মবিশ্লেষণ করতে বসে সে দেখতে পেল, তার জীবনে কোন আলো নেই, সবটাই নিকষ অন্ধকার। তার মানসিক অপরিপক্কতার জন্যই একদিন সে এই কঠিন বাস্তব সম্পর্কে অচেতন ছিল। মার আসল ভূমিকার কথা সে কখনো ভেবে দেখেনি। জন্ম থেকে দেখে এসেছে তার মার সঙ্গে খাতির যতসব অতি সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য পরিবারের লোকদের, যাদের আদব-কায়দা অনন্য। তারা সসম্মানে চুমু খাচ্ছে তার মার হাতে। তারা সকলেই এমন ঢঙে কথা বলে যেন তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ওদের মধ্যে কারা যে সত্যিকারের রাজবংশের, কে তাকে বুঝিয়ে দেবে?

নেহাৎ ছেলেমানুষ বেচারি জোয়েত। গভীরভাবে কোন কিছু চিন্তা করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সে তার মায়ের মতো লোকচরিত্র বোঝে না। তার জীবনধারা ছিল প্রবহমান সুখে পরিপূর্ণ, নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত।

আর আজ সেই সুখ ও বিশ্বাসের আসন টলে গেছে! সারভিনির একটি মাত্র বিদ্রূপাত্মক কথায় সে আতঙ্কগ্রস্ত। জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যয়পূর্ণ প্রতীতি ধ্বসে পড়ছে। কানের কাছে বাজছে সারভিনির সেই হিংস্র কথাগুলি : তুমি কি আমাকে আর সব চাটুকারদের মতো গর্দভ মনে করো নাকি ?... তোমার প্রতি আমার প্রেম অটুট, কিন্তু তাই বলে তোমাকে বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কেন ?

কোন্ অধিকারে সারভিনি তাকে এমন অপমান করে গেল ?

নিশ্চয় এর পিছনে কোন গূঢ় লজ্জাকর ইতিহাস লুকিয়ে আছে, যা জোয়েত এখনো জানে না।

কি সেই লজ্জাকর ঘটনা ? নিজের সর্বাঙ্গে যেন প্রচ্ছন্ন কলঙ্কের কালিমা দেখতে পাচ্ছে জোয়েত। অনুভব করে, সারভিনি তার সঙ্গে কত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! সন্দেহ, ভয়, দুঃখ, জ্বালা এসে বিভ্রান্ত করে, জোয়েতের দু' চোখ বেয়ে লোনা জল গড়াতে থাকে টপ টপ করে। কাঁদতে কাঁদতে একসময় তার বুকখানা হাল্কা হয়ে গেল। আর কোন বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি তার রইলো না। নিজেকে সে কল্পনা করলো সেই সব উপন্যাসের নায়িকাদের সঙ্গে, জীবন-যন্ত্রণায় যাদের অশ্রু মুক্তাবিন্দুর মতো ঝরে পড়ে, আবার যন্ত্রণা শেষে যারা নতুন সুখের সন্ধান পেয়ে যায়।

ইত্যাকার স্বপ্নে মশগুল হ'য়ে পড়লো জোয়েত। সে তখন পুরোপুরি রূপকথার জগতে। দারুণ এক সুখানুভূতি উদ্দীপ্ত করে তুলছে তাকে। সে কি কোন রাজপুত্রী ? নিশ্চয়। সম্ভবত ইতালীর সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েল একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মায়ের রূপে ; রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে অন্য এক জায়গায় সরিয়ে রেখেছিলেন তার মাকে। তারপর ভিক্টর ইমানুয়েলের ঔরসেই জন্ম নিলো একদিন ফুলের মতো ফুটফুটে এক শিশু— জোয়েত!

অথবা, জোয়েত হলো বিখ্যাত এক দম্পতির অনাকাঙ্খিত শিশু,—মারসিঅনেস যাকে কুড়িয়ে এনে মাতৃস্নেহে লালন করেছে। আরো অনেক অলীক কল্পনা ঝর্ণার জলের মতো সিক্ত করছে জোয়েতের মনকে।

সুখকর বিষন্নতায় তৃপ্তি পাচ্ছে সে। এক মহান রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের মহিয়সী নায়িকা হিসেবে ভাবছে সে নিজেকে। সে যেন স্ক্রাইব অথবা, জর্জ সান্দ-এর উপন্যাসের নায়িকা।...

চোখ বুজলো জোয়েত। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তার সুখস্বপ্ন অন্তর্হিত, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সুন্দর কল্পনাকেই সে মনের পর্দায় টেনে আনতে

পারলো না। রাতের বয়স অনেক। প্রায় বাসি হ'য়ে গেল রাতটা। হাড় কাঁপানো হিমেল বাতাস বইছে।

পরদিন সকাল থেকেই জোয়েত খুব গম্ভীর। দারুণ সতর্কতার সঙ্গে সে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে। গোয়েন্দাসুলভ তার সন্দেহবাতিক। আর কোন অবাস্তব কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় না সে। সে যেন কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তামাম দুনিয়ার বিরুদ্ধে যেন তার নীরব প্রস্তুতি। মনে মনে বিড় বিড় করছে সে, "আমি একা। আমার আপন বলতে কেউ নেই।"

সারভিনি ও সেভেল এলো সকাল দশটায়।

জোয়েত এতটুকু উৎফুল্ল হলো না। শুষ্ক কণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করলো সারভিনিকে, "সুপ্রভাত। ভালো আছো?"

সারভিনি মনে মনে ভাবলো,— জোয়েত আবার এখন কি খেলা দেখাবে কে জানে। মুখে বললো, "সুপ্রভাত। তুমি ভালো তো?"

মারসিঅনেস যথারীতি এগিয়ে গিয়ে সেভেলের হাত ধরেছে। সারভিনিও জোয়েতের একখানা হাত ধরে। তারা গোলাকার বাগানে পায়চারি করতে থাকে। সময় সময় ঝোপের আড়ালে যে কোন যুগলমূর্তি আড়াল হ'য়ে যায়।

সারভিনি বক বক করে চলেছে, জোয়েতের মুখে কিন্তু রা-টি নেই। কিছুই যেন ঢুকছে না তার কানে। হঠাৎ সে একটা বিচিত্র প্রশ্ন করে বসে, "তুমি কি সত্যিই আমার বন্ধু, মাস্কেদ?"

"নিশ্চয়, মাদময়জেল।"

"খাঁটি বন্ধু?"

"নির্খাদ, বান্ধবী—এ নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমার সব কিছুই তোমাতে নিবেদিত।"

"তুমি আমাকে কখনো মিথ্যা বলবে না?"

"যদি তুমি চাও, কখনোই বলবো না।"

"অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা বলবে?"

"নিশ্চয় বলবো।"

"বেশ। প্রিন্স ক্রাভালো সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? ঠিক ঠিক করে বলবে।"

"হা ঈশ্বর!"

"এ যে মিথ্যা বলার প্রস্তুতি!"

"না, মিথ্যা আমি বলবো না।... শোন, প্রিন্স একজন রুশ, সত্যি ও রাশিয়ার লোক। ও জন্মেছিল রাশিয়াতে, বাড়িতে কথা বলে রুশ ভাষায়। বোধহয় পাশপোর্ট নিয়ে ফ্রান্সে এসেছে। এই অব্দি সবই সত্যি। কিন্তু মিথ্যা ওর নাম এবং এই 'প্রিন্স' উপাধিটি।"

জোয়েতের দৃষ্টি ধারালো হ'য়ে ওঠে, সারভিনির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকায় "অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও, ও একজন—"

ঈষৎ দ্বিধার সঙ্গে বললো সারভিনি, "একজন সাধারণ ভাগ্যান্বেষী বলতে পারো।"

"ধন্যবাদ। কাভেলিয়ার ভলরেলিও নিশ্চয় ঐ দলেই ?"

"ঠিক তাই।"

"আর মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো ?"

"ওর সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা ভিন্ন কথা খাটে। ভদ্রলোক যদিও গোঁয়ার প্রকৃতির, এসেছেন কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে। তবে ঐ—আগুন দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁর পাখা পুড়ে ছাই।"

"আর তুমি নিজে ?"

নির্দ্বিধায় সারভিনি আত্মপরিচয় দিতে থাকে, "আমার কথা বলছো ? সোজা উপমায় বলা চলে, আমি একটি স্বাধীন দিলখুস্ কুকুর। বড় ঘরের অবিবাহিত যুবক, পয়সা অঢেল, অবসরও প্রচুর। ফূর্তি-টুর্তির ধাক্কায় তার বর্তমান মগজটি ব্যয়িত হচ্ছে, হরেক রকম অপকর্মে শরীরের তাগদ অনেক কমে গেছে। তবে এসবের বিনিময়ে সংগৃহীত হচ্ছে অভিজ্ঞতা, যার সাহায্যে আমি অনেক মিথ্যাসংস্কারের মত থেকে রেহাই পেয়েছি। অভিজ্ঞতার জোরেই আমি স্ত্রীলোকদের বিশেষ কতকগুলি একঘেঁয়েমিকে সহ্য করতে শিখেছি, শিখেছি অনেক বাজে লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে। এখনো আমার ভেতরে সময় সময় সততা-বোধ প্রবল হ'য়ে ওঠে, তুমি হয়তো খেয়াল করে থাকবে। আর এখনো কোন মেয়েকে বিশেষভাবে ভালোবাসার সক্ষমতা আমার রয়েছে, হয়তো তুমি তার পরিচয় পেয়ে থাকবে। এই সমস্ত দোষ ও গুণের মানুষ আমি আজ তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ব্যস, আমার আর নিজের সম্পর্কে কিছু বলবার নেই।"

এত কথা শুনবার পরেও জোয়েতের মুখে হাসি নেই। গভীরভাবে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবছে সারভিনির সদ্য উচ্চারিত কথাগুলিকেই।

হঠাৎ জোয়েত জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা কাউন্টেস্ লামিয়েকে কেমন লাগে ?"

"কোন মেয়ে সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়ো না।"

"কোন মেয়ে সম্পর্কেই নয় ?"

"না, কারুর সম্পর্কেই নয়।"

"অর্থাৎ, ওদের সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই খারাপ। কিন্তু কোথাও কি কোন ব্যতিক্রম তোমার চোখে পড়েনি ?"

সারভিনি বেপরোয়াভাবে জবাব দিলো, "হ্যাঁ, ব্যতিক্রম আছে বৈকি—আমার বর্তমান সঙ্গিনীটি হচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম!"

জোয়েতের গালে ঈষৎ লালিমা লাগে, কিন্তু তার পরবর্তী প্রশ্ন স্পষ্টতর, "তবে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?"

"বলতেই হবে ? বেশ, তবে শোন। তোমার সুন্দর রুচিবোধ আছে, কোন কোন সাধারণ ব্যাপারে তুমি যথেষ্ট তীক্ষ্ণধি, তোমার সাধারণ জ্ঞান প্রশ্নাতীত। কিন্তু তুমি

অদ্ভুত ছলনাময়ী ও অভিনয় পটু। অপরকে অপদস্থ করে আঘাত দিয়ে তুমি আনন্দ পাও। টোপ ফেলে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে তুমি সক্ষম।"

"এই সব?"

"হ্যাঁ, এটাই তুমি।"

জোয়েত ধীরে ধীরে সারভিনির কবল থেকে নিজের হাতখানাকে মুক্ত করে। গম্ভীর গলায় বলে, "আমার সম্পর্কে তোমার সব ধারণাগুলিকেই বদলাতে হবে মাস্কেদ।"

বলেই সেই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায় তার মার দিকে।

তার মা তখন সেভেল-সঙ্গ পেয়ে তন্ময়। মধুর স্বরে হৃদয়ের যত বাষ্প উজাড় করে দিচ্ছে। রঙীন চশমার অন্তরালে তার রঙীন দৃষ্টি কত কি সম্ভাবনার চিত্র আঁকছে যেন। আর সেভেল ক্রমশই উত্তেজিত হতে হতে চাপ দিতে শুরু করেছে। মারসিঅনেসের নরম দেহলতায়। একসময় খুব জোরে জাপটে ধরে।

দূর থেকে দৃশ্যটা চোখে পড়তেই এই প্রথম যেন হোঁচট খেলো জোয়েত। তার মনে একটা সন্দেহ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। তার নিজের শরীরটাই অদ্ভুত কোন বিরুদ্ধশক্তিতে মোচড় দিয়ে ওঠে। এমন এক ধরনের তপ্ত অনুভূতিতে সে শিরশিরিয়ে ওঠে, যার কোন ব্যাখ্যা ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। অনুভূতিটা যেন বায়ুতাড়িত এক খণ্ড মেঘ—ঝড়ের দাপটে এসেই সব অন্ধকার করে দিয়ে বিদায় নিলো।

খাবারের ঘণ্টা যখন বাজলো, প্রকৃতি তখন ঝড়ের প্রত্যাশায় থমথমে, গুমোট। বিশাল একখণ্ড কালো মেঘে ঢাকা চরাচর। কফির কাপে চুমুক দিয়ে মারসিঅনেস তার মেয়েকে বললো, "চমৎকার আবহাওয়া। তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারো।"

হিম দৃষ্টি মেলে কঠিন গলায় জোয়েত বললো, "না, আজ আর আমি বাইরে যাবো না।"

হকচকিয়ে যায় মারসিঅনেস, "আজ বরং একটু ঘুরেই এসো। তোমার শরীরের পক্ষে প্রয়োজন।"

অস্থির গলায় জোয়েত বললো, "না, আমি ওর সঙ্গে কোথাও যেতে চাই না। কারণটা নিশ্চয় তোমার অজানা নয়।"

মারসিঅনেসের মনে পড়লো, জোয়েতকে সে-ই নিষেধ করেছিল, সারভিনির সঙ্গে একাকী কোথাও বেড়াতে যেতে অথচ আজ এই মুহূর্তে সে নিরালা—সুযোগের প্রত্যাশী সেভেলকে নিয়ে গোটা দুপুরটা নির্জনে মাতামাতি করবে বলে। লজ্জা পেয়ে দ্বিধার সঙ্গে বললো, "ঠিকই মনে করেছো। আমার যে আজকাল কি হয়েছে! কিছুই মনে থাকে না।"

বহুদিন পর জোয়েত কাপড়ে সুঁ-ই সুতো দিয়ে ফুল তুলছে। তার নিজের ভাষায় এই কাজটি হলো 'জনকল্যাণকর' এবং সচরাচর সে এ কাজ পছন্দও করে না। আজ কিন্তু সে কাপড়ে ফুল তুলতেই নিবিষ্টচিত্ত।

ইতিমধ্যে সারভিনি ও সেভেল এখানে উপস্থিত হয়েছে। দুটো চেয়ার দখল করে সিগ্রেট টানতে থাকে তারা। নিস্তরঙ্গ অলস সময় যেন আর কাটতে চায় না। মারসিঅনেস দেখলো জোয়েত গোটা সম্ভাবনাকেই আজ পণ্ড করে দেবে। সেভেলের দিকে তাকিয়ে সে চোরা ইঙ্গিত করে।

তারপর সারভিনিকে বলে, "ডিউক, তোমরা কিন্তু আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাবে। কাল সবাই মিলে লাঞ্চ খেতে যাবো শাতুর ফোরনাইজ হোটেলে।"

চতুর সারভিনি মহিলার উদ্দেশ্য বিলক্ষণ টের পায়। মাথা হেঁট করে অভিবাদন করে এবং সহাস্যে বলে, "আপনার ইচ্ছের বাইরে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

আবার সেই নিরেট নীরবতা। ঝড়ের গুমোট সম্ভাবনায় ধুঁকতে ধুঁকতে অকালে শেষ হ'য়ে গেল দিনটা। ক্রমে ডিনারের সময় এলো ঘনিয়ে। কালো মেঘ মাটি ছুঁই ছুঁই। বাতাসের ছিটে-ফোঁটাও নেই। ডিনার-টেবিলেও সকলে নিঃশব্দ। কি যেন এক অস্বস্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই চারটি প্রাণীকে। কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। খাওয়া হ'য়ে যাবার পরও তারা অনেকক্ষণ বসে থাকে বারান্দায়। চারজনই নিজ নিজ বাসনায় সিদ্ধিলাভ করতে চায়, কিন্তু মুখ খুলতে কেউই যেন সাহস পাচ্ছে না। হঠাৎ ঘুটঘুটি অন্ধকারের বুক চিরে বজ্রপাত হলো কাছাকাছি কোথাও। প্রচণ্ড আলোর ঝলকানিতে ধাঁধিয়ে গেল এদের দৃষ্টি। ব্রিজের ওপর দিয়ে বিশালকায় কোন যন্ত্র পেরিয়ে যাবার মতো ঘর্ঘর শব্দ ভেসে আসছে আকাশ থেকে।

হঠাৎ জোয়েত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আমি চললাম শুতে। ঝড়কে আমার বড় ভয়।"

সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে সে চলে গেলো।

এই ভিলার তোরণদ্বার-বারান্দার ঠিক ওপরেই জোয়েতের ঘর। ঘরের দরজার ঠিক বিপরীত দিকে প্রকাণ্ড বাদাম গাছটা, যার পাতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে সবুজ আলো নামছে। সারভিনি নীচে বসে সেই আলাতে বারান্দায় দাঁড়ানো জোয়েতের ছায়া দেখতে পেলো। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই দপ্ করে নিভে গেলো আলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মারসিঅনেস।

বললো, " মেয়ে আমার শুয়ে পড়লো।"

এবার উঠে দাঁড়ালো সারভিনি, "অনুমতি করুন, আমি এবার শুতে যাই।"

মারসিঅনেসের হাতে চুমু খেয়ে বিদায় নিলো সে।

এখন রহস্যময় অন্ধকারে শুধু এরা দু'জন— সেভেল ও মারসিঅনেস। দু'জনেই নিজেদের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনতে আনতে এক সময় একে অপরকে স্পর্শ করে, স্পর্শ রূপান্তরিত হয় আলিঙ্গনে। সেভেলের বলিষ্ঠ বাহু পীড়ন করতে থাকে

মারসিঅনেসের নরম দেহকে, মারসিঅনেসও প্রবল আবেগে জাপটে ধরে সেভেলকে ; প্রেম ও কামনার জালে আবদ্ধ তারা একেবারে বুঁদ। নাড়ীর স্পন্দন দ্রুততর, শরীর যেন উত্তাপে ফেটে পড়ছে। সেভেলের বাধা সত্ত্বেও মারসিঅনেস তার কোমর নামিয়ে তার পায়ের কাছে বসে পড়ে, ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, "বিদ্যুতের আলোয় আমি তোমার সম্পূর্ণ রূপ দেখবো।"

অন্যদিকে বাতি নিবেয়ে দিলেও জোয়েত কিন্তু শুয়ে পড়েনি। খালি পায়ে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যালকনিতে। মৃদুমন্দ বাতাসে তার ক্লান্তি এতটুকুও দূর হচ্ছে না। মনে পাঁকিয়ে পাঁকিয়ে উঠছে সেই দৃশ্য ও সন্দেহটা—সেভেল ও তার মা নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু একটা করবে আজকের রাতে। সেই সন্দেহের তাড়নায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সে শুনবার চেষ্টা করলো, নীচ থেকে কোন কথা বা শব্দ ভেসে আসছে কিনা।

অবস্থানগত অসুবিধের জন্য সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ; কিন্তু টুকরো টুকরো কিছু কিছু আলাপ ভেসে আসছিল ওপরে। কিন্তু ঐ সব কথাগুলিকে সে ঠিক ধরতে পারছে না, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। কানের দু'পাশে ঝাঁ ঝাঁ করে। সারভিনির ঘরের কপাট বন্ধ, আলো নেই ; অর্থাৎ, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। এবং এই সুযোগে নিরালায় তার মা ও সেভেল... !

রক্ত তার চন্‌মনিয়ে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ-চমক এবং আচ্ছন্ন জোয়েত পরিষ্কার শুনতে পেলো তার মার গলা, "ওহ্! আমি তোমায় ভালোবাসি! আমাকে গ্রহণ করো।"

না, আর কোন সাড়া নেই। শব্দ, কথা, আলাপ, আবেদন হারিয়ে গেল। জোয়েতের সর্ব শরীর থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, এক ভয়াল দুঃস্বপ্নের সম্ভাবনা তার কাছে অনিবার্য বোধ হয়। কী অদ্ভুত নীরবতায় ধুঁকছে তামাম ব্রহ্মাণ্ড! যেন গোটা পৃথিবীটাই একটা নিথর কবরখানায় পরিণত হয়েছে। জোয়েতের নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে, তার ফুসফুসে চেপে বসেছে বুঝি কে, শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসছে লাভাস্রোত।

আবার আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি। আবার আবার আবার...। আলোয় মুহূর্মুহূ চতুর্দিক আলোকিত।

তখনই শোনা গেল সেই সমর্পিত স্বর, "ইস্! দাও-দাও...আমি তোমায় কত ভালোবাসি সোনা!"

এই স্বর জোয়েতের আবাল্য পরিচিত।

এই স্বর তার জন্মদায়িনী মা মারসিঅনেসের!

একটি দুটি করে বড় বড় জলের ফোঁটা এসে পড়ছে গাছ-গাছালির মাথায়। দীর্ঘ বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ। সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায়। বহুক্ষণ পর উদ্দাম হ'য়ে উঠলো দমকা বাতাস। ঝড়। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি। চললো প্রকৃতির সৃষ্টিছাড়া নৃত্য। জোয়েত ভিজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্বাঙ্গ তার ভিজে চুপচুপ।

তার কানে এলো,—ওরা দু'জনে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো, দরজা বন্ধ করে দিলো।

কি যে হলো জোয়েতের! তার কঠিন প্রশ্নের কঠিনতর জবাব পাবার জন্য একছুটে নেমে এলো নীচে, বাগানে; ঐ বিশেষ ঘরটার জানালার কাছ বরাবর একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলো সে। এই ঘরটি তার মার শোবার ঘর। গোটা বাড়িটায় একমাত্র এই ঘরেই আলো জ্বলছে। সেই আলোয় জোয়েতের আয়ত বিস্ফারিত আরক্ত দৃষ্টির সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠতে থাকে ভয়ঙ্কর সত্যিটা,—দুটি মূর্তি পাশাপাশি জড়াজড়ি করতে করতে ওলোট-পালোট খাচ্ছে, তারপর একের কঠিন নিষ্পেষণে অপরজন শিথিল, সমর্পিত। ঘর্ষণরত মূর্তি দুটি এইক্ষণে এক হ'য়ে গেছে! ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চমকালো। আলোয় ব্যাপকভাবে সেই ভয়াল নগ্নতা প্রত্যক্ষ করলো জোয়েত। তার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে ওঠে, প্রচণ্ড আতঙ্ক ও বিস্ময়ে অচেতনভাবেই সে তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে ওঠে: মা-গো!

ধ্বনি আঘাত হানে। চকিতে দেহ দুটি পৃথক হ'য়ে যায়। তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় ধ্বনির উৎসকে।

মার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে জোয়েত ততক্ষণে ছুটে পালাচ্ছে। তীরবেগে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে খিল তুলে দেয়। ভয়ে, বিস্ময়ে, অবসাদে ভেঙ্গে পড়ছে তার শরীর। হাঁটু মুড়ে বসে সে বার বার ঈশ্বরের কাছে শক্তি প্রার্থনা করে—প্রভু! আমায় আলো দেখাও, এই বিপদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করো! ভেজা সপ্‌সপে জামা-প্যাণ্ট পরে বহুক্ষণ জোয়েত ঐ একভাবে বসে রইলো। তারপর কখন থেমে গেল বৃষ্টি। কখন যেন পূবাকাশ একটু একটু করে ফর্সা হতে শুরু করেছে। ভেজা কাপড় বদলে শূন্য মন নিয়ে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো জোয়েত। মনে মনে শপথ গ্রহণ করলো, মাকে ঐ নোংরামির হাত থেকে সে বাঁচাবেই!

সকাল হ'য়েছে বহুক্ষণ। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। জোয়েত একটি ঝিকে বললো, "মাকে বলবে, আমার শরীর ভালো নেই। ভদ্রলোক দু'জন না যাওয়া পর্যন্ত আমি শুয়ে থাকবো। কেউ যেন এখানে এসে আমাকে বিরক্ত না করে।"

জোয়েতের ডাঁই করে রাখা ভেজা জামা-কাপড়গুলিকে দেখে বিস্মিত ঝি জিজ্ঞেস করে, "মাদময়জেল, কাল রাতে কি বৃষ্টির সময় আপনি বাইরে বেরিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, মাথাটা ঠাণ্ডা করতে ভিজতে বেরিয়েছিলাম।"

ঝি বিরক্ত মুখে ওগুলি গুছিয়ে তুলে নিয়ে বিদায় নেয় সেখান থেকে। পোশাকগুলি যেন কোন জলমগ্ন মেয়ের...এখনো জল ঝরছে টপ্‌টপিয়ে।

জোয়েত জানে, খবর পেয়ে তার মা নির্ঘাৎ ছুটে আসবে। সে তারই প্রতীক্ষারত।

মারসিঅনেস কাল রাতে সেই 'মা-গো' চীৎকার শুনবার পর থেকেই বিশ্রী একটা অনুভূতিতে মরমে মরছে। এখন দাসীর মুখে খবর পেয়ে ঝটিতি এসে হাজির হয় জোয়েতের ঘরে।

"কি হয়েছে?"

জোয়েত অস্ফুটস্বরে বলে "আমি—আমি..." বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

হতভম্ব মারসিঅনেস বার বার জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছে? কি বলছো তুমি?"

পরিকল্পনামাফিক কিছুই করে উঠতে পারলো না জোয়েত। দুঃখ ও আত্মগ্লানিতে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে।

প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি মারসিঅনেস। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পরই ব্যাপারটা সে ধরতে পারে। নিজেকে সামলে নিয়ে মেয়ের মাথায় হাত রাখে, "তোমার কষ্টটা কোথায় আমায় খুলে বলবে তো!"

তোতলাতে শুরু করে জোয়েত, "মাগো...উঃ...কাল রাতে জানালা দিয়ে আ-মি-মি...তোমাদের...দেখে ফেলেছি।"

বিবর্ণ মারসিঅনেস কোন রকমে সামাল দেবার চেষ্টা করে, "তাতে কি হয়েছে?"

ভেঙ্গেপড়া জোয়েত আড়ষ্ট গলায় বলে, "না—মা—"

ক্রমশঃ বিরক্তিতে পূর্ণ হ'য়ে গেল মারসিঅনেসের মন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে তিক্ত গলায় বললো, "তোমার মাথাটি একেবারে গোল্লায় গেছে। এ রকম ছিঁচকাঁদুনি থামলে আমার সঙ্গে দেখা করো!"

জোয়েত কান্নাভরা মুখ তুলে বললো, "না, তুমি যেও না, তোমাকে সব শুনে যেতে হবে...আমাকে তোমার কথা দিতে হবে...চলো, আমরা এই সব ইতর শহরাঞ্চল ছেড়ে দূর কোন গ্রামাঞ্চলে চলে যাই। সেখানে আমরা দরিদ্র সরল কৃষকদের মধ্যে দিনগুলি কাটিয়ে দেবো। আমাদের এই সব লোভী লোকগুলি খুঁজে পাবে না।...যাবে তো মা? মাগো! কথা দাও..আমি তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমাকে ক্ষমা করো, আমি আর এই পরিবেশ সহ্য করতে পারছি না।"

মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় মারসিঅনেস। বুকের ভেতরটা কে যেন দুমড়ে-মুচড়ে পঙ্গু করে দিচ্ছে। সন্তানের কাছে মা-র এ বড় লজ্জা! অজানা ভয় ও বিরক্তি যুগপৎ মরীয়া করে তোলে তাকে। আবার আপত্য স্নেহের ফল্গুধারাও তাকে বিচলিত করে রাখে। সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপছে তার। এই মুহূর্তে সে রাগবে না সহানুভূতি দেখাবে—ভেবে উঠতে পারছে না। কোন রকমে শুধু উচ্চারণ করলো, "তোমার কথা আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।"

জোয়েত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, "গত রাতে তোমাদের আমি ঐ অবস্থায় দেখে ফেলেছি...আর কখনো ও রকম করো না...তুমি ওদের ছেড়ে দাও...আমাকে বুকে করে পালিয়ে যাও...আমরা দু'জনে বহুদূরে চলে যাবো, পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবো...অতীতের এই সব গ্লানি মুছে যাবে।"

স্খলিত স্বরে মাদাম বললো, "জোয়েত, লক্ষ্মীটি, এই দুনিয়ার রহস্য অপার। সব কিছু বুঝবার মতো সক্ষমতা এখনো তুমি অর্জন করোনি। আমাদের পরিস্থিতি বুঝলে, কখনো এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে না।...তবে আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনো এ ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিতে এসো না।"

কিন্তু জোয়েত এখন ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়, সে তার মাকে কাদা থেকে উদ্ধার করে ছাড়বে যেন। বললো, "না, আমাকে মুখ খুলতেই হবে। আমি আর সেই শিশুটি নই। আমার চারদিকে এই সব নোংরামি চলবে, আর আমি বুঝি নীরবে তাই সহ্য করবো? সব বাজে লোক, যত পয়সাওয়ালা লোকগুলি খদ্দের হ'য়ে তোমার কাছে আসে। এর জন্যই আমাদের কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। সব আমি বুঝি। আর আমার মুখে পাথর চাপা দিতে পারবে না। আমি এ সব সহ্য করবো না। আমরা সব ছেড়ে-ছুঁড়ে চলে যাবো—অনেক দূরে গিয়ে সৎ মহিলাদের মতো জীবন যাপন করবো। খরচ চালাবার জন্য তুমি তোমার গয়নাগুলো একে একে বেচে দেবে। তারপর প্রয়োজনে আমরা চাকরি করবো। তখন যদি আমার বিয়ে হয়, কেউ আমাদের সামাজিকভাবে অসম্মান করবে না!"

মেয়ের উত্তেজক শব্দগুলি মারসিঅনেসের মগজে আগুন ধরিয়ে দেয়; তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখে "তোমার মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। আগে কিছুটা সুস্থ হও, আমাদের সঙ্গে খাবার টেবিলে চলো, তারপর সব শুনবো।"

মেয়ে হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানায়, "না, আমি যা বলছি, অনেক ভেবেই বলছি। আমার কথার নড়চড় হবে না। ঐ লোক দুটো এ বাড়ি ছেড়ে যদি না যায় তবে আমাকেই চলে যেতে হবে।"

"কোন্ চুলোয় যাবে শুনি? খাবেটা কি?"

"জানি না। ও সবে আমার কিছু আসে যায় না। আমি সৎ সুন্দরভাবে জীবন কাটাতে চাই।"

'সৎ' কথাটি মারসিঅনেসের ক্ষোভ ও বিরক্তিকে দ্বিগুণ করে। আর নিজেকে সে সংযত রাখতে পারে না। রাস্তার নীচু স্তরের মেয়েদের মতো চেঁচিয়ে উঠলো, "চোপরাও! আর একটা কথা বলবি না। যে সব মাগীদের তুই 'সৎ' বলছিস, তাদের চেয়ে আমার সততা কিছু কম নয়। হ্যাঁ,—আমি আমার দেহ ও রূপ নিয়ে ব্যবসা করি। এটা আমার জীবিকা এবং এর সার্থকতায় আমি গর্বিত। আমি তোদের ঐ তথাকথিত একডজন 'সৎ মেয়েমানুষের' সমান। বুঝলি?"

আক্রান্ত জোয়েত শুধু উচ্চারণ করে, "ছিঃ! মা!"

মারসিঅনেস কিন্তু থামে না, "হ্যাঁ, আমার পরিচয়—আমি গণিকা। দেহের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করি। আমাদের জীবনযাত্রায় যে স্বচ্ছলতা তুমি দেখে আসছো, তার মূলে আমার এই দেহ ও যৌবন। এতে লজ্জার কি আছে? আমি যদি এ পথে নেমে না আসতাম তাহলে আমাদের পরিণতিটা কি দাঁড়াতো? পরিণতি হতো এই যে, অপরের বাড়িতে আমাকে ঝিগিরি করতে হতো। উদয়াস্ত খাটতে খাটতে শরীর মন ভেঙ্গে চুড়মার হ'য়ে যেতো। এঁটো বাসন ধুতে হতো, গিন্নীর ফরমাইশ মতো ছুটতে হতো কসাইখানায় মাংস আনতে। একটু ক্লান্তি এলেই হরেক গঞ্জনা শুনতে হতো; ভুল হলেই ঘাড় ধরে দিতো বিদায় করে। এ রকম একটা কুশ্রী সম্ভাবনা

এড়িয়ে তুমি যে আনন্দের স্রোতে স্বাধীনভাবে গা ভাসিয়ে চলেছো, তা একমাত্র আমি 'সৎ' নই বলেই। ঝিগিরি করে ক' পয়সা তুমি জমাতে পারতে? বড় জোর পঞ্চাশ ফ্রাঁ। ঐ সামান্য টাকা দিয়ে ধনী হবার স্বপ্ন দেখাও বাতুলতা। এমন কোন মূলধন তুমি সারা জীবনেও সংগ্রহ করতে পারবে না যা দিয়ে কোন ব্যবসা ফাঁদা যায়। অর্থাৎ, আমাদের সামনে আর কোন বৃত্তি খোলা নেই,—গণিকাবৃত্তিই একমাত্র উপায়।"

নিজের বুক ও কপাল চাপড়ে মারসিঅনেস আরো বলতে থাকে, "জানো, আমাদের মতো ভাগ্যহীনা মেয়েদের কপালে কোন উপায়েই সৌভাগ্যের দীপ জ্বলে না। যে জিনিস প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে, সেটাকেই ভাঙ্গিয়ে খেতে হবে। নচেৎ পচে মরতে হবে অকথ্য দারিদ্র্যে। এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই জোয়েত।"

মারসিঅনেস আরো বললো. "আর তোমার 'সৎ' মহিলাদের তুমি খুব সতী মনে করো নাকি? তোমার অভিজ্ঞতা নেই. তাই এরকম বলছো। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জানি. ওরা সব অতি নীচ. কীটেরও অধম! পয়সা কড়ি আছে, সামাজিক স্বীকৃতি আছে. আছে অঢেল অবসর. তবু গোপনে ওরা কী করে জানো? শুধু মাত্র বৈচিত্র্যের সন্ধানে লুকিয়ে-চুরিয়ে পরকীয়া প্রেমের ফাঁদ পাতে। আমি ওদের চেয়েও ইতর?"

মারসিঅনেসের প্রতিটি জ্বালাধরা শব্দ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত। বিধ্বস্ত জোয়েত বড় অসহায় বোধ করে। তার ইচ্ছা হলো. চীৎকার করে বলে: আমাকে সাহায্য করো! আবার মনে হলো. এখনই এখান থেকে ছুটে পালানো দরকার! কিন্তু কিছুই সে করে উঠতে না পেরে হাউ মাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

মা মারসিঅনেস পাথরের মতো নিথর। মেয়ের দুঃখ, অসহায়ত্ব তাকে স্পর্শ করে। দু'হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সেও কেঁদে ফেলে ঝর ঝর করে, "সোনামণি. কেঁদো না. লক্ষ্মীটি। যদি একবার বুঝতে. আমারও এই বুকের মধ্যে কত ব্যথা, কত অপমানের গ্লানি বছরের পর বছর জমাট বেঁধে আছে!"

অনেকক্ষণ ধরে মা ও মেয়ে একসঙ্গে অশ্রু বিসর্জন করলো। অবশ্য মারসিঅনেসের বেদনা ক্ষণস্থায়ী। দুঃখকে সে কখনো প্রশ্রয় দিতে চায় না। এক সময় সে বললো "জোয়েত. আর কেঁদো না। আমাদের ফেরার কোন পথ নেই। এই জীবনকেই সহজভাবে গ্রহণ করো।"

কিন্তু জোয়েতের দুঃখ ও বেদনা গভীর।-সে এই যন্ত্রণার হাত থেকে আর কোন মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

মা বললো. "চলো. এবার খাবার টেবিলে—কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।"

মেয়ে মাথা নেড়ে বললো, "না, মা। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমাকে ওদের সামনে যেতে বলো না। আমি ওদের সহ্য করতে পারবো না। আবার যদি ওরা কেউ এখানে আসে, আমি আত্মহত্যা করবো!"

মারসিঅনেস অবিচলিত স্বরে বললো, "মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার কথাগুলি ভেবে দেখো।...ঠিক আছে, তুমি এখন বিশ্রাম নাও। সন্ধ্যার সময় আবার তোমার কাছে আসবো।"

মা চলে গেলে ঘরে খিল তুলে দিলো জোয়েত। নির্জন ঘরে একাকী বসে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। বেলা এগারোটা নাগাদ বাড়ির ঝি এসে কপাটে ধাক্কা দেয়, "মাদময়জেল, লাঞ্চ করবেন না? মাদাম জানতে চাইলেন, আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কিনা?"

ঘরের ভেতর থেকে জোয়েত জবাব দেয়, "আমার ক্ষিদে নেই। আমি একটু একা থাকতে চাই।"

বিছানার ওপর ক্লান্ত জোয়েত তার শরীর বিছিয়ে দেয়।

বেলা তিনটে নাগাদ এলো তার মা। কপালে হাতবুলিয়ে দিতে থাকে জোয়েতের।

"এখন কি একটু ভালো বোধ করছো না? ডিম খাবে একটা?"

"না, দরকার নেই।"

"আজ আর উঠবে না?"

"এখনই উঠবো," জোয়েত বললো, "সারাটা দিন আমি কেবল ভেবেছি। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারিনি। আমার কাছে অতীত মূল্যহীন ভবিষ্যৎটাই সব এবং সেই ভবিষ্যৎ গড়তে হবে অন্যভাবে। আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। থাক এখন আর এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগছে না।"

মারসিঅনেস দেখলো, মেয়ে তার বড় গোঁয়ার। সে ভীষণ চটে গেল মনে মনে। বোকা মেয়েটা এতদিন তবে কিছুই জানতো না? মনের ক্ষোভ চেপে রেখে মারসিঅনেস বললো, "তুমি কি এখন উঠবে?"

"হ্যাঁ, চলো।"

মারসিঅনেস নিজের হাতে মেয়েকে সব পোশাকগুলি এগিয়ে দিলো। ওর কপালে চুমু খেলো।

"ডিনারে বসবার আগে আমার সঙ্গে একটু পায়চারি করবে?"

"করবো মা।"

নদীর তীর বরাবর হেঁটে বেড়ালো তারা দু'জনে। অতি সামান্য ও তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলো।

॥ চার ॥

পরদিন জোয়েত আর কারুর সঙ্গে নয় একাকী বেরিয়ে পড়লো ভিলা ছেড়ে। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে গেল সেই নির্জন জায়গাটায় যেখানে বসে সারভিনি একদা তাকে পড়ে শুনিয়েছিল 'পিপীলিকার ইতিবৃত্ত।' বসে পড়লো জোয়েত। মনে মনে শপথ নিলো, "যা আমি ঠিক করেছি, তা থেকে এক পাও পিছু হটবো না।"

নীচে বহমান নদীর ছল-ছল কল-কল কলতান। জোয়েত ভাবতে ভাবতে নানা রকম সিদ্ধান্ত নেয়—মুক্তি তার চাই-ই-চাই!

সে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে চলে যাবে দূর-দূরান্তরে। কিন্তু কোন্ ঠিকানায়? তার পেটই বা চলবে কি করে? কে দেবে তাকে কাজ? ঝিগিরি করতে সে পারবে না। আত্মসম্মানে লাগবে। বরং সে তার পড়া অনেক উপন্যাসের চরিত্র আয়া হতে পারে। কিন্তু যে তরুণীর বংশপরিচয় নেই, তাকে আয়া রাখতে রাজি হবে কে?

সন্ন্যাসিনী হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার মনে ধর্মের প্রভাব অত জোরদার নয়। বর্তমানে যে কেউ তাকে বিয়ে করে উদ্ধার করবে, এমন সম্ভাবনাও নেই। মুক্তির একটা পথও দেখতে পাচ্ছে না জোয়েত।

অগত্যা সে ঠিক করলো—আত্মহত্যা করবে।

আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এতটুকুও কেঁপে উঠলো না জোয়েত। ব্যাপারটা যেন নেহাৎই সহজ—এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বেড়াতে যাবার মতো।

মৃত্যুই যে চূড়ান্ত, যার কোন শুরু নেই—সরল জোয়েত এতটুকুও ভেবে দেখলো না। তার মনে হলো, পথ সে পেয়ে গেছে। সুন্দর সহজ সমাধান।

কিন্তু আত্মহত্যার উপায়? উপায়গুলি দুঃখদায়ক ও ভয়ঙ্কর। হিংস্র হ'য়ে ওঠা জোয়েতের স্বভাববিরুদ্ধ। ছোরা বা পিস্তলের কথা সে ভাবতেই পারে না। ওদের দ্বারা সে বড় জোর নিজেকে আহত করতে পারবে, খুন হতে পারবে না। কারণ, তার সেই দক্ষতাই নেই। মাঝ থেকে এমন সুন্দর শরীরটা বিকৃত হ'য়ে যাবে।

গলায় ফাঁস দেবে? না, না, সে বড় কদর্য ভঙ্গী! জলে ডুবে মরবে? সম্ভবই নয়, সে যে সাঁতারে তুখোড়!

হ্যাঁ, একমাত্র একটি উপায় রয়েছে—বিষ খাওয়া। কিন্তু কি ধরনের বিষ? অধিকাংশ বিষই শরীরে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, বমির উদ্রেক করে। এ সব বাপু তার চলবে না। ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো ক্লোরোফরমের কথা। একবার খবরের কাগজে সে পড়েছিল, অত্যধিক ক্লোরোফরম্ সেবনে জনৈক তরুণীর মৃত্যু। মনের মতো উপাদানটি পেয়ে আত্মতৃপ্ত জোয়েত। এই মুহূর্তে নিজেকে তার সম্মান করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওরা বুঝবে, জোয়েত কত উঁচু স্তরের মেয়ে ছিল।

বিষ খুঁজতে জোয়েত গেল বগিভাঁতে। দাঁতের ব্যথার নাম করে পরিচিত অপরিচিত বহু ওষুধের দোকান থেকে সে বিন্দু বিন্দু ক্লোরোফরম্ যোগাড় করে লাঞ্চের আগেই ফিরে এলো বাড়িতে। একপেট খাবার খেয়ে পরিতৃপ্তির ভঙ্গী করলো। মেয়ের ভাবান্তরে মা বেজায় খুশী, বুক থেকে পাথরখানা নেমে গেল যেন। খাবার টেবিলেই মা মেয়েকে আগাম শুনিয়ে রাখলো একটি খোশখবর, "আগামী রবিবার এখানে একটি জমাটি ভোজের আসর বসবে। আসছে আমাদের সব বন্ধুরাই, প্রিন্স ক্রাভালো, মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো, সারভিনি, সেভেল—সব।"

খবর শুনে ঈষৎ বিষণ্ন হলেও জোয়েত কোন জবাব দেয় না...পরদিনই সে টিকিট কেটে সোজা হাজির হলো প্যারিসে। বিকেল পর্যন্ত দোকানে দোকানে ঘুরে

ঘুরে সংগ্রহ্ করলো ক্লোরোফরম্। অনেকগুলি ছোট ছোট শিশি ভর্তি হ'য়ে গেলো ঐ বস্তুতে। পরদিনও চললো সেই অভিযান। একটি দোকান থেকেই তো পেয়ে গেলো পুরো দশ আউন্স।

শনিবার গুমোট গরম, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; একটা বেতের চেয়ারে বসে গোটা দিন কাটিয়ে দিলো জোয়েত। আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞাটাকে ঝালিয়ে নিলো মনে মনে।

পরদিন রবিবার, জোয়েত সেদিন চমৎকার সব পোশাকে সাজলো খুব: আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরখ করলো নিজের আগুন-রূপ—'এই দেহ ও মন আগামী কাল আর দেখা যাবে না!' কথাটা উচ্চারণ করতেই কী এক শিহরণ! 'আমি একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে যাবো।' 'কোন স্বর আমার কণ্ঠ থেকে মুক্তি পাবে না, আর বই নিয়ে ডুবে থাকবো না, আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। পৃথিবীর এই সব সুন্দর দৃশ্যগুলি আর আমার দৃষ্টির সামনে হিল্লোলিত হবে না।' নিজেকে অবাক হ'য়ে দেখছে জোয়েত! ইস্, আমি কী সুন্দরী! আয়না সামনে না থাকলে নিজেকে চিনতেই পারতাম না!

জোয়েত যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে, দুগ্ধফেননিভ শয্যার ওপর পড়ে আছে তার প্রাণহীন নিথর দেহখানা! প্রাণশূন্য! মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মাটির নীচে পচে গলে ঝিম্ কালো হ'য়ে যাবে এই দেবসৃষ্ট মুখাবয়ব, এমন আয়ত চক্ষু, এমন ছোট্ট কপাল, আর এই রাশি রাশি এলায়িত কুন্তল!

ভাবতে গিয়ে বিমর্ষ বোধ করলো জোয়েত। সে ভাবলো—তার মৃত্যুতে পৃথিবীতে তো কোন পরিবর্তন হবে না। এমন কি, এই ঘরটারও কোন রূপান্তর ঘটবে না। এই বিছানা, খাট, আয়না, চেয়ার—সব অটুট থাকবে। শুধু থাকবে না এক অনন্যা তরুণী, জোয়েত যার নাম। একমাত্র মা ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ তেমন নাড়াও খাবে না তার মৃত্যুতে। লোকেরা হয়তো প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করবে, 'আহ্! বেচারী জোয়েত! কী চমৎকার দেখতে ছিল মেয়েটা!'...জোয়েতের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে, কেমন এক থমথমে বিহ্বল করে রাখে।

ঠিক তখনই বাগানে অভ্যাগতদের সমাবেশে আসর জমে উঠেছে। গমগমে আওয়াজ। হাসিতে-খুশিতে উপচে পড়ছে মারসিঅনেস। মনে হচ্ছে, যেন একদল ছাত্র স্কুল ছুটির পর ছুটে এসেছে ঐ বাগানে। উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইছে মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো:

"বাতায়নে বসে ছিলেম প্রিয়
তোমার অপেক্ষায়
তুমি এলে, তুমি এলে—
লগ্নশেষে প্রায়।"

জোয়েত একবার ওখান থেকে ঘুরেও এলো। ঘৃণায় গা রি রি করে ওঠে। একগাদা পুরুষ এসেছে পয়সার বিনিময়ে তার মার শরীরটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

বুকে ঘৃণা, অথচ মুখে হাসি নিয়ে জোয়েত আবার গিয়ে হাজির হলো সেই আসরে, সকলের সঙ্গে ব্যক্তিত্বপূর্ণভাবে করমর্দন করতে থাকে।

সারভিনি জিজ্ঞেস করলো, "মেজাজ ভালো তো?"

অদ্ভুত গাম্ভীর্যপূর্ণ গলায় জোয়েত জবাব দিলো, "খুশির উচ্ছলতায় আমি তো এখন যেন প্যারিসের দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছি। তবে তোমার ব্যবহার একটু সংযত রেখো।"

মঁসিয়ে দ্য বেলভিনোর দিকে চেয়ে জোয়েত বললো, "মলভসি, আজ তোমাকেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে। খাবারের পাট চুকে গেলে আমরা সবাই মিলে মর্লির মেলায় যাবো।"

মর্লিতে গিয়ে আরো হুল্লোড়। দু'জন নবাগত এসেছে আজকের আসরে —কাউন্ট তামিন ও মারকুস্ দ্য বুকেতত।

খাবার টেবিলে বসে মনের দুশ্চিন্তা চেপে রাখবার জন্য দারুণ মদ্যপান করলো জোয়েত। বেশ কিছুটা ব্র্যাণ্ডিও ঢাললো গলায়। ঢুল ঢুলু চোখে চকচকে দৃষ্টি। এ্যালকহলের প্রভাবে মন আবার তরতাজা। সকলকে ডেকে বললো, "চলো, আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

বেলভিনোর হাত ধরে নাচতে নাচতে চলেছে জোয়েত। পেছনে যেন ছোট-খাটো একটি মিছিল।

জোয়েত নেতৃত্ব দেবার ভঙ্গীতে বললো, "শোন, তোমরা আমার সৈন্যদল। সারভিনি, তোমাকে আমি সার্জেন্টের পদ দিলাম—ডান দিক দিয়ে তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাবে। একেবারে সামনে থাকবে অশ্বারোহী বাহিনীর দুই শ্রেষ্ঠ সেনানী—প্রিন্স আর কাভেলিয়ার; তাদের পিছনের সারিতেই স্থান পাবে আমাদের নবাগত দুই বিশিষ্ট বন্ধু। মার্চ। কুইক মার্চ।"

জোয়েতের বাহিনী এগিয়ে চললো জোর কদমে।

সারভিনি মুখ দিয়ে শব্দ ক'রে বিউগিল বাজালো। নবাগত দু'জন এমন ভঙ্গী করছে যেন সত্যি সত্যি ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। একমাত্র বিব্রত বোধ করছে বেলভিনো, "মাদময়জেল, এতটা ছেলেমানুষি করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আপনাকে পরে ওরা সমালোচনা করবে।"

জবাব দিলো জোয়েত, "আমি কারুর সমালোচনার ধার ধারি না, রইসিনা, তুমি থাকবে আমার সঙ্গে। আমার মতো মেয়েকে গভীর সান্নিধ্য দেওয়া তোমার কর্তব্য।"

এই বিচিত্র বাহিনী যখন বগিভাঁর মধ্যে দিয়ে চলেছে, রাস্তার দু'পাশে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে যায়। এমন অলীক সৈন্যদল তারা আর কখনো দেখেনি। অনেক বাড়ির দরজা জানালা খুলে যায়। প্রত্যেকটা বাড়ির ছাদের ঝুল-বারান্দায় বিস্মিত নর-নারীর ভিড়। অনেক নতুন ছেলে মেয়েরাও এসে যোগ দেয় সেই অভিযাত্রী দলে। এমন কি একটা চলমান রেলগাড়ি থেকেও ছোকরা যাত্রীরা চীৎকার করে যেন এদের অভিনন্দন জানাতে থাকে।

জোয়েত চলেছে সামরিক নিষ্ঠায়। কিন্তু ওর মুখে কোন উল্লাসের চিহ্ন নেই, কেমন যেন বিষাদময় গাম্ভীর্যে পাণ্ডুর। সারভিনি মাঝে মাঝে নানা রকম আদেশ

জারী করছে তার বাহিনীর ওপর। প্রিন্স ও কাভেলিয়ার কিন্তু চাপা গলায় সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে জোয়েতের এই খেয়ালীপনার। আর নবাগত দু'জন সমানে বাজিয়ে চলেছে কাল্পনিক ড্রাম। মেলায় কে একজন মোটামত লোক আক্ষেপের সঙ্গে বললো, "জীবনটাকে ওরাই উপভোগ করতে শিখেছে।"

এরপর মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় দারুণ পাক খেতে লাগলো জোয়েত। সে তার পাশের কাঠের ঘোড়াটিতে বসালো বেলভিনোকে। কিন্তু বেলভিনোর সেই শারীরিক সক্ষমতা নেই—বার পাঁচেক পাক খেয়েই জগৎ অন্ধকার দেখছে। প্রচুর পুতুল কিনলো জোয়েত। সকলের হাতে হাতে একটি করে পুতুল ধরিয়ে দিলো সে। এইসব উদ্ভট কাণ্ডকারখানায় সকলেই প্রায় ক্লান্ত, বিরক্ত প্রিন্স ও কাভেলিয়ার।

একমাত্র সারভিনি আর নবাগত দু'জন সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে জোয়েতের সঙ্গে।

এলোমেলো ছুটতে ছুটতে দলটি নদীর কিনারে এসে দাঁড়ালো।

জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জোয়েতের দৃষ্টিতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ফুটে ওঠে। তার মাথায় তখন আর এক উদ্ভট খেয়াল। সকলকে ডেকে আনে নদীর তীরে। চীৎকার করে বলে, "কে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে? সে যেন এই মুহূর্তে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে!"

সকলে নিশ্চুপ। চারদিক থেকে পিল পিল করে লোক আসছে রগড় দেখতে। সাদা এ্যাপ্রন পরা দু'জন মহিলার মুখ থমথমে। দু'জন সেপাই বোকার মতো হেসে উঠলো ফিক্-ফিক্ করে।

জোয়েত আবার বললো, "তবে কি আমার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো কেউ নেই তোমাদের মধ্যে?"

ঠিক তখনই 'ধ্যাৎ...' বলে সারভিনি নিপুণ তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে, খানিকটা জল চলকে এসে ভিজিয়ে দিলো জোয়েতের সুন্দর পদযুগল।

নদীর পাড়ে সারবদ্ধ জনতার মৃদু গুঞ্জন। এতেও রেহাই নেই। জোয়েত একখণ্ড কাঠ নদীতে ছুঁড়ে দিয়ে সারভিনির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে, "ঐ কাঠের টুকরোটা নিয়ে এসো দেখি।"

সারভিনি সাঁতরে টুকরোটা দাঁতে করে নিয়ে আসে। জোয়েতের পায়ের কাছে নামিয়ে দেয় হাঁটু গেড়ে।

জোয়েত সারভিনির ভেজা মাথায় সেই কাঠ ছুঁইয়ে বলে ওঠে, "কি চমৎকার আমার পোষা কুকুরটি।"

ভিড়ের মধ্যে কে যেন টিপ্পনি কাটে, "চমৎকার!"

জনৈকা স্থূলাঙ্গী নাশা কুঞ্চিত করে, "ছিঃ! এমন নোংরা অপমান সহ্য করা যায় না।"

কে একজন চড়া গলায় নিজের অভিমত জানালো, "একটা মেয়েমানুষের জন্য এতটা হেয় হবার চাইতে নরকে যাওয়া অনেক ভালো।"

জোয়েত বেলভিনোর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, "মূর্খ! তুমি যে কি সুযোগ হারালে, তা জানো না।"

এবার ফেরার পালা।

পথের দু'পাশে যত লোক, সকলের ঘৃণা ও বিরক্তি জোয়েতের ওপর। কে যেন বললো, "একপাল হ্যাংলা হাবা-গোবাকে চরাতে এসেছিল মেয়েটা।" তারপর ফিরে তার বন্ধুকে বললো, "তোর চরিত্রটাও ঠিক ঐ রকম।"

ইতিমধ্যে গোটা দলই কেমন যেন শিথিল। অনেকেই দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন। সারভিনির চলাফেরায় অপমানিতের গ্লানি। তার সর্বাঙ্গ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

জোয়েত বললো, "কি ব্যাপার! তোমরা সব যে একেবারে ঝিমিয়ে পড়লে। তোমার তো একেই 'মজা' বলো, তাই না? আমি একাই তোমাদের পয়সার দাম অনেকটা মিটিয়ে দিলাম।"

বলতে বলতে জোয়েত মুখ নীচু করে, তারপর ভেঙ্গে পড়ে। বেলভিনো সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে, জোয়েতের চোখে জল।

"একি! তুমি কাঁদছো?"

"চুপ। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার অধিকার তোমার নেই।"

কিন্তু বেলভিনো নির্বোধের মত পীড়াপীড়ি করতে থাকে, "নিশ্চয় কিছু হয়েছে! না হলে তোমার চোখে জল! ভাবাই যায় না!"

জোয়েত ধমকের সুরে বলে, "তুমি চুপ করবে কি না?"

বলেই আর নিজেকে রাখতে পারে না জোয়েত। পাহাড় ভাঙ্গা নদীর মতো দু' চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে। যে তিক্ত বেদনাকে এতক্ষণ সে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল, এই মুহূর্তে তা ফেটে পড়ে। কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে তার দেহ।

বেলভিনো তখনো বকে চলেছে, "কি যে হলো তোমার জোয়েত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ছুটে এলো সারভিনি। জোয়েতের কাঁধে হাত রেখে মধুর স্বরে বললো, "ছিঃ! এ রকম পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কাঁদতে নেই। লোকে কি বলবে? চলো ঘরে ফিরে চলো। এ রকম আমোদ-ফূর্তি যদি ভালোই না লাগে, তবে তুমি যোগ দাও কেন?"

সারভিনি জোয়েতের হাত ধরে একরকম হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলে।

ভিলাতে ঢুকেই জোয়েত তার হাত ছাড়িয়ে নেয়, ছুটে পালায় নিজের ঘরে।

ঘর থেকে যখন সে ফিরে এলো তখন ডিনারের আসন পাতা হয়েছে।

অদ্ভুত বিষণ্ণতায় সে বুঝি বিধ্বস্ত। চোখের দৃষ্টি জাগতিক নয়। এরা সকলে কিন্তু জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সারভিনি কোত্থেকে একটা মজুরের কালিঝুলি মাখা পোশাক পরে দেহাতী ভাষায় গেঁয়ো রসিকতা করছে।

নীরবে খাওয়া শেষ করলো জোয়েত। কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়েই ফিরে গেল নিজের ঘরে।

নীচ থেকে তাড়া করে আসছে ওদের সমবেত হুল্লোড়। সস্তা আলোচনা, স্থূল মন্তব্য অথবা, অশ্লীল খিস্তি।

সারভিনি আকণ্ঠ পান করে মাতলামি শুরু করে দিয়েছে। মারসিঅনেসকে ডাকছে 'মিসেস ওবারদি' বলে। আর সেভেলকে বলছে 'মিষ্টার ওবারদি।'

আর তখন মৃত্যু-আলিঙ্গনে-প্রতিজ্ঞ জোয়েত প্যাডের একটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে লিখছে:

বগিভাঁ

রবিবার, রাত ন'টা।

গণিকা হবার পরিণতি এড়াতে আমি বেছে নিলাম আত্মহননের পথ।

জোয়েত.

খামে লেখাটা পূরে খামের উপর লিখলো—'মাদাম লা মারসিঅনেস ওবারদি।'

তারপর চেয়ারটাকে টেনে আনলো জানালার কাছে। চেয়ারে শায়িত তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ শিথিল. হাত জোড়া টেবিলের ওপর. হাতের কাছে তুলোর ছিপি আঁটা ক্লোরোফরমের বড় শিশিটা। একটা মস্ত গোলাপ গাছ উঁকি মারছে এ ঘরের জানালা দিয়ে। বাতাস গোলাপ-গন্ধে ম ম। মিশকালো আকাশে এক চিলতে বাঁকা চাঁদ, পাতলা মেঘের লুকোচুরি চলছে কখন থেকে।

মনে করবার চেষ্টা করলো. এই তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলি....এরপর সে নেহাৎ স্মৃতি হ'য়ে যাবে। গভীর বেদনাবোধে বুক ফাটে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আহ্! এ সময় কেউ কি তাকে অকৃত্রিম ভালোবাসা উপহার দিতে পারে না? এই দুনিয়ায় কেউ কি তাকে দয়া করতে পারে না?

সারভিনির বকবকানি ভেসে আসছে। বস্তাপচা রসের গল্পে সব মশগুল। হো-হো-খিল-খিল। মারসিঅনেস তো একেবারে আত্মহারা. সারভিনিকে তারিফ জানিয়ে বলছে. "তোমার মতো এমন সুন্দর করে কেউ বলতে পারবে না।"

শিশি থেকে খানিকটা তরল পদার্থ তুলোতে ঢাললো জোয়েত। তীব্র ও মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধ এসে লাগে নাকে।

সেই তুলোটা জিভে ঠেকাতেই বিজাতীয় স্বাদ. জোয়েতের বুক ঠেলে কাশি এলো। জোরে শ্বাস নিয়ে সেই গরল গিলে ফেললো জোয়েত। এবার মৃত্যু আসবে. অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘটবে তার আবির্ভাব—জোয়েত নিজেই টের পাবে না কখন সে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে।

দুঃখ নেই. বেদনা নেই—সব উবে যাচ্ছে। সুখকর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। সে এখন কল্পলোকের যাত্রিনী।

হঠাৎ সে সচেতন হ'য়ে উঠলো—আশ্চর্য! এখনো যে আমি মরিনি এবং তুলোটা শুকিয়ে গেছে। তার ইন্দ্রিয়গুলি আদৌ বিকল হয়নি বরং সে আরো অনুভূতিপ্রবণ হ'য়ে উঠেছে। নীচ থেকে ভেসে আসা প্রতিটি শব্দ তার কাছে এখন স্পষ্টতর। প্রিন্স ক্রাভালো নানা উপমায় ব্যাখ্যা করছে একদা সে কিভাবে ডুয়েলে খতম করেছিল এক অস্ট্রিয়ান জেনারেলকে।

দূরে কোথায় ঢং ঢং করে পেটা ঘড়ি সময় জানায়। রাস্তার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে। ভেককুলের ঐক্যতান শোনা যায়। বাতাসে ঝরা পাতার খস্ খস্ শব্দ।

আর এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে সে নাকের সামনে ধরলো। আবার সেই মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধ। আবার মাথার ভেতরে ঝিম ঝিম ভাব। দু'বার এরকম ওষুধঢালা তুলোতে ঘ্রাণ নিলো সে। এবার সত্যি সে তলিয়ে যাচ্ছে ঘুমের অতলান্তে। তার দেহ থেকে খসে খসে পড়ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন দেহে কেবল তার চৈতন্য জীবিত, যার দ্বারা অনুভূতি বুঝি অতি প্রবল।

অতীতের স্মৃতিগুলি ক্রমশই জীবন্ত। ছেলেবেলায় ফেলে আসা দিনগুলিকে দেখতে পাচ্ছে জোয়েত। বড় ভালো লাগছে।

তখনো বারান্দায় ওদের আসর জমজমাট। জোয়েতের কাছে এমন বর্তমান এখন অর্থহীন। নীচ থেকে ভেসেআসা শব্দগুলি তার মর্মস্থলে প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না।

মনে হচ্ছে, সে যেন একটা বিশাল নৌকায় চেপে ভাসমান। তরুণী চলেছে এক দূরের দেশের কিনারা ঘেঁষে। তীরে কত লোকজন তাকে দেখে উল্লাস প্রকাশ করছে। হঠাৎ জোয়েতের মনে হলো, সে ঐ পুষ্পিত দেশের মধ্য দিয়ে একাকী আপন সুখে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আচমকা কোত্থেকে এসে হাজির হলো সারভিনি—সে নাকি তাকে ষাঁড়ের লড়াই দেখাবে! সারভিনির পোশাক রাজপুত্রের মতো জমকালো! কোথা থেকে আবার ভিড় জমিয়েছে গাদা গাদা লোক। বক-বক-বক-বক। হ্যাঁ, এরা সকলেই তার পরিচিত!

কিছুক্ষণ একেবারে চেতনাশূন্য অন্ধকার। তারপর আবার চৈতন্যের উন্মেষ। অর্থাৎ, এই উজ্জ্বল পৃথিবী ছেড়ে এখনো সে অচেনা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসায়নি। অদ্ভুত স্বস্তি ও সুখ! যদি এমন জবুথবু নিথর দেহে চনমনে কল্পনা বহুকাল জীবিত থাকে, বড় ভালো হয়! বুকের এই কল্লোল ধ্বনি চিরজীবি হোক। দম নিয়ে মাথাটা ঈষৎ ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকালো জোয়েত। আধখানা চাঁদ আটকে আছে ঝাঁকড়া গাছের মাথায়। আর তো কোন জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখবোধ তাকে পীড়িত করছে না। না, সে মরবে না! তিল তিল সংগৃহীত নীরবতায় সে বেঁচে থাকবে।

কেন সে বাঁচবে না? কেন সে ভালোবাসা পাবে না? সুখে বেঁচে থাকতে তার বাধাটা কোথায়?

জীবন, আহ্, জীবন বড় মূল্যবান, মধুর, রমণীয়! আরো খানিকটা তরল মিষ্টি গন্ধ গ্রহণ করলো জোয়েত। এই দ্রব্যটির গুণে স্বপ্ন তার দীর্ঘতর হবে কিন্তু মৃত্যুর ভয় থাকবে না।

ক্রমশঃ চাঁদের গায়ে ফুটে উঠছে কোন এক সুন্দরীর মুখাবয়ব, যে আপন সুখে গান গাইছে।

ঐ সুন্দর মুখ তার আবাল্য পরিচিত, ঐ মুখ তার মা মারসিঅনেসের।....

নীচে, আসরে, তখন মারসিঅনেস পিয়ানোয় বসে গান ধরেছে।

জোয়েতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, কিন্তু দুটো ডানা পেয়েছে সে। নীরব নিকষ রাতে বনাঞ্চলের ওপর দিয়ে দূর দূরান্তরে উড়ে যাচ্ছে সে। নিঃসীম মহাশূন্যে সুখ। বাতাসের স্নেহ পরশে দেহ পুলকিত, ঘুমন্ত বুকের কাছে কোন দুঃস্বপ্ন নেই। সে মহানন্দে এত জোরে পাক খাচ্ছে যে নীচের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।....হঠাৎ দেখলো, সে যেন একটা পুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছে। ছিপ তুলতেই দেখলো, বঁড়শিতে গাঁথা রয়েছে তার বড় প্রিয় আকাঙ্খার বস্তু একছড়া মুক্তোর মালা। কখন যেন তার পাশে ছিপ্ হাতে বসে পড়েছে সারভিনিও। সারভিনির বঁড়শিতে গেঁথে উঠলো একটা কাঠের ঘোড়া।...

স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল।

আবার একটু একটু করে বর্তমানে ফিরে আসছে জোয়েত।

নীচে তার নাম ধরে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি।

মারসিঅনেস বলছে, "জোয়েত বাতি নিভিয়ে দাও!"

সারভিনির সোচ্চার রসিকতা, "মাদামমেয়জেল জোয়েত, তোমার আলোটা নেভাও।"

সঙ্গে সঙ্গে সকলের মিলিত সরস ধ্বনি, "মাদময়জেল জোয়েত, এবার তোমার আলোটা নেভাও।"

জোয়েত ঘরময় মাদক গন্ধ ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে দিতে থাকে। তারপর এক বিশেষ লোভনীয় ভঙ্গীতে দেহটিকে গুটিয়ে নেয়। মৃত্যুর ইচ্ছা তার মৃত। এখন শুধু পরীক্ষা করছে ওদের।

মারসিঅনেস বলছে, "মেয়েটা আমার আচ্ছা বোকা। শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

চিন্তার কথা। বারান্দার দিকের জানালাটাও খোলা। "ক্লিমেন্স, তুমি যাও তো উপরে— ও ঘরের জানালা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে চলে আসবে।"

ঝি ক্লিমেন্স ওপরে গিয়ে জোয়েতের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়, "মাদময়জেল মাদময়জেল..."

কোন সাড়া নেই।

ক্লিমেন্স আবার চড়া গলায় বললো, "মাদময়জেল, মাদাম লা মারসিঅনেস আপনাকে বাতি নিভিয়ে জানালা বন্ধ করে শুতে বলেছেন।"

এবারও উত্তর নেই।

এবার সে চীৎকার করে ডাকলো, "মাদময়জেল, মাদময়জেল!"

এখনও সেই নিরেট নীরবতা।

ঝি নীচে নেমে গিয়ে বললো, "মাদময়জেল দারুণভাবে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিছুতেই জাগানো গেলো না।"

মা মন্তব্য করলো, "এভাবে ঘুমানোটা ঠিক নয়।"

সারভিনির নেতৃত্বে সকলে মিলে জোয়েতের জানালা বরাবর দাঁড়িয়ে হুল্লোড় তোলে, "হিপ্ হিপ্ হুররে, মাদময়জেল জোয়েত!"

সেই সমবেত হৈ-হৈ রৈ-রৈ রব রাত্রির স্তব্ধতা চিঁরে খান্ খান্ করে।

তবু তো জোয়েতের সাড়া নেই!

মারসিঅনেসের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা, "ওর কিছু হয়নি তো?"

অনেকগুলি গোলাপের কুঁড়ি যোগাড় করে সারভিনি একটার পর একটা ছুঁড়তে থাকে খোলা জানালা দিয়ে। প্রথমটা গায়ে পড়তেই দারুণ আঁতকে উঠেও নিজেকে সামলে নেয় জোয়েত। এরপর অনেকগুলি ফুল এসে পড়তে থাকে তার উপর। নিশ্চল জোয়েত নিশ্চুপই থাকে।

মারসিঅনেস আতঙ্কে উচ্চারণ করে, "জোয়েত সাড়া দাও।"

গম্ভীর সারভিনিও, "ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। বারান্দার পাঁচিল বেয়ে আমাকে ঐ ঘরে নামতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয় কাভেলিয়ার, "না, তা হবে না। ব্যাপারটা তোমাদের সাজানো। আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমরা দু'জনে এভাবে মিলিত হবে। এ চক্রান্ত চলবে না!"

প্রতিধ্বনি দিয়ে ওঠে আরো অনেকে, "এ চক্রান্ত চলবে না। সব সাজানো ব্যাপার।"

বিব্রত মারসিঅনেস বললো, "কিন্তু একজনকে তো ঢুকে দেখতেই হবে ব্যাপারটা কি?"

প্রিন্স নাটুকে গলায় ক্ষোভের সঙ্গে বললো, "বুঝেছি। আমি হলপ্ করে বলছি, মাদাম ডিউককেই এই দুর্লভ সুযোগটা দিতে চায়। আমাদের সঙ্গে তঞ্চকতা করা হলো।"

কাভেলিয়ার পকেট হাতড়ে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে লটারির প্রস্তাব দেয়, "টস্ করে স্থির করতে হবে, কে সুযোগ পাবে, আর কারা পাবে না।"

প্রথমে এগিয়ে এলো প্রিন্স ক্রাভালো। বললো, "টেল।'

কিন্তু মুদ্রা উৎক্ষেপনের পর জানা গেলো—"হেড"।

এলো সেভেল। তার বাজি 'হেড'। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। একে একে সকলেরই ভাগ্য পরীক্ষিত হলো। কেউই উত্তীর্ণ হলো না। বাকি রয়েছে শুধু সারভিনি। কিন্তু সে নিজের হাতে মুদ্রা ছুঁড়েও প্রার্থিত ফল লাভে ব্যর্থ হলো।

হঠাৎ সারভিনি প্রিন্সকেই প্রস্তাব দিয়ে বসলো, "প্রিন্স, তুমিই যাও!"

এই আকস্মিক সুযোগ পেয়ে হতবুদ্ধি প্রিন্স, এদিক ওদিক তাকাতে থাকে।

কাভেলিয়ার জিজ্ঞেস করলো, "কি খুঁজছো তুমি, প্রিন্স?"

"আমি, আমি......মানে যদি একটা ইয়ে—মানে যদি একটা মই পেতাম—"

প্রিন্সের ভীরুতা ও আমতা-আমতা জবাবে অন্য সকলের সম্মিলীত কলকাকলি।

বিপুলদেহী সেভেল এগিয়ে এসে প্রিন্সকে বললো, "ঠিক আছে, আমি আপনাকে সাহায্য করছি।" বলেই প্রিন্সকে মাটি থেকে সোজা উপরে তুলে ধরে বলে, "ধরুন এবার বারান্দার কার্নিশটা শক্ত করে।"

প্রিন্স দু'হাত আঁকড়ে ধরে কার্নিশ। সেভেজ তখনই তাকে ছেড়ে দেয়। সে এক বিচিত্র দৃশ্য!

হাতে ভর দিয়ে শূন্যে দোদুল্যমান প্রিন্স বাতাসে খাবি খাচ্ছে! মজাটা আরো জমলো যখন সারভিনি প্রিন্সের ঝুলন্ত ঠ্যাং দুটো চেপে ধরে নিজেও দুলতে লাগলো। প্রিন্সের বিপদ বুঝে তেড়ে-ফুঁড়ে ছুটে আসছিল বেলভিনো; কিন্তু ঠিক তখনই আর সামলাতে না পেরে প্রিন্স একেবারে হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়লো বেলভিনোর গোলগাল ভূঁড়িটির ওপর।

সারভিনির চকচকে ধারালো দৃষ্টি সকলের মুখের ওপর। তার তেজি জিজ্ঞাসা, "এবার কে যেতে চায়?"

সকলের মুখ চূণ। রাটি নেই।

বেলভিনোর দিকে চেয়ে সে বললো, "মঁসিয়ে বেলভিনো, তুমি তোমার সাহস ও কসরৎ দেখিয়ে দাও।"

"আরে না, না! তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। পৈতৃক প্রাণের প্রতি আমার একটু আধটু মমত্ব এখনো আছে।"

"কাভেলিয়ার, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? প্রায়ই তো উঁচু উঁচু দুর্গ পার হবার গল্প বলে থাকো।"

"বাছা ডিউক, দায়িত্বটা আমরা তোমাকেই দিচ্ছি।"

"উত্তম, চেষ্টা করে দেখি। অবশ্য আমি কখনো তোমাদের মতো নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে বড় বড় কথা বলি না।"

অতঃপর সারভিনির সামগ্রিক সপ্রতিভ আচরণে যথার্থ পৌরুষের ছায়াপাত। সে পিলারটার চারপাশে বারেকের জন্যে চক্কর কাটে, পরখ করে, তারপর একলাফে বারান্দার কার্নিশে। সেখান থেকে বরগা ধরে ধরে এগুতে থাকে সারভিনি।

নীচের দর্শকরা বাহবা না দিয়ে পারলো না। যেন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে লোকটা!

সারভিনির গতি কিন্তু ক্রমশ শ্লথ, কেমন যেন উদ্বিগ্ন চরণে সে এগিয়ে গেলো সেই জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে এবং পরক্ষণেই সরে ছিটকে এসে আর্তনাদ করে ওঠে, "তোমরা শীগ্‌গির এসো! শিগ্‌গির জোয়েতের জ্ঞান নেই!...."

ডুকরে কেঁদে উঠে মারসিঅনেস ছুটতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে। তামাশাপ্রিয় মতলববাজ লোকগুলিও উদ্বিগ্নচিত্তে ছুটে আসে উপরে।

ঘরে ঢুকে কপাট খুলে দিয়েছে সারভিনি।

আকুল মারসিঅনেস ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়ের বুকের ওপর, "তোর কি হয়েছে, আমাকে বল। মা, তুই মুখ খোল।"

ক্লোরোফরমের শিশিটি তুলে সারভিনি বললো, "স্বেচ্ছায় অজ্ঞান হবার ওষুধ ব্যবহার করেছে জোয়েত।"

তারপর নীচু হ'য়ে জোয়েতের বুকে সে কান পাতে, বলে "এখনো শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। এখনি ওকে সুস্থ করে তোলা দরকার। একটু এ্যামোনিয়া পাওয়া যাবে এ বাড়িতে?"

ঝি ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞেস করে, "কি চাইছেন স্যার, আমাকে বলুন।"

"সলভোলেতাইল জাতীয় কোন ওষুধ?"

"হ্যাঁ আছে।"

"এক্ষুণি ছুটে নিয়ে এসো। আর এই ঘরের জানালা-দরজা সব খুলে দাও, বাতাস খেলুক।"

মারসিঅনেস ভেঙ্গে পড়েছে কান্নায়: "জোয়েত—জোয়েত, সোনা, মামণি আমার, এ তুই কি করলি! ওহ্! ঈশ্বর! তুমি আমায় এ কী শাস্তি দিচ্ছো, ঠাকুর!"

হতভম্ব হতচকিত আর সকলে কে কি করবে, ভেবে উঠতে পারছে না। কেউ টেনে আনছে বালতিতে করে জল, কেউ এনে রাখছে তোয়ালে, কেউ আবার গেলাস ও ভিনিগার নিয়ে দিশেহারা। তারই মধ্যে কার যেন সুযুক্তি শোনা গেল, "মেয়েটার গা থেকে জামা খুলে নেওয়া দরকার।"

কাঁপা হাতে মারসিঅনেস চেষ্টা করলো জোয়েতের জামার ফিতে খুলতে কিন্তু বিহ্বল হাতে এটা-ওটা টানাটানিতে গিঁট আরো কষে যায়। ভাঙ্গা গলায় ডুকরে কেঁদে ওঠে মারসিঅনেস, "আমি পারছি না—ওগো, আমার আর শক্তি নেই।"

ঝি ওষুধ নিয়ে এলো।

ধীরে সুস্থে সেই ওষুধ রুমালে ঢেলে জোয়েতের নাকের কাছে চেপে ধরলো সারভিনি।

তৎক্ষণাৎ জোয়েতের শরীরটা নাড়া-চাড়া খেয়ে ওঠে। খুশিতে ঝলমল করে সারভিনির চোখ, "আচ্ছা! ভয়ের কোন কারণ নেই। জোয়েত স্বাভাবিক হয়ে উঠলো বলে!"

সারভিনির নির্দেশে ঝি জোয়েতের বসন খুলতে থাকে। স্বচ্ছ অন্তর্বাসটি ছাড়া জোয়েতের শরীরে আর কোন আবরণই থাকে না। প্রাণৈশ্বর্যের ও রূপৈশ্বর্যের রাণী যেন তার যৌবনের শেষ সুপ্ত স্থানটিও এই মুহূর্তে মেলে ধরবে। সারভিনি ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দেয়। জোয়েতের স্বল্পাবৃত দেহের নিবিড় স্পর্শে সারভিনির শিরা উপশিরাগুলো চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। মারসিঅনেসের দিকে তাকিয়ে বলে, "চিন্তার কোন কারণ নেই। জোয়েত সুস্থ হ'য়ে উঠছে।"

হঠাৎ তার খেয়াল হলো, জোয়েতের অর্ধাবৃত দৈহিক সুষমাকে অনেকেই যেন চক্ষু দিয়ে গিলে খাচ্ছে।

এই প্রথম রেগে উঠলো সারভিনি, ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো সে, "এই যে মশাইরা, দয়া করে আপনারা আর অসুস্থের ঘরে ভিড় জমাবেন না। যান আপনারা—এখান থেকে। শুধু আমি, সেভেল আর মারসিঅনেস থাকবো এখানে।"

সারভিনির ধমকে পিছু হটে গেল তারা। জোয়েতকে ঘিরে রইলো শুধু তিনজন—মারসিঅনেস, সারভিনি ও সেভেল।

মারসিঅনেস সেভেলকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষত ঘষতে বলে, "ওকে বাঁচিয়ে তোলো প্রিয়, ও যে আমার প্রাণের অধিক!"

পিছনে ফিরে সারভিনি আবিষ্কার করলো জোয়েত-লিখিত চিঠি দুটি :

'গণিকা হবার পরিণতি এড়াতে আমি বেছে নিলাম আত্মহননের পথ,'

'আমায় বিদায় দাও মাগো, আমায় ক্ষমা করো!

জোয়েত।'

চিঠি দু'টি পকেটে পুরে সারভিনি মনে মনে ভাবলো, 'ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আমি পরে ভাববো।'

মারসিঅনেস তখনো হাঁপুস নয়নে কাঁদছে, "একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।"

"না, তার আর দরকার নেই" দৃঢ়স্বরে সারভিনি বললো, "শুধু এক মিনিটের জন্য বাইরে যান। আপনার মেয়েকে আমি পরিপূর্ণ সুস্থ করে তুলছি।"

মারসিঅনেস ও সেভেল ঘর ছেড়ে চলে যায়।

সারভিনি জোয়েতের একখানা হাত তুলে নিয়ে মধুর স্বরে বলে, "মাদময়জেল, চোখ মেলে আমার দিকে তাকাও, কথা বলো।"

সুমিষ্ট স্বপ্নের সৌরভ নিয়েই জোয়েত তার আশ্চর্য আয়ত চক্ষু দুটি মেলে ধরে।

সারভিনি বললো, "এবার উঠে বসো। কেন এমন বোকামি করতে যাচ্ছিলে?"

জোয়েত ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করে, "আমার বড় কষ্ট মাস্কেদ!"

সারভিনি ওকে আদর করতে থাকে, "ছি! এরকম বোকামি করতে নেই। প্রতিজ্ঞা করো—আর কখনো এরকম বিপজ্জনক পরীক্ষা চালাবে না।"

জোয়েত নিঃশব্দে সম্মতি জানায়। সারভিনি ওর অন্তরসম্পদের স্পর্শ অনুভব করছে। জোয়েতের চিঠিটা বের করে জিজ্ঞেস করে, "দেখাবো নাকি এটা তোমার মাকে!"

জোয়েত মাথা নাড়িয়ে নিষেধ করলো।

সারভিনি ওকে বলতে থাকে, "প্রিয়া, পৃথিবীতে যখন এসেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। শত দুঃখেও ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। আমি বুঝতে পেরেছি কোথায় তোমার দুঃখ। আমি শপথ করে বলছি—"

সারভিনি কথা শেষ করবার আগেই জোয়েত বলে ওঠে, "তোমার দয়ার অন্ত নেই।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সারভিনি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেই অপরূপার দিকে। জোয়েতের চোখে মুখে এখন সমর্পণের নির্ভুল ইঙ্গিত। হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে সারভিনিও বিপুল আগ্রহ ও আবেগে সাড়া দেয়। দীর্ঘ—দীর্ঘ চুম্বনে দুটি সত্তা একাকার।

অনেকক্ষণ কেটে গেল ঐ আচ্ছন্নভাবে। সারভিনি অনুভব করে, শরীর তার ক্রমশঃ উত্তেজিত হচ্ছে।

তবু নিজেকে সংযত রেখে সে উঠে দাঁড়ায়।

জোয়েতের মুখে পরিতৃপ্ত প্রেমের হাসি।

সারভিনি বললো, "তোমার মাকে ডেকে আনি।"

জোয়েত মদির স্বরে বললো, "আর একবার আমার একান্তে এসো। বড় ভালো লাগছে।"

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমাকে সারাজীবন প্রেম জানাবে তো?"

সারভিনি হাঁটু মুড়ে বসে জোয়েতের হাতে চুমু খায়, শপথ নেয়, "তোমাকে আমি শ্রদ্ধাও করি জোয়েত।"

মারসিঅনেসকে ডেকে আনলো সারভিনি। মা ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়ের বুকে। দু'জনের চোখেই জল।

সারভিনি এখন এসে দাঁড়িয়েছে খোলা বারান্দায়। নির্মল বাতাসের আনাগোনা। বুক ভরে শ্বাস নেয় সে; তার দেহ-মন অনাস্বাদিত এক আনন্দে ভরপুর।

স্বপ্ন?

Was it a dream?

স্নায়বিক যন্ত্রণায়, গাঁটে গাঁটে উৎক্ষিপ্ত জ্বালায় আমার ঐ একটি অনুভূতিই স্পষ্ট হ'য়ে আছে,—আমি তার প্রেমে অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম, তাকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম। আচ্ছা, মানুষের মনে ভালোবাসার উন্মেষ ঘটে কেন? কখন সেই ভালোবাসা বেওয়ারিশ অন্তরটাকে কুক্ষিগত করে ফেলে? কেন?

বিচিত্র এক শিহরণ সেই ক্ষণে, ভয়-ভাবনা কোথায় উবে যায়, প্রেমিকের দৃষ্টিতে তামাম দুনিয়ায় একটিমাত্র সত্তাই সত্যি, সমগ্র হৃদয় তোলপাড় করে একটিমাত্র বাসনা এবং বারংবার উচ্চারিত হয় একটিমাত্র নাম, পারিপার্শ্বিক অন্য সবের হদিশ মেলে না তখন।

আপনাদের কাছে স্বীকারোক্তি দিচ্ছি, আমাদের গল্প আপনাদের শোনাবো। কিছুই বাদ দেবো না, জরু-গরু সমেত হুবহু। জানেন তো, প্রেম জীবনে একবারই আসে, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি সারাজীবন ধরে বেজে চলে।

তাকে দেখলাম। তার রূপে সোহাগে আমি আলোকিত ও সতেজ হ'য়ে উঠলাম। তার উদ্ধত যৌবনে, বাচালতায়, সুকণ্ঠস্বরে আমি তন্ময় ও আচ্ছন্ন।

পৃথিবীর বয়স বাড়ে, দিনের পর রাত আসে, জীবনের শেষ হয় মরণে—কিন্তু আজও সেই কল্পতরু প্রেমের প্রভাবে আমি চৈতন্যহীন।

মৃত্যু, যা অনিবার্য, যার উন্মত্ততা কেউ রোধ করতে পারে না, একদিন তাকে এই দুনিয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কি ভাবে ? আমি বলতে পারবো না। হন্যে হ'য়ে খুঁজলেও এর জবাব পাবো না।

এক ভুলকালাম বৃষ্টির দিনে ভিজতে ভিজতে সে ঘরে ফিরলো। পরদিন থেকে সর্দি-কাশিতে দারুণ অসুস্থ, বিছানায় সেঁটে রইলো সপ্তাহখানেক। দুর্যোগের সানুদেশে কি কি ঘটনা ঘটেছিল মনে নেই। মনে আছে, ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তিনি ওষুধের নাম লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য তৎপরতায় নিশ্চয় সেই ওষুধ আনা হয়েছিল এবং একটি নার্স সুচারুহাতে তাকে তা খাইয়েও দিয়েছিল।

অসুস্থের দুই হাত অসম্ভব গরম, কপালের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে বুঝি, দুই চোখ দারুণ রক্তাভ, কমনীয় চেহারা রোগ যন্ত্রণায় ক্রমশই পাথুরে চেহারায় রূপান্তরিত। তখনো সে আমার প্রশ্নের অমায়িক জবাব দিচ্ছিলো, যদিও আমরা কি বলছিলাম, মনে নেই।

সব ভুলে গেছি। উদ্বিগ্ন কথাবার্তার একটি শব্দও আজ মনে নেই। শুধু এখনো কানে বাজছে তার অন্তিম ক্ষীণ নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ ; নার্স বলে উঠেছিল অস্ফুটস্বরে, 'ইস্!' সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম, সব শেষ হয়ে গেল, আসক্তিপূর্ণ এই জগৎ থেকে চির বিদায় নিলো সে।

এর বেশী কিছু আমার জানা নেই, আর কিছুই আমি বলতে পারবো না।

একজন যাজক আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার প্রিয়া ?'

মুহূর্তে মনে হয়েছিল, একান্ত অনধিকার প্রশ্ন, মৃতের প্রতি এ একান্ত অপমানসূচক শব্দ, যা উচ্চারণ করবার অধিকার এই দুনিয়ায় কারুর নেই ; আমার মগজে বিস্ফোরণ ঘটলো, আমি তাঁকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলাম।

এরপর যে পাদ্রী এলেন, তিনি প্রাচীন ও অভিজ্ঞ, তিনি মৃতের গুণাবলী মধুর স্বরে বলতে লাগলেন ; এবার আর আমি বাজখাঁই গলায় চীৎকার করে উঠলাম না, বরং আমার দু'চোখ বেয়ে লোনা জল ঝরতে থাকে।

গির্জার লোকেরা আমার সঙ্গে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে কিছু আলোচনাও করেছিলেন, কিন্তু আমার স্মৃতি থেকে সেই সমস্ত শব্দ মুছে গেছে। কিছু একটা হুলুস্থুল কাণ্ড তো বটেই ! আমার দৃষ্টির সামনে আজও শুধু ভাসছে সেই বীভৎস শবাধারটি। কফিনের ওপর পেরেক ঠোকার শব্দ এখনো কানে এসে লাগছে।

ওহ্ ঈশ্বর !

বাড়বাড়ন্ত এই পৃথিবীর সাড়ে তিন হাত জমির তলায় সমাধিস্থ হলো সে। চারপাশে আরো কত কবর ! কবরে কবরে ছয়লাপ। অন্ধকার বিবরে চিরশয়ানে শায়িতা সে। কিছুক্ষণ পর টিমটিমে মোমবাতিটাও নিভে যাবে। সব অন্ধকার।

ওর কয়েকজন বান্ধবী এসেছিল। তাদের আয়ত সজল দৃষ্টির মুখোমুখি হবার আগেই আমি কবরখানা থেকে পালিয়েছিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে। পরের দিন বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে উদ্দেশ্যহীন যাত্রাপথে।

গতকাল প্যারিতে ফিরে নিজের ঘরে পা দিতেই আবার সেই হারানো যন্ত্রণা আমাকে পেয়ে বসে। এই আমাদের সেই ঘর, আমাদের শয্যা, আমাদের আসবাবপত্র, অলস মুহূর্তগুলিতেও যাদের আমরা ব্যবহার করেছি—একটি প্রাণ নিঃশেষিত হ'য়ে যাবার পরও ওরা সব যথাযথ রয়েছে, ঠিক তেমনি একোণে ওকোণে নিখুঁত সাজানো, যেন কোন দক্ষ কারিগর এই কিছুক্ষণ আগে ওদের সাজিয়ে রেখে গেছে। দুঃসহ বেদনায় ইচ্ছে হলো, এখনই একটা জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করি। চোখের সামনে যেন থৈ থৈ অন্ধকার এবং অতীতের স্মৃতিগুলি ক্রমশই দুঃসহ বোঝা হ'য়ে উঠছে, সাধ্য নেই দু'পাশে স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার। ঘরের এই চার-দেয়াল একদিন তাকে আশ্রয় দিয়েছিল; আজ সেই চার-দেয়ালের আবেষ্টনীতে দাঁড়িয়ে রিক্তমুখ আমি তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছি—সে এখানে রয়েছে, এখানেই!

সহ্য করতে না পেরে টুপি হাতে নিয়ে পালিয়ে এলাম ঐ ঘর থেকে। কিন্তু হলঘরে ঢুকতেই আমার বিভ্রান্ত দৃষ্টি ঈষৎ কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে—সামনেই একটি বিশাল আয়না। প্রসাধনের উদ্দেশ্যে সে-ই এই আয়নাটা এখানে এনে রেখেছিল, প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হবার আগে আমি এই আয়নায় নিজেকে আপাদমস্তক দেখে নিতাম। সেই বিশ্বস্ত বস্তুটি আজও অটুট।

থমকে দাঁড়ালাম ওর সামনে। এটিও বহন করে চলেছে টুকরো টুকরো অজস্র স্মৃতি।

কতবার কতভাবে এই মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, চিন্তা করতে গিয়ে কেঁপে উঠলাম এবং পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলাম। ঐ কাঁচটাকেই আমার তাই ভালোবাসতে ইচ্ছা করছে, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলাম, চক্চকে কাঁচের পোড়ামাটি রং কাঠামোটিকে আঙুল দিয়ে ছুঁতে থাকি। হিম বরফ! স্মৃতি! চোয়াল ঝুলে পড়ছে আমার। বড় কষ্টদায়ক এই আয়না, বুঝি এক অগ্নিদগ্ধ দর্পণ, ভয়ানক চক্রান্তকারী, দারুণ জেদ—কোন মানুষকে এতো কষ্ট দিতে পারে! বেঈমান!

যে মানুষ চটপট সব ভুলে যেতে পারে, সে-ই তো সুখী। স্নেহ, প্রেম, মমতা ইত্যাদি যাবতীয় স্মৃতিকে যে মুক্তি দিতে পারে, তার সুখ অনাবিল। হায়, কেন যে দুঃখ আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

অভিষ্ট না থাকলেও কখন যেন প্রবল আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হ'য়ে উপস্থিত হলাম গোরস্থানে। স্বভাবতই পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়ায় তার সাদামাটা সমাধি স্থানটি খুঁজে নিলাম; সাদা মার্বেল পাথরের ক্রশচিহ্নে লেখা রয়েছে:

"সে ভালোবেসেছিলো এবং ভালোবাসা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছে।"

"সে ঐ গন্ধমাদন মাটির স্তূপের নীচে লীন হ'য়ে গেছে। কী ভয়ানক! সমাধিতে কপাল ঠেকিয়ে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। চারদিক থেকে নির্জনতা

তথা শূন্যতা যেন তেড়েফুঁড়ে আসছে, অনেক—অনেকক্ষণ রয়ে গেলাম ঐ অবস্থায়। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো এবং সেই নির্জন অন্ধকার একটা বিচিত্র বাসনাকে আমার দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে—আমি আজ সারা রাত ধরে প্রিয়ার সমাধিতে চোখের জল ফেলবো কিন্তু কাজটা সহজ নয়, ধরা পড়ে যেতে পারি এবং আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে অপমান করে সমাধিক্ষেত্র থেকে বের করে দেবে। কি ভাবে সম্ভব!

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

আমি নির্জন গোরস্থানে, সেই নিস্তব্ধ মৃতের রাজ্যে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। পায়ের তলায় কখনো ভেজা নরম ঘাস, কখনো শুকনো শিকড়, কখনো বা নিরেট পাথর—আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই, সর্বশক্তি ব্যয় করে বুঝি আমার এই পদচারণা!

যে তাঁতানো জীবন্ত নগরীতে আমাদের বাস, তার তুলনায় এই সমাধিস্থ জগতের পরিধি কত ক্ষুদ্র; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, জীবিতের তুলনায় মৃতের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী। চারপুরুষ ধরে বসবাসের জন্য আমরা গড়েছি আকাশস্পর্শী অট্টালিকা, অতি সাবধানে সাজিয়েছি রকমারি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, তৈরী করেছি চওড়া রাস্তা এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সুস্থ রাখবার জন্য চারপাশে ছড়িয়ে রেখেছি প্রচুর ফাঁকা জায়গা। পানীয় জলের জন্য ঝর্ণার জল তিরতিরিয়ে ওঠে, দ্রাক্ষাকুঞ্জ রয়েছে সুরা প্রস্তুতের জন্য, আর চাষবাসের জন্য সমতল উর্বর ভূমি। অথচ, এখানে আমাদের গতায়ু পূর্বপুরুষরা সামান্য উপকরণ নিয়ে পরম শান্তিতে শায়িত, কোন চাহিদা নেই, প্রতিবাদ নেই, নেই কোন বিপজ্জনক মুহূর্তসৃষ্টির প্রয়াস। মা ধরণী তার সন্তানদের কোলে ফিরিয়ে নেন, কালের বিবর্তন তাদের স্মৃতিকেও মুছে দেয়। ওহ্ ঈশ্বর!

ইতস্ততঃ পদচারণায় বৃত্ত রচনা করে একসময় আমি গোরস্থানের প্রান্তিক রেখায় এসে দাঁড়ালাম। যদিও চরাচর ঝাপসা, আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, এ দিকটার বয়স অনেক প্রাচীন, বহুযুগ আগেই এখানকার মৃতদেহগুলি মাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গেছে, কালের প্রত্যাখ্যানে কবরের পাথর টুকরো টুকরো, ক্রুশ চিহ্নগুলি ভেঙ্গে চুরমার, হয়তো আর কিছুকালের মধ্যেই নতুন মৃতেরা স্থানাভাবে এইখানেই নতুন করে সমাধিস্থ হবে। মানবদেহের ওপর গজিয়ে উঠেছে এক বিষণ্ন ও মনোরম উদ্যান—অযত্নে বিকশিত গোলাপ, বেপরোয়া বেড়ে ওঠা সমর্থ বিশাল সাইপ্রেস গাছ...।

এক ধরনের অস্ফুট শব্দ উঠছে এই শবাকীর্ণ এলাকায়, যে শব্দ নিরেট নৈঃশব্দেরই ফলশ্রুতি। আমি একা, একদম একা। একটি সবুজ ঝাঁকড়া গাছের নীচে যথাসম্ভব আত্মগোপন করে থাকি, ডুবন্ত জাহাজের আরোহী যেমন একটুকরো কাঠকে অবলম্বন করেই ভেসে থাকবার চেষ্টা করে, আমিও তেমনি গাছের একটা ডালকে অবলম্বন করে অনেকটা যেন জিজ্ঞাসু চোখে সামনের দিকে চেয়ে আছি। বিব্রত দিন শেষ হয় এবং সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে, ক্রমে অন্ধকার ঘন হয় এবং তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মেজাজ ফিরে পায়। তখন আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম, নাটকীয় সন্তর্পণে কাল্লখানার ওপর ইতস্ততঃ হাঁটতে থাকি।

অনেকক্ষণ পরিবেশজনিত প্রতিকূলতা গ্রাহ্য না করে আমি আমার বাঞ্ছিত কবরটি খুঁজতে থাকি। কিন্তু পেলাম না। একাধিক স্মৃতিসৌধে আমার মাথা, হাত, বুক, জানু ঠোক্কর খেতে থাকে; কিন্তু কোথায় সেটি? কোন্ অজুহাত দেখাবো আমার এই ভ্রান্তির? অন্ধের মতো পথ হাতড়াচ্ছি, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি পাথরের ফলক, ক্রুশ, লোহার রেলিং, ধাতুর তৈরী কৃত্রিম মালা এবং ফুলের অকৃত্রিম স্তবক। ব্যস্ততায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। ফলকে খোদিত অক্ষরগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে মৃতের নাম ধাম পরিচয় জানবার চেষ্টা করছি। গিজ গিজ করছে কবরের পর কবর। এই থৈ থৈ অন্ধকার রাতে আমি আর তাকে খুঁজে পাবো না।

চাঁদহীন ভয়াল অন্ধকার, এক ঝলক দমকা বাতাসও বয় না, সারিবদ্ধ কবরের মধ্য দিয়ে আগুয়ান আমি যেন কোন গলিপথ অতিক্রম করছি। আতঙ্কে শিহরণ জাগে, চারদিকে খালি কবর আর কবর, একটির সঙ্গে অপরটি ঠেস দিয়ে শুয়ে আছে। ডান হাতে, বাঁ হাতে, সামনে, পিছনে কেবল মৃতের ভূমিশয্যা, বাতাসে একই ধরনের বিজাতীয় সুবাস, যা আমাকে ক্রমশ দুর্বল, কাতর করে তুলছে, এখানকার প্রতিটি পদক্ষেপ শক্তির দ্রুত অপচয়, পা কাঁপছে থরথরিয়ে। স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছে প্রচণ্ড, ফলতঃ অন্যমনস্কও হতে পারি না! দু'পায়ের ওপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে একটা পাথুরে সমাধির ওপর বসে পড়লাম, ভয়ার্ত চোখে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি সামনের দিকে, নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ মনে হলো, কি সব ধ্বনির ঔজ্জ্বল্য এসে আঘাত করছে আমার কর্ণকুহরে। এ কিসের শব্দ? শব্দ ক্রমশঃ চীৎকারে রূপান্তরিত হয়। এমন আওয়াজ, যার কোন জাগতিক ব্যাখ্যা চলে না, নামহীন এলোমেলো হট্টগোল। তীক্ষ্ণ অথবা সকুণ্ঠ বুদ্ধি দিয়ে এই মুহূর্তে এর উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। উৎস হয় নিছক আমার মস্তিষ্ক, নচেৎ জাগতিকভাবে ঐ সব কবরের অন্তঃস্থল। চারপাশে আমার দৃষ্টি ঘূর্ণায়মান, ক্রমশ আমি অবশ হিম, বিষণ্ন চিত্তে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, অবসন্ন স্বরে চীৎকার করে উঠতে চাইলাম, পারলাম না। আমার হাত-পা ইত্যাকার জাগতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আর কোন প্রেরণা সঞ্চার করতে পারছে না।

আমি যে পাথরখণ্ডের ওপর বসেছিলাম, অকস্মাৎ মনে হলো ওটা যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠছে, নড়ে চড়ে উঠলো সেটা। হ্যাঁ, নিশ্চয় নড়ছে, এতক্ষণের নিরাসক্ত বস্তুপিণ্ডে নির্ঘাৎ প্রাণসঞ্চার ঘটছে। আস্তে আস্তে ঠেলে উঠছে তার মাথা। এক ধাক্কায় আমি পাশের একটা কবরে ছিটকে এসে পড়লাম।

বিস্ময় ও আতঙ্কের প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে দেখলাম, ঐ পাথরটাকে সরিয়ে কবর ঠেলে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হচ্ছে এক উলঙ্গ কঙ্কাল। কঙ্কাল তার পিঠ দিয়ে পাথরের খণ্ডটাকে ঠেলে দিলো আমার দিকে। সেই জমাট অন্ধকার রাতেও আমি পাথরটার গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলিকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম।

"জ্যাক আলভা এখানে শুয়ে আছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একান্ন। পরিবারের সকলের প্রতি তিনি সমান যত্নে তদারকি করতেন। তিনি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের চরণে স্থানলাভ করেছেন।"

কঙ্কালটিও লেখাগুলি পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে যেন তার ভাবান্তর ঘটে। পথ থেকে একটুকরো ধারালো পাথর তুলে নিয়ে হিংস্র ক্ষিপ্রতায় ঐ প্রতিটি অক্ষর সে খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলতে থাকে। তারপর পাথর জোড়াতালি দিয়ে কমবয়সী ছেলেরা যেমন আঁক কাটে, কঙ্কালটিও তেমনি পাথরখণ্ডে নতুন কতকগুলি শব্দ সাজিয়ে ফেলে, যেগুলি আমি অনায়াসে পড়ে ফেললাম:

"এখানে, এই কবরের তলায় আলভা নামক একজন লোক, যে একান্ন বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার লোভ ছিল নিদারুণ, সম্পত্তির লোভেই সে তার বাবার অকালমৃত্যু ঘটিয়েছিল। স্ত্রীর প্রতি তার বেআব্রু অত্যাচারের সীমা ছিল না, নিজের ছেলে-মেয়ের প্রতি তার ব্যবহার একটানা জঘন্য পীড়নের ইতিকথা। প্রতিবেশীদের প্রতি রূঢ় আচরণ ও তঞ্চকতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; লোভনীয় কোন বস্তু আঁচ করতে পারলেই সে প্রায় দস্যু হয়ে উঠতো। পরিণামে ঘটেছিল তার অভ্রান্ত করুণ মৃত্যু।"

নিজের বৃত্তান্ত নিজেই রচনা করে প্রেতায়িত চরিত্র স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিকে তাকাতে আমি আরো প্রাণান্তকর দৃশ্য দেখতে পেলাম। ছড়ানো-ছিটানো খাপছাড়া এলোমেলো কবরগুলি ঠেলে ঠেলে আবির্ভূত হচ্ছে এক একটি বিচলিত কঙ্কাল। ওরা প্রত্যেকেই আত্মীয় পরিজনের মিথ্যাস্তুতি মুছে ফেলে নিজের নিজের আসল চরিত্র ও কীর্তি লিখে ফেলতে ব্যস্ত। মিথ্যার স্তর লোপাট করে অসহনীয় বাস্তব সত্য ফুটে উঠেছে।

এবং আমি প্রতিটি লেখাই পাঠ করছি। দেখছি, এরা সকলেই ঠগ, প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে; তারা ঈর্ষাপরায়ণ, বিদ্বেষপরায়ণ, লোভী, সততার ধার ধারে না, মিথ্যার বেসাতিতে মশগুল, আনুষঙ্গিক চারিত্রিকস্খলন তাদের পুরোমাত্রায়। সুযোগ পেলেই ওরা চুরি করেছে, অপরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙেছে, বশম্বদ থাকবার ভান করে উপকারীর সর্বনাশ করেছে। কবরের লিপিতে যারা কর্তব্যপরায়ণ পিতা, সাধ্বী পত্নী, অনুগত পুত্র, নিষ্প্রাণ কন্যা, সৎ ব্যবসায়ী,—তারা সকলেই পার্থিব জগতে ছিল ধুরন্ধর প্রবঞ্চক।

ঠিক তখনই আমার মনে হলো, আমার প্রিয়াও নিশ্চয় এই সময় কবর থেকে উঠে এসে জবানবন্দী লিখছে! ছুটে চললাম তার কবর লক্ষ্য করে এবং তক্ষুনি দেখতে পেলাম তাকে—চাদরে মুখ ঢেকে মার্বেলের গায়ে আঁক কাটছে।

যে ফলকে এর আগে লেখা ছিল, "সে ভালোবেসেছিল এবং ভালোবাসা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছে," এখন সেখানে ফুটে উঠেছে এক নির্মম সত্য-ভাষণ:

"প্রেমিককে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ অভিসারে গিয়েছিল সে এবং
ফিরবার পথে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে মারা যায় সে।"

পরের দিন সকালে ঐ কবরখানায় আমাকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল।

আমাদের বন্ধু ইংরেজরা

Our friends the English

চামড়ায় বাঁধানো ছোট খাতাখানা যে ট্রেনের উঁচু আসনে পড়েছিল, তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকি। এক ভ্রাম্যমানের রোজনামচা, ভুলক্রমে ফেলে গেছেন।

এই ডায়েরির শেষ তিনটি পৃষ্ঠা এখানে তুলে ধরলাম।

১লা ফেব্রুয়ারী:

শহরের নাম মেনটন, সেখানে যত ক্ষয়রোগীদের আবাস। এ সেই মাটির নীচে পুষ্ট হওয়া আলুর ক্ষয়রোগ নয়। আমার এক বিদ্বান ডাক্তার বন্ধু এ সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল করেন।...

হোটেলের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়েছি। রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, নেদারল্যাণ্ড—দেশের সেরা সেরা হোটেলগুলিতে চষে বেড়ানো অভিজ্ঞ লোক আমি অবশেষে ঘর পেলাম একটা, যা আয়তনে এত বিশাল যে মনে হয় এক বিশাল শূন্যতা সতত বিরাজমান।

অতঃপর শহরময় ঘুরে বেড়ালাম; একটি উদ্ধত পাহাড়ের সানুদেশে এর অবস্থান [গাইড-বুক দ্রষ্টব্য]। মুলাকাৎ হলো অনেকেরই সঙ্গে, এরা প্রায়শই রুগ্ন, দুর্বল, মুখে চোখে তাদের বিরক্তি ও হতাশা। অধিকাংশেরই গাল-গলা মাফলারে ঢাকা [সেই সমস্ত প্রকৃতি-বিশারদদের স্মরণ করছি, যাঁরা এই পোশাকটির অন্তর্ধান নিয়ে চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেন!]

সন্ধ্যা ছ'টা। ডিনার খাবার জন্য শহর থেকে ফিরে এসেছি হোটেলে। লম্বা লম্বা টেবিল বড় ঘরখানি জুড়ে; এক লহমায় আন্দাজে বলতে পারি, এখানে অন্ততঃ শ' তিনেক লোক খানা-পিনা সারতে পারে। কিন্তু তিন শ'র বদলে খানার আসরে আছে মোটে বাইশজন। আর ঐ বাইশজন এ ঘরে ঢুকলেন বেশ সারবদ্ধ হ'য়ে—একের পিছনে অপরে। প্রথম যিনি ঢুকলেন তিনি এক দীর্ঘদেহী ইংরেজ, দাড়ি-গোফ নিখুঁত কামানো। পরনে তাঁর ফ্রক কোট, লম্বা ঝুলের শার্ট কোমর অব্দি, একখানা হাত পকেটে এমনভাবে ঢোকানো যেন একটা গুটিয়ে রাখা ছাতা। ওঁর এই বাহারে পোশাক দেখে আমার এক কশাক পুরোহিতের কথা মনে পড়ে অথবা সাদৃশ্য খুঁজে পাই কোন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন বা পেনসানভোগী সৈনিকের অভিনব বেসামরিক পোশাকের

সঙ্গে। কোটে লম্বালম্বি আগাপাস্তালা বহু বোতামঘর এবং সারিবদ্ধ ক্ষুদে ক্ষুদে বোতামগুলি যেন একদল বুনো উকুন। ওয়েস্টকোটেরও দশা ঐ রকম। এমন মানুষ নিজের জিন্দেগী আর ভলাইয়ের জন্য আর যাই করুন, তিনি যে খুব চটপটে নন, এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

তিনি আমাকে দেখে ঈষৎ ঝুঁকলেন; আমিও সৌজন্য জ্ঞাপন করি।

এরপর নজর কাড়ে তিন ইংরেজ ললনা,—মা এবং তার দুই মেয়ে; তাদের চুল মাথার ওপর লক্ষণীয়ভাবে ডিম্বাকৃতিতে আঁট করে বাঁধা। মাঠাকুরণের মতো তার মেয়েরাও যেন প্রবীণা; অথবা, বলা যায়, মেয়েদের মতো তাদের মা-ও বয়স্কা। বিধিদত্ত শারীরিক গড়নে তারা একই ছাঁদের—চিমসে হাড়সর্বস্ব চেহারা, পাণ্ডুর মুখ চোখ এবং সামনের দাঁতগুলি উৎকট উঁচু হ'য়ে যুগপৎ খাবার প্লেট ও মানুষকে ভয় দেখায়।

দেখতে দেখতে আরো অনেকে এলেন। সব আলাদা আলাদা। কেউ কারুর সাকরেদি করছেন না, সুনিশ্চিত। জাতে সব ইংরেজ। পুরুষদের মধ্যে মাত্র একজন স্থূলকায় ও রক্তাভ। মহিলাদের সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে চৌদ্দতে, তাদের মধ্যে জনাকয়েক যুবতী, কেউ কেউ দেখতে হয়তো মন্দ নয়, কিন্তু কোন মাদকতা সৃষ্টি করে না।

দু'জন যুবক সংসারী পাদ্রীকে দেখতে পেলাম, নিজেদের স্ত্রী ও বাচ্চাকাচ্চাদের সামলাচ্ছেন। আমাদের পরিচিত পাদ্রীদের চেয়েও তাঁরা যেন আরো বেশী গম্ভীর, ঋজু ও মমত্বহীন।

সকলেই খাবার টেবিলে সমবেত হওয়ার পর প্রধান পাদ্রী বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করেন।—অর্থাৎ আমার ডিনার, আমার নামে নয়, ইস্রায়েল ও আলবেনিয়ার দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হলো। প্রার্থনার পর সুপ্ নিয়ে যে যার ডিনার শুরু করে দিলেন।

বিশাল ঘর জুড়ে অখণ্ড অস্বাভাবিক নীরবতা; মনে হয়, যেন পবিত্র ভেড়ার পাল এক ছাগলের অভিযানে বিব্রত, গম্ভীর। বিশেষতঃ ঐ মহিলারা, যারা স্পষ্টতই ভীত, সন্ত্রস্ত, হয়তো তারা তাদের চুল ও প্রসাধনের বাহার অটুট রাখতে এমন অনড়।

পার্টির যিনি বড় কর্তা, তিনি ধর্মপ্রাণ পুরুষ, চাপাস্বরে সমবেত সকলকে কি সব ধর্মগাথা শোনালেন। দুর্ভাগ্য আমার, ইংরেজি বুঝি না। শুধু তাঁর হাবভাব দেখে অনুমান করতে পারি, তিনি দেবতা ও দৈব সম্পর্কেই কিছু বক্তব্য রাখছেন এবং সকলে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথা শুনছেন।

পছন্দ করি বা না করি, অনেক অবিশ্বাস্য উক্তির মধ্যে দিয়ে আমাকে খাবারে হাত দিতে হলো। যথা, ওঁদের মধ্যে এক ধার্মিক উক্তি করলেন, "তৃষ্ণার্তের জন্য আমি জল রেখেছি।"

এ কথার সারমর্ম আমি অনুধাবনে অসমর্থ। আমি এই পবিত্র মানুষগুলির একটি উক্তিও বুঝি না, যদিও তাঁদের উচ্চারিত শব্দগুলি আমার কানের কাছে মৌমাছির মতন গুন্ গুন্ করে, মস্তিষ্কের স্নায়ুকে করে পীড়িত।

"ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রার্থনা করতে দাও।"

"বায়ুর অধিকার পক্ষীকুলের, যেমন মৎসদের অধিকার সমুদ্রে!"

"ডুমুর গাছে ডুমুর ঝোলে, খেজুর গাছে খেজুর!"

"যে শোনে না, তার জ্ঞান জন্মায় না!"

এইগুলিই এঁদের খুব জ্ঞানগর্ভ বাণী!

অথচ, আমাদের হেনরী মনিয়ার এঁদের চেয়ে কত মূল্যবান ও মর্মস্পর্শী সত্য অল্প কথায় বলে গেছেন। সমুদ্রের দিকে চেয়ে তিনি বলেছিলেন, "সমুদ্র কী সুন্দর! কিন্তু কত ভূমি গ্রাস করে তবেই এর বিস্তৃতি!"

জগতের চিরায়ত সত্যকে তিনি এই ভাবে উপমাসিদ্ধ করেছেন, "এই তরবারিটিই হলো আমার জীবনের আলো। আমি এর সাহায্যে এরই দেওয়া শক্তিকে প্রতিহত করি এবং প্রয়োজনে একেই আক্রমণ করি।"

যদি সমবেত ইংরেজদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেতাম, তবে নিশ্চয় তাঁদেরকে শোনাতাম আমাদের ফরাসী মহাপুরুষদের আশ্চর্য সব বাণী।

ডিনার শেষ হলো, সকলে ফিরে গেলাম লাউঞ্জে।

আমি এককোণে একাকী এবং বৃটিশ নাগরিকরা লাউঞ্জের অন্যত্র নিজেদের জমায়েতকে জমাটি রাখবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

হঠাৎ একজন মহিলা এগিয়ে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসলেন।

'ব্যস', আমি মনে মনে উচ্চারণ করি, 'এবারে তবে গানবাজনার পর্ব। ভালোই হলো।'

সঙ্গীতের প্রারম্ভিক প্রস্তুতিতে মহিলার একাগ্রতা যেন দুই ভুরুর মাঝখানে স্থাপিত, তিনি পিয়ানোর ডালা খুললেন এবং সমবেত নর-নারীরা সৈন্যবাহিনীর মত ঐ মহিলাকে ঘিরে ব্যূহ রচনা করেন—প্রথম সারিতে মেয়েরা, পিছনে পুরুষরা।

ওঁরা কি এখন পালা গাইবে নাকি?

দলের যিনি পাণ্ডা, সেই ঈশ্বরপ্রেমিকই প্রথম স্বর তুললেন এবং অন্য সকলে কোরাসে সেই স্বরের সামিল হলেন। আর সুরসাধনার সে কী বীভৎস অভিপ্রকাশ! উদ্ধতমস্তক পাণ্ডার যে গলা, এঁদেরও তাই,—গলা চিরে বেরিয়ে আসছে এক ঘিন্‌ঘিনে সুরতরঙ্গ। এঁরা ধর্মসংগীত গাইছেন!

মহিলারা আর্তনাদ করছেন, পুরুষদের গলায় কুকুরের ডাক, এমন অভূতপূর্ব কোরাস গানের দাপটে ঘরের জানালাগুলিও বুঝি কাঁপছে থরথরিয়ে। হোটেলের পোষা কুকুরটা হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে ডাকতে শুরু করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসতে থাকে প্রতিবেশী সারমেয়দের সপ্রতিভ প্রত্যুত্তর।

আমি আর পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল থাকতে পারি না, পরিবেশ আমার কাছে অসহ্য মনে হয়, চিন্তা ও ভাবনায় আগুন জ্বলছে যেন দাউ দাউ করে, ক্ষিপ্ত হ'য়ে ছুটে বেরিয়ে আসি হোটেল ছেড়ে। শহরময় কয়েক চক্কর পাক খেলাম। এটা এমন এক বিশ্রী নিরস জায়গা, যেখানে থিয়েটার নেই, জুয়ার আসর নেই, প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত নেই। সুতরাং বিরস বদনে আবার সেই হোটেলেই ফিরে যেতে হলো।

তখনো ইংরেজদের গান থামেনি।

আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি। ওঁরা গাইছেন। মধ্যরাত পর্যন্ত চললো ঐ ঈশ্বর-বন্দনা। আমি জীবনে অত বিরক্তিকর কুৎসিত গান আর কখনো শুনিনি। রেগেমেগে স্বয়ং শুয়ে শুয়ে বিকৃত গলায় উদ্ভট গানের মাধ্যমেই ওঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাই:

করুণা আমার সেই ইংরাজ-ঈশ্বরকে,
এমন ভয়াল স্তোত্র ধ্বনিত যাঁর প্রতি!
থাকে যদি তাঁর শ্রবণশক্তি
বোঝেন যদি রসের গতি,
সুন্দর মুখ, গান এবং জীবনের প্রতি
থাকে যদি তাঁর বোধ,
নিতেন প্রতিশোধ।
করুণা করি ঈশ্বর তাই!
করুণা করি অন্তঃস্থল হ'তে।

একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম; কিন্তু ঐ সব উত্তেজিত ক্রুদ্ধ মুহূর্তের পর সুনিদ্রা আশা করা ভুল; সারাটা রাত নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে কেটে গেল। ভয়াবহ রক্তজলকরা সব দুঃস্বপ্ন।

২রা ফেব্রুয়ারী:

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই হোটেল-মালিককে চেপে ধরলাম, জানতে চাইলাম—ঐ সমস্ত অভব্য নর-নারীরা প্রতিদিনই কি এমন কুৎসিত গানের আসর বসায় নাকি?

"না, না, স্যর", তিনি মৃদু হেসে বললেন, "কাল যে ছিল রবিবার এবং নিশ্চয় জানেন, রবিবার ওঁদের কাছে একটি পবিত্র দিন।"

আমি উত্তরে বললাম:

নিদ্রা ও বিশ্রামে ব্যাঘাত
এই বুঝি ধর্মাচারণ?
যদি চলে এমন—
ছুটে গিয়ে ধরবো টেনে;
ধর্ম! আ মরণ!

গৃহস্বামী ঈষৎ বিস্মিত হলেন আমার জবাব দেবার বাহারে, অবিশ্যি কথা দিলেন, আমার নিদ্রা ও বিশ্রামে যাতে ব্যাঘাত না হয়, তা তিনি দেখবেন।

গোটা দিন ধরে পুলকিত আমি এ পাহাড় সে পাহাড় ঘুরে বেড়াই। তারপর রাত্রে আবার সেই সব নর-নারীর জটলা। আজকে আর লাউঞ্জে নয় ড্রইংরুমে। আজ কি করবে তাঁরা?

হঠাৎ গত রাত্রের সেই 'গায়িকা' মহিলাই আবার পিয়ানোর ডালা খুলে বসলেন। স্তম্ভিত অস্বস্তিতে আমার শরীরে কাঁটা দেয়।

তিনি বাজাতে শুরু করলেন ওয়ল্‌স্‌ নাচের সুর।

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠলো ঘুরন্ত নাচে।

এবং ধার্মিক পুরুষরা, প্রাত্যহিক অভ্যাস বশতঃ, প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। ওয়ল্‌স্‌এর পর জোড়ায় জোড়ায় নৃত্য; নর-নারীর যৌথ নৃত্য।

যদিও আমি বিস্মিত বিমূঢ়, আজকের পরিবেশ আমার কাছে অনেক সহনীয়। অপরিচিত জন, তাই এককোণে একাকী বসে আছি।

৩রা ফেব্রুয়ারী:

আমি আবার সেই পাহাড়ী দুর্গের ধ্বংসস্তূপ দেখতে চলেছি। ঐ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার অনস্বীকার্য আনন্দ। ছবির মতন সুন্দর, গোটা পাহাড়টা জুড়েই ছিল দুর্গটা, এখনো প্রতিটি চূড়ায় প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য হয় না। চমৎকার দেশ!

মনের উৎফুল্লতায় খাবার টেবিলে বসে পার্শ্ববর্তিনী মহিলাকে স্বয়ং নিজের পরিচয় দিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তরই দিলেন না,—ইংরেজী ভদ্রতা!

সন্ধ্যায় আর এক প্রস্থ বলনাচ।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী:

মোনাকো [গাইড-বুক দ্রষ্টব্য] ঘরে এলাম। রাতে ইংরেজদের বলনাচ। নীরব নিথর ধাতু মূর্তির মতন আমার উপস্থিতি।

৫ই ফেব্রুয়ারী:

আজ গিয়েছিলাম সান রেমোতে [গাইড-বুক দ্রষ্টব্য]। রাতে যথারীতি ইংরেজদের বলনাচ। আমার ভূমিকা পূর্ববৎ।

৬ই ফেব্রুয়ারী·

গিয়েছিলাম নিসে [গাইড-বুক দ্রষ্টব্য]। রাতে ওঁদের বলনাচের আসর। আমি বিছানায়।

৭ই ফেব্রুয়ারী:

আজ ঘুরে এসেছি ক্যানেসে [গাইড-বুক লক্ষনীয়]। রাতে ইংরেজদের বলনাচ। আমি তখন এক কোণে বসে চা খাচ্ছি।

৮ই ফেব্রুয়ারী:

রবিবার। প্রতিশোধ নেবার দিন। ওঁদের ঐ কেলেঙ্কারির জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি। ওঁরা রবিবাসরীয় ব্যাপারের জন্য মুখ ঘষছেন এবং ঠোঁটে রঙ মাখছেন ধর্মসংগীত

গাইবার জন্য। সুতরাং, ডিনার খাবার আগেই আমি চুপি চুপি ড্রয়িংরুমে অনুপ্রবেশ করি, পিয়ানোতে তালা মেরে চাবিটা পকেটস্থ করি এবং হোটেল বয়কে বলি, "ধর্মভীরু লোকগুলি যদি পিয়ানোর চাবি খোঁজে, বলবে বস্তুটা আমি নিয়ে গেছি এবং তারা যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

খাবার টেবিলে বসে তাঁরা বাইবেল ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা নিয়ে হরেক বিতর্কের ঝড় তুললেন। তারপর অনুমান অনুযায়ী তাঁরা প্রবেশ করলেন ড্রয়িংরুমে। পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়ে হতবাক। এক ধরনের শিহরণ খেলে যায় তাঁদের ওপর দিয়ে। মৃদু গুঞ্জন। মনে হয়, ওঁরা বুঝি বজ্রাহত। মেয়েদের মাথার পরিপাটি চুল খুলে যায় আর কি। দলের প্রধান হন্‌হনিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যান, ফিরেও আসেন। আবার ফিস্‌ফিস্ আলোচনা। সকলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এবার আমার দিকে। তিনজন পুরুষ বিচিত্র কায়দায় ঝুঁকে আমার কাছে তাঁদের দাবি জানালেন ফরাসী ভাষায়।

আমি বললাম, "মশাই, আমি আপনাদের ঐ মেয়েদের অনুরোধ বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সেই অনুরোধ মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

দলের প্রবীণতম লোকটি আমার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

আমি বলতে থাকি, "আপনি যেমন ধার্মিক লোক, আমিও তাই। বরং ধর্মের ব্যাপারে আমি আরো একনিষ্ঠ এবং সেই কারণেই ধর্মের নামে এমন হুল্লোড় বরদাস্ত করতে পারি না।"

আরো বলি, "ধর্মের দোহাই পেড়ে পিয়ানো বাজাবেন এবং মেয়েরা ধেই ধেই করে নাচবে,—এমন জিনিস আপনি সহ্য করতে পারছেন! আমরা মশাই কখনো গির্জায় নাচানাচি করি না বা ঈশ্বরস্তোত্রের নামে অর্গান বাজিয়ে জুটি বেঁধে নাচি না। যে উদ্দেশ্যে আপনারা এই যন্ত্রটার ব্যবহার করছেন তা আমার ধৈর্যচ্যুতির পক্ষে যথেষ্ট। আপনি আমার এই বক্তব্য মহিলাদের বুঝিয়ে বলতে পারেন।"

হতমান তিন পুরোহিত ফিরে গেলেন। মেয়েরাও বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ। তবু তাঁরা গাইলেন এবং পিয়ানো ছাড়াই।

৯ই ফেব্রুয়ারী :

দুপুর। এই মাত্র হোটেল-মালিক আমাকে হোটেল ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। ঐ সমস্ত ইংরেজ খদ্দেরদের দাবিতেই আমি এখন এখানকার অবাঞ্ছিত জন। যাবার আগে সেই তিন পুরোহিতকে ডেকে বাইবেল ও ধর্মীয় নির্দেশ সম্পর্কে অনেক যুক্তিপূর্ণ কথা আমি শুনিয়ে দিলাম। প্রত্যুত্তরে তাঁরা তিনজনই একসঙ্গে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলেন, পালিয়ে গেলেন।

দুপুর দুটোয় ট্রেনে চেপে বসলাম নিসের উদ্দেশ্যে।

ডায়েরি এখানেই শেষ। যদিও লেখক বেশ কৌতুক এবং কোন কোন জায়গায় আদি রসের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, আমার মনে হয়, তাঁর এই রচনা যে কোন মুসাফিরের কাছে শিক্ষাপ্রদ,—অন্তত:, প্রবাসে ইংরেজদের বিচিত্র মানসিকতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ও সতর্ক থাকতে পারেন। পরিশেষে আমার বক্তব্য,

এই দুনিয়ায় চিত্তাকর্ষক ইংরেজ নরনারীর অভাব নেই এবং তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ঘটেছে। তাঁরা ঐ হোটেলের একপাল ইংরেজ নর-নারী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

নামকরণ

The Christening

খামারের কপাটের সামনে রবিবাসরীয় পোশাকে লোকগুলি দাঁড়িয়েছিল। মে মাসের অবিঘ্নিত সূর্য অতি উজ্জ্বল; আলোর বন্যা পুষ্পিত আপেল গাছগুলি মিষ্টি ছায়াপাত ঘটেছে গোটা খামার বাড়িটার ওপর। বেগনি ও সাদা রঙের ভগ্নাংশগুলি লক্ষণীয়; আলো-অন্ধকার, অন্ধকার-আলো। ফুলের পাপড়ি ঝরে অনলস ঝর্ণার মতন, ঘন দীর্ঘকায় ঘাসের বুকে তারা বুঝি ঘুলঘুলি, ড্যাণ্ডিলিয়ন ফুলগুলি আগুনের শিখা এবং পপিস্‌গুলি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। এমন দৃশ্যে মন খাঁচা থেকে পালানো পাখি।

একটি শূকরী স্তূপাকৃত সারের ওপর সন্তর্পণে নিদ্রা যায়, এবং ওর ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাগুলি মার বিশাল উদরের সমৃদ্ধ স্তনের কাছে কুৎ কুৎ ঘুরে বেড়ায়।

অনেক দূরে, খামারের গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে দেখা যায় যে গির্জা, হঠাৎ সেখানে ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। ধাতব শব্দের আর্তি পৌঁছে দেয় কিরণবিকাশী স্বর্গের কেন্দ্রে। ঠিক তখনই সোয়ালো পাখির ঝাঁক ধনুক-বাঁকা ছন্দে উড়ে চলেছে বৃক্ষস্পর্শিত বিশাল নীলাকাশ চিরে। আস্তাবলের মৃদু গন্ধের সঙ্গে আপেল গাছের মিষ্টি ঘ্রাণের মাখামাখি।

ওদের মধ্যে একজন কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে মুখ তুলে চীৎকার করে:

"মিলিনা, এখনই চলে এসো; ঘণ্টা বাজছে।"

বয়স তার তিরিশের কাছাকাছি, দীর্ঘদেহী চাষী, ক্ষেত খামারে কঠিন পরিশ্রম সত্ত্বেও শারীরিক লালিত্য নষ্ট হয়নি। তাঁর বুড়ো বাপ, গ্রন্থিযুক্ত ওক্ গাছের গুঁড়ির মতন শরীর, হাতময় ক্ষতচিহ্ন, বাঁকা দুটি পা ঘোষণা করে: "মেয়েরা! ওরা কোনদিন চটপট তৈরী হয়ে নিতে পারে না।"

অপর দুই ছেলের মুখে হাসি; তাদের একজন ঘুরে তাকায় সবচেয়ে বড় ভাইয়ের দিকে, যে এই কিছুক্ষণ আগে স্বর সপ্তমে তুলেছিল, বললো, "তুমি বরং একটু এগিয়ে দেখো; ওরা দুপুরের আগে আসছে না।"

যুবকটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

এক ঝাঁক পাতিহাঁস ডাকতে শুরু করে, পাখা ঝাপটায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে খামারের পুকুরে। তখন বাড়ির দরজা খুলে আবির্ভূত হলো এক সমর্থদেহী স্ত্রীলোক, কোলে তার মাস দুয়েকের একটি শিশু। তার টুপির সাদা সুতাতন্তু পিঠ অব্দি ঝুলন্ত এবং গায়ের শালটার রং এত রক্তাভ যে মনে হয়, বুঝি বাড়ির ঐ জায়গায় আগুন লেগেছে। বাচ্চাটিকে সাদা পোশাকে মুড়ে রাখা হয়েছে, সে এই নার্সের তপ্ত উদরের কাছাকাছি নিরাপদ শান্ত।

এরপর দেখা গেল শিশুটির মাকে। বয়স খুব বেশী হলে আঠারো, সুঠাম শরীর, ঝকমকে হাসি হাসি মুখ, স্বামীর হাত ধরে আগুয়ান। তারপর দুই বৃদ্ধা ঠাকুরমা, বুড়ো আপেল যেন দুটি। একজন বিধবা; সে তার ঠাকুরদার হাত ধরে সকলের আগে আগে চলতে থাকে, পিছন পিছন আর সকলে, মিছিলের শেষে ছোটরা মিষ্টির প্যাকেট হাতে গুটি গুটি এগিয়ে চলে।...

ছোট ঘণ্টাটি সমানে বেজে চলেছে; শিশুরা হামাগুড়ি দিয়ে টিলার ওপর উঠছে; দরজার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে অনেকের মাথা, গোয়ালিনীরা তাদের পাত্র নামিয়ে রেখে দেখছে, নামকরণের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

এবং শিশুটাকে কোলে নিয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গীতে নার্স কাদা ও বালিময় পথ বেয়ে এগিয়ে চলে। বয়স্ক বয়স্কারাও চলেছে; তাদের চলন, বয়স হেতু সামান্য আঁকা-বাঁকা। যুবকদের ভিতর এসে গেছে নাচের উন্মাদনা, ঘুরে তারা তাকায় পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কৌতূহলী যুবতীদের দিকে।

শিশুর বাপ-মার মুখে গম্ভীর প্রত্যয়; তাদের এই সন্তান 'দেঁস্ত' বংশের সুনাম অক্ষুন্ন রাখবে। আজ তারই শুভ সূচনা।

তাড়াতাড়ি গির্জায় পৌঁছবার জন্য পথ ছেড়ে তারা মাঠ পার হতে থাকে। ক্রমশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে গির্জাটা, তীক্ষ্মমুখ চূড়াগুলি স্পষ্টতর।...এবং ঘণ্টাটি বেজে চলেছে, এখনো সমানে বেজে চলেছে নবজাতকের প্রথম ঈশ্বরের আবাসে পদার্পণকে স্বাগত জানাতে।

শোভাযাত্রার অনুগামী একটি কুকুরও; ওরা তার দিকে মিষ্টি ছুঁড়ে দেয়, সে ওদের পায়ের কাছে গিয়ে লেজ নাড়ে।

চার্চের দরজা খোলা। বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পুরোহিত। দীর্ঘকায়, শীর্ণ অথচ মজবুত, একমাথা লাল চুল। তিনিও 'দেঁস্ত' পরিবারের সন্তান, বর্তমান শিশুটির কাকা। ভাইপোর মুখে প্রতীকী পবিত্র লবণ খণ্ড ছোঁয়াতেই বাচ্চাটি কেঁদে ওঠে।

উৎসব সাঙ্গ হবার পর গোটা পরিবারটা গির্জার সিঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়ায়, যাজকও তাঁর সাদা বহির্বাস খুলে দলের সঙ্গে যোগ দেন। তারপর আবার সেই চলমান শোভাযাত্রা—এবার গৃহাভিমুখে। ফিরে যাবার গতি দ্রুততর, কেননা ভোজসভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তার একদল ফচকে ছোঁড়াও চলেছে তাদের পিছন পিছন, এবং যখনই ওদের দিকে একমুঠো মিষ্টি ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, সাংঘাতিক কামড়া-কামড়ি

মারামারি শুরু হ'য়ে যাচ্ছে। রীতিমত হাতাহাতি চুলোচুলি যুদ্ধ। এমনকি কুকুরগুলিও ছুটে এসে সামিল হচ্ছে সেই লড়াইয়ে এবং ছোকরাদের চেয়ে তাদের সাফল্যই লক্ষণীয়।

নার্স ক্লান্ত; পুরোহিতের দিকে ঘুরে রাগত ক্লান্ত স্বরে বলে, "আমি আর পারছি না। আপনার ভাইপোকে বয়ে বয়ে আমার পেটে খিল ধরে গেলো।"

নার্সের কোল থেকে শিশুটিকে তুলে নেন পুরোহিত; কিন্তু শিশু বহনে তাঁর অনভ্যাস ও অপটুত্ব ফুটে ওঠে। তাঁর অবস্থা দেখে সকলেই হেসে ওঠে; বুড়ি ঠাকুরমাদের একজন বলে ওঠেন, "তোমার নিজের তো কোন সন্তান নেই! তাই বাচ্চা কি করে কোলে নিতে হয় জানো না।"

পুরোহিত জবাব না দিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন, মাঝে মাঝে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন শিশুর আশ্চর্য নীল চোখ দুটি। তাঁর অদম্য ইচ্ছা শিশুটিকে চুম্বন করবার। একসময় করলেনও।

সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার বাপ মজাদার গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, "আরে, তোমার যদি বাচ্চার সখ থাকে তো একটিবার মুখ ফুটে বলতেই পারতে! উপায়টা আমি বাতলে দিতাম।"

গ্রাম্য রসিকতায় আর এক দফা হাসিতে তারা ফেটে পড়ে।

খাবার টেবিলে আবার হুল্লোড়। পরিবারের বুড়ো কর্তা খুব ফূর্তি করছেন। তাঁর ছেলেরা ও পুত্রবধূরাও কম যায় না। আমন্ত্রিত অতিথিরা নবজাতক ও এই বংশের ঐতিহ্যময় শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে। পুরোহিত কিন্তু এই কোলাহল থেকে সামান্য ব্যবধানে, নার্সের পিছনে বসে ভাইপোকে আদর করছেন। তিনি এই শিশু-মুখ দর্শনে বিস্মিত; মুখে এক ধরনের অদ্ভুত স্বপ্নময় আচ্ছন্নতা, তীক্ষ্ণ অথচ অস্পষ্ট বিষণ্নতা তাঁকে ক্রমশই অভিভূত করে ফেলছে।

তিনি কিছুই শুনছেন না, কিছুই দেখছেন না, শুধু চোখ দুটো স্থির হ'য়ে আছে শিশুর মুখের ওপর। নার্স তাঁর কাছ থেকে বাচ্চাটিকে নিয়ে নেবার পর মানসিক আকুলতা আরো বৃদ্ধি পায়। আর নার্সও বাচ্চা কোলে নিয়ে খাবার খেতে খুব অসুবিধে বোধ করছে।

"ওকে আমার কোলে দাও," পুরোহিত বললেন, "আমার ক্ষিধে পায়নি।"

এবং শিশুটিকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন থেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মুছে গেল, অপলক চোখে তিনি চেয়ে রইলেন শিশুটির মুখের দিকে। ক্রমশঃ ঐ ছোট্ট দেহের উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে যেন পরশ বুলিয়ে দিতে থাকে—কী নরম, কী পবিত্র, কী মধুর! তাঁর দু'চোখ জলে ভরে যায়। ভোজনতৃপ্ত নর-নারীদের হট্টগোল তখন তুঙ্গে। ঐ চীৎকারে নবজাতক-ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। কে যেন রসিকতা করলো, "পুরোহিত, আপনার বাচ্চাকে দুধ দিন!"

হো-হো অট্টহাসিতে গোটা ঘরটা কেঁপে ওঠে। কিন্তু শিশুর মা উঠে দাঁড়ায়; সে তার সন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাশের ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ফিরে এসে ঘোষণা করে, বাচ্চাটা দোলনায় শুয়ে চটপট ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভোজন পর্ব তখনও চলেছে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পুরুষ ও মেয়েরা বাগানে যাচ্ছে, তারপর আবার ফিরে এসে টেবিলের সামনে বসে পড়ছে। মাংস, তরিতরকারি, আপেলের রস এবং মদ অনবরত তাদের গলা বেয়ে নামছে, পেটগুলি ফুলে জয়ঢাক, স্নায়ুতন্ত্রী উত্তেজিত।

রাত ঘনাবার পর কফি এলো। অনেকক্ষণ আগেই এই ঘর ছেড়ে পুরোহিত বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে এদের কোন মাথাব্যথা নেই।

অবশেষে যুবতী মা উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে যায় সেই ঘরের দিকে, যেখানে তার সন্তান ঘুমিয়ে আছে। অসম্ভব অন্ধকার সেই ঘর। তাই সন্তর্পণ তার গতি—কোন আসবাবপত্রে ধাক্কা লেগে বাচ্চার ঘুম না ভেঙ্গে যায়!

হঠাৎ সেই অন্ধকারে তার মনে হলো, ঘরে কে যেন ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলছে। দারুণ ভয়ে আঁতকে ওঠে সে। ছুটে এসে এ ঘরে খবর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ মাতালের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার। এখনই তারা সেই অন্ধকারের জীবকে শাস্তি দেবে। সন্তানের বাবা এক হাতে বাতি নিয়ে সকলের আগে হন্‌হনিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। তখনই তারা দেখতে পায় এক বিচিত্র দৃশ্য!

দোলনার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন পুরোহিত, শিশুর পাশে একটা বালিশ চেপে চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন নিজেকে।

স্বীকারোক্তি

The Confession

ভেজিরস-লা-রেথেলের সকল অধিবাসীরাই মঁসিয়ে বেদন লারেমিনসের শবানুগমন করেছিলেন। সেই স্মরণীয় পারলৌকিক অনুষ্ঠানে একটি সত্যই উচ্চারিত হলো :

"আমাদের মধ্যে থেকে একজন সম্মানীয় ব্যক্তি বিদায় নিলেন।"

সত্যিই, জীবনের প্রতিটি প্রত্যক্ষ ঘটনায় তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ও অনন্য। তিনি তাঁর ভাষণে, উপমা-নির্বাচনে, আবির্ভাবে, আচরণে, চলন ভঙ্গিতে, দাড়ির বাহারে, টুপির গঠনে ছিলেন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন। কখনো এমন কোন কথা উচ্চারণ করেননি, যার তাৎপর্য নেই; দান-খয়রাতের সময় প্রার্থীর প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল অনিবার্য; বিশাল দুই বাহু প্রসারিত করে তিনি ঈশ্বরের কাছে মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান দুটি সন্তান, এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেটি টাউন কাউন্সিলে প্রতিষ্ঠিত এবং মেয়েটি মঁসিয়ে পোরিল দ্য লা ভলতে নামক এক আইনজীবিকে বিয়ে করে সুখী ও সুনামের অধিকারী।

বাবার মৃত্যুতে তারা শোকাহত; বাবার প্রতি ভালোবাসায় তাদের কোন খাঁদ ছিল না। কবরস্থ করবার অনুষ্ঠান শেষ হলেই তারা মৃতের আবাসে ফিরে আসে।

তারা মানে এই তিনজন—ছেলে, মেয়ে এবং জামাই। ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রথমেই তারা মৃতের দলিল খুলে বসে। জামাই মঁসিয়ে পোরিল, যেহেতু আইন-ব্যবসায়ী, সর্বপ্রথম সীল খুলে দলিলটা বের করে। চোখে চশমা এঁটে তার উকিলসুলভ নিরস গলায় দলিলের বয়ান পাঠ করতে আরম্ভ করে:

"আমার বাছারা, আমার সন্তানরা, আমি কবরে শুয়েও শান্তি পাবো না, যদি এই মুহূর্তে তোমাদের কাছে এই স্বীকারোক্তি ব্যক্ত না করি। এ এক পাপের স্বীকারোক্তি,—যে পাপ দুঃসহ তিক্ততায় আমার জীবনকেই বিষময় করে তুলেছিল। হ্যাঁ, আমি অপরাধী, জঘন্য পাপে পাপী!

"তখন আমার বয়স ছাব্বিশ। প্যারিতে এসে সবে মাত্র আইনের জগতে যোগ দিয়েছি। প্যারিতে আগত আর পাঁচজন ভিন্ দেশীয় যুবকের মতন অবস্থা আমার—পরিচয়শূন্য, পরিজন বিহীন, নির্বান্ধব।

"আমি আমার দিন ও রাতগুলিকে আকর্ষণীয় করবার মানসে একটি মেয়েমানুষ যোগাড় করে ফেললাম। জানি, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই আমার এই রুচিকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তাদেরই একজন, যারা একা থাকতে পারে না। নিঃসঙ্গতা আমার স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, আতঙ্ক ধরায়; র'তে সেই একাকীত্ব ভয়াল, দিনে একাকী আগুনের সামনে বসে বিশাল শূন্যতা অনুভব করি। অনুভব করি, যদিও আমি এই পৃথিবীতে একা, দারুণ একা, তবু ভয়ের অনেকগুলি অদৃশ্য উৎস আমায় ঘিরে যেন নাচছে। ...কেমন যেন একটা জ্বর জ্বর ভাব; ভয় ও অস্থিরতার কারণে এই শারীরিক তাপ। নিরেট নীরব দেয়ালগুলিও বুঝি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। নির্জন কক্ষের নীরবতা কত গভীর ও বিষণ্ন নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে! শুধু দেহকে ঘিরে এই নীরবতা নয়, এই নির্জনতা আত্মাকেও ঘিরে, সেই কারণে কোন একটু সামান্য শব্দেই, আসবাবপত্রে সামান্য ঠোকাঠুকিতেও প্রচণ্ড চমকের সৃষ্টি হয়, মন আঁতকে ওঠে, মেরুদণ্ড বেয়ে হিমেল স্রোত নামে।

"প্রায়শই আত্মগতভাবে আমি নির্জনতার দ্বারা আক্রান্ত, বে-এক্তেয়ার; তখন যে বেঁচে আছি, তা প্রমাণের জন্য একা একাই কথা বলে উঠি; ঠিক কথা নয়, কতকগুলি শব্দের উত্থান মাত্র। নিরেট নির্জনতাকে মাড়িয়ে নিজের সাহস ও প্রত্যয়কে মেরামত করবার সে এক প্রাণান্তকর প্রয়াস; শব্দের তরঙ্গ বুজবুজিয়ে ওঠে, যদিচ তাদের কোন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না; কেবল একটা বিজাতীয় আওয়াজ—চার দেয়ালের আবদ্ধ আবেষ্টনীতে আছাড়ি-পিছাড়ি খায়, তখন আমার মুখের ভয়ার্ত বিষণ্ন ছাপ আরো পরিস্ফুট, কেন না আমি নিজের স্বরকেই সনাক্ত করতে পারছি না। শূন্য ঘরে একাকী নিজের সঙ্গে অর্থহীন প্রলাপ বকার চেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে? এ রকম পরিস্থিতিতে, বিশেষতঃ কোন যুবকের পক্ষে, বেঁচে-বর্তে থাকা দুঃসাধ্য।

"সুতরাং, এই অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য, স্বস্তিতে বেঁচেবর্তে টিকে যাবার জন্য, আমি একটি মেয়েমানুষ আমদানি করলাম। বয়স যথেষ্ট কম।

সে প্যারির সেই সব কমবয়সী মেয়েদেরই একজন, যাদের অল্প কিছু পয়সার বিনিময়ে নিজের কাছে ধরে রাখা যায়। বেশ মিষ্টি উপাদেয় যুবতী; ওর বাপ-মা থাকতো পঁয়েজিতে এবং কখনো কখনো সে কিছুদিন তার বাপ-মার কাছে কাটিয়ে আসতো।

"একটা ঘটনাশূন্য বছর আমি ওকে নিয়েই কাটিয়ে দিলাম। যখনই কোন উপযুক্ত মেয়ের সঙ্গে আমার স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তখন নিশ্চয় ওকে ত্যাগ করবো। দৃঢ় ও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। সামান্য কয়েকটা টাকা আমি ওকে দিতাম পারিশ্রমিক হিসেবে। কারণ এটাই রেওয়াজ,—মেয়েমানুষকে সর্বদাই তার প্রেমের পরিবর্তে কিছু মূল্য ধরে দিতে হয়; দরিদ্র হলে অর্থ, ধনী হলে উপহার-সামগ্রী।

"কিন্তু একদিন সে আমাকে এমন একটি খবর জানালো, যাতে আতঙ্কে আমার শরীর ছম্‌ছমিয়ে ওঠে,—সে নাকি আমাদের সহবাসের পরিণতিতে মা হতে চলেছে! অত্যন্ত দুঃসংবাদ! আমার কল্পিত আয়োজনগুলি এক লহমায় ভেঙ্গে পড়লো। চকিতে নিজের সর্বনাশা ভবিষ্যৎকে দেখতে পেলাম যেন! ঘেন্নায় গা ঘোলায়। আমার দিব্যদৃষ্টিতে এক অজগর-শৃঙ্খল, যা আমৃত্যু আমাকে নিস্তার দেবে না। এই মেয়েমানুষটা আমার ভবিতব্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে তার জঠরে বহন করা এক শিশুকে দিয়ে, যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলে অনেকগুলি প্রথাসিদ্ধ কর্তব্য এসে হাজির হবে,—নিশ্চয় ওকে বড় ক'রে তুলবার দায়িত্ব আমার, ওর প্রতি নজর রাখতে হবে আমাকে, বিপদ-আপদ অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা করতে হবে, যদিও ওর জন্ম-রহস্য যথাসাধ্য গোপন রাখবার প্রয়াসকে অস্বীকারের ক্ষমতা আমার থাকবে।

"আমি ভেঙ্গে পড়ছি; সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ পরিকল্পনাও মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে,—এমন একটা বাসনা, যা আমি কোন দিন প্রকাশ করিনি, কিন্তু মনের গহনে লালন করেছি, যেন কপাটের আড়ালে লুক্কায়িত একটা শয়তান; ভয়ানক পাপচিন্তা আমার মানসিক জগতকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো। আমি একটি দুর্ঘটনার কথা কল্পনা করছি। বহু শিশুই তো ভূমিষ্ঠ হবার আগে খতম হয়ে যায়।

"না, না, আমি আমার রক্ষিতার মৃত্যু কামনা করিনি! ভাগ্যহীনাকে আমি ভালোবাসতাম নিশ্চয়। কিন্তু, সম্ভবত, মৃত্যু কামনা করছিলাম অপর জনের—নিজের চোখে তাকে দেখবার আগেই!

"তবু সে জন্মালো। একরত্তি শিশু। অবিবাহিত তরুণের ঘরে আকস্মাৎ এক পরিবার—একটি শিশু সহ নকল পরিবার। অস্বাভাবিক। গোপনীয়।

শিশুটি কিন্তু আর পাঁচটা নবজাতকের মতনই দেখ্‌তে। আমি ওকে ভালোবাসতে পারলাম না। তোমরা জানো, পিতৃস্নেহ প্রথম অবস্থাতেই প্রবল হ'য়ে ওঠে না। এটা সময়ের ব্যাপার। কিন্তু মাতৃস্নেহ অফুরাণ, নিঃস্বার্থ। সন্তান জঠরে আসবার লগ্ন থেকেই। সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে, তারপর পিতা আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে সেই দৃঢ় মানবিক বন্ধনে, যা পরিবারকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

"আর একটি বৎসর অতীত হ'য়ে গেল ; আমি এখন আমার তিক্ত আবাস ছেড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াই, আর বর্তমানে আমার ঘরের অবস্থা এই রকম—এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে মেয়েমানুষের অন্তঃপরিচ্ছদ, নানারকম কাপড়ের পট্টি, মোজা, বিভিন্ন আয়তনের গ্লাভস্, আরো হাজারো রকমের টুকরো টাকরা, কোনটা টেবিলের ওপর, কোনটা চেয়ারের হাতলে, সর্বত্র—সর্বত্র! সর্বোপরি, আমি যথাসম্ভব ঘরমুখো হইনা পাছে কোন শিশুর কান্না শুনতে হবে বলে! আর ওটা কাঁদেও থেকে থেকে, পোশাক বদলাবার সময় কাঁদবে, স্নান করাবার সময় চীৎকার তুলবে, ঘুমোবার সময় গলা ফাটাবে,—সব সময় ঐ কান্না!

"এ সময় বাইরের জগতে আমি কিছুটা সামাজিক। আমার কতিপয় বন্ধু জুটেছে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একদিন এক পরিচিত জনের ড্রয়িং রুমে প্রথম পরিচিত হলাম তোমাদের মার সঙ্গে। আমি তার প্রেমে পড়ে যাই এবং তাকে বিয়ে করবার বাসনা অনিবার্যভাবে প্রবল হ'য়ে ওঠে। একদিন নিজের প্রার্থনা তাকে জানালাম, আমি তোমার পাণিপ্রার্থী। সে সম্মতি দিলো।

"কিন্তু তখন তো আমি ফাঁদে আটকানো প্রাণী! নিজের প্রেম ও আকুলতা নিয়ে নিশ্চয় এই মহিলাকে আমি বিয়ে করবো! অথচ আমার ঘরে অন্য একটি স্ত্রীলোক আমারই ঔরসজাতকে নিয়ে বাস করছে! আমি যদি সব সত্য অকপটে খুলে বলি, পরিণতি কি দাঁড়াবে ? আমার প্রেমিকার পিতা-মাতা যথেষ্ট অভিজাত ও কঠিন স্বভাব, এমন লোকের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিতে কখনোই রাজি হবেন না।

"গোটা মাস ধরে চললো আমার মানসিক অস্থিরতা, নৈতিক অবনতি! হাজার হাজার ভয়ঙ্কর সমস্ত পরিকল্পনা কামড় মারে। আমি আমার নিজের সন্তানের প্রতি তিতি-বিরক্ত, ওর ঐ বেঁচে থাকার ও বড় হ'য়ে ওঠার লক্ষ্মণগুলি আমার চোখে বিষ, ওর ঐ নরম মাংসল চেহারা অসনীয়,—ও আমার জীবনের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক, আমার যৌবনের সমস্ত সুখ ও আনন্দ শুষে নিয়েছে!

"হঠাৎ মেয়েমানুষটাই অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। সুতরাং, শিশুটিকে দেবার ভার আমারই ওপর বর্তালো।

"তখন ডিসেম্বর মাস, তীব্র শীত। আর কী বিচিত্র সেই রাত্রি। এই মাত্র আমার রক্ষিতাটি ঘর ছেড়ে গেছে। আমি একা ভি খেলাম। তারপর সন্তর্পণে প্রবেশ করলাম সেই ঘরে, যেখানে শিশুটি ঘুমন্ত।

"আগুনের সামনে চেয়ার টেনে বসে পড়ি। শুকনো, হিমেল বাতাস বাইরে ঝড় তুলেছে, জানালায় ওদের আছাড়ি-পিছাড়ি, জানালার কাঁচ দিয়ে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি শীতের বিশাল আকাশ অজস্র নক্ষত্রের জ্বল জ্বল চোখ।

"তখন ক্রমশঃ আমার মগজকে আক্রমণ শুরু করে গত এক মাস ধরে লালিত বিকট আচ্ছন্নতা। এই নিশ্চুপ বসে থাকা। মুহূর্তগুলিতে শয়তানটা আমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলে। কর্কট রোগ যেমন মাংসে পচন ধরায় ও স্ফীতি ঘটায়, অস্বাভাবিক ভাবনাটাও তেমনি আমার সমস্ত শুভবুদ্ধিতে ক্ষয় ধরাচ্ছে। আমার মগজে, হৃদয়ে,

গোটা শরীর জুড়ে এই বিপর্যয়কর পরিকল্পনা। একটা বন্য পশুর মতন তা আমাকে অহরহ কামড় মারছে। আমি অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি এর হাত থেকে রেহাই পেতে, মনের গতি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি, নতুন কোন আশার আলো খুঁজছি, যেন কেউ জানালা খুলে রাত্রিকালীন আবদ্ধ বাতাসকে বের করে দিতে চাইছে প্রথম বেলার মুক্ত আকাশে! কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও এর হাত থেকে মুক্তি পেলাম না, পাচ্ছি না। ব্যাখ্যার অতীত যন্ত্রণা। শরীর ও মনে আমি সেই অদৃশ্য শয়তান দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত।

"আমার জীবন শেষ! এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তির কি উপায়? কি ভাবে এই বাধা অতিক্রম করি?

"এবং আমি তোমাদের মায়ের প্রেমে সে সময়ে অন্ধ; প্রেমের আকুতি, বাসনা পূরণের ইচ্ছা আমাকে আরো ভয়ানক ও বেপরোয়া করে তুলছে।

"ভয়ানক ক্ষোভ ও হিংসা মস্তিষ্কে দাপাদাপি রত...আমাকে পাগল করে দেবে...পাগলামি! হ্যাঁ, আমি পাগল, সেই রাতে আমি পাগলই!

"শিশুটি ঘুমিয়ে আছে। উঠে দাঁড়াই, এগিয়ে যাই, ঘুমন্ত মুখের উপর ঝুঁকে দেখতে থাকি। এই তো সে, ছোট্ট অবাঞ্ছিত, আমার সুখ-সঙ্কল্পকে যে কাজে পরিণত হতে দিচ্ছে না, যার কারণে প্রাণটি আমার বিষময়!

"ঘুমিয়ে আছে, ঠোঁট দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত; একরাশ বালিশ দিয়ে ঘেরা এই বিছানা, যেখানে ইদানীং আমার ঘুম আসে না।...আমি কি করতে যাচ্ছি? মস্তিষ্কের উত্তপ্ত মালমশলা আমার ভেতরে কোন্ শপথের জন্ম দিচ্ছে? আমি কি সেই শপথের গুহ্য তাৎপর্য অনুভব করতে পারছি? নাকি, এই হিংস্র চিন্তা খামকা আমাকে নাড়িয়ে দিয়ে বিদায় নেবে? শুধু বুঝতে পারি, বুক কাঁপছে, ভীষণ রকম কাঁপুনি লেগেছে; মনে হচ্ছে, হাতুরি ঠুকে ঠুকে কে বুঝি দেয়াল ভাঙ্গছে! কিছুই আর অবিকৃত অবস্থায় নেই! অনুভূতি বলতে এইটুকুই, অন্য সব তো আমদানী করা হিংস্র আচ্ছন্নতায় বিলুপ্ত। মগজে তখন অদ্ভুত এলোমেলো—পরিকল্পনাহীন, কোন কিছু নিয়ে আগাপাস্তলা ভাববার শক্তি আমার নেই, সাধারণ বোধ-বুদ্ধি বিলকুল লোপ পেয়েছে। এমন বিপর্যয়কর ফ্যাসাদে মানুষ কদাচিৎ নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। নিজের ইচ্ছা ও কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা আর আমার নেই।

"শিশুটির শরীর যথোচিত ঢেকে রাখা হয়েছিল যে চাদরে, আমি সন্তর্পণে সেটি তুলে ফেলি। আমি আমারই সন্তানের উলঙ্গ রূপ দেখলাম। সে তখনো নিশ্চুপ, ঘুম থেকে জেগে উঠবার কোন গরজ তার নেই। আমি তখন ফিরে গেলাম জানালার কাছে, গতি পূর্ববৎ মন্থর ও শব্দহীন এবং জানালার কাছে পৌঁছে নিঃশব্দে জানালার কপাট খুলে ফেললাম।

"সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে ঝলকে ঠাণ্ডা হিম বাতাস খুনীর মত এ ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ে; এত ঠাণ্ডা যে নিজেই কুঁকড়ে পড়ছি! মোমবাতিটা নিভে গেল। সেই হিম-উৎস জানালার সামনে আমি মূর্তিবৎ, ফিরে তাকাবার সাহস নেই। আমার পিছনে এই

মুহূর্তে কি প্রতিক্রিয়া ঘটছে যাচাই করবার মানসিক বল হারিয়ে ফেলেছি। আমার কপাল, বুক, হাত, পা—সর্বত্র মৃত্যুর শীতলতা বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ঐ বাতাস। বহুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।

"আমি তখন কিছু ভাবতে পারছি না। চিন্তাশক্তি উবে গেছে। হঠাৎ শ্লেষ্মাজড়িত একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে চকিতে সক্রিয় হ'য়ে উঠি। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দারুণ কেঁপে ওঠে এবং তৎপরতায় জানালার কপাটগুলি বন্ধ করে দিই। তারপর ঘুরে তাকালাম, ছুটে গেলাম শিশুটির দিকে।

"সে তখনো ঘুমিয়ে আছে। মুখ হা। নিরাভরণ। আমি কাঁপা হাতে ওর পা দুটো স্পর্শ করি। একেবারে বরফ। চাদরটা টেনে দিই।

"ঠিক তখনই আমার মন দুর্বল হ'য়ে পড়ে। বিবেক মাথাচাড়া দেয়। দুঃখ ও অনুতাপ প্রভাব বিস্তার করে। আমার কষ্ট হলো, মায়া জাগলো ঐ ছোট্ট শিশুটির প্রতি, চুম্বন এঁকে দিয়ে আবার এসে আসন গ্রহণ করি আগুনের সামনে।

"ভয় ও বিহ্বলতা নিয়ে তখন আমি নিজেকে বিচার করছি—আমি কি করছি! উত্তেজনার বশে মানুষ কত সহজে তার বিবেক ও কর্তব্যকে বিসর্জন দেয়। ঝড়ের মুখে পতিত জাহাজের মতন দিশেহারা অবস্থা!

"আর একবার শিশুটির শ্লেষ্মা জড়ানো কাশি শোনা গেল। ঐ শব্দে আমার বুক বিদীর্ণ। যদি ও মারা যায়! হা ঈশ্বর! হা ভগবান! আমার কি হবে?

"আবার একটা মোমবাতি ধরিয়ে বিছানার কাছে চলে গেলাম। ওর স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তৃতীয়বার সে যখন বিশ্রীভাবে কেশে উঠলো, আমি এমন আঁতকে উঠলাম যেন কোন ভয়ানক বস্তু দর্শন করছি। উত্তেজনায় আমার হাত থেকে মোমবাতিটা খসে পড়ে।

"নীচু হ'য়ে মোমবাতিটা তুলে নেবার পর বুঝতে পারি, যন্ত্রণা ও অনুশোচনার ঘামে আমি স্নান করে উঠেছি! এ এক অকথনীয় গোপন অত্যাচার, যা আমাকে বস্তুত আগুনের মতন পুড়িয়ে মারছে এবং বরফের মতন হিম করে রাখছে; ত্বকের গভীরে এবং স্নায়ুমণ্ডলীর আধার মস্তিষ্কে এই একই বিপর্যয়!

"পরদিন ভোর হওয়া পর্যন্ত আমি সেই শিশুর শিয়রে।...সকালে সে জেগে উঠতে দেখা গেল, তার দুই চোখ দারুণ লাল, গলার ভেতরে ঘর ঘর আওয়াজ, পরিষ্কার অসুস্থতার লক্ষণ।

"বাড়ির ঠিকা ঝি আসা মাত্রই তাকে পাঠালাম ডাক্তার ডাকতে। ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার এলেন; শিশুটিকে পরীক্ষা করার পর বললেন:

"ওকে কি ঠাণ্ডা লাগানো হয়েছিল?"

"না, সে রকম তো মনে হয় না"—আমার জবাব বৃদ্ধ মানুষের মতন কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট।

তারপর জিজ্ঞেস করি:

"আপনার কি মনে হয়? সাংঘাতিক কিছু?"

"আমি এখনই বলতে পারছি না" ডাক্তার বললেন, "সন্ধ্যার সময় আর একবার এসে দেখে যাবো।"

"সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আবার এলেন। আমার শিশুটি সারাটা দিন ধুঁকলো, সর্দি ও কাশিতে বুক-গলা জমে আছে যেন, থেকে থেকে কাশছে।...রাত্রে শ্বাসযন্ত্রের অবস্থার আরও অবনতি ঘটলো।

"তারপর মাত্র দশটি দিন। ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারবো না, এই দশটি দিন আমি কি দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। খুনী যখন অনুতপ্ত হয়, তখন তার এমনটিই হ'য়ে থাকে।...

"সে মারা গেল।...

"এবং সেই থেকে আমি একটা ঘণ্টাও, না, একটা মুহূর্তও স্বস্তিতে কাটাতে পারিনি। প্রতি ক্ষণে, শয়নে-জাগরণে সেই স্মৃতি আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে! যেন সর্বক্ষণ আমার বুকে বাঁধা রয়েছে একটা ভীত পশু।

"হায়! আমি যদি পাগল হয়ে যেতে পারতাম!"

মঁসিয়ে পোরিল দ্য লা ভলতের দলিল পাঠ শেষ। উকিলসুলভ গাম্ভীর্যে তিনি তাঁর চশমাটাকে আর একটু ঠেলে দিলেন। তিনজনই একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব, নিশ্চল।

মুহূর্তখানেক পর উকিল মন্তব্য করলো, "এটা অবশ্যই নষ্ট করে ফেলতে হবে।"

অপর দু'জন সায় দিলো। দলিলের স্বীকৃতি-পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে আগুন ধরানো হলো। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, কিভাবে সেই স্বীকারোক্তি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে! তবু কয়েকটা অক্ষর যেন দেখা যাচ্ছিলো। মেয়েটি মরিয়া হ'য়ে সেই অংশটি পায়ে দলিয়ে গুঁড়ো ক'রে ফেলে তারপর পোড়া ছাইগুলি চিমনির মধ্যে ফেলে দেয়।

এরপরও কিছুক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ওদের আশঙ্কা, এখনই চিমনির ভেতর থেকে গোপন সত্য বেরিয়ে এসে আত্মপ্রকাশ করবে!

দানবদের মাতা

The Mother of Monsters

সেই ভয়ানক কাহিনী, যা বিলকুল রেওয়াজ-বহির্ভূত, আমার মনে আছে; মনে আছে, বিস্ময়ে উদ্বোধক সেই ভয়ানক মহিলার কথাও, যাকে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারছিলাম—সে দাঁড়িয়েছিল সমুদ্রের সামনে, প্যারির সর্বমহলে তার পরিচিতি, বয়সে যুবতী, রূপে কিন্নরী লাস্যময়ী, সার্বজনীন প্রেম ও সম্মানের পাত্রী।

আমার এ গল্পের বয়স অনেক। কিন্তু কালের কলহ-কচকচিতে, সুখে বা দুঃখে নেহাৎ ভুলে যাবার নয়।

আমার এক বন্ধুর আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম তার শহরতলির আবাসে দিনকতক কাটিয়ে আসতে। বন্ধু তার জেলা-শহরের গৌরব বৃদ্ধির আশায় তামাম শহর জুড়ে আমাকে নিয়ে চক্কর কাটতে শুরু করে। অপরিমিত উৎসাহে সে আমাকে দেখালো স্থানীয় সব সেরা সেরা জিনিস—মস্ত মস্ত জমিদার-প্রাসাদ, বয়সপ্রাচীন বিশাল দুর্গ, স্থানীয় শিল্পকেন্দ্র এবং ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপগুলি, যাদের আঁটাল আকর্ষণীয় ক্ষমতা অস্বীকার করা যায় না; শহরময় সফরকালে সে আমাকে দেখিয়েছিল আরো অনেক কিছু, যথা—দুটি একটি স্তম্ভ, গির্জা, ঝুল ঝুল মাকড়সার জাল সমেত গথিকরীতির কারুকার্যমণ্ডিত প্রাচীন দরওয়াজা, অপেক্ষাকৃত নির্জনে বেড়েওঠা পল্লবিত বনস্পতি, নিছক পর্যবেক্ষণে যার বয়স নির্ণয় দুঃসাধ্য।

আমি আমার সাধ্যানুসারে জোরালো উৎসাহ দেখালাম ইত্যাকার দ্রষ্টব্য দর্শনে, যদিও পরিশেষে বন্ধুবর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করলো, এইগুলি বাদ দিলে আর কিছুই দেখবার নেই সেই জায়গায়। আমি বুক ভরে দম নিই। চোখের সামনে যে ছায়ানিবিড় বনস্পতি, তারই ছায়ায় দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে উদ্যোগী হই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ত্রস্তে বন্ধু আমাকে বাধা দেয়, "কেন না, ওর নীচে কেউ যায় না। ওটা যে দানবের মাতার আস্তানা!"

"সে আবার কে?" আমি প্রশ্ন তুলি, "দানবের মাতা আবার কে?"

সে উত্তর দেয়, "সে এক ভয়ানক মেয়েমানুষ, সাক্ষাৎ রাক্ষুসী। প্রতিবৎসর ওখানে সে স্বেচ্ছায় একরাশ বিকৃত চেহারার ভয়ানক রাক্ষস-সন্তানের জন্ম দেয় এবং তাদের বিক্রী করে দেয় মুরগী-শাবক-ব্যবসায়ী যাযাবরদের কাছে।

"আর ঐ বেদুইনদের চাল-চলনও স্বাভাবিক সমাজে বরদাস্ত করবার নয়, সবকিছুই ভূতুড়ে। তারা দানবমাতার প্রসবকালে এসে হাজির হয় এবং বাচ্চাগুলিকে কিনে নেয়।

এ পর্যন্ত এরকম এগারোটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে দানবমাতা এবং তাদের বিক্রী করে যথেষ্ট পয়সাও কামিয়েছে।

তুমি হয়তো ভাবছো, আমি ঠাট্টা করছি বা অতিরিক্ত রং ফলিয়ে বলছি। না, বন্ধু, আমি সত্যি কথাই বলছি, নির্ভেজাল সত্যি কথা।

এসো আমার সঙ্গে, সেই মেয়েমানুষটাকে তোমায় দেখাবো। তারপর শোনাব সেই গল্প, কি ভাবে সে দানব-সৃষ্টির এক কারখানায় পরিণত হলো।"

এই পর্যন্ত বলেই বন্ধু রহস্যের উৎস দেখাতে আমাকে নিয়ে চললো শহরতলীর প্রান্তিক অঞ্চলে।

মেয়েমানুষটি বাস করে রাস্তার ধারে একটি ছোট্ট সুন্দর বাড়িতে। বেশ সাজানো গোছানো বাড়ি। বাহারে বাগান, দেখলে রোমাঞ্চ জাগে, অজস্র, ফুল, বাতাসে সুগন্ধ।

বাগানে ঘেরা এমন একটি মনোরম বাড়ি দেখলে যে কেউ ভাবতে পারে, হয়তো এখানে কোন অবসরপ্রাপ্ত আইন ব্যবসায়ী বসবাস করেন!

এক পরিচারক আমাদের এনে বৈঠকখানায় বসায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেই দুর্দশাগ্রস্ত জীবটির আবির্ভাব ঘটে।

তার বয়স আন্দাজ চল্লিশ, দীর্ঘাঙ্গী, পেশীবহুল সমর্থ শরীর, যেন কোন চাষী পরিবারের প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত স্ত্রীলোক, অত্যধিক কাঠিন্য তাকে যেন অর্ধ-নারী করে রেখেছে। তার রূপ-দর্শনে মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সে নিশ্চয় সচেতন, সেই কারণেই তার বিদ্রূপাত্মক কর্কশ স্বর ধ্বনিত হয়, "মশাইদের উদ্দেশ্যটা কি?"

আমার বন্ধু জবাব দেয়, "শুনলাম, আপনার শেষ সন্তানটি নাকি আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশুর মতনই দেখতে হয়েছে, অন্ততঃ তার ভাইদের মতন নয়। ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করতে আমরা উৎসুক।"

আমাদের বায়নায় দানবমাতার মেজাজ নিশ্চয় আরো খিঁচড়ে গেল, তার চোখে ক্রোধ ও ঘৃণামিশ্রিত বিস্ময়; বললো, "আরে না-না! বরং সে আমার অন্যান্য সন্তানদের চেয়েও দেখতে কুৎসিত ও ভয়ানক হয়েছে।...জানি না ঈশ্বর আমার মত হতভাগিনীর প্রতি আর কত নিষ্ঠুর হবেন!"

বলতে বলতে তার স্বর পরিবর্তিত হয়, কান্না-ভেজা আওয়াজ; সে নতমুখী, যদিও বন্য পশুর মতন দেখাচ্ছে তাকে। এক বিশাল হাড়-প্রধান শরীর থেকে নির্গত ঐ করুণ আর্তি কেমন যেন অস্বাভাবিক ও গোলমেলে মনে হয়।

"আমরা আপনার শিশুটিকে দেখতে ইচ্ছুক।"—বন্ধু বললো।

ওর গালে যেন ঈষৎ লজ্জাজনিত রক্তিমাভা দেখা গেল। অথবা আমারই কি দেখবার ভুল?

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর অপেক্ষাকৃত চড়া স্বরে সে প্রশ্ন করে, "বাচ্চা দেখে কি হবে?"

প্রশ্নটা করেই দানবমাতা মাথা নাড়ায়, দুই চোখ যেন চকিতে জ্বলে ওঠে।

"কেন, আপনি কি আপনার বাচ্চাকে আমাদের দেখাতে চাইছেন না?" আমার বন্ধু নির্দয়ভাবে বললো, "অন্য অনেককেই তো প্রসবের পরে বাচ্চা তুলে দেখান। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি কাদের কথা বলছি।"

বন্ধুর বক্তব্যে যেন দানবমাতার ভেতর সন্ত্রাসের সঞ্চার ঘটে, কেঁপে ওঠে তার শরীর, গলার স্বরও পৌঁছে যায় সপ্তমে, "এই জন্যই বুঝি এই জাহান্নামে আসা? শুধু আমাকে নিয়ে মস্করা করবার বদ মতলব? কারণ, আমার মাথায় মানুষের মগজ নেই, পশুর, এ্যাঁ? বেশ, আমি আমার সন্তানদের দেখাবো না, দেখাবো না, না, না, না! বেরিয়ে যান এখান থেকে। আমি আপনাদের সকলকে চিনি, জানি, কিসের ফিরিস্তি নিয়ে আমার কাছে আসেন! আমাকে এইভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া!"

জানুর ওপর হাত রেখে অতি জীবন্ত বিভীষিকার মতন সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। তার ঐ তপ্ত সপ্তম-আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘর থেকে আর একটি বিজাতীয় স্বর ভেসে আসে—মনে হয়, যেন পাগলের গোঙানি অথবা, কোন অসুস্থ বিড়ালের ডাক। আমার মজ্জায় মজ্জায় কাঁপুনি লাগে।

আমরা ওর সামনে থেকে ফিরে চলি।

বন্ধু ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমাকে বলে, "একটু সাবধানে থেকো, ওটা তো একটা ডাইনী! সুযোগ পেলেই ক্ষতি করবে!"

বন্ধুর উক্তি শুনে মেয়েমানুষটি তেলে-বেগুনে আরো জ্বলে ওঠে, দুই হাত শূন্যে নাড়াতে নাড়াতে চীৎকার করে, "বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি! আমি ডাইনী! অসভ্য, ইতর, পশু কোথাকার!"

সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল আমাদের ওপর। তাঁর আগেই অবশ্য আমরা সরে পড়ি। রীতিমত আতঙ্কগ্রস্থ আমরা।

বাড়ির বাইরে আসার পর বন্ধুর প্রথম জিজ্ঞাসা, "এবার তো দেখলে। কি ধারণা হলো ওর সম্পর্কে?"

বললাম, "আমি ওর নিষ্ঠুর ইতিহাস জানতে চাইছি।"

তারপর সাদা উঁচু পথে পায়চারি করতে করতে, রাস্তার দু'ধারের পাকা শস্যের ঘ্রাণ নিতে নিতে আমি শুনলাম এক ভাগ্যহীনার বিচিত্র ইতিহাস।

আজ যার পরিচিতি 'দানবের মাতা', এককালে সে যখন বালিকা ছিল, কাজ করতো এক খামারে। দারুণ কাজের মেয়ে, ব্যবহার চমৎকার, নিয়ম মাফিক সাবধানে দায়িত্ব পালন করে। তার কোন প্রেমিক ছিল বলে শোনা যায়নি; বা সে-ধরনের কোন দুর্বলতাও তার ছিল না।

তবু শস্যকাটার এক মরশুমী রাতে, এই সব ভাগ্যহীনা অসহায় মেয়েদের কপালে যা ঘটে থাকে, তারও তেমন এক অভিজ্ঞতা হলো। আকাশে তখন ঝড়ের পূর্বাভাষ, নিথর বাতাসে হলকা, মেয়েটিকে শুইয়ে ফেলা হয়েছে পাকা শস্যের গাদায় এবং সে প্রথম যৌনস্বাদ অনুভব করছে; তার এবং পুরুষটির ঘন ঘন আন্দোলিত শরীর ঘামের বন্যায় টস্‌টসে।

ঐ একটি রাতের অভিজ্ঞতার পর সময় পেরিয়ে গেল জোর কদমে। একদিন সে অনুভব করলো, তার জঠরে সন্তান। ভয়ে ও লজ্জায় সে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে। তার তখন একমাত্র লক্ষ্য, যেমন করেই হোক এ কলঙ্ককে ধামা চাপা দিতেই হবে! লজ্জা ও কলঙ্ককে ঢাকতে সে এক মারাত্মক উপায় উদ্ভাবন করলো,—কাঠ ও দড়ির সাহায্যে সে তার পেটটাকে প্রচণ্ড শক্তিতে বেঁধে রাখে। যত দিন যায়, ততই বাঁধন কঠিনতর হয়—তার উদরের স্ফীতি যেন কারুর নজরে না আসে। এই উপায়েই সে তার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ নিকেশ করলো।

যন্ত্রণা অনুভব করতো। কিন্তু সে তা সহ্য করতো সাহসের সঙ্গে। সে তখন জোর করে আরো চটপটে, আরো নিপুণ। এমন চাল-চলন দেখাতো, যেন কেউ

সন্দেহ করতে না পারে, কী যন্ত্রণা তার জঠরে। অনেক কষ্টে মুখের ভাব শান্ত ও নিরুদ্বেগ রাখে, যদিও শরীরের ভেতর আর একটা শরীর ক্রমশঃ বড় হ'য়ে উঠতে চায় এবং সে ওর বৃদ্ধি—নাশ করবার জন্য ঝাঁকানি দিয়ে আরো কষে পেট বাঁধে দড়ি ও কাঠ দিয়ে। পোশাকের নীচে সে এক অভিনব মারণাস্ত্র, যার হদিশ অন্য কেউ বুঝতে পারছে না। মা হবার মাদকতাকে নিষ্ঠুরভাবে খতম করবার এ এক অভাবনীয় প্রয়াস! সে পরিকল্পিত উপায়ে তার সন্তানকে ধ্বংস করছে—শিশুটির চেহারা গঠিত হচ্ছে বিকৃতভাবে, অমানুষ কল্পিত দানবের যেন জন্ম দিতে চলেছে সে। মাথাটা সম্পূর্ণ চ্যাপ্টা, কপালটা ভেঙ্গে একটা বিন্দুতে এসে ঠেকেছে, দুটো বিরাট চোখ সেই কপাল ঠেলেই বেরিয়ে আসতে চায়। হাত-পা ভেঙ্গে গেছে এবং দ্রাক্ষালতার মতন দুলছে; আঙুল এবং পায়ের পাতা মাকড়সার মতন। ধড়টা খুব ছোট ও একটা সুপারির মতন গোলাকার।

বসন্তকালের এক সকালে খোলা ময়দানে সে ঐ আজব জীবটিকে প্রসব করলো। আশে-পাশের অনেক মেয়েরা তাকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু নবজাতকের বীভৎস রূপ দেখে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। লোকের মুখে মুখে গল্প ছড়ায়,—ঐ মেয়েটা এই পৃথিবীতে একটা দানবের জন্ম দিয়েছে! তখন থেকেই তার পরিচিতি 'দানবমাতা' বা 'ডাকিনী'।

তার কাজ গেল। পাঁচজনের দয়ার ওপর তাকে বেঁচে থাকতে হলো। অথবা, তার গোপন প্রেমিকরাই তাকে বাঁচিয়ে রাখলো। কারণ, আর যাই হোক, তার যৌবন ও রূপ ছিল, যার আকর্ষণে অনেক লোকই নরকে যেতে ভয় পায় না!

মার তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা সত্ত্বেও দানবটির কিন্তু বয়স বাড়তে থাকে। মেয়েমানুষটার মনে তখন অন্য এক ভয় ঢুকেছে,—সে হয়তো আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

অবশেষে একদিন একদল চলমান যাযাবর ঐ দানব-জন্মের গল্প শুনে তার কাছে এসে হাজির হয় এবং শিশুটিকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। শিশুটিকে দেখে তাদের পছন্দ হয় এবং অমন এক আজব প্রাণী দেখিয়ে প্রচুর কামাবার মতলবে বাচ্চাটিকে পাঁচ শ' ফ্রাঁ দিয়ে কিনে নেয়।

সে কিন্তু প্রথমে লজ্জায় বাচ্চাকে দেখাতে চায়নি। কিন্তু পরে সে আবিষ্কার করলো, তার পক্ষে এই দুনিয়ায় স্বচ্ছলতার সঙ্গে বেঁচে থাকবার এটাই সর্বোত্তম উপায়। যাযাবরদের সঙ্গে সে রীতিমত দরাদরি করেছিল, একটি পেনিও কম নিতে রাজি হয়নি। উপরন্তু, ওরা তাকে কথা দিতে বাধ্য হলো, এই শিশুটিকে প্রদর্শনীতে রেখে তারা যে টাকা কামাবে, তার থেকে বাৎসরিক চার শ' ফ্রাঁ শিশুর মাকে দিয়ে যাবে।

হঠাৎ এই সৌভাগ্যের চমক মেয়েমানুষটার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে; সে আবার নতুন করে জন্ম দিতে আগ্রহী হয়,—অপরিসীম উৎসাহে সে একের পর এক দানবের জন্ম দিতে চায়। এই তো সেই পথ, যার দ্বারা উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মতন সেও নির্দিষ্ট আয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে!

যেহেতু বার বার গর্ভবতী হবার মতন অঢেল উর্বরতা তার ছিল, তার উচ্চাকাঙ্খা অদ্ভুতভাবে সফল হলো। সন্তান গর্ভে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তার উৎকট পীড়ন; অত্যাচারের নতুন নতুন পদ্ধতি বের করে সে নবজাতকের চেহারাতেও তারতম্য ঘটাতে শুরু করে। গুটিকয়েক সন্তান মারাও গেল এবং এই লোকসান হওয়ায় সে খুব দুঃখিতও হয়েছিল।

তার জীবিত সন্তানদের সংখ্যা বর্তমানে এগারো, আর তার বাৎসরিক আয়কে এনে দাঁড় করিয়েছে কমপক্ষে দু' হাজার ফ্রাঁতে। শুধু একটি শিশুকে সে এখনো প্রদর্শকদের হাতে তুলে দেয়নি, যাকে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেশীদিন নিজের কাছে রাখবে বলেও মনে হয় না, কারণ ইতিমধ্যেই দুনিয়ার যত সার্কাস-মালিক তার আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেছেন। তাঁরা এসে সময়ান্তরে খোঁজ নিয়ে যায়, মেয়েমানুষটা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারলো কি না! প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমশই ওর বাচ্চাদের দাম বাড়ছে এবং এর পুরোপুরি সুযোগ নিতে তার কোন ভুল হয় না।

বন্ধু নীরব হলো। আমার অন্তর জুড়ে ঘৃণা। শুধু ঘৃণা কেন, ক্রোধ ও ক্ষোভ। ইচ্ছে হচ্ছে, ঐ শয়তানীটাকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিই!

"কিন্তু ওদের জনকটি কে?"—আমি জিজ্ঞাসা করি।

"কেউ বলতে পারে না," বন্ধু জবাব দেয়, "একজনও হতে পারে, আবার একাধিক নাগর থাকাও বিচিত্র নয়। তবে সে বা তারা লুকিয়ে-লুকিয়ে দিব্যি কম্মটি করে যাচ্ছে। হয়তো বখরাও পায়।"

আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি।

কিন্তু অন্য একদিন অন্য এক ঘটনা দেখে আবার আমার মাথায় রক্ত চড়ে যাবার উপক্রম। সমুদ্র তটে সুন্দর এক পরিবেশে আমি সেদিন দেখলাম এক অপূর্ব রূপসীকে, যাকে ঘিরে আছে বহু লোক এবং যার প্রতি সম্ভ্রম জানাতে প্যারির একাধিক লোক উদ্‌গ্রীব!

আমি আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে সেই জমায়েতের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দশ মিনিট ধরে লক্ষ্য করলাম, একজন নার্স বালুবেলায় গড়াগড়ি যাওয়া তিনটি শিশুকে আগলাচ্ছে। একজোড়া খঞ্জের যষ্টি করুণভাবে পড়ে আছে বালিতে। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, শিশু তিনটির গড়ন—ওদের মানুষ বলে সনাক্ত করা দায়। ভাঙ্গা-চোরা দেহ, কুঁজো ও খোঁড়া! বিচিত্র তিনটি জীব।

ডাক্তার আমাকে বললো, "ঐ তিনটি শিশু হলো সুন্দরী মহিলাটিরই সন্তান।" শুনে আমার করুণা হলো বাচ্চাগুলো এবং তাদের মার জন্য।

"ভাগ্যহীনা মা!" আমি বিষণ্ন বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে উঠি, "কি ভাবে তিনি এখনো হাসতে পারেন?"

"অত দুঃখে কাতর হয়ো না বন্ধু," ডাক্তার বললো, "দুঃখ জানাবে শুধু হতভাগ্য শিশু তিনটির জন্য। নিজের শরীরের জেল্লা বজায় রাখবার জন্য ওদের মা তার

সন্তানদের জঠরেই অমন বিকৃতি সাধন করেছে। এর জন্য এই মুহূর্তে তার কোন অনুতাপ নেই, কারণ এখনো সে তার অটুট সৌন্দর্য নিয়ে সমান আকর্ষক!"

এবং তখনই আমার মনে পড়লো সেই দানবমাতা ডাইনীর কথা, যে তার সন্তানদের বিক্রী করে পয়সা কামাচ্ছে।

বৃদ্ধ জুডাস

Old Judas

গোটা শহর জুড়ে বিস্ময়ের হিল্লোল। কারণ, দুর্লক্ষণ বিনাশার্থে প্রায় এক ধর্মীয় আড়ম্বরে সামিল এরা।

চারদিকে নিরলঙ্কার পর্বতশ্রেণী, সেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুটি একটি ওক গাছ ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না, বাতাসের দাপটে সেই সব খামখেয়ালী গাছগুলি হেলছে-দুলছে; আর লক্ষণীয়, পাহাড় ঘেরা একটি ছোট্ট হ্রদ, যার কালো নিথর জল চুম্বন করে হাজার নল-খাগড়ার ঝাঁড়।

এই বিষণ্ন-হ্রদের ধারে একটি ছোট্ট নীচু বাড়ি তামাম দুনিয়া থেকে যেন বিচ্ছিন্ন; বাড়ির মালিক বৃদ্ধ যোশেফ জাতে মাঝি, পেশায় জেলে। প্রতি সপ্তাহে সে তার মাছ নিয়ে নেমে আসে কাছাকাছি গ্রামগুলিতে এবং যা উপায় করে, তাতে এই পৃথিবীতে কোন রকমে তার অস্তিত্বটুকু বজায় আছে।

আমার বাসনা ছিল, একদিন এই সন্ন্যাসীকে দেখতে যাবো। ইচ্ছাপূরণেও অবশ্য বিলম্ব ঘটেনি। একদিন সে নিজে আমাকে আমন্ত্রণ জানালো তার সঙ্গে জাল টানতে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

তার নৌকাটি পোকায় কাটা জীর্ণ ও গোলাকার। হাড়পুষ্ট শীর্ণ দেহে আশ্চর্য শান্ত তন্ময়তায় সে দাঁড় টানছে এবং তার ঐ ছন্দবদ্ধ প্রয়াস আমার মনের গভীরতাকে ছুঁয়ে যায়; বিশাল চরাচর ও ঝুলন্ত আকাশে বিষণ্নতা আচ্ছন্ন করে রাখে। এই প্রাচীন হ্রদে তরতরিয়ে এগিয়ে যাওয়া জীর্ণ বোট, দাঁড় হাতে এক গম্ভীর বয়স্ক লোক,—মন আমার সুদূর পিয়াসী হয়ে ওঠে; ভাবি, আমি বুঝি আদিম পৃথিবীতে ফিরে গেছি।

বাইবেল বর্ণিত মৎস্যশিকারীর মতন সে জাল টেনে তোলে, মাছগুলিকে এনে রাখে পায়ের কাছে। তারপর আমাদের ডিঙ্গী চললো বিলের অন্য প্রান্তে। হঠাৎ নজরে এলো, হ্রদের অন্য তীরে একটি ধ্বংসস্তূপ, ভাঙ্গাচোরা কুটিরের শূন্যতা এবং তার দেওয়াল ঘেঁষে একটা ক্রশ, বিশাল রক্তবর্ণ ক্রশ; অস্তমিত সূর্যের আভায় মনে হচ্ছে ক্রশের সর্বাঙ্গ বেয়ে রক্ত ঝরছে।

"ওটা কি?"—জিজ্ঞেস করি।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রশ আঁকে। জবাব দেয় :

"ঐ সেই জায়গা, যেখানে জুডাস মারা গিয়েছিলেন।"

জবাব শুনে অবাক হলাম না ; এমনই কিছু একটা শুনতে পাবো আশা করেছিলাম।

কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি করতে শুরু করি :

"জুডাস ? কে জুডাস ?"

সে বললো, "স্যার, তিনি ছিলেন এক ভ্রাম্যমান ইহুদি।"

আমি তার কাছে পুরো উপকথাটি শুনতে চাইলাম।

কিন্তু না, এটি উপকথার চেয়েও মহত্তর, এটি ইতিহাসের এক খণ্ডাংশ—প্রায় সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কারণ বুড়ো যোশেফ তাকে চিনতো।

একসময় ঐ কুটিরে বাস করতো এক দীর্ঘাঙ্গী ভিখারিণী। লোকের অনুগ্রহের ওপর তাকে নির্ভর করতে হতো। ঠিক কার কাছ থেকে যে সে ঐ কুটিরের মালিকানা পেয়েছিল, বৃদ্ধ যোশেফ মনে করতে পারছে না।

এক রাত্রে সেখানে এক বিচিত্র বৃদ্ধের আবির্ভাব ঘটলো ; তার চুল-দাড়ি ধবধবে সাদা, বয়স যেন দু' শতাব্দী পার হয়ে এসেছে, ঠিক মতন পা ফেলে ফেলে চলতে পারে না ; ঐ কুটিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ভিখারিণীর কাছে ভিক্ষা চাইলো।

মেয়েমানুষটি বললো, "বাবা, আপনি বসুন। এখানে যা কিছু দেখছেন, তাতে এই পৃথিবীর সকলের অধিকার। এবং এইগুলি পৃথিবীরই দান।"

বৃদ্ধ কুটিরের সামনে একখণ্ড পাথরের ওপর আসন নেয়। তারপর ভাগ বসায় ভিখারিণীর রুটি, তরকারি এবং বাসস্থানের ওপর।

সে আর কখনো ওকে ছেড়ে যায়নি। তার পরিভ্রমণও তখন সমাপ্ত।

বৃদ্ধ যোশেফ আরো বললো :

"স্যার, ঐ ভিখারিণী আর কেউ নয়, যীশু খ্রীস্টের মাতা, যিনি জুডাসের জন্য তাঁর কুটিরের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন।

কারণ আগন্তুক জুডাস ছিলেন ভ্রাম্যমান ইহুদি।

ধারে কাছের লোকেরা ব্যাপারটা প্রথমে খেয়াল করেনি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সন্দেহ হলো ; কারণ, আগন্তুক প্রচণ্ড অভ্যাসের বশে অহরহ পায়চারি করতেন। আরো সন্দেহ হলো, আগন্তুক ও ঐ স্ত্রীলোক—দু'জনেই ইহুদি, কারণ কেউ কোনদিন তাদের চার্চে যেতে দেখেনি।

সকলেই এমনকি শিশুরাও ওদের দেখলে 'যিহুস' বলে চীৎকার করে উঠতো।

সারাটা দিন ধরে ভিখারিণী ও বৃদ্ধ দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতেন, পথচারিদের সামনে হাত পেতে দাঁড়াতেন। কখনো তাঁদের দেখা যেত নির্জন পথে, কখনো গ্রাম্য ময়দানে ; কখনো তাঁরা গাছের ছায়ায় বসে রুটি চিবুচ্ছেন ; কখনো বা প্রচণ্ড দাবদাহে হেঁটে চলেছেন।

লোকটিকে সকলে ডাকতে শুরু করলো 'বৃদ্ধ জুডাস' বলে।

একদিন তিনি থলিতে ভরে নিয়ে এলেন পাঁচটি শূকর-ছানা। একজন খামার মালিককে রোগের হাত থেকে রক্ষা করায় এইগুলি লাভ করেছিলেন তিনি।

শীঘ্রই ভিক্ষায় যাওয়া বন্ধ করলেন তিনি। তখন তিনি ব্যস্ত শূকরছানাদের রক্ষণাবেক্ষণে! স্ত্রীলোকটি কিন্তু সারাদিন ভিক্ষা করছেন। সন্ধ্যার পর অবশ্য তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হন।

তাঁদের সঙ্গে গির্জার যেন কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি, তাঁরা কখনো ক্রুশও আঁকেন না। এই নিয়েই সাধারণ মানুষদের ভেতরে যত জল্পনা-কল্পনা।

একদিন বৃদ্ধ জুডাসের সঙ্গিনী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, বাতাসে কাঁপতে লাগলেন ঠকঠকিয়ে। অবস্থা ক্রমশই আয়ত্বের বাইরে চলে গেল। বৃদ্ধ ওঁকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলেন। শেষে কুটিরের দরজা বন্ধ করে দু'দিন একটানা পড়ে রইলেন সঙ্গিনীর শিয়রে।

স্থানীয় পাদ্রী ঘটনাটা শুনবার পর স্থির করলেন, মৃত্যুপথের যাত্রিনীকে তিনি অন্তিমে ধর্মের বাণী শোনাবেন। কিন্তু ঐ কুটিরে উপস্থিত হওয়া মাত্র বৃদ্ধের দু'চোখে তিনি যেন আগুন দেখতে পেলেন। জুডাসের গালি-গালাজ ও অভিশাপ শুনে ফিরে আসতে হলো তাঁকে।

সঙ্গিনী মারা গেলেন।

জুডাস একাই কুটিরের সামনে তাঁকে কবর দিলেন। তাঁরা এত গরীব ছিলেন যে, এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতে এলো না।

এবার শুরু হলো তাঁর একক সংগ্রাম। তিনি শূকর-ছানা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আবার ভিক্ষে করতেও বের হন। কিন্তু পাদ্রীর প্রতি তাঁর ব্যবহারের জন্য লোকেরা তখন তাঁর প্রতি বিমুখ। ভিক্ষে বিশেষ জোটে না।....

পবিত্র ইস্টার মানডেতে একদল বালক-বালিকা ঘুরতে ঘুরতে হ্রদের এ ধারটাতে চলে আসে। হঠাৎ তারা শুনতে পায়, কুটিরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কেমন একটা বিশ্রী চীৎকার। তারা কপাট ভেঙ্গে ফেলতেই হরিণের মতন লাফাতে লাফাতে একজোড়া শূকর ছুটে পালিয়ে আসে ঘরের ভেতর থেকে। পলায়নপর ঐ চারপেয়ে পশু দুটোকে আর দেখা গেল না।

এরা সকলে ঘরে ঢুকে দেখলো এক বীভৎস দৃশ্য। বৃদ্ধ জুডাসকে তার শূকররাই হত্যা করেছে! পড়ে আছে তাঁর খুলি ও টুকরোটাকরা হাড়, ঘর রক্তে রক্তময়।

গল্প শেষে বৃদ্ধ যোশেফ মন্তব্য করলো :

"ঘটনাটা ঘটেছিল গুড ফ্রাইডেতে, ঠিক দুপুর তিনটেয়।"

জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি করে জানলেন?"

সে বললো, "এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়।"

আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম না, ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এতে অলৌকিকত্ব কি আছে?

আর ঐ ক্রুশের রক্তবর্ণ? নিশ্চয় কেউ ওখানে রঙ বুলিয়েছিল।

কর্ণেলের চিন্তাধারা

What the Cornel thought

"আমি এখন বৃদ্ধ," কর্ণেল লেপোর্ট কবুল করলেন, "বাতের ব্যথায় ভুগছি, পা দুটো বেড়ার কাঠির মতন শক্ত। তবু, এখনো যদি কোন সুন্দরী আমাকে একটা ছুঁচের ফুটোর মধ্যে দিয়ে যেতে বলে, অসম্ভব জেনেও সঙ্গে সঙ্গে সার্কাসের জোকারের মতন গোলাকার ঘাগরা পরে ঝাঁপিয়ে পড়বো। মৃত্যু আমার এভাবেই হবে ; এ মশাই রক্তের দোষ! মেয়েমহলে আমি পুরনো খেলোয়াড়, সারাটা জীবন ধরে মেয়েদের প্রীতিই চেখে এসেছি। সুন্দরী কাউকে দেখলেই আপাদ-মস্তকে শিহরণ খেলে যায়। হলপ্ করে বলছি, এমন হবেই!

"আমরা ফরাসীরা, মশাই, চরিত্রে এমনটিই হয়ে থাকি। আমৃত্যু আমরা মহাবীর এবং আমাদের এই বিশাল বীরত্ব অফুরাণ প্রেম ও অনুরাগের। কাম ও প্রেমের দেবতার দেহরক্ষী আমরা।

"আমাদের অন্তঃকরণ থেকে মেয়েদের কেউ সরিয়ে নিতে পারে না। নারীর উপস্থিতি চিরায়ত। আমরা তাকে ভালোবাসি, বাসতে থাকবোও চিরকাল। যতদিন য়ুরোপের মানচিত্রে ফ্রান্সের অবস্থিতি থাকবে, যে-কোন ধরনের পাগলামি করতে আমরা পিছু-পা নই। এবং, এমনকি, ফ্রান্স যদি ধুয়ে মুছে যায়, জাতি হিসাবে ফরাসীরা বেঁচে থাকবেই!

"নিজের কথাই বলছি, যদি কোন সুন্দরী মেয়ে আমার দিকে যৎকিঞ্চিৎ নেক নজর দেয়, আমি অসাধ্যসাধন করতে পারি। তার টানা টানা আশ্চর্য চোখ আমার স্নায়ুতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর তখন আমি এক প্রচণ্ড ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী, যে শক্তির তাগিদে আমি দিশেহারা—যুদ্ধ করতে চাই, সংগ্রাম করতে চাই, সমস্ত আসবাবপত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলতে চাই; এ ভাবেই প্রমাণ করতে চাই, আমি সবচেয়ে বলবান পুরুষ, সবচেয়ে সাহসী লোক, সবচেয়ে বেপরোয়া প্রাণী এবং মানবতার সবচেয়ে বড় পূজারী।

"আর এ শুধু আমার একার কথা নয়, তামাম ফরাসী বাহিনীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে বাঘা বাঁঘা জেনারেল অব্দি সকলেরই মানসিকতা এরকম—নারী, সুন্দরীদের জন্য তারা চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করতে রাজি। মনে করুন, অতীতে জোয়ান অফ্ আর্কের ডাকে আমরা কি না করেছি! বাজি ধরে বলতে পারি, সেডানের যুদ্ধে মার্শাল ম্যাকমোহন আহত হবার পর যদি শুধু সেই রাতের জন্য ফরাসী বাহিনী কোন নারীর অধিনায়কত্ব পেতো, তবে যুদ্ধের ফলাফল

অন্যভাবে লেখা হতো ইতিহাসে—অনিবার্যভাবেই আমরা প্রুশিয়ানদের ব্যূহ ভেদ করে ফেলতাম এবং তাদের স্তব্ধ কামানের মুখে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ পান করতাম।

"এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যুদ্ধকালীন একটি ছোট ঘটনা, যা প্রমাণ করে,—নারীর উপস্থিতিহেতু আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি।

"সে সময় আমি একজন সাধারণ ক্যাপ্টেন। মুষ্টিমেয় সৈন্যদের নিয়ে মরণপণ লড়াই চালাচ্ছি এমন একটা জেলা-শহরে, যার অধিকাংশই কার্যতঃ প্রুশিয়ানরা দখল ক'রে নিয়েছে। মূল বাহিনী থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন এবং প্রচণ্ড চাপ এসে পড়ছে আমাদের ওপর। শরীরে ও মনে গভীর অবসাদ, আহতদের সংখ্যা বাড়ছে, খাদ্যের যোগান নেই, অথচ অমানুষিক পরিশ্রমে মৃত্যুর হাতছানি।

"যাই হোক, পরের দিন আমাদের বার-সুর-টেনে পৌঁছতে হবেই! যদি তা সম্ভব না হয়, আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বো এবং আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হ'য়ে উঠবে। কি ভাবে যে এতদিন টিকে আছি, সেটাই আশ্চর্য। সারাটা রাত ধরে সমানতালে হাঁটছি তো হাঁটছিই। হাঁটতে হাঁটতে বারো লীগ পথ অতিক্রম করলাম। পেটে দানা নেই, হাঁটছি পুরু বরফের মধ্য দিয়ে, যেদিকেই তাকাই মাটির চিহ্ন নেই, মাথার ওপর সমানে সুমসাম তুষারপাত । ভাবলাম : এই আমাদের শেষ। আমার এই বাহিনীর একজনও আর ফিরে যেতে পারবে না!

"গতকাল থেকে নির্জলা উপবাস। দিনের আলো ফুটতেই আমরা একটা শস্যগোলার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। এটা খামার বাড়ি, যেখানে সারাটা দিন একটুখানি উষ্ণতার জন্য আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইলোম নির্জিব, নিথর হ'য়ে ; নড়া-চড়ায় অনীহা, কথা বলার ক্ষমতা নেই, মাঝে মাঝেই অশেষ ক্লান্তিতে ঝিমুনি আসছে।

"পাঁচটা বাজতে না বাজতেই অন্ধকার। বরফঝরা দিনের নিরেট অন্ধকার। আমি আমার লোকদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তুলতে থাকি। অনেকেই উঠে বসতে নারাজ অথবা, দু'পায়ে উঠে দাঁড়াবার মতন শক্তিও তাদের নিঃশেষিত। প্রতিটি অস্থিসন্ধি প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কঠিন ও অক্ষম হ'য়ে পড়েছে। সামনেই আদিগন্ত চরাচর বরফে আচ্ছাদিত! একেই বলে নরক। বরফ পড়ছেই। মনে হয়, যেন একটা সীমাহীন সাদা পর্দা আকাশ থেকে নেমে ঢেকে ফেলছে সবকিছু। মৃত, মসৃণ, নিঃশব্দ। পৃথিবীর এটাই বুঝি প্রান্তরেখা।

'বেরিয়ে এসো ছেলেরা। ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

"তারা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলো, বরফের ধূলি-ঝড়। আকাশের উৎসমুখ থেকে তুষারের অন্তহীন শোভাযাত্রা। সৈন্যরা বোধহয় ভাবলো : 'অনেক হয়েছে ; মরতে হয় এখানে বসেই মরবো। তবু—'

"ওদের মনোভাব বুঝতে পেরে উপায়হীন ক্ষিপ্ততায় আমি কোমর থেকে পিস্তল টেনে বের করি, হুঁশিয়ার করে দিই :

'ভয়ে যে পালাবার চেষ্টা করবে, তাকেই গুলি করবো।'

"উদ্ধত পিস্তলের মুখে তারা চলতে শুরু করে। এ যেন এক বিষণ্ন শবযাত্রা। অতি মন্থর গতি, পা যেন আর ওঠে না, নামে না।

"মনে হচ্ছে, বরফের নীচে আমাদের জীবন্ত সমাধি অনিবার্য। টুপিগুলি কুচি কুচি বরফে ভিজে, সাদা ও ভারী। দেখলে মনে হবে, কতকগুলি ক্লান্ত তুষার-ভূত চলেছে সারিবদ্ধভাবে।

"আমি সংগোপনে অনুভব করি: 'মুক্তি নেই। কোন অলৌকিক কিছু না ঘটলে এর হাত থেকে নিস্তার পাব না।'

"সময় সময় কয়েক মিনিটের জন্য আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয় পিছিয়ে পড়া জোয়ানদের জন্য। তখন আদিগন্ত উপত্যকা জুড়ে কোন শব্দ নেই, কেবল তুষারপাতের ফিস্‌ফিসানি। কখনো সেই ফিস্‌ফিসানি গোঙানো কান্নার রূপ নেয়।

"জোয়ানদের কেউ কেউ তখন কেঁপে ওঠে; অনেকের সে ক্ষমতাও নেই।

"সেই অবস্থাতেই আমার হুকুমে তারা কদম কদম এগিয়ে চলেছে; কাঁধের ওপর আকাশমুখো রাইফেল, অবশ একজোড়া পায়ের এলোমেলো পদক্ষেপ।

"হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়ায়, সামান্য পিছিয়ে আসে, কিসের এক উত্তেজনায় ও সন্দেহে ঋজু হ'য়ে ওঠে তারা। সামনে কিসের যেন একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে তারা। আমি দু'জন জোয়ান সহ একজন সার্জেন্টকে পাঠালাম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকি।

"অকস্মাৎ তুষারময় উপত্যকা জমাট স্তব্ধতাকে চিরে ভেসে আসে তীব্র তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের আর্তনাদ এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সামনে এনে হাজির করা হলো একজোড়া বন্দীকে— তাদের একজন বৃদ্ধ, অপরজন যুবতী।

"চাপা গলায় আমি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। গত সন্ধ্যায় শত্রু প্রুশিয়ানরা তাদের এলাকায় ঢুকে পড়েছে, অনেকের ঘর বাড়ি বেদখল করেছে, জয়ের আনন্দে তারা প্রচণ্ড মদ্যপান করছে এবং এরা দুটিতে সেই মাতালদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কোন ক্রমে পালিয়ে এসেছে। বাবা ভয় পেয়েছিল তার যুবতী মেয়ের পরিণতি সম্পর্কে এবং চাকর-বাকর কাউকে না জানিয়ে সোজা ওর হাত ধরে সাঁ সাঁ ছুটে এসেছে এই মৃত্যুপুরী বরফ-উপত্যকায়।

"মুহূর্তে আমার সনাক্তকরণে ভুল হয় না, এরা মধ্যবিত্ত বা আরো বিত্তশালী পরিবারের সদস্য-সদস্যা।

'আসুন আমাদের সঙ্গে'—আমি তাদের বললাম।

"আবার সেই ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটা। বৃদ্ধ লোকটি এ দেশের পথ-ঘাটের সঙ্গে পরিচিত। কাজেই সে এখন আমাদের পথপ্রদর্শক। ক্রমে তুষারপাত বন্ধ হয়। আকাশের বুকে দেখা যায় অসংখ্য নক্ষত্র। শীত আরো ভয়ঙ্কর। বাবার হাত ধরে যুবতীটি কোনরকমে বরফের গভীরে পা তুলে তুলে পথ অতিক্রমের চেষ্টা করছে। বারকয়েক তাকে বিলাপ করতে শোনা গেল: 'আর পারছি না এভাবে হাঁটতে!' একটি মেয়ের এরকম শারীরিক কষ্ট দেখে আমি বিচলিত।

"এক সময় সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'বাবা' গভীর অবসাদের সঙ্গে সে জানায়, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আর হাঁটতে পারছি না।'

"বৃদ্ধ তাকে কোলে তুলে নেবার বৃথাই চেষ্টা করে, সে ক্ষমতা তার নেই। হঠাৎ মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়।

"আশ্চর্য বিপত্তি। আমরা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। আমি হাত-ঘড়িতে সময় দেখে নিলাম। এই মুহূর্তে কি যে করণীয়, ভেবে উঠতে পারছি না। সকন্যা বৃদ্ধকে এই ভয়ঙ্কর স্থানে ত্যাগ করে যেতেও মন সায় দেয় না।

"তখন আমাদের মধ্যে একজন, যার ডাক নাম স্লিম জিম, হঠাৎ উদ্যোগী হয়ে বলে :

'আসুন, আমরা এই মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে যাই। নচেৎ আমরা ফরাসী নামেরই অযোগ্য।'

"বিচিত্র এক প্রীতিকর অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করে যায়। বললাম :

'উত্তম প্রস্তাব। আমিও তোমাদের সঙ্গে কাঁধ মেলাতে রাজি আছি।'

"অন্ধকারে অদূরের এক বনভূমি নজরে এলো। আমাদের মধ্যে জনাকয়েক সেখানে গিয়ে এক বোঝা কাঠ নিয়ে আসে এবং তৎপরতার সঙ্গে একটা মাচা তৈরী করে ফেলে।"

'কে রাজি আছো, মাথার টুপি খুলে দিতে?' স্লিম জিম আহ্বান জানায়, 'এই সুন্দরীর জন্য কে করবে আত্মত্যাগ?'

"সঙ্গে সঙ্গে স্লিম জিমের পায়ের কাছে টপাটপ দশটি টুপি এসে জমা পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে ঐ টুপিগুলি সাজিয়ে একটি বিছানা প্রস্তুত হ'য়ে গেল মেয়েটির জন্য। তারপর সেই যুবতীকে কাঁধের ওপর তুলে দু'জন সৈনিকের বলদর্পী পদযাত্রা। সবচেয়ে বিস্ময়কর, আমি স্বয়ং ডান দিকের হাতলটি কাঁধের ওপর এনে বসিয়েছি। এমন একটি বোঝা বইবার সুযোগ পেয়ে মন খুশিতে ভরপূর।

"এমন উৎসাহে হাঁটছি, যেন এই মাত্র একপাত্তর টেনে উঠলাম। নেশাখোরের মতন গরম শরীরে নতুন প্রাণশক্তি। এমনকি, জোয়ানরা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি, রসালাপ জুড়ে দিয়েছে। আপনি জানেন, উৎসাহের প্রাবল্যে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবার জন্য ফরাসীদের প্রয়োজন কেবল নারী।

"জোয়ানরা তখন যথার্থই তাদের বৈশিষ্ট্য ফিরে পেয়েছে। তেমনি সাহসী ও হৃদয়বান। কে বলবে, এই কিছুক্ষণ আগেও তারা ছিল অভুক্ত ও অবসাদে অসমর্থ।

"একজন বৃদ্ধ সৈনিকও সেই মাচায় কাঁধ পাতবার জন্য রীতিমত লড়াই করছে যেন। আমি তার মন্তব্য শুনতে পেলাম, 'হতে পারি বুড়ো, তবু তো পুরুষ! মেয়েমানুষের জন্য বয়স ও সাহস দুটোরই পুনরুদ্ধার সম্ভব!'

"প্রায় এতটুকু বিরাম না দিয়ে সকাল তিনটে পর্যন্ত সমান তালে হেঁটে এলাম। তারপরই এলো সেই মুহূর্ত। আমরা কালো ছায়াকে যেন এগিয়ে আসতে দেখলাম। ব্যবধান কমলে দেখা গেল, একদল অশ্বারোহী প্রুশিয়ান। দুশমন!

"আমি চীৎকার করে উঠলাম: 'চালাও গুলি!'

"একসঙ্গে পঞ্চাশটা রাইফেলের অগ্নিস্রাবী গর্জন রাতের স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে ফেলে।

"ধোঁয়ার আস্তরণ সরে গেলে দেখলাম বারোটি মানুষ ও ন'টি ঘোড়া খতম! তিনটি আহত ঘোড়া দিশেহারা হ'য়ে লাফাচ্ছে পা তুলে।

"আমার পিছনে এক জোয়ান অট্টহাসি হেসে ওঠে। অন্য একজন মন্তব্য করে: 'কয়েকজন বিধবা হলো।'

"সম্ভবত সে বিবাহিত। তৃতীয় একজন বলে, 'কত অল্প সময়ে ফয়সলা হ'য়ে গেল।'

"ঠিক তখনই মাচা থেকে একটি মুখ ঝুঁকে পড়ে জানতে চায়: 'ব্যাপার কি? যুদ্ধ-টুদ্ধ চলছে বুঝি?'

'এমন কিছু নয়,' উত্তরটা দিলাম আমি, 'মাত্র ডজনখানেক প্রুশিয়ানের একটা গতি করে ফেললাম।'

'বেচারি'—সে মন্তব্য করে। কিন্তু ঠাণ্ডায় বেশীক্ষণ মাথা তুলে রাখা সম্ভব না হওয়ায় মেয়েটি আবার শুয়ে পড়ে সৈনিকদের টুপি পাতা বিছানায়।

"আবার আমাদের পদযাত্রা। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত। অবশেষে আকাশে গোলাপী আভা দেখা যায়। ক্রমশ বরফের চাকচিক্য নজরে আসে, পূর্বাকাশে সেই ঔজ্জ্বল্যের উৎস।

"দূর থেকে চীৎকার শোনা যায়:

'আসছে কারা!'

"আমাদের দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। এবং আমি এগিয়ে গিয়ে সেণ্ট্রিকে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করি। আমরা 'ফরাসী লাইন'-এ পৌঁছে গেছি!

"কাঁধে বয়ে আনা মাচাটির দিকে নজর পড়তেই একজন উচ্চপদস্থ অশ্বারোহী ফরাসী জেনারেল আওয়াজ তুললেন:

'ওটার মধ্যে কি নিয়ে যাচ্ছো তোমরা?'

"প্রশ্নটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র মাচাটা ঈষৎ দুলে উঠলো; একমাথা এলোমেলো চুল সমেত একটি ছোট্ট খুশি খুশি মুখ মুহূর্তে সুরেলা গলায় বলে উঠলো:

'মঁসিয়ে, মাচার ওপর শুয়ে আমি।'

"সকলেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে। আমাদের মন অনাবিল আনন্দে ভরপুর।

"তখন স্লিম জিম, যে এতক্ষণ ধরে মাচাটার পাশে পাশেই ছিল, চীৎকার করে উঠলো:

'ফ্রান্সের জয় হোক!'

"কেন জানি না, ঐ ধ্বনিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। মনে হলো, সত্যি যেন আমরা আমাদের জন্মভূমিকে রক্ষা করেছি! এমন কিছু একটা করেছি, যা অপরে এখনো পারেনি। এমন কিছু একটা করেছি, যা সরল হলেও প্রকৃতই দেশাত্মবোধক।

"আমি তার ছোট্ট খুশি খুশি মুখখানার কথা কোন দিন ভুলব না। এবং আমাকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হতো, আমি প্রতিটি রেজিমেণ্টে যুদ্ধের উত্তেজক বাজনা ড্রাম ও বিউগলের বদলে একটি করে সুন্দরী যুবতীকে নিয়োগ করতাম। এর প্রতিক্রিয়া জাতীয় সংগীতের চেয়েও সক্রিয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেদিন সেই ভয়াল মুহূর্তগুলিতে কর্ণেল ও তাঁর দলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন জীবন্ত নিখুঁত ম্যাডেনা! তাই তো আমরা অনায়াসে অমন প্রতিকূলতাকে জয় করতে পেরেছি।"

একটু থেমে একমুখ বাতাস টেনে নিয়ে কর্ণেল তাঁর মাথা ঝাঁকালেন:

"হ্যাঁ, আমরা, ফরাসীরা নারীর মহান প্রেমিক।"

প্রত্যাবর্তন

The return

ছোট ছোট আশ্রিত জীব যেন সমুদ্রের ঢেউগুলি, সীমাহীন অনলস, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে ও ভূমিক্ষয় করে। উপরে নীলাকাশ বিশাল, যেখানে বায়ুতাড়িত খণ্ড খণ্ড মেঘ আশ্চর্য উড়ন্ত পাখির ঝাঁক বুঝি। উপত্যকাটা ঢালু হতে হতে একেবারে সমুদ্রগর্ভে; উপত্যকায় গড়ে ওঠা গ্রাম সূর্যের আলো গায়ে ঢুলুনি ঢুলছে। গ্রামে ঠিক ঢুকবার মুখে, রাস্তার ধারে মার্টিন-লেভাস্‌কিউসদের আবাস নির্জনতায় একক। জেলের পর্ণকুটির, মাটিলেপা দেওয়াল, খড়ের ছাউনী দিগন্তজোরা রামধনুর বাহারে ঝুঁটি হয়েছে যেন।

পকেটে গোঁজা রুমালের মতন বাড়ির সামনে এক চিলতে পরিস্ফীত বাগান, যেখানে থোকা থোকা পেঁয়াজকলি, ইতস্ততঃ বাঁধাকপি, বর্ণময় গুচ্ছ গুচ্ছ শাকসব্জি,—রাস্তার ধারে এমন একটি সবুজের হাট ঠিকরে সরে এসেছে, রাস্তার সঙ্গে এর ব্যবধান—দায়িত্বে একটা বুনো ঝাঁড়।

কর্তা গেছে মাছ ধরতে। কর্ত্রী বাড়ির সামনে মস্ত খয়েরী জালটার ফুটো-ফাটা মেরামতে মগ্ন! আর জালটা যেন অতিকায় মাকড়সা—চার পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে বেতের চেয়ারে বসে অনুরূপ কায়দায় শনের কাপড়-মেরামতিতে নিজের কারিকুরি দেখাচ্ছে, কাপড়ের ফুটোগুলো প্রায় বন্ধ হ'য়ে এসেছে।

এর চেয়ে বছর খানেকের ছোট আর একটি মেয়ে চালচলনে স্বাভাবিক চাপল্য, ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাই এখনো কথা বলতে বা হাঁটতে শেখেনি। আরো জনা দুই-তিন এই পরিবারের শিশু সদস্য স্বকীয় বন্দোবস্ত অনুযায়ী

মাটিতে মুখোমুখি খেলা করছে, নখ দাবিয়ে মাটি খুঁড়ছে এবং মাটির অন্দরমহল থেকে তুলে আনা মুঠো মুঠো ধূলো এনে অপরের মুখে ছুঁড়ে মারছে।

কিন্তু এরা অদ্ভুত নিঃশব্দ। শুধু শব্দ তুলছে ঐ শিশুটি। চাপা রুগ্ন স্বরের কান্না। চিক টাঙানো জানালার ওপর একটা বিড়াল কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে; খড়ের ছাউনীর ওপর এক ঝাঁক মৌমাছির মৌরব।

ছোট মেয়েটা পায়ে পায়ে বাড়ির সীমানা পার হতে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই আচমকা সে তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে ওঠে:

"মা গো!"

"কি হয়েছে রে?"—মা প্রশ্ন করে।

"ঐ লোকটা আবার এসেছে।"

সকাল থেকেই বিস্ময় ও অস্বস্তি। তক্তাপোশ ছেড়ে মাটিতে পা রাখলেই ভয়টা আরো বাড়ে। ঘটনাটা হলো, আজ সাতসকালেই একটা অপরিচিত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যে মানুষটা ইতিমধ্যেই বারকয়েক পাক খেয়েছে বাড়িটার চারপাশে। বুড়ো মানুষ, চেহারা আদৌ শাঁসালো নয়, বরং ভিখিরী-ভিখিরী। বাবাকে নৌকায় তুলে দিতে যাবার সময় এ বাড়ির ছেলে-মেয়েরা প্রথম দেখেছিল ওকে। ফিরবার পথে আবার দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা থর থর ভয়। বাড়ির দরজার বিপরীতে একটা গর্তের মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসেছিল সে। বসে বসে নিষ্পলকে চেয়েছিল এই বাড়ি, বাগান ও পাঁচিলের দিকে। কি যে দেখছিল অমন মশগুল হ'য়ে খোদায় মালুম, রুগ্ন দীন জবুথবু আকৃতি। একঘণ্টা যাবৎ নিদারুণ একাগ্রতায় সে নিথর। তারপর একসময় বোধ হয় তার খেয়াল হয়েছিল, ঐ বাড়ির লোকেরা সকলেই তার বেঢপ চেহারা ও হ্যাংলাপনা তাকিয়ে থাকাকে সন্দেহের চোখে দেখছে।

মনে হতেই সে উঠে দাঁড়িয়েছিল, খোঁড়া পা টানতে টানতে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে চেয়েছিল সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে—সেই অপসৃয়মান দেহ বীভৎস দুঃখের সাকার রূপ মাত্র।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙ্গা পা টানতে টানতে সে আবার ফিরে আসে। বাচ্চারা তখন নতুন করে খেলায় মেতেছে, গিন্নী জাল বোনার তোড়জোড় করছে। সে তার নির্বিচারে অত্যাচারিত দেহটাকে ত্রিভূজের আকারে ভেঙ্গে চুড়ে সেই গর্তের মধ্যে স্থাপিত করে এবং এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে থাকে, যেন এই ভিলা ও তার বাসিন্দাদের ওপর গোয়েন্দাগিরিই তার উদ্দেশ্য!

বাচ্চাদের বিস্ময়জনিত হট্টগোলে ওদের মা চমকে ওঠে, অস্বস্তিতে তার শরীর শির শির করে। স্বভাবে সে নম্র ও ভীরু—কোনরকম মানসিক চাপ সহ্য করতে পারে না। এই মুহূর্তে এক ধরনের অসহায়ত্ব তাকে অধিকার করে। তার স্বামী যে রাত আসবার আগে সমুদ্র থেকে ফিরছে না!

ঘটনা যতই তুচ্ছাতিতুচ্ছ হোক, এক ধরনের ভয়মিশ্রিত অধিরতা তাকে অধিকার করে।...শ্রীমতীর জীবনে একাধিকবার আঁধার ঘনিয়েছে, অল্পেতেই তাই সে অধীর হ'য়ে পড়ে।

বিয়ের আগে তার স্বামীর উপাধি ছিল লেভাসকিউস্ এবং তার নিজের উপাধি ছিল মার্টিন,—দু'য়ে মিলে বিয়ের পর তাদের পারিবারিক পরিচিতি দাঁড়ালো মার্টিন-লেভাসকিউস্। এর পিছনে আরো একটা ইতিহাস আছে, যা প্রকৃতই ভয়ানক। আদতে মার্টিনের এটা দ্বিতীয় বিয়ে। তার প্রথম স্বামী মঁসিয়ে মার্টিন ছিল সমর্থ সমুদ্র-মানুষ, দুনিয়াসুদ্ধ মৎস্য শিকারীদের মধ্যে তার পরিচিতি, প্রতি গ্রীষ্মে জাহাজে চেপে সে যেতো নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে কড মাছ শিকার করতে। দু'বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী তাকে উপহার দিয়েছিল ছোট্ট একটি মেয়ে এবং জঠরে ছ'মাসের অন্য একটি শিশু বেড়ে উঠবার কালেই ঘটলো সেই সর্বনাশ!

তার স্বামী পালতোলা পোত 'টু সিস্টারস্' দেইপি বন্দর থেকে সেই যে নোঙর তুললো, আর ফিরে এলো না।

সমুদ্রের তরফ থেকে এমন বিপর্যয় প্রায়শই স্বাভাবিক। 'টু সিস্টারস্' সম্পর্কে কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

এমন কি জাহাজের একজন নাবিকও ফিরে আসেনি। সলিল সমাধিই নিশ্চিত পরিণতি।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে মাদাম মার্টিন প্রতীক্ষা করেছিল তার স্বামীর জন্য। জীবন তখন আরো কঠিন, দারিদ্র্য নির্মম, ভাগ্যের কাছে কোন বখশিসই মেলেনি মার্টিনের, কোন রকমে বড় করে তুলেছিল তার সন্তান দুটিকে।

অতঃপর দশ বছর ব্যবধানেও যেহেতু সে সমর্থ যৌবনবতী সুন্দরী, স্থানীয় এক বিপত্নীক মৎস্যশিকারী লেভাসকিউস্, যার একটি ছেলেও বর্তমান, মাদাম মার্টিনকে বিয়ের প্রস্তাব করে। অপরের ফরমাস খাটতে খাটতে ক্লান্ত মার্টিন এক কথাতেই সম্মতি দেয়। তিন বছরের মধ্যে আরো দুটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সে এখন লেভাসকিউসের দায়িত্বসচেতন গৃহিণী।

নতুন করে সংসার নামক আখড়ায় প্রবেশ করেও স্বচ্ছলতার মুখ কিন্তু দেখতে পেল না মার্টিন। সেখানেও দারিদ্র্যের জটিলতা, প্রাণান্তকর পরিশ্রম। অভাবের মহিমায় রুটি তাদের কাছে অতি প্রিয় এবং মাংসের স্বাদ তো ভুলেই গেছে। দিন আনে দিন খায়, অন্য কিছুতেই মনোনিবেশের অবসর কোথায়? তদুপরি নিস্ফলা শীতে ও ঝড়-জলের মাসগুলিতে নিয়ম মাফিক তাদের সুদে টাকা ধার করতে হয়। তবু এমন দুঃসময়ে খরিদ আর খয়রাতির অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা সবিনয়ে সহনশীল এবং তাদের ক্রমশঃ বড় হ'য়ে ওঠা সন্তানরা যথার্থ বলিষ্ঠ, তাদের মধুর ব্যবহার প্রতিবেশীদের মুগ্ধ করে, জীবন-সংগ্রামের কঠিন ধাপগুলি যেন সতর্ক ভাবে অতিক্রম করে যাচ্ছে তারা; সে কারণেই প্রতিবেশীরা এই পরিবারটি সম্পর্কে বলে থাকে:

"চমৎকার মানসিকতা মার্টিন-লেভাসকিউস্ পরিবারের। মার্টিন গৃহিণী হিসেবে একটি পেরেকের মতন স্থির কঠিন; আর লেভাসকিউসের মতন দক্ষ জেলে সচরাচর দেখা যায় না।"

ছোট মেয়েটা দুঃসহ কৌতূহল ও উত্তেজনায় তার মাকে আরো জানায়:

"মা, লোকটা এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন আমাদের চেনে। মনে হচ্ছে, এপ্রিভিলা বা এজবক্সের কোন ভিখিরী হবে!"

কিন্তু তাদের মা ঠিকই বুঝতে পেরেছে, লোকটা স্থানীয় নয়। কোন স্থানীয় লোকের দৃষ্টি অমন অপার্থিব, ক্ষুধার্ত হবে কেন?

মাদাম উঠে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করে, লোকটার দৃষ্টি কেমন নিষ্পলক। মাদাম মার্টিনের পক্ষে আর মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব হলো না। আপাদ-মস্তক শিউরে ওঠে তার। অস্বস্তি ও ভয় তার স্বরকে সপ্তমে পৌঁছে দেয়: "তুমি কি জ্যান্ত মানুষ না কি হে? করছোটা কি?"

"বাতাস নিচ্ছি," ভাঙ্গা কর্কশ গলায় সে বলে, "আমি কি তোমাদের কোন ক্ষতি করেছি?"

"তুমি কি এই বাড়ির ওপর গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছো?"—তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করে মাদাম।

"আমি কারুর ক্ষতি করতে আসিনি," লোকটা বলে, "রাস্তার পাশে কি বসে থাকতে পারি না?"

এ প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পায় না মার্টিন; মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে, কুঁকড়ে যায় দেহ, টলমল করতে করতে ঘরে ফিরে যায়।

ক্রমে দিনের বয়স বাড়ে। দুপুরে লোকটার প্রবৃত্তিতে ঈষৎ পরিবর্তন দেখা গেল। জায়গাটা ছেড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল সে। অবিশ্যি মাথা গুঁজে বসে থাকবার গরজ নেই। এক চক্কর পাক খেয়েই চলে গেল, আর পাত্তা নেই সেই রাতে।

লেভাসকিউস্ ফিরে এলে জানানো হলো ঘটনাটা।

"নোংরা লোক-টোক হবে, দুর্ভাগ্যের হাত থেকে যাদের পরিত্রাণ নেই।"—লেভাসকিউস্ মন্তব্য করে।

রাতে দুর্ভাবনাহীন লেভাসকিউসের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হলো না। কিন্তু যত দুশ্চিন্তা ও দুঃস্বপ্ন মাদাম মার্টিনের,—একজোড়া পলকহীন চোখের অগ্নিশিখা তাকে যেন বিদ্ধ করছে!

পরদিন সকাল থেকেই ঝড়, দমকা বাতাসের শানিত আছাড়ি-পিছাড়ি। এই প্রবল প্রতিকূলতায় সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া অসম্ভব। লেভাসকিউস্ তাই আর সেই হাঙ্গামায় না গিয়ে বসে গেল তার স্ত্রীর সাহায্যে—দু'জনে মিলে মিশে জাল মেরামত করল।

সকাল ন'টায় মার্টিনের সবচেয়ে বড় মেয়েটি, যে রুটি আনতে বাইরে গিয়েছিল, ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসে। উত্তেজনায় প্রায় কণ্ঠরোধ, মুখ রক্তাভ, চোখে বিস্ময়, ঝপ্ ক'রে বসে পড়ে বলে, "মা, লোকটা—আবার এসেছে!"

মাদামের সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে; মুখ-চোখ বিবর্ণ, স্বামীকে বলে, "যাওনা, ওকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে বারণ করো! আমার আর ভালো বোধ হচ্ছে না।"

লালমুখো লেভাসকিউস্ উঠে দাঁড়ায়, তার চেহারা বিশাল, মাথার চুল লাল, চোখের রঙ নীল, সামুদ্রিক ঝড় ও বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেতে ঘাড় পর্যন্ত উলের জামা। সে শান্তভাবে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় লোকটার দিকে।

তারপর তাদের দু'জনকেই দেখা গেল আলোচনারত অবস্থায়। ব্যবধানে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের নিয়ে মাদাম মার্টিন স্বচক্ষে দেখছে যেন কোন রোমহর্ষক ঘটনা।

হঠাৎ অজানা লোকটা গর্ত ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, লেভাসকিউসের পিছন পিছন বাড়ির দিকেই আসতে থাকে। লোকটার বিবর্ণ ক্লিষ্ট মুখে যেন কোন দূরাগত আশা-আকাঙ্খার ছায়াপাত। ভয় ও উত্তেজনায় কেঁপে উঠছে মাদাম মার্টিন। কেন যে তার বুকে এমন ভূকম্পন শুরু হয়ে গেল এই মুহূর্তে!

অথচ তার স্বামী স্বাভাবিক মেজাজী দরাজ গলাতেই বলে, "শুনছো, একে সামান্য রুটি, আর এক মগ মদ এনে দাও। মানুষটা গত পরশু থেকে অভুক্ত রয়েছে।"

বলতে বলতে দু'জনে ছাউনীর ভিতরে ঢোকে। পিছন পিছন বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে মার্টিন। খাবারের থালার সামনে বসে পড়ে লোকটা, ধীরে ধীরে রুটিতে কামড় লাগায়। সপরিবারে লেভাসকিউস্ দেখছে ওর ভোজনতৃপ্তি। কিন্তু লোকটার মাথা সব সময়ই হেঁট হ'য়ে আছে, মুখের ভগ্নাংশ মাত্র দেখা যায়।

মাদাম মার্টিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার দুই বড় মেয়ের চোখেও যৎপরোনাস্তি বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা।

লেভাসকিউস্ ওর সামনে আসন নেয়, জিজ্ঞেস করে:

"তা হলে, অনেক দূর থেকে আসছেন?"

"কিট থেকে।"

"এ ভাবে পায়ে হেঁটে?"

"হ্যাঁ।"

"মর্মান্তিক।"

"আপনার যদি টাকা না থাকে, আপনি তো হেঁটে আসতেই বাধ্য।"

"যাচ্ছিলেন কোথায়?"

"এখানেই।"

"পরিচিত কেউ আছে নাকি এখানে?"

"বোধহয়।"

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ তারা।

লোকটি খুব আস্তে আস্তে রুটি চিবুচ্ছে; ক্ষুধার্ত হলেও তাড়া নেই, অবশ্য মাঝে মাঝেই একমুখ রুটি সহ মদের গেলাসে চুমুক লাগাচ্ছে সে। শিরাময় বলিরেখাঅঙ্কিত

তার প্রাচীন মুখে একাধিক ক্ষতচিহ্ন, সাড়া-শব্দহীন এই ঘরে তার শ্বাসকষ্টের চাপা আওয়াজ স্পষ্ট অনুভূত।

লেভাসকিউস্ আচমকা জিজ্ঞেস করে বসে:

"কি নাম আপনার?"

মাথা না তুলেই সে জবাব দেয়:

"আমার নাম মঁসিয়ে মার্টিন।"

চকিতে এক প্রহেলিকাময় ভাবান্তর প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় মাদাম মার্টিনকে। বিস্ময়ের দমকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে আসে সে, ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করে ঐ আশ্রয়হীন হতভাগ্যকে, তার হাত দুটো ঝুলে পড়ে, মুখ হা হ'য়ে যায়।

কারুর মুখে কোন কথা নেই।

আবার লেভাসকিউস্ মুখ খোলে:

"তার মানে, আপনি—এখানকার মানুষ?"

"হ্যাঁ, এখানকারই।"

এবার লোকটা মুখ তুললো। মুখ তুলে দেখলো মাদামকে এবং তার সন্তানদের।

হঠাৎ মাদামের স্বরভঙ্গ ঘটে, প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে সে:

"তুমি—তুমি—আমার সেই স্বামী?"

"হ্যাঁ, আমিই তোমার প্রথমজন।"—ধীর গলায় উত্তর আসে। এতটুকু উত্তেজনা নেই তার, তখনো রুটি চিবুচ্ছে।

লেভাসকিউস্, উত্তেজনার চেয়ে বিস্ময় যার বেশী, বলে:

"আপনি তবে সেই নাবিক মার্টিন!"

"হ্যাঁ, আমিই!"

"কি করে এবং কোথা থেকে এলেন?"—দ্বিতীয় স্বামী বিস্তৃত জানতে চায়।

সে তার গল্প শোনাতে আরম্ভ করে:

"আফ্রিকার উপকূল। আমাদের জাহাজ আছড়ে পড়লো এক প্রবাল প্রাচীরের ওপর। অলৌকিকভাবে প্রাণে বাঁচলাম আমরা মোটে তিনজন—পিকার্ড, ভাতিনেল এবং আমি। প্রাণে বাঁচলেও ভয়ের কালো ছায়াটা আমাদের ছাড়লো না। মনোবল ফিরে পাবার আগেই কয়েদ হলাম একদল বুনো অধিবাসীর হাতে। বারোটা বছর ওরা আমাদের আটকে রেখেছিল। ত্রিসীমানায় উদ্ধার পাবার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাইনি। পিকার্ড ও ভাতিনেল তো মারাই গেল। তারপর এক ইংরেজ পর্যটক আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে কিটে। কিট থেকে পায়ে হেঁটে সোজা এখানে।"

কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে মাদাম মার্টিন।

"কি এখন আমাদের করণীয়?"

—কপাল কুঁচকে প্রশ্নটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দেয় লেভাসকিউস্!

"আপনি নিশ্চয় ওর স্বামী?"

—নাবিক মার্টিন জানতে চায়।

"হ্যাঁ, আমি ওর বর্তমান স্বামী।"

লেভাসকিউস্ জবাব দেয়।

দু'টি পুরুষ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নাবিক মার্টিন আড়চোখে একবার মাদামকে দেখে নিয়ে চারধারে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। তার দৃষ্টি এসে স্থির হয় বড় দুই মেয়ের মুখের ওপর; সে জানতে চায়:

"এরা দু'জনই কি আমার?"

"হ্যাঁ, ওরা আপনার।"

—লেভাসকিউস্ মাথা নেড়ে সায় দেয়।

সে কিন্তু উঠে দাঁড়ায় না; বা ওদের চুম্বন করতে এগিয়ে যায় না; কেবল উচ্চারণ করে:

"ঈশ্বর! এরা কত বড় হয়ে গেছে!"

"কি এখন আমাদের করণীয়?"

—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লেভাসকিউস্ আর একবার বললো কথাটা।

এ প্রশ্নের জবাব নাবিক মার্টিনেরও জানা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার সিদ্ধান্ত জানায়।

"আপনি যা বলবেন, তাই হবে। আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। কিন্তু এই বাড়িটার কথা ভাবতে গেলেই মনটা আমার কঠিন হ'য়ে ওঠে। আমার ঔরসজাত দুটি সন্তান রয়েছে, আপনার রয়েছে তিনটি। ওদের মা অতঃপর কার কাছে থাকবে, সেটা আপনিই স্থির করুন। কিন্তু এ বাড়িটা—এটা সম্পূর্ণ আমার! আমার বাবা এটি আমাকে দিয়ে গিয়েছেন। আমি এখানেই জন্মেছিলাম। আমার অধিকার সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ।"

মাদাম মার্টিন তখনো কাঁদছে। চোখের জলে ভাসছে তার বুক, জামা-কাপড়। আর বড় দুই মেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছে মায়ের, অস্বস্তিভরা দৃষ্টিতে দেখছে তাদের জনককে।

তার ভোজনপর্ব সমাপ্ত। এবার সে পাল্টা প্রশ্ন করে:

"এখন আমাদের কি করণীয়?"

লেভাসকিউস্ উপায় বাৎলায়:

"আমাদের উচিৎ কোন পুরোহিতের কাছে যাওয়া। তিনিই সিদ্ধান্ত দেবেন।"

নাবিক মার্টিন উঠে দাঁড়ায়, স্ত্রী কাছে যেতেই মাদাম তার বুকের ওপর ভেঙ্গে পড়ে:

"তুমি—সেই তুমি এলে! আমার মার্টিন, আমার সেই তুমি প্রিয়!" মাদাম তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে। এই মুহূর্তে তার মন অতীতের সুখস্মৃতিতে অবগাহন করে। মনে পড়ে, অতীতের প্রেম-প্রীতি, প্রথম চুম্বনের সলজ্জ উষ্ণতা!

আবেগে আপ্লুত মঁসিয়ে মার্টিনও। দীর্ঘ বিরহের পর স্ত্রীর টুপিতে ঘন ঘন চুমু খেতে থাকে। ঐ দিশেহারা দৃশ্য দেখে বাচ্চারা কেঁদে ওঠে। বিশেষ করে কনিষ্ঠতম শিশুটি চীৎকার শুরু করে দেয়।

লেভাসকিউস্ তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আসুন, আমরা ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিই।"

নাবিক মার্টিন তার স্ত্রীর কাছে থেকে সরে আসে, তাকায় নিজের মেয়ে দুটির দিকে। তাদের মা বলে, "বাবাকে চুমু খাও।"

হতবাক মেয়ে দুটি ভয়ে ভয়ে এসে একের পর এক তাদের অপরিচিত জনকে চুম্বন করে।

তারপর দুই কর্তা একসঙ্গে বেরিয়ে আসে বাড়ির বাইরে।

তারা গিয়ে দাঁড়ায় একটা কাফের সামনে। লেভাসকিউস্ জিজ্ঞেস করে, "একটু পান করবেন?"

"অল্পস্বল্পে আপত্তি নেই।"—মার্টিন বলে।

দু'জনে গিয়ে কাফের একটা টেবিলের সামনে বসে। ঘরটা এখনো শূন্য। লেভাসকিউস্ চড়া গলায় ঘোষণা করে:

"ওহে চিকট, এদিকে একবার এসো। দু'বোতল ব্র্যাণ্ডি চাই। সেরা জিনিস হওয়া চাই!...ইনি হলেন মার্টিন, ফিরে এসেছেন। মার্টিন গো, আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামী। সেই যে 'টু সিসটারস্' জাহাজ ডুবে গিয়েছিল, নাবিক মার্টিন!"

বার-ম্যান মদের গেলাস হাতে টেবিলের কাছে আসে। লাল-মুখ, ঘটির মত পেট, লোকটা শান্তস্বরে বলে: "আশ্চর্য! আপনি সেই মার্টিন!"

মার্টিন জবাব দিলো:

"হ্যাঁ, আমিই সে-ই!"

স্রোতের বিরুদ্ধে

Against the Tide

তরঙ্গহীন ঝলমলে সমুদ্র, অবিশ্যি মৃদু বাতাস একটু বইছে এবং সমুদ্রের গভীর প্রশান্তিতে ঈষৎ হিল্লোল। হ্যাভয় শহরের যত লোক, সকলেই যেন সমবেত জাহাজঘাটায়, অধিকাংশের দৃষ্টি নোঙরপাতা জাহাজগুলির দিকে, অনেকে আবার জাহাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যান্ত্রিক কলাকৌশল দেখছে।

দূরে অনেকগুলি জাহাজ, ক্রম আগুয়ান। ওদের মধ্যে কিছু কিছু স্টিমার, যাদের স্নায়বিক চাঞ্চল্য অনেক বেশী—গলগলিয়ে ধোঁয়া আকাশকে অন্ধকার করছে। কিছু

আবার গাধাবোট, অদৃশ্য দড়ির বাঁধনে ভাসছে, তাদের ন্যাড়া মাস্তুল চেয়ে আছে আকাশের দিকে নিস্পলক চোখে।

আবছা দিগন্তের মোহ ছেড়ে এই সব জলযানগুলি জেটিতে আশ্রয় পেতে উন্মুখ। আর সংকীর্ণ মুখগহ্বরবিশিষ্ট জেটি অনায়াসে তাদের চালান দিচ্ছে নিরাপদ উদরে। ধরাছোঁয়া দেবার পূর্বলগ্নে প্রতিটি জলযানের তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ সমুদ্রের সুপ্রশস্ত হৃদয় কাঁপিয়ে তোলে। শব্দ ওঠে হুস্ হাস্ ফুস্ ফাস্—ঝলকে ঝলকে বাষ্পের গোলা ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে। মনে হয়, যেন কতকগুলি শ্বাসরুদ্ধ পশুর বেপরোয়া মানসিকতা ঐ সব জলযানের—সম্পূর্ণভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বার আগে বাঁচবার আপ্রাণ প্রয়াস।

জাহাজ ঘাটে যাত্রী সাধারণের ওঠা-নামার ঢালুপথে অসাধারণ ভিড়। যে জাহাজটি আবার পুনর্জীবন লাভ করতে চলেছে, তার পাটাতনে কালো মাথায় গিজগিজ, ফুলে ফলে ভরা ভাসন্ত বাগান যেন একটি।

সবশুদ্ধ কত লোক যে চলেছে, আন্দাজে বলা মুশকিল ; তবে ওদের মধ্যে অমায়িক নমস্কার বিনিময় করতে করতে এগিয়ে চলেছে যে দু'জন তরুণ অফিসার, তাদের সহজেই সনাক্ত করা যায়। পরিচিত জনের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ লাভের ক্ষণে কখনো কখনো সৌজন্যতায় তারা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথাও বলে নিচ্ছে।

দু'জনের মধ্যে যে দীর্ঘতর, তার নাম পল দ্য আঁরিকল। হঠাৎ পল তার বন্ধু জাঁ রেনলদির হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সংশয়হীন চাপা স্বরে বললো, "আরে দোস্ত, একটুখানি ঐ মাদাম পয়কতের দিকে চোখ ফেরাও। ভদ্রমহিলা যে ভাবে বারবার তোমাকে দেখছেন।" সাকরেদের কথায় চকিতে দৃষ্টি ঘোরায় জাঁ রেনলদি।

হ্যাঁ, মাদাম তার গুম্ মেরে থাকা স্বামীর হাত ধরে পথ পার হচ্ছে। বয়স যথেষ্ট হয়েছে,—চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু এ বয়সেও আশ্চর্য হবার মতো শারীরিক বাঁধুনি ও সৌন্দর্য তার রয়েছে। একটু যেন কমনীয়তা হ্রাস পেয়েছে, দেহের কোন কোন অংশ যেন ঈষৎ শক্ত অনড়। তবু ঐ আকর্ষক দেহ দেখলে নিজের দৃষ্টিকে সামলে রাখা দুঃসাধ্য ; বিশ বছর বয়সী তন্বীর ব্যাকুল যৌবন এখনো যেন ওর সর্বাঙ্গে, কামনার ঘোর সহজেই লাগে। গভীর কালো টানা টানা চোখ, চাল-চলনে পুরোদমে অহমিকা, নিজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের গুণে বন্ধু মহলে সে দেবী হিসেবে মাননীয়া, অহেতুক কারুর মগজ বিগড়ে দেবার মতো কাজ সে করে না। তার কোন নিন্দুক নেই, স্তুতি করবার জন্য অসংখ্য,—এমন মনোরম চরিত্রের নারী নাকি বিরল। সৎ ধার্মিক অবিকৃত নির্মল চরিত্র। এ রকম একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে প্রেম ও কামনার কথা স্বপ্নে ভাবাও অনেক মেহনতের ব্যাপার। তবু গত একমাস ধরে পল দ্য আঁরিকল বলে বলে তার বন্ধুর কানকে প্রায় অবসন্ন ক'রে তুলেছে,—মাদাম পয়কত নাকি রেনলদির প্রেমে পড়েছে এবং ওর সত্যতা সম্পর্কে সে নিশ্চিত, নিরুদ্বেগ!

"কোন নারী-চরিত্র সম্পর্কে আমার ধারণা ষোল আনা নির্ভুল। দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, সে তোমায় সাংঘাতিকভাবে ভালোবাসে। তোমার প্রেমে রীতিমত খাবি খাচ্ছে।

আমার বক্তব্য পরে মিলিয়ে নিও। তোমার প্রতি তীব্র আকর্ষণে বেচারির বাস্তব অবাস্তব খেয়াল অব্দি নেই, ঠিক প্রথম বয়সের অনভিজ্ঞা কুমারীরা কামনার তাড়নায়, যেমনটি অস্থির হ'য়ে ওঠে। আসলে কি জানো, মেয়েদের পক্ষে এই চল্লিশ বছর বয়সটা বড় মারাত্মক, তথাকথিত সতী সাধ্বীদের পক্ষেও এ সময় নির্বিকার পদস্খলন খুবই সম্ভব। এই একটা বয়স, যখন নারীরা অসাবধানী হয়, কাম বাড়ে, বয়সজনিত আশঙ্কায় বিচলিত বোধ করে, লুকিয়ে-চুরিয়ে এমন সমস্ত অপরাধে প্রবৃত্ত হয়, যা কল্পনাতীত। কামনা-বাসনা তখন তুঙ্গে, শরাহত পাখির মতোই নিম্নগামী। এই মেয়ে মানুষটির বর্তমান অবস্থা ঠিক তাই এবং ওর নজর এসে পড়েছে তোমার ওপর। দুটি হাতের পেষণে নিজেকে পিষে ফেলতে চায়। এমন কাম যতক্ষণ না তৃপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ ওর মগজ স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে না। শান্ত মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে, হিসেবে গরমিল হয়।...তাই বলছি, ওর দিকে একটু দৃষ্টি ফেরাও।"

বন্ধুর ওকালতিতে দৃষ্টি ফেরাতেই হলো।

সুগঠিত দীর্ঘাঙ্গী, আগে আগে চলেছে তার দুই মেয়ে—একজনের বয়স বারো, অন্যজন পনেরো। হঠাৎ চোখাচোখি হতেই মহিলার মুখ বিবর্ণ আকার ধারণ করে; যাবতীয় নির্লিপ্ততা উবে গিয়ে ভেসে ওঠে একধরনের চাঞ্চল্য। দৃষ্টি আর নামিয়ে নিতে পারছে না। কামনা-রূপ বিষের হুলকায় চিত্রার্পিত। স্বামী এবং কন্যাদ্বয় যে ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে, সেদিকেও খেয়াল নেই। এ এক বিদঘুটে মানসিক অবস্থা।

যুবক দুটি নমস্কার করে। প্রত্যুত্তর দেবার ক্ষমতাও যেন ঐ নারী হারিয়ে ফেলেছে। দু' চোখের ঐ দিশেহারা ভাব দেখে তৎক্ষণাৎ বন্ধুর কথায় প্রত্যয় খুঁজে পায় রেনলদি। কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার তার বন্ধু বলে, "কি, এবার দেখলে তো?...ঈশ্বর, মেয়েটি সুন্দরী বটে!"

কিন্তু জাঁ রেনলদি একটি অন্য ধাতুর মানুষ। জবরদস্ত নীতিসিদ্ধ। অবৈধ গোপন প্রণয়ে তার অনীহা। প্রেম-ট্রেমকে সে কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। তবে হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু আমোদ আহ্লাদ, নাটকীয় স্ফূর্তিতে মেতে উঠতে কোন যুবক বা একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে ভালোবাসে? আদতে রেনলদি ঝামেলা পছন্দ করে না। শিক্ষিতা মেয়েরাও যখন চাপা আওয়াজে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, অতিরিক্ত কমনীয়তা প্রদর্শন করে, নানা রকম ফষ্টিনষ্টির মাধ্যমে নিজের যৌনজ পরোয়ানা জারি করে, জাঁ রেনলদি তখন বিরক্ত হয়, অস্বস্তি বোধ করে। দুঃসাহসিক প্রেমে তার বড় ভয়—এই বুঝি জীবনের সুখ, শান্তি, সম্মান ভেস্তে গেল। তার ধারণা, ভালোবাসার নামে এ একজাতের মতলব হাসিল করা, এবং এর সামিল হওয়া মানেই ফাঁদে পা দেওয়া। বৃহৎ না হোক, ক্ষুদ্র কোন না কোন বন্ধন এসে হাজির হবেই, তার শক্তি ক্ষয় পাবে, খুব অল্প দিনের মধ্যেই সে কাবু হ'য়ে পড়বে। সে তাই যুক্তি দেখায়, "এক মাস যেতেই দেখতে পাবো, কত রকমের বাঁধন এসে আমাকে জড়িয়ে ফেলছে! তখন শত বিচলিত হলেও মুক্তির উপায় থাকবে না, বিনয় ও ধৈর্যের সঙ্গে আরো মাস ছয়েক প্রতীক্ষা করতে হবে।"

ঐ অবস্থায় সর্বনাশের কারণ বুঝতে পেরেও নারীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ সে ত্যাগ করতে পারবে না, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অহরহ উত্তেজিত হবে, নিজের অন্তিম সম্বল খুইয়ে বসবে।...

এমত পর্যালোচনা করে জাঁ রেনলদি মাদাম পয়কতের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকে। সে কখন কোথায় থাকে, তার কোন হদিস ঐ পরস্ত্রীকে দিতে চায় না।

কিন্তু এক সন্ধ্যায় এক পার্টিতে ডিনার টেবিলে বসে হঠাৎ সে আবিষ্কার করে ফেললো, মাদাম পয়কত ঠিক তার পাশের চেয়ারটিতে বসে আছে। ঘুণাক্ষরেও এই বিপর্যয়ের পূর্বাভাষ টের পায়নি রেনলদি। অথচ এখন সে ক্রমশই শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। সুন্দরী স্বল্প ব্যবধানে বসে তাকে দেখছে। কখন যে দু'জন দু'জনের হাত চেপে ধরেছে, রেনলদির তা খেয়ালও নেই। শুধু প্রবল আচ্ছন্নতায় শরীর গরম হ'য়ে ওঠে এবং সে মাদামের করতল সমানে টিপতে থাকে। সেই থেকে যাবতীয় ভয় বিভীষিকাকে একপাশে সরিয়ে রেখে শুরু হলো তার নতুন অভিজ্ঞতা লাভ—পরকীয়া প্রেম!

তবে এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে রেনলদি মনের দিক থেকে কখনোই সায় পায় না। অনেকটা যেন দৈবনির্দিষ্ট পথেই তাদের মিলন, সাক্ষাৎ, মজলিশ। মহিলার ভালোবাসায় কোন খাদ নেই, কামনা অতি উষ্ণ! রেনলদি তাকে করুণা করতে শুরু করে—ওর অতিরিক্ত ও দুর্বোধ্য প্রেম নিবেদনের প্রত্যুত্তর সে দিতে থাকে! ঘটনাটা সে গ্রহণ করলো নিছক ভাবাবেগ হিসেবে, তার ব্যক্তিগত অনুরাগ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

কোথায় দেখা হবে এবং মিলন ঘটবে, সেই সমস্ত স্থান মাদাম পয়কতই ঠিক করে রাখতো। গোপনে দেখা হওয়া মাত্র সোৎসাহে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে রেনলদির ওপর, তখন প্রেমের অভিনয় করা ছাড়া সামরিক অফিসারটির উপায় থাকে না।

দেখতে দেখতে দু'মাস অতীত হ'য়ে গেল।

দু'মাস ধরে নারীর সোহাগ চুটিয়ে উপভোগ করলো রেনলদি। কামতপ্ত অভিজ্ঞ নারীর সম্ভোগে যে আনন্দ, তা সে পূর্ণভাবে পেলো। আর মাদামও তাকে পাকড়িয়েছে পাকা ঘুঁটি হিসেবে—যেন এই ব্যাপারটা চিরদিনই বজায় থাকবে! দাহকালে মানুষের যেমন যথাসর্বস্ব আগুন গ্রাস করে, উৎকট কামনার তাগিদে মাদামও তেমনি তার যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে বসেছে। দেহ-মন যশ-মান, ইহকাল-পরকাল—সব যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে! এই বিপুল সমর্পণ দেখে স্বয়ং রেনলদি বিমূঢ়, বিস্মিত। একসময় তার নিজেরই ক্লান্তি আসে, ঈষৎ বিরক্তিও। মগজে আত্মাভিমান ঘুরপাক খায়—আমার মতন একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ অফিসারের উচিত হয়নি ঐ বয়স্কা পরস্ত্রী নিয়ে মাতামাতি করাটা। ওকে প্রথম থেকেই পাত্তা না দেওয়াটা উচিত ছিল। ভাবতে গিয়ে মন বিষিয়ে ওঠে, নিজের জন্য অনুতাপ হয়। কিন্তু উপায় নেই, নারীর অতুলনীয় সোহাগের কাছে সে একরকম বন্দী, এখন আর পিছপা হবার সামর্থ্যও নেই। বড় বেয়াড়া এই সম্পর্ক! অবৈধ প্রেমের বাঁধন অনেক জটিল ও কঠিন। অনিচ্ছুক রেনলদি

শুনতে পায়, মাদাম যেন তাকে বলছে: "তোমাকে তো আমি আমার যথাসর্বস্ব দিয়েছি। বল, আর তুমি কি চাও?"

"আমি তোমার কাছে কিছুই চাইনি। না চাইতেই যা দিয়েছো, সব ফিরিয়ে নাও।"

প্রতিটি সন্ধ্যায় মাদামের স্বৈরিণী আবির্ভাব অনিবার্য। আর তার প্রেমের খিদ্‌মদ্‌গার হ'য়ে মুখ বুজে সহ্য করতে হয় রেনলদির। মাদাম বেপরোয়া, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; এই কল্লোলিত শহরে চূড়ান্ত হতে পারে, সে সম্পর্কে বিলকুল উদাসীন। কামনার জোরালো দাবীর কাছে পারিবারিক বন্ধনও ম্লান হ'য়ে গেছে। প্রেমাস্পদের সামনে দাঁড়িয়ে সে দিশাহারা—রেনলদির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রাণপণে তাকে নিজের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রাখে, অজস্র চুম্বনের ঘোরালো পরিস্থিতিতে মাদামের গভীরতায় আস্তে আস্তে ডুব দেয় রেনলদি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সম্বিত ফিরে পেয়ে রিঁ রিঁ ক'রে ওঠে রেনলদির সর্বাঙ্গ। ক্লান্ত অবশ স্বরে সে তখন বলে, "তুমি বড় অবুঝ হ'য়ে পড়ছো।"

জবাবে সে বলে, "আমি যে তোমায় ভালোবাসি।"

বলেই আবেগের বশে সে রেনলদির পায়ের কাছে বসে পড়ে, তন্ময় হয়ে প্রেমিকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে বহুক্ষণ। ঐ দৃষ্টির একাগ্রতা রেনলদি ঠিক সহ্য করতে পারে না, ওকে তোলার চেষ্টা করে, "উঠে বসো। এসো পাশাপাশি বসে কথা বলি।"

কিন্তু সে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, "না আমাকে বসে থাকতে দাও।"

তপস্যাসফল কোন ঋষির আত্মা যেন সে যোগাড় করেছে। একভাবে সমাহিত থাকে বহুক্ষণ।

রেনলদি তার বন্ধু পল দ্য আঁরিকলকে বললো......"এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। আমার বদ্ধমূল ধারণা, ওকে খুন না করলে নিস্তার নেই। দিনের পর দিন অমন বিগলিত সোহাগ পেয়ে পেয়ে ঘেন্না ধরে গেল। আমি এর এখনই পরিসমাপ্তি চাই। কি করি বলো?"

বন্ধু জবাব দিলো, "সম্পর্ক ছিন্ন করো।"

"তুমি তো বেশ দরাজ গলায় বিধানটি দিয়ে দিলে! নিশ্চয় ভাবছো, খুব সহজ কাজ। যে মেয়ের যত্নে এতো অত্যাচার, ভালোবেসে যে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে, তাকে এড়িয়ে যাবার সংকল্প নেওয়া কি সম্ভব?"

হঠাৎ এই সময় উপর মহল থেকে রেনলদির বদলির হুকুম চলে এলো। তার মন আনন্দে উদ্বেলিত—মাদামের হাত থেকে রেহাই পাবার এই সুবর্ণ সুযোগ! এর জন্য রূঢ় হতে হলো না, অভিমানের ঝড়ও তুলতে হলো না, তল্লাসি করতে হলো না কোন অপ্রীতিকর তিক্ততার। এখন শুধু দু'টি মাস আত্মস্থভাবে অপেক্ষা করা। তারপর মুক্তি—সেই পূর্বেকার বন্ধনহীন টান টান নির্বিরোধ জীবন।

সেই সন্ধ্যাতেই কিন্তু মাদাম পয়কত ছুটে এলো। দুঃসংবাদ চাপা থাকেনি। মন দারুণ চঞ্চল। মাথা থেকে টুপি না খুলেই ঘাড় টান রেখে একদৃষ্টিতে রেনলদি মুখের দিকে চেয়ে থাকে, বিশেষ কোন বিশেষণ না টেনেই তার কঠিন বক্তব্য শুরু হয়:

"আমি খবর ঠিকই পেয়েছি, তুমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছো। স্বভাবতই আঘাতটা খুবই মর্মান্তিকভাবে বিঁধেছিল আমাকে। নানান সম্ভাবনাও উঁকি ঝুঁকি মারছিল মনে। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ধাতস্থ হয়েছি —আমি আমার লক্ষ্যে স্থির। মনে কোন দ্বিধা নেই, ভয় নেই, পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য। প্রেমের জন্য একটি মেয়ে যতদূর যেতে পারে, আমি ততদূরই যাবো। সাধারণ অবস্থায় আমি চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবো। তোমার সঙ্গে পালাবো। সমস্ত রকম ধিক্কার—ধ্বনি উপেক্ষা ক'রে তোমার হাত ধরে হারিয়ে যাবো। পড়ে থাক পিছনে আমার স্বামী, এতদিনকার সংসার, সন্তান। হয়তো অলক্ষিতে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলছি। তবু এতেই আমার সুখ। তুমি করুণাময়, আমায় গ্রহণ করো, নতুন ক'রে অশেষ আনন্দে তোমার জীবন আমি ভরিয়ে তুলবো। জীবন পরিক্রমায় নারী যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দিতে পারে, তুমি তাই পাবে। তোমার অন্তর থেকে সমস্ত সংশয় অন্তর্হিত হোক। এই আমি চিরদিন তোমার।"

লাবণ্যময়ীর বক্তব্য শুনে কেঁপে ওঠে রেনলদি, তার মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা শীতল স্রোত নামছে! এতক্ষণের পরিপাটি পরিকল্পনা এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে। দারুণ ক্ষোভ আর জেদ তার স্নায়ুগুলিকে যুগপৎ অবসন্ন ও উত্তেজিত ক'রে তুলছে। তবু সে ধৈর্যচ্যুত হয় না, বুক টান করে মুখে মোলায়েম হাসি টেনে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে মাদামকে, ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে,—অনন্তকাল ধরে এ সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। এই নির্ভর-নির্ভর আবেগ এক ধরনের বাতিকমাত্র।

মাদাম পয়কত রেনলদির যুক্তিগুলি চুপচাপ শুনতে থাকে। কিন্তু তার মুখ দেখলে বোঝা যায়, এ সব কথার সে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

রেনলদির বলা শেষ হলে মাদাম শুধু বললো, "তুমি কি এতখানি কাপুরুষ হতে পারবে? তুমি কি সেই সবদেরই একজন, যারা মেয়েদের নানাভাবে পটিয়ে এনে ভোগ করে তারপর একদিন ছুঁড়ে ফেলে দেয়?"

পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে রেনলদি আরো কিছুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করলো মাদামকে। ঝোঁকের বশে তারা যা করতে যাচ্ছে, তার পরিণতি ভয়ংকর, সুখকর তো নয়ই। এ সম্পর্ক চিরদিন জগদ্দল পাথর হ'য়ে বসে থাকবে দু'জনেরই বুকের ওপর। দুনিয়ার যেখানেই তারা মোতায়েন হোক না কেন, সামাজিক সম্মান তারা পাবে না। একটা কুৎসিত ইতিকথার নায়ক-নায়িকা হ'য়ে বেঁচে থাকতে হবে। হেয় করবে সকলে। আগামী দিনগুলিতে কোন সুখ তারা অবলোকন করতে পারবে না।

কিন্তু মাদামের সেই নির্বিকল্প জবাব, "ভালোবাসার কাছে ও সমস্তই মূল্যহীন! প্রেমে আবদ্ধ নর-নারী সামাজিক বিধি-নিষেধের ভয়ে তটস্থ থাকে না।"

তার জোরালো যুক্তিগুলিকে এভাবে উড়িয়ে দিচ্ছে দেখে রেনলদির এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, "ওসব কথা বাদ দাও। আমি কিছুতেই তোমাকে নিয়ে সরে পড়তে পারবো না। কিছুতেই না! তুমি যাতে ঝোঁকের বশে নিজের সর্বনাশ না করে বসো, সেটা দেখাও আমার কর্তব্য।"

রেনলদির কথা শুনে মাদাম এই প্রথম চমৎকৃত। কিন্তু তার বেজার মুখ আরো বিষণ্ণ হবার আগে রেনলদি তার স্বরে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বিতৃষ্ণাকে আর চেপে রাখতে পারে না, আচমকা ফুঁসে ওঠে, "না, তোমার কি হলো না হলো, তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমার কোনদিনই ইচ্ছে ছিল না তোমাকে নিয়ে নাচানাচি করবার। তুমিই তোমার একতরফা কামনার ভয়াবহতা নিয়ে আমার ওপর এসে ভর করতে। এখন বাপু দয়া করে সরে পড়ো। তোমার কুঅভিসন্ধির ফাঁদে আমাকে আর জড়াবার চেষ্টা করো না।"

মাদাম নিঃশব্দ। মাথা হেঁট করে মাটির বুকে কি যেন নিরীক্ষণ করছে। অকথ্য যন্ত্রণার প্রতিফলন তার মুখাবয়বে, মুখের ও কপালের শিরাগুলি দপ্ দপ্ করছে, স্নায়ু ও মাংসপেশীর অব্যক্ত জ্বালায় সে যেন এখন নিজের জীবনকেই নস্যাৎ ক'রে ফেলতে পারে।

কোন রকমে সে উঠে দাঁড়ায়, প্রথাসিদ্ধ বিদায় না জানিয়ে হারিয়ে যায়।

সে রাতেই মাদাম পয়কত বিষ খেলো।

সাতদিন ধরে চললো যমে-মানুষে টানাটানি। এই আশ্চর্য ঘটনাটা তখন জানাজানিও হয়ে গেছে শহরবাসীদের মধ্যে। সকলের আলোচনার পাত্রী মাদাম পয়কত। কিন্তু কেউ তাকে নিন্দা করছে না ; বরং প্রেমের কারণে তার যে এই আত্মত্যাগ, গণ-মানসে সেটাই জ্বল জ্বল করছে। সকলেরই বক্তব্য, যে মেয়ে ভালোবাসার জন্য আত্মহত্যায় উদ্যোগী হতে পারে, সে আর যাই হোক, উচ্ছৃঙ্খল নয়। মন তার মণি-মুক্তার খনি, জঞ্জালের পাহাড় নয়।

লোকের যত বিরক্তি ও ঘৃণা লেফ্টেন্যাণ্ট রেনলদির ওপর,—লোকটার এত ছোট মন যে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর মাদাম পয়কতকে একবার দেখতে পর্যন্ত গেল না। সকলেই ছি-ছি করছে।

ক্রমশ রটে গেল, রেনলদি লোকটা নির্ঘাৎ অসৎ চরিত্রের, ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েদের সর্বনাশ করে, প্রতারণা করে, মধু খাবার পর সেই ফুলের আর মর্যাদা দেয় না।

উপরওয়ালা অফিসার কর্ণেলও রেনলদিকে অনুরোধ করলেন, ভদ্রমহিলার প্রতি সহানুভূতিস্পন্ন হতে। অবিকল ঐ একই উপদেশ দিলো বন্ধুবর পল, "ক্ষতি যদি হয়ও, তবু তুমি ওকে গ্রহণ করো রেনলদি। একটা মেয়ে এভাবে মারা যাবে, ভাবতে কেমন যেন খারাপ লাগে। তুমি নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারোনা। এ একটা জঘন্য লজ্জার ব্যাপার। খুব অন্যায় হবে, খুব অন্যায় হবে।"

রেনলদি ক্ষিপ্ত হ'য়ে পলকে গালাগাল দিলো। পলও দিলো তপ্ত প্রত্যুত্তর। শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধুতে 'ডুয়েল'। ইচ্ছে করেই ডুয়েলে আহত হলো রেনলদি, জখমী শরীর নিয়ে পড়ে রইলো বিছানায়।

খবর পেয়ে মাদাম পয়কত আকুল। তার ভালোবাসা যেন আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে। তার কল্পনা, নিশ্চয় রেনলদি তার জন্যই ডুয়েল লড়েছিল। কিন্তু তার নিজের শরীর এত দুর্বল যে রেনলদিকে দেখতে যাবার শক্তি নেই।

এরই মধ্যে বদলির জায়গায় আর সকলের সঙ্গে চলে গেল রেনলদি। দেখতে দেখতে নিরবিচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে তিনটি মাস অতীত হ'য়ে গেল।

একদিন সকালে মাদাম পয়কতের এক বোন এলো রেনলদির সঙ্গে দেখা করতে। পয়কতের রূপের সেই ঝাঁঝ নাকি আর নেই, দীর্ঘদিনের রোগভোগ ও হতাশায় এখন তার গলা চিরে শুধু মৃত্যুর গোঙানি,—অন্তিমে মাত্র একটি বারের জন্য তার প্রেমাস্পদ রেনলদিকে দেখতে চায়।

সময়ের বিবর্তনে রেনলদিও আর আগের মতো শঙ্কাকুল বা উৎকণ্ঠিত নয়, অতীত সম্পর্ক নিয়ে তাকে যে আর ধকল সইতে হবে না, এ সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত। মন ত্রাসহীন, বিরাগশূন্য। বরং এই মুহূর্তে তার নিজেকে অতি অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। বেদনায় দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে। পয়কতের বোনকে মদত দিতে তখনই সে রওনা দিলো হ্যাভয়ের উদ্দেশ্যে!

ততক্ষণে সমস্ত প্রশ্নেরই প্রায় ফয়সালা ক'রে ফেলেছে মাদাম,—মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত। কোন লোক তার শিয়রে বহাল নেই। একাকী ছুটে গেল রেনলদি। হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো সে। অপ্রত্যক্ষভাবে সে-ই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী হতে চলেছে।

রেনলদি কান্না ভেজা গলায় ওর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করে, "না, তুমি মরবে না। তোমাকে আমি মরতে দেবো না। ভাল হ'য়ে ওঠো, তারপর চিরকাল আমরা ভালোবাসায় আবদ্ধ থাকবো।"

মাদাম ক্লিষ্টমুখে চিকণ হাসি হাসে, "তুমি তবে আমাকে ভালোবাসো?"

অনুতপ্ত রেনলদি ভালোবাসার নামে শপথ করে। মাদাম পয়কতকে অজস্র চুম্বনে ভরিয়ে দিয়ে একসময় বিদায় নেয়। অসুস্থ মাদাম একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার প্রাণাধিকের অপসৃয়মান ছায়ার দিকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, দেড় মাসের মধ্যে রোগশয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালো মাদাম পয়কত এবং প্রথমেই ছুটে এলো রেনলদির কাছে। কিন্তু রোগযন্ত্রণা ইতিমধ্যে শুধু ওকে দুর্বল করে দেয়নি, যৌবন ও রূপ বরবাদ করে দিয়ে গেছে। এ যেন সেই মাদাম নয়। কিন্তু প্রেমাবেগ যেন আরো বেশী।

সহানুভূতির সঙ্গে ওকে গ্রহণ করলো রেনলদি। এমনভাবে তাদের যৌথ জীবনযাত্রা শুরু হলো, যেন তারা সত্যি স্বামী-স্ত্রী। ক্রমশ এই নিয়েও সমালোচনার ঝড় উঠলো। যে কর্ণেল একদা রেনলদিকে তার ব্যবহারের জন্য দায়ী করেছিলেন, তিনিও বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন—কোন সৈনিকের পক্ষে নাকি এ ধরনের অবৈধ সম্পর্ক টেনে বেড়ানো উচিত নয়। উপরমহলে রেনলদির বিরুদ্ধে নালিশ গেল। সৈনিকদের ব্যারাকে রেনলদির পক্ষে টিকে থাকাই মুস্কিল হ'য়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত চাকরিই ছেড়ে দিলো সে।

প্রেমিকদের কাছে যা স্বর্গ, সেই ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী এক গ্রামে তারা নীড় বাঁধলো।

আরো তিনটি বছর অতীত হ'য়ে গেল। রেনলদি এখন এক পরাজিত ব্যক্তিত্ব, একঘেয়ে নারীর ভালোবাসা তার কাছে তখন অনুভূতিশূন্য ব্যাপার; চুলেও তার পাক ধরেছে। জীবনে যেন তার আর কিছুই করার নেই। এক বিশাল শূন্যতা দৃষ্টির সামনে ভাসছে।

হঠাৎ এক সকালে তার নামে একখানা কার্ড এলো। লেখা রয়েছে:—

জোসেফ পয়কত

জাহাজের মালিক, হ্যাভ্রা।

এ যে পয়কতের সেই স্বামীর পাঠানো কার্ড! সেই লোক, যে নিজের স্বৈরিণী স্ত্রীকে বেঁধে রাখবার বৃথা প্রয়াস করেনি। কিন্তু এতকাল পরে কি সে চায়?

পয়কতের প্রাক্তন স্বামী বাগানে অপেক্ষা করছে। ঘরে ঢুকতে রাজি হলো না। এমনকি বাগানের বেঞ্চিতে বসতেও নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুস্পষ্ট সংযত গলায় বললো, "মঁসিয়ে, এতকাল বাদে আপনার সঙ্গে আমি বিবাদ করতে আসিনি। আমি জানি, কেন এমন হলো। দুর্ভাগ্য আমাদের দু'জনেরই। যাক, একটি বিশেষ কারণে আমাকে আসতে হলো। আমার দুটি মেয়ে আছে, আপনি নিশ্চয় জানেন। বড় মেয়েটি এক যুবককে ভালোবাসে। যুবকটি ওর প্রতি অনুরক্ত! কিন্তু মেয়ের মার কেচ্ছাকাহিনী শুনে ছেলেটির পরিবারের লোকেরা বেঁকে বসেছে। মঁসিয়ে, আমার ভেতরে কোন বিদ্বেষ নেই, স্ত্রীর প্রতি কোন টানও এখন আর নেই। কিন্তু আমি আমার সন্তানদের স্নেহ করি এবং তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আশাকরি, মাদাম আমার বাড়িতে যেতে আপত্তি করবে না এবং আমিও সন্তানদের মুখ চেয়ে সব ভুলে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করবো।"

লোকটির প্রস্তাব শুনে আনন্দে রেনলদি যেন নেচে উঠলো। সে যেন তার যাবতীয় অপরাধের ক্ষমা পাচ্ছে। প্রায় তোতলাতে থাকে সে, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—খুবই ঠিক কথা—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মঁসিয়ে—মাদাম পয়কত আপত্তি করবে না।"

এবার মঁসিয়ে পয়কত বসলো। রেনলদি একছুটে তার প্রেমিকার দরজায় গিয়ে গুছিয়ে বলবার জন্য মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করে নিলো, বললো "তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এক ভদ্রলোক নীচে অপেক্ষা করছেন। উনি তোমার মেয়েদের সম্পর্কে কিছু বলতে চান।"

মাদাম বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়, "আমার মেয়ে? তারা এখনো বেঁচে আছে তো!"

রেনলদি বললো, "আছে; কিন্তু মেয়েরা একটি গুরুতর সমস্যার মধ্যে পড়েছে, যার সমাধান একমাত্র তোমার হাতে।"

মাদাম আর কথা না বাড়িয়ে চকিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

রেনলদি একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়, কান কিন্তু সজাগ রাখে ওদের কথা শুনবার জন্য! বেশ কিছুক্ষণ পর সে মাদাম পয়কতের উত্তেজিত স্বর শুনে নীচে নেমে আসে, দেখতে পায় এক বিচিত্র দৃশ্য।

মাদামের স্কার্টের প্রান্ত ধরে টানছে লোকটি এবং দারুণভাবে অনুনয় বিনয় করছে, "....আমাদের মেয়ে দুটোর এভাবে সর্বনাশ করো না। ওরা তোমারই গর্ভজাত সন্তান।"

রেনলদি নিজেও উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "সে কি, ও কি যেতে আপত্তি করছে?"

মাদাম রেনলদির মুখের দিকে চেয়ে কেমন লজ্জারুণ, "জানো, ও আমার কাছে কি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে? বলছে আবার নাকি আমাকে ওর সঙ্গে সহবাস করতে হবে! এও কি সম্ভব?"

স্বামী বেচারি হতাশায় প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে, আর রেনলদির মুখের দিকে চেয়ে মাদামের মধুর প্রেমময় স্মিত হাসি।

রেনলদির কাছে গোটা দৃশ্যটাই অসহ্য। সে প্রায় মরিয়া হ'য়ে মাদামকে বোঝাতে থাকে, তার গর্ভজাত কন্যাদের বিষময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু সবটাই কাকস্য পরিবেদনা। স্বামী বেচারিও কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য দরদ ঢেলে অতীত দিনের মতো প্রেমপূর্ণভাবে বলে, "দেলফিঁ, একটিবার আমার মুখের দিকে তাকাও। তোমার মেয়েরা তোমার জন্যে অধীর হ'য়ে বসে আছে। ফিরে চলো, সোনা।"

মাদামের দু'চোখ ঠিক তখনই ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এক লাফে সিঁড়ির উঁচু ধাপে গিয়ে দাঁড়ায়, রেনলদি ও নিজের স্বামীকে সমভাবে ধিক্কার দেয়, "তোমরা দু'জনেই শয়তান।" বলেই সটান নিজের ঘরে চলে যায়।

আর নীচে এরা দু'জনে সেই মুহূর্তে পরস্পরের সমব্যথী। মঁসিয়ে পয়কত হাত বাড়িয়ে নিজের টুপিটা তুলে নেয়, পোশাক থেকে ধূলো ঝাড়ে। রেনলদি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। ভারি পায়ে বিদায় নেবার আগে মঁসিয়ে পয়কত রেনলদিকে বলে যায়:

"আমার মতো আপনার বরাতও খুব খারাপ!"

আদর্শ

Ideal

ভিয়েনায় আমার বন্ধুর সংখ্যা অনেক, তাঁদের মধ্যে একজন সাহিত্যিক। সরল আদর্শবাদী লোক, এবং তাঁর আদর্শের ঘটা আমার কাছে শিশুসুলভ হাস্যকর মনে হয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আমি আদর্শবাদী নই। নিজে আদর্শবাদী বলেই অন্যের আদর্শ নিয়ে মস্করা করি না। কিন্তু আমার এই বন্ধুর আদর্শ বড় উদ্ভট।

আমার বন্ধু সাহিত্যিক ক্ষমতাসম্পন্ন, চিন্তাশক্তি কম নয়, অভাব হলো অভিজ্ঞতার। সমালোচক হিসেবে তার যুক্তি ক্ষুরধার, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ। নির্মোহ—সমাজ, রাষ্ট্র বা সাহিত্য তাকে পক্ষপাতদুষ্ট করতে পারেনি। নারীরাও তার মনে কোনরকম আলোড়ন আনে না।

ব্যতিক্রম কেবল একটি বিষয়ে। কোন অভিনেত্রীর প্রসঙ্গ উঠলেই তাকে বিচলিত হতে দেখা যায়। সে তখন উচ্ছ্বসিত, উন্মাদের মতো আশাবাদী, নাট্যমোদী হেকলাঁদ্র যেন, যিনি রঙ্গমঞ্চকে দুনিয়ার একমাত্র পবিত্রস্থান বলে মনে করতেন।

স্বভাবতই বন্ধুটি আমার সর্বদাই কোন না কোন অভিনেত্রীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। যে কোন এক উঠতি তারকা-সুন্দরীর একনিষ্ঠ প্রেমিক বলে সে নিজেকে মনে করতো।

তার পকেটে থাকে তার মানস প্রেমিকার ছবি ; কখনো কখনো একাধিক সুন্দরীর ছবি। মেজাজ খুশ থাকলে, আমাকে একটির পর একটি ছবি দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ছবিগুলি দেখে বারেকের জন্যও মনে হয়নি, এদের কেউ বিন্দুমাত্রও আমার বন্ধুর অনুরক্ত হতে পারে।

একদিন প্রথমবেলায় আমরা দু'জনে চায়ের টেবিলে বসে আছি, বন্ধু ফস্ করে পকেট থেকে একখানা ছবি বের করে টেবিলের ওপর রাখে। এক লাস্যময়ী সুন্দরী। নিখুঁত সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, প্রথমেই নজর আটকে যায় সাদা দুই চোখের ওপর।

আমি বললাম, 'ওর চুলের রঙটা জীবন্ত না হলে আমি ধরে নিতাম এ কোন মূর্তির ছবি।' লেখক উৎসাহিত হয়, 'ঠিক ঠিক। প্রকৃত জীবন্ত ভেনাস বলতে যা বোঝায়।'

'কে কে ?'

'একজন উদিয়মান অভিনেত্রী।'

'সে তো আমি বুঝতে পারছি।'

জবাবে ঝাড়া বক্তৃতা। এ নামটি এখন জার্মানী ও অষ্ট্রীয়ার বাতাসে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, লোকের মুখে মুখে ফিরছে, ভিয়েনার রঙ্গমঞ্চে তার আবির্ভাব-লগ্নকে অভিনন্দন জানাতে হাজার হাজার নর-নারীর সমাবেশ ঘটে...ইত্যাদি গুণগাথা।

হয়তো মেয়েটির সৌন্দর্যের সঙ্গে ভেনাসের নাম নির্দোষ উচ্ছ্বাসে উচ্চারিত হতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ঐ অভিনেত্রীর নাম আমি এই প্রথম শুনছি।

বন্ধুর বক্তব্য অনুযায়ী এই তরুণী বিরল প্রতিভা এবং চরিত্র অতি নির্মল। আমি হয়তো প্রথম কথাটি মেনে নিতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর দিতে রাজি নই। এই চরিত্রগত ব্যাপার ট্যাপারে অপরের মুখে ঝাল খেতে আমি নারাজ।

এরই দিন কয়েক বাদে আমি এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তার ব্যক্তিগত এ্যালবামের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ছবিতে চোখ আটকে যেতেই চমকে উঠি—আরে, এ যে সেই লেখকের মানস প্রেমিকার ফটো!

বর্তমান বন্ধুটি আমার চারিত্রিক শুচিতা—টুচিতার ধার ধারে না। রীতিমত ইন্দ্রিয়াসক্ত ভিয়েনীজ, বহু নারীর সঙ্গ-লাভে অভিজ্ঞ।

আমি জিজ্ঞস করি, 'এই ভেনাসসুন্দরীর ছবি তোমার এ্যালবামে এলো কেমন করে?' বন্ধুর সপ্রতিভ জবাব, 'হ্যাঁ, রূপে ভেনাসপ্রায়, তবে দরে বড় সস্তা। গ্রাঁবে* গিয়ে কিছু খরচা করলেই এ মাল চাখতে পারবে।'

'অসম্ভব।'

'দিব্যি কেটে বলছি, কথাটা আমার মিথ্যে নয়।'

---

*ভিয়েনার সুন্দরী গণিকাদের পাড়া।

আমার আর কি বা বলবার আছে! লেখকবন্ধুর জন্য কষ্টে বুকটা ভরে যায়,—তার বিরল-প্রতিভা নির্মল চরিত্রের ভেনাসসুন্দরী একটি গণিকা-মাত্র!

কিন্তু আমার সাহিত্যিকবন্ধুর একটি উক্তি কিন্তু বিস্ময়করভাবে সত্যে পরিণত হলো। মেয়েটির সত্যি অভিনয়-পারদর্শিতা অসাধারণ। খুব অল্প দিনের ভেতরেই নাট্যজগতের পাদপ্রদীপে স্থান পেলো সে। শহরতলীর নগণ্য রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে ভিয়েনার প্রধান থিয়েটারে এসে স্বকীয় দক্ষতায় সকলকে মুগ্ধ করে রাখলো। দু'বছরের মধ্যেই সহ-নায়িকার ভূমিকা থেকে উন্নীত হলো মুখ্য নায়িকায়।

তার এই অভাবনীয় উন্নতির মূলে আমার বন্ধুর যথেষ্ট হাত ছিল। সে-ই থিয়েটার-মালিকের ওপর প্রভাব খাটিয়ে মেয়েটিকে প্রথম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ করে দেয়। থিয়েটারের পরিচালকও পরীক্ষা করে দেখলেন, মেয়েটি উপযুক্ত বটে!

ক্রমশ দূর-দূরাঞ্চলেও অভিনয়ের জন্য তার ডাক আসতে থাকে। সঙ্গে যেত লেখক। সর্বদাই তার নজর থাকতো, সুন্দরীর অভিনয়-খ্যাতির প্রশংসা ক্রমশই যেন বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে বেশী খ্যাতি সে পেলো 'মেরী স্টুয়ার্ড' বইতে প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে। ভ্রাম্যমান অভিনয়ের জগৎ ছেড়ে ভেনাসসুন্দরী এরপর উত্তরাঞ্চলের এক সুবিশাল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলো মোটা টাকার বিনিময়ে। খ্যাতির একেবারে তুঙ্গে আরোহণ করলো সে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কোর্ট থিয়েটারের মালিক এসে হাজির হলো তার কাছে টাকার থলি নিয়ে। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে কোর্ট থিয়েটারের প্রধান নায়িকা হয়ে গেল সে। এক খ্যাতিমান লেখকের চটকদার নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে সে একেবারে কিস্তিমাৎ ক'রে দেয়,—শহরের তাবৎ ক্ষমতাবান পুরুষরা, ধনকুবেররা একরাতে যেন তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে; তাকে ঘিরে এই সব উপরতলার মানুষরা চক্কর কাটতে শুরু করে,—রাজধানীর মক্ষীরাণী বলতে তখন এই রূপসী অভিনেত্রীকেই বোঝায়।

স্বচ্ছলতা ও বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে আছে রাণী। প্রাসাদোপম অট্টালিকা, অজস্র স্তাবকদের পর্বত প্রমাণ উপহার, স্বর্ণ ও রৌপ্যের সীমাহীন স্রোত।

নায়িকা যত ওপরে ওঠে, আমার লেখকবাবু ততই পিছিয়ে পড়ে। শেষে আর নাগাল না পেয়ে হতাশ হ'য়ে আর এক নতুন প্রতিভার পিছনে ছুটলো সে।

ইতিমধ্যে একটি করুণ ঘটনার সূত্রপাত হলো। ভেনাসসুন্দরীর অসংখ্য স্তাবকদের মধ্যে একজন ছিল এক যুবক ছাত্র। তার না আছে রূপ, না আছে রূপো। খুবই সাধারণ পরিবারের ছেলে। কিন্তু তার নিষ্ঠা ও ভাবপ্রবণতা অপরিমিত। 'মেরী স্টুয়ার্ড' অভিনয় দেখবার পর থেকেই এই নায়িকার প্রেমে সে বদ্ধ পাগল।

প্রেয়সীকে পূর্ণভাবে দু'চোখ ভরে দেখবার উচ্চাশায় সে প্রায় উপবাসি থেকে একটি একটি করে পেনি জমাতে থাকে। প্রতিটি নাটকের শো দেখবার জন্য সে সবচেয়ে দামী টিকিট কিনতো, যাতে একেবারে সামনের সারিতে বসে তার মানস

সুন্দরীকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। পাছে পছন্দসই আসনটি বেদখল হ'য়ে যায়, এই ভয়ে শো আরম্ভ হবার অন্তত ঘণ্টা তিনেক আগে থেকে সে থিয়েটারের দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো।

মঞ্চের ওপর যে মুহূর্তে নায়িকার আবির্ভাব হয়, তরুণটির মুখাবয়ব উত্তেজনায় রক্তাভ বর্ণ ধারণ করে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয়। নায়িকার হাসিতে তার মুখেও হাসি, নায়িকার কান্নায় সেও বুক ভাসায়, তারপর একসময় মুগ্ধমুগ্ধ উল্লাসে সজোরে হাততালি দিতে থাকে।

কিছুদিনের মধ্যেই কোর্ট থিয়েটারের দর্শকরা এই বিশেষ আবেগপ্রবণ তরুণটিকে চিনে ফেললো। ওর আচরণ নিয়ে হাসি মস্করা, মুখরোচক গাল-গল্প শুরু হ'য়ে গেল। এমনকি স্বয়ং নায়িকার কানেও এলো কথাটা।

কিন্তু যুবক স্তাবকটি বয়সে যতই তরুণ হোক, সামর্থ্য নেই একেবারে—নায়িকাকে দামী কিছু উপহার দেওয়া তার সাধ্যাতীত। সুতরাং নায়িকার খাসমহল থেকে কোন তলব এলো না তার জন্য।

তবু ঘটনাক্রমে তরুণটি নায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণে একদিন সক্ষম হলো।

নায়িকা যখন হল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতো, যুবক বরফে-কাদায় ভিজে তার গাড়ির সামনে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতো। বেশ কিছুদিন পর নায়িকার পরিচারিকা ব্যাপারটি লক্ষ্য ক'রে জানায়। বড় বড় চোখ মেলে সুন্দরী তাকায় তার গুণগ্রাহীর দিকে।

সেই অনুপম দৃষ্টির প্রসন্নতায় যেন গলে যায় যুবক। তার পবিত্র উচ্চাশা স্বপ্নের হাত ধরে আরো স্ফীত হ'য়ে ওঠে।

নীরব চোখে চোখে যেন তাদের ভাববিনিময় ঘটে। প্রতিদিনই যুবকটির মুখের দিকে তাকায়, স্মিতহাস্যে তাকে প্রীত করে। গাড়ি ছুটতে শুরু করলে ব্যাকুল প্রেমিক পড়ি-কি-মরি করে সেই গাড়ির পিছনে অনেকটা পথ ছুটে আসে। একসময় গাড়িটা মিলিয়ে যায় দৃষ্টিপথ থেকে, তখন হাঁপাতে থাকে অবসন্ন প্রেমিক।

সেদিন গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ঝড় উঠলো। প্রেমিক ভিজতে ভিজতে কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ায় নায়িকার বাড়ির কপাটের সামনে। এলিয়ে পড়েছে তার দেহ। গোঙানো বাতাসের তীক্ষ্ণমুখ ঝাঁপটা এসে লাগছে তার গায়ে।

হঠাৎ মৃদু শব্দের সঙ্গে দরজা খুলে গেল। এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলো যুবক। একজন বলিষ্ঠদেহী সরকারী লোক অভিনেত্রীকে এমনভাবে আদর করছেন যেন তিনি পৌরাণিক প্লুটোর বহুমস্তকবিশিষ্ট দ্বাররক্ষী কুকুরকে সোহাগ জানাচ্ছেন। সুন্দরী ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দেয় এবং ঠিক তখনই অফিসারের পা এসে লাগে লুক্কায়িত যুবকের শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর তলোয়ার টেনে বের করেন এবং আতঙ্কে তরুণটি ছুটে পালায়।

সেই রাত্রির অভিজ্ঞতার পর যুবকটি আর কখনো নিরস্ত্র অবস্থায় ওখানে যায় না।

সে তার কোমরে লুকিয়ে রাখে একটা ছোরা এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় ঐ লোকটাকে খুন করে সে নিজে আত্মহত্যা করবে।

অবশ্য সে রকম কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো না।

ঘটলো যা, তারও বিস্ময় কম নয়।

সেদিন সন্ধ্যায় বেশ একটু রাত করেই হল ছেড়ে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো নায়িকা। কপাল কুঁচকে দেখলো, যথারীতি অদূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছেলেটি। গাড়ির মধ্যে উঠেও দরজা বন্ধ করে না ভেনাস। হাতের ইশারায় আদর্শবান গুণমুগ্ধকে কাছে ডাকে।

বিস্ময় ও আনন্দের আতিশয্যে টলে ওঠে যুবক। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না, ছুটে এসে পায়ের কাছে বসে, আবেগে তার প্রতিভাময়ীর হস্ত চুম্বন করে।

ভেনাসরূপসী ওর আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশের বহর দেখে মনে মনে বেশ খুশি হয়। প্রসন্ন চিত্তে গাড়িতে তুলে নেয় ওকে।

প্রেমান্ধ যুবক গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করে নায়িকাকে, তারপর ঐভাবে হাতে হাত রেখেই নায়িকার খাসমহলে গিয়ে উপস্থিত হয়।

বাড়ির পরিচারিকা যুবককে নিয়ে একটা বিলাসবহুল সুসজ্জিত ঘরে এনে বসায়।

একটু পরেই ঘরোয়া পোশাকে নায়িকা এসে দাঁড়ায় তার প্রেমিকের সামনে। অনায়াসে তরুণকে পাশে নিয়ে একটা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দেয়। বিহ্বল যুবকের চোখে চোখ রেখে বলে, 'কি গো, আমাকে বুঝি তোমার খুব মনে ধরেছে?'

তরুণটি আবেগে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি আমার স্বপ্নের দেবী!'

রঙ্গমঞ্চের রাজকুমারী সকৌতুকে মিষ্টি হাসি হাসে, 'বেশ। আমি তোমার স্বপ্নকে সার্থক করবো, তা সে যেভাবেই হোক। তোমাকে আমি বঞ্চিত করবো না। তোমার এই নবীন বয়স, প্রচণ্ড আবেগ—কামনা—এ সবকে আমি উপেক্ষা করবো না। কোন আক্ষেপ তুমি করতে পারবে না। এসো, আজ রাতে আমি তোমার। শুধুই তোমার।'

ভয়ানক পুলকে যুবকের জীবনীশক্তি যেন এখনই নিঃশেষ অথবা, সে একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নায়িকার পদযুগল।

তার মানসপ্রেমিকা হেসে ওঠে, 'এই দুষ্টু। একটু থামো! আমার আরো কিছু বলার আছে। দেখো, আমি তাদের কাছেই ধরা দিই, যারা আমাকে অনেক-অনেক দামী-দামী বিলাস উপকরণ যোগাতে পারে। যতদূর খবর পেয়েছি তোমার আর্থিক অবস্থা আদৌ ভালো নয়। তবু আজ প্রথাবিরুদ্ধভাবেই আমি তোমাকে সুখ দেবো—কেবলমাত্র আজকের রাতটার জন্য। কিন্তু এর বদলে তোমাকে প্রতিজ্ঞা

করতে হবে, কাল সন্ধ্যা থেকে তুমি আর আমার পিছনে ঘুরবে না। আমার সম্পর্কে আবোল তাবোল গল্প করে বেড়াবে না। কি রাজী ?”

হতভাগ্য যুবকের বুকের পাঁজরগুলি যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে সে নায়িকার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুন্দরী আবার জিজ্ঞেস করে, 'কি, রাজী ?'

যুবক প্রায় কঁকিয়ে ওঠে, 'রাজি।'

রাত কাবার হ'য়ে গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল এক হতভাগ্য তরুণ তার আদর্শকে কবর দিয়ে বিখ্যাত অভিনেত্রীর বাড়ি থেকে টলতে টলতে ফিরে আসছে। তার রক্ত তথা প্রাণশক্তিকে যেন শুষে খাওয়া হয়েছে, বিধ্বস্ত যৌবনের করুণ প্রতিমূর্তি, বিভ্রান্ত দৃষ্টি, মড়ার মতো সাদা চোখ। তবু এখনো সে বেঁচে আছে বলেই যদি তার কোন স্বপ্ন এখনো থেকে থাকে, তবে তা নিশ্চয় কোন রঙ্গমঞ্চের নটীকে নিয়ে নয়।

গহন বনে

Under the Wood

মধ্যাহ্ন ভোজের পর মাত্র দিবাকালীন আমেজটুকু উপভোগ করছেন, এমন সময় মেয়র সাহেব খবর পেলেন, বন-বিভাগের রক্ষী অপরাধী ঠাহর ক'রে দু'জনকে পাকড়াও করেছে এবং তাঁর জন্য টাউনহলে অপেক্ষা করছে।

বিশ্রাম মাথায় উঠলো, টাউনহলের দিকে ছুটতে হলো মেয়রকে। গিয়ে দেখলেন, চৌকিদার হোচেদুর খুব হম্বিতম্বি করছে, তার কঠিন কব্জায় ধরা পড়েছে এক গ্রাম্য দম্পতি, তাদের বয়স যথেষ্ট হয়েছে। পুরুষটি মোটাসোটা বেগুনে রঙের নাক, চুল সাদা। দেখলেই বোঝা যায়, চৌকিদারের ঝাঁঝের মুখে পড়ে সে খুব বিচলিত। মহিলাটি বেঁটে, প্রায় গোলাকার, গায়ের রঙ লালচে, পরনে রবিবাসরীয় চটকদার পোশাক, জবরদস্ত অভিযোগের মুখেও দৃষ্টি তার উদ্ধত।

মেয়র জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনাটা কি ?"

হোচেদুর ঘটনাটা খুলে বলে। প্রাত্যহিক নিয়মে আজও সে টহল দিচ্ছিলো। আর্জেনাভিউলে গিয়ে মিশেছে যে শ্যামপিয়ক্রা বন, তার যাত্রাপথ ছিল সেদিকেই। মনোরম পরিবেশ, প্রকৃতি সকলকেই আপ্যায়ন করছে যেন, মাঠে অফুরন্ত সোনালী গমের গাছ, সবই স্বাভাবিক। ক্ষেতের মালী ছোকরাবয়সী ব্রাদেল আঙুর ক্ষেতে কাজ করছিল, হোচেদুরকে দেখে তার কাছে গিয়ে বললো :

"হোচেদুর, ব্যাপার গুরুতর। ছুটে যাও, তোমার বনে কমসে কম একশ' তিরিশ বছরের একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা কী কাণ্ডটাই না করছে!"

চকিতে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হোচেদুর চোখের দৃষ্টি সাফ রেখে নির্দেশিত বনে হন্‌হনিয়ে এগিয়ে চলে। কিছুদূর যেতে না যেতেই বনের গহন থেকে গুন-গুন আলাপ এসে কানে বাজে, চৌকিদারের মুখ কঠিনতর হয়, এই নির্জন বিমর্ষ বনে দিব্যি অসামাজিক রসালো ব্যাপার চলেছে! অপরাধীদের পালাবার বিন্দুমাত্র ফুরসত না দেবার বাসনায় শিকার করা পশু চুরির প্রতিরোধের কৌশলে হোচেদুর গুটি গুটি এগুতে থাকে এবং একসময় ঐ অপরাধী নর-নারীকে বিলক্ষণ কৌতুকপ্রদ আপত্তিজনক অবস্থায় পাকড়াও করে ফেলে।

ঘটনাটা এ রকমই ঘটেছিল; এতটুকু হেরফের না ক'রে বনরক্ষী তার তারিফযোগ্য কাজের বর্ণনা দেয়।

মেয়র কিন্তু রীতিমত অবাক, অপরাধীদের দিকে তাকিয়ে আত্মপ্রসাদের বদলে তাঁর জমাট বিস্ময়—কারণ, লোকটার বয়স তো ষাট হবেই এবং মহিলাও পঞ্চান্নর কাছাকাছি! এই পড়তি বয়সে বনে ঢুকে ঐ সব কাজকর্ম....ধ্যানধারণায় আসে না।

মেয়র প্রথমে লোকটিকে জেরা করতে শুরু করলেন। তাঁর প্রশ্নের বহরে ওর বুড়ো হাড়ে কাঁপুনি লাগে, জবাব আসে এমন ক্ষীণ স্বরে, যা শুনতে গেলে যথেষ্ট মনোযোগের দরকার।

"নাম?"

"নিকোলাস ব্যুরেন।"

"কি করা হয়?"

"কাপড়ের ব্যবসা, প্যারির রু দ্য মারতারসে।"

"বনে কি করছিলে?"

কিছু একটা বলতে গিয়ে হোঁচট খায় অপরাধী, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপচাপ, মৌন দৃষ্টি লেপ্টে আছে নিজেরই স্থূল বপুর ওপর, হাতদুটো ঝুলছে জানুর ওপর। এমন নীরবতার তাৎপর্য বোধগম্য না হবার নয়।

মেয়র চেপে ধরেন, "অভিযোগ অস্বীকার করতে পারো?"

"না স্যার।"

"তাহলে দোষ স্বীকার করছো?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"বেশ, তাহলে একটা বিহিত করা দরকার। কিন্তু অপকর্মের জন্য ঐ মেয়েমানুষটাকে জোটালে কোত্থেকে?"

"ও আমার স্ত্রী স্যার।"

"তোমার স্ত্রী!"

"হ্যাঁ স্যার, আমার স্ত্রী।"

"কিন্তু—কিন্তু প্যারিতে কি তোমরা একসঙ্গে থাকো না?"

"মাপ করবেন স্যার, আমরা একসঙ্গেই থাকি।"

"পাগল—যত সব পাগলের কাণ্ড। তবে কি চৌকিদারের হাতে ধরা পড়বার জন্যই স্বামী স্ত্রীতে বনের মধ্যে ঐ কুকর্মটি করছিলে ?"

এতক্ষণ তবু জোর পটুত্বের সঙ্গে জেরার জবাব দিচ্ছিলো লোকটি, এবার যেন লজ্জায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, চক্ষুদ্বয় রীতিমত সজল, ফিসফিসিয়ে কোন রকমে বললো, "আমি কি করবো হুজুর, ওর যে ঐ রকমই একটা ইচ্ছা জেগেছিল। আর জানেন তো, মেয়েদের মাথায় যদি কোন মতলব একবার ঢোকে, তা হলে আর রেহাই নেই!"

ঘটিয়াল ভুঁড়ি বুড়োর অসহায় অথচ রসাল উক্তি শুনে মেয়রের গাম্ভীর্য আর বজায় থাকে না, তাঁর হাসি শুরু হয়, কেননা—আদতে তিনি রসিক লোক, রসিকতা করতেও ছাড়লেন না।

"হক কথা। স্ত্রীর মাথায় এমন একটি মতলব না এলে, তোমার আর কি সাধ্যি এখানে এসে ঢোকো।"

বুড়ো ব্যবসায়ী এবার তার স্ত্রীর দিকে ঘুরে ফোঁস করে ওঠে, "বোধগম্য হচ্ছে এবার ব্যাপারটা ? তোমার প্যানপ্যানানির জ্বালায় আমার এই ফ্যাসাদ। ছি-ছি, এই বয়সে অশালীনতার অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে! শেষঅব্দি দোকানপাট বিক্রি করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে অন্য কোথাও পাড়ি জমাতে হবে। বেশ রোমহর্ষক মজার ব্যাপার হলো একটা, তাই না ?"

স্বামীর আক্রমণ অক্লেশে হজম করলো মেয়েমানুষটি অথবা সে যেন ভ্রূক্ষেপও করলো না ইত্যাকার অভিযোগের। সময়োচিত স্থৈর্যে অবিচল সে, বিপদের ঘনঘটায় বুদ্ধিভ্রংশতার লক্ষণ নেই, এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট অবিকৃত গলায় বলতে থাকে :

"জানি আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা আপনাদের মতো পাকা নয়। কিন্তু যদিও একজন নগণ্য মেয়েমানুষের, ঘটনাটা গুছিয়ে বলবার জন্য আমি যারপরনাই ব্যস্ত, আপনি অনুমতি দিন। আমার ধারণা, সবটুকু শুনবার পর আপনি অন্ততঃ আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড়োবার লজ্জা থেকে রেহাই দেবেন। এই মুমূর্ষু অবস্থা কাটিয়ে আবার ঘরে ফিরে যাবার শক্তি খুঁজে পাবো।"

অনেকদিন আগের কথা, আমি তখন একটি কিশোরী, নিজস্ব জগৎ নিয়ে মশগুল ; এমন সময় এই অঞ্চলেই মঁসিয়ে ব্যুরেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। যদিও অনেক কাল আগের কথা, আমার স্মৃতি এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ, যেন গত কালের ঘটনা ; এখনো বলতে গেলে ত্বরিতে লজ্জা আসে, গর্বও জাগে ; ও কাজ করতো এক কাপড়ের দোকানে, আমি কাজ শিখছি সেলাইয়ের। আমার এক বান্ধবী ছিল—রোজলাইভাকু, প্রায়ই আমরা একসঙ্গে থাকতাম, ছুটি-ছাটার দিনে ঘুরতে ঘুরতে ঐ দোকানের কাছাকাছি চলে আসতাম। আমার কোন পুরুষ বন্ধু ছিল না, ছেলেদের সম্পর্কে তখনো ধারণাটা আবছা-আবছা ; কিন্তু রোজ প্রগলভা এবং তার একটি পুরুষ বন্ধু জুটেছিল। ঐ পুরুষ বন্ধুটি প্রায়শই আমাদের সঙ্গে ঘুর ঘুর করতো।

একদিন সে হাসতে হাসতে আমাকে শুনিয়ে বললো, আগামী ছুটির দিনে সে তার এক বন্ধুকে নিয়ে আসবে। আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেনি, সেই কারণে পুরুষটির কথার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম, তবে তো আপনার বন্ধুর শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে মাত্র। নিশ্চয় ধারণা করতে পারছেন হুজুর, আমি তখনো একটি খাঁটি মেয়ে, যার মতিভ্রম ঘটেনি।

"পরের দিনই স্টেশানে পরিচিত হলাম মঁসিয়ে ব্যুরেনের সঙ্গে। সেই সময় ব্যুরেনের চেহারা ছিল নজর কারবার মতো, রীতিমত সুশ্রী যুবা। আমি অবিশ্যি আগেই ঠিক করেছিলাম, মুখ টিপে সংযত ও নিস্পৃহ থাকবার চেষ্টা করবো। পেরেও ছিলাম।

"আমাদের পরবর্তী মুলাকাৎ বেজনস-এ। এজাহারে সেই দিনটির কথা বলতে গিয়ে এখনো আমার শরীরে কাঁটা দিচ্ছে, চমৎকার নির্জনতা-অন্বেষী দিন, যার নিস্তরঙ্গ আবরণে দাঁড়িয়ে বাসনা জাগে চোখের জল ফেলতে—অকারণে অশ্রু বিসর্জনে একপ্রকার তৃপ্তি পাওয়া যায়। বিশাল ও উন্মুক্ত প্রকৃতি যে কোন বেদনার বিহিত করতে পারে, যদিও কোন সম্যক উপলব্ধি না রেখে আমি তখন বার বার অন্যমনস্ক, আচরণে পাগল-পাগল। এটা আমার আবাল্য স্বভাব। শ্যাম্পেন পানে যে বৈচিত্র্যময় নেশা, বিশেষত অনভ্যস্ত লোক যখন সেই নেশায় সন্তরণরত হয়, আমার অবস্থা তদ্রূপ—আলোময় এমন হেমকান্তি চরাচরে সবুজ নরম দূর্বা, বাতাসের হিল্লোল পাকা ফসলের ধ্যান বানচাল করে দেয়, আকাশে দোয়েল পাখিরা দিনের পরমায়ু বাড়িয়ে পাখা ঝাপটায়, ডেইজি ফুল আর হরেক জাতের পাখিরা রৌদ্রে আরোগ্য-স্নান সারে, সেই সঙ্গে বুনো আফিমের শঙ্কাপ্রদ গন্ধও বর্তমান...। সুখ ও আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত একটা উজ্জ্বল দিন, চোখ ভরে যত দেখি মনের আনন্দ ও বেদনা ততই নিগূঢ় হয়। হাঁটছি পাশাপাশি মঁসিয়ে ব্যুরেনের সঙ্গে, এ যেন পরমার্থ লাভের বিরল মুহূর্ত, মাঝে-মধ্যে একটা-আধটা কথা একে অপরের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি, অবিশ্যি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে বাক্যালাপে আমার এক ধরনের লজ্জাকর লালিত্য আছে। লজ্জা আমার একার নয়, অনুরূপ সলজ্জ অভিব্যক্তি ও হেঁয়ালি বুরেনের আচরণেও পরিস্ফুট এবং ওর এই উদ্‌ব্যস্ত লজ্জা আমার কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ।

"আমাদের আগে আগে আর একজোড়া....রোজ ও সিঁম, আবেগে ডগমগ, একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন চুমু খায়। এতে আমার অস্বস্তি আরো বৃদ্ধি পায়। একসময় আমরা বনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লাম, সেখানকার পরিবেশ যে কোন ধরনের বীতশ্রদ্ধাকে দূর করতে পারে; আমরা নরম ঘাসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম, যেন এইমাত্র হিম জলে স্নান করে উঠেছি এমন একটি স্নিগ্ধ মধুর আমেজ। আমার অমন সংঘাতপ্রসূত লজ্জা ও গাম্ভীর্য নিয়ে রোজ ও তার প্রেমিক হাসাহাসি করলো কম নয়। কিন্তু আমি কি করতে পারতাম? এ যাবৎ যে পরিবেশে মানুষ, তার রেশ মুহূর্তে কি ভাবে অস্বীকার করতে পারি? এখানে বসেও রোজ ও তার

বন্ধু অস্থির পঞ্চম, আমাদের উপস্থিতিকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে অহরহ ফিসফাস হাসাহাসি করে, ঘন ঘন চুমু খায় তারপর একসময় বলা নেই কওয়া নেই, দু'জনে উঠে গিয়ে এক ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

"তখন আমার কী দুর্ভাবনা ও লজ্জা, কেন না সামনে একজন প্রায়অপরিচিত যুবক এবং ঝোঁপের আড়ালে বান্ধবী তার নাগরের সঙ্গে না জানি কি রোমহর্ষক খেলায় মেতেছে! ঝোঁপের আড়ালে ঐ অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়াটা সরীসৃপ-ভঙ্গীর সঙ্গে তুলনীয়। সংকোচের জগদ্দল পাহাড়টাকে একটু হাল্কা করবার মানসে দুটি একটি বাক্যালাপে আগ্রহ দেখাই। জেনে নিলাম, ও কি করে—কাপড়ের দোকানে কাজ করে। কিছুক্ষণ কথা বলাতেই ওর সাহস বেড়ে গেল, সাহসের সঙ্গে লোভও। কিন্তু ঐ লোভকে আমি বাড়তে দিইনি, সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত করেছি। কি ব্যুরেন, ঠিক বলছি না?"

ব্যুরেন কিন্তু মাটির দিকেই চেয়ে আছে, জবাব নেই।

মাদাম পুনর্বার শুরু করে, "সেদিনই ওর মালুম হলো, আমি কেমন ধাতুর মেয়ে! এরপর থেকে আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল শিষ্ট ও সন্তর্পণ। প্রতি রবিবার আমাদের দেখা হতো। নিজের ইচ্ছাসুখকে সংযত রেখেও ও আমাকে সত্যি ভালোবেসে ফেললো, ভালোবাসলাম আমিও। সে সময় কী চমৎকার ছেলে ছিল এই ব্যুরেন।

"অল্প কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, সেপ্টেম্বর মাসটা আমাদের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় মাস। আমাদের বিয়ে হয় এই মাসে এবং এই মাসেই রুঁ দ্য মারতারসে দোকান খুলে আমরা একাগ্রভাবে ব্যবসা শুরু করি।

"প্রথম প্রথম অবশ্য দোকান ভালো চলতো না; বিসদৃশ অনটনে দিন কাটিয়েছি; গ্রামে গিয়ে যে একটু চক্কর কাটবো, গোলাপ ফুল সংগ্রহ করবো, আকাশমার্গে পুলকে তাকিয়ে থাকবো, তেমন সঙ্গতিও ছিল না। ক্রমশ আমরা বেড়াতেও ভুলে গেলাম। কোন এক অন্তরীক্ষের তাগিদে আমরা জীবনের অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে ব্যবসাকেই জড়িয়ে ধরলাম এবং আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, একজন ব্যবসায়ীর কাছে গোলাপের চেয়ে ক্যাসবাক্সের কদর—অনেক বেশী। কাজের চাপে ডুবে থাকি, সময় পেরিয়ে যায়। কবে যে আমাদের বয়স বাড়লো, যৌবন শেষ হ'য়ে গেল, টেরই পেলাম না। দাম্পত্য-জীবনের একঘেঁয়েমিতেই দিব্যি অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলাম।

"তারপর আমরা আমাদের দূরবস্থা কাটিয়ে উঠলাম, ভবিষ্যতের জন্য অঢেল সঞ্চয়; এখন কিন্তু আমার ভেতরে একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ জোরদার হ'য়ে উঠতে থাকে, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ থেকেও আমি আপনাকে এই মানসিকতাটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো না।

"আমি যেন স্কুলের একটি কিশোরী ছাত্রী, চপলতায় অশিষ্ট, অল্পেতেই আশ্চর্যান্বিত, যত সব সুখ-কল্পনায় পুলকে নেচে উঠি। যদিও সামান্য ক্যাসবাক্স, তবু মন এখন কাতরোক্তি করে এবং নাকে এসে লাগে গোলাপের ঘ্রাণ। পথে কোন ফুলওয়ালা

দেখলে রক্তে আমার যুবতীর ঔদ্ধত্য, চীৎকার করে ওকে ডেকে নিয়ে আসতাম আমাদের দরজায়। রাস্তার দু'পাশে যতই বিশাল বিশাল অট্টালিকা থাকুক না কেন, মাথার ওপর বিশাল নীলাকাশ চোখ মেললেই দেখা যায়, আকাশ তো নয়—বুঝি প্যারির বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দীর্ঘ নীল নদী। আকাশে ভাসমান দোয়েল পাখিরা যেন নদীর গহনে সন্তরণরত মিন্-সন্তানদের দল। আমার এমন বয়স, যা স্পষ্টতই গাম্ভীর্যে সমীহ আদায় করবে, কেন যে এমন ভাবপ্রবণ হ'য়ে উঠলো! দুঃখ হয়, সারাটা জীবন কেবল কাজ-কাজ করে জীবনের মধুময় সময়টাকে হেলায় হারিয়েছি। আমার যৌবন বিগত, দেহসৌষ্ঠব নষ্ট। অথচ দেখুন, গত বিশ বছর ধরে আমি তো আর দশটা যুবতীর মতো জীবনকে উপভোগ করতে পারতাম, যখন তখন আরণ্যক পরিবেশে চুটিয়ে প্রেমলীলা উপভোগ করতে পারতাম। ম্রিয়মান না থেকে মনের মানুষটিকে পাশে নিয়ে, গাছ-গাছালির ছায়ায় অনাবিল সুখ উপভোগ করবার সম্ভাবনা নিশ্চয় আমার ছিল। এই যে ভাবনা, আক্ষেপ, আমাকে কি দিন কি রাত অধিকার করে রাখে, আমি কখনো অতিমাত্রায় চঞ্চল, কখনো প্রস্তরবৎ। ক্রমশই আমি স্বাপ্নিক হ'য়ে উঠলাম, স্বপ্নই আমাকে উজ্জীবিত করে, বয়সোচিত গাম্ভীর্যের বদলে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় ভেসে যেতে থাকি। বৈষয়িক ভাবনা-চিন্তা এবং তৎসংলগ্ন শব্দস্রোত আর আমাকে নাড়া দেয় না, প্রেমসুধা উপভোগের বাসনায় আমি উন্মাদপ্রায়।

কিন্তু মঁসিয়ে ব্যুরেনের কাছে তো এ কথা চট করে খুলে বলতে পারি না; কারণ, সে অবাক হবে, মস্করা করবে, টুকিটাকি কেনাকাটার ব্যবসায়িক উপদেশ দেবে, ফলতঃ আমার অকাল-প্রাপ্ত সবুজতা উপেক্ষায় ফিকে হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যুরেনের কাছে এই প্রস্তাব দেবার বিশেষ আগ্রহও আমার ছিল না—প্রেম ও কামনার তাগিদে কল্যাণময়ী রমণীটি হয়ে থাকবার বাসনা ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু বিপদ, আয়নার বুকে প্রতিবিম্বিত আমার দেহ বিগতযৌবনা, রূপ ও রস-হীন যাকে পুঁজি করে অন্য কোন নাগর সংগ্রহের ফিকির খোঁজা বৃথা।

অতএব, একদা বুকের সাহস মুখে এনে হাতের হস্কা খেলিয়ে ওকে বললাম, চলো না গো আমাদের সেই মিলনের প্রথম স্থানটিতে বেরিয়ে আসি। ও আমার মনের কথা টের পায়নি, হয়তো ভেবেছে ক্বচিৎ মুক্ত বায়ুর আকর্ষণে সহধর্মিণীর এই প্রস্তাব। ব্যুরেন রাজী হ'য়ে গেল।

অনেক কাল পরে আমরা তাই যৌথ বিহারে এসে পৌঁছলাম; ফসল ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে বর্তমান তছনছ, বুঝি আমি আমার কৈশোরের মত চপলা, চোখের রঙও বদলে গেল স্যার—স্বামীটিকে দেখছি ঠিক তেমনি শান্ত চোখ সুদর্শন তরুণ। এতটুকু দোমনা হলাম না, আমার কাছে এই সুখটুকুই বাস্তব হ'য়ে গেল, কারণ নারীর মনে বসন্ত চিরায়ত। যুবতীসুলভ ছলাকলায় আমি তখন ব্যস্ত, রাগ অনুরাগের প্রাবল্যে ব্যুরেনকে অহরহ চুমু খেতে লাগলাম, আমার এই জুত করে জড়িয়ে ধরা ও সোহাগের প্রাবল্য দেখে বিস্মিত ব্যুরেন বললো, 'কি ব্যাপার বলতো? এমন করছো কেন?'

এ কথার জবাব দেবার মতো মানসিকতা তখন আমার নয়, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস ও বুকের ওঠানামাই একমাত্র সত্য, আমি ওকে জোর করে বনের আড়ালে নিয়ে গেলাম। তারপরের ব্যাপারটা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এবং জেনেও গেছেন। আমি যা বলবার, অকপটে বললাম।"

মেয়র সাহেব লোক খারাপ নন। মুচকি হেসে রায় দিলেন: "নির্বিঘ্নে ফিরে যাও। তবে হ্যাঁ, বনের মধ্যে ও কাণ্ড করতে আর কখনও এসো না।"

মডেল

Model

মোঁমাত্রে'র সেই পুরনো মদের আড্ডা আবার এখন জমজমাট। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে, চলবে রাত গভীর অব্দি। এখানে যারা জমায়েত হয়, তারা সকলেই সাবালক শিল্পী! বিভিন্ন মুখ, হরেকরকম চেহারা, কেউ লিকপিকে, কেউ বা সিন্ধুঘোটকের মতন থপ্‌থপিয়ে চলতে অভ্যস্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সস্তা মডেলকে চোখের সামনে রেখে শ্বাসরোধকারী নীরবতার মধ্যে তুলির আঁচড় কাটতে কাটতে যারা হাঁপিয়ে ওঠে, তারাই নিজেদের দুর্গন্ধময় দেহটাকে টেনে আনে এখানে, হৈ-হুল্লোড়ে মেতে ওঠে, কমদামী সাধারণ মদ আকণ্ঠ গিলে যেন ট্রাপিজের খেলা দেখায়। সময়ে ওরা টেবিল বাজিয়ে গান গায়, কেউ আবার ঘুম জড়ানো গলায় প্রলাপ বকতে বকতে গণিকা পাড়ার দিকে রওনা দেয়। অধিকাংশ স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন চিত্রকরের কপালে যা জোটে, এরা তার ব্যতিক্রম নয়—সেই দারিদ্র্যভরা খামখেয়ালী জীবন। প্রতি মুহূর্তে শক্তিক্ষয় এবং কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবার বাসনার বিরাট টিউলিপ আকৃতির গেলাসে ক'রে আগুনের মতন পানীয় গলায় ঢালা।

সাত মাথা এক হ'য়ে নরক গুলজার করছে। তাদের পায়ের তলাটা স্যাঁতসেঁতে, নাকের কাছে পাইপের ধোঁয়া আর বাতাসে বাসি মদের গন্ধ।

পিয়ের তার লাল গালটা চুলকোতে চুলকোতে বললো, "কাল আমি পিগালে যাবো। বিশ্বাস কর, ওখানকার মডেলরা যে কী সুন্দরী! পাকা আপেলের মতন বুক আর নেসপাতির মতন পাছা।"

ফ্যাঁস্ করে হেসে উঠলো ষণ্ডা চেহারার রাস্ত, "পিগালে তো বেশ্যাদের আড্ডা। বহুল ব্যবহারে ওদের শরীর সব বেঢপ। তুই বুঝি ইদানিং ওদেরই মডেল পাকড়েছিস ?"

পিয়ের প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "বেশ্যা হোক, যাই হোক, শরীর তাদের অটুট। যাস একদিন পিগালে, দেখিয়ে দেবো মডেল কাকে বলে!"

মডেল নিয়ে এদের বাদ-প্রতিবাদ ক্রমশ তুঙ্গে ওঠে এবং সেই শব্দে কাঠের ছাদটা কাঁপতে থাকে। ঠিক তখনই হঠাৎ এক বৃদ্ধের আগমন ঘটলো এদের টেবিলে। খুব পুরনো ওভারকোটে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা, একমুখ সাদা দাড়ি তিরতিরিয়ে কাঁপছে, চোখ দুটো লাল হলেও অসম্ভব উজ্জ্বল, সারা কপালের চামড়া কুঁচকে আছে।

রাস্তু ফিসফিসিয়ে ওঠে, "মঁসিয়ে জিদলার!"

পিয়েরও সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলে, "বসুন জিদলার।"

হাঁটুতে হাত রেখে জিদলার সান দেন। ওঁর নখে তখনো রঙের ছোপ লেগে আছে, হয়তো এইমাত্র স্টুডিও থেকে আসছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কি নিয়ে আলোচনা করছিলে?"

ছোকরা শিল্পী এডগার উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠে, "মডেল নিয়ে! আমরা সবাই যে যার মডেলের সুখ্যাতি করছি।"

বৃদ্ধ রহস্যময় হাসি হাসেন।

রাস্তু বললো, "পিয়ের তার মডেলের পশ্চাদ্দেশ দেখে তৃপ্তি পায়। আর আমি দেখি মডেলের সর্বাঙ্গ।"

সঙ্গে সঙ্গে পিয়ের প্রতিবাদ জানায়, "একদম বাজে কথা।"

জিদলার হাত তুলে ওদের থামিয়ে দেন। এক গেলাস মদের অর্ডার দিয়ে কি যেন ভাবেন তারপর সামান্য গম্ভীর স্বরে বলেন, "তোমরা মডেল নিয়ে কামড়া-কামড়ি করো। অথচ, আমি কোন মডেল ছাড়াই দিনের পর দিন ছবি আঁকছি।"

অন্য এক শিল্পী প্যাস্তো বেফাঁস বলে ওঠে, "সেই জন্যই তো আপনার ছবি বাজারে বিকোয় না।"

দপ্ করে জ্বলে ওঠে জিদলারের চোখ ও গলার স্বর, "তোমাদের ছবি বিক্রী হয়? যথেষ্ট পয়সা পাও তোমরা? যদি পেতে, তাহলে আর এখানে বসে আড্ডা মারতে না।"

পিয়ের জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি কোনদিন মডেলের সাহায্য নেননি?"

গেলাসে চুমুক দিলেন জিদলার। আবার তাঁর মুখে সেই রহস্যময় হাসি। ক্রমশ সেই হাসি অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ভরে যায়। কাঁপা-কাঁপা গলায় বিড় বিড় করতে থাকেন, "হ্যাঁ, এককালে আমারও চোখের সামনে মডেল ছিল। একটি মাত্র মডেল, যার রূপ ও গভীরতার কোন ব্যাখ্যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, একমাত্র রঙেই তা ব্যক্ত করা সম্ভব!...সে ছিল লিসা, আমার স্ত্রী লিসা।...."

এডগারের গলায় আবার সেই উৎসাহ, "কোথায় আছেন তিনি? নিশ্চয় এতদিনে বুড়ি হ'য়ে গেছেন। তবু আমরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।"

বৃদ্ধার সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে ওঠে, যেন তিনি কারুর কথা শুনতে পাননি এমন ভাবে বলে চলেন, "আমার সেই মডেল চুরি গেল। কোথাকার এক কাউণ্ট বাজারে লিসার পোর্ট্রেট দেখেই শয়তান হ'য়ে উঠেছিল। আমি গরীব শিল্পী। আমার মডেল হারিয়ে গেল!....আর তোমরা নিত্য-নতুন মডেল নিয়ে হুল্লোড় করো, গর্বে ডগমগ হ'য়ে ওঠো।...যত্তো সব!...."

এক গেলাস মদ খেয়েই টলতে টলতে ফিরে গেলেন জিদলার।

ওঁর দেহটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল চাপড়ে রাস্তু মন্তব্য করে, "পাগল! পুরনো যুগের বদ্ধ পাগল।"

"পাগল!"

—সেই মন্তব্যের সামিল হ'য়ে এরা সকলে আর এক দমক হেসে ওঠে।

—অনুবাদ: শেখর সেনগুপ্ত

মোহমুক্ত

The charm dispelled

নৌকোটা যাত্রীতে ভরে উঠল। বাতাস অনুকূল থাকায় হাভারের যাত্রীরা ক্রভিল যাবার জন্য নিশ্চিন্তে চেপে বসল নৌকোটায়। আর জায়গা না থাকায় ক্যাপ্টেন বাঁশি বাজিয়ে নৌকোটা ছেড়ে দিল। যাত্রীরা হাত ও রুমাল নেড়ে উৎসাহের সঙ্গে তাদের আত্মীয় স্বজনদের বিদায় জানাতে লাগল। যেন তারা অনেক দূর দেশে যাচ্ছে।

তখন জুলাই মাস। উত্তপ্ত সূর্যের কিরণ ঝরে পড়ছিল জলে। সেন নদীটাকে বাঁ দিকে ফেলে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম সমুদ্রের দিকে। নৌকোর উপর উঠেই আমি ডেকের যাত্রীদের মধ্যে আমার পরিচিত কোন মুখের খোঁজ করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন আমার নাম ধরে ডাকল। ঘুরে দেখলাম তার নাম হেনরি সিদোনিক। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ দশ বছর দেখা নেই।

তার সঙ্গে প্রথম করমর্দনের পর দু'জনে বোটের মধ্যেও খাঁচার ভালুকের মত এক পা এক পা করে কিছুটা বেড়ালাম। আমাদের নৌকোটায় ইংরাজ যাত্রী বেশী ছিল। বিশেষ করে ইংরেজ মেয়েযাত্রী ছিল বেশী। সাপের মত বিনুনি করা চুলের উপর টুপী মাথায়, সাদা স্কার্ট আর নীল জুতো মোজা পরা তরুণী ইংরেজ মেয়েদের দেখে মনে হচ্ছিল ইংরেজরা সত্যিই নৌশক্তিতে সুদক্ষ। আমার বন্ধু সিদোনিক কিন্তু ইংরেজ যাত্রীদের পানে বারকতক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এত ইংরেজ ফরাসীদেশে ছিল? কোথায় যাচ্ছে?

আমি বললাম, ওরা সবাই যাচ্ছে ক্রভিল। কিন্তু তুমি ওদের দেখে বিরক্ত হচ্ছ কেন?

সিদোনিক বলল, আমি ওদের বিষয়ে খুব ভালই জানি। তুমি হয়ত জাননা, আমি নিজে একজন ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করেছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তাহলে আমাকে তোমার বিবাহিত জীবনের সব কথা খুলে বল। তোমার ইংরেজ স্ত্রী কি তোমার জীবনে কোন অশান্তি সৃষ্টি করেছে? সে কি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে?

সিদোনিক বলল, না, তা ঠিক না। তবে তাকে ঠিক আমার আর ভাল লাগে না। তার কথা শুনলেই বিরক্তি বোধ হয়।

আমি বললাম, তোমার বিরক্তির কারণ কি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সিদোনিক তখন বলল, তাহলে শোন বলছি সব কথা। বছর ছয়েক আগে আমি একবার এশিয়াতে গ্রীষ্মটা কাটাতে যাই। আমি ছিলাম একা। জীবনে বিয়ে করার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল না আমার। নিঃসঙ্গ জীবনযাপনই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু আমার সে লক্ষ্যের পথে বাধ সাধল এত্রিয়াতের সমুদ্রতীর। সমুদ্রে স্নানরতা অথবা স্নানান্তিকা অথবা প্রশস্ত বেলাভূমিতে স্বল্পাবৃত অবস্থায় শায়িতা তরুণী

মেয়েদের দেখে কোন অবিবাহিত যুবকের কখনো মাথার ঠিক থাকতে পারে না। প্যারিসে যেমন বয়স্ক মেয়েদের ভিড় বেশী তেমনি এত্রিয়াতের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে দেখবে তরুণী মেয়েদের ভিড়। তার উপর যদি তুমি দেখ তোমার সামনে সমুদ্রের উদার বেলাভূমিতে আঠারো বছরের এক সুন্দরী তরুণী ছুটে বেড়াচ্ছে অথবা পথের ধারের কোন ফুলগাছ হতে ফুল তুলছে তাহলে তুমি কখনই তোমার কৌমার্য রক্ষা করতে পারবে না।

এমন সময় এক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। পরিবারের ছয়জন লোকের মধ্যে বাবা মা আর চারটি ছেলেমেয়ে। দুটি ছেলে বড় হয়েছে, অন্য দুটি মেয়ের মধ্যে একটি বড়, অন্য একটি সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছে। এই ছোট মেয়েটির রূপে মন আমার মজে গেল। আমার সারা জীবনের সব স্বপ্ন সব আশা আকাঙক্ষা মূর্ত হয়ে দেখা দিল তার দু'চোখের তারায়। আমি সব ভুলে গেলাম। ওলট পালট হয়ে গেল আমার জীবনের সব লক্ষ্য।

আমাদের ফরাসী জাতির একটা দোষ কি জান। তারা বিদেশীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। মেয়েটি বিদেশিনী বলেই হয়ত তাকে বেশী করে ভালবেসে ফেললাম। তার মুখে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ফরাসী ভাষা শুনতে তখন খুব ভাল লাগত আমার। কিন্তু কি আশ্চর্য! এখন তার মুখে সেকথা শুনতে আর মোটেই ভাল লাগে না। আর শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে আজও নির্ভুলভাবে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে না।

আমি বললাম, তোমার স্ত্রী এখন কোথায় আছে?

সিদোনিক বলল, তাকে এখন এত্রিয়াতেই রেখে এসেছি। আমি এখন যাচ্ছি ক্রভিলে। কিছুদিন একা একা বেড়াব।

কথায় কথায় ক্রভিলের বন্দর এসে গেল। সিদোনিক নামার আগে আমায় বলল, যারা বিয়ে করেনি তারা বেশ ভাল আছে। তুমি ধারণা করতে পারবে না বিবাহিত লোকদের জীবনে তাদের স্ত্রীরা এক এক সময় কী ধরনের বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

ম্যাদময়জেল

Mademoiselle

তার নাম ছিল জাঁ মেরি ম্যাথিউ ভেলার। কিন্তু লোকে তাকে বলত, ম্যাদময়জেল, যা বলা হয় কোন কুমারী মেয়ের নামের আগে। ছোটবেলায় তার চেহারাটা ফর্সা আর রোগা-রোগা ছিল বলে তার মা আর ঠাকুরমা তাকে ম্যাদময়জেল বলে ডাকতেন। মা, ঠাকুরমা মারা গেলেও সেই নামটা বাইরে প্রচারিত হয়ে যায়। তাই গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সকলেই তাকে ম্যাদময়জেল বলে ডাকে। এমন কি ওর পোশাকটাও ছিল

মেয়ের মত। ও সাধারণতঃ পরত লম্বা ফ্রক আর টুপী। দেখলেই একনজরে মেয়ের মতই মনে হয়।

ওকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা উপহাস করলেও ওর থাকা খাওয়ার কোন ভাবনা ছিল না। পরের কাছে হাত পাততেও হত না। মা ওর জন্য কিছু সম্পত্তি রেখে যান। তার থেকেই ওর চলে। ওর বাবার এক কাকা আছেন। তিনিই ওকে ছোট থেকে মানুষ করে তোলেন।

গাঁয়ের কোন উৎসবে ওর বয়সের ছেলেরা যখন এক একজন মেয়ের হাত ধরে নাচত ও তখন একা নাচত। কেউ যদি কখনও বলত তুমি কোন মেয়ের সঙ্গে নাচ না কেন, ও তখন বলত, আমি ত ছেলেদের মত পোশাক পরে নেই তাই একাই নাচি।

কেউ কেউ ওকে বলত, তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে মেয়ে বলে।

ও বলত, লোকে আমাকে মেয়ের পোশাকে দেখে মজা পায় বলেই আমি এ পোশাক পরি। ইচ্ছা করেই পরি।

একদিন ওর কি মনে হলো, ও সকালে উঠে পুরুষের পোশাক পরে বার হলো গাঁয়ের পথে। একটা পায়জামা, একটা কোট আর মাথায় পুরুষের টুপী। কিন্তু পথে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা পিছু নিল ওর। সবাই তাড়া করল ওকে। ঠাট্টা টিটকারিতে অতিষ্ঠ করে তুলল ওকে। এমন কি বয়স্ক মানুষরাও নানা রকমের প্রশ্ন করতে লাগল ওকে।

মনে মনে রাগ করল ও। কেন ও ত সত্যি সত্যিই পুরুষ মানুষ। পুরুষের মত পোশাক পরে কি ভুল বা কি অন্যায় করেছে ও? অনেক ভাবনা চিন্তা করেও কিছু বুঝতে পারল না। ব্যাপকতর বিদ্রূপের ভয়ে ও পরদিন আবার মেয়ের পোশাক পরে বার হলো পথে। কিন্তু মনের মধ্যে ওর বিদ্রোহ রয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করে রাখল, যে যাই বলুক ও যে পুরুষ একথাটা সামাজের সকলের সামনে প্রচার করবে একদিন জোর গলায়। ওর পুরুষত্বকে একদিন সকলের চোখের সামনে প্রতিষ্ঠিত করবে। আর তার জন্য উপযুক্ত সুযোগ খুঁজতে লাগল ও।

গাঁয়ে যেদিন কোন নাচগানের উৎসব হত ও প্রায়ই শুনত ওর বয়সের ছেলেরা গর্ব করে বলত কে কোন মেয়েকে নিয়ে নেচেছে, কে কোন মেয়ের দেহটাকে উপভোগ করেছে। তারা আরও বলত যেসব ছেলেরা জোর করে এগিয়ে যায় সাহস করে মেয়েরা তাদের খাতির করে। ও দেখত নাচগানের পর মেয়েদের কোমর ধরে ছেলেরা অন্ধকার বনপথ ধরে চলে যাচ্ছে আপন আপন ঘরের দিকে। অনেক সময় সেই পথের ধারে অন্ধকারে আপন আপন প্রেমাস্পদের সঙ্গে নর্মক্রিয়ায়ও প্রবৃত্ত হয়ে পড়ত। ও এমন অনেকদিন দেখেছে।

একদিন রাত্রিবেলায় নাচগানের উৎসব শেষ হয়ে গেলে ম্যাদময়জেল সেই অন্ধকার বনপথের ধারে একা একা দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ জোশেফিন নামে একটি সুন্দরী যুবতীকে

সেই পথ দিয়ে যেতে দেখেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জোশেফিন তখন তাকে জোর করে ঠেলে ফেলে দিল। ম্যাদময়জেল তার গলাটা দু'হাত দিয়ে টিপে ধরে। জোশেফিন তখন ভয়ে চীৎকার করতে থাকে। তার চীৎকার শুনে পথচারীরা ছুটে আসে। তারা জোর করে ম্যাদময়জেলকে ঠেলে সরিয়ে দিলে সে উঠে এসে বীরদর্পে সকলের সামনে জোর গলায় বলে, আর আমি মেয়ে নেই। আমি পুরুষ। একথা আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি। জানিয়ে দিচ্ছি।

দার্শনিক

A philosopher

ব্লেরত ছিল আমার সুদূর শৈশবের বন্ধু। সে আমার এত অন্তরঙ্গ ছিল যে জীবনের যতসব গোপন কথা অকপটে বিশ্বাস করে বলতে পারতাম তার কাছে। আর সেও সব অকুণ্ঠভাবে বলত আমার কাছে।

এ হেন অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্লেরত যখন একদিন বলল সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তখন সত্যিই একটা অজানা অব্যক্ত ব্যথায় মনটা আমার ভরে গেল। মনে হলো তার বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের দু'জনের এই বন্ধুত্বের নিবিড়তা আর থাকবে না। মনে হলো, আমাদের দু'জনের এই অবিচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গতার মাঝখানে এক অনতিক্রম্য বাধা হয়ে তার স্ত্রী এগিয়ে আসছে। আরো মনে হলো জীবনে স্ত্রীর থেকে একদিক দিয়ে বন্ধু অনেক বড়। অনেক মানুষ স্ত্রীকে তার জীবনের অনেক গোপন কথা বলতে পারে না। কিন্তু বন্ধুকে তা বলতে পারে।

ব্লেরতের বিয়েটা যখন রেজেস্ট্রী হয় তখন সেখানে আমি যাইনি। তবে চার্চে ও তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তার স্ত্রী সত্যিই সুন্দরী। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। সুন্দর চোখ মুখ। আমাকে পেয়ে ব্লেরত আবেগের সঙ্গে বলল, সত্যিই আমি সুখী। আমি সত্যিই আমার মনোমত স্ত্রী পেয়েছি। রূপে গুণে অদ্বিতীয়া অতুলনীয়া সে। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। দেখলাম সত্যিই গুণবতী তার স্ত্রী। প্রথম পরিচয়েই সে আপন করে নিল আমাকে। আন্তরিকতার সুরে বলল, আসবেন, এ বাড়ি নিজের মতো মনে করবেন।

কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই দেশভ্রমণে বেরিয়ে গেলাম। আঠারো মাস ধরে জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশ ঘুরে অবশেষে প্যারিসে ফিরে এলাম। ব্লেরতের কথাটা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম।

আসার পরদিনই আমি বুলভার্ড অঞ্চলে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখলাম ব্লেরত আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে চিনতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। এই ক'মাসের

মধ্যে সে যে এমনভাবে বদলে যাবে চেহারায় আমি কোন মতেই ভাবতে পারলাম না।

কিন্তু ব্লেরত আমাকে চিনতে ভুল করেনি। আমাকে জড়িয়ে ধরে বদেভিল থিয়েটারের দিকে নিয়ে গেল। তার চেহারাটা অসম্ভব রকমের রোগা হয়ে গেছে, তার চোখগুলো কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে। মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে মত দেখাচ্ছিল। বেশীক্ষণ হাঁটতে বা কথা বলতে পারছিল না সে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?

ব্লেরত বলল, ডাক্তার বলেছে এ্যানিমিয়া।

আমি বললাম, তুমি কোন মনোকষ্ট পাচ্ছ না ত ?

ব্লেরত বলল, না, আমি খুব সুখে আছি। আমার স্ত্রী সত্যিই খুব ভাল মেয়ে। আমি তাকে আগের থেকেও বেশী ভালবাসি।

আমি তবু জিদ ধরলাম, সব কথা আমাকে বল। কিছু গোপন করো না।

ব্লেরত প্রথমে কিছু বলতে চাইলে না। এড়িয়ে যেতে লাগল বারবার। তারপর আমার অনেক পীড়াপীড়িতে বলল, বলব আর কি, কারো কোন দোষ নেই, আমার ভালবাসাই আমাকে দিনে দিনে হত্যা করছে।

আমি তার কথা বুঝতে পারলাম না। সে তখন আমাকে বলল, আমার স্ত্রীর প্রতি আমি এতই আসক্ত যে সেই আসক্তির আতিশয্যই আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি আর বেশীদিন বাঁচব না।

তখনও আমি তার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। সে বলল, রোজ ভাবি, না, এভাবে আর চলবে না,আমি কোথাও চলে যাব। দূরদেশে কোথাও। তাহলে আমি বেঁচে যাব। কিন্তু যখনি বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী একা একা আমারই পথ চেয়ে বসে রয়েছে। যখন সে আমার মুখপানে গভীর দৃষ্টিতে তাকায়, যখন দেখি তার কম্পিত অধরোষ্ঠে চুম্বনের একটা তপ্ত পিপাসা উত্তাল হয়ে উঠেছে তখন আমি সব ভুলে যাই। তখন আমি তাকে আবার জড়িয়ে ধরি। আবার সেই নিষিদ্ধ দেহসংসর্গে লিপ্ত হই। এইভাবে আমার স্ত্রীর প্রতি উন্মত্ত আসক্তির রূপ ধরে আমাকে ধীরে ধীরে জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি এর পরিণতি কোথায়। কিন্তু কোনমতেই নিবৃত্ত করতে পারছি না নিজেকে।

আমি বললাম, এক কাজ করো, তোমার স্ত্রীর কাছে এক প্রেমিক জুটিয়ে দাও। তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নাও।

কিন্তু কথাটা মনঃপূত হলো না ব্লেরতের; সে উঠে গেল আমার কাছ থেকে।

তারপর থেকে দু'মাস কোন খবর পাইনি ব্লেরতের। একদিনও দেখা হয়নি কোথাও তার সঙ্গে। রোজ ভাবতাম তার শোকযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য একখানা চিঠি পাব যেকোনদিন। কিন্তু আমার সে ভাবনা ভুল প্রমাণিত হলো। ছ'মাস পর সত্যিই একদিন দেখা পেলাম ব্লেরতের। দেখলাম তার স্বাস্থ্য ফিরে গেছে। চেহারার উজ্জ্বলতা অনেক

বেড়ে গেছে। আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু সে তার কোন উত্তর দিল না। সে জোর করে তার বাড়িতে সন্ধের সময় ডিনার খাবার জন্য নিয়ে গেল আমাকে।

তার স্ত্রী আমায় আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল। ব্লেরত ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, লুসিয়েঁ আসেনি এখনো ?

তার স্ত্রী বলল, না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন লম্বা ভদ্রলোক এসে খাবার টেবিলে যোগদান করল। আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল ব্লেরত। আমি লক্ষ্য করলাম লুসিয়েঁ আর ব্লেরতের স্ত্রীর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। অথচ ব্লেরতকে খুব খুশি আর নির্বিকার দেখা যাচ্ছিল।

খাওয়ার পর ব্লেরত তার স্ত্রীকে বলল, আমি আমার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি। তোমরা থাক।

বাইরে বেরিয়ে এসে ব্লেরত হঠাৎ আমায় বলল, চল না আজ সন্ধ্যায় কিছু মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করা যাক।

আমি উত্তর করলাম, তোমার যা খুশি।

নারীর ফাঁদ

Woman's Wiles

নারী ? কে শুনতে চাও নারীদের সম্বন্ধে ? নারীর মত এমন কোন যাদুকর নেই যারা তাদের খেয়াল খুশিমত আমাদের ফাঁদে ফেলে আমাদের উপর চাতুরী খেলে নিজেদের কাজ হাসিল করে চলে যায়। তোমরা হয়ত বলতে পার অনেক সময় এ কাজ বাধ্য হয়েই করে নারীরা। আর তাছাড়া পুরুষরাও অনেক সময় অত্যাচার করে নারীদের উপর। কিন্তু পুরুষদের খেয়াল খুশিগুলিকে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে কাজে লাগিয়ে তাদের সঙ্গে মিষ্টিভাবে প্রতারণা বা ছলনার খেলা খেলতে নারীদের মত আর কেউ পারবে না।

এই কথাগুলো বললেন ফ্রান্সের ভূতপূর্ব বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী কাউন্ট দ্য লিঁয়। লিঁয়র কথাগুলো একজন যুবক আগ্রহ সহকারে শুনছিল।

লিঁয় আবার বলতে শুরু করলেন, তুমি জান, আমাকে সাধারণ এক অশিক্ষিত গৃহস্থ স্ত্রীলোক আশ্চর্যভাবে ঠকায়। আমি তখন ছিলাম বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী। রোজ সকালে শ্যাম এলিসি অঞ্চলে হাওয়া খেতাম। সেখানে রোজ এক সুন্দরী রমণীকে গর্বভরে চলে যেতে দেখতাম। মেয়েটি যাবার সময় আমার প্রতি কটাক্ষ করে যেত। একদিন তাকে একটা বেঞ্চের উপর একা একা বসে থাকতে দেখে তার পাশে বসে

আলাপ করলাম তাঁর সঙ্গে। প্রথম আলাপেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমরা পরস্পরের। সে বলল, তার স্বামী সামান্য এক কেরাণীর কাজ করে। আমার পরিচয় শুনে সে চমকে উঠল।

পরদিন সে আমার দপ্তরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করল। তারপর থেকে রোজ আমাদের সকালে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখা হতো। দেহমিলন হতো। বিশেষ করে রোজ সকালে পার্কে দেখা হতো আমাদের। তখন ঠিক হতো আবার কবে কোথায় দেখা হবে।

মাস দুই পরে একদিন সকালে দেখলাম, তার চোখমুখ অস্বাভাবিক রকমের ভার। মনে হলো, তার চোখের কোণে জল দেখা যাচ্ছে। আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হলো তোমার?

সে বলল, আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছি।

আমি বললাম, তাতে কি হয়েছে। তুমি ত বিবাহিতা, তোমার স্বামী আছে।

সে বলল, আমার স্বামী আছে বটে, কিন্তু সে এখন ইটালিতে। ছ'মাস হলো এখানে নেই আর এখন সে আসবেও না।

তার কথাটা সত্যিই বুকটাকে বিদ্ধ করল অতর্কিতে। আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। এই অবৈধ অবাঞ্ছিত পিতৃত্বের দায়িত্ব হতে মুক্ত করতে চাইলাম নিজেকে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল আমার মাথায়। বললাম, তুমি এখনি তোমার স্বামীর কাছে কোন একটা অজুহাতে চলে যাও।

দেখলাম সে রাজী। তবু তাকে ইতস্তত করতে দেখে বুঝলাম, সে কিছু টাকা চায়। তখন তার হাতে পথ খরচের জন্য কিছু টাকা দিয়ে বললাম, দেরি না করে অবিলম্বে সেখানে চলে যাও।

দিনকতক পর তার একখানা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, আমার স্বাস্থ্য ভালই আছে। তবে পেটটা মোটা হয়ে উঠেছে। আমার স্বামী কিছু সন্দেহ করেনি। প্রসবের সব ঝামেলা চুকে গেলে একেবারে দেশে ফিরব।

আট মাস পরে সে আবার জানাল একখানি চিঠিতে তার এক পুত্র সন্তান হয়েছে।

এব মাসখানেক পরেই সে একদিন আমার কাছে এসে হাজির। আমি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে আমার রু দ্য গ্রেনেলের বাড়িতে বাস করছি। সে আবার আগের মত আমার কাছে আসতে লাগল। একদিন সে বলল, তুমি কিন্তু বড় নিষ্ঠুর, তোমার ছেলেকে একবারও দেখতে চাও না।

আমি বললাম, আমার দেখার দরকার নেই। তুমি বরং কিছু টাকা নাও। তার দেখাশোনা করো। তার খাওয়া পরার দিকে যত্ন রেখো।

কিন্তু সে আমায় এত চাপ দিতে লাগল যে একদিন আমি কথা দিলাম পরদিন সকালে আমি পার্কে গিয়ে আমার ছেলেকে দেখে আসব, সে কোলে করে নিয়ে আসবে।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে আমি গেলাম না। ভাবলাম ছেলেটার যদি মায়ায় পড়ে যাই, মনে আবেগ আসে তাহলে মুস্কিলে পড়ে যাব। আমি না গিয়ে ভাইকে মেয়েটার ঠিকানা দিয়ে তার খোঁজ খবর নিতে বললাম। তাকে আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বললাম।

আমার ভাই ঠিকানা খুঁজে ঠিক তার বাসায় যায়। কিন্তু তখন সে বাসায় ছিল না বলে দেখা হয়নি। কিন্তু সেখানে আর যারা ছিল তাদের কাছে আমার ভাই অনেককিছু জানতে পারে। জানতে পারে তার কোন সন্তান আদৌ হয়নি। আর সে কোনদিন ইটালিও যায়নি। তবে তার স্বামী সত্যিই ভাল লোক এবং বরাবর এখানেই থাকে।

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার খুব রাগ হলো। মেয়েটা তাহলে প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে। ছলনার খেলা খেলেছে। আমি একটা দিন ঠিক করে আমার বাড়িতে আসতে বললাম তাকে। তারপর আমার ভাইকে বললাম, আমি থাকব না। তুমি নির্দিষ্ট সময়ে তার সঙ্গে দেখা করে তাকে প্রশ্ন করে জানবে কেন সে প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে। তারপর এই দশ হাজার ফ্রাঁ তাকে দিয়ে বলবে এই টাকাটা আমি দিচ্ছি। আর যেন সে কখনো আমার কাছে না আসে।

যথাসময়ে সে আমার বাড়ি এলে আমার ভাই তাকে সব কথা বললে সে উত্তর করে, ছলনার আশ্রয় না নিলে কাউন্টের মত এতবড় লোককে তিন বছর আমার প্রেমে আবদ্ধ করে রাখতে পারতাম না। কাউন্ট সেদিন পার্কে গেলে আমি আমার এক দিদির ছেলেকে দেখাতাম।

আমার ভাইয়ের দেওয়া টাকাটা তুলে নিয়ে সে বলে, ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের। কাউন্ট কি আমার সঙ্গে আর দেখা করবে না?

আমার ভাই উত্তর দেয়, না, আর কোনদিন না।

কিন্তু মেয়েটা তখন নির্বিকারভাবে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যায় আমাদের বাড়ি থেকে। সুতরাং আবার বলছি এই ধরনের বাস্তুঘুঘুদের কখনো বিশ্বাস করবে না।

চন্দ্রালোক

Moonlight

মাদাম জুলি রুবেয়ার তার বোন মাদাম হেনরিয়েত্তে লেতোরের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। মাদাম হেনরিয়েত্তে সবেমাত্র সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ করে দেশে ফিরেছে।

মাদাম লেতোর সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে তার স্বামীকে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের গাঁয়ের খামারবাড়ি ক্যালভাডোসে। তাঁর সেখানে জরুরী কাজ আছে। স্বামীকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে প্যারিসে বোনের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। আর তারই জন্য অপেক্ষা

করছে মাদাম জুলি রুবেয়ার। অন্যমনস্কভাবে একটা বই পড়তে পড়তে অপেক্ষা করছিল মাদাম জুলি।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সবেমাত্র ঘন হয়ে উঠতে শুরু করেছে এমন সময় সদর দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠল। মাদাম লেতোর সোজা বাড়ি ঢুকে তার বোনের কাছে চলে এল। দু'জনে দু'জনকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল।

চাকরে বাতি দিয়ে গেলে সেই বাতির আলোয় মাদাম লেতোরের মাথায় ঘন কালো চুলের মধ্যে মাত্র দু'গাছি সাদা চুল দেখে অবাক হয়ে গেল মাদাম রুবেয়ার। তার মনে হচ্ছিল মাদাম লেতোরের কালো চুলের অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে আশ্চর্য দুটি রূপালি জলের ধারা। অথচ মাদাম লেতোরের বয়স মাত্র চব্বিশ। রুবেয়ারের থেকে দু'বছরের বড়। মাদাম রুবেয়ার আরো দেখল তার দিদির মুখখানা কেমন যেন এক অব্যক্ত বিষাদে মলিন।

রুবেয়ার বলল, কি হয়েছে বলত? তুমি যদি মিথ্যা কথা বল তাহলে পরে আমি সব তথ্য খুঁজে বার করব।

কাঁপা কাঁপা গলায় মাদাম লেতোর বলল, আমি একজনকে ভালবেসেছি। এই কথা বলে তার বোনের কাঁধের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মাদাম রুবেয়ার তখন তার দিদিকে বসার ঘর থেকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল। দু'জনে পাশাপাশি একটি সোফায় বসল। মাদাম লেতোর একটু শান্ত হয়ে তার সব কথা বলতে শুরু করল বোনের কাছে।

ওঃ, সেকথা কি বলব! সেদিন থেকে আমার কেবলি মনে হচ্ছে আমি যেন পাগল হয়ে গেছি। খুব সাবধানে চলবি জুলি, আমার এই ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করবি। আমরা মেয়েরা দুর্বলমনা। অল্পতেই সব দৃঢ়তা গলে যায় আমাদের। মাঝে মাঝে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে এক ভাবময় বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেলে আমাদের মনকে। তখন কোন কিছু ভাল লাগে না। তখন শুধু মনে হয় অতি অন্তরঙ্গ মানুষকে দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করি, আর বুকে বুক দিয়ে মনের কথা সব খুলে বলি।

তুমি জান আমার স্বামী ভাল লোক, আর তাকে আমি কত ভালবাসি তাও জান। কিন্তু তার মনটা এমনই পাকা পরিণত আর দৃঢ় যে সে আমাদের নরম মনের সূক্ষ্ম মধুর অনুভূতিগুলোর কথা কিছুই বুঝতে পারে না। কতবার মনে হয়েছে আমার স্বামী আমাকে দু'হাত দিয়ে আগ্রহভরে জড়িয়ে ধরে অসংখ্য চুম্বনে আমার মুখখানা ভরিয়ে দিক। আমাদের দুটো সত্তা এক হয়ে যাক সেই আলিঙ্গন আর চুম্বনের মাঝে। কতবার মনে হয়েছে আমার স্বামী বড় একা। আমার নিবিড়তর সাহচর্য তাঁর দরকার। আমি তাঁকে আদর করি চুম্বন করি! তাঁর শীতল একাকীত্বটাকে উত্তপ্ত করে তুলি আমার সান্নিধ্যের নিবিড়তায়।

এগুলো বোকামির কথা বলে মনে হতে পারে অনেকের। কিন্তু আমার যা যা সত্যি সত্যিই মনে হয়েছে আমি তাই বলছি। স্বামীর সঙ্গে প্রতারণার কথা আমি

কখনো ভাবতে পারিনি। কিন্তু আজ সেকথা ভাবছি। অথচ তার পিছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাইনি আমি। তার একমাত্র যুক্তি হলো এই যে সেদিন সুইজারল্যাণ্ডে এক পাহাড়ের ধারে লুসার্ণে হ্রদের জলে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমার স্বামীর সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড বেড়াতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলাম। চারদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ আমার অন্তরাত্মায় যখনি কোন তপ্ত আবেগ অবুঝ উচ্ছ্বাসে ফুটে উঠতে চেয়েছে বুদ্বুদের মত তখনি আমার স্বামী তাঁর শান্ত শীতল ঔদাসিন্যের অনুশাসন দিয়ে তাকে দমিয়ে দিয়েছেন। কোনদিন সূর্যোদয়কালে চার ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে বেড়াবার সময় যখন একটা পাতলা কুহেলির অবগুণ্ঠন ঢাকা পাহাড় বন নদী সমুদ্র দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি, আপন মনে হাততালি দিয়েছি, আবেগের মাথায় স্বামীকে আমায় চুম্বন করতে বলেছি, আমার স্বামী তখন কড়া গলায় জবাব দিতেন, কোন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তোমার ভাল লেগেছে তাই আমাদের পরস্পরকে চুম্বন করতে হবে—এটা যুক্তির কথা হলো না।

এইভাবে তার কথায় আমার সব আবেগ অকালে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমার সব উচ্ছ্বাস শান্ত হয়ে গেছে। আমার কেবলি মনে হত সুন্দর কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংস্পর্শে এলে মানুষের ভালবাসার প্রবণতা বেড়ে যায়। সে সংস্পর্শে প্রেমিক প্রেমিকারা আরো কাছে এসে পড়ে পরস্পরের। আমার কেবলি মনে হত আমার মনটা যেন ফুটন্ত জলের বয়লার, অথচ আমার নীতিবাদী স্বামী জোর করে তার মুখটা এঁটে দিয়েছেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমার স্বামীর মাথায় যন্ত্রণা করায় তিনি বেরোলেন না। একাই আমি হ্রদের ধার দিয়ে বেড়াতে গেলাম সন্ধের সময়। তখন আকাশে চাঁদ কিরণ দিচ্ছিল। মাথায় শুভ্র তুষারের মুকুট পরে লম্বা পাহাড়গুলো গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়েছিল। মৃদুমন্দ মিষ্টি বাতাসের আলতো ছোঁয়ায় ছোট ছোট ঢেউ জাগাচ্ছিল হ্রদের বুকে। অকারণ আনন্দের এক অনির্বচনীয় রোমাঞ্চ জাগছিল আমার সারা গায়ে। কিসের একটা অজানা আবেশ ফুলে ফুলে উঠছিল আমার অন্তরের গভীর গোপনদেশে।

হ্রদের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাসের উপর বসেছিলাম আমি। সহসা ভালবাসার এক সর্বনাশা নেশা জেগে উঠল আমার মধ্যে। আমার মনে হলো, মিষ্টি চাঁদের অফুরন্ত আলো ঝরেপড়া এই হ্রদের ধারে এই নরম ঘাসের বিছানায় আমি যদি একটি মানুষকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারতাম, যদি তার মুখে মুখ আর বুকে বুক দিয়ে মন জানাজানি করতে পারতাম। মনে হলো, আমাদের এই ধরনের ভালবাসাবাসির জন্যই ঈশ্বর এই মনোরম নিদাঘনিশীথের শান্ত শীতল বুকটাকে আলোছায়ার এমন মায়া দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছেন।

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সহসা শুনলাম কে যেন আমায় কি বলছে। মুখ ফিরিয়ে দেখি একজন যুবক আমার দিকে এগিয়ে এসে বলছে, আপনি কাঁদছেন মাদাম ?

আমি তাকে চিনতাম। যুবকটি একজন ব্যারিস্টার। অবিবাহিত। মাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল সুইজারল্যাণ্ডে। আমি এমনই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম যে আমি কী উত্তর দেব তা বুঝে উঠতে পারলাম না। সঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললাম, আমার শরীরটা ভাল নেই।

আমি কোন কথা বলতে না পারলেও, আমার অন্তরের অবর্ণনীয় আবেগকে প্রকাশ করতে না পারলেও মনে হলো আমার চারদিকের পাহাড়, হ্রদের জল আর চাঁদের আলোই আমার মনের সব কথা বলে দিচ্ছে। এক অনন্ত মাধুর্য অশ্রুত গানের মত ধ্বনিত হয়ে উঠছে যেন তাদের না বলা কথার নীরব বাঙময়তায়।

কেমন করে ঘটে গেল ব্যাপারটা তা ঠিক বলতে পারব না। কেমন করে কোন যাদুমন্ত্রবলে ঘটল তাও ঠিক জানি না। তারপর থেকে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। একবার হয়েছিল যখন সে হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। সে আমাকে একখানা কার্ড দিয়েছিল।

সবকিছু শুনে রুবেয়ার বলল, আমার কি মনে হয় জানিস দিদি। এক এক সময় আসলে আমরা কোন মানুষকে ভালবাসি না, ভালবাসি আমাদের মনের ভালবাসাটাকে। সেদিন রাত্রিতে আসলে তুমি যাকে ভালবেসেছিলে সে হলো চাঁদের আলো।

সংশয়াত্মক সুখ

Doubtful happiness

জায়গাটার নাম আমি বলতে পারব না, লোকটার নামও জানি না। শুধু জানি জায়গাটা ছিল এখান থেকে বহুদূরে এক উপকূলভাগে। সেদিন সকাল থেকে সোজা হেঁটে চলেছিলাম আমি। সূর্যকিরণে তপ্ত সমুদ্রটাকে ডাইনে ফেলে রেখে তার তীরবর্তী বিরাট গমের ক্ষেতের উপর দিয়ে অবিরাম হেঁটে চলেছিলাম আমি।

এখানকার স্থানীয় কোন লোক আমায় বলেছিল, এই ক্ষেতের শেষ প্রান্তে কমলালেবু গাছে ঘেরা একটি বাড়ির মধ্যে এক ফরাসী ভদ্রলোক বাস করেন। আপনি সন্ধের সময় তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলে রাত্রিটা সেখানে কাটাতে পারবেন।

আমি ঠিক তাই করেছিলাম। কিন্তু এখনো জানতে পারিনি ভদ্রলোক কে। শুধু জেনেছিলাম তিনি দশ বছর আগে কোথা হতে এসে সমুদ্রের ধারে এই জায়গাগুলো চাষের কাজের জন্য একে একে কিনে নেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা উষর মাটিকে উর্বর করে তুলে সোনার ফসল ফলান তাতে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা চাষের বিভিন্ন কাজ তদারক করতে থাকেন। ক্রমে টাকার নেশা পেয়ে বসে তাঁকে। তিনি খুব ধনী হয়ে ওঠেন ক্রমবর্ধমান চাষের আয়ে।

সেদিনটার কথা আমার আজও মনে আছে। আমি যখন কমলালেবু গাছে ঘেরা বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমার ডাকে বাড়িয়ালা লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। রাত্রির মত আশ্রয় চাইলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাড়ির চাকরদের কি বললেন।

আমরা একসঙ্গে খেতে বসলাম। খাবার সময় আমাকে ভদ্রলোক বললেন, জায়গাটা ভালই। তবে প্রিয়জনের কাছ থেকে এত দূরে থাকতে কারোরই মন চায় না।

আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ফ্রান্সের জন্য দুঃখ করছেন?

তিনি বললেন, আমি বলছি প্যারিসের কথা।

আমি তখন বললাম, আপনি সেখানে যান না কেন? গেলেই ত পারেন।

তিনি বললেন, হ্যাঁ সেই চেষ্টাই করছি।

এরপর তিনি খুঁটিয়ে প্যারিসের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন বুর্তেন, রিদেমি প্রভৃতি পুরুষ আর সুজান বার্নার, সোফি এ্যাস্তিয়ের প্রভৃতি মেয়েদের কথা। আমি বললাম আমি তাদের চিনি। তবে সোফি মারা গেছে।

তিনি আমাকে ভিতরের একটি প্রশস্ত ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরের সামনের দেওয়ালে দুটো বন্দুক টাঙ্গানো ছিল। এক কোণে কতকগুলো কোদাল, টাকনা ও চাষের কিছু যন্ত্রপাতি জড়ো করা ছিল। আর একটি ঘরে গিয়ে দেখলাম সারা ঘরখানা জুড়ে বহু ভাল ভাল বড় বড় ছবি সাজানো রয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটি সোনার বাক্সে একখণ্ড সিল্কের কাপড় গাঁথা একগাছি লম্বা চুলে জড়ানো একটা পিন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, এই পিনটিই আমার জীবনের সব। গত দশ বছর ধরে রোজ একবার করে দেখে আসছি এই পিনটি। না দেখে কিছুতেই পারি না।

আমি বললাম, আমার মনে হয় কোন নারীঘটিত ব্যাপারে জীবনে দুঃখ পাচ্ছেন আপনি।

কথায় কথায় ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। দোতলায় সেই বারান্দা থেকে দেখলাম বাড়িটার অদূরে সামনে দু'দিকে দুটো উপসাগরের মাঝখানে একটা পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠেনি। বাড়ির উঠোনভর্তি কমলালেবু গাছে কুঁড়ি ধরেছিল। তার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল সন্ধ্যার উতল বাতাসে।

ভদ্রলোক একসময় হঠাৎ বলে উঠলেন, জিয়ান দ্য লিমোর্স এখনো বেঁচে আছে? আপনি তাকে চেনেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ চিনি, এখন ভালই আছে। প্যারিসের মধ্যে সবচেয়ে মনোহারিণী রমণী। রাজরাণীর মত বিলাসব্যসনে জীবনযাপন করে।

ভদ্রলোক বললেন, ওকে আমি একদিন ভালবাসতাম, আজও বাসি। ওকে নিয়ে আমি তিন বছর একসঙ্গে বাস করি। এর মধ্যে আমি ওকে পাঁচ ছ'বার খুন করার চেষ্টা করি আর ও এই পিনটা দিয়ে আমার চোখদুটো কানা করে দেবার চেষ্টা করে।

আমার চোখের পাতার উপর একটা দাগ এখনও আছে। ওটা প্রেমের দাগ বলতে পারেন। আসল কথা কি জানেন ? দু'ধরনের প্রেম আছে। একধরনের সরল সাদাসিদে প্রেম আছে তাতে প্রেমিক-প্রেমিকার দু'জনের মনের খুব মিল দেখা যায়। আবার একধরনের প্রেম আছে যা অসম আর ভয়ঙ্কর। তাতে দু'জনের মনের মধ্যে কোন মিল দেখা যায় না। দু'জনের মধ্যে কোন মিল না থাকলেও কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না। আমি তার জন্য তিন বছরের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ ফ্রাঁ খরচ করি। তার চোখ মুখের মধ্যে আমি কি যে পেয়েছিলাম তা জানি না। ওকে যতই দেখতাম, ততই আরো দেখতে ইচ্ছা হত। ওকে যত ভোগ করতাম আরো ভোগবাসনা জাগত। মনে হত সব নারীকেই ঠিকমত জানা যায়, তার হৃদয়ের তল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অনন্যসাধারণ ওর নারীত্বের মধ্যে এমন এক অপরিমেয় রহস্যের গভীরতা ছিল যার তল খুঁজে পাইনি আমি কোনদিন।

ওর মতো মেয়ে আমি কোথাও কখনো দেখিনি। আমি যখন ওকে নিয়ে পথে বার হতাম তখন সব মানুষের দৃষ্টি ওর উপর পড়ত। আমার কেবলি মনে হত ও শুধু আমার একার নয়, ও সকলের। ওকে পেয়েও পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছি না অথবা ওর উপর আমার দখলিস্বত্বটাকে একান্তভাবে কায়েম করতে পারছি না এই ধরনের একটা অলস আশঙ্কা, একটা অনির্দেশ্য আক্রোশ আমার মনটাকে কুরে কুরে খেত অনবরত।

তখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। কমলালেবুর কুঁড়িগুলোর সুবাস ভেসে আসছিল সন্ধ্যার শান্ত নিস্তরঙ্গ বাতাসে। আমি বললাম, আপনি কি তাকে আবার পেতে চান ?

ভদ্রলোক বললেন, চাই মানে? আমি তাকে আজও ভালবাসি। আমি তাকে পাবার জন্য দশ বছর ধরে কষ্ট করে আসছি। এত কষ্ট করছি শুধু তারই জন্য। কারণ আমি অনেক খেটে আজ পর্যন্ত সাত আট লক্ষ ফ্রাঁ জমিয়েছি। আর কিছু হলেই দশ লক্ষ অর্থাৎ এক মিলিয়ন পূর্ণ হবে আর তা হলেই আমি চলে যাব তার কাছে। তার সঙ্গে অন্ততঃ একটা বছর সুখে কাটাতে পারব।

আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না, তারপর ?

উনি বললেন, তারপর বলব আমাকে তোমার ভৃত্য হিসাবে অন্ততঃ তোমার কাছে রেখে দাও।

আদালতের ভিতরে

In the Court room

জর্জভিলের আদালত সেদিন লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় চাষীলোকদের ভিড়ে গোটা ঘরটা একরকম ভরে গেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে জজসাহেব এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি আদালতে হাকিমগিরি করলেও পণ্ডিত লোক। তিনি হোরেস অনুবাদ করেছেন এবং ভলতেয়ার পড়েছেন।

জজসাহেব ঢুকতেই কোর্টের কেরাণী যাদের মামলার বিচার হবে প্রথমে তাদের নাম ধরে ডাকল। মাদাম ভিক্তোরি বাসকিউন বনাম ইসিদোর পাতুরোঁ।

ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে মোটা চেহারার এক গ্রাম্য মহিলা এগিয়ে এল। তার বুকে একটা চেন ঝোলানো ঘড়ি ছিল।

জজ একবার সেদিকে তাকিয়ে বললেন, মাদাম বাসকিউন, আপনার অভিযোগের কথা আপনি বলুন।

বাদী পক্ষে মাদাম বাসকিউন একা। সে যখন তার জবানবন্দীর জন্য এগিয়ে এল তখন কানের দুলগুলো জ্বলন্ত বাতির মত জ্বলজ্বল করছিল। বিবাদী পক্ষে ছিল তিনজন—একজন যুবক, তার স্ত্রী আর তার বৃদ্ধ পিতা।

মাদাম বাসকিউন জজকে বলল, হুঁজুর, এই যুবককে আমি পনেরো বছর ধরে কাছে রেখে মাতৃস্নেহে পালন করেছি। মানুষ করে তুলেছি। আমি মর্তিনে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেছি ওকে। আমার এই দানের একটি শর্ত ছিল। সে শর্ত এই যে সে আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার সেবা করে যাবে। এই দেখুন একটা কাগজে ও এই শর্তে রাজী হয়ে সই করেছে।

ইসিদের পাতুরোঁ আপত্তি করে বলল, মিথ্যা কথা হুঁজুর।

মাদাম বাসকিউন একটা স্ট্যাম্প লাগানো চুক্তিপত্র জজের হাতে দিতে জজ সেটা পড়তে লাগলেন। 'আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ইসিদোর পাতুরোঁ আমার উপকারিণী মাদাম বাসকিউনেরা নিকট এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে আমি আমার সারা জীবনকাল ধরিয়া তাঁহার সেবা করিয়া যাইব। কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে কখনো ত্যাগ করিয়া যাইব না। জর্জভিল, আগস্ট ৫, ১৮৮৩।'

কাগজটা পরে জজ বললেন, স্বাক্ষরের জায়গাটায় একটা সই রয়েছে। কে সই করেছে?

ইসিদোর বলল, আমি সই করতে জানি না হুঁজুর। ও নিজেই মিথ্যে করে সই করেছে। আমি আমার বাবা মা ও ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি সই করিনি।

জজ ইসিদোরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে মাদাম বাসকিউনের কি সম্পর্ক ছিল?

ইসিদোর বলল, আমি ওকে সঙ্গ দান করতাম। আনন্দ দিতাম।

ইসিদোরের পিতা বৃদ্ধ পাতুরোঁ বলল, আমার ছেলের বয়স পনেরো বছর পূর্ণ না হতেই মেয়েটা আমার ছেলেকে খারাপ করে। তার আগে হতেই ও তাকে আদর যত্ন করতে থাকে। তারপর ওর দেহে যৌবন এলেই ওকে কুপথে নিয়ে যায়। আমার ছেলেকে ওই মেয়েটার কবল হতে মুক্ত করা সম্ভব নয় বলেই আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি হুঁজুর।

মাদাম বাসকিউন এই সময় বলল, না হুঁজুর, ওরা মিথ্যা বলছে, আমি ছেলেটাকে মানুষের মত মানুষ করে তুলি। কিন্তু সেকথা এখন ওরা অস্বীকার করছে অকৃতজ্ঞের মত। ছেলেটা আমার দেওয়া সেই সম্পত্তি ওর নববিবাহিতা স্ত্রীকে দান করে দিয়েছে।

এবার ইসিদোর বলল, ওর কথা সত্য নয় হুঁজুর। আজ নয়, আজ হতে পাঁচ বছর আগেই আমি ওকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাই। কারণ ওর দেহটা অত্যধিক মোটা হওয়ায় আমার সঙ্গে খাপ খেত না। আমি চলে যেতে চাই। কিন্তু ও তখন আমায় মার্তিনের জমিটা নিয়ে আরো পাঁচ বছর থাকতে বলে। আমি অতিকষ্টে আরো পাঁচ বছর কাটাই ওর কাছে। তারপর চলে আসি। কাজেই ওর শর্ত আমি যথাযথ পালন করেছি বলে মনে করি। আজ আমি স্বাধীন। আমার ওপর আজ আর ওর কোন অধিকার নেই।

বৃদ্ধ পাতুরোঁ বলল, হ্যাঁ হুঁজুর, ও আজ স্বাধীন। ওর উপর মেয়েটার কোন অধিকার নেই।

জজ মাদাম বাসকিউনকে বললেন, আমি কিছু করতে পারি না মাদাম। আপনি বিধিগতভাবেই সম্পত্তিটা দান করেছেন। সুতরাং সে সম্পত্তি গ্রহীতা ইচ্ছামত তার স্ত্রীকে দান করতে পারে। আমি শুধু সব ব্যাপারের আইনগত দিকটা বিচার করে দেখতে পারি। আর কিছু করার সাধ্য আমার নেই।

মাদাম বাসকিউন তার চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

জজ তাকে বললেন, কেঁদে লাভ নেই। ও গেলেই বা কি! আর একজনকে খুঁজে নাও।

কাঁদতে কাঁদতে মাদাম বাসকিউন বলল, আর যে পাচ্ছি না কাউকে।

জজ বললেন, তোমার জন্য কাউকে আমিও খুঁজে পাচ্ছি না। এ জন্য আমিও দুঃখিত।

মাদাম বাসকিউন একটা কাঠের উপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তিটার পানে তাকিয়ে থেকে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জজ বললেন, ইউলিসেস চলে গেলে ক্যালিপসোর দুঃখ এমনি কোন সান্ত্বনা মানেনি। কই এরপর কার মামলা আছে দেখ।

কেরাণী হাঁকল, পোলাইৎ লেকাশোর বনাম প্রসপার দোনোকেৎ।

আসল রসিকতা

Practical Joke

বর্তমানে মানুষকে হাসাবার জন্য যে সব রসিকতা করা হয় তা বড় বাস্তব আর সেই জন্যেই তা কেমন যেন ভয়াবহ। অগেকার কালে অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে যে সব রসিকতা করা হত তা ছিল যেমন নির্দোষ তেমনি হাস্যোদ্দীপক।

আমি নিজেও অনেকের সঙ্গে রসিকতা করেছি এবং আমার সঙ্গে অনেকে রসিকতা করেছে। আমি একজনের সঙ্গে এমন রসিকতা করেছিলাম যে তার ফল হয়েছিল বড় ভয়ানক। লোকটা শেষে মারা গিয়েছিল।

তবু সে কথা যদি আজ কারো কাছে বলি তাহলে অনেকে হাসতে থাকবে সে কথা শুনে। ব্যাপারটা ঘটেছিল প্যারিসের এক মফঃস্বল শহরে। সে ঘটনা যারা দেখেছিল আজও তারা সে কথা মনে পড়লে হাসতে থাকবে। কিন্তু সে কথা আমি পরে বলব।

আজ আমি বলব দুটি রসিকতার ঘটনার কথা। একটি ঘটনায় আমার উপর রসিকতা করা হয় অর্থাৎ আমি ছিলাম রসিকতার বস্তু; আর একটি ঘটনায় আমি ছিলাম নায়ক অর্থাৎ আমি একজনের সঙ্গে রসিকতা করি।

আমার কয়েকজন বন্ধু একবার পিকার্ডিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করে। তারা আমায় খাতির করতে থাকে, বন্দুক ছুঁড়ে এমন অভ্যর্থনা জানাতে থাকে যে আমি মনে মনে বলতে বাধ্য হই, অত খাতির ত ভাল নয়।

রাত্রিতে খাবার সময় তারা কেউ বিশেষ হাসল না। এতে আমার ভয় হলো, আমার মনে হলো ওরা আমাকে ঠকাবার কোন পরিকল্পনা আঁটছে মনে মনে। খাওয়ার পর ওরা সবাই আমায় শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। আমার মনে হলো বাইরে ওদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে আর ওরা হাসাহাসি করছে। আমার মনে হলো হয়তো আমি শুলেই খাটটা ভেঙ্গে পড়বে। আমি এর আগে মানুষকে যে যেভাবে ঠকিয়েছিলাম সেইভাবে আমাকেও হয়ত ঠকানো হবে একথা বারবার ভাবতে লাগলাম। ভয়ে ঘুম হলো না আমার। দরজার কাছে একটা চেয়ার টেনে তার উপর বসে বসে ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ কি মনে হলো খাটের উপর থেকে তোষক চাদর সব টেনে নিয়ে মেঝের উপর বিছানা পেতে তার উপর শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতের পর ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কি একটা গরম জিনিস মুখে পড়তে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ের উপর মানুষের মত একটা ভারী জিনিস পড়ল। আমি তখন হাত দিয়ে তার নাকে মুখে ঘুষি মারতে লাগলাম।

পরে ঘুমের ঘোর কাটলে জানলাম বাড়ির চাকর আমার জন্য সকালের চা নিয়ে ঘরের দরজা ঠেলে দেখে আমি খাটের পরিবর্তে মেঝের উপর শুয়ে আছি। সে হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই অবাক হয়ে যায় আর তার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যায়। গরম চা আমার মুখে লাগে। সে নিজেও আমার দেহের উপর পড়ে যায়। আর আমি তখন ঘুষি মারতে থাকি। কথাটা শুনে হাসতে থাকে সবাই।

আর একটা ঘটনা ঘটেছিল আমার ছেলেবেলায়। আমার প্রিয় শাস্ত্র রসায়নবিদ্যা। ক্যালসিয়াম ফসফেট নিয়ে আমি প্রায়ই খেলা করতাম। ক্যালসিয়াম ফসফেট জলে

দিলেই আগুন ধরে যায় আর ধোঁয়া ছাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্‌ঘুটে গন্ধ বার হয়।

একবার ছুটির সময় বাড়িতে গেছি। দেখি মাদাম দুফোর এসেছেন আমাদের বাড়ি বেড়াতে। উনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসতেন। কিন্তু আমাকে উনি মোটেই দেখতে পারতেন না। আমি যা কিছু করতাম বা বলতাম উনি তার ভুল ব্যাখ্যা করে আমাকে বকতেন বা লোকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতেন।

একদিন রাত্রিতে একটা পরিকল্পনা করলাম। মাদাম দুফোরকে জব্দ করতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম মাদাম দুফোর রোজ শোবার সময় তাঁর বাঁধানো দাঁত খুলে জলভরা একটা গ্লাসে রাখেন এবং পরচুলটাও খুলে রাখেন। তখন তাঁকে বিশ্রী দেখায়। একদিন আমি শোবার সময় চাতুরী করে ওর জলের গ্লাসে ক্যালসিয়াম ফসফেট ফেলে দিই। মাদাম দুফোর তখন হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছিলেন।

সহসা জলের গ্লাসে এক জোর বিস্ফোরণ দেখে চমকে ওঠেন মাদাম দুফোর। উনি দেখেন ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলি পাকিয়ে আর বিদঘুটে এক গন্ধে ভরে গেছে ঘরখানা। উনি ভাবলেন নিশ্চয় কোন শয়তানের কাজ।

আমি কাজটা করে নিঃশব্দে আমার শোবার ঘরে চলে যাই। তারপর চেঁচামেচি হাসাহাসি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বাবা এসে আমার কান মলে দেন। মাদাম দুফোর কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেননি। অথবা বুঝতে চেষ্টা করেননি। হয়তো কারো কথায় বিশ্বাস করেননি তিনি। তিনি শুধু কয়েক গ্লাস জল খেয়ে বললেন, মাঝে মাঝে শয়তানেরা এসেই এই রকম কাজ করে। মানুষকে অসুস্থ করে তোলে।

বিড়াল সম্বন্ধে

On Cats

সেদিন আমি আমার ঘরের দরজার কাছে একটা বেঞ্চের উপর বসে জর্জ দুভানের লেখা 'কপার' নামে বইটা পড়ছি এমন সময় একটা বিড়াল হঠাৎ লাফিয়ে পড়ল আমার কোলের উপর। আমি তখন বইটা বন্ধ করে বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিলাম আদর করার জন্য।

বিড়ালটাকে তুলে তার সিল্কের মত নরম লোমগুলোর উপর হাত বুলোতে লাগলাম। এত নরম মোলায়েম এবং এত আরামপ্রদ আর কিছু হতে পারে না। তাই বিড়ালকে আদর করতে আমি ভালবাসি। আমি যখন তার সাদা নরম গায়ে হাত বোলাই তখন আমার আঙুলের ডগা থেকে একটা আশ্চর্য সংবেদন শিরায় শিরায় খেলে যায়।

বিড়ালটা আমার কোলের উপর উঠে গড়াগড়ি খেতে লাগল। একবার পাগুলো উপরের দিকে তুলে শুয়ে রইল আমার কোলে। কিন্তু যখনি আমি কোন বিড়ালকে

আদর করি তখনই আমার মনে হয় বিড়ালরা সব সময় বড় সতর্ক, বড় সচকিত। ওরা আদর ভালবাসে, কিন্তু তার মাঝে কোথাও একটু শত্রুতার ভাব বুঝলেই সঙ্গে সঙ্গে তার সন্দিগ্ধ শত্রুকে আঁচড়ে ও কামড়ে দেবে। তাই আমি কোন বিড়ালকে আদর করি বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে সব সময় সতর্ক থাকি। মনে হয় এই বুঝি বা আমাকে আঁচড়ে বা কামড়ে দেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে আঁচড়ে দেবার কামড়ে দেবার যে হিংস্র ভাবটা অন্তর্নিহিত আছে সে ভাবটা আমার মধ্যে গোপনে সঞ্চারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে জেগে ওঠে এক জিঘাংসার ভাব। মনে হয় যাকে আমি এই মুহূর্তে আদর করছি তাকে পরমুহূর্তে খুন করে ফেলি। অনেক সময় তাই কোন বিড়ালকে আদর করতে করতে তার ঘাড়টা ধরে এত দূরে নির্মমভাবে আছাড় মেরে ফেলে দিয়েছি যে সেখান থেকে ও এসে আমার উপর আর প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

ছোটবেলায় বিড়ালকে ভয় করতাম আমি। একবার হঠাৎ ফাঁদে আটকে পড়ে একটা বিড়ালকে ছটফট করে মরতে দেখেছি। তবু তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করিনি। অথচ কোন কুকুর হলে আমি তাকে নিশ্চয় বাঁচাতাম। অনেকে অবশ্য বিড়াল ভালবাসে। ফরাসী কবি বোদলেয়ার ত বিড়ালের কত গুণগান করেছেন তাঁর কবিতায়।

আমার মনে হয় মেয়েদের সঙ্গে বিড়ালদের কোথায় যেন মিল আছে। বিড়ালদের মত মেয়েদের গা-টাও বড় কোমল। তারাও বড় আদর ভালবাসে। কিন্তু বিড়ালদের মতই ওরা সদাসতর্ক, সচকিত আর ভয়ঙ্করভাবে স্বার্থপর। আদর করার সময় বিড়ালরা যেমন তাদের হলুদ চোখের নীল তারা দিয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকিয়ে থাকে এবং একটু তৃপ্তি বা নিরাপত্তার অভাব দেখলেই আমাদের আঁচড়ে ছিঁড়ে ও কামড়ে দিয়ে চলে যায়। মেয়েরাও ঠিক তেমনি তাদের তৃপ্তি বা নিরাপত্তার অভাবের কোন আভাস আমাদের মধ্যে কোনভাবে পেলেই আমাদের কামড়ে দিয়ে চলে যায়।

আমার বেশ মনে আছে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে বেড়াতে বেড়াতে পার্বত্য অঞ্চলে একটা প্রাচীন প্রাসাদে গিয়ে পড়ি। সেখানে যারা বাস করে তাদের আতিথ্যে একটা রাত বাস করি আমি সেখানে। সেই প্রাসাদের মত বিরাট বাড়িটিতে এমনি একটা সাদা বিড়াল সারা রাত ধরে অবাধে নিঃশব্দ পদক্ষেপে আধিপত্য করে বেড়াত।

গত বছর ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত নিমেতে আমি যাই প্রথম। কিন্তু সেখানে বড় গরম বোধ হওয়াতে আমি চলে যাই ফ্লোরেন্সের পার্বত্য অঞ্চলে। এই পার্বত্য অঞ্চলে অনেক ঘোরাঘুরির পর হঠাৎ নব জাগরণের যুগের প্রারম্ভে নির্মিত চারটি গম্বুজবিশিষ্ট এক প্রাচীন প্রাসাদের সামনে গিয়ে পড়ি। তার তিনদিকে লম্বা লম্বা পাইনগাছ আর সামনে ঘাসে ঢাকা সবুজ প্রান্তর। বড় মনোরম জায়গায় অবস্থিত দুর্গের মত বিরাট প্রাসাদটা। ফ্লোরেন্স থেকে যখন আমি আসি তখন একজন ভদ্রলোক এই প্রাসাদের মালিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটা পরিচয়পত্র দেন। চারদিকে

পাহাড়ের মাঝে খুঁজতে খুঁজতে একটা উপত্যকাভূমিতে সেটা পেয়ে গেলাম। বাড়িতেই আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাত্রিতে একটা বিরাট ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। শোবার সময় আমি সব দরজা জানালা ঠিকভাবে বন্ধ করে দিলাম। তারপর শুতেই ঘুম এল। কিন্তু ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম, আমি এক পান্থশালায় একটা ঘরে শুয়ে আছি। সে ঘরে কোন দরজা নেই আর সেই পান্থশালার দু'জন চাকর আমাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে আসছে। অস্বস্তিতে আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখলাম ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। সহসা কি একটা নরম জিনিস পড়ার শব্দ হলো মেঝের উপর। আমি একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে দেখলাম কোথাও কিছু নেই।

তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম আসতেই আবার একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম আমি তুর্কীদের দেশে বেড়াতে গিয়েছি। তুর্কী মুসলমানদের কোন এক বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছি আমি। সহসা রাত্রিতে আমার শোবার ঘরে দেখি পরমা সুন্দরী এক তুর্কী রমণী বসে রয়েছে। আমি তার পাশে গিয়ে তার হাত ধরে আমার বিছানায় নিয়ে আসতেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের নিচে নরম তুলতুলে একটা জিনিস অনুভব করলাম। দেখলাম একটা বিড়াল নিশ্চিন্তভাবে আমার কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি বিড়ালটা পালিয়ে গেছে কোথায়। কিন্তু কোন্‌দিক দিয়ে বিড়ালটা এল ?

বাড়ির মালিককে কথাটা বলতেই তিনি বললেন, এ বাড়ির সব ঘরেই দেওয়ালে গর্ত করা আছে। প্রয়োজন মত সেই গর্ত দিয়ে একটা মানুষও কোনমতে বেরিয়ে যেতে পারে গুড়ি মেরে। জানলাম প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের সব বাড়িতেই, সব ঘরেই এমনি করে একটা করে গর্ত থাকত যাতে কোন মানুষ ইচ্ছামত বাড়ির যেকোন ঘরে দরকার পড়লে যাওয়া আসা করতে পারত।

বাড়ির মালিক বললেন, ঐ বড় সাদা বিড়ালটা আমাদের সারা বাড়িটাতে সারা রাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। যেকোন বিছানাতে ও শোয়, যেকোন ঘরে ঢোকে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ওই নিশাচরটা ঘুরে বেড়ায় ইচ্ছামত।

এগারো নম্বর ঘর

Room no. 11

আচ্ছা তুমি কি জান প্রেসিডেন্ট আমাদঁ কিভাবে অপসারিত হন ?

না। আমার জানা নেই।

অবশ্য আসল কারণটা জানা যায়নি। তবে এবিষয়ে একটা অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়।

বল না সে কাহিনী।

আচ্ছা, মাদাম আমাদঁর কথা তোমার মনে আছে? সেই সুন্দরী মধ্যবয়সী মহিলা যাকে পার্থুই লে অঞ্চলে সবাই মাদাম মার্গারেট বলে ডাকত।

হ্যাঁ মনে আছে।

আর একটু ভেবে দেখ সারা শহরের লোক তাঁকে কত ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। মায়া মমতা ও সামাজিকতার দিক থেকে তাঁর গুণের তুলনা পাওয়া যায় না। গরীবদের সাহায্যের জন্য তিনি মাঝে মাঝে চাঁদা তুলতেন। শহরের যুবকদের খুশি করার জন্য কত সময় কত আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন।

আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা প্রায় সবাই প্যারিসের লোক। তাঁরা প্যারিসের মেয়েদের গুণগানে পঞ্চমুখ। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান প্যারিসের অতি আধুনিকা বিলাসিনী রমণীরা বড় চটুলমনা। তারা সুন্দরী হলেও তাদের সে সৌন্দর্য বড় খরতপ্ত। কোন শান্তশীতল ভাব নেই সে সৌন্দর্যের মধ্যে যেটা তুমি গ্রাম অঞ্চলের সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে দেখতে পাবে। তারা ছল চাতুরী তত জানে না।

মাদাম আমার মফঃস্বলের অভিজাত সমাজের মহিলা হলেও তিনি ছিলেন ক্ষণপ্রণয়ের ছলনায় সিদ্ধ। মাদাম আমাদঁ সব সময় তাঁর চোখে মুখে এমনই এক সরলতা ফুটিয়ে রাখতেন যে কেউ ঘুণাক্ষরেও তাকে কখনো সন্দেহ করত না।

মাদাম আমাদঁ সব সময় সেনাদলের অফিসারদের মধ্য হতে তাঁর প্রেমিক নির্বাচন করতেন। কিন্তু তিন বছরের বেশী কাউকে ভালবাসতেন না। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর অফিসারেরা তিন বছরের বেশী কোন সৈন্যনিবাসে থাকে না। একজনকে নির্বাচিত করে তাকে তিন বছর ভালবাসার অভিনয় করার পর সে বদলি হয়ে গেলেই আবার নূতন দলের একজন অফিসারকে বেছে নিতেন।

মাদাম আমাদঁর প্রেমিক নির্বাচনের পদ্ধতিটাও ছিল বড় অদ্ভুত। এক একটি দলে কতজন সামরিক অফিসার থাকে এবং তাদের কার কি যোগ্যতা তা সব তাঁর জানা ছিল। প্রথমে তিনি প্রতিটি দলের তালিকা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে তাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতেন। তারপর তাকে কোন নাচের আসরে বা বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার সঙ্গে নাচতেন। নাচের সময় তার হাতটাতে খুব জোরে চাপ দিতেন আর নিজের দেহটাকে খুব বেশী করে ঠেলে দিতেন নাচের সঙ্গী সেই অফিসারের গায়ের উপর। মাদাম আমাদঁর এই সঙ্কেত বুঝতে পারলে সেই অফিসার অবশ্যই তাঁর সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু মাদাম আমাদঁ এত সহজে নিজেকে ধরা দিতেন না কারো কাছে। পাকা দেড় মাস ধরে খোঁজখবর নিতেন সেই অফিসারের স্বভাব চরিত্র কেমন, অমিতব্যয়ী বা অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসে কি না।

এই সব পরীক্ষায় যে অফিসার উত্তীর্ণ হতো মাদাম তাকে আবার একবার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন। তারপর এক ফাঁকে নিচু গলায় বলতেন, আগামী মঙ্গলবার রাত্রি ন'টার সময় গোল্ডেন ইস্ট হোটেলে ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসের নাম করে অপেক্ষা করব। আমি অপেক্ষা করব সেখানে তোমার জন্য। তবে সাদা পোশাক পরে যাবে।

আট বছর ধরে ঐ ছোটজাতের হোটেলটায় একটা ঘর ভাড়া রাখেন মাদাম আমাদঁ। ওঁর প্রেমিকদের সঙ্গে ওখানে মিলিত হতেন উনি। ওঁর নির্বাচিত অফিসারদের বয়স ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। কারণ মাদাম আমাদঁর মতে তিরিশের কম বয়সের পুরুষদের তেমন বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না। আবার চল্লিশের বেশী বয়স হলেই দেহের মধ্যে তেমন বলিষ্ঠতা থাকে না।

মফঃস্বল এলাকায় সাদাসিদে একটা ছোটখাটো হোটেল। তার মধ্যে একটা ঘর নেওয়া ছিল মাদাম আমাদঁর। ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে ছিল দুটো চেয়ার, একটা ইজিচেয়ার। একটা শোবার খাট আর দেওয়ালে তিনটি ছবি। তিনটি ছবিই তিনজন কর্ণেলের ঘোড়ায় চাপা অবস্থায় তোলা।

নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেই হোটেলে নির্বাচিত নায়কের সঙ্গে গোপনে মিলিত হবার জন্য উপায়ের কোন অভাব হত না মাদাম আমাদঁর। তিনি সমাজের অনেক সেবা করেছেন, দেশের সেবা করেছেন। তিনি সন্ধের সময় তাঁর স্বামীকে বলতেন, কোন সভা সমিতির অনুষ্ঠান আছে। তাঁকে আজ রাতে সেখানে যেতে হবে। স্বামী কোন খোঁজখবর না নিয়েই সরলভাবে বিশ্বাস করতেন তাঁর কথা। কারণ সত্যি সত্যিই এ ধরনের অনেক সভায় গেছেন মাদাম আমাদঁ।

সেখানে যাবার সময় সাদাসিদে পোশাক পরতেন মাদাম। রাস্তায় বেরিয়ে কুমারী মেয়েদের টুপী পরতেন। হোটেলে তাঁর পরিচয় ছিল ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসে। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে চিনতে পারেনি। হোটেলের মালিক ক্রভোও কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু একদিন একটা ঘটনার মাধ্যমে ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসের আসল পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়।

হোটেলে মাদাম আমাদঁর ঘরটা ভাড়া করা থাকলেও সেখানে রোজ তাঁর নায়কের সঙ্গে মিলিত হতেন না। দিনকতক বাদ দিয়ে আবার যেতেন। কিন্তু গত গ্রীষ্মকালে প্রেসিডেণ্ট মঁসিয়ে আমাদঁ এক সপ্তার জন্য বাইরে যান। সেই সুযোগে কোন এক মঙ্গলবার হোটেলে তাঁর প্রেমিক কমাণ্ডার বারাঙ্গেলকে পরের দিনও ঠিক সেই সময়ে আসতে বলেন। তাঁর ঘরের নম্বর ছিল এগারো।

মাদাম আমাদঁ তখন কমাণ্ডার বারাঙ্গেলের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী বাড়িতে না থাকায় বারাঙ্গেলকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি যদি আগামীকাল ঠিক এই সময়ে আমার আগে এসে পড় তাহলে বিছানায় আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

কিন্তু মাদাম আমাদঁ পর পর দু'দিন প্রেম করতে আসবেন তাঁর এই ঘরে তা ভাবতে পারেনি হোটেল মালিক ক্রভো। তাই সে পরদিন দুপুরে ঘরটা কয়েক ঘণ্টার জন্য একজন পথিককে থাকতে দেয়। তখন চারদিকে কলেরা হচ্ছিল। লোকটা এসে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। হোটেল মালিক ক্রভো তা জানতে পেরে হোটেলের বাসিন্দাদের কাউকে কিছু না বলে গোপনে ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে। পুলিশ লাশটা দুপুর রাতে সরিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক হয়।

কিন্তু মাদাম আমাদঁ ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসে সেজে এসে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখেন বিছানায় কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে। তিনি ভাবেন তাঁর নির্দেশমত কামাণ্ডার বারাঙ্গেল শুয়ে ঘুমোচ্ছে অথবা ঘুমোবার ভান করছে। তাই একে একে সব পোশাক খুলে শুধু লাল গাউনটা পরে বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন মাদাম আমাদঁ। কিন্তু হঠাৎ দেখেন একটা ঠাণ্ডা অসার মৃতদেহ। বাতিটা এনে ভাল করে দেখে সেই গাউন পড়েই ঘর থেকে বাইরে গিয়ে চীৎকার করতে থাকেন মাদাম আমাদঁ। বলতে থাকেন, আমার ঘরে খুন হয়েছে।

চীৎকার শুনে হোটেলের অন্যান্য ঘরের বাসিন্দারা বেরিয়ে এলেন। মালিক ক্রভোও এল। সব কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলল। এমন সময় কমাণ্ডার বারাঙ্গেলও এল। তাকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে মাদাম আমাদঁ বললেন, আমাদের ঘরে একটা খুন হয়েছে।

হোটেলের বাসিন্দাদের মধ্যে একজন বলল, ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসে ও তার প্রেমিককে পুলিশ না আসা পর্যন্ত ছাড়া হবে না। কারণ মৃতদেহটা তাদের ঘরেই আছে।

হোটেল মালিক ক্রভো বারবার বলল, ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক, আমি দায়ী রইলাম ওদের জন্য।

কিন্তু বাসিন্দারা রাজী হলো না। অগত্যা পুলিশ আসার জন্য অপেক্ষা করতে হলো। পুলিশ এসে অবশ্য তাঁদের মুক্তি দিল। কিন্তু সব গোপন কথ ফাঁস হয়ে গেল।

ফলে পরের মাসেই অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যেতে হলো মঁসিয়ে আমাদঁকে।

বিকল্প

The substitute

মাদাম বন্দেরয় ?

হ্যাঁ মাদাম বন্দেরয়।

অসম্ভব।

আমি তোমাকে বলছি ঠিক তাই।

ফিতের টুপী মাথায় সেই ধর্মভীরু প্রায়বৃদ্ধা মহিলা মাদাম বন্দেরয়—যার মাথায় আছে কোঁকড়ানো পরচুল ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি বলছি তারই কথা।

তুমি দেখছি পাগল হয়ে গেছ।

আমি বলছি তিনিই সেই মহিলা। সেই মাদাম বন্দেরয়, আর কেউ নয়। তাহলে আমাকে খুলে বল ব্যাপারটা।

ব্যাপারটা হলো এই।

মঁসিয়ে বন্দেরয় ছিলেন একজন নামকরা উকিল। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাঁর স্ত্রী মাদাম বন্দেরয় ছিল মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। কিন্তু মনটা ছিল তার বড় নীচ। লোকে বলাবলি করত তার জারজ লালসা পরিতৃপ্ত করার জন্য তাঁর স্বামীর কেরাণীদের মধ্যে একজনকে সে বেছে নিত।

স্বামীর মৃত্যুর পর নির্বিঘ্নে নিজের কামনা চরিতার্থ করে যেতে থাকে মাদাম বন্দেরয়। স্বামী যা রেখে গেছে তাতে খাওয়া পরার অভাব ছিল না। কিন্তু বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারত না মাদাম বন্দেরয়ের আসল পরিচয়টা। কারণ বন্দেরয় নিয়মিত চার্চে যায়। পাড়াপ্রতিবেশীদের যেকোন অন্যায় কাজের সমালোচনা করে।

তুমি হয়ত জান না দু'জন সামরিক অফিসার, তার মধ্যে আমার এক বন্ধুও আছে একবার মাদাম বন্দেরয়ের জন্য ডুয়েল লড়ে। তারা নিজের মুখে স্বীকার করে তারা মাদাম বন্দেরয়ের জন্য ডুয়েল লড়েছে। অবশ্য তাতে কারো কোন ক্ষতি হয়নি এবং পরে তাদের মিলন হয়।

কি বলছ তুমি ?

আচ্ছা শোন, সেই সামরিক অফিসার অর্থাৎ আমার বন্ধু যা বলেছিল আমি তাই বলছি। ঘটনাটা প্রথম ঘটে দেড় বছর আগে। আমার বন্ধু আমাকে বলল, একদিন সন্ধের সময় সে যখন তাদের সৈন্যাবাসের কাছে বেড়াচ্ছিল তখন একজন মধ্যবয়সী মহিলা এসে তাকে বলে, শোন সৈনিক, আচ্ছা তুমি কি সপ্তায় দশ ফ্রাঁ রোজগার করতে চাও ?

সে বলল, হ্যাঁ মাদাম অবশ্যই চাই। তখন মহিলাটি বলল, তাহলে আগামী কাল বেলা বারোটার সময় আমার বাড়ি চলে এস। আমার নাম মাদাম বন্দেরয়, আমার বাড়ির ঠিকানা হলো—৬, রুয় দ্য লী ত্রানসী।

পরদিন যথাসময়ে আমার বন্ধু তার সামরিক পোশাক পরে শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে গিয়ে হাজির হলো সেই বাড়িতে। মাদাম নিজেই দরজা খুলে তার ঘরে নিয়ে গেল। সোফায় বসিয়ে বলল, একথা যদি ঘুণাক্ষরেও কাউকে কখনো বল তাহলে তোমাকে জেলে দেব।

আমার অফিসার তখনো বুঝতে পারল না তাকে কি করতে হবে। সে বলল, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মাদাম।

তারপর মাদাম বন্দেরয় জানিয়ে দিল কি তাকে করতে হবে। তখন সে তার শিরস্ত্রাণ খুলে চেয়ারের উপর রেখে বলল, প্রকৃত সৈনিক কখনো কোন কাজে পিছপা হয় না।

মাদাম বন্দেরয়ের দেহে আর যৌবন না থাকলেও তার দেহটা একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। আমার বন্ধু তার কাজ সেরে দশ ফ্রাঁর একটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চলে এল। মাদাম বন্দেরয়ের কথামত প্রতি মঙ্গলবার দুপুর বারোটায় সে তার বাড়িতে যেত।

এই ভাবে এক বছর চলল। একদিন আমার বন্ধুর শরীর খারাপ থাকায় উঠতে পারেনি। সে তখন তার বিশ্বস্ত এক বন্ধুকে সব বুঝিয়ে বলে এই কাজে পাঠায়। মাদাম প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও পরে সবকিছু শুনে রাজী হয়। পরে মাদাম বন্দেরয় দু'জনকেই নিযুক্ত করে রাখে। দু'জনের জন্য সপ্তায় দুটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। দু'জনকেই দশ ফ্রাঁ করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আমার বন্ধু অফিসার স্বীকার করল এতে সে নিয়মিত তার বাবার কাছে প্রতি মাসে ঠিক সময়ে টাকা পাঠাতে পারে। এই রোজগারের সব টাকাটাই সে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এতে সবদিকই বজায় থাকে।

কোন এক কৃষক বালিকা

A farm girl

সেদিন আবহাওয়াটা বেশ ভাল ছিল বলে অন্যদিনকার থেকে দুপুরের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে নিয়েছিল খামারবাড়ির লোকেরা বড় রান্না ঘরটায়। তখন উঠোনে একটা বড় পাত্রে জল গরম হচ্ছিল আর সেই জল নিয়ে বাসনপত্রগুলো পরিষ্কার করছিল খামারবাড়ির ঝি রোজ। সূর্যের রশ্মি আধখোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে চওড়া টেবিলটার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাসনমাজা ও ঝাড়া মোছার যাবতীয় সব কাজ শেষ করে রান্নাঘরের বাইরে গিয়ে লম্বা-লম্বা ঘাসে ঢাকা উঠোনটার মাঝখানে ক্লান্ত হয়ে বসল রোজ। সামনে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল সে। দেখল বসন্তের সবুজ আপেলগাছগুলোতে সাদা সাদা কুঁড়ি ধরেছে। অদূরের মাঠ থেকে হাওয়া ছুটে আসছে। একটা ঘোড়ার বাচ্চা ছুটে বেড়াচ্ছিল সারা উঠোনময়। ক্লান্ত রোজের সহসা মনে হলো সেও এমনি করে ঐ মাঠভাঙ্গা হাওয়ার মত অশান্ত অশ্বশাবকটার মত ছুটে বেড়াবে সারা খামারটায়।

উঠোনের একদিকে মুরগীর ঘর, গোয়াল ঘর, আস্তাবল, গ্যারেজ ঘর। গ্যারেজের পাশে একটা খাল। খালের ধারে ভায়োলেট ফুল ফুটে আছে। তার ওধারে মাঠ। মাঠে চাষীরা কাজ করছিল। দূর হতে তাদের পুতুলের মত দেখাচ্ছিল।

লম্বা লম্বা ঘাসের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রোজ। ফুলগাছঘেরা খালটার দিকে চলে গেল। একটা চালার নিচে খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল। কেমন যেন মিষ্টি আরামের একটা আমেজ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল তার ক্লান্ত অবসন্ন দেহের শিরায় শিরায়। ঘুমের ঘোর আসছিল চোখে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আপনা হতে কখন।

সহসা বুকের উপর কার হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে বসল রোজ। দেখল জ্যাক কখন চুপিসারে এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। পিকাডি থেকে আসা কৃষক যুবক জ্যাক ভেড়া চড়ায় এই খামারে। প্রায় বছরখানেক আগে প্রেম নিবেদন করে জ্যাক

রোজের কাছে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে দেখা হয় দু'জনের মধ্যে। জ্যাক রসিকতা করে। মন মেজাজ ভাল থাকলে রোজ তার প্রত্যুত্তর দেয়।

রোজ খড়ের গাদার উপর উঠে বসতেই তাকে চুম্বন করতে গেল জ্যাক। রোজ কিন্তু তার মুখটা হাত দিয়ে সজোরে সরিয়ে দিল। তখন জ্যাক তার পাশে বসল।

দু'জনে সুখদুঃখের কথা বলতে লাগল। তাদের মালিকের কথা, আবহাওয়ার কথা, তাদের ফেলে আসা গ্রাম আর অতীত জীবনের কত সব কথা। রোজ একসময় বলল, আমি আমার মাকে কতদিন দেখিনি।

জ্যাকের কিন্তু মাথায় ছিল এক চিন্তা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে রোজের পানে। তার ফুলো-ফুলো লাল গাল, লাল ঠোঁট আর স্ফীত বুকের উপর তার স্থির লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে ছিল। লোভ সামলাতে না পেরে একসময় রোজকে জোর করে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতেই রোজ এক ঘুষি মেরে দিল জ্যাকের মুখে। ঘুষিটা তার নাকে লাগতেই নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। রোজ তখন লজ্জায় পড়ে গেল। জ্যাকের হাত ধরে সামনের পথটা ধরে এগিয়ে চলতে লাগল ধীর গতিতে। এবার একসময় হঠাৎ জড়িয়ে ধরে রোজই চুম্বন করল। দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে থাকল।

এরপর থেকে তারা প্রায়ই গোপনে মিলিত হত। কখনো-কখনো রাতের অন্ধকারে কোন গোপন স্থানে। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে রোজ একদিন আবিষ্কার করল তার প্রতি আর কোন আগ্রহ নেই জ্যাকের। গোপনে তার সঙ্গলাভের জন্য আগের মত আর লালায়িত হয় না জ্যাক। ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে গেলে এমনি দু'একটা কথা বলে। কিন্তু কোন উত্তাপ থাকে না তার সে কথায়। কোন লালসার আগুন থাকে না তার দৃষ্টিতে।

একদিন আর একটা জিনিস আবিষ্কার করল রোজ। সে মা হতে চলেছে। জ্যাক একদিন তাকে কথা দিয়েছিল তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু আজ পিছিয়ে যাচ্ছে দায়িত্বহীন জ্যাক। অথচ জ্যাকই পারে এই লজ্জা ও অপমানজনক গর্ভের কলঙ্ক হতে তাকে মুক্ত করতে।

একদিন রাত্রিবেলায় গোপনে জ্যাকের কাছে গেল রোজ। আস্তাবলে খড়ের গাদায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল জ্যাক। তাকে উঠিয়ে তার গলাটা রাগের মাথায় সজোরে টিপে ধরল রোজ। জ্যাক দেখল তার থেকে রোজের গায়ের জোর বেশী। সে পেরে উঠবে না। তাই সে আপোষ করতে চাইল। রোজের কথা আপাততঃ মেনে নিয়ে তাকে বিয়ে করবে বলে ঈশ্বরের নামে শপথ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার গলাটা ছেড়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল রোজ।

কিন্তু এত করেও কিছু হলো না। দিন ছয়েকের মধ্যেই রোজ জানতে পারল খামারের কাজ ছেড়ে দিয়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে জ্যাক। তার জায়গায় নিযুক্ত হয়েছে নতুন লোক। একবার ভাবল চার্চে বিশপের কাছে গিয়ে স্বীকারোক্তি করবে।

কিন্তু ভয়ে যেতে পারল না। তার কেবলি মনে হল বিশপ সাধারণ মানুষ নন, তিনি এমনই একজন অতিপ্রাকৃত লোক যিনি তার মুখপানে তাকিয়েই তার জীবনের সব ত্রুটিবিচ্যুতি ও চরিত্রের সব দুর্বলতার কথা ধরে ফেলবেন।

একদিন তার বাড়ি থেকে আসা একখানা চিঠি পেল রোজ। তার মার খুব অসুখ। চিঠিখানা দেখিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ছুটি নিল মালিকের কাছে। খামারের মালিকের বয়স পঁয়তাল্লিশ। দু'বার স্ত্রী মারা যাওয়ায় আর বিয়ে করেনি। রোজের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তাকে বাড়ি যাবার অনুমতি দিল।

বাড়ি গিয়ে রোজ দেখল মা তার মৃত্যুশয্যায়। মার মৃত্যুর পর সাত মাসের এক অপুষ্ট পুত্রসন্তান প্রসব করল রোজ। কোনরকমে বেঁচে গেল ছেলেটা, কিন্তু মাসখানেক পর প্রতিবেশীদের কাছে ছেলেটিকে রেখে ফিরে গেল তার কাজের জায়গায়।

সেই খামারবাড়িতে ফিরে এসে রোজ বলল বাড়ি গিয়ে সে বিয়ে করে এসেছে। তার স্বামী দেশেই আছে। তার সহকর্মীরা তার কথা শুনে ঠাট্টা করে। নানারকম প্রশ্ন করে।

এদিকে মালিকের মন তুষ্ট করে মাইনে বাড়াবার আশায় আগের থেকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে থাকে রোজ। একদিন ঝিকে ছাড়িয়ে দিয়ে তার কাজ করতে থাকে। মালিক নিজের মুখে স্বীকার করে রোজ একাই একশো।

কিন্তু এত খাটলেও মাইনে বাড়ে না তার। সে বছরে পায় মাত্র দুশো ফ্রাঁ। একদিন মাইনে বাড়াবার আবেদন নিয়ে মালিকের কাছে দেখা করতে গেল রোজ। কিন্তু সেকথা না বলে বলল অন্য কথা। এক সপ্তার ছুটি চাইল বাড়ি যাবার জন্য।

ইতিমধ্যে আট মাস কেটে গেছে। ছেলেটার জন্য প্রায়ই মন খারাপ করে রোজের। তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার নরম তুলতুলে দেহের উত্তাপ নিজের গায়ে স্পর্শ করার এক প্রবল ইচ্ছা জাগে তার। মালিক রোজের পানে তাকিয়ে বলল, তুমি বাড়ি থেকে ঘুরে এলে একটা কথা বলব তোমায়।

ছেলেটাকে দেখে অতিরিক্ত আদরের দ্বারা তার নরম দেহটাকে বারবার পীড়িত করে যথাসময়ে ফিরে এল রোজ। একদিন মালিক তার নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল রোজকে। রোজ ভয়ে-ভয়ে গিয়ে দাঁড়াল মালিকের সামনে।

মালিক বলল, আচ্ছা রোজ, তুমি আজও বিয়ে করনি কেন? তোমার মত কর্মঠ সৎ মেয়ে স্ত্রী হিসাবে পাওয়া ত যেকোন লোকের পক্ষে ভাগ্যের কথা।

কোন উত্তর দিল না রোজ। রোজকে চুপ করে থাকতে দেখে মালিক বলল, একজন গিন্নী না থাকলে খামার চালানো যায় না। আমি বলছিলাম তোমার পক্ষে আমার গৃহিণী হওয়া কি সম্ভব হবে?

রোজ ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, তা কি করে হয় মালিক?

মালিক বলল, কেন, কেন তুমি আমায় বিয়ে করতে পার না রোজ? শোন, ছেলেমানুষি করো না। আমি কাল পর্যন্ত তোমায় ভাববার সময় দিলাম।

সে-রাতে বিছানায় গিয়ে ঘুমোতে পারল না রোজ। এক ফোঁটাও ঘুম এল না চোখে। এত দুঃখে চোখে এক ফোঁটা জলও এল না। চেষ্টা করেও কাঁদতে পারল না রোজ।

একদিন পর রোজ স্পষ্ট জানিয়ে দিল তার মালিককে সে বিয়ে করতে পারবে না। মালিক তখন জিদ ধরল, তোমাকে খুলে বলতে হবে ব্যাপারটা। তুমি কি অন্য কাউকে ভালবাস অথবা বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছ?

কিন্তু রোজ শুধু একটা কথাই বারবার বলতে লাগল, আমি তা বলতে পারব না মালিক।

গ্রাম অঞ্চলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ বছরের ব্যবধান এমন কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। খামারবাড়ির মালিক আর সেই খামারের চাষী মেয়েদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটাও এমন কিছু নতুন নয়। রোজ ভাবছিল অন্য কথা। সে জ্যাকের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ও তার সন্তানের কথা কোনক্রমেই পরিষ্কার করে বলতে পারছিল না। বলতে পারলে হয়ত হালকা হত, মুক্ত হত সে।

মালিক তাকে আবার সময় দিল। তখনকার মত পরিত্রাণ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রোজ। রাত্রিতে বিছানায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল সারা দিনের খাটুনির পর।

সহসা মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল রোজের। মনে হলো কে যেন তার ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। রোজ উঠে বসতে না বসতেই মালিক গম্ভীর গলায় বলল, ভয় পেয়ো না রোজ, আমি কিছু কথা বলব তোমার সঙ্গে।

বাতির আলোয় মালিকের মুখপানে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল রোজ। নিজেকে অসহায় মনে হতে লাগল তার। এবার মালিক কোন কথা না বলে রোজের দেহটাকে জড়িয়ে ধরল সমস্ত শক্তি দিয়ে। রোজ প্রথমে বাধা দিল। কিন্তু সে বাধার মধ্যে কোন বলিষ্ঠতা ছিল না। যে প্রবৃত্তি নিজে অতিমাত্রায় বলিষ্ঠ হয়েও অপর এক অনুরূপ প্রবৃত্তির আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে না সেই প্রবৃত্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো রোজ। তার দেহটা ক্রমে নিথর নিস্পন্দ হয়ে উঠল মালিকের আলিঙ্গনের চাপে।

পরদিন থেকে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করতে লাগল দু'জনে। দিন কতকের মধ্যেই বিয়েটা হয়ে গেল।

এইভাবে পর পর কয়েকটি বছর কেটে গেল। তবু তার ছেলের কথাটা তার নতুন স্বামীর কাছে বলতে পারল না রোজ। এদিকে রোজ হঠাৎ বুঝতে পারল তার স্বামী যেন প্রায়ই কি ভাবে। কি একটা গোপন চিন্তায় তার দেহটা বয়সের অনুপাতে বেশী বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তার মেজাজটা হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক রকমের খিটখিটে। কথায়-কথায় রেগে যায় রোজের উপর। একদিন পাড়ার একটি ছেলেকে রোজ বকতেই রেগে গেল তার স্বামী। বলল, ও তোমার নিজের ছেলে হলে ওকে এভাবে বকতে পারতে?

সে রাত্রিতে খাবার সময় কোন কথা হলো না দু'জনের মধ্যে। রাত্রিতে বিছানায় শুয়েও কেউ কাউকে স্পর্শ করল না।

পরদিন আর থাকতে না পেরে হঠাৎ একসময় তার স্বামীর পা দুটো জড়িয়ে ধরল রোজ। কাতর কণ্ঠে বলল, কেন তুমি আমার উপর রাগ করেছ, কি আমার দোষ আমায় বল।

মুখ ভার করে তার স্বামী বলল, দোষ আর কি, আজ পাঁচ ছ' বছর বিয়ে করেছি তোমাকে, কিন্তু একটি সন্তান হলো না আমাদের। এর থেকে দুঃখের আর কি থাকতে পারে। গাই গরুর বাচ্চা না হলে তার যেমন কোন দাম নেই তেমনি কোন বিবাহিতা নারীর সন্তান না হলেও তার কোন দাম নেই।

তেমনি কাতর কণ্ঠে উত্তর করল রোজ, এর জন্যে কি আমি দায়ী?

তার স্বামী বলল, আমি তা ঠিক বলছি না। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই খুব দুঃখের।

এরপর থেকে আর একটি সন্তান লাভই তার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে উঠল রোজের। অনেকে কথাটা বলল। অনেকে অনেক পরামর্শ দিল। অনেক ওষুধ খেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একদিন রাত্রিতে শোবার পর তার স্বামীর রাগটা চরমে উঠল। সে সবকিছুর জন্য একমাত্র রোজকে দায়ী করে তাকে গালাগালি দিতে লাগল। পরে মারতেও শুরু করে দিল। থাকতে না পেরে রোজও তার স্বামীকে দেয়ালে চেপে ধরল। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলল, ছেলে চাও? ছেলে আমার আছে। হ্যাঁ, জ্যাকের ঔরসজাত আমার গর্ভের সন্তান। জ্যাক আমাকে বিয়ে করব বলে পরে পালিয়ে যায়। আমার সেই সন্তান আমার গাঁয়ের বাড়িতে রেখে এসেছি। একমাত্র তার মুখ চেয়েই তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হইনি প্রথমে।

হঠাৎ তার স্বামীর রাগটা পড়ে গেল। আগ্রহের সঙ্গে নরম সুরে বলল, তোমার ছেলে আছে! আগে বলনি কেন? আমি এদিকে পরের কোন ছেলেকে পোষ্য হিসাবে নেবার জন্য চেষ্টা করছি। আমাদের বিশপকেও বলেছি। তোমার ছেলের বয়স কত?

রোজ খুশী মনে বলল, ছয়।

তার স্বামী বলল, তাহলে ত খুব ভালই হয়।

সেদিন তার স্বামীর কাছে রোজের দামটা হঠাৎ আশ্চর্য রকমভাবে বেড়ে গেল। পরদিন রোজকে জড়িয়ে ধরে তার স্বামী বলল, চল আমরা দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে তোমার সে সন্তানকে নিয়ে আসব। তোমার সন্তান মানে আমারও সন্তান। আজ আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারব না তোমাকে।

মঁসিয়ে পেরেন্ত

Monsieur Parent

পার্কের একধারে ছোট্ট জর্জ যখন বালি দিয়ে একটা পিরামিড গড়ে তার মাথায় একটা বাদাম পাতা চাপিয়ে দিচ্ছিল তার বাবা পেরেন্ত তখন একটা লোহার চেয়ারে বসে একদৃষ্টিতে তা লক্ষ্য করছিল। র‍্যু সাঁ লাজারের বাড়িগুলোর ওধারে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল আর তার হলুদ রশ্মিগুলো তির্যকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল পার্কের বাদাম গাছগুলোর পাতায় পাতায়।

রোজ বিকালে এই পার্কটায় ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে আসে পেরেন্ত। অন্য ছেলেদের মত বেশ কিছুক্ষণ প্রাণ ভরে খেলা করে জর্জ আর সেইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পেরেন্ত। তারপর তাকে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। অন্যদিনকার মত আজও পার্কের একটা লোহার চেয়ারে বসে জর্জের খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ কি মনে করে উঠে পড়ল পেরেন্ত। জর্জকে কোলে নিয়ে পা চালিয়ে দিল বাড়ির দিকে। সে চাইছিল তার স্ত্রী হেনরিয়েত্তে বাড়ি ফেরার আগেই বাড়ি ফিরবে। শুধু আজ নয়, সব দিন, সব ব্যাপারেই স্ত্রীকে খুব ভয় করে পেরেন্ত।

পেরেন্তের বয়স চল্লিশ। মোটাসোটা গড়ন। এই অল্প বয়সেই চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে। চাকরি বা কাজ কারবার কিছু করে না। পৈত্রিক সম্পত্তির আয় থেকে বছরে যা পায় তাতে ভালভাবেই সংসার চলে যায়। বছরকতক আগে বিয়ে করেছে। একটিমাত্র সন্তান জর্জের বয়স তিন বছর। স্ত্রীকে ভালবাসে পেরেন্ত। কিন্তু স্ত্রী তাকে ভালবাসা দূরে থাক, মোটেই দেখতে পারে না।

বাড়ি গিয়ে পেরেন্ত দেখল ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা। বাড়ির বুড়ী আয়া জুলি দরজা খুলে দিল। পেরেন্তের এক প্রশ্নের উত্তরে কড়া গলায় উত্তর করল, মাদাম সাড়ে ছ'টার সময় কোন্‌দিন ঘরে ফেরে তা বলতে পার ? যাই হোক, রাত্রি আটটার আগে আমি রাতের খাবার দিতে পারব না তা বলে দিচ্ছি।

রান্নাবাড়ার কাজ সব জুলিই করে। অন্যান্য কাজকর্মের জন্য একজন ঝি আছে। পেরেন্তের আর একটা অস্বস্তি ও অশান্তির কারণ হলো জুলি। জুলি তার স্ত্রীকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। আজ ছ'মাস হলো জুলি বেশী ক্ষেপে উঠেছে। দিনে বারবার তার নামে অসংখ্য অভিযোগ আনে।

হেনরিয়েত্তে বলে, ওকে তাড়িয়ে দাও। তবু ওকে তাড়াতে পারে না পেরেন্ত মানবতার খাতিরে। কারণ জুলি তাদের বাড়িতে বরাবর আছে। তার জন্মের পর থেকে তাকে মানুষ করেছে। তার মার মৃত্যুকালে জুলি তাঁর সেবা করেছে। আজ তার বয়স হয়েছে। এ সময় তাকে তাড়ানোর কথা তাই ভাবতে পারে না পেরেন্ত।

জর্জকে ঝিয়ের হাতে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল পেরেন্ত। মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ভাবতে লাগল আকাশ পাতাল। তার মনে হলো সমস্ত সংসারটাই বিরোধিতা করছে তার। সমস্ত সংসারটা একটা জ্বালাময়ী মরুভূমি তার কাছে। এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে জুলি আর হেনরিয়েত্তের অহেতুক পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চায় সে। এই জ্বলন্ত মরুভূমির দুঃসহ উত্তাপ থেকে এক সবুজ মরুদ্যানের মত একমাত্র জর্জ টেনে নিয়ে যায় তাকে মাঝে মাঝে। ক্ষণিকের জন্য কিছু নির্মল আনন্দ লাভ করে।

তার পুরনো বন্ধু পল লিমোসিনের কথা মনে হলো পেরেন্তের। তার স্ত্রী যখন অকারণে যখন তখন ঝগড়া করে তখন পল তার পক্ষ অবলম্বন করে তার স্ত্রীকে তিরস্কার করে। কিন্তু পল আবার জুলিকে দেখতে পারে না। তাই জুলির কথা তার কাছে বলতে গেলে বলবে ওকে তাড়িয়ে দাও। হেনরিয়েত্তেকে নিয়ে ঘর করতে মন আর চায় না। শুধু জর্জের খাতিরেই স্ত্রীর সব লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান মুখ বুজে সহ্য করে চলে পেরেন্ত।

সাড়ে সাতটার সময় একবার জুলি ঘরে এল। রাতের খাওয়া তৈরী হয়েছে কি না জানতে চাইল পেরেন্ত। কিন্তু জুলি ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, আটটার আগে হবে না।

পেরেন্ত বলল, আমাদের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আটটার সময় বাচ্চা ছেলেটা খেলে ওর পাকস্থলীটা যে একেবারে যাবে। আর এই নিয়ে ওর মা-ও রাগারাগি করবে। ওর মা আর যাই হোক তার ছেলের খাওয়া পরা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন।

জুলি মুখ ভেংচে বলল, খুব হয়েছে, ওর আর মাগিরি ফলাতে হবে না। এমন মা যেন আর কারো না হয়।

পেরেন্ত গম্ভীরভাবে বলল, দেখ জুলি, গৃহকর্ত্রীর সম্বন্ধে এই ধরনের অপমানকর কথা আমার সামনে আর কোনদিন বলবে না।

জুলি আর কোন কথা না বলে ঘরের দরজাটা জোরে বন্ধ করে চলে গেল ঘর থেকে। এমন সময় জর্জ তার ঘরে এল। জর্জকে কোলে নিয়ে তাকে গল্প শোনাতে লাগল পেরেন্ত। কিন্তু তার মনটা এক অজানা অথচ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ভরে রইল। এখনি হেনরিয়েত্তে এসে রাতের খাওয়া নিয়ে ঠিক জুলির সঙ্গে তুমুল ঝগড়ার ঝড় তুলবে। আর তার সঙ্গে সেও জড়িয়ে পড়বে স্বাভাবিকভাবেই। সে ঝড় কেমন করে কাটবে, কেমন করে সে মুক্তি পাবে তা কে জানে। ছেলেকে গল্প শোনাতে শোনাতেই সে বারবার দেয়াল ঘড়িটার পানে তাকাতে লাগল।

দেখতে দেখতে আটটা বেজে গেল। কিন্তু হেনরিয়েত্তে এল না। আশ্চর্য হয়ে গেল পেরেন্ত। তবু আসন্ন ঝগড়ার ঝড়ের আশঙ্কাটা মন থেকে গেল না তার। যেকোন মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে হেনরিয়েত্তে আর আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের থেকেই কারণে অকারণে তুলবে বাকবিতণ্ডা আর ঝগড়ার একটা প্রচণ্ড ঝড়।

হেনরিয়েত্তের পরিবর্তে জুলি এল। জুলি এসে গম্ভীরভাবে বলল, মঁসিয়ে, তুমি জান আমি দীর্ঘদিন তোমার মার কাছে কাজ করেছি। তোমার জন্মের পর থেকে তোমাকে মানুষ করে আসছি। দীর্ঘদিন তোমাদের পরিবারের সেবা করে আসছি। সে শুধু টাকার জন্য নয়। আমি তোমাকে স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি, তোমার সঙ্গে কোনদিন কোন ব্যাপারে আমি প্রতারণা করিনি। জীবনে কোনদিন একটাও মিথ্যা কথা বলিনি।

পেরেন্ত গম্ভীরভাবে বলল, তা ঠিক জুলি। সে কথা ত সবাই জানে।

জুলি কিন্তু থামল না। সে যেন এতক্ষণ শুধু একটা ভূমিকা প্রস্তুত করেছে। আসল কথা বলা তার এখনো হয়নি। জুলি বলল, কিন্তু মঁসিয়ে আর এভাবে চলে না, এর একটা বিহিত করতেই হবে। এতদিন তোমাকে আমি কিছুই বলিনি, সব কথা গোপন করে এসেছি। কিন্তু আর চলে না। পাড়ার সব লোক সেকথা জানে এবং সবাই হাসাহাসি করছে, তোমার প্রতি বিরূপ হচ্ছে। আমি বলছি আমার মাদামের কথা। উনি যখন তখন বাড়ি ফেরেন তার মানে এই যে উনি পরপুরুষের সঙ্গে ইচ্ছামত বিহার করে বেড়ান। এবং এই নোংরামির তুলনা হয় না। আর সেটা বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

বিরক্ত হয়ে পেরেন্ত বলল, আমি তোমাকে একদিনই বলে দিয়েছি এসব কথা আমার সামনে বলবে না।

জুলি দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে বলল, না, আজ আমি সব বলব। সব কথা খুলে বলব। তুমি শুনতে না চাইলেও বলব। জেনে রাখ, উনি তোমাকে শুধু ওঁর নিজের স্বার্থের জন্য আর তোমার টাকার জন্য বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরদিন থেকেই উনি প্রতারণা করে আসছেন তোমার সঙ্গে। তোমাকে একদিনের জন্যেও ভালবাসেননি। তোমার সারা জীবনটাকে দুঃখে ভরিয়ে তুলেছেন। সেকথা ভাবলে দুঃখে বুকটা ফেটে যায় আমার।

হাত দুটো মুঠো করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল পেরেন্ত। একসময় বলল, যাও যাও, চুপ করো। আর কিছু বলতে হবে না।

সহসা জুলির সঙ্গে তার বাবার কথা কাটাকাটি দেখে কেঁদে উঠল জর্জ আর তা দেখে জুলির দিকে ছুটে গেল পেরেন্ত। হাত উঁচু করে বলল, চুপ করবে কি না বল। দেখছ না ছেলেটা ভয়ে কাঁদছে।

জুলি বলল, আমি তোমাকে ছেলের মত মানুষ করেছি। তা সত্ত্বেও আজ তুমি আমাকে ধরে মারতে পার। তবু আমি আসল কথা, সত্যি কথাটা বলে যাবই। খুব ছেলে ছেলে করছ। কিন্তু ও ছেলে কার তা জান? ও ছেলে পল লিমোসিনের। আমি নিজে দেখেছি তোমার স্ত্রী পলকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করছে।

কোল থেকে ছেলেটাকে নামিয়ে পেরেন্ত জুলির কাঁধ দুটো দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, হিংসুক কুটিল কোথাকার। দূর হয়ে যা ঘর থেকে, তা না হলে তোকে আমি খুন করব।

এই বলে জুলিকে ঘরের বাইরে নিয়ে ঠেলে দিতেই খাবার টেবিলের উপর পড়ে গেল জুলি। টেবিলের কাঁচ আর তার উপর রাখা প্লেটগুলো পড়ে ভেঙ্গে গেল। তবু উঠে দাঁড়িয়ে জুলি বলে যেতে লাগল, আমার কথা বিশ্বাস না হয় আজই তার প্রমাণ নিজের চোখে দেখতে পার। রাতের খাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়ে ফিরে এসে দেখবে কি কাণ্ড হয়। দেখবে আমি মিথ্যা কথা বলছি কিনা।

এই বলে জুলি তার নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল। কিন্তু পেরেন্তও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, আমি বলছি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে তুমি দূর হয়ে যাও। আমি তোমাকে আর চাই না।

ভিতর থেকে জুলি উত্তর করল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার মঁসিয়ে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই এ বাড়ি ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাব।

পল তার ঘরের মধ্যে ফিরে এল। জর্জ তখন একটা চেয়ারে বসে কাঁদছে। ছেলেটাকে চুপ করিয়ে তাকে মেঝের কার্পেটের উপর বসিয়ে তার পানে তাকিয়ে দেখতে লাগল পেরেন্ত—সে লিমোসিনের মত দেখতে হয়েছে কিনা। দেখতে লাগল আসলে জর্জ কার ঔরসজাত সন্তান—তার না লিমোসিনের। লিমোসিনের মুখটা একবার মনে করল পেরেন্ত। কিন্তু তার মুখে একটু দাড়ি আছে। তাই ঠিক বুঝতে পারল না। অথচ জুলি তাকে বারবার বলেছে একটা কানা লোকও ছেলেটার মুখের পানে তাকিয়ে বুঝতে পারবে সে লিমোসিনের ছেলে।

একটা বড় আয়নার সামনে জর্জের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনের মুখের মধ্যে একটা সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করল পেরেন্ত। কিন্তু চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসছিল তার দৃষ্টি। সব যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। পেরেন্ত কিছুই বুঝতে পারল না।

এমন সময় বাড়ির কলিং বেলটা বেজে উঠল। প্রথমবার শুনেও শুনল না পেরেন্ত। দ্বিতীয়বার বেজে উঠতেই এগিয়ে গেল। জুলি ওর আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

ঘরে ঢুকে পেরেন্তকে দরজা খুলতে দেখে হেনরিয়েত্তে আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি! জুলি কোথায়?

পেরেন্ত কোন কথা বলতে পারল না। রেগে গিয়ে হেনরিয়েত্তে বলল, তুমি কি হঠাৎ বোবা হয়ে গেলে নাকি?

পেরেন্ত বলল, আমি জুলিকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কারণ সে জর্জের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। কারণ সে তোমার নামে যা তা বলেছে।

হেনরিয়েত্তে বলল, আমার নামে কি বলেছে বল?

পেরেন্ত বলল, সে বলেছে তুমি নাকি স্ত্রী ও মা হিসাবে কোন কর্তব্যই পালন করো না।

হেনরিয়েত্তে রাগের মাথায় আমতা আমতা করে বলল, তুমি বলছ আমি—

পেরেন্ত বলল, আমি বলছি না। বলেছে জুলি। শুনতে চাইলে বলে বললাম।

হেনরিয়েত্তে বলল, তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

পেরেস্ত বলল, না। তার আগেই সে চলে গেছে।

কাপড় ছেড়ে হেনরিয়েত্তে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই সবকিছু এলোমেলো ও কাঁচভাঙ্গা দেখে চমকে উঠল। এসব কি ?

জর্জ তখন বলল, জুলি বাবাকে মারছিল।

হেনরিয়েত্তে হেসে লিমোসিনকে বলল, শুনলে পল আমার স্বামী কেমন বীরপুরুষ, জুলির হাতে মার খেয়েছে।

পেরেস্ত বলল, না। আমিই বরং ওকে মেরেছি। ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছি। ও পড়ে যেতেই এই অবস্থা হয়েছে।

হেনরিয়েত্তে বলল, সে যা ক্ষতি করেছে তাতে তোমার পুলিশ ডেকে তাকে ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, এখন খাওয়ার ব্যবস্থা করো।

ঝিকে ডেকে খাবার ব্যবস্থা করল পেরেস্ত। লিমোসিন তাকে সাহায্য করতে লাগল। সকলে একসঙ্গে খেতে বসল। খেতে খেতে একসময় পেরেস্ত বলল, খাওয়ার পর আমি একটু বেরোব। তোমরা থাক। জর্জকে ওঘরে শুইয়ে দেবে। জুলি চলে গেছে, তার জায়গায় একজন লোক ত চাই।

হেনরিয়েত্তে সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক আছে। তাই যাও।

বাইরের দরজায় চাবি দিয়ে গেল পেরেস্ত।

পেরেস্ত চলে গেলে লিমোসিন বসার ঘরে গিয়ে একটা ঈজি চেয়ারে বসে বলল, কারণে অকারণে পেরেস্তকে বক কেন ? ও ত আমাদের মেলামেশার ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে না।

হেনরিয়েত্তে বলল, আমি ওর মত কাপুরুষদের মোটেই দেখতে পারি না। একটা অপদার্থ। তুমিও দেখছি কাপুরুষদের মত কথা বলছ। ওর মত লোককে ভয় করার কি আছে ?

লিমোসিন বলল, কিন্তু কেন তুমি ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে না ? তুমিই ওকে ঠকাচ্ছ। ওর সঙ্গে প্রতারণা করছ। কিন্তু তার জন্য ও ত তোমাকে মারেও না, গালমন্দও করে না।

লিমোসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হেনরিয়েত্তে কাতর কণ্ঠে বলল, আমি ওর সঙ্গে প্রতারণা করি সে ত তোমার জন্যে। তুমি একথা আমাকে বলতে পারলে পল ?

লিমোসিন হেনরিয়েত্তেকে জড়িয়ে ধরে বলল, আরে, আমি বললাম আমাদের দু'জনের ভালর জন্যই। আমাদের ভালর জন্যেই ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা দরকার। ও যেন আমাদের সন্দেহ না করে।

লিমোসিনকেও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগল হেনরিয়েত্তে। এই নিবিড় চুম্বন ও আলিঙ্গনে দু'জনে আবদ্ধ হয়ে কতক্ষণ ছিল তা ওরা কেউ জানে না। সহসা একটা চীৎকার করে লিমোসিনকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল হেনরিয়েত্তে।

দেহমিলনের আনন্দে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ওদের চেতনা যে পেরেন্ত কখন চাবি খুলে তাদের ঘরে এসে ঢুকেছে তা ওরা কেউ টেরই পায়নি।

পেরেন্ত প্রথমে ওদের এই অবস্থায় দেখে হতভম্ব ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে ছুটে গিয়ে লিমোসিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা টিপে ধরল। বলল, বিশ্বাসঘাতক, আজ তোকে শেষ করে ফেলব।

লিমোসিনকে বেকায়দায় দেখে হেনরিয়েত্তে ছুটে গিয়ে পেরেন্তের ঘাড়ে তার আঙুলের নখগুলো বসিয়ে দিয়ে তার ঘাড়টাকে কামড়ে ধরল।

পেরেন্তের ঘাড় থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সে তখন পলকে ছেড়ে দিয়ে ওদের দু'জনকেই বলল, তোমরা দু'জনে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও। তা না হলে তোমাদের দু'জনকেই আমি খুন করব।

এই বলে একটা চেয়ার উঁচিয়ে লিমোসিনের মাথার উপর তুলে ধরল পেরেন্ত। তখন হেনরিয়েত্তে তাড়াতাড়ি লিমোসিনের কাছে গিয়ে তার একটা হাত ধরে বলল, চল পল, এখান থেকে চলে যাই। লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

লিমোসিনের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হেনরিয়েত্তে। যাবার আগে শেষবারের মত একটা আঘাত দিয়ে যেতে চাইল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পেরেন্তের মুখের ওপর নির্মমভাবে ছুঁড়ে মারল একটা ভয়ঙ্কর কথার ঢিল। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে যাব।

পেরেন্তের বুকের ভিতরটায় কে যেন হাতুরীর ঘা দিল। ছেলে! কোন্ সাহসে তুমি ছেলের কথা বলছ!

হেনরিয়েত্তে বলল, হ্যাঁ, ও আমার ছেলে। ওর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। ও আমার আর পলের ছেলে।

গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল পেরেন্ত। তুই মিথ্যা কথা বলছিস। হতভাগী বদমাস।

হেনরিয়েত্তে গলার স্বরটা কমিয়ে বলল, তুমি বড় বোকা। একমাত্র তুমি ছাড়া একথা সবাই জানে।

পরমুহূর্তেই একটা জ্বলন্ত বাতি নিয়ে পাশের ঘর হতে ঘুমন্ত জর্জকে কোলে করে নিয়ে এল পেরেন্ত। শেষবারের মত একবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে হেনরিয়েত্তের কোলে তাকে তুলে দিল। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখল পেরেন্ত। জর্জ তার শেষ সম্বল। সে সম্বল হাতছাড়া করতে চাইছিল না। সে তাই কাতর কণ্ঠে লিমোসিনকে বলল, বল পল, তুমি ত জান। বল, জর্জ কার ছেলে—তোমার না আমার?

লিমোসিন কোন কথা বলল না। নীরবে হেনরিয়েত্তের সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পেরেন্তের তখন দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। ওরা সবাই চলে গেল কোনরকমে দরজাটা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে চলে গেল সে।

মামলা মোকদ্দমা করার ইচ্ছে ছিল না পেরেন্তের। তাতে কেলেঙ্কারীর কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। ওদের উকিলের কথামত একটা বাৎসরিক বৃত্তি দেবার প্রস্তাব মেনে নিল পেরেন্ত। আসলে লিমোসিন বেকার। সেই বৃত্তিতে ওদের ছোট্ট সংসারটা চলে যাবে।

ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ একা পেরেন্ত। বাইরে একটা হোটেল থেকে খেয়ে আসে। ঠিকে-ঝি ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। কিন্তু সারা দিনরাতের মধ্যে একটুও শান্তি পায় না পেরেন্ত। সব সময় শুধু জর্জের কথা মনে পড়ে। রাত্রিতে মাঝে মাঝে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে হয় জর্জ তাকে ডাকছে। জর্জের চিন্তা এমনভাবে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তুলল যে পেরেন্তের মনে হলো এইভাবে কিছুকাল চললে সে পাগল হয়ে যাবে। আবার এক একসময় জর্জের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সেই কুটিল সন্দেহটাও মাথা তুলে ওঠে। এবিষয়ে বিভিন্ন কাল্পনিক যুক্তি তর্কের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে চায় সে। কিন্তু পারে না।

অবশেষে নিজের বাড়িটা একদিন বন্ধ করে দিয়ে একটা হোটেলের একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে থাকতে লাগল পেরেন্ত। সেখানে অন্ততঃ অনেক মানুষ আছে। হাঁপ ছেড়ে কিছুটা বাঁচল পেরেন্ত। অজস্র অবাঞ্ছিত বাসি স্মৃতির কঙ্কালে ভরা একটা নির্জন বাড়ির শূন্য নীরব ঘরগুলো আর তাকে একা পেয়ে গিলে খেতে আসবে না। তার মন প্রাণের সব আবেগ সব অনুভূতি শুধু একটা চিন্তার উপর আর কেন্দ্রীভূত হতে পারবে না।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। তবু কোন বৈচিত্র্য দেখা দিল না পেরেন্তের নিঃসঙ্গ জীবনে। এই ভাবে কেটে গেল পাঁচটি বছর। হঠাৎ একদিন এক বিকেলে পথে যেতে যেতে ওদের দেখতে পেল পেরেন্ত। ওদের মানে, ওদের তিনজনের সেই শান্ত সুখী সংসারটাকে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল পেরেন্ত। পল লিমোসিনের লম্বা চওড়া চেহারা, গালে লম্বা জুলপি। গোলগাল বেঁটে ধরনের চেহারার হেনরিয়েত্তে আর আট বছরের ছেলে জর্জ।

পেরেন্তের একবার মনে হলো ছুটে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে। ওদের দেখে খুব সুখী মনে হলো। স্বামী স্ত্রী আর একটি সন্তান—ওদের তিনটি মানুষের সংসারটা খুবই সুখের। ওদের সুখ দেখে বুকটা জ্বলে যায় পেরেন্তের। আরো বেড়ে যায় তার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা। বেড়ে যায় সব হারানোর জ্বালাটা। এইভাবে এই জ্বালা আর বেদনার মধ্য দিয়ে আরো কয়েকটা বছর কেটে যায়। এই অবিচ্ছিন্ন দুঃখের জীবনে মাঝে মাঝে একটি মেয়ের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে একটু শান্তি ও সান্ত্বনা পায় পেরেন্ত। সে হলো ম্যাদময়জেল

জো নামে একটি তরুণী। পেরেন্ত যে হোটেলে থাকে সেই হোটেলেই কাজ করে। একদিন জো পেরেন্তের শরীরের অবনতি দেখে বলল, আপনার কিছুদিন বাইরে কোথাও যাওয়া দরকার। জলবায়ুর পরিবর্তন চাই।

ঠিক হলো সাঁ জার্মেন নামে একটা গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাবে পেরেন্ত। সেখানে একটি পান্থনিবাসে কিছুদিন থাকবে। দেহমনের পরিবর্তন হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে বেশীদিন থাকা সম্ভব হলো না তার পক্ষে।

হোটেলে খাবার সময় হঠাৎ একদিন সন্ধের কিছু আগে দেখল তার অদূরে লিমোসিনরা খাচ্ছে। জর্জ এখন বেশ বড় হয়েছে। হেনরিয়েত্তে তেমনি শক্ত আছে। শুধু লিমোসিনের বয়সটা একটু বেশী দেখাচ্ছে। ওরা উঠে হোটেল থেকে নিকটবর্তী একটা বনপথ ধরল।

পেরেন্তও উঠে পড়ে ওদের পিছু নিল। আজ ও তাদের সামনে গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করবে, কেন ওরা ওর জীবনকে এমন করে এক সীমাহীন দুঃখ আর ব্যর্থতার মধ্যে ঠেলে দিল।

বয়সের তুলনায় বেশী বুড়ো দেখাচ্ছিল পেরেন্তকে। মুখে দাড়ি ছিল। পোশাকটাও ময়লা ছিল। পেরেন্ত সরাসরি হেনরিয়েত্তের কাছে গিয়ে বলল, চিনতে পারছ? আমার নাম হেনরি পেরেন্ত। আমাকে ঠকিয়ে গিয়ে ভেবেছিলে খুব সুখভোগ করবে। কিন্তু আজ সবকিছুর কৈফিয়ৎ চাই। সমস্ত প্রতারণার পূর্ণ প্রতিশোধ চাই।

হেনরিয়েত্তে ও লিমোসিন দু'জনেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। জর্জ ভাবল লোকটা পাগল। তাই উঠে গিয়ে পেরেন্তের জামার কলারটা ধরে ফেলল। পেরেন্ত তখন হেনরিয়েত্তেকে লক্ষ্য করে বলল, বল আমি কে। জর্জকে বল, ওর পিতা কে।

তারপর হঠাৎ জর্জের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি জান তোমার পিতা কে? আমি হচ্ছি তোমার পিতা। সত্যিকারের পিতা। তোমার মা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে যাবার সময় আমাকে চরম আঘাত দেবার জন্য তোমাকে নিয়ে যায়। মিথ্যা করে বলে যায় লিমোসিন তোমার পিতা। এবার তুমি তার বিচার করবে, তুমি এখন বড় হয়েছ। তারপর আমাকে জানাবে। আমি থাকি হোটেল দ্য কন্তিনেন্তে।

এই কথা ক'টি বলে ঝড়ের বেগে সেখান থেকে চলে এল পেরেন্ত। সেই রাতেই প্যারিসে ফিরে আসার জন্য ট্রেন ধরল।

পেরেন্তকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল জো। প্রশ্ন করল, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কেন? আপনাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?

কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একমনে মদ খেয়ে যেতে লাগল পেরেন্ত। সে রাতে পেরেন্ত এত বেশী মদ খেয়েছিল যে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হয়েছিল তার শোবার ঘরে।

মার্কুই দ্য ফিউমেরল

The Marquis De Fumerol

আমার বাবা রোজার দ্য তুমভিল তখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসে ডিনার খাচ্ছিলেন। এমন সময় একটা চিঠি এসে তাঁর হাতে পড়ল। তোমরা সবাই জান বিপ্লবোত্তর ফরাসী দেশে যখন রাজনৈতিক অবস্থাটা খুব বিক্ষুব্ধ ছিল, যখন বুর্বন ও অলিয়ান্স দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল, আমার বাবা তখন নিজেকেই দেশের রাজা বলে মনে করতেন এবং আমার মা এবিষয়ে তাঁকে প্রেরণা দান করতেন।

চিঠিখানা পড়ে বাবা মাকে বললেন, তোমার দাদার খুব অসুখ। বাঁচার কোন আশা নেই। কথাটা শুনে মার মুখটা মলিন হয়ে গেল। বাবা আবার বললেন, আমার একটা সামাজিক মর্যাদা আছে। সুতরাং এ বিষয়ে আমার একটা কর্তব্য আছে।

আমার মামা মার্কুই দ্য ফিউমেরল আগে অভিজাত সমাজের একজন কর্ণধার ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন লর্ড এবং বড়দরের একজন সামরিক অফিসার। কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। বিশেষ করে নারীসংসর্গে তিনি বহু অর্থ উড়িয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত দুটি নিচু সমাজের মেয়েকে বাড়িতে রেখে দেন। আমার বাবাকে চিঠিখানা লিখেছে মেলানি নামে আমার মামার এক রাঁধুনি।

আমার বাবা আমার মাকে বললেন, তোমার দাদার শেষকৃত্যটা কিভাবে করা যাবে তা ঠিক করো।

আমার মা বললেন, আমি আমাদের যাজক সাহেব আব্বেকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। আমি মনে করছি রোজার আর যাজক আব্বেকে নিয়ে আমিই যাব। তোমাকে আর যেতে হবে না। তোমার একটা সামাজিক মর্যাদা আছে। তোমার সেখানে যাওয়া চলে না।

আমার বাবা তা সমর্থন করে বললেন, ঠিক বলেছ।

অবশেষে আমাকে ও যাজক আব্বেকে সঙ্গে নিয়ে মা রওনা হলেন। মামার বাড়িতে পৌঁছতেই মোটা চেহারার মেলানি দরজা খুলে দিল। আমরা ঘরে ঢুকলে মেলানি আমাদের বসার জন্য চেয়ার দিল। কিন্তু আমার মাকে মামার কাছে যেতে দিল না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি মেলানিকে আমার আগমন সংবাদটা দিতে বললাম।

মেলানি এসে আমাকে ঘরে নিয়ে গেল। আমি দেখলাম, মামাকে খুবই রুগ্ন ও ক্ষীণ দেখাচ্ছে। তাঁর দু'দিকে দুটি বারবণিতা শ্রেণীর যুবতী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের অনাবৃত হাত আর নোংরা পোশাক দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তারা কোন্ শ্রেণীর মেয়ে। মামা একটা ঈজি চেয়ারে শুয়ে ঝিমোচ্ছিলেন। তাঁর বিছানার খাটের পাশে টেবিলের উপর কিছু খাবার নামানো ছিল। বোঝা গেল ঐ মেয়ে দুটির খাবার।

আমাকে দেখে আমার মামা চিনতে পারলেন। বললেন, কিরে তোর মা আসতে পারল না?

আমি বললাম, আমার মা এখানে কি করে আসবে?

আমি মেয়ে দুটিকে লক্ষ্য করেই একথা বললাম। এমন সময় আমাদের যাজক আব্বে ঘরে ঢুকতেই রেগে উঠলেন মামা। বললেন, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। তোমরা মানুষ না মরতেই তার আত্মা চুরি করে নিয়ে যাও। তোমাদের দেখলেই মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। তোমাকে কোন প্রয়োজন নেই। আমি আরো বাঁচতে চাই।

আব্বে চলে গেল। আমিও আব্বের পিছু পিছু মার কাছে চলে গেলাম। মামার মৃত্যুর আগে ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড কি করে করা যাবে তার উপায় খুঁজতে লাগলাম তিনজনে। সহসা একটা চীৎকার শুনে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। মেলানি ব্যস্ত হয়ে আমাকে ডাকতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে দেখলাম আর একজন প্রোটেস্ট্যাণ্ট যাজক ঘরে ঢুকতেই তাকে দেখে মামা চীৎকার করছেন। আমি গিয়ে যাজককে সরিয়ে দিলাম।

এর একটু পরেই মামা পড়ে গেলেন বসে থাকতে থাকতে। আমার মা ছুটে গিয়ে মেয়ে দুটিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। বললেন, তোমাদের কাজ এবার ফুরিয়ে গেছে। এখন আসতে পার।

মেয়ে দুটিও ঘর থেকে বিনা প্রতিবাদে বেরিয়ে গেল। আব্বে গিয়ে ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড করতে শুরু করে দিল। অন্তিমকালে মামার একটু জ্ঞান ফিরে এল। এক তৃপ্তিসূচক আবেগের সঙ্গে বললেন, হা ভগবান, কী আনন্দ, কী পরম শান্তি!

মামার মৃত্যুর পর তাঁর শোকযাত্রায় সমাজের অনেক বিশিষ্ট লোক অংশগ্রহণ করলেন। একজন ব্যারণ ও সিনেটের সদস্য বললেন, অভিজাত বংশের লোকেরা সাময়িক ভুলবশতঃ পাপ কাজ করলেও মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেন। তাদের পাপকর্মের সময় ঈশ্বর যেমন তাদের আত্মা ছেড়ে চলে যান, মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাদের আত্মার মাঝে আবার নেমে আসেন।

পরিত্রাণ

The Saved

রেনেডেনের মার্কুইপত্নী তীরবেগে এসে গ্র্যাঞ্জেরির ব্যারণপত্নীর ঘরে ঢুকল। সে হাসছিল। এত হাসছিল যে হাসির আবেগে কথা বলতে পারছিল না। ঘরের মধ্যে ঢুকে সে কোনরকমে হাসি চেপে বলল সে তার স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিয়েছে।

গ্র্যাঞ্জেরির ব্যারণপত্নী তার দিকে কৌতূহলভরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, এখন কি করেছ তাই বল।

মার্কুইপত্নী বলল, কি করেছি? বড় মজার কাজ করেছি। আর তার ফলে আজ আমি মুক্ত। একেবারে মুক্ত এবং চিরদিনের মত।

ব্যারণপত্নী আশ্চর্য হয়ে বলল, কিসের থেকে মুক্ত?

মার্কুইপত্নী বলল, আমার অত্যাচারী ঈর্ষাপরায়ণ স্বামীর হাত থেকে।

ব্যারণপত্নী বললেন, তোমাদের বিবাহবিচ্ছেদ কি হয়ে গেছে?

মার্কুইপত্নী উত্তর করল, এখনো হয়নি। তবে তার জন্য প্রয়োজনীয় অভ্রান্ত প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি। কিন্তু তার জন্য আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

ব্যারণপত্নী এবার হাতের বইটা ফেলে উঠে বসল; বলল, ভাল করে খুলে বল ব্যাপারটা।

মার্কুইপত্নী বলল, আমার স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলাম অনেকদিন হতে। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারণ আমার উপর অনেক অত্যাচার অবিচার করলেও তার কোন প্রমাণ রাখত না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব সময় ও বিরক্ত করত আমায়। কথায় কথায় আঘাত দিত আমার মনে। যখন আমি ঘরে থাকতে চাইতাম ও আমায় বাইরে যেতে বলত, আবার যখন বাইরে যেতে চাইতাম তখন ঘরে আটকে রাখত। আমি চাইতাম ও আমাকে ধরে মারুক। কিন্তু গায়ে কোনদিন হাত দিত না। আমি ভাবতাম এভাবে আর চলতে পারে না। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পেতাম না। তারপর সহসা একসময় একটা উপায়ের কথা মাথায় এল আমার। ওর একজন রক্ষিতা ছিল। কিন্তু ও খুব সতর্কতার সঙ্গে সেখানে যেত। ফলে কেউ কিছু টের পেত না। তারপর অতিকষ্টে একদিন আমার ভাইকে দিয়ে বেশকিছু টাকা খরচ করে সেই মেয়েটার একটা ফটো যোগাড় করলাম। তারপর সেই ফটোটা নিয়ে একটা দালালের কাছে গেলাম। গিয়ে বললাম এই মেয়েটার মত দেখতে একটা সুন্দরী ঝি চাই যে আমার বাড়িতে কাজকর্ম করবে। বেশ ভাল দেখে একটা মেয়ে।

দালালটা বলল, আপনি কি চরিত্রের দিক থেকেও ভাল চান?

আমি বললাম, না তা ঠিক না, কারণ আমি বিশেষ করে আমার স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই চাইছি।

সে আমার কথা বুঝতে পেরে হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে। এক সপ্তার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। পেলে তবেই টাকা দেবেন।

তিন দিনের মধ্যেই একটা লম্বা সুন্দরী মেয়ে আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। তার সঙ্গে কথা বলে দেখলাম সে রাজি আছে। আমার স্বামী কি খেতে ভালবাসেন, কি ধরনের সেন্ট ভালবাসেন তা জেনে নিল। সে বলল, এই ধরনের দশটি বিবাহবিচ্ছেদ এইভাবে সে ঘটিয়েছে।

আমি বললাম, এ কাজে সফল হতে তোমার কতদিন লাগবে?

মেয়েটি বলল, সেটা নির্ভর করছে আপনার স্বামীর মেজাজের উপর। আমি তাঁকে একবার দেখলেই তা বলে দেব। আমাকে আপনি রোজ বলে ডাকবেন।

সেদিনই আমার স্বামী বাড়ি ফিরে রোজকে দেখে অবাক হয়ে গেল। আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি বেশ সুশ্রী ত! কোথায় পেলে?

আমি বললাম গ্র্যাঞ্জেরির ব্যারণপত্নী আমার জন্য যোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমার স্বামী খুশি হলো। সেদিন থেকে আমাকে ইচ্ছামত বাইরে বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতা দিল। আমি সারাদিন বাইরে থাকলেও কিছু বলত না আমায়। আমিও চাইতাম ওদের মধ্যে দ্রুত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠুক আমার অনুপস্থিতিতে। একদিন রোজ আমায় বলল, আমার স্বামী ওর নাম জিজ্ঞাসা করেছে। তার মানে তার গলার স্বরটা কেমন জানতে চেয়েছে। আর একদিন এসে বলল, হয়ে গেছে। আজ সকালে।

আমি জিজ্ঞাসা করতে বলল, তিন চার দিন ধরে আমার স্বামী ওকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এসব ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হতে নেই। তাই আমি তিন চারদিন ওঁকে এড়িয়ে গিয়েছি। অবশেষে আজ সকালে রাজী হই।

আমি তখন বললাম, তাহলে এবার দেরী না করে একটা দিন ঠিক করে ফেল। যেদিন আমি তোমাদের এ কাজে হাতেনাতে ধরে ফেলব, তাহলেই সব কাজ হাসিল।

অবশেষে ঠিক হলো আগামী বৃহস্পতিবার ঠিক বেলা পাঁচটার সময় আমার ঘরে আমার বিছানাতেই আমি ওদের ধরে ফেলব। অর্থাৎ আমি তখন বাইরে থাকব। আর ঠিক সময়ে উপযুক্ত সাক্ষীদের সঙ্গে করে এসে ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকব।

তার কথা শেষ করে ব্যারণপত্নীর ঘরের মধ্যে আনন্দে নাচতে লাগল মার্কুইপত্নী।

ব্যারণপত্নী শুধু একবার হতাশার সুরে বলল, ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখার জন্য আমাকে ডাকতে পারলে না! আমাকে আগে জানাতে হত!

বানিজার ভেনাস

The Venus of Baniza

কিছুকাল আগে বানিজায় এক ইহুদী পণ্ডিত ছিল। সে যেমন ধর্মভীরু ছিল তেমনি ধর্মশাস্ত্রে তার ছিল বিশেষ ব্যুৎপত্তি। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে ও শাস্ত্রীয় বিচার উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাঝে মাঝে ডাক পড়ত তার। তবে তার নিজের শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তার স্ত্রীর অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথাটাও ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে।

সাধারণতঃ পণ্ডিতদের স্ত্রীরা কুৎসিত হয় এই ধরনের একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই প্রবাদের ব্যাখ্যা করে ইহুদী পণ্ডিতটি বলত, পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। ঈশ্বর জানেন পণ্ডিতরা নারীর রূপটাকে বড় করে দেখবে না। তাই যে সব কুরূপা নারীদের সাধারণ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষরা গ্রহণ করবে না ঈশ্বর তাদের পণ্ডিতদের দান করেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে ঈশ্বর তাঁর এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। তিনি এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী স্ত্রী হিসেবে দান করেছেন এই ইহুদী পণ্ডিতকে। তার সৌন্দর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে স্থানীয় লোকেরা বলত বানিজার ভেনাস। লম্বা চেহারার অপূর্ব মুখশ্রী, টানা টানা কালো চোখ, ফর্সা ঘাড়ের দু'পাশে ছড়ানো কালো চুলের গোছা। শুভ্র মসৃণ

হাতদুটো দেখে মনে হত হাতীর দাঁত থেকে কুঁদে কুঁদে নির্মাণ করা হয়েছে। এক কথায় সে সৌন্দর্যের তুলনা পাওয়া যায় না অন্য কোন নারীর মধ্যে। অন্ততঃ বানিজার লোকেরা তা পায়নি।

ইহুদী পণ্ডিতের কিন্তু সেদিকে খুব একটা উৎসাহ ছিল না। সে প্রায় দিনের সব সময় শাস্ত্রপাঠ আর পূজা অর্চনা নিয়েই থাকত। আর তার স্ত্রী ভেনাস বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে বসে রাস্তার লোক চলাচল দেখত। তাদের অবস্থা ভাল ছিল বলে বাড়িতে কাজকর্ম করার লোকের অভাব ছিল না। ভেনাসের হাতে ছিল তাই অফুরন্ত সময়। সারা দিনরাতের মধ্যে একমাত্র খাওয়া আর ঘুমোন ছাড়া অন্য কোন কাজ হাতে না থাকায় ভেনাস সাজগোজ করে পথের উপর তার শূন্য স্বপ্নালু দৃষ্টি ছড়িয়ে বসে থাকত। আর মাঝে মাঝে তার পানে তাকিয়ে তার মুনির মন টলানো, রাজার সিংহাসন কাঁপানো, কবি চিত্রকরের প্রেরণা যোগানো রূপসৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে যেত পথচারিরা।

একদিন বিকালের দিকে একটা প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে গেল সারা শহরটার উপর দিয়ে। সহসা একসময় ভেনাস তার স্বামীর পূজোর ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বলতে পার ডেভিডের পুত্র মেসিয়া কখন আসবে ইহুদী জাতির মাঝে?

পণ্ডিত বলল, যখন সমগ্র ইহুদী একেবারে পুণ্যবান ও ধর্মাত্মা হয়ে উঠবে অথবা একেবারে পাপাত্মা হয়ে উঠবে একমাত্র তখনি তাদের মাঝে আবির্ভূত হবে ডেভিডপুত্র মেসিয়া।

ভেনাস তখন আবার প্রশ্ন করল, তুমি কি বিশ্বাস কর ইহুদীরা কোনদিন সম্পূর্ণরূপে পুণ্যাত্মা হয়ে উঠবে একযোগে?

পণ্ডিত উত্তর করল, সেকথা আমি কি করে বলব বল।

ভেনাস বলল, তাহলে তারা যখন সম্পূর্ণরূপে পাপিষ্ঠ হয়ে উঠবে তখনি আসবে মেসিয়া।

কথাটাকে তুচ্ছভাবে উড়িয়ে দিয়ে আবার পূজোয় মন দিল পণ্ডিত। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় থেমে গিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে সেই বৃষ্টি দেখতে দেখতে আপন দেহের পোশাকের উপর আনমনে হাত বোলাতে লাগল ভেনাস।

একদিন পাশের এক শহরে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শাস্ত্র বিচারের কাজে ডাক পড়ল পণ্ডিতের। বাড়িতে বলে গেল পরদিন সকালে আসবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ মিটে যেতে সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরল পণ্ডিত অপ্রত্যাশিতভাবে।

বাড়ির সামনে এসে আশ্চর্য হয়ে গেল পণ্ডিত। দেখল তার বাড়ির সদর দরজার সামনে কোন পদস্থ সরকারী অফিসারের এক আর্দালি পাহারা দিচ্ছে। বাড়ির ভিতরটা আলো দিয়ে ভালোভাবে সাজানো হয়েছে।

পণ্ডিত প্রহরীকে বলল, তুমি এখানে কি করছ?

লোকটি বলল, আমি দেখছি সুন্দরী ভেনাসের স্বামী হঠাৎ এসে পড়ে কি না।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে না পেরে বাগানবাড়ির দিকের পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকল পণ্ডিত। উপরে যেতে যেতে দেখল খাবার টেবিলে দু'জনের খাবার সাজানো হচ্ছে, দেখল তার স্ত্রী বারান্দায় তেমনি সাজগোজ করে বসে আছে।

পণ্ডিত রাগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, আমার অবর্তমানে কে এই বাড়িতে এসেছে?

ভেনাস কোন কথা বলল না। কোন জবাব দিল না। তখন পণ্ডিত বলল, আমি জানি, সৈন্যবিভাগের এক ক্যাপ্টেন এসেছে তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে রাত্রিবাসের জন্যে।

শান্তকণ্ঠে ভেনাস উত্তর করল, কেন আসবে না বলতে পার?

পণ্ডিত বলল, বউ, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

তার স্ত্রী উত্তর করল, আমার পূর্ণ জ্ঞান আছে।

ভেনাসের সুন্দর ঠোঁট দুটোর মাঝখানে এক রহস্যময় হাসির রেখার একটা ঝিলিক খেলে গেল। সে হাসি মুখ হতে মিলিয়ে যেতে না যেতেই সে বলল, ভুলে যেও না অধঃপতিত হতভাগ্য ইহুদী জাতির উদ্ধারের জন্য যাতে মেসিয়ার আবির্ভাব ঘটে তার জন্য আমারও কিছু করার আছে।

লা মোরিলনি

La Morillonne

মেয়েটাকে গাঁয়ের সবাই লা মোরিলনি বলে ডাকতো। তার কালো চুল আর শরতের ঘনকৃষ্ণ গাছের পাতার মত গায়ের রংএর জন্য এ নামে তাকে ডাকত না তারা। ডাকতো তার পুরু নীল ঠোঁটের জন্য।

এ অঞ্চলের সব লোকই শ্বেতকায়। তাদের চুলগুলো বাদামী রংএর। এখানকার লোকেরা তাই বলাবলি করত মোরিলনির বংশের কোন মেয়ে কোন কৃষ্ণকায় নবাগতর প্রেমে পড়ে। সেই রক্ত আজ আত্মপ্রকাশ করেছে মোরিলনির মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মোরিলনির গায়ের রংটাই শুধু কালো নয়, তার মনটাও কালো, কুটিল আর হিংস্র প্রকৃতির।

গায়ের রংটা কালো হোক, দেহের মধ্যে একটা শ্রী ত থাকতে পারে। কিন্তু মোরিলনি দেখতে একেবারে বিশ্রী, কুৎসিত। চেহারাটা রোগা-রোগা, মুখটা কালো, দেখতে খারাপ, চোখের মধ্যে কোন বাহার নেই। মাথার চুলগুলো মোটা আর অপরিচ্ছন্ন।

অথচ তার এই কদাকার চেহারা সত্ত্বেও গাঁয়ের বহু লোক পাগল তার জন্য। মোরিলনির বয়স যখন মাত্র বারো তখন থেকেই সে বহু ছেলের মাথা খেয়ে আসছে।

গাঁয়ের অল্পবয়সী যুবকদের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেলো, গাঁয়ের যারা বয়োঃপ্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ ভূতপূর্ব পৌরপিতা, ধনী চাষী, স্কুলমাষ্টার প্রভৃতিরাও মোরিলনিকে একবার করে কাছে পাবার জন্য আকুল। পুলিশের বড়বাবু কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না এবিষয়ে; কারণ অনেকে বলে তিনি নিজেও নাকি সমান দোষে দোষী। তবে মোরিলনির কাছে যারা যায়, তাকে যারা কাছে একবার করে পায় তারা কিন্তু কেউ কারো প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নয়। তারা যেন সবাই সমানভাবে ভাগ করে উপভোগ করতে চায় মোরিলনিকে। সে যেন গ্রামের সাধারণের সম্পত্তি।

কিন্তু মোরিলনি কারো কাছে কোনদিন ধরা দেয়নি সম্পূর্ণরূপে এবং জীবনে কোনদিন দেবেও না। গাঁয়ের এমন কোন পুরুষের ক্ষমতা নেই যে মোরিলনিকে নিয়ে তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে ভোগ করে। একথা কেউ ভাবতেই পারে না।

একমাত্র ব্রু নামে গাঁয়ের এক মেষপালকের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল। ব্রু ছিল এক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে মাঠের ধারে একটা স্থাবর কাঠের কুঁড়েতে বাস করত সে। সারাদিন ভেড়া চড়িয়ে বেড়ানোই তার কাজ ছিল। গাঁয়ের লোকেরা তাকে ভয় করত, কেউ কাছে যেতে চাইত না। কারণ ব্রুর তিনটে ভয়ঙ্কর কুকুর ছিল যারা ব্রুর নির্দেশে মানুষকে জীবন্ত ছিঁড়ে খেত। তাছাড়া ব্রু চোখ দিয়ে বাণ মেরে কোন গরু-ভেড়াকে পঙ্গু করে দিতে বা কারো তৈরী ফসল নষ্ট করে দিতে পারত।

গাঁয়ের সব লোক যখন মোরিলনির জন্যে পাগল একমাত্র ব্রুই তার প্রতি একেবারে উদাসীন। আশ্চর্যভাবে নির্বিকার । মোরিলনির অহঙ্কারে স্বাভাবিকভাবে আঘাত দিল ব্রুর এই ঔদাসিন্য।

একদিন একা পেয়ে মোরিলনি ব্রুর পিছু নিয়ে গাঁয়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ব্রু একবার পিছন ফিরে বলল, কি চাস?

মোরিলনি বলল, আমি চাই তোকে।

ব্রু সঙ্গে সঙ্গে মোরিলনিকে জড়িয়ে ধরে তার কুঁড়েতে নিয়ে গেল। পুরো এক সপ্তা ধরে মোরিলনি সেইখানেই রয়ে গেল। একটিবারের জন্যেও গাঁয়ের ভিতরে গেল না। নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল গাঁয়ের লোকেরা। অবশেষে বহুবল্লভা বহুভোগ্যা মোরিলনি একা ব্রুর মত একটা গরীব রাখালের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে গেল। কথাটা ভাবতে অপমান বোধ করল অনেকেই, আশ্চর্যও হলো তারা। যে ব্রুর চোখকে সবাই ভয় করে, জংলী বর্বর যে লোকটার কাছে যেতে সাহস পায় না—সেই লোকটাকে দিব্যি বশ করে ফেলল মেয়েটা। মোরিলনিও হয়ত যাদু জানে।

একদিন গাঁয়ের এক সাহসী যুবক একটা বন্দুক নিয়ে ব্রুর কুঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল। ব্রুর কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল। যুবক তখন চীৎকার করে ব্রুকে ডেকে বলল, তোমার কুকুরগুলোকে বাঁধ, তা না হলে আমি ওদের গুলি করে মেরে ফেলব।

ব্রুর পরিবর্তে মোরিলনি বেরিয়ে এসে উত্তর করল, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। কুকুরগুলোকে আমি শান্ত করব।

ব্রু গর্জন করে উঠল, লোকটা কি চায়?

মোরিলনি বলল, লোকটা চায় আমাকে। আমি যাব ওর সঙ্গে।

ব্রু ওদের পিছনে কুকুর তিনটে লেলিয়ে দিল। কিন্তু মোরিলনি তার হাতটা বাড়িয়ে দিতেই হিংস্র কুকুরগুলো শান্ত হয়ে তার সেই হাতটা আদর করে চাটতে লাগল। মোরিলনি ব্রুকে ডেকে বলল, দেখ, ব্রু, এখন থেকে কুকুরগুলো আমার। আমি ওদের প্রভু।

একপাত্র মদ দাও

Wanted a bock

আজকের এই শীতের সন্ধ্যায় কেন আমি এই মদের দোকানে এসে ঢুকে পড়লাম তার কারণটা ঠিক আমি নিজেই বলতে পারব না। আর সত্যি সত্যিই কোন কারণ নেই বলেই তা বলতে পারব না। এখানে আসব বলে আগে থেকে তৈরী হয়ে আসিনি, মদের প্রয়োজনেও আসিনি। আসলে পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি।

বাইরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। কুয়াশায় ঢেকে ছিল চারদিক। ভীষণ ঠাণ্ডা। পথে যেতে যেতে আমি একটা বড় কাফে দেখতে পেলাম। কিন্তু সেটাতে ভিড় দেখে গেলাম না। আসলে আমি চাইছিলাম একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গা যেখানে বসে এই বর্ষণঘন শীতের সন্ধ্যাটা কাটাতে পারি।

মদ খাবার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। তবু দোকানটায় কোন ভিড় ছিল না বাইরে থেকে দেখে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে একজন লোকের পাশে বসে পড়লাম। লোকটিকে একনজরে বৃদ্ধ মনে হচ্ছিল আমার। তার জামাকাপড় মলিন। একটা পাইপ মুখে ছিল। তার সামনে সাত আটটা মদের খালি বোতল পড়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। লোকটা কি এত মদ সব একা খেয়েছে?

যাই হোক, আমি তার পাশে বসে পড়ে এই সব ভাবছি এমন সময় লোকটা আমাকে সোজা প্রশ্ন করল পরিচিত ব্যক্তির মত, কেমন আছ? আমাকে হয়তো তুমি চিনতে পারছো না।

আমি বললাম, না চিনতে পারছি না।

সে তখন বলল, আমি ব্যারেৎস্।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম অপার বিস্ময়ে। বললাম, কাউন্ট জাঁ দে ব্যারেৎস্ আমার কলেজবন্ধু!

আমি তার হাতটা ধরে বললাম, এখন কি করছ?

সে শান্তভাবে বলল, তুমি দেখছ আমি কি করছি।

আমি বললাম, আমি বলছি তোমার পেশার কথা। অন্যদিককার কথা।

সে তার পাইপ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমার কাছে সবদিনই সমান।

ব্যারেৎস্ দোকানের বয়কে ডেকে বলল, দু' গ্লাস মদ দিয়ে যাও।

একজন বয় এসে একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে দুটো গ্লাসে ভরে দিয়ে গেল। ব্যারেৎস্ একচুমুকে তার গ্লাসটা শেষ করে ফেলল। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, নতুন খবর কি বল?

আমি বললাম, নতুন খবর আর কি, আমি এখন ব্যবসা করি।

ব্যারেৎস্ বলল, তুমি যদি নিজের জন্য কাজ করো তাহলে নিশ্চয়ই তাতে আনন্দ আছে, তার একটা অর্থ আছে। কিন্তু যদি পরের জন্য কাজ করো তাহলে তার কোন অর্থ থাকতে পারে না। শুধু সময় নষ্ট, আর তাতে পাবে শুধু অকৃতজ্ঞতা।

আমি তাকে তখন বললাম, আচ্ছা কিছু একটা না করে কি করে তুমি সময় কাটাও ?

আবার এক গ্লাস মদ শেষ করে ব্যারেৎস্ বলল, আমি এখান থেকে রাত প্রায় একটার সময় উঠি। তারপর বেলা বারোটায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ খাই। তারপর মদ। সন্ধেয় রাতের খাওয়া সেরে আবার মদ। এই দোকানের বাইরে আমার জীবনের কোন সত্য কোন অর্থ নেই। আমার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, কোন ভালবাসার বন্ধন নেই। কিছুই নেই।

আমি বললাম, তোমার এখন বয়স কত ?

ব্যারেৎস্ বলল, মাত্র তিরিশ, কিন্তু দেখে মনে হয় পঁয়তাল্লিশ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। মাথায় টাক পড়ে গেছে। একমুখ দাড়ি-গোঁফ।

আমি তাকে বললাম, নিশ্চয় তুমি জীবনে বড়রকমের একটা দুঃখ, আঘাত বা আশাভঙ্গের বেদনা পেয়েছ। তার জন্যই সমগ্রভাবে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছ তুমি। তুমি বিয়ে করেছ ?

ব্যারেৎস্ বলল, না। কখনো কোন মেয়ের প্রেমে পড়িনি। তবে আমার বাল্যকালে আমি একটা নিদারুণ আঘাত পাই মনে। তবে শোন বলি। কিন্তু তোমার পিপাসা পায়নি ? এক গ্লাস মদ খাও।

আমি বললাম, না। আমি বেশী মদ খাই না।

ব্যারেৎস্ বলতে শুরু করল, আমার বয়স তখন মাত্র তের। তার কিছুদিন পরেই আমি স্কুলে ভর্তি হই। আমাদের সাদা রঙের বিরাট বাড়িটা তুমি দেখেছ। আমরা যেখানে থাকতাম সেখানকার সকলেই আমার বাবাকে ভয় করত, খাতির করত। আমার বাবা ছিলেন একজন কাউন্ট।

তখন সেপ্টেম্বর মাস। একদিন বিকালের দিকে পার্কের একটা গাছে উঠে একা একা খেলা করছিলাম আমি। হঠাৎ দেখলাম সেই পার্কের নিকটবর্তী একটা রাস্তা দিয়ে আমার বাবা মা পাশাপাশি বেড়াচ্ছেন। আমি ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে তাদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলাম। দেখা দিলাম না। হঠাৎ আমার বাবা একসময় আমার মাকে বললেন, তোমাকে এ কাগজে সই করতেই হবে।

মা বললেন, এ সম্পত্তি জাঁর। তুমি তা হাতে পেলে মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করে উড়িয়ে দেবে।

তখন আমার বাবা হঠাৎ মাকে ধরে মারতে মারতে ফেলে দিলেন। মা পড়ে গেলেও মারতে লাগলেন। আমি প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। তারপর সামনে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে লাগলাম। আমার বাবা তখন মাকে ছেড়ে দিয়ে

আমার দিকে তেড়ে এল। আমার মনে হলো আমাকে পেলে বাবা আমাকে খুন করে ফেলবে। তাই আমি তখন বন-বাদাড় পার হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে চলে গেলাম। অজানা একটা জায়গায় গিয়ে একটা গাছের তলায় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম আমি। পরের দিন সকালে রোদ উঠলে আমার ঘুম ভাঙ্গল। তারপর একটা লোক আমাকে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে গেল। আমাকে বাবা মার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার মা বললেন, সেদিন তুমি হঠাৎ ঐভাবে চীৎকার করায় আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রাতে ঘুমোতে পারিনি।

আমি কোন কথা না বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বাবা কোন কথা বললেন না। গম্ভীরভাবে চুপ করে রইলেন। তার সাত আট দিন পরেই আমাকে স্কুল বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সেদিন জীবনের যে খারাপ দিকটা দেখেছিলাম আমি তা কোনদিন ভুলতে পারিনি আর পারবও না। সেদিন থেকে জীবনের কোন ভাল দিক দেখতে পাইনি আমি। এর কারণ কি। তখন আমার বালক মনে কি চিন্তা ঢুকেছিল তা বলতে পারব না। তবে সেই থেকে আমি কোন কিছুর আশা করিনি। কোন আশা আকাঙ্ক্ষা বা প্রেমানুভূতি জাগেনি আমার মনে। আমার মনে শুধু ভেসে উঠত একটা ছবি—আমার মা মাটিতে পড়ে রয়েছেন আর বাবা তাঁকে মারছেন। এ ছবিটা ঘুরে ঘুরে আজও আসে আমার মনে। সেই ঘটনার বছরকতক পরেই আমার মা মারা যান। বাবা এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু সেই থেকে তাঁকে আর চোখে দেখিনি আমি।

কথা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ব্যারেৎস্।

বিবাহবিচ্ছেদের অজুহাত

The sequel to a divorce

নামকরা কৃতী ব্যারিস্টার মান্‌প্রে গেরুলিয়ার বদেমন্তএর কাউন্টপত্নীর সব কথা শুনে চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন। যেকোন মামলায়, বিশেষ করে বিবাহবিচ্ছেদসংক্রান্ত মামলায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সাধারণতঃ তিনি যে সব মক্কেলের হয়ে লড়াই করেন তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই গেরুলিয়ারের মত দুর্দান্ত আইনবিদ ঘাবড়ে গেলেন। বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন কাউন্টপত্নীর কথা শুনে।

গেরুলিয়ার দেখলেন কাউন্টপত্নী সত্যিই সুন্দরী। তার সে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেকোন লোক যেকোন অসাধ্য সাধন করতে ছুটবে, সে পর্বতপ্রমাণ বাধাকে অপসারিত করতে যাবে অথবা তার আপন আত্মাটাকে শয়তানকে বিলিয়ে দেবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গেরুলিয়ার লক্ষ্য করলেন কাউন্টপত্নী বড় ভাবপ্রবণ। বাস্তববুদ্ধির একান্ত অভাব তার

মনে। পাখির মতই উড়ু উড়ু এক ভাব নিয়ে সব বাধাবিপত্তি কল্পনার পাখা দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলো। হীরের পিন দিয়ে আঁটা মুক্তা বসানো দামী কালো পোশাক পরে বসে সোনালী চুলগুলো ছড়িয়ে সে যখন আবেগের সঙ্গে কথা বলছিল তখন তার নাসারন্ধ্রটা কাঁপছিল।

গেরুলিয়ার একমনে তার সব কথা শুনে যেতে লাগলেন। তার আবেগ ও উত্তেজনায় কোন বাধা দিলেন না। তবু সে সব কথার পুরো অর্থ বুঝতে পারলেন না তিনি। শুধু একটা কথা বুঝতে পারলেন, কাউন্টপত্নী বিবাহবিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এসেছে তাঁর কাছে। আর সেই বিচ্ছেদসংক্রান্ত মামলা রুজু করায় সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো তার উকিলের কাছে ব্যক্ত করছে। তখন সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে। কাউন্ট তখন হয়ত ক্লাবে ফেন্সিং খেলা শিক্ষায় মন দিয়েছে।

কাউন্টপত্নীর সব কথা শেষ হলে গেরুলিয়ার বললেন, আপনি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগের কথা বললেন তা বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। বিবাহবিচ্ছেদ ব্যাপারটা ত আর ছেলেখেলা নয়।

কথাটা শুনে মুখটা ম্লান হয়ে গেল কাউন্টপত্নীর। কোন শিশুর হাত থেকে খেলনাটা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে দিলে সে যেমন হতাশ হয়ে পড়ে তেমনি হতাশ আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ল কাউন্টপত্নী।

যাই হোক, কাউন্টপত্নীকে আশ্বস্ত করার জন্য গেরুলিয়ার শেষকালে বললেন, হতাশ হবার কিছু নেই। আমার সঙ্গে আবার দেখা করবেন। সব মানুষেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা বা ত্রুটি বিচ্যুতি আছেই। দেখতে হবে কি করা যায়।

গেরুলিয়ারের কথামত চলে তাঁর নির্দেশমত কাজ করে কয়েক মাসের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় জিতে গেল বদেমন্তের কাউন্টপত্নী। কাউন্টের কাছে এটা ছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। তিনি ভাবতেই পারেননি তাঁর স্ত্রী বিনা দোষে এ মামলা দায়ের করবে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এক অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কাউন্ট।

প্রথমে খুব রেগে গেলেন কাউন্ট। তাঁর স্ত্রীর উকিলের কাছে গিয়ে তার কান কেটে নেবেন বলে ভয় দেখালেন। তারপর রাগটা পড়ে গেলে বললেন, ওর যা খুশি হয়েছে করেছে। ও সুখে থাকুক।

এরপর ভারত ও সিংহলে বেড়াতে যাবার জন্য এক দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পরিকল্পনা করলেন কাউন্ট। ভাবলেন মনটার পরিবর্তন হবে। সব দুঃখ ও আঘাতের ক্ষতটা পূরণ হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। এমন অবস্থায় শূন্য বাড়িতে থাকা কোনমতেই সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

এদিকে বিবাহবিচ্ছেদের পর সব বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন কাউন্টপত্নী। তার মনে হলো সে যেন তার সেই অনেকদিনের হারানো বাধাবন্ধনহীন সেই শৈশব-জীবন ফিরে পেয়েছে। এখন সে ইচ্ছামত যেকোন জায়গায় যেতে পারে, যেকোন কাজ করতে পারে। তবু অল্প দিনের মধ্যেই সেই অবাধ অফুরন্ত মুক্তিতে

ক্লান্তি অনুভব করতে লাগল কাউন্টপত্নী। অবাধ মুক্তির সীমাহীন শূন্যতায় বেশীদিন থাকতে পারে না, বাঁচতে পারে না, কোন মানুষ। ঘর চাই। সেই ঘর বাঁধার জন্য আবার বিয়ে করল সে।

ওদিকে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় মনে কোন শান্তি পেলেন না কাউন্ট। যার স্মৃতি মন থেকে মুছে দেবার জন্য ঘর ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন দূর সমুদ্রে তার স্মৃতি অহোরহঃ পীড়িত করে তুলেছে তাঁর মনটাকে। তাছাড়া তাঁর স্ত্রীর ছবিটাও তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বারবার সে ছবিটা দেখতেন তিনি। স্ত্রীর সব দোষের কথা ভুলে গেছেন তিনি। তাঁর শুধু মনে হয়েছে এই বিবাহবিচ্ছেদের সব দোষ তাঁর নিজের। তাঁর স্ত্রীর রূপগুণের মর্যাদা হয়তো ঠিকমত দিতে পারেননি তিনি।

দুর্মর স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন পীড়ন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পেরে এক একসময় মৃত্যুর কথা ভেবেছেন কাউন্ট। অকারণে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কোন জায়গায় গিয়েছেন। তবু মৃত্যু হয়নি। জলপথে বহু দেশে ঘুরে অবশেষে দেশে ফিরে এলেন কাউন্ট। অথচ কোন পরিবর্তন হলো না মনের। দুঃখের ভারী পাথরটা বুকের ভিতরে যেখানটায় ছিল সেখানেই রয়ে গেল।

দেশে ফিরে একদিন কাউন্টপত্নীকে দেখতে পেলেন কাউন্ট। কোন কথা বলার সুযোগ ছিল না। তবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন সেও সুখী নয়। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিয়ে করেও সুখী হতে পারেনি।

একথা শুনে উৎসাহিত হয়ে কাউন্টপত্নীকে আবেগের সঙ্গে একটা চিঠি লিখলেন কাউন্ট। লিখলেন তাকে ছেড়ে তিনি জলহীন মীনের মত মৃতপ্রায় হয়ে আছেন। তাকে ছাড়া তাঁর জীবন বৃথা, দুঃসহ। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করার এক প্রার্থনা জানালেন।

অল্প দিনের মধ্যেই চিঠির উত্তর পেলেন কাউন্ট। কাউন্টপত্নী দিন ধার্য করে জানিয়েছে ঐদিন সে এসে দেখা করবে কাউন্টের সঙ্গে। অধীর আগ্রহে নির্দিষ্ট সময়ে প্রতীক্ষায় বসে রইলেন কাউন্ট। যথাসময়ে এসে তাঁর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে তাঁর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাউন্টপত্নী। কাউন্টের মনে হলো দীর্ঘ নির্বাসনের পর তিনি তাঁর বহুআকাঙ্খিত ঘরে আবার ফিরে এসেছেন। সেই পরিচিত শান্তির নীড়ে।

কৃত্রিম বিচ্ছেদের মাধ্যমে কোন স্বামীর হৃদয় জয় করার এই কৌশলের কথা শুনে গেরুলিয়ার বললেন, এমন আশ্চর্য ঘটনার কথা তিনি কখনো শোনেননি।

খৃস্টোৎসব

Epiphany

ক্যাপ্টেন কাউন্ট দ্য গ্যারেন বলল, প্রুশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জানুয়ারী মাসের ষষ্ঠ দিনে খৃস্টোৎসব উপলক্ষে আমরা যে নৈশ ভোজন করেছিলাম তার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমি এক অশ্বারোহী দলের কোয়ার্টার মাস্টার ছিলাম। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় একটা ছোটখাটো যুদ্ধে আমরা জনকতক শত্রুসৈন্যকে খতম করি। আমাদের পক্ষের তিনজনকে হারাই। তাদের মধ্যে একজন হলো জোশেপ রদেভিন। তাকে হয়ত তোমরা চেন।

সেদিন আমার উর্ধ্বতন অফিসার হুকুম দিলেন মাত্র দশজন সৈন্য নিয়ে আমাকে পোর্তেরিণ গাঁটাকে দখল করতে হবে। এই গাঁটায় গত তিন সপ্তার মধ্যে পাঁচ পাঁচবার যুদ্ধ হয়ে গেছে। গাঁটাকে দখল করে বাকি রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে।

তখন শেষ রাত। মাত্র দশজন সৈন্য নিয়ে ভোর চারটের সময় পোর্তেরিণ গাঁয়ের পথে রওনা হলাম আমি। তখনও ঘন অন্ধকার চারদিকে। গাঁয়ের প্রথম বাড়িটার সামনে এসে পীয়ের দ্য মার্কাসকে আমি হুকুম করলাম সে যেন প্রথমে একা গিয়ে গাঁয়ের অবস্থা দেখে এসে তার বিবরণ দেয়। সারা গাঁটার মধ্যে তখন মাত্র পনের থেকে বিশটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন নেই বললেই চলে।

মার্কাস ছিল খেঁকশেয়ালের মত ধূর্ত আর সাপের মত সতর্ক। সে যেন শত্রুসৈন্যদের গন্ধ পেত দূর থেকে। তাই অন্য সৈনিকদের থেকে তাকেই বেছে নিলাম আমি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল মার্কাস। বলল, আজ তিন দিন হলো এ গাঁ হতে প্রুশীয়রা সব চলে গেছে। আর আসেনি। চার্চের একজন সিস্টারের সঙ্গে দেখা হলো। সে তিন-চারজন আহত সৈনিকের সেবা করছে। এবার আমার সঙ্গে আপনারা চলুন।

সে বলল, থাকার মত একটা সুন্দর বাড়ি আছে। সেখানে গিয়ে আমরা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেব।

তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখলাম বাড়িটা সত্যিই ভাল। সামনে একফালি বাগান। পিছনে আস্তাবল। সেখানে আমাদের ঘোড়াগুলো রাখা হলো। আমি পাঁচজন সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। মার্কাসের কাছে রয়ে গেল চারজন। তাদের সাহায্যে আমাদের জন্য খাবার তৈরী করতে লাগল সে।

আমি আমার সঙ্গে পাঁচজন সৈনিককে গাঁয়ের চারদিক প্রহরায় নিযুক্ত করে ফিরে এসে দেখলাম মার্কাস বসার ঘরে একটা ঈজি চেয়ারে বসে আরাম করে সিগারেট খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, আজ রান্নার জন্য দুটো মুরগী, একটা হাঁস আর তিনটে কালো পায়রা পেয়েছি। রান্না হচ্ছে। কয়েক বোতল মদও পেয়েছি। এক জায়গায়

লুকোন ছিল। এবার দরকার মেয়েমানুষের। আজ জানুয়ারীর ছয় তারিখ। খৃস্টের উৎসব। কিন্তু কোন একজন বিবাহিতা নারী ছাড়া এ উৎসব উদ্‌যাপিত হবে কি করে? তুমি আমাদের দলের অধিনায়ক। তোমাকেই যোগাড় করতে হবে।

আমি বললাম, কোথায় পাব, এ গাঁয়ে একটিও লোক নেই।

মার্কাস বলল, তুমি গাঁয়ের চার্চে গিয়ে আব্বেকে বল সে আমাদের সঙ্গে এখানে নৈশভোজন করবে। তাকে বল দু'-একজন মেয়ে সে ঠিক যোগাড় করে দেবে।

যেতে আমার মন চাইছিল না। তবু মার্কাস বলল, দেখবে যুদ্ধের শেষে আমরা গল্প করব এই ঘটনার। আমি এক ছন্দোবদ্ধ কবিতায় এ অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখব।

মার্কাসের পীড়াপীড়িতে আমি চার্চে গিয়ে যাজককে সব কথা বললাম। সব কথা শুনে সে ভাবতে লাগল। তারপর বলল, কোন মেয়ে এ গাঁয়ে নেই। বিবাহিত অবিবাহিত সব মেয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

আমি তবু জেদ ধরলাম। যেকোনভাবে দু'-একজনকে অন্ততঃ খুঁজে বার করতেই হবে। তিনি স্থানীয় লোক। অনেক জানাশুনা। হাসপাতালের নার্স হলেও হবে। যাজক অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। অবশেষে একসময় হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা তুমি যাও, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিন-চারজন মেয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি বিজয়গর্বে ফিরে মার্কাসকে সব কথা বললাম। আমাদের নয়-দশজনের মত খাবার টেবিলে সাজানো হলো। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। অবশেষে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে একজন সৈনিক দরজা খুলে দিল। যাজক আব্বে এসে গেছে। সঙ্গে চারজন মহিলা।

প্রথম এল নার্স সিস্টার অফ মার্সি। রোগা-রোগা চেহারার ভীরু প্রকৃতির একটি মেয়ে। বয়স হয়েছে। গায়ের মাংসগুলো প্রায় জড়ো-জড়ো হয়ে পড়েছে। সে আমাদের প্রত্যেককে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে অপর তিনজন মহিলার পরিচয় দান করল। অপর তিনজন মহিলার মধ্যে দু'জন খুবই বৃদ্ধা। ঠিকমত চলতে পারছিল না।

সিস্টার প্রথমে আমাকে বলল, আপনি যে আমাদের এই উৎসবে স্মরণ করেছেন এজন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। প্রথমে বলি মাদার পমেলের কথা। এঁর বয়স ষাট। এঁর স্বামী ও পুত্র দু'জনেই আফ্রিকার এক যুদ্ধে নিহত হয়। দ্বিতীয় মহিলাটি হলেন জাঁ জিয়ান, এঁর বয়স সাতষট্টি। ইনি প্রায় অন্ধ। এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এঁর মুখ আর ডান পাটা পুড়ে যায়। আমাদের দলের তৃতীয় মহিলাটি হলেন লা পুতয়, এঁর বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ।

খাবার টেবিলে সবাই বসে খেতে খেতে ঠাট্টা রসিকতা করতে লাগল। আমাদের দলের অন্যেরা বেশ উপভোগ করতে লাগল। বৃদ্ধারা বেশ মজা পাচ্ছিল। রসিকতার উত্তর দান করছিল। একমাত্র মার্কাসই কোন কথা বলছিল না। ঘরের ভেতরটা খুব গরম হচ্ছিল। তাই আমি মার্কাসকে বললাম, একটা জানালা খুলে দাও।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। বেশ ঠাণ্ডা। হঠাৎ একটা গুলির শব্দে জেগে উঠলাম আমি। আমি চীৎকার করে বললাম, মার্কাস, তুমি এখনি দু'জন সৈনিক নিয়ে ঘোড়ায় করে বেরিয়ে যাও। দেখ ব্যাপারটা কি, নিকটে কোথাও শত্রু আছে কিনা।

সঙ্গে সঙ্গে তিনজন ঘোড়া ছুটিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল। আমি ও দু'জন সৈনিক বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখলাম। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্কাস ফিরে এল। এসে বলল, একজন চাষীলোক প্রহরারত সৈনিকদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ও তাদের কথার কোন জবাব না দেওয়ায় তারা গুলি করেছে তাকে। লোকটাকে এখনি ওরা নিয়ে আসছে।

আমাদের উৎসব স্থগিত রইল। বাধা পড়ল আমাদের আহার ও আনন্দের কাজে। গুলিবিদ্ধ চাষী লোকটাকে ধরাধরি করে ঘরের ভিতরে নিয়ে এলে দেখা গেল তার ক্ষতস্থান থেকে তখনো রক্ত ঝরছে। যাজক আবেব দেখে বলল, এ ত বোবা কালা। ওকে মারতে গেলে কেন? আহা বেচারা! সিস্টার বলল, আর কোন উপায় নেই।

আমি বললাম, বোবা কালা বলেই লোকটা ওদের কথার উত্তর দিতে পারেনি।

যাই হোক, আমাদের বড় খারাপ লাগছিল। বৃদ্ধারা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘরের কোণে বসেছিল। সিস্টার তাদের নিয়ে আমাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেল। আমি সেই উৎসবের কথা কখনো ভুলব না।

বিদূষক

The clown

দুর্গের সম্মুখস্থ প্রান্তরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ফেরিওয়ালাদের ছোট্ট কুঁড়েটা। নামেমাত্রই শুধু ওরা ফেরিওয়ালা। ওদের মধ্যে কয়েকজন করে মদ কেনাবেচা। আর বাকিরা সুযোগ পেলেই চুরি করে বেড়ায়। কয়েকজন জেলও খেটেছে বেশ কয়েকবার।

ওরা মানে আঠারোজন পুরুষ আর একজন মাত্র নারী। একটামাত্র ঘরে ওরা থাকে। একটা উনোনে ওদের সকলের জন্য রান্না হয়। লোকগুলোর বয়স হয়েছে। কিন্তু ওরা বেশ শক্ত সমর্থ আছে এখনো। মেয়েটার বয়স চল্লিশ। ওদের সকলের থেকে তার বয়স অনেক কম।

ওরা সবাই খাতির করে ওই মোটা মেয়েটাকে। সকলে মিলেই ওর সঙ্গ লাভ করে। কিন্তু কেউ কাউকে ঈর্ষা করে না। ওদের মধ্যে ব্রিয়াগনি একটু সঙ্গতিসম্পন্ন পয়সার দিক থেকে। তাই তার খাতির ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। লোকটার পা দুটো অশক্ত বলে খুঁড়িয়ে চলে। তবু হাতে বেশ জোর আছে।

ব্রিয়াগনি বলে, আমাদের এই আঠারো জনের সাধারণতন্ত্র ভালভাবেই চলছে। আমরা সবাই সুখী। তবু যদি কোনদিন রাজা করার প্রশ্ন আসে আমাদের মধ্যে তাহলে ওরা সবাই আমাকেই করবে দলের রাজা।

ব্রিয়াগনির বিচারবুদ্ধি আছে। তার কাছে খাঁটি বিচার। সে বলে, এখানে কার পয়সা বেশী বা কম সেটা বড় কথা নয়। এই মেয়েটি আমাদের সকলের ভোগ্যা। সকলে সমানভাবে এর সঙ্গ লাভ করবে। মেয়েটা যদি এক ডিশ খাবার হ্য় তাহলে সকলের ভাগ্যেই জুটবে এক চামচ করে। মাত্র এক চামচ করেই সকলে পাবে। তার বেশী না। কোনক্রমেই না।

মেয়েটার নাম ত্রোলোপ। ত্রোলোপও ভালভাবে মানিয়ে নিয়েছিল সকলের সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ একদিন কোথা থেকে একটা লোককে নিয়ে এল ত্রোলোপ। তারপর ওদের বলল, দেখ, এই লোকটা আমার পেয়ারের লোক। এ কিছু করবে না। তোরা একে খাওয়াবি পরাবি সকলে মিলে। এটা তোদের সকলের দায়িত্ব। এ শুধু বসে বসে খাবে আর থাকবে। এর বয়স তোদের সকলের থেকে কম। আমি তোদের মত বুড়োদের নিয়ে এতদিন ঘর করেছি। এবার আমি ওকে নিয়ে থাকবো। এ হবে তোদের রাজা। তোরা যদি একে না চাস তাহলে আমি একে সঙ্গে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

তখন ওরা সবাই মিলে যুক্তি করে রাজী হলো ত্রোলোপের কথায়। তার পেয়ারের লোককে মেনে নিল সবাই। লোকটা খুব হাসাতে পারত বলে ওরা সবাই বলত ভাঁড়। লোকটার বয়স বড়জোড় চল্লিশ। সবেমাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। গায়ে দারুণ ক্ষমতা। একটা মেয়েকে জোর করে ধরতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে যায়।

প্রথম প্রথম ভাঁড় চুপচাপ থাকত। কিন্তু ওরা যখন মাত্রাতিরিক্তভাবে ঠাট্টা করে ওকে জ্বালাতন করতে লাগল, ওর খাবারের মধ্যে ধূলো দিতে লাগল তখন ভাঁড়ও ওদের মারধোর করতে লাগল। ও একাই ওদের খুব মারতে লাগল। ওরা বুড়ো বলে কেউ ওর সঙ্গে পেরে উঠত না।

ওদের আঠারো জনের মধ্যে কখনো ঈর্ষা জাগেনি ত্রোলোপকে নিয়ে। কিন্তু এবার প্রথম ঈর্ষা জাগল ওদের মনে। কারণ ত্রোলোপ ওদের সামনে রাত্রে ভাঁড়কে নিয়ে শুত। ভাঁড় আসার পর থেকে ত্রোলোপ ওদের কাউকে পাত্তা দিত না। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রিয়াগনি পর্যন্ত হার মেনে গেল। কোন ফন্দী এঁটে কিছু করতে পারল না।

অবশেষে একদিন ওদের ঈর্ষা চরমে উঠল। সেদিন গভীর রাতে ত্রোলোপ ভাঁড়ের গলা জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। ঘরের একপাশে তখন ওরা সবাই একযোগে পরামর্শ করে ওদের দু'জনকে বেঁধে প্রহার করতে লাগল।

জেগে উঠে ভাঁড় অবাক হয়ে গেল। বুড়ো ব্রিয়াগনি বলল, এই হচ্ছে আমাদের রাজার শাস্তি। আমরাই একদিন আমাদের রাজাকে গিলোটিনে চড়িয়ে তার মাথা

কেটেছিলাম। কিন্তু আমাদের রাজাকে প্রাণে না মেরে শাস্তি দিলাম। কারণ আমরা ন্যায়পরায়ণ প্রজা।

প্রেমের জাগরণ

Love's awakening

বরকনে দেখে সবাই খুশি হলো। এমন সাজন্ত বড় একটা দেখা যায় না। মঁসিয়ে সাইমন লেব্রুমেন্ত যখন প্যারিস থেকে এসে ম্যাদময়জেল জিয়ানিকে বিয়ে করল তখন হৈ হৈ পড়ে গেল সারা বোতিগান অঞ্চলে। সকলেই প্রশংসা করতে লাগল পরস্পরের রুচির।

বিয়ের পর ঠিক হলো সাইমন লেব্রুমেন্ত দিনকতক শ্বশুরবাড়িতে থাকবে। তারপর তার স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিসে চলে যাবে। সে বলেছে সে নাকি প্যারিসে বড় কাজকারবার করে।

দুটিতে যেন একটি। এমন গভীর ভালবাসা সচরাচর দেখাই যায় না। জিয়ানি বাড়িতে একমুহূর্তও স্বামীকে চোখের আড়াল করে থাকতে পারে না। বলে, সব সময় বাড়িতে থাক।

এক-একবার স্বামীর কোলে বসে স্বামীকে বলে, চোখ বন্ধ করে হাঁ করো।

লেব্রুমেন্ত হাঁ করলে তার মুখে মুখ দিয়ে এক দীর্ঘ চুম্বনে ঢলে পড়ে জিয়ানি। এইভাবে সকাল সন্ধে কোনদিকে কেটে যায় বুঝতেই পারে না দু'জনে।

এক সপ্তা এইভাবে কেটে গেলে লেব্রুমেন্ত একদিন তার স্ত্রীকে বলল, এবার আমি প্যারিসে যেতে চাই। তোমার কোন আপত্তি না থাকলে আগামী সপ্তার মঙ্গলবারেই প্যারিসে যাব।

জিয়ানিও খুশি হয়ে বলল, ঠিক আছে। তাহলে খুব ভাল হয়।

লেব্রুমেন্ত বলল, তাহলে তোমার বিয়ের সব যৌতুক তোমার বাবাকে ঠিক করে রাখতে বলবে। আমি যাবার সময় নিয়ে যাব।

জিয়ানি বলল, আমি কাল সকালেই বাবাকে বলব।

নির্দিষ্ট দিনে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলো লেব্রুমেন্ত। স্টক ও নগদে মিলিয়ে তিন লক্ষ ফ্রাঁ যৌতুক পেয়েছে সে। নগদ টাকা সব সে নিয়ে যাবে। তার শ্বশুর পগিলন বলল, এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাবে?

লেব্রুমেন্ত বলল, কাজকারবারের ব্যাপারে আমাদের এসব অভ্যাস আছে। আপনি ভাববেন না।

প্যারিসে ট্রেন থেকে নেমে লেব্রুমেন্ত বলল, চল প্রথমে বাজার থেকে প্রাতরাশ সেরে আসি। তারপর কোন একটা হোটেলে গিয়ে উঠব।

বাজারের কোন একটি রেস্তোরাঁয় যাবার জন্য জিয়ানি বলল, একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করো। দু'জনে যাওয়া যাবে।

লেব্রুমেন্ত তার পরিবর্তে তিনঘোড়াটানা একটা বড় যাত্রীবাহী বাস থামিয়ে উঠল। জিয়ানিকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে উপরে উঠল। বলল, আমি সিগারেট খাব বলে উপরে উঠছি।

প্যারিসের পথ ঘাট কিছুই চেনে না জিয়ানি। সে এ শহরে প্রথম আসছে। কখন বুলভার্ড অঞ্চল পার হয়ে গেছে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। একে একে সব লোক নেমে গেল। কনডাকটার চীৎকার করে জিয়ানিকে বলল, নেমে যান।

জিয়ানি বলল, উপরে আমার স্বামী আছে।

কনডাকটার বলল, গাড়ির উপরে কেউ নেই।

জিয়ানি গাড়ি থেকে নেমে দেখল সত্যিই কেউ নেই। দু'-একজন লোক জড়ো হলো। কনডাকটার সবাইকে বলতে লাগল, ওঁর স্বামী ওঁকে ছেড়ে চলে গেছেন।

কিন্তু এ কি করে সম্ভব ? জিয়ানি তা ভাবতে পারে না। তার চোখে জল আসছিল। মাথাটা ঘুরছিল, এই বিরাট শহরে কোথায় কার কাছে সে গিয়ে উঠবে। তার কাছে মাত্র দু'ফ্রাঁ আছে। সব টাকা আছে তার স্বামীর কাছে।

হঠাৎ তার মনে পড়লো হেনরির কথা। তাদের গ্রাম ও জ্ঞাতি সম্পর্কের ভাই হেনরি এই শহরেই নৌবিভাগের অফিসে কাজ করে। একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে তাতে উঠে হেনরির বাসায় চলে গেল জিয়ানি। হেনরি তখন সবেমাত্র অফিসে বার হচ্ছিল। জিয়ানির কাছে সব কথা শুনে হেনরি বলল, সব যৌতুকের টাকা নিয়ে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে গেছে তোমার স্বামী।

হেনরি তার বাসার মধ্যে জিয়ানিকে নিয়ে গিয়ে তার ঝি সোফিকে হোটেল থেকে প্রাতরাশ আনার জন্য পাঠিয়ে দিল। বলল, আজ আমি আর অফিসে যাব না।

বেড নম্বর ২৯

Bed no. 29

ক্যাপ্টেন এপিভেঁত যখন রাস্তা দিয়ে চলে যেত তখন চারদিক হতে মেয়েরা তার পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। তার মত সুদর্শন সামরিক অফিসার বড় একটা দেখাই যায় না। তার লম্বা সবল সুগঠিত দেহ আর সুন্দর টানা মোচের জন্য অহঙ্কার ছিল তার মনে। সামরিক পোশাক পরে থাকলে তাকে সত্যিই খুব ভাল দেখাত।

এপিভেঁতের একটা দোষ ছিল। সে একমাত্র সামরিক বিভাগের পদস্থ অফিসার ছাড়া আর কাউকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করত না। আবার এই অফিসারদের মধ্যে যারা ছিল বেঁটে আর মোটা তাদেরও সে দেখতে পারত না দু'চোখে।

শহরের মেয়ে মহলে যেমন বেশ নাম ছিল ক্যাপ্টেন এপিভেঁতের তেমনি পুরুষ মহলে তার ছিল চরম দুর্নাম। বাজারের-মেয়ে থেকে শুরু করে শহরের গৃহবধূরা পর্যন্ত এপিভেঁতকে কাছে পেতে চাইত, লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। তেমনি শহরের ধনী ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর পুরুষরা ঈর্ষার বশে তাকে ঘৃণার চোখে দেখত, বলত একটা জঘন্য প্রকৃতির লম্পট।

এপিভেঁতের মাথায় একটু টাক ছিল। কিন্তু মোচটার জন্য তাকে মানিয়ে যেত, টাকের কথা মনে হত না। অন্ততঃ এপিভেঁত তাই মনে করত। লাম্পট্য-দোষ ও উচ্ছৃংখলতা সত্যিই ছিল তার চরিত্রে। কিন্তু সেটা এমন কিছু দোষের বলে মনে করত না সে। কোন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বসে নৈশভোজন করতে গিয়ে তাকে ভাল লাগলে তাকে নিয়ে রাত্রিবাস করত এপিভেঁত। তাতে যদি কেউ তাকে লম্পট বলে ত বলুক। তবু আশ্চর্যের কথা এই যে, তার এই লাম্পট্যের কথা জেনেও মেয়েরা তাকে খাতির করে চলত।

এপিভেঁত যখন রাস্তা দিয়ে তার সামরিক পোশাক পরে গর্বের সঙ্গে হেঁটে যেত তখন দু'পাশের বাড়ির বিবাহিত অবিবাহিত ভদ্র গৃহস্থ মেয়েরাও এপিভেঁতের কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য তার মুখপানে তাকাত। এপিভেঁতকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহের শিরায় শিরায় একটা গোপন জারজ লালসার কাঁপন জাগত। এপিভেঁত তাদের পানে না তাকালেও তারা তাদের মুগ্ধ নীরব দৃষ্টির মাধ্যমে অনেক কথাই ব্যক্ত করত।

কিন্তু যেসব মেয়েরা এপিভেঁতকে পছন্দ করত, এবং একটুখানি কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্য লালায়িত হত তাদের স্বামীরা কিন্তু এপিভেঁতকে দেখতে পেলেই গাল দিত। একদিন এক ধনী ব্যবসায়ী তার দোকানের সামনে দিয়ে এপিভেঁতকে যেতে দেখে বলল, লোকটা অফিসার বলে অহংকার করে। কিন্তু আসলে একটা অপদার্থ। আমি ওর থেকে একটা কশাইকে বেশী শ্রদ্ধা করি। কারণ সে পেটের দায়ে কতকগুলো পশু হত্যা করে আর ও গর্বের সঙ্গে মানুষ হত্যা করে যুদ্ধ করতে গিয়ে।

ঐ ব্যবসায়ী তার স্ত্রীকে একদিন বাড়িতে বলল, ঐ অপদার্থ নিষ্ঠুর নররক্তপিপাসু লোকটার পানে যারা তাকায় তারা হচ্ছে মহামূর্খ।

তখন ১৮৬৮ সাল। এপিভেঁত তার অধীনস্থ সেনাদল নিয়ে রুয়েন শহরের সৈন্যনিবাসে থাকত। সারা রুয়েন শহরের প্রায় সকলেই তাকে চিনত। রোজ বিকাল পাঁচটা বাজতেই বুদো মলের সন্নিকটস্থ কমেডি নামে একটি বড় রেঁস্তোরায় সন্ধ্যাকালীন চা ও মদ্যপান করতে আসত এপিভেঁত। মাঝে মাঝে শহরের বারবণিতাদের মহলেও যেত মন হলে। সে দেখতে ভাল ছিল। তার উপর বড়দরের সামরিক অফিসার। তাই তাকে কে তার ঘরে নিয়ে যাবে, কে তার মন জয় করবে এই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত তাদের মধ্যে।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ধের সময় কমেডিতে সুন্দরী ইর্মা এসে হাজির। নিটোল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের দিক থেকে ইর্মা ছিল শহরের মধ্যে সেরা। তার বিয়ে হয়নি আবার সে সাধারণ বারবণিতাও ছিল না। সে মঁসিয়ে তেমপ্লিয়ারের রক্ষিতা হিসাবে থাকত। আবার অনেকে বলত সে ছিল স্বাধীন রূপোপজীবিনী; তবে সে নিজের থেকে কাউকে মনোনীত না করলে কেউ যেতে পারত না তার কাছে।

সেই ইর্মা একদিন নিজে থেকে এসে আলাপ করল এপিভেঁতের সঙ্গে। ইর্মাকে দেখে এপিভেঁতের উপরওয়ালা একজন কর্ণেল তাকে নিচু গলায় বলল, মেয়েটাকে হাত করো। এ সুযোগ ছেড়ো না।

সেই রাতেই দু'জনে দু'জনের মধ্যে পেয়ে গেল তাদের মনের মানুষ। দু'জনে যেন দু'জনকে অনেকদিন ধরে খুঁজছিল। এরপর থেকে দেখা গেল দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে আর কোথাও যায় না। ইর্মা এমন কি তেমপ্লিয়ারের কাছে যাওয়াও ছেড়ে দিল। এপিভেঁতও আর কোন মেয়ের কাছে যেত না। সারা শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তাদের প্রেমকাহিনী। প্রায় একটি বছর ধরে সারা শহর জুড়ে উড়তে লাগল তাদের বিজয়ী প্রেমের পতাকা। ইর্মার মত শহরের সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে পেয়ে গর্ব করে বেড়াত এপিভেঁত। কথায় কথায় বলত, ইর্মা চায় আমি এটা করি। বলত, ইর্মা আমাকে একমুহূর্তও ছেড়ে থাকতে চায় না। আবার ইর্মাও এপিভেঁতের মত সুদর্শন অফিসারকে পেয়ে খুশিতে টগবগ করে বেড়াত। বড়াই করে বেড়াত।

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো। যুদ্ধ বাধল ফ্রান্স আর প্রুশীয়র সঙ্গে। এপিভেঁতের ডাক পড়ল। তাকে তার সেনাদল নিয়ে রণাঙ্গনে যেতে হবে। তাকে বিদায় নিতে হবে আজ রাতেই।

ইর্মার সে কি কান্না! ইর্মার ঘরে এপিভেঁত বিদায় নিতে যেতেই পাগলের মত চুল ছিঁড়তে লাগল ইর্মা। কখনো কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল। তাকে অনেক করে বোঝাতে লাগল এপিভেঁত। বলল, কেঁদো না ইর্মা। আমাকে সহজভাবে বিদায় দাও। আমি যুদ্ধ শেষ করেই ফিরে আসব তাড়াতাড়ি। ফিরে আসব তোমার কাছে বিজয়ী বীরের মত।

তবু শান্ত হয় না ইর্মা। ইর্মার ভালবাসায় অবাক হয়ে গেল এপিভেঁতের মত কড়া অফিসার। কোন বিবাহিত স্ত্রীও তার স্বামীকে বিদায় দেবার সময় এমন দুঃখে ভেঙে পড়ে না। এপিভেঁতের মনে হলো, ইর্মা শুধু টাকার জন্যেই তাকে চায় না। তার হৃদয় বলে একটা জিনিস আছে। আর সে হৃদয়ে সে সম্রাটের মত এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। যুদ্ধ শেষ করে আবার রুয়েন শহরের সেনানিবাসেই ফিরে এল এপিভেঁত। তারা জয়লাভ করেছে। তার সেনাদল কৃতিত্ব দেখিয়েছে যুদ্ধে। সত্যিই বিজয়ী বীরের মত যুদ্ধশেষে ফিরে এসেছে এপিভেঁত। কিন্তু ফিরে এসে ইর্মাকে দেখতে পেল না। অনেক খোঁজ করেও কোথাও সন্ধান পেল না তার।

কেউ বলল, ইর্মা কোন প্রুশীয় অফিসারকে বিয়ে করে কোথাও চলে গেছে। কিন্তু সঠিক কথা তার সম্বন্ধে কেউ বলতে পারেনি। এপিভেঁতও তার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল।

এমন সময় একদিন সকালে তার মেসে একটা কাগজের চিরকুট পেল এপিভেঁত। তাতে লেখা আছে, প্রিয়তম, আমি হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘদিন আছি। তুমি যদি আমাকে একদিন দেখতে আস তাহলে আমি বড় আনন্দ পাব। ইতি ইর্মা।

চিঠিতে তার বেড নম্বর দেওয়া ছিল। তার বেড নম্বর উনত্রিশ। কোনরকমে প্রাতরাশ সেরেই বেরিয়ে পড়ল এপিভেঁত। ইর্মা তাহলে তাকে এখনো ভোলেনি।

হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ করে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেমনি ইর্মা যে ওয়ার্ডে আছে সে ওয়ার্ডে ঢুকতে যাবে, ঢোকার মুখে দেখল বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে 'সিফিলিস'। দেখে ভয়ে আঁতকে উঠল এপিভেঁত। ওষুধ আর পঁচা ঘায়ের দুর্গন্ধ চারদিকে। অবশেষে দেখা পাওয়া গেল ইর্মার। দেখে চেনা যাচ্ছিল না। সারা দেহটা কাপড়ে জড়ানো। শুধু কালসিটেপড়া শীর্ণ মুখটা দেখা যাচ্ছিল।

সেই উনত্রিশ নম্বর বেডের সামনে শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এপিভেঁত। মুখে কথা সরছিল না তার। এদিকে তাকে দেখে মড়ার মত পড়ে থাকা ইর্মা যেন হঠাৎ প্রাণ পেল। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমি আর ভাল হব না। ডাক্তার বলছে, খুব সিরিয়াস হয়েছে আমার রোগটা। তবু তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। তোমার হাতে সম্মানের ক্রশ। তুমি জয়ী হয়েছ। আজ আমার কী আনন্দ!

এপিভেঁত এবার কথা বলল। বলল, এ রোগ কি করে ধরল? তুমি সাবধান হওনি আগে থেকে?

ইর্মা বলল, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকজন প্রুশীয় অফিসার আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আমি ছাড়া পাওয়ার পর দূরে পালিয়ে গেলে হয়ত বাঁচতে পারতাম। কিন্তু আমি সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য বেছে বেছে প্রুশীয় অফিসারদের মধ্যে আমার রোগটা ছড়িয়ে দিতে লাগলাম। আজ আমার সেটাই বড় সান্ত্বনা। আমি মরছি। কিন্তু অনেক শত্রুকেও আমি ঘায়েল করেছি এইভাবে।

এপিভেঁত যেতে চাইলে ইর্মা বলল, আমাকে একটা চুম্বন দেবে?

এপিভেঁত তার মাথার কাছে গিয়ে তার কপালে একটা চুম্বন করল আর ইর্মা আবেগের সঙ্গে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল তার রোগা-রোগা হাত দিয়ে। তারপর বলল, আবার কবে আসবে? বৃহস্পতিবার এসো।

অফিসারদের মেসে ফিরে এসে এপিভেঁত বলল, ইর্মার হার্টের অসুখ। আসল কথাটা গোপন করে গেল। কিন্তু অন্যান্য অফিসাররা বলাবলি করতে লাগল। রুয়েনে সবাই এখন ঘৃণা করে ইর্মাকে। কারণ সে শত্রুপক্ষের জনৈক প্রুশীয় অফিসারকে বিয়ে করে। তার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতে অনেকেই দেখেছে।

বৃহস্পতিবার যথাসময়ে হাসপাতালে গেল এপিভেঁত। কিন্তু তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলল, ছিঃ ছিঃ, শত্রুপক্ষের কোন প্রুশীয়কে তুমি বিয়ে করেছিলে?

ইর্মা বলল, আমি ত আগেই বলেছি। ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাই আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। আমি কাউকে বিয়ে করিনি, আমি ত আপোষ করিনি। তুমি যুদ্ধে শত্রুসৈন্য মেরে বিজয়ী বীরের সম্মান পেয়েছ। কিন্তু সে সম্মান আমি না পেলেও আমিও সকলের অলক্ষে অগোচরে তখন কম শত্রু মারিনি। তোমার থেকে দেশপ্রেম আমার কম নয়।

এপিভেঁত বলল প্রুশীয়দের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা সারা শহরের মধ্যে লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমি আসতে পারব না।

ইর্মা তখন পাগলের মত বলতে লাগল—তুমি যত শত্রুসৈন্য মেরেছ তার থেকে বেশী শত্রু আমি মেরেছি। তোমার থেকে আমার দেশপ্রেম কম নয়।

সেখানে আর না দাঁড়িয়ে একরকম ছুটে পালিয়ে গেল এপিভেঁত। পরদিন শুনল ইর্মা মারা গেছে।

স্ত্রীর স্বীকারোক্তি

Wife's confession

আমাদের বাড়িটা ছিল নির্জন গ্রামাঞ্চলে। ধারে কাছে লোকালয় বলতে কিছু ছিল না। পুরনো আমলের বিরাট প্রাসাদকে ঘিরে শ্যাওলাধরা মোটা মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছ। সামনের দিকে ছিল একটা পার্ক। পার্কের ওধারে ছিল পানা আর দলদামে ভর্তি দুটো বড় বড় পুকুর। একটা লম্বা টানা খাল পুকুর দুটোকে যোগ করে দাঁড়িয়েছিল তাদের মাঝখানে। সেই খালটার উপরে বুনো হাঁস শিকারের জন্য একটা কুঁড়ে তৈরী করেছিল আমার স্বামী।

তখন শরৎকাল। এই সময়ে খালে বিলে প্রচুর বুনোহাঁস ও পাতিহাঁস পাওয়া যায়। আমাদের এই এষ্টেট ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলে শিকার করতে যেতাম আমরা। বাড়িতে আমি আর আমার স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না। কয়েকজন চাকরবাকরের মধ্যে আদিম বন্য মানুষের মত দেখতে একজন দারোয়ান ছিল আমাদের। সে আমার স্বামীর বড় ভক্ত ও বাধ্য ছিল। আমার একমাত্র সহচরী ছিল ষোল বছরের একটি স্পেনীয় মেয়ে। তার বয়স ষোল হলেও তার স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলে দেখে মনে হত কুড়ি।

সাধারণতঃ শিকারের সময় আমি আমার স্বামী আর দু'-একজন চাকরবাকর যেত। আমি নিজেও ভাল বন্দুক চালাতে পারতাম। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে একজন যুবক আসত। আমার স্বামীর সূত্রে আলাপ। সে ছিল কোথাকার ব্যারণ; তার এষ্টেট ছিল। সে খুব বেশী যাওয়া আসা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ সে আসা বন্ধ করে

দিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তারপর থেকেই আমার প্রতি স্বামীর আচরণটা কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠল।

সব সময় কি যেন ভাবত। আমাকে আর আগের মত চুম্বন বা আদর করত না। আমার ঘর থেকে অনেক দূরে একটা ঘরে শুত। কিন্তু রোজ রাত্রি গভীর হলে আমি কার পায়ের শব্দ শুনতে পেতাম। মনে হত কে যেন আমার ঘরের কাছে এসে আবার চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে অন্ধকারের মাঝে একটা মানুষের ছায়ামূর্তি দেখেছি। আমার স্বামীকে সেকথা বলতে সে উদাসীনভাবে বলেছে, ও কেউ নয়, দারোয়ান।

একদিন সন্ধের সময় হঠাৎ আমার স্বামী হার্ভে এসে আমায় কৃত্রিম খুশির সঙ্গে বলল, নৈশভোজনের পর আমার সঙ্গে শিকারে যেতে পারবে? ঘন্টাতিনেক লাগবে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম বিস্ময়ে। হার্ভে বলল, একটা শেয়াল রোজ সন্ধেবেলায় এসে আমার বাড়ির মুরগী ধরে নিয়ে যায়। আজ আমি ওকে মারবই। তোমার ভয় করবে না ত?

আমি উত্তর করলাম, ভয়! কত নেকড়ে ও বন্য শুয়োর আমি মেরেছি, একটা শেয়াল ত কিছুই নয়।

খাওয়ার পর আমরা রওনা হলাম রাত্রি প্রায় দশটার সময়। কিন্তু হার্ভেকে অত্যন্ত অশান্ত ও চঞ্চল দেখাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় গুলিভরা বন্দুক নিয়ে নির্জন বনপথ ধরে এগিয়ে চলছিলাম শুধু আমরা দুটি প্রাণী। অবশেষে আমরা সাঁকো পার হয়ে সেই কুঁড়েটাতে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু কোথাও কোন শেয়াল দেখতে পেলাম না। শরতের সেই স্তব্ধনীরব রাত্রির ছায়ায় আধ ঘন্টা চুপ করে বসে রইলাম আমরা। মৃত্যুর মত এমন স্তব্ধনিথর রাত্রি দেখা যায় না। একটা ব্যাঙ বা পেঁচার চীৎকারও শোনা যাচ্ছিল না। আমি একবার হার্ভেকে বললাম, তুমি জান এই পথ ধরেই শেয়ালটা যাতায়াত করে?

হার্ভে বলল, হ্যাঁ আমি জানি।

হঠাৎ হার্ভে আমাকে বলল, ঐ গাছের তলায় দেখ।

গাছের ফাঁক দিয়ে পড়া চাঁদের আলোয় কোনরকমে দেখলাম গাছতলায় একটা লোক বসে রয়েছে। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজে সমস্ত বনভূমি কেঁপে উঠল। আমি দেখলাম একটা লোক কুঁজো হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু না পেরে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ল। আমি ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চীৎকার করে উঠলাম। সহসা দেখলাম আমার স্বামী পাগলের মত আমার গলাটা চেপে ধরল। তারপর দু'হাত দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘাসের উপর লুটিয়েপড়া সেই মৃত লোকটার উপর আমাকে ফেলে দিল। আমি দেখলাম মৃত ব্যক্তি আমাদের বাড়ির দারোয়ান।

ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে একটা জিনিস বুঝলাম আমার স্বামী আমাকে হত্যা করতে যেন বদ্ধপরিকর।

হঠাৎ আমার সহচরী পরকুইভা কোথা হতে এসে সেই মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে চুম্বন করতে লাগল আবেগের সঙ্গে। তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার কাছে ক্ষমা চাইল হার্ভে। আমার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে হার্ভে বলল, আমি তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম। সন্দেহের বশবর্তী হয়েই দারোয়ানকে হত্যা করেছি। কিন্তু এখন বুঝছি ও ছিল এই মেয়েটার প্রেমিক।

আমার কিন্তু সে কথায় কান ছিল না। হার্ভের উপর আমার দৃষ্টি ছিল না। আমি শুধু একমনে, একদৃষ্টিতে দেখছিলাম কিভাবে একজন জীবন্ত যুবতী নারী একটি মৃত লোকের দেহকে বারবার চুম্বন করছে। দেখতে দেখতে ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে হলো আমার স্বামী ছাড়া অন্য কোন মানুষকে আমি যদি এইভাবে ভালবাসতে পারতাম। এইভাবে চুম্বন করতে পারতাম।

কোন এক মৃত নারীর গোপন কথা

A dead woman's secret

তার লম্বা লম্বা সাদা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল মাথার চারদিকে। রক্তহীন ফ্যাকাশে দেহটা নিথর হয়ে পড়ে ছিল বিছানায়। দেখে মনে হচ্ছিল এক পুণ্যবতী গুণবতী নারী তার নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক দীর্ঘ জীবন যাপনের পর এক প্রশান্ত চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে।

স্বামীহারা এই বিধবা নারীর মাত্র দুটি সন্তান—একটি পুত্র আর একটি কন্যা। পুত্রটি বর্তমানে একজন জেলাশাসক। ন্যায়বিচার ও প্রশাসনের কাজে সমান দক্ষ। কন্যাটি পবিত্র কৌমার্য জীবন যাপন করছে ধর্মের আশ্রয়াধীনে থেকে। সে নিজেকে ঈশ্বরের সেবাদাসী বলে মনে করে। ঈশ্বরই যেন তার স্বামী। ছেলেটি মার পায়ের কাছে বসে ছিল আর মেয়েটি তার মার বিছানার পাশে তার মার শুচিশুভ্র হাতীর দাঁতের মত একটি হাত চুম্বন করছিল।

পুরনো দিনের যত সব কথা ছেলেবেলাকার যত সব ঘটনার কথা ভিড় করে আসতে লাগল তাদের দু'জনের মনে । তারা বেশ বুঝতে পারল একমাত্র মার চেষ্টাতে তারা মানুষ হয়েছে। তাদের জীবনে যতকিছু নীতিবোধ ও বিচারবুদ্ধি তা তাদের মার শিক্ষাতেই গড়ে উঠেছে।

তাদের চার্চের যাজক নৈশভোজন সেরে এসে বলল, আমি আজ রাতে তোমাদের কাছে থাকব বৎস। রাত্রি জাগরণে সাহায্য করব তোমাদের।

কিন্তু তারা তাতে রাজী হলো না। বলল, আজ সারারাত ধরে মাকে আমরা দেখব। আর ত জীবনে কখনো দেখতে পাব না। সুতরাং একা থাকতে চাই। আপনি যেতে পারেন।

যাজক চলে গেলে ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল আবার। তাদের দু'জনের মনে হলো নৈশ প্রকৃতির অনন্ত শান্তি, এক স্বর্গীয় বিষাদ আর প্রশান্ত নীরবতা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই ঘরে আর বিশেষকরে তাদের মার মুখের মধ্যে। ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই হঠাৎ হাঁটুগেরে বসে আকুলভাবে কাঁদতে লাগল মার জন্য। মা তাদের কখন কি কথা বলেছিলেন তা মনে পড়ল তাদের। তারা যেন স্পষ্ট তাদের মার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তাদের বাবাকে তারা দেখেনি। শুনেছে তার বাবা তাদের মাকে ত্যাগ করে কোথায় চলে যান। মা-ই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাদের বংশধারার একমাত্র যোগসূত্র। সেই মাকে হারিয়ে স্বভাবতই তারা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ল জীবনে। অসহায় বোধ করতে লাগল।

অবশেষে সিস্টার ইউলেনি তার ভাইকে বলল, মার ড্রয়ার খুলে চিঠিগুলো বার করে পড়া যাক। সময় কেটে যাবে। আমাদের বংশপরিচয়ের অনেককিছু জানাও যাবে। পড়ার পর এই সব চিঠিগুলোও আমরা মার কবরে দেব।

হঠাৎ ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা চিঠি খুলে পড়তে লাগল ইউলেনি, 'হে প্রিয়তমা, আমি তোমাকে পাগলের মত ভালবাসি। গতকাল হতে তোমার স্মৃতির জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে ছারখার হচ্ছে আমার মন। তোমার ওষ্ঠাধরের মিষ্টতা এখনো অনুভব করছি আমার ওষ্ঠে। তোমার দেহের রক্তমাংসের উত্তাপ এখনো অনুভব করছি আমার ওষ্ঠে। তোমার ভালবাসা আমাকে পাগল করেছে। তোমাকে আবার পাবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে আমার মন। তোমার চুম্বনের মাধুর্যে এখনো সিক্ত হয়ে আছে আমার অধরোষ্ঠ। আমার সমগ্র দেহ তার সমস্ত নিবিড়তা নিয়ে তোমারই জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।'

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে তার বোনের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে তার তলায় স্বাক্ষর দেখল। নাম রয়েছে হেনরি। অথচ তাদের বাবার নাম হলো রেনে। তারা বেশ বুঝতে পারল এটি তাদের মাকে লেখা তাঁর কোন প্রেমিকের আবেগতপ্ত অবৈধ প্রেমপত্র। এর উত্তরে একটি চিঠির একটি লাইন পাঠ করল ছেলেটি। তাতে লেখা আছে, তোমার চুম্বন ও আদর ছাড়া আমিও আর থাকতে পারছি না।

সহসা বিচারকের কঠোরতা ফুটে উঠল জেলাশাসকের মুখে। সে একবার তার মার মুখপানে তাকাল। আর ইউলেনি তার ভাইএর মুখপানে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। এইভাবে রাত্রি শেষ হয়ে কখন সকাল হয়ে গেল তা তারা বুঝতেই পারল না।

সকাল হতেই আর তাদের মার মুখপানে না তাকিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেল দু'জনে।

হিপ্পোলিটের দাবি

Heppolyte's claim

আদালতে জজসাহেব একটি জমির দখলিস্বত্বসংক্রান্ত মামলার শুনানী শেষ করে হিপ্পোলিটের মামলাটি ধরলেন। মামলাটি বড় অদ্ভুত ধরনের। এই মামলার বাদীপক্ষ হচ্ছে হিপ্পোলিট ল্যাঙ্কার। হিপ্পোলিটের অভিযোগ হলো এই যে বিবাদী মাদাম লিনো একশত ফ্রাঁ কোন একটি কাজের জন্য দেব বলে দেয়নি। তাই সেই টাকা আদায়ের জন্য মামলা রুজু করেছে আদালতে বিচারের আশায়।

বিবাদী পক্ষের ছয়জন সাক্ষী প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে আদালত গৃহে। জজসাহেব প্রথমে বাদী হিপ্পোলিটকে ডাকলেন। হিপ্পোলিট প্রথমে বলল, হুঁজুর, আজ হতে ঠিক নয় মাস আগে এ্যাবথিমে লিনোর বিধবা পত্নী মাদাম লিনো কোন এক সন্ধ্যায় আমার কাছে এসে তার বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার জন্য একটি সন্তান চায়।

জজসাহেব কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে বললেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বল।

হিপ্পোলিট বলল, হুঁজুর, সে একটি সন্তান চায় আমার কাছে।

জজসাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, তার মানে? সে কি কোন সন্তান পোষ্য নিতে চেয়েছিল?

হিপ্পোলিট বলল, না হুঁজুর। সে আমাকে তার গর্ভে একটি সন্তান উৎপাদন করতে বলেছিল আর বলেছিল তার জন্য সে আমাকে একশত ফ্রাঁ দেবে।

জজসাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, কি উদ্দেশ্যে সে এই অস্বাভাবিক অনুরোধ তোমায় করে তা জান?

হিপ্পোলিট বলল, হুঁজুর, আমিও প্রথমে তার কথার আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারিনি। পরে জিজ্ঞাসা করায় সে খুলে বলে। মাদাম আমার কাছে আসার মাত্র এক সপ্তা আগে তার স্বামী হঠাৎ মারা যায়। মাদাম লিনো তখন তার স্বামীর সম্পত্তির দখল সম্বন্ধে উকিলের পরামর্শ নেয়। উকিল বলে, আজ হতে দশ মাসের মধ্যে যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে লিনোর সন্তান বলেই আইনতঃ গৃহীত হবে এবং সেই সন্তানই মঁসিয়ে লিনোর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। কারণ তার স্বামী তার বাড়ির অমতে তাকে বিয়ে করেছিল, তা না হলে লিনোর সব সম্পত্তি তার পরিবারের আত্মীয়স্বজনেরা পাবে। তাই সন্তানের জন্য পাগল হয়ে আমার কাছে ছুটে আসে মাদাম লিনো। কারণ সে জানত আমি আটটি সন্তানের জনক এবং সে সন্তানরা আজও জীবিত আছে।

জজসাহেব বললেন, সংক্ষেপে বল।

হিপ্পোলিট বলল, মাদাম লিনো তখন বলল, আজ হতে দু'মাসের মধ্যে ডাক্তার যদি অন্তঃস্বত্বা বলে রিপোর্ট দেয় তাহলে আমি তোমাকে একশত ফ্রাঁ দেব। আমি

দু'মাস পরে জানতে পারি মাদাম লিনোর গর্ভে আমারই ঔরসজাত সন্তান বেড়ে উঠছে। আমি তখন তার কাছে সেই প্রতিশ্রুত টাকা চাই। কিন্তু বারবার চাওয়া সত্ত্বেও সে টাকা দেয়নি সে।

জজসাহেব বললেন, বিবাদী, তোমার কিছু বলার আছে?

মাদাম লিনোর চেহারাটা যেমন মোটা, গলার স্বরটাও তেমনি মোটা। লিনো পরিষ্কার বলল, ও মিথ্যাবাদী হুঁজুর, আমি আমার মৃত স্বামীর নামে শপথ করে বলছি এ সন্তান তার নয়।

জজসাহেব তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, কেমন করে প্রমাণ করবে তুমি যে সন্তান গর্ভে ধারণ করছ সে সন্তান তার নয়।

মাদাম লিনো আমতা-আমতা করে বলল, কেমন করে প্রমাণ করব? আমার ঐ দু'জন সাক্ষীকে ডাকুন হুঁজুর, তারা সবাই বলবে। আসলে ওর সন্তান উৎপাদনের কোন ক্ষমতাই নেই। ওর আটটা সন্তানও ওর নিজের নয়। ওসব সন্তান ওর স্ত্রীর গর্ভে অন্যদের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

জজসাহেব বললেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ বাদ দিয়ে তোমার বক্তব্য বল।

মাদাম লিনো বলল, প্রথমে আমি ওর কাছে এ প্রস্তাব করেছিলাম ওর যোগ্যতার কথা জানতে না পেরেই। তারপর আমি এই দু'জনের কাছে যাই। এদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

জজসাহেব এবার সাক্ষীদের একে একে জিজ্ঞাসা করলেন। সকলকে একই প্রশ্ন করলেন। আচ্ছা তুমি কি মনে করো মাদাম লিনোর গর্ভস্থ সন্তান তোমার ঔরসজাত?

সকলেই এক উত্তর দেয়, হ্যাঁ, হুঁজুর।

অবশেষে জজসাহেব তাঁর রায়ে বললেন, সন্তান যারই হোক, যেহেতু মাদাম লিনো প্রথমে হিপ্লোলিটের কাছে গিয়ে তাকে অনুরোধ করে এ কাজে সেই হেতু হিপ্লোলিটকে পারিশ্রমিকস্বরূপ পঁচিশ ফ্রাঁ দিতে হবে।

তামাকের দোকান

Tobacco shop

আমি একবার বারভিলারে একটা যাদুঘর দেখতে যাই। যাদুঘরটা ঘুরে দেখার পর ছোট মফঃস্বল শহরের সবচেয়ে বড় রাস্তাটায় বেড়াতে লাগলাম একা একা। ঘড়িতে তখন বেলা চারটে বাজে।

একা একা কি করব, কোথায় যাব খুঁজে পাচ্ছি না। এমন সময় হঠাৎ একটা সিগার খাবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু কাছে সিগার না থাকায় একটা সিগারেটের দোকান খুঁজতে লাগলাম। এদিক ওদিক তাকাতেই একটা দোকান দেখতে পেলাম। কিন্তু

দেখলাম দোকানের বিক্রেতা একজন মেয়েলোক। কয়েকটা বাক্স সে আমার সামনে তুলে ধরল। কিন্তু দেখলাম সবগুলোই বাজে। আমি তখন সেই মেয়েটির মুখপানে তাকালাম।

তার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। মোটাসোটা চেহারা। মুখখানা বেশ গোলগাল। মাথার চুলগুলো কালো। আমার মনে হল মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না। তাই তাকে চেনার জন্য বারবার তার মুখপানে তাকাতে লাগলাম। সে যাতে সন্দেহ না করে তার জন্য তাকে বললাম, ক্ষমা করবেন মাদাম। বারবার এভাবে তাকাবার জন্য কিছু মনে করবেন না। বহুদিন আগে আপনাকে হয়ত কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

সে বলল, এটা অবশ্য আশ্চর্য কথা। তবে আমারও তাই মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, তুমি কি সেই? তুমি কি আমাদের সেই 'হঠাৎ দেখা'?

মেয়েটি এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, তুমি জর্জ না! কিন্তু সাবধান, কেউ যেন শুনতে না পায়।

সেখানে অবশ্য অন্য কেউ ছিল না। আমি তাকে চিনতে পারলাম। সেই রোগা মেয়েটা কেমন মোটাসোটা ঘরণী গৃহিণীর মত হয়ে উঠেছে। আমরা তখন লারণ নামে একটা গ্রামাঞ্চলে একটা নদীর উপর নৌকায় বেদের জীবন যাপন করতাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম প্রায় বারো তের জন। তার মধ্যে কয়েকজন যাওয়া-আসা করত। আর পাঁচ ছয়জন বরাবর একটানা থাকত। আমাদের 'হঠাৎ দেখা' সেই মেয়েটি হঠাৎ এসে জোটে এবং আমরা যে পাঁচ ছয়জন একসঙ্গে থাকতাম তাদের সঙ্গে থাকতে শুরু করে দেয়। আমাদের মধ্যে অনেকে আবার ওকে জায়রা বলে ডাকত। কারণ অনেকে মনে করত সে নাকি ইসরায়েলের মেয়ে। জায়রা থেকে পরে তার নামটা জারাতে পরিণত হয়।

আমি তাকে বললাম, এখন কেমন চলছে?

সে বলল, আগের থেকে কিছুটা ভাল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেখান থেকে কি করে এলে? তুমি কি সেই লারণ থেকে সোজা এসেছ?

সে বলল, না প্যারিস থেকে।

আমি বুঝতে পারলাম না সে আগে কি করত এবং কোথা হতে কিভাবে এল। তাই কৌতূহলবশে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, প্যারিসে কি করতে, কোথায় থাকতে?

সে বলল, আমি থাকতাম মাদাম ব্যাভেলেতের কাছে। উনি পোশাক তৈরী করতেন। ওঁর একটা দোকান ছিল আর আমরা পাঁচ ছয়জন মেয়ে সেখানে কাজ করতাম। কত রকমের চরিত্রের কত সৌখীন মেয়ে আসত আমাদের দোকানে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমাদের রোজগার তখন মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু মাদাম ব্যাভেলেত ওরফে ইর্মা একদিন আমাদের বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলেই তোমাদের রোজগার বাড়াতে পার।

আমরা প্রথমটায় তাঁর কথা বুঝতে পারলাম না। পরে উনি বললেন, এটা ত খুব সোজা কথা। আমি যখন অপেরায় চলে যাব তখন তোমরা চারজন এক একটা ঘোড়ার গাড়িতে অপেক্ষা করবে সাজগোজ করে। দেখবে কোন না কোন ভদ্রলোক তোমাদের এক একজনের গাড়িতে উঠে পড়বে আর উঠে পড়লেই তাকে জড়িয়ে ধরবে নিবিড়ভাবে। পরমুহূর্তেই তাকে ছেড়ে দিয়ে বলবে ভুল হয়ে গেছে। বলবে তোমরা ভেবেছিলে তোমাদের পরিচিত ও, বাইরের কোন লোক। তখন লোকটা কিন্তু উত্তেজিত হয়ে তোমাদের ফাঁদে পড়বে এবং তোমাদের ছাড়তে চাইবে না। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমরা তার সঙ্গে কোন হোটেলে গিয়ে নৈশভোজনটা সেরে আসবে আর ক্ষতিপূরণস্বরূপ বেশকিছু টাকাও পাবে।

আমাদের থেকে ইর্মা দেখতে ভাল ছিল এবং মন্ত্রীসভায় এক সদস্য নাকি তাঁর প্রেমিক ছিল। তিনি এমন একটা ভাব দেখাতেন যাতে মনে হতো কোন রাজা মহারাজা তাঁকে দেখলেই তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। আমরা নিজেদের মধ্যে একথা অনেক সময় বলাবলি করতাম।

একদিন ইর্মা অপেরায় গেলে তাঁর কথামত আমরা বাইরে গাড়িতে সাজগোজ করে লোকের জন্য বসে অপেক্ষা করছি। এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক এসে আমার গাড়িতে ঢুকতেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম নিবিড় আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে। পরে ভুল হয়েছে বলে কাঁদতে লাগলাম। তখন সে দারুণ অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হয়ে উঠল। অনেক করে বোঝাতে লাগল। আমি কান্না থামাতেই সে খুশি হলো। সে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। তারপর আমি শান্ত হলে সে আমার কোমরে হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর আদর করে আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল।

কিন্তু প্যারিসের এই ধরনের ক্ষণপ্রণয়ের ছলনাময় অভিনয়ে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠলাম আমি। এ জীবনের পরিবর্তন চাইছিলাম।

আমি তখন বললাম, কিন্তু এই দোকানটা করলে কেমন করে?

সে বলল, আমি প্যারিসে যেখানে থাকতাম সেখানে আমার ঘরের সামনে একটা ঘরে একজন ছাত্র থাকত। সেই ঘরে থেকে সে পড়াশুনো করত। কিন্তু পড়ায় মন ছিল না তার। তার সঙ্গে আমার দেহসংসর্গের ফলে রোজার নামে একটি পুত্রসন্তান হয়। সে আমাকে এই সন্তান পালনের জন্য কিছু টাকা দেয়। পরে সে সরকারী একটা উচ্চ পদ পেলে এই দোকানটার ব্যবস্থা করে দেয়।

তারপর মেয়েটি তার ছেলে রোজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। লম্বা চেহারার ভদ্র একটি যুবক। তার মা বলল, মেয়রের অফিসে এখন কেরাণীর কাজ করে। পরে সামরিক বিভাগে যোগ দেবে।

আমি তার সঙ্গে করমর্দন করে হোটেলে ফিরে গেলাম।

একটি গরীব মেয়ে

A poor girl

সত্যিই, সেই রাত্রির স্মৃতি আমি কখনই ভুলতে পারব না। কোন মানুষ ডুলিতে করে খনির অন্ধকার গর্তে নামার সময় তার মধ্যে ভীতিসিক্ত যে একটা শিহরণ জাগে আমারও তেমনি মনে হচ্ছিল আমি যেন মানবজীবনের দারিদ্র্যের অতল অন্ধকার গর্তের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। আমি বুঝতে পারলাম মানুষ অনেক সময় এমন অবস্থার মধ্যে পড়ে যেখানে তার সততা রক্ষা করে চলতে পারে না। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তা পারে না।

সেদিন সন্ধে থেকে দারুণ বৃষ্টি নামে। সারা শহরের সমস্ত পথঘাট জলে ভেসে যায়। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তবু জল থামেনি। সবাই ছাতা মাথায় দিয়ে পথ হাঁটছিল। আমি যাচ্ছিলাম বদেভিল থেকে দ্রুয়ত স্ট্রীটের দিকে। পথের ধারের ঘরগুলোয় বারবণিতারা হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক তুলে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে চলমান পুরুষ পথিকদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিল। সহসা দেখলাম সেখানে তাদের দলের তিনটি মেয়ে প্রাণভয়ে ছুটছে। দু'হাতে পরনের পোশাকটা ধরে ছুটছে । সহসা আমি অনুভব করলাম কে পিছন থেকে এসে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরল। ঘুরে দেখলাম সেই তিনটি মেয়ের একটি কাতরকণ্ঠে আমাকে বলছে, আমাকে বাঁচান স্যার, আমাকে বাঁচান।

আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে বললাম, ঠিক আছে। দাঁড়াও, শান্ত হও।

সে বলল, আপনি কি আমাকে আপনার ঘরে একবার নিয়ে যাবেন ?

আমি বললাম, না আমার বাড়িতে স্ত্রী আছে।

আমি তাকে কিছু পয়সা দিয়েছিলাম। তাই সে কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে আমাকে সেবাদান করতে চাইছিল। আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, আপনার এই দান আমি কখনো ভুলব না। এ জীবন আমার আর ভাল লাগে না।

আমি বললাম, এ জীবনে কেন এলে ?

মেয়েটা বলল, সেটা আমার দোষ না।

কেমন একটা কৌতূহল পেয়ে বসল আমায়। রাত্রি বেশী হলেও আমি তার কথা শুনতে চাইলাম। আমি বললাম, তোমার সব কথা বল। আমি শুনব।

সে বলতে শুরু করল, আমার বয়স তখন মাত্র ষোল। আমার বাবা মা কেউ ছিল না। আমি তখন ইভেত্‌ৎ নামে এক জায়গায় মঁসিয়ে লেরেবল্ নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজ করতাম। মঁসিয়ে লেরেবল্ ছিল বয়সে প্রবীণ ও ধর্মভীরু। প্রতি রবিবার ভক্তিভরে চার্চে যেত ধর্ম করতে। তবু আমার দিকে কেমন কটমট করে তাকাত।

একদিন আমাকে ধরে একটা নির্জন ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে আমার শালীনতা নষ্ট করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আমি যে বাড়িতে থাকতাম সেই বাড়ির উল্টো দিকে এক মুদিখানার দোকানে একটি সুন্দর যুবক কাজ করত। তাকে আমার ভাল লাগত। একদিন রাত্রিতে আমার শোবার ঘরের দরজা খুলে রেখে তাকে আসতে বলি। সে আসে। কিন্তু আওয়াজ পেয়ে বুড়ো লেরেবল্ উঠে পড়ে আমার ঘরে ঢুকে আমার প্রেমিককে আক্রমণ করে। আমি ছুটে পালিয়ে যাই। পরে শুনতে পাই লেরেবল্ সেই ছেলেটাকে খুন করেছে। আমি ভয়ে রুয়েনের পথে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকি। পথে একদল পুলিশ আমাকে বনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অবশ্য আমি ভয়ে তাদের কুৎসিত প্রস্তাবে বাধ্য হয়ে রাজী হয়েছিলাম। তাছাড়া সেই নির্জন বনপথে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা এবং আমার রাজী হওয়া বা না হওয়ার কোন অর্থ ছিল না। তারা শুধু আমাকে এক গ্লাস মদ ছাড়া আর কিছুই দেয়নি।

তারপর আমি অতিকষ্টে রুয়েনে আসি। একটি লম্পট লোক আমাকে কপট আশা দিয়ে নদীর ধারে নিয়ে যায়। আমার ক্লান্তি সত্ত্বেও আমার দেহটাকে ভোগ করে আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশরা আমাকে সন্দেহ করে থানায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে আদালতে নিয়ে যায়। আদালতের জজ আমাকে মুক্তি দেয়। হঠাৎ আমি একদিন বুঝতে পারি আদালতের জজই হচ্ছে সেই মঁসিয়ে লেরেবল্। লেরেবল্ও আমাকে চিনতে পারে। আমি তার বাড়ি যাই। সে আমাকে একশো টাকা দিয়ে সপ্তায় দু'দিন করে তার বাড়িতে যেতে বলে। আমি আবার বাইরের লোকও ধরতাম। আমি বাধ্য হয়ে এই ব্যবসায় চলে এলাম। এছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

একদিন পঁচাত্তর বছরের এক ধনী বৃদ্ধ আমাকে নিয়ে ফূর্তি করার জন্য এক হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানে সে আমার ঘরে মারা যায়। তাতে আমার তিন মাস জেল হয়। কারণ আমি কারো অধীনে থেকে এই ব্যবসা করতাম না বলে সেটা বেআইনী।

এরপর আমি প্যারিসে চলে আসি। কিন্তু এখনো আমি কোন ঘরভাড়া করতে পারিনি। এখানে এ ব্যবসায় প্রতিযোগিতা অনেক বেশী বলে কিছুই হয় না। খাবার জোটে না সব দিন। তার উপর যখন বৃষ্টি হয় তখন আমাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়।

মেয়েটি আবার তাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করল। আমি তাকে সেই একই উত্তর দিলাম, বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে।

তখন আমি দেখলাম মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই বুড়ী হয়ে যাওয়া সেই মেয়েটি তার কালিমাখা বিষণ্ন মুখখানা নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখনো সমানে বৃষ্টি পড়ছিল।

ধরাপড়া

Caught

গত গ্রীষ্মের সময় ভিয়েনার অভিজাত পরিবারের এক সুন্দরী বিবাহিতা যুবতী তার স্বামীকে না নিয়ে একাই বেড়াতে গিয়েছিল অস্ট্রীয়ার কার্লস্‌বাদ অঞ্চলে। একটা ঘর ভাড়া করে সে একা একাই থাকে।

ভদ্রমহিলা আসলে তার পরিবারের চাপে পড়ে টাকার জন্য এক ধনীকে বিয়ে করে। বিয়ের পর তাদের একটি সন্তানও হয়। তারপর আপনা থেকেই কেমন যেন শিথিল হয়ে যায় ওদের দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধনটা। স্বামীও যেমন ইচ্ছামত ক্লাবে ঘুরে বেড়ায়, রাত পর্যন্ত স্ত্রীও তেমনি খুশিমত যেখানে সেখানে বেড়াতে যায়।

কার্লস্‌বাদে এসে ভদ্রমহিলা এক সুদর্শন পোল যুবকের প্রেমে পড়ে যায়। যুবকটি ভদ্রমহিলার নির্জন ঘরে দিনকতক আসতে থাকে পরপর। কিন্তু কোন নিঃসঙ্গ মহিলার বাড়িতে কোন অনাত্মীয় যুবক বারবার এলে স্বভাবতই সেটা সন্দেহের কারণ হয়ে ওঠে প্রতিবেশীদের চোখে। তাই ভদ্রমহিলা কৌশল করে একটা মতলব খাটাল।

পোল যুবকটি দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। কিন্তু তার চেহারা ও চোখ মুখের মধ্যে নারীসুলভ একটা কমনীয়তা ছিল। ভদ্রমহিলা তাই তাকে পরামর্শ দিল তুমি মেয়ে সেজে মাথায় একটা ওড়না চাপিয়ে গাড়িতে করে আসবে। তাহলে কেউ সন্দেহ করবে না।

পোল যুবকটি তার প্রেমিকার নির্দেশমত মেয়ে সেজে আসতে লাগল। তার মেয়ে সাজাটা এমনি নিখুঁত ছিল যে সবাই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকে বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী এক যুবতীর মতই মনে হত। একদিন সে সন্ধের সময় মেয়ের সাজপোশাক পরেই বাজারের ভিতর দিয়ে থিয়েটার দেখতে যায়। অসংখ্য কৌতূহলী মুগ্ধদৃষ্টি যখন তার উপর নিবদ্ধ হয় তখন তার বড় ভয় লাগে। সে যখন তার বক্সে বসে থিয়েটার দেখছিল তখন এক ভদ্রলোক পাশ থেকে একটি কাগজের চিরকুট তার হাতে গুঁজে দেয়। তাতে লেখা ছিল, 'তুমি বিশ্বের অন্যতম সেরা সুন্দরী। তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি।'

পোল যুবকটি থিয়েটার ভেঙ্গে গেলে তার গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে যে ভদ্রলোকটি তার হাতে সেই কাগজটা দেয় সে গিয়ে সেই গাড়িতে ওঠে। পোল যুবকটি তাদের বাড়ি পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যায়। তারপর তাকে নামিয়ে দেয়। পোল যুবকটি সেই লোকটিকে বলে, তার নাম ভ্যালেস্কা।

একদিন পোল যুবকটি যখন সেই ভদ্রমহিলার ঘরে ছিল তখন হঠাৎ ভদ্রমহিলার স্বামী এসে হাজির। ভদ্রমহিলা ভয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। এদিকে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তার স্বামী একটা ধারাল ছোরা দিয়ে পোল যুবকটিকে কাটতে যায়। এমন সময় যুবকটি সেই মেয়ের পোশাক পরে পালাবার চেষ্টা করে। আর তাকে সেই পোশাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে ভদ্রমহিলার স্বামী বলে ওঠেন, ভ্যালেস্কা তুমি ?

পোল যুবকটি বলে, হ্যাঁ আমি আপনার স্ত্রীর কাছে আপনার লেখা কিছু প্রেমপত্র দেখাতে এসেছিলাম।

তখন স্বামী ভদ্রলোক বিপদে পড়েন। বলেন, ঠিক আছে, তার আর দরকার হবে না। আমাদের মধ্যে সন্ধি করাই ভাল। তুমি চলে যাও। আমি কিছু করব না। তবে আবার যদি এদিকে আস তাহলে এই ছোরা দিয়ে তোমাকে শেষ করব।

তারপর থেকে স্বামী-স্ত্রীতে ওরা নাকি সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে।

আর্দালি

Orderly

বিভিন্ন পদের সামরিক অফিসারে ভর্তি হয়ে পড়েছে কবরখানাটা। চারদিকে শুধু ফুল আর ফুল। একটা সদ্য-খোঁড়া কবরের তলদেশে এক সুন্দর যুবতীর মৃতদেহটাকে এইমাত্র নামানো হয়েছে। সেই কবরের তলদেশে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন কর্ণেল লিমোসিন। পুকুরে চান করতে গিয়ে ডুবে মারা যায় তাঁর সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। সীমা পরিসীমা নেই তাঁর সেই শোক দুঃখের। তাঁর মনে হচ্ছিল সেই কবরের কোন তল নেই। তার অতল অন্ধকার গর্তে তাঁর অন্তরটাও হারিয়ে গেছে চিরদিনের মত।

কবরের মুখটায় দাঁড়িয়ে তার তলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন কর্ণেল লিমোসিন। তিনি শোকে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে সেখান থেকে কিছুতেই যেতে চাইছিলেন না। অবশেষে জেনারেল গুরমঁত নামে একজন অফিসার তাঁর হাত ধরে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। কর্ণেল লিমোসিন আর কোন আপত্তি না করে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। হঠাৎ তাঁর যেন চোখ পড়ল টেবিলের উপর তাঁর স্ত্রীর হাতে লেখা ঠিকানাসহ একখানা খাম পড়ে রয়েছে।

কর্ণেল লিমোসিন খামটা তুলে দেখলেন চিঠিটা। কর্ণেল লিমোসিনের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তাঁর লম্বা রোগা-রোগা চেহারা দেখলেই বুড়ো বলে মনে হয়। তাঁর চোখটা একেবারে বসে গেছে। আজ বছর তিনেক হলো তিনি এক তরুণী যুবতীকে বিয়ে করেন। মেয়েটি তাঁরই এক সহকর্মীর। কিন্তু সহকর্মীর অকালমৃত্যুতে মেয়েটি অনাথা হয়ে পড়ে। পরে তাঁর মেয়ের বয়সী সেই অনাথা মেয়েটিকে বিয়ে করেন লিমোসিন।

দু'জনের বয়েসের মাঝে এতই ফারাক যে বিয়ের পর প্রথম প্রথম মেয়েটি তার স্বামীকে পিতা বলে ডাকতে থাকে। আর লিমোসিনও তাকে কথায় কথায় 'বৎসে' বা 'বাছা' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। স্ত্রী হয়েও মেয়ের মত তার স্বামীর কোলে মাঝে মাঝে বসে পড়ত মেয়েটি, কত আবদার করত।

চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করলেন লিমোসিন। তাতে লেখা ছিল, আমায় ক্ষমা করো পিতা। আগে তোমায় যেমন পিতা বলে ডাকতাম তেমনি আজও পিতা বলে ডাকছি। আমি কিন্তু তোমার কাছে কোন দয়া চাইছি না। আমার পাপ স্খালন করতেও বলছি না। আমি আসল সত্যটা প্রকাশ করে যেতে চাই। কারণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করে পরলোকে চলে যাব আমি।

যখন তুমি উদারতার বশবর্তী হয়ে আমায় বিয়ে করেছিলে তখন আমি সত্যিই তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আমার সে ভালবাসার সঙ্গে ছিল কৃতজ্ঞতা। আমি তোমাকে আমার নিজের পিতার মতই দেখতাম। কিন্তু শহরে আসার পর কি হয়ে গেল। আমি একজনের প্রেমে পড়ে গেলাম।

আমি প্রথমে এটা চাইনি। নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠিনি। হার মানতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার অধঃপতন ঘটে গেল। কিন্তু সে যাই হোক, আমার সেই প্রেমিক কে তা জানতে চেয়ো না পিতা। তাকে ঘৃণা করো না। সে কে তা তুমি বুঝতে পারবে না। কারণ প্রায় ডজনখানেক অফিসার আমার চারদিকে ঘুরঘুর করত। তদের মধ্যে কে সেই ব্যক্তি আন্দাজ করতে পারবে না।

একদিন বেকাসে দ্বীপের এক জায়গায় আমরা দু'জনে মিলিত হব বলে ঠিক করি। ঠিক হয় আমি সাঁতার কেটে সেখানে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে তার জন্য অপেক্ষা করব। অথবা সে আগে থেকে সেখানে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। আমি সেইভাবে গিয়ে সেই ঝোপের মাঝে তাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু হঠাৎ তোমার আর্দালি ফিলিপ্পিকে অদূরে দেখতে পেয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলাম আমি।

ফিলিপ্পি আমাকে বলল, ভয় নেই, আপনি সাঁতার কেটে বাড়ি চলে যান। পরের দিন ফিলিপ্পি এসে বলল, কোন চিন্তা নেই আপনার, কোন চিঠি থাকলে দিতে পারেন, আমি পৌঁছে দেব যথাস্থানে।

আমি তাকে বিশ্বাস করে অনেক চিঠিপত্র দিই। এইভাবে দু'মাস কেটে যায়। তারপর একদিন সেই দ্বীপে আবার মিলনের ব্যবস্থা করি। ফিলিপ্পি তা জানতে পেরে আগে হতে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে আমার জন্য। সে আমার প্রেমিককে কোন খবর দেয়নি ইচ্ছে করে। সে আমাকে দেখে আমার দেহটা ভোগ করতে চায়। আমাকে ভয় দেখিয়ে বলে সে আমার সব চিঠি রেখে দিয়েছে, আমি কথা না রাখলে সে সব কথা তোমাকে বলে দেবে। আমি তোমার ভয়ে কাপুরুষের মত তার কথায় বাধ্য হয়ে রাজী হই। একটি পাপ হতে আর একটি পাপের গর্তে চলে যাই। এইভাবে সে আমার অসহায়তার সুযোগটা নিয়ে বারবার দেহভোগ করে।

কিন্তু এইভাবে আর চলে না। মৃত্যু ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নেই পিতা। তাই ঠিক করেছি চান করতে গিয়ে ডুবে মরব। আমার এই চিঠি তুমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মৃত্যুবরণ করব। আমি আমার প্রেমিককে সব কথা জানিয়ে একখানি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি। একই সময়ে সেও সে চিঠি পাবে।

তোমাকে বলার আর কিছু নেই পিতা। আমাকে ক্ষমা করো। তোমার যা খুশি করো। জীবনে যে কথা বলতে পারিনি ভয়ে, মৃত্যুকালে সে কথা বলতে কোন ভয় নেই। কারণ একমাত্র মৃত্যুতেই মানুষ সব ভয় হতে উত্তীর্ণ হতে পারে। বিদায় পিতা—

চিঠিখানা পড়া শেষ হলে তাঁর আর্দালি ফিলিপ্পিকে ডেকে পাঠালেন লিমোসিন। ফিলিপ্পি এলে তাঁর ড্রয়ারটা খুলে বললেন, আমার স্ত্রীর প্রেমিকের নাম বল।

ফিলিপ্পির চতুর মুখখানা সহসা কালো ও কুটিল হয়ে উঠলো। লিমোসিন রিভলবারটা বার করে তার দিকে ধরে বললেন, তুমি জান, বল শীগগির।

ফিলিপ্পি বলল, ক্যাপ্টেন আলবার্ত।

তার কথা শেষ হতে না হতে রিভলবারের একটা বুলেট ছুটে গিয়ে তার কপালটা বিদ্ধ করল। সামনে মুখ গুঁজে পড়ে গেল ফিলিপ্পি।

কালা-বোবা

The deaf and mute

হে আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি জানতে চেয়েছ কেন আমি প্যারিসে ফিরছি না। আমি যদি তার কারণ তোমাকে জানাই তাহলে হয়ত তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে।

তার মানে এই নয় যে আমি শহর ভালবাসি না, প্যারিসে থাকতে আমি ভালবাসি না। প্যারিসে থাকতে আমি ভালবাসি ঠিকই, তবে শরৎকালটা আমি বনে বনে ঘুরে শিকার করেই কাটাতে চাই। একটা ঘর আর ঘরের বাইরে থাকাটার মধ্যে পার্থক্য যে কত তা তুমি এখানে এলে বুঝতে পারবে। প্যারিস শহরে পথে ঘাটে সব সময় এত লোক যে সব পথগুলোই মনে হবে দেয়ালহীন এক একটা ঘর। অবশ্য বর্তমানে প্যারিসে না ফেরার এটা কোন কারণ নয়। এখন আমি প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি না তার কারণ এখন প্রচুর সংখ্যক বনমুরগী উড়ছে এখানে।

এখানে আমি আছি একটা পাহাড়ের উপত্যকা প্রদেশে অবস্থিত নরম্যান যুগের পুরনো আমলের একটা বিরাট বাড়িতে। বাড়িটার সামনেই একটা নদী বয়ে গেছে। এই বাড়ি থেকে শিকার করা খুব সহজ ব্যাপার। যেদিন শিকারের কাজ থাকে না সেদিন ভাল ভাল বই পড়ে সময় কাটাই। এখানে আমার সঙ্গী বলতে দ্য ওয়গেমন আর তার ভাই। ওরাই আমার এখন একমাত্র বন্ধু আর অবিরাম সহচর। এখানে

বরফ পড়তে শুরু করলেই আমরা চলে যাব এখান থেকে। এখান থেকে আমরা যাব ক্যান্নেতভে।

ওরগেমন আর তার ভাইকে দেখতে ঠিক দৈত্যের মত। ওদের দেহে নরম্যান রক্ত আছে। ওরা দু'জনেই খুব সাহসী।

একদিন ওরগেমনের ভাই বলল, বরফে চারদিক সাদা হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

এর দু'দিন পরেই আমরা একটা হান্টিং ওয়াগনে করে ক্যান্নেতভের পথে রওনা হই। পথে বরফ পড়তে থাকায় ভীষণ শীত করছিল। সারাটাদিন শেষ করে বেলা পাঁচটায় আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম।

মাষ্টার পিকত নামে এক চাষীর বাড়িতে আমরা উঠলাম। পিকত ছিল বেঁটেখাটো ধরনের শক্ত কাঠামোর এক মানুষ। মুখে হাসি সব সময় লেগেই আছে। কিন্তু হাসিখুশিতে ভর্তি থাকলেও মুখখানা দেখলেই বেশ চতুর মনে হয়।

আসলে বাড়ি মানে খামারবাড়ি। খামারটার মালিক হচ্ছে ওরগেমনরা, পিকত সেটা দেখাশোনা করে। আমি পনের বছর ধরে বছরে একবার প্রতি শরৎকালে যাই সেখানে আমার বন্ধু ওরেগমনদের সঙ্গে। আর শরৎকালে বনমুরগী শিকারের সময়টা এলেই পিকতের খামারে যেন উৎসবের ধুম লেগে যায়। খামারের মধ্যে সার দিয়ে লাগানো আপেল আর বীট গাছের মাঝে একটি পাকা বাড়ি। অদূরের সমুদ্র থেকে ছুটে আসা দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে সারা বছরই লড়াই করে যেতে হয় গাছগুলোকে।

রান্নাঘরের পাশে খাবার ঘরে খেতে গিয়ে দেখলাম পিকতের স্ত্রী খুব হিসেবী মেয়ে। শক্ত ও লম্বা চেহারার মাদাম পিকতের সব সময় সজাগ দৃষ্টি থাকে ঝি চাকরদের উপর।

পরদিন সকালে আমরা শিকারে বার হলাম। শীতের সকালে যখন নীল বাতাসে সোনারোদ কাঁপতে থাকে তখন আলোছায়ায় ভরা বনে গিয়ে শিকার করতে বড় ভাল লাগে। পিকত আমার সঙ্গে ছিল। আসলে আমরা নেকড়ে শিকারের জন্য তৈরী হয়েই বেরিয়েছিলাম। শুধু বনমুরগী শিকার করতে বার হলে বনমুরগী পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা বনমুরগী এসে যায়।

হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম বনের ধারে মাঠের এককোণে গার্গন বসে বসে ভেড়া চড়াচ্ছে আর কি একটা বুনছে। ওর বয়স খুব একটা বেশী না হলেও মুখে লম্বা দাড়ির জন্য ওকে বুড়ো বুড়ো দেখায়। ও কালা আর বোবা দুই-ই। ও বরাবরই ভেড়া চড়ায় এই খামারে। আর আশ্চর্য, ভেড়াগুলো ওকে এতই ভালবাসে যে ও কোন কথা না বললেও ওর প্রতিটি ইশারা যেন তারা বুঝতে পারে।

হঠাৎ পিকত ওর দিকে হাত বাড়িয়ে একসময় আমাকে বলল, জানেন, ওর স্ত্রীকে ও নিজের হাতে খুন করেছে।

আমি চমকে উঠলাম, তাই নাকি! ওই কালা-বোবা লোকটা খুন করেছে তার স্ত্রীকে!

পিকত বলল, হ্যাঁ, গত বছর শীতকালে। রুয়েনে মামলা চলল তার জন্য। অনেককরে ওকে ছাড়িয়ে এনেছি। সব বলব আপনাকে।

গার্গন হচ্ছে পিকতের বাবার আমলের লোক। পিকতের বাবা ওকে ভেড়া চড়াবার কাজ দেয়। ও জন্ম থেকেই বোবা-কালা। কিন্তু ভেড়া বা গরু চড়াবার কাজে ও নাকি খুব ভাল। ভেড়ার পাল থেকে একটি ভেড়া কোথাও পালিয়ে গেলেও তাকে খুঁজে বার করবেই। তার বাবার মৃত্যুর পর পিকত খামারের ভার নেয় যখন তখন গার্গনের বয়স তিরিশ। কিন্তু তার লম্বা দাড়িটা আর রোগা-রোগা লম্বাচেহারাটার জন্য চল্লিশ বছরের মত মনে হতো। এই সময় ঐ অঞ্চলে মাদাম মার্তেন নামে এক গরীব মহিলা তার পনের বছরের এক অনাথা মেয়েকে রেখে মারা যায়। মেয়েটা ঘুরতে ঘুরতে খামারে এসে জোটে। তবে ও নিয়মিত খামারের কাজটাজ করত না। ওর কোন শোবার জায়গা ছিল না বলে প্রায়ই ও খামারের খড়ের গাদার উপর যেখানে সেখানে যার তার কাছে শুয়ে থাকত। মেয়েটা ছিল আধপাগলা মত। মদের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক ছিল ওর। এক বোতল বা দু-এক পাত্র মদের জন্য ও যে কোন পাপ কাজ করতে পারত। যেকোন লোককে দেহদান করতে পারত অবলীলাক্রমে।

কিন্তু দেখা গেল ওই মেয়েটা বোবা-কালা গার্গনকে বেশী পছন্দ করছে। গার্গনকে ও কেন বেশী পছন্দ করতে লাগল এবং তার কাছে শুতে লাগল তা কেউ বলতে পারে না। গার্গনও মেয়েটাকে ভালবাসতে শুরু করল। ওরা এই খামারেই স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে থাকে। পরে চার্চে নিয়ে গিয়ে ওদের বিয়ে দেওয়া হয়। যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী।

বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটার স্বভাব বদলালো না। সেই মদ আর মদ। মদের ফোঁটা গলায় না পড়লে ওর যেন গলাটা শুকিয়ে যেত। তাই ওকে দেখলেই ছেলে বুড়ো সবাই 'মদের ফোঁটা' বলে চীৎকার করত। ওর অনুপস্থিতিতেও সবাই একজায়গায় জড়ো হলে ওর কথা আলোচনা করত।

গার্গন কিন্তু ওসব কিছু লক্ষ্য করত না। সে শুধু একমনে ভেড়া চড়াত। তার স্ত্রী মদের জন্য কার সঙ্গে কোথায় কি করছে সে সম্বন্ধে কোন ভাবনাই ছিল না ওর।

একদিন একটা ঘটনা ঘটল সাংঘাতিক রকমের। মেয়েটার দেহে নতুন যৌবনের জোয়ার দেখে নারীলোলুপ লোকগুলো প্রায়ই ঘুরঘুর করত তার চারদিকে। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মদের বোতল দেখিয়ে কোন-একটা নির্জন জায়গায় তাকে নিয়ে যেত। ইচ্ছামত তার দেহটা ভোগ করত। একদিন সামোভিলের একটা ছোকরা এসে একটা মদের বোতল দেখিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যায় একটা মিলের পিছনে। দিনের বেলা। কাছেই কোথাও ভেড়া চড়াচ্ছিল গার্গন। হঠাৎ চোখে পড়তেই ছুটে যায়। গার্গনকে দেখে ছোঁড়াটা পালিয়ে যায়। গার্গন তখন তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেয়েটার গলা টিপে ধরে। চীৎকার শুনে আশেপাশের জায়গা থেকে লোকজন

ছুটে আসার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। মেয়েটার জিবটা বেরিয়ে আসে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বার হতে থাকে।

পুলিশে ধরে নিয়ে যায় গার্গনকে। মামলা হয় রুয়েনের আদালতে। মামলার কাহিনী শুনতে শুনতে আদালত-ঘরের সব লোক হাসতে থাকে। কারো জেরা বা কথার কোন উত্তর দিত না গার্গন। একমাত্র আমার প্রশ্নের উত্তরে ও চোখে মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ওর মনের ভাবটা প্রকাশ করত। গার্গন কেন এবং কিভাবে তার স্ত্রীকে হত্যা করে পুরো কাহিনী সে আদ্যোপান্ত তার হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ করে। সেটা সত্যিই দেখার মত। ওর স্ত্রী সামান্য মদের জন্য কিভাবে একজন পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাও অকপটে বুঝিয়ে দিল। কারণ ওর মনে ত লজ্জা বা গোপনীয়তা বলে কোন জিনিস নেই। তারপর দেখাল কিভাবে ওর স্ত্রীর গলাটা টিপে ধরেছিল। ও এমনভাবে দেখাল, মনে হলো সত্যি সত্যিই ও যেন কাউকে গলা টিপে মারছে।

অবশেষে বেকসুর খালাস পেল গার্গন। আগের মতই ও কাজ করে যাচ্ছে। ওর মনে কোন বিকার নেই। এতবড় ঘটনাটা যেন ও একেবারে ভুলে গেছে অনায়াসে।

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে হুঁস ফিরে পেলাম। হয়ত বনমুরগীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

এবার বুঝতে পারছ বন্ধু, কিভাবে আমি বনমুরগীর সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছি, বুঝতে পারছ হয়ত কেন আমি এখন প্যারিসে ফিরছি না।

মন্ত্রশক্তি

Magnetism

সেদিন এক ডিনার পার্টিতে খাওয়ার পর মন্ত্রশক্তির অলৌকিকত্ব এবং এ বিষয়ে দোনাতোর কলাকৌশল আর চরকোতের অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। সে পার্টিতে যারা উপস্থিত ছিল তারা সকলেই সুধী ব্যক্তি, ধর্মে তাদের বিশ্বাস নেই। তবু তারা প্রত্যেকেই এমন এক একটা ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিল যা অবিশ্বাস্য এবং অলৌকিক মনে হলেও সত্য।

তাদের মধ্যে একজন যুবক সবচেয়ে বেশী নাস্তিক। সে কোন ঘটনার অলৌকিকতায় বিশ্বাস করত না। ধর্মকর্মে কোন মতিগতি ছিল না তার। তখনো সে বিয়ে করেনি, কিন্তু অবাধে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করত আর মাঝে মাঝে শিকার করে বেড়াত।

নাস্তিক যুবকটি সকলের কথা শুনে বলল, সব বাজে। মঁসিয়ে চারকোতের ওসব কথা এডগার এ্যালান পো-র গল্পের যত সব মনগড়া ঘটনার মতই বাজে। অনেক সময় মানুষ জটিল স্নায়বিক ক্রিয়াসঞ্জাত অনেক ঘটনার কারণ বুঝতে না পেরে যাজক পুরোহিতদের কাছে যায় আর তাদের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করে।

একজন বলল, প্রাচীনকালে সত্যি সত্যিই অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটত।

নাস্তিক বলল, আগে যদি ঘটত তবে এখন ঘটে না কেন?

তখন নাস্তিকের ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য একে একে অনেকে অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা বলল। বলল, আজও অলৌকিক ঘটনা অনেক ঘটে। মহাশূন্যে পরলোকগত আত্মায় আত্মায় কথা হয়। একজন গোপনে অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করে অন্যের উপর।

কিন্তু নাস্তিক অবিশ্বাসের সুরে বলল, সব বাজে কথা। অলৌকিক বলে কোন কিছু নেই। অবশেষে সে তার মুখ থেকে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, আমি দুটো ঘটনার কথা বলে তার কারণ ব্যাখ্যা করে দেব। আপাততঃ সে ঘটনা অবশ্য অলৌকিক মনে হবে। ঘটনা দুটো এই: এত্রিয়াতের গ্রামাঞ্চলে মৎসজীবী এক সম্প্রদায় বাস করে। তারা প্রতি বছর কড মাছ ধরতে যায় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে। একদিন নিশীথ রাতে এক জেলের ছেলে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, মা মা, বাবা জলে ডুবে গেল। এক মাস পরে সত্যি সত্যিই খবর পাওয়া গেল ঐ ছেলেটির বাবা সেইদিনই জলে ডুবে মারা যায়। এই কথাটা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা এটা অলৌকিক ঘটনা ভাবল।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন তখন বলল, কিন্তু তুমি কি করে ব্যাখ্যা করবে?

নাস্তিক তখন বলল, আমি এর রহস্য খুঁজে বার করেছি। আমি ঐ অঞ্চলের জেলেদের পরিবারে খোঁজ নিয়ে জেনেছি জেলেরা বাড়ি থেকে চলে গেলে তাদের স্ত্রী, ছেলে বা মারা প্রতিদিনই তাদের স্বপ্নে দেখে। শুভ অশুভ সব রকম স্বপ্নই দেখে। তাদের মধ্যে কিছু স্বপ্ন সত্যি হয়, কিছু হয় না। যে স্বপ্ন সত্যি হয় না সে স্বপ্নের কথা তারা শীঘ্রই ভুলে যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি স্বপ্নের কথা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে অকস্মাৎ মিলে যায় তার কথা মুখে মুখে অলৌকিক ঘটনা হিসাবে প্রচারিত হয়।

শ্রোতাদের মধ্যে আর একজন বলল, তোমার দ্বিতীয় ঘটনাটা বল এবার।

নাস্তিক বলল, হ্যাঁ বলছি। আমাদের সমাজে আমার সঙ্গে যে সব মেয়ের আলাপ আছে তাদের মধ্যে একজনকে আমি মোটেই দেখতে পারতাম না। সে দেখতে খুব-একটা খারাপ না হলেও তাকে দেখলে কোন কামনাই জাগত না আমার। একদিন রাত্রিতে শোবার কিছু আগে আমি আগুনের পাশে বসে কতকগুলো চিঠি লিখছিলাম। নির্জন চিন্তার সেই অলস অবকাশে কতকগুলো ছবি ভেসে উঠল আমার মনে। কলমটা আমার হাতেই স্থির হয়ে রইল। বুকের ভিতরটায় কেমন যেন শিহরণ খেলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো আমার একান্ত অবাঞ্ছিত সেই মেয়েটি হঠাৎ এসে হাজির হলো আমার সামনে। মনে হলো তার অনাবৃত দেহটা আমি স্পর্শ করছি। যার কথা একদিন মনে ভাবতেও ঘৃণা বোধ হতো আমার। যার মধ্যে কোন ভাল কিছু খুঁজে পাইনি, হঠাৎ মনে হলো সে যেন রূপগুণের খনি।

আমি উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নেও আবার তাকে দেখলাম। তারপর অবিরাম আদর আলিঙ্গন ও চুম্বনের নিবিড়তায় ও তীব্রতায় দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠল আমাদের সেই স্বপ্নঘটিত মিলন।

পরদিন সকালে উঠেও তার কথাই ভাবতে লাগলাম। আমি সোজা তার কাছে চলে গেলাম। সে তখনো বিছানায় শুয়ে ছিল। তাকে উঠিয়ে সব কথা বললাম। আমার কেবলি মনে হতে লাগল গত রাত্রিতে সত্যি সত্যিই আমি মিলিত হয়েছিলাম তার সঙ্গে। মনে হলো তার চুম্বনরসে এখনো সিক্ত হয়ে রয়েছে আমার ওষ্ঠাধর। আমার হাতের প্রতিটি আঙ্গুলে এখনো লেগে রয়েছে তার স্পর্শনের শিহরণ। তার দেহভোগের এক অনাস্বাদিতপূর্ব আস্বাদ এখনো সজীব হয়ে রয়েছে আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পরতে পরতে।

সেও যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই সে উঠে বসল বিছানায়। আমি তাকে সব কথা বলতে বলতেই তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগলাম পাগলের মত।

এরপর হতে পুরো দুটি বছর আমি মেয়েটিকে নিয়ে একসঙ্গে বাস করি।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলল, এর থেকে কি সিদ্ধান্তে তুমি এলে ?

আমার মনে হয় অনেক সময় আমরা সচেতন মনে যে বস্তু বা ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করি তার প্রতি একটা গোপন আসক্তি বা আগ্রহ আমাদের মনের কোণে কোথায় যেন রয়ে যায়। সেই আসক্তি বা আগ্রহই স্মৃতি হয়ে কোন অসতর্ক মুহূর্তে অবচেতনার সিঁড়ি বেয়ে আমাদের মনের উপর উঠে আসে। সেই সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে জীবন্তরূপে উপস্থাপিত করে আমাদের সামনে।

গল্প শেষ হলে শ্রোতাদের একজন নাস্তিককে বলল, এর পরেও যদি অলৌকিকে বিশ্বাস না করো তাহলে বলব তুমি অকৃতজ্ঞ।

বহুরূপে

In various roles

আমার যে সব পূর্বস্মৃতিগুলি আমি বর্ণনা করব তার মধ্যে এমন একটি নারীর কথা বারবার এসে পড়বে যে ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত এ দেশের পুলিশবাহিনীর ইতিহাসে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। তার নাম হলো ওয়ান্দা ভন শেবার্ত। তার বয়স যখন মাত্র ষোল তখন সে প্রেমে পড়ে তার ইচ্ছামত একজন অফিসারকে বিয়ে করে।

কিন্তু দুটি বছর যেতে না যেতেই ওয়ান্দার স্বামী মারা যায়। ওয়ান্দার মত বিলাসপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় মহিলা দেখাই যায় না। বিলাসব্যসন ও আমোদ আহ্লাদ ছাড়া একমুহূর্তও

থাকতে পারত না। আর একটা দোষ ছিল ওয়ান্দার, সে আবার একজায়গায় খুব একটা বেশীদিন থাকতে পারে না।

তার স্বামীর মৃত্যুর দু'-চার দিনের মধ্যেই আবার একজনের প্রেমে পড়ে ওয়ান্দা। তখনও স্বামীর শোকপালনপর্ব শেষ হয়নি। আগের মতই তেমনি বিলাসবহুল উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে লাগল। হঠাৎ ওয়ান্দা তার নতুন প্রেমিককে নিয়ে কোথায় চলে গেল। বোধহয় তারা গিয়েছিল ইতালি। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তাদের সম্পর্ক। দু'বছর পার হতেই উত্তর ইতালির একটা শহরে তাকে ফেলে রেখে তার প্রেমিক পালিয়ে যায়।

ওয়ান্দা তখন সত্যিই খুব বিপদে পড়ে। হাতে বিশেষ টাকাপয়সা ছিল না। জীবিকা অর্জনের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু চতুর ওয়ান্দা এবার প্রেমিকের পরিবর্তে একটা কাজ যোগাড় করে নেয়। সেখানকার পুলিশের গোপন সংবাদ সংগ্রহ বিভাগে চাকরি নেয় সুন্দরী ওয়ান্দা এবং অল্পদিনের মধ্যেই পুলিশের উঁচু মহলে বেশ মর্যাদার আসন পেয়ে যায়। তার কারণও ছিল। ওয়ান্দা শুধু যে দেখতে সুন্দরী ছিল এবং তার সুন্দর চোখের মায়ার দ্বারা যেকোন মানুষকে অল্প সময়ের মধ্যে মোহগ্রস্ত করে ফেলতে পারত তা নয়, সে পোল, ফরাসী, জার্মান, ইংরাজি, ইতালীয়, রুশীয় প্রভৃতি ছয় রকম ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে পারত। তার আর একটা গুণ ছিল। সে যেকোন জায়গায় থাকতে পারত, যেকোন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারত। এবং দরকার হলে যেকোন মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যেতে পারত।

একবার ওয়ান্দা যখন জেনেভার কাছে লেকের ধারে ভিভে নামক এক জায়গায় কিছুদিনের জন্য বাস করছিল তখন একদিন হোটেলে হঠাৎ ডন এসকোভেদো নামে ব্রাজিলদেশীয় এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়। যুবকটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান্দার মনে হলো অত সুন্দর মানুষ সে যেন জীবনে কখনো কোথাও দেখেনি। লম্বা সুগঠিত চেহারা, ঘন কোঁকড়ানো কালো চুল, টানা টানা কালো চোখ, ফর্সা ধবধবে গায়ের রং। একই সঙ্গে এত সূক্ষ্মতা, সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতার সমন্বয় কোন পুরুষের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

প্রথম আলাপের দিনই তাকে আপন করে নিল ওয়ান্দা। পরদিন দু'জনে পরস্পরের প্রেমের গভীরে ডুবে গেল নিঃশেষে।

কিন্তু ক্রমশই একটা সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল ওয়ান্দার মনে। এসকোভেদো কিছুই করে না। তার আয়ের উৎস কোথায় তার কিছুই বুঝতে পারল না, একসঙ্গে বেশকিছুদিন থেকেও। পর পর দু'বার এসকোভেদো তার কাছে টাকা ধার করতে সে সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।

তারপর হঠাৎ একদিন ওয়ান্দাকে একা ফেলে এক বয়স্কা ধনী মহিলাকে নিয়ে কোথায় চলে গেল এসকোভেদো তার আর কোন খবর পায়নি ওয়ান্দা। বছরখানেক

পর লুক্কাতে ওয়ান্দা রোগা-রোগা চেহারার এক ইংরেজ মহিলার হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতে দেখে এসকোভেদোকে ।

তার প্রেমিককে ওয়ান্দা চিনতে পারলেন কিন্তু ওয়ান্দাকে চিনেও চিনল না তার ভূতপূর্ব প্রেমিক। দু'-চারদিন পর ওয়ান্দা স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানতে পারল সেখানে এসকোভেদো অন্য নামে পরিচিত। লুক্কাতে তার নাম হলো রোমানেসকো।

একদিন ওয়ান্দা সমুদ্রস্নানের জন্যে হেগোলোল্যাণ্ড নামে একটি দ্বীপে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে একটি হোটেলে একজন রুশমহিলার সঙ্গে বসে গল্প করতে দেখে এসকোভেদোকে। তার চেহারাটা আগের মত ঠিকই আছে। তবে মাথার চুলগুলো একটু পাতলা হয়ে গেছে। ওয়ান্দা বলল, আপনার মাথার চুলগুলো আগে খুব ভাল ছিল।

এসকোভেদো তাকে না দেখার ভান করে বলল, তাই নাকি? কিন্তু আপনি হয়ত আমাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করছেন। আপনি কার কথা বলছেন?

ওয়ান্দা বলল, ডন এসকোভেদোর কথা।

এসকোভেদো বলল, মাফ করবেন, আমার নাম কাউণ্ট দেমবিৎস্কি। আমার বাড়ি থানকিমিয়া।

ওয়ান্দা অবাক হয়ে বলল, তা হবে হয়ত।

বছরখানেক পর ওয়ান্দা এসকোভেদোকে আবার দেখল ভিয়েনার কাছে বেভেন নামে এক জায়গায়। সেখানে ওয়ান্দা দেখল এসকোভেদো এক গ্রীক রাজকুমার হিসাবে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। তার নতুন নাম হলো এ্যানাস্তেমিও মরোকরদাতোস। ওয়ান্দা দেখল তার চুলগুলো তেমনি কালো আছে। তবে মুখে দাড়ি রেখেছে।

এবার ওয়ান্দাকে দেখে তার পরিচয় আর গোপন করল না এসকোভেদো। ওয়ান্দা ঠাট্টা করে বলল, এরপর কি কোন নিগ্রো রাজা সাজবে?

এবার ওয়ান্দার কাছে আত্মসমর্পণ করল এসকোভেদো। কাতরভাবে অনুরোধ করল ওয়ান্দাকে সে যেন কাউকে তার আসল পরিচয় না দেয়।

এসকোভেদো তখন অস্ট্রিয়ার এক কাউণ্টের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছিল। মেয়েটি তখন এক স্থানীয় অফিসারকে ভালবাসত। কিন্তু এই সুদর্শন গ্রীক রাজকুমারকে পেয়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

সেই অফিসারের সঙ্গে ঘটনাক্রমে ওয়ান্দার আলাপ হতেই ওয়ান্দা তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এদিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কাউণ্টকন্যার প্রেমের জন্য বিরোধ দেখা দেয় এবং একদিন ডুয়েল লড়ার ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু সে ডুয়েল আর লড়তে হয়নি। তার আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এসকোভেদো। কাউণ্টকন্যা তার প্রেমিকের কাছেই ফিরে আসে।

শয়তান কাউণ্টপত্নী

Countess Satan

ওদের মধ্যে তর্ক হচ্ছিল নানা বিষয়ে। ডিনামাইট, সমাজবিপ্লব, শূন্যতাবাদ প্রভৃতি কত বিষয় ওদের তর্কের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে পড়ছিল।

ওদের মধ্যে একজন ভাল বক্তা ছিল। সে যেকোন ঘটনা সুন্দরভাবে বলতে পারত। সে বলল, তোমরা যাই বল, শূন্যতাবাদী বাকুনিনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যেভাবে হয় তার কথা বললে সেটা অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হবে। তবে শোন ব্যাপারটা।

কাউণ্টপত্নী নিকোসার সঙ্গে আলাপ হয় নেপলস্ শহরে। নিকোসা ছিল রুশ দেশের মেয়ে। তার চেহারাটা রোগা-রোগা হলেও হাড়গুলো খুব শক্ত ছিল। তার চোয়ালগুলো ছিল উঁচু উঁচু। তার কথা বলার ভঙ্গিমাটি ছিল বড় চমৎকার।

দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক পণ্ডিতের মত অনেক বড় বড় কথা বলত নিকোসা। কিন্তু মনটা ছিল বড় দূষিত আর তার মতবাদ ছিল উগ্র আর ধ্বংসাত্মক। সে কারো কোন ভাল দেখতে পারত না। সে শুধু জীবনের অনিত্যতা, হতাশা আর ধ্বংসের তত্ত্বে বিশ্বাস করত।

আমি তাকে খুশি করে হাত করার জন্যে প্রায়ই বলতাম, আমিও লেখক হিসাবে তোমার কথাই লিখে বইগুলোতে যে কথার বিষ ছড়াই সেই কথা অনুসারেই অনেকে চলে।

নিকোসাই একদিন আমাকে বলে বাকুনিনের কথা। বাকুনিন জীবনে যে সব দুঃসাহসিক কাজ করেন, মৃত্যুদণ্ডকে এড়িয়ে প্রাগ, ড্রেসডেন প্রভৃতি এক দেশ হতে অন্য দেশে কিভাবে তিনি ঘুরে বেড়ান এবং বর্তমানে তিনি লণ্ডনে থেকে কেমন করে শূন্যতাবাদের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তার একটা ফিরিস্তি দেয় নিকোসা আমাকে। নিকোসার মতে বাকুনিনই একমাত্র জগতে আদর্শ পুরুষ। আর আমিও যদি তার মত বাকুনিনকে আদর্শ পুরুষ বলে মেনে নিতে পারি তাহলেই সে আমাকে গ্রহণ করতে পারে। তার প্রতি আমার আসক্তি দেখে সে একদিন আমায় স্পষ্ট জানিয়ে দিল, মনে-প্রাণে বাকুনিন হও, তাহলেই আমাকে পাবে।

লণ্ডনে বাকুনিনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন রওনা হলাম দু'জনে। পিমনিকো অঞ্চলে একটা ছোট্ট একতলা বাড়িতে থাকতেন বাকুনিন। বাড়িটির সামনে ছিল ছোট্ট একফালি বাগান। আমরা দু'জনে গিয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি তাঁকে জীবনে কখনো দেখিনি।

অবশেষে তিনি এসে গেলেন। শূন্যতাবাদী দর্শনের আপোষহীন প্রবক্তা ও বর্তমান মানবজাতির ত্রাণকর্তা বাকুনিনের চেহারাটা সত্যিই দেখার মত। মনে হলো তাঁর গায়ে

বোধ হয় এ্যাটিলা, চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুর লঙের রক্ত আছে। মোটা চেহারা, হাঁড়ির মত বড় মুখ। চোখদুটো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মনে হলো ঈশ্বরবিশ্বাসী কোন আর্যজাতি হতে জন্ম হয়নি বাকুনিনের। নাস্তিক কোন যাযাবর দলই হলো তাঁর পূর্বপুরুষ।

শূন্যতাবাদের ধারণাটা কিন্তু বাকুনিনের নিজস্ব নয়। এটা তিনি পেয়েছেন তুর্গেনিভের কাছ থেকে। তিনি শুধু সে ধারণাকে রূপ দিতে চলেছেন বীরের মত। তিনি হার্জেনের কাছ থেকে কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ ও পউগাৎশেভের কাছ থেকে ধ্বংসাত্মক বিপ্লববাদের দুটো আদর্শও বার করেছেন। হার্জেন চেয়েছিলেন শ্ল্যাভ কৃষকদের উন্নতি আর পউগাৎশেভ চেয়েছিলেন পথের সব কাঁটা বিপ্লবের মাধ্যমে সরিয়ে নিজে সম্রাট হতে। কিন্তু বাকুনিন চেয়েছিলেন সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে ভাঙ্গতে। শুধু সব ভাঙ্গার কথা, গড়ার কথা তাঁর মুখে বা মনে নেই।

বাকুনিনের সঙ্গে দেখা করে আসার পর নিকোসা কেমন যেন ঝিমিয়ে গেল। তার প্রতি আমার আসক্তিও কমে গেল। একটা প্রদীপ থেকে কোন অগ্নিকাণ্ড হলে যেমন সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশে সেই প্রদীপটি নিষ্প্রভ লাগে তেমনি বাকুনিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নিকোসাকে কেমন যেন নিস্তেজ এবং নিষ্প্রাণ মনে হলো আমার। আগুন জ্বেলে উঠলে যেমন আর প্রদীপের কোন প্রয়োজন থাকে না তেমনি বাকুনিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নিকোসার প্রতি আর কোন উৎসাহ রইল না আমার। তার সব প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে গেল আমার কাছে।

আমি একদিন তাকে ফেলে চলে গেলাম।

দরকারী বাড়ি

A useful house

উপস্থিত বন্ধুদের একটা গল্প শোনাতে গিয়ে গল্পের কথাটা মনে করে নিজেই হাসতে লাগল রোয়ামঁত। হাসির ঝোঁকে দুলে দুলে উঠতে লাগল তার মোটা দেহটা।

রোয়ামঁত বলল, আজ আমি তোমাদের এক মজার কথা বলব। বলব কিভাবে একটা বোকা বুদ্ধি খাটিয়ে, ফন্দী করে তার বন্ধুর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে পাওনাদারদের হাত হতে রেহাই পায়।

তার এক বন্ধু বলল, ওসব ভূমিকা বাদ দাও। আসল গল্পটা বল।

রোয়ামঁত বলল, বলছি। যে বর্দেলেভের হাতে একটা পয়সা ছিল না সে আবার একটা বই প্রকাশ করতে যাচ্ছিল। বইটা তারই জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা আর বদেভিলের এক নামকরা লেখক তার ভূমিকা লিখতে রাজী হয়েছিলেন। এই বর্দেলেভ আর কুইলানেতের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। দুই বন্ধুতে এমন মিল

যেন দেখাই যায় না। অথচ দুই বন্ধুর আর্থিক অবস্থার মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ। কারণ বর্দেলেভ ধনী ঘরের ছেলে হলেও তার বিষয় সম্পত্তি সব দেনার দায়ে বন্ধক আছে। তার নিজের বলতে কিছুই নেই। অথচ তার বন্ধু কুলানেত ছিল প্রচুর ধনী। তার বাৎসরিক আয় ছিল আট লক্ষ ফ্রাঁ। সে আবার সামরিক বিভাগে কণ্ট্রাক্টারি নিয়েও প্রচুর টাকা রোজগার করে।

কুইলানেত ছিল কেমন যেন গম্ভীর প্রকৃতির লোক। একেবারে যাকে বলে নীরস। কিন্তু বর্দেলেভ ছিল ঠিক তার উল্টো। সে যতক্ষণ তার বন্ধু কুইলানেতের কাছে থাকত ততক্ষণ হাসিখুশিতে মাতিয়ে তুলত তাকে। এজন্য কুইলানেতও মনে মনে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিল তার বন্ধুর প্রতি। বর্দেলেভের মত না নিয়ে কিছু করত না কুইলানেত। কখন কোন্ মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করবে কুইলানেত, কোন্ মেয়ের সঙ্গে তার রুচি ও স্বভাবের খাপ খাবে তা বলে দিত বর্দেলেভ। বর্দেলেভ ছিল তার এমনই অন্তরঙ্গ আর বিশ্বস্ত।

এই কুইলানেত গত বছর বিয়ে করে। প্যারিসের এক নামকরা সুন্দরী সুজেত্তে মার্লিকে অবশেষে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে কুইলানেত। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাড়ি ভাড়া করে বন্ধুদের পরামর্শে। বাড়িটার সামনে উঠোন, পিছনে বাগান। নিরিবিলি বাড়িটা নববিবাহিত দম্পতিদের প্রেমচর্চার পক্ষে চমৎকার।

বাড়িটার উপরতলায় থাকত কুইলানেত আর তার স্ত্রী আর নিচের তলায় থাকত বর্দেলেভ একা।

একবার তার একতলার বাসায় এক ভোজসভার আয়োজন করে বর্দেলেভ। তাতে তার বন্ধু কুইলানেত ও তার স্ত্রী ছাড়াও আরো অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। খাওয়ার পর মদ্যপান করতে করতে অতিথিরা যখন আপন আপন স্ত্রী বা প্রণয়িনীকে কোলে বসিয়ে ফূর্তি করছে তখন বর্দেলেভ একা একা বসে একটা সিগারেট খাচ্ছিল। এমন সময় চাকর এসে বর্দেলেভকে বলল, একজন ভদ্রলোক বাইরের ঘরে আপনাকে ডাকছেন।

বর্দেলেভ রেগে বলল, বলগে এখন দেখা হবে না।

চাকর বলল, উনি জোর করছেন দেখা করার জন্য। বলছেন আপনি দেখা না করলে পুলিশ ডাকবেন।

ব্যাপার বুঝে বর্দেলেভ বাইরের ঘরে গিয়ে দেখেন একজন ভদ্রলোক তার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। তাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, এই দেখুন, এই চুক্তিপত্রে আপনি সই করেছিলেন। এ সই কি আপনার?

বর্দেলেভ বলল, হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু আপনি টাকা দেননি। আপনি যদি এখনি সব টাকা না দেন আমার হাতে তাহলে এই বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র নিয়ে যাব আমি। আদালতের দু'জন লোক বাইরে অপেক্ষা করছেন।

আসলে বাড়িটা তারই, কুইলানেতকে সে ভাড়া দেয়। কোন উপায় না দেখে কুইলানেতকে ডেকে সব কথা বলে বর্দেলেভ। তার যতসব সুন্দর সুন্দর ছবি, সৌখিন আসবাবপত্র, তার স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের চোখের সামনে দিয়ে সব টেনে নিয়ে যাবে এ কথা ভেবে বাধ্য হয়ে সব টাকা মিটিয়ে দিল কুইলানেত।

এইভাবে সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল বর্দেলেভ।

দুটি তরুণ সৈনিক

Two little soldiers

প্রতি রবিবার তারা এখানে আসত। ওদের ব্যারাকবাড়ি থেকে বার হয়ে শহরের শেষ প্রান্তে সেন নদীর সেতু পার হয়ে একটা মাঠ অতিক্রম করে অবশেষে বনের ধারে এই জায়গাটায় বসত ওরা। খাদ্য ও পানীয় যা সঙ্গে করে নিয়ে আসত তাই ওরা খেত এইখানে বসে।

ব্রেঁতো থেকে আসা এই দুই সৈনিক যখন শহরটাকে ছাড়িয়ে নদী পার হয়ে মেঠো পথে হাঁটতে শুরু করত তখন তাদের নিজেদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত বাড়ির কথা।

সেন নদীর সেতুটা পার হয়ে একটা দোকান থেকে ওরা কিছু রুটি আর মদ কিনত। তারপর আবার পাশাপাশি পথ চলতে শুরু করত ওরা। সবুজ ফসলে ভরা মাঠটার ভিতর দিয়ে পথ চলতে চলতে চোখ জুড়িয়ে যেত ওদের। জাঁ কার্নেদেন একসময় তার বন্ধু লুক লে গ্যানিদেককে বলত, দেখ দেখ, ঠিক আমাদের গাঁ প্লাউনিদনের মত দেখতে লাগছে।

দূর সমুদ্র থেকে ছুটেআসা লবণাক্ত বাতাস যখন কচি সবুজ ফসলগুলোকে দুলিয়ে দিত মাঠে তখন ওদের শৈশবের অনেক ঘটনার ঝাপসা স্মৃতি ভিড় করে আসত ওদের মনে। তারপর ধীরে ধীরে সেই মাঠটা পার হয়ে ওরা একটা বনের ধারে এসে একটা গাছের তলায় বসত।

আর ঠিক সেই সময়ে গরু চড়াতে আসত একটি তরুণী চাষী মেয়ে। হৃষ্টপুষ্ট দেহ আর সরল মন দেখে তাদের গাঁয়ের চাষী ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে যেত।

মেয়েটির হাতে থাকত একটি টিনের কৌটো। তাতে করে একটা গাই দুইয়ে সে দুধ এনে ওদের দু'জনকে খেতে বলত। তার থেকে লুক অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা বন্ধু জাঁকে দিত।

এক-একদিন ওদের খাওয়া শেষ হলে মেয়েটি আসত। আবার এক-এক-দিন খাওয়ার আগে। খাওয়ার আগে এলে তাকেও কিছু ভাগ দিত ওদের খাবার থেকে।

মেয়েটি এসে সেই গাছের তলায় ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে ওদের কাছে বসত, কত সুখ দুঃখের গল্প বলত।

প্রতি রবিবারই নিয়মিত ওরা সেখানে যেত। এক রবিবার যাবার সময় মেয়েটার জন্য কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যাবার কথা ভাবল ওরা। অনেক ভেবে ওরা কিছু লজেন্স কিনে নিয়ে গেল।

ওরা সেই গাছের তলায় গিয়ে প্রাতরাশ সারল। মেয়েটি তখনো না এলেও তার জন্য কিছু রুটি ও মদ রেখে দিল। তারপর জাঁ তাকে দূরে দেখতে পেয়ে বলল, ঐ আসছে। মেয়েটির সঙ্গে গরুর পাল থাকত না। মাত্র একটি গরু নিয়ে চড়াতে আসত।

তাদের কাছে এসেই মেয়েটি তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ সব?

ওরা বলল, ভাল। তুমি কেমন আছ?

লুক বলল, আমরা তোমার জন্য দেখ কি এনেছি।

মেয়েটি পরম আনন্দে তাদের দেওয়া লজেন্স এ গাল ও গাল করে চুষতে লাগল।

রবিবার ছাড়া ওরা কোথাও যেত না অবসর সময়ে। দু'জনে সঙ্গছাড়া হতো না কখনো। কিন্তু কোন এক বৃহস্পতিবার দুপুরে খাওয়ার পর লুক তার বন্ধু জাঁর কাছে কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরে যাবার অনুমতি চাইল। ঠিক পরের বৃহস্পতিবারও তাই করল। লুক একা একা কোথায় যায় কি করে তার কিছুই বুঝতে পারল না জাঁ। মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও পারত না। কারণ তার মনে হলো ব্যাপারটা যখন লুক গোপন রাখতে চাইছে তখন সেটাকে খুঁচিয়ে বার করে লাভ হবে না।

তারপর রবিবার আসতে যথারীতি ওরা সেখানে গেল। কিন্তু সেদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করল জাঁ। মেয়েটি এসে তার দিকে না তাকিয়ে সোজা লুকের দিকে এগিয়ে গেল এবং তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগল।

জাঁ আশ্চর্য হয়ে গেল। মেয়েটি তাকে দেখেও দেখল না। তারপর তারা দু'জনেই বনের ভিতরে চলে গেল। তাদের পিছনে যতদূর সম্ভব বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল জাঁ। ওরা গাছপাতার আড়ালে চলে গেল, হারিয়ে গেল কোথায়, আর কিছুই বুঝতে পারল না জাঁ। অনেকক্ষণ পরে ওরা ফিরে এল। তারপর কিছুক্ষণ বসে থেকে মেয়েটি জাঁর পানে তাকিয়ে শুধু একটু মুচকি হেসে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাবার পরও ওরা দু'জনে বসে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু কোন কথা হলো না। জাঁ এবার সব কিছু জলের মত বুঝতে পারল। ওরা কোন কথা না বললেও ওদের মুখের উপর ওদের মনের যত সব কথা যেন লেখা ছিল।

অবশেষে উঠে পড়ল ওরা। মন্থর গতিতে এগিয়ে যেতে লাগল ব্যারাকের দিকে। কিন্তু ওরা দু'জনেই যেন অন্য মানুষ। সেন নদীর সেতুর উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল জাঁ। সে কি ভাবছিল। রেলিংএর উপর ঝুঁকে নদীর প্রবহমান জলধারার পানে তাকিয়ে সে যেন কি দেখছিল। দেখছিল একদৃষ্টিতে অন্যমনস্কভাবে। কিন্তু লুকের সাহস হলো না সে অত কি দেখছে বা ভাবছে সেকথা একবার জিজ্ঞাসা করতে।

রেলিংএর উপর ঝুঁকতে ঝুঁকতে জাঁর মাথাটা অনেক নিচু হয়ে পড়ল। তবু ও যেন তাকিয়ে আছে জলের পানে। কি যেন দেখছে। দেখার যেন শেষ নেই।

হঠাৎ একটা ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল জাঁ। তার পাদুটো উপরে উঠে গেল। আর কিছু দেখতে পেল না লুক। নদীর জলস্রোতের মধ্যে জাঁর দেহটা তলিয়ে গিয়ে একবার উঠে পড়ল জলের উপরে। একবার দেখা দিয়েই আবার ডুবে গেল।

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে এই কথাটা অতি কষ্টে ব্যারাকের সহকর্মীদের কাছে ব্যক্ত করল লুক।

প্রেত

Ghosts

একদিন এক যুবক থানায় এসে পুলিশ ডিরেক্টরের কাছে সাহায্য চাইল একটি বিষয়ে। সে বলল, আমাকে আমার বাবা তাঁর সম্পত্তির অধিকার হতে বিচ্যুত করছেন। যদিও আমি দেশের প্রচলিত কোন আইন ভঙ্গ করিনি, আমি তাঁর প্রতি কোন অন্যায় বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজ করিনি, তথাপি তিনি উইল করে তাঁর সব সম্পত্তি চার্চকে দিয়ে যাচ্ছেন। আমার একমাত্র দোষ ক্যাথলিক চার্চ আর তার যাজকদের রীতিনীতি আমার ভাল লাগে না।

আমার এই দোষের জন্য আমার বাবা আমাকে নাস্তিক বলেন এবং তাঁর সব সম্পত্তি জেসুট ফাদারদের দিয়ে যাচ্ছেন। আমার যতদূর মনে হয় এ ব্যাপারে চার্চের পুরোহিতরা আমার বিরুদ্ধে বাবাকে উত্তেজিত করছে। বছরখানেক আগেও আমার বাবার সঙ্গে আমার সদ্ভাব ছিল। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। কিন্তু পুরোহিতদের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে মেলামেশা করতে শুরু করার পর থেকে আমার উপর বিরূপ হয়ে পড়েছেন আমার বাবা।

পুলিশ অফিসার বললেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমি কি করতে পারি বলুন। আপনার পিতা মনের দিক থেকে সুস্থ আছেন। তাঁর সম্পত্তি ইচ্ছামত কোন ব্যক্তিকে দান করার অধিকার তাঁর আছে।

যুবকটি তখন বলল, তাহলেও আপনারা আমায় অবশ্যই সাহায্য করতে পারেন। কারণ চার্চের যাজকরা আমার বিরুদ্ধে এক চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। গতকাল আমি যখন বাবার কাছে তাঁর উইলের প্রতিবাদ করি তখন তিনি বলেন আমার মার প্রেতাত্মা নাকি তাঁর সামনে এসে তাঁকে বলেছে আমার মত নাস্তিক সন্তানকে সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত না করলে তাঁর মুক্তি হবে না। সেই ভয়ে আমার বাবা নাকি এ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভূত প্রেতে মোটেই বিশ্বাস করি না।

পুলিশ অফিসার বললেন, আমিও না। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণ না পেলে আমরা এগোতে চাই না এ কাজে। আপনি জানেন চার্চের ক্ষমতা কত বেশী। কোন চার্চের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে গিয়ে আমি যদি ব্যর্থ হই অর্থাৎ অপরাধযোগ্য কোন কাজের প্রমাণ না পাই তাহলে আমারও চাকরি যাবে। তাই বলি, আপনি এ ব্যাপারে আরো কিছুটা এগিয়ে কোন অকাট্য তথ্য ও প্রমাণ হাতে নিয়ে আমার কাছে আসবেন। আমি অবশ্যই সাহায্য করব।

এক মাস যুবকটির দেখা পাওয়া গেল না। এক মাস পর সে থানায় এসে অফিসারকে বলল, আমি প্রমাণ পেয়েছি। আমাদের বাড়ির এক পুরনো চাকর আমাকে খুব ভালবাসে। সেই প্রথমে আমাকে বাবার গোপন উইলের কথা জানায়। পরে আমি জানতে পারি বাবা পুরোহিতের সঙ্গে আমাদের গাঁয়ের কবরখানায় আমার মার কবরের কাছে এক একদিন গভীর রাতে যান। সেখানে কার প্রেতাত্মার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। আমার মার ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। মৃত্যুর পর মাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। আমি খবর নিয়ে জেনেছি আমার বাবা আজ রাতেই আবার চার্চের যাজকের সঙ্গে সেখানে যাবেন।

অতএব এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আপনাকেও সেই রহস্য ও চক্রান্তের কথা ফাঁস করতে হবে।

অফিসার বললেন, আজ আমি যাব। কারণ আজ আপনার কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আপনি সন্ধে আটটা বাজলেই তৈরি হয়ে আমার অফিসে চলে আসবেন। কাউকে কোন কথা বলবেন না।

রাত্রি ঠিক এগারোটার সময় ওরা চারজন একটি ঢাকা গাড়িতে করে রওনা হলো সেই গাঁয়ের দিকে। ওরা মানে অফিসার বা পুলিশ ডিরেক্টর, যুবকটি, একজন পুলিশ সার্জেন্ট আর একজন কনস্টেবল।

কবরখানায় যখন ওরা পৌঁছল তখন ঘড়িতে বাজে রাত্রি এগারোটা। অন্ধকার রাত। যুবকটি কোনরকমে তার মার কবরটা কোথায় দেখিয়ে দিল। কবরখানার ভিতরে যে প্রার্থনা-ঘর ছিল সেই ঘরের ভিতরে এক কোণে অফিসার আর যুবকটি লুকিয়ে রইল। বাকি দু'জন পুলিশ একটা খালের মধ্যে বসে রইল লুকিয়ে।

সাড়ে এগারোটা বাজতেই যুবকটির বাবা আর চার্চের যাজক একটা লণ্ঠন হাতে এসে প্রার্থনার ঘরে গিয়ে প্রথমে মৃতের জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনা করল। তারপর কবরখানায় গিয়ে যুবকটির মার কবরটাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। তিনবার পবিত্র ধর্মীয় জল ছিটিয়ে যাজক কিছুটা দূরে গিয়ে বসে তিনবার কি একটা উচ্চারণ করল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেই কবরটার উপর ধোঁয়া উঠছে। তারপরেই এক প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হলো সেখানে। যাজক চীৎকার করে বলল, তোমার নাম কি ?

প্রেতমূর্তি বলল, জীবিতকালে আমার নাম ছিল এ্যানা মেরিয়া।

যাজক বলল, তুমি এখনো পার্গেটারি বা পরিশুদ্ধি রাজ্য থেকে মুক্তি পাওনি ?

প্রেতমূর্তি বলল, না, আমার নাস্তিক পুত্র শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তি পাব না।

যাজক বলল, কিন্তু সে ত শাস্তি পেয়েছে। তোমার পুত্রকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন তোমার স্বামী।

প্রেতমূর্তি বলল, এটা যথেষ্ট নয়। সেই উইল আদালতে জমা দিতে হবে আর পুত্রকে ঘর থেকে তাড়াতে হবে।

যাজক বলল, কিন্তু তা কিরূপে সম্ভব ?

এ কথার কোন উত্তর দেবার আগেই পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল। আর সেই প্রেতমূর্তি চীৎকার করে উঠল। পুলিশ ডিরেক্টর নিজে গিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেললেন। অন্যান্য পুলিশরা ছুটে এল। যাজককে তাদের বিভাগীয় বিচারের অধীনে রাখা হলো। যুবকটির বাবা সেদিন থেকে ক্যাথলিক চার্চের উপর হতে সব বিশ্বাস হারিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে যান। তিনি সব ভুল বুঝতে পারেন এবং তাঁর ছেলের কাছে ক্ষমা চান।

এক অভিনব সংবেদন

A strange sensation

মাদাম দ্য অরমন্দের মাথায় যেন ঠিক একটা শয়তান বাস করত। কত যে অদ্ভুত খেয়াল খুশি সব সময় কিলবিল করত তার মাথায় তার কিছু ঠিক ছিল না। সে যে কিসে খুশি হয় আর কিসে অখুশি হয় তা কেউ বুঝে উঠত না।

মাদাম অরমন্দের গড়নটা বেশ ছিপছিপে ধরনের। একটা সূক্ষ্মমেদুর সৌন্দর্যের ঢেউ খেলে যেত তার সারা দেহে। তার রোগা-রোগা সুন্দর হাতের আঙুলগুলোতে সব সময়ে একটা সুগন্ধি লেগে থাকত। অনেকে সে আঙুল চুম্বন করার জন্য পাগল হয়ে উঠত। তার মাথার চুলগুলোর রং ছিল সোনালী আর তা ছিল রেশমের মত নরম। হাসার সময় যখন তার ছোট মুখটা খুলত অরমন্দে তখন মনে হত সকালের আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে প্রসন্ন সূর্যালোক।

কোন একটা বিশেষ বস্তুতে যদি প্রীত হত মাদাম অরমন্দে তাহলে তাকে তুষ্ট করা বা খুশি করা সহজ হত অনেকের পক্ষে। কিন্তু অরমন্দের মনের আসল ঠিকানা আজও কেউ খুঁজে পায়নি। কেউ ঠিক ধরতে পারেনি সে কি পেলে সন্তুষ্ট হয়, তৃপ্ত হয়। আর একথাটা জানতে না পারার জন্যই হয়ত তার ভক্তের দল বেড়ে যেত। যে সব শক্ত ধাতের পুরুষ মেয়েদের কাছে কখনো ধরা দেয় না বলে বড়াই করে বেড়াত; তারাও মাদাম অরমন্দেকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করত।

কিন্তু সে চেষ্টার দিক থেকে জেভিয়ার দ্য ফ্রন্তেন স্বচ্ছন্দে হার মানিয়ে দিয়েছিল আর সবাইকে। মাদাম অরমন্দের মন তাকে জয় করতেই হবে। অরমন্দে যেন তার

কাছে ছিল এক সাধনার বস্তু। যে অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে তীর্থযাত্রী তার উপাস্য দেবতার মন্দিরের পানে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যায় সে প্রতিজ্ঞা জেভিয়ারের মনেও ছিল। তার বাসনা পূরণ না করে সে ছাড়বে না।

অরমন্দের ছোট বড় যেকোন ইচ্ছা বা বাসনাকে পূরণ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকত জেভিয়ার। অরমন্দে যা চাইত তাই সে এনে দিত। অথবা দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত।

ক্রমে সত্যি সত্যিই অরমন্দের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল জেভিয়ার। তার নিরন্তর সাধনার তাপে অরমন্দের পাথরের মত শক্ত অন্তরটা গলতে শুরু করল। মাদাম অরমন্দে একদিন তাকে বলল, আমি একসঙ্গে বেশীক্ষণ ভালবাসার কথা ভাবতে পারি না। যদি পাঁচ মিনিট ধরে কখনও কাউকে ভালবাসতে পারি একসঙ্গে একটানা তাহলে জেনে রেখো তোমাকেই ভালবাসব।

কিন্তু এত করেও মাদাম অরমন্দের একটা বাসনা মেটাতে পারেনি জেভিয়ার। জেভিয়ার ছিল অবিবাহিত। সে যে ফ্ল্যাটটায় ভাড়া থাকত মাদাম অরমন্দের সেটা পছন্দ হল না। সেখান থেকে চারদিকের শহরটা দেখা যেত। নানা কলরব কানে আসত। মাদাম চাইত দূর নির্জন কোন গ্রামাঞ্চলে একটা সাজানো বাড়িতে গিয়ে মিলিত হবেন দু'জনে। মাদামের মতে প্রেমিক প্রেমিকাদের মিলনের স্থান হবে যেমন নির্জন তেমনি মনোরম। মিলনের সময় এমন এক মধুর অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব রস আস্বাদন করবে যার কথা সারা জীবনে তারা কখনো ভুলতে পারবে না।

একদিন সন্ধের সময় একটা মেলায় বেড়াতে গিয়েছিল দু'জনে। হঠাৎ এক ভ্রাম্যমান জ্যোতিষের গাড়ি দেখতে পেয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। জ্যোতিষ মাদাম অরমন্দের কাছে এসে বলল, আমি আপনার জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব বলে দেব। একটা প্রশ্নের উত্তর চাইলে আমি নেব পাঁচ ফ্রাঁ, আর সারা জীবনের সবকিছু জ্ঞাতব্য বলে দিলে নেব কুড়ি ফ্রাঁ। গাড়ির ভিতর নির্জন বসার জায়গা আছে। পরীক্ষা করতে পারেন।

জেভিয়ার অরমন্দেকে বলল, তোমার ভাগ্য গণনা করে নাও।

মাদাম অরমন্দে আপত্তি করল না। জেভিয়ার গাড়ির দরজা খুলে দিল। দু'জনে ঢুকে পড়ল। ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল অরমন্দে। এই রকম একটা সাজানো নির্জন ঘর যেন সে চাইছে দীর্ঘদিন ধরে। মাঝখানে পাতা সারা টেবিলটা শুধু গোলাপে ভর্তি। চারদিকে চারখানা চেয়ার। চমৎকার এক সুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে মন। একদিকে একটা বিছানা। খাবার ব্যবস্থা।

জেভিয়ার নিচু গলায় বলল, কী, পছন্দ হয়েছে?

কোন কথা না বলে চুম্বনের জন্য তার ঠোঁটদুটো জেভিয়ারের মুখপানে এগিয়ে দিল মাদাম অরমন্দে।

—অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

থিয়োদুল স্যাবোতের স্বীকারোক্তি

Theodule Sabot's Confession

মার্টিনভাইলের হোটেলে যখনই স্যাবোত এসে হাজির হোত তখনই তার কাছ থেকে মজাদার কিছু শোনার আশায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠত। মজাদার মানুষ ছিল স্যাবোত। পাদরীদের সে মোটেই পছন্দ করত না; না, না, মোটেই না, কায়দামত পেলে সে নাকি তাদের ধরে-ধরে আস্তো গিলে ফেলত।

মার্টিনভাইলের র‍্যাডিক্যাল দলের লোক ছিল স্যাবোত—লম্বা, রোগা চেহারার মানুষ; মাথার চুলগুলি চাঁদি পর্যন্ত ব্রাশ করা, চোখ দুটো ধূসর রঙের; কিঞ্চিৎ চতুর বলেই মনে হোত তাকে। কোন পাদরীকে দেখে সে যখন মন্তব্য করত—ওই যে আমাদের অপদার্থ পাদরী বাবা আসছেন—তখন তার বলার ঢঙে এমন হাবভাব প্রকাশ পেত যে সবাই একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ত, অট্টহাসিতে ঘর ফেটে যেত। রবিবার দিন গির্জায় যখন প্রার্থনা বসত তখন সে ইচ্ছে করে কাজ করত। হোলি উইক-এর সোমবার সে একটা শুয়োর জবাই করে কালো পুডিং তৈরী করে রাখত। সেই পুডিং সে 'ইস্টার' পর্যন্ত চালাত। কোন পাদরী তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে সে খুশি হয়ে বলত—ওই লোকটা মদের সঙ্গে ভগবানকে গিলছে।

এই বিদ্রূপের জন্যে স্যাবোতকে অনেকেই সমর্থন করত; দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবান পাদরী এই জন্যে তাকে একটু ভয় করতেন। পাদরীর নাম রেভারেণ্ড মেরিটাইম। চরিত্রের দিক থেকে তিনি কূটনীতিজ্ঞ; মার্জিত কলাকৌশলই তিনি পছন্দ করতেন বেশী। দীর্ঘ দশ বছর ধরে দু'জনের মধ্যে এই ধরনের তিক্ত, গোপন, এবং অবিরাম সংগ্রাম চলেছিল। শহরের পৌর প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিল মিস্ত্রী স্যাবোত; অনেকেই ভেবেছিল সে মেয়রের পদে নির্বাচিত হবে। সেটা সম্ভব হলে গির্জার কাছে নিঃসন্দেহে তা পরাজয় ছাড়া আর কিছু হবে না।

কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচন শুরু হওয়ার কথা ছিল। মার্টিনভাইলের যাজক সম্প্রদায় তাদের নিরাপত্তার জন্যে কাঁপতে লাগল। একদিন সকালে পাদরী রাওয়েনের দিকে যাত্রা করলেন; চাকরকে বলে গেলেন তিনি আর্চবিশপের বাড়ি যাচ্ছেন।

দু'দিন পরে তিনি ফিরে এলেন। তাঁর মেজাজটা বেশ ভাল। মনে হল যে-কাজের জন্য গিয়েছিলেন তাতে তিনি সাফল্যলাভ করেছেন। পরের দিনই সবাই জেনে গেল যে যাজকদের জন্যে সংরক্ষিত গির্জার পূর্বদিকের অংশটিকে সংস্কার করা হবে। বিশপ তাঁর নিজের তহবিল থেকে এর জন্যে ছ'শ' ফ্রাঁ দিয়েছেন। আচার্যদের জন্যে পুরনো পাইন গাছের তৈরী গির্জায় যেসব পুরনো বসার চেয়ার রয়েছে সেগুলি বাতিল করে

ওক গাছের তক্তা দিয়ে নতুন চেয়ার বানানো হবে। এই কাজের জন্যে অভিজ্ঞ ছুতোর মিস্ত্রী দরকার। সঙ্ঘের মধ্যে সকলের মুখে ওই একই কথা।

থিয়োদুল স্যাবোতের মুখে হাসি নেই।

পরের দিন গাঁয়ের পথ দিয়ে সে যখন যাচ্ছিল তখন তার প্রতিবেশী, বন্ধু, আর শত্রু সকলেই ঠাট্টা করে তাকে জিজ্ঞাসা করল—কাজটা তো তুমিই করছ হে?

উত্তর দেওয়ার মত কিছুই ছিল না তার; ভেতরে-ভেতরে রাগে ফুলতে লাগল সে। তারা একটু ক্ষুণ্ন হয়েই মন্তব্য করল: কাজটা বেশ বড়। দু'তিনশ' ফ্রাঁর ব্যাপার। দিন দুই পরে জানা গেল সারানোর কাজটা পার্চিভিলার ছুতোর গিলেসটিঁ চেমবারলাঁকে দেওয়া হবে। তারপর জানা গেল গুজবটি মিথ্যা; এবং তারপরে আরও জানা গেল যে গির্জার বসার জন্যে যে ঘেরা আসনগুলি রয়েছে সেগুলিও সারানো হবে। এই সব কাজের জন্যে খরচ হবে প্রায় দু' হাজার ফ্রাঁ; এই টাকার কিছুটা অংশ অনুদানের জন্যে সরকারের কাছে গির্জার কর্তৃপক্ষ নাকি আবেদন করেছে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ল চারপাশ।

স্যাবোত তা শুনেছিল। রাত্রিতে সে রকটকের বাড়িতে হাজির হল। চাকরের কাছে শুনল যে তিনি গির্জায় গিয়েছেন। এই শুনে সে-ও গির্জার পথ ধরল।

যাজকের তদারকীতে দুটি বৃদ্ধা অবিবাহিতা দেবদাসী সেণ্ট মেরীর উৎসবের জন্য বেদী সাজাচ্ছিল। গির্জায় গায়কদের জন্যে যে নির্দিষ্ট স্থান থাকে সেইখানে বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাজের নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

খুব অস্বস্তি লাগছিল স্যাবোতের। মনে হল সে যেন তার পরম শত্রুর ঘরে এসে ঢুকেছে। কিন্তু লোভ তাকে খোঁচাতে লাগল। দেবদাসীদের ভ্রূক্ষেপ না করে হাতে টুপিটি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এল। দেবদাসীরা তাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ারের ওপরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

সে আমতা-আমতা করে বলল: নমস্কার, যাজক মশাই।

যাজকের চোখ দুটো তখন বেদীর দিকে নিবদ্ধ ছিল। মুখ না ঘুরিয়ে তিনি বললেন—নমস্কার, মিস্ত্রী।

ঘাবড়িয়ে গিয়ে স্যাবোত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; তারপরে বলল: উৎসবের আয়োজন হচ্ছে বুঝি?

যাজক মেরিটাইম বললেন: হ্যাঁ। সেণ্ট মেরীর উৎসব-মাস এগিয়ে আসছে।

ঠিক, ঠিক—চুপ করে গেল স্যাবোত।

আর কোন কথা না বলেই সে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল; কিন্তু গায়কদের পুরনো আসনগুলি তাকে বাধা দিল। সে লক্ষ্য করল ডান দিক আর বাঁ দিক ক'রে মোট ষোলটা স্টল মেরামত হবে। বাইরের দিকের এই ষোলটা ওক কাঠের স্টল তৈরী করতে তিনশ' ফ্রাঁর কাছাকাছি লাগবে। একটু বুদ্ধি করে কাজ চালাতে পারলে

যে-কোন চতুর ছুতোর মিস্ত্রী এতে দু'শ' ফ্রাঁ লাভ করতে পারবে। এই ভেবে সে আমতা-আমতা করে বলল : আমি কাজটার জন্যে এসেছিলাম।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন যাজক—কোন্ কাজ ?

মরীয়া হয়ে স্যাবোত কোনরকমে বলে ফেলল : যে কাজটা এ নে শুরু হবে।

এই কথা শুনে যাজক ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন—অর্থাৎ, আমার গির্জায় যে সারানোর কাজ হবে সেই কাজের কথা তুমি বলছ ?

যাজকের কথার স্বরে মনে হল স্যাবোতের শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা ঝলক বয়ে গেল। সেখান থেকে নিঃশব্দে কেটে পড়ার একটা উদগ্র কামনা আর একবার তাকে ঠেলা দিল। কিন্তু সে বেশ শান্তভাবেই বলল : হ্যাঁ।

তাঁর সেই বিস্তৃত উদরের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে দুটি হাত রেখে বজ্রাহতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন যাজক ; বিস্ময়ে মুখ থেকে তাঁর কথা বেরোল না। তারপরে তিনি বললেন :...তুমি, তুমি...স্যাবোত...এখানে আমার কাছে এসেছ কাজের জন্যে...। তুমি...আমার গির্জায় একমাত্র নাস্তিক তুমি। আরে না, না—তোমাকে এ কাজ দিলে চারপাশে একেবারে ঢি-ঢি পড়ে যাবে, বিরূপ সমালোচনায় জেরবার হয়ে যাব আমি। আর্চবিশপ আমাকে বকাবকি করবেন। চাই কি চাকরিও খোওয়াব আমি।

দম নেওয়ার জন্যে একটু থামলেন তিনি ; তারপর একটু ধীরভাবে শুরু করলেন আবার : এইরকম উন্নতমানের একটা কাজ পাশের গ্রামের ছুতোর মিস্ত্রীকে দেওয়া হবে এটা শুনে যে তোমার কষ্ট হওয়ার কথা সেটাও আমি অহেতুক বলে মনে করছিনা ; কিন্তু এছাড়া অন্য কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব না—যদি না অবশ্য...কিন্তু না...সে-ও অসম্ভব। তুমি কিছুতেই রাজি হবে না...অথচ সেটা ছাড়া...এ কাজ তোমাকে দেওয়া কিছুতেই চলবে না।

ডান দিকে পশ্চিমের দরজা পর্যন্ত যে দীর্ঘ আসনের সারি রয়েছে সেইদিকে স্যাবোত একবার তাকিয়ে দেখল। হায় ভগবান, এগুলিও সব সারানো হবে নাকি ?

সে জিজ্ঞাসা করল : কী চাই আপনার ? বলতে দোষ নেই কোন।

যাজক বেশ শক্ত গলায়ই বললেন : তোমার যে সৎ বাসনা রয়েছে সেবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ চাই।

আমতা-আমতা করল স্যাবোত : তা আমি বলছি—তবে এমন কি রয়েছে যাতে আমরা একটা বোঝাপড়ার মধ্যে আসতে পারিনা ?

যাজক বললেন : পরের রবিবার এখানে যে উচ্চ পর্যায়ের প্রার্থনাসভা বসবে সেখানে প্রকাশ্যে তোমাকে গির্জার কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

বিবর্ণ হয়ে গেল মিস্ত্রী ; সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল : এই আসনগুলিও সারানো হবে ?

যাজক জোর দিয়ে বললেন : হবে ; তবে পরে।

স্যাবোত বলল : অবশ্য আমি বলছিনা—মানে—আমি নাস্তিক নই—উঁহু—না। ধর্মের সঙ্গে কোন বিরোধ আমার নেই। ধর্মের আচারটাই আমাকে তিতিবিরক্ত করে তোলে। কিন্তু এরকম ব্যাপারে, ধর্মবিষয়ে আমার যে কোন গোঁড়ামি নেই তা আপনি দেখতে পাবেন।

জয়লাভ করেছেন বুঝতে পেরে যাজক ঘরোয়া হয়ে এলেন ; তারপর বেশ খুশিমনেই বললেন : চমৎকার! চমৎকার! এবারে তুমি বিজ্ঞের মত কথা বলেছ। দাঁড়াও, দেখি কী করা যায়।

বেশ অস্বস্তির সঙ্গে হাসল স্যাবোত ; তারপরে জিজ্ঞাসা করল : এই স্বীকারোক্তি ব্যাপারটা কয়েকটা দিন পিছিয়ে দিলে হয় না ?

কিন্তু যাজক আবার তাঁর রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন।

যেমুহূর্ত থেকে তোমাকে এই কাজটা দেওয়া হবে সেইমুহূর্ত থেকে আমি নিশ্চিত হতে চাই যে তোমার চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে—তারপরেই তিনি শান্তভাবে বললেন : দেরী ক'রে লাভ নেই। তুমি বরং কালকেই চলে এসে আনুগত্য নাও ; কারণ, তোমাকে অন্তত দু'বার পরীক্ষা করতে হবে আমায়।

দু'বার ?

একটু হেসে বললেন যাজক : হ্যাঁ তোমাকে ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার ঝরঝরে করে তুলতে হবে। তোমাকে কাল আশা করছি আমি।

বেশ কষ্টের সঙ্গেই মিস্ত্রী জিজ্ঞাসা করল : কোথায় যাব ?

কেন...গির্জায়, যেখানে আনুগত্যের শপথ নেওয়া হয়।

কী বললেন ? ...কোণে যে বাক্স রয়েছে ওইখানে ? শুনুন, শুনুন...ওই বাক্সটা মোটেই আমার পছন্দমত নয়।

কেন ?

কেন...মানে...ওতে চড়ার অভ্যাস আমার নেই! তাছাড়া কানেও একটু কম শুনি আমি।

যাজক ভেবে দেখলেন কথাটা ; বললেন : ঠিক আছে, তাহলে আমার বাড়িতেই এস, সেখানেই সবার চোখের বাইরে কাজটা আমরা সেরে নেব। এতে তোমার আপত্তি নেই তো ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয় ; কিন্তু ওই বাক্সটা কিছুতেই নয়। উঁহু—না।

ঠিক আছে। তাহলে কাল এস ; সন্ধে ছ'টার সময়—দিনের কাজ শেষ হওয়ার পরে।

বেশ। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কথা পাকা রইল। কাল আপনার সঙ্গে দেখা করব। কথার নড়চড় হলে জাহান্নামে যাব আমি।

স্যাবোত তার বিরাট হাতটা বাড়িয়ে দিল। যাজক তার হাতটা ধরে বিরাট একটা ঝাঁকানি দিলেন। ঝাঁকানির শব্দ গির্জার ভেতরে ঝঙ্কৃত হয়ে গম্বুজের ওপাশে মিলিয়ে গেল।

পরের সারাটা দিনই স্যাবোতের মনটা বেশ অস্বস্তির ভেতর দিয়ে কাটালো। দাঁত তুলতে যাওয়া মানুষের মনে যেরকম একটা আশঙ্কা জাগে এটাও ঠিক সেই ধরনের একটা আশঙ্কা। প্রতিটি মুহূর্ত তার মনে হ'তে লাগল—আজ সন্ধের সময় আমাকে আনুগত্য জানাতে হবে। তার সেই সংশয়সঙ্কুল আত্মা—নাস্তিক তাকে যে একেবারে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি—স্বর্গীয় রহস্যের নাম-না-জানা ক্ষমতার শাসনে দাঁড়াতে হবে এই কথা ভেবে বার-বার কাঁপতে লাগল।

পরের দিন কাজ শেষ হওয়ার পরে সে যাজকের বাড়িতে হাজির হল। যাজক তখন বাগানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন; প্রার্থনা পুস্তক পড়তে-পড়তে সরু রাস্তার ওপরে পায়চারি করছিলেন। স্যাবোতকে দেখে তিনি বেশ খুশিই হলেন; একমুখ হেসে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে।

আরে—এস, এস, মঁসিয়ে স্যাবোত—কেউ তোমাকে গিলে ফেলবে না।

স্যাবোতই তাঁর ঘরে প্রথমে ঢুকল; বলল: আপনার কোন অসুবিধে না হলে আমার এই ছোট ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায় ততই ভাল। পোশাক বার করাই রয়েছে।

এক মিনিট—তারপরেই আমি তোমার সব কথা শুনব।

যাজক তাঁর সাদা পোশাকটি পরলেন, গভীরভাবে শূন্য মনে স্যাবোত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

যাজক ইঙ্গিত করে বললেন: ওই গদীর ওপরে হাঁটু মুড়ে বোস।

হাঁটু মুড়ে বসতে লজ্জা করল স্যাবোতের; সে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর আমতা-আমতা করে বলল: হাঁটু মুড়ে বসে কোন লাভ হবে?

হাঁটু মুড়ে বোস; অনুতাপের বিচার শুরু হোক।

হাঁটু মুড়ে বসল স্যাবোত।

প্রার্থনা কর।

কী করব?

আমি বলে যাই—তুমি আমার কথাগুলি উচ্চারণ করে যাও।

উচ্চারণ শেষ হলে যাজক বললেন: এবারে পাপ স্বীকার কর তোমার।

কী বলতে হবে, কোথায় শুরু করতে হবে বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল স্যাবোত।

রেভারেণ্ড মেরিটাইম তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন: প্রিয় বৎস, এদিক থেকে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই বলেই আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। একটি একটি করে ভগবানের নির্দেশ গ্রহণ করবে তুমি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার কথা মন দিয়ে শোন। খোলাখুলিভাবে কথা বল, বেশী বলতে ভয় পেয়ো না।

'তুমি একটিমাত্র দেবতাকে পূজা করবে; এবং সারা হৃদয় দিয়ে তাঁকেই কেবল শ্রদ্ধা জানাবে'—ভগবানের মত আর কোন মানুষ বা জিনিসকে কি তুমি ভালবাস? তোমার সমস্ত আত্মা, হৃদয় আর ভালবাসা দিয়ে কি ভগবানকে তুমি ভালবাস?

বিষয়টা নিয়ে ভাবতে গিয়েই স্যাবোত ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল; তারপর বলল: না, না—ভগবানকে যতদূর সম্ভব আমি ভালবাসি। হ্যাঁ; নিশ্চয় তাঁকে আমি ভালবাসি। তবে তার অর্থ এই নয় যে আমার ছেলেদের আমি ভালবাসিনা। না—না, সে সত্যি নয়। তার মানে এই নয় যে এদের মধ্যে কাকে আমি ভালবাসব সে-কথাটা আমাকে ভেবে দেখতে হবে। কেউ যদি বলে ভগবানকে ভালবাসার জন্যে আমাকে একশ'ফ্রাঁ হারাতে হবে—তাতেও আমি রাজি নই। তবে, কথাটা ঠিক যে ভগবানকে আমি ভালবাসি।

যাজক বেশ গম্ভীর গলায় বললেন: সকলের চেয়ে ভগবানকে তোমাকে অবশ্যই ভাল বাসতে হবে।

স্যাবোতের মন সদিচ্ছায় বোঝাই ছিল; সে বলল: সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি।

যাজক বললেন: ভগবান বা আর কারও নাম ক'রে শপথ করবে না কোন দিন। মাঝে-মাঝে কি তুমি দিব্যি দিয়ে কথা বল?

না, না—তা নয়। আমি কোনদিন দিব্যি করিনি, না—কখনও না। মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ হলে অবশ্য করিনি যে তা নয়। কিন্তু দিব্যি হিসাবে কোনদিনই আমি তা করিনা।

কিন্তু সেটাও দিব্যি। যাক গে; ভবিষ্যতে আর কোরো না। পরের নির্দেশ হল—ভগবানের পূজা আরাধনায় রবিবার দিনটি তুমি কাটাবে। রবিবার দিন তুমি কি কর?

স্যাবোত তার কান চুলকোতে লাগল।

সাধ্যমত আমি ভগবানের পূজা করি, পাদরী বাবা। বাড়িতেই আরাধনা করি তাঁর। রবিবারে আমি কাজ করি।...

যাজক দরাজ হৃদয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললেন: আমি জানি ভবিষ্যতে তুমি ভালভাবে চলবে। পরবর্তী তিনটি নির্দেশ এবারে আমি বলছি, কারণ, আমার ধারণা, আগের দুটি নির্দেশ না মেনে তুমি কোন পাপ করনি। এবারে আমরা ছ' নম্বর আর ন' নম্বর নির্দেশ একসঙ্গে পড়ব।—অন্য লোকের জিনিসে হাত দেবে না তুমি; এবং জ্ঞানতঃ, অন্য লোকের জিনিস নিজের কাছে রাখবে না। তোমার নয় এমন কিছু জিনিস কি তুমি কখনও নিয়েছ?

এবারে বেশ চটে উঠল থিয়োদুল স্যাবোত; বলল: নিশ্চয় না। আমি সৎ মানুষ সে-কথা আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি। অবশ্য, কাজ করার সময় দু' একটা ঘণ্টা বেশী সময় যে আমি নিইনি সে কথা আমি বলছিনা। মাঝে মাঝে পাওনা টাকার ওপরে কয়েকটা সেনটাইম যে আমি কখনও চড়াইনি, সে কথাও বলছিনা আমি। কিন্তু আমি চোর নই, না—না কিছুতেই নয়।

যাজক বেশ রূঢ়ভাবেই বললেন: একটা সেনটাইম নিলেও তা চুরি করা হয়। যা করেছ করেছ; আর কোনদিন ওকাজ করো না—এর পরে হচ্ছে—'কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না।'—তুমি কি মিথ্যে কথা বলেছ কোনদিন?

না; বলি নি। আমি মিথ্যেবাদী নই। সেকথা আমি গর্ব করেই বলতে পারি। তবে একথা আমি বলছিনা যে, আমি কোনদিন লম্বা-লম্বা কথা বলিনি। প্রয়োজনমত অন্য কারও কাছে যে মিথ্যা কথা আমি বলিনি সে কথাও সত্যি নয়। কিন্তু মিথ্যাবাদী বলতে যা বোঝায় আমি তা নই।

যাজক সহজভাবে বললেন: নিজের ওপরে অবশ্যই তুমি লক্ষ্য রাখবে।

তারপরে তিনি বললেন: 'বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মহিলার দেহ তুমি কামনা করবে না।' নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে তুমি কামনা বা ভোগ করেছ কি?

স্যাবোত বলল: না। নিশ্চয় না। স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করা? না, না। কাজে বা চিন্তায় এমন কাজ কখনও আমি করিনি।

একটু থেমে গলা নিচু করে সে আবার বলল; হঠাৎ মনে হ'ল, এবিষয়ে কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তার।

অবশ্য একথাও সত্যি নয় যে শহরে গিয়ে আমি নিছক স্ফূর্তি করতে কোন জায়গায়—কোন্ জায়গার কথা বলছি তা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—যাইনি বা কোন নারীর সঙ্গে মিশিনি। কিন্তু তার জন্যে আমি তাদের পয়সা দিয়েছি। টাকা দিলে আর দোষ থাকে না: তাই না?

যাজক আর জের না টেনে তাকে দীক্ষা দিলেন।

স্যাবোত এখন গির্জার কাজটা করছে—আর প্রত্যেক রবিবার উপাসনা সভায় যাচ্ছে।

পরিত্যক্ত

The Castaway

সত্যি বলছি পাঠক, এই আবহাওয়ায় গ্রামের পথে বেড়াতে যাওয়াটা আমার মতে পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়। গত দু'টি মাস ধরে তোমার এই পাগলামো শুরু হয়েছে। ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক তুমি আমাকে সমুদ্রের ধারে টেনে নিয়ে যাও; আমাদের বিবাহিত জীবনের পঁয়তাল্লিশটি বছর কিন্তু তোমার এরকম কোন বাসনা হয়নি। ফি-ক্যাম্পের মত বিশ্রী জায়গায় যাওয়ার জন্যে তুমি অস্থির হয়ে ওঠ, তোমাকে আগে বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর ছিল; কিন্তু বর্তমানে বাইরে ছোটাছুটি করার এমন একটা উদগ্র কামনা তোমার জেগেছে যে বছরের এই সবচেয়ে গরমের দিনগুলিতেও তুমি বাইরে ঘুরে বেড়াতে চাও। দ্য অ্যাপ্রিভেল-এর

সঙ্গে তোমার মেলে ভাল; তোমার সঙ্গী হ'তে তাকেই বরং বল। আমি এখন বিশ্রাম নিতে চললাম।

মাদাম দ্য কডোর তার পুরনো বন্ধুর দিকে ঘুরে বললেন: আমার সঙ্গে তুমি আসছ দ্য অ্যাপ্রিভেল?

পুরনো আমলের শৌর্যের সঙ্গে একটু হেসে তিনি ঘাড়টা নোয়ালেন।

তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

ঠিক আছে; তাহলে যাও, আর রোদে মাথা ঘুরে পড়।—এই বলে মঁসিয়ে দ্য কডোর বিছানায় দু'এক ঘণ্টা শুয়ে থাকার জন্যে হোটেলের ঘরটিতে ঢুকলেন।

দু'জনে একা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাটি একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। মাদাম তাঁর বন্ধুর একটি হাত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বেশ মিষ্টি করেই বললেন: এতদিন পরে, এতদিন পরে!

দ্য অ্যাপ্রিভেল বিড়বিড় করে বললেন: পাগল হলে নাকি! না, পাগলই হয়েছ। এর বিপদ কত সেটা একবার চিন্তা কর। যদি সেই লোকটা...

চমকে উঠলেন মাদাম—হেনরীর কথা বলছ? ওকে মানুষ বলে ডেকো না।

অ্যাপ্রিভেল অশিষ্টভাবেই বললেন—আমাদের ছেলে যদি কোন সন্দেহ করে তাহলে তোমাকে আমাকে দু'জনকেই সে ঝামেলায় ফেলবে। চল্লিশটি বছর ধরে তাকে না দেখেই তুমি কাটিয়েছ; আজ তোমার হঠাৎ কী হল?

সমুদ্র থেকে যে দীর্ঘ পথটি সোজা শহরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে সেই পথে তাঁরা এগোতে লাগলেন। তাঁদের সামনের পথটি প্রচণ্ড রোদের তাতে ঝলসে-ঝলসে উঠছিল। ধীরে পায়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন। বন্ধুর হাত ধরে ধরে মাদাম অভিভূতের মত সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন: তুমিও তাকে দেখনি?

না, না। কোনদিন না।

এও কি সম্ভব?

প্রিয় বান্ধবী, এ-আলোচনার শেষ হবে না কোনদিন। সুতরাং তা আবার নতুন করে শুরু করার দরকার নেই। তোমার যেমন স্বামী আছে; আমারও তেমনি স্ত্রী রয়েছে, রয়েছে সন্তান। সেই জন্যেই বাইরে যাতে আমাদের কেলেঙ্কারি ছড়াতে না পারে তার জন্যে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

কোন উত্তর দিলেন না মাদাম। তিনি তাঁর পুরনো দিনগুলির কথা ভাবছিলেন—ভাবছিলেন তাঁর বিনষ্ট যৌবন আর বিগত দিনগুলির কথা।

সব সংসারে যেমন হয় সেই রকম যৌবনেই তাঁর একদিন বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ডিপ্লোম্যাট স্বামীকে তিনি একরকম চিনতেনই না। পরে তাঁর সঙ্গে সৌখীন রমণীর মতই দিন কাটিয়েছিলেন।

তারপরে ওই যুবক মঁসিয়ে দ্য অ্যাপ্রিভেল। তিনিও তাঁরই মত আর একজনকে বিয়ে করেছিলেন। সেই যুবকটি তাঁর সঙ্গে একদিন গভীর প্রেমে পড়ে গেলেন। একবার মঁসিয়ে দ্য কডোর রাজনৈতিক কাজে বেশ কিছুদিনের জন্যে ভারতে এলেন। সেই সময় যুবকটির কাছে তিনি ধরা দিলেন।

বাধা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল কি তাঁর? নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখা কি সম্ভব হোত তাঁর পক্ষে? আত্মসমর্পণ না করার মত শক্তি আর সাহস ছিল কি তাঁর? কারণ, যুবকটিকে তিনিও তো খুব ভালবাসতেন। না, নিশ্চয় না। খুব কষ্ট হোত তাঁর। তাঁরও খুব কষ্ট হোত। জীবন কী ছলাকলাতেই না পূর্ণ! কী নিষ্ঠুর এই জীবন! প্রলোভন কি আমরা এড়াতে পারি? অথবা অনিবার্য পরিণতিকে রাখতে পারি ঠেকিয়ে? অথচ সেই দিনগুলি কত মধুর, কত স্বপ্নিল!

তারপর একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। কী ভয়ানক পরিস্থিতি! হায়রে, দক্ষিণদিকে তাঁর সেই ভয়ানক যাত্রার কথা কি তিনি ভুলে গিয়েছেন? তাঁর দুঃখ, তাঁর অবিরাম ভীতি; ভূমধ্যসাগরের একটি নির্জন কুটিরে অজ্ঞাতবাস। বাড়ির বাগানের বাইরে তিনি বেরোতেও সাহস করতেন না। কমলালেবুর গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে তিনি গভীর আশঙ্কায় যে দীর্ঘ দিনগুলি কাটাতেন তা কি ভুলে যাওয়া এতটা সহজ? বাইরে বেরিয়ে সমুদ্রের হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তাঁর হৃদয় কতই না আকুলি বিকুলি করত। কিন্তু ফটকের বাইরে বেরোতে তিনি সাহস করতেন না। যদি এই অবস্থায় কেউ তাঁকে দেখতে পায়? কী লজ্জা!

আর সেই অপেক্ষার দিনগুলি? সেই শেষ ক'টি যন্ত্রণায় ভরা দিন! সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি। কী দুঃখই না তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে?

সত্যি সেই রাত্রিটি কী ভয়ঙ্করই না ছিল? গোঙানি আর চীৎকারের সুর এখনও যেন তাঁর কানে এসে বাজছে। তাঁর প্রেমিকের সেই বিবর্ণ মুখের চেহারা এখনও তাঁর চোখের ওপরে ভাসছে। সেই সঙ্গে ভাসছে ডাক্তারের নিরুদ্বেগ মুখ আর নার্সদের টুপি।

শিশুর মৃদু চীৎকারে কী ভীষণভাবেই না তিনি কাঁপতে শুরু করেছিলেন।

আর তার পরের দিন। পরের দিনটি কি বেদনাময়। ওই দিনই তিনি তাঁর ছেলেটিকে চুমু খেয়েছিলেন। সেই প্রথম আর সেই শেষ। তারপর থেকে আর তাকে দেখেন নি তিনি।

তারপর থেকে একটি দীর্ঘ শূন্যতা—সন্তানের চিন্তা সব সময় তাঁর মনের গহ্বরে ভেসে-ভেসে বেড়াত। সেই ছোট শিশুটিকে—যেটি তাঁর নিজের রক্ত-মাংসের—নিজের অস্থিমজ্জা দিয়ে গড়া—তাকে আর কোনদিনই তিনি দেখেন নি। ছেলেটিকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি কেবল জানতেন যে নরম্যান চাষীদের বাড়িতে সে মানুষ হয়েছে; সেই ছেলেটি নিজেই চাষী হয়েছে—যে বাবার নাম সে জানে না সেই বাবার কাছ থেকে অনেক টাকা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করেছে।

এই চল্লিশ বছরের মধ্যে কতবারই না সেই ছেলেটিকে দেখার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। কতবারই না তিনি তাকে চুমু খেতে চেয়েছিলেন। কোন সময়েই তাঁর মনে হয়নি যে ছেলেটি বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর বারবার মনে হয়েছে ছেলেটি সেইরকমই রয়েছে—সেই প্রথম দিন তাকে যেমন তিনি দেখেছিলেন।

কতবারই তিনি তাঁর প্রেমিককে বলেছেন: আর আমি পারছিনা; তাকে একবার দেখতেই হবে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।

প্রতিবারই তাঁর প্রেমিক তাঁকে বাধা দিয়েছেন। অস্থির হয়ে উঠেছেন মাদাম।

মাদাম জিজ্ঞাসা করেছেন: কেমন আছে সে?

আমি জানিনা। আমিও তাকে আর দেখিনি।

এও কি সম্ভব? ছেলে রয়েছে, অথচ তাকে না-জানাটা কি সম্ভব? তাকে ভয় করা—অসম্মানের বোঝা হিসাবে তাকে পরিত্যাগ করাটা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

ভাবতেও ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায়।

রোদে-পোড়া তামাটে পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মাদাম বলে চললেন: একেই বলে ভগবানের বিচার। আমার কোন সন্তান হয়নি। তাকে একবার চোখে দেখার ইচ্ছেটাকে আর আমি দাবিয়ে রাখতে পারছিনা। চল্লিশটি বছর ধরে ও আমাকে কশাঘাতে জর্জরিত করছে। এসব জিনিস পুরুষ মানুষে বুঝতে পারে না। মনে রেখ, পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে আমার। আর কখনও হয়ত তাকে আমি দেখতে পাব না।...কী করে এটা সম্ভব হল? এতদিন তাকে আমি না দেখে থাকলাম কেমন করে? সারা জীবন ধরেই তার কথা আমি ভেবেছি। ফলে কী দুঃখেই না জীবন কেটেছে আমার! তুমি কি জান, এমন একটা দিনও আমার যায়নি যেদিন ঘুম থেকে জেগে উঠেই তার কথা মনে হয়নি আমার। হায়রে, তার কাছে আমি কত অপরাধিনী! এই রকম ক্ষেত্রে লোকে কী বলবে সেই ভয়ে কি চুপ করে বসে থাকা সম্ভব? আমার উচিত ছিল সবকিছু ছেড়ে, সব ভয় পরিত্যাগ ক'রে তার সঙ্গে চলে যাওয়া, তাকে মানুষ করা, তাকে ভালবাসা। তাহলে নিশ্চয় আমি খুশি হতাম। কিন্তু আমি তা সাহস করিনি। আমি কাপুরুষ ছিলাম। হায়রে, আমি কত সহ্য করেছি। এই সব পরিত্যক্ত শিশুরা নিশ্চয় তাদের মায়েদের কত ঘৃণাই না করে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে হঠাৎ চুপ করে গেলেন মাদাম।

দ্য অ্যাপ্রিভেল বললেন: এখানে বস—বিশ্রাম কর একটু।

তাঁর সঙ্গে মাদাম একটি ছোট জলার ধারে হাতের চেটোয় মুখ ঢেকে ঘাসের ওপরে বসে পড়লেন। তাঁর মাথার সাদা চুলগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় দু'পাশে ঝুলতে লাগল। গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি ফোঁপাতে লাগলেন।

মঁসিয়ে চুপচাপ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী যে করবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তারপরে মাদামকে তিনি বললেন: এস; সাহস সঞ্চয় কর।

দাঁড়িয়ে উঠলেন মাদাম ; বললেন : হ্যাঁ ; সাহস সঞ্চয় করতেই হবে।—তারপরে বৃদ্ধার স্খলিত পদক্ষেপে তিনি টলতে-টলতে এগোতে লাগলেন।

কিছুটা দূরে রাস্তার ওপরে মাঝে-মাঝে গাছের ঝাড় উঠেছে। তাদেরই ধারে কিছু ঘর সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানকার কামারশালা থেকে হাতুড়ি পেটার যে শব্দ হচ্ছিল সেই শব্দ তাঁরা শুনতে পাচ্ছিলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁরা দেখতে পেলেন ডানদিকে একটা নিচু ঘরের সামনে একটা শকট এসে থামল ; আর দেখলেন দু'টি লোক একটা চালার নীচে ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাচ্ছে।

মঁসিয়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি পেইরি বেনিডিক্ট-এর গোলা ?

একজন বলল : বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যান সরাইখানার পাশ দিয়ে ; তারপর সোজা। পোরেট-এর বাড়ির পরে তৃতীয় বাড়িটা। বেড়ার ধারে একটা ছোট পাইন গাছ রয়েছে। চিনতে ভুল হবে না আপনাদের।

বাঁ দিকের পথ দিয়ে ঘুরে গেলেন তাঁরা। মাদাম ধীরে-ধীরে এগোচ্ছেন। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি কেঁপে-কেঁপে উঠছেন ; তাঁর বুক এত জোরে-জোরে কাঁপতে শুরু করল যে মনে হল তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বিড়-বিড় ক'রে প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন—হে ভগবান, হায় ভগবান !

মঁসিয়ে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন ; মুখের রঙ-ও কিছুটা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর ; তবু তিনি বেশ তীক্ষ্ণ স্বরেই বললেন : নিজেকে সংযত করতে না পারলে তুমি কিন্তু সব গোলমাল করে দেবে। ধরা পড়ে যাব আমরা। নিজেকে সংযত কর।

এক গোলা ঘর থেকে আর একটি গোলা ঘরের মধ্যে দিয়ে ছোট-ছোট সরু পথগুলি এগিয়ে গিয়েছে। সেই পথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে শেষ পর্যন্ত একটা বাচ্চা পাইন গাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা।

মঁসিয়ে বললেন : বাড়িটা এইখানেই।

থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন মাদাম।

সামনে বিরাট জায়গা—সেই গোলাঘর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেইখানে আপেল গাছের সারি। এদের দিকে মুখ ক'রে আস্তাবল, মরাই, গোয়ালঘর, আর মোরগ চরার জায়গা। স্লেটের ছাউনির তলায় কোম্পানীর গাড়ি, একটা দু'চাকার শকট, একটা ওয়াগন, আর দু'চাকার ঘোড়ায় টানা একটা হালকা গাড়িও দেখা গেল। গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাস খাচ্ছে চারটে বাছুর। কালো মুরগীগুলো চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোথাও কোন শব্দ নেই। ঘরের দরজা খোলা ; কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না।

ভেতরে ঢুকলেন তাঁরা। সঙ্গে-সঙ্গে বিরাট একটা নাসপাতি গাছের তলা থেকে একটা কালো কুকুর দৌড়ে এসে ভীষণ চীৎকার করতে লাগল।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মঁসিয়ে দ্য অ্যাপ্রিভেল চীৎকার করলেন : ভেতরে কেউ আছেন ?

বছর দশেক বয়সের একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পরনে তার কেবল একটি বক্ষ-আবরণী আর উলের পেটিকোট; পা দুটো খোলা আর অপরিষ্কার। মনে হল, মেয়েটি যেন ভয় পেয়েছে; আর সেইজন্যেই হয়ত বা সে দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল: কী চান?

তোমার বাবা বাড়িতে আছেন?

না।

কোথায় তিনি?

জানি না।

তোমার মা?

গরু নিয়ে মাঠে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি ফিরবেন?

জানি না।

বৃদ্ধ মহিলাটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন; মনে হল, কেউ যেন তাঁকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—তাকে না দেখে আমি কিছুতেই যাব না।

আমরা অপেক্ষা করব, প্রিয়তমা।

ঘুরে দাঁড়াতেই তাঁরা একটি মহিলাকে সেইদিকে আসতে দেখলেন। তার কাঁধে দুটো টিনের পাত্র। দেখে মনে হল বেশ ভারি। তাঁদের ধারণা হল রমণীটি একটি দরিদ্র চাকরাণী—অপরিচ্ছন্ন, আর হতভাগ্য।

মেয়েটি বলল: ওই মা আসছে।

ঘরের সামনে এসে রমণীটি এই দুটি আগন্তুকের দিকে একটু বিরক্তিকর তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপরে তাঁদের যেন দেখেনি এই রকম একটা ভঙ্গি ক'রে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

মনে হল রমণীটির বেশ বয়স হয়েছে; তার মুখটা শুকিয়ে চুপসে গিয়েছে; একজন দেহাতি রমণীর মুখের মত তার ভেতরে কোন কমনীয়তা নেই।

মঁসিয়ে হাঁক দিয়ে বললেন: তোমার কাছ থেকে দু' গ্লাস দুধ কিনতে চাই আমরা।

টিনের পাত্র দুটি নামিয়ে রেখে ফিরে এল রমণীটি; বলল: আমি দুধ বিক্রী করিনা।

আমাদের বড় তেষ্টা পেয়েছে। এই মহিলাটি বৃদ্ধা এবং পরিশ্রান্ত; তেষ্টা মেটানোর মত কিছু পাওয়া যাবে কি?

দেহাতি রমণীটি তাঁদের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে একবার তাকাল; তারপর হঠাৎ মনস্থির করে বলল: আপনারা যখন এসেছেন তখন কিছু দুধ আপনাদের আমি দেব।

এই বলে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর দুটি চেয়ার নিয়ে এল বাচ্চা মেয়েটা; আপেল গাছের তলায় পেতে দিল; তারপরে ধূমায়িত দু'কাপ দুধ নিয়ে ফিরে এল তার মা; আগন্তুকদের হাতে কাপ দুটি দিল।

রমণীটি তাদের সামনে এসে দাঁড়াল; মনে হল, আগন্তুকদের আসল ইচ্ছেটা কী তাই সে জানতে চায়।

আপনারা কী ফি-ক্যাম্প থেকে আসছেন?—জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি।

মঁসিয়ে বললেন: হ্যাঁ। গ্রীষ্মটা এখানে কাটানোর জন্যে এসেছি।

তারপরে একটু থেমে বললেন: প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের তুমি মুরগী বিক্রী করতে পারবে?

একটু ইতস্তত করে মেয়েটি বলল: তা পারি। আপনাদের কি বাচ্চা মুরগী দরকার?

হ্যাঁ—বাচ্চা।

বাজার থেকে কী দামে কেনেন?

দ্য অ্যাপ্রিভেল-এর তা জানা ছিল না; সঙ্গিনীর দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন—কত দাম বলত?

চার থেকে সাড়ে চার ফ্রাঁ—আমতা-আমতা করে বললেন মাদাম। চোখ দুটি তাঁর জলে ভরে গেল।

বিশেষ আশ্চর্য হয়ে রমণীটি তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল: উনি কি অসুস্থ? কাঁদছেন যেন...

কী উত্তর দেবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না মঁসিয়ে; আমতা-আমতা করে বললেন: না, না। তা নয়। মানে, আসার পথে উনি ওর সুন্দর হাতঘড়িটা হারিয়ে ফেলেছেন। সেই জন্যই বড় দুঃখ পেয়েছেন, কেউ কুড়িয়ে পেলে আমাদের জানিও।

উত্তরটা মাদাম বেনিডিক্ট-এর কেমন অদ্ভুত লাগল; কিন্তু কোন উত্তর দিল না সে। হঠাৎ সে বলে উঠল: ওই আমার স্বামী আসছে।

কথাটা শুনেই দ্য অ্যাপ্রিভেল ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। চেয়ার থেকে ঘুরে ব্যাকুলভাবে দেখার চেষ্টায় আর একটু হলে মাদাম হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপরে পড়ে যেতেন।

দশ পা দূরে দাঁড়িয়েছিল একটি লোক; তার হাতে ছিল একগাছা দড়ি; সেই দড়ি দিয়ে একটা গরু বাঁধা। বেশ কুব্জ; পরিশ্রান্ত হওয়ার ফলে বেশ কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলতে হচ্ছিল তাকে। আগন্তুকদের দিকে লক্ষ্য না করেই লোকটি গালাগালি দিল একটা—বদমাস জানোয়ার কোথাকার!

তাঁদের পাশ দিয়ে গোয়ালঘরের দিকে এগিয়ে গেল লোকটি; তারপরে সেখানে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বৃদ্ধাটির চোখের জল হঠাৎ শুকিয়ে গেল। কেমন যেন হতভম্ব হওয়ার ফলে বাকশক্তিরহিত আর চিন্তাশক্তিরহিত হয়ে গেলেন তিনি। এই তাঁর পুত্র—এই!

একই চিন্তায় মুহ্যমান হয়ে গেলেন দ্য অ্যাপ্রিভেল; ক্লিষ্ট স্বরে বললেন: ইনিই মঁসিয়ে বেনিডিক্ট, তাই না?

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রমণীটি জিজ্ঞাসা করল: ওর নামটা আপনাদের কে বলল?

বড় রাস্তার ধারে যে কামার রয়েছে সে-ই।

তারপর সব চুপচাপ। সবাই তাকিয়ে রইল সেই গোয়ালঘরের দিকে। দেখে মনে হল বাড়ির গায়ে সেটা একটা কালো গর্তের মত। ভেতরে কী রয়েছে কিছুই চোখে পড়ল না তাঁদের; গোয়ালঘরের ভেতরে যে শব্দ উঠছিল তাই তাঁদের কানে এল।

শেষ পর্যন্ত কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে লম্বা-লম্বা অপ্রকৃতিস্থ পা ফেলে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে লোকটি বসতবাটির দিকে এগোতে লাগল। পথে আবার সে আগন্তুকদের কাছাকাছি এসে পড়ল; কিন্তু আগন্তুকদের উপস্থিতি লক্ষ্য না করেই সে তার স্ত্রীকে বলল: আমার জন্য এক গ্লাস আপেলের রস নিয়ে এস। আমার বড় পিপাসা পেয়েছে।

এই কথা বলে সে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল; তার স্ত্রী চলে গেল মদের বোতল যে-ঘরে পোঁতা থাকে সেই ঘরের দিকে। কেবল দুটি বিদেশীই চুপচাপ বসে রইল।

কী করা উচিত বুঝতে না পেরে মাদাম আমতা-আমতা করে বললেন: হেনরি, আমরা যাই চল।

দ্য অ্যাপ্রিভেল তাঁর হাত ধরে তাঁকে ওঠালেন; সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ধরলেন; মনে হল, মাদাম এখনই পড়ে যাবেন। তারপরে, একটা চেয়ারের ওপরে পাঁচটা ফ্রাঁ ছুঁড়ে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

ফটক থেকে বেরোনোর সঙ্গে-সঙ্গে মাদাম ফোঁপাতে লাগলেন—হায়রে হায়, তুমি ওর এই হাল করেছ?

দ্য অ্যাপ্রিভেল কেমন বিবর্ণ হয়ে গেলেন; তারপরে বেশ রূঢ়ভাবেই তিনি বললেন: আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তাই আমি করেছি। ওর এই সম্পত্তির দাম আশী হাজার ফ্রাঁ। অনেক মধ্যবিত্তই বিয়ের যৌতুক হিসাবে এত টাকা পায় না।

আর কোন কথা না বলে তাঁরা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। মাদাম তখনও ফোঁপাচ্ছেন। চোখের জল অবিরাম গতিতে বেরিয়ে তাঁর দুটি গাল বেয়ে তখন গড়িয়ে পড়ছে।

মোহাম্মেদ ফ্রিপুইল

Mohammed Fripouille

ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন—ছাদের ওপরে বসে কি আমরা কফি খাব?

আমি বললাম—নিশ্চয়; সে কথা আর বলতে!

তিনি উঠলেন। ঘরের মধ্যে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। মুরদের বাড়ির প্রথা অনুযায়ী ভেতরের দালানে যে আলো জ্বলছিল তারই ছিটেফোঁটা এসে পড়েছিল ঘরের ভেতরে, টেবিলের ওপরে বেশ বড়-বড় আফ্রিকার ফল ছাড়া আর কিছুই পড়ে

ছিল না। কুলের মত বড়-বড় আঙুর ফল, লাল রঙের ডুমুর, হলদে আপেল, লম্বা পুরুষ্ট কলা; আর যে-সব ঘাস দিয়ে কাগজ তৈরী হয় সেই ঘাসের ঝুড়িতে টোগোর্ট-এর খেজুর।

মুরদেশীয় চাকর দরজা খুলে দিলে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম। শেষ অপরাহ্নের মৃদু আলোতে আকাশ-রঙা দেওয়ালগুলি আলোকিত হয়ে উঠেছিল। খোলা বারান্দার ওপরে এসে আমি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। এখান থেকে অ্যালজিয়ার্স দেখা যায়, দেখা যায় বন্দর, রাজপথ আর দূরের সমুদ্রতীর।

ক্যাপ্টেন যে বাড়িটি কিনেছেন সেটি হল প্রাচীন একটি আরব বসতির মধ্যে। এখানকার পথঘাটগুলি আঁকাবাঁকা—গলি-ঘুজিতে বোঝাই। এদের ভেতর দিয়ে আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলের বাসিন্দারা গিজ-গিজ করছে। নীচে চওড়া চৌকো ছাদগুলি অতিকায় সিঁড়ির মত য়েরোপীয়ান বসতি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। আর ওপাশে নোঙর-বাঁধা জাহাজের মাস্তুল, আর নিস্তব্ধ নীল আকাশের নীচে উন্মুক্ত সমুদ্র।

বালিশের ওপরে মাথা দিয়ে আমরা মাদুরের ওপরে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে বেশ মিষ্টি স্বাদের দেহাতি কফি একটু-একটু করে খেতে লাগলাম। অন্ধকারে ঢাকা নীল আকাশের ভেতর থেকে প্রথম নক্ষত্রগুলিকে ফুটে উঠতে দেখতে পেলাম। একটি হালকা ধরনের উষ্ণতা আমাদের আদর করে গেল। মাঝে-মাঝে আফ্রিকার ফুলের গন্ধ নিয়ে জোরাল বাতাসও গেল বয়ে। মনে হল অ্যাটলাস পাহাড়ের ওপর দিয়ে মরুভূমির গন্ধ মেখে সেই বাতাস দৌড়ে আসছে। ক্যাপটেন ওপর দিকে মুখ করে শুয়ে মন্তব্য করলেন: কী সুন্দর দেশ বন্ধু! জীবন এখানে কী মধুর! এখানে বিশ্রামের আয়োজনটি কী মিষ্টি। স্বপ্ন দেখার জন্যেই এই রকম রাত্রির সৃষ্টি হয়েছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখতে-দেখতে অলসভাবে সুখের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে বললাম: দক্ষিণে তোমার জীবন কেমন করে কেটেছিল সেবিষয়ে কিছু বলা নিশ্চয় তোমার উচিৎ।

ক্যাপটেন ম্যারেট ছিলেন আফ্রিকান আর্মির একটি বেশ পুরনো অফিসার। ছিলেন সিপাই; পরে তরোয়ালের মুখে তিনি তাঁর উন্নতির পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। এদিক থেকে তাঁকে সৌভাগ্যবান বলা যেতে পারে, তাঁর পরিচিত আর তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ধন্যবাদ; তাঁদের সাহায্যেই মরুভূমির ওপরে এমন সুন্দর অভিযানটি আমার সার্থক হয়েছে। ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার আগে সেই রাত্রিতে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কী রকম গল্প তুমি শুনতে চাও? এই মরুভূমিতে আমি বিশ বছর চাকরি করেছি; সেই বিশ বছরের চাকরি-জীবনে এত রকমের ঘটনা আর দুর্ঘটনা ঘটেছে যে তাদের পৃথক-পৃথক করে দেখার মত সামর্থ্য আমার নেই।

আরব দেশের মেয়েদের কথা বল।

ক্যাপটেন কোন কথা বললেন না। মাথার নীচে দুটি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে মাদুরের ওপরে চুপচাপ শুয়ে রইলেন। মাঝে-মাঝে তাঁর পোড়া সিগারেটের গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল; আর সেই গন্ধ গুমোট রাত্রির আকাশে পড়ছিল ছড়িয়ে।

হঠাৎ তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন: বেশ। অ্যালজিরিয়াতে প্রথম চাকরি জীবনে যে একটা হাসির ঘটনা ঘটেছিল সেই কাহিনীই তোমাকে আজ বলব। সেই সময় আফ্রিকার সেনাবাহিনীতে অদ্ভুত ধরনের কিছু অফিসার ছিলেন। সেই সব মানুষও আজকাল নেই; সেই সব অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনাও আজকাল আর ঘটতে দেখা যায় না। ঘটলে সারা জীবনই তুমি মহাস্ফূর্তিতে এদেশে কাটিয়ে দিতে পারতে।

আমার বয়স তখন কুড়ি। মাথায় সুন্দর ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। খুব কর্মঠ—যাকে বলে একেবারে দুর্দান্ত—সাধারণ সৈনিক ছিলাম তখন কিন্তু অ্যালজিরিয়ার সৈন্য বলতে যা বোঝা যায় ঠিক সেই রকম। বোঘারের সামরিক ঘাঁটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আমি। তুমি জান, বোঘারকে সবাই বলত দক্ষিণ দিকের বারান্দা। বস্তুত, এখান থেকেই মরুভূমি শুরু। প্রচণ্ড সূর্যের তাপে গনগনে বালির দাবানল সেখান থেকে বেশ স্পষ্টই দেখা যেত।

'একদিন সংবাদ এল যে আউলড বাঘি যাযাবরের দল একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীকে হত্যা করেছে। খবর যখন পৌঁছলো তখন বোঘারে সিপাই ছিলাম আমরা চল্লিশজন, একদল কয়েদী সেনাবাহিনী, আর এক কোয়াড্রন বর্শাধারী আফ্রিকান সেনা। ভগবান জানেন, ইংরাজ ভ্রমণকারীটি কেমন করে এদেশে এসে পড়লেন। তবে ইংরাজদের মাথায় মাঝে-মাঝে শয়তান ভর ক'রে তাদের যত সব অকুতোস্থানে ঘুরিয়ে মারে।

'য়ুরোপীয়ানকে হত্যা করা পাপ; এবং হত্যাকারীদের তার জন্যে শাস্তি পেতেই হবে। এই শাস্তি দেওয়ার জন্যে একদল সেনাবাহিনী পাঠানো উচিৎ কিনা সেবিষয়ে আমাদের সেনাপতি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে একজন ইংরাজকে হত্যা করার জন্যে খুব বেশী একটা হইচই না করাই ভাল।

'তুমি জান, গ্যারিশন শহরের চেয়ে দক্ষিণে সামরিক বাহিনীর স্বাধীনতা অনেক বেশী। এদিকে অফিসার আর তাঁর অধস্তন সেনানীদের মধ্যে বেশ একটা প্রীতির সম্পর্ক রয়েছে। এ জিনিসটা তুমি অন্য কোথাও দেখতে পাবে না। ব্যাপারটা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি এমন সময় একজন অশ্বারোহী সার্জেণ্ট বলে উঠলেন—আমাকে ছ'জন সৈন্য দিলে আমি শয়তানদের শায়েস্তা করে আসব।

ক্যাপটেন হো-হো করে হেসে বললেন—বৎস, তুমি?

হ্যাঁ ক্যাপটেন। চান তো সমস্ত দলটাকেই আমি বন্দী করে আনব।

অফিসারটি ছিলেন খেয়ালী। তিনি সার্জেণ্টের মুখের কথাতেই বিশ্বাস করে বললেন: তোমার খুশিমত ছ'জনকে বেছে নিয়ে কাল সকালেই তুমি বেরিয়ে পড়বে। যদি প্রতিজ্ঞা রাখতে না পার তাহলে বিপদে পড়তে হবে।

'গোঁফের তলায় হেসে সার্জেন্ট বললেন: ভয় নেই কর্ণেল, খুব দেরী হলে বুধবার দুপুরের মধ্যে আমার বন্দীরা এখানে এসে হাজির হবে।

এই সার্জেন্টের নাম সার্জেন্ট মোহাম্মেদ ফ্রিপুইল, মানুষটা একেবারে খাঁটি তুর্কী—অদ্ভুত—আশ্চর্য ধরনের। অনেক ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে সে ফরাসী সেনাবাহিনীতে চাকরি নেয়। গ্রীসে, এশিয়া মাইনর, ইজিপ্ট, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি নানান দেশে সে ঘুরে বেড়ায়; এই সব জায়গায় অনেক খারাপ কাজ নিশ্চয় সে করে এসেছে। সত্যিকার শক্ত বলতে যা বোঝায় লোকটি সেইরকম; হনুমানের মত চতুর, আর সেই সঙ্গে দক্ষ অশ্বারোহী। তার গোঁফ জোড়াটি দীর্ঘায়ত—এত দীর্ঘ যে চোখে না দেখলে মানুষের বিশ্বাস হবে না; আর যমকালো। আরবদের সে সত্যিকার ঘৃণা করত; আর তাদের জব্দ করার জন্যে সব সময় সে নিষ্ঠুর মতলব ভাজতো। তার গায়ে শক্তি ছিল অসীম; আর লোকটা ছিল অসম্ভব রকমের দুর্ধর্ষ।

আমাকে নির্বাচিত করল মোহাম্মেদ। আমার ওপরে বীরপুঙ্গবটির আস্থা ছিল অগাধ, আমাকে নির্বাচন করার জন্যে দেহ আর মনে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আমি যে সম্মানসূচক ক্রশ পেয়েছিলাম তার জন্যে আমি যতটা আনন্দ পেয়েছিলাম—সেদিন তার সঙ্গী হতে পেরেও ঠিক ততটা আনন্দই পেয়েছিলাম।

'মোহাম্মেদ আমাদের প্রত্যেককে দশটা করে দড়ির টুকরো দিল; প্রতিটি টুকরোর দৈর্ঘ্য এক গজ ক'রে, আমিই ছিলাম বয়সে সকলের ছোট; আর দেহের ওজন ছিল আমার সবচেয়ে কম। ফলে আমার ওপরেই ভার পড়ল ওই একশ' গজ দড়ি বওয়ার। এই সব দড়ি দিয়ে কী হবে জিজ্ঞাসা করায় সে ঠাণ্ডা মাথায় তির্যক ভঙ্গীতে বলল: আরবদের বঁড়শীতে গেঁথে তোলার জন্যে।

আমাদের দলের পুরোভাগে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। মাথার ওপরে একটা লাল পাগড়ী বাঁধা; মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় সে ওইভাবেই পাগড়ী বেঁধে নিত। বিরাট গোঁফের আড়ালে সে হাসতে লাগল। দেখতে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। বিরাট দশাসই চেহারার তুর্কী; বিরাট ভুঁড়ি, সুবিরাট কাঁধের পরিধি; ধীর স্থির। মাঝামাঝি দোহারা চেহারা একটা সাদা ঘোড়ার ওপরে চেপেছিল সে; কিন্তু বড় শক্ত, বড় তেজী সেই ঘোড়া। তবে আরোহীটি তার চেয়ে দশগুণ বিরাট। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে ছিল একজন স্প্যানিয়াড, দু'জন গ্রীক, একজন অ্যামেরিকান, তিনজন ফ্রেঞ্চ। বিভিন্ন ঢঙে তারা সব কথাবার্তা বলছিল। আর মোহাম্মেদ ফ্রিপুইলের কথা স্বতন্ত্র। কথা বলার সময় সে অদ্ভুতভাবে তোতলামি করত।

'দক্ষিণ দিকের সূর্য ভয়ঙ্কর; দাবানলের মত; ভূমধ্যসাগরের অপরদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে এ-সূর্যের পরিচয় নেই। সেই রোদের মধ্যে দিয়ে আমরা ধীর গতিতে এগোতে লাগলাম। সারাদিনই আমাদের এইভাবে কাটলো; না পড়ল একটা গাছের ছায়া; না দেখলাম কোন আরবের অধিবাসীকে। দুপুরের দিকে একটা ঝরনার ধারে বসে শুকনো মাটন আর রুটি চিবিয়ে মিনিট কুড়ির মত বিশ্রাম নিলাম আমরা। তারপর আবার চলতে শুরু করলাম।

অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ মোচার মত একটা ছোট পাহাড়ের তলায় আমরা একদল দেহাতি লোকের সন্ধান পেলাম। হলদে মাটির ওপরে তাদের সেই নীচু খয়েরি তাঁবুগুলিকে দেখে মনে হল কালো-কালো বিন্দুর মত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ওগুলো মরুভূমিতে গজিয়েওঠা বিরাট বিরাট লতানে গুল্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

'ওই লোকগুলোকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। একটু দূরে ঘাসের ঘন সবুজ মাঠের ধারে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঘোড়াগুলি ঘাস খাচ্ছে।

'মোহাম্মেদের নির্দেশ এল—'জলদি চল।' ঝড়ের মত আমরা তাঁবুর মাঝখানে এসে হাজির হলাম। ভয়ে হতভম্ব হয়ে সাদা ন্যাকড়া জড়ানো মেয়েরা ঝটিতি ক্যানভাসের তৈরী তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাড়ানো পশুর মত সেখানে শুয়ে-শুয়ে ভয়ে চীৎকার করতে লাগল। আর পুরুষেরা পাহাড়ের চারপাশ থেকে নেমে এল সম্ভবতঃ আত্মরক্ষা করার জন্যে। ওখানকার সবচেয়ে উঁচু তাঁবুটা সম্ভবতঃ ওদের সর্দারের। আমরা সোজা সেইদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

মোহাম্মেদের অনুকরণে আমাদের তরোয়াল খাপেই পোরা ছিল, খুব অদ্ভুতভাবে সে ঘোড়া ছোটালো। ছোট ঘোড়াটার ওপরে খাড়া হয়ে সে চুপচাপ বসে রইল। তার ভারে ঘোড়াটা ছটফট করতে লাগল। লম্বা গোঁফধারী অশ্বারোহীর শান্ত সমাহিত ভাবের সঙ্গে জানোয়ারটির অস্থিরতা বেশ একটা বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল।

'তাঁবুর সামনে যেতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সর্দার। লম্বা রোগাটে চেহারার মানুষ এই সর্দার; কালো, চোখ দুটো তীক্ষ্ণ, মেজাজী; ঝুলেপড়া কপাল; ভুরু দুটি অর্দ্ধ বৃত্তের মত বাঁকানো।

'আরবী ভাষায় সে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করল: কী চাই?

'বলগায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে মোহাম্মেদ তার ঘোড়াটা থামাল; একই ভাষায় বলল: তুমিই কি একজন ইংরেজ পথিককে মেরেছ?

'সর্দার বেশ চীৎকার করেই উত্তর দিল: ও প্রশ্ন করার কোন অধিকার তোমার নেই।

'আমাদের চারপাশে তখন আরবরা ঘিরে ফেলেছে; গর্জন করছে—মনে হচ্ছে ওটা হল ঝড়ের পূর্বাভাষ। তারস্বরে চীৎকার করতে শুরু করেছে তাঁরা। তীক্ষ্ণচক্ষু শিকারী পাখির মত মনে হল তাদের। তাদের হাড়-বার করা রোগা মুখ আর ঢিলে জামা সেই উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

'মোহাম্মেদের চোখে উত্তেজনা; মাথার পাগড়িটা একপাশে সরানো। সে তখন হাসছিল। সকলের স্বর ছাপিয়ে বজ্রনির্ঘোষে সে বলল: যে হত্যা করেছে তাকে আমরা হত্যা করব।

এই বলেই সর্দারের তামাটে মুখের ওপরে সে রিভলবারটা উঁচিয়ে ধরল। নলের মুখ থেকে একটু ধোঁয়া বেরতেও দেখতে পেলাম। তারপরেই সর্দারের মাথার ঘিলুটা ছিটকে পড়ল, তার কপালের ওপরে রক্তের ফোয়ারা ছুটল। মনে হল যেন বিদ্যুতের

স্পর্শে সে আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে গেল—হাত দুটো তার লুটিয়ে পড়ল দু'পাশে।

'চারপাশ প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়ল ; মনে হল আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। মোহাম্মেদ তার তরোয়াল খুলে প্রস্তুত হয় দাঁড়াল ; আমরাও তার দেখাদেখি তরোয়াল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যাঁরা তার কাছাকাছি এগিয়ে এল তরোয়ালের কোপ আকাশের বুকে বসাতে-বসাতে তাদের দূরে সরিয়ে দিল ; তারপর চীৎকার করে বলল : যারা বশ্যতা স্বীকার করবে তাদের আমরা কিছু বলব না ; যারা তা না করবে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

'এই কথা বলে সবচেয়ে কাছের লোকটাকে তার সেই শক্তিমান মুঠোর মধ্যে ধরে সে তাকে শুইয়ে দিল ; তারপরে তার দুটো হাত বাঁধতে-বাঁধতে চীৎকার করে বলল—তোমরাও এই রকম কর : যে বাধা দেবে তাকে তরোয়াল দিয়ে কুঁচিয়ে ফেল।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে এইভাবে আমরা কুড়িজন আরবকে বন্দী করে তাদের হাতগুলো শক্ত করে বেঁধে ফেললাম। তারপরে আমরা পলায়মান লোকদের পিছু ধাওয়া করলাম। আমাদের সেই খোলা তরোয়াল দেখে অনেকেই তখন দৌড় দিয়েছে। আরও প্রায় তিরিশজন লোককে আমরা বন্দী করলাম।

'সারা অঞ্চলটাই তখন সাদা পোশাক-পরা দেহাতি লোকদের ভয়ার্ত চীৎকার আর ছোটাছুটিতে সরগরম হয়ে উঠেছে। মেয়েরা চীৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাচ্চাগুলিকে টেনে তাঁবুর মধ্যে ঢোকাতে লাগল। শেয়ালের মত হলদে কুকুরগুলো তাদের সাদা-সাদা দাঁত বার করে আমাদের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

'আনন্দে আত্মহারা হয়ে মোহাম্মেদ ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে মাটির ওপরে নেমে পড়ল ; তারপরে আমি যে দড়ির গোছা নিয়ে এসেছিলাম সেগুলি আমার কাছ থেকে নিয়ে বলল : বৎসগণ, এখন সাবধান। তোমাদের মধ্যে দু'জন নেমে পড়।

'তারপর সে এমন একটি কাজ করল যেটি যেমন বীভৎস তেমনি হাস্যকর। বন্দীদের বা ঝুলন্ত লোকদের নিয়ে সে একটা লম্বা হার গেঁথে ফেলল। প্রথম বন্দীটার হাতের কব্জী দুটো শক্ত করে বাঁধলো ; তারপরে সেই দড়ির বাকি অংশটা নিয়ে সে তার গলায় ফাঁস বেধে দিল। সেই দর্ড়ির বাকিটুকু দিয়ে দ্বিতীয় বন্দীটির কব্জী বেঁধে তাই দিয়ে তার গলায় লাগাল ফাঁস, আমাদের পঞ্চাশজন বন্দীর অবস্থা দাঁড়াল বিপজ্জনক। কেউ পালানোর চেষ্টা করলেই তার নিজের গলায় তো ফাঁস শক্ত হয়ে বসে যাবেই, উপরন্তু আর দু'জনেরও ফাঁস শক্ত হওয়ার ফলে দম আটকে মরে যাবে তারা, এইভাবে তাদের সমান তালে হাঁটতে বাধ্য করলাম আমরা। পদক্ষেপের একটু ইতরবিশেষ হলেই তাদের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তাদের পক্ষে সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি।

'কাজ শেষ হওয়ার পরে মোহাম্মেদ হাসতে লাগল—সে হাসি নিঃশব্দ—মুখের ওপরে প্রকাশ পেল না বটে; কিন্তু সেই হাসির দমকে পেটটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। "একেই বলে আরব-শৃঙ্খল।" ভয়ার্ত বন্দীদের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমরাও সব হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম।

'আমাদের নেতা নির্দেশ দিলেন—এখন বৎসগণ, একটা-একটা খুটো পুঁতে দড়ির সঙ্গে এদের বাঁধ।

'সেই ভূতুড়ে গতিহীন স্থবির বন্দীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; আমরা যথারীতি খুঁটো পুতে দিলাম।

'নেতা হুকুম দিলেন—এবার ডিনার তৈরী কর।

'আগুন জ্বালানো হল; একটা মেড়াকে ছাড়িয়ে আস্তো ঝলসানো হল সেই আগুনে, সেটাই শুধু হাতে আমরা ভাগ করে নিলাম। তাঁবুর ভেতর থেকে কিছু খেজুর আর দুধ সংগ্রহ করেছিলাম; সেগুলিও উদরস্থ করলাম আমরা। পলাতক আসামীরা যে সামান্য কিছু হীরের গহনা তাঁবুর মধ্যে ফেলে গিয়েছিল সেগুলিও কুড়িয়ে নিলাম আমরা।

'আমরা যখন নিরুপদ্রবে বসে-বসে খানা খাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ল সামনের পাহাড়ের ওপরে একটি অদ্ভুত জনসমাবেশ হয়েছে। এরা সেই পলাতক নারীদের দল, এখন আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। মোহাম্মেদের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করলাম আমি। সে হেসে বলল—ওরাই আমাদের শেষ ভোজনের অনুপান। তাই বটে।

'ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাগলের মত তারা আমাদের দিকে দৌড়ে এল; সেই ভাবে ছুটে আসতে-আসতে আমাদের ওপরে ঝুড়ি-ঝুড়ি পাথর ছুঁড়তে লাগল। লক্ষ্য করলাম তাদের কাছে ছোরাও রয়েছে। আর রয়েছে তাঁবু পোঁতার বড় বড় পেরেক আর ভাঙা মাটির পাত্র।

'মোহাম্মেদ এবার ভয় পেয়েছে বোঝা গেল; সে চীৎকার করে বলল: ঘোড়ায় ওঠ।

'এবারে পালাতেই হবে; কারণ সে-আক্রমণ ভয়ঙ্কর। বন্দীদের মুক্ত করার জন্যে তারা দড়ি কাটার চেষ্টা করতে লাগল, বিপদটা কোথায় বুঝতে পেরে আমাদের নেতা তো ভীষণ ক্ষেপে উঠে হুকুম জারি করল—ওদের কেটে কুঁচিয়ে ফেল, কেটে কুঁচিয়ে ফেল।

'এই নতুন ধরনের আক্রমণে হতচকিত হয়ে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাছাড়া মেয়েদের হত্যা করতেও কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল আমাদের। এই দেখে মোহাম্মেদ একাই তরোয়াল বাগিয়ে তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'সেই ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা নারীদের বিরুদ্ধে একাই সে লড়ে গেল। সেই জানোয়ারটা হত্যার বিপুল আনন্দে এমনভাবে বেপরোয়া তার তরোয়াল ঘোরাতে লাগল যে একটার পর একটা নারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'এত ভয়ঙ্করভাবে সে নিধন-যজ্ঞ শুরু করল যে নারীরা যেমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসেছিল ভীত-চকিত হয়ে তেমনি দ্রুতগতিতেই তারা চারপাশে পালাতে লাগল। পেছনে ফেলে গেল এক ডজনের মত মৃত অথবা আহত নারীদের। তাদের রক্তে পলায়মানাদের সাদা পোশাক লাল হয়ে গেল।

'মোহাম্মেদ বিকৃত মুখে আমাদের দিকে ঘুরে বলল: বৎসগণ, এবার আমরা পালিয়ে যাই চল। ওরা আবার আসছে।

'নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পিছু হটতে শুরু করলাম আমরা—বন্দীদের নিয়ে এগোতে লাগলাম ধীরে-ধীরে। দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ভয়ে তারা কেমন চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে গেল।

'পরের দিন আমরা যখন গলায় দড়ি-বাঁধা বন্দীদের নিয়ে বোঘার-এ হাজির হলাম তখন বেলা বারটা বাজে। পথে মারা গিয়েছিল মাত্র ছ'জন। কিন্তু পথে প্রায়ই আমাদের নেমে বন্দীদের গলার দড়িগুলিকে কিছুটা শিথিল করতে হয়েছিল; অন্যথায় প্রতিটি হেঁকচায় অন্তত দশ থেকে বারজন একসঙ্গে মারা যেত।'

থামল ক্যাপটেন। আমি কোন উত্তর দিলাম না। যেসব দেশে এই সব ঘটনা ঘটে সেই অদ্ভুত দেশের কথা আমি ভাবতে লাগলাম। কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি; সেই সঙ্গে অসংখ্য চকচকে নক্ষত্রের দিকে।

বার্থা

Berthe

ডঃ বোনেট আমার একটি বয়স্ক বন্ধু। মাঝে-মাঝে মানুষের এমন কিছু বন্ধু থাকে যারা বয়সে অনেক বড়। রায়োমে তাঁর সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর জন্যে তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন। ১৮৭৬ সালে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি একটা সময়ে ঠিক করলাম এবার সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করব।

সকালের ট্রেনে নির্ধারিত স্টেশনে হাজির হলাম। হাজির হয়ে প্লাটফর্মের ওপরে প্রথমে যিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি হচ্ছেন ডঃ বোনেট। তাঁর পোশাক ছিল ধূসর রঙের। মাথায় চাপিয়েছিলেন নরম ফেল্ট-এর একটা টুপী—গোল আর কালো; ধোঁয়াহীন চুল্লীর মত তার মাথাটা সূঁচোলো। এইভাবে সজ্জিত হওয়ার ফলে ডঃ বোনেটকে একটি যুবক-বৃদ্ধ বলেই মনে হল আমার—রোগা শরীরের ওপরে হালকা রঙের কোট; বিরাট মাথার ওপরে সাদা ধপধপে চুলের স্তবক।

অনেক দিনের প্রত্যাশিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে মফঃস্বল শহরের মানুষেরা যে অকৃত্রিম আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানান তিনি আমাকে ঠিক

সেইভাবে জড়িয়ে ধরলেন, তারপরে তাঁর দুটি হাত দু'দিকে প্রসারিত করে বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন: এই হচ্ছে আমাদের অভরর্জিঁ শহর।

আমার চোখে কিন্তু চারপাশে পাহাড় ছাড়া আর কিছুই পড়ল না। পাহাড়ের চূড়াগুলি সব ছাঁটাই করা। দেখে মনে হল ওগুলি একদিন আগ্নেয়গিরি ছিল—বর্তমানে নির্বাপিত।

স্টেশনটির ওপরে শহরের নাম লেখা প্লেট একটা ছিল। একটা আঙুল তুলে সেইদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তিনি বললেন: এই সেই রায়োম—ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্মভূমি—আদালতের গর্ব। শহরটিকে আমরা প্রখ্যাত ডাক্তারদের জন্মভূমি বলেও অভিহিত করতে পারি।

কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

তিনি হেসে বললেন: কেন? শহরের নামটা উলটিয়ে পড়—হয়ে যাবে 'মোরি'—যার অর্থ হচ্ছে 'মরা'। সেইজন্যেই তো আমি এরই কাছাকাছি একটা জায়গায় আস্তানা নিয়েছি বৎস।

নিজের রসিকতায় খুশি হ'য়ে হাত কচলাতে-কচলাতে তিনি আমাকে নিয়ে এগিয়ে এলেন।

এক কাপ কফি গলাধঃকরণ করার সঙ্গে-সঙ্গে পুরনো শহরটি দেখার জন্যে বেরোতে হল আমাকে। ডাক্তারের বাড়ি আর অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাড়িগুলি—রঙ তাদের সব ক'টিরই কালো—আমার ভালই লাগল। সেগুলির সামনেটা খোদাই করা পাথর দিয়ে তৈরী। কসাইদের সেন্ট ভার্জিনের মূর্তিটির আমি বেশ প্রশংসা করলাম: আর এই সম্পর্কে আমি এমন একটা হাসির অভিযানের গল্প শুনলাম যে-বিষয়ে আর একদিন আপনাদের আমি কিছু বলব; এমন সময় ডঃ বোনেট বললেন পাঁচ মিনিটের মত ছুটি দাও আমাকে। একটা রোগী দেখতে যাব। ফিরে এসে লাঞ্চের আগেই তোমাকে আমি চ্যাটেল গুয়োঁ পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যাব। সেখান থেকে সারা শহরের দৃশ্যটা তুমি দেখতে পাবে; সেই সঙ্গে দেখতে পাবে পুই-দ্য-ডোম-এর সারা পার্বত্য অঞ্চল। তুমি এই ফুটপাতের ওপরে দাঁড়াও; আমি যাব আর আসব।

মফঃস্বল শহরের পুরনো বিরাট একটি বাড়ির ঠিক উলটো দিকে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি চলে গেলেন। বাড়িটি অন্ধকার, বন্ধ, নিস্তব্ধ এবং নিরানন্দ। বাড়িটার চেহারা দেখে তাকে আমার বেশ অলুক্ষণে বলেই মনে হল। এরকম মনে হওয়ার কারণটা কী তা-ও আমি বুঝতে পারলাম। শক্ত কাঠের জাফরী দিয়ে একতলার সব বড় জানালার নীচের অর্দ্ধেকটাই ঢাকা, খোলা কেবল ওপরের অর্দ্ধেকটুকু, মনে হল এই ঘরে কাউকে বন্দী করে রাখা হয়েছে; এবং সে যাতে বাইরের কিছু দেখতে না পায় তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। ডাক্তার ফিরে এলে তাঁকে আমি ওই কথাটাই বললাম।

তিনি বললেন: ভুল হয়নি তোমার। যে হতভাগ্য প্রাণীটি ওইখানে বন্দী হ'য়ে রয়েছে বাইরের জিনিস কিছুতেই তার দেখা চলবে না। প্রাণীটি একটি উন্মাদিনী

নারী, মূর্খ অথবা পঙ্গুও বলতে পার তাকে। সত্যিই কাহিনীটি বড় করুণ, আর সেই সঙ্গে রোগ নিরূপণবিদ্যার একটি অত্যাশ্চর্য নিদর্শনও বটে। সে-কাহিনী তুমি শুনবে?

বলুন।

তিনি বললেন: আমার মনিব—ওই বাড়ির যাঁরা মালিক—আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তাঁদের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি আর দশটা মেয়েরই মত। কিন্তু আমি শীঘ্রই দেখলাম যদিও বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির শরীর অদ্ভুতভাবে পুষ্ট হয়ে উঠেছে; তবু তার বুদ্ধির বিকাশ একেবারে হচ্ছে না। অতি অল্প বয়স থেকে সে হাঁটতে পারত; কিন্তু কথা বলতে সে আদৌ চাইত না। প্রথমে ভেবেছিলাম মেয়েটা কানে শুনতে পায় না, পরে বুঝলাম—শুনতে সে পায় ঠিকই; কিন্তু বুঝতে পারে না কিছুই। ভয়ঙ্কর শব্দে সে কাঁপতে থাকে, কিন্তু সেই সব হট্টগোলের উৎস কোথায় তা সে বুঝতে পারে না।

বেড়ে উঠল মেয়েটি; শারীরিক গঠন তার অপূর্ব হয়ে দেখা দিল; কিন্তু কথা সে বলতে পারল না—বুদ্ধির দরজা এতটুকু খুলল না। তার মগজের মধ্যে বুদ্ধির রশ্মি ঢোকানোর কত চেষ্টাই না আমি করলাম, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। মনে হল, সে তার নার্সকে চিনতে পারে; কিন্তু দুধ ছাড়ার পর মাকে সে আর চিনতে পারে না। যে শব্দটা শিশুরা প্রথম উচ্চারণ করে, মরার সময় সৈন্যরা যে-শব্দটা একেবারে শেষে উচ্চারণ করে—সেই শব্দটা বলতে সে কোনদিনই জানত না। মাঝে-মাঝে জড়িয়ে-জড়িয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করত সে; কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই মুখ থেকে বেরোত না তার।

আবহাওয়া ভাল থাকলে পাখির কাকলির মত সে হাসত; বৃষ্টি পড়লে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর কুকুরের মত সে আর্তনাদ করত। বাচ্চা পশুর মত সে ঘাসের ওপরে গড়াগড়ি দিতে ভালবাসত; সূর্যের আলো তার ঘরে ঢুকলে আনন্দে সে হাততালি দিত। জানালা খোলা হলেই তাকে পোশাক পরিয়ে দেওয়ার জন্যে সে হাততালি দিত। তার মা বা চাকরাণী, তার বাবা অথবা আমি, কোচয়ান অথবা বাবুর্চি—এদের মধ্যে কোন পার্থক্যই তার নজরে পড়ত না।

তার অসুখী বাপ-মাকে আমার বেশ লাগত; আমি প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের দেখতে যেতাম, প্রায়ই আমি তাঁদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতাম; আর সেই সময়েই দেখতাম বিশেষ কয়েকটি খাবারের ওপরে বার্থার [মেয়েটির নাম বার্থা] বিশেষ ঝোঁক ছিল।

সেই সময় তার বয়স বারো; অথচ দেখতে ছিল আঠারোর মত; আমার চেয়েও সে ছিল লম্বা। হঠাৎ আমার মনে হল ওর মগজের শিরায় কম্পন জাগানোর জন্যে খাবারের ওপরে ওর যে কিছুটা লোভ রয়েছে সেটাকে বাড়িয়ে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়। বিভিন্ন স্বাদ আর গন্ধের খাবার ওর সামনে ধরলে পার্থক্য কিছু ও বুঝতে পারে কি না। তার পরে তার অনুভূতির দরজায় আঘাত ক'রে এবং আমাদের উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হয় এইরকম কিছু শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তার সুপ্ত বুদ্ধিকে জাগানো যায় কি না সেই সব চেষ্টাই আমি করলাম।

সেই জন্যে একদিন তার সামনে আমি রাখলাম এক প্লেট সুপ আর এক প্লেট মিষ্টি ভ্যানিলা কাস্টার্ড। পরপর দুটি প্লেটের খাবারই তাকে চাখালাম। তারপরে নির্বাচনের ভারটা ছেড়ে দিলাম তারই ওপরে। সে নির্বাচন করল ভ্যানিলা কাস্টার্ড। এইভাবে অনতিবিলম্বেই আমি তাকে অত্যন্ত লোভী করে তুললাম। যে খাবার সে পছন্দ করত সেই প্লেটটা সে আঁকড়ে ধরে থাকত; জোর ক'রে সেটা সরিয়ে নিয়ে গেলেই চীৎকার করতে শুরু করত সে।

তারপরে বেল বাজিয়ে খাবার ঘরে যাতে তাকে ডেকে আনা যায় সে চেষ্টা আমি করলাম, সময় অবশ্য বেশ লেগেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলাম আমি। পরিচ্ছন্নভাবে কিছু বুঝতে না পারলেও শব্দ আর স্বাদের মধ্যে সে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল।

আমার এই পরীক্ষার ক্ষেত্র আরও একটু প্রসারিত করলাম। বেশ কষ্টই হয়েছিল আমার; তবে শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা দেখে খাবার সময় ঠিক করতে সে পেরেছিল। যে পদ্ধতিটি এবিষয়ে আমি কাজে লাগিয়েছিলাম সেটা খুব সহজ। বেল বাজার রীতিটি বন্ধ ক'রে দিলাম; ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সবাই খাবার ঘরে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু ঘণ্টা বাজার শব্দ গোণা শিক্ষার চেষ্টাটা আমার ব্যর্থ হয়েছিল। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ হলেই সে দরজার কাছে দৌড়ে যেত। কিন্তু একটু-একটু করে সে হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে খাবারের সঙ্গে সব ঘণ্টাধ্বনির মূল্য এক নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার চোখ দুটো ঘড়ির ডায়ালের ওপরে নিবদ্ধ থাকত।

এই দেখে প্রতিদিনই দুপুর বারোটা আর বিকাল ছ'টায় আমি তাদের বাড়ি যেতাম; আর যে মুহূর্তটির জন্যে সে অপেক্ষা করে বসে থাকত সেই মুহূর্তটি এলেই বারোটা আর ছ'টার ঘরে আমার আঙুলগুলি চেপে ধরতাম। তারই সামনে ব্রাশের তৈরী ঘড়ির কাঁটা আমি একটু ক'রে এগিয়ে দিয়ে দেখলাম কাঁটার এই অগ্রগতিকে সে বেশ গভীরভাবেই লক্ষ্য করছে।

তাহলে সে বুঝতে পারছে! অথবা, ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছে, এটা বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে। ঘড়ির কাঁটার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ঠিক সময়ে খাবার দেওয়ার ফলে মাছদের যেমন সময়ের জ্ঞান জন্মায় আমিও সেইরকম তার মগজে সময়ের একটা জ্ঞান অথবা অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এরপরে সব ছেড়ে বাড়ির সমস্ত টাইম-পিসগুলির ওপরে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। এদের দিকে তাকিয়ে এদের শব্দ শুনে সে জীবন কাটাতে লাগল—অপেক্ষা করতে লাগল উপযুক্ত সময়ের জন্যে। এই সময়েই একটা মজার ঘটনা ঘটলো। ষোড়শ লুই-এর সময়কার একটি সুন্দর ঘড়ির ঘণ্টা বাজার যন্ত্রটি বিকল হওয়ার ফলে ঘণ্টাজ্ঞাপক

ধ্বনি আর হচ্ছিল না। দশটা বাজার শব্দ শোনার অপেক্ষায় মিনিট কুড়ি সে কাঁটা দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। দশটার ঘর কাঁটাগুলি পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যখন কোন শব্দ হল না তখন কেমন যেন হতভম্ব হয়ে সে চুপচাপ বসে রইল; বিরাট একটা বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমরা যেমন চুপচাপ হয়ে ভাবতে থাকি। দেখে মনে হল সে-ও যেন তেমনি ভাবছে। কী হয় দেখার জন্যে সেই ঘড়িটার কাছে সে অদ্ভুত একটা ধৈর্য নিয়ে চুপচাপ বসে রইল এগারটা পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই তখনও তার কানে কোন শব্দ ঢুকল না। তারপরে হঠাৎ সে রেগে উঠল। প্রতারিত বা প্রবঞ্চিত কোন জানোয়ারের মত, অথবা কোন একটা ভীষণ রহস্যের সামনে পড়ে অতিরিক্ত ভয় পেয়েছে এইভাবে রাগে গরগর করতে করতে চুল্লীর কাছ থেকে মোটা সাঁড়াশীটি নিয়ে তখনই ঘড়িটাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেলল।

বোঝা গেল তার মগজ কাজ করছে, হিসাব করতে শিখেছে; অবশ্য স্বাভাবিক বলতে আমরা যা বুঝি সেভাবে নয়; সীমিতভাবে; কারণ সময়ের হেরফেরটা যেমন সে বুঝতে পারত লোকের হেরফের ততটা পারত না। মনের মধ্যে বুদ্ধির শিখা জ্বালাতে গেলে সাধারণ অর্থে দেহের উত্তেজনা বলতে যা বোঝা যায় সেই উত্তেজনা তার মধ্যে জাগাতে হবে।

এদিক থেকে আর একটা প্রমাণও শীঘ্রই আমরা পেয়েছিলাম—যদিও সেই প্রমাণ হচ্ছে ভয়ানক। চেহারার দিক থেকে বার্থা অপরূপ সুন্দরী নারীতে পরিণত হয়েছে। বয়স এখন তার ষোল। অপরূপা বোধশক্তিহীনা ভেনাসের প্রতিমূর্তিতে রূপায়িত হয়েছে সে। এমন নিখুঁৎ চেহারার ষোড়শী আমার চোখে আজ পর্যন্ত পড়েনি। সুন্দরী, পরিপুষ্ট তনুধারিণী, শক্তিময়ী, চোখ দুটি বড়-বড়, পরিচ্ছন্ন, কিন্তু ফাঁকা; ফুলের মত নীলাভ, গোলাকার মুখ, লুব্ধ কামনার্ত ওষ্ঠ; চুম্বন খাওয়ার জন্যে যারা সদা উদ্গ্রীব।

একদিন সকালে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী ক'রে তার বাবা আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন; তাঁকে এতই চিন্তিত দেখা গেল যে আমার প্রভাতী অভ্যর্থনার কোন উত্তর দিলেন না তিনি।

তিনি বললেন: আপনার সঙ্গে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এসেছি। বার্থা...বার্থা কি বিয়ে করতে পারে?

অবাক হয়ে চীৎকার করে উঠলাম আমি: বার্থা?...বিয়ে...অসম্ভব।

তিনি বললেন: হ্যাঁ; তা আমিও জানি...কিন্তু ডাক্তারবাবু ভেবে দেখুন...মানে মনে হয়...যদি ওর ছেলেমেয়ে হোত...এটা তাকে বেশ বড়রকমেরই একটা নাড়া দেবে...কষ্টও পাবে হয়ত...আনন্দও পাবে অনেক...আর মাতৃত্ব তার বুদ্ধিবৃত্তিকে যে জাগাবে না একথা কে বলতে পারে?

আমি বড় গোলমালে পড়ে গেলাম। কথাটা সত্যি। অভিজ্ঞতার নতুনত্ব, সেই অত্যাশ্চর্য মাতৃত্ববোধ—যা নারীর মত পশুদের বুকেও সমানভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যার ফলে বাচ্চাদের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে মা মুরগীরা কুকুরের মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই বোধটা হয়ত তারও বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আলোড়নের সৃষ্টি ক'রে সেই সুপ্ত বুদ্ধিযন্ত্রটিকে চালিয়ে দেবে।

এইরকম একটি অভিজ্ঞতার কথা আমারও হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে আমার ছোট একটা কুকুর ছিল; সেটা এত বোকা যে তাকে দিয়ে আমি কিছু করাতে পারতাম না। তার বাচ্চা হল; তারপরেই একদিন—ঠিক বুদ্ধি নয়, তবে অনেক অল্পবুদ্ধি কুকুরের মতই সে মোড় নিল।

বর্তমান ক্ষেত্রে সেরকম কোন সম্ভাবনা রয়েছে কিনা সেদিকে ভালভাবে বিচার বিবেচনা না ক'রেই বার্থার বিয়ে দেওয়ার জন্যে আমার মনে প্রবল আগ্রহ জাগল। তার জন্যে বা তার হতভাগ্য বাবা-মার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার জন্যেই কেবল এ আগ্রহ আমার জন্মায়নি, জেগেছিল নিছক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জন্যে। এর পরিণাম কী দাঁড়াবে? সমস্যাটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হল।

সেই জন্যে তার বাবাকে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন...আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি...যতটা সম্ভব চেষ্টা করা উচিৎ...কিন্তু...কিন্তু...ওকে বিয়ে করবে এমন পাত্র আপনি পাবেন না।

তিনি একটু নীচু গলায় বললেন: একজন পেয়েছি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম—ভদ্র ছেলে? আপনার সমাজের?

হ্যাঁ; নিঃসন্দেহে।

তার নাম আমি জানতে পারি?

সেই কথাটাই আপনাকে বলে আপনার উপদেশ জানতে এসেছি। পাত্রটির নাম মঁসিয়ে গসটন...

প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলাম—ওই শুয়োরটা! কিন্তু নিজেকে সংযত ক'রে নিলাম আমি; একটু চুপ ক'রে থেকে আমতা-আমতা করে বললাম: হ্যাঁ ঠিক আছে। কোন বাধা দেখছিনা।

হতভাগ্য মানুষটি আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন; বললেন: আগামী মাসেই ওদের বিয়ে হবে।

মঁসিয়ে গসটন যুবক এবং সদ্বংশজাত; কিন্তু বদমাস, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে অশেষ নোংরা কাজ ক'রে ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছে। অর্থ রোজগারের এখন সে নতুন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে; এবং সে-পথটি সে খুঁজে বার করেছে।

ছোকরাটির চেহারা ভাল; কিন্তু হতচ্ছাড়া। মফঃস্বল শহরের ঘৃণ্য অসামাজিক দলের লোক। বাইরে থেকে দেখলে মনে হোত স্বামী হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা তার রয়েছে; কিন্তু ভেতরে সে একেবারে খাজা। এই প্রস্তাব নিয়ে এই বাড়িতে সে এসেছিল; এবং মূর্খ সুন্দরীটির সামনে এমন সব হাবভাব দেখিয়েছিল যে মনে হবে

সে তাকে পছন্দ করে। সে তার জন্যে ফুল কিনে আনত, তার হাতে চুমু খেত, তার পায়ের কাছে বসে প্রেমের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু তার কোন কিছুর দিকেই মেয়েটির কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না; অন্য সকলের থেকে ছেলেটির কোন পার্থক্য সে দেখতে পায়নি।

বিয়ে হয়ে গেল।

তার ভেতরের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না মুখ দেখে তা বোঝার জন্যে বার্থাকে পরের দিনই আমি দেখতে গেলাম। দেখলাম, কোন পরিবর্তনই তার হয়নি। আগের মতই ঘড়ি আর ডিনার নিয়েই সে ব্যস্ত। কিন্তু তার স্বামীকে দেখে মনে হল স্ত্রীকে খুব পছন্দ হয়েছে তার। বিড়ালছানার সঙ্গে মানুষ যেমন খেলা করে সেও তেমনি নানারকম ছোট খাট জিনিসের মাধ্যমে তাকে বিরক্ত করে তার আনন্দবর্দ্ধন করতে চেয়েছিল।

এ-ছাড়া আর কিছু করার ছিল না তার।

এরপরে প্রায়ই আমি নবদম্পতির বাড়িতে যেতাম। আমি শীঘ্রই লক্ষ্য করলাম যুবতীটি তার স্বামীকে চিনতে পেরেছে; এবং মিষ্টি খাবারের ওপরে সে এতদিন যে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তার স্বামীর ওপরেও সেই রকম ভাবে তাকিয়ে রয়েছে।

বার্থা তার স্বামীর চলাফেরা অনুসরণ করত, সিঁড়িতে তার পদশব্দ বুঝতে পারত, স্বামী ঘরে ঢুকলে সে হাততালি দিত; একটি আনন্দে আর কামনায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত। সমস্ত দেহ, আত্মা আর হৃদয় নিয়ে—কৃতজ্ঞ জানোয়ারের হৃদয় দিয়ে—বার্থা তাকে ভালবাসলো।

লোকটি কিন্তু এই সুন্দরী কামনাময়ী, মূক প্রাণীটিকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়িই ক্লান্ত হ'য়ে উঠল। প্রতিদিন কয়েকটি ঘণ্টা ছাড়া বার্থার কাছে আর সে রইল না—রাত্রির কয়েকটি ঘণ্টাই তার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হল।

বার্থার কষ্ট বাড়তে লাগল। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে তার স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করত; তার চোখ দুটি নিবদ্ধ থাকত ঘড়ির ওপরে; খাবার দিকেও তার কোন লক্ষ্য থাকত না; কারণ, বাড়িতে যাতে আসতে না হয় এই জন্যে স্বামীটি বাইরের হোটেল-রেস্তোঁরায় মধ্যাহ্নভোজন সারতো।

রোগা হ'য়ে যেতে লাগল মেয়েটি। তার মন থেকে আর সব চিন্তা-ভাবনা—আশা-আকাঙ্খা নষ্ট হয়ে গেল। যে ক'ঘণ্টা স্বামীর সঙ্গে তার দেখা হোত না সেই ঘণ্টাগুলি তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক হ'য়ে উঠেছিল। তারপর অনতি-বিলম্বেই স্বামীটি তার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল—ক্যাসিনোতে রাত কাটাতে লাগল মেয়েদের নিয়ে—বাড়িতে ফিরতে লাগল ভোর হওয়ার সামান্য কিছু আগে।

স্বামী না ফেরা পর্যন্ত কিছুতেই বার্থা শুতে যেতে চাইত না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চেয়ারের ওপরে সে চুপচাপ বসে থাকত। দূর থেকে স্বামীর ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে যাওয়া মাত্র সে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠত; ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে কিম্ভূতকিমাকারভাবে ঘড়ির দিকে আঙুল তুলে যেন বলতে চাইত—'দেখ কত দেরী

করলে আসতে।' সে তার মূর্খ হিংসুটে প্রেমময়ী স্ত্রীটির সামনে দাঁড়াতে ভয় পেত কিন্তু মনে-মনে সে তাকে সহ্য করতে পারত না। এক রাত্রিতে বার্থাকে সে আঘাত করল।

আমাকে ডেকে পাঠানো হল। প্রচণ্ড ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ—আমি জানিনা আর কী কী কারণ ছিল—বার্থা তখন ভয়ঙ্কর চীৎকারে ফেটে পড়েছে। কে বলবে সেই অপরিণত মগজের মধ্যে কী ঘটছে।

মরফিন ইনজেকশন দিয়ে আমি তাকে শান্ত করলাম; ওই লোকটার সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ করতে তাকে আমি নিষেধ করলাম; কারণ আমি ভাবলাম এই বিয়েই নিঃসন্দেহে তার মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে।

তারপরেই বার্থা পাগল হ'য়ে গেল। হ্যাঁ, প্রিয় বন্ধু, সেই মূর্খ মেয়েটা পাগল হ'য়ে গেল। মেয়েটি সব সময় তার কথা ভাবত, এবং তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকত। সারা দিন আর রাত, প্রতিটি মুহূর্তে, নিদ্রায় এবং জাগরণে বার্থা তার স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকত। তাকে দিন-দিন রোগা হতে দেখে, আর ঘড়ি থেকে তার চোখকে কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না দেখে, সময় মাপার সব কিছু যন্ত্রকে আমি বাড়ি থেকে সরিয়ে দিলাম। এইভাবে সময় পরিমাপ করার সমস্ত সম্ভাবনা দূর করে দেওয়ার ফলে যাতে আর স্বামীর আগমনের পূর্বতন মুহূর্তগুলি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও তার না থাকে সে চেষ্টা আমি করেছিলাম। যে জ্ঞানের শিখা জ্বালাতে একদিন আমি চেষ্টা করেছিলাম আশা ছিল অবশেষে একদিন সেই জ্ঞান তার চিরতরে লুপ্ত হ'য়ে যাবে।

এখন সে রোগা হ'য়ে গিয়েছে; তাকে দেখলে মায়া হয়; তার দুটি চোখ জ্বল-জ্বল করছে; সেগুলি কোটরগত এখন। বন্দী জানোয়ারের মত এখন ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

তার ঘরের জানালার ওপরে দুটো তক্তা বসানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমি; ঝুলিয়ে দিয়েছি উঁচু পর্দা; মেঝের সঙ্গে আঁটিয়ে দিয়েছি চেয়ার—সে আসছে কিনা এটা দেখার জন্যে বার্থা যাতে কিছুতেই রাস্তা দেখতে না পায় এই জন্যে।

তার বাবা-মার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। কী দুঃখই না তাঁরা ভোগ করছেন।

এরই মধ্যে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি। ডাক্তার আমার দিকে ঘুরে বললেন: এখান থেকে রায়োমের দিকে তাকিয়ে দেখ।

শহরটিকে দেখে মনে হল প্রাচীন কালের দেওয়ালঘেরা একটি শহর। ডাক্তার শহরটির সম্বন্ধে নানা কথা আমাকে বলতে লাগলেন। কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না। আমি কেবল মেয়েটির কথা ভাবছিলাম।

হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, স্বামীটির কি হল ?

অবাক হ'য়ে একটু থেমে আমার বন্ধুটি বললেন: তাকে একটি মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই নিয়ে সে রোয়াতে থাকে। সে বেশ সুখেই রয়েছে। সে স্ফূর্তি করেই দিন কাটাচ্ছে।

ওই শুয়োরের বাচ্চা, মোরিঁ

That pig, Morin

ল্যাবার্বকে আমি বললাম: আবার তুমি সেই কথাটা বললে—'ওই শুয়োরের বাচ্চা, মোরিঁ।' আচ্ছা, বলতে পার—'শুয়োরের বাচ্চা' যোগ না ক'রে মোরিঁর নাম কেউ উচ্চারণ করে না কেন?

সম্প্রতি ডেপুটি হয়েছে ল্যাবার্ব। আমার কথা শুনে প্যাঁচার মত চোখ দুটো কুঁচকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল: লা রোচেলি থেকে আসছ, অথচ, মোরিঁর কাহিনী তুমি জান না, এই কথাই কি তুমি আমাকে বলতে চাও?

না; মোরিঁর কোন কাহিনী আমি শুনিনি।

তাহলে শোন।

মোরিঁকে তুমি চেন। কয় দ্য লা রোচেলিতে ওই যে বড় কাপড়ের দোকান হে—ওটা তো তারই।

খুব ভাল করেই চিনি।

১৮৬২ কি ৬৩ সালে স্ফূর্তি করার জন্যে মোরিঁ দিন পনের প্যারিতে কাটায়। তবে উদ্দেশ্যটা সে কাউকে বলেনি; বলেছিল পুরনো মালের বদলে নতুন মাল কেনার জন্যে যাচ্ছে। গ্রাম্য দোকানদারদের কাছে প্যারিতে পনের দিন কাটানোটা যে কি বস্তু তা তুমি জান। রক্ত তাদের উত্তাল হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেক রাত্রিতে এখানে থিয়েটার চলে; মেয়েরা তোমার গা ঘেঁষে চলাফেরা করে—প্রতি মুহূর্তে এখানে উত্তেজনা। এরাই পাগল করে দেয় মানুষকে। খাটো পোশাক-পরা অভিনেত্রী ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। তাদের নগ্ন পা দুটি গোলাকার, মাংস কাঁধ—অর্দ্ধ উলঙ্গ। হাতের কাছেই তারা ঘুরে বেড়ায়; অথচ, তাদের গায়ে হাত দিতে কেউ সাহস করে না। অতি সাধারণ অভিনেত্রীদের সঙ্গেও সামান্য আলাপ-পরিচয় হয়েছে এরকম ঘটনাও বড় দুর্লভ। শুধু তাদের চুমু খাওয়ার জন্যে মানুষের ঠোঁটগুলি কেমন যেন কিলবিল ক'রে ওঠে।

লা রোচেলিতে ফেরার জন্যে রাত্রি ৮-৪০ এর ট্রেনের অপেক্ষায় সে যখন বিরাট প্লাটফর্মের ওপরে পায়চারি করছিল তখনও মোরিঁর মনের অবস্থা ছিল ওইরকম! হঠাৎ সে একটি যুবতীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। যুবতীটি তখন একটি বৃদ্ধাকে চুমু খাচ্ছিস। মেয়েটির মুখের ঘোমটা তোলা ছিল। তাকে দেখেই মোরিঁ আনন্দে নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলল: সুন্দরী মেয়ে একখানা বটে, সত্যি।

বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েটি বিশ্রামাগারের দিকে এগিয়ে যেতেই মোরিঁও তার পিছু নিল। মেয়েটি প্লাটফর্মে গেল; পেছনে গেল মোরিঁ। মেয়েটি একটা খালি

কামরায় উঠল; মোরিঁও উঠল সেই কামরায়। সেই ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা খুব কমই ছিল। হুইসিল্ বাজিয়ে ট্রেন ছাড়ল। কামরার মধ্যে তখন তারা দু'জন। মেয়েটিকে সে চোখ দিয়ে গিলতে লাগল। মেয়েটির বয়স উনিশ—কুড়ির মত—দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী—চুলগুলি তার বিবর্ণ। একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে মেয়েটি ঘুমানোর জন্যে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

মেয়েটি কে সেই কথাটাই অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগল মোরিঁ। হাজার রকমের চিন্তা আর অনুমান তাকে গ্রাস করে ফেলল। সে ভাবল—ট্রেনের পথে কত রকমেরই তো রোমাণ্টিক ঘটনার কথা শোনা যায়। সেইরকমের একটা রোমান্স হয়ত আমার ভাগ্যেও জুটবে! কে জানে। এ রকম ঘটনা অতি দ্রুত ঘটে যায়। সম্ভবতঃ, আমার একটু সাহসের দরকার। দাঁতন না কে যেন বলেছেন—'সাহস, সাহস আরও সাহস।' দাঁতন যদি নাও বলে থাকেন, তাহলে মিরাবু নিশ্চয় বলেছেন। কে বলেছে তাতে কি আসে যায়? কিন্তু বিপদ হচ্ছে আমার সাহস নেই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি না জেনেই প্রতিটি মানুষ প্রতিদিনই অদ্ভুত-অদ্ভুত সুযোগ হারায়। মেয়েটি যে তাকে পছন্দ করে তার সামান্য একটু লক্ষণ চোখে পড়লেই।......

কিন্তু এগোনোর কোন পথ পেল না সে। একটা ছলছুতো করে যে এগোবে সে-রকম কিছুও নজরে পড়ল না তার। বুকটা তার ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল, ওলট-পালট হ'য়ে গেল তার মন। একটা কোন সুযোগের অপেক্ষায় সে অপেক্ষা ক'রে বসে রইল। রাত কেটে গেল। সেই বিদ্যেধরীটি তখনও ঘুমোচ্ছে। মোরিঁ বসে-বসে মেয়েটি কখন ঢলে পড়বে সেই কথা ভাবছিল। সকাল হল। প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়ল কামরার ভেতরে। ঘুম ভেঙে গেল মেয়েটির। উঠে বসে বাইরের দিকে তাকাল। তারপরে তাকাল মোরিঁর দিকে; তাকিয়ে একটু হাসল। মনে হল এই ইঙ্গিতটুকুর জন্যেই যেন সে অপেক্ষা করে বসেছিল। সেই হাসিটি যেন তাকে তিরস্কার করে বলছে—তুমি কী মূর্খ, গর্দভ। সারা রাত ধরে এইভাবে চুপচাপ বসে রয়েছ। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি কি সুন্দরী নই। আমার মত সুন্দরী নারীকে সামনে রেখে সারা রাত তুমি চুপচাপ বসে রয়েছ? তুমি একটি বলিবর্দ ছাড়া আর কী?

মেয়েটির দিকে সে তাকিয়ে দেখল। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে হাসছিল। চোখাচোখি হতেই দেখল কৌতুকে মেয়েটির চোখ দুটি নাচানাচি করছে। সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার মাথা বন-বন করে ঘুরতে লাগল। 'না; আর সহ্য করা যায় না—যা থাকে কপালে'—এই বলে সে উঠে পড়ল; তারপর দুটি হাত প্রসারিত করে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে...তারপর মেয়েটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

চট করে দাঁড়িয়ে উঠল মেয়েটি—"রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলে চীৎকার করতে করতে মেয়েটি গাড়ীর দরজা খুলে বাইরের দিকে হাত নাড়তে লাগল। আতঙ্কে তার মাথা বিকৃত হয়েছে বলে মনে হল—মনে হল, এখনই সে বোধহয় লাফিয়ে পড়বে নীচে। এই দেখে মোরিঁও কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, পাছে মেয়েটি

লাফিয়ে পড়ে এই ভয়ে মোরিঁ মেয়েটির স্কার্টটা পেছন থেকে টেনে ধরল—আর তাকে সাহস দেওয়ার জন্যে বলতে লাগল—ও মাদাম, ও মাদাম...

গাড়ীর গতি কমতে-কমতে থেমে গেল। যুবতীটিকে ওইভাবে ডাকাডাকি করতে দেখে দু'জন শাস্ত্রী সেই কামরাতে উঠে এল—মেয়েটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল—এই লোকটা...এই লোকটা আমার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিল...

এই কথা বলেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

শাস্ত্রীরা মোরিঁকে গ্রেপ্তার করল—তারপরে পুলিশ চার্জশিট তৈরী করল তার বিরুদ্ধে। অনেক রাত ক'রে হতভাগ্য বস্ত্র ব্যবসায়িটি বাড়ি ফিরল—প্রকাশ্যে নারী ধর্ষণ করার অভিযোগ তখন তার মাথায় ঝুলছে।

দুই

সেই সময় আমি ফ্যানাল দ্য ক্যারেনটিস পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। কাফে দ্যু কমার্সে মোরিঁর সঙ্গে আমার তখন প্রায়ই দেখা হোত। তার করণীয় কী রয়েছে তা বুঝতে না পেরে এই ঘটনার পরের দিনই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সব শুনে তার সম্বন্ধে আমার ধারণাটা কী তা প্রকাশ্যে বলতে আমি দ্বিধা করি নি। "তুমি একটা শুয়োর ছাড়া আর কিছু নও।" কোন ভদ্রলোক প্রকাশ্যে ও কাজ করে না।

সে কাঁদতে লাগল; তার স্ত্রী তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়েছে! সে বেশ বুঝতে পারল—এই দুর্নাম ছড়ালে তার ব্যবসা নষ্ট হবে, চারপাশে ছি-ছি করবে লোক, রাস্তায়-ঘাটে দেখা হলে, বন্ধুবান্ধবরা সব মুখ ঘুরিয়ে নেবে। তার অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত মায়া হল আমার। আমি আমার বন্ধু রিভেতকে ডেকে পাঠালাম। বেঁটে খাটো মানুষ রিভেত খুব বুদ্ধিমান। পরামর্শ ক'রে দেখা যাক সে কী বলে।

পাবলিক প্রসিকিউটর আমার বন্ধুলোক। রিভেত তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমাকে উপদেশ দিল। মোরিঁকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম যাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়েছিল তিনি একটি যুবতী—কুমারী হেনরিয়েত বার্নেল। প্যারিস থেকে সম্প্রতি তিনি শিক্ষয়িত্রীর পরিচয়পত্র নিয়েছেন, তাঁর বাবা-মা নেই। তিনি তাঁর কাকার বাড়ি মজ-এ গিয়েছিলেন ছুটিতে। তাঁর কাকা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, এবং সম্মানিত। বিপদ হয়েছে অভিযোগ করেছেন তাঁর কাকা। তবে তিনি যদি তাঁর অভিযোগ তুলে নেন তাহলে পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোবে না।

মোরিঁর বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখলাম বেচারা শুয়ে রয়েছে; উত্তেজনা আর মনোবেদনায় সে মর্মাহত হ'য়ে পড়েছে। তার স্ত্রীর দীর্ঘাঙ্গিনী—আসুরিক চেহারা—একটু

দাড়ির ছায়া পড়েছে গালের ওপর; তাকে ক্রমাগত গালাগালি দিচ্ছিল। ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে সে আমাকে চীৎকার ক'রে বলল: 'আপনি ওই শুয়োর মোরিঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বুঝি! ওই যে—ওই সোনার-টুকরো শুয়ে রয়েছে।'

এই কথা বলে সে নিজের হাঁটুর ওপরে একটা হাত চাপিয়ে বলদৃপ্ত ভঙ্গীতে বিছানার পাশে এসে বসল। সমস্ত ঘটনাটা তাকে আমি খুলে বললাম। সব শুনে মেয়েটির কাকার সঙ্গে দেখা করে একটা ফয়সালা করতে সে আমাকে অনুরোধ করল। কাজটা দুরূহ সন্দেহ নেই। তবু দায়িত্বটা না নিয়ে আমি পারলাম না। হতভাগাটা বার-বার আমাকে বলতে লাগল—বিশ্বাস করুন, আমি তাকে চুমু খাইনি—মানে খাওয়ারও চেষ্টা করিনি—যদি দিব্যি করতে বলেন তাতেও আমি রাজি।

আমি বললাম—দিব্যি করতে হবে না। তুমি একটি শুয়োর ছাড়া আর কিছু নও।

উঠে আসার সময় প্রয়োজনমত খরচ করার জন্যে সে আমাকে এক হাজার ফ্রাঁ দিল। একা যাওয়া নিরাপদ নয় জেনে বন্ধু রিভেতকে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করলাম। পরের দিনই তার একটা জরুরী কাজ ছিল। সেইজন্যে সেইদিনই আমরা যাত্রা করলাম দু' ঘণ্টা পরে, আমরা একটা সুন্দর গ্রাম্য বাড়ির কলিং বেল টিপলাম। একটি সুন্দর চেহারার মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। ওই মেয়েটিই যে সেই মেয়ে সেবিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। আমি রিভেতকে নীচু গলায় বললাম—সাবাস! মোরিঁকে এবারে আমি বুঝতে পারছি।

কাকার নাম মঁসিয়ে টোনেলেট। তিনি ফ্যানাল পত্রিকার একজন পাঠক; এবং আমাদের রাজনৈতিক মতবাদের একজন গোড়া সমর্থক। আনন্দে হাত দুটি প্রসারিত ক'রে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের শুভ কামনা করলেন। তাঁর প্রিয় সংবাদপত্রের দু'জন সম্পাদককে তাঁর ঘরে আসতে দেখে খুব খুশি হলেন তিনি। রিভেত আমাকে ফিস-ফিস করে বলল—মনে হচ্ছে, শুয়োর মোরিঁর সমস্যাটা আমরা সহজেই মিটিয়ে ফেলতে পারব।

মেয়েটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে অতি সন্তর্পণে আমরা কথাটা পাড়লাম। ঘটনাটা বাইরে ছড়িয়ে পড়লে তাঁদের যে দুর্নাম রটার সম্ভাবনা রয়েছে সে-কথাও তাঁকে আমরা জানালাম—তার ফলে যুবতীটির মর্যাদা যে ক্ষুণ্ন হবে সেকথাও জানাতে দ্বিধা করলাম না আমরা—কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না যে ওই পরিস্থিতিতে লোকটি তাঁকে সামান্য একটা চুমু খেয়েই ছেড়ে দিয়েছিল। ভদ্রলোকটিও আমাদের আশংকাকে একেবারে নাকচ ক'রে দিতে পারলেন না। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার আগে এবিষয়ে কিছু স্থির করতে পারলেন না তিনি। তাঁর স্ত্রী তখন বাড়ি ছিলেন না। সন্ধের আগেও তাঁর বাড়ি ফেরার কোন সম্ভাবনা ছিল না। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠলেন: বহুৎ আচ্ছা; আপনারা আজ এখানে থেকে যান—খাওয়া দাওয়া

করুন। আমার স্ত্রী ফিরে এলে এবিষয়ে সন্তোষজনক একটা মীমাংসায় আসার পথে কোন অসুবিধে হবে না বলে আমার মনে হয়।

এ প্রস্তাবে প্রথমে রাজি হয়নি রিভেত; কিন্তু শুয়োর মোরিঁকে হয়ত বাঁচানো যাবে এই আশায় সে শেষ পর্যন্ত থাকতে রাজী হয়ে গেল। কাকা উঠে পড়লেন খুশি হ'য়ে; তারপর ভাইঝিকে ডেকে বললেন: সিরিয়াস কথাবার্তা সব সন্ধের পরে হবে। এখন একটু বাগানে বেড়াতে যাই চল।

সবাই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। রিভেত তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আমরা পড়লাম কিছুটা পিছিয়ে। অদ্ভুত চমৎকার মেয়েটি। অতি সন্তর্পণে সেদিনের ঘটনার উত্থাপনা ক'রে তার ওপরে সহানুভূতি জানিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করলাম আমি। দেখে মনে হল, সেদিনের ঘটনায় মেয়েটি মোটেই বিভ্রান্ত হয়নি, আমার কাহিনীটি সে বেশ খুশি হ'য়েই শুনল।

আমি তাকে বললাম: ব্যাপারটা কী বিশ্রী একবার ভেবে দেখুন, মিস। আপনাকে আদালতে হাজির হ'তে হবে; সে রাত্রির ঘটনাটিকে আনুপূর্বিক বর্ণনা করতে হবে; উৎসুক জনতা আপনার কথাগুলি রসিয়ে-রসিয়ে গিলবে। আচ্ছা বলুন তো ওইভাবে চীৎকার করে পুলিশের সাহায্য না নিয়ে আপনি কি জানোয়ারটার সঙ্গ ছেড়ে অন্য কোন কামরায় যেতে পারতেন না?

মেয়েটি হাসতে-হাসতে বলল: আপনার কথা সত্যি। কিন্তু কি করব বলুন? ভয়ে বিভ্রান্ত হলে মানুষ তার জ্ঞানগম্যি সব হারিয়ে ফেলে। ব্যাপারটা বুঝতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ ডাকার জন্যে আমি বেশ দুঃখিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন দেরী হ'য়ে গিয়েছে। মনে রাখবেন, লোকটা কিছু না বলেই উন্মাদের মত আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; সে যে কী চাইছিল তাও আমি বুঝতে পারিনি।

কোনরকম ভয় বা সঙ্কোচ না করেই মেয়েটি আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাল। নিজের মনেই আমি বললাম—মেয়েটি বড় সপ্রতিভ। শুয়োর মোরিঁ যে কেন ভুল করে বসল তা আমি বুঝতে পারছি।

আমি তাকে ঠাট্টা ক'রে বললাম: শুনুন মিস; আপনি স্বীকার করুন, লোকটা নিরপরাধ; কারণ আপনার মত অপরূপ সুন্দরীর মুখোমুখী বসে আপনাকে চুম্বন করার নীতিগত বাসনা কোন পুরুষের জন্মাবে না একথা নিশ্চয় আপনি অস্বীকার করবেন।

কথাটা শুনে মেয়েটি আরও জোরে হাসতে লাগল; কচি-কচি দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল তার। সে বলল: বাসনা আর কাজ করার মধ্যে একটা সম্ভ্রম-বোধ থাকা উচিৎ মঁসিয়ে।

তার বলার ধরনটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগল। হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ধরুন, আমি যদি এখনই আপনাকে চুমু খাই আপনি কী করবেন?

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার তাকাল, তারপরে শান্তভাবে বলল: আপনি! সে অন্য কথা।

বাজি রেখে বলতে পারি, আমাদের দু'জনের মধ্যে তফাৎ ছিল। আমার চেহারা সুন্দর—সবাই আমাকে ডাকত 'ল্যাবার্ব কার্তিক' ব'লে। তখন আমার বয়সও ছিল তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু তবু আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বলুন তো?

মেয়েটা কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল: কারণ আপনি, আপনি তার মত বোকা নন।

তারপরে পাশে তাকিয়ে বললেন: তার মত কদাকারও নন।

আমাকে এড়ানোর জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করার আগেই আমি তার গালে একটা চুমু খেলাম। সে চমকে লাফিয়ে সরে গেল; কিন্তু যা হওয়ার তখন হ'য়ে গিয়েছে। মেয়েটি বলল: আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিশেষ লজ্জিতও হননি। কিন্তু ওকাজ আর করবেন না।

নিরপরাধ দৃষ্টি মেলে দিয়ে নীচু গলায় আমি বললাম: হায়রে কপাল; আমি যদি আর কারও চেয়ে আপনার কাছে বেশী কিছু চাই তাহলে ওই মোরিঁর মত আমাকেও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

কেন?

তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলাম আমি: কারণ, আপনার সৌন্দর্য অপরূপ। কারণ, আপনার কাছ থেকে জোর করে কিছু আদায় করতে পারলে সেটা আমার কাছে গৌরবজনকই হবে। সবাই বলবে ল্যাবার্ব সত্যিকারের সৌভাগ্যবান।

মেয়েটি আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বলল: আপনি বেশ মজার মানুষ দেখছি।

কথাটা তার শেষ হওয়ার আগেই আমি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম; তারপর তার সারা দেহে, কপালে, গালে, চোখে, মাথায়, মাঝে-মাঝে ঠোঁটে চুমুতে-চুমুতে ভরিয়ে দিলাম। শরীরের কিছু-কিছু অংশ বাঁচানোর জন্যে যেসব অংশ তার উন্মুক্ত হল সেগুলিতেও চুমু খেতে আমি দ্বিধা করলাম না। অবশেষে মেয়েটি আমাকে ছাড়িয়ে নিল। মুখ তখন তার লজ্জায় আর উত্তেজনায় লাল হ'য়ে উঠেছে। সে রেগে বলল: মঁসিয়ে, আপনি সভ্যতা জানেন না। আপনার কথা এতক্ষণ আমি শুনেছি বলে দুঃখ হচ্ছে আমার।

কিছুটা বিভ্রান্ত হ'য়ে আমি তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমতা-আমতা করে বললাম: ম্যাদময়জেল, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে বিরক্ত করেছি। আমি পশুর মত ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে। যা করেছি তার জন্যে আমার ওপরে আপনি রাগ করবেন না। আমি যদি জানতাম—

জুৎসই একটা কৈফিয়ৎ খোঁজার চেষ্টা ক'রেও কিছু যোগাল না। কয়েক সেকেণ্ড পরে মেয়েটি বলল: জানার কিছু দরকার আমার নেই, মঁসিয়ে।

কিন্তু ততক্ষণে আমার মুখে কথা জুগিয়েছে; আমি বললাম: ম্যাদময়জেল, গত একটি বছর ধরে আমি আপনাকে ভালবাসছি।

আমার কথা শুনে সত্যিই অবাক হ'য়ে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম: আমার কথা সত্যি। মোরিঁকে আমি চিনিনা; তার কী হবে বা না হবে তা নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। সে হাজতে গেলেও আমার কিছু যাবে আসবে না। গত বছর এই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে আপনাকে দেখেছিলাম। বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, সেই থেকে আপনি আমার মন এবং প্রাণ অধিকার ক'রে ফেলেছেন। আপনাকে দেখার জন্যে, পরিচিত হওয়ার জন্যে আমি ছটফট করছিলাম। মূর্খ মোরিঁ সেই সুযোগটা আমাকে দিয়েছে। অবশ্য ঘটনার পরিস্থিতিতে আমি কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি; সেই জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমার মুখের দিকে তাকাল মেয়েটি। সত্যি বলছি কিনা সেটাই হয়ত সে যাচাই করতে চাইছিল; ঠোঁটের ওপরে হাসির রেখা দেখা গেল। তারপরে সে বিড়-বিড় করে বলল: হামবাগ কোথাকার!

আমি হাত তুলে গাঢ় স্বরে বললাম: শপথ করে বলছি, আমার কথা সত্যি।

বলেন কী?...সহজভাবে মন্তব্য করল মেয়েটি।

রিভেত আর মেয়েটির কাকা দূরের পথে অদৃশ্য হওয়ার ফলে আমরা দু'জনে একা হ'য়ে গেলাম। মেয়েটিকে আমি যে কত ভালবাসি সেকথা তাকে আমি বললাম—বললাম অনেক মিষ্টি-মিষ্টি কথা—সে সব শুনল—কতটা বিশ্বাস করল তা আমি জানিনা। অবশেষে আমার উন্মাদনা জাগলো; আমার নিজেরই যেন মনে হল আমি যা বলেছি সব সত্যি। আমার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল; কাঁপতে লাগলাম আমি। ধীরে-ধীরে আলতোভাবে মেয়েটির কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে ফিস-ফিস ক'রে অনেক কথা বললাম। ধীরে-ধীরে একসময় আমার হাতের ওপরে তার একটি হাত নেমে এল; আমার আঙুলে চাপ দিল সে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম—সে নড়লো না; একভাবে বসে রইল। তারপরে আবার চুমুতে-চুমুতে ভরিয়ে দিলাম তার সর্বাঙ্গ। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম জানিনা, হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমার ঠিক পেছনে কে যেন গলা খাঁকারি দিল। সে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঝোপের মধ্যে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ঘুরে দেখি রিভেত আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝপথে থেমে সে একটুও না হেসে বলল: এইভাবেই তুমি শুয়োর মোরিঁর সমস্যার সমাধান করছ নাকি?

বললাম: বন্ধু, মানুষ যেটুকু পারে তাই সে করে। কিন্তু কাকাটির সংবাদ কী? তাঁকে তুমি বোঝাতে পেরেছ? ভাইঝির ব্যবস্থা আমি করব।

সে বলল: বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

তিন

ডিনারের পরে চাঁদের আলোতে আবার আমরা বেড়াতে গেলাম। এবারেও মেয়েটিকে অনেক প্রেমের কথা আমি শোনালাম। বার-বার তাকে কাছে টেনে আলিঙ্গন

করলাম—চুম্বন করলাম বার-বার। তার কাকা আর রিভেত গল্প করতে-করতে আগে-আগে চলছিলেন। পেছনে বালির রাস্তায় তাদের ছায়া পড়ছিল। আমরা বাসায় ফিরে আসার পরে একটি টেলিগ্রাম এল—মেয়েটির কাকিমা পরের দিন সকাল সাতটায় প্রথম ট্রেনে ফিরছেন।

কাকা বললেন: হেনরিয়েত, তুমি ওঁদের শোওয়ার ব্যবস্থা কর।

প্রথমেই সে রিভেতকে ঘরে নিয়ে গেল; তারপর আমাকে সঙ্গে ক'রে আর একটা ঘরে এসে হাজির হল। ঘরের মধ্যে ঢুকেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম—চুমু খেলাম—তার উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা করলাম। প্রতিরোধ করার শক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে বুঝতে পেরেই একসময় আমার আলিঙ্গন ছাড়িয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে। শুয়ে পড়লাম আমি। ঘুম না আসায় আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়।

কে?

আমি।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকে এল মেয়েটি।

কাল সকালে কী খাবেন আপনি—চকোলেট, চা, না কফি? জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছলাম আমি।

আবার তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে-খেতে বললাম—আমি...আমি...

কিন্তু সে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় ঘরের বাতিটা দিয়ে গেল নিবিয়ে। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি দেশলাই কাঠি খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। শেষকালে অনেক কষ্টের পরে একটা দেশলাই সংগ্রহ করে অর্দ্ধোন্মাদের মত বাতিটা জ্বালিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

কী করতে যাচ্ছি সেকথা ভাববার মত সময় তখন আমার ছিল না। মেয়েটিকে খুঁজে বার করার জন্যে আমি হন্যে হয়ে উঠেছিলাম। কোন কিছু চিন্তা না ক'রেই কয়েক পা আমি এগিয়ে গেলাম; তারপরেই থমকে দাঁড়ালাম। যদি কাকার ঘরে ঢুকে পড়ি? ধরা পড়ে গেলে কী বলব? কয়েক সেকেণ্ড ভাবলাম। তারপরেই যুৎসই একটা কৈফিয়ৎ খুঁজে পেলাম। ধরা পড়ে গেলে বলব একটা প্রয়োজনীয় কাজে রিভেত-এর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। এগিয়ে গেলাম আমি—প্রতি ঘর আর জানালায় টোকা দিলাম। শেষ পর্যন্ত একটি ঘরের দরজা খুলে দেখি মেয়েটি বসে রয়েছে। আমাকে দেখেই তার চোখের ওপরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ঘরের দরজা নিঃশব্দে বন্ধ করে আমি ভেতরে ঢুকে গিয়ে বললাম: একটা বই পড়ার কথা বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

মেয়েটি অস্বস্তিতে নড়ে-চড়ে বসল। যে-বইটা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সেই বইটা আমি শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম। কী বই সেকথা আমি তোমাকে বলব না। কিন্তু বইটা বড় রোমান্টিক—সুন্দর-সুন্দর কবিতায় একেবারে ঠাসা। একটা খুলে

তাকে দেখালাম। তারপরে পাতার পর পাতা উলটে যেতে সে আমাকে ইঙ্গিত করল। এইভাবে পরিচ্ছেদ ওলটাতে-ওলটাতে একসময় বাতিটি পুড়ে নিঃশেষ হ'য়ে গেল।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিঃশব্দে আমি ঘরে ফিরে আসছিলাম এমন সময় একটা শক্ত হাত আমাকে ধরে ফেলল; গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম আততায়ী রিভেত ছাড়া আর কেউ নয়। সে আমাকে ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করল: তুমি এখনও সেই মোরিঁ শুয়োরের সমস্যাটার সমাধান করতে ব্যস্ত রয়েছ?

পরের দিন সকাল সাতটায় মেয়েটি নিজেই এক কাপ চকোলেট নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলো। এমন সুন্দর মোলায়েম, ভেলভেট রঙের সুগন্ধী আর মেজাজী চকোলেট আমি আর কখনও খাইনি। মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই রিভেত ভেতরে এসে ঢুকলো। দেখে মনে হল সে কেমন যেন ভয় পেয়েছে—মেজাজটা তার তিরিক্ষি হ'য়ে উঠেছে। সে বেশ চটেই বলল: তুমি যদি এইভাবে চল তাহলে সেই মোরিঁ শুয়োরটার 'কেস' বানচাল হ'য়ে যাবে।

বেলা আটটায় কাকিমা এসে পৌঁছলেন। আমাদের আলোচনা সামান্যই হল। তাঁরা তাঁদের অভিযোগ তুলে নিলেন; আর শহরের দরিদ্র সেবার জন্যে আমি তাঁদের হাতে পঁচিশ ফ্রাঁ দিয়ে এলাম। দিনের বেলাটা সেইখানে থেকে শহরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি দেখার জন্যে তাঁরা আমাদের অনুরোধ করলেন। হেনরিয়েতও কাকার পেছন থেকে আমাকে থেকে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করল। আমি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম: কিন্তু রিভেত কিছুতেই রাজি হয়নি। অনেক অনুরোধ করলাম তাকে। সে চটে বলল: মোরিঁ শুয়োরের কেসটা নিয়ে আমার অনেক হয়েছে, বুঝেছ?

আমাকেও ফিরতে হল; কিন্তু জীবনে বোধ হয় এত কষ্ট আর কখনও আমার হয়নি। এই সমস্যা সমাধান করার জন্যে সারাটা জীবনও যদি আমাকে কাটাতে হোত তাহলেও আমার কোন দুঃখ থাকত না। ট্রেনের কামরায় ওঠার আগে হেনরিয়েতের সঙ্গে নিঃশব্দে করমর্দন করে রিভেতকে আমি বললাম: 'তুমি একটি পশু'। রিভেত বলল: বন্ধু, তুমি আমাকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলেছিলে।

ফ্যানালের অফিসে ফিরে এলাম আমরা। বিরাট একটি জনতা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাদের দেখেই তারা চীৎকার করে উঠল: মোরিঁ শুয়োরের ব্যাপারটার ফয়সালা করে এসেছেন?

ট্রেনেই রিভেতের মেজাজটা ভাল হ'য়ে এসেছিল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে সে বলল: হয়েছে। ল্যাবার্বকে ধন্যবাদ।

মোরিঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি পায়ে সরষের প্রলেপ দিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দুঃখে প্রায় মরার মত হয়ে বেচারা একটা আরাম কেদারায় শুয়ে তখন অনবরত কাশছিল। তার স্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছিল বাঘিনী বলে—তাকে ছিঁড়ে মেরে ফেলার জন্যে সে যেন তৈরী হ'য়ে বসে রয়েছে। আমাদের দেখেই সে এমন কাঁপতে লাগল

যে তার হাত পা অবশ হ'য়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি কালক্ষেপ না করেই বললাম—নোংরা ইতর কোথাকার—তোমার ব্যাপারটা মিটিয়ে এসেছি। আর কোন দিন ওকাজ করো না।

আবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে উঠল; আমার হাত ধরে গভীর সম্ভ্রমে চুম্বন করল; এমন কি আনন্দের আতিশয্যে মাদামকেও একটা চুমু খেল। মাদাম তাকে ঠেলে ফেলে দিল। বেচারা আরাম কেদারার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু এই ধাক্কা কোনদিনই সে সামলে উঠতে পারেনি। তার মন একেবারে ভেঙে পড়েছিল। চারপাশে সবাই তাকে লক্ষ্য করে বলত—ওই মোরিঁ শুয়োর! কথাটা তরোয়ালের ফলার মত তার বুকে গিয়ে আঘাত করত। তার বন্ধুরাও তাকে নিয়ে এই রকম নিষ্ঠুর তামাশা করত; শুয়োরের মাংস খেতে-খেতে তারা বলত—এটা কি তোমারই মাংস নাকি হে?

দু'বছর পরে সে মারা গেল।

১৮৭৫ সালের 'চেম্বার অফ ডেপুটি' নির্বাচনে আমি একজন প্রার্থী ছিলাম। টোসারির নতুন নোটারি মঁসিয়ে বেলোনকোলের বাড়িতে গিয়েছিলাম ভোট ভিক্ষা করার জন্যে। সেইখানে দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী, বেশ দামী পোশাক-পরা একটি মহিলা আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে চিনতে পারছেন?

না—না তো মাদাম—

হেনরিয়েত বোর্নেল?

আরে তাইত, তাইত! কেমন যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেলাম আমি। তার কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই; আমার দিকে চেয়ে সে একটু হাসলো মাত্র।

স্বামীর জিম্মায় আমাকে রেখে হেনরিয়েত চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মঁসিয়ে আমার দুটি হাত বেশ জোরেই মর্দন করে বললেন: অনেক দিনই ভেবেছি আপনার বাড়ি গিয়ে আলাপ করে আসব। আমার স্ত্রী আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে বলেছে। আমি জানি কী রকম একটি যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে আপনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন—আমি এটাও জানি কী ভদ্র, সঙ্কোচ আর সম্ভ্রমের সঙ্গে আপনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন—তারপরেই একটু দ্বিধা করে যেন একটা ঘৃণ্য কথা বলছেন, এইভাবে স্বর নীচু করে বললেন: আমি ওই শুয়োর মোরিঁর কথা বলছি।

একটি নরম্যান

A Norman

রাওয়েন ছেড়ে জুমিয়েজের পথে জোর কদমে আমরা এগিয়ে চলেছি। দু'-পাশে মাঠ; মাঝখান দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তার ওপর দিয়ে আমাদের হালকা গাড়ীটা ছুটছিল। এক জায়গায় এসে ঘোড়াটা থেমে গেল। এবার আমাদের ক্যানটেলুর পাহাড়ে উঠতে হবে।

মরি মরি—কী অপরূপ দৃশ্য! আমাদের পেছনে রাওয়েন। গির্জার শহর এই রাওয়েন। গোথিক আমলের ঘণ্টা ঘর এই সব গির্জায় আপনারা দেখতে পাবেন। হাতির দাঁতের অলঙ্কারের মত কারুকার্য করা তাদের দেহ। সামনে আমাদের কারখানার শহরতলি সেন্ট-সেভার। প্রাচীন শহরের ঠিক উলটো দিকে হাজার হাজার ধোঁয়া উদ্গীরণকারী চিমনি আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদিকে মানুষের হাতে-গড়া বিরাট গির্জার চূড়া; আর এক দিকে তারই প্রতিদ্বন্দ্বী লা ফোডারের "ফায়ার পাম্প," উচ্চতায় ইজিপ্ট-এর সবচেয়ে উঁচু পিরামিডের চেয়ে কিছু বেশী।

আমার বন্ধুটি শহরতলীর মানুষ। আমার চোখ দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার কথা তাঁর নয়। কিন্তু ক্রমাগতই তিনি হাসতে লাগলেন। মনে হল যেন নিজের মনে-মনেই তিনি হাসলেন। হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—আ, এবার তুমি একটা মজার জিনিস দেখতে পাবে। জিনিসটা হল ফাদার ম্যাথুর গির্জা। দেখার মত জিনিস।

বলার ধরন দেখে আমি তাঁর দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি নিজের আবেগেই বলে গেলেন: নরম্যানডির একটি মিষ্টি সুবাস তোমাকে আমি সোঁকাব। এই সুবাসটি তোমার নাকে লেগে থাকবে। এই অঞ্চলে ফাদার ম্যাথু হচ্ছেন সবচেয়ে সুপুরুষ নরম্যান। তাঁর গির্জাটিও হচ্ছে বিশ্বের একটি পরম আশ্চর্য বস্তু। যাকে বলে সত্যিকার আশ্চর্য! কিন্তু ভূমিকা হিসাবে এখানে তোমাকে আমি কিছু বলব। ফাদার ম্যাথু একজন ভূতপূর্ব সার্জেন্ট-মেজর। লোকে তাঁকে ফাদার বুজ বলেই ডাকে। অবসর নিয়ে তিনি গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর চরিত্রে গুণ ছিল দুটি; একটি হচ্ছে তাঁর সামরিক দম্ভ; আর একটি হচ্ছে নরম্যানদের চাতুরী। তাঁর মুরুব্বি ছিল অসংখ্য; ছলাকলাও ছিল তাঁর অবিশ্বাস্য রকমের বহুমুখী। এই দুটি গুণের জোরে এই অঞ্চলের একটি অলৌকিক গির্জার প্রধান যাজকের পদটা তিনি পান। অলৌকিক বলছি এই জন্যে যে এই গির্জার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন স্বয়ং ভার্জিন; আর এখানে যারা নিয়মিত আনাগোনা করে তাদের মধ্যে গর্ভবতী অল্পবয়সী মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। এই গির্জায় যে অদ্ভুত সুন্দর বিগ্রহটি রয়েছে তিনি তার নাম দিয়েছেন "নতারদাম দ্যু গ্রস-ভেনতার।" এই বিগ্রহটির সঙ্গে তিনি বেশ ঘরোয়াভাবেই মেলামেশা করেন।

এই মেলামেশার রীতি দেখে লোকে তাঁকে বিদ্রূপ করলেও শ্রদ্ধার কিন্তু এতটুকু অভাব ছিল না তাঁর। তাঁর ইষ্টদেবী "গুড ভার্জিনের" স্তবের জন্যে তিনি নিজেই বিশেষ কয়েকটি প্রার্থনার পদ রচনা করে সেগুলি ছাপিয়ে রেখেছেন। অনিচ্ছাকৃত ব্যঙ্গ আর নরম্যানদের জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তি—এ-দুটির অদ্ভুত মিশ্রণ এগুলির মধ্যে দেখা যাবে। সেন্টদের মানুষ স্বভাবতই ভয় করে। কোন একটি রহস্যময়ী গোপন শক্তির প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকেই এই ভীতির উৎপত্তি। ইষ্টদেবীর ওপরে তাঁর নিজের কিন্তু খুব একটা আস্থা নেই। তবু, যেটুকু রয়েছে সেটুকুকে তিনি নীতি হিসাবেই ব্যবহার করেন। এই অনবদ্য প্রার্থনার প্রথম ছত্রটি কী দেখ:

"এই অঞ্চল, তথা সারা বিশ্বের অল্প বয়সী মা-মেয়েদের অবিতর্কিতা পেট্রন আমাদের 'গুড লেডি ভার্জিন মেরী,' মুহূর্তের ভ্রান্তিতে তোমার যে সেবিকা অপরাধ করেছে, তাকে তুমি ক্ষমা কর।"

প্রার্থনার শেষ হচ্ছে এইভাবে:

"বিশেষ ক'রে তোমার দেবদূত স্বামীর কাছে আমার হ'য়ে কিছু বলতে তুমি ভুলে যেয়ো না। তোমার স্বামীর মত আমি একটি সৎ স্বামী পাইয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি যেন পরম পিতা ভগবানের কাছে আর্জি পেশ করেন।"

এই প্রার্থনা স্থানীয় যাজক সম্প্রদায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই এগুলিকে তিনি গোপনে বিক্রী করেন। যারা কপটচারী এগুলি তাদের কাছে সত্যিই বড় উপাদেয়। আসলে একটি প্রথিতযশা মহামহিমান্বিত রাজকুমারের পরিচারক যে তার প্রভুর অনেক কিছু ছোটখাট অন্তরঙ্গ গোপন কাজের সংবাদ রাখে—সে তার প্রভুর সম্বন্ধে যেমনভাবে প্রচার চালায়, ভার্জিন মেরীর সম্বন্ধেও তিনি ঠিক সেইভাবে প্রচার চালাতেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক ছোটখাট গল্প তিনি জানেন; মদ খাওয়ার পরে সেগুলি তিনি বন্ধুদের কানে-কানে বলেন।

কিন্তু এ বিষয়ে তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকা উচিৎ।

ইষ্টদেবীর দৌলতে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাতে তাঁর কুলোয় না। তাই তিনি অনেক সেন্টদের মূর্তি রাখার ব্যবস্থা করেছেন। বলতে গেলে, কোন সেন্ট-ই প্রায় তাঁর বদান্যতা থেকে বঞ্চিত নন। গির্জার ভেতরে স্থানাভাব হওয়ার ফলে অনেকগুলিকে তিনি গির্জার পেছনে কাঠের চালাঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। প্রয়োজনমত তাদের তিনি বাইরে টেনে নিয়ে আসেন। যে বছর তার ঘর রঙ করা হল সেই বছর কাঠ কেটে নিজের হাতেই এই মূর্তিগুলি তিনি তৈরী করেছিলেন। নিজেই রঙ মাখিয়েছিলেন তাদের গায়ে। তুমি জান, এই সেন্টদের কাজ হচ্ছে অসুখ সারানো। প্রতিটি সেন্ট-এরই বিশেষ-বিশেষ রোগ সারানোর ক্ষমতা রয়েছে। বিশেষ একটি রোগের জন্যে সেই রোগের যিনি ধন্বন্তরী সেন্ট তাঁর কাছে না গিয়ে অন্য সেন্ট-এর কাছে ধর্ণা দেওয়ার ফল বড় বিষময়। কারণ, সাধারণ মানুষের মতই তাঁরাও বড় হিংসাপরায়ণ। এদিক থেকে পাছে কোন ভুল হ'য়ে যায় এই ভয়ে দরিদ্র বৃদ্ধারা এখানে এসে পাদরী ম্যাথুর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে কাজ করে।

তারা জিজ্ঞাসা করে: আচ্ছা বলত বাবা, কানের অসুখ সারানোর জন্যে কোন সেণ্ট-এর কাছে যাব ?

তিনি বলেন: একজন আছেন—তিনি হচ্ছেন সেণ্ট ওসিমাস; তিনি ভালই। আরও একজন আছেন; তিনি হচ্ছেন সেণ্ট প্যাসফিলিয়াস। তিনিও খারাপ নন।

এটাই ম্যাথুর সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। হাতে সময় থাকলে ম্যাথু মদ খান। মদ খান—তবে কলাবিদের মত। প্রতি সন্ধ্যায় মদ খেয়ে তিনি টলতে থাকেন। তিনি যে টলেন সেকথা তিনি নিজেও জানেন। এতটা পরিষ্কারভাবে জানেন যে কোন্ দিন তিনি কতটা মাতাল হয়েছেন সে সম্বন্ধে নিখুঁতভাবে একটা খাতায় তিনি টুকে রাখেন; এটাই তাঁর মুখ্য কাজ; গির্জার কাজ গৌণ।

এছাড়া, তাঁর একটা আবিষ্কার রয়েছে। সেকথা শুনলে তুমি অবাক হ'য়ে যাবে। এই আবিষ্কারটির নাম "বুজোমিটার।" এরকম যন্ত্রের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত কারও চোখে পড়েনি; কিন্তু ম্যাথুর গণনা অর্থবিদদের মতই নির্ভুল। তুমি তাঁকে ক্রমাগতই বলতে শুনবে—

গত সোমবার থেকে আমি পঁয়তাল্লিশের ওপরে যাইনি; অথবা বাহান্ন থেকে আটান্ন, অথবা ছেষট্টি থেকে সত্তর, অথবা...দুত্তোর নিকুচি করেছে, আমার ধারণা, পঞ্চাশ পূর্ণ হয়েছে মাত্র। এখন দেখছি, পঁচাত্তরের কোঠায় এসে পৌঁচেছি।

ম্যাথু যখন স্বীকার করেন তিনি নব্বুই-এর সীমারেখা অতিক্রম করেছেন তখনই বুঝতে হবে তিনি মাতাল হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মিলি আর একটি আজব বস্তু। স্বামীকে এমত অবস্থায় দেখলেই সে রাগে গর-গর করতে থাকে। স্বামী বাড়ি ফেরার সময় দাঁড়িয়ে থাকে দরজার সামনে। ম্যাথু ঘরে ঢোকামাত্র সে চীৎকার ক'রে বলে: অসভ্য শুয়োর কোথাকার। অপদার্থ মাতাল।

ম্যাথু তখন হাসেন না। তার সামনে নিজেকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে বলেন: মিলি, চোপ। এখন কথা বলার সময় নয়। কাল সকালে।

এরপরে মিলি যদি চেঁচানি না থামায় তাহলে ম্যাথু তার সামনে এগিয়ে যাবেন; তারপরে স্বরটাকে মোটা করে বলবেন: চোপ-প। এখন আমি ন'য়ের কোঠায়। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। কাউকে ধোলাই দেওয়ার জন্যে হাতটা আমার নিসপিস করছে। সাবধান।

এই আপ্তবাক্য শুনেই কেটে পড়ে মিলি।

পরের দিন আবার সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তিনি সোজাসুজি হেসে বলবেন: হয়েছে, হয়েছে—যথেষ্ট হয়েছে। যতদিন না আমি একশ'র গাঁট পেরোচ্ছি ততদিন মা ভৈ; সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলেই ঠিক কথার সুযোগ তোমাকে আমি দেব—কথা দিলাম।

কথা বলতে-বলতে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠলাম। বোমার-এর অদ্ভুত সুন্দর বনানীর মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ। দুক্লেয়ার ছাড়িয়ে গেলাম আমরা। তারপরে জুমিয়েজের দিকে না গিয়ে আমার বন্ধুটি বাঁ দিকের পথ ধরে বনের দিকে সোজা হাঁটতে শুরু করলেন। অনতিবিলম্বেই সবুজ পাহাড়ের চূড়া থেকে সীন নদীর ধারে

মনোরম উপত্যকাটিকে নতুন করে দেখতে পেলাম আমরা, দেখতে পেলাম আমাদের পায়ের তলা দিয়ে প্রবাহিত আঁকাবাঁকা নদীটিকে।

ডান দিকে ছোট একটি বাড়ি ;· ছাতটা তার শ্লেট দিয়ে ছাওয়া। ছাতার মত উঁচু গম্বুজাকৃতি একটা ঘড়ি—একটি সুন্দর বাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সারসীগুলি সবুজ রঙের—মধুর চাক আর গোলাপ ফুলে ঢাকা।

শুনতে পেলাম কে যেন কাকে চেঁচিয়ে বলল : ক'জন বন্ধু এসেছেন।

কথাটা শুনে বারান্দার ওপরে এসে দাঁড়ালেন ম্যাথু। বয়স ষাট, রোগাটে—সূঁচোলো দাড়ি—সাদা গোঁফ। আমার বন্ধুটি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন ; আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর। ম্যাথু একটা শীতল পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরের মধ্যে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন। ওই ঘরটিকেই শোয়ার ঘর হিসাবে ব্যবহার করেন তাঁরা।

ম্যাথু বললেন : আমার কোন আলাদা শোয়ার ঘর নেই। খাবার ঘর থেকে বেশী দূরে থাকতেও আমি চাইনা। থালা-বাটিরাই তো হচ্ছে মানুষের আসল সঙ্গী।

তারপরে আমার বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে বললেন : আজ বৃহস্পতিবার তুমি এসেছ কেন ? তুমি জান আজ হচ্ছে আমার লেডির "কনসালটেশন ডে।" আমি তো আজ বেরোতে পারব না।

কথাটা শেষ করেই দরজার কাছে গিয়ে হুংকার দিলেন একটা—মি-লি।

অন্য পাশ থেকে কারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভ্রূকুটি করলেন ম্যাথু : গতকাল আমি ন'য়ের কোঠায় ছিলাম। তাই সে আমার ওপরে চটে রয়েছে।

আমার প্রতিবেশীটি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন : ন'য়ের কোঠা ! সেটা আবার কি বস্তু ?

উত্তর দিলেন ম্যাথু : বলছি তোমাকে। গত বছর আমি কিছু আপেল পেয়েছিলাম। সেগুলি থেকে এক ব্যারেল সিডার মদ আমি তৈরী করেছিলাম। গতকাল সেটাই ভাঙলাম। কি বলব ভায়া, একেবারে সত্যিকারের অমৃত। আমার সঙ্গে ছিল পোলাইট। এক বোতল খেলাম আমরা, তারপরে আর এক বোতল—তেষ্টা আর মেটে না। আগামীকাল পর্যন্ত গলায় ঢালতে পার এই মদ—তবু তোমার তেষ্টা মিটবে না। এত মদ আমি পেটে ঢাললাম যে পেটটা আমার ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল। তখন আমি পোলাইটকে বললাম : এক গ্লাস ব্র্যানডি খেলে শরীরটা গরম হয়ে উঠবে। সেও আমার সঙ্গে একমত। ব্র্যানডি চালালাম। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটা গরম হয়ে গেল ; এত গরম যে আবার তাকে ঠাণ্ডা না করে উপায় নেই। আবার সেই সিডার ঢাল। একবার ঠাণ্ডা, আর একবার গরম করার পালা চলল। বুঝতে পারলাম এইভাবে ন'য়ের কোঠায় পৌঁচেছি। পোলাইট একশর অনেক নীচে।

দরজা খুলে গেল। মিলি হাজির হল ; তারপরে আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর আগেই চেঁচিয়ে বলল : শুয়োরছানা কোথাকার। তোমরা একশ'র মাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছিলে—তোমরা দু'জনেই।

রেগে কাঁই হয়ে ম্যাথু বললেন: ওকথা বলো না মিলি। একশ'র মাত্রা আমি কোনদিনই ছাড়াইনি।

নতারদামের ছোট গির্জার পাশে দুটি লাইম গাছের নীচে তাঁরা আমাদের চমৎকার ব্রেকফাস্ট দিলেন। খেতে-খেতে ম্যাথু দু'চারটে অলৌকিক কাহিনীও শোনালেন।

খেয়ে-দেয়ে আরাম করে আমরা পাইপ ফুঁকছি এমন সময় দুটি দেহাতি বৃদ্ধা এসে হাজির হ'ল। তারা কেবল বৃদ্ধাই নয়; শুকনো, হাড্ডিসার; দেহগুলি তাদের নুয়ে পড়েছে। তারা এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল পাদরীকে; সেন্ট ব্ল্যাঙ্ককে চাইল। তাদের দিকে পিট-পিট করে তাকিয়ে ম্যাথু বললেন—এনে দিচ্ছি।

এই বলে কাঠের তৈরী গুদোম ঘরের দিকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে হন্তদন্ত হ'য়ে বেরিয়ে এসে হাত উঁচিয়ে বললেন: সেন্ট ব্ল্যাঙ্ক কোথায় গিয়েছেন জানি না। তাঁকে আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। ঠিক জানি ওই গুদোমেই তিনি ছিলেন।

তারপরে হাতটা শিঙের মত বাঁকিয়ে হাঁকলেন—মিলি!

বাগানের নীচে থেকে উত্তর দিল মিলি—কী চাই?

সেন্ট ব্ল্যাঙ্ক কোথায়? গুদোমে তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনা।

উত্তর এল মিলির—খরগোসের বাক্সের গর্ত বোজানোর জন্যে গত সপ্তাহে সেটা তুমি নাওনি?

হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই বটে। তোমরা আমার সঙ্গে এস।

বৃদ্ধা দুটি তাঁর পিছু নিল। হাসির চোটে মরে যাই আর কি! আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, এতদিন মাটি—কাদায় মেশানো হ'য়ে সেন্ট ব্ল্যাঙ্ক গুদোম ঘরে আরও দশটা জঞ্জালের সঙ্গে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। তারপরে সেটা নিয়ে ম্যাথু খরগোসের বাক্সের গর্তে চাপা দিয়েছেন।

সেন্টকে পেয়ে বৃদ্ধা দুটি মাটিতে বসে প্রার্থনা করতে শুরু করল। ম্যাথু সেই দেখে বললেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও মাটিতে বস না। কিছু খড় বিছিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে খড় যোগাড় ক'রে প্রার্থনার আসন করে দিলেন তিনি। তারপরেই তাঁর লক্ষ্য পড়ল সেন্টএর গোটা শরীরটা কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে না মোটে। তাই তিনি সেটাকে জল দিয়ে একটু ধোপদুরস্ত করার চেষ্টা করলেন। মোটামুটি কাজ চালানো গোছের করে সেটাকে তাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে আমাদের জন্যে আর এক পাত্র মদ পরিবেশন করলেন।

মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে তিনি একটু বিব্রত হ'য়ে বললেন—মানে, সেন্ট ব্ল্যাঙ্ককে দিয়ে আমার এক পেনিও আর রোজগার হবে না। এই ভেবেই ওটাকে আমি খরগোসের খাঁচায় বসিয়ে দিয়েছিলাম। গত দুটি বছর ধরে কেউ সেন্ট ব্ল্যাঙ্ককে চায়নি। কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, সেন্টরা অমর—কোনদিনই তাদের মৃত্যু হয় না।

মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে তিনি বলে গেলেন—আর এক রাউণ্ড হয়ে যাক। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মদ খেতে বসলে পঞ্চাশ পাত্রের নিচে থামা উচিৎ নয়। আমাদের হয়েছে মাত্র আটতিরিশ।

মিথ্যা ভয়

False alarm

ফ্রেমিকোর্ত বলল, পিয়ানো আমি মোটেই দেখতে পারি না, কেন জানি না মেহগনি কাঠের বাদ্যযন্ত্রটার প্রতি আমার আছে একটা দারুণ ভীতি। কোন পিয়ানো দেখলেই আমার মনে হয় কোন এক সুন্দরী যুবতী চাঁপার কলির মত তার সুন্দর আঙুল দিয়ে সেটা বাজিয়ে চলেছে আর তার পানে তাকিয়ে আছে জনকতক অদৃশ্য শ্রোতা। কত মেয়েকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অযথা আটকে রেখে দেওয়া হত ঐ পিয়ানোতে।

পিয়ানোর প্রতি কোনদিন আমার কোন মোহ ছিল না। তবু একটা পিয়ানো আমায় বাধ্য হয়ে কিনতে হয়েছিল। কিনতে হয়েছিল আমার প্রেয়সী লালীর জন্য। লালীর মত সুন্দরী প্রেয়সী যদি কিছু চায়, তা না দিয়ে পারা যায় না। পিয়ানো ত সামান্য কথা, আমি আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে পারতাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় পিয়ানোটা আমার বড় অপয়া। মাসিক কিস্তিতে টাকা শোধ দেওয়ার শর্তে দাম দিয়ে পিয়ানোটা কিনেছিলাম। কিন্তু কোন ফল হলো না। তাতে চারখানা গান শিখতে না শিখতেই একদিন হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেল লালী। সে যেমন হঠাৎ একদিন আমার জীবনে এসে হাজির হয়েছিল, আমার অন্তরের সব ভালবাসা কেড়ে নিয়েছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল সে। আমি তার কারণটা ঠিক বলতে পারব না। হয়ত সে অন্য কাউকে ভালবেসেছিল অথবা সে হয়ত একজনের সঙ্গে বেশীদিন ঘর করতে পারে না।

যাই হোক, লালী আমাকে ফেলে চলে যাওয়ায় বাড়িখানা আমার শূন্য হয়ে গেল। এত সুন্দর করে সাজানো ঘরগুলো খাঁ-খাঁ করতে লাগল। আমার মনের শূন্যতাটা হয়ে উঠল আরো দুঃসহ। কারণ লালীর অভাবটা হঠাৎ কাউকে দিয়ে কোনভাবে পূরণ করতে পারলাম না। সেটা সম্ভবও নয় বোধ হয়। আমি তখন বেশ বুঝতে পারলাম কোন পুরুষের জীবনে প্রেমের পশরা নিয়ে কোন নারী আবির্ভূত হওয়ার পর হঠাৎ যদি সে চলে যায় তাহলে সে পুরুষ এক নিদারুণ অসহায়তাবোধে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাকে আবার নূতন করে জীবন শুরু করতে হয়। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে সহসা হারিয়ে যে চলমান জীবন হতে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে, সে জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক সময় লাগে তার।

এমন সময় আমি কিছুদিনের জন্য ভেনিসে গিয়ে কাটাবার মনস্থির করে ফেললাম। চমৎকার শহর ভেনিস। বায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনেরও পরিবর্তন হবে।

অতীতের কত ধ্বংসাবশেষ তার চারদিকে। ভেনিসে নাকি আমেরিকান, শ্ল্যাভ, ভিয়েনীজ, ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে এসে ভিড় জমায়। অতীতের ইতিহাসের এক বিষণ্ন নীরবতার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা ভেনিসের মধ্যে যেন নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছে এই সব মেয়েরা। বলা যায় না, তাদের মধ্যে একজনকে আমি আমার জীবনসঙ্গিনী হিসাবে নির্বাচিত করে নিতেও পারি।

ঠিক হলো, আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘর দেখাশোনা করবে মাদাম পিকুইগনোল। সে আমার ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম একাই করত। গৃহকর্মে পটু পিকুইগনোল একাই একশো। এমন সময় একদিন আমার বন্ধু স্ট্যানিস এসে একটা অনুরোধ করল। আমি যতদিন ভেনিসে থাকব সে ততদিন আমার ঘরে বাস করবে। আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে সে মাদাম ফ্রেজুস নামে এক বিবাহিতা মহিলাকে ভালবাসত। কিন্তু স্ট্যানিসের নিজস্ব কোন ঘর ছিল না। সে কোন হোটেলে থাকত। মাদাম ফ্রেজুসের স্বামী মঁসিয়ে ফ্রেজুস ওথেলোর মত দারুণ ঈর্ষাপরায়ণ ও সন্দেহবাতিক লোক। সেজন্য স্ত্রীর কোন পুরুষ বন্ধু তার বাড়িতে যেতে পারত না। স্ট্যানিস তাই আমাকে বলল তার অবর্তমানে সে আমার বাড়িতে তার প্রণয়িনীর সঙ্গে নির্বিঘ্নে মিলিত হতে পারবে।

প্রথমে আমি তার কথায় রাজি হতে পারিনি। যে ঘরের বাতাসে আমার বিগত প্রেমের কত স্মৃতি কত চুম্বন আজও ভেসে বেড়াচ্ছে সেই ঘরে অন্য এক প্রেমিক প্রেমিকা এসে তাদের প্রেমমিলনের নিবিড়তা দিয়ে আমার সেই প্রেমের অশরীরী শুচিতাকে নষ্ট করে দেবে, তার স্মৃতিকে নিষ্পেষিত করে দেবে, এটা আমি চাইনি। কিন্তু স্ট্যানিস কোনমতেই ছাড়ল না। তাই আমি রাজি হয়ে গেলাম।

কিন্তু পরে জানলাম, আমার পিয়ানোটার জন্যে একদিন ওরা বিপদে পড়ে যায়। একদিন যখন আবার সেই সুসজ্জিত সুন্দর ঘরে ওরা স্বামী-স্ত্রীর মতই মিলিত হয়েছিল, মাদাম ফ্রেজুস তখন সবেমাত্র ঠাণ্ডা জলে স্নান করে প্রসাধন সেরে স্ট্যানিসের প্রেমালিঙ্গনে ঢলে পড়েছিল, এক আকর্ষণীয় স্বপ্নের আবেশে চোখের পাতা মুদিত হয়ে আসছিল মাদাম ফ্রেজুসের ঠিক তখনি হলো বিনা মেঘে বজ্রপাত। দু'তিনজন লোক এসে আমার অর্থাৎ বাড়ির মালিক ফ্রেমিকোর্তের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু ব্যাপারটা না বুঝেই পিকুইগনোল কোনমতে স্ট্যানিসকে পিছনের দরজা দিয়ে বার করে দিয়ে বলল, তুমি চলে যাও, মাদামের ভার আমি নিলাম।

লোকগুলো ফ্রেমিকোর্তের খোঁজ করতে পিকুইগনোল বলল, এখানে এখন ফ্রেমিকোর্ত থাকে না। তখন লোকগুলো বলল, তাহলে পুলিশ নিয়ে আসব।

এই কথা শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল মাদাম ফ্রেজুস। তার সুন্দর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল নীরবে। সে ভাবল, নিশ্চয় ওরা পুলিশ নিয়ে এসে ওর অবৈধ গোপন প্রেমচর্চা ধরে ফেলবে। চারদিকে প্রচারিত হয়ে যাবে ওর কলঙ্কের কথা আর ওর স্বামী মামলা রুজু করবে আদালতে।

এমন সময় পিকুইগনোল এসে মাদাম ফ্রেজুসকে বার-বার বুকের উপর টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাদাম ফ্রেজুস। হঠাৎ জোর চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভেঙে যায় তার। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে কে ডাকছে। পরে ভাল করে দেখল অন্য কেউ না। স্ট্যানিস ডাকছে।

পিকুইগনোল দরজা খুলে দিতেই স্ট্যানিস বলল, যাক ভয়ের কিছু না। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম আমার বন্ধু ফ্রেমিকোর্ত কিস্তিতে যে পিয়ানোটা কিনেছিল সেই পিয়ানোর মাসিক কিস্তি আদায় করতে এসেছিল লোকগুলো, অন্য কিছু নয়।

পিকুইগনোল রেগে বলল, চুলোয় যাক পিয়ানোটা।

এইভাবে যে বাঁকাচোরা পথ ধরে স্ত্রী হিসাবে তার সুনামটা অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছিল মাদাম ফ্রেজুস সে সব তাকে সঠিক লক্ষ্যতেই পৌঁছে দেয়। তার জন্য তাকে পুরস্কার দান করা উচিত।

প্রেমের একটি দিক

One phase of love

পাগলাগারদের একটি ঘরে একটি বেতের চেয়ারে একটি পাগল আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ঘরখানার একদিকের দেওয়ালের উপর একটা মাত্র জানালা ছিল। পাগলটা ছিল রোগা-রোগা চেহারার, মাথার চুলে পাক ধরেছে। মুখখানা শুকনো এবং বিষাদে ভরা। দেখলেই বোঝা যায় একটা প্রবল দুশ্চিন্তা ওর দেহের সব সুষমাকে অনবরত কুরে-কুরে খাচ্ছে, ওর দেহের সব রক্তকে শোষণ করে নিচ্ছে, ওর জীবনের দীপটাকে নিবিয়ে দিচ্ছে।

কী আশ্চর্য! কীটদষ্ট একটা সুন্দর ফলের মত এই লোকটা শুধু একটা অদৃশ্য চিন্তার দংশনে মারা যাবে। কিন্তু সেই ভয়াবহ চিন্তাটা কি যা তাঁর সারা মুখটাকে বিধ্বস্ত ও জর্জরিত করে দিয়েছে?

পাগলাগারদের ডাক্তার আমাকে বললো, একধরনের ব্যর্থ প্রেমের আঘাতেই ও পাগল হয়ে গেছে। তবে ও ওর জীবনের সেই ভয়ঙ্কর প্রেমের সব কথা লিখে রেখেছে। লেখাটা ইচ্ছা করলে আপনি দেখতে পারেন।

ডাক্তারের কাছ থেকে খাতাটা নিয়ে আমি একমনে পড়তে লাগলাম।

'আমার জীবনের বত্রিশটা বছর বেশ ভালভাবেই কেটে যায়। কোন ভালবাসার নেশা কখনো জাগেনি আমার মনে। কিন্তু কোন মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় যে একেবারে ছিল না তা নয়। তবে কাউকে বিশেষ আপন করে একান্তভাবে ভাববার কোন বাসনা কোনদিন জাগেনি আমার মধ্যে। নিতান্ত শান্ত সহজ ও সরলভাবে কেটে যাচ্ছিল আমার জীবনটা।

আমার আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল এবং আমাকে ধনী বলা চলে। জীবিকা অর্জনের জন্য আমাকে কোন কাজ করতে হত না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি খুশিমত ঘুরে বেড়াতাম। তবে আমার একটা নেশা ছিল। পুরনো সৌখীন কোন আসবাবপত্র দেখলেই আমি তা কিনে নিতাম। পুরনো সেইসব আসবাব বাড়িতে নিয়ে এসে আমি ভাবতাম তাদের কথা যারা সেগুলো একদিন ব্যবহার করত। অতীতের সেই সব অপরিচিত লোকদের মূর্তিগুলো কল্পনা করে নিয়ে তাদের কথা ভাবতে ভাল লাগত আমার। একবার অর্ধ শতাব্দীর আগেরকার একটি অতি সৌখীন হাতঘড়ি কিনে এনে আমি কত কথা ভাবলাম। মেয়েটি নিশ্চয় খুব সৌখীন ছিল। নিশ্চয় সে এটাকে খুব ভালবাসত। তার হৃৎপিণ্ডের তালে-তালে এই ছোট্ট ঘড়িটা টিক-টিক করে চলত। তার সুন্দর চোখের দৃষ্টি কতবার নিবদ্ধ হয়েছে এর কাঁটার উপরে।

একবার একটা খুব সুন্দর ইতালীয় দেরাজ কিনে আনি। বাড়িতে এনে সেটার সব দিক দেখতে দেখতে একটা গোপন জায়গা খুঁজে পাই। তার মধ্যে একটা ছোট্ট ভেলভেটের বাক্সে একগাছি সোনালী চুল সযত্নে ভরা ছিল। সেটা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। চুলটা কোন নারীর; কিন্তু কেন এবং কে-ই বা এটা এখানে রাখল এই নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু করে দিলাম। মেয়েটির প্রেমিক অথবা স্বামী কি বিদায়ের দিনে তার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তার এই সোনালী একগাছি চুল কেটে রাখে? অথবা এমনও হতে পারে কোন প্রণয়ী বা স্বামী তার প্রিয়তমাকে কবর দেবার সময় তার মাথার একগাছি সোনালী চুল কেটে সযত্নে রেখে দেয়। সত্যিই কী অমূল্য অবিনশ্বর রত্ন এই চুল! সত্যিই মাথার মণি। মানুষের দেহ কত নশ্বর, তা যতই সুন্দর হোক রাখা চলে না। কিন্তু একগাছি চুল মাথা হতে কেটে রেখে দিলে যুগ যুগ ধরে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সত্যি কথা বলতে কি, কার চুল তা আমি না জানলেও সেই অজ্ঞাতনামা মেয়েটার জন্য চোখে জল আসে আমার। যাই হোক, সেই ভেলভেটের বাক্সে চুলটাকে রেখে দিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমার মনে হতে লাগল যেন সেই মেয়েটিকে না দেখেই ভালবেসে ফেলেছি। প্রথম প্রেমে পড়ার সময় মানুষের মনে যে অশান্ত অবস্থা হয়, সহসা নিরাশার দ্বন্দ্বে যেভাবে তার মনটা দুলতে থাকে আমারও তাই হচ্ছিল। হঠাৎ একটা কবিতার কথা মনে পড়ল আমার। কোথায় সেই সুন্দরী ফুলপরী? কোথায় হাসির আলো আর অশ্রুর ঝর্ণাঝরা মুখ...ইত্যাদি। বাড়ি ফিরে আবার সেই দেরাজ খুলে আবার সেই চুলটা দেখার ইচ্ছা হলো।

আমি চুলটাকে বার করে আদর ও চুম্বন করে আবার ভেলভেটের বাক্সটার মধ্যে রেখে দিলাম। সহসা মনে হলো এটা একটা চুল নয়, যেন একটা জীবন্ত মানুষ বন্দী হয়ে ভরা আছে এক গোপন স্থানে।

ঠিক যেমন কোন মানুষ কোন নারীকে ভালবাসে সেইভাবে আমি ভালবাসতে লাগলাম চুলটাকে। শুধু একগাছি সোনালী চুল। আমি কিন্তু সেই চুলটাকে হাতে ধরে আমার গালে রেখে তাকে চুম্বন করার সময় তার স্পর্শের মধ্যে এক জীবন্ত নারীদেহের আস্বাদ পেতাম।

আমি আমার শোবার ঘরে বারোমাস শুতাম। একদিন রাত্রিতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কোন মৃত নারী আমার ঘরে এসেছে। আমি উঠে গিয়ে বাক্স খুলে চুলটা বার করে চুম্বন করে সেটা রেখে দিলাম। কিন্তু তাতে আমার তৃপ্তি হলো না। চুলটাকে আমি আমার বিছানায় নিয়ে এলাম। আমার ঠোঁটের উপর সেটাকে রেখে দিয়ে তার স্পর্শসুখ উপভোগ করতে লাগলাম।

তন্দ্রা আসতে না আসতেই কেবলি মনে হতে লাগল যার চুল সেই নারী এসেছে আমার ঘরে। এক নশ্বর নারীদেহ আমার গায়ে গা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। আমার মনে হলো মৃতরাও আসতে পারে। মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে।

এরপর থেকে আমি নিদ্রাহীনতায় ভুগতে লাগলাম। বাইরে খুব একটা বেরোতাম না। চুলটাকে নিয়ে দিন রাত ঘরেই থাকতাম। বাইরে বেরোলে চুলটাকেও সঙ্গে নিতাম। বার-বার ভেলভেটের বাক্স খুলে দেখতাম তাতে লোকের সন্দেহ হতে লাগল। এইভাবে একদিন পাঁচজনের চোখ পড়ায় আমার সেই চুলটা কেড়ে নেয়। আমার বহুমূল্যবান সেই সম্পদটা কেড়ে নিয়ে ওরা আমায় পাগলাগারদে দেয়।'

আমার পড়া শেষ হয়ে গেল। ডাক্তার উঠে গিয়ে একগাছি সোনালী চুল আমার হাতে এনে দেন। চুলটা দেখে আমার মনে হলো যেন একটা সোনালী পাখি আমার দিকে উড়ে আসছে। সেটাকে দেখে দু'ধরনের ভিন্ন অনুভূতি জাগল আমার মনে। একবার রাগ হলো। কোন হত্যাকারীকে দেখলে যে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ জাগে মানুষের মনে, সেই ক্রোধ জাগল আমার মধ্যে। কখনো কোন রহস্যময় বস্তু দেখলে সেটাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিবিড়তা দিয়ে জানায় ও তার আস্বাদ গ্রহণ করার যে মৃদুশিহরিত বাসনার একটা কাঁপন জাগে, আমার মধ্যেও তাই জাগছিল। সোনালী চুলটাকে আমারও চুম্বন করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

ডাক্তার বললেন, মানুষ না পারে এমন কোন কাজ নেই।

মাদাম ব্যাপটিস্ট

Madame Baptiste

লোবেঁর স্টেশনের বিশ্রামাগারে ঢুকেই প্রথমে আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। প্যারিসে যাওয়ার এক্সপ্রেস ট্রেন আসতে এখনও দু'ঘণ্টা দশ মিনিট বাকি।

হঠাৎ খুব ক্লান্ত মনে হল নিজেকে। মনে হল আমি যেন মাইল কুড়ি হেঁটে এসেছি। সময়টা কোনরকমে কাটানো যায় কিনা এই ভেবে আমি স্টেশনের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। তারপর স্টেশনের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সময়টা কী করে কাটাবো ভাবতে লাগলাম। একটা বেড়াল রাস্তা পেরিয়ে খুব সাবধানে ছাদের নালীর ওপর উঠে গেল। প্রতিটি গাছের নিচে খাবারের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে একটা ঘেয়ো কুকুর ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোন লোকজন চোখে পড়ল না। কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলাম আমি। সময়টা আমি কাটাবো কেমন করে? রেল স্টেশনের কাছাকাছি যেসব ছোট-ছোট কাফে থাকে সেইখানে ঢুকে কিছু অখাদ্য মদ গলায় ঢেলে আঞ্চলিক সংবাদপত্রের ওপরে চোখ বুলানোরও ইচ্ছা আমার একটা হয়েছিল। এমন সময় দেখলাম একটি শোকযাত্রা উলটো দিকের রাস্তা থেকে বেরিয়ে আমি যে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েছিলাম সেইদিকে এগিয়ে আসছে। শবাধারটিকে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। অন্তত, মিনিট দশেকের জন্যেও সময়টা কাটানো যাবে।

হঠাৎ আমার ঔৎসুক্যটা বেড়ে গেল। শবাধারের পেছনে মাত্র আটজন ভদ্রলোক আসছেন; তাঁদের মধ্যে একজন কাঁদছেন; বাকি সবাই একসঙ্গে প্রার্থনার পদ উচ্চারণ করছেন। কিন্তু সঙ্গে কোন পাদরী ছিলেন না। ভাবলাম সম্ভবত এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। লোবেঁর মত শহরে অন্তত একশজন এমন রয়েছেন যাঁরা স্বাধীন চিন্তাশীল। তাঁদের সেই মতটা প্রকাশ করার জন্যেই হয়ত এই শোকযাত্রায় গির্জার কোন প্রতীককে তাঁরা সঙ্গে নেননি। তাছাড়া এর পেছনে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে কি? যেরকম দ্রুতভাবে তাঁরা হাঁটছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছিল কোনরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান বর্জন করেই কাজটা তাঁরা শেষ ক'রে ফেলতে চান।

আমার চিন্তাটা যে অলস মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত সেদিকে কোন সন্দেহ ছিল না। শবযাত্রাটি কাছাকাছি হওয়ামাত্র আমার মগজে এক অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেল। সেই আটজন ভদ্রলোকের সঙ্গে-সঙ্গে যেতে ইচ্ছে হল আমার। তার ফলে ঘণ্টাখানেক সময় আমার কাটবে। এই ভেবে আমি রাস্তায় নেমে সেই দলে ভিড়ে গেলাম।

আমাকে দলে ভিড়তে দেখে তাঁরা নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে কথা বলতে লাগলেন—আমি এই শহরের মানুষ কিনা তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। তাঁরা যেভাবে আমাকে দেখছিলেন তাতে আমার খুব বিরক্তি লাগছিল। সেই অস্বস্তি

কাটানোর জন্যে আমি তাদের কাছে গিয়ে অভিবাদন ক'রে বললাম—আপনাদের আলোচনায় বাধা দিচ্ছি বলে ক্ষমা করবেন। বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় ব'লেই আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। মৃত ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই।

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—ইনি একজন মহিলা।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম—কিন্তু এটা সিভিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, তাই নয় কি?

আর একটি ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ-ও বলতে পারেন, না-ও বলতে পারেন। গির্জায় ঢোকার অনুমোদন পাদরী আমাদের দেননি।

তাই বুঝি! অ-বা-ক কাণ্ড।

ভদ্রলোকটি বললেন—এটি একটি দীর্ঘ কাহিনী। যুবতীটি আত্মহত্যা করেছিল। সেইজন্যেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তার কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে না। যে ভদ্রলোকটি কাঁদতে-কাঁদতে প্রথমে যাচ্ছেন উনিই মৃতা যুবতীর স্বামী।

কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে আমি বললাম—শুধু অবাকই হচ্ছি না; কিছুটা কৌতূহলও আমার জাগছে। মঁসিয়ে কী ঘটেছিল জানতে চাওয়াটা কী অভদ্রতা হবে?

ভদ্রলোকটি পরিচিত মানুষের মত আমার একটা হাত ধরে বললেন—মোটেই নয়। আসুন, আমরা একটু ধীরে-ধীরে এগোই। কাহিনীটা বড় করুণ। তবু আপনাকে আমি বলব। ওই দূরে পাহাড়ের ওপরে যে গাছগুলি দেখছেন ওইখানেই সিমেট্রি। ওখানে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগবে।

এই কথা বলে শুরু করলেন তিনি—

এই যুবতীর নাম মাদাম পল হ্যামোত। পাশাপাশি অঞ্চলের একটি বেশ অর্থশালী ব্যবসাদার মঁসিয়ে ফঁতানেলের মেয়ে। এগার বছর বয়সে বাড়ির চাকর ওর ওপরে ভয়ানক রকমের পাশবিক অত্যাচার করে। সেই জঘন্য অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মেয়েটি প্রায় মর-মর হয়ে পড়েছিল। জানোয়ারটার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হল। অত্যাচারের বর্বরতার দিকে লক্ষ্য রেখে বিচারে তার যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়েটি বেড়ে ওঠে। সমবয়সী আর বয়স্ক মানুষ—কেউ তার সঙ্গে মেলামেশা না করায় তাকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। পাছে তার সংস্পর্শে এলে দূষিত হ'তে হয়, এই ভয়ে কেউ তাকে চুমু খেত না। শহরের ভেতরে সবাই তাকে এড়িয়ে চলত। সে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সবাই তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কী সব বলত—সরে যেত অন্য পাশে। তার বাবা মা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোনোর জন্যে কোন পরিচারিকাও সংগ্রহ করতে পারতেন না।

মেয়েটার অবস্থা কী অসহনীয় হয়ে পড়েছিল তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। বিকালে তার সমবয়সী মেয়েরা মাঠের মধ্যে খেলাধূলো করছে, হুল্লোড় করছে, আর একটি পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে সে একপাশে মুখ চূণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝে-মাঝে

মেয়েদের সঙ্গে মেশার জন্যে ভয়ে-ভয়ে নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সে তাদের দলে ভিড়ে যেত। এই দেখেই অন্যান্য মেয়েদের মা বা পরিচারিকারা দৌড়ে গিয়ে তাদের টেনে বের করে আনত। কিছু বুঝতে পারত না বাচ্চা মেয়েটা। দুঃখে সে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে গিয়ে তার পরিচারিকার বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার অবস্থা আরও সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়াল। প্লেগগ্রস্ত রোগীর সান্নিধ্য মানুষ যেমন এড়িয়ে থাকত, যুবতী মেয়েদেরও তাদের বাপ-মায়েরা তেমনিভাবে তাদের সরিয়ে রাখত। তার লেখাপড়া হ'ল না ; বিবাহের রাত্রিতে মেয়েরা যে জিনিসটা শেখে সে কিছু লেখাপড়া না জেনেই সে জিনিসটা শিখে ফেলেছে—এই তার অপরাধ। যখন সে চোখ নিচু ক'রে পরিচারিকার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটতো, অপাপবিদ্ধা না হলেও অন্যান্য মেয়েরা চট ক'রে মাথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিত। কেউ তাকে অভিবাদন জানাত না ; আর চ্যাংড়া ছেলেরা তাকে 'মাদাম ব্যাপটিস্ট' নামে ডেকে ব্যঙ্গ করত। যে চাকরটা তার ওপরে ব্যভিচার করেছিল সেই লোকটার নাম ছিল ব্যাপটিস্ট।

তার মনের ভেতরে যে যন্ত্রণা হোত সেকথা কেউ জানত না। মনের কথা কোনদিনই সে মুখ ফুটে কাউকে বলত না ; হাসতও না সে কোনদিন। এমন কি তার বাবা-মাও তাকে দেখে বড় অস্বস্তি বোধ করতেন। সেই অপরাধের জন্যে তাঁরাও তার ওপরে বেশ চটেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ওই হতচ্ছাড়া মেয়েটার জন্যেই সমাজে তাঁদের মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে।

এইরকম একটি অপরাধীকে কোন্ ভদ্র যুবক বিয়ে করবে? নিজের ছেলেও যদি সেই রকম অপরাধী হয় কোন বাপমা তার বিয়ে দিতে চাইবেন না। এঁরাও সেই কথা ভেবে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার আশা জলাঞ্জলি দিলেন। মেয়েটি সুন্দরী ছিল ; কিন্তু বিবর্ণ তার চেহারা। দেখতে যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত, দীর্ঘাঙ্গিনী ; সেই কলঙ্ক জড়িয়ে না থাকলে আমারও মেয়েটিকে বেশ ভালই লাগত।

তারপরে এখানে যখন নতুন সাব-প্রিফেক্ট নিযুক্ত হলেন তখন তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। সেটা প্রায় আঠার মাস আগের কথা। বড় অদ্ভুত মানুষ এই প্রাইভেট সেক্রেটারী। সম্ভবত তিনি ল্যাটিন কোয়ার্টারে থাকতেন। এই কুমারীকে দেখে তিনি সোজাসুজি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। যখন তাঁকে মেয়েটির পূর্ব ইতিহাস বলা হল তখন তিনি তা তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন—বা! ভবিষ্যতে ওটাই তো হবে আমার গ্যারাণ্টি। অঘটন জিনিসটা বিয়ের পরে না ঘটে আগে ঘটাই ভাল। এর ফল হচ্ছে মেয়েটিকে নিয়ে আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারব।

ভদ্রলোকটি তার কাছে গেলেন ; তার কাছে প্রস্তাব দিলেন বিয়ের। বিয়ে হয়ে গেল ; এবং নিজের যে সাহস রয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন অনেককে। যেন কিছুই ঘটেনি এই রকম একটা ভাব ; সেই ভোজে অনেকেই এলো না। কিন্তু অবশেষে সকলেই আগের কথা ভুলে গেল ; এবং মেয়েটি সমাজে তার পূর্ণ মর্যাদা পেল। এই মর্যাদা যে তার স্বামীর জন্যেই পেয়েছে এই কথাটা সে ভুলতে

পারল না। স্বামীর এই তেজস্বিতা তাকে মুগ্ধ করেছিল। স্বামীকে সেইজন্যে সে দেবতার মত ভক্তি করত।

তারপরে সে অন্তঃসত্ত্বা হল ; এবং এতদিন যারা তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিল, কুৎসা প্রচার করেছিল তারাই তাকে দরজা খুলে দিল—সাদর অভ্যর্থনা জানাল তাকে—কারণ মাতৃত্বের পূতঃ সলিলে অবগাহন ক'রে সে শুদ্ধ হয়েছে।

ব্যাপারটা কৌতুককর হ'লেও সত্যি। মেয়েটি সগৌরবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল। তারপরে সেদিন আমাদের শহরের পেট্রন সেন্ট এর উৎসব শুরু হল। সেই সূত্রে গানের যে জলসা বসেছিল তাতে পৌরোহিত্য করেছিলেন প্রিফেক্ট। সঙ্গে ছিল তাঁর দলবল। প্রিফেক্টএর বক্তৃতা শেষ হলে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মেডেল বিলোতে উঠলেন।

আপনি জানেন এই পুরস্কার বিতরণের ব্যাপারে আপনি কাউকে কোনদিন সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। গ্রহীতারা সব সময় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, হিংসা করে পরস্পরকে। ফলে, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে তারা। সমস্ত রমণীরা প্লাটফর্মের ওপরে জমায়েত হয়েছিলেন। এঁদের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মেডেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ, সকলকে যে প্রথম শ্রেণীর মেডেল দেওয়া সম্ভব নয় তা আপনি স্বীকার করবেন। মোরিলোঁ গ্রামের ব্যাণ্ড মাষ্টার পুরস্কার নেওয়ার জন্যে এলে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মেডেলটি দেওয়া হল। প্রাইভেট সেক্রেটারী এই মেডেলটি দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে সেটি তাঁর মুখের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—ব্যাপটিস্টের জন্যে এটা আপনি রেখে দিন। ঠিক আমার মতই তাকে আপনার প্রথম শ্রেণীর মেডেল দেওয়া উচিৎ।

এই কথা শুনে কিছু লোক হাসতে আরম্ভ করল। সাধারণ মানুষের মনে উদারতাও নেই, রুচিও নেই। সবাই সেই হতভাগ্য রমণীটির দিকে চোখ ফেরালো। মঁসিয়ে, কোন নারীকে আপনি উন্মাদ হ'য়ে যেতে দেখেছেন ? আমরা সেদিন দেখলাম। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল ; তারপরে তিন-তিনবার চেয়ারের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মনে হ'ল সে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চায় ; কিন্তু কিছুতেই জনতার ভিড় ঠেলে পালাতে পারল না। তারপরে জনতার ভেতর থেকে একজন চীৎকার করে উঠল—ও-হো! মাদাম ব্যাপটিস্ট!

প্রচণ্ড হই-চই, হট্টগোল শুরু হল। কথাটা বার-বার চেঁচিয়ে বলতে লাগল সবাই। সেই হতভাগ্য রমণীকে দেখার জন্যে অনেকেই বুড়ো আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে মুখ উঁচু করে দিল। স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের উঁচু করে তুলে ধরল।

কে—কোন্—কোন্টি ? ওই নীল পোশাক পরা ?

ছেলেগুলো মুরগীর মত চেঁচাতে লাগল।

মেয়েটি একভাবে চেয়ারের ওপরে বসে রইল। মনে হল, সকলকে দেখানোর জন্যেই সে যেন চেয়ারে বসে রয়েছে। সে নড়াচড়া করতে পারল না, পালিয়ে যেতে পারল না—মুখ ঢাকতে পারল না। সূর্যের আলো চোখে পড়লে মানুষ যেমন

মিটমিট ক'রে তাকায় সেও সেইরকম করে তাকাতে লাগল। উঁচু পাহাড়ের ওপরে ওঠার সময় ঘোড়ারা যেমন করে হাঁপায় সেও সেইরকমভাবে হাঁপাতে লাগল। এরই ভেতরে মঁসিয়ে হ্যামোত একজনের গলা টিপে ধরেছেন। দু'জনে তখন ধস্তাধ্বস্তি করে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। বিরাট একটা হট্টগোল আর বিশৃঙ্খল।তার ভেতরে উৎসবটির ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হ'য়ে গেল।

একঘণ্টা পরে হ্যামোত দম্পতি বাড়ির পথ ধরলেন। এতক্ষণ এত অপমানের পরেও মাদাম হ্যামোত কোন কথা বলেনি। সে থরথর করে কাঁপছিল। একটা পুলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সে নীচে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বামী বাধা দেওয়ার কোন সুযোগ পেলেন না। প্রায় ঘণ্টা দুই অনুসন্ধানের পরে মাদামের মৃতদেহটি খুঁজে পাওয়া গেল।

একটু থেমে বক্তাটি বললেন—অবশ্য, এছাড়া তার আর করারই বা কি ছিল? মানুষের জীবনে এমন কিছু কলঙ্ক থাকে যেগুলিকে মুছে ফেলা যায় না। এইজন্যেই পাদরী মৃতদেহটিকে গির্জায় ঢুকতে দেননি।

সিমেট্রির ভেতরে আমরা সবাই ঢুকলাম। কফিনটি নামানো হল। তারপরে আমি হতভাগ্য স্বামীটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্বামীটি তখন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। চোখের জলের ভেতর দিয়ে অবাক হ'য়ে আমার দিকে তিনি তাকালেন। আমি জোরে তাঁর হাতে চাপ দিতেই তিনি বললেন—মঁসিয়ে, আপনার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ।

শবযাত্রাটি অনুসরণ করার জন্যে আমার কিন্তু কোন দুঃখ হয়নি।

মাষ্টার বেলহোম-এর জানোয়ার

Master Belhomme's beast

ক্রিকেতোত থেকে হ্যাভারেগামী স্টেজ-কোচ ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। কমার্শিয়াল হোটেলের চত্বরে প্যাসেঞ্জাররা সব তৈরি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এবার তাঁদের নাম ডাকা হবে। হলুদ রঙের গাড়ী ধূলো-বালি-কাদায় ধূসর হ'য়ে গিয়েছে। সামনের চাকাগুলি ছোট-ছোট। পেছনের চাকাগুলি বড়-বড়, কিন্তু হাড্ডিসার। গাড়ীটারও ছিরিছাঁদ বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। তিনটে বেশ বড় ঘোড়া গাড়ীটার সঙ্গে বাঁধা ছিল। এই অদ্ভুত গাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাড়োয়ানটি বেঁটে-খাট, স্থূলকায়; কিন্তু অনবরত ওঠা-নামা করার ফলে, আর রোদে-জলে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে যথেষ্ট কর্মঠ। সব সময়েই তার চোখ দুটো মিটমিট করে। তাকে দেখলে মনে হবে লোকটা সব সময় রোদ-জল আর ঝড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতের পেছন দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে সে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল।

দেহাতী মেয়েদের সামনে বড়-বড় ডিম আর হাঁস-মুরগী বোঝাই-করা বেশ ভারি বোঝা ছিল। ড্রাইভার একটা-একটা করে সেগুলো নিয়ে গাড়ীর মাথায় তুলে দিল। তারপরে বীজ ভর্তি কয়েকটা থলি সে সন্তর্পণে নিচে থেকেই ছুঁড়ে দিল ওপরে; সেইসঙ্গে তুলে দিল ছোট-ছোট কয়েকটি পুটলী। তারপরে গাড়ীর পেছনকার দরজা খুলে একটা তালিকা হাতে নিয়ে সে যাত্রীদের নাম ডাকতে লাগল:

"জর্জভাইলএর সম্মানিত ফাদার।"

দীর্ঘাঙ্গী, চওড়া ছাতি, শক্ত-সমর্থ পাদরী এগিয়ে গেলেন। মুখের রঙটা তাঁর লাল; কিন্তু হৃদয়টা তাঁর বড় কোমল। তারপর, মহিলারা যেমন ক'রে তাদের স্কার্ট উঁচিয়ে ধরে সেইভাবে চাপকানটা পায়ের ওপরে কিছুটা গুটিয়ে নিয়ে তিনি নড়বড়ে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন।

"রোলেবক্স-লা-গ্রিনেটসএর মাষ্টারমশাই।"

মাষ্টারমশাইও দীর্ঘাঙ্গী। হাঁটু পর্যন্ত তাঁর ফ্রককোট নামানো। ইতস্তত করতে-করতে তিনি খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

"মাষ্টার পয়রেত—দুটি আসন।"

দীর্ঘ চেহারার মানুষটি মাথা নিচু ক'রে ভেতরে ঢুকলেন। উপযুক্ত খাবারের অভাবে তাঁর শরীরটা ডিগডিগ করছে—দেহের নানা জায়গা থেকে চামড়া ঝুলে পড়েছে। পেছনে এলেন তাঁর স্ত্রী। বেঁটে চেহারার মানুষটি—সংসারের জোয়াল টেনে-টেনে ক্লান্ত মাদী ঘোড়ার মত চেহারা হয়েছে তাঁর। ঢোকার সময় বিরাট ছাতাটিকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন।

"মাষ্টার ব্যারোত, দুটি আসন।"

চরিত্রের দিক থেকে ব্যারোত অস্থিরচিত্ত। ডাক শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে ডাকছেন?

ড্রাইভারের ডাক নাম "ফক্সি।" সে একটা রসিকতা করার চেষ্টা করতেই তাঁর স্ত্রী পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়ায় গাড়ীর ভেতরে তিনি গড়িয়ে পড়লেন। ভদ্রমহিলার চেহারা গোলাকার, ব্যারেলের মত তাঁর উদর, ধোপানীর কাপড়কাচা কাঠের হাতুড়ির মত লম্বা তাঁর হাত। গর্তের মধ্যে ইঁদুরের মত ব্যারোত সুড়ুৎ ক'রে ঢুকে গেলেন।

"মাষ্টার ক্যানিভ্যু।"

বিরাট দশাসুর চেহারার চাষী তার সমস্ত শক্তি একসঙ্গে করে ভেতরে ঢুকে গেল।

"মাষ্টার বেলহোম।"

লম্বা, কৃশকায় মানুষ বেলহোম। তাঁর কাঁধ ঘর্মাক্ত; চেহারাটা করুণ। একটা রুমাল দিয়ে তাঁর কান দুটো জড়ানো। দেখলেই মনে হবে লোকটি দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগছে।

যাত্রীদের গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল গাড়োয়ান। তারপরে ছাদে উঠে চাবুক মারল ঘোড়াগুলির পিঠে। চলতে শুরু করল গাড়ী। ঝাঁকানি খেতে-খেতে ভেতরের যাত্রীরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগলেন।

প্রথম দিকে পাদরীর উপস্থিতির জন্যে সবাই চুপচাপ বসেছিলেন ; আবোলতাবোল গল্প করতে সাহস পাননি। ভদ্রলোক নিজেই কিছুটা বাচাল আর বন্ধুবৎসল হওয়ার ফলে তিনিই শুরু করলেন প্রথমে—মাষ্টার ক্যানিভূ, ভাল আছেন তো ?

ক্যানিভূ হেসে বললেন—তা, একরকম ভালই, ফাদার। আপনি কেমন আছেন ?

আমি সব সময়েই ভাল থাকি। পয়রেত, আপনার সংবাদ কী ?

ভালই ফাদার, এক ওই চাষ ছাড়া। ফসল ভাল হ'লে তাই দিয়েই আমাদের ক্ষতি হয় যা আমরা উসুল ক'রে নিই।

অবশ্য, সময়টা বড় খারাপই চলেছে।

র‍্যাবোতের শক্তকায়া মহিষী পুলিশদের কাছাকাছি গলার স্বর করে বললেন—হায় ভগবান, দিনকাল সত্যিই বড় খারাপ।

পাশের গ্রাম থেকে আসছেন ব'লে পাদরী তাঁর নামটা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।

তুমি কি ব্লনডেলের মেয়ে ?—পাদরীটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ, আমি র‍্যাবোতকে বিয়ে করেছি।

দুর্বল, রোগাটে, আর সুখী র‍্যাবোত একটু হেসে পাদরীকে অভিবাদন করে বললেন—হ্যাঁ আমি সেই র‍্যাবোত ; আমাকে ওই ব্লনডেলের মেয়ে বিয়ে করেছে।

মাষ্টার বেলহোম কানে রুমাল জড়িয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। দাঁত চিপে পা ঠুকে-ঠুকে এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন যে মনে হল ভীষণ একটা যন্ত্রণায় তিনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন।

পাদরী বললেন—তোমার দাঁতের ব্যথাটা খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছে ব'লে মনে হচ্ছে।

উত্তর দেওয়ার জন্যে একটু চুপ করে থেকে চাষীটি বললেন—না, না—ফাদার। দাঁত নয় ফাদার, যন্ত্রণা হচ্ছে আমার ডান কানের ভেতরে।

কী হয়েছে ডান কানে ? ফোড়া ?

ফোড়া কিনা জানিনা ; তবে ওটা যে একটা জঘন্য জন্তু সেবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি যখন খামারে খড়ের গাদায় শুয়েছিলাম তখনই ব্যাটা আমার কানের ভেতর ঢুকেছে।

জন্তু ? ঠিক বলছ ?

ঠিক বলছি কিনা জানিনা। তবে ফাদার, এটুকু আমি ধর্ম সাক্ষী রেখে বলতে পারি যে ব্যাটা আমার কানের ভেতরটা কুরে-কুরে খেয়ে ফেলছে। এ ব্যাটা আমার মাথাটাকে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলবে, ও—হো...এই বলে প্রচণ্ড বিক্রমে পা আছড়াতে লাগলেন তিনি।

এই দৃশ্যে আশপাশের সকলেই প্রায় কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। এই যন্ত্রণার উপশম কেমন ক'রে হতে পারে সে-সম্বন্ধে প্রত্যেকেই এক-একটা উপদেশ দিলেন। পয়রেত বললেন, জন্তুটা মাকড়শা না হয়ে যায় না ; শিক্ষকটি বললেন—ও নিশ্চয় শুঁয়ো

পোকা। এরকম ঘটনা ঘটতে তিনি নাকি শুনেছেন। একবার একটি লোকের মাথার মধ্যে এইরকম একটা শুঁয়োপোকা ঢুকেছিল ; তবে সে পরে তার নাক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে কানের ভেতর দিয়ে শুঁয়োপোকাটি ঢুকেছিল সেই কানে আর সে শুনতে পেত না ; কারণ, কানের পর্দাটাকে ব্যাটা কেটে একেবারে তছনছ ক'রে দিয়েছিল।

পাদরী বললেন—নিশ্চয় কোন পোকাটোকা হবে।

মাষ্টার বেলহোম একেবারে শেষকালে গাড়ীর ভেতরে ঢুকেছিলেন ; ফলে, তাঁকে বসতে হয়েছিল দরজার একেবারে ধারে। সেই দরজার গায়ে হেলান দিয়ে তিনি গোঙাতে লাগলেন...ও হো হো...আমি মরে গেলাম, মরে গেলাম। মনে হচ্ছে একটা পিঁপড়ে...ইয়া বড় একটা পিঁপড়ে...ওই...ওই...ব্যাটা কানের ভেতরে লম্ফঝম্প জুড়ে দিয়েছে...গেলাম গেলাম, মলাম, মলাম...।

ক্যানিভূ জিজ্ঞাসা করলেন—ডাক্তার দেখাননি ?

না, ভগবান, না।

কেন দেখান নি ?

ডাক্তারের ভয়ে বেলহোমের অসুখটা সেরে গেল বলে মনে হল। রুমালটা কান থেকে খুলে না নিয়ে তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

কেন দেখাইনি ? এই সব অপদার্থ মানুষদের জন্যে নষ্ট করার মত টাকা আপনার রয়েছে ? একবার, দু'বার, তিনবার...আপনি যাচ্ছেন, যাচ্ছেন, আর যাচ্ছেন। আর প্রত্যেকবারেই কিছু-না-কিছু খসছে আপনার। আর তার প্রতিদানে সে আমার কতটুকু উপকার করছে ? কচু...কচু...কিছু জানেন... ?

ক্যানিভূ হেসে বললেন—তা আমি জানব কেমন ক'রে ? তা আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

চ্যামবারলেনকে দেখানোর জন্যে হ্যাভারের দিকে যাচ্ছি।

চ্যামবারলেন কে ?

ডাক্তার।

কোন্ ডাক্তার ?

যে ডাক্তার আমার বাবাকে সারিয়েছিল।

আপনার বাবা ?

হ্যাঁ ; বাবা যখন বেঁচে ছিলেন।

আপনার বাবার কী হয়েছিল ?

হাওয়া জমেছিল পিঠে, ফলে তিনি হাত-পা কিছুই নাড়তে পারতেন না।

তা, আপনার ওই চ্যামবারলেন কী করলেন ?

তিনি ময়দা দলার মত ক'রে তার পিঠটা আচ্ছা ক'রে দলেছিলেন। দু'ঘণ্টায় রোগ সেরে গেল।

চ্যামবারলেন যে সেই সঙ্গে কিছু মন্ত্রও আওড়েছিলেন সে কথা বেলহোমের বেশ মনে রয়েছে; কিন্তু পাদরীর সামনে সে কথা বলতে সাহস হ'ল না তাঁর।

ক্যানিভূ হাসতে-হাসতে বললেন—আপনার কানের ভেতরে যে একটা খরগোস ঢোকেনি তা আপনি কেমন ক'রে জানলেন? আপনার কানের ভেতরে চুলের যে জঙ্গল জন্মেছে, তাতে সে হয়ত ভেবেছে ওরই মধ্যে আরাম করে সে বাসা বাঁধতে পারবে। একটু থামুন; ব্যাটা পাঁই-পাঁই ক'রে পালাতে পথ পাবে না।

এই ব'লে হাতের দুটো তালুকে একসঙ্গে ক'রে শিকারের পেছনে দৌড়ানোর সময় শিকারী কুকুর যেরকম গর্জন করে, ক্যানিভূও বেলহোমের কানের কাছে মুখ নিয়ে সেইরকম চীৎকার করতে শুরু করলেন—ঘেউ...ঘেউ...ঘে-উ-উ...ঘে-উ-উ...ঘাঁক...ঘাঁক ইত্যাদি। সেই ধ্বনিতে সবাই হেসে উঠলেন, এমন কি স্কুলের শিক্ষকও বাদ গেলেন না।

সবাই তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করছে বুঝতে পেরে বেলহোম বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এই দেখে সকলেরই দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরানোর জন্যেই পাদরী র‍্যাবোতের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার সংসারটি বেশ বড় ব'লেই মনে হচ্ছে আমার। তাই না?

হ্যাঁ ফাদার। ঠিক বলেছেন। তাদের প্রতিপালন করা কী কষ্টকর বলুন তো!

মাথা নেড়ে সায় দিলেন র‍্যাবোত—হ্যাঁ, ফাদার। সেকথা ঠিক।

ছেলে-মেয়ে আপনার ক'টি?

বুকের ছাতি ফুলিয়ে ইচ্ছে ক'রে স্বরটাকে রূঢ় ক'রে র‍্যাবোত-মহিষী বললেন—ষোলটি, ফাদার। পনেরটি আমার এই স্বামীটিরই ঔরসজাত।

নিজের কৃতিত্বের কথা স্ত্রীর মুখে শুনে র‍্যাবোতের মুখের ওপরে বড় একটা হাসির রেখা ফুটে বেরোল। পনেরটি সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যে তিনি বেশ গর্ব অনুভব করলেন। কিন্তু ষোড়শ সন্তানের পিতা কে সে সংবাদ পাওয়া গেল না। সম্ভবত, ওই সন্তানটিই তাঁদের প্রথম। সম্ভবত, সে-সংবাদ অনেকেরই জানা রয়েছে। তাই, এই সংবাদে কেউ আশ্চর্য হলেন না। এমন কি ক্যানিভূ পর্যন্ত না।

কিন্তু আবার চীৎকার করতে শুরু করলেন বেলহোম—ওরে বাবারে, মরে গেলাম রে। জানোয়ারটা আমাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল রে।

কাফে পোলাইটএর কাছে গাড়ীটা থামলো। পাদরী বললেন—তোমার কানের মধ্যে কিছুটা জল ঢেলে দিতে পারলে পোকাটা বেরিয়ে আসত। চেষ্টা ক'রে দেখবে একটু?

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

এই কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে সকলেরই হাতগুলি প্রসারিত হ'ল। পাদরী একটা বেসিন আনতে বললেন, সেই সঙ্গে আনতে বললেন একখানা রুমাল আর এক গ্লাস জল। তিনি বেলহোমের মাথাটাকে একপাশে ধরে রাখার জন্যে শিক্ষকটিকে

অনুরোধ করলেন; সেই সঙ্গে বললেন জল কানের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার পরে তার মাথাটাকে নিয়ে তিনি যেন জোরে জোরে বারকয়েক ঝাঁকানি দেন।

কিন্তু ক্যানিভূ ইতিমধ্যে বেলহোমের কানটা টেনে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করেছেন; এবং দেখেই তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন—হায়, ভগবান! কানের ভেতরটা খোলে একেবারে বোঝাই হয়ে রয়েছে যে। ওর ভেতর থেকে কোন খরগোস বেরিয়ে আসতে পারে? তার চারটে পা-ই ওই আঠার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে।

পাদরীও ভাল ক'রে পরীক্ষা করলেন। কথাটা মিথ্যে নয়। ওই কানের ভেতর দিয়ে কোন পোকার বাইরে বেরিয়ে আসার মত ক্ষমতা থাকার কথা নয়। শিক্ষক মশাই দেশলাইএর একটা কাঠি নিয়ে কানের খোল পরিষ্কার করতে লাগলেন। তারপরে পাদরী সেই কানের ভেতরে প্রায় আধ গ্লাস জল ঢেলে দিলেন; সেই জলের বেশ কিছুটা অংশ বেলহোমের চোখ-মুখ ভাসিয়ে দিল। তারপরে শিক্ষক মশাই বেলহোমের মাথাটা জোরে-জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বেসিনের ওপরে ধরে রাখলেন। সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বেসিনের ওপরে। না, কোন জানোয়ারই বেসিনের ওপরে সাঁতার কাটছে না!

বেলহোম মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—কই, মাথার মধ্যে আর কিছু নেই মনে হচ্ছে।

পাদরী বিজয়গর্বে চেঁচিয়ে উঠলেন—জানোয়ারটা নিশ্চয় তাহলে ডুবে মরেছে।

এই সংবাদে সবাই খুশী হ'য়ে গাড়ীর ভেতরে গিয়ে উঠে পড়লেন। কিন্তু গাড়ী চলতে না চলতেই আবার আর্তনাদ করে উঠলেন বেলহোম—ওরে বাবারে, গেলাম রে...ইত্যাদি। বেশ বোঝা গেল জন্তুটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে—গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ব্যাটা ছটফট করছে। বেলহোমের মনে হল জানোয়ারটা এবার মাথার মধ্যে ঢুকে তাঁর মস্তিষ্কটা চিবিয়ে খাচ্ছে। এমনভাবে বেলহোম চেঁচাতে শুরু করলেন, হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন যে পয়রোতের স্ত্রী তো কেঁদেই অস্থির; ভাবলেন, নিশ্চয় লোকটাকে ভূতে ধরেছে। তারপরে যন্ত্রণাটা যেন একটু কমে এল। মনে হল যেন জানোয়ারটা মাথা থেকে নেমে এসে কানের চারপাশে ঘুরঘুর করছে। জানোয়ারটা কেমন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা তিনি আঙুল নেড়ে-নেড়ে দেখাতে লাগলেন: এই দেখুন—এই রকম ক'রে...ও, মরে গেলাম, মরে গেলাম...

ততক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে ক্যানিভূর। তিনি বললেন—ওই জলের জন্যেই জানোয়ারটা মগজের মধ্যে তিড়িংবিড়িং করছে। সম্ভবত ওটা মদ খেতে বেশী অভ্যস্ত।

সবাই তো হেসে অস্থির। কিন্তু ক্যানিভূ তাঁর সন্দেহে অটল। তিনি বললেন—কাফে বোরবোতে পৌঁছানো মাত্র ওকে সামান্য একটু ব্র্যান্ডি দিয়ে দেবেন; তাহলে ওটা আর আপনাকে জ্বালাতন করবে না।

কিন্তু বেলহোমকে কিছুতেই আর থামানো গেল না। যন্ত্রণায় তিনি চীৎকার করতে লাগলেন—ছুঁড়তে লাগলেন হাত-পা। তখন সবাই মিলে গাড়োয়ানকে পরের যেকোন একটা বাড়ির কাছে গাড়ী থামাতে অনুরোধ জানালেন।

রাস্তার পাশে একটা ফার্ম। গাড়ীটা এসে সেইখানেই থামলো। তারপরে নতুনভাবে চিকিৎসা করার জন্যে তাঁকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের টেবিলের ওপরে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। ক্যানিভূর কথা মত ব্র্যান্ডি দেওয়া হ'ল। তাতেই জানোয়ারটা হয় মাতাল হ'য়ে যাবে, না হয়, একেবারে মরে যাবে। কিন্তু পাদরী ভিনিগারটাই পছন্দ করলেন বেশী। এই সময় সবাই এক ফোঁটা, এক ফোঁটা ক'রে কানের মধ্যে মদ ঢালতে লাগলেন—যাতে ক'রে ফোঁটাগুলি কানের একেবারে অপরপ্রান্তে গিয়ে পড়ে। তারপরে কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর একটা বেসিন নিয়ে আসা হ'ল। পাদরী আর ক্যানিভূ দু'জনে মিলে বেলহোমকে বেসিনের ওপরে উপুড় করে ধরলেন; আর শিক্ষকটি তাঁর স্বাস্থ্যবান হাত দিয়ে কানের ওপরে ঘুষি বসাতে লাগলেন। এমন কি ছড়ি হাতে নিয়ে ব্যাপারটা দেখার জন্যে ড্রাইভার পর্যন্ত নেমে এল।

সবাই একযোগে বেসিনের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সেখানে লালচে রঙের ছোট একটা পোকা নড়ছে। একটা মাছি। প্রথমে সবাই অবাক হ'য়ে গেল; তারপরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন সবাই। একটা মাছি! মহানন্দে ক্যানিভূ তাঁর দাবনা চাপড়াতে লাগলেন; গাড়োয়ান বাতাসে তার চাবুক কষাতে লাগল; পাদরী গাধার ডাকের মত হঃ-হঃ করলেন, শিক্ষক হাঁচলেন কি হাসলেন ঠিক বোঝা গেল না; আর দুটি মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন; মনে হ'ল, মুরগীরা যেন কোঁক-কোঁক করছে!

জলের মধ্যে জানোয়ারটার শরীরটা কোঁকড়াচ্ছিল, এপাশ-ওপাশ করছিল। বেলহোম বেসিনের ধারে বসে একটা নিষ্ঠুর আনন্দে সেইদিকে তাকিয়েছিলেন।

শুয়োরের বাচ্চা! তুমি!—এই ব'লে প্রচণ্ড ঘৃণায় তার গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিলেন।

গাড়োয়ান বিপুল আনন্দে চীৎকার ক'রে বলল—মাঝি, মাঝি, শয়তানটা...

তারপরে উচ্ছ্বাস ক'মে এলে সে বলল,—চলুন, চলুন। অনেক বাজে সময় নষ্ট হ'ল আমার।

হাসতে-হাসতে সবাই গাড়ীর ভেতরে উঠে এলেন। সব শেষে ছিলেন বেলহোম; বললেন, আমি আবার ক্রিকোতোত-এ ফিরে যাব। হ্যাভারেতে যাওয়ার কোন দরকার নেই আমার।

গাড়োয়ান বলল—ঠিক আছে। আমার ভাড়াটা দিয়ে দিন।

আমি অর্দ্ধেক পথও আসিনি। সুতরাং অর্দ্ধেক ভাড়াই দেব আমি।

না। পুরো ভাড়া দিতে হবে।

কথা কাটাকাটি হ'তে-হ'তে বিরাট ঝগড়ার সৃষ্টি হ'ল। বেলহোম বললেন, কুড়ি সো-র বেশী কিছুতেই তিনি দেবেন না। গাড়োয়ান বলল—চল্লিশ সো আমার চাই।

জোর ঝগড়া। দু'জনে দু'জনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে খিঁচোতে শুরু করল।

তাড়াতাড়ি গাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এলেন ক্যানিভূ; বেলহোমকে লক্ষ্য করে বললেন—প্রথমতঃ পাদরী বাবার কাছে তোমার ঋণ রয়েছে চল্লিশ সো। তারপরে সবাইকে ড্রিঙ্ক খাওয়াতে হবে। তার জন্যে খরচ হবে তোমার পঞ্চাশ সো। তার ভেতর থেকে গাড়োয়ানকে দেবে কুড়ি সো। ফস্নি, কী বল—এতে তুমি রাজি?

বেলহোমের কাছ থেকে বেশী অর্থ নেওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সে বলল—রাজি।

তাহলে দিয়ে দাও।

না, দেব না। যাই বলুন, পাদরী ডাক্তার নন।

তুমি যদি না দাও তাহলে ওই গাড়ীতে চাপিয়ে তোমাকে আমরা হ্যাভারে পাঠিয়ে দেব।—এই বলে সেই দশাসুর চেহারার মানুষটি বেলহোমের কোমর ধরে শূন্যে তুলে গাড়ীর দিকে এগোতে লাগলেন।

বেলহোম দেখলেন তাঁর সঙ্গে শরীরের শক্তিতে তিনি পারবেন না। তাই টাকার থলি বার করে চাহিদা মিটিয়ে দিলেন।

গাড়ী তার যাত্রীদের নিয়ে হ্যাভারের দিকে এগিয়ে চলল। বেলহোম ফেরার পথ ধরলেন।

কাঠের গুঁড়ি

The Log

বসার ঘরটি ছোট; মোটা পর্দা ঝুলছে চারপাশে। ঘরের ভেতরে মিষ্টি একটা গন্ধের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। চুল্লীর ভেতরে গনগন করছে আগুন। পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে তারই আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঘরের মধ্যে দু'জন বসে-বসে গল্প করছিলেন। সেই আলো মৃদু আভায় ছড়িয়ে পড়েছে তাদের মুখে।

এ বাড়ির কর্ত্রী হচ্ছেন একটি বৃদ্ধা। মাথার চুলগুলি তাঁর সাদা। পরিচ্ছন্ন রুচিসম্পন্না মহিলা। দেহের ওপরে এখনও কোন বলিরেখা জেগে ওঠেনি। এ ঘরের দ্বিতীয় মানুষটি হচ্ছেন একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধটি অবিবাহিত; ভদ্রমহিলার পুরনো বন্ধু। দীর্ঘ জীবনে পরস্পরের মধ্যে একটা অটুট সৌহার্দ বজায় রয়েছে। এছাড়া দু'জনের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

প্রায় মিনিটখানেক দু'জনে চুপচাপ আগুনের দিকে তাকিয়ে নির্বাকভাবে বসে রয়েছেন। তাঁরা যে বিশেষ কিছু ভাবছিলেন তা নয়। সুখী হওয়ার জন্যে যাঁদের অনবরত কথা বলতে হয় না, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন যাঁদের অটুট

রয়েছে—এই নীরবতা তাঁদের সেই নিস্তব্ধ বোঝাপড়ায় মুখর। হঠাৎ একটা পোড়া কাঠের চাঁই চুল্লীর বাইরে গড়িয়ে পড়ল। তারই ফলে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের টুকরোগুলি। বৃদ্ধা মহিলাটি এই দেখে ছোট একটি আর্তনাদ ক'রে লাফিয়ে উঠলেন। মনে হ'ল ঘর থেকে পালিয়ে যাবেন তিনি; কিন্তু ভদ্রলোকটি গোড়ালির ঠোক্কর দিয়ে গুঁড়িটাকে চুল্লীর ভেতর দিলেন ঢুকিয়ে; তারপরে আগুনের যে টুকরোগুলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলোকে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে দিলেন। বিপদমুক্ত হওয়ার পরে একটা পোড়া গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বান্ধবীর উলটো দিকে চেয়ারে বসে ভদ্রলোক একটু হেসে তাঁর দিকে তাকালেন; তারপরে জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়িটার দিকে নির্দেশ ক'রে বললেন—এইরকম একটা দুর্ঘটনা আগেও আমার জীবনে ঘটেছিল। তাই আমি বিয়ে করিনি।

ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন। পুরুষের অন্তরঙ্গ সব কিছু জানার জন্যে মহিলা, বিশেষ ক'রে বৃদ্ধা মহিলাদের যেরকম গভীর আর হিংসাত্মক কৌতূহল থাকে—সেইরকম কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুর দিকে তাকালেন; তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন—যথা?

"সে-কাহিনী দীর্ঘ; করুণ, আর অপ্রীতিকর।

"আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজনের নাম জুলিয়েন। আমাদের মধ্যে হঠাৎ বিচ্ছেদ ঘটার কারণটা বুঝতে না পেরে আমার পুরনো বন্ধুরা অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কেমন ক'রে যে আমাদের অটুট বন্ধুত্বের দেওয়ালে চিড় ধরল সেকথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারলেন না। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ কেন হ'ল সেই কথাটাই আমি আজ তোমাকে বলছি।

"একদিন সন্ধ্যায় জুলিয়েন আমাকে এসে জানালো সে বিয়ে করবে ঠিক করেছে। সংবাদটা পেয়ে খুব ধাক্কা খেলাম আমি। মনে হ'ল কেউ যেন আমার ঘরে ডাকাতি করেছে, অথবা, প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে। কোন প্রিয় বন্ধু যখন বিয়ে করে তখন তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ফুরিয়ে যায়। এতদিন আমরা দু'জনে এক আত্মা ছিলাম—এখন সেই নিগূঢ় সম্পর্কের দেওয়ালে ফাটল যে ধরবে সেদিক থেকে আমার মনে কোনরকম সন্দেহ ছিল না। স্বার্থপর এবং হিংস্র দুটি পুরুষের এই একাত্মতাকে কোনদিনই বরদাস্ত করবে না। দুটি পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠুক এটা কোন স্ত্রীই বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

"পুরুষ আর নারীর মধ্যে ভালবাসা যত গভীরই হোক না কেন মন আর বুদ্ধির দিক দিয়ে তারা চিরদিনই বিপরীত জগতে বাস করে। তারা যেন দুটি জাতের। সুযোগ পেলেই একে অপরকে আঘাত না ক'রে পারে না। সহঅবস্থানের রীতিতে তারা বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে একজন হবে জয়ী, আর একজনকে যুদ্ধের অমোঘ রীতিতে পরাজয় বরণ করতে হবে। কামনার আতিশয্যে পরস্পরের হস্তমর্দন করবে তারা—একথা সত্যি; কিন্তু কোনদিন পরস্পরের কাছে তারা সরল বিশ্বাস আর আনুগত্যে হৃদয় উন্মোচন করবে না। যে সন্তানেরা বৃদ্ধ বয়সে অনিবার্যভাবেই তাদের পরিত্যাগ ক'রে

যাবে তাদের আশায় বিয়ে না ক'রে যারা সত্যিকারের বিজ্ঞ তারা বৃদ্ধ বয়সে একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খুঁজে বেড়ায়। দুটি বন্ধুর মধ্যেই পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান পরিচ্ছন্নভাবে চলে বলে তারাই বার্দ্ধক্যের একমাত্র সঙ্গী হওয়ার যোগ্য।

"যাই হোক, বন্ধু জুলিয়েন বিয়ে করল। তার স্ত্রীটি সত্যিই বড় সুন্দরী। কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো চুলের স্তবক, হাসিখুশি ভাব; বেঁটে চেহারার স্বাস্থ্যবতী যুবতী। আমার বন্ধুটিকেও সে খুব ভালবাসত। তাদের সহজ মেলামেশার পথে পাছে আমি কোন বাধার সৃষ্টি করে ফেলি এই ভয়ে প্রথম দিকে খুব বেশী একটা আমি তাদের বাড়ি যেতাম না। কিন্তু পরে যে-কোন কারণেই হোক তাদের ওপরে আমার আকর্ষণ বাড়লো; তারাও আমাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাতো; মনে হ'ল, আমার সঙ্গটা তাদের বেশ ভাল লাগত। ফলে, তাদের মিষ্টি জীবনযাত্রার সঙ্গে আমিও নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলাম। প্রায়ই তাদের বাড়িতে আমি ডিনার খেতাম। রাত্রিতে যখন ফিরে আসতাম তখন আমার খুব খারাপ লাগত; মনে হোত, আমার বাসাটায় কোন আনন্দ নেই! মনে হোত এবার আমিও একটা বিয়ে করব।

"একদিন জুলিয়েন আমাকে ডিনার খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালো। আমিও যথারীতি গেলাম। সে বলল—বন্ধু, এখনই বিশেষ একটা জরুরী কাজে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। এগারটার আগে আমি ফিরতে পারব না। তার বেশী দেরী আমার হবে না। এই সময়টা তুমি বার্থার কাছে থাকতে পারবে কি?

"যুবতীটি হেসে বলল—'এই পরিকল্পনাটি কিন্তু আমারই।'

"আমি রাজি হ'লাম; কেবল রাজি হ'লাম না, তাদের এই অন্তরঙ্গতায় বেশ খুশিই হ'লাম। আটটার সময় ডিনার শেষ হ'ল আমাদের। তারপরে বেরিয়ে গেল জুলিয়েন। সে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অদ্ভুত অস্বস্তি এসে আমাদের দু'জনকেই গ্রাস ক'রে বসল। যদিও আমাদের মধ্যে প্রায় একটা ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তবু আমরা এইভাবে একা-একা দু'জনে কোনদিন থাকিনি। আমরা তাই একটা নতুন পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়লাম। এই রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শূন্যতা ভরিয়ে দেওয়ার খাতিরে আমি দু'চারটে একথা-সেকথা বললাম। সে তার কোন জবাব দিল না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল; মনে হ'ল, কোন একটা গভীর সমস্যা সমাধান করার জন্যে সে বেশ ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। আর কোন কথা বলার বিষয় না পাওয়ায় আমিও চুপচাপ বসে রইলাম। মাঝে-মাঝে কথা খুঁজে পাওয়াটা যে কী রকম কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ায় তা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি আমার হাড়ে মজ্জায় তখন কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি শিরশির ক'রে উঠছিল। কেন উঠছিল তা আমি বলতে পারব না; সেই বিশেষ অনুভূতিটা কোন্ জাতীয় তাও আমার অজানা। ভালই হোক, আর খারাপই হোক, মনে হ'ল কেউ যেন আমার ওপরে লক্ষ্য রাখছে। এরকম অনুভূতি মাঝে-মাঝে মানুষের হয়।

"এই অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে কিছুক্ষণ কাটার পরে বার্থা বলল—আগুনটা নিবে আসছে; আপনি একটা কাঠ চুল্লির ভেতরে দয়া করে ফেলে দিন তো।

"তোমার ঘরে যেখানটায় কাঠ রাখার বাক্স রয়েছে সেখানেও ওইরকম একটা বাক্স ছিল। সেই বাক্সটার ডালা খুলে আমি একটা কাঠের চাঁই বার করলাম; চাঁইটা বেশ বড়ই ছিল। তারপরে সেটাকে চুল্লীর ভেতরে চাপিয়ে দিলাম আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল।

"কিছুক্ষণের ভেতরেই গনগন করে কাঠ পুড়তে লাগল। মনে হ'ল সেই আগুনের তাপে আমাদের মুখ পুড়ে যাবে। যুবতীটি আমার দিকে তাকালো—সেই চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন অদ্ভুত। বলল—এখানে বড় গরম লাগছে। চলুন আমরা ওই সোফার ওপরে গিয়ে বসি।

"আমরা সেই সোফার ওপরে গিয়ে বসলাম; তারপরেই সে আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল—কোন মহিলা যদি বলে আপনাকে সে ভালবাসে তাহলে আপনি কী করবেন?

"এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব বুঝতে না পেরে আমি বললাম—সত্যি কথা বলতে কি সেরকম কোন অঘটন যে ঘটতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনা, কিন্তু কিভাবে প্রশ্নটা করা হবে তারই ওপরে আমার উত্তরটা নির্ভর করবে।

"সে একটু হাসল; হাসিটা কেঁপে-কেঁপে উঠল। এ হাসি সেই ধরনের প্রতারণার হাসি; মনে হবে সেই হাসির শব্দে পাতলা কাঁচের গ্লাস ভেঙে যায়। তারপরে সে বলল—'পুরুষরা কোন দিনই দুঃসাহসী বা চতুর নয়।' তার পরে একটু থেমে সে আবার বলল—'মঁসিয়ে পল, কোনদিন আপনি কি কাউকে ভালবেসেছেন?' বেসেছি শুনে আমাকে সেই কাহিনীটি বলতে সে অনুরোধ করল। আমি একটা কাহিনী খাড়া ক'রে তাকে শোনালাম। সে সেই কাহিনী বেশ মন দিয়ে শুনল; শোনার সময় কখনও তার চেহারায় ঘৃণার একটা চিহ্ন ফুটে বেরোল; কখনও বা আমার বক্তব্যকে সে ইঙ্গিতে সমর্থন জানালো। তারপরে সে হঠাৎ বলে উঠল—'উঁহু! প্রেম জিনিসটা কী তার আপনি কিছুই জানেন না। আমার বিশ্বাস, সত্যিকার প্রেম মনকে অস্থির করে তোলে, স্নায়ুগুলিকে ক'রে তোলে দুর্বল, আর মস্তিষ্কটিকে বিকল ক'রে ফেলে। করতে বাধ্য—কিন্তু আমার বক্তব্যটিকে ঠিকভাবে প্রকাশ করার মত ভাষা আমি পাচ্ছিনা। সত্যিকার প্রেম বড় ভয়ঙ্কর অস্ত্র; এ কারও পরোয়া করে না—ধর্মাধর্ম মানে না; মানে না কোন নীতি বা আইনের অনুশাসন। কোন স্বর্গীয় বাধা এর চলার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। যে প্রেমের মধ্যে দুর্নীতি নেই, যে প্রেমে তরঙ্গ নেই, যা সহজ সরল অনুত্তেজক—তাকে কি প্রেম বলে?'

"কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। মনে হল দার্শনিক উত্তর দিয়ে বলি—এরই নাম নারী। কথা বলার সময় বন্ধু-স্ত্রীটি এমন একটা ভাব দেখালো যে মনে হ'ল জীবনের ওপরে তার একটা বীতশ্রদ্ধা জন্মেছে। কুশনের ওপরে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে সে আমার ঘাড়ের ওপরে তার মাথাটা রাখলো; তার স্কার্টটা টেনে নিল একটু; পায়ের সিল্কের মোজার কিছুটা অংশ বেরিয়ে পড়ল; আগুনে সেগুলো চকচক ক'রে

উঠল। দু' এক মিনিট সেইভাবে পড়ে থেকে সে বলল—'আমি যদি বলি তোমাকে আমি ভালবাসি—তাহলে তুমি কী করবে?'

"আমি কোন উত্তর দেওয়ার আগেই দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মাথাটা তার বুকের ওপরে টেনে এনে আমার ঠোঁটের ওপরে তার দুটো ঠোঁট চিপে ধরল।

"সত্যি কথা বলছি, তার এই ব্যবহারে আমি মোটেই খুশি হ'তে পারিনি, শেষ পর্যন্ত বন্ধু জুলিয়েনকে প্রতারণা করব? এই বোকা, গর্ধভ, গবেট মেয়েটার প্রেমিক হ'তে হবে আমাকে? এই কামুক মেয়েটার! নিজের স্বামী তার কাছে যথেষ্ট নয়? আর এরই জন্যে—এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করার জন্যে আমি আমার বন্ধুকে ক্রমাগত বঞ্চনা ক'রে যাব? না, না। ওপথ আমার নয়, কিন্তু আমি করব কী? এই উদ্ধত কলঙ্কিনী নারীকে আমি সামলাবো কেমন ক'রে? আমি তো জোশেফের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারব না। যে পুরুষ কোনদিন এমন কোন নারীর চুম্বনের স্বাদ পায়নি—যে নারী তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে...সেই প্রথম আমার ওপরে আঘাত হানুক।

"আর একটি মুহূর্ত...সেইটিই আমার জীবনে সবচেয়ে শঙ্কটপূর্ণ—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ...কী হবে, কী হ'তে পারে...কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি...সে কী করত...আমি কী ক'রে ফেলতাম...হঠাৎ আমরা দু'জনেই লাফিয়ে উঠলাম। হঠাৎ সেই কাঠের চাঁইটা চুল্লীর ভেতর থেকে ভীষণ একটা শব্দ ক'রে মেঝের ওপরে লাফিয়ে পড়ল। সেই ধাক্কায় টুকরো-টুকরো আগুনে পোড়া লাল-লাল কাঠের টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। কার্পেটটা পুড়তে শুরু করল। তারপরে সেই কাঠের চাঁইটা আর্ম-চেয়ারের সামনে এসে স্থির হয়ে গেল। আর একটু হ'লে চেয়ারটায় আগুন ধরে যেত।

"পাগলের মত আমি লাফিয়ে উঠলাম। তারপরে কাঠটাকে সরিয়ে আমি চুল্লীর মধ্যে পুরে দিলাম। ঠিক সেই সময় দরজা খুলে জুলিয়েন ঘরে ঢুকে এল। মুখে একটা তৃপ্তির আর আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে সে বলল—যতটা সময় নেবো ভেবেছিলাম তার ঘণ্টা দুই আগেই কাজটা আমার শেষ হয়ে গেল।

"বন্ধু তাহলেই বুঝতে পারছ—ওই কাঠের গুঁড়িটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না উঠলে সে আমাদের ধরে ফেলত। তার ফলটা কী দাঁড়াত তা তুমি বুঝতেই পারছ। তারপর থেকে এসব ব্যাপারে আমি খুব সাবধান হয়ে গেলাম। তার পর থেকে জুলিয়েনও কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমার ওপরে তার আকর্ষণও কমে এল। সম্ভবত, আমাদের এই বন্ধুত্ব তার স্ত্রী ঠিক পছন্দ করেনি। ধীরে-ধীরে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেল।

"সেজন্যেই আমি বিয়ে করিনি। নিশ্চয় এতে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ না।"

অস্থি

The Relic

অ্যাবে লুই দ্য এনেমারে-কে, সয়সোঁস

প্রিয় অ্যাবে,

তোমার মামাতো বোনের সঙ্গে আমার যে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তা ভেঙে গিয়েছে। তার জন্যে দায়ী অবশ্য আমার মূর্খতা। প্রাণের দায়ে আমি তোমার বোনের সঙ্গে বোকার মত ছলনা করেছিলাম। তার ফল আমি পেয়েছি। তুমি আমার সহপাঠী। তুমিই এই বিপদ থেকে আমাকে বাঁচাতে পার এই আশা নিয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। যদি সাহায্য করতে পার তাহলে চিরজন্ম আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

গিলবার্তাকে তুমি চেন; অথবা, চেন বলে তোমার ধারণা। কারণ নারীদের কি আমরা আজ পর্যন্ত কোনদিনই চিনতে পেরেছি? তাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, জল্পনা-কল্পনা আমাদের অবাক করে দেয়। নারীজাতটা কোনদিনই সোজা পথে চলতে জানে না। সব সময়ই তারা ঘোরানো পথ দিয়ে হাঁটে; এমন সব তর্ক ক'রে যা বোঝা কোন পুরুষেরই কর্ম নয়। তাদের তর্কের ধারাতেও যথেষ্ট গলদ রয়েছে; তাদের চিন্তাটা সব সময়ই একগুঁয়েমীর মত, কোন একটা জিনিস একবার ধরলে তা থেকে আর তাদের নড়ানো যায় না। অথচ সেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও সামান্য কারও কথায় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। নারীচরিত্র বিধাতার একটা দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টি।

তোমার বোনটি যে ধার্মিক প্রকৃতির সেকথা না বললেও চলে। কারণ ন্যানসিতে শ্বেত অথবা কৃষ্ণবর্ণের সিস্টারদের কাছেই সে মানুষ হয়েছে। এ বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে ভালই জান। তুমি যা জান না তা হচ্ছে এই যে ধর্মের বিষয়ে সে যেমন সহজেই উত্তেজিত হয় সেইরকম অন্যান্য সকল বিষয়েই তার উত্তেজনা সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়। বাতাসে ওড়া পাতার মত একটু কোন উত্তেজনার সুযোগ এলেই তার বুদ্ধিবৃত্তিগুলি উড়তে শুরু করে। আসলে সে নারী, অথবা বালিকাই তাকে বলতে পার। ভালবাসা পাওয়ার জন্যে সে যেমন বাঁধনছেঁড়া হয়ে দৌড়ে যায়, ঠিক তেমনি যাকে সে ঘৃণা করে তার কাছ থেকেও সে পাঁই-পাঁই ক'রে পালিয়ে যায়। মেয়েটি যে সুন্দরী তা তুমি জান...অথবা আমি যতটুকু জানি তার চেয়েও সে অনেক বেশী সুন্দরী...এক হিসাবে কতটা সুন্দরী তা তুমি জান না।

যাই হোক, বিয়েটা আমাদের ঠিক হয়ে গেল। তারপর একদিন সন্ধেবেলা কোলোন থেকে আমি একটা টেলিগ্রাম পেলাম। কনসালটেশনের জন্যেই আমাকে ডাকা হয়েছিল; তবে রোগীর অবস্থা যেরকম খারাপ তাতে হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাকে একটি কঠিন এবং বিপজ্জনক অপারেশন করতে হ'তে পারে—টেলিগ্রামের ভাবটা ছিল এই জাতীয়।

পরের দিন সকালেই আমাকে যাত্রা করতে হবে ব'লে আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম; বলে এলাম পরিবর্তিত অবস্থায় আগের সিদ্ধান্তমত তার সঙ্গে বুধবার আমি ডিনার খেতে পারব না; খাব শুক্রবার, ওই দিনই আমি ফিরে আসব, হায়রে, এই শুক্রবার সম্বন্ধে সাবধান হয়ো বন্ধু। ওই বারটা যে অপয়া তা তোমাকে আমি জোর ক'রেই বলতে পারি।

যাওয়ার কথা শুনেই তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল, তারপরে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব শুনে সে আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল—তুমি যাচ্ছ শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি আমার জন্যে কিছু নিয়ে এস—সামান্য কিছু—একটা স্মৃতিচিহ্ন আর কী! কী জিনিস আমার ভাল লাগতে পারে তা বাপু তুমি নিজেই ঠিক করো, খুশি হলে বুঝবো তোমার বুদ্ধি রয়েছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার বলল—কিন্তু কুড়ি ফ্রাঁর বেশী কিছুতেই তুমি খরচ করবে না। দামের জন্যে নয়, আমাকে তুমি কতটা ভালবাস তাই যাচাই করার জন্যে আমি ওটা পেতে চাই।

তারপরে আরও একটু থেমে বলল—যদি উপহারটার দাম বেশী না হয় অথচ বেশ নতুন রকমের হয় তাহলে...তাহলে...আমি তোমাকে চুমু খাব।

পরের দিনই আমি কোলোনে চলে গেলাম। রোগীর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। রোগীকে ঘিরে তাঁর বাড়ি সকলেই একেবারে কান্নাকাটি হইচই জুড়ে দিয়েছিলেন। ক্ষতস্থানটি কেটে বাদ দিতে হবে। তাঁরা আমাকে আটকে রাখলেন; আটকে রাখার চেয়ে চাবি দিয়ে রাখলেন বলাই ভাল। একটি মরণোন্মুখ মানুষের দেহে আমি কঠিন অস্ত্রোপচার করলাম। একবার মনে হল, টেবিলের ওপরেই সে মারা যাবে। দুটি রাত্রি সেই রোগীর পাশে আমাকে কাটাতে হল। তারপর যখন বুঝলাম রোগীটির বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী তখনই আমি ফেরার পথ ধরলাম। কিন্তু সময়ের ভুল হয়েছিল আমার। স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন ছাড়তে তখনও এক ঘণ্টা দেরী। আমার সেই হতভাগ্য রোগীটির কথা ভাবতে-ভাবতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় একটি লোক এসে আমাকে জার্মান ভাষায় কী যেন বলল। আমি জার্মান বুঝিনা, সে বোঝে না ফরাসী ভাষা। কিন্তু তার শরীর আর কথার বিশেষ ভঙ্গিমা দেখে মনে হল সে আমাকে প্রাচীনকালের কিছু একটা স্মৃতিচিহ্ন গছাতে চায়। হঠাৎ আমার গিলবার্তার কথা মনে পড়ে গেল। আমি জানতাম সে একটি গোঁড়া ভক্ত। আর তাকে খুশি করার জন্যে উপযুক্ত বস্তুটা নিজেই আমার হাতের কাছে এগিয়ে এসেছে। সুতরাং যেখানে এই জাতীয় ধর্ম-সংক্রান্ত বস্তু বিক্রী হচ্ছে সেখানে লোকটির সঙ্গে আমি গেলাম। এগার হাজার ভার্জিনের একজনের একটুকরো অস্থি কিনে ফিরে এলাম। একটা পুরনো রূপোর বাক্সের মধ্যে সেই ভার্জিনের অস্থিটি ছিল। বাক্সটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল বলেই কিনেছিলাম আমি। তারপর সেটিকে পকেটে পুরে প্যারিসগামী ট্রেনে চড়ে বসলাম।

বাড়ি ফিরে পকেট থেকে কৌটোটা বার করেই দেখি ডালাটা খোলা; আর ভার্জিনের সেই টুকরো অস্থিটা হাওয়া! পকেট হাতড়ালাম, ওলট-পালট করলাম পকেট। কাকস্য পরিবেদনা। আধখানা আলপিনের মত অস্থিটা একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

প্রিয় বন্ধু অ্যাবে, তুমি জান, ধর্মে আমার বড় একটা বিশ্বাস নেই, কিন্তু বন্ধু হিসাবে তা নিয়ে তুমি বিশেষ দুশ্চিন্তা করো না; আমাকে আমার ভবিষ্যতের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু পুরনো জিনিস বিক্রির দোকানদার আসল ভার্জিনের হাড় বিক্রী করছে একথা বিশ্বাস করতে কোনমতেই আমি রাজি নই। সেদিক থেকে তুমিও নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবে। সেইজন্যে ভেড়ার সেই টুকরো হাড়টা হারিয়ে আমার সত্যিকার কোন দুঃখ হয়নি। বাজার থেকে ওই মাপের একখানা হাড় কিনে নিয়ে জুয়েলের মধ্যে পুরে আমি আমার প্রেয়সীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমাকে দেখেই প্রেয়সী হাসতে-হাসতে ছুটতে-ছুটতে আমার কাছে এসে বলল—কী এনেছ দেখি!

আমি বললাম—হাই যা! ওকথা আমার একদম মনে নেই। কিন্তু আমার কথা সে বিশ্বাসই করল না। অনেক অনুনয়-বিনয় করার পরে আমি তাকে জিনিসটা দেখালাম। রূপোর বাক্সটা পেয়ে সে একেবারে আনন্দে আত্মহারা।

অস্থি! ও! অস্থি এনেছ?

এই বলতে-বলতে গভীর শ্রদ্ধাভরে বাক্সটাকে সে বার-বার চুমু খেতে লাগল। তাই দেখে তাকে যে প্রতারণা করেছি এই ভেবে নিজেরই কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। সে তো বেজায় খুশি; তারপরেই কিন্তু তার চোখ দুটো ভয়ে বড় বড় হয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করল—তুমি ঠিক জান, এটা আসল অস্থি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। একেবারে খাঁটি।

কী ক'রে নিশ্চিত হলে?

এবারে আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। রাস্তার একটি অজানা লোকের মারফৎ বস্তুটি আমি কিনেছি এই কথা শুনলেই আমার দফা রফা হ'য়ে যাবে। কী বলা উচিত ভাবছি, এমন সময় মগজে আমার চিন্তা তড়িৎপ্রবাহবৎ খেলে গেল। সামান্য একটু হেসে [মানে হাসিটি রহস্য-মেশানো আর কী!] বললাম—তোমার জন্যে চুরি করেছি।

চুরি!! কোথা থেকে!!!—অবাক বিস্ময়ে বড়-বড় চোখে সে আমার দিকে তাকালো।

গির্জা থেকে। এগার হাজার ভার্জিন যেখানে থাকেন সেই গির্জা থেকে।

তার বুকটা তখন আনন্দে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে; ভাবাবেগে বাক্যস্ফূর্তি হল না তার। কোনরকমে সে বলল—তুমি...মানে...তু...মি। আমাকে খুলে বল।

বোঝ ঠেলাটা! আর তো আমি কবুল করতে পারিনা। একটা সুন্দর রোমাঞ্চকর গল্প তৈরি করতে হল আমাকে; আর বেশ বিস্তারিতভাবেই। সবকিছু নিজের চোখে দেখার জন্যে গির্জারক্ষককে একশ ফ্রাঁ দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকে গেলাম। গির্জা তখন

সারানো হচ্ছিল। লোকজন আর পাদরী লাঞ্চ খেতে বাইরে গিয়েছেন। সেই সুযোগে আমি একটা কাঠের তক্তা সরিয়ে ফেলতেই অনেক হাড়ের মধ্যে [এগার হাজার ভার্জিনের হাড় কি একটু-আধটু হ'তে পারে!] ছোট একখানা [খুব ছোট!] হাড় কুড়িয়ে নিলাম। তারপরে সেটিকে পকেটে পুরে একটা সোনার দোকানে গিয়ে উপযুক্ত একটা কাসকেট কিনলাম। ওই রূপোর বাক্সটা কিনতে আমার যে পাঁচশ ফ্রাঁ লেগেছে সেটা বলতেও আমার কোন দুঃখ হয়নি।

কিন্তু দাম নিয়ে সে এতটুকু ব্যতিব্যস্ত হল না। কাঁপতে-কাঁপতে গভীর আনন্দ আর রোমাঞ্চের সঙ্গে সে আমার কাহিনী শুনে ফিসফিস করে বলল—'ওঃ, তোমাকে আমি কত ভালবাসি!' এই বলেই সে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

ব্যাপারটা একটু অনুধাবন কর বন্ধু! তার জন্যে গির্জাকে আমি অপবিত্র করেছি; তার জন্যে আমি চুরি করেছি, ধর্মীয় নীতি লঙ্ঘন করেছি, শুধু লঙ্ঘনই করিনি—পবিত্র অস্থি চুরি করেছি। এই সব অকার্য আর কুকার্য করার জন্যেই সে আমাকে এত ভালবাসে। আর তার ভালবাসা এতটা স্বর্গীয়!! প্রিয় অ্যাবে, একেই বলে নারী!!

দুটি মাস মহা আনন্দেই কাটলো আমাদের। নিজের ঘরেই সেই টুকরো ভেড়ার হাড়টিকে রাখার জন্যে সে একটা সুন্দর গির্জা তৈরি করালো। এই হাড়খণ্ডটিই প্রেমের জন্যে আমি চুরি করে এনেছি। সেই হাড়টিকে পূজা করার সঙ্গে সকাল-সন্ধে রীতিমত সে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু করে দিল। ব্যাপারটা প্রচার হ'লে চুরির অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে জার্মানীতে চালান করে দিতে পারে এইরকম একটা ভয় দেখিয়ে সে যাতে বেশী হই-চই না ক'রে সেদিকে সাবধান করে দিলাম তাকে।

গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে যে জায়গা থেকে আমি অস্থিটি চুরি করে এনেছিলাম সেই জায়গাটা দেখার জন্যে গিলবার্তার মনটা একেবারে আইঢাই করে উঠল। আমাকে কোন কথা না বলে সে তার বাবাকে ধরল সেইখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আর তার বাবাও কোথায় যাচ্ছেন সেবিষয়ে আমাকে কোন কথা না বলে কন্যার ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে স্বকন্যা তিনি কোলোনের পথে যাত্রা করলেন।

এইখানে তোমাকে বলা আদৌ অযৌক্তিক হবে না যে উপরিউক্ত গির্জার ভেতরে আমি কোনদিনই ঢুকিনি। এগার হাজার ভার্জিনের কবরখানা কোথায় [সত্যিই যদি তেমন কিছু থেকে থাকে] তাও আমি জানিনা। তা ছাড়া যাব কী ক'রে! ওসব জায়গায় কি কাউকে যেতে দেয়!

এক সপ্তাহ পরে দশটি ছত্রের একটি চিঠি পেলাম। আমাদের বিয়ে নাকচ। সেই সঙ্গে কৈফিয়ৎ হিসাবে তার বাবার একখানি চিঠি।

গির্জাটি দেখেই গিলবার্তা আমার চালাকি ধরে ফেলেছে। সে বুঝতে পেরেছে এক মিথ্যাভাষণ ছাড়া অন্য কোন অপকর্ম করার ক্ষমতা আমার নেই। সেখানে সম্প্রতি কোন ডাকাতি হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন গির্জার রক্ষককে সে করছিল। প্রশ্ন শুনে রক্ষকটি তো হেসেই অস্থির। ওখান থেকে কোন জিনিস চুরি করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। যেমুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে ওই পবিত্র জায়গা থেকে পবিত্র অস্থি

চুরি ক'রে নিজেকে আমি অপবিত্র করিনি সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল তাকে বিয়ে করার যোগ্যতা আমার নেই।

বৃথাই তাকে অনুরোধ উপরোধ করলাম। তাদের বাড়িতে আমার প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেল। সেই পুণ্যাত্মা নারীকে কিছুতেই টলানো গেল না। গত সপ্তাহে তার সম্পর্কের এক বোন—তোমার সম্পর্কেও তাই—বলে পাঠালো যে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দেখা করলে সে বলল একটি শর্তে সে আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারে। সেই শর্তটি হচ্ছে—আমাকে একটি সত্যিকার অস্থি সংগ্রহ করতে হবে; সেই অস্থিও যে আসল সেবিষয়ে আমাদের হোলি ফাদার পোপকে লিখিতভাবে স্বীকার করতে হবে।

প্রয়োজন হ'লে রোমেই যেতে হবে আমাকে। কিন্তু হঠাৎ গিয়ে পোপের সঙ্গে দেখা করা যায় না; আর গিয়ে আমার এই মূর্খ অভিযানের কথাও বলা যাবে না তাঁকে। আর তাছাড়া, গির্জার সঙ্গে সংযুক্ত নয় এমন কাউকে তারা ভার্জিনের অস্থি দেয় কিনা সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কোন কার্ডিনেলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তুমি আমাকে একটা পরিচিতিপত্র দিতে পার। অথবা মহিলা সেন্টএর অস্থি রয়েছে এমন কোন ফরাসী পাদরী হলেও চলবে। অথবা, এই রকম একটি মূল্যবান বস্তু যদি তোমার সংগ্রহশালায় থাকে তো আরও ভাল।

তোমার দ্বিতীয় বোনটিও আমাকে বলেছে—হতভাগিনী গিলবার্তা আর কাউকেই জীবনে বিয়ে করবে না।

হে আমার ছাত্র জীবনের প্রিয় বন্ধু, আমার একটা মূর্খ প্রতারণার শিকার হ'য়ে তোমার বোনটি কি শেষ পর্যন্ত মারা যাবে? দয়া করে এগার হাজার এক ভার্জিন না হ'তে তাকে অনুরোধ কর।

আমাকে ক্ষমা কর। অপদার্থ আমি। কিন্তু তোমাকে আমি আলিঙ্গন জানাচ্ছি। আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।

তোমার পুরনো বন্ধু
হেনরি ফঁত্যাল

বিছানা

The Bed

গত গ্রীষ্মকালের একটা বেশ গরম অপরাহ্নের কথা বলছি। বেশ বড় বড় নীলাম করার ঘরগুলি যেন ঘুমোচ্ছিল। নীলাম-ওয়ালারা খেয়াল-খুশি মত জিনিসপত্রগুলোকে এধার-ওধার করতে লাগল। পেছনের দিকের একটা ঘরের এককোণে পুরনো ধর্মীয়

সিল্কের পোশাকের দুটো স্তূপ পড়েছিল। মাঝে-মাঝে এসব জায়গায় পুরনো দামী জিনিসও আপনারা খুঁজে পাবেন। ময়লা দাড়ি-ওয়ালা দু'চারজন পুরনো আসবাবপত্রের ব্যবসাদার সেখানে ঘোরাঘুরি করছিল। সেইসঙ্গে ছিল একটা মোটা মেয়েমানুষ। তার পেটটা বেশ বড়। এই সব মেয়েরা পুরনো আসবাবপত্র কেনাবেচা করে; সেই সঙ্গে লুকিয়ে মেয়েমানুষের সংবাদ দিয়ে যায়। পুরনো পোশাকের মত মেয়েমানুষ নিয়েও এরা দালালি করে।

ঘুরতে-ঘুরতে পঞ্চদশ লুই-এর আমলের একটা বেশ সুন্দর পোশাক কিনে নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। পুরনো আমলের সমস্ত রঙ-ই তার অটুট ছিল; এতটুকু কোথাও দাগ পড়েনি তার গায়ে। কিনে নিয়ে আসার সময় তার গা থেকে বেশ একটা মৃদু মিষ্টি আমেজি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে। বাড়িতে এসে ভাবলাম ওই সুন্দর জিনিসটাকে কোথায় রাখা যায়। ওই যুগের এমন একটি সুন্দর চেয়ার আমার চাই। তারপরে সেটা পাট করতে গিয়ে একটা খসখস শব্দ হল। সম্ভবতঃ, ওর ভেতরে একটা কাগজ রয়েছে। লাইনিং কেটে দিয়ে পোশাকটা ঝাড়তেই কয়েকটা চিঠি আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল। চিঠিগুলি এত পুরনো যে হলদে হ'য়ে গিয়েছে; অক্ষরগুলোও সব ঝাপসা-ঝাপসা। প্রাচীন পদ্ধতিতে চিঠিটা ভাঁজ করা। তাদের ওপরে বেশ সুন্দর ক'রে লেখা রয়েছে একটি নাম—মঁসিয়ে লা আবে দ্য আরজেনস্।" প্রথম তিনটি চিঠিতে কোথায় তাঁদের দেখা হবে সেই সব নিয়ে আলোচনা; কিন্তু চতুর্থটি অন্যরকম। সেইটিই আমি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"প্রিয় বন্ধু,—আমার শরীর মোটেই ভাল নেই; সত্যি কথা বলতে কি আমি অসুস্থ; বিছানা ছেড়ে ওঠার সামর্থ্য নেই আমার। বৃষ্টির ঝাট এসে আমার জানালার গায়ে পড়ছে; আমি সিডার তুলোর গদীর ওপরে আরাম ক'রে শুয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখছি। আমি একটা বই পড়ছি; বেশ ভালই লাগছে আমার। মনে হচ্ছে আমার জীবনের কাহিনী নিয়েই যেন কেউ বইটা লিখেছে। শুনবে কী সে কাহিনী? না থাক। শুনলে হয়ত রাগ হবে তোমার।

"পেছনে বালিশ দিয়ে ওরা আমার মাথাটাকে উঁচু করে দিয়েছে। তুমি আমাকে যে একটি সুন্দর ডেস্ক উপহার দিয়েছিলে তারই ওপরে কাগজ রেখে তোমাকে আমি এই চিঠি লিখছি।

"তিনি দিন ধরে একনাগাড়ে বিছানায় শুয়ে থাকার ফলে বিছানার কথাই কেবল ভাবছি দিনরাত; এমন কি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও আমি ওই বিছানার স্বপ্ন দেখি। সম্প্রতি আমি এই উপসংহারে এসেছি যে এই বিছানাই আমাদের সমস্ত জীবন অধিকার ক'রে বসে রয়েছে। আমরা এই বিছানাতেই জন্মগ্রহণ করি, বিছানাতেই জীবন কাটাই, আর এই বিছানার ওপরেই আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। আমার যদি লেখার ক্ষমতা থাকত তাহলে বিছানা নিয়ে এমন একখানা রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনা করতাম যা পড়ে সবাই অবাক হ'য়ে যেত। এই বিছানা থেকে মানুষ কত উপদেশই না সংগ্রহ করতে পারে!

"বন্ধু, আমার বিছানাটির সঙ্গে তোমার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে, কিন্তু এই তিনটি দিনে বিছানার মধ্যে এত জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি, আর তারই ফলে তাকে আমি এত ভালবেসে ফেলেছি যে তুমি তা কল্পনাও করতে পারনা। আমার বিশ্বাস এ বিছানার মধ্যে অনেক মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, জড়িয়ে রয়েছে অনেক মানুষের স্পর্শ আর অনুভূতি।

"সে বিছানার সঙ্গে কারও কোন স্মৃতি জড়িয়ে নেই, জড়িয়ে নেই কারও কোন স্নেহ—সেরকম নতুন বিছানা মানুষ কেমন ক'রে কেনে তা আমি বুঝতে পারিনা। আমাদের এই সব বিছানায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কত স্মৃতিই না জড়িয়ে থাকে। যখন থেকে খাট তৈরী হয়েছে সেই তিনশ' বছর আগে থেকে এই বিছানার প্রতিটি অঙ্গে যে কত মানুষের আশা, আকাঙ্খা, হাসি, কান্না জড়িয়ে রয়েছে তা কে বলবে।

একটি যুবতী এই বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

মাঝে-মাঝে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে; তারপরে গোঙাচ্ছে; কাঁদছে তারপরে। তার মা বসে রয়েছেন তার পাশে। তার ঠিক পরেই বিড়ালের মত মিউ মিউ শব্দ ক'রে একটি শিশু এসে উপস্থিত হ'ল। একটা খোকার জন্ম দিয়েছে মেয়েটি। ভীষণ যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও মায়ের আনন্দ আর ধরে না। সন্তানের প্রথম কান্না শুনেই আনন্দে তার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম করল, তারপরে ছেলেটিকে স্পর্শ করার জন্যে সে তার হাত দুটি বাড়িয়ে দিল। তার আশেপাশে যারা বসেছিল তাদের চোখেও তখন আনন্দের অশ্রু বইছে; কারণ, এই সন্তানটিও তাদের বংশকে বাঁচিয়ে রাখবে।

"তারপর জীবনের একটি মধুর আর পবিত্র সন্ধিক্ষণে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা সেই প্রথম এই বিছানায় নীড় বাঁধলো। সেই প্রথম মিলনের শিহরণে তারা কেঁপে কেঁপে উঠল; তারপরে ধীরে ধীরে তারা খুব কাছাকাছি এল; একজনের ঠোঁট দুটি স্পর্শ করল আর একজনের ঠোঁট দুটিকে। সেই একটি চুমুতেই তারা এক হ'য়ে গেল—যাকে বলে একাত্মা। তারপরে তাদের বিছানা উন্মাদনায় উত্তাল সমুদ্রে ঢেউ-এর মত কাঁপতে লাগল; কারণ, প্রেমের যে রহস্যময় ক্রিয়াকলাপ তা সম্পন্ন হ'ল এই বিছানার ওপরেই। প্রেমিক-প্রেমিকার এই অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনের চেয়ে বেশী মিষ্টি, বেশী সুন্দর এ পৃথিবীতে আর কিছু রয়েছে কি?

"তারপরে মনে করে দেখ মৃত্যুর কথা। সেই মানুষের কথা যারা এই বিছানায় শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছে। কারণ, এ জগতে প্রবেশ করার পথ যেমন এই বিছানা, তেমনি এই বিছানাই আমাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্খার সমাধি; আমাদের সবকিছুর পরিসমাপ্তি এইখানেই। কত কান্না, কত আর্তনাদ, দুঃখ আর হতাশা এই বিছানার ওপরে ঝরে-ঝরে পড়েছে। কত হাহাকার, চিরতরে হারিয়ে যাওয়া আনন্দকে ফিরে পাওয়ার জন্যে কত আবেদন যে এই বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছে সেকথা কে বলবে!

"বিছানাই যে আমাদের জীবনের প্রতীক সেকথা তোমার নিশ্চয় স্মরণ রয়েছে। এই শেষ তিনদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি এটাই আবিষ্কার করেছি। বিছানা ছাড়া ভাল জিনিস এ দুনিয়ায় আর কিছু নেই। আমাদের জীবনের অনেক সুন্দর আর মধুর মুহূর্তগুলি কি এই বিছানাতেই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আমাদের কাটে না?

"তারপরে দুঃখ-যন্ত্রণার কথাও ধর। বিছানায় শুয়ে-শুয়েও আমরা কম যন্ত্রণা ভোগ করিনা। যারা অসুস্থ, যারা যন্ত্রণাকাতর—এই বিছানাই তাদের শেষ আশ্রয়। দুঃস্থ, বিপর্যস্ত দেহের শেষ আশ্রয়স্থল।

"বিছানাই তো একটি পরিপূর্ণ মানুষ। প্রভু যীশুর কোন বিছানার প্রয়োজন হয় নি। এই থেকেই প্রমাণ হয় তিনি ছিলেন মহাপুরুষ। তিনি জন্মেছিলেন খড়ের ওপরে, মারা গিয়েছিলেন ক্রুশের ওপরে। আমাদের মত দরিদ্র দুর্বল মানুষদের জন্যে তিনি রেখে গিয়েছিলেন বিছানা।

"বিছানা নিয়ে অনেক চিন্তাই আমার মাথায় এসেছে। কিন্তু সে সমস্ত কথা তোমাকে লেখার মত সময় আমার নেই; তাছাড়া, সে-সব চিন্তাও বেশ পরিষ্কার নয় আমার কাছে। তাছাড়া, আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; এখন আমি বালিশটা একটু ঝেড়ে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে চাই একটু। কিন্তু আগামীকাল বেলা তিনটে নাগাদ আমাকে দেখতে আসতে যেন ভুলে যেয়ো না। কাল হয়ত আমি একটু ভাল থাকব, আর তা তোমার কাছে প্রমাণ করতেও পারব।

"হে বন্ধু বিদায়। তোমার চুম্বনের জন্যে হাত দুটি আমার বাড়িয়ে দিলাম, সেই সঙ্গে আমার ওষ্ঠাধরও।"

জাগরণ

The awakening

তিন বছর হল তার বিয়ে হয়েছে। এই ক'টি বছর ভাল-দ্য-সিরি ছেড়ে সে অন্য কোথাও যায়নি। এইখানেই তার স্বামীর দুটি তুলোর মিল রয়েছে। বেশ শান্তভাবেই তার জীবনটা গাছের অরণ্য ঘেরা দেহাতি মানুষেরা যাকে প্রাসাদ বলত সেই বাড়িতে কেটে যাচ্ছিল। ছেলেপিলে না হলেও, বেশ আনন্দেই ছিল সে। তার চেয়ে তার স্বামী মঁসিয়ে ভাসুরের বয়স অনেকটা বেশী; কিন্তু তিনি বেশ দয়ালু ছিলেন। সে-ও তার স্বামীকে বেশ ভালবাসত; কোন দিন অসৎ চিন্তা তার মনে দেখা দেয়নি।

প্রতিটি গ্রীষ্মকালেই অবশ্য তার মা আসতেন বাড়িতে; তারপরে শীতকালে পাতা ঝরতে শুরু করলে তিনি আবার প্যারিসে ফিরে যেতেন। শরৎকাল থেকে শুরু করে পাঁচটি মাস এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ঘন কুয়াশায় ঢেকে দিত। সেই পাতলা কুয়াশায় ঢাকা নিচু মাঠগুলিকে দেখে জলাভূমি বলে মনে হোত। তারই ওপর থেকে দেখা যেত বাড়ির ছাদ। তারপরে ঢেউ খেলানো সাদা-সাদা ধোঁয়া এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অঞ্চলটিকে ঢেকে দিত। গোটা অঞ্চলটিকে একটি ভূতুড়ে রাজ্য বলে ভ্রম হোত। দশ গজ দূর থেকেও কাউকে চেনা যেত না। তাই ভেতর থেকে

গাছপালাগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতো। তাদের ডালপালা থেকে পিটপিট করে কুয়াশার ফোঁটা ঝরে পড়ত। এই ক'টি মাসই জেনি খুক-খুক করে কাশতো।

সেবার অক্টোবর মাসে ডাক্তাররা শীতকালটা প্যারিসে কাটিয়ে আসতে জেনীকে পরামর্শ দিলেন; কারণ, ওখানকার জলবায়ুটা তার দুর্বল বুকের ওপরে বেশ চাপ সৃষ্টি করেছিল। জেনী প্যারিসেই গেল, কিন্তু মাসখানেক সে তার বাড়ি আর শান্ত পরিবেশটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারল না। কিন্তু ধীরে ধীরে সে তার নতুন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। প্যারিসের আমোদ-প্রমোদ, সান্ধ্য মজলিস, আর ডিনার পার্টিতে সে বেশ মিশে গেল।

তখনও পর্যন্ত তার ছেলেমানুষী যায়নি। কী করবে না করবে কিছুই সে ঠিক করতে পারত না। চলা ফেরায় কেমন যেন জবুথবুর মত হয়ে পড়েছিল সে, ক্লান্তভাবে হেঁটে বেড়াত; গায়ে যেন কোন শক্তি তার ছিল না। কিন্তু সে প্রায় জীবন্ত হয়ে উঠল; আনন্দের আসরে যোগ দিয়ে রীতিমত আনন্দও সে পেতে লাগল। পুরুষেরা তাকে খুশি করার চেষ্টা করল। তাদের কথাবার্তা শুনে তারও বেশ মজা লাগতে লাগল; সে তাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে কিছু ঠাট্টা-তামাসাও করল; তাদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি তার যে রয়েছে সেদিক থেকে সে নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, বিয়ের পরে ভালবাসা বলতে সে যা বুঝেছে এদের ভালবাসার সঙ্গে সেই ভালবাসার পার্থক্য অনেক, তাই সে এদের ভালবাসার অভিনয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যথেষ্ট। এই সব দাড়িওয়ালা পুরুষদের অপরিচ্ছন্ন আদরের কাছে নিজের দেহটা সমর্পণের কথা ভাবতে গেলেই তার করুণার একটা হাসি আসত; আর তার শিরায়-শিরায় সৃষ্টি করত একটা চঞ্চল বিতৃষ্ণা। বাড়িতে আইনসঙ্গত স্বামী থাকা সত্ত্বেও কেমন করে মহিলারা যে পরিচিতদের দেহদান ক'রে গর্হিত কাজ করতে পারে সেটা বার-বার সে নিজের মনেই চিন্তা করত। স্বামীর সঙ্গে সে যদি বন্ধুর মত ঘুরে বেড়াতে পারত তাহলে স্বামীকে সে আরও ভালবাসত; আর অনেক বেশী পবিত্র চুম্বনে তাকে আদর করত; কারণ, সেই আদরগুলি হচ্ছে আত্মার আসল আত্মীয়। কিন্তু তাকে পাওয়ার জন্যে পুরুষদের চোখে যে কামনাবহ্নি ধক ধক ক'রে উঠত, সেই কামনাকে প্রশ্রয় না দিলেও, তার ভালই লাগত। পার্টিতে ভাল ডিনারের পরে ড্রয়িংরুমে ফেরার পথে হঠাৎ একলা পেয়ে তারা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে যে প্রেমের বাণী আওড়াত তার অর্থ সে ভালই বুঝতে পারত, এবং তার রক্তও তাতে ঠাণ্ডা হয়ে যেত; কিন্তু তবু তার নারী-হৃদয় পুরুষদের এই প্রশংসায় খুশির আনন্দে কেঁপে-কেঁপে উঠত। এটা তার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তারা যখন হঠাৎ তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ত, আর চাকরবাকরদের পায়ের শব্দে বিভ্রান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ত, সে তাদের সমস্ত প্রার্থনা আর আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করত সত্যি কথা তবু তার মনটা আনন্দে নেচে-নেচে উঠত।

মাঝে-মাঝে সে কর্কশভাবে হাসত। সেই হাসি দেখে উন্মাদ প্রেমিকের উচ্ছ্বাসও ফুটো বেলুনের মত চুপসে যেত। মাঝে-মাঝে সে বেশ রূঢ় কথাও বলত। সেই কথা তাদের প্রেমবহ্নিতে একঘড়া ঠাণ্ডা বরফজল ঢেলে দিত। তার স্বর শুনে তার সবচেয়ে বড় প্রেমিকেরও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে যেত। তবু তার সেই অজস্র গুণমুগ্ধদের মধ্যে দু'জন ছিল যাদের কিছুতেই দূরে সরানো গেল না। এই দু'জনের মধ্যে কিন্তু কোনরকম মিল নেই। তাদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে পল পেরোনেল; লম্বা চওড়া চেহারা, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ; সাহসী; কোনকিছুতেই হার স্বীকার করতে সে রাজি নয়। প্রেমের ব্যাপারে সে সফল পুরুষ. সে জানত অপেক্ষা করতে; তারপরে একদিন যখন সুযোগ আসত সেই সুযোগের সে অপব্যবহার করত না।

আর একজনের নাম হচ্ছে মঁসিয়ে দ্য আভাঁসেল। তার সঙ্গে দেখা হলেই ভাবাবেগে সে কাঁপতে শুরু করত। সে যে তাকে ভালবাসত সেই কথাটা সে মুখ ফুটে বলতেও পারত না; কিন্তু সব সময় জেনীর পিছু পিছু ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। জেনী তার প্রথম প্রেমিকের নাম দিয়েছিল "ক্যাপ্টেন ফ্যাকাসে," আর দ্বিতীয়টিকে ডাকত "অনুগত ম্যাড়া" বলে। শেষকালে দ্বিতীয়টিকে সে ব্যক্তিগত ভৃত্যে পরিণত করেছিল।

কেউ যদি তাকে বলত তোমার অনুগতটিকে তোমার ভালাবাসা উচিৎ তাহলে তার বেশ আমোদ লাগত; কিন্তু তবু জেনী তাকে ভালই বাসত; তবে সেই ভালবাসাটি ছিল অদ্ভুত ধরনের; অনুগতটি খুব বেশী তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত বলে অনুগতটির চলন-বলন, হাসি-ঠাট্টা, বেশ-ভূষা সবই প্রায় তার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে স্বপ্নেও তার মুখটা জেনীর কাছে ভেসে উঠত; মনে হোত, সে যেন তাকে চোখের সামনে দেখছে।—সেইরকম ভদ্র, রুচিশীল—তার প্রেমে উন্মাদ। মনে হোত, সে তার ডাক শুনছে; সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে যেত। তারপরে একদিন সন্ধ্যায় ছোট একটি বনের মধ্যে সে আর তার প্রণয়ীটি পাশাপাশি ঘাসের ওপরে বসল; অনুগতটি প্রেমের অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা তাকে শোনাল. তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে চুমু খেল সেই হাতে। তার উষ্ণ ত্বকের স্পর্শ পেল জেনী, তার নিঃশ্বাস তার গায়ে এসে লাগল; এবং জেনী সহজভাবে তার মাথার ওপরে হাত বুলোতে লাগল।

বাস্তব জগৎ থেকে স্বপ্নের জগৎ আমাদের কত দূরে। তারপরে জেনী একদিন স্বপ্ন দেখল—সে তার প্রেমিককে খুব ভালবাসে; একটা গভীর প্রেমে সে অবগাহন করে রয়েছে। প্রেমিককে হাতে করে ধরে সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে তার প্রেমিককে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল; চুমু খেল তার চোখে, গালে। সে ছাড়িয়ে নিল না নিজেকে। তারপরে একজনের ওষ্ঠাধর আর একজনের ওষ্ঠাধরের ওপরে চেপে বসল; জেনী সমর্পণ ক'রে দিল নিজেকে। এই মুহূর্তটি ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ; অতিমানবিক আনন্দের উচ্ছ্বাসে উদ্দাম—দৈহিক এ আনন্দকে কিছুতেই না বলে জেনী ফিরিয়ে দিতে পারল না। এইরকম পরিপূর্ণ আনন্দ কি বাস্তব জীবনে পাওয়া যায়? শরীরে রোমাঞ্চ নিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল জেনীর। প্রিয় মিলনের আশায় তার

মনটা এতই ব্যাকুল হয়ে উঠল যে সেদিন আর সে ঘুমোতে পারল না। মনে হল, সে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

পরের দিন তার সঙ্গে দেখা হল জেনীর। স্বপ্নের কথা স্মরণ করে লজ্জায় সে লাল হয়ে গেল। অনুগতটি তার এই বিকলন লক্ষ্য করল। সে চুমু খেতে পারে এই আশংকা থাকা সত্ত্বেও জেনী স্বপ্নদর্শনের কথাটা তাকে না ব'লে পারল না; সেই সঙ্গে এই অনুরোধও সে তাকে করল যেন সে তাকে সম্মান করে। অনুগতটি তার সম্মান রক্ষা করেছিল। তারপরে তারা অনেকক্ষণ ধরে একা একা ঘুরে বেড়াত; সেই সময় আত্মায় আত্মায় তাদের মিলন হোত। তারপর তারা যখন যে যার ঘরে ফিরে যেত তখন দু'জনেরই কেমন যেন দুর্বল দুর্বল লাগত।

মাঝে মাঝে তারা চুমু খেত; একটি পবিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে তারা সেই আনন্দ উপভোগ করত। এরই মাঝখানে জেনী বেশ বুঝতে পারল অনুগতটিকে আর বোধ হয় রাখা যাবে না। তখন সে তার স্বামীকে লিখল এবার সে তার শান্ত গৃহকোণে ফিরে যাবে। কিন্তু স্বামীর চিঠিতে বুঝলো সেখানে প্রচণ্ড শীত চলেছে। এ সময় স্বাস্থ্যের খাতিরেই তার বাড়ি যাওয়া উচিৎ হবে না। ভীষণ ক্ষেপে উঠল জেনী। আচ্ছা মানুষ! তার মনের ভেতরে যে সংঘর্ষ চলেছে তার সে কিছুই অনুমান করতে পারছে না, বুঝতে পারছে না কিছুই।

উষ্ণ ফ্রেব্রুয়ারী মাস এল প্যারিসে। অধুনা যদিও সে মঁসিয়ে আভাঁসেলের সান্নিধ্য কিছুটা এড়িয়েই চলছিল তবু একদিন সন্ধ্যায় লেকের ধারে বেড়ানোর সময় সে জেনীকে আমন্ত্রণ জানাল। জেনী সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ীতে চড়ে তারা দু'জন বেড়াতে গেল। তাদের গাড়ীটা ধীরে ধীরে বনের দিকে এগিয়ে চলল। খুব পাশাপাশি তারা বসে রয়েছে। দু'জনেই দু'জনের হাত দুটি ধরে রয়েছে। জেনী ভাবল—এইবার আমার শেষ। কারণ স্বপ্নে তার শিরায় শিরায় যে উত্তেজনার ঢল নেমেছিল প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করার সেই কামনা তাকেও ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। প্রতিটি মুহূর্তেই তাদের ঠোঁটগুলি মিশছিল, ছাড়ছিল—আবার মিশছিল। মঁসিয়ে তাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে যেতে সাহস করল না; দরজার সামনে রেখে ভেতরে ঢুকে গেল। ছোট ড্রয়িংরুমে মঁসিয়ে পল তার জন্য অপেক্ষা করছিল। জেনীর সঙ্গে করমর্দন করেই সে বুঝতে পারল জেনীর হাতটা কাঁপছে। মঁসিয়ে পল মৃদুস্বরে তাকে প্রেম নিবেদন করতে লাগল।

কোন উত্তর না দিয়েই জেনী তার কথা শুনছিল। কারণ, সে তখন অপর প্রেমিকটির কথা ভাবছিল—গভীর আগ্রহে, একেবারে তন্ময় হয়েই ভাবছিল। একটা চীৎকার করে তার তন্ময়তা কেটে গেল। দেখল পল তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। সে যখন তার খোলা চুলের ওপরে চুমু খেতে লাগল তখন জেনী চীৎকার করে উঠল—"চলে যান, চলে যান।...আপনাকে আমি ঘৃণা করি।" অবাক হয়ে পল দাঁড়িয়ে উঠল; তারপরে টুপীটা নিয়ে চলে গেল।

পরের দিনই সে ভাল-দ্য-সিরিতে ফিরে গেল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে তার স্বামীকে বলল—তোমাকে ছেড়ে বেশী দিন আমি থাকতে পারি না।

ভদ্রলোক দেখলেন জেনীর চরিত্রে বেশ একটা পরিবর্তন হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কী বলত? মনে হচ্ছে তুমি সুখী নও! কী চাও তুমি?

জেনী বলল—কিছুই না। এ পৃথিবীতে সুখ শুধু আমাদের স্বপ্নেই।

পরের গ্রীষ্মে আভাঁসেলে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। জেনী তাকে অত্যন্ত সহজভাবে অভ্যর্থনা জানাল। কারণ জেনী বুঝতে পেরেছিল সে তাকে কোনদিনই ভালবাসেনি। ভালবাসার যে স্বপ্নে সে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সেই স্বপ্ন থেকে পল তাকে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জাগিয়ে দিয়েছে।

যুবকটি তখনও জেনীকে ভালবাসত; প্যারিসে ফিরে গিয়ে সে ভাবল—মহিলাটি সত্যিই বড় অদ্ভুত, জটিল আর দুর্বোধ্য।

সিঁদেল চোর

The burglar

"আমি তোমাকে বলছি; কিন্তু তুমি তা বিশ্বাস করবে না।"

"তবু বল।"

"বেশ, শোন। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা আমি বলতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও, আমার কাহিনীটা সত্যি। একমাত্র আর্টিস্টরাই এই কাহিনী শুনে অবাক হবে না। উত্তেজিত অবস্থায় ইয়ার্কি শুরু করলে চরম বিপর্যয়ের মুখেও যে ইয়ার্কি করা বন্ধ করা যায় না সেকথা তারা জানে।" বৃদ্ধ আর্টিস্ট চেয়ারের ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। বারবিজোনে একটা হোটেলের ডাইনিঙ রুমে আমরা তখন বসেছিলাম।

"দরিদ্র সোরিইউলের বাড়িতে আমরা সেদিন ডিনার খেয়েছিলাম। বেচারা মারা গিয়েছে। আমাদের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে খারাপ। সম্ভবত সেদিন আমরা তিনজন ছিলাম—সোরিইউল, আমি, আর পয়তেভিঁ। তবে সেকথা আমি ঠিক মনে করতে পারছিনা। অবশ্য পয়তেভিঁ বলতে আমি ম্যারাইন পেণ্টার ইউজিন লে পয়তেভিঁর কথাই বলছি। সেও আজ মৃত।

"সোরিইউলের বাসায় ডিনার খেয়েছিলাম—একথার অর্থই হচ্ছে আমরা তখন মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের ভেতরে একমাত্র লে পয়তেভিঁর মাথাটা তখনও টলটলায়মান হয়নি। এটা আমাদের যৌবনের কাহিনী। স্টুডিও ঘরের পাশের ঘরে মেঝের ওপরে আমরা লম্বা হয়ে শুয়ে আবোল-তাবোল বকছিলাম। চেয়ারের ওপরে

পা তুলে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে মুখ করে শুয়েছিল সোরিইউল। শুয়ে শুয়ে সে যুদ্ধের আর যুদ্ধ পোশাকের গল্প করছিল। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে বিরাট ওয়াড্রোবটা খুলে ফেলল। সেইখানেই সে তার যন্ত্রপাতি আর পোশাক রাখত। সেই পোশাক সে পরল। তারপরে সে ব্রিটিশ সেনানীর একটা পোশাক বার করে পয়েতেভিঁকে পরতে বলল। কিন্তু সে রাজি না হওয়ায় আমরা দু'জনে তাকে জাপটে ধরে উলঙ্গ করে সেই পোশাক পরিয়ে দিলাম। সেই আলখাল্লায় সে একেবারে ঢাকা পড়ে গেল। নিজেকে সাজালাম অশ্বারোহী সেনানীর বেশে। সাজগোজ হলে সোরিইউল আমাদের দিয়ে কিছুক্ষণ জটিল মিলিটারী প্যারেড করালো। প্যারেড শেষ হলে সে চীৎকার ক'রে বলল—আমরা এখন সৈন্যবাহিনী। সুতরাং এস আমরা সবাই সেনাবাহিনীর মতই মদ্যপান করি।

তথাস্তু। এক গামলা মদ নিয়ে পাঞ্চ ক'রে আমরা সবাই গলায় ঢাললাম; তারপরে এক গামলা 'রাম' উদরস্থ করলাম। মদ খাওয়ার পর্ব শেষ ক'রে সত্যিকার সেনাবাহিনীর জোয়ানদের মত গলা ছেড়ে গান শুরু করে দিলাম। অতটা মদ গলায় ঢালার পরেও লে পয়তেভিঁর মাথাটা কিছুটা প্রকৃতিস্থ ছিল। সে হঠাৎ একটা হাত তুলে বলল—চু-প! নিশ্চয় কেউ স্টুডিওর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ। নিশ্চয়।

সোরিইউল টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠে বলল —'চোর!' তারপরেই সে নির্দেশ দিল—কমরেডস, অস্ত্র নিয়ে তৈরী হও।

নির্দেশ পেয়েই দেওয়ালের গা থেকে যে যার মর্যাদা অনুযায়ী অস্ত্র খুলে নিলাম। আমি নিলাম একটা মাসকেট আর একখানা তরোয়াল। পয়তেভিঁর হাতে গুঁজে দেওয়া হল ব্যায়োনেট শুদ্ধ একটা বিরাট বন্দুক। ঠিক কোন্ অস্ত্রটা চাই বুঝতে না পেরে সোরিইউল একটা পিস্তল তুলে নিয়ে তার বেল্টের ভেতরে গুঁজে রাখলো। তারপরে এক হাতে একটা কুড়োল নিয়ে স্টুডিওর দরজাটা খুব সাবধানে গিয়ে খুলল। সেই সন্দিগ্ধ রাজত্বে সৈন্যবাহিনীটি সন্তর্পণে প্রবেশ করল। বড় বড় ক্যানভাস, আসবাবপত্র, আর অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসে বিকীর্ণ বিরাট ঘরটির মাঝখানে ঢুকে আসার পরে সোরিইউল বলল—নিজেকেই আমি সেনাপতির পদে বরণ করলাম। এস আমরা যুদ্ধকালীন মন্ত্রণাসভায় বসি। হে অশ্বারোহী সেনানী, শত্রুর পথরোধ করবে তুমি। অর্থাৎ দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। আর তুমি পদাতিক সেনানী, তুমি আমার সঙ্গে এস।

সেনাপতির নির্দেশমত কাজ ক'রে আমি মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলাম। মূল বাহিনীর কাছে পৌঁছনো মাত্র আমি একটা ভীষণ শব্দ শুনলাম। একটা জ্বলন্ত বাতি নিয়ে ব্যাপারটা কী জানার জন্যে আমি দৌড়ে গেলাম। দেখলাম পয়তেভিঁ তার ব্যায়োনেট দিয়ে একটা ডামীকে এফোঁড় ওফোঁর করছে আর আমাদের সেনাপতি তার কুড়োল দিয়ে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। ভুলটা ধরা পড়ার পরে সেনাপতি নির্দেশ দিলেন—সাবধান! তারপরে আবার আমাদের অভিযান শুরু হল।

কুড়িটি মিনিট ধরে স্টুডিও ঘরের চারপাশ আমরা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম। তারপরে পয়তেভিঁ কুলুঙ্গীর দিকে এগিয়ে গেল। কুলুঙ্গীটা বেশ গভীর আর অন্ধকার থাকার

ফলে একটা বাতি নিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েই হতভম্ব হয়ে আমি পিছিয়ে এলাম। একটা সত্যিকার জীবন্ত মানুষ তার ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যাই হোক, তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গীর কপাটটা বন্ধ করে দিলাম আমি। তারপরে কয়েক পা পিছিয়ে এসে আমরা আবার মন্ত্রণাসভায় বসলাম।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বিষয়ে আমরা একমত হ'তে পারলাম না। সোরিইউল বলল—ধোঁয়া দিয়ে চোরটাকে তাড়িয়ে দাও। পয়তেভিঁ বলল—অনাহারে চোরটাকে শুকনো ক'রে মেরে দাও। আমার প্রস্তাবটা হল ডিনামাইট ফাটিয়ে লোকটাকে উড়িয়ে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত পয়তেভিঁর মতটাই মেনে নেওয়া হল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরে আবার আমরা মদ্যপানের ব্যবস্থা করলাম। পয়তেভিঁ তার সেই বিরাট বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে পাহারা দিতে লাগল; আমরা কুলুঙ্গীর সামনে বসে নিবিষ্ট মনে বন্দীর স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে মদের জালা শেষ করতে লাগলাম। কয়েক জালা মদ শেষ করার পরে পয়তেভিঁ প্রস্তাব দিল—বন্দীকে বার ক'রে এনে তার চেহারাটা একবার নিরীক্ষণ করা যাক।

উত্তম প্রস্তাব। 'হুররে' বলে চীৎকার ক'রে উঠলাম আমি। তারপরে অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে নিয়ে বিপুল আনন্দে চীৎকার করতে করতে আমরা কুলুঙ্গীর দিকে ছুটলাম। কুলুঙ্গীর দরজাটা খোলা হল। সোরিইউল তার পিস্তলটা [পিস্তলের ভেতরে কোন টোটা ছিল না] নিয়ে সকলের আগে আগে বীরদর্পে এগিয়ে গেল। উন্মত্তের মত চীৎকার ক'রে আমরা দু'জন তার পিছু পিছু ছুটলাম। তারপরে তিনজনে মিলে বন্দীকে আমরা বার করে নিয়ে এলাম। বিশ্রী চেহারার, সাদা চুলো-বুড়ো ডাকাত; ছেঁড়া নোংরা পোশাক-পরা। তার হাত-পা বেঁধে আমরা তাকে আর্ম চেয়ারের ওপরে শুইয়ে দিলাম। সে কোন কথা বলল না।

সোরিইউলের মগজে তখন বেশ নেশা ধরে গিয়েছে। সে বলল—আমরা এই হতভাগাটার বিচার করব। আমারও মনে হল, প্রস্তাবটা ঠিকই। ঠিক হল পয়তেভিঁ বন্দীর পক্ষে আর আমি বিপক্ষে সওয়াল করব। বন্দীর নিজের উকিল ছাড়া সর্ববাদীসম্মতভাবে বন্দী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল।

সোরিইউল বলল—আমরা ওকে ফাঁসি দেব। তবে অনুশোচনা না ক'রে ও মরতে পারে না। তারপরে একটু ইতস্তত ক'রে সে বলল—ঠিক আছে। একটা পাদরীকে ডেকে পাঠানো যাক।

অনেক রাত্রি হওয়ায় এই প্রস্তাবে আমি আপত্তি জানালাম। এই কথা শুনে সে আমাকেই পাদরীর কাজ করতে বলল। সেই সঙ্গে বন্দীকে বলল তার পাপ স্বীকার করতে। গত পাঁচ মিনিট ধরে বন্দীটি চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে আমাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছিল। আমাদের হাবভাব দেখে সেও বেশ শঙ্কিত চিত্তেই ভাবছিল আমরা কোন্ দেশী হতচ্ছাড়া। এইবার হেঁড়ে গলায় সে জিজ্ঞাসা করল—সত্যি-সত্যিই তোমরা এ কাজ করতে চাও না? তাই না?

সোরিইউল জোর ক'রে তাকে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিয়ে বলল—চোপ্। তোমার শেষ সময় উপস্থিত। নিজের পাপ স্বীকার কর। তারপরে তার ব্যাপটিজম্ হয়নি এই ভয়ে সে তার মাথায় এক গ্লাস 'রাম' ঢেলে দিল।

ভয় পেয়ে সেই বুড়ো শয়তানটা চীৎকার করে উঠল—'বাঁচাও, বাঁচাও', তার চেঁচানিতে পাছে পাশের বাড়ির লোকেরা জেগে ওঠে এই ভয়ে আমরা তার মুখটা চেপে ধরলাম।

তারপরে সে মেঝের ওপরে হাত-পা ছুঁড়ে, টেবিল চেয়ার ফেলে দিয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল ; ক্যানভাসের ছবিগুলিকে ভেঙে প্রায় গুঁড়িয়ে দিল। অবশেষে সোরিইউল বিরক্ত হ'য়ে ক্ষেপে উঠে বলল—একে শেষ করে ফেলি। এই বলে সে তার পিস্তলের ঘোড়াটা টিপে দিল। একটা তীক্ষ্ণ ক্লিক শব্দ ক'রে পিস্তলের চাবিটা পড়ে গেল। তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে বন্দীর দিকে লক্ষ্য ক'রে আমিও আমার বন্দুক ছুঁড়লাম। অবাক হ'য়ে দেখলাম মাত্র একটু আগুন বেরিয়ে চুপ করে গেল। তারপরে পয়তেভিঁ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল—এই মানুষটিকে হত্যা করার কোন অধিকার কি আমাদের রয়েছে?

সোরিইউল অবাক হ'য়ে বলল—কেন? আমরা তো ওকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছি।

তা বটে! কিন্তু বেসামরিক লোকদের গুলি ক'রে মারার অধিকার আমাদের নেই। চল, আমরা ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আসি। তারাই ওকে জল্লাদের হাতে তুলে দেবে।

প্রস্তাবে রাজি হলাম আমরা। বুড়োটার হাঁটবার কোন শক্তি ছিল না বলে আমরা একটা তক্তার সঙ্গে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলাম। আমি আর পয়তেভিঁ তাকে কাঁধে করে নিয়ে চললাম। সোরিইউল অস্ত্র নিয়ে সতর্ক হ'য়ে চলল আমাদের পিছনে। থানার মুখে পুলিশ আমাদের আটকে দিল। পুলিশের বড় কর্তা আমাদের চিনতেন। আমরা যে কী ধরনের ঠাট্টা তামাশায় অভ্যস্ত তাও তাঁর অজানা ছিল না। তাই তিনি আমাদের বন্দীকে গ্রহণ করলেন না ; হেসে আমাদের ফিরিয়ে দিলেন। সোরিইউল জিদ ধরাতে তিনি আমাদের বেশ রূঢ়ভাবেই বললেন—বাড়ি ফিরে যাও। গোলমাল করো না। সুতরাং সৈন্যবাহিনী মার্চ করতে-করতে আবার স্টুডিওতে ফিরে এল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এবার?

পয়তেভিঁ সহানুভূতির স্বরে বলল—হতভাগাটা নিশ্চয় বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

লোকটার ওপরে আমারও কেমন যেন দয়া হ'ল [মদের সৌজন্যেই অবশ্য] ; আমি তার মুখের বাঁধন খুলে দিলাম ; জিজ্ঞাসা করলাম—বুড়ো, তুমি কেমন আছ?

বুড়ো আর্তনাদ করে বলল—আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে বাপু!

পিতৃস্নেহ উথলে উঠল সোরিইউলের। সে তার হাত আর পায়ের দড়িদড়া খুলে দিয়ে তাকে একটা চেয়ারের ওপরে বসিয়ে দিল,, এবং অনেক দিনের হারানো বন্ধুর মত তার সঙ্গে ব্যবহার করতে শুরু করল। আমরা আবার মদ নিয়ে বসলাম। বুড়োটা আর্ম চেয়ারে বসে আমাদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। পাঞ্চ তৈরী হওয়ার

পরে বন্দীকে আমরা এক গ্লাস মদ এগিয়ে দিলাম ; বেশ খুশি হ'য়েই আমরা তার মাথাটাও উঁচিয়ে ধরতে পারতাম। টোস্টের পর টোস্ট চলতে লাগল। দেখলাম আমরা তিনজনে মিলে যতটা মদ খেলাম বুড়োটা একাই তার চেয়ে অনেক বেশী মদ উড়িয়ে দিল। দিনের আলো ফুটে বেরোনোর সঙ্গে-সঙ্গে বুড়োটা শান্তভাবে উঠে বলল—ধন্যবাদ। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে।

আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও থাকতে সে রাজি হ'ল না। সুতরাং করমর্দন ক'রে আমরা তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। বাতি জ্বালিয়ে সোরিইউল দরজার কাছ পর্যন্ত এসে বলল—বাইরে চৌকাঠটা ভাল ক'রে দেখে যেয়ো। হোঁচট খেয়ো না যেন।

তার গল্প শুনে সবাই হোহো ক'রে হাসতে লাগল। গল্প শেষ ক'রে সে উঠে দাঁড়াল ; তারপরে পাইপটা ধরিয়ে আমাদের সামনে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলল—এই কাহিনীর সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল।

ঘোড়ার পিঠে

On horse back

স্বামীর মাইনের ওপরে নির্ভর করেই সংসার চলত। দুটি সন্তান ছিল তাদের। একদিন সমাজে তারা অবস্থাপন্নই ছিল ; কিন্তু তারপরে অবস্থা পড়ে যায় ; তবু বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখতে হোত তাদের। ফলে আর্থিক অবস্থা তাদের আরো সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছিল।

হেক্টর দি গ্রিবেলিঁ বাবার সংসারে গ্রামেই মানুষ হয়েছিল। বৃদ্ধ অ্যাবের কাছেই সে লেখাপড়া শিখেছিল। ধনী ছিল না তারা। কোনরকমে দারিদ্র্যকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। বছর কুড়ি বয়সে সে নৌ-মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতে গেল। চাকরিটা কেরাণীর—মাইনে ছিল পনের শ' ফ্রাঁ। জীবনে কঠোর পরিশ্রমের জন্যে যারা প্রস্তুত থাকে তাদেরই মত হেক্টর চাকরির জীবনে দিশেহারা হয়ে পড়ল। যারা জীবনে অসুবিধার সঙ্গে মোকাবিলা করার শিক্ষা পায়নি, শৈশব থেকে যাদের মন অপরিপুষ্ট, যারা জীবন সংগ্রামে অপটু, হেক্টর ছিল তাদেরই একজন। চাকরি জীবনের প্রথম তিনটি বছর তার কাছে ছিল ভয়ঙ্কর।

কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তাদেরই স্বগোত্র প্রাচীন কিছু লোকের সঙ্গে সে আলাপ করল, তারই মত দরিদ্র তারা। ফবার্জ সেনত-জাঁর্মের কিছু বিশেষ রাস্তায় বাস করত তারা, রাস্তাটাও তেমনি নিরানন্দ। আধুনিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে তাদের কোন পরিচয়-পত্র ছিল না। দরিদ্র, অথচ দম্ভ ছিল তাদের বেশ। পুরনো বাড়িতে এইসব

হৃতভাগ্য অভিজাতরা বাস করত—একতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত; কিন্তু কোন তলাতেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। চিরন্তন কুসংস্কার, পুরনো লুপ্তপ্রায় বনেদীআনার দম্ভ, আর অর্থ রোজগারের জন্যে প্রচেষ্টার অভাব, পুরুষদের কর্মহীনতা, সব মিলিয়ে তাদের দুরবস্থার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। এই রকম এক দরিদ্র সংসারেই হেক্টর বিয়ে করল। চারটি বছরে দু'টি সন্তান হ্ল তাদের। দারিদ্র্যের বোঝা ঘাড়ে চাপায় তারা কোনরকম আমোদ করতে পারত না। রবিবার দিন মাঝে-মাঝে কাছাকাছি একটু তারা বেড়িয়ে আসত; আর প্রতিটি শীতের সময় বন্ধুর দেওয়া ফ্রি পাশ নিয়ে দু'একবার তারা থিয়েটার দেখতে যেত।

কিন্তু বসন্ত আসার সময় তার মনিব তাকে দিয়ে অফিসের কিছু বাড়তি কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। সেই কাজের জন্যে হেক্টর তিনশ' ফ্রাঁ বাড়তি রোজগার করেছিল সেবার। সেদিন রাত্রিতে বাড়ি ফিরে সে তার স্ত্রীকে বলল—প্রিয় হেনরিয়েটা, এই টাকাটা নিয়ে আমাদের কিছু একটা করা উচিৎ। ছেলেদের নিয়ে বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি চল না?

অনেক আলোচনার পরে ঠিক হ্ল সবাই মিলে তারা বনভোজনে যাবে।

হেক্টর বলল—বাইরে যাওয়ার অভ্যাস আমাদের খুব কম রয়েছে। তাই যোগাড়যন্ত্র আমাদের বেশ ভালভাবেই করতে হবে। তুমি আর বাচ্চারা যাবে গাড়ীতে করে; আমি যাব ঘোড়ার পিঠে। আমার দিক থেকে সেটা ভালই হবে।

সারা সপ্তাহটা কেবল ওই নিয়েই আলোচনা হ্ল। যাকে বলে একরকম সরগরম আলোচনা। সবাই উত্তেজনায় একেবারে ভেঙে পড়ল। গাড়ীর পাশে পাশে হেক্টর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে এ দৃশ্য একেবারে অভূতপূর্ব। হেক্টর বুক ফুলিয়ে বলল ঘোড়ায় চড়তে সে বেশ ভাল করেই শিখেছে। একবার ঘোড়ার পিঠে চড়লে আর তাকে ধরে রাখা যাবে না।

হাতের চেটো ঘষতে-ঘষতে সে তার স্ত্রীকে বলল—আমার সবচেয়ে ভাল তেজী ঘোড়া। আমি কেমন করে ঘোড়ায় চেপে যাই তা তুমি এবার দেখবে। তোমার ইচ্ছে হ'লে চ্যাম্পস-ইলিসির পাশ দিয়েও আমরা ফিরতে পারি। খুব ভালই হবে। ফেরার পথে আমারই অফিসের কারও সঙ্গে দেখাও হ'য়ে যেতে পারে। মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার এর চেয়ে ভাল পথ আর নেই।

যাত্রার দিন গাড়ী আর ঘোড়া দুটোই তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। হেক্টর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে তার ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করতে লাগল। আগের দিনই সে একটা চাবুক কিনে এনেছিল। বাতাসের বুকে সেটাই সে সাঁই-সাঁই ক'রে কসাতে লাগল। তারপরে সে ঘোড়ার পিঠ, বুক, পা, পাঁজর—সব ভাল ক'রে পরীক্ষা করে দেখল; মুখ চিরে ভেতরটা দেখল তার; তারপর তার পিঠে হাত বুলোল। বয়সটা কত যাচাই করল। আর সকলে এসে যখন গাড়ীতে চাপার উপক্রম করল তখনও সে ঘোড়ার জাত নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তার সংসারের সবাই গাড়ীর ওপরে বেশ আরাম ক'রে বসল। তারপরে হেক্টর ঘোড়ার ওপরে তড়াং ক'রে লাফিয়ে উঠল।

ঘোড়ার পিঠে বসার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াটা এমনভাবে নাচতে শুরু করল যে আর একটু হলেই হেক্টর ছিটকে পড়ে যেত। লজ্জা পেয়ে হেক্টর ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল—'স্থিরোভব বৎস, স্থিরোভব।' ঘোড়া আর আরোহী সামলে নেওয়ার পরে হেক্টর জিজ্ঞাসা করল—রেডি?

সবাই বলল—রেডি।

চলতে শুরু করল দলটি। সবারই চোখ তখন হেক্টরের ওপরে নিবদ্ধ। সে তখন ঘোড়ার ওপরে দেহটা নানাভাবে বাঁকিয়ে একটা বেশ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। মনে হল, সে বোধ হয় ঘোড়ার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কোনমতে নিজেকে আয়ত্তের ভেতরে রেখে সে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু তখন তার অবস্থা বিশেষ ভাল না। কপাল কুঁচকিয়ে বিবর্ণ মুখে সে কোনরকমে তাল সামলাতে ব্যস্ত ছিল। তার স্ত্রী আর চাকরাণী দুটো ছেলেকে ধরে রেখেছিল। ছেলেদুটো বারবার হেক্টরের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে বলতে লাগল—দেখ, দেখ—বাবা যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে। বাইরে বেরিয়ে তাদের বেশ স্ফূর্তি হয়েছে। চীৎকার ক'রে মনের আনন্দ তারা প্রকাশ করতে লাগল।

তাদের চীৎকারে বিভ্রান্ত হয়ে হঠাৎ ঘোড়াটা লাফাতে-লাফাতে ছুটতে শুরু করল। তাকে সংযত করতে গিয়ে হেক্টরের টুপীটা গেল পড়ে। ঘোড়া থামিয়ে নিচে নামতে হ'ল আরোহীকে। টুপীটা কুড়িয়ে নিয়ে হেক্টর তার স্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে চেঁচিয়ে বলল—বাচ্চাদের চীৎকার করতে বারণ কর—বুঝেছ!

দুপুরের খাবারটা তারা সঙ্গেই নিয়েছিল। ভিসিনেট বনের মধ্যে গিয়ে তারা লাঞ্চ খেল। গাড়োয়ানই ঘোড়ার তদারক করছিল; তবু বার-বার হেক্টর ঘোড়াটার কাছে উঠে গিয়ে তার দেখাশোনা করতে লাগল। সে আদর করে ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বুলোল; তাকে রুটি, কেক আর চিনি খাওয়ালো। স্ত্রীকে বলল—ঘোড়াটা খুব তেজী। প্রথমে ও আমাকে একটু বেকায়দায় ফেলেছিল। কিন্তু দেখলে তো ওকে কেমন ক'রে আমি কায়দা করে ফেললাম। আমি যে কী চিজ সেটা ও এখন বুঝতে পেরেছে।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা চ্যাম্পস-ইলিসি-র পাশ দিয়েই ফিরল। বিরাট রাজপথটা তখন লোকজন, গাড়ী-ঘোড়ায় একেবারে গিজগিজ করছে। সূর্যের আলো পড়ে গাড়ীর রঙ, লোহার জিন, আর দরজার হাতলগুলি সব চকচক করতে শুরু করেছে। সবাই তখন গতির আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। কিছুটা দূর এগোনোর পরেই হেক্টরের ঘোড়াটা দুর্বার গতির ছন্দে মেতে উঠল। সেই অজস্র যানবাহনের ভেতর দিয়ে বেপরোয়া হয়ে সে তার আস্তাবলের দিকে ছুটতে শুরু করল। তাকে সংযত করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল হেক্টরের। যে গাড়ীতে ক'রে তার স্ত্রী-পুত্রেরা আসছিল সেই গাড়ীটা অনেক পেছনে প'ড়ে রইল। প্যালে ডি ল ইনডাসট্রির সামনে এসে ঘোড়াটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেল। সেই সময় একটি বৃদ্ধা ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হচ্ছিল। ঘোড়াটাকে সামলাতে না পেরে হেক্টর চীৎকার ক'রে উঠল—অ্যাই...অ্যাই...সাবধান। কিন্তু বৃদ্ধাটি সম্ভবত কালা থাকায় সে তার কথা

শুনতেই পেল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি যেতে লাগল। ঘোড়াটা তাকে গিয়ে জোরে একটা ধাক্কা মারল। ধাক্কা খেয়ে বৃদ্ধাটি বারতিনেক ডিগবাজি খেয়ে দশ ফুট দূরে ছিটকে পড়ল। জনকয়েক লোক বেরিয়ে এসে চীৎকার করে উঠল—ধর, ধর—ঘোড়াটাকে ধর।

প্রচণ্ড বিভ্রান্তির মধ্যে হেক্টর তখন মরীয়া হয়ে প্রাণপণে ঘোড়াটার ঘাড়ের লোমগুলি হাত দিয়ে ধরে চীৎকার করে উঠল—বাঁচাও, বাঁচাও। বিরাট একটা ধাক্কা খেয়ে সে ঘোড়ার ওপর থেকে ছিটকে পুলিশম্যানের প্রসারিত হাতের মধ্যে পড়ে গেল। গোলমাল শুনে পুলিশটি ঘোড়াটা থামানোর জন্যে সেইদিকে ছুটে এসেছিল। সরকারী পোশাক পরা একটি বৃদ্ধ তো ব্যাপারটা দেখে ক্ষেপে লাল হয়ে উঠল; বলল—কী কাণ্ড! আপনি যদি ঘোড়ায় চাপতে না জানেন তাহলে আপনার ঘরে বসে থাকা উচিত ছিল। এইভাবে রাস্তায় মানুষ চাপা দেওয়ার কোন অধিকার আপনার নেই।

চারটি লোক বৃদ্ধাটিকে তুলে নিয়ে এল। মনে হ'ল বৃদ্ধাটি মারা গিয়েছে। তার মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে; গোটা গাটা ছেয়ে গিয়েছে ধূলোয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলল—একে ডাক্তারখানায় নিয়ে যান। আমরা স্টেশনহাউসে যাচ্ছি। একদল লোক হেক্টরের পিছু-পিছু চলল। হেক্টর চলল দুটি পুলিশের পাশে-পাশে। আর একজন নিয়ে চলল তার ঘোড়াটা। ইতিমধ্যে তার স্ত্রীর গাড়ীটা এসে পড়েছে। দূর থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করে সে তার দিকে দৌড়ে এল। চাকরাণী আর বাচ্চারা কাঁদতে-কাঁদতে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো। হেক্টর বলল তার ঘোড়া একটি বৃদ্ধাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। ব্যাপারটা কিছুই নয়। সে শীগগীরই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এই কথা শুনে রীতিমত ভয় পেয়েই তার পরিবারের সকলে বাড়ি ফিরে গেল।

স্টেশন-হাউসে বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। নিজের নাম ঠিকানা আর তার অফিস কোথায় এই সব সংবাদ দিয়ে আহত বৃদ্ধাটির খবরটা কি জানার জন্যে সে অপেক্ষা করতে লাগল। সংবাদ নিয়ে একটি পুলিশ ফিরে এল। বৃদ্ধাটির নাম মাদাম সাইমন; পেশায় সে কাঠকুড়ানী। বয়স পঁয়ষট্টি। তার জ্ঞান ফিরে এসেছে; তবে তার বিশ্বাস তার শরীরের ভেতরে কিছু জখম হয়েছে। বৃদ্ধা মারা যায়নি এই সংবাদ পেয়ে হেক্টর তার মনোবল ফিরে পেল; বলল—বৃদ্ধার চিকিৎসার জন্যে যা খরচ হয় তা সে করবে। যে ওষুধের দোকানে বৃদ্ধাটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেইখানে সে গেল। বৃদ্ধাটি 'যাই বাবা, গেলাম বাবা' বলে কাতরাচ্ছিল। দু'জন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা বললেন—কোন হাড় ভাঙেনি; কিন্তু ভয় হচ্ছে, ভেতরে কিছু গণ্ডগোল হয়ত হয়েছে।

হেক্টর জিজ্ঞাসা করল—খুব কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ, হচ্ছে।

কোথায়?

মনে হচ্ছে শরীরটা আমার পুড়ে যাচ্ছে।

একজন ডাক্তার তার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী?

হ্যাঁ, স্যার।

একে একটা হাসপাতালে পাঠানো দরকার। একটা হাসপাতালের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে। তারা রোজ ছ' ফ্রাঁ হিসাবে নেবে। সেইখানে আমি কি এর জন্যে ব্যবস্থা করব?

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং সেই মত ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়ে আশ্বস্ত হ'য়ে হেক্টর বাড়ি ফিরে গেল। দেখল তার স্ত্রী তখনও বসে-বসে কাঁদছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—কিছু ভেব না। বিশেষ কিছু নয়। তাকে আমি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিন দিনে সুস্থ হ'য়ে উঠবে।

পরের দিন অফিসের পর সে মাদাম সাইমনকে দেখতে গেল। সে ভালই রয়েছে—গরুর মাংসের স্যুপ খেতে তার ভালই লাগছে।

হেক্টর জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছ?

সে বলল—ভাল নয়। মনে হচ্ছে আমি মরে গিয়েছি। মোটেই ভাল নয়।

ডাক্তার বললেন—এখনই বলা যাচ্ছে না। পরে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

তিন দিন অপেক্ষা করার পরে হেক্টর আবার গেল বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করতে। তার দেহের রঙ ফিরেছে; ফিরে এসেছে চোখের জেল্লা। কিন্তু হেক্টরকে দেখামাত্র সে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করল—আমি মোটেই হাঁটাচলা করতে পারছিনা। বাকী জীবনটা আমাকে এইভাবেই কাটাতে হবে দেখছি।

কথাটা শুনে হেক্টরের শিরায়-শিরায় একটা ঠাণ্ডা শিহরণ জেগে উঠল। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ক'রে রোগীর কথা জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তার বললেন—আমিও বুঝতে পারছিনা। ওকে বিছানা থেকে একটু তোলার চেষ্টা করলেই ও এমন চীৎকার ক'রে ওঠে যে আমরা ভয় পেয়ে যাই। তবু, ওকে বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই। যতক্ষণ না ও হাঁটতে পারছে ততক্ষণ ও রোগমুক্ত হয়েছে বলতে পারব না।

বৃদ্ধাটি তাদের আলোচনা বেশ মন দিয়ে শুনল। তার চোখের ওপরে ফুটে বেরোল একটা ধূর্ত চাউনি। এক সপ্তাহ কাটলো, দু' সপ্তাহ কাটলো; দেখতে-দেখতে এক মাস কেটে গেল। তবু, মাদাম সাইমনকে চেয়ার থেকে ওঠানো গেল না। তার ক্ষিদে চমৎকার—সেদিক থেকে কোন অভিযোগ তার নেই। স্বাস্থ্যও বেশ ফিরেছে। অন্যান্য রোগীদের সঙ্গেও সে বেশ গল্পগুজব করছে। পঞ্চাশ বছর ধরে ঘুঁটে কুড়ানোর পরিশ্রম ক'রে সে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। এই বিশ্রাম নেওয়ার পূর্ণ অধিকার তার যেন রয়েছে।

প্রতিদিন হেক্টর আসে তাকে দেখতে। প্রতিদিনই বৃদ্ধা বলে—ভাল নয়, মোটেই ভাল নয়।

বাড়ি ফিরলে প্রতিদিনই হেক্টরের স্ত্রী তাকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছে?

হতাশ হয়ে হেক্টর বলে—একই রকম। কোন উন্নতি নেই।

চাকরাণীকে জবাব দিল তারা। সংসারের খরচ কমালো। অফিসের মনিবের কাছ থেকে বাড়তি সে যা পেয়েছিল সব খরচ হয়ে গেল। তারপরে একদিন হেক্টর চারজন ডাক্তারের সঙ্গেই মাদাম সাইমনের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করল। বৃদ্ধাটি তাদের কথা শুনল; ধূর্তের মত তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।

একজন ডাক্তার বললেন—ওকে হাঁটতে হবে।

হাঁটতে আমি পারব না।

তাঁরা হাত ধরে হাঁটাতে লাগলেন। কয়েক পা গিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চীৎকার করতে-করতে মাটিতে বসে পড়ল। তাঁরা আবার তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। কোন অভিমত দিলেন না তাঁরা কিন্তু এটা বললেন যে জীবনে আর সে কাজ করতে পারবে না।

বাড়িতে এসে দুঃসংবাদটা দেওয়া মাত্র হেক্টরের স্ত্রী মাটিতে শুয়ে পড়ল প্রায়; তারপরে বলল—ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসাই ভাল। তাতে আমাদের খরচ কমই পড়বে।

আমাদের বাড়িতে? বলছ কী?

এছাড়া আর কী করতে পারি বল? নিশ্চয় এর জন্যে আমি দায়ী নই?

সহানুভূতি

Sympathy

বিষণ্ন মনে লোকটি রিউ দে মার্টারস্‌এর পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মেয়েটিও সেই একই পথ ধরল। লোকটি বৃদ্ধ—বয়স ষাটের কোঠায়; মাথায় টাক; টাকের ওপরে জীর্ণ একটা টুপী; দীর্ঘ শার্টের কলারে অর্দ্ধেকটা ঢাকা সাদা দাড়ি; ম্লান দুটি চোখ, বিমর্ষ মুখ, আর হলদে দাঁত।

মেয়েটির বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। তার চুলগুলি বিরল হয়ে এসেছে; পোশাকের রঙ বিবর্ণ; মনে হয় রাস্তার ধারে পুরনো কোন দোকান থেকে নামমাত্র দাম দিয়ে সেগুলি সে কিনেছে। লোকটি রোগা; মেয়েটি স্থূল, গোলগাল। লোকটির চেহারা একসময় ভালই ছিল। আত্মবিশ্বাস ছিল তার; ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সে ছিল স্থিরবিশ্বাসী; তাকে দেখে মনে হয় প্যারিসে উচ্ছল জীবনযাত্রায় পূর্ণ অংশ গ্রহণ করার জন্যে সব সময় সে প্রস্তুত হয়েছিল। আর মেয়েটি ছিল সুন্দরী। যৌবনে তাকে পাওয়ার জন্যে অনেকেই লালায়িত ছিল। সেদিন সে নিয়মিতভাবেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে বেড়াত।

তার এই বিষণ্ন দিনগুলিতে এখনও মাঝে-মাঝে লোকটির যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়। প্রথম যেদিন সে প্যারিসে এল সেদিন একটা বাক্স করে সে এনেছিল

এক বাণ্ডিল কবিতা আর কিছু নাটক। তখনকার সমস্ত সাহিত্যিকদের ওপরে বিরাট একটা অনীহা নিয়ে সেদিন সে ভেবেছিল—একমাত্র সে-ই তাদের সবাইকে ছাপিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে নাম করতে সক্ষম হবে। আর দুঃখের দিনে মেয়েটিও তার যৌবনের দিনগুলির কথা ভাবত। তার জন্মের কথা; ভাবত সেই সব তারই বন্ধু-বান্ধবদের কথা যারা তারই মত পাপের পথে নেমেছিল, তারই মত যারা অন্য মহিলাদের প্রণয়ীদের ছিনিয়ে নিয়ে আসত; ভাবত সেই সব মধুর অথচ উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলির কথা যেদিন তার প্রেমিকের সংখ্যা ছিল অগণিত।

লোকটি জীবন শুরু করেছিল বেশ ভালভাবেই। গল্প-কবিতায় নাম অবশ্য সে করতে পারেনি; কিন্তু নাম করেছিল পরের কুৎসা রচনা করে। এই কুৎসা রচনায় তার কলম এতই দক্ষ হয়ে উঠেছিল যে বুলেভার্ডে সে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এর জন্যে কিছু ক্ষতিপূরণ তাকে অবশ্য দিতে হয়েছিল; দ্বন্দ্বযুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল কয়েকবার; কিন্তু তীক্ষ্ণধী আর সাহসী বন্ধু বলে তাকে স্বীকার করতে অনেকেই বেশ গর্ব অনুভব করত।

মেয়েটিরও যশ একদিন তুঙ্গে উঠেছিল। যদিও তা সামান্য কিছুদিনের জন্যে। সে হয়ত ম্যারী পি—অথবা, ক্যামিলী এল-এর যশকে নষ্ট করতে পারেনি, তবু মেজাজী হোটেল আর কাফেতে তাকে নিয়ে অনেকেই হইচই করত। তারপর একদিন যে খবরের কাগজে আমাদের ওই বন্ধুটি তার কুৎসা প্রচার করে নাম কিনেছিল সেই খবরের কাগজটি উঠে গেল, কারণ তার চেয়ে বড় কুৎসা-রচনাকারী আর একজন ক্ষমতাশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল। তার লেখা পড়ে, পূর্বতন লেখকের কুৎসাগুলি নিতান্ত জলো বলে সকলের ধারণা হয়েছিল। ফলে তাকে ছোট একটি কাগজের সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছিল। তখন সে পরিণত হল দরিদ্র 'ম্যার্চি'। প্রতিটি লাইনের জন্যে সে তখন এক পেনী করে মজুরি পেত।

একদিন ম্যারী পি, এবং ক্যামিলী এল-এর প্রতিদ্বন্দ্বিনী অসুখে পড়ল; অর্থ-সংকট ঘনিয়ে এল তার। আর 'কে-জানে-কে' বেশ্যাটি ডিনার খাওয়ার জন্যে পথে বেরোল; মনত্মার্টি হোটেলের বেশ গরম খানা খাওয়ার শখ হয়েছিল তার। এদিকে ম্যার্চির আবার কাব্য আর নাটক লেখার শখ চাপলো। কিন্তু তার যৌবনের কবিতাগুলি ততদিনে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। অন্য ধরনের কাব্য রচনা করতে হবে তাকে; কিন্তু সে-ক্ষমতাও তার রয়েছে বলে সে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে বসল। তার মাথার মধ্যে তখন অজস্র নতুন চিন্তা আর ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখনও ইচ্ছে করলে অনেক নামকরা সাহিত্যিককেই সে ঘায়েল ক'রে দিতে পারে। কিন্তু বিপদটা হচ্ছে কোথায় বসে সে লিখবে? তার সে সময়ই বা কোথায়? রোজকার খাবার যোগাড় করতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছে; তাছাড়া রয়েছে তার কফি, জুয়া, আর এদিক-ওদিকের খরচ। পাতার পর পাতা লিখে যেটুকু সে পায় তাতেই তো তার পেট ভরে না সুতরাং বছরের পর পছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও তার দারিদ্র্য আর ঘুচলো না; সে আগের মতই দরিদ্র রয়ে গেল।

মেয়েটিও ভাবত তার অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে নতুন কোন প্রেমিকের সন্ধান পাওয়াটা এমন একটা কিছু কঠিন কাজ নয়। তার চেয়ে দেখতে অনেক খারাপ মেয়েরাও কি সে-সুযোগ পায়নি? কিন্তু বিপদটা হচ্ছে তার যৌবন আর নেই। অন্য মেয়েমানুষরা তাদের পছন্দমত মনিব সংগ্রহ করতে পারে; তাকে প্রতিদিনই দর কমাতে হচ্ছে। এইভাবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে গেছে। সেই 'কে-জানে-কে' বেশ্যাটি এখনও সেই 'কে-জানে-কে'-ই রয়ে গেল।

হতাশায় মরীয়া হয়ে লোকটি সফল কোন মানুষকে লক্ষ্য করে মনে-মনে গজরাতো—কিন্তু যাই বল, ওই লোকটার চেয়ে আমি অনেক বেশী চালাক। দিনের পর দিন ক্লান্ত পথপরিক্রমার পরে যারা বিলাসের মধ্যে দিয়ে দিন কাটায় সেই সব বেশ্যাদের উদ্দেশ্য করে সেই মেয়েটিও বলত—কোন্ দিক দিয়ে ওই নচ্ছার বেশ্যাটা আমার চেয়ে ভাল?

এইভাবে ম্যার্চির বয়স ষাট হল, তার মাথায় টাক গজালো, দাড়ি পাকল, দাঁত বেগনে হয়ে গেল। এইভাবে সকলের ওপরে ক্ষেপতে-ক্ষেপতে সে একদিন বুড়িয়ে গেল। আর 'কে-জানে-কে' বেশ্যাটির মাথায় চুল উঠতে লাগল—দাঁত পড়তে লাগল—পোশাক পরিচ্ছদ বিবর্ণ হয়ে উঠল; দরিদ্র পোশাক পরে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে সেও সকলের ওপরে ক্ষেপে উঠল।

হায়রে, দুঃখের কী জ্বালা! পূর্বস্মৃতির কী ভয়ঙ্কর বেদনা। সেদিন সন্ধ্যায় লোকটি বিশেষভাবে মুষড়ে পড়েছিল। অতএব কষ্ট ক'রে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কাগজ সম্পাদনা করার জন্যে সে এক মাসের আগাম মাইনে যে তিনশ ফ্রাঁ পেয়েছিল একটা বেশ্যার বাড়িতে গিয়ে সেই টাকা সে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে। মুষড়ে পড়ারই কথা, আর মেয়েটিও তার বান্ধবীর বাড়িতে বিনা পয়সায় অনেকটা বিয়ার খেয়ে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। তাছাড়া বাসায় ফিরে যেতে ভয়ও করছিল তার; কারণ সকালেই তার বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়েছিল সে যদি রাত্রির মধ্যে রোজ এক ফ্রাঁ ক'রে পনের দিনের বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দিতে না পারে তাহলে তার সমস্ত আসবাবপত্র কেড়ে নিয়ে তাকে সে তাড়িয়ে দেবে।

এই কারণেই দু'জনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। এই কারণেই মন তাদের বিষণ্ন ছিল। কর্দমাক্ত পথের ওপরে একজন পথচারীও ছিল না। তার ওপরে অন্ধকার হয়ে আসছে; বৃষ্টি পড়তেও শুরু ক'রেছে। নর্দমা থেকে বেরিয়ে আসছে পচা গন্ধ।

লোকটি মেয়েটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি যান্ত্রিক স্বরে বলল—হে সুন্দর অন্ধকারের পথিক, তুমি কি আমার বাড়িতে আজ আসবে না?

লোকটি উত্তর দিল—আমার কাছে কিছু নেই।

দৌড়ে গিয়ে মেয়েটি তার একটা হাত ধরে বলল—মাত্র এক ফ্রাঁ। ওটা তোমার কাছে কিছুই নয়।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াল—তাকালো মেয়েটির দিকে। মনে হল মেয়েটি দেখতে ভালই—এবং স্বাস্থ্যবতী [স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের সে বেশী পছন্দ করে]; সে বলল—কোথায় থাক? কাছাকাছি?

রু লেপিক-এ।

কী! আমিও তো সেইখানেই থাকি।

তাহলে তো ভালই হল। আমার সঙ্গে এস।

লোকটি পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখল মাত্র তিরিশটা সো তার কাছে রয়েছে। বলল : বিশ্বাস কর—এছাড়া আর কিছু আমার কাছে নেই।

মেয়েটি বলল—ওতেই হবে। এস।

বিষন্ন ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল তারা ; কেউ কোন কথা বলল না ; তারা ভাবতেও পারল না যে তাদের দুটি জীবন একই খাদে বয়ে চলেছে, আর দুজনে একই সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে থাকার ফলে তারা তাদের সেই দুটি দুর্ভাগ্যকে একই সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

একটি অদ্ভুত ভোজনোৎসব

An odd feast

সময়টা শীতকাল। বছরটা আমার মনে নেই। জুলে দি ব্যানেভাইল সম্পর্কে আমার ভাই হয়। নরম্যানডির একটা পুরনো খামারে একটি চাকর আর চাকরাণী নিয়ে সে একাই থাকত। তার বাড়িতে সেবার আমি গিয়েছিলাম। শিকার করার ঝোঁক আমার প্রচণ্ড। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আমি কেবল শিকার করেই বেড়াতাম।

ধূসর রঙের পুরনো কেল্লাটির চারপাশে লম্বা-লম্বা পাইন আর ওক গাছের অরণ্য। দেখলেই মনে হবে যুগ-যুগ ধরে জায়গাটি জনমানবহীন হয়ে রয়েছে। প্রাচীন আসবাবপত্র আর জুলের পূর্ব-পুরুষদের ছবিগুলি এখানকার বড়-বড় প্রশস্ত ঘরগুলির একমাত্র বাসিন্দা। সেই ঘরগুলি এখন বন্ধ। এই বিরাট বাড়িটির বাসযোগ্য একটিমাত্র ঘর ছিল। সঙ্গে ছিল বিরাট একটা রান্নাঘর। ইঁদুরদের তাড়ানোর জন্যে তার দেওয়ালগুলিতে পলেস্তারা করা হয়েছিল। সেই ঘরটিতে আমরা থাকতাম। ঘরের বড়-বড় সাদা দেওয়ালে নানা-জাতীয় বন্দুক আর শিঙ্গা ঝুলানো থাকত। বিরাট চুল্লীতে কাঠের আগুন জ্বলত। অপ্রীতিকর ঘরটির ভেতরে সেই চুল্লীর আলোই ছড়িয়ে পড়ত চার পাশে। প্রতিদিন রাত্রিতে আমরা আগুনের ধারে হাত পা ছড়িয়ে বসতাম। আমাদের কুকুরগুলি সেই বিস্তীর্ণ ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকত ; ঘুমোত, ঘুমোতে ঘুমোতে চীৎকার করত। তারপরে ঝিমোতে ঝিমোতে আমরাও একসময় শীতে হিহি করতে-করতে বিছানার ওপরে ঢলে পড়তাম।

সেদিন খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল। আমরা যথারীতি আগুনের ধারে বসেছিলাম, একটা খরগোস আর দুটো প্যাট্রিজ তখন সেদ্ধ হচ্ছিল। তাদের সুগন্ধ ভরিয়ে দিয়েছিল আমাদের নাক।

জুলে বলল—যা ঠাণ্ডা পড়েছে আজ ঘুমানো খুব কষ্টকর হবে।

উদাসীনভাবে আমি বললাম—তা বটে; তবে কাল সকালে শিকার পাওয়া যাবে প্রচুর।

পরিচারিকা একপাশে আমাদের খাবার দিয়ে আর একপাশে তাদের খাবার সাজালো। তারপরে সে জিজ্ঞাসা করল—আজ যে ক্রিসমাস ইভ তা কি আপনারা জানেন?

সে-খেয়াল আমাদের আদৌ ছিল না। তাই আমরা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালাম।

জুলে বলল—তাই বুঝি গির্জায় ঘণ্টা পড়েছে। আর রাত্রিতে তাহলে গির্জায় ভজন গান হবে?

হ্যাঁ, স্যার। তবে বুড়ো ফোরনেল মারা গিয়েছে। বেল বাজার সেও একটা কারণ।

ফোরনেল একটি বুড়ো মেষপালক—এ অঞ্চলে বেশ পরিচিত। বয়স তার হয়েছিল ছিয়ানব্বই। একমাস আগেও তার কোন অসুখ ছিল না। তারপর একদিন রাতের অন্ধকারে সে পুকুরে পড়ে যায়। সেই থেকে তার ঠাণ্ডা লাগে; আর তাতেই সে মারা গিয়েছে।

জুলে আমাকে বলল—তোমার ইচ্ছে হলে ডিনার সেরে এই দরিদ্র লোকটিকে একটু দেখে আসতে পারি।

বৃদ্ধটির সংসারে আছে এক নাতি; বয়স তার আটান্ন। তার স্ত্রীর বয়স এক বছর কম। তার ছেলেমেয়েরা অনেক আগেই মারা গিয়েছে। গ্রামে ঢোকার পথে একটা একেবারে রদ্দি বাড়িতে তারা বসবাস করত।

নির্জন বাড়িতে ক্রিসমাস ইভ সত্যিই বোধ হয় মানুষকে উৎসাহিত করে। যাই হোক, সেদিন আমরাও বেশ গল্প করলাম। ডিনার শেষ করতে-করতে বেশ রাত হয়ে গেল আমাদের। চাকররা চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে আমরা পাইপের পর পাইপ টানতে লাগলাম, স্মৃতিচারণা করলাম; আলোচনা হল পরের দিনের শিকার কাহিনী নিয়ে। চারপাশের নির্জনতা আমাদের দু'জনেকে খুব কাছাকাছি টেনে নিয়ে এল। দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই আমরা পরস্পরের কাছে এগিয়ে এলাম।

চাকরটি ফিরে এসে বলল—আমি গির্জায় যাচ্ছি, স্যার।

জুলে বলল—কী ব্যাপার! এত তাড়াতাড়ি?

বারটা বাজতে আর মিনিট পনের বাকি আছে স্যার।

জুলে বলল—তাহলে আমরাও উঠি চল। মধ্যরাত্রির ভজন গান শুনতে বেশ ভালই লাগে।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। তারপরে বেশ ভাল ক'রে দেহগুলিকে জড়িয়ে আমরা গ্রামের দিকে যাত্রা করলাম। ঠাণ্ডাটা ভীষণ পড়েছে; কিন্তু রাত্রিটি বেশ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। বরফজমা মাটির ওপরে চাষীদের কাঠের জুতোর শব্দ হচ্ছে; আর হচ্ছে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। রাস্তার ওপরে এখানে-ওখানে বিন্দু-বিন্দু আলোর নাচন শুরু হয়েছে। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের পথ দেখানোর জন্যে চাষীরা লণ্ঠন নিয়ে চলেছে। গ্রামের কাছাকাছি আসতেই জুলে বলল: এখানেই ফোরনেলরা থাকে। চল, ভেতরে যাই।

বার-বার দরজায় ধাক্কা দিলাম আমরা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। একজন চাষী আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল—ওরা কেউ বাড়ি নেই। ঠাকুর্দার আত্মার জন্যে প্রার্থনা করার জন্যে তারা সব গির্জায় গিয়েছে।

আমরা গির্জায় ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই ভজন শুরু হল। অজস্র ছোট-ছোট বাতি জ্বালানো হয়েছে চারপাশে। বাঁদিকে ছোট একটি চ্যাপেল; তারই মধ্যে যীশুর জন্ম মুহূর্তটি দেখানোর জন্যে ছ'টি মোমের মূর্তি গড়া হয়েছে। পুরুষরা মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে; গভীর শ্রদ্ধায় মেয়েরা হাঁটু মুড়ে বসে হাত দুটি জড়ো করে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে জুলে বলল—এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে। চল, বাইরে যাই।

শীতার্ত চাষীদের প্রার্থনা-সভায় রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম; তারপরে নির্জন পথের ওপরে নেমে এসে আবার কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম। ভজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা গল্প করলাম। তারপরে আমরা গ্রামে ফিরে এলাম। ফোরনেলদের ঘরের ভেতর থেকে ফিকে একটা আলোর রেখা বেরোচ্ছে।

জুলে বলল—মৃত আত্মাকে এরা পাহারা দিচ্ছে। আমাদের দেখলে এরা খুশিই হবে।

আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম। ছোট নিচু ঘরে একটিমাত্রই আলো জ্বলছিল। ঘরের মধ্যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। সেইখানে বিষণ্ণ মুখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে ফোরনেল আর তার স্ত্রী। ক্রিসমাস ইভের প্রিয় খাদ্য এক প্লেট পুডিং সামনে বসানো রয়েছে। সেটা থেকে টুকরো-টুকরো করে কেটে রুটির সঙ্গে মিশিয়ে তারা খাবে। পুরুষের গ্লাসটি শূন্য হয়ে গেলে মেয়েটি সিডার ভর্তি মাটির কলসী থেকে সিডার নিয়ে আবার সেটা ভর্তি করে দেবে।

তারা আমাদের ভেতরে ডেকে তাদের সঙ্গে খাবার অনুরোধ করল। আমরা খেতে অস্বীকার করায় তারা যেমন খাচ্ছিল তেমনি খেতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে জুলে বলল—অ্যানথাইম, তোমার ঠাকুর্দা তাহলে মারা গিয়েছেন!

হ্যাঁ স্যার। আজ বিকেলে।

কোন কথা খুঁজে না পেয়ে আমি বললাম—অনেক বয়স হয়েছিল। তাই না?

মেয়েটি বলল—হ্যাঁ, মরার বয়স তাঁর হয়েছিল। এ জগতে তাঁর আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

বৃদ্ধটিকে একবার দেখার আমার একটা দুর্দান্ত ইচ্ছে জাগলো। আমি তাকে দেখতে চাইলাম। ওরা দু'জনে হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। অর্থাৎ, মৃতদেহটি দেখানো উচিৎ হবে কিনা। জুলে তা লক্ষ্য করল। আরও জিদ চেপে গেল তার। তখন লোকটি সন্দেহজনকভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে ধূর্তের মত জিজ্ঞাসা করল—দেখে কী লাভ হবে স্যার?

জুলে বলল—কিছুই হবে না। কিন্তু আমাদের দেখতেই বা তোমরা দেবে না কেন?

কাঁধটা কুঁচকিয়ে লোকটি বলল—আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এখন দেহটাতে ঠিক হাত দেওয়া যাবে না।

তারপরে আমরা নানা কথা ভাবলাম; কিন্তু তাদের কেউ নড়াচড়া করল না। চোখ নিচু করে বিষণ্ন মুখে তারা চুপচাপ বসে রইল। মনে হল তারা যেন বলতে চায়—বাপু, তোমরা কেটে পড়।

জুলে অধিকার খাটিয়ে বলল—এস অ্যানথাইম, আমরা ঘরের ভেতরে যাই।

কিছু লাভ হবে না স্যার। সে ওখানে নেই—

কোথায় আছে?

মেয়েটি বাধা দিয়ে বলল—দেখুন স্যার, মৃতদেহ রাখার কোন জায়গা নেই আমাদের। তাই সকাল পর্যন্ত মৃতদেহটা আমরা ময়লা ফেলার ঝাঁপির মধ্যে রেখে দিয়েছি।

তারপরে টেবিলের খোলটা তুলে ফেলে সেই ফাঁকের মধ্যে সে বাতিটা ঢুকিয়ে দিল, ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, সে-ই বটে। মেষপালকের পোশাকে জড়ানো, রুগ্ন, অনেক দিনের শুকনো বাসী রুটির মতই সে তালগোল পাকিয়ে বাড়ির সমস্ত জঞ্জালের মধ্যে শেষ ঘুম ঘুমোচ্ছে। যে পাত্রের ভেতরে তার মৃতদেহটা রয়েছে সেই পাত্রের ওপরটা টেবিল হিসাবে ব্যবহার করছে তার নাতি।

মৃতদেহের এই অসম্মানে বেশ চটে গিয়ে ঘৃণামিশ্রিত স্বরে জুলে চেঁচিয়ে উঠল—বদমাশ কোথাকার! তাকে তার বিছানার ওপরে শুইয়ে রাখলে না কেন?

মেয়েটি কেঁদে ফেলল; তারপরে তাড়াতাড়ি বলল—মানে, কী করব বলুন! আমাদের বিছানা বলতে ওই একটা। ওইখানেই আমরা তিনজনে রাত্রে শুতাম। কিন্তু তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা দু'জনে মেঝেতেই রাত কাটিয়েছি। মেঝেটা খুব শক্ত আর ঠাণ্ডা। সেই জন্যে আজ বিকেলে যখন তিনি মারা গেলেন তখন আমরা বলাবলি করলাম—মারা গেলে মানুষের কোন অনুভূতি থাকে না। সেই জন্যে ওঁকে আর বিছানার ওপরে শুইয়ে রেখে লাভ কী? ওই ময়লা ফেলার পাত্রও ওঁর কাছে যা—বিছানাও তাই।—মরা মানুষের সঙ্গে আমরা শুতে পারিনা। পারি কি?

ভীষণ ক্ষেপে বিরক্ত হয়ে জোরে দরজাটা ঝাঁকানি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জুলে। তার পেছনে বেরিয়ে এলাম আমি। হাসতে-হাসতে তখন আমার পেটে খিল ধরে গিয়েছে।

মঁসিয়ে জোকাস্তে

Monsieur Jocaste

মাদাম, এক সন্ধ্যায় ছোট একটি জাপানী ড্রয়িংরুমে বাবার একটি ব্যভিচারকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের মধ্যে যে বিরাট কলহ বেঁধেছিল সেকথা নিশ্চয় আপনার মনে রয়েছে। সেদিন আপনি যে আমাকে কড়া-কড়া কথা বলেছিলেন, সেদিন আপনি

যে আমার ওপরে ভীষণ রাগ করেছিলেন সে সব কথা নিশ্চয় আপনি ভুলে যান নি। একথাও নিশ্চয় আপনার মনে রয়েছে সেদিন আমি বাবাকেই সমর্থন করেছিলাম। আপনি আমার ওপরে দোষারোপ করেছিলেন। আপনার বিরুদ্ধে আমি আপীল জানাচ্ছি।

আপনি বলেছিলেন আমি যাকে সমর্থন করেছিলাম সেই মানুষকে পৃথিবীর কেউ সমর্থন করতে পারে না। আজ আমি সেই কাহিনীটি সকলের সামনে বলছি।

নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচারকে অনেকেই সহ্য করতে পারে না কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষও রয়েছে যারা বুঝতে পারে যে অনেক সময় এমন অনেক দুর্ঘটনা মানুষেরও জীবনে ঘটে, চরিত্রের দিক থেকে যাদের তারা প্রতিরোধ করতে পারে না। চরিত্রের দুর্দান্ত আবেগে কুটোর মত সে ভেসে যায়।

ষোল বছর বয়সে মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল একটি নিষ্ঠুর প্রকৃতির বৃদ্ধের সঙ্গে। ব্যবসাদার বৃদ্ধটি মেয়েটির টাকার জন্যেই তাকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটির সুন্দর চেহারা, স্বপ্নিল তার চোখ দুটি—আনন্দময়ী; আদর্শ সুখ পাওয়ার জন্যে তার মনটা সব সময় আকুলি-বিকুলি করত। সেই আশা বিবাহিত জীবনে তার পূর্ণ হয়নি; ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল তার হৃদয়। হঠাৎ জীবনটা সে উপলব্ধি করল। সে বুঝতে পারল তার কোন ভবিষ্যৎ নেই, আর কোন আশা নেই তার। একটিমাত্র আশাই তার আত্মাকে তখন গ্রাস করে বসল। তার ভালবাসাকে সার্থক করে তুলতে চাই একটি সন্তান।

কিন্তু কোন সন্তানই তার হল না। দুটি বছর কেটে গেল। তারপর সে একটি যুবকের প্রেমে পড়ে গেল। যুবকটির নাম পেয়ারি মার্টেল। বয়স তার তেইশ। মেয়েটিকেও সে উন্মাদের মতই ভালবাসত।

শীতকালে একদিন সন্ধ্যায় মেয়েটির বাড়িতে তারা একা-একা বসেছিল। মার্টেল এসেছিল এক কাপ চা খেতে। একটা নিচু সোফার ওপরে আগুনের ধারে তারা পাশাপাশি বসেছিল। কথাবার্তা তারা প্রায় বলেইনি। কিন্তু দুটি হৃদয়ের মধ্যে প্রেম তখন তরঙ্গভঙ্গে নেচে-নেচে চলেছিল। দু'-জোড়া ওষ্ঠাধরই তখন তৃষ্ণার্ত; বিস্তারিত হওয়ার জন্যে দু'জনের বাহু দুটিও তখন কাঁপছিল। ড্রয়িংরুমের মধ্যে একটি আলোর শিখা চারপাশে একটি প্রহেলিকার সৃষ্টি করেছিল। কথা বলতে সত্যিই তারা বড় অস্বস্তি বোধ করছিল। তবু যখন তাদের চোখাচোখি হচ্ছিল তখন তাদের হৃদয় দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

কষ্ট ক'রে যে ভব্যতাকে বেঁধে রাখা হয়, প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসের সামনে সেই বাঁধ কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে? প্রকৃতির দুর্নিবার ধাক্কার কাছে কতক্ষণ মানুষ নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারে? ধীরে-ধীরে তাদের হাতগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করল। এই যথেষ্ট। তারপরে আর তাদের ধরে রাখা গেল না। প্রবল আলিঙ্গনের মধ্যে হারিয়ে ফেলল নিজেদের।

মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হল। এর জন্যে দায়ী তার স্বামী না তার প্রেমিক বোঝা গেল না। সেই বা জানবে কেমন ক'রে? নিঃসন্দেহে এর পিতা তার প্রেমিকই।

হঠাৎ মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হল প্রসবের সময়ই সে মারা যাবে। সে বার-বার বলতে লাগল এই সন্তানটির জন্মের জন্যে যে দায়ী সেই এর ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ ভার নেবে; এর জীবনকে সম্পূর্ণ করে তুলতে কোন কিছু করতেই সে পিছ-পা হবে না—প্রয়োজন হলে অন্যায় পর্যন্ত। প্রসবের সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার মনে ওই এক চিন্তাই তোলপাড় করতে লাগল।

মেয়ের জন্ম দিয়ে সে মারা গেল।

যুবকটি দুঃখে দিশেহারা হয়ে গেল। এতটা অস্থির হয়ে উঠল যে কিছুতেই দুঃখটাকে সে ভেতরে চেপে রাখতে পারল না। মেয়েটির স্বামী হয়ত কিছু সন্দেহ করে থাকবে। হয়ত সে বুঝতে পেরেছিল এই মেয়েটি তার নয়। যাকে সে এই মেয়েটির বাবা বলে সন্দেহ করেছিল তাকে সে বাড়িতে ঢুকতে দিল না। তার কাছ থেকে মেয়েটিকে সরিয়ে একটি গোপন জায়গায় পাঠিয়ে দিল।

তারপর অনেকগুলি বছর কেটে গেল।

মানুষে যেমন সাধারণত ভুলে যায় পেয়ারি মার্টেলও সবকিছু ভুলে গেল। সে অর্থ রোজগার করে ধনী হল; কিন্তু আর কাউকেই সে ভালবাসতে পারল না। বিয়েও সে আর করল না। সুখী শান্ত সাধারণ মানুষের মতই সে দিন কাটাতে লাগল। তার মৃতা প্রেমিকার স্বামীর কাছ থেকে আর কোন সংবাদ সে পায়নি। তার মেয়েটিও যে কোথায় তাও সে জানতে পারেনি।

তারপরে প্রায় একটি অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে একদিন সে একটি চিঠি পেল। সেই চিঠিতেই সে বুঝতে পারল তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বামীটি মারা গিয়েছে। খবরটা পেয়েই সে বিব্রত হয়ে উঠল—মেয়েটার জন্যে অনুশোচনায় ভরে উঠল তার মন। মেয়েটি কোথায় রয়েছে, কেমন রয়েছে কিছুই জানে না সে। তারপরে অনুসন্ধান করে জানল মেয়েটি রয়েছে তার এক কাকীর কাছে, কাকীটি বড় দরিদ্র।

মেয়েটিকে সে দেখতে চায়, সাহায্য করতে চায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে একদিন তার কাকীর বাড়িতে হাজির হল পেয়ারি।

সে তার নাম বলল। কিন্তু সে নামের কাউকেই তারা চিনতে পারল না। পেয়ারির বয়স চল্লিশ; কিন্তু চেহারায় এখনও সে যুবকের মতই। তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। পাছে ভবিষ্যতে কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক হয় এই ভয়ে সে বলতে পারল না যে তার মায়ের সঙ্গে তার একদিন পরিচয় ছিল।

ছোট ড্রয়িংরুমে সে বসেছিল উৎকণ্ঠা নিয়ে। কিন্তু মেয়েটি যখন সামনে এসে দাঁড়াল তখন সে স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে গেল। এ কে? একি তার মেয়ে? না, সেই মৃতা নারীর আত্মা? এই মেয়েটির বয়স সেই মেয়েটিরই মত। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই রকম চুল, সেই রকম চেহারা, সেই রকম হাসি, সেই রকম স্বর, কথা বলার ধরণ। মায়া, না মতিভ্রম? যাই হোক, এই সাদৃশ্য দেখে পেয়ারি একেবারে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। মৃতা প্রেমিকার ওপরে তার সমস্ত ভালবাসা তার বুকের তটে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেল। করমর্দন করল তারা।

বাড়িতে ফিরে আসার পরে তার সেই পুরনো ক্ষতটা আবার টনটন ক'রে উঠল। উন্মাদের মত সে কাঁদল। যে নারীটি মারা গিয়েছে তার জন্যে সে দু'হাতের মাঝখানে মাথাটা ধরে কাঁদতে লাগল। তার স্মৃতি আবার ফিরে এল। সে যেসব কথা বলত, যে ভাবে বলত সবই মনে পড়ে গেল তার। সে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল। সেই দুঃখ থেকে তার আর মুক্তি নেই।

মেয়েটির বাড়িতে সে আবার গেল। তাকে না দেখে, তার মিষ্টি কথা না শুনে সে পারল না। ফল হল, তার চিন্তার মধ্যে এই দুই নারী কেমন একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বসল। একজন মৃতা, আর একজন জীবন্ত। সময়ের দুরত্ব সে ভুলে গেল; মৃত্যুর কথা সে বিস্মৃত হল। একবারও সে ভাবতে চাইল না যে—মেয়েটি সেই মেয়েটির মেয়ে। তালগোল পাকিয়ে সব একাকার হয়ে গেল। মেয়েটি যে দারিদ্র্য আর অসুবিধের মধ্যে রয়েছে সেকথা ভাবতে গিয়ে সে মেয়েটিকে আরও বেশী ভালবেসে ফেলল।

এখন সে কী করবে? টাকা দেবে? টাকা দেওয়ার অধিকার তার কী রয়েছে? সে কি তার অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে? তার নিজের বয়স তো এমন কিছু বেশী নয়? সবাই তাকে মেয়েটির প্রেমিক বলে মনে করবে। তার কি সে বিয়ে দিয়ে দেবে? চিন্তাটা হঠাৎ মনে হতেই সে কেমন ভয় পেয়ে গেল। তারপরে সে শান্ত হল। কে তাকে বিয়ে করবে? এক কপর্দকও যে তার নেই।

মেয়েটির কাকিমা তার আসা-যাওয়া লক্ষ্য করলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে সে মেয়েটির প্রেমে পড়েছে। তাহলে সে অপেক্ষা করছে কেন? সে কি তা নিজেই জানত?

একদিন সন্ধ্যায় পাশাপাশি একটি সোফার ওপরে বসে তারা ফিসফিস করে গল্প করছিল। বাবা যেমন করে তার মেয়ের হাত ধরে সে-ও সেইরকম হঠাৎ মেয়েটির হাত ধরল। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার হৃদয় আর অনুভূতি উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটি তার হাত সরিয়ে নিল না দেখে সেও জোর করে তার হাতটা সরিয়ে দিতে পারল না। কিন্তু সে দুর্বল হতে লাগল। হঠাৎ মেয়েটি তার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল কারণ তার মা তাকে যেমন ভালবাসত সেও পেয়ারিকে ঠিক তেমনি ভালবেসেছিল। তার মায়ের কাছ থেকেই সে তার এই ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী প্রবণতা লাভ করেছিল।

জ্ঞানগম্যি হারিয়ে পেয়ারি মেয়েটির সুন্দর চুলগুলির ওপরে চুমু খেল। নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে মাথাটা তুলতেই তাদের চার চোখের মিলন হল।

মাঝে-মাঝে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। তারাও উন্মাদ হয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে পেয়ারি সোজা হাঁটতে লাগল। কী করবে কিছুই সে ভেবে পেল না।

মাদাম, তখন আপনি ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে বলেছিলেন—আত্মহত্যা ছাড়া তার আর কোন পথ ছিল না।

আপনার সেই কথাটা আজও আমার মনে রয়েছে। আমি তখন প্রশ্ন করেছিলাম—আর মেয়েটি? মেয়েটিকেও কি পেয়ারির হত্যা করা উচিত ছিল?

মেয়েটিও যে তাকে পাগলের মত ভালবাসে। একটি উদ্দাম কামনা সেই অপাপবিদ্ধা নারীটিকে যে পুরুষের বুকের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল। সে এমন কাজ করল কেন? করল এই জন্যে যে তার সমস্ত সত্তায়, ধমনীর শিরায় শিরায় যে মাদকতা জেগে উঠেছিল, তাকে সে সংযত করতে পারেনি। যৌবনজলতরঙ্গকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার তখন ছিল না। ছিল না বলেই তার প্রেমিকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল সে।

পেয়ারি যদি আত্মহত্যাই করত তাহলে মেয়েটির কী হোত?...সে মারা যেত...অসম্মানের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে...হতাশায়...ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে সে মারা যেত।

সে এখন কী করবে?

মেয়েটিকে পরিত্যাগ করে তার জন্যে একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে?...তাহলে সে মরে যাবে। তার কাছ থেকে কোন টাকা না নিয়ে, আর কাউকে বিয়ে না করে, গভীর দুঃখেই সে মারা যাবে। কারণ, সে যে পেয়ারিকেই প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। পেয়ারিই তো তার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, নষ্ট করেছে তার আনন্দ, লুটে নিয়েছে বেঁচে থাকার তার সমস্ত রসদ। তারই জন্যে মেয়েটি সারা জীবন ভুগবে; শেষ পর্যন্ত সেই শোকে তার মৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে।

তাছাড়া, সে নিজেও যে মেয়েটিকে ভালবাসে। তবে সেই ভালবাসায় সে নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সে তারই মেয়ে। তা হোক। মেয়েটিকে সে তার মায়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য করেই দেখেছে। শুধু তাই নয়, মেয়েটি তার কাছে আরও অনেক বেশী। তার মনের মধ্যে দুটি ভালবাসা এক হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া, সে কি সত্যি-সত্যি তারই মেয়ে? তাতেই বা কী আসে যায়? কে তা জানে?

সেই মৃতা মহিলার আকুতি তার স্মৃতিপথে ভেসে উঠল—পেয়ারি প্রতিজ্ঞা করেছে তার সমস্ত জীবন দিয়ে সন্তানটিকে সুখে রাখবে। তার জন্যে তাকে যদি কিছু অন্যায়ও করতে হয় তাতেও সে পিছপা হবে না। সন্তানকে সুখী করাটাই হবে তার প্রথম আর প্রধান কাজ।

পেয়ারি মেয়েটিকে এত ভালবাসত যে সে আর কোনদিকে তাকাল না। যন্ত্রণায় গোঙাতে-গোঙাতে কামনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে এই অন্যায় করল; যে অন্যায় ক'রে মানুষের অন্তরাত্মা গভীর আত্মপ্রসাদে ভরে ওঠে।

তার বাবা মারা গিয়েছে। তার আর কোন সাক্ষী নেই।

সে বলল—তবে তাই হোক। গোপন পাপ আমার হৃদয়টাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিক। ও যখন কোন সন্দেহ করছে না তখন এই পাপের বোঝা আমি একাই বয়ে বেড়াব।

তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

তারা সুখী হয়েছে কিনা তা আমি জানিনে। কিন্তু মাদাম, আমি নিজেও ওই অবস্থায় পড়লে ওই কাজই করতাম।

বিধবা

A widow

দ্য বানভিলের গ্রামাঞ্চলে শিকারের মরসুম চলেছে। শরৎকালটা বৃষ্টিতে জ্যাবজ্যাব করছে। গাছে লাল পাতাগুলি পায়ের তলায় পড়ে দুমড়ে যাওয়ার পরিবর্তে প্রচণ্ড বৃষ্টির জলে পচতে শুরু করেছে। প্রায় পত্রহীন বনভূমি বাথরুমের মত স্যাঁতসেঁতে হ'য়ে উঠেছে। বিরাট-বিরাট গাছের তলা দিয়ে চলার সময় একটা ভ্যাপসা গন্ধ আপনাকে অস্থির ক'রে মারবে। এই বিরামহীন বৃষ্টির নীচে শিকারীদের নাকালের শেষ থাকত না। ভিজে জায়গায় কুকুরগুলো ল্যাজ নীচু করে শিকারের সন্ধানে বৃথাই ঘুরে বেড়াত। আর নাজেহাল হোত আঁটসাঁট পোশাক পরা যুবতী শিকারীরা। এইভাবে ক্লান্ত বিপর্যস্ত হ'য়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারা বিমর্ষ হ'য়ে ফিরে আসত।

ডিনার শেষ ক'রে রাত্রিতে তারা বিরাট হলঘরে বসে লোটো খেলত—কিন্তু খেলা তাদের মোটেই জমত না। কেউ-কেউ গল্প বলার প্রস্তাব রাখত, কিন্তু ভাল গল্প কারও মুখ থেকে বেরোত না। কোন-কোন শিকারী খরগোশ শিকারের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বলত—নতুন কোন কাহিনী আবিষ্কারের জন্যে মহিলারা মাথা কুটে সারা হ'য়ে যেত। কিন্তু মনোরম অথবা চটকদার কোন কাহিনীই কারও মাথা থেকে বেরোত না।

এ-ব্যাপারে বিশেষ জুৎ হচ্ছে না ভেবে তারা যখন গল্প শোনার চেষ্টা পরিত্যাগ করার উপক্রম করল ঠিক এমনি সময় একটি যুবতী তার অবিবাহিতা বৃদ্ধা মাসীর হাতটা নিয়ে খেলা করতে-করতে তাঁর আঙুলে ছোট একটি আংটি লক্ষ্য করল। এই বস্তুটি সে আগেও মাসীর আঙুলে দেখেছিল, কিন্তু সেটাকে আগে সে বিশেষ আমল দেয়নি। আঙুলের ওপরে আংটিটা আলতোভাবে নাড়তে-নাড়তে সে হঠাৎ বলে উঠল: আন্টি, এই আংটির গল্পটা আমাদের বল। এটাকে একটা শিশুর কেশ ব'লে মনে হচ্ছে যেন......

বৃদ্ধা মহিলাটির মুখটা হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠল; বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন তিনি; তাঁর স্বরটা কাঁপতে লাগল; তিনি বললেন: কাহিনীটি বড় করুণ; এত করুণ যে এটা বলার আগ্রহ আমার হয়নি কোনদিন। আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ আর কষ্ট ওই কাহিনীটিকেই কেন্দ্র ক'রে। আমি তখন যৌবনের সীমানায় এবং ঘটনাটি এমনই বেদনাদায়ক যে তার কথা মনে হলেই আজও আমি চোখের জল রাখতে পারিনা।

গল্পটা শোনার জন্যে সবাই উদ্গ্রীব হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রথমে বলতে রাজি হননি; তারপর সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে শুরু করলেন তিনি:

'সাঁতেজ বংশের কথা আমার কাছে প্রায়ই তোমরা শুনেছ। সেই বংশে বাতি দেওয়ার কেউ নেই আজ আর। এই বংশের শেষ তিনটি ভদ্রলোককে আমি জানি। তিন মাসের মধ্যে একইভাবে তাঁরা মারা যান। এই কেশটি শেষ বংশধরের। আমার জন্যে সে যখন আত্মহত্যা করল তখন তার বয়স তের। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে তোমাদের, তাই না?

'পৃথিবীতে একদল রয়েছে যারা অদ্ভুত রকমের মূর্খ—মূর্খতাই তাদের সৌন্দর্য—এদের আমরা মূর্খ-প্রেমিক বলি। বাপ-ঠাকুর্দা থেকে শুরু ক'রে এই বংশের সকলেই ভীষণ রকমের ভাবপ্রবণ; এই ভাবপ্রবণতার ফলে তাঁরা যেমন অনেক ভাল কাজ করেছে, তেমনি করেছে অনেক অন্যায় কাজও। তাঁদের আত্মীয় স্বজনেরা বলাবলি করতেন—ওঁরা এই সাঁতেজ-এর মতই কামাতুর।

'তাঁদের দেখলেই এই বৈশিষ্ট্যটি অনুমান করা যায়। তাঁদের চুলগুলি কোঁকড়ানো, কপাল পর্যন্ত ঝোলানো; কোঁকড়ানো দাড়ি, চোখ দুটি বড়; সেই দুটি চোখের মণি থেকে এমন চাহনি বেরিয়ে আসত যে অন্য লোকে অস্থির হ'য়ে উঠতো—কেন হোত তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারত না।

'এঁদের একজনের ঠাকুর্দা ছিলেন ভয়ানক রকমের ভাবপ্রবণ। নারীঘটিত ব্যাপারে অনেক দুঃসাহসিক কাজ তিনি করেছিলেন, দু'দশটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেও পিছিয়ে আসেন নি। সেই ঠাকুর্দা শেষ পর্যন্ত তাঁর নায়েবের মেয়ের গভীর প্রেমে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি, আমার সঙ্গে দু'জনেরই পরিচয় ছিল। মেয়েটির চেহারা ভালই; কিছুটা বিবর্ণ—হাবভাব সম্ভ্রান্ত, মিষ্টি চাহনি—কথা বলতেন বেশ মিষ্টি করে। তাঁকে দেখলে আমার ম্যাডোনার কথা মনে পড়ে যেত। বৃদ্ধ লর্ড তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁকে তিনি এত ভালবেসে ফেললেন যে তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তও তিনি থাকতে পারতেন না। তাঁর কন্যা আর পুত্রবধূ তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন। বংশের সকলেই প্রেমটাকে এত বড় ক'রে দেখতেন যে এ-ব্যাপারটা তাঁদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। কেউ যদি তাঁদের কাছে ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী বর্ণনা ক'রে প্রতিহিংসা নেওয়ার কথা ঘোষণা করত তাঁরা সবাই বলতেন—'আহা, বেচারা কত কষ্টই না পেয়েছে।' হৃদয়ঘটিত সব ব্যাপারটাকেই তাঁরা সবাই বেশ সহানুভূতির চোখে দেখতেন; এবং নায়করা যত অপরাধীই হোক না কেন তাদের সম্বন্ধে কোনদিনই তাঁরা তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলতেন না।

'এক শরৎকালে তিনি মঁসিয়ে দ্য গ্র্যাভেল নামে একটি যুবককে শিকারের জন্যে নিমন্ত্রণ করেন; সেই ছোকরা তাঁর যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গেল, মঁসিয়ে সাঁতেজ চুপচাপ রইলেন—দেখে মনে হল ব্যাপারটাকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেননি। কিন্তু একদিন সকালে সবাই আবিষ্কার করল একপাল কুকুরের ঘরে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন।

'১৮৪১ সালে তাঁর ছেলেটিও প্যারিসের একটা হোটেলে ওই একইভাবে আত্মহত্যা করেন। অপেরার একটি গায়িকা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল।

'তাঁর একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির বয়স তখন বার। আর ছিলেন ছেলেটির বিধবা মা। তিনি হচ্ছেন আমার মাসী। বার্তিলোঁ এসটেটে আমার বাবার বাড়িতে ছেলেটাকে নিয়ে তিনি বাস করতে আসেন। আমার বয়স তখন সতের।

'এই বাচ্চা ছেলেটি যে কী অদ্ভুত ধরনের অকালপক্ক ছিল তা তোমরা ভাবতে পারবে না। দেখলে মনে হবে বংশের এই শেষ সন্তানটির মধ্যে সাঁতেজ বংশের সব উত্তেজনা, সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলি একসঙ্গে বাসা বেঁধেছিল। আমাদের বাড়ি থেকে অরণ্য পর্যন্ত এলম গাছের মধ্যে দিয়ে যে পথটি বেরিয়ে গিয়েছে সেই পথটির ওপর দিয়ে সব সময় সে স্বপ্নালু চোখে ঘুরে বেড়াত। জানালা দিয়ে প্রায়ই লক্ষ্য করতাম এই ভাববিহ্বল আত্মসমাহিত ছেলেটি পেছনে দুটি হাত মুড়ে মাথা নীচু করে আপন মনে পথ দিয়ে হাঁটছে; মাঝে-মাঝে চারপাশে তাকাচ্ছে—মনে হচ্ছে এমন একটা কিছু সে অনুভব করতে চায় যা তার বয়সী ছেলেদের পক্ষে অনুভব করা কষ্টকর।

'প্রায় মাঝে-মাঝে পরিষ্কার ঝরঝরে রাত্রিতে ডিনারের পরে সে আমাকে বলত—দিদি চল; আমরা একটু বেড়াতে-বেড়াতে স্বপ্ন দেখি গে। আমরা দু'জনে পার্কের ভেতরে বেড়াতে যেতাম। মাঝে-মাঝে ফাঁকা জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়াত; চাঁদের আলোতে বনের পাতায় সূক্ষ্ম তুলোর মত যে আবরণ পড়ত—সেইদিকে একমনে তাকিয়ে থাকত সে। আমার হাত ধরে বলত: দেখ, দেখ। কিন্তু না; আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না। আমি বুঝতে পারলে তুমি সুখী হবে। ভাল ক'রে কাউকে জানতে গেলে তাকে ভালবাসতে হয়।

তার কথা শুনে হেসে আমি তাকে জড়িয়ে ধরতাম। ছেলেটা আমাকে সত্যিই বড় ভালবাসত—এতটা ভালবাসত যে আমার ভালবাসা পাওয়ার জন্যে সে মরতেও পারত।

কখনও-কখনও ডিনারের পরে আমার মায়ের কোলে বসে সে বলত—আন্টি, একটা প্রেমের গল্প বল। ঠাট্টা করে আমার মা আমাদের বংশে যত উদ্দাম প্রেমের কাহিনী আর সত্যমিথ্যায় মেশানো কিংবদন্তী রয়েছে সেগুলি তাকে শোনাতেন। পূর্বপুরুষদের অকাজগুলিই পরবর্তী পুরুষদের উত্তেজিত করত। তারাও পূর্বপুরুষদের মতই কাজ ক'রে বংশের গৌরব বাড়াতে চাইত।

এই সব কাহিনী শুনে সেই বাচ্চা ছেলেটি উত্তেজনায় সোজা হ'য়ে বসত: তারপরে হাততালি দিয়ে বলত—আমি—আমিও ভালবাসতে জানি–তাঁদের চেয়ে অনেক ভাল ক'রে জানি।

তারপরেই সে আমাকে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করল—খুব ধীরে-ধীরে ভয়ে-ভয়ে, গভীরভাবে। তার ব্যাপার দেখে আমরা হাসতাম। প্রতিদিন সকালে সে

আমার জন্যে ফুল তুলে আনত। প্রতিদিন রাত্রিতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমার হাতে চুমু খেয়ে আস্তে-আস্তে বলত—আমি তোমাকে ভালবাসি।

অপরাধিনী আমি—নিজেকে আমি খুবই অপরাধিনী মনে করছি—একদিন নয়, দু'দিন নয়—প্রতিদিন—অবিবাহিতা থেকে, অথবা, তার বাগদত্তা বিধবার বেশে—চিরদিন আমি আমার কৃতকার্যের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করছি। তার এই ছেলেমানুষীতে আমার বেশ আমোদ লাগত; আমি অনেক সময় তাকে তাতিয়ে দিতাম। এটাই ছিল আমার সময় কাটানোর একটা খেলা; আমার মা আর তার মা-ও এতে বেশ আমোদ পেতেন। বয়স্ক প্রেমিকদের সঙ্গে যুবতীরা যেরকম ছলাকলা দেখায় আমিও তার সঙ্গে সেইরকম লীলা করতাম—তাকে আদর করতাম—প্রতারণা করতাম তার সঙ্গে। এই শিশুটিকে আমি উত্তেজিত করতাম। তোমরা ভেবে দেখ, ছেলেটির বয়স তখন মাত্র বার। বাচ্চার এই শিশু প্রেমকে কে সত্যি বলে মনে করে। তার ইচ্ছেমত আমি তাকে চুমু খেতাম। এমন কি তাকে আমি প্রেমপত্রও লিখতাম। সেই পত্রগুলি আমাদের মায়েরাও পড়তেন। সেগুলির উত্তরও সে দিত—উচ্ছ্বাসভরা সেই চিঠিগুলি। সেই প্রেমপত্রগুলি এখনও আমার কাছে রয়েছে। সে নিজেকে পুরুষ মানুষ বলে ভাবত; সে ভেবেছিল আমাদের ভালবাসা তৃতীয় কেউ জানত না। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম সে সাঁতেজ বংশের ছেলে।

এইভাবে এক বছর কাটলো। তারপরে একদিন রাত্রিতে পার্কে বেড়ানোর সময় সে আমার পায়ের কাছে বসে আমার স্কার্টের উপরে চুমু খেয়ে বেশ আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বলল: আমি তোমাকে ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি। তোমাকে আমি জীবন দিয়ে ভালবাসি। যদি কোনদিন তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা কর—আমাকে ছেড়ে আর কাউকে ভালবাস তাহলে বাবা যা করেছিলেন আমিও তা-ই করব।

তারপর একটু থেমে আস্তে-আস্তে বলত—বাবা কী করেছিলেন তা তুমি জান?

তার কথা শুনে ভয়ে বুকটা আমার ধড়ফড় করে উঠত।

তারপরে সোজা হ'য়ে উঠে সে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে মিষ্টি করে আমার নাম ধরে ডাকত। তার সেই মিষ্টি ডাকে আমার দেহের ভিতর দিয়ে শিহরণের দোলা লাগত; আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বলতাম—এবার চল, ঘরে ফিরে যাই।

আর কিছু না বলে সে আমার পিছু-পিছু ফিরত। সিঁড়িতে ওঠার সময় আমাকে থামিয়ে আবার সে স্মরণ করিয়ে দিত—আমাকে ছেড়ে গেলে আমি কী করব তা তুমি জান। আত্মহত্যা করব।

আমি যে অনেকদূর এগিয়ে পড়েছি তা বুঝতে পেরেই আমি সংযত হ'য়ে গেলাম। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে সে একদিন আমাকে তিরস্কার করলে আমি বলেছিলাম—দেখ, ঠাট্টা-তামাসা করার মত বয়স তোমার আর নেই। সত্যিকার প্রেম করার মত বয়সও তোমার এখনও হয়নি। আমি অপেক্ষা করব।

ভেবেছিলাম তার হাত থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি।

শরৎকালে তাকে দূরের একটা স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। পরের গ্রীষ্মে সে যখন ফিরে এল আমার বিয়ের ব্যবস্থা তখন পাকা হ'য়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে তার এতটুকু দেরী হ'ল না। এক সপ্তাহেরও বেশী সে এমন চুপচাপ হয়ে গেল যে আমারই কেমন অস্বস্তি লাগছিল।

নয় দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম দরজার তলা দিয়ে আমার ঘরে কে একখানা ছোট চিঠি ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। পত্রটা তুলে নিয়ে পড়লাম: তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ। তুমি জান সেদিন আমি কী বলেছিলাম। তুমি আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়েছ। আমি চাইনা কেউ আমাকে দেখুক। কেবল তুমি পার্কের সেই কোণায় এস যেখানে গত বছর তোমাকে আমি আমার প্রেম নিবেদন করেছিলাম সেখানেই খুঁজলে আমাকে তুমি দেখতে পাবে।

উন্মাদিনীর মত কোনরকমে পোশাক পরে আমি সেই পার্কের নির্ধারিত জায়গার দিকে ছুটলাম। মাটির ওপরে কাদায় তার সেই ছোট স্কুলের টুপীটা পড়েছিল, আগের রাত্রিতে সারাক্ষণই বৃষ্টি পড়েছিল। চোখ তুলে তাকালাম আমি। ঝড়ের ঝাপটায় পাতার আড়ালে কী যেন একটা দুলছে মনে হ'ল আমার।

তারপরে কী যে করেছিলাম তা আমার মনে নেই। নিশ্চয় আমি চীৎকার করে মূর্ছা গিয়েছিলাম—তারপরে দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি আমি বিছানায় শুয়ে রয়েছি—মা বসে রয়েছেন আমার পাশে।

প্রথমে মনে হয়েছিল আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমি বিড়-বিড় করে জিজ্ঞাসা করলাম—ও—ও কি গোনট্রা ?

কেউ কোন উত্তর দিল না।

আমার অনুমান সত্য। সে-ই-বটে।

আমি আর তার দিকে তাকাতে সাহস করিনি। আমি কেবল তার একগাছি সুন্দর চুল চেয়েছিলাম।'

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রমহিলা বারকয়েক রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছলেন; তারপরে বললেন: কোন কারণ না দেখিয়েই বিয়েটা আমি ভেঙে দিলাম, তারপর থেকে আমি—আমি সেই তের বছরের শিশুর বিধবা স্ত্রী হ'য়ে দিন কাটাচ্ছি।

এইটুকু বলেই তিনি বুকের ওপরে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগলেন—অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে।

সবাই সে রাত্রির মত বিদায় নিলে একটি স্থূলকায় শিকারী—যে এতক্ষণ ঘুমোনোর ব্যর্থ চেষ্টায় মনে-মনে গজরাচ্ছিল—তার পাশের লোকটির কানে-কানে বলছে: অতটা ভাবপ্রবণ হওয়ার বিপদ এইখানে। তাই না ?

ছায়াময়ী

An apparition

কোন একটা মামলায় সম্পত্তি পৃথকীকরণের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছিলাম। রু দ্য গ্রেনেল-এর পুরনো বাড়িতে সন্ধ্যার সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে জটলা করছিলাম আমরা। কথা ছিল আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একটা সত্যি কাহিনী বলবে। তারপরে বিরাশি বছর বয়স্ক মার্কুই দে লা টুর স্যাময়েল দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিত স্বরে নিম্নলিখিত কাহিনীটি বললেন—

আমিও কিছু আশ্চর্য কাহিনীর কথা জানি। কাহিনীগুলি এমন অদ্ভুত যে সারা জীবন ধরে তারা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ছাপ্পান্ন বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল ; তবু এমন একটা মাসও যায়নি যে মাসে সেই কাহিনী নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখিনি। সেদিন যে ভয়টা আমি পেয়েছিলাম সেই ভয়টা আজও আমার মন থেকে অপসৃত হয়নি। পুরো দশটি মিনিট ধরে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার সামনে আমি বসেছিলাম। সেই স্মৃতিটা আজও আমার মন থেকে মুছে যায়নি। হঠাৎ কোন গোলমাল শুনলেই আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে; রাত্রির অন্ধকারে আবছা কিছু দেখলেই ভয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি। মোট কথা, রাত্রিতে আমি ভয় পাই।

ঘটনাটি আমাকে এতই ভয়বিহ্বল আর বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি; খুঁজে পাইনি বলেই সে কথা কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি। ঠিক যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল সেভাবে আমি তোমাদের কাছে বলব না। এর কোন কৈফিয়তও আমি তোমাদের দেব না। সে সময় আমি যদি উন্মাদ হয়ে না যেতাম তাহলে হয়ত ঘটনাটিকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারতাম। কিন্তু আমি প্রমাণ করব যে আমি উন্মাদ হইনি। তোমাদের যা ইচ্ছে হয় মনে করতে পার। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

১৮২৭ সাল—মাসটা হচ্ছে জুলাই। তখন আমি রাওয়েনে চাকরি করছি। একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলাম—এমন সময় একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। মনে হল, তাঁকে আমি চিনি; কিন্তু কবে আর কোথায় যে আমাদের পরিচয় হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারলাম না। স্বাভাবিকভাবেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনিও তা লক্ষ্য করলেন, তারপরে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

ভদ্রলোকটি আমার যৌবনের বন্ধু। তাঁকে একসময় আমি খুবই ভালবাসতাম। পাঁচটা বছর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। মনে হল, ক'বছরের মধ্যে তিনি পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ হ'য়ে গিয়েছেন। চুল সাদা; জীর্ণের মত তিনি কুঁজো হ'য়ে হাঁটছিলেন। আমাকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী বললেন।

একটি দুর্ভাগ্য তাঁকে একেবারে ধরাশায়ী করেছে। একটি যুবতীর প্রেমে পড়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। বছরখানেক উম্মাদের মত ভালবেসেছিল তাকে, সুখের সাগরে ভেসে দিন কাটিয়েছিলেন। তারপরে হঠাৎ হৃদ-রোগে যুবতীটি মারা যায়—খুব সম্ভবতঃ প্রেমের ব্যর্থতাও সেই মৃত্যুর জন্যে কিছুটা দায়ী ছিল। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেদিন শেষ হল সেইদিনই তিনি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন; এবং রাওয়েনে তাঁর যে নিজের বাড়ি রয়েছে সেইখানে বসবাস করতে থাকেন। সেইখানে শোকে মুহ্যমান হ'য়ে তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। মাঝে-মাঝে শোকের উচ্ছ্বাসটা তাঁর এত বেড়ে ওঠে যে আত্মহত্যার কথা চিন্তা না ক'রে তিনি পারেন না।

তিনি বলে গেলেন—তোমার সঙ্গে আবার যখন আমার দেখা হ'য়ে গেল, তখন তুমি একটা কাজ করে দাও। কাজটা খুব জরুরী। তুমি আমার পুরনো বাসায় যাও; সেখানে আমার অর্থাৎ আমাদের শোওয়ার ঘরের ডেস্ক-এ আমার কয়েকটা দরকারী কাগজ পড়ে রয়েছে। সেগুলি নিয়ে এস। জিনিসটাকে গোপন রাখার প্রয়োজন রয়েছে বলেই আমি কোন উকিল বা চাকরকে সেখানে পাঠাতে চাইনা। আমার কথা যদি বল তাহলে বলব বিশ্বের কোন কিছুর লোভেই আর আমি সেখানে যাব না। তোমাকে আমি ঘরের চাবিটা দিচ্ছি। চলে আসার সময় নিজেই আমি ঘরে তালা দিয়ে এসেছিলাম। সেই সঙ্গে দিচ্ছি ডেস্ক-এর চাবি—মালিকেও একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে-ই তোমাকে দরজা খুলে দেবে। কিন্তু কাল এস, আমার সঙ্গে প্রভাতী চা খাবে। পরের ব্যবস্থাটা আমরা তখনই ঠিক করে ফেলব।

এইটুকু সাহায্য আমি করব—এই বলে তাঁকে আমি আশ্বাস দিলাম। একটু বেড়িয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। রাওয়েন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাঁর পূর্বতন বাড়ি। ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছিল মাত্র।

পরের দিন সকাল দশটায় ব্রেকফাস্টের জন্যে আমি বন্ধুর বাসায় হাজির হলাম; দু'জনে বসে একসঙ্গেই খেলাম, কিন্তু তিনি বিশেষ কথা বললেন না। তিনি কথা না বলার জন্যে আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন—বললেন ও-বাড়ির কথা মনে হতেই আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি। পুরনো শোকটা আবার আমার উথলে উঠেছে।

তাঁকে দেখে বেশ উত্তেজিত মনে হল। মনে হল তিনি কী যেন ভাবছেন। যেন তাঁর মনের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ চলছে।

অবশেষে কী আমাকে করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাকে সব বুঝিয়ে বললেন। কাজটা খুব সহজ। ডেস্ক-এর ডান দিকের প্রথম ড্রয়ারে দুটো চিঠির প্যাকেট রয়েছে আর রয়েছে এক বাণ্ডিল কাগজ। সেই ড্রয়ারের চাবিটা আমাকে তিনি দিলেন। তিনি বললেন—চিঠিগুলির ওপরে ইচ্ছে করলে তুমি চোখ বুলাতে পার।

তাঁর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বেলা একটার সময় আমি কাজে বেরিয়ে গেলাম।

আবহাওয়াটি বড় চমৎকার ছিল। ভরতপাখির গান শুনতে-শুনতে বুকের ওপরে তরোয়ালের ঝংকার তুলে মাঠের ওপর দিয়ে মহা আনন্দে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগোতে লাগলাম। তারপরে আমি বনের মধ্যে ঢুকলাম—ঘোড়াটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম।

তাঁর পল্লীনিবাসে পৌঁছে মালির জন্যে যে চিঠিটি পকেটে ছিল সেটিকে আমি বার করলাম। অবাক হ'য়ে দেখলাম সেটার মুখ গালা দিয়ে জোড়া। শুধু চটিইনি; বিরক্ত হ'য়ে আমি ভেবেছিলাম ফিরে আসি; কিন্তু তারপরেই মনে হল—এইভাবে ফিরে গেলে নিজের ভাবাবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আমার বন্ধুটি তাঁর বর্তমান মানসিক বিপর্যয়ের জন্যেই হয়ত অন্যমনস্কভাবে চিঠিটা এঁটে দিয়েছেন; আর আমি তা লক্ষ্য করিনি।

দেখে মনে হল, প্রায় বছর কুড়ি বাড়িটি পরিত্যক্ত রয়েছে। গেট খোলা, এতটা ভাঙা যে ওই অবস্থায় ওটা যে কেমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা ভেবেই আমি আশ্চর্য হলাম। ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা বড়-বড় ঘাসে বোঝাই হ'য়ে গিয়েছে। ফুলগাছগুলিকে উঠোনের ঘাসে আর চেনা যায় না।

জানালায় জোরে ঝাঁকানি দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে একটি বুড়ো লোক বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে কেমন যেন অবাক হ'য়ে গেল। চিঠিটি পেয়ে সে পড়ল, একবার নয়, বার বার, তারপরে সেটি পকেটে ঢুকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কী চাই আপনার?

আমি ছোট্ট করে বললাম: তোমার তা জানা উচিৎ কারণ মনিবের নির্দেশ তুমি পড়েছ। আমি ঘরে ঢুকতে চাই।

কেমন যেন বিভ্রান্ত হ'য়ে গেল লোকটি—মানে আপনি......মেয়েটির ঘরে ঢুকবেন.......

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার যোগাড় হল আমার—এই...শোন...তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও?

বিভ্রান্ত হ'য়ে সে আমতা-আমতা করতে লাগল—না, তা নয় স্যার। সেই থেকে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ও-ঘরটা আর খোলা হয়নি।—আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন......আমি দেখে আসি...

আমি চটে উঠে থামিয়ে দিলাম তাকে; বললাম, কী বলতে চাচ্ছ তুমি? চাবি আমার কাছে, তুমি ঘরে ঢুকবে কী করে?

তাহলে, স্যার, আসুন।......এ ছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না তার।

বললাম, আমাকে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও। আমি নিজেই ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করব।

কিন্তু স্যার...মানে...বাস্তবিক...

এবারে আমি সত্যি-সত্যিই চটে উঠলাম; বললাম, এখন তুমি চুপ কর। বকবক করলে মজাটা বুঝতে পারবে।

এই বলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

প্রথমে আমি রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। তারপরে ঢুকলাম দু'টি ঘরে—একটি ঘরে থাকত তার চাকর, আর একটি ঘরে তার স্ত্রী। তারপরে পড়ল একটি বড় হল ঘর। সেখান থেকে উঠলাম সিঁড়িতে। তারপর বন্ধুর নির্দেশিত ঘরের দরজাটাকে চিনতে

পারলাম। দরজাটা সহজেই খুলে ফেললাম। তার পর ভেতরে ঢুকলাম। ঘরটা এত অন্ধকার ছিল যে প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পাইনি; আমি একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেকদিন ধরে ঘর বন্ধ থাকলে, বিশেষ ক'রে যে ঘরের মধ্যে কেউ মারা গিয়েছে সেইরকম ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে যেরকম একটা পচা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয় এই ঘরটির ভেতরেও সেইরকম শ্বাসরোধকারী একটা দুর্গন্ধ ছাড়ছিল। তারপরে ধীরে ধীরে অন্ধকারে আমার চোখ দুটি থিতিয়ে এল। সেই বিরাট অগোছালো শোওয়ার ঘরটি আমি বেশ ভাল করেই দেখতে পেলাম। দেখলাম, বিছানার ওপরে কোন চাদর পাতা নেই; কিন্তু তখনও একটা মাদুর পাতা রয়েছে, আর রয়েছে বালিশ। তার একটির ওপরে বেশ গভীর একটা দাগ পড়েছে, দেখলেই মনে হবে কিছুক্ষণ আগেই কেউ যেন কনুইয়ের ওপরে তার মাথাটি রেখে বিশ্রাম করছিল। চেয়ারগুলি এদিকে-ওদিকে ছড়ানো। একটা ছোট ঘর আমার চোখে পড়ল। তার দরজা অর্ধেকটা খোলা।

প্রথমেই আমি জানালার ধারে গেলাম; আলো ঢোকার জন্যে পাল্লাগুলো খুলে দিলাম। কিন্তু জানালার খড়খড়িগুলি অনেক দিন বন্ধ থাকার ফলে এমনি শক্ত হ'য়ে বসে গিয়েছিল যে সেগুলিকে কিছুতেই আমি নড়াতে পারলাম না। তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করলাম। তাতেও কিছু হল না। তারপর আমি যখন তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠলাম—এবং সেই আলোতেই মোটামুটি সবকিছু দেখতে পারছিলাম এই ভেবে খড়খড়ি খোলার চেষ্টায় আর পণ্ডশ্রম না করে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

একটা আরাম কেদারার ওপরে বসে যে ড্রয়ারটার কথা বন্ধু আমাকে বলেছিল তার ডালাটা টানলাম। ড্রয়ারটা একেবারে বোঝাই হয়ে ছিল। আমার দরকার ছিল মাত্র তিনটি কাগজের প্যাকেট। সেইগুলিই হাতড়াতে লাগলাম।

প্যাকেটগুলির ওপরের লেখাগুলি পড়ার জন্যে আমি যখন চোখ চিরে-চিরে দেখছি এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল আমার পেছনে একটা যেন খস খস শব্দ হচ্ছে। বাইরের হাওয়ায় ভেতরের কোন কাগজপত্র নড়ছে এই ভেবে প্রথমে ব্যাপারটাকে আমি কিছুমাত্র গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিনি। কিন্তু দুই-এক মিনিটের মধ্যেই আর একটা খসখসানি হ'ল; এবারে খুব কাছে—আর প্রায় অস্পষ্ট সে শব্দ। আমার চামড়ার ভিতর দিয়ে একটা অস্বস্তিকর কনকনে শিহরণ বয়ে গেল। ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা মূর্খতা হবে ভেবে একবারও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম না আমি। তখন আমি দ্বিতীয় প্যাকেটটা পেয়েছি; এবং তৃতীয় প্যাকেটটা তুলে নেওয়ার জন্যে হাত দিয়েছি এমন সময় ঠিক আমার কাঁধের ওপরে একটি দীর্ঘ আর করুণ যন্ত্রণাদায়ক নিঃশ্বাস এসে পড়ল। হঠাৎ পাগলের মত এক ঝটকায় পেছনে ঘুরেই লাফ দিলাম আমি—কয়েক ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লাফ দিয়েই তরোয়ালের মাথাটা মুঠোর মধ্যে ধরে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। সত্যি কথা বলতে কি অশরীরিটি আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এটা অনুভব করতে না পারলে কাপুরুষের মত আমি চোঁ-চোঁ দৌড় দিতাম।

কী দেখলাম! একটি মহিলা—দীর্ঘাঙ্গিনী—সাদা ধবধব করছে তার পোশাক; যে চেয়ারের ওপরে একমুহূর্ত আগে আমি বসেছিলাম সেই চেয়ারের পেছন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার সারা শরীরের ভেতরে এমন একটা কাঁপুনি ধরল যে আর একটু হলে আমি মেঝের ওপরে পড়ে যেতাম। সেই ভয়ানক আতঙ্ক যে কোনদিন অনুভব করেনি তাকে আমার অবস্থাটা বোঝানো যাবে না। অথচ, সেই আতঙ্কের পিছনে কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি। এই অবস্থায় কোন কিছু চিন্তা করার মত মানসিক অবস্থা মানুষের থাকে না; হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম করে। সারা শরীরটা স্পঞ্জের মত শিথিল হ'য়ে যায়—মনে হয় প্রাণটুকু এবারে বুঝি বেরিয়ে যাবে।

ভূত-টুতে আমি বিশ্বাস করিনা; তবু সেদিন ভূতের ভয়ে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। সেদিন সেই অশরীবী আত্মাটাকে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি যে ভয় পেয়েছিলাম ওরকম জীবনে আর কোনদিনই আমি পাইনি। সে যদি কথা না বলত তাহলে হয়ত আমি মারাই যেতাম। কিন্তু সে কথা বলল; এমন মিষ্টি সুরে বলল যে আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। একথা আমি বলতে পারব না যে নিজেকে সামলিয়ে নিতে পেরেছিলাম আমি। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করার শক্তিও যে ফিরে পেয়েছিলাম সে কথাও বলব না আমি। না, আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে কী করছি তা আমি মোটেই বুঝতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, একটা গর্ব, সৈনিকের শেষ দম্ভ নিয়ে মুখের চেহারাটাকে আমি মোটামুটিভাবে সহজ করে রাখতে পেরেছিলাম। নিজের কাছে ভূতেই হোক, অথবা কোন নারীই হোক—তার কাছে আমি যে ভয় পাইনি সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। অবশ্য পরে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম; কারণ সেই মূর্তিটি দেখার পরে, আমি তোমাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি, ওসব কথা আদৌ মনে হয়নি আমার। তখন আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

মেয়েটি বলল—করুণ কণ্ঠে বলল—স্যার, আমার জন্যে অনেক কিছু করতে পারেন আপনি।

উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু মুখে কোন কথা যোগায়নি। গলার ভেতর থেকে কেবল একটা অস্পষ্ট শব্দ তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল মাত্র।

সে বলে গেল—করবেন? আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন; নিরোগ করতে পারেন আমাকে, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে—ভীষণ, ভীষণ।—এইভাবে বলতে বলতে সে সেই চেয়ারের ওপরে বসে পড়ল। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলল—করবেন?

তখনও আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না; কেবল ঘাড় নেড়ে বললাম—হ্যাঁ, করব।

এই কথা শুনে মেয়েটি আমার সামনে কচ্ছপের খোলার একটা চিরুনী ধরে আস্তে-আস্তে বলল: আমার চুলগুলি আঁচড়িয়ে দিন। তাতেই আমার অসুখ সেরে যাবে। চুল আমার আঁচড়ে দিতেই হবে আপনাকে। আমার মাথার দিকে চেয়ে দেখুন। কী কষ্টই না পাচ্ছি। এই চুলগুলিই আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

তার চুল খোলা, লম্বা আর কালো। মনে হল চেয়ারের পেছন দিয়ে ঝুলে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। কাঁপতে-কাঁপতে সেই চিরুনীটা আমি নিলামই বা কেন, আর তার সেই লম্বা কালো চুলগুলি—যেগুলি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা ভীষণ ঠাণ্ডা কনকনে অবসাদ নেমে এল তা আমি বলতে পারব না। সেই অনুভূতিটা আজও আমার আঙুলের ডগায় লেগে রয়েছে। সেকথা মনে হলেই আজও আমি ভয়ে শিউরে উঠি।

কেমন করে তার সেই ঠাণ্ডা চুলগুলিকে সেদিন আমি আঁচড়েছিলাম তা আমি জানিনা। সেই চুলগুলি টেনে-টুনে আঁচড়ে দিয়েছিলাম আমি; ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম জট। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মাথা নীচু করেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সে বেশ আরাম পাচ্ছে। হঠাৎ সে বলে উঠল—ধন্যবাদ। তারপরে আমার হাত থেকে চিরুনীটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশের ঘরে পালিয়ে গেল। আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম পাশের ঘরের দরজাটা আধ খোলা অবস্থায় ছিল।

একা বসে রইলাম আমি। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে মানুষ যেভাবে চুপচাপ বসে থাকে বেশ কয়েক সেকেণ্ড আমিও সেইরকম চুপচাপ হতভম্বের মত বসে রইলাম। অবশেষে জ্ঞান ফিরে এল আমার। জানালার ধারে দৌড়ে গেলাম আমি; জোর করে খড়খড়িগুলো খুলে দিলাম। ঘরের মধ্যে একঝলক আলো ঢুকে এল। যে দরজা দিয়ে মেয়েটি ভিতরে ঢুকে গেল সেই দরজার সামনে হাজির হলাম। দেখলাম কপাট তার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। তাকে খোলার সাধ্য আমার নেই।

তারপর আকস্মিক একটা আতঙ্কের মত দৌড়ে পালিয়ে আসার একটা উন্মাদ বাসনা আমার ওপরে ভর করে বসল; যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা জানে এ আতঙ্ক কী জিনিস। ডেস্কের ওপরে কাগজের যে তিনটে প্যাকেট পড়েছিল সেগুলি তুলে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি, চারটে করে সিঁড়ির ধাপ এক একটা লাফে পেরিয়ে এলাম; কেমন করে যে শেষ পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে এলাম তা আমি জানিনা। ঘোড়াটা আমার একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সোজা তার ওপরে লাফিয়ে পড়ে উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

পুরো একটি ঘণ্টা ধরে আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম—সত্যিই কি আমি ভূত দেখেছি। আমার স্নায়ুগুলি দুর্বোধ্য কোন আতঙ্কে যে দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানসিক দুর্বলতার ফলেই মাঝে-মাঝে আমরা অলৌকিক বস্তু দেখতে পাই; এই অলৌকিক ঘটনার মূলে রয়েছে অতিপ্রাকৃত কোন শক্তি।

জানালার কাছে এসে আমার মনে হল হয়ত আমি অবাস্তব ছায়াই দেখেছি—। তারপরেই হঠাৎ আমার বুকের দিকে লক্ষ্য পড়ল। আমার সামরিক পোশাক চুলে ভর্তি হ'য়ে গিয়েছে। মেয়েদের লম্বা চুল—আমার গলার বোতামে আটকে রয়েছে। কাঁপতে-কাঁপতে একটি-একটি করে তুলে সেগুলি আমি বাইরে ফেলে দিলাম।

তারপরে আমি আর্দালীকে ডাকলাম। বিগত কয়েকটি ঘণ্টায় আমি এতই বিব্রত হ'য়ে ছিলাম যে তখনই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল

না। তাঁকে আমার কী বলা উচিত সে-বিষয়েও কিছু চিন্তা করার ছিল আমার। আর্দালীর হাতে বন্ধুটিকে তার চিঠিগুলি পাঠিয়ে দিলাম। বন্ধুটি সেনানীটির হাতে প্রাপ্তি স্বীকারও করেছিলেন। বিশেষ করে আমার কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাকে। সেনানীটি তাঁকে বলেছিল যে রোদে আমার মাথা ধরেছে—আমি অসুস্থ। সংবাদটা পেয়ে তাঁকে আমার সম্বন্ধে বেশ উদ্বিগ্ন হতে দেখা গিয়েছিল। পরের দিন প্রভাতে সত্য কথাটা বলার অভিপ্রায় নিয়ে আমি তাঁর বাসায় গেলাম। শুনলাম আগের দিন সন্ধেবেলাতেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন—তখনও ফেরেননি। সেদিন আবার গেলাম। তখনও তিনি ফেরেননি। এক সপ্তাহ আমি অপেক্ষা করলাম—তখনও তিনি নিরুদ্দেশ। ব্যাপারটা আমি কর্তৃপক্ষকে জানালাম। অনুসন্ধান করার জন্যে দল বেরোল; কিন্তু তাঁর কোন চিহ্ন কেউ পেল না—বা, কী ভাবে তিনি নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন সে বিষয়েও কেউ কিছু জানে না।

বন্ধুর পরিত্যক্ত সেই গ্রাম্য বাড়িটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হল। সন্দেহজনক কোন কিছুই চোখে পড়ল না। সেখানে যে কোন মহিলাকে আটকে রাখা হয়েছে তারও কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধানে কিছু পাওয়া গেল না দেখে অনুসন্ধান বন্ধ করে দেওয়া হল। পরের ছাপ্পান্ন বছর ধরে আর কিছু শুনিনি আমি। আমি আগেও যা জানতাম আজও তাই জানি—তার বেশী নয়।

আমাদের চিঠি

Our letters

রাত্রিতে ট্রেনযাত্রীরা কেউ-কেউ ঘুমোয়, কেউ-কেউ অনিদ্রায় ভোগে। আমার কথা যদি বলেন, ট্রেনে চাপলেই পরের দিন আমার ঘুম হবে না।

অ্যাবেল এসটেটে যখন আমি পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে। বাড়িটি মুরেত দ্য আর্টাসদের। ওঁরা আমার বন্ধু। ওইখানেই তিন সপ্তাহ কাটানোর জন্যে আমি গিয়েছিলাম। বাড়িটি বড় সুন্দর। গত শতাব্দীর শেষে ওদেরই পূর্ব পুরুষরা ওই বাড়িটি তৈরী করিয়েছিলেন। তারপর থেকে বাড়িটিতে তাঁদের সংসারের ছেলেমেয়েরাই বাস করেন। সেইজন্যেই এটির পরিবেশ অত্যন্ত ঘরোয়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে মানুষের বাস করার স্পর্শ ছড়িয়ে রয়েছে, জড়িয়ে রয়েছে পরিষ্কার করার প্রয়াস। একই বাড়ির মানুষেরা এ ঘর সাজিয়েছে, গুছিয়েছে, সরগরম করে রেখেছে। কিছুই এর পরিবর্তন হয়নি। কোন আত্মাই এ-বাড়ির চৌহদ্দি থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়নি। একটি আসবাবও এ ঘর থেকে সরে যায়নি, পর্দাগুলি বিবর্ণ অবস্থায় দেওয়ালের

একই জায়গায় ঝুলছে। নতুন আসবাব আসার ফলে পুরনোগুলি নতুন আত্মীয়দের স্থান করে দেওয়ার জন্যে একটু সরে দাঁড়িয়েছে মাত্র। মনে হবে, ভাই-বোনদের মধ্যে নতুন একটি শিশুর আবির্ভাব হয়েছে।

একটা পার্কের মাঝখানে পাহাড়ের ওপরে বাড়িটি। পাহাড়টা ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমে গিয়েছে। যেখানে নদীর সঙ্গে মিশেছে সেখানে ছোট একটা পাথরের সেতু। নদীর ওপাশে দূরে বিরাট মাঠ। সেখানে ভিজে ঘাসের বনে গরুগুলো ধীরে সুস্থে ঘাস খায়, পায়চারি করে। এই বাড়িটি আমার বেশ ভাল লাগে। খুব আনন্দের সঙ্গেই প্রতিটি শরৎকালে আমি এখানে আসি। ফিরে যাওয়ার সময় কষ্ট পাই।

ডিনার শেষ হওয়ার পরে প্রিয় বন্ধু পল মুরেতকে জিজ্ঞাসা করলাম: এ বছর কোন্ ঘরে আমাকে শুতে দেবে?

আন্ট রোজের ঘরে।

এক ঘণ্টা করে দুটি দীর্ঘাঙ্গিনী কন্যা আর বিরাট বপু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে মাদাম মুরেত আমাকে আন্ট রোজের ঘরে পৌঁছে দিলেন। এ-ঘরে আগে কোনদিন আমি ঘুমোইনি।

সবাই চলে গেলে ঘরটির সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার জন্যে আমি দেওয়াল আর আসবাবপত্রগুলি পরীক্ষা করলাম। এই ঘরে আগে দু' একবারের বেশী আমি ঢুকিনি। সেই জন্যে এর সঙ্গে পরিচয়টা আমার খুব বেশী ছিল না। রঙীন খড়ি দিয়ে আঁকা আন্ট রোজের যে প্রতিকৃতিটি ছিল তার দিকেও বিশেষ অবহেলার সঙ্গেই তাকিয়ে রইলাম। তাঁর নাম থেকেই ঘরের নাম হয়েছে।

আন্ট রোজের বয়স অনেক; চুলগুলি কোঁকড়ানো, চশমার ভেতর থেকে তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু সে-চাহনি আমার মনের ওপরে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, দেখে মনে হল তিনি প্রাচীনপন্থী মহিলা; এঁদের নীতি আর অনুজ্ঞা ধর্মীয় এবং চারিত্রিক নীতির মতই গোঁড়া, এঁকে দেখলেই আমার সেই সব বৃদ্ধা আন্টদের কথা মনে পড়ে যায় যাঁরা সংসারের সমস্ত রকম আনন্দ আর উচ্ছ্বাসকে শিথিল-ভ্রূকুটি দিয়ে নষ্ট করে দেন, যৌবনের আগুন ভিজে কম্বল দিয়ে নিবিয়ে দেন।

তাঁর সম্বন্ধে কারও কাছ থেকে কিছু শুনিনি। তাঁর জীবন অথবা মৃত্যু কোন বিষয়েই আমি কিছু জানিনা। তিনি কি এই শতাব্দীর মানুষ অথবা আগের শতাব্দীর? তিনি কি আর পাঁচজনের মত সহজভাবেই দেহত্যাগ করেছেন, অথবা, তাঁর জীবন ছিল উদ্দাম। তিনি কি পবিত্র অবিবাহিতা নারী হিসাবেই স্বর্গে গিয়েছেন? অথবা, বিবাহিতা মহিলার শান্ত আত্মা নিয়েই তিনি মারা গিয়েছেন; অথবা মাতৃহৃদয়ের কোমল প্রাণ ছিল তাঁর? আর তাতে তফাতটাই বা কী রয়েছে? 'আন্ট রোজ'—এই নামটাই কেমন যেন হাস্যকর শুনতে, অতি সাধারণ, আর কুৎসিত।

আমি একটা বাতি তুলে নিয়ে সোনার ফ্রেমে ঝোলানো আন্ট রোজের রূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুখের ওপরে বিশেষ কিছু দেখার ছিল না অথবা, মুখটা

খারাপই লাগল আমার—দেখে মনে হল, তার মধ্যে করুণার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তাই আমি আসবাবপত্রগুলি দেখতে লাগলাম। অতি প্রাচীনকালের আসবাব—সেই ষষ্ঠ লুই-এর আমলের। তারপর থেকে নতুন একটা চেয়ার অথবা পর্দা—কিছুই এ ঘরে ঢোকেনি। এদের মধ্যে থেকে একটি ক্ষীণ আর তীক্ষ্ণ গন্ধ বেরিয়ে আসছিল—সেই গন্ধ হচ্ছে কাঠ, পোশাক, চেয়ার, টেবিল, পর্দা—সব মিশিয়ে; সেই সঙ্গে এতদিন যারা এ ঘরে বাস করত, ভালবাসত, এবং দুঃখ পেত—তাদের গায়ের মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে।

বাতিটা নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়লাম; কিন্তু ঘুম এল না। দু' এক ঘণ্টা এপাশ ওপাশ ক'রে আমি ঠিক করলাম বিছানা থেকে উঠে দু'একখানা চিঠি লিখে ফেলি। দুটো নালার মাঝখানে একটা ছোট মেহ্গনি ডেস্ক ছিল। কালি আর একটু কাগজের খোঁজে আমি সেই ডেস্ক-এর ডালাটা একটু তুললাম। কিন্তু বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না—একটা খাগের কলম ছাড়া—তার একটা পাশ চিবনো। ডেস্কটাকে আমি বন্ধ করতে যাব এমন সময় হঠাৎ একটা চকচকে জিনিসের ওপরে আমার চোখ পড়ে গেল। মনে হল একটা পেরেকের হলদে মাথার মত, ট্রের একটা কোণে একটু উঁচু হ'য়ে রয়েছে। আঙুল দিয়ে তার মাথাটা খুঁটতেই মনে হল সেই যেন ঘুরছে। দুটো নখের ভেতরে ধরে সেটাকে আমি জোরে টান দিলাম। আস্তে-আস্তে সেটা বেরিয়ে এল। এটা একটা লম্বা পিন—কাঠের মধ্যে ঢোকানো ছিল। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে এটা একটা পিন।

হঠাৎ এখানে পিন কেন? কিন্তু তখনই আমার মনে হল হয়ত এর ভেতরে গোপন কোন ড্রয়ার রয়েছে। সেটার কোন স্প্রিং এটা দিয়ে খোলা যাবে। সেটাই খুঁজতে লাগলাম আমি। অনেক দেরী হল—প্রায় ঘণ্টা দুই চেষ্টার পরে প্রথম গর্তটির ঠিক উলটো দিকে, কিন্তু কাঠের খাঁজের একেবারে তলায় আর একটা ফুটো রয়েছে। এর ভেতরে আলপিনটা ঢুকিয়ে চাপ দিতেই আমার মুখের সামনে একটা ডালা তড়াং করে লাফিয়ে উঠল। সেই খোপের ভেতরে দু' প্যাকেট হলদে চিঠি দেখতে পেলাম। একটা নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা রয়েছে সেগুলি।

আমি সেগুলি পড়লাম। এখানে দু'টি আমি পড়ছি:

"তাহলে তুমি চিঠিগুলি ফিরে পেতে চাও—তাই না প্রিয়তম? তাই পাঠালাম; কিন্তু পাঠাতে বেশ কষ্ট হয়েছে আমার। কিসের ভয় করেছিলে তুমি? হারিয়ে ফেলব? কিন্তু ওগুলি আমি চাবি দিয়ে রেখেছিলাম; সেগুলি খোয়া যাবে বলে কি ভয় হয়েছিল তোমার? ওগুলি আমার সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন, ওগুলি যাতে খোয়া না যায় সেদিক থেকে সতর্ক ছিলাম আমি।

হ্যাঁ, খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার। এর জন্যে মনে-মনে তুমি কোন অনুশোচনা করছ কিনা অবাক হয়ে সেই কথাটাই আমি ভাবছি। আমাকে ভালবাসার জন্য অনুশোচনা নয়—কারণ আমি জানি তুমি আজও আমাকে ভালবাস, অনুশোচনা হচ্ছে এই কারণে যে সাদা কাগজে কলমের মুখ দিয়ে যে ভালবাসা তুমি প্রকাশ করেছ তা তুমি আমার

সামনে বিশ্বাস ক'রে প্রকাশ করতে পারনি। ভালবাসলে মুখোমুখী কথা বলে অথবা লিখে সেই ভালবাসা প্রকাশ করতে হয়। আমরা তাই করে থাকি। ভালবাসার কথাগুলি সঙ্গীতের মত মিষ্টি। সেই বায়বীয়, নরম, উষ্ণ আর হালকা কথাগুলি বলার সঙ্গে-সঙ্গেই উড়ে যায়—পড়ে থাকে কেবল স্মৃতিটুকু; কিন্তু তোমার হাতে লেখা শব্দের মত কেউ তাকে না পারে দেখতে, না পারে স্পর্শ করতে, না পারে চুমু খেতে। তোমার চিঠি? হ্যাঁ, সেগুলি আমি ফিরিয়েই দিচ্ছি। কিন্তু কী দুঃখে!

তুমি যা বলেছ তা মোছা যাবে না। দ্বিতীয় চিন্তায় তুমি নিশ্চয় এই কাজের জন্যে লজ্জিত হয়েছ। তোমার ভীরু স্পর্শকাতর মনের অন্তঃস্থলে নিঃসন্দেহে তুমি আঘাত পেয়েছ এই ভেবে যে, যে লোকটি তোমাকে ভালবাসে তাকেই তুমি চরম আঘাত করেছ। তুমি যে কথাগুলি লিখেছিলে নিশ্চয় তা তোমার মনে রয়েছে। তুমি তখন নিজের মনেই বলেছিলে: সেই কথাগুলিকে আমি পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

সন্তুষ্ট হও এবার। শান্ত হও এই তোমার চিঠি নাও। আমি তোমাকে ভালবাসি।

"প্রিয় বন্ধু,

না, তুমি আমাকে বুঝতে পারনি, ধরতে পারনি আমার কথা। তোমাকে আমি যে ভালবাসার কথা শুনিয়েছি তার জন্যে আমি কোন অনুশোচনা করিনি—করবও না কোনদিন। আমি সব সময় তোমাকে চিঠি দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু পড়ার পরেই সেগুলি তুমি অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে আমাকে।

প্রিয়তম, এর কারণটা কী তোমাকে যদি বলি তাহলে তুমি আঘাত পাবে। তুমি যা মনে করেছ—এর মধ্যে কবিত্ব কিছু নেই; রয়েছে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয়। আমি ভয় পাই—তোমাকে নয়—কোন দুর্যোগকে। অপরাধিনী আমি নিজে। আমি চাইনা সেই অপরাধের বোঝা আর কাউকে বইতে হয়।

আমাকে ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি আর আমি দু'জনেই মারা যাব। তুমি রোজ ঘোড়ায় চড়; ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে পার তুমি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে হঠাৎ আক্রান্ত হতে পার, হৃদ্‌যন্ত্র ঘটিত অসুখে মারা যেতে পার তুমি, গাড়ির দুর্ঘটনাতেও মারা যাওয়ার সম্ভাবনা তোমার রয়েছে। হাজার রকমে তোমার মৃত্যু হতে পারে। কারণ, মানুষের মৃত্যু যদিও একবারই আসে আমরা যত দিন বেঁচে থাকি তবু তারচেয়েও বেশী পথ দিয়ে মৃত্যু আসতে পারে।

তখন তোমার বোনেরা, তোমার ভাই, অথবা ভাই-এর বৌ-এর হাতে আমার লেখা চিঠিগুলি পড়তে পারে। তোমার কি মনে হয় তারা আমাকে পছন্দ করে? সেবিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। ধরে নিলাম তারা আমাকে পছন্দই করে। কিন্তু তাহলেও দুটি মহিলা আর একটি পুরুষের পক্ষে এই গোপন জিনিস সত্ত্বেও তা বাইরে প্রকাশ না করা কি সম্ভব?

প্রথমেই তোমার মৃত্যুর কথা বলে পরে তোমার আত্মীয়দের বিচক্ষণতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে মনে হয় আমি ভয়ানক রকমের অন্যায় কথাই বলছি। কিন্তু আমরা সবাই কি মারা যাব না?—কেউ দু'দিন আগে; কেউ দু'দিন পরে। আর

আমাদের মধ্যে একজন যে আগে মারা যাবে সে-সম্বন্ধেও আমাদের কোন সন্দেহ নেই। সবরকম বিপদের কথাই আমাদের আগে থাকতে ভেবে রাখতে হবে। এমন কি ওই মৃত্যুর সম্ভাবনাটা পর্যন্ত। আমার কথা যদি বল, আমি চিঠিগুলি আমার কাছেই রাখব—আমার ছোট একটা গোপন ড্রয়ার রয়েছে সেখানে। কবরখানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকা দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার মত প্রেমের কথায় আর ভাবে বিভোর হয়ে সিল্কের ফিতেতে বাঁধা চিঠিগুলি তাদের গোপন গুহায় ঘুমোচ্ছে—তোমাকে আমি তা দেখাব।

তুমি আমাকে বলবে: তুমি যদি আগে মারা যাও তাহলে ওই চিঠিগুলি তোমার স্বামীর হাতে গিয়ে পড়বে।

না, না। সে-ভয় আমি করিনা। প্রথমত আমার এই গোপন ড্রয়ারটির কথা তিনি জানেন না—এবং জানারও চেষ্টা করবেন না। আর আমার মৃত্যুর পরে এগুলি যদি তাঁর চোখেও পড়ে তাতেও আমার কোন ভয় নেই। মৃতা কোন মহিলার ড্রয়ারে কতগুলি প্রেমপত্র রয়েছে তা কি তুমি কোনদিন দেখতে চেয়েছ? বেশকিছুদিন ধরেই ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা করেছি; আর সেই জন্যেই আমার চিঠিগুলি তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার কথা আমি স্থির করে ফেলেছি।

মনে রেখ, যে-চিঠিতে নারীকে কেউ ভালবাসার কথা জানায় সেই চিঠি সে কোনদিনই পোড়ায় না, ছিঁড়ে ফেলে না, নষ্ট করে না। ভালবাসাই তো হচ্ছে আমাদের সারা জীবন, সমস্ত আশা, আকাঙ্খা, আর স্বপ্ন। এই সব ছোট-ছোট কাগজে যেখানে আমাদের আদর করে কিছু লেখা হয় সেইগুলিই তো আমাদের স্মৃতিচিহ্ন, এবং আমাদের—মহিলাদের গির্জা রয়েছে—সেখানে প্রেমিকরা আমাদের সেণ্ট বলে পূজা করে। প্রেমমাত্রই আমাদের সৌন্দর্য, লাবণ্য, আমাদের মনোমুগ্ধকারী চটুলতা আর দম্ভ বিস্তারের ক্ষেত্র, আমাদের হৃদয়ের ধন। কোন নারী এই গোপনকাহিনী নষ্ট করতে পারে না; কারণ ওগুলিই হচ্ছে আমাদের জীবনের কারুকার্য।

কিন্তু আর সকলের মতই আমরাও মারা যাব, এবং তারপর...তারপর এই চিঠিগুলি লোকের চোখে পড়বে। কে খুঁজে পাবে? স্বামী? খুঁজে পেয়ে তিনি কী করবেন? কিছু না—পুড়িয়ে ফেলবেন।

এ-বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি আমি। একবার ভেবে দেখ অপরের ভালবাসা নিয়ে প্রতিদিনই নারীরা মারা যাচ্ছে। প্রতিদিনই সেই সব নারীদের অপরাধের দলিল স্বামীদের হাতে পড়ছে; আর তার জন্যে বাইরে তাদের কোন কুৎসা রটে না—দ্বন্দ্বযুদ্ধ তো নয়ই।

প্রিয়তম, পুরুষদের হৃদয় যে কী দিয়ে গড়া সেকথা একবার ভেবে দেখ। জীবন্ত নারীদের ওপরেই পুরুষরা প্রতিহিংসা নেয়। কোন পুরুষ প্রেমিকাকে অপমান করলে তার প্রেমিক সেই অপমানকারীর সঙ্গে লড়াই করে। প্রেমিকা বেঁচে থাকতেই সে করে আত্মহত্যা—কারণ—কেন বলত? ঠিক কেন তা আমি জানিনা। কিন্তু সেই প্রেমিকার মৃত্যুর পরে সেই পুরুষ যদি একই রকমের প্রমাণ পায় তাহলে সে সেগুলিকে

হাসতে-হাসতে গল্প করতে-করতে অসংখ্য মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে—মদ খাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যে আমি থিয়েটারে গেলাম। সেখানে এত আলো যে অবসন্ন হ'য়ে পড়লাম আমি। আলোর ঝলকানি সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এলাম। হাজির হলাম ক্যাম্পস-এলিসিতে। সেখানে ফাঁকা জায়গায় কনসার্ট বসেছে। মনে হল যেন গাছের ডালগুলি সব দাউ-দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রিক বাল্বগুলিকে দেখে মনে হল উজ্জ্বল চাঁদগুলি ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে; মনে হল চাঁদের ডিম তারা। বিশ্রী গ্যাসের বিভিন্ন রঙের আলোতে মনে হল যেন বিরাট-বিরাট জীবন্ত মুক্তোবিন্দু আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে।

দীর্ঘ এবং অদ্ভুত সুন্দর রাজপথের দিকে তাকিয়ে দেখার জন্যে আমি আর্ক দ্য ট্রায়োমফের নিচে দাঁড়ালাম। আগুন আর নক্ষত্রের সারির মধ্যে দিয়ে এই রাজপথটি সোজা প্যারিসের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। তারপরে হাজির হলাম বয় দ্য বোলোন-এ। আমি অনেকক্ষণ রইলাম। এইখানে একটা নাম-না-জানা চঞ্চলতা আমাকে গ্রাস করে ফেলল—একটি অভূতপূর্ব উত্তেজনা—মনে হল, ভেতরের উত্তেজনায় আমি উন্মাদ হ'য়ে যাব। আমি হাঁটতে লাগলাম। তারপরে ফিরলাম। তারপরে আবার কখন আর্ক দ্য ট্রায়োমফেতে ফিরে এলাম তা আমি বলতে পারব না। সময়ের কোন জ্ঞান ছিল না আমার। সারা শহর তখন ঘুমোচ্ছে; আর বিরাট-বিরাট কালো মেঘ আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই প্রথম আমার মনে হল ভয়ঙ্কর কিছু একটা আজ ঘটবে।

খুব শীত-শীত করছিল। আমার প্রিয় রাত্রির ওপরে, আমার হৃদয়ের ওপরে বাতাস ভারি হ'য়ে চেপে-চেপে বসছিল। জনশূন্য রাজপথ। একটা ঘোড়ার গাড়ির পাশ দিয়ে দুটি নিঃসঙ্গ পুলিশ হেঁটে যাচ্ছিল; 'হাল'-এর দিকে চলেছিল সারিবন্দী হয়ে অনেকগুলি সব্জীর গাড়ি—নিঃশব্দে অন্ধকারে। তাদের গ্যাসের লণ্ঠন নিবু-নিবু হয়ে উঠেছিল। গাজর, শালগম আর কফিতে বোঝাই ছিল গাড়িগুলি। ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। গাড়োয়ানরা ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ঘোড়াগুলি স্বাধীনভাবে কোনরকম শব্দ না করেই এগিয়ে যাচ্ছিল ধীরে-ধীরে। মাঝে-মাঝে রাস্তার বাতিস্তম্ভগুলি পেরিয়ে যাওয়ার সময় আলো পড়ে সব্জীগুলি চিকচিক করে উঠছিল। তাদের পিছু-পিছু কিছুটা গিয়ে আমি রু অ্যালএর দিকে ঘুরলাম—তারপরে ফিরে এলাম বুলেভার্ডে। পথঘাট নির্জন—কোন কাফেই খোলা নেই। কেবল কিছু পথচারী রাত হয়ে যাওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে। এইরকম মৃত আর পরিত্যক্ত প্যারিস কোনদিনই আমার চোখে পড়েনি। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো বাজে।

একটা শক্তি আমাকে যেন টেনে নিয়ে চলেছিল। ব্যাস্টিন পর্যন্ত তাই আমি এগিয়ে গেলাম। সেখানেই বুঝতে পারলাম এত অন্ধকার রাত্রি জীবনে আমি দেখিনি; কারণ, কোলোন·দ্য জিলেটকেও আমি দেখতে পারছিলাম না। ওখানকার সোনার জিনিয়াস মূর্তিটিও দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি। আশেপাশে একটা লোকও চোখে পড়ল না আমার। একটা মাতাল আমার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল; তারপরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ

ধরে তার স্খলিত পদের অবিন্যস্ত পদধ্বনি আমি শুনতে পেলাম। আমি চলতে লাগলাম। ফবর্গ মন্তমার্ত্রির ওপরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেলাম। সেটা সীন নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। গাড়োয়ানকে আমি ডাকলাম—কিন্তু আমার কথা কানেই তুলল না সে। রু দ্রুয়োতের কাছে একটা বারবণিতা দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। আর কেউ কোথাও নেই—আর কোন শব্দ নেই কোনখানে; ভদেভিল থিয়েটারের সামনে একটা ভিখারীর সঙ্গে দেখা হল। পুচকে একটা লণ্ঠন নিয়ে সে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ক'টা বাজে বন্ধু?

সে গজগজ করে বলল, কী করে জানব? আমার হাতে কোন ঘড়ি নেই।

তারপর হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম সব আলো নিভে গিয়েছে। আমি জানতাম ব্যয় সঙ্কোচের জন্যে বছরের এই সময়টায় তাড়াতাড়ি রাস্তার আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দিনের আলো আসতে এখনও অনেক—অনেক দেরী।

মনে-মনে বললাম: চল, এখন 'হাল'-এর দিকে যাই। সেখানে জীবন্ত মানুষের কিছু সন্ধান পেতে পারি।

সেদিকে এগিয়ে গেলাম; কিন্তু বড় অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বনের মধ্যে দিয়ে লোকে যেমন করে পথ চলে আমিও সেইভাবে অতি সন্তর্পণে রাস্তা গুণে-গুণে এগোতে লাগলাম। ক্রেডট ল্যায়োনের কাছে একটা কুকুর চীৎকার করে উঠল। খানিকটা পিছন ফিরলাম আমি; তারপরেই গুলিয়ে ফেললাম পথ। আবার অন্ধকারে ঘুরতে লাগলাম। সারা প্যারিস শহরই যেন মরণ ঘুমে ঘুমোচ্ছে। দূরে একটা—মাত্র একটা—ঘোড়ার গাড়ির ক্যাচক্যাচানি শোনা গেল। সম্ভবত এটার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই আমার দেখা হয়েছিল। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃতবৎ নির্জন পথের ওপর দিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম আমি। আবার পথ হারিয়ে ফেললাম। আমি কোথায়? এইভাবে রাস্তার সব আলো নিভিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয়? একটা লোকও রাস্তায় নেই—একেবারে নির্জন, নিরালা পথ। একটা চোরও নেই—কামুক কোন বেড়ালের ডাকও শুনতে পেলাম না। কিছু না, কিছু না।

মনে মনে বললাম: পুলিশই বা কোথায়? জোরে চেঁচাই। তাহলে নিশ্চয় তাদের সাড়া পাওয়া যাবে।

এই ভেবে চীৎকার করলাম। না, কেউ কোথাও নেই। আরও জোরে চীৎকার করলাম। কারও কোন সাড়া নেই। কোন প্রতিধ্বনিও শুনতে পেলাম না। সেই দুর্ভেদ্য রাত্রির অন্ধকারে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। ব্যাকুল হয়ে আমি আবার চীৎকার করে উঠলাম—সাহায্য কর, সাহায্য কর। আমার সেই আর্তনাদে কেউ সাড়া দিল না। ক'টা বাজে। ঘড়িটা টেনে নিলাম। কিন্তু আমার কাছে কোন দেশলাই ছিল না। একটু অদ্ভুত আর অপরিচিত আনন্দে ঘড়িটা টিকটিক করতে লাগল। মনে হল ওটা জীবন্ত। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজেকে আর একা মনে হল না আমার। কী অদ্ভুত! সেই অন্ধকারে লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে আমি এগোতে লাগলাম। দিনের আলো ফুটে উঠতে আর কত দেরী দেখার জন্যে মাঝে-মাঝে আমি আকাশের দিকে

যাচ্ছি। মা তো কেঁদেই আকুল। এই সব কষ্টকর বিদায় অনুষ্ঠান থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে আমার স্বামী আমাকে তাড়াতাড়ি বার ক'রে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। সুখী হলেও, আমার চোখেও তখন জল ঝরছিল। এর কারণটা আমি জানিনা, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কে যেন পেছন থেকে আমাকে টানছে। ঘুরে চেয়ে দেখি আমার কুকুর বিজো। তার কথা সকাল থেকে আমার মনেই ছিল না। বেচারা তার নিজের মত ক'রে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে। আমার খুব কষ্ট হল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চুমু খেতে লাগলাম।

আর বিজো-ও তখন আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে। সে আমার গায়ে মুখ ঘষতে লাগল, গালে থাবা মারতে লাগল, চাটতে লাগল আমার সর্বাঙ্গ। হঠাৎ আমার নাকটা ধরে বাচ্চা কুকুরটা তার দুটো দাঁত বসিয়ে দিল। খুব লেগে গেল আমার। চীৎকার করে উঠলাম আমি। চীৎকার করেই কুকুরটাকে মাটিতে নামিয়ে দিলাম। খেলার ছলে সত্যি সে আমাকে জোরে কামড়ে দিয়েছে। সবাই তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এল, নিয়ে এল ভিনিগার আর ব্যাণ্ডেজ। আমার স্বামী নিজেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যে এগিয়ে এলেন। ব্যাপারটা এমন একটা কিছু নয়। সূঁচ ফোটালে যেমন ফুটকি পড়ে এ-ও অনেকটা সেইরকম দুটো ফুটকি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রক্ত বন্ধ হ'য়ে গেল। বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

আমরা ঠিক করেছিলাম নরম্যানডিতে ছ' সপ্তাহ বেড়াব।

সন্ধের দিকে আমরা ডিপিতে পৌঁছলাম। সন্ধে অর্থে মাঝ রাতে। তুমি জান সমুদ্রকে আমার খুব ভাল লাগে। স্বামীকে বললাম সমুদ্র না দেখে আমি ঘুমোতে যাব না। প্রস্তাবটা শুনে তিনি তো অবাক! আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

না, তা নয়। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি যে একা থাকতে চাই সেটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ?

অবাক হয়ে গেলাম আমি—আমার সঙ্গে একা? কিন্তু প্যারিস থেকে সারা পথটাই তো ট্রেনে আমরা ছিলাম।

তিনি হাসলেন—হ্যাঁ, তা বটে...ট্রেনে একা থাকা আর দু'জনে ঘরের ভেতরে একা থাকা এক কথা নয়।

আমি রাজি হলাম না, বললাম: বেশ সমুদ্রের তীরে দু'জনে আমরা একা থাকব—চল।

আমার কথা শুনে নিশ্চয় তিনি খুশি হলেন না; তবুও বললেন, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন চল।

কী সুন্দর অপূর্ব রাত্রি। এমন রাত্রিতে মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন অস্পষ্ট, বিরাট অনুভূতিতে ভরে যায়; মনে হয় দুটি ডানা মেলে সে অসীম শূন্যে উড়ে যাবে। গোটা আকাশটাকেই জড়িয়ে ধরবে বুকের মধ্যে। আর কী যে সে করবে তা আমি জানিনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস এমন রাত্রিতেই মানুষ বিশ্বের রহস্য বোঝার কাছাকাছি

এসে পড়ে। বাতাসে স্বপ্নের জাল; রোমান্স আমাদের হৃদয়কে গুঁড়িয়ে দেয়। চাঁদ, নক্ষত্র, আর চঞ্চল জলরাশির ভেতর থেকে একটা স্বর্গীয় মাদকতা উঠে আমাদের উন্মাদ করে তোলে। এদের চেয়ে শুভ মুহূর্ত মানুষের জীবনে আর নেই।

আমার স্বামী কিন্তু ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার কী ঠাণ্ডা লাগছে? তাহলে, ওইখানে যে নৌকোটা বাঁধা রয়েছে. তার দিকে তাকিয়ে দেখ। মনে হচ্ছে, জলের ওপরে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর চেয়ে সুন্দর জায়গা আর আমরা পাব না; পাব কি? সকাল না হওয়া পর্যন্ত এখানে আমি বসে থাকতে পারি। আচ্ছা বলত, তোমার কি তা ভাল লাগে না?

তিনি ভাবলেন আমি ঠাট্টা করছি। এই ভেবে জোর করে টেনে আমাকে তিনি হোটেলে নিয়ে এলেন। তখন আমি কি জানতাম ওর পেটে এত দুষ্টুমি ছিল?

ঘরের মধ্যে দু'জনে ঢোকার পরেই আমার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। বিশ্বাস কর, কী জানি কেন আমার বড় অস্বস্তি লাগছিল। শেষকালে আমি তাঁকে বসার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হায় বন্ধু, কী করে বোঝাব তোমাকে? কিন্তু ব্যাপারটা এই। আমার নির্ভেজাল অজ্ঞতাকে তিনি লজ্জা বলে ভেবেছিলেন; আমার চরম সরলতাকে তিনি লাম্পট্য বলে মনে করেছিলেন; আমার অকৃত্রিম স্বাধীনতা তিনি ভেবেছিলেন মহিলাদের ছলনা বলে। ফলে এই জাতীয় গোপন যৌন রহস্য প্রকাশ করার জন্য অনভিজ্ঞতা এবং অপ্রস্তুত নারীর কাছে যে সঙ্কোচ আর কোমলতা দেখাতে হয় তার ব্যবহারে ঠিক সেই রকম সূচিতা দেখা যায়নি।

হঠাৎ আমার মনে হল তাঁর মাথাটি বিগড়ে গিয়েছে। আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?

সঙ্গে-সঙ্গে, ভীষণ ভয়ঙ্কর রকমের দুশ্চিন্তা আমাকে গ্রাস করে ফেলল। যেসব যুবতীরা দুষ্ট লোকদের বিয়ে ক'রে বিপদে পড়ে তাদের করুণ কাহিনী খবরের কাগজে ছাপা হয়। সেই সব কাহিনী আমার মনে পড়ে গেল। আমি কি এই মানুষটিকে চিনতাম। ভয়ে উন্মাদ হ'য়ে উঠলাম আমি। ধস্তাধস্তি করে সরিয়ে দিলাম তাঁকে। এমন কি হাতে ক'রে তাঁর একমুঠো চুল ছিঁড়ে ফেললাম! ছিঁড়ে ফেললাম তাঁর গোঁফের একটা পাশ। এই করে ছাড়া পেলাম আমি। বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে চীৎকার করলাম—বাঁচাও, বাঁচাও। দরজার কাছে দৌড়ে গেলাম, দরজা খুলে বাইরে থেকে হুড়কো টেনে দিলাম, তারপরে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়ে গেলাম সিঁড়ির কাছে।

অন্য ঘরের দরজাগুলি খুলে গেল। নাইট শার্ট পরে লণ্ঠন হাতে নিয়ে পুরুষরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তাদের একজনের বুকের মধ্যে ঢুকে আমি বললাম—আমাকে বাঁচান। সেই লোকটি আমার স্বামীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তারপরে কী হল তা আমার মনে নেই। তাঁরা চীৎকার করতে-করতে মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলেন। তারপরে হো-হো করে হেসে উঠলেন। এরকম উচ্চগ্রামের হাসি আর কোনদিনই আমি শুনিনি জীবনে। সারা বাড়িটা হেসে কুটিকুটি। বারান্দায় সবাই জোরে-জোরে হাসতে লাগল। সেই শব্দ কানে এল আমার, শোওয়ার ঘরগুলিতেও

যে কী রকম তা তোমাকে কী বলব? সন্ধের দিকে স্বামীকে লুকিয়ে আমি গির্জায় হাজির হলাম। অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করলাম সেখানে।

ফিরে আসার সময় মনে হল নাকে আবার যন্ত্রণা হচ্ছে। একটা ডাক্তারখানায় হাজির হলাম। ডাক্তারকে বললাম—আমার একটি বন্ধুকে কুকুরে কামড়িয়েছে। কী করব বলুন। কী করা উচিৎ সেকথা তিনি আমাকে বলেছিলেন; কিন্তু আমার মনটা তখন এতই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল যে তিনি কী বলেছিলেন তা আমি একেবারে ভুলে গেলাম। বন্ধুকে দেওয়ার অজুহাতে কয়েক বোতল ওষুধ আমি কিনলাম; কিন্তু কী ওষুধ কিনলাম—তা আমি স্মরণ করতে পারছিনা।

রাস্তার কুকুর দেখলে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠতাম; দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার একটা অদ্ভুত আকাঙ্খা আমাকে গ্রাস করে ফেলত। মাঝে-মাঝে মনে হোত তাদের আমি কামড়িয়ে দিই। রাত্রিতে আমি ঘুমোতে পারলাম না। অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলাম। আমার স্বামী সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। সকাল হ'তেই মায়ের চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন বিজো ভালই আছে। কিন্তু রেলে করে একলা তাকে পাঠানো একটু বিপজ্জনক। সেই জন্যে তাঁরা তাকে পাঠাবেন না। তাহলে সে মারা গিয়েছে!

এরপরে আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। হেনরী মনের আনন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। কয়েকবার অবশ্য সে জেগে উঠল; কিন্তু অবসাদে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলাম।

পরের দিন আমি সমুদ্রে স্নান করলাম। এত শীত লাগছিল যে জলে নেমে আমার মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। কনকনে ঠাণ্ডার জন্যে আমার শরীর অবশ হয়ে উঠছিল; কাঁপছিল আমার পা দুটো; কিন্তু সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণা হচ্ছিল নাকে।

স্থানীয় একজন মেডিকেল ইনস্‌পেক্টরের সঙ্গে আমার আলাপ হল। ভদ্রলোকটি বেশ চমৎকার। বুদ্ধি ক'রে ঘুরিয়ে অত্যন্ত সাবধানে তাঁর কাছে ব্যাপারটা বললাম আমি। তারপরে তাঁকে বললাম, কয়েকদিন আগে আমার বাচ্চা কুকুরটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে, জায়গাটা ফুলে উঠলে কী করব সে কথাটা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি হেসে বললেন, আপনার বিষয়ে, মাদাম, আমি একটি কথাই বলতে পারি। সেটি হচ্ছে অপারেশন।

কথাটা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না দেখে তিনি আবার বললেন: সে কাজটা আপনার স্বামীর।

তাঁর কথার বিন্দুবিসর্গ আমার মাথায় ঢুকল না।

সেদিন সন্ধের সময় হেনরীকে স্ফূর্তি করতে দেখা গেল। সন্ধের দিকে ক্যাসিনোতে গেলাম আমরা। কিন্তু অভিনয় শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসার কথা বলতেই আমি রাজি হয়ে গেলাম। বাইরে থাকতে একটুও ভাল লাগছিল না আমার।

কিন্তু সুস্থির হয়ে বিছানায় আমি শুয়ে থাকতে পারছিলাম না। আমার সারা শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আসছিল। তারও ঘুমানোর কোন লক্ষণ দেখলাম না। সে

আমাকে জড়িয়ে ধরল, আদর করল। মনে হল আমি যে কষ্ট পাচ্ছি তা সে যেন বুঝতে পেরেছে। তার আসল উদ্দেশ্যটা কী তা বুঝতে না পেরে—অথবা, সে কথা গ্রাহ্য না করেই—আমি শুয়ে-শুয়ে তার আদর খেতে লাগলাম।

হঠাৎ দারুণ একটা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। সে যে কী ভীষণ যন্ত্রণা তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। চীৎকার করে উঠলাম আমি। হেনরী আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে দু'হাতে ঠেলে ফেলে মেঝের ওপরে লাফিয়ে পড়লাম, তারপরে কপাটের ওপরে মুখ চেপে কাঁদতে লাগলাম। আমি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলাম।

ব্যাপারটা কী বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গেল হেনরী। আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল কী হয়েছে আমার। কোন উত্তর দিলাম না আমি। সহ্য বা কিছু চিন্তা করার মত শক্তি তখন আমার ছিল না। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম আমি। আমি জানতাম কিছুক্ষণ বিরতির পরে আবার এই উত্তেজনা দেখা দেবে। তারপর আর একটা, তারপরে শেষ উত্তেজনা, তারপরেই মৃত্যু।

সে আমাকে বিছানার ওপরে শুইয়ে দিল। ভোর হয়-হয় এমন সময় হেনরী আবার বাঁদরামি শুরু করল। আবার সেই উত্তেজনা দেখা দিল আমার। শরীর কাঁপতে লাগল। এবারে উত্তেজনাটা অনেকক্ষণ ধরে রয়ে গেল। আমার মনে হল সব ভেঙে, ছিঁড়ে, কেটে-কুটে, কামড়ে শেষ ক'রে ফেলি। ভয়ঙ্কর সে যন্ত্রণা, এত বিশ্রী যে ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল আমার।

সকাল আটটার সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। গত চারদিনের মধ্যে সে-ই আমার প্রথম ঘুম।

এগারটার সময় একটি বহুপরিচিত প্রিয় স্বর শুনে আমি জেগে উঠলাম। মা এসেছেন। আমার চিঠি পেয়ে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছেন আমাকে দেখতে। তাঁর কোলে বেশ বড় একটা ঝুড়ি। হঠাৎ শুনতে পেলাম সেই ঝুড়ির ভিতর থেকে কুকুর ডাকছে। ডালা খুলে ফেললাম আমি। সঙ্গে-সঙ্গে বিজো আমার বিছানার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। তারপরে আনন্দের চোটে আমাকে আদর করতে লাগল, গা চাটতে লাগল, বিছানার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত গড়াগড়ি দিতে সুরু করল।

একেই বলে কল্পনা......অথবা দুশ্চিন্তা। এই বস্তুটি মানুষের কত ক্ষতি করে বুঝতে পার। আমি কী ভেবে নিয়েছিলাম বলত? কী বোকামি করেছি আমি?

বুঝতেই পারছ, সেই চারটি দিন কী মানসিক যন্ত্রণাই না ভোগ করেছিলাম আমি। সেই যন্ত্রণার কথা কাউকেই আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি। আমার স্বামী যদি জানতে পারতেন?

বেশ গরম থাকায় মেয়েটি একটা শ্যেমিজ আর ছোট পেটিকোট ছাড়া আর সব খুলে ফেলেছিল। সেই অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় সে জামাগুলি ক্লিপ খুলে-খুলে টেনে তুলছিল বলেই তার দেহের বেশ কিছুটা অনাবৃত অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল।

সেই বাঁধের পাশে এক ঘণ্টারও বেশী সে গুঁড়ি দিয়ে বসে রইল—মেয়েটি চলে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ। তারপরে সে ফিরে গেল ঘরে; কিন্তু মেয়েটির চিন্তা আরও গভীরভাবে তাকে গ্রাস করে ফেলল। প্রায় এক মাস ধরে তার মনটা মেয়েটির চিন্তায় সরগরম হয়ে রইল। তার কাছে কেউ মেয়েটির কথা বললেই তার সারা সত্তা শিরশির করে উঠত। খাওয়া-দাওয়ায় রুচি ছিল না তার। ঘুমোতে-ঘুমোতে সে জেগে উঠত; প্রতিটি রাত্রিতেই ঘামে ভিজে যেত তার দেহ—ছটফট করত সে। রবিবার দিন উপাসনার সময় গির্জার ভেতরে বসে সারাক্ষণই সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকত; মেয়েটি তা লক্ষ্য করে হাসত।

একদিন সন্ধ্যায় দু'জনের হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। তাকে আসতে দেখে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল। একটা আতঙ্ক আর সঙ্কোচ তাকে দুর্বল করে তুললেও সে ঠিক করে ফেলেছিল আজ সে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবেই। আমতা-আমতা ক'রে বলল, শোন শোন; এভাবে আর চলছে না।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল: কী চলছে না?

মনে হল মেয়েটি তাকে উপহাস করছে।

সে বলল: তোমার কথা দিনের মধ্যে চব্বিশটি ঘণ্টা আমি চিন্তা করি। মানে, না ক'রে পারি না।

কোমরের ওপরে দু'টি হাত রেখে মেয়েটি বলল, তার জন্যে আমার দায়িত্ব কতটুকু? আমি কি আপনাকে চিন্তা করতে বলেছি?

আমতা-আমতা করে উত্তর দিল সে: করেছ বই কি! আমি না পারি খেতে, না পারি শুতে, না পারি ঘুমোতে।

মেয়েটি মিষ্টি করে বলল, তাই বুঝি? তাহলে রোগটা সারবে কেমন করে জানতে পারি কি?

কথাটা শুনে সে অবাক হয়ে গেল—অবশ হয়ে গেল তার হাত পা, চিন্তা করার শক্তি। সেই সুযোগে মেয়েটা তার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

পরদিন থেকে আবার তাদের বাঁধের ধারে দেখা হতে লাগল, সেই সংকীর্ণ পথের ধারে; ঝোপের ধারে—সন্ধের সময় মাঠের ধারে বেশী—যখন সে মাঠ থেকে ছাগলগুলি তাড়িয়ে নিয়ে আসত—আর মেয়েটি ফিরত তার গরু নিয়ে।

মেয়েটির সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে তার মন কেমন আকুলি-বিকুলি করে উঠত। বেনয়েস্টের মনে হোত মেয়েটিকে সে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একেবারে দম বন্ধ করে মেরে ফেলে। কিন্তু মেয়েটিকে সে একান্ত নিজস্ব করে পায়নি। এই না-পাওয়ার বেদনায় সে অসহায়ের ব্যর্থ আক্রোশে ফুলে-ফুলে মরত। তাদের নিয়ে চারপাশে কানাঘুষা শুরু হল; সবাই ভেবেছিল তাদের বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছে। সত্যি

বলতে কি একদিন সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি আমাকে বিয়ে করবে? মেয়েটি বলেছিল—করব। সব ঠিক করেছিল তারা। বাকি ছিল কেবল বাড়িতে জানানোর ব্যাপারটা। তারই জন্যে তারা সুযোগ খুঁজছিল।

তারপর হঠাৎ একদিন যথাসময়ে মেয়েটি আর এল না। সে যে আসবে না সেকথা তাকে সে আগের দিনও বলেনি। মেয়েটি গোলার চারপাশে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও বেনয়েস্ট তাকে দেখতে পেল না। রবিবার দিন উপাসনা করার পরেও তাকে দেখা গেল না। তারপরে এক রবিবার পাদরী তাঁর মণ্ডপ থেকে ঘোষণা করলেন যে ভিক্টর-অ্যালিয়েড মার্টিন-এর সঙ্গে জোসেপিন-ইসিডোর ভার্লির বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়েছে।

বেনয়েস্টের হাতের পেশীতে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা জেগে উঠল। মনে হল তার শিরাগুলি রক্তহীন হয়ে গিয়েছে। তার কান দুটো ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। কিছুই কানে ঢুকলো না তার। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই বুঝতে পারল সে কাঁদছে।

মাসখানেক সে আর ঘর থেকে বেরোয়নি। তারপরে আবার সে যথারীতি কাজকর্ম শুরু করল। কিন্তু চিন্তার হাত থেকে সে একেবারে মুক্তি পেল না। মেয়েটির কথা ক্রমাগত ভাবতে লাগল। মেয়েটি যে বাড়িতে থাকত সেই বাড়ির পাশের রাস্তাটি সে এড়িয়ে চলত; যদিও তার ফলে সকাল সন্ধ্যায় অনেকটা পথ তাকে বেশী হাঁটতে হোত।

মেয়েটি যাকে বিয়ে করেছে ও-অঞ্চলে সে লোকটি ছিল সবচেয়ে ধনী চাষী। ছেলেবেলা থেকে বেনয়েস্ট-এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। এখন আর তার সঙ্গে কথা বলে না।

গাঁয়ের পথে হাঁটতে-হাঁটতে একদিন সন্ধ্যায় শুনল মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে। সংবাদটা শুনে সে দুঃখে মুষড়ে পড়েনি; বরং সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেবেছিল—এই ভাল হল। এখন সব শেষ হয়ে গেল। মনে মনে এই রকমই কিছু একটা চাইছিল সে।

মাসের পর মাস কেটে গেল। দেহের মধ্যে একটা বোঝা নিয়ে ধীরে ধীরে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যেতে মেয়েটিকে কয়েকবার সে দেখেছিল। তাকে দেখে মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে মুখ নীচু ক'রে তার গতি বাড়িয়ে দিত, আর সে-ও পাছে মুখোমুখি পড়তে হয় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি অন্য পথে ঘুরে যেত। কিন্তু তার কেমন যেন মনে হোত, একদিন-না-একদিন তাকে মেয়েটির মুখোমুখী হতেই হবে। কথাটা ভেবে সে রীতিমত অস্বস্তি ভোগ করত। সেদিন তো মেয়েটির সঙ্গে তাকে কথা বলতেই হবে। একদিন সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, তাকে আবেগভরে চুমু খেয়েছিল; তারপরে এখন সে তার সঙ্গে কথা বলবে কেমন ক'রে? প্রতিজ্ঞা ক'রেও অন্য কাউকে বিয়ে করাটা তার অন্যায় হয়েছে।

একটু-একটু করে সে সহজ হয়ে এল; পড়ে রইল একটু স্মৃতি মাত্র। তার পরে একদিন মেয়েটির বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে আবার সে যাচ্ছিল। কাছাকাছি আসার অনেক আগে থেকেই মেয়েটির ঘরের চাল তার নজরে পড়ল। এই বাড়িতেই সে আর একটি মানুষের সঙ্গে বাস করছে। আপেল গাছে ফুল ফুটছে, গোয়াল ঘর থেকে মোরগ ডাকছে। কেউ বাড়িতে নেই। বসন্তের ফসল কাটতে সবাই এখন মাঠে। কুকুরটা তার ঘরের সামনে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে; তিনটে বাছুর ধীরে-ধীরে পুকুর ঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে। একটা মোরগ তার পালক মেলে মুরগীর পালের ভেতরে অভিনেতার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বেনয়েস্ট দাঁড়াল। কান্নার একটা প্রচণ্ড আবেগ হঠাৎ তাকে অভিভূত করে ফেলল, কিন্তু হঠাৎ সে একটা আর্তনাদ শুনতে পেল—'বাঁচাও, বাঁচাও'। আর্তনাদটা ঘরের ভিতর থেকেই আসছিল। সেই কাঠের খুঁটিটাকে শক্ত করে ধরে হতভম্ব হয়ে সে আর্তনাদ শুনতে লাগল। আবার একটা আর্তনাদ। তার সারা সত্তার ওপরে সেই আর্তনাদ সূচের মত বিঁধতে লাগল। সেই মেয়েটিই কাঁদছে। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল সে; ঘাসের বন পেরিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল; দেখল মেয়েটি মেঝের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠছে; চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে মেয়েটি।

বিবর্ণ হয়ে সে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, তারপরে আমতা-আমতা করে বলল, এই যে, এই যে আমি এসে গিয়েছি।

হাঁপাতে-হাঁপাতে মেয়েটি বলল—আমায় ছেড়ে যেয়ো না, ছেড়ে যেয়ো না, বেনয়েস্ট।

আর কী বলা উচিত বা কী করা উচিত তা বুঝতে না পেরে বেনয়েস্ট তার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি যন্ত্রণায় আবার চীৎকার করে উঠল—ওঃ, মরে গেলাম, মরে গেলাম বেনয়েস্ট।

যন্ত্রণায় আবার সে কুঁকড়ে উঠতে লাগল।

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না বেনয়েস্ট; মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্যে, মেয়েটির যন্ত্রণা কমানোর জন্যে হঠাৎ সে উন্মত্ত হয়ে উঠল। নীচু হয়ে বসে দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে নিল, বিছানায় শুইয়ে দিল তাকে। যন্ত্রণায় তখনও মেয়েটি গোঙাচ্ছে। সে তার পোশাক খুলতে লাগল, বক্ষআবরণী, স্কার্ট, পেটিকোট সব খুলে দিল। চীৎকার না করার জন্যে মেয়েটি হাত মুঠো ক'রে কামড়াতে লাগল। বেনয়েস্ট গরু, ঘোড়া, আর ছাগলদের প্রসব করানোর জন্যে যে পদ্ধতি গ্রহণ করে এখানেও সেই পদ্ধতি গ্রহণ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বেশ স্বাস্থ্যবান শিশু কাঁদতে-কাঁদতে তার দুটি হাতের ওপরে বেরিয়ে এল। তারপরে শিশুটির উপযুক্ত ব্যবস্থা করে, সে মায়ের কাছে ফিরে এল।

বেনয়েস্ট মেয়েটিকে মেঝেতে নামিয়ে দিল; বিছানা পরিষ্কার ক'রে আবার তার ওপরে শুইয়ে দিল তাকে। মেয়েটি কোনরকমে বলল, বেনয়েস্ট ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! তোমার দয়ার শরীর।

চোখ দিয়ে তার দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

বেনয়েস্ট কিন্তু তখন নির্বিকার। তার মন থেকে সব ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কেন, কী ক'রে তা সে জানে না। গত একটি ঘণ্টায় যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করল তাতেই তার ভালবাসা উবে গেল; দশ বছরের অদর্শন এতটা ম্যাজিকের মত কাজ করতে পারত না।

ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল: কী হল? ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে। ভারি সুন্দর মেয়ে।

কয়েক মুহূর্তের বিরতি নেমে এল। তারপরে মেয়েটি বলল, আমাকে একবার দেখাও।

বেনয়েস্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে মেয়েটির কাছে দিতে যাবে এমন সময় দরজা খুলে গেল; ভেতরে ঢুকে এল ইসিডোর ভার্লি।

ব্যাপারটা কী প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারল না; তারপরে হঠাৎ বুঝতে পারল সব।

বিভ্রান্ত হয়ে বেনয়েস্ট বলল, আমি এই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—এমন সময় ওর আর্তনাদ শুনলাম...আর্তনাদ শুনেই ভেতরে ঢুকে এলাম আমি...এটা তোমারই বাচ্চা ভার্লি।

স্বামীটির চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে; ঝুঁকে প'ড়ে বাচ্চাটা সে কোলে তুলে নিল; চুমু খেল তাকে। ভাবাবেগে মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে; তারপরে বাচ্চাটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সে বেনয়েস্টের দিকে দুটো হাত প্রসারিত করে বলল, ওখানেই রেখে দাও, বেনয়েস্ট। এখন আমাদের আর কিছু বলার নেই। তোমার আপত্তি না থাকলে আবার আমরা বন্ধু হব।

বেনয়েস্ট উত্তর দিল—আমি রাজি—নিশ্চয় রাজি।

এক রাত্রির আনন্দ

One Night's Entertainment

সার্জেন্ট-মেজর ভারাজু তাঁর বোন মাদাম প্যাদোই-এর সঙ্গে দেখা করার জন্যে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছিলেন। ভারাজু তখন রেনের সৈন্যশিবিরে থাকতেন। স্ফূর্তি করতে-করতে নিজেও তিনি কপর্দকহীন হয়ে পড়েছিলেন—বাড়িতেও তাঁর সুনাম

নষ্ট হয়েছিল যথেষ্ট। সেইজন্যে তিনি তাঁর বোনকে লিখেছিলেন যে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে তিনি তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে আসবেন। তিনি যে মাদাম প্যাদোইকে ভালবাসতেন তা নয়, আর তারই ফলে হয়ত তিনি ক্যাট-ক্যাট করে কথা বলতেন। কিন্তু ভারাজুর বড় অর্থাভাব চলছিল; এবং প্যাদোইরাই তাঁর একমাত্র আত্মীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়েন যাঁদের কাছ থেকে তখনও পর্যন্ত তিনি কোন ট্যাক্স আদায় করার সুযোগ পান নি।

সিনিয়র ভারাজু অ্যানজার্সে ব্যবসা করতেন; তাঁর পেশা ছিল উদ্যান-পালন বিদ্যায় অপরকে জ্ঞান দেওয়া। ব্যবসা থেকে অবসর নেওয়ার পরে তিনি তাঁর এই লক্ষ্মীছাড়া সন্তানটিকে একটি পয়সাও দেননি; কেবল তাই নয়, বছর দুই পর্যন্ত তার মুখদর্শনও করেননি। তাঁর মেয়েটি বিয়ে করেন ভূতপূর্ব ব্যাঙ্কের কেরাণী প্যাদোইকে। বর্তমানে তিনি ভ্যানের ট্যাকস্ কালেকটর।

ভারাজু ট্রেনে চেপে তার ভগ্নীপতির বাড়িতে হাজির হলেন। ভগ্নীপতিকে তিনি অফিসে পেলেন—সেইখানে পাশের গ্রাম থেকে আগত কয়েকজন ব্রিটন চাষীদের কী একটা বিষয় নিয়ে তিনি গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই প্যাদোই দাঁড়িয়ে উঠে একগাদা ফাইলপত্রের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। আস্তে-আস্তে বললেন, বস, এক মিনিট। তারপরেই তোমার সঙ্গে কথা বলব।

এই বলে তিনি বসে পড়লেন; তারপরে পূর্ব আলোচনায় ফিরে গেলেন। চাষীরা তাঁর কথা বুঝতে পারছিল না; তিনি পারেছিলেন না তাদের কথা বুঝতে; আর মাঝখানে যে কেরাণীটি দোভাষীর কাজ করছিল তার অবস্থা আরও সঙ্গীন। দু'পক্ষের ভাষাই তার কাছে সমান দুর্বোধ্য ছিল।

অনেকক্ষণ ধরে ভারাজু তাঁর ভগ্নীপতির কার্যকলাপ লক্ষ্য করে ভাবলেন—একটি আস্ত গর্দভ।

প্যাদোই-এর বয়স নিশ্চয় পঞ্চাশের কম নয়; লম্বা, রোগা, লোমশ, অস্থিময়, অতিমাত্রায় বাঁকানো ভুরু; মাথায় একটি ভেলভেট ক্যাপ; দৃষ্টিটা ব্যবহারের মতই তাঁর নরম। কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম সবেতেই তাঁর ওই নরম মেজাজ। ভারাজু মনে-মনে তাঁর সেই পূর্ব মন্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করলেন: একটি আস্ত গাধা।

তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত স্ফূর্তিবাজ। মদ আর মেয়েমানুষের মত বড় ধরনের আনন্দ তাঁর আর কিছু ছিল না। এ দুটি জিনিস ছাড়া আর কিছু বুঝতেনও না তিনি। মদ্যপ আর দাম্ভিক হওয়ার ফলে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বড় অজ্ঞও ছিলেন; সেই অজ্ঞতার শিখর থেকে প্রতিটি মানুষকেই তিনি অবজ্ঞা করতেন। কাউকে প্রশংসা করতে গেলে তিনি বলতেন, গোল্লায় যাও! তুমি সত্যিই একটি ভাঁড়।

চাষীদের বিদায় দিয়ে প্যাদোই শেষকালে শ্যালককে নিয়ে পড়লেন: ভাল তো সব?

দেখতেই পাচ্ছ খুব খারাপ নয়। তোমাদের খবর কী?

মোটামুটি ভালই। ধন্যবাদ। তুমি যে মনে করে আমাদের দেখতে এসেছ এতেই আমি আনন্দিত।

তোমাদের এখানে আসার ইচ্ছে অনেকদিনই আমার ছিল; কিন্তু বুঝতেই পারছ, সামরিক চাকরিতে ইচ্ছে করলেও মানুষ অনেককিছুই করতে পারে না।

না, না। সেকথা অবশ্যই আমি জানি। তবু, তুমি যে আসতে পেরেছ এতেই তোমার বদান্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

জোসেপিন ভাল আছে?

হ্যাঁ। ধন্যবাদ। এখনই তাকে দেখতে পাবে তুমি।

কোথায় সে?

একটু বেরিয়েছে। এখানে আমাদের পরিচিতের সংখ্যা অনেক কিনা। শহরেও বেশ বাছা-বাছা লোক বাস করেন।

আমিও সেদিক থেকে নিশ্চিত।

কিন্তু দরজা খুলে গেল। মাদাম প্যাদোই ভেতরে ঢুকে এলেন। ভাইকে দেখে তিনি যে বেশ অনন্দ পেয়েছেন তা মনে হল না। তবু চুমু খাওয়ার জন্যে ভাই-এর মুখের কাছে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, অনেকক্ষণ এসেছ?

না। আধ ঘণ্টাটাক হবে।

তাই বুঝি! ভেবেছিলাম, ট্রেন আসতে দেরী হবে। ড্রয়িংরুমে এস।

তাঁরা দু'জনে ড্রয়িংরুমে হাজির হতেই মাদাম বললেন, তোমার সম্বন্ধে সুন্দর-সুন্দর কাহিনী শুনতে পাচ্ছি।

যথা?

মনে হচ্ছে, তুমি বেশ জঘন্য জীবন যাপন করছ। মদ খেয়ে-খেয়ে দেনা বাড়াচ্ছ কেবল।

কথাটা শুনে যেন ভীষণ অবাক হয়েছেন এইরকম একটা ভঙ্গী করে তিনি বললেন, কখনও না, কখনও না।

অস্বীকার করো না। আমি খুব ভালই জানি।

আত্মরক্ষার্থে আর একবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু মাদাম এমন দুর্দান্তভাবে তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন যে বাধ্য হয়েই ভারাজু চুপ করে রইলেন। বকা শেষ করে মাদাম বললেন—ছ'টার সময় আমরা ডিনার খাব। সেই সময় পর্যন্ত তোমার ছুটি। আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। সেইজন্যে তোমাকে আমি সঙ্গ দিতে পারব না এখন।

ছাড়া পেয়ে, ঘুমোবেন না বেড়াতে যাবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না তিনি। যে দরজা দিয়ে তাঁর ঘরে ঢোকা যায় একবার তিনি সেইদিকে তাকালেন; আর একবার তাকালেন রাস্তার দিকে। তারপরে তিনি রাস্তায় বেরোনোর মনস্থ করলেন।

সুতরাং তিনি রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন, ধীরে-ধীরে এগোতে লাগলেন। তাঁর কোষবদ্ধ তরোয়ালটা পায়ে লেগে ঝনঝন শব্দ করতে লাগল। এই শহর ব্রিটন—ধূ-ধূ করছে, রুক্ষ, ঘুমন্ত, অনেকটা জীবন্মৃতের মত। ধূসর রঙের ছোট-ছোট বাড়িগুলির দিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, দেখলেন দু'চারজন পথচারীদের; আর তাকালেন জনশূন্য

বিপণির দিকে; তারপরে বিরক্ত হ'য়ে বিড়বিড় করলেন: হতচ্ছাড়া জায়গা, এই ভ্যানে। এমন একটা রদ্দি জায়গাতে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে।

বিষণ্ন মনে হাজির হলেন তিনি, তারপরে পরিত্যক্ত বুলেভার্ডের পাশ দিয়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরলেন বাড়িতে। ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে লম্বা একটা ঘুম দিলেন সেই ছ'টা পর্যন্ত।

দরজায় টোকা পড়ল—ডিনার তৈরী, স্যার।

নিচে নেমে এলেন ভারাজু। ডাইনিং-রুমটা ভিজে স্যাঁতসেঁতে, দেওয়ালগুলির নিচের অংশ থেকে চূণবালি সব ঝরে পড়েছে। খাবার টেবিলের ওপরে কোন ঢাকা নেই। তারই ওপরে একগামলা সুপ; আর তার সঙ্গে তিনটে প্লেট সাজানো রয়েছে। মঁসিয়ে আর মাদামও সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলেন।

সবাই খেতে বসলেন। খাওয়া শুরু করার আগে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পাকস্থলীর ওপরে ক্রশের ভঙ্গিতে হাত দুটি করে খেতে শুরু করলেন। সুপ শেষ হওয়ার পরে গরুর মাংস এল। বেশী সেদ্ধ হওয়ার ফলে একেবারে গলে গিয়েছে। সার্জেন্ট-মেজর ধীরে-ধীরে চিবোতে লাগলেন; খাবারের ছিরি দেখে বিরক্তি, অবসাদ আর রাগে ফেটে পড়লেন তিনি।

মাদাম স্বামীকে বলছিলেন: আজ রাত্রিতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা রয়েছে না?

হ্যাঁ।

বেশী রাত করো না। কোথাও গেলেই আজকাল তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়। খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে তোমার বাইরে বেরোনো উচিৎ নয়।

তারপরে এল আলুর তরকারি, ঠাণ্ডা সসেজ; চিজ দিয়ে ডিনার-পর্ব সমাপ্ত হল। কফি নেই।

ভারাজু বুঝতে পেরেছিলেন সন্ধেটা জেনের সঙ্গে একাই কাটাতে হবে তাঁকে। এই কাটানোর অর্থ হচ্ছে বোনের গুচ্ছের গালাগালি খাওয়া। এক-আধ গ্লাস মদ পেলেও না হয় গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু সে-সম্ভাবনাও না থাকায় তিনি ঠিক করলেন একটু বাইরে বেরিয়ে পড়বেন। তিনি মাদামকে বললেন—তাঁর কাগজপত্র ঠিক-ঠাক করার জন্যে এখনই একবার পুলিশ ফাঁড়িতে যেতে হবে তাঁকে। এই বলেই তাড়াতাড়ি তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সন্ধে তখন সাতটা।

পুকুর থেকে স্নান করে কুকুর যেমন গা-ঝাড়া দেয় রাস্তায় বেরিয়ে তিনিও তেমনি গা-ঝাড়া দিলেন। বাবা, কী নোংরা জায়গা।

কাফের সন্ধানে তিনি বেরিয়ে পড়লেন—শুধু কাফে হলেই হবে না, হতে হবে একটা ভাল কাফে। শেষ পর্যন্ত ভাল কাফেই বেরোল একটা। ভেতরে পাঁচ ছ'জন কনুই-এর উপরে ভর দিয়ে মদ খেতে-খেতে বেশ শান্তভাবে গল্প করছিল। দেখে মনে হয় বেশ অবস্থাপন্ন ব্যবসাদার তারা। দু'জন বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় টেবিলের দিকে গেল এগিয়ে। খেলার ফলাফল জোরে-জোরে ঘোষিত হচ্ছিল: আঠার, উনিশ, না

কপালে নেই। বাঃ, বাঃ, চমৎকার মার! সাবাস! এগার। লালটা থেকে তোমার পয়েণ্টটা নেওয়া উচিত ছিল। কুড়ি......চালাও, চালাও।

ভারাজু অর্ডার দিলেন—কফি; আর খুব ভাল ব্র্যান্ডি।

তারপরে পানীয় আসার অপেক্ষায় চুপচাপ বসে রইলেন তিনি।

অবসর সময়টা তিনি এতদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হইচই করে সিগারেট ফুঁকে কাটিয়ে দিতেন। এই জায়গাটার নিস্তব্ধতা তাঁর অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। প্রথমে তিনি কফি খেলেন; তারপরে ব্র্যান্ডির বোতলটা টেনে নিলেন। প্রথম বোতল নিঃশেষ হওয়ায় তারপরে দ্বিতীয় বোতলে দিলেন টান। এখন তিনি হাসতে পারেন, চীৎকার করতে পারেন, গান করতে পারেন; যুদ্ধও করতে পারেন কারও সঙ্গে।

তিনি বললেন, ভগবানকে ধন্যবাদ। ভারাজু এখন স্বস্থানে ফিরে এসেছে।

তারপরে স্ফূর্তি করার জন্যে কোন মেয়েমানুষ সংগ্রহ করার কথা মনে হল তার। ওয়েটারকে ডাকলেন তিনি: ওহে ছোকরা।

বলুন স্যার।

এখানে স্ফূর্তি করার কোন জায়গা আছে কিনা বলতে পার?

তাঁর প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে লোকটা হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

জানিনে স্যার। এখানে?

এখানে মানে কী? স্ফূর্তি করা বলতে কী বোঝ তুমি?

জানিনা স্যার। এক গ্লাস ভাল বিয়ার মদ বা খাওয়া?

বোকা কোথাকার! মেয়েমানুষ!

মেয়েমানুষ!! আ!!!

হ্যাঁ; মেয়েমানুষ। এখানে কোথায় পাওয়া যাবে বলত?

মেয়েমানুষ?

অবশ্যই, মেয়েমানুষ।

ওয়েটারটি সামনে এগিয়ে এসে নীচু গলায় বলল, বাড়িটা আপনি জানতে চান?

হ্যাঁ।

বাঁদিক দিয়ে দ্বিতীয় রাস্তা; তারপরে ডানদিকে ১৫ নম্বর।

ধন্যবাদ। এই নাও তোমার বকশিস।

ধন্যবাদ স্যার।

ঠিকানাটা আওড়াতে-আওড়াতে ভারাজু কাফে থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটার পরে তিনি ভাবলেন: বাঁদিকে দ্বিতীয় রাস্তা...হ্যাঁ...কিন্তু কাফে থেকে আমি ডানদিকে ঘুরব, না বাঁদিকে ঘুরব? জাহান্নামে যাক। আমি শীঘ্রই খুঁজে বার করে নেব।

হাঁটতে-হাঁটতে দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে তিনি বাঁদিকে ঘুরলেন, তারপরে এগিয়ে গেলেন প্রথম ডান দিকে। তারপরে তিনি পনের নম্বর খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। বাড়িটা মোটামুটি বেশ বড়। তিনি দেখতে পেলেন দোতলার বন্ধ শাসীর ভেতরে আলো

জ্বলছে। সামনের দরজার অর্দ্ধেকটা খোলা রয়েছে। হলঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। সার্জেণ্ট-মেজর ভাবলেন এটাই সেই বাড়ি।

সুতরাং তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন; এবং কেউ বেরিয়ে এল না বলে তিনি ডাকলেন—হ্যালো, হ্যালো!

একটি বাচ্চা পরিচারিকা বেরিয়ে এল; কিন্তু একটি সৈনিককে দেখে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি তাকে বললেন, গুড ইভনিঙ! মহিলারা ওপরতলায়?

হ্যাঁ, স্যার।

ড্রয়িংরুমে?

হ্যাঁ, স্যার।

মনে হচ্ছে আমি ওপরে যেতে পারি। পারি তো?

হ্যাঁ, স্যার।

সিঁড়ির ওপরে দরজা?

হ্যাঁ স্যার।

তিনি সোজা ওপরে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। ভেতরের ঘরটিতে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল, সেই ঘরে সান্ধ্য-পোশাক পরে চারটি মহিলা বসেছিল। তাদের হাবভাবে মনে হচ্ছিল, কারও জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। সবচেয়ে ছোট তিনটি যুবতী ভেলভেটের পোশাক পরে পর-পর চেয়ারে বসে রয়েছে। চতুর্থটির বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। একটি ফুল সাজানো পাত্রে সে ফুল সাজাচ্ছিল। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সে খুব মোটা। সবুজ রঙের সিল্কের পোশাক তার পরিধানে। তার হাত আর গলাটি বেশ বড়। প্রসাধনের দাপটে সেগুলি গোলাপের মত লাল দেখাচ্ছে।

সার্জেণ্ট-মেজর স্যালুট করে বললেন—গুড ইভনিং লেডিস।

বয়স্ক মহিলাটি ঘুরে দাঁড়াল—দেখে মনে হল সে বেশ অবাক হয়েছে; কিন্তু মাথা নীচু করে বলল—গুড ইভনিং।

তিনি বসলেন। কিন্তু তারা তাঁকে দেখে বেশ খুশী হল না দেখে তাঁর মনে হল এখানে হয়ত অফিসাররাই ঢুকতে পারে। চিন্তাটা তাঁকে অস্থির করে তুলল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা করলেন: সব ঠিক আছে তো?

বয়স্ক, বেশ শক্ত সমর্থ মহিলাটিও সম্ভবত ওখানকার মিসট্রেস। সে বলল, হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

আর কী বলবেন বুঝতে পারলেন না তিনি। আর কেউ কোন কথা বলল না।

অবশেষে নিজের যে এগিয়ে যেতে লজ্জা করছিল এই ভেবে তিনি নিজেই লজ্জা পেলেন; তারপরে অস্বস্তির সঙ্গে হেসে বললেন, যাই হোক, বেশী হইচই আমরা করব না। এক বোতল মদের দাম আমি দেব,......

কথাটা তাঁর শেষ হ'তে-না-হ'তেই আবার দরজা খুলে গেল; ঢুকে এলেন প্যাদোই।

তাঁকে দেখেই ভারাজু প্রচণ্ড আনন্দে ফেটে পড়লেন; তারপর দাঁড়িয়ে উঠে ভগ্নীপতির দুটো হাত ধরে নাচতে শুরু করে দিলেন; নাচতে-নাচতে বললেন, প্যাদোই এসেছে...বৃদ্ধ প্যাদোই...এসেছে...এসেছে...

প্যাদোই তো অবাক—যাকে বলে একেবারে হতভম্ব। তাঁকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে, ভারাজু তাঁর মুখের ওপরে চীৎকার ক'রে বললেন, ও তুমি...কুকুর...এখানে মজা করতে এসেছ? আর আমার বোন...তাকে তুমি ছেড়ে দিয়ে এসেছ...নাকি!

প্যাদোইকে এই অবস্থায় তিনি বাগে পাবেন তা তাঁর কল্পনাতীত ছিল। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন এর ফলে প্যাদোইকে মোচড় দিয়ে ইচ্ছেমত টাকা ধার পাওয়া যাবে, ব্ল্যাকমেইল করার সুযোগ পাওয়া যাবে অনেক। এই কথা ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সোফার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি।

এই দেখে তিনটি যুবতী একসঙ্গে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল; আর বয়স্কাটি দাঁড়াল গিয়ে একটা কোণে। তাব চোখ মুখের অবস্থা দেখে মনে হল হয়ত সেও মূর্ছা যাবে।

সান্ধ্য-পোশাক পরে এবং সরকারী চিহ্ন ঝুলিয়ে দু'জন ভদ্রলোক ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন। প্যাদোই তাঁদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বিনীতভাবে বললেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট, লোকটা পাগল...পাগল,...অসুস্থ। ওকে সারিয়ে তোলার জন্যে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজের চোখেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন...ও পাগল...।

হাসি বন্ধ হয়ে গেল ভারাজুর। ব্যাপারটা কী তা তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না; কিন্তু কোথাও যে তিনি একটা বিরাট ভুল ক'রে ফেলেছেন সেটা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হল না। দুশ্চিন্তাটা হঠাৎ মাথায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন; তারপরে ভগ্নীপতির সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এ বাড়িটা কার? আমরা কোথায় এসেছি?

হঠাৎ চটে উঠে প্যাদোই তোতলাতে লাগলেন: আমরা কোথায়? আমরা কোথায় এসেছি...হতচ্ছাড়া...নচ্ছার কোথাকার! রাস্কেল...বদমাশ। কোথায়? প্রেসিডেন্টের বাড়িতে...প্রেসিডেন্ট দ্য মর্টমেঁর প্রাসাদে...দ্য মর্টমেঁ...ও হো...শুয়োর...শুয়োর...শুয়োর... গাধা...উল্লুক কাঁহাকার...

স্বীকারোক্তি

The Confession

ক্যাপটেন হেক্টর ম্যারি দ্য ফঁতের সঙ্গে মিলি লরিঁর যখন বিয়ে হল তখন সবাই এমন কি তাঁদের বাপ-মা এবং বন্ধুবান্ধবরাও পর্যন্ত—সবাই একবাক্যে বলেছিলেন যে এ বিয়েটা অত্যন্ত অযৌক্তিক হয়েছে।

চেহারার দিক দিয়ে মিলি ছিল সুন্দরী, রোগাটে, দুর্বল; কিন্তু মোটেই চঞ্চল প্রকৃতির নয়। বার বছর বয়সেই তিরিশ বছর বয়সের মত ছিল তার আত্মপ্রত্যয়।

অনেক অকালপক্ক খুদে প্যারিস বালিকার মতই সে-ও জীবন যাপনের কলাবিদ্যাটা সঙ্গে নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল; মেয়েদের সবরকম চাতুরীতে দক্ষ ছিল সে। এছাড়া সহজাত ছিল তার অপূর্ব ছলাকলা দেখানোর দক্ষতা,—পুরুষের সঙ্গে খেলা করার আর তাদের বিভ্রান্ত করার, প্রতারিত করার যে সমস্ত গুণগুলি নারীদের মজ্জাগত—সেগুলির কোনটারই অভাব ছিল না তার মধ্যে। নারীদের ক্রিয়াকলাপ সবই পূর্বপরিকল্পিত; হঠাৎ করে তারা কিছু ক'রে না; সবকিছু ভেবে চিন্তে—ফলাফল চিন্তা ক'রে তারা নিজেদের পথে এগিয়ে যায়। অভিনয় করাটাই তাদের জীবন। মিলি শৈশব থেকেই ছিল যাকে বলে পরিপক্ক রমণী।

ফুটফুটে ছিল মেয়েটি। হাসির একটু কথাতেই সে একেবারে হেসে কুটিকুটি হ'য়ে যেত—কলহাস্যে গড়াগড়ি দিত মাটিতে। তখন আর তাকে ধরে রাখা যেত না। লোকের সামনেই সে হাসত—সেই হাসিটা অনেকক্ষেত্রেই অশালীনতার পর্যায়ে পড়ত। কিন্তু সেই হাসিটি এমনই মধুর ছিল যে কেউ রাগ করত না।

তাছাড়া ছিল তার অর্থ। প্রচণ্ড ধনী ছিল মেয়েটি। ক্যাপটেন ফঁতের সঙ্গে তার বিয়ে হয় একজন পাদরীর মধ্যস্থতায়। ক্যাপটেন শিক্ষা পেয়েছিলেন এমন একটি বিদ্যালয়ে যেখানে চরিত্র গঠন আর নিয়মানুবর্তিতার ওপরে জোর দেওয়া হোত সবচেয়ে বেশী। সেই শিক্ষা পেয়ে তিনি নিজের সৈন্যদেরও কঠোর হাতে সংযত করেছিলেন। চরিত্রের দিক থেকে তিনি এমন একটি মানুষ ছিলেন ভাগ্য যাকে হয় কোন সেণ্ট অথবা দানব করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এসব মানুষের আদর্শই এঁদের ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করে; এবং এঁরা যা করব বা করা উচিৎ বলে মনে করে তা থেকে এঁদের বিচ্যুত করা যায় না।

লম্বা-চওড়া চেহারা, কৃষ্ণবর্ণ যুবক, গম্ভীর প্রকৃতির, নীতির দিক থেকে কঠোর, সরল, স্থিতি-প্রতিজ্ঞ; উত্তর দেন সোজাসুজি, মুখের ওপর, এবং একগুঁয়ে। ইনি সেই প্রকৃতির মানুষ যিনি জীবনের অসংখ্য অলিগলির কথা জানেন না, দুনিয়ার সহস্র ছলাকলার সম্বন্ধে যিনি অনভিজ্ঞ। এই জাতীয় মানুষ সন্দেহ করেন না কাউকে; কারও যে নিজস্ব কোন চিন্তাধারা রয়েছে সে কথা যিনি বিশ্বাস করেন না; এবং আত্মবিশ্বাসের দৌরাত্মে সব সময় যিনি অন্য মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করেন।

মিলি তাঁকে দেখল, একটু দৃষ্টি দিয়েই তাঁর চরিত্র কী রকম তা বুঝে নিল। তারপরে তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হ'য়ে গেল।

বেশ ভালভাবেই দিন কাটছিল তাঁদের, বুদ্ধিমতী মেয়ে মিলি; যাকে বলে ধুরন্ধর, সাংসারিক বিষয়ে নিজেকে সে তাড়াতাড়ি খাপ খাওয়াতে পারত। ভাল কাজে এতটুকু অনিচ্ছা ছিল না তার, আনন্দের আসরে উচ্ছ্বাসময়ী; গির্জা এবং থিয়েটার—এই দুটি জায়গাতেই সে নিয়ম করে যেত। গম্ভীর প্রকৃতির স্বামীর সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলার সময় তার চোখের ভিতরে একটা ব্যঙ্গ আর তামাসার দ্যুতি সব সময় ঝলসে উঠত। গির্জার পাদরীদের সঙ্গে যে সব জনহিতকর কাজের আয়োজন সে করেছে

সেগুলির ফিরিস্তি সে তার স্বামীকে নিয়ম করে দিত; আর এই সব কাজের অছিলায় সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে ঘরের বাইরে কাটাত।

কিন্তু মাঝে-মাঝে এই সব জনহিতকর কাজের বর্ণনা দিতে-দিতে সে খিলখিল করে হেসে উঠত। সেই হাসির আবেগটা হঠাৎ এমন বেড়ে যেত যে কিছুতেই নিজেকে সে সামলিয়ে রাখতে পারত না। ক্যাপটেন সাহেব স্ত্রীর এই অকারণ উদ্বেগজনক হাসির কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। স্ত্রীর হাসির উচ্ছ্বাস থিতিয়ে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন—ব্যাপারটা কী বলত? স্ত্রী বলত—না, না। ও কিছু নয়। আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এই বলেই সে হয়ত কোন একটা গল্প ফেঁদে বসত।

১৮০৩ সালের গ্রীষ্মকালে ক্যাপটেন হেক্টর দ্য ফঁতেঁ বত্রিশ নম্বর সামরিক বাহিনীর বিরাট অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা শহরের বাইরে তাঁর বাহিনী তাঁবু ফেলেছিল। দশ দিন কঠোর পরিশ্রম আর ক্যানভাসের ছাউনিতে থাকার পরে ক্যাপটেনের বন্ধুরা ঠিক করলেন এবার ক'দিন ভাল-ভাল ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমে মঁসিয়ে ফঁতেঁ তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হননি; তারপরে সবাই যখন অবাক হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল তখনই তিনি রাজি হলেন। সামরিক অভিযানের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করার ছলে, এবং একমাত্র এই বিষয়ে আলোচনা করতেই ক্যাপটেন ফঁতেঁ আনন্দ পেতেন, মেজর দ্য ফরি টেবিলে তাঁর পাশে বসলেন এবং ফঁতেঁর শূন্য গ্লাস মদে পূর্ণ করতে লাগলেন। খুব গরম পড়েছিল সেদিন—মানুষের কণ্ঠ শুকিয়ে যাচ্ছিল বারবার। কোনকিছু খেয়াল না করেই ক্যাপটেন ফঁতেঁ গ্লাসের পর গ্লাস মদ গলায় ঢালতে লাগলেন। তিনি বুঝতেও পারলেন না যে তাঁর মেজাজটা বেশ শরীফ হয়ে উঠছে, মাথার ভেতরে একটা উত্তেজনা চঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনের মধ্যে একটা নাম-না-জানা আকাঙ্খা জেগে উঠল তাঁর।

ডিনারের শেষ পর্যায়ে যখন ফলমূল হাজির হল তখন তিনি মাতাল হ'য়ে পড়েছেন। উন্মাদের মত তিনি জোরে-জোরে হাসতে লাগলেন, অদ্ভুত মুখভঙ্গী করতে লাগলেন। অমন যে শান্ত মানুষ—মদের চাপে তিনিও কেমন যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

থিয়েটারে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন একজন। বন্ধুদের সঙ্গে তিনিও থিয়েটারে গেলেন। হঠাৎ একজন অভিনেত্রীকে দেখে চিনতে পারলেন। অভিনেত্রীটি নাকি পূর্বজীবনে তাঁর প্রেমিকা ছিল। রাত্রিতে ভোজের আয়োজন হল; সেইখানে নিমন্ত্রণ জানানো হল থিয়েটারের সমস্ত অভিনেত্রীদের।

পরের দিন সকালে একটি অপরিচিত ঘরে ক্যাপটেন ফঁতেঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। ঘুম ভাঙতেই তিনি দেখলেন একটি ক্ষুদে চেহারার সুন্দরকেশী রমণীর আলিঙ্গনের মধ্যে তিনি শুয়ে আছেন। তাঁকে চোখ খুলতে দেখে রমণীটি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল—গুড মর্নিং, ডিয়ার।

ব্যাপারটা কী তা প্রথমে তিনি বুঝতে পারলেন না। পরে ধীরে-ধীরে ঘটনাটা আবছা-আবছা মনে পড়ল তাঁর। কোন কথা না বলে তিনি উঠে পড়লেন, পরলেন পোশাক; তারপরে কুলুঙ্গি থেকে টাকার ব্যাগটা নিয়ে উপুড় করে দিলেন। সুসজ্জিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, এবং সম্ভবত বারবণিতার ঘরে রাত কাটানোর জন্যে তিনি যথেষ্ট লজ্জিত হলেন। তখনই বাইরে বেরিয়ে যেতে বা প্রকাশ্যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে সাহস করলেন না তিনি। কেউ তাঁকে ওই পোশাকে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলে লজ্জায় মরে যাবেন তিনি।

রমণীটি বলল, কী হল তোমার? কথা নেই যে! গত রাত্রিতে তো মুখ থেকে ফোয়ারা ছুটছিল। একটি কিম্ভুতকিমাকার বস্তু বাপু তুমি।

রমণীটিকে আভিজাত্যের সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে সাহস সংগ্রহ করে বাসায় ফিরে এলেন তিনি। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে তাঁর হাবভাব আর পোশাক-আশাক দেখে সবাই জানতে পেরেছে যে তিনি বারবণিতার ঘর থেকে সোজা উঠে আসছেন।

অনুশোচনায় জর্জরিত হ'য়ে উঠলেন। গির্জায় গিয়ে তিনি পাপ স্বীকার করলেন। তবু শান্তি পেলেন না। পদস্খলনের জন্যে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল এখনও কিছুটা পবিত্র কর্তব্য তাঁর বাকি রয়ে গিয়েছে—সেটা হচ্ছে তাঁর স্ত্রীর কাছে।

অভিযানের সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর বাপের বাড়িতে। এক মাসের আগে তাঁর সঙ্গে ক্যাপটেনের দেখা হয়নি। দেখা যেদিন হল সেদিন প্রেয়সী দু'হাত বাড়িয়ে হাসতে-হাসতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ক্যাপটেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন বেশ বিব্রত হয়ে। দ্বিধা আর সঙ্কোচের সঙ্গে এতই ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন যে সন্ধের আগে অর্দ্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে কোন কথাই বলতে পারলেন না তিনি।

দু'জনে একসঙ্গে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কী বলত, ডারলিং! তোমাকে কেমন-কেমন লাগছে যেন!

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিলেন ক্যাপটেন—না, না, কিছু না—কিছু না।

কী বললে? কিছু না? নিশ্চয় কিছু, এবং ভয়ঙ্কর রকমের কিছু। আমি বেশ বুঝতে পারছি এমন কিছু ঘটেছে যেটা তোমাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে—হয় তুমি কোন বিপদে পড়েছ, আর না হয়ত কোন দুঃখ পেয়েছ। অথবা, আর কিছু ঘটেছে।

মানে, হ্যাঁ; আমি বিক্ষুব্ধ।

কিসের জন্যে?

তা আমি তোমাকে বলতে পারব না।

আমাকে বলতে পারবে না? কেন? আমার ভয় করছে।

বলার মত কোন কারণ আমার নেই। যদিও থাকে, আমি তোমাকে তা বলতে পারব না।

স্ত্রী বসেছিলেন একটা নীচু সোফার ওপরে। ক্যাপটেন পেছনে দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মেঝের ওপরে পায়চারি করছিলেন। পায়চারি করার সময় স্ত্রীর দুটি চোখ তিনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন।

স্ত্রী বললেন, ঠিক আছে। তাহলে আমি তোমার স্বীকারোক্তিই শুনব। শোনাই আমার কর্তব্য। তোমার মুখ থেকে সত্যি কথা শোনার অধিকার আমার রয়েছে। তোমার কাছে আমার যেমন কোন গোপন কথা থাকবে না, আমার কাছ থেকেও তেমনি তুমি কোন কথা গোপন করে রাখতে পার না।

ক্যাপটেন সাহেব পেছন ফিরে লম্বা উঁচু জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, সেখান থেকেই বেশ গম্ভীর স্বরে বললেন—প্রিয়তমে, এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা না বলাই ভাল। সেইরকম একটা জিনিসই আমাকে বিব্রত করে তুলেছে।

কথা শুনে স্ত্রী উঠলেন, এগিয়ে গেলেন; স্বামীর হাত ধরে টেনে নিজের দিকে ঘুরালেন। নিজের দুটো হাত দিয়ে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরে ভুরু দুটি কুঞ্চিত করে হাসতে-হাসতে আদর ক'রে বললেন, শোন ম্যারি, (স্বামীকে যখন তিনি খুব ভালবাসতেন তখন এই নামে তাকে ডাকতেন) আমার কাছ থেকে কোনকিছুই তুমি লুকিয়ে রাখতে পার না। আমার বিশ্বাস, তুমি কোন খারাপ কাজ করেছ।

তিনি বিড়বিড় করে বললেন—আমি একটা খারাপ কাজই করেছি।

হাসির ছলে স্ত্রী বললেন—তাই বুঝি? তুমি? আমাকে অবাক করলে দেখছি।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল স্বামীর স্বর—আর তোমাকে কিছু আমি বলব না। বারবার একই প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই তোমার।

স্ত্রী কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্রী নন। স্বামীকে তিনি ধরে এনে আরাম-কেদারায় বসালেন—নিজে বসলেন তাঁর ডান কোলে; তাঁর গোঁফের সূচলো অংশে ছোট্ট একটা চুমু খেলেন; তারপরে বললেন, তুমি যদি আমাকে না বল, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব থাকবে না।

আমি যা করেছি তা যদি তোমাকে বলি তাহলে তুমি আমাকে ভবিষ্যতে ক্ষমা করবে না।

ঠিক তার উলটো, ডারলিং। আমি তোমাকে সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষমা করে দেব।

না; এ অসম্ভব।

কথা দিচ্ছি।

আমি বলছি, এ অসম্ভব।

প্রতিজ্ঞা করছি।

না, না। তুমি তা পারবে না।

ডারলিং, কী ছেলেমানুষীই না তুমি করছ? তুমি কী করেছ সেকথা আমাকে না বলার ফল কী জান? আমি তোমার সম্বন্ধে যা-তা কথা ভাববো। সব সময় আমি ওই কথাটাই ভাববো। আর তুমি যে আজ আমাকে তোমার পাপের কথা বললে না তার জন্যে চিরকালই তোমার ওপরে আমি একটা রাগ পুষে রাখবো। আর তুমি যদি সব কথা এখনই আমাকে খোলাখুলি বলে দাও তাহলে কালই তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেব।

মানে, আমি...

কী করেছ... ?

বলতে গিয়ে কানের গোড়াগুলি পর্যন্ত তাঁর লাল হয়ে গেল, তিনি বেশ গম্ভীরভাবেই বললেন, পাদরীর কাছে যেমন করে মানুষ নিজের পাপের কথা স্বীকার করে আমি তোমার কাছে সেই রকম করেই স্বীকার করব আমার অন্যায়।

একটা হাসির ঝিলিকে মহিষীর ঠোঁট দুটি কুঁকড়ে উঠল; তারপরে কিছুটা ঠাট্টার সুরে তিনি বললেন, বলে যাও। আমি শুনছি।

স্বামী বলে গেলেন—আমি যে খুব মদ্যপান করি তা তুমি জান। যা খাই সেটা হচ্ছে জল—পাতলা মদ দিয়ে একটু রঙিন করা মাত্র।

হ্যাঁ; তা আমি জানি।

তুমি কি জান এই অভিযানের সময় একদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে আমি একটু বেশী পরিমাণ মদ্যপান করেছিলাম...

তুমি মাতাল হয়েছিলে? কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

হ্যাঁ; আমি মাতাল হয়েছিলাম।

কড়া অনুশাসনের পরে স্ত্রী বললেন, তাহলে মদ খেয়ে তুমি মাতাল হয়েছিলে...স্বীকার করছ তুমি। এত মাতাল হয়েছিলে যে চলতে পারনি—তাই না?

না, ঠিক ততটা নয়। জ্ঞানটা আমি হারিয়েছিলাম সত্যি কথা; দেহের সমতা হারাইনি। আমি খুব বকবক করেছিলাম, হেসেছিলাম; আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম।

চুপ করে গেলেন ক্যাপটেন।

ক্যাপটেন-পত্নী বললেন, এই স-ব?

না।

মানে, এর পরেও রয়েছে...... ?

তারপরে...তারপরে...আমি...আমি একটা ঘৃণ্য কাজ করেছিলাম।

অস্বস্তির সঙ্গে ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছুটা আতঙ্ক আর কিছুটা করুণার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—কী করেছিলে, ডারলিং?

রাত্রির ভোজ-এ আমরা কয়েকজন অভিনেত্রীকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম...এবং কী করে যে ঘটনাটা ঘটলো তা আমি জানিনা; কিন্তু তোমার প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি লরিঁ।

উদাত্ত সুরে গম্ভীরভাবে ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি করার মত ক্যাপটেন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

ভদ্রমহিলা একটু নড়াচড়া করলেন; একটা কৌতুকের ঝিলিকে, একটা বিপুল আর অদম্য কৌতুকে তাঁর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি বললেন—তুমি...তুমি...তুমি...

একটুকরো নিরানন্দ হাসি বারতিনেক তাঁর ঠোঁট দুটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, রুদ্ধ করে দিল তাঁর স্বর।

গাম্ভীর্য পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করলেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু যতবারই তিনি কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যান ততবারই গলার নীচে হাসির বুদ্বুদ উঠে তাঁর কণ্ঠ রোধ করে দেয়। আবার কথা বলতে যান ; আবার হাসির আবেগে সব ভেস্তে যায়। ছিপি-না-খোলা বোতলের ভিতরে শ্যাম্পেনের ফেনাগুলি যেমন গ্যাসের চাপে আটকে থাকে এ-ও সেইরকম একটা ব্যাপার। ভেতরের আবেগটাকে প্রশমিত করার জন্যে তিনি ঠোঁটের ওপরে আঙুল চাপা দিলেন; এবং মুখের মধ্যে যে হাসির ফোয়ারা উঠছিল তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাসি ছিটকে বেরিয়ে পড়ল, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল তাঁর। অসংলগ্ন প্রলাপের মত বেরিয়ে এল কথাগুলি—তুমি...তুমি...তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। ও-হো...ও-হো...ও-হো...

বজ্রাহতের মত ক্যাপটেন সাহেব নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা আত্মসংযমের সব চেষ্টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। মনে হল হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। ছোট ছোট ভাঙা-ভাঙা তীক্ষ্ণ কান্নার সুর মনে হল তাঁর বুকের মধ্যে থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে এল বাইরে। দুটো হাত দিয়ে নিজের পেট টিপে ধরলেন তিনি। উদ্গত হাসির ঝোঁকে তাঁর প্রায় দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। হাসি চাপতে যতবারই চেষ্টা করলেন ততবারই হুপিং কাশির মত খকখক করে কাশতে লাগলেন তিনি।

ভদ্রমহিলাকে আরাম কেদারায় ফেলে ক্যাপটেন নিজে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন—লরিঁ, তুমি অসভ্যেরও অধম।

কৌতুকের উচ্ছ্বাসে ভদ্রমহিলা তোতলাতে লাগলেন—মানে, মানে...কী তুমি আশা করেছিলে...? আমি...আমি নিজেকে সামলাতে পারছিনা। তুমি এত রসিক...ওঃ—ওঃ—ওঃ।

ক্যাপটেন একদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন আতঙ্কিত হয়ে। সেই দৃষ্টির অন্তরালে অদ্ভুত-অদ্ভুত চিন্তা ঘুরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ কিছু বলার জন্যে চেঁচাতে গিয়ে মুখটা বুজিয়ে ফেললেন তিনি। তারপরে দরজাটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আরও ঝুঁকে পড়লেন তাঁর স্ত্রী ; ক্লান্ত, মূর্ছাতুরা হয়ে হাসতে লাগলেন—অর্দ্ধ নির্বাপিত আগুনের শিখার মত এক একবার অদম্য কাশির ঝোঁক উঠে বাইরে ছিটকে পড়তে লাগল তাঁর।

জানালা

The window

এই বছর শীতের সময় প্যারিসে মাদাম দি জ্যাডেল-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরিচয় হওয়ামাত্র তাঁকে আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মত আপনারাও তাঁকে জানেন...না...ক্ষমা করবেন...আমি তাঁকে যতটা জানি আপনারাও প্রায় ততটাই তাঁকে জানেন। আপনারা জানেন তিনি যতখানি রোমান্টিক ঠিক ততখানিই খামখেয়ালী। আচার-ব্যবহারে দিলখোলা, হৃদয়বতী, একগুঁয়ে, কোন বিষয়েই গোঁড়ামির বাষ্পটুকু তার মধ্যে আপনারা খুঁজে পাবেন না; ভয় বলে কোন বস্তু তাঁর ভেতরে নেই, দুঃসাহসিকা বেপরোয়া। সংস্কার মাত্রকেই তিনি ঘৃণা করতেন; এবং তা সত্ত্বেও, বড়ই ভাবপ্রবণ, খুঁতখুঁতে; বিরূপ মন্তব্যে খুব তাড়াতাড়িই রেগে যান তিনি, নম্র এবং অনুভূতিপ্রবণা।

ভদ্রমহিলা বিধবা। আমি নিজে অলস; তাই আমি বিধবাদের শ্রদ্ধা করি। সেই সময় বিয়ে করার কথা আমি ভাবছিলাম। সেই জন্যে তাঁর সঙ্গে আমি মেলামেশা করতে শুরু করে দিলাম। পরিচিতির অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ভাললাগার গভীরতাও আমার বাড়তে লাগল। ঠিক করে ফেললাম—এবার আমার প্রস্তাবটা তাঁর কাছে রাখব। আমি তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম, শুধু প্রেম নয়, একেবারে গভীর প্রেম। বিয়ে করার সময় কোন মানুষেরই তার স্ত্রীর সঙ্গে গভীর প্রেমে পড়া উচিত নয়; পড়লে, নিজেকে সে একটি আস্ত গাধায় পরিণত করবে। আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে সে বোকার মত কাজ করবে, এককথায় ছ্যাবলা হয়ে যাবে সে। পুরুষ মানুষের কাছে আত্মসংযমটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম রাত্রিতেই সে যদি তার সংযমের বাঁধ ভেঙে ফেলে, একটি বছরের মধ্যেই তার মত আর পথ পরিবর্তনের যথেষ্ট বিপদ রয়েছে।

সেই জন্যে একদিন হালকা ধরনের দস্তানা পরে আমি তাঁর বাড়িতে হাজির হলাম, বললাম, মাদাম, আমার অনেক সৌভাগ্য যে আমি তোমাকে ভালবাসতে পেরেছি। তোমাকে খুশি করব আর তোমাকে আমার যা কিছু ভাল রয়েছে সব দান করব এই আশা নিয়ে আমি আজ এখানে এসেছি। সেই সঙ্গে আমার পদবীটাও তোমাকে দান করার বাসনা আমার রয়েছে।

শান্তভাবে উত্তর দিলেন তিনি—তোমার যা অভিরুচি। তোমাকে ভালবেসেই যে শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব এমন কথাও আমি এখনই ঠিক বলতে পারছিনা। কিন্তু একটা পরীক্ষা করতে আপত্তি নেই। মানুষ হিসাবে আমি তোমাকে পছন্দ করি। তোমার স্বভাব-চরিত্র কেমন, চালচলনই বা কী রকম তা দেখা দরকার। অনেক বিয়েই যে দুর্যোগে ভেঙে যায়, অথবা শেষ পর্যন্ত নীতি-বিগর্হিত হয়ে দাঁড়ায় তার

একমাত্র কারণ হচ্ছে বিয়ের আগে দু'পক্ষের কেউ পরস্পরকে ভালভাবে চেনার সুযোগ পায় না। ফলে, সামান্য-সামান্য অথবা অতি তুচ্ছ কারণেই দুজনে ঝগড়া করে; কোন গভীর বিতৃষ্ণা, নীতি বা ধর্ম বা অন্য কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত পরস্পরের থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা অপ্রিয় অপগুণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করে—পরস্পরকে চিরশত্রু করে তোলে। পৃথিবীর অনেক-অনেক প্রেমিক দম্পতির জীবনই ঠিক এই কারণেই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

'ভালভাবে না জেনে কাউকেই আমি বিয়ে করব না; যাকে আমি জীবনে সঙ্গী করব তার চরিত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটি, চাল-চলন, হাব-ভাব লক্ষ্য করব আমি। সময়মত, খুব কাছাকাছি থেকে কয়েক মাস ধরে আমি তাকে অনুশীলন করতে চাই।

'আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই: লভিল-এ আমার যে স্টেট রয়েছে সেইখানে গ্রীষ্মের সময়টা তুমি থাকবে চল। আমাদের একসঙ্গে বাস করার যোগ্যতা রয়েছে কিনা সেই শান্ত-পরিবেশে আমরা যাচাই করে দেখব...

'দেখতে পাচ্ছি আমার কথা শুনে তুমি হাসছ। আমার সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করছ তুমি। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, নিজেকে আমি খুব ভাল ক'রে না চিনলে কখনই তোমাকে এই প্রস্তাব আমি দিতাম না। প্রেম-ভালবাসা বলতে তোমাদের মত পুরুষরা যা বোঝে তার ওপরে আমার এত ঘৃণা আর বিরক্তি জন্মেছে যে আর কোন প্রলোভনেই আমি আমার মাথাটাকে বিকৃত হওয়ার সুযোগ দেব না। আমার প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করলে?

তাঁর হাতে চুমু খেয়ে বললাম, কখন আমরা যাত্রা করব, মাদাম?

১০ই মে। রাজি তো?

রাজি।

একমাস পরে আমি তাঁর প্রাসাদে গিয়ে উঠলাম। সত্যিই অদ্ভুত এই মহিলা। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তিনি আমাকে দেখতে লাগলেন। ঘোড়ায় চড়তে তাঁর খুব ভাল লাগত। তাই আমরা প্রতিদিন বনের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। বেড়াতে-বেড়াতে পৃথিবীতে এমন কিছু বিষয় আর অবিষয় ছিল না যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম না, কারণ আমার গভীরতম চিন্তার বিষয়েও যেমন তিনি অবহিত হ'তে চাইতেন, আমার ছোটখাট ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তেমনি তিনি আদৌ উদাসীন ছিলেন না।

আমার কথা যদি ধরেন তাহলে আমি বলতে পারি যে আমি তাঁকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিলাম। তাই চরিত্রগত মিল আমাদের রয়েছে কি না তাই নিয়ে বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত হইনি আমি। শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম, আমার রাত্রির নিদ্রাটিকেও পাহারাধীনে রাখা হয়েছে। আমার পাশের ঘরেই একজন ঘুমোত। অনেক রাত্রি না হলে সে আমার ঘরে ঢুকতো না; আর ঢুকত অত্যন্ত সন্তর্পণে, পা টিপে-টিপে। রাত্রির অন্ধকারে এই মানুষটির ক্রমাগত অভিসারে শেষ পর্যন্ত আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। ব্যাপারটার একটা ফয়শালা করতে বদ্ধপরিকর হলাম আমি। সন্ধের সময় কথাটা পাড়তেই এমন ধাতানি খেলাম যে সে-প্রসঙ্গে বেশীদূর এগোতে আর সাহস করলাম না; কিন্তু

আমি ঠিক করে ফেললাম যেমন করেই হোক এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। কী করে নেওয়া যায় সেই কথাই ভাবতে লাগলাম আমি।

আপনারা সিজার্রীকে জানেন। সিজার্রী হচ্ছে তাঁর পরিচারিকা। গ্রাঁভালির সব মেয়েদের মতই সে সুন্দরী, একদিন বিকালে তাকে আমি ঘরের মধ্যে টেনে এনে পাঁচটা ফ্রাঁ তার হাতে গুঁজে দিয়ে মিষ্টি করে বললাম—এই শোন। আমি তোমাকে অন্যায় কিছু করতে বলছিনা; কিন্তু তোমার মনিব আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করছেন আমিও তাঁর সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করতে চাই।

পরিচারিকাটি ব্যঙ্গ ক'রে মুচকে একটু হাসল।

আমি বললাম,রাতদিন যে আমি ভীষণ মনোকষ্টে রয়েছি তা আমি জানি। আমার খাওয়া থেকে শুরু করে জামাকাপড় পরা, মোজা পরা, কথা বলা, হাসা—সব বিষয়ে কেউ গভীর লক্ষ্য রাখছে।

যুবতীটি বলল, মানে, ব্যাপারটা কী হচ্ছে জানেন স্যার...

এইটুকু বলেই সে থেমে গেল। আমি বলে গেলাম—তুমি আমার পাশের ঘরে শোও; আমার নাক ডাকে কিনা, ঘুমোতে-ঘুমোতে আমি ভুল বকি কিনা—এই সব তুমি শুয়ে-শুয়ে শোন। অস্বীকার করো না।

সোজাসুজি হাসতে লাগল মেয়েটি; বলল, মানে, জানেন কি স্যার...

আবার থেমে গেল মেয়েটি; ভাবের আবেগে আমি বলে গেলাম—তুমি বুঝতেই পারছ—আমার গোপন চরিত্রটা সবাই জেনে যাবে আর যে মহিলাটি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'তে যাচ্ছেন তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু জানতে পারব না—এটা ঠিক নয়। আমি অবশ্য তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। সেদিক থেকে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। তবুও এমন কিছু আছে যা জানার জন্যে আমি অনেক কিছু দিতে পারি।...

সিজার্রী আমার টাকাটা তার জামার পকেটে ঢোকাতে মনস্থ করতেই আমি বুঝলাম আমার দাওয়াইটা লেগেছে। আমি বললাম—শোন...আমরা পুরুষ মানুষ...মেয়েদের সম্বন্ধে আমরা এমন কয়েকটা জিনিস জানতে চাই, অর্থাৎ শারীরিক গঠনের কথা আমি বলছি, যে জিনিসগুলি তাদের বাইরের সৌন্দর্য নষ্ট করে না বটে—কিন্তু আমাদের চোখে তাদের দাম অনেকটা পালটিয়ে যায়। তোমার মনিবের নিন্দে করতে আমি তোমাকে বলছিনে; যদি তাঁর গোপন দোষ থাকে সেকথাও বলতে তোমাকে আমি অনুরোধ করব না। তাঁর সম্বন্ধে চারটে কি পাঁচটা প্রশ্ন আমি তোমাকে করব। সেগুলির যথাযথ উত্তর দাও তুমি। মাদামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তোমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত, কারণ প্রতিদিনই তুমি তাঁকে পোশাক-আশাক পরাও। তাঁকে যেরকম মোটাসোটা দেখায় আসলে তিনি কি সেইরকম ?

পরিচারিকাটি কোন উত্তর দিল না।

আমি বলে গেলাম—বৎস, তোমার নিশ্চয় অজানা নেই যে কিছু মহিলা প্যাড ধারণ করেন...মানে প্যাড বাঁধেন সেইখানে যেখান থেকে শিশুরা দুধ খায়, আবার যেখানে ভর দিয়ে তুমি বস সেইখানে। আমাকে বলত—মাদাম কি সেইরকম প্যাড ব্যবহার করেন ?

চোখমুখ নীচু ক'রে সিজারী ভয়ে-ভয়ে বলল, আপনার সব প্রশ্ন শেষ করুন স্যার। আমি একসঙ্গে উত্তর দেব।

ভাল কথা, বৎস। কিছু-কিছু মহিলা রয়েছেন যাঁরা বক্রজানু। এর ফলে প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁদের হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠোক্কর লাগে। আর একদল রয়েছেন যাঁদের বক্রতা এত দূরে-দূরে যে তাঁরা যখন হাঁটেন তখন তাঁদের পা দুটি গোলের ওপরে খিলানের মত বেঁকে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে ইচ্ছে করলে তুমি গ্রাম্য পরিবেশটি বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পাবে। এই দুটি ফ্যাশানই সুন্দর। তোমার মনিবের পা দুটি কেমন বল দেখি?

এবারেও সে কোন উত্তর দিল না। আমি আবার শুরু করলাম—এমন কিছু কিছু মহিলা রয়েছেন যাঁদের কুচযুগল বড় সুন্দর। নীচের দিকে তাদের বেশ গভীর ভাঁজ রয়েছে। কারও-কারও হাতগুলি বেশ মোটা, শরীরটা রোগা। কোন-কোন মহিলা আছেন যাঁদের সামনে থেকে দেখতে বেশ ভালই লাগে; কিন্তু পেছনটা তাঁদের একেবারে যাচ্ছেতাই। কিছু মহিলা আছেন যাঁদের পেছনটা ভাল—সামনেটা একেবারে বিশ্রী। এই সব ফ্যাশানগুলিই কিন্তু ভারি সুন্দর, কিন্তু তোমার মনিবটির চেহারা কেমন সেইটুকুই আমি জানতে চাই।

সিজারী কী যেন দেখার জন্যে আমার দিকে তাকাল; তারপরে খিলখিল করে হেসে বলল, রঙটা কালো ছাড়া, মাদামের চেহারা ঠিক আমারই মত স্যার।

এইটুকু বলেই সে ছুট দিল।

আমার হয়ে গেল। মনে হল কী বোকা আমি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলাম এই অবাধ্য মেয়েটিকে উচিৎ শিক্ষা দেব আমি।

যে ছোট ঘর থেকে মেয়েটি আমার ঘুমনোর ঘরে নজর রাখত, ঘণ্টা খানেক পরে সেই ঘরে ঢুকে আমি খিলটা খুলে রাখলাম। মধ্য রাত্রিতে মেয়েটি ঘরে ঢুকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করার নির্ধারিত জায়গায় এসে উপস্থিত হল। আমি তখনই তার পিছু নিলাম। আমাকে দেখতে পেয়েই মনে হল মেয়েটা এখনই চীৎকার করে উঠবে, কিন্তু আমার হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরলাম; এবং তাকে বোঝাতে আমার বেশী সময় গেল না যে সে যদি মিথ্যে কথা বলে না থাকে তাহলে মাদামের শারীরিক গঠন নিশ্চয় সুন্দর। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার জন্যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমি আরও ভাল করে পরীক্ষা করলাম। তাতে সে অখুশি হল ব'লে মনে হল না আমার। তারপরে সেই দিনই তাকে আমি একটা ফ্ল্যাস্ক অ্যাম্বার ল্যাভেনডার উপহার দিলাম। এরপরে খুব তাড়াতাড়ি পরস্পরের প্রতি আনুগত্য আমাদের বেড়ে গেল। একরকম বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা। মিস্ট্রেস হিসাবে সে ছিল অপরূপা। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি সুন্দরী। প্যারিসে গেলে সে বিখ্যাত রূপজীবিনী হিসাবে নাম কিনতে পারত।

যে আনন্দ সিজারীর কাছ থেকে আমি পাচ্ছিলাম তাতেই খুশি হয়ে মাদামের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ধৈর্য নিয়েই অপেক্ষা করছিলাম। আমার ব্যবহার, চাল চলন একেবারে নিখুঁত হয়ে দাঁড়াল।

আমার বাগদত্তার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে হবে তিনি অতীব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এমন কতকগুলি লক্ষণ আমার চোখে পড়ল যা থেকে আমার মনে হল যে আমাকে তিনি শীঘ্রই গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন। একটি সুন্দরী যুবতী যে আমার কাছে অস্বাভাবিক রকমের প্রিয় ছিল—তার কোলের মধ্যে বসে আমার পাত্রীর কাছ থেকে আইনসঙ্গত চুমু খাওয়ার জন্যে আমি শান্তভাবে অপেক্ষা করছিলাম।

এবার আমার কাহিনীর ক্লাইমেক্সে আসছি।

সেদিন রাত্রিটা বেশ শান্তভাবে কাটিয়ে পরের দিন ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে উঠে পড়লাম আমি। তারপর পোশাক ছাড়লাম; সকালে চিলে-ছাদে গিয়ে প্রতিদিন আমি সিগারেট খেতাম। এখানের সিঁড়িটা ঘোরানো। এরই পাশে একতলার মুখে একটা জানালা। মরক্কো চটি পরে নিঃশব্দে আমি ওপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম জানালার ওপরে আধখানা ঝুঁকে সিজার্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিজার্রীর সমস্ত চেহারাটা আমি দেখতে পাইনি; তার পেছনের অংশটাই আমার দিকে ছিল। সেই অংশটাই আমার পছন্দ! যেমন আমার ভাল লাগে মাদামের শরীরের ওপরের অংশটুকু। যে অংশটি আমার সামনে ছিল সেটি আমার কাছে বড়ই মনোরম বলে মনে হচ্ছিল। ছোট একটা সাদা পেটিকোট পরনে ছিল তার—ছোট—আবরণের দিক থেকে সেটি আদৌ পরিমিত ছিল না।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম আমি—নিঃশব্দে। মেয়েটি জানতেও পারল না যে আমি উঠছি। হাঁটু মুড়ে বসলাম আমি; তারপরে অসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে পেটিকোটের দুটি কোণ ধরে ওপরে তুললাম। তুলেই বুঝতে পারলাম সেটি আমার মিসট্রেস সিজার্রীর হৃষ্টপুষ্ট মসৃণ দাবনা। তার ওপরে গালটা আমার চেপে ধরলাম।—প্রেমিকের একটি চুম্বন এঁকে দিলাম সেখানে। কোন্ কাজ করতে প্রেমিকরা ভয় পায়?

অবাক হয়ে গেলাম। গন্ধটা ল্যাভেনডারের নয়, ভারবেনার। কিন্তু তখন আর গবেষণা করার সুযোগ ছিল না আমার। বেশ জোরাল একটা ঘুষি এসে পড়ল আমার মুখে; কেউ যেন জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আমাকে। আমার নাকটা আর একটু হলে ভেঙে যেত আর কি! একটা চীৎকার কানে এল আমার। শব্দ শুনেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। মহিলাটি ঘুরে দাঁড়ালেন। ইনি মাদাম দি জ্যাডেল।

মূর্ছাতুর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে মানুষ যেমন হাওয়ার বুকে ঘুষি ছোঁড়ে তিনিও সেই রকম হাওয়াতে ঘুষি ছুঁড়তে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন তিনি; তারপরে হাত তুললেন—মনে হল, আমাকে মারবেন। তারপরে পালিয়ে গেলেন।

মিনিট দশেক পরে সিজার্রী আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল—মাদাম দি জ্যাডেল আশা করেন, মঁসিয়ে দি ব্রাইভস যেন এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে যান।

আমি চলে গেলাম।

অনেক চেষ্টা করেছিলাম তাঁকে খুশি করার জন্যে; কিন্তু পারিনি।

আপনারা কি জানেন সেই থেকে আমার নাকের কাছে ভারবেনার একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে ওঠে। সেই গন্ধ ভূরিভোজন করার জন্য আমার মনে একটা অদ্ভুত মাদকতা জাগে।

মোচি

Mouche

একটি মাঝির স্মৃতিচারণ

সে বলল—আমি যখন নদীর বুকে ঘুরে বেড়াতাম সেই পুরনো দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল আমার। তখন কত অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিসই না চোখে পড়েছে আমার—সেই সঙ্গে অদ্ভুত মেয়েছেলে। কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে যেরকম হইচই হট্টগোল আর স্ফূর্তি করে সীন নদীর ওপরে কপর্দকহীন অবস্থায় দিনগুলি আমার কেটেছে মাঝে-মাঝে মনে হয় তাই নিয়ে একখানা ছোট বই লিখি। সেই বইটার নাম হবে "সীন নদীর ওপরে"।

আমি তখন কপর্দকহীন কেরাণী। এখন আমি সাফল্য অর্জন করেছি। আজ আমি মুহূর্তের খেয়াল মেটাতে প্রচুর অর্থ খরচ করতে পারি। আমার মনের মধ্যে অজস্র ছোট-খাট বাসনা ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার কল্পনাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। তাদের অনেকগুলিকেই চরিতার্থ করার কোন উপায় নেই। আজ তো আরাম কেদারায় বসে-বসে বেশ মাথা নাড়ছিলাম। হঠাৎ কেন দাঁড়িয়ে উঠলাম বুঝতে পারছিনা। দশটি বছর ধরে সীন নদীই ছিল আমার প্রধান আকর্ষণ। হায়রে, সেই সুন্দর, শান্ত, পরিবর্তনশীল, আর অপরিচ্ছন্ন সীন নদীর জল আমার মনে কত মরীচিকাই না সৃষ্টি করেছিল, নোংরা করে তুলেছিল আমার কল্পনা। সীন নদীর দৌলতেই জীবনের আস্বাদ আমি পেয়েছিলাম; সেই জন্যেই নদীটা আমার কাছে এত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল; অন্তত: তাই আমার ধারণা। এর দুটি তীরই ফুলে বোঝাই হয়ে থাকত—কত রঙিন-রঙিন ফুল তার ইয়ত্তা নেই, শালুক গাছের পাতার ওপরে আমার বন্ধু ব্যাঙেরা বসে-বসে স্বপ্ন দেখত; আর নীল আগুনের শিখার মত কিং-ফিসার পাখীরা আমার সামনে দিয়ে সোঁ-সোঁ করে উড়ে বেড়াত। কী ভালই না লাগত আমার!

মানুষ যেমন সুন্দর রাতের স্বপ্ন দেখে, আমি সেই স্বপ্ন দেখতাম ভিজে সকালে যে সূর্য ওঠে তাকে; প্রভাতের আগে মৃতের মত সাদা যে ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা থাকে তাকে। তারপরে প্রভাতের রঙিন আলো যখন মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে তখন স্বপ্ন দেখতাম প্রবহমান জলের ঢেউ-এ কাঁপা-কাঁপা ভাঙা-ভাঙা চাঁদের আলোকে। মানুষের শাশ্বত স্বপ্ন আমার কাছে স্বপ্নিল হয়ে উঠেছিল কর্দমের আবর্তে—প্যারিসের আবর্জনা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যে জল হুঁ হুঁ করে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল সেই জল থেকে।

আর বন্ধুদের সঙ্গে কী আনন্দ করেই না জীবন কাটত আমরা। দলে আমরা ছিলাম পাঁচজন; ছোট দল ছিল আমাদের। আজ তারা সবাই বেশ সফল মানুষ, খুব সিরিয়াস প্রকৃতির। সে যুগে আমাদের পয়সা ছিল না। তাই আর্জেন্টিউলে আমরা ছোট একটা ঘর নিয়েছিলাম। সেই ঘরটাই ছিল আমাদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা। সেইখানে কত উদ্দাম সন্ধ্যাই না আমি কাটিয়েছি। স্ফূর্তি করা আর নদীতে নৌকো বাওয়া ছাড়া তৃতীয় কোন কাজ আমাদের তখন ছিল না। নৌকো বাওয়াটাকে তখন আমরা ধর্ম বলে মনে করতাম। সেই অনবদ্য দুঃসাহসিক অভিযানের কথা আজও আমার মনে পড়ে যায়। আমরা পাঁচজন বেকার বন্ধু মিলে যে ধরনের রসিকতায় মসগুল হয়ে থাকতাম সে সব কথা বললে আজ আর কেউ বিশ্বাস করবে না। আজকাল আর সে রকম আনন্দ নেই—এমন কী সীন নদীও তা হারিয়ে ফেলেছে। আসল কথাটা হচ্ছে আধুনিক জগৎ থেকে সেই রকম আনন্দ করার মনটাই গিয়েছে হারিয়ে।

পাঁচ বন্ধুতে মিলে অনেক কষ্টে আমরা একটা নৌকো কিনেছিলাম। তাই নিয়ে সে যুগে আমরা অনেক হাসাহাসি করেছি—ভবিষ্যতে আর করব না। বিরাট নৌকো; ভারি, কিন্তু সরেস, বেশ চওড়া, আর আরামপ্রদ। বন্ধুদের বিশেষ বর্ণনা আপনাদের কাছে আর আমি করব না। একজন ছিল বেঁটে-খাটো চেহারার—ভারি বদমাইশ—তার ডাকনাম হচ্ছে পেতিত ব্লিউ। দ্বিতীয়টির চেহারা বেশ লম্বা চওড়া, ধূসর চোখ—কালো চুল—দেখতে অসভ্যের মত। তার ডাকনাম তোমাহক। আর একজন ছিল ভীষণ কুঁড়ে—কিন্তু মগজটা তার বেশ উর্বর ছিল। তাকে আমরা লা-তোকি বলে ডাকতাম। ওই ছোকরাটাই কেবল দাঁড় ছুঁতো না। বলত—আমি দাঁড়ে হাত দিলেই তোমাদের নৌকো ডুবে যাবে। আর একজন ছিল—রোগাটে, বেশ সুন্দর চালচলন ছিল তার। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম না-কুঁ-ইল। ওই নামে সম্প্রতি ক্লডেলের একটি উপন্যাস বেরিয়েছে। সে একচোখে চশমা পরত। আর আমার নাম ছিল যোশেফ প্রুনিয়ার। মনের দিক থেকে আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না, আমাদের একটি মাত্র দুঃখ ছিল। সেটা হচ্ছে হাল-রমণী। নৌকো বাইতে গেলে সঙ্গে মেয়েছেলে না থাকলে চলে না। চলে না এই জন্যে যে মাঝিদের একঘেয়ে জীবনটা হাসি-ঠাট্টা আর আনন্দ দিয়ে সে-ই মশগুল করে রাখে। কিন্তু এ মেয়ে যেমন-তেমন হলে চলবে না; কারণ আমরা পাঁচ বন্ধু পৃথিবীর আর পাঁচটা মানুষের মত ছিলাম না। আমরা এমন একটি মেয়ে চেয়েছিলাম—সত্যি কথা বলতে কি যাকে খুঁজে পাওয়া বড়ই দুষ্কর। কয়েকজনকে সুযোগ দেওয়া হল; কিন্তু তারা টিকলো না। এরা ছিল সব দাঁড়ী-মেয়ে—দাঁড়ী-রমণী নয়। সাধারণ দাঁড়ীমাঝির নৌকোতে যেসব মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় তারা ছিল সেই জাতীয়—বোকা-বোকা, নদীর জলের মত পাতলা মদ খেতেই তারা ভালবাসত। একদিনের মত নৌকোতে রেখে পরের দিনই বিরক্ত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিতাম আমরা।

সেদিনটা ছিল এক শনিবারের সন্ধ্যা। না-কুঁ একটা ছোটখাটো রোগাটে মেয়ে নিয়ে হাজির হল। বেশ প্রাণবন্ত মেয়েটা, চটপটে; জিবের ওপরে কোন সংযম তার ছিল না। হাসি-ঠাট্টা-মস্করা করতে একেবারে অদ্বিতীয়া। প্যারিসের উপান্তে যে সব বস্তীবাসী মেয়েপুরুষ বাস করে তাদের কাছে এই ধরনের ঠাট্টা উঁচু ধরনের রসিকতা বলে পরিচিত। সুন্দরী নয়; তবে চেহারাটা মিষ্টি; ডিনার শেষ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে নীচুমানের চিত্রকরেরা তিনটি আঁচড়েই পেন্সিল দিয়ে এই ধরনের নারীর ছায়াচিত্র আঁকতে পারে; সাধারণতঃ আঁকেও। প্রকৃতিও মাঝে-মাঝে এই ধরনের নারী সৃষ্টি করে থাকে।

প্রথম রাত্রিতেই তার হাসি আর ঠাট্টায় সে আমাদের একেবারে অবাক করে দিল। তাকে নিয়ে আমরা কী করব ভেবে পেলাম না। আমরা সব পুরুষ মানুষ। কোনরকম ইয়ার্কি ফাজলামি করতেই আমাদের দ্বিধা হোত না। সেই দলের মধ্যে পড়ে সে খুব তাড়াতাড়ি অবস্থাটা তার আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসে একেবারে সর্বময়ী গিন্নী বনে গেল। পরের দিন সকালে সে আমাদের জয় করে ফেলল।

তাছাড়া, মেয়েটা প্রকৃতির দিক থেকে অদ্ভুত—পাগলাটে বলা যেতে পারে। পেটে মদের বোতল নিয়েই সে যেন জন্মেছে। মাতাল অবস্থায় তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হোত। জীবনে কোনদিনই সে স্থিরপ্রকৃতির হতে পারে নি; কারণ 'রাম'-এর ফোঁটা দিয়েই তৈরী হয়েছিল তার ধমনীর রক্ত।

আমাদের মধ্যে কে তার নাম মোচি দিয়েছিল তা আজ আর আমার মনে নেই, বা কেনই বা তার ওই নামটা রাখা হয়েছিল তাও আমি ভুলে গিয়েছি, কিন্তু নামটা তার বেশ মানানসই হয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে কি তাকে আমরা পূজো করতাম। এই পূজো করার পেছনে কারণ ছিল অনেক; পরে অবশ্য একটা কারণেই এসে দাঁড়িয়েছিল। নৌকোর ওপরে বসে সে অনর্গল কথা বলে যেত; সেই শব্দ বাতাসে উড়ে জলের ওপরে হড়কে পড়ত। সে বকছে তো বকছেই; ক্রমাগত বকবক করে যাচ্ছে। তার সেই বকবকানি শুনে মনে হোত বাতাসে কোন যান্ত্রিক পাখার ভনভনানি ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ সে হয়ত চীৎকার ক'রে উঠত; এমন সব অপ্রত্যাশিত আর হাস্যকর কাজ করত যা দেখে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম।

তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উত্তর পাওয়ার জন্যে মাঝে-মাঝে আমরা তাকে নানারকম প্রশ্ন করতাম—খুঁচিয়ে দিতাম তাকে। সেগুলির মধ্যে আমাদের একটি প্রশ্নই তাকে খুব বিব্রত করত।

তোমাকে সবাই 'মোচি' বলে ডাকে কেন?

প্রশ্নটির এমন উত্তর সে দিত যে দাঁড় ফেলা বন্ধ ক'রে আমরা হাসতাম।

মেয়েছেলে হিসাবেও তাকে আমাদের খুব ভাল লাগত। আমাদের মধ্যে লা-তোকে কোনদিনই দাঁড় ধরত না। সারাদিন তার পাশে বসে থাকত সে। একদিন সে বলল—তোমার নাম মোচি কেন হল বলব? তুমি বিষাক্ত মাছি বলে।

তাই বটে। ভনভনে ক্যানথারিস মাছির মতই—সব সময় জ্বরের বীজাণু নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে সেই প্রাচীন যুগের ক্যানথারিস-এর মত বিষাক্ত নয় এই যা। এর হুলের দাপটে আমাদের নৌকোর মাঝি-মাল্লারা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

মোচি আমাদের নৌকোতে আসার পর থেকেই না-কুঁ বেশ ভারিক্কী হয়ে গেল; সব বিষয়েই আমাদের ওপরে সে টেক্কা দিতে লাগল—মনে হল পাঁচজনের মধ্যে মোচি একমাত্র তারই। আমাদের সামনেই মাঝে-মাঝে মোচিকে জড়িয়ে ধরে সে তার সুযোগের অপব্যবহার করত। আমরাও বেশ চটে যেতাম—এ ছাড়াও খাবার শেষে মাঝে-মাঝে সে তাকে কোলে নিয়ে বসত; এমন সব হাবভাব দেখাত যা দেখে আমরা যে কেবল বিরক্তই হতাম তা নয়—কাজগুলিও রীতিমত লজ্জাকর বলে মনে হোত। সেই জন্যে ওই নৌকোর ভেতরে তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে পর্দা-ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু অতি শীঘ্রই আমাদের অতিবাহিত জীবনে মস্তিষ্কে একটা প্রশ্নই বারবার ঘ্যানঘ্যান ক'রে ঘুরতে লাগলো—কোন বিষয়েই মোচির কোনরকম সংস্কার নেই। তাহলে, কোন্ নীতি অথবা দুর্নীতির বলে সে একমাত্র তার প্রেমিককে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে—বিশেষ ক'রে যখন উন্নত স্তর অথবা সমাজের মহিলারা স্বামীর কাছে দাসখৎ লিখে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে স্বীকার করে না।

আমাদের চিন্তার পেছনে যে যুক্তি রয়েছে তা আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারলাম। এ-চিন্তাটা আমাদের মাথায় আগে আসে নি কেন? যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি ব'লে আমরা আর সময় নষ্ট করলাম না। মোচি না-কুঁকে প্রতারিত ক'রে আমাদের বাকি ক'জনকেও সে টেনে নিল। এর জন্যে কোন আপত্তি জানায়নি সে, কোনরকম বাধা দেয়নি। প্রত্যেকে প্রস্তাব দেওয়া মাত্র সে রাজি হয়ে গেল।

আমার বিশ্বাস নীতিবাগীশরা মোচির এই ব্যবহারে ভীষণ আহত হবেন। কিন্তু কেন? কোন্ রুচিবাগীশ বারবণিতার এক ডজনের কম প্রণয়ী রয়েছে? আর তাদের মধ্যে এত বোকা মানুষ কে রয়েছে যে এটা জানে না? থিয়েটার বা অপেরায় যাওয়ার মত কোন বিখ্যাত, আর আকাঙ্খিত রূপজীবির ঘরে একটি সন্ধ্যা কাটানোটা কি একটা প্রচলিত রীতি নয়? দশজন ভাগ করে একটা বেশ্যা পুষে—যেমনভাবে একটা রেসের ঘোড়া রাখার জন্যে দশটা লোক ক্লাব তৈরী করে, যদিও সেই ঘোড়ার পিঠে একমাত্র জকী ছাড়া আর কেউ চড়ে না।

রুচির দিক থেকে বিচার করে শনিবারের সন্ধ্যা থেকে রবিবারের সকাল পর্যন্ত মোচিকে আমরা না-কুঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। নদীতে যে ক'টা দিন আমরা থাকতাম সে ক'টা দিন মোচি তারই ছিল। সীন নদী থেকে দূরে প্যারিসে যখন আমরা কাটাতাম সপ্তাহের সেই অন্য দিনগুলি আমরা তাকে ভাগ করে নিয়েছিলাম। এটা মোটেই বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় না।

ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত এই জন্যে যে আমরা এই চারটি দস্যু যারা মোচির অনুকম্পা ভাগ করে নিয়েছিলাম—আমরা সবাই এ বিষয়ে অবহিত ছিলাম; মাঝে-মাঝে এই নিয়ে আমরা ঠারেঠুরে আলাপ আলোচনাও করতাম। তাই নিয়ে মোচিও বেশ আনন্দ পেত। কেবল না-কুঁ এ সম্বন্ধে কিছু জানত বলে মনে হয় না। ফলে, তার সঙ্গে আমরাও বেশ প্রাণ খুলে কথা বলতে পারতাম না। মনে হোত, আমাদের এতদিনকার বন্ধুত্বের দেওয়ালে চিড় ধরেছে। তাকে দেখে আমরা ভাবতাম—আহা বেচারা! প্রবঞ্চিত প্রেমিক আর প্রবঞ্চিত স্বামী একই পর্যায়ের। কিন্তু বড় চতুর ছিল এই না-কুঁই। সত্যিই কি সে কোন সন্দেহ করেনি? সে আমাদের নতুন সংবাদ পরিবেশন করার চেষ্টা করত; এমনভাবে করত যে ব্যাপারটা বেশ কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়াত। সেদিন বোগিভাল-এ ডিনার খেতে যাওয়ার জন্যে জোরে-জোরে দাঁড় ফেলছিলাম। এমন সময় মোচির একেবারে গা ঘেঁষে বসল লা-তোকে। সেদিন সকাল থেকেই তাকে বেশ তৃপ্ত আর স্ফূর্তিবাজ দেখাচ্ছিল। সে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল—দাঁড়াও।

চার জোড়া দাঁড় সেই শব্দে একসঙ্গে জলের ওপর উঠে স্থির হয়ে রইল।

তোমাকে সবাই মোচি বলে ডাকে কেন?

মোচি কোন উত্তর দেওয়ার আগেই না-কুঁ বলল—তার কারণ সে সব মাংসভোজীদের সঙ্গে একটা রফা করতে পারে।

কথাটা শুনে প্রথমেই আমাদের ওপরে একটা গভীর স্তব্ধতা নেমে এল। হাসতে গিয়ে মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল একটা বিভ্রান্তি। মোচি নিজেও কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।

লা-তোকে নির্দেশ দিল—চালাও পানসী!

তীর বেগে ছুটতে লাগল নৌকো।

ঘটনার সমাপ্তি এইখানেই। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল।

এই ছোট ঘটনাটি আমাদের চরিত্রের বা চালচলনের মধ্যে কোনরকম ব্যতিক্রম আনেনি। এটা শুধু না-কুঁ আর আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনায় সাহায্য করেছিল। শনিবারের সন্ধ্যা থেকে রবিবারের সকাল পর্যন্ত মোচির ওপরে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে লাগল সে; আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে গেল। আমরা তার অনুগামী বন্ধু হয়েই খুশি হলাম; আর সন্তুষ্ট রইলাম সপ্তাহের বাকি ক'টা দিন মোচিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে। এ-ব্যাপারে আর আমাদের মধ্যে কোনরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা রইল না।

মাস তিনেক এইভাবে ভালই কাটলো। তারপরে হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম মোচি কেমন একরকম হয়ে গিয়েছে যেন। আর তার সে আনন্দ নেই, কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে; মেজাজটা হয়ে উঠেছে তিরিক্ষী—একটা অস্থিরতা জেগেছে তার দেহে। আমরা ক্রমাগত তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম—কী হয়েছে তোমার?

সে বলল—কিছু না। আমাকে একলা থাকতে দাও।

শনিবারের এক সন্ধ্যায় না-কুঁ সত্যি ঘটনাটা আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিল। আমরা সবাই খাবার ঘরে টেবিলের ধারে খেতে বসেছি। সুপ খাওয়া শেষ করে মাছ ভাজার জন্যে অপেক্ষা করছি এমন সময় আমাদের বন্ধু না-কুঁ বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মোচির একটা হাত ধরল, তারপরে বলল, প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের কাছে একটি জরুরী বার্তা ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছি। এ নিয়ে হয়ত দীর্ঘ আলোচনা হবে। বন্ধুগণ, খেতে-খেতে সে নিয়ে আলোচনা আমরা নিশ্চয় করব। বেচারা মোচি আমাকে একটা বিপজ্জনক সংবাদ দিয়েছে, সেই সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছে সেই সংবাদটা তোমাদেরও জানিয়ে দিতে।

সংবাদটা হচ্ছে—'মোচি অন্তঃসত্ত্বা।'

এর সঙ্গে আমি কেবল দুটি কথা যোগ করব—এখন ওকে পরিত্যাগ করা যাবে না, আর ওই সন্তানের বাবা কে সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা চলবে না।

সংবাদটা শুনে প্রথমেই আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। অপরাধীকে সনাক্ত করার জন্যে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু কে অপরাধী? কার ওপরে অপরাধের বোঝা চাপানো হবে? প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। গর্ভস্থ সন্তানের পিতা কে সে কথা প্রকৃতি আমাদের ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় না।

আমাদের মধ্যে তোমাহক চিরকালই কম কথা বলে; সে শান্তভাবে বলল, মিলনই হল শক্তি। দশে মিলি করি কাজ......

বাসন মাজার চাকর ততক্ষণে মাছ ভাজা নিয়ে হাজির হল। কিন্তু তখনও মনের দিক থেকে আমরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারিনি। তাই চিরাচরিত অভ্যাস মত তখনই আমরা সেই ভাজা মাছের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম না।

না-কুঁ বলে গেল—এই অবস্থায় অনেক সঙ্কোচের সঙ্গে ও আমাদের সব কথা বলেছে। বন্ধুগণ, এদিক থেকে আমরা সকলেই অপরাধী। আমার কথায় রাজি হও তোমরা। এস, এই সন্তানটিকে আমরা সবাই মিলে গ্রহণ করি।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। সেই ভাজা মাছের ডিশের দিকে হাত বাড়িয়ে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করলাম যে সন্তানটিকে আমরা সবাই একসঙ্গে গ্রহণ করব।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাঁদতে লাগল মোচি; বলল, বন্ধুরা, তোমাদের এত দয়া! ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

আমাদের চোখের ওপরে সেই প্রথম তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

তারপরে নৌকোয় বসে-বসে শিশুটার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম। আলোচনার ধরণ দেখে মনে হোত শিশুটা বোধ হয় সত্যিই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। মোচির শারীরিক বিকৃতি যতই ঘটতে লাগল ততই আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। মাঝে-মাঝে আমাদের উদ্বেগটা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল।

দাঁড় ফেলা বন্ধ করে আমরা জিজ্ঞাসা করতাম—মোচি, তোমার কী হবে? ছেলে, না, মেয়ে?

ছেলে।

সে কী হবে বলত ?

এইবার সে তার কল্পনাকে ডানা মেলে অবিশ্বাস্যভাবে আকাশে উড়িয়ে দিত। জন্ম থেকে শেষ বিজয় পর্যন্ত শিশুটি কী করবে সে-সম্বন্ধে সে অসংখ্য কথা বলে যেত আমাদের। এই অদ্ভুত, অশিক্ষিত মেয়েটির সব কল্পনা রাঙিয়ে উঠেছিল অজাত শিশুটির মধ্যে। সে আমাদের বলত "পাঁচটি বাবা"। একবার সে বলল ছেলেটি নাবিক হয়ে অ্যামেরিকার চেয়ে অনেক বড় মহাদেশ আবিষ্কার করবে। একবার বলল সে সেনাপতি হয়ে ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধ করে অ্যালসেকলোরেন উদ্ধার করে আনবে। তারপরে বলল শিশুটা সম্রাট হয়ে বিজ্ঞ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করবে—যিনি তাঁর দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। বৈজ্ঞানিক হতে পারে সে। বৈজ্ঞানিক হয়ে প্রথমেই সে সোনা তৈরী করার গোপন তথ্যটি আবিষ্কার করবে,তারপর অনন্ত জীবনের পথটা আবিষ্কার করবে। শেষকালে বলল—সে হবে মহাকাশচারী—অনন্ত আকাশকে সে জনসাধারণের খেলার মাঠে পরিণত করবে। কী অদ্ভুত, চমৎকার স্বপ্ন !

হায়রে, বেচারা কী আনন্দেই না মসগুল হয়ে রইল—কিন্তু গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত। বিশে সেপ্টেম্বরই তার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। কিছুদিন ধরেই সে বেশ ভারি হয়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে আগের মত সহজভাবে চলাফেরা করতে পারত না বলে নিজের ওপরে সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠত, নৌকো তীরে ভিড়লে নৌকো থেকেই সে তীরে লাফ দিয়ে নামত। এখন তাকে আমরা হাত ধরে নামাই। কিন্তু আমাদের চীৎকার সত্ত্বেও সে প্রায় কুড়িবার তীরে নামার চেষ্টা করেছিল ; পারেনি। নামলে সে আছাড় খেত।

সেই বিশেষ দিনের কথা বলছি। মোচির হঠাৎ তেষ্টা পাওয়ায় সেণ্ট জারমেন এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা পেক-এ থামলাম। অসুস্থ বা পরিশ্রান্ত পালোয়ানরা বাহবা নেওয়ার জন্যে যেমন মাঝে-মাঝে হঠকারীর মত কাজ করে ফেলে, মোচিও সেদিন সেইরকম একটা কাণ্ড করে বসল। নৌকো তীরে বাঁধার অপেক্ষা না করেই আমাদের হতচকিত ক'রে দিয়ে সে নৌকো থেকে লাফ দিয়ে তীরে নামার চেষ্টা করল। খুবই দুর্বল ছিল সে। পাথর দিয়ে গাঁথা তীরের ওপরে পায়ের আঙুলগুলি মাত্র ঠেকলো ; পড়েই সে হড়কে গেল। পাথরের ওপরে মুখ গুঁজে পড়ল, পাথরের সূঁচোলো মুখটা তার পেটের চামড়ায় বিঁধে গেল ; যন্ত্রণায় তীব্র একটা চীৎকার ক'রে সে গড়িয়ে পড়ল জলে ; তারপরে অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়।

আমরা পাঁচজনেই লাফিয়ে পড়লাম জলে ; অনেক কষ্টে ওপরে তুলে আনলাম ওকে। তখন সে নীল হয়ে গিয়েছে ; যন্ত্রণায় কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠছে।

কাছাকাছি একটা সরাইখানায় তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডাকলাম।

পরের দশটি ঘণ্টা বীরত্বের সঙ্গে সে যন্ত্রণা ভোগ করল। আমরা ভয় আর অনুশোচনায় তার পাশে চুপ করে বসে রইলাম। তারপরে একটা মরা শিশু প্রসব করল সে। আরও কয়েকটা দিন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সে পড়ে রইল। তারপরে একদিন সকালে

ডাক্তার আমাদের বললেন, মনে হচ্ছে মেয়েটি বিপদমুক্ত হয়েছে। মেয়েটির শরীরটা লোহার।

খুশি হয়ে আমরা তার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

আমাদের হয়ে না-কুঁ তাকে বলল—মোচি, আর কোন ভয় নেই তোমার। আমরা খুব খুশি হয়েছি।

এই কথা শুনেই সে কেঁদে উঠল। চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠল। আমাদের সামনে এই তার দ্বিতীয়বার কান্না।

তোমরা যদি জানতে আমার কত দুঃখ......কত কষ্ট......আমার আর সান্ত্বনা নেই...

কিন্তু কেন বলত?

কারণ, আমিই তাকে মেরে ফেলেছি...আমিই মেরে ফেলেছি...কিন্তু আমি চাই নি...কী কষ্ট আমার।

কাঁদতে লাগল মোচি। কী করব, কী বলা উচিৎ বুঝতে না পেরে আমরা চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে দাঁড়ালাম।

মোচি জিজ্ঞাসা করল—তোমরা তাকে দেখেছ?

আমরা একবাক্যে উত্তর দিলাম—দেখেছি।

ছেলে? তাই না?

হ্যাঁ।

বেশ সুন্দর দেখতে?

আমরা একটু ইতস্তত করলাম। আমাদের মধ্যে পেতিত ব্লিউ হচ্ছে সবচেয়ে বেপরোয়া। সে বলল—ভারি সুন্দর।

কথাটা বলা তার ঠিক হয়নি; কারণ, এই কথা শুনেই সে আবার কাঁদতে শুরু করল।

না-কুঁ সম্ভবত তাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত। তাকে শান্ত করার চমৎকার একটা পরিকল্পনা তার মাথায় গেল। জলে-ভেজা চোখ দুটিতে চুমু খেয়ে সে বলল, কেঁদ না, কেঁদ না, মোচি;—আমরা তোমাকে আর একটা ছেলে দেব।

তার হাড়ে-মজ্জায় রসিকতার যে বীজ লুকিয়ে ছিল সেটা হঠাৎ বেরিয়ে এল। তার কথা যে সে একেবারে বিশ্বাস করল তা মনে হল না। কান্নার আবেগে তখনও সে ফুলে-ফুলে উঠছিল, তা সত্ত্বেও কিছুটা ঠাট্টার সুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল—প্রতিজ্ঞা করছ?

আমরা একস্বরে উত্তর দিলাম—প্রতিজ্ঞা করছি।

মুখোশ

The mask

এলিসি-মন্তমার্টিতে সেদিন 'ফ্যান্সি-ড্রেস বল'-এর আয়োজন হয়েছিল। উৎসবটা ছিল "মিডলেনট" এর। বাঁধ ভেঙে যেমন নদীর জল বেরিয়ে আসে চারপাশ থেকে সেই রকম মানুষের স্রোত ভেসে আসছিল এইদিকে—আলোতে ঝলমল বারান্দার ওপর দিয়ে তারা নাচঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অর্কেস্ট্রার তুমুল ধ্বনি ঝড়ের মত উচ্চনাদে ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে—ঘরের দেওয়াল, ছাদ ফুঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সেই শব্দ; তারপরে রাস্তায় বেরিয়ে পাশাপাশি রাস্তা, রাস্তা ছাড়িয়ে বসতি, বসতি পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভীষণ নাদে সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়ল—মানুষের মনের গভীরে যে পশুটা ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগিয়েছিল। হই-হই করতে করতে দুর্নিবার একটা আকাঙ্খার টানে ছুটে এল মানুষ—'ফ্যান্সি-ড্রেস বল' এ যোগ দেওয়ার জন্যে।

যারা নিয়মিত এখানে আসা যাওয়া করে প্যারিস শহরের চারপাশ থেকে তারা এসেছে; যারা মোটা ধরনের রসিকতা, আমোদ-প্রমোদ, উচ্ছ্বাস-কলরব পছন্দ করে, যারা মাতাল, লম্পট, চরিত্রহীন—সব ঝেঁটিয়ে এসেছে। কেউ বাদ যায়নি। সর্বস্তরের মানুষ হাজির হয়ে জায়গাকে শ্রীক্ষেত্র বানিয়ে তুলেছে। দোকানের কর্মচারীরা এসেছে, ভিড় করেছে কুটনী আর বারবণিতারা; দরিদ্র বারবণিতা থেকে বেশ ধনী, গয়নাপরা বারবণিতা, কপর্দকহীন যুবক থেকে শুরু করে অর্থশালী ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই এসেছে। কেউ এসেছে মক্কেলের সন্ধানে, কেউ এসেছে টাকা খরচ করার তালে। অনেক যুবতী এসেছে যারা নিষ্পাপ কুসুম নয়; তবু তারা আকাঙ্খিত; সুন্দর ধোপদুরস্ত পোশাক পরে অনেকে এসেছে তাদের অনুসন্ধানে। আর একদিকে এই বিপুল বিভিন্নমুখী জনতাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে মুখোশধারীরা নাচছে। বিখ্যাত কোয়াড্রিল নাচিয়েরা তাদের চারপাশে অনেক লোক জড় করেছে। সেই বিরাট ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলিত জনতা চারটি মুখোশধারী নৃত্যবিদের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে; ঘূর্ণায়মান আবর্তে তারা নাচছে। জনতা সেই নৃত্যের তালে তালে একবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার তাদের পথ করে দেওয়ার জন্যে পিছিয়ে আসছে। এই নৃত্যবিদরা একসঙ্গে জোট পাকিয়ে নাচছে; দেখে তাদের সাপের মত মনে হচ্ছে। দুটি মেয়ে অদ্ভুত কেরামতি দেখাচ্ছে তাদের পায়ের। ভারতীয় রবার স্প্রিং দিয়ে দাবনার সঙ্গে পা দুটি তাদের বাধা রয়েছে বলে মনে হল যেন। সেই পা দুটিকে এক একবার আকাশের দিকে এমনভাবে ছুঁড়ে দিচ্ছে যে মনে হবে এবারে তারা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে; আবার সেগুলিকে গুটিয়ে নিচ্ছে তারা—প্রসারিত করছে দু'পাশে; তারপরে সামনে আর পেছনে দু'টি পা

দু'দিকে যুগপৎ লম্বা করে দিচ্ছে। এইভাবে তারা এতটা দ্রুতভাবে মাটির সঙ্গে নিজেদের দেহটা মিশিয়ে দিচ্ছে যা দেখলে কেবল খারাপই লাগে না, হাসিও লাগে।

তাদের মধ্যে একজনই একা-একা নাচছে। একটি বিখ্যাত নর্তকের অনুপস্থিতি পূরণ করার জন্যে এই মানুষটি এসেছে। তার অদ্ভুত নাচের ভঙ্গিমায় ব্যঙ্গ আর আনন্দের ধ্বনি বেরিয়ে আসছে দর্শকদের কাছ থেকে। মানুষটি রোগা, পাতলা। ফুলবাবুর পোশাক তার গায়ে; রংকরা সুন্দর একটা মুখোশ তার মুখে বসানো, বেশ সুন্দর কোঁকড়ানো তাঁর গোঁফজোড়া, মাথার ওপরে জট পাকানো পরচুলা।

গ্রেভি মিউজিয়ামে একটি সুন্দর চটকদার যুবকের মোমে গড়া যে অদ্ভুত ব্যঙ্গ প্রতিকৃতিটি রয়েছে, লোকটির চেহারা প্রায় সেইরকম। নাচের মধ্যে কোন ফাঁকি তার নেই—কিন্তু ভঙ্গিমাটি তার স্খলিত। অন্য সকলের চটকদার লম্ফঝম্পের অনুকরণ সে করছে নিশ্চয়; কিন্তু বেশী মানাচ্ছে না তাকে। মনে হল পা দুটো খোঁড়া; সে দুটির উত্থান আর পতনও তাই ছন্দবিহীন। মনে হচ্ছে একটা ছোট চ্যাপ্টা নেকো কুকুর বিরাট গ্রেহাউণ্ডদের সঙ্গে খেলা করছে। দর্শকদের ব্যঙ্গধ্বনি তাকে এমনভাবে উৎসাহিত করে তুলল যে সে আরও জোরে নাচতে শুরু করল। এই রকম উত্তেজনায় তার মাথা গেল টলে—দর্শকদের গায়ের ওপরে সে ঢলে পড়ল। তাকে পথ করে দেওয়ার জন্যে দর্শকরা সব সরে গেল। তারা সরে যেতেই লোকটি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার সেই আপাত নির্জীব দেহটির চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল দর্শকরা।

সবাই তাকে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। 'ডাক্তার,' 'ডাক্তার' বলে চীৎকার শোনা গেল চারপাশে। সেই শব্দ শুনে একটি পরিচ্ছন্ন চেহারার যুবক সামনে এগিয়ে এলেন। গায়ে তাঁর একটি কালো কোট—শার্টের ওপরে অজস্র মুক্তো বসানো। বেশ নম্রভাবেই তিনি বললেন—মেডিকেল স্কুলের আমি একজন প্রফেসর। তাঁরা তাঁকে রাস্তা ছেড়ে দিল। ডাক্তার একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। দেখে মনে হচ্ছিল ঘরটি একটি দোকান—কাগজের বাক্সে বোঝাই। সেই ঘরের একটি চেয়ারের ওপরে তিনি একটি অচৈতন্য দেহ দেখতে পেলেন। দেহটি চেয়ারের ওপরে শোওয়ানো রয়েছে। ডাক্তার প্রথমেই মুখোশটা খোলার চেষ্টা করলেন; দেখলেন, সে বড় জটিল ব্যাপার। অসংখ্য সরু-সরু তার দিয়ে পরচুলার সঙ্গে জড়ানো; শুধু পরচুলা নয়; মাথার চারপাশে ঝুরির মত তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। সহজভাবে সেগুলিকে ছাড়ানো খুবই কষ্টকর। ঘাড়ের ওপরে একটা চামড়ার খোলস বেশ শক্ত করে জড়ানো। রং ক'রে সেই খোলসটাকে মানুষের গায়ের চামড়ার মত করা হয়েছে।

একটা শক্ত বড় কাঁচি দিয়ে সব কাটতে হল তাঁকে। সব কেটেকুটে মুখোশটাকে টেনে বার করে আনতেই আসল মানুষটিকে দেখা গেল। মুখটি বৃদ্ধের, বিবর্ণ, ক্ষতবিক্ষত, পাতলা মাংসহীন বৃদ্ধের মুখ; বলিরেখায় আকীর্ণ। যারা সেই সুন্দর মুখোশপরা যুবক নর্তককে তুলে নিয়ে এসেছিল এই দেখে তারা এতই মর্মাহত হল যে একটুও হাসল না তারা; মুখ থেকে একটি কথাও বেরোল না তাদের।

তারা অবাক হয়ে সেই চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়া মূর্তিটির বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটি তার বোজানো; দেহের এখানে-ওখানে সাদা চুলগুলি ছড়ানো; তাদের মধ্যে কতকগুলি বড়-বড়—কপালের ওপর থেকে মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; কয়েকটি ছোট-ছোট গাল আর থুতনির ওপরে ফুটে বেরিয়েছে: সেই কদাকার মুখটির পাশে সেই সুন্দর, চকচকে, তাজা পালিশ করা মুখোশটা তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হাসছে।

অনেকক্ষণ পরে লোকটির জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু তখনও তাকে বেশ দুর্বল আর অসুস্থ বলে মনে হল। ডাক্তারের ভয় হল হয়ত কোন জটিল রোগে সে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

আপনি কোথায় থাকেন ?—জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

মনে হল, বৃদ্ধ নর্তকটি তাঁর স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে; তারপর মনে পড়ল তার। সে একটা রাস্তার নাম বলল। সে-রকম নাম কেউ জানে বলে মনে হল না। যে অঞ্চলে সে থাকে সেই অঞ্চলের অনেক খবরাখবর তারা নিল। অনেক কষ্টে সে সব খবর সে দিল বটে; কিন্তু যেভাবে দিল তাতে মনে হল তার মনটা তখনও স্থির হ'তে পারেনি।

ডাক্তার বললেন—চলুন; আমিই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

লোকটির সম্বন্ধে তাঁর একটা কৌতূহল জেগে উঠেছিল।

একটা বেশ উঁচু বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন। চেহারা দেখে মনে হল বড়ই দরিদ্র সেই বাড়ি। বাড়িটা তখনও পুরোপুরি তৈরী হয়নি। দুটি এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটি। অজস্র জানালায় বাড়িটা একেবারে গিজগিজ করছে। দেখলেই বেশ বোঝা যায় এ বাড়িতে যারা বাস করে তারা হচ্ছে দরিদ্র—সমাজের একেবারে তলানি যারা তারা।

কোনরকমে টানতে-টানতে রেলিঙ ধরে-ধরে ডাক্তার বৃদ্ধটিকে চারতলায় নিয়ে গেলেন। এর ভেতরে বৃদ্ধটি তার শক্তি ফিরে পেয়েছে। ধাক্কা দিতেই একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। সামনে এসে দাঁড়ালেন একটি মহিলা। তাঁরও বয়স যথেষ্ট হয়েছে; কিন্তু পরিচ্ছন্ন; অস্থিময় মুখ; মাথায় সাদা নাইট ক্যাপ—বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। একটি পরিশ্রমী, বিশ্বাসী খেটে-খাওয়া রমণীর মতই তাঁর চেহারা—পরিশ্রমে পোড়-খাওয়া, উদার, সৎ মুখের আদলটি তাঁর। তাঁদের দেখেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন—কী ব্যাপার ? কী হল ওর ?

সব শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন; এটা যে তার প্রথম দুর্ঘটনা নয় এই বলে ডাক্তারকেও নিশ্চিন্ত করলেন তিনি। তারপরে বললেন—ওকে এবারে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে স্যার। এছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। ও ঘুমোবে। কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তার বললেন—কিন্তু উনি যে কথা বলতে পারছেন না।

ও কিছু নয়। মদটা একটু বেশী খেয়েছে, এই যা। শরীরটা নরম রাখার জন্যে ও ডিনার খায়নি; তার ওপরে খেয়েছে দু'বোতল "আবসিনথ্"। ওটা না খেলে ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন ও জিনিসটা মানুষের বুদ্ধিনাশ করে। যেভাবে ও এখন নাচে সেরকম নাচার মত বয়স ওর আর নেই। না। ওর যে কোনদিন বুদ্ধি হবে সে-আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

অবাক হয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে উনি নাচেন কেন?

কাঁধে স্রাগ করলেন তিনি; মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল; ভেতরে-ভেতরে রাগের আগুন তখন তাঁর জ্বলতে শুরু করেছে।

কেন? কেন আবার? মুখোশের বাইরে থেকে সবাই ওকে যুবক বলে ভাববে; রসিক কুকুর ভেবে মেয়েরা ওর কানে ফিস-ফিস করে যতসব নোংরা কথা বলবে; সেই শুনে ও তাদের দেহে, সেই নোংরা দেহে, গা ঘষবে; তাদের চামড়ায় লাগানো সেণ্ট আর পাউডারের গন্ধ শুঁকবে। ওঃ, কি বিশ্রী, কী বিশ্রী!! কী জীবন আমার!! এই করে চল্লিশটা বছর আমাকে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু যাতে ওর কোন ক্ষতি না হয় সেই জন্যে প্রথমেই ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার, আপনি দয়া করে একটু হাত লাগাবেন? এই রকম অবস্থায় আমি একা ওকে তুলতে পারিনা!

মাতালের মত তাকিয়ে বৃদ্ধটি বিছানার ওপরে বসেছিল। লম্বা-লম্বা চুলগুলি তার মুখের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তার সঙ্গিনীর কেমন যেন মায়া হল; কিন্তু তারপরেই তিনি রেগে বললেন—দেখুন, এই বয়সেও ওর মুখটা কী সুন্দর। অথচ, ও বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে বদমাসের মত লুকিয়ে রাখে কেন? রাখে, এই জন্যে যে লোকে ওকে যুবক বলে মনে করবে। কী দুঃখের কথা! ওর মুখটা সত্যিই বড় সুন্দর, স্যার। একটু দাঁড়ান, শুইয়ে দেওয়ার আগে আমি আপনাকে তা দেখাব।

একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি; সেখানে হাত ধোবার একটা বেসিন ছিল। সেই বেসিনের ওপর থেকে একটা ব্রাশ নিয়ে বিছানার কাছে ফিরে এলেন। তারপরে সেই ব্রাশ দিয়ে বৃদ্ধ লোকটির মাথার ওপরে যে জড়ানো চুলগুলি ছিল সেইগুলি সযত্নে এদিক-ওদিক ক'রে দিলেন। সেই বিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুলগুলি দেখে মনে হবে চিত্রকররা এই রকম একটি মুখকেই মডেল হিসাবে ব্যবহার করে। সামনের দিকে দু'একপা এগিয়ে এসে তিনি একদৃষ্টিতে শায়িত স্বামীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন—এই বয়সেও চেহারাটা যথেষ্ট সুন্দর রয়েছে, তাই না?

ডাক্তার বললেন—সত্যিই বড় সুন্দর।

মহিলাটি বললেন—ওর পঁচিশ বছর বয়সের চেহারাটা যদি আপনি দেখতেন। কিন্তু এখন ওকে শুইয়ে দিতে হবে; তা না হলে, অ্যাবসিনথ্ ওর পাকস্থলীটাকে আবার গোলমাল করে দেবে। এখন ওর জামার হাতা দুটো একটু তুলে ধরুন তো। আরও একটু ওপরে...হ্যাঁ, হ্যাঁ...ব্যাস...এবারে ওর ব্রিচেশ দুটো...আমি ওর জুতো খুলে দিচ্ছি...এখন আপনি একটু তুলে ধরুন, আমি বিছানাটা গুছিয়ে দিই। ঠিক

আছে...এবার ওকে আপনি শুইয়ে দিন। আমার শোয়ার জন্যে ও যে বিন্দুমাত্র বিব্রত হবে তা ভাববেন না। শোওয়ার জন্যে বিছানার কোণে একটু জায়গা খুঁজে নেব আমি। সেজন্যে ও মোটেই ব্যস্ত নয়। বুড়োমস্তান, এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়।

বিছানার মধ্যে শুয়েছে বুঝতে পেরেই, বেচারা তার চোখ দুটি বন্ধ করে দিল, আবার খুলল। বারকয়েক পর্যায়ক্রমে খোলা আর বন্ধ করার পরে মনে হল, ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে সে এবার মনস্থির করে ফেলেছে।

সেই শায়িত মানুষটির দিকে কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থেকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে উনি 'ফ্যানসি-ড্রেস বল'-এ যুবকের অভিনয় করেন—তাই না ?

সমস্ত নাচের আসরেই, স্যার। সকালের দিকে কী বিশ্রী অবস্থায় ও যে বাড়ি ফিরে আসে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। বুঝতেই পারছেন দুঃখ আর অনুশোচনাতেই ও বাইরে ছুটে যায়। দুঃখ হচ্ছে, আগে ও যা ছিল এখন আর তা নেই ; আর নেই বলেই, এখন মানুষে আর ওকে পুছে না।

মানুষটি এখন ঘুমোচ্ছে। শুধু ঘুমোচ্ছে না, নাকও ডাকছে। ভদ্র-মহিলাটি করুণার দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন, তারপরে বললেন—ওঃ, একদিন ওই মানুষটি একের পর এক জয় করে ঘুরে বেড়াত। সে সাফল্য যে কী তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। সমাজের যে কোন অভিজাত মানুষ, অথবা সেনাপতির চেয়েও ওর বিজয় অভিযান ছিল বড় ; অনেক বেশী সাফল্যমণ্ডিত।

বলেন কী ? উনি কী করতেন তখন ?

ওর ভরা যৌবনের দিনগুলির কথা আপনি জানেন না বলেই অবাক লাগছে আপনার। ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ওই বল-এ। কারণ, প্রতিটি বলেই ও অংশগ্রহণ করত। প্রথমবার দেখেই ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। কী সুন্দর চেহারা ছিল ওর ! ওর দিকে তাকালেই চোখ দুটি আমার জলে ভরে উঠত। কাকের মত কালো দুটি চোখ। ওঃ—কী সুন্দর চেহারাই না তখন তার ছিল ! সেই রাত্রিতেই ও আমাকে নিয়ে পালিয়ে আসে। তার পর থেকে একদিনের জন্যেও ওকে আমি ছেড়ে যাইনি। না ; কোন প্রয়োজনেই না। তবুও আমাকে কম কষ্ট দিয়েছে ?

আপনারা বিয়ে করেছেন ?

মহিলাটি সহজভাবে বললেন—হ্যাঁ, স্যাঁর......তা না হলে, অন্য সকলের মত, আমাকেও ছেড়ে ও পালিয়ে যেত। আমি একাধারে ওর স্ত্রী, আর নার্স। ও যা চায় সব আমি। এই জন্যে ও আমাকে কম কাঁদায়নি। কিন্তু কোনদিন ওর সামনে আমি চোখের জল ফেলিনি।....ও আমাকে ওর নিত্য নতুন বিহার আর ভালবাসার কথা বলত। বুঝতেও পারত না সেই সব কাহিনী শুনে কত কষ্ট পেতাম আমি।

কিন্তু ওর পেশাটা কি ছিল ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছি, ভুলে গিয়েছি। মার্টেল-এর দোকানে ও ছিল হেড অ্যাসিসটেণ্ট—কদর ছিল খুব। ও ছিল একজন আর্টিস্ট। ঘণ্টায় গড়পড়তা দশ ফ্রাঁ রোজগার হোত ওর।

মার্টেল ?...ওরা কারা ?

ওরা ? ওরা হচ্ছে বিখ্যাত হেয়ার ড্রেসার; অপেরা-র অভিনেত্রীরাই হচ্ছে ওদের মক্কেল। হ্যাঁ, নামকরা সব অভিনেত্রীরা ওখানে যেত চুল বাঁধতে। অ্যামব্রইসির কাছে চুল বাঁধতে না পারলে তাদের মন খুঁতখুঁত করত। বাড়তি টাকাও তারা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে যেত। এইভাবে অনেক টাকা রোজগার করেছিল ও। আপনাকে আর কী বলব, স্যার! সব মেয়েই এক জাতের। যে পুরুষ তাদের একটু খুশি করে তাকে তারা সব কিছু দিয়ে দেয়। মেয়েদের খুশি করা কত সহজ। আর এ শিক্ষা পুরুষদের হয় না। ও আমাকে সব কথাই বলত; ও চুপ করে থাকতে পারত না।......এই সব জিনিস পুরুষদের খুব আনন্দ দেয়। মেয়েদের সঙ্গে মিশে যা আনন্দ পায় তার চেয়েও বোধ হয় বেশী পায় সেই কাহিনী ফলাও করে বলতে।

কোন-কোন দিন রাত্রিতে সে ফিরে আসত কিছুটা বিবর্ণ হয়ে; বেশ খুশি খুশি ভাব; চোখ দুটো হয়ত জ্বলজ্বল করছে। এই দেখেই আমি নিজের মনেই বলতাম—আজকে নিশ্চয় আবার একটা মেয়ে জুটিয়েছে ও। ব্যাপারটা জানার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম; একবার শুরু করলে ও আর থামতে চায় না, এই আশঙ্কায় কোনকিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভয় লাগত আমার। তখন আমরা দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

আমি জানতাম যে শেষ পর্যন্ত সে না বলে পারবে না; আর সেই জন্যেই মনে-মনে সে তৈরী হচ্ছে। তার হাবভাব, খুশ মেজাজ দেখেই আমি তা বুঝতে পারতাম। সে বলত—মেদেলিঁ, আজকের দিনটা আমার ভালই গিয়েছে। তার মুখের দিকে না তাকানোর, তার কথা না শোনার ভান করতাম আমি। খাবার টেবিল গোছানোর চেষ্টা করতাম আমি। সুপ নিয়ে তার উলটো দিকে বসতাম আমি।

সেই সময়টা সত্যি কথা বলতে কি স্যার, ওর ওপরে বিতৃষ্ণায় ভরে যেত আমার মন; মনে হোত, আমার দেহটাকে কে যেন পাথরের টুকরো দিয়ে ঠুকে-ঠুকে ভাঙছে। মনের এই অবস্থাটাই হচ্ছে সত্যিকার ভয়ঙ্কর। কিন্তু সে সব চিন্তা ওর ছিল না। ও ভাবতেই পারত না যে এসব কথা শুনতে আমার কষ্ট হয়। কাউকে এসব কাহিনী বলতে সে চাইত; তাকে যে মেয়েরা কত ভালবাসে সেই কথাটা গর্বের সঙ্গে বলার জন্যে সে আকুলি-বিকুলি করত। আর আমাকে ছাড়া আর কাকে ও বলবে......বুঝতে পারছেন আমার অবস্থাটা ? সেইজন্যেই বিষ খাচ্ছি মনে করেই সে-কাহিনী আমাকে শুনতে হোত। সুপ খেতে-খেতে সে বলত—মেদেলিঁ আজকে আর একজন এসেছিল।

আমি ভাবতাম—এবার শুরু হল। ভগবান, এ-মানুষটা কী ? এই মানুষটাকেই আমার জীবনের সঙ্গী করেছি ?

তারপরেই শুরু করত ও—আর একজন......যাকে বলে সত্যিকারের সুন্দরী।...

মেয়েটির নাম-ধাম গোত্র সব বলত; কোন্ ঘরে তারা ছিল, কী তারা করেছে, কী তারা খেয়েছে......স-ব স-ব আনুপূর্বিক বর্ণনা করে যেত ও। এই সব শুনে আমার মনটা পুড়ে যেত; কিন্তু ও বলছে তো বলছেই......একটানা বলে চলেছে।

মাঝে-মাঝে আমাকে হাসির ভান করতে হোত। সেটুকু না করলে ও ভীষণ চটে যেত। ও যা বলত তার সবটাই হয়ত সত্যি নয়; কারণ—নিজেকে ফোলানোর জন্যে অনেককিছুই বাড়িয়ে বলা ওর অভ্যাস ছিল। তার জন্যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতেও কোনরকম দ্বিধা হোত না ওর। তবে যা বলত তা যে একেবারে মিথ্যা সে রকম ভাবার পেছনেও কোন যুক্তি ছিল না। এসব রাত্রিতে তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাত। খাওয়ার পরেই সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠত।

প্রেমের উপাখ্যান শেষ করার পরে সিগারেট খেতে-খেতে সে মেঝের ওপরে পায়চারি করত। তার সেই সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমি ভাবতাম—ও আমাকে সত্যি কথাই বলে। আমি নিজেই তো ওকে দেখে একদিন উন্মাদ হয়েছিলাম। অন্য মেয়েরাও যে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

কিন্তু তবু মনটা আমার দাউ দাউ করে জ্বলতো। খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার করতে করতে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হোত আমার; ইচ্ছে হোত জানালা দিয়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ি, ও নিজের মনে সিগারেট খেত, মাঝে মাঝে হাই তুলত তারপরে শুতে যাওয়ার আগে বার দু'তিন বলত—হায় ভগবান, আজ কি আমার ঘুম হবে!

এই জন্যে ওকে আমি দোষ দিতাম না; কারণ ও বুঝতে পারত না যে ওর কথা শুনে আমি কষ্ট পাচ্ছি। এতটুকু বুঝতে পারত না। ময়ূররা যেমন পেখম তুলে নিজেদের চেহারা দেখিয়ে বেড়ায় ও-ও সেই রকম এই সব কাহিনী বর্ণনা করে নিজেকে দেখিয়ে বেড়াতে ভালবাসত। কেমন যেন ওর একটা ধারণা হয়েছিল যে সব মেয়েরাই ওর দিকে তাকিয়ে থাকে—সব মেয়েরাই ওকে পেতে চায়। বৃদ্ধ হওয়ার পরেই ব্যাপারটা হজম করা ওর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

সত্যি কথা বলছি স্যার, ওর মাথায় যখন আমি প্রথম সাদা চুল দেখলাম তখন আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম; সেই সঙ্গে আনন্দও কিছুটা হয়েছিল ঠিকই...একটা নিষ্ঠুর আনন্দ...ভীষণ-ভীষণ আনন্দ...সত্যিকার আনন্দ বলতে যা বোঝা যায় তাই। মনে মনে বললাম—বাছাধন, এইবার তোমার শেষ...শেষ। মনে হল, এবারে কারাগার থেকে মুক্তি হবে আমার। আর কোন মেয়েই ওর দিকে তাকাবে না—ও একমাত্র আমার...আমার হয়ে যাবে, আর কোন অংশীদার থাকবে না।

সেদিন সকালে বিছানায় শুয়েছিলাম আমরা। ও তখনও ঘুমোচ্ছিল। চুমু খেয়ে ঘুম ভাঙানোর জন্যে আমি ওর ওপরে ঝুঁকে পড়েছিলাম; এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল ওর মাথার ওপরে লম্বা রূপোর সুতোর মত কী একটা জিনিস চক্‌চক্ করছে। চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেল আমার। ভাবলাম, এও কি সম্ভব? একবার মনে হল, ওকে না জানিয়ে চুলটা তুলেই দিই। কিন্তু ভাল ক'রে দেখতে গিয়ে—একটু ওপরে আরও একটা সাদা চুল চোখে পড়ল আমার। সাদা চুল! ওর চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে! কথাটা ভাবতে গিয়ে বুকটা ধড়ফড় করে উঠল আমার। গায়ের চামড়া গেল ভিজে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মনে-মনে খুশিই হলাম।

এ-সব কথা নিয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করাটা আনন্দের নয়; কিন্তু সেদিন ওকে না জাগিয়ে বেশ আনন্দের সঙ্গেই সংসারের কাজ কর্ম করে গেলাম; এত আনন্দ অনেকদিনই আমার হয় নি। ঘুম ভাঙলে ওকে আমি বললাম—তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে তখন একটা জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি।

কী?

তোমার মাথার কিছু চুলে পাক ধরেছে।

কাতুকুতু দিলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, ও-ও সেইরকম বিরক্ত হয়ে চট করে বিছানার ওপরে উঠে বসল; তারপরে বেশ রাগ করেই বলল, তোমার কথা সত্যি নয়।

হ্যাঁ; তোমার কপালে। চারটে চুল পেকেছে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আয়নার কাছে দৌড়ে গেল ও। দেখতে পেল না কিছু। আমি তখন পাকানো কোঁকড়া চুল ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম—তুমি যেভাবে জীবন কাটাচ্ছ তাতে চুল পাকাটা এমনকিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। আর দুটি বছর; তারপরেই তোমার শেষ হয়ে যাবে।

স্যার, আমি সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলাম; দু'বছর পরে তাকে দেখলে আর আপনি চিনতে পারতেন না। কত তাড়াতাড়িই না মানুষের চেহারা পালটে যায়। তখনও চেহারাটা তার সুন্দরই ছিল; কিন্তু আগের মত মেয়েরা আর ওর পেছনে ছুটলো না। সেই সময়টা কী কষ্টেই না আমার গিয়েছে! বাইরে ধাক্কা খেয়ে—সেই ধাক্কা নির্মমভাবে ও আমাকে ফিরিয়ে দিল। কিছুতেই ও আর খুশি হল না। টুপীর ব্যবসা করার জন্যে ও চাকরি ছেড়ে দিল; তাতে অনেক টাকা নষ্ট করল। তারপরে চেষ্টা করল অভিনেতা হ'তে; পারল না। তারপরে নাচের মজলিসে যেতে শুরু করল। অবশ্য কিছুটা টাকা সে যে বুদ্ধিমানের মত আগেই সরিয়ে রেখেছিল তাই রক্ষা। সেটাও এমন কিছু বেশী নয়; তবে তাতেই আমাদের চলে যাচ্ছে। একসময় কত টাকাই না সে রোজগার করেছে।

বর্তমান ও কী ক'রে বেড়াচ্ছে তা আপনি নিজের চোখে দেখতে পেলেন। কেমন একটা ঝোঁক ওর ঘাড়ের ওপরে চেপে বসেছে। যৌবন ওকে ফিরে পেতেই হবে। মেয়েদের সঙ্গে নাচতে ওকে হবেই; তাদের দেহের গন্ধ, রুজ পাউডারের সুবাস তাকে শুঁকতেই হবে। হায়রে! ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।

মনে হ'ল এবার বুঝি তিনি কান্নায় ভেঙে পড়বেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাঁর ঘুমন্ত বৃদ্ধ স্বামীর দিকে গভীর স্নেহে তাকিয়ে রইলেন। স্বামীটির তখন নাক ডাকছে। ধীরে-ধীরে তার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি; তাঁর চুলের ওপরে আলতোভাবে চুমু খেলেন। এই অদ্ভুত দম্পতিকে বলার আর কিছু ছিল না ডাক্তারের। এবারে ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

দু'এক পা এগিয়ে যেতেই মহিলাটি বললেন—আপনার ঠিকানাটা একটু দেবেন? ওর শরীরটা যদি খারাপ হয় তাহলে আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব।

মাদার সুপিরিয়র-এর পঁচিশটি ফ্রাঁ

The mother superior's twentyfive franks

বৃদ্ধ প্যাভিলী; তার পা দুটি বিরাট মাকড়শার মত বাঁকানো; পুঁচকে চেহারা, লম্বা হাত; সূঁচলো দাড়ি—আর মাথার খুলির চারধারে আগুনে রঙের লাল চুলের গুচ্ছ। সব জড়িয়ে মানুষটাকে একটা বিদূষক ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। মানুষটা সত্যিই একটি ভাঁড়, চেহারা আর পেশায়। তবে বেশ আমুদে সরল—প্যাঁচোয়া নয়। চাষীর ছেলে প্যাভিলী, নিজেও সে চাষী। শরীরের নানা ভঙ্গী দেখিয়ে সে লোক হাসাত। লেখাপড়া সে জানত না; ওই ভাঁড় সেজেই সে তার রুজি-রোজগার করত। হ্যাঁ, ভগবান তাকে গ্রামের অজস্র দরিদ্র মানুষদের, থিয়েটারে পয়সা দিয়ে যাওয়া যাদের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব ছিল না, তাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের কিছুটা আনন্দ দেওয়ার জন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করত। আমোদ করার জন্যে লোকেরা কাফের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখত, মদ খাওয়াতো। সেও বোতলের পর বোতল শেষ করে ফেলত; যারা সেখানে আসত-যেত তাদের আনন্দ দিত। কেউ তাতে বিরক্ত হোত না; সবাই তার রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ত।

চেহারাটা বলতে গেলে তার কুৎসিতই ছিল; তবু তার অঙ্গভঙ্গী দেখে মেয়েরাও কোন আপত্তি করত না; তারাও খিলখিল করে হাসত। সে তাদের কাঁধের ওপরে তুলে দেওয়াল, খানা, অথবা কোন আস্তাবলের ধারে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে কাতুকুতু দিত যে হাসতে-হাসতে তাদের পেটে খিল ধরে যেত; একহাতে পেট চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে তারা তাকে ঠেলে দিত। এই ঠেলা খেয়ে সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পিছিয়ে আসত; তার হাবভাব দেখে মনে হোত সে বোধ হয় আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। তার সেই ভঙ্গিমা দেখে মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ত; হাসির দাপটে চোখ ফেটে তাদের জল গড়িয়ে পড়ত। এই দেখে তিন লাফে সে ফিরে এসে তাদের দেহটা ধরে এমন কৌশলে ঝাঁকানি দিত যে তারা আর বাধা দিতে পারত না; শেষ পর্যন্ত তারই কাছে নিজেদের ছেড়ে দিত।

একবার জুন মাসের শেষদিকে ফসল কাটার জন্যে রুভিল-এর কাছে লে হারিভুর খামারে সে গেল। তিনটি সপ্তাহ দিনরাত্রি ধরে সে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ক্ষেতের মজুরদের নেচে-কুঁদে আনন্দ দিল। ফসল কাটার সময় মজুররা কাজ করতে করতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত; আর কাটা ফসলের শিষ বাঁধতে বাঁধতে সে এমন সব অঙ্গভঙ্গী করত যে মাঠের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মজুরেরা হো-হো করে হেসে মাঠ একেবারে ফাটিয়ে দিত। রাত্রিতে চারপায়ের ওপরে ভর দিয়ে জন্তুর মত মেয়েদের আস্তানায় হাজির হোত। অন্ধকারে তাদের খুঁজে বেড়াত; সবাই হইচই

করে জেগে উঠত; ছোট ছোট ডাণ্ডা নিয়ে তাকে তাড়া করত। সেই তাড়া খেয়ে সে হনুমানের মত চারপায়ে অদ্ভুতভাবে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে যেত। তাই দেখে হো-হো করে হেসে উঠত সবাই।

ফসল কাটার শেষ দিনে মজুররা সব মাথায় ফিতে জড়িয়ে, ব্যাগ পাইপ বাজিয়ে একটা ওয়াগনে চেপে রওনা হল। ছ'টা ঘোড়া সেই গাড়ীটাকে ধীরে ধীরে টানতে লাগল। গাড়োয়ান ছিল ঢিলে পোশাক পরা একটা ছোকরা। সবাই মদ খেয়ে গাড়ীর ওপরে নাচছে; আর তাদের মাঝখানে মেয়েদের মধ্যে বুড়ো প্যাভিলী মদে চুর হয়ে নেচে নেচে ধিনতা-ধিনা করতে লাগল। তার শরীরের অদ্ভুত ভঙ্গিমায় সেই মজুর ছোকরারা হাঁ করে বসে নানান ঢঙে হেলে দুলে তাল দিতে লাগল।

তারপরে লে হারিভুর খামারের ধারে গিয়ে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যাভিলী দুটো হাত ওপরে তুলে গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ল মাটিতে, কিন্তু মাটিতে নামার আগে দুর্ভাগ্যবশত গাড়ীর একটা লম্বা কাঠে ধাক্কা খেয়ে পড়ল গিয়ে চাকার ওপরে। সেখান থেকে ছিটকে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। পড়েই চুপ করে গেল। একটি চোখ বন্ধ আর একটি চোখ মেলে ধূলোর ওপর চুপ করে পড়ে রইল তার বিরাট দেহটা। ভয়ে মুখটা তার নীল হয়ে গিয়েছে তখন। সেই দেখে তার বন্ধুরা লাফিয়ে পড়ল নীচে। তার ডান পায়ে হাত দিতেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল। তারা যখন তাকে ধরে তুলতে গেল, তখন সে দাঁড়াতে পারল না; মাটিতে পড়ে গেল।

একজন চীৎকার করে বলল—নিশ্চয় ওর পা ভেঙেছে।

কথাটা সত্যি। পা একটা সে ভেঙেছে।

তাকে ধরাধরি করে সবাই খামারের ভেতরে নিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার এলেন। ক্ষেতের মালিক তার চিকিৎসার খরচ দেবেন এই শুনে ডাক্তারবাবু তাঁর নিজের গাড়ীতে করে তাকে একটা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। সেইখানেই তার পায়ের হাড়টাকে বসিয়ে দেওয়া হল।

যখন সে বুঝতে পারল এ-অসুখে মারা যাওয়ার তার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই, এখানে তাকে খেতে দেওয়া হবে, তাকে ওষুধ দেওয়া হবে, তার যত্ন নেওয়া হবে—তখনই সে অন্য মানুষ হয়ে গেল। কোনরকম কাজকর্ম না থাকার ফলে বিছানার ওপরে শুয়ে-শুয়ে সে নিঃশব্দে মহাখুশিতে টেনে-টেনে হাসতে লাগল। সেই হাসির চোটে তার পোকায় কাটা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

সিস্টার তার বিছানার ধারে হাজির হলেই সে তার দিকে চেয়ে মুখ ভেঙাত, চোখ মারত, নাক বাঁকাত। শরীরের এই ভঙ্গিমাগুলি দেখাতে এতটুকু কষ্ট হোত না তার। পাশাপাশি যে সব রোগীরা শুয়ে থাকত তারা বেশ আনন্দ পেত তাতে। সিস্টার-ও মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার এই সব নিরপরাধ ব্যঙ্গ কৌতুক উপভোগ করার জন্যে কিছুটা সময় তার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াত। প্যাভিলীও তাকে খুশি করার জন্যে নিত্য নতুন মতলব ভাঁজতো।

একদিন প্যাভিলী ঠিক করল সিস্টারের কাছে গান গাইবে। তার গান শুনে সিস্টার মহাখুশি। তারপরে তার গানের ধারাটা পালটানোর জন্যে সিস্টার একদিন তাকে প্রার্থনা সঙ্গীতের একটা বই এনে দিল। বইটা পেয়ে সে ধীরে-ধীরে বিছানার ওপরে উঠে বসল—পাটাও তার সেরে আসছিল তখন। বিছানায় বসে নানান সুরে সে যীশুর স্তব, ভগবান আর তাঁর 'হোলি গোস্ট' এর স্তব গাইতে শুরু করল; আর সিস্টার তার বিছানার একধারে বসে তাল দিতে লাগল হাতের তালু বাজিয়ে। সে মাটিতে হাঁটতে শুরু করল। এই দেখে মাদাম সুপিরিয়র তাকে দিয়ে গির্জায় গান গাওয়ানোর উদ্দেশ্যে আরও কিছুদিন ধরে রাখতে চাইলেন। প্যাভিলীর এতটুকু আপত্তি ছিল না তাতে। পরের একটি মাস মহা আনন্দে গান করতে লাগল; সন্ধ্যাবেলা গির্জায় না গিয়ে অনেকেই হাসপাতালে ভিড় করতে লাগল তার মুখে হাসির গান শোনার জন্যে।

পৃথিবীতে সব কিছুরই শেষ হয় একসময়। প্যাভিলীর মেয়াদও শেষ হয়ে এল একদিন। হাসপাতাল ছাড়ার সময় এল তার। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মাদার সুপিরিয়র তাকে পঁচিশটা ফ্রাঁ বকশিস দিলেন।

টাকাটা পকেটে পুরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল প্যাভিলী। রাস্তায় এসে দাঁড়ানো মাত্র সে ভাবতে লাগল এবার সে কী করবে? গ্রামে ফিরে যাবে? উঁহুঁ! অনেকদিন সে পেট পুরে আরাম করে মদ খায়নি। সেই সাধ পূর্ণ হওয়ার আগে গ্রামে ফেরার কোন কথাই ওঠে না। সুতরাং একটা কাফেতে ঢুকল সে। শহরে সে খুব কমই এসেছে—বছরে একবার কি দু'বার। শহরে আসার একমাত্র আকর্ষণ মদ আর মেয়েমানুষ। তার কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছিল যে মানুষ ওই জন্যেই শহরে আসে। সেও ঠিক করে ফেলল—মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে সেও একটু স্ফূর্তি করে যাবে।

কাফেতে ঢুকেই এক গ্লাস কনিয়্যাক-এর অর্ডার দিল সে। কনিয়্যাক আসামাত্র সবটা গলায় ঢেলে একটু ভিজিয়ে নিল; তারপরে জিনিসটা কী রকম খেতে তাই জানার জন্যে আর একটা গ্লাস গলায় ঢাললো। ব্র্যানডিটা গলায় ঢালাব সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল। এই জ্বালাময় আনন্দ অনেকদিন সে পায়নি। গলায় ঢালার সঙ্গে-সঙ্গে একটা তিক্ত বিষণ্ন, উত্তেজক অনুভূতি তাকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলল যে মনে হল গোটা বোতলটাই সে নিঃশেষ করে ফেলে। কিন্তু অন্য মদও তাকে খেতে হবে। এই জন্যে ওই বোতলটার দাম কত জানতে চাইল। দাম তিন ফ্রাঁ জেনে পুরো বোতলটাই গলায় ঢেলে দিল। তারপরে অন্য মদ খেয়ে সে একেবারে মাতাল হয়ে গেল।

কিন্তু যাতে অন্য স্ফূর্তি করার শক্তি সে হারিয়ে না ফেলে সেদিকেও সে সাবধান হয়ে গেল। তার চোখের ওপরে চিমনীগুলো কাঁপতে শুরু করেছে বুঝতে পেরেই সে উঠে পড়ল; তারপরে বগলে একটা বোতল নিয়ে স্খলিত পায়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বেশ্যাপাড়ার পথ ধরল। পথে একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করল—সে বলতে

পারল না। একটা পিওনকে জিজ্ঞাসা করল—সে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিল। একটা রুটিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতে সে তাকে যা-নয়-তাই বলে গালাগালি দিল। শেষকালে একটি বরকন্দাজ দয়াপরবশ হয়ে তাকে সঙ্গে করে একটি বেশ্যাবাড়ির দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল; বলে গেল, এইখানেই "কুইন" থাকে।

তখনও সূর্য মধ্য গগনে এসে হাজির হয়নি। সেই রসের অন্তঃপুরে মহা আনন্দে ঢুকে গেল প্যাভিলী। বাড়ির চাকরাণী তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু নানারকম বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করে সে তাকে হাসালো; তার পরে তিনটি ফ্রাঁ দেখাল। ওই জায়গায় বিশেষ আমোদ প্রমোদের রেট-ই হচ্ছে ওই। তারপরে একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অনেক কষ্ট করে পরে সে দোতলায় উঠল। ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে "কুইনকে" ডেকে পাঠালো। ডেকে পাঠিয়েই বোতল খুলে খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিল।

দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে এল দীর্ঘাঙ্গিনী, মোটাসোটা, লালমুখী, বিশালবপুধারিণী একটি রমণী। অভ্রান্ত দৃষ্টি আর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে লোকটিকে একবার সে যাচাই করে নিল; তারপরে চেয়ারে উপবিষ্ট সেই মাতালটাকে বলল—এ সময়ে আসতে তোমার লজ্জা করল না?

সে জড়িয়ে-জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে-ন, কে-ন বলত রাজকন্যা?

তুমি একটি ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করতে এসেছ—তার দুপুরের খাবার খাওয়ার আগেই—এই জন্যে।

প্যাভিলী হাসার একটু চেষ্টা করে বলল—সাহসী মানুষের কাছে কোন সময়ই অসময় নয়।

বুড়ো-হাবড়া কোথাকার—মাতলামি করার এ সময় নয়।

ক্ষেপে উঠল প্যাভিলী; বলল—প্রথমত আমি বুড়ো নই; দ্বিতীয়ত আমি মাতাল নই।

মাতাল নও?

কক্ষনো না।

তাহলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না কেন?

মেয়েটির বন্ধুবান্ধবরা সব খেতে বসেছে; আর সে অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে এই ভেবে মেয়েটি রোষকষায়িত চক্ষে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল।

প্যাভিলী উঠে দাঁড়িয়ে বলল—এই দেখ, আমি 'পোলকা' নাচ নাচছি।

তার পা যে কাঁপছে না, সে যে মাতাল হয়নি এটা প্রমাণ করার জন্যেই সে চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গী করল; তারপরে বিছানার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। সেই পরিষ্কার বিছানার চাদরের ওপরে তার কাদা-মাখামাখি জুতোর দুটি বিরাট ছাপ পড়ে গেল।

মেয়েটা চীৎকার করে উঠল—হতচ্ছাড়া, নচ্ছার, পাজি...

এই বলে তার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার পেটে এইসা জোরে একটা ঘুষি মারল যে বেচারা প্যাভিলী তাল সামলাতে না পেরে কোচের নিচে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল; সেখান থেকে আর একটা ডিগবাজি খেয়ে পড়ল ড্রয়ারের গায়ে। ড্রয়ারের ওপরে ছিল মুখ ধোওয়ার বেসিন আর জলের কুঁজো—প্রচণ্ড চীৎকার করতে-করতে সেই দুটো নিয়ে সে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপরে। সেই ধস্তাধস্তি আর তার প্রচণ্ড হৃদয়বিদারক চীৎকারে সেখানকার সবাই দৌড়ে এল—মঁসিয়ে থেকে শুরু করে মাদাম, চাকর-চাকরাণী সবাই।

মঁসিয়েই প্রথম তাঁকে মেঝে থেকে তোলার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পায়ের ওপরে দাঁড় করানোর সঙ্গে-সঙ্গে প্যাভিলী আবার মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ল; পড়েই তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল—তার একটা পা ভেঙে গিয়েছে—এবারে তার ভাল পা-টা।

কথাটা সত্যি। দৌড়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল তারা। এই ডাক্তারটি সেই আগের; ইনি সে হারিভুর খামারে প্যাভিলীর প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিলেন।

প্যাভিলীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আবার আপনি? কী হয়েছে আপনার?

আর একখানা পা ভেঙে গিয়েছে ডাক্তার।

কী করে ভাঙলো?

এই বেশ্যাটা ভেঙে দিয়েছে।

তাঁর এই মন্তব্যে সবাই বিরক্ত আর অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার বললেন—এই দুর্ঘটনাটা আপনার ক্ষতি করবে মঁসিয়ে। টাউন কাউন্সিল আপনাদের সুনজরে দেখে না। এই ঘটনার কথা তাদের কানে গেলে তারা আপনাদের সহজে ছেড়ে দেবে না।

কী করা উচিৎ তাহলে?—জিজ্ঞাসা করলেন মঁসিয়ে।

উচিৎ হচ্ছে এইমাত্র যে হাসপাতাল থেকে ও ছাড়া পেয়েছে সেই হাসপাতালে ওকে এখনই পাঠিয়ে দেওয়া; আর সেই সঙ্গে ওর চিকিৎসার খরচ দেওয়া।

মঁসিয়ে বললেন—কেলেঙ্কারীর চেয়ে খরচই বরং আমি দেব।

আধঘণ্টা পরে মত্ত অবস্থায় গোঙাতে-গোঙাতে যে হাসপাতাল সে ঘণ্টাখানেক আগে ছেড়ে গিয়েছিল, প্যাভিলী আবার সেই হাসপাতালে ফিরে এল।

মাদার সুপিরিয়র মহা-আনন্দে দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে; হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কী হল ভাই?

আর একটা পা ভেঙেছে, ডিয়ার সিস্টার।

আবার তুমি খড়ের গাদায় উঠেছিলে? পাগল কোথাকার...

বিভ্রান্ত হয়ে প্যাভিলী জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল—না, না,...এবার খড়ের গাদা নয়...তবে দোষটা আমার নয়—এবারে দোষ হচ্ছে খড়ের তৈরী শতরঞ্জির।

মাদার সুপিরিয়র বুঝতে পারলেন না এর জন্যে দায়ী হচ্ছে তাঁর পঁচিশটি ফ্রাঁ।

খোঁড়া

The cripple

১৮৮২ সালের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল ঘটনাটা।

ট্রেনের একটা ফাঁকা কামরায় সেইমাত্র ঢুকে নিরুপদ্রবে কাটানোর জন্যে দরজাটা সবেমাত্র বন্ধ করে দিয়েছি এমন সময় দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। কে যেন বলছে শুনলাম—সাবধানে আসুন স্যার। আমরা লাইনের ধারে এসে পৌঁচেছি। পাদানিটা খুব উঁচুতে।

আর একটা স্বর শোনা গেল তার পরেই—ভয় নেই লরেঁ! আমি শক্ত করেই ধরছি।

তারপরেই একটা মাথা ঢুকে এল। মাথার ওপরে একটা গোল টুপী। কামরায় দু'পাশে যে চামড়ার দড়ি ঝোলানো ছিল, সেই দড়ি দুটি হাতে শক্ত করে ধরল। সব শেষে একটা বেশ মোটা চেহারার শরীর ঢুকে এল। কামরার মেঝেতে পা দেওয়ামাত্র লোহায়-লোহায় ঘর্ষণ খেয়ে যেরকম ধাতব একটা শব্দ হয় সেই রকম শব্দ হল। সমস্ত শরীরটা ভেতরে ঢুকে আসার পরে দেখলাম যাত্রীটির দুটি পা-ই কালো কাঠের।

এই যাত্রীটির পেছনে আর একটা মাথা উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—ঠিক আছে স্যার ?

হ্যাঁ।

এই আপনার জিনিসপত্র, আর ক্রাচ রইল।

যে চাকরটি কথা বলছিল তাকে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সেনানী বলেই মনে হল। কালো আর সবুজ কাগজে মোড়া, শক্ত ক'রে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোটখাট অনেকগুলি বাণ্ডিল ছিল তার হাতে। সেগুলি সে একটি-একটি করে নামিয়ে তার মনিবের মাথার ওপরের র‍্যাকে বেশ ভাল করে গুছিয়ে রাখল; তারপরে বলল—এই সব রইল স্যার। মিষ্টি, পুতুল, ড্রাম, গান, আর এইটা—মোট পাঁচটা।

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

মামুলি দু'চারটে কথা বলে চাকরটি বিদায় নিল। যাওয়ার সময় বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা। এতক্ষণে, সহযাত্রীটির দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখার সময় পেলাম আমি।

মাথার চুলগুলি তার সবই প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছে বটে, তবু আমার মনে হল বয়স তার পঁয়তিরিশের ওপরে যাবে না। তার জামার ওপরে নানা রকম স্মারক চিহ্ন ঝুলছে। গোঁফ রয়েছে, বেশ শক্ত সমর্থ; খুব কর্মঠ মানুষ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন একটু খিটখিটে হয়ে যায় আগন্তুকটিকে দেখে আমার কিছুটা সেই প্রকৃতিরই মনে হল।

কপালের ঘাম মুছে একটু জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি; মনে হল তিনি যেন বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তারপরে সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সিগারেট খেলে কি আপনার কোন অসুবিধে হবে স্যার?

না, স্যার। নিশ্চয় না।

ওই চোখ, ওই স্বর, ওই মুখ—খুব পরিচিত বলেই মনে হল আমার। কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক মনে করতে পারলাম না। নিশ্চয় একদিন ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি। এবং নিশ্চয় একদিন ওঁর সঙ্গে আমি করমর্দন করেছি। কিন্তু সে অনেক দিন আগে। কতদিন আগে স্মৃতির কুয়াশায় তা ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। আগন্তুকটিও ঠিক সেইভাবেই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল তিনিও যেন তাঁর স্মৃতির ভাঁড়ার খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অস্বস্তির সঙ্গে দু'জনেই আমরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলাম; চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনেই মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে লুকোচুরি খেলার পরে আমিই কথা বললাম প্রথম—সত্যিই স্যার, এইভাবে ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের দিকে তাকানোর ছলনা না করে কোথায় আমাদের পরিচয় হয়েছে সেটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করাটা কি আমাদের উচিৎ হবে না?

ঠিকই বলেছেন স্যার—আমার সহযাত্রীটি মিষ্টি ক'রে বললেন।

আমি তাঁকে আমার নাম বললাম। তিনি বললেন—আমার নাম হেনরী বুক্রেয়ার। আমি এখন ম্যাজিস্ট্রেট।

একটু চুপ করে রইলেন তিনি; ইতস্তত করলেন একটু; তারপরে বেশ অনিশ্চয়তার সঙ্গে বেশ কষ্ট ক'রে তিনি বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ; ঠিকই মনে হচ্ছে। অনেকদিন হল, যুদ্ধের আগে, পঁয়সেল-এ আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। প্রায় বার বছর হবে।

হ্যাঁ; তাই বটে। আপনিই লেফটন্যাণ্ট রেভালিয়ের?

হ্যাঁ। উড়ন্ত গোলায় আমার দুটি পা একসঙ্গে উড়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম।

অপরিচিতির কুয়াশা কেটে যাওয়ার পরে আমরা আবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

খুব ভাল ক'রেই এবার মনে পড়ে গেল আমার। তখন ইনি ছিলেন দোহারা চেহারার সুন্দর তরুণ। কী তৎপরতার সঙ্গেই না ইনি তখন সৈন্য পরিচালনা করতেন। ঝড়ের মত বেগে ঝাঁপিয়ে পড়তেন শত্রুবাহিনীর ওপরে। সেই জন্যে তাঁর নাম ছিল 'দুরন্ত ঝড়'। কিন্তু সেই দুরন্তপনার মধ্যে এর আর একটি চরিত্র অলক্ষ্যে কাজ করত; সেটি হচ্ছে হৃদয় সম্পর্কিত—প্রণয়ের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ রয়েছে। যদিও সেটি ক্ষণস্থায়ী ছিল। ঘটনাটা আমি একদিন জানতাম; আজ আমি ভুলে গিয়েছি। ঠিক যেমন-ভাবে কুকুর শিকারের গন্ধ শুঁকে বেড়ায় আমিও তেমনি মনের গহনে সেই বিস্মৃতপ্রায় অনুভূতিটি হাতড়াতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গেল; আমার সামনে ভেসে উঠল একটি যুবতীর মুখ। সশব্দে ফাটা ক্র্যাকারের মত তার নামটাও হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। তার নাম হচ্ছে মিলি দি ম্যানডেল। সমস্ত ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেল। এটা একটা প্রেমের কাহিনী অবশ্যই; কিন্তু অতি সাধারণ। আমার সঙ্গে যখন এই যুবকের আলাপ হল তখন ওদের মধ্যে প্রেম বেশ জমে উঠেছে। তাদের যে শীঘ্রই বিয়ে হবে সে কথাও শুনতে পেলাম; যুবকটিও মেয়েটিকে খুব ভালবাসত।

কিছুক্ষণ আগে চাকরটি যে সব জিনিস র‍্যাকের ওপরে রেখে গিয়েছিল ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সেগুলি ঠক ঠক করে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। সেইদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি। হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা রোমাণ্টিক চিন্তা আমার মনের মধ্যে ঝলকে উঠল। এরকম রোমাণ্টিক কাহিনী আমরা গল্প-উপন্যাসে সাধারণত পড়ে থাকি। এই সব কাহিনীতে বাগদত্তা মেয়ে অথবা ছেলে দুর্ঘটনায় পড়ার পরেও তাদের প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনীকে বিয়ে করেছে। সেই দুর্ঘটনা দেহেরই হোক অথবা অর্থ সম্বন্ধীয়ই হোক—তাতে তারা পিছপাও হয় না। সেই রকম, যুদ্ধে বিকলাঙ্গ হওয়ার পরে এই যুবকটি যুদ্ধশেষে তার প্রেয়সীর কাছে ফিরে আসে, এবং প্রেয়সী তাকে বিয়ে করে।

বই-এর কাহিনীতে এই ধরনের আত্মত্যাগ খুবই সহজ, এই ব্যাপারটিকেও আমি তেমনি সুন্দর এবং সহজ ভেবেছিলাম। এই সব উদার কাহিনী পড়ে আমাদের হৃদয়ও ঔদার্যে বিস্তৃত হয়, আত্মদান করার বিরাট উৎসাহে উৎসাহিত হই; অথচ, পরের দিনই কোন হতভাগ্য বন্ধু সামান্য কিছু অর্থ ধার করতে আমাদের দ্বারস্থ হলে বিরক্তিতে আমাদের গাটা রি-রি করে ওঠে।

কিন্তু তারপরেই অকস্মাৎ আর একটি সম্ভাবনার কথা উঁকি দিয়ে গেল। এটি কম রোমাণ্টিক এবং বেশী মাত্রায় বাস্তব। সম্ভবত, হয়ত যুদ্ধে তার পা দুটি উড়ে যাওয়ার আগেই তাদের বিয়ে হয়েছিল; ফলে যুদ্ধের পরে মেয়েটি তাকে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে, বাধ্য হয়েছে তাকে সান্ত্বনা দিতে, তার সেবাশুশ্রূষা করতে।

ছেলেটি কি সুখী হয়েছিল, না, যন্ত্রণা পেয়েছিল? ব্যাপারটা কী জানার একটু ইচ্ছে হয়েছিল আমার; কিন্তু পরে সেই ইচ্ছে প্রবল হ'তে হ'তে একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ালো। পুরোটা না হোক; বিশেষ-বিশেষ কিছু সূত্র পেলেও কাহিনীটি আমি কল্পনা দিয়ে গেঁথে নিতে পারব। মামুলি কিছু কিছু আলাপ আলোচনার পরে র‍্যাকের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম—তাহলে সাকুল্যে ওরা পাঁচজন? স্ত্রী, দুটি ছেলে, একটি মেয়ে, আর নিজে। ওই পাঁচজনের জন্যে পাঁচটি উপহার বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার ছেলেপুলে হয়েছে, স্যার?

আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই, স্যার।

হঠাৎ আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম; মনে হল, আমি কোন অশালীন ব্যবহার করেছি, বললাম—ক্ষমা করবেন। আপনার সঙ্গীটি খেলনার যে ফিরিস্তি দিয়ে গেল তাতে আপনার সম্বন্ধে আমি ওই কথাই ভেবেছিলাম। অনেক সময় মনোযোগ না দিয়েই মানুষ অন্য লোকের কথা শোনে; আর তাই শুনে উপসংহার টানে।

একটু হেসে তিনি বিড় বিড় করে বললেন—না। আমি বিয়ে করিনি, আমাদের ব্যাপারটা বেশীদূর এগোয়নি।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার; বললাম—তা বটে, তা বটে। আপনার সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল তখন, যতদূর মনে হয়, মিলি দি ম্যানডেলের সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়েছিল।

হ্যাঁ, স্যার। আপনার স্মরণশক্তি অদ্ভুত।

সাহস পেয়ে বললাম—হ্যাঁ; মনে পড়েছে আমার। যতদূর শুনেছি, মিলি যাঁকে বিয়ে করেছেন তাঁর নাম মঁসিয়ে...মঁসিয়ে...।

শান্তভাবে পাদপূরণ করলেন তিনি—মঁসিয়ে দি ফ্লুরেল।

হ্যাঁ, তাই বটে। এই বিয়ের পটভূমিকাতেই আপনার আহত হওয়ার সংবাদ আমি পেয়েছিলাম।

আমি তাঁর মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি একটু লজ্জা পেলেন।

হেরে যাওয়ার পরে মানুষ যেমন মাঝে-মাঝে নিজের হয়ে জগতের কাছে কৈফিয়ৎ দেয়, সেইরকম একটা আগ্রহ নিয়ে তিনি বললেন—মাদাম দি ফ্লুরেল-এর সঙ্গে আমার নাম যোগ ক'রে লোকে ভুল করে স্যার। দুটি পা হারিয়ে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পরে সে আমাকে বিয়ে করুক এ-প্রস্তাবে কিছুতেই আমি রাজি হতাম না। একাজ করা কি সম্ভব? করুণা প্রচার করার জন্যে কেউ বিয়ে করে না, স্যার। মেয়েরা বিয়ে করে একটি পুরুষের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত বেঁচে থাকার জন্যে। আর সেই মানুষটি যদি আমার মত বিকলাঙ্গ হয় তাহলে তাকে বিয়ে করার অর্থই হচ্ছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জ্বালা আর যন্ত্রণাকে স্বীকার করে নেওয়া। সত্যি কথা বলতে কি স্যার একটা সীমা পর্যন্ত সমস্ত রকম আত্মত্যাগ অথবা আকর্ষণকে আমি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু কিছু হাততালি বা বাহবা পাওয়ার জন্যে কোন মেয়ে যদি তার জীবনের সব আনন্দ, সব স্বপ্ন নষ্ট করতে যায় তার সেই আত্মত্যাগকে কোন মতেই আমি সমর্থন করতে পারিনা। যখন আমার ঘরের মেঝেতে প্রতিটি পা ফেলার সময় আমার ক্রাচ-এর তলায় লোহার পাতের শব্দ হয় তখন মাঝে-মাঝে উন্মাদের মত চাকরটার গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে যায় আমার। পুরুষ নিজে যা সহ্য করতে পারে না আপনি কি মনে করেন মেয়েটি চিরজীবন ধরে তা-ই সহ্য করুক এটা সে চায়? তার ওপরে, আপনার কি মনে হয় আমার এই কাঠের পা দুটি দেখতে খুব সুন্দর......

চুপ করে গেলেন তিনি। আমি তাকে কী বলব? মনে হল, তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। মেয়েটিকে কি আমি দোষ দিতে পারি, না ঘৃণা করতে পারি? তাঁর বা মেয়েটির বিরুদ্ধেই কি কোন রায় দিতে পারি? না। তবু কৌতূহল মেটে না মানুষের। আমি তাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম—মাদামের ছেলেপুলে রয়েছে?

রয়েছে। একটি মেয়ে, দুটি ছেলে। তাদের জন্যেই এই সব খেলনা নিয়ে যাচ্ছি।
তাঁর স্বামী এবং তিনি নিজেও আমাকে বেশ ভালবাসেন।

সেন্ট-জাঁর্সের পাহাড়ের ওপর দিয়ে আমাদের ট্রেন তখন উঠতে শুরু করেছে। টানেলের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে, স্টেশনে এসে থেমে গেল ট্রেনটা।

বিকলাঙ্গ অফিসারটিকে নামায় সাহায্য করার জন্যে আমি এগিয়ে গেলাম; এমন সময় খোলা দরজার ভেতর দিয়ে দুটি হাত ঢুকে এল।

তুমি কেমন আছ, ডিয়ার রিভেলিয়ার?

তোমরা ভাল তো, ফ্লুরেল?

লোকটির পেছনে তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে; একমুখ হেসে দস্তানায় ঢাকা আঙুলগুলি উঁচিয়ে তিনি তাঁর দিকে নাড়ছেন। তাঁর পাশে একটি বাচ্চা মেয়ে আনন্দে নাচছে। দুটি ছেলে লোভীর মত দুটি ড্রামের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের বাবা তখন ট্রেনের কামরা থেকে ওই দুটি ড্রাম আর বন্দুকটা নামিয়ে আনছিলেন।

বিকলাঙ্গ মানুষটি প্লাটফর্মে নামতে ছেলেমেয়েরা চারপাশ থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তাঁরা চলতে লাগলেন। বাচ্চা মেয়েটা তার ছোট হাতে পরম স্নেহে একটা ক্রাচের মসৃণ দেহটা ধরে রেখেছে। মনে হল সে যেন তার কোন প্রিয় বন্ধুর একটা হাত ধরে চলেছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী পিন

The rival pins

মেয়েরা একেবারে জানোয়ার, জানোয়ার!

অর্থাৎ?

তারা আমার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছে।

তোমার সঙ্গে?

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে।

অনেকগুলি, না, একটি মেয়ে?

দুটি।

একই সঙ্গে?

হ্যাঁ, একই সঙ্গে।

কী রকম বলত।

বুলেভার্ডের ওপরে বিরাট একটা কাফে। তারই সামনে দুটি যুবক মুখোমুখী বসে মদে জল মিশিয়ে খাচ্ছিল। মদের রঙটা দেখতে হয়েছিল "ওয়াটার-কালার পেন্টের" মত।

তাদের বয়স প্রায় একই রকমের—পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। একজন সুন্দর, আর একজন কালো। কেতাদুরস্ত চেহারা দু'জনেরই। এদের মত মানুষদেরই সাধারণত স্টক একস্চেঞ্জে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, দেখা যায় ড্রয়িং রুমে। এদের গতি সর্বত্র, বাসা এদের সব জায়গা ; আর যেখানে এরা যায় সেখানেই তারা প্রেম ক'রে বেড়ায়। কালো চেহারার লোকটি বলল, দিপির সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদে মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তার সঙ্গে আমার যে একটা অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল সে কথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি।

হ্যাঁ ; তা বলেছ।

এই অন্তরঙ্গতার অর্থ কী তা তুমি জান। প্যারিসে আমার একটি প্রণয়িনী রয়েছে ; তাকে আমি খুব ভালবাসি। সে-ই আমার পুরনো বন্ধু, আর বেশ ভাল বন্ধু। আসল কথাটা, তার সঙ্গে প্রেম করাটা কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস ?

হ্যাঁ ; অভ্যাস ছাড়া আর কী ? তার আমার দু'জনেরই এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাকে আমি ছাড়তে চাইনি। তার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল সেই ছোকরাটিও বেশ সুন্দর। তাকে আমারও খুব ভাল লাগত। বেশ হাসিখুশি ভাব, আমার সত্যিকারের বন্ধু। ছোট্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় তাদের বাড়িতেই আমার জীবন কেন্দ্রীভূত ছিল।

তারপর ?

তারা প্যারিস ছেড়ে আসতে পারল না বলেই দিপিতে নিজেকে মৃতদার বলে মনে হল আমার।

দিপিতে গিয়েছিলে কেন ?

হাওয়া বদলাতে। শহরের বিলাসে সারা জীবন তুমি কাটাতে পার না।

বলে যাও।

তারপরেই সমুদ্রতটে ওই ক্ষুদে মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ হল।

ওই সিভিল সার্ভেন্টের বউ-এর সঙ্গে ?

হ্যাঁ। মনের দিক থেকে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মেয়েটি। একমাত্র রবিবারের দিনগুলিতেই তার স্বামী ঘরে আসত ; আর স্বামী তো নয়, একেবারে যাচ্ছেতাই বস্তু। তার অবস্থাটা কী তা আমি ভালই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে আমরা দু'জনে গল্প করলাম, হাসলাম, এবং নাচলাম।

বাকিটা ?

হ্যাঁ, তবে পরে। আমাদের দেখা হত ; পরস্পরকে পছন্দ করলাম আমরা ; আমি যখন বললাম—'তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে'—সে আমার মুখ দিয়ে আবার সেই কথাটা বলিয়ে নিল—আমার কথাটা যে ঠিক সেটা যেন সে যাচাই করে নিতে চায়। ফলে আমার পথে সে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি।

তুমি কি তাকে ভালবাসতে ?

হ্যাঁ; কিছুটা। মেয়েটি বড় ভাল।

আর একজনকে?

সে তো তখন প্যারিসে। ছ'টি সপ্তাহ্ ধরে দিনগুলি আমাদের ভালোই্ কাটলো; তারপর, পরম বন্ধুর মত আমরা ফিরে এলাম। কোন মহিলার ওপরে তোমার কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও কেমন করে তার কাছ্ থেকে দূরে সরে যাওয়া যায় তা কি তুমি বলতে পার?

নিশ্চয় পারি।

কী করে?

আমি তাকে বর্জন করি।

শুরু কর কেমন ক'রে?

তার সঙ্গে দেখা করতে যাই্না।

সে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে?

তাহ্লে...আমি...আমি বাড়িতে নেই্।

যদি সে আবার ফিরে আসে?

আমি বলি আমি অসুস্থ্।

সে যদি তোমাকে দেখতে চায়?

তাহ্লে আমি তার সঙ্গে একটু নোংরামি করি।

সেটাকেও যদি সে হ্জম করে ফেলে?

তখন আমি তার স্বামীর নামে বেনামা চিঠি ছেড়ে সাবধান ক'রে দিই্। যেদিনটা তার আমার কাছে আসার কথা সেদিনটা তার গতিবিধি লক্ষ্য করার নির্দেশ দিই্।

ওইটাই্ আসল কথা। কিন্তু কাউকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই্। মেয়েদের আমি পরিত্যাগ করতে পারিনা। আমি তাদের সংগ্রহ্ করি। কারও সঙ্গে আমি বছরে একবার দেখা করি, কারও সঙ্গে দশ মাসে একবার; কারও-কারও সঙ্গে দিনে তিনবার; আর কারও-কারও সঙ্গে বাইরে ডিনার খাওয়ার সময়। যাদের সঙ্গে আমার দিন ঠিক করা রয়েছে তাদের নিয়ে আমার কোন অসুবিধে নেই্; অসুবিধে হ্চ্ছে নতুন সংগ্রহ্দের নিয়ে।

তারপর?

তারপর ওই্ ক্ষুদে সিভিল সার্ভেন্টটি রেগে কাই্ হ্য়ে গেল। তার অবশ্য দোষও নেই্। তার স্বামী সারাটা দিনই্ প্রায় অফিসে কাটাতেন। বেচারা একেবারে বেকার। তাই হ্ঠাৎ-হ্ঠাৎ আমার বাড়ি আসার চেয়ে ভাল কাজ তার হাতে ছিল না। দু'বার সে আমাকে পায়নি।

শয়তান কোথাকার!

যা বলেছ। এই্ ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্যে আমি ওদের দিন ঠিক করে দিয়েছিলাম। সোমবার আর শনিবার দিলাম পুরনো বন্ধুটিকে; মঙ্গল, বৃহ্স্পতি আর রবিবার ঠিক করে দিলাম নতুনটিকে।

এইরকম পক্ষপাতিত্ব কেন ?

বুদ্ধু কোথাকার। নতুনটির বয়স অনেক কম যে !

সপ্তাহে মাত্র দু'টি দিন তাহলে ছুটি ছিল তোমার !

ওই তো যথেষ্ট।

আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

কিন্তু বিবেচনা কর, পৃথিবীর মধ্যে যাকে বলে সবচেয়ে হাস্যকর আর হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্তমানে তাই ঘটেছে। চার মাস ধরে পরিকল্পনাটি নিখুঁতভাবে কাজ করেছে। দু'জনের সঙ্গেই আমি শুয়েছি, সত্যিকারের সুখী হয়েছিলাম। হঠাৎ একটি সোমবারে অশনিপাত হল।

একটা বেশ দামী সিগারেট টানতে-টানতে আমার প্রথম প্রেমিকার জন্যে আমি অপেক্ষা করে বসেছিলাম। সময়টা তখন দুপুর একটা বেজে পনের। বসে-বসে আমি স্বপ্নের জাল বুনছিলাম ; খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল নির্ধারিত সময় অতিক্রম করেছে। হঠাৎ অবাক হয়ে গেলাম আমি ; কারণ, এসব বিষয়ে সে একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে ; কিন্তু আমি ভাবলাম হয়ত আকস্মিক কোন কারণে সে সময়টা রাখতে পারেনি। যাই হোক, আধ ঘণ্টা কাটলো, তারপরে এক ঘণ্টা ; তারপরে দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। আমি নিশ্চিত হলাম হয়ত তার মাথা ধরেছে, অথবা কোন অপ্রত্যাশিত অতিথি এসে হাজির হয়েছেন। তাই সে আসতে পারে নি। এইভাবে অপেক্ষা করাটা সত্যিই বড় কষ্টকর...সম্পূর্ণ অর্থহীন...ভারি বিরক্তিকর ; এই ধরনের প্রতীক্ষা স্নায়ুর ওপরে বেশী চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে, অবশ্যম্ভাবীর কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম ; তারপরে কী করা উচিৎ বুঝতে না পেরে আমি তাকে দেখতে গেলাম।

দেখলাম সে একটা উপন্যাস পড়ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপারটা কী ?

সে বেশ শান্তভাবে বলল—আমি যেতে পারিনি...আমাকে যেতে দেয়নি।

কেন দেয়নি ?

ওঃ—মানে...ওই সব ব্যাপার ?

কী সব ব্যাপার ?

ওই একটি বিরক্তিকর অতিথি।

আমার মনে হল যে কোন কারণে আসল কারণটা সে আমাকে বলতে রাজি নয় ; আর এ ব্যাপারে তাকে মোটেই উত্তেজিত দেখা গেল না বলেই আমিও কোন অস্বস্তি বোধ করলাম না। পরের দিন অপর প্রেমিকার ওপর দিয়ে আমার ক্ষতিটা পুষিয়ে নেব এই কথাটাই ভেবে নিলাম আমি।

সেই জন্যে বৃহস্পতিবার...খুব উত্তেজিত হয়ে প্রেমিকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে হল, তাকে আমি খুব ভালবাসি। সে যে কিছুটা আগে আসছে না কেন এই ভেবে অবাক হলাম। অধীরভাবে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম

আমি। পনের মিনিট পেরোল, পেরিয়ে গেল আধ ঘণ্টার সীমানা; তারপরে বাজলো দুটো।...আর সহ্য করা কষ্টকর হয়ে উঠল আমার পক্ষে; ঘরের মধ্যেই আমি পায়চারি করতে লাগলাম। সিঁড়ির ওপরে তার পায়ের শব্দ হচ্ছে কি না তাই শোনার জন্যে আমি কান পেতে রইলাম।

বাজলো আড়াইটে! তারপরে তিনটে! টুপীটা মাথায় চাপিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম আমি। সে কী করছিল জান কি বন্ধু? নভেল পড়ছিল।

আতঙ্কিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কী বলত?

বেশ শান্তভাবেই সে বলল—যেতে পারলাম না কেন জান? যেতে দিল না আমাকে।

কে দিল না?

ওঃ...ওই সব ব্যাপার।

কিন্তু...ব্যাপারটা কী?

একটি বিরক্তিকর অতিথি এসে হাজির হল। কী ক'রে যাই?

অবশ্য আমি তখনই বুঝতে পারলাম যে ও সব জানে, কিন্তু তার মধ্যে কোনরকম মানসিক উদ্বেগের চিহ্নটুকু না দেখে আমার মনে হল নিশ্চয় কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। ও যে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করবে সেকথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। ঘণ্টাখানেক ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তার সঙ্গে গল্প করলাম; এর মধ্যে তার বাচ্চা মেয়েটা অন্তত ডজনখানেক বার আমাদের ঘরে এল আর গেল। তারপরে বিরক্ত হয়ে আমি উঠে গেলাম। পরের দিন কী হল জান...

একই ঘটনা?

হ্যাঁ...তারপরের দিনও তাই। পুরো তিনটি সপ্তাহ ধরে ওই একই ব্যাপার ঘটে গেল। কেন ঘটছে, এর পেছনে আসল কারণটা কী তা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না; অবশ্য সন্দেহ একটা আমার হয়েছিল।

তারা দুজনেই জানতে পেরেছিল?

অবশ্যই। কিন্তু কী ক'রে? কারণটা খুঁজে বার করার আগে পর্যন্ত কী দুর্ভাবনাতেই না আমার কেটেছে ক'দিন?

শেষ পর্যন্ত তুমি বার করলে কেমন ক'রে?

আমাদের চিঠি পড়ে। একই দিনে একই ভাষায় তারা আমাকে বর্জন করল।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম। মেয়েদের দেহে যে অনেক পিন থাকে তা নিশ্চয় তুমি জান। হেয়ার পিনের ব্যাপারটা আমি জানি। ওদের আমি বড় অবিশ্বাস করি; সব সময় খুঁজে বেড়াই কোথাও ওটা পড়ে রয়েছে কি না। কিন্তু অন্য পিনগুলি বড়ই বিশ্বাসঘাতক—ওই হতচ্ছাড়া কালো কালো মাথার পিনগুলি—আমাদের চোখে দেখতে সবাই প্রায় একই রকমের—মূর্খ আমরা—কিন্তু তুমি যে স্বচ্ছন্দে ঘোড়া

আর কুকুরের পার্থক্যটা বলে দিতে পার—ওরা তার চেয়েও স্বচ্ছন্দে ওই জাতীয় দুটি পিনের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তা বলে দিতে পারে।

সম্ভবত একদিন আমার ওই ক্ষুদে আমলাতান্ত্রিক মহিলাটি আমার আয়নার ধারে তার ওই তুচ্ছ পিনটি ফেলে গিয়েছিল। আমার প্রথম প্রেমিকা সেটি দেখে বুঝতে পেরেছিল যে ওটি অন্য পিন, এই দেখে বিনা বাক্যব্যয়ে সে সেই পিনটি তুলে নিয়ে নিজের পিনটি—আকৃতির দিক থেকে দুটি পৃথক ছিল—একই জায়গায় রেখে গেল।

পরের দিন আমার আমলাতান্ত্রিক প্রেমিকা তার সম্পত্তি ফিরিয়ে আনতে গিয়েই দেখল তার সম্পত্তিটি হস্তান্তরিত হয়েছে; তার জায়গায় আর এক জনের সম্পত্তি পড়ে রয়েছে। তখন তার সন্দেহ হল। সেদিন সে তার দুটি পিন খুলে এড়োএড়ি করে ফেলে রেখে গেল। আমার প্রথম প্রেমিকা এই টেলিগ্রাফিক ইঙ্গিতের উত্তর দিল তার তিনটি কালো মাথার পিন দিয়ে—একটার ওপরে আর একটা চাপিয়ে সেইখানে ফেলে গেল সে।

শুরু হওয়ার পর দ্রুতগতিতে এই খেলা কিছুদিন ধরে চলল; কেউ কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করল না, শুধু দু'জনেই দু'জনের ওপরে লক্ষ্য রাখতে লাগল। তারপরে সম্ভবত আমার প্রথম প্রেমিকা—সেই কিছুটা দুঃসাহসিনী—পিনের সঙ্গে নিজের ঠিকানা লেখা একটা ছোট কাগজ মুড়ে রেখে গেল একদিন।

তারপরেই তাদের পত্রালাপ শুরু হল। আমার কপাল পুড়লো। বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা করাটাও তাদের কাছে বেশ সহজ ছিল না। এসব ব্যাপারে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ততটা সতর্ক হয়েই তারা চলছিল। হঠাৎ আমার প্রথম প্রেমিকা বেশ দুঃসাহসের সঙ্গেই দ্বিতীয় প্রেমিকার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বসল। তাদের নিজেদের মধ্যে কী কথা হল তা অবশ্য আমি জানিনা। আমি যেটুকু জানি তা হচ্ছে এই যে আমি তাদের কাছে বেশ একটা মজার খেলায় পরিণত হয়েছিলাম।

এই কি সব?

হ্যাঁ, এই সব।

তাদের সঙ্গে আর তুমি দেখা কর না?

নিশ্চয় করি। তবে বন্ধুর মত। পাকাপাকিভাবে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি।

এবং তাদের মধ্যেও আবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে?

আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

বটে, বটে! এরপরেও কিছু মাথায় ঢুকছে না তোমার?

না। কী বলত?

গবেট কোথাকার! আরে ওই জন্যেই তো তারা সেফটি-পিন রেখে গিয়েছিল।

দুচো

Duchox

ক্লাব ঘরটাকে এতটা উত্তপ্ত করা হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যেন আগুন ছুটছে। ক্লাবের প্রধান সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ব্যারণ মর্দিয়েঁ তাঁর ফার ওভারকোটের বোতামগুলি খুলে দিলেন। কিন্তু বাইরে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে এমন কড়া শীত তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে তিনি ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। তাছাড়া, খেলায় টাকা হেরেছিলেন সেদিন; আর বেশ কিছুদিন ধরে অজীর্ণতে ভুগছিলেন; ফলে ইচ্ছেমত খেতে তিনি পারতেন না।

বাড়ির কাছাকাছি এসে আর একটা চিন্তা তাঁকে ক্লিষ্ট করে তুলল। তাঁর সেই বিরাট নির্জন ঘর; তাঁর সেই বিরাট প্রাচীন শয্যা—যেটির কথা ভাবলেই মৃত্যুশয্যা বলে মনে হয়—এদের কথা মনে হতেই তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। পাশের ঘরে চাকর ঘুমোচ্ছে—তাঁর প্রসাধন-গৃহে স্টোভের ওপর জল ফোটার শব্দ হচ্ছে। বাড়ির সেই নিরানন্দ পরিবেশের কথা মনে হতেই তাঁর দেহের মধ্যে যে শীতার্ত শিহরণ বয়ে গেল বাইরের শীতের চেয়েও সেটি অনেক বেশী নিষ্করুণ।

কয়েক বছর ধরেই নিঃসঙ্গতার একটা পাষাণ-ভার তাঁর বুকের ওপরে চেপে বসেছে। কিছু-কিছু অবিবাহিত বৃদ্ধদের এই রকম নিঃসঙ্গতার পাষাণ-ভারে জর্জরিত হতে হয়। এমন একটা সময় ছিল যখন তিনি মনের জোরেই দিন গুলি আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারতেন। তখন তিনি বৃদ্ধ। কোন কিছু করতেই আর তার ভাল লাগে না। ব্যায়াম তাঁকে ক্লান্ত করে তুলত। বেশী খাওয়া-দাওয়া অসুস্থ করত; এমন কি, আগে যে মেয়েদের নিয়ে তিনি এত স্ফূর্তি করতেন সেই মেয়েদেরও আজকাল আর তাঁর ভাল লাগে না।

সেই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন। একই রকম সান্ধ্য মজলিস, একই ক্লাব, একই বন্ধুবান্ধব, একই রকম আলোচনা, সেই তাস খেলা, সেই হারজিত, এমন কি একই মেয়েদের নিয়ে একই রকমের কুৎসা প্রচার—বিরক্তিকর, বিরক্তিকর। মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হোত এবারে তিনি আত্মহত্যা করবেন। এইরকম একঘেয়ে বিবর্ণ জীবন আর যেন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। কী জানি কেন তাঁর মনে হচ্ছিল এবারে একটু শান্তি চাই, চাই বিশ্রাম, আর একটু আরাম।

তাই বলে অবশ্য বিয়ে করার কথা তিনি চিন্তা করেননি; কারণ বিয়ে করার অর্থকে তিনি দাসত্ব বলে মনে করতেন। বিয়ে করার অর্থই হচ্ছে নারী আর পুরুষের একান্ত সহবাস; আর এ দুটি নর-নারী বিশেষ পরিচিতির ফলে বৈচিত্র্যহীন, যারা পরস্পরকে এমনভাবে চেনে যে একজনের প্রতিটি ভঙ্গী অপরের স্পষ্ট। বাস্তবের

এই রুক্ষ মাদকতাহীন দৈনন্দিন জীবনের ব্যভিচারের মুখোমুখী দাঁড়ানোর সাহস ছিল না তাঁর। ব্যারণ মনে করতেন, নারীরা ততক্ষণই কামনীয়া যতক্ষণ তারা অল্প বা অপরিচিতির অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, যতক্ষণ তাদের ধরা-ছোঁওয়া যায় না—যতক্ষণ তাদের মনের অতলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সেই জন্যেই তিনি এমন একটি সংসার কামনা করেছিলেন যেখানে সাংসারিক জীবনের অত্যাচাব নেই; যেখানে তিনি দিনের কিছুটা অংশ কাটাতে পারেন। নিজের ছেলের স্মৃতিটা আবার তাঁকে অস্থির করে তুলল।

গত একটি বছর ধরে এই ছেলের কথা ক্রমাগত তিনি ভেবেছেন; তার সঙ্গে দেখা করার, পরিচিত হওয়ার বাসনা দিন দিন তাঁর বেড়েছে, আর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ার ফলে বেশ কষ্টও পেয়েছেন তিনি। এই ঘটনাটা ঘটেছিল তাঁর যৌবনে। তখন তাঁর মনটা রোমান্সে ভরপুর ছিল। ছেলেটিকে দক্ষিণ ফ্রান্সে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। মার্সেলিস-এ মানুষ হয়েছিল সে। কিন্তু তার বাবার নাম সে জানত না। শৈশবে, পাঠ্যাবস্থায় এবং তারপরেও তার ভরণপোষণের সমস্ত খরচ তার বাবাই দিতেন। তারই ফলে ছেলেটির বিয়ে ভালই হয়েছিল। গোপন রহস্য ফাঁস না করে একজন বিশ্বাসী আইনজ্ঞের মারফতে এই কাজটি ব্যারণ করেছিলেন।

ব্যারণ শুধু এইটুকুই জানতেন যে মার্সেলিস-এর কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় তাঁর ছেলে থাকে। ছেলেটি মোটামুটি বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত; আর সে বিয়ে করেছে একটি আর্কিটেক্ট এবং সার্ভেয়ার-এর মেয়েকে; শ্বশুরের মৃত্যুর পরে তাঁরই ব্যবসাটির মালিক হয়েছে সে। ছেলেটি যে বেশ টাকা রোজগার করে সে সংবাদও তাঁর কানে এসেছে।

নিজের পরিচয় ফাঁস না করে তিনি সেই অপরিচিত ছেলের বাড়ি যাবেন না-ই বা কেন? তার সঙ্গে আলাপ করে তিনি দেখতে চান জীবনের বাকি ক'টা দিন ছেলের সঙ্গে কাটানো যায় কি না। ছেলেটির জন্যে তিনি অকৃপণ ভাবেই খরচ করেছেন। ছেলেও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে-সব গ্রহণ করেছে। এই সব ভেবেই তাঁর মনে হল ছেলেটির অযৌক্তিক কোন দম্ভ নেই। এই চিন্তা করেই দক্ষিণে যাওয়ার আকাঙ্খা তাঁর হয়েছিল; এবং দিন-দিন সে আকাঙ্খা বাড়ছিল তাঁর। মনের ভেতরে আরও একটা চিন্তা খেলা করছিল তাঁর। সমুদ্রোপকূলে একটি মিষ্টি বাড়ির কথা ভাবছিলেন তিনি। সেখানে রয়েছে তাঁর সুন্দরী যুবতী পুত্রবধূ। নাতি-নাতনী আর ছেলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। একান্ত আপনার জনের কাছে থাকার ফলে তাঁর সেই অল্প-পরিসর অথচ আনন্দের দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাবে। তাঁর একমাত্র অনুশোচনা হচ্ছে তাঁর ভূতপূর্ব বদান্যতা—এই বদান্যতাই ছেলেকে মানুষ করার পথে সাহায্য করেছিল—আর তারই ফলে উপকারকারীর মূর্তিতে তিনি আর তাদের কাছে হাজির হতে পারবেন না।

এই সব কথা চিন্তা করতে-করতে মাথার ওপরে ফার কোটটা টেনে দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে দেরী হল না তাঁর। চলন্ত একটা

গাড়ী থামিয়ে তার ওপরে চড়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। ঘুমন্ত চাকরকে ডেকে দরজা খুলিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন—লুই, কাল সন্ধ্যায় আমরা মার্সেলিস যাচ্ছি। সম্ভবত, দিন পনের সেখানে আমরা থাকব। খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেল।

পীত বর্ণের সমতল আর পাহাড়ঘেরা সূর্যকরোজ্জ্বল গ্রামের মধ্যে দিয়ে রোন নদীর বালিভরা তীরের পাশ দিয়ে ছুটে চলল ট্রেন। একটি রাত্রি গাড়ীতে কাটিয়ে ব্যারণ বিষণ্ণভাবে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখছিলেন। প্যারিসের আবছায়া আলোতে এতদিন যা তাঁর চোখে পড়েনি, দক্ষিণের পরিচ্ছন্ন আলোতে মুখের ওপরে বার্দ্ধক্যের সেই বলিরেখাগুলি তাঁর চোখে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল। নিজের মনেই তিনি বিড়-বিড় করে বললেন—হায় ভগবান, এ যে দেখছি শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছি।

মার্সেলিস-এ নেমে একটা গাড়ী ভাড়া করলেন তিনি; তারপরে একসারি গাছের একেবারে শেষ প্রান্তে রোদে কাঠফাটা একটি গ্রাম্য বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। গাছের সারির ভেতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বেশ খুশি হয়েই তিনি বললেন—না, জায়গাটা সত্যিই বড় সুন্দর।

হঠাৎ পাঁচ ছ' বছরের একটি বাচ্চা ঝোপের ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে আগন্তুকের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

ব্যারণ এগিয়ে গিয়ে বললেন—সুপ্রভাত খোকা।

খোকা কোন উত্তর দিল না।

চুমু খাওয়ার জন্যে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিতেই তার মুখ দিয়ে রসুনের এমন একটা কড়া গন্ধ বেরিয়ে এল যে তিনি তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন—এ নিশ্চয় মালির ছেলে।

তারপর তিনি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

দরজার সামনে সারি-সারি কাচা প্যাণ্ট, জামা, তোয়ালে শুকোচ্ছে, জানালার ওপরে ঝুলছে মোজার দঙ্গল। দেখলেই মনে হবে কষাই-এর দোকানে শিকে বাঁধা মাংসের টুকরো ঝুলছে।

একটি চাকরাণী তাঁর ডাক শুনে বেরিয়ে এল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—মঁসিয়ে দুচো বাড়িতে রয়েছেন?

চাকরাণী বলল—বৈঠকখানায় বসে তিনি নক্সা আঁকছেন।

তাঁকে বল মঁসিয়ে মার্সি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, তাই বুঝি? আসুন, আসুন। মঁসিয়ে দুচো, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বিরাট একটা ঘরে ঢুকলেন ব্যারণ। জানালার শার্সিগুলি অর্দ্ধেকটা বন্ধ থাকার ফলে ঘরের ভেতরে বিশেষ আলো পড়েনি। তাঁর কেমন যেন মনে হল ঘরের ভেতরে নোংরা জমে রয়েছে।

একটা টেবিলের ওপরে একগাদা কাগজপত্র ছড়ানো ছিল। সেই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একজন বেঁটেখাটো টেকো লোক কাজ করছিল। কাজ বন্ধ করে সে এগিয়ে

এল। তার বোতাম খোলা ওয়েস্ট কোট, ঢলঢলে ট্রাউজার, জামার হাতা দুটো গোটানো। এই সব দেখে মনে হবে ঘরটা বেশ গরম। তার কাদা মাখানো জুতো দেখে মনে হবে সম্প্রতি সে অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছিল।

সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—কার সঙ্গে আমি কথা বলছি...

তার স্বরের মধ্যে দক্ষিণ ফ্রান্সের উচ্চারণী ঢঙটা প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমার নাম মঁসিয়ে মারলিঁ। এই অঞ্চলে বাড়ি—জমি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কিছুটা আলোচনা করতে এসেছি।

তাই বুঝি! ভাল, ভাল।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে তার স্ত্রী সেলাই করছিল। তার দিকে তাকিয়ে দুচো বলল—জোসেপিন, একটা চেয়ার খালি ক'রে দাও।

ব্যারণ তাকিয়ে দেখলেন জোসেপিন যুবতী—বয়স বছর পঁচিশের কাছাকাছি; কিন্তু গ্রাম্য নারীদের মত এরই মধ্যে সে যেন বুড়িয়ে গিয়েছে। দেখেই মনে হয় শরীরের ওপরে কোন যত্ন নেয় না; পরিষ্কার করে না তার দেহ। সত্যি কথা বলতে কি টয়লেট প্রভৃতি শরীর চর্চার যে সব অসংখ্য প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করে নারীরা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাদের যৌবনকে ধ'রে রাখে সেগুলির কোনটিই তার অঙ্গে পড়ে নি। তার কাঁধের ওপরে একটা তোয়ালে ছিল; তার সেই ঘন কালো চুলগুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কপালের চারপাশে। দেখে মনে হল সেই চুলগুলির ওপরে কোনদিন চিরুণী পড়েনি। তার সেই শক্ত হাত দুটি দিয়ে চেয়ারের ওপর থেকে সে একটা বাচ্চার জামা, একটা ছুরি, একটা লোহার তার, একটা শূন্য ফুল রাখার পাত্র, আর চিটচিটে একটা প্লেট তুলে নিয়ে আগন্তুককে তাতে বসতে বলল।

বসলেন ব্যারণ; তারপরে লক্ষ্য করলেন দুচো যে টেবিলের ওপরে কাজ করছিল সেই টেবিলের ওপরটাও যথারীতি অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে—তার পড়ার বই ছাড়াও, সদ্যকাটা লেটুসের ডাঁটা, একটা জল ঢালার পাত্র, একটা হেয়ার ব্রাশ, একটা তোয়ালে, একটা রিভলভার, আর সেই সঙ্গে কয়েকটা শূন্য চায়ের কাপ পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপরে।

আগন্তুক টেবিলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে দুচো একটু হেসে বলল—ঘরটা বড় অপরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য দুঃখিত আমি। ছেলেদের জ্বালায় কিছু পরিষ্কার রাখার উপায় রয়েছে?

এই বলেই সে চেয়ার টেনে নিয়ে আগন্তুকের সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা বলার চেষ্টা করল; মার্সেলিস-এর আশেপাশে আপনি একটু জায়গা চান?

যদিও ব্যারণ তার কাছ থেকে একটু দূরেই বসেছিলেন, তবু দুচোর মুখ থেকে কড়া রসুনের একটা গন্ধ ভেসে এল তাঁর নাকে। ফুলের গন্ধ শোঁকার মত দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসীরা রসুনের গন্ধ শুঁকতে ভালবাসে।

ব্যারণ জিজ্ঞাসা করলেন—গাছতলায় যাকে দেখলাম সে কি আপনার ছেলে?

হ্যাঁ। মেজ ছেলে।

তাহলে আপনার ছেলে হচ্ছে দুটি ?

তিনটি স্যার—বছরে একটি করে—কথাটা বলতে গিয়ে মনে হল গর্বে তার বুক ভরে উঠেছে।

পূর্ব কথার জের টানলেন ব্যারণ—হ্যাঁ, এই কাছাকাছি একটু জায়গা খুঁজছিলাম—মানে একটু নির্জন সমুদ্রের উপকূলে...

দুচোর মুখে কথার ফুলঝুরি ফুটে বেরোল। সে বলল তার সন্ধানে দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশটি প্লট রয়েছে ঠিক ওই রকম। যার ঠিক যেরকমটি পছন্দ সেইরকম জমি সন্ধানে রয়েছে। এই সব আলোচনা করার সময় পরিপূর্ণ আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সে তার টেকো মাথাটিকে বারবার দোলাতে লাগল।

সেই ক্ষুদ্র চেহারার, গৌরবর্ণা, কিছুটা বিষণ্ন মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। সে তাঁকে ভাবের আতিশয্যে "প্রিয়তম " "প্রিয়তম" বলে সম্বোধন করত। সেই মধুর স্মৃতিটা তাঁকে উন্মাদ করে তুলত। তিনটি মাস ধরে সে তাঁকে কী ভালই না বেসেছিল। তারপরেই অন্তঃসত্বা হয়ে পড়ে। তার স্বামী কোন একটি কলোনীর গভর্ণর ছিলেন। তাঁরই অনুপস্থিতিতে সে গর্ভবতী হয়; ভয় আর আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে মেয়েটি আত্মগোপন করে। সেই সময়েই এই ছেলেটির জন্ম হয়। জন্মের পরে ব্যারণ এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ছেলেটিকে দূরে সরিয়ে দেন। সেই থেকে তাঁদের কেউ-ই আর ছেলেটিকে দেখেননি।

তারপরে মেয়েটি কলোনীতে তার স্বামীর কাছে ফিরে যায়। বছর তিনেক পরে সেইখানে ক্ষয়রোগে সে মারা যায়। তাঁর পাশে বর্তমানে যে বসে রয়েছে এ তাঁদের সেই ছেলে। দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলল—জায়গার কথা যদি বলেন স্যার...তাহলে এমন সুবর্ণ সুযোগ...

দক্ষিণা বাতাসে মৃদুগুঞ্জনের মত আর একটি মিষ্টি সুর ব্যারণের কানে ভেসে এল—প্রিয়তম—আমরা কোনদিনই ছাড়াছাড়ি হব না।

সেই শান্ত, নীল, আবেগমাখা দুটি চোখের দৃষ্টি আবার তাঁর মনের দরজায় উঁকি দিল। সেই সঙ্গে সামনে বসা সেই ছেলেটির দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। এর চোখ দুটিও গোলাকার, নীল; কিন্তু শূন্য তার চাহনি। তার চেহারা দেখলেই হাসি পায়। মায়ের মতই তার চেহারা, তবু যেন কত তফাৎ—তার চাল-চলন, হাব-ভাব, উচ্চারণ সবই তার মায়ের মত; হনুমানের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য যেটুকু—ছেলেটির সঙ্গে তার মায়ের সাদৃশ্যও তার চেয়ে বেশী নয়। তবু এই ছেলে তারই রক্ত দিয়ে গড়া, তার অনেক ছোটখাটো অভ্যাস এই ছেলেটির মধ্যে সংক্রামিত, কিন্তু সেগুলি সবই বিকৃতির মধ্যে দিয়ে এর মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই দু'জনের সাদৃশ্যটা ব্যারণের কাছে প্রকট হতে লাগল; একটা দুঃস্বপ্নের কবলে পড়লে মানুষ যেমন অস্থির হয়ে ওঠে, তিনিও সেইরকম মনে মনে অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন, তারপরে কোনরকমে বিড়-বিড় করার ভঙ্গিতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—জমি কখন আমরা দেখতে পারি ?

ইচ্ছে হলে, আগামীকালই।

তাই হবে। কখন ?

বেলা একটার সময়।

ঠিক আছে।

যে ছেলেটিকে তিনি রাস্তায় দেখেছিলেন সে ঘরের মধ্যে ঢুকে কাঁদতে-কাঁদতে বলল—বাবা!

কেউ তার দিকে নজর দিল না।

সেখান থেকে পালিয়ে আসার একটা অদম্য উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে মর্দিয়েঁ উঠে পড়লেন। 'বাবা' শব্দটি বুলেটের মত তাঁকে গিয়ে আঘাত করল।

সেই রসুনের গন্ধ মুখে ছড়ানো 'বাবা'—সেই দক্ষিণ ফ্রান্সের 'বাবা' যেন তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। হায়রে, অতীতে তাঁর প্রিয়তমার গা দিয়ে যে সুগন্ধ বেরোত তা কত মিষ্টি!

দুচো পিছু-পিছু বাড়ির বাইরে এগিয়ে এলে ব্যারণ জিজ্ঞাসা করলেন—এইটিই আপনার বাড়ি ?

হ্যাঁ, স্যার। সম্প্রতি এইটাই আমি কিনেছি। এর জন্যে আমি গর্বিত। আমি যে সৌভাগ্যবান সেকথা আমি অস্বীকার করব না। কারও কাছে আমার ঋণ নেই। নিজের চেষ্টাতেই আমি বড় হয়েছি—আমি ঋণী নিজের কাছেই।

দরজার সামনে সেই বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে আবার চীৎকার করল—বাবা।

তাঁর মনে হল এ স্বরটা যেন অনেক দূর পথ অতিক্রম করে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। মর্দিয়েঁ ভয়ে শিউরে উঠলেন; একটা আতঙ্ক তাঁকে প্রায় গ্রাস করে ফেলল। ভয়ঙ্কর কোন বিপদ থেকে মানুষ যেভাবে পালিয়ে যায় তিনিও সেই রকম পালিয়ে এলেন। তিনি ভাবলেন—আমি কে ও নিশ্চয় ধরে ফেলবে। তারপরেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরে 'বাবা' বলে ডেকে ওই রসুনের গন্ধে ভরা মুখে তাঁকে চুমু খাবে।

কাল আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে স্যার!

কাল, বেলা একটার সময়।

সাদা রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ী ঘড়ঘড় ক'রে ছুটতে শুরু করল।

তিনি চীৎকার ক'রে বললেন—ড্রাইভার, সোজা স্টেশনে চল।

দুটি স্বর তাঁর পিছু-পিছু ছুটতে লাগল, একটি অনেকদিন আগে শোনা মিষ্টি স্বর—প্রিয়তম। আর একটি বিশ্রী কাংসকণ্ঠের ধ্বনি—বাবা! মনে হল পলায়মান চোরকে ধরার জন্যে যেমন কেউ চেঁচিয়ে বলে—ওকে থামাও—'বাবা' শব্দটা যেন সেই রকম।

পরের দিন সন্ধ্যায় যথারীতি ক্লাবে হাজির হ'তেই কাউন্ট দ্য এড্রেলিস তাঁকে বললেন—তিনদিন তোমাকে আমরা দেখিনি। তুমি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে ?

হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। মাঝে-মাঝে আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়।

রাঁদিভূ

The rendezvous

মেয়েটির মাথায় ছিল টুপী; গায়ে ছিল কোট। কালো ঘোমটাটা তার নাক পর্যন্ত টানা। চার চাকার গাড়ীতে ঢোকামাত্র আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়ার জন্যে আর একটা কালো ঘোমটা সে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। ছাতার বাঁট দিয়ে সে তার জুতোর ওপরে ঠুকলো; তারপরে নিজের ঘরে বসে ভাবতে লাগল প্রমোদ বিহারে সে এবার বেরোবে কি না।

কিন্তু তবু স্টক্এক্সচেঞ্জে তার স্বামী বেরিয়ে গেল [তার স্বামী ছিল স্টক ব্রোকার] বিগত দুটি বছরের মধ্যে কতদিনই না সে তার সুন্দর চেহারার প্রেমিক ভাইকাউণ্ট দ্য মার্টিলেটের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে তার বাড়িতে গিয়েছে! তার পেছনে যে দেওয়াল ঘড়ি ছিল জোরে টিক্‌টিক্ ক'রে সেটা সময়টাকে এগিয়ে দিচ্ছিল। জানালার মাঝখানে গোলাপ কাঠের একটা লেখার টেবিল ছিল; তার ওপরে খোলা অবস্থায় পড়েছিল আধপড়া একটা বই। কুলুঙ্গিতে ছোট সুন্দর দুটো ফুল রাখার জায়গা ছিল: তার ওপরে দু'গোছা ভায়লেট ফুল ভাসছিল। সেইখান থেকে তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল, সঙ্গে মিশে ছিল ভারবেনার মিষ্টি গন্ধ।

ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠল, ঘড়ির দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল সে; ভাবল-'সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে—এবারে সে রেগে যাবে।' তারপর সে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে চাকরকে ডেকে মিথ্যে কথা বলল—আমার ফিরতে অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরী হবে।

মে মাসের শেষ। শেষ বিদায়ের আগে বসন্ত প্যারিসকে ফলে ফুলে রঙিন ক'রে তুলেছে।

মাদাম হগাঁ রাস্তায় বেরিয়ে ডানদিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। গাড়ী ধরার জন্যে দ্য প্রোভেনস্-এর পথ ধরে এগোনোর ইচ্ছে ছিল তার; কিন্তু বসন্তের আমেজ হঠাৎ তাকে গ্রাস করে ফেলল। কি জানি কেন পথ পরিবর্তন করল মাদাম; ট্রিনিটি পার্কে মেলা দেখার জন্য রু দ্য লা চোসি দ্য আর্তির পথ ধরল।

মনে-মনেই বলল মাদাম—'মিনিট দশেক সে অপেক্ষা করতে পারে।' প্রেমিককে বসিয়ে রাখার কথা মনে হতেই সে বেশ খুশি হয়ে উঠল। জনতার ভেতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে মানস চোখে দেখতে পেল—ভাইকাউন্ট ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে; ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখছে বারবার, জানালার শার্সি খুলছে—দরজার ওপরে কান পেতে পায়ের শব্দ শুনছে, বসছে, উঠছে। সিগারেট খেতে সে তাকে নিষেধ করেছিল

বলে সে সিগারেট ধরাতে সাহস করছে না—ধরাতে না পেরে মরীয়া হয়ে বারবার সে তার সিগারেট কেস-এর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাচ্ছে।

ধীরে-ধীরে সে এগোতে লাগল ; দোকান, মানুষ, আর এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে তার গতি ক্রমশ শ্লথ হ'তে লাগল। প্রেমিকের দরবারে হাজিরা দেওয়ার ইচ্ছা তার এতটা কমে গেল যে সে প্রতিটি দোকানের শো-কেসের কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে লাগল। রাস্তার শেষে গির্জা। তার সামনে যে সবুজ পার্ক রয়েছে সেটি তাকে আকর্ষণ করল। রাস্তা পেরিয়ে সে শিশুদের বাগানে এসে ঢুকল। এখানে শিশুরা খেলা করে। সেইখানে চকচকে পোশাক পরে নার্সরা সব শিশুদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে নিজেকে সে মিশিয়ে দিল। তারপরে একটা চেয়ারে বসে ঘড়ির দিকে তাকালো।

আধ ঘণ্টা বাজার শব্দ হল। শব্দটা কানে ঢোকামাত্র তার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ইতিমধ্যে তার আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে ; আরও একটু এদিক-ওদিক ঘুরে প্রেমিকটির বাড়ি পৌঁছতে সাকুল্যে এক ঘণ্টার মত দেরী হ'তে পারে তার। প্রমোদ-বিহার থেকে এক ঘণ্টা চুরি! তাহলে চল্লিশ মিনিটও তার থাকা হবে না ; তারপরেই সব শেষ।

হায় ভগবান! যেতে তার একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। ডেনটিস্টের দোকানে যাওয়া এমনিতেই বিরক্তিকর। এই নিয়মিত দেখা করার ব্যাপারটা তাঁর স্মৃতিকে বিব্রত করে তুলল ; গত দুটি বছর ধরে নিয়ম ক'রে প্রতিটি সপ্তাহে একবার ক'রে—আর এখনই আর একবার নিয়মগতভাবে তাদের দেখাশুনা হবে এই কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। অবশ্য ডেনটিস্টের দোকানে যাওয়ার মত কষ্টকর নয় ; তবু, এই সাক্ষাৎকার এতই একঘেয়ে, এতই দীর্ঘ, এতই অস্বস্তিকর আর অপ্রীতিকর যে মনে হয় অপারেশনও বুঝি তার চেয়ে অনেক ভাল। তবু সে এগোতে লাগল, কখনও কখনও ধীর পায়ে, কখনও কখনও বসে, কখনও বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আজকের এই দেখা না হলে কত খুশিই না সে হোত। কিন্তু গত মাসে বেচারা ভাইকাউন্টের সঙ্গে সে দু'বার ছলনা করেছিল। এত তাড়াতাড়ি তাকে আর একবার ঠকাতে মাদামের সাহস হল না। কেন সে ফিরে এল? হ্যাঁ, কেন? কারণ, এটা তার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আর বেচারা ভাইকাউন্ট যদি জিজ্ঞাসা করে তার এই মত পরিবর্তনের কারণটা কী তাহলে মাদাম তার কোন জুৎসই উত্তর দিতে পারবে না। মাদাম এই ব্যাপারটা শুরু করল কেন? কেন? সেকথা তার আর মনে নেই। তাকে সে ভালবাসে? সম্ভবত! খুব বেশী নয়—ওই একটু আর কি। ভাইকাউন্ট-এর ব্যবহারটি বড় সুন্দর। কিছুতেই সে অখুশি হয়না, বেশ সম্ভ্রান্ত তার রুচি, আর সাহসী। তাকে একবার দেখেই ব'লে দেওয়া যায় পৃথিবীর মধ্যে নারীদের প্রেমিক হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তারই রয়েছে। ভাব আদান-প্রদান চলেছিল তিন মাস ধরে—নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার এইটুকু সময়ই যথেষ্ট। তারপরেই মাদাম আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু প্রথম মিলনের দিন—প্রথমই বা বলি

কেন—পরের মিলনগুলিতেও—কি দুরু-দুরু বুকে, কি লজ্জানত মুখে, কি সুন্দর সঙ্কোচের ভেতর দিয়ে মাদাম নিজেকে ধরা দিয়েছিল রু মিরোমেসনিলের অবিবাহিত ফ্ল্যাটে। তার হৃদয়! এই রকমভাবে প্রলুব্ধা হয়ে, পরাজিতা হয়ে সে যখন প্রথম দিন সেই দুঃস্বপ্নের ঘরের দরজার মধ্যে প্রবেশ করল তখন সে কী ভেবেছিল? সত্যিই তা সে জানত না? সে কথা সে ভুলে গিয়েছে। কোন কাজ, কোন দিন, কোন জিনিস মানুষের মনে থাকে; কিন্তু দু'বছর আগে মানুষের মনে যে ভাবালুতা জাগে সে কি কারও মনে থাকে না, থাকার কথা? স্মৃতির বুকে ভাস্বর হয়ে থাকার মত দ্যুতি তার নেই। বাকি সবই তার মনে রয়েছে, বিহার, মিলন—সব। এসব ব্যাপারগুলি তার কাছে নক্কারজনক ব'লে মনে হয়।

হায় ভগবান! সঙ্কেতকুঞ্জে যাওয়ার জন্যে যে সব চার-চাকার গাড়ী এই দু'বছরে সে ভাড়া করেছে তাদের কথা একবার ভেবে দেখ। আর এই সব গাড়ী সাধারণ গাড়ী নয়। গাড়োয়ানরা নিশ্চয় আন্দাজ করেছে কোথায় সে যায়। গাড়োয়ানরা যে দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত সেই দৃষ্টি তার চোখ এড়ায়নি; আর প্যারিস শহরের এই জাতীয় গাড়োয়ানরা কী ভয়ানক। এদের স্মৃতিশক্তি কত প্রখর! আদালতে ফৌজদারী মামলায় আসামীদের সনাক্ত করতে এরা ওস্তাদ। কয়েক বছর আগে গভীর রাত্রিতে কোন রাস্তা বা স্টেশন থেকে একবার যাকে ওরা বিশেষ কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে তাদের চিনে ফেলতে ওদের দেরী হয় না। একবারমাত্র দেখেই ওরা কোনরকম চিন্তা না করেই বলে দিতে পারে—এই মানুষটিকে আমি গত বছর দশই জুলাই রাত্রি পৌনে একটার সময় রু দ্য মার্টারস্ থেকে তুলে নিয়ে লায়নস্ স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিলাম। প্রেমবিহারে যাওয়ার সময় নারীর সমস্ত ঝুঁকি আর মর্যাদা রাস্তার প্রথম গাড়োয়ানের হাতে যে তোমাকে তুলে দিতে হয় এ কথা ভাবতেই যে-কোন নারীর বুক ধড়ফড় ক'রে ওঠে। গত দুটি বছর সপ্তাহে একবার করে সে অন্তত একশ' বা একশ' কুড়িবার ওই জাতীয় গাড়ী ভাড়া করেছে। বিপদের মুহূর্তে সেই সব গাড়োয়ানরাই হয়ত তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে।

গাড়ীতে উঠেই মাদাম তার পকেট থেকে আর একটা ঘোমটা বার ক'রে মাথার ওপরে চাপিয়ে দিত, ঝুলিয়ে দিত চোখের ওপরে। এটাতে তার মুখ ঢাকা পড়ত সত্যি কথা; কিন্তু তার হাত-পা, পোশাক-আশাক—এগুলি তো ঢাকা পড়ত না। এসব জিনিস কি তাদের চোখে পড়ে না? তারা যে আগেই লক্ষ্য করেনি সে কথাই বা কে বললে? প্রেমিকের বাড়িতে কী যন্ত্রণাই না সে ভোগ করেছে। তার মনে হল প্রতিটি মানুষ—তার পথের ধারে যারা পড়ে—তাদের সবাইকে সে চেনে। ফলে গাড়ী থামতে না থামতেই সে বাইরে লাফিয়ে পড়ে গিরগির করে ছোটে। ভাইকাউন্টের গেটে একজন দরোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়। সেই লোকটা তার নাম ধাম গোত্র, তার স্বামীর নাম, পেশা—নিশ্চয় সবকিছু জানে। গত দুটি বছর ধরে সে দরোয়ানটিকে ঘুষ দিয়ে হাত করতে চেয়েছিল, তার মনে হোত যাওয়ার পথে তার সামনে একশ' ফ্রাঁর একটা নোট ফেলে দিয়ে যায়; কিন্তু পাছে লোকটা

বুঝতে না পেরে পেছন থেকে তাকে ডাকে এই ভয়ে সে এ কাজ করতে পারে নি। নোট ত চুলোয় যাক ; একটুকরো কাগজ ছুঁড়ে দিতেও ভয় হোত তার। কিসের ভয়? তা সে জানত না। কেলেঙ্কারীর ভয়? গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়? সম্ভবত। ভাইকাউন্টের ফ্ল্যাট মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি ওপরে ; সেই ক'টা সিঁড়ি ভাঙতেই মাদামের মনে হোত যেন সে স্বর্গে উঠছে। বাড়ির ফটকের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হোত সে যেন ফাঁদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। তখন সামনে অথবা পেছনে এতটুকু শব্দ হলেই সে চমকে উঠত। এগোতেও সাহস করত না, পেছোতেও সাহস হোত না তার। কেউ নেমে এলে সে সাহস করে মার্টিলেটের কলিং বেল টিপতে পারত না। দরজা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত যাতে লোকে মনে করে সে অন্য কোথাও যাবে। সে উঠে যেত...একতলা...দোতলা...তিনতলা...। তারপরে সব চুপচাপ হয়ে গেলে আবার নেমে আসত সে, এবং প্রায় দৌড়ে—প্রতি মুহূর্তে তার ভয় হোত যদি সে ফ্ল্যাট ভুল করে ফেলে।

ভেলভেটের পোশাক পরে ভাইকাউন্ট ঠিক অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলেই হাসি পেত তার। বিগত দুটি বছর ধরে একই রীতিতে ভাইকাউন্ট তাকে অভ্যর্থনা করেছে—তার হাবভাব, চলাফেরার মধ্যে এতটুকু ইতর-বিশেষ চোখে পড়েনি মাদামের।

দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাইকাউন্ট বলবে—'প্রিয় বান্ধবী, তোমার হাত দুটি চুমু খেতে আমাকে অনুমতি দাও।' এই বলেই সে তার পিছু-পিছু ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবে। ঘরে যথারীতি শার্সি বন্ধ থাকে ; সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাতি জ্বলে। শীত অথবা গ্রীষ্ম—একইভাবে আলো জ্বলে এ ঘরে। তারপরে তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে ভাইকাউন্ট তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করবে। প্রথম প্রথম মাদামের এটা ভালই লাগত। এখন মনে হয় ভাইকাউন্ট পঞ্চম অঙ্কে অভিনয় করছে—আর এই একই অভিনয় সে করে চলেছে একশ' কুড়িবার। এই রীতির কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয় তার করা উচিৎ।

এবং তারপর...হায়রে হায়...হা ভগবান...ভাবতে গেলেও লজ্জায় মরে যায় মাদাম...সে ব্যাপারটা সহ্য করা সত্যিই তার পক্ষে কষ্টকর। না ; সেখানেও বেচারার কোন নতুনত্ব নেই। মানুষটা ভাল...কিন্তু বড়ই গতানুগতিক।

পরিচারিকার সাহায্য ছাড়া উলঙ্গ হওয়া কী কষ্টকর ব্যাপার। এক আধ বার না হয় কষ্ট করে তা হওয়া যায় ; কিন্তু প্রতি সপ্তাহে এইভাবে কারও সাহায্য না নিয়ে উলঙ্গ হওয়াটা কী বিরক্তিকর। না ; কোন পুরুষেরই এদিক থেকে নারীর ওপরে জুলুম করা উচিৎ নয়। কিন্তু উলঙ্গ হওয়াটা যত কষ্টকরই হোক, কারও সাহায্য না নিয়ে জামা-কাপড় পড়াটা আরও কষ্টকর। এই সময় কোন পুরুষ যদি অক্ষম হাতে নারীকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে, বলে—'আমি একটু সাহায্য করব কী?' তখন ইচ্ছে যায় তার কানে একটা ঘুষি বসিয়ে দিই, সাহায্য করবে তুমি? কী ক'রে উলঙ্গ নারীদের পোশাক পরাতে হয় তা তুমি জান? ভাইকাউন্ট যেভাবে পিন ধরে তা থেকেই বোঝা যায় এসব ব্যাপারে সে একেবারে অপদার্থ। ঠিক এই সময়েই

ভাইকাউন্টের ওপরে তার বিতৃষ্ণা জাগে। মনে হয় তাকে সে খুন করে ফেলবে। তা ছাড়া যে পুরুষ কোন নারীকে পরিচারিকার সাহায্য ছাড়াই একশ' কুড়িবার পোশাক পরতে বাধ্য করে সে-পুরুষকে ঘৃণা করে না এমন নারী কে রয়েছে? কথাটা সত্যিই যে অনেক পুরুষই এসব ব্যাপারে তার মত অপদার্থ নয়। ক্ষুদে ব্যারণ দি গ্রিমবেলএর কথাই ধরা যাক, কোন সময়েই সে বলে না—তোমাকে একটু সাহায্য করব কি?—সে সব সময় দক্ষ হাতে এগিয়ে আসে। একেবারে প্রাণবন্ত এই ব্যারণ—যাকে বলে নিখুঁত কলাবিদ। সে পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরে বেরিয়েছে—নানা দেশের নারীদের সাজসজ্জার কৌশল সে জানে; এটা তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।

গীর্জার ঘড়িতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের শব্দ হল। নিজেকে টেনে তুলল মাদাম—ঘড়ির দিকে তাকাল—একটু হাসল, ভাবল—এতক্ষণে নিশ্চয় সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারপরে দ্রুত সে পার্ক ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। সে সবেমাত্র রাস্তায় পৌঁচেছে এমন সময় একটি লোক তার সামনে মাথাটা নুইয়ে তার টুপীটা খুলে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে মাদাম বলল—কী আশ্চর্য, ব্যারণ তুমি?

হ্যাঁ, মাদাম। তুমি কেমন আছ?

দু' একটা একথা-সেকথার পরে ব্যারণ বলল—তুমি কি জান আমার বান্ধবীদের মধ্যে একমাত্র তুমিই এখনও পর্যন্ত আমি যে জাপানী চিত্রকলার আয়োজন করেছি তা দেখতে আসনি।

কিন্তু ব্যারণ, কোন বিবাহিতা নারী কোন অবিবাহিত পুরুষের বাড়িতে যায় কি?

কী, কী বললে? দুষ্প্রাপ্য শিল্প দেখতে যাওয়াও কি অন্যায়?

বস্তুটা যাই হোক, একলা সে দেখতে পারে না।

কিন্তু কেন পারে না? অনেক বিবাহিতা মহিলাই একা-একা সেই সংগ্রহ দেখতে গিয়েছেন। প্রতিদিনই তাঁরা যান। তাঁদের নাম আমি বলব? না, থাক। মনের মধ্যে কোন পাপ না থাকলেও প্রত্যেকের রুচিশীলা হওয়া উচিৎ। নীতির দিক থেকে কোন ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়ার মধ্যে কোন অপরাধ নেই; বিশেষ ক'রে যে ভদ্রলোক বহুপরিচিত আর সম্ভ্রান্ত—যদি অবশ্য কেউ সেখানে খারাপ উদ্দেশ্যে যায়।

হ্যাঁ, অবশ্য, মোটের ওপরে তুমি সত্যি কথাই বলেছ।

তাহলে তুমি আমার সংগ্রহ দেখতে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

কখন? এখনই?

অসম্ভব। আমি আজ বড় ব্যস্ত।

বাজে কথা বলো না। এই পার্কে তুমি আধ ঘন্টা বসে রয়েছ।

তুমি আমাকে লক্ষ্য করছিলে?

আমি তোমাকে দেখছিলাম।

সত্যি বলছি, আমার খুব তাড়া রয়েছে।

আমিও সত্যি কথাই বলছি, কোনরকম তাড়া তোমার নেই। সেটা তুমি স্বীকার কর।

মাদাম হাসতে-হাসতে বলল—না, না...খুব বেশী নয়...

একটা গাড়ী পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ; ব্যারণ তাকে থামিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল—এস মাদাম।

কিন্তু ব্যারণ, অসম্ভব, আজ আমি যেতে পারব না।

তুমি বড় অবাধ্য, মাদাম। এ-স। আমাদের দিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছে। এখনই ভিড় জমে যাবে। তারা ভাববে তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দু'জনকেই পুলিশে গ্রেপ্তার করবে। তোমাকে অনুরোধ করছি—ভেতরে ঢোক।

ভয় পেয়ে আচ্ছন্নের মত মাদাম গাড়ীর ভেতরে ঢুকলো। তার পাশে ব'সে ব্যারণ বলল—রু দ্য প্রোভেনস্-এ চালাও।

হঠাৎ মাদাম চীৎকার করে উঠল—হায় হায়, একটা জরুরী টেলিগ্রাম করতে আমি ভুলে গিয়েছি। কাছাকাছি একটা পোস্ট অফিসে আমাকে নিয়ে যাবে কি ?

একটু দূরে গাড়ীটা থামলে মাদাম ব্যারণকে বলল—পঞ্চাশ সেণ্টাইম দামের একটা টেলিগ্রাফ কার্ড নিয়ে এস তো। স্বামীর কাছে কথা দিয়েছিলাম মার্টিলেটকে আগামী কাল আমরা ডিনারে নিমন্ত্রণ করব। সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

নীল কার্ডটা নিয়ে ব্যারণ ফিরে এলে মাদাম পেনসিল দিয়ে লিখল—

প্রিয় বন্ধু,

আমার শরীর ভাল নয়। স্নায়ুর অসুখে আমি শয্যাশায়িনী। বেরোতে পারছিনা। আমার অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে কাল সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে তোমার ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল। এস। জেনি—

জিব দিয়ে আঁটাটা ভিজিয়ে নিয়ে টেলিগ্রাফ কার্ডটা এঁটে তার ওপরে ভাইকাউণ্টের ঠিকানা লিখে ব্যারণকে মাদাম বলল—টেলিগ্রাম ফেলার বিশেষ বাক্সে এটা একটু ফেলে দিয়ে এস।

বন্দরে

In Port

১৮৮২ সালের তেসরা মে হ্যাভার পরিত্যাগ ক'রে তিন-পালের জাহাজ নোতর-দ্যম-দেভেনতস্ চীন সমুদ্রে পাড়ি দিল ; তারপরে চার বছর পরে ১৮৮৬ সালের চৌঠা আগস্ট মার্সেলিস বন্দরে আবার এসে ঢুকলো। একটা চীনা বন্দরে যাওয়ার জন্যে সে মালবোঝাই করেছিল। সেই মাল নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে নতুন

মাল নিয়ে সেটি বুয়েনস্ এয়ারস্-এর পথে ভাসলো। সেখান থেকে মাল বোঝাই ক'রে চলে গেল ব্রেজিলের দিকে।

এগুলি ছাড়া আরও অনেক বন্দর সে ঘুরেছে। এছাড়া ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার ফলে সারানোর জন্যে কয়েকটি মাস তাকে চুপচাপ পড়ে থাকতে হয়েছে; ঝড়ের ঝাপটায় গতিচ্যুত হ'তে হয়েছে তাকে; দুর্ঘটনা ঘটেছে কিছু; দুঃসাহসিক অভিযান, এবং ব্যর্থ কিছু অভিযানকেও একেবারে নাকচ ক'রে দেওয়ার উপায় ছিল না। এত সব হাঙ্গামা হুজ্জোতের পরে তিন-পালের নরম্যান জাহাজটি শেষ পর্যন্ত অ্যামেরিকান খাবার বোঝাই অজস্র টিনের বাক্স ভর্তি ক'রে মার্সেলিস বন্দরে এসে ঢুকলো।

প্রথম যাত্রার সময় ক্যাপটেন আর মেট ছাড়া জাহাজে ছিল চৌদ্দটি নাবিক—আটজন নর্মান আর ছ'জন ব্রিটন। শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল পাঁচজন ব্রিটন, আর চারজন নর্মান। একজন ব্রিটন সমুদ্রে মারা যায়। নানান অবস্থার মধ্যে চারজন নর্মান জাহাজ থেকে উধাও হয়ে যায়। তাদের স্থান পূরণ করে দু'জন অ্যামেরিকান, একজন নিগ্রো, আর এক সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরের গর্ত থেকে নিয়ে আসা হয় সাংহাইএর স্থায়ী বাসিন্দা একটি নরওয়েজকে।

একটি ইতালিয়ান ব্রিগ আর একটি ইংলিশ স্কুজারের মাঝখানে নোতর-দ্যম তার জায়গা করে নিল। তারপরে শুল্ক বিভাগের কাজ শেষ হওয়ার পরে ক্যাপটেন তাঁর নাবিকদের তীরে বেড়ানোর জন্যে সান্ধ্য ছুটি মঞ্জুর করলেন।

রাত্রি হয়েছে। জ্বলে উঠেছে মার্সেলিস এর রাস্তার বাতিগুলি। গ্রীষ্মকালীন উষ্ণ সন্ধ্যায় বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে রসুন দিয়ে রান্না করা খাবারের গন্ধ। রাস্তায় ভিড়ে, গাড়ীর শব্দে, মানুষের চীৎকারে পথ একেবারে সরগরম। এই সব দক্ষিণ অঞ্চলের রীতিই এই রকম।

জাহাজ থেকে মাটিতে পা দিয়েই দশটি মানুষ অতি সন্তর্পণে হাঁটতে লাগল। অনেকদিন তারা শহর থেকে নির্বাসিত ছিল। তার ফলে খুব সাবধানে দু'জন দু'জন করে একসঙ্গে এগোতে লাগল তারা। বন্দরের মুখ থেকে বেরিয়ে নানান পথ বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে তারা এগিয়ে গেল। বিগত ষাটটি দিন সমুদ্রে বাস করার ফলে তাদের দেহের প্রতিটি অংশ নারীসঙ্গ কামনায় একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘায়ত, চতুর আর স্বাস্থ্যবান সিলেসটিন ডুক্লোসের নেতৃত্বে নরম্যানরা চলল সামনে। যতবারই এখানে শহরে পদযাত্রা করেছে ততবারই এই সিলেসটিন নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের। সবচেয়ে ভাল জায়গাটা সে-ই নির্বাচন করেছে; কোন্ জায়গাটা ভাল আর পরিতৃপ্তিকর সেটা ঠিক করে দিয়েছে সে; তীরে নাবিকদের মদ খাওয়ার নোংরা আস্তাবল আর তাদের স্বাগত জানানোর জন্যে যে সব বিশ্রী পতিতালয় রয়েছে সেগুলিকে সে সব সময় দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু যেখানে সে ঢুকেছে সেখানে সে বীরের মতই নির্ভয় হয়ে ঢুকেছে।

শহরের চারপাশে নালার মত যে সব রাস্তা বেরিয়েছে সেই সব রাস্তা ঘুরতে-ঘুরতে সিলেসটিন শেষ পর্যন্ত একটা গলির মধ্যে দিয়ে দলবল নিয়ে ঢুকে গেল। সে রাস্তাটায়

আলো ছিল প্রচুর—দোকানপত্তর বাড়ি-ঘর দুয়ারের ওপরে সাইনবোর্ডগুলি ঝকমক করছিল। খোলা দরজার ভেতরে সরু-সরু পথ। তাদের সামনে ছোট-ছোট চেয়ারের ওপরে ঢিলেঢালা জামা পরে মেয়েরা বসেছিল। তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে তারা সবাই প্রত্যাশায় উঠে দাঁড়ালো—রাস্তার ওপরে এগিয়েও এল কয়েকটা পা। তাদের সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। জনতাও সামনে বেশ্যাপল্লী দেখে উত্তেজিত হয়ে গুনগুন করে গান করতে লাগল। কখনও-কখনও দোতলার জানালা খুলে গেল। সামনে এসে দাঁড়ালো বেশ শক্ত করে পোশাক পরা অর্দ্ধ উলঙ্গ কোন একটি বেশ্যা; পোশাকের ভেতর থেকে তার দেহের শক্ত গাঁথুনিটা বাইরে প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। ভেতরে আনার জন্যে ওপর থেকেই জানালার বাইরে মুখ বার করে সে পথচারীদের ডাকতে লাগল। কখনও-কখনও নীচে নেমে এসে তাদের কারও-কারও হাতে টান দিয়ে অথবা মাকড়শার মত তাকে জড়িয়ে ধরে তার চেয়েও ভারি কোন লোককে ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তার স্পর্শে উত্তেজিত হয়ে লোকটি মৃদু বাধা দিল; তার দলের লোকেরা চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল; ভেতরে যাবে কি যাবে না ভাবতে লাগল। দেরী তাদের যেন আর সইছিল না। কেউ কেউ আবার ভাবছিল দেহের ক্ষিদেটাকে আর একটু জিইয়ে রাখার জন্যে আরও কিছুটা সময় তারা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। তারপরে প্রবল বিক্রমে অনেক ধস্তাধস্তির পরে মেয়েটা লোকটাকে টানতে-টানতে তার দরজার কাছে নিয়ে গেল; তার দলের লোকেরাও তাদের পিছু-পিছু গিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় অভিজ্ঞ সিলেসটিন হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—মারচান্দ, ওখানে যেয়ো না। আমাদের যাওয়ার উপযুক্ত ঘর ওটা নয়।

তার নির্দেশ শিরোধার্য করে লোকটা প্রায় পাশবিক শক্তি খাটিয়ে মেয়েটির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল; তার বন্ধুরাও সঙ্গে-সঙ্গে পিছু ঘুরে দাঁড়াল। মেয়েটি তাদের পিছু-পিছু এগিয়ে এসে অশ্রাব্য ভাষায় তাদের গালাগালি দিতে লাগল। অন্য মেয়েরাও সঙ্গিনীর ব্যর্থতায় দল বেঁধে বেরিয়ে এসে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে ভেতরে আসার জন্যে তাদের প্রলুব্ধ করতে লাগল। প্রেম-দেউলের দ্বাররক্ষিনীদের প্রলুব্ধ অনুনয় আর জৈবিক ক্ষুধার তাড়না—এই দুই সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে আন্দোলিত চিত্তে তারা সোজা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল; তাদের পেছনে ব্যর্থ অপমানিতা বারবনিতাদের অশ্রাব্য চীৎকার একসঙ্গে গমগমিয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে আরও অনেক দলের সঙ্গে তাদের দেখা হল; তাদের মধ্যে সেনাবাহিনীর লোকও ছিল। তরোয়ালের ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল তাদের চলার সঙ্গে-সঙ্গে। ছিল নাবিকের দল। নিঃসঙ্গ পথচারী—দু'জন দোকানদারও ছিল তাদের মধ্যে। অশুভ ইঙ্গিত দেখিয়ে চারপাশে সরু-সরু গলিগুলি তাদের সামনে খুলে গেল। খোয়া-ওঠা চিটচিটে পিছল রাস্তার ওপর দিয়ে তারা দৃঢ়পদক্ষেপে এগোতে লাগল। দু'পাশে বেশ্যালয় গিজগিজ করছে। সেই রাস্তার ওপরে নোংরা জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে মনোস্থির করে বসল ডুক্লো। মোটামুটি দেখতে ভাল এইরকম একটা বাড়ির সামনে এসে সে দাঁড়ালো। তারপরে দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

২

খাওয়া-দাওয়া আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয়নি। পরের চারটি ঘণ্টা ধরে নাবিকরা প্রেমের আদান-প্রদান আর সুরার উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিল নিজেদের। এতেই তাদের ছ'মাসের বেতন হাওয়া হয়ে গেল। অতিথিদের অভ্যর্থনা করার বিরাট ঘরে মনিবের মত তারা ভারিক্কী চালে বসল। যেসব সাধারণ শ্রেণীর মক্কেলরা এক-একটা চেয়ারে ছড়িয়ে বসেছিল তাদের দিকে অসৌজন্যভরে তাকালো। ঢিলে জামা গায়ে দিয়ে বুড়ো খুকী অথবা গানের আসরে গায়িকার মত একটা মেয়ে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে এগিয়ে এল; কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পেয়ে তাদের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ওখানে গিয়েই তারা পছন্দমত নিজেদের সঙ্গিনী বেছে নিল; কারণ এখানে সবাই প্রায় একই রকম। তিনটে টেবিল এক জায়গায় টেনে আনা হল। প্রথম দফায় মদ খাওয়া শেষ করে তারা দুটি দলে বিভক্ত হল। প্রতিটি নাবিক এক-একটি মেয়ে বেছে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে কাঠের সিঁড়ির ওপরে চারটি পায়ের শব্দ শোনা গেল; তারপর শোভাযাত্রাটি ভিন্ন-ভিন্ন ঘরে অন্তর্হিত হল।

তারপরে মদ খাওয়ার জন্যে আবার তারা নীচে নেমে এল। মদ খেয়ে উঠে গেল ওপরে; আবার নেমে এল নীচে। এইভাবে মদ গিলতে-গিলতে একসময় তারা মাতাল হয়ে উঠল; তারপরেই চীৎকার করতে শুরু করল তারা; প্রেয়সীকে হাঁটুর ওপরে বসিয়েছে; তারপর জুড়েছে গান। সে তো গান নয়, চীৎকার। চীৎকার করতে করতে দু' হাতের ঘুষি তুলে তারা টেবিলের ওপরে জোর করে মারতে লাগল। গলায় মদ ঢেলে পশুর মত ব্যবহার করতে শুরু করল তারা। সারা ঘর সরগরম হয়ে উঠলো। তাদের মাঝখানে বসেছিল সিলেসটিন ডুক্লো, ছড়িয়ে দেওয়া দুটো পায়ের ওপরে একটি দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী বেশ্যাকে বসিয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মদ সে যে কিছু কম খেয়েছে সেকথা সত্যি নয়; তবে অন্যদের মত সে অতটা মাতাল হয়নি। একটিমাত্র জিনিস ছাড়া অন্য আরও অনেক জিনিস যে রয়েছে সেকথা ভাবার মত শক্তি তার তখনও ছিল! অন্যান্য সঙ্গীদের মত তখনও সে তার মনুষ্যত্ববোধ হারায়নি। মেয়েটির সঙ্গে তাই সে আলাপ করার চেষ্টা করল। কিন্তু সুস্থভাবে চিন্তা করার মত ক্ষমতাও তখন তার ছিল না। কী কথা সে বলবে, কেমন করে আলাপ করবে সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা তার মনে জন্মানোর সঙ্গে-সঙ্গেই আবার তার খেই হারিয়ে ফেলে সে।

হাসতে-হাসতে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে সে—তারপর...হ্যাঁ...তারপর...কী যেন বলেছিলে...ক'দিন তুমি এখানে রয়েছ?

মেয়েটি বলল—ছ' মাস।

মনে হল, মেয়েটির কথা শুনে সে বেশ খুশিই হয়েছে—যেন ছ'টা মাস পতিতালয়ে বাস করাটা যেকোন মেয়েরই সৎ চরিত্রের পরিচায়ক। তারপরে সে আলাপ শুরু করে দিল—এ জীবন তোমার ভাল লাগে?

একটু ইতস্তত করল মেয়েটি; তারপরে হতাশভাবে বলল—সবই সহ্য হয়ে যায়। অন্য সব কাজের চেয়ে এটা খারাপ নয়। কোন বাড়িতে চাকরাণীর কাজ করা অথবা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এ কাজ অনেক ভাল।

এই কথা যে সত্যি তা সেও স্বীকার করল।

এই অঞ্চলের মেয়ে তুমি নও?

কোন উত্তর না দিয়ে সে কেবল ঘাড় নাড়লো।

অনেকদূর থেকে তুমি এসেছ?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো মেয়েটি। কোন উত্তর দিল না।

তোমার দেশ কোথায়?

মনে হল তার দেশ কোথায় সেই কথাটাই খুঁজে বার করার জন্যে মেয়েটি তার স্মৃতির ভাঁড়ার হাতড়াচ্ছে। তারপরে সে বিড়বিড় করে বলল—পার-পিগনা।

শুনে খুব সন্তুষ্ট হল ডুক্লো; বলল—ও, বেশ, বেশ।

এবার মেয়েটার জিজ্ঞাসা করার পালা: তুমি নাবিক, তাই না?

হ্যাঁ, প্রিয়তমে।

তুমি কি অনেকদূর থেকে আসছ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। অনেক দেশ, বন্দর পার হয়ে এসেছি আমি।

মনে হচ্ছে, সারা পৃথিবী বেড়িয়ে এসেছ?

তার দ্বিগুণ জায়গা ঘুরেছি একথা তোমাকে আমি বলতে পারি।

আবার মনে হল মেয়েটি ইতস্তত করছে। কী যেন একটা হারানো জিনিস সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপরে গম্ভীরভাবেই সে জিজ্ঞাসা করল—সমুদ্রে অনেক জাহাজ নিশ্চয় তুমি দেখেছ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

নোতর-দ্যম জাহাজটিও চোখে পড়েছে?

চুকচুক করে উঠলো ডুক্লো—নিশ্চয়। এই ত সপ্তাহখানেক আগে দেখেছি তাকে।

তার মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল; মনে হল তার গণ্ডদেশ থেকে সব রক্ত নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল—সত্যিই!

হ্যাঁ, সত্যি।

তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলছ না?

ডুক্লো একটা হাত আকাশের দিকে তুলে বলল—ভগবানের দিব্যি...

তাহলে তুমি কি জান সিলেসটিন ডুক্লো সেই জাহাজে রয়েছে কি না!

আশ্চর্য হয়ে গেল ডুক্লো; কিছুটা অস্বস্তিও লাগল তার। মেয়েটির কথার উত্তর দেওয়ার আগে আরও কিছু জানতে চাইল সে।—তুমি কি তাকে চেন?

মেয়েটিও এবারে কিছুটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো ; বলল—আমি না ; আমারই পরিচিত কোন মেয়ে।

এখানকার কোন মেয়ে ?

না।

রাস্তার কোন মেয়ে ?

না। অন্য একটি।

কী রকম মেয়ে ?

মেয়ে যে রকম হয় ; ধর, আমারই মত।

তার সঙ্গে এই মেয়েটির কী দরকার ?

তা আমি কেমন করে বলব ?

তারা এবারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ; অপরের মনের মধ্যে ঠিক কী রয়েছে সেইটাই যেন খুঁজে বার করার চেষ্টা করল তারা। দু'জনেই ভাবলো এবার কোন একটা সিরিয়াস ঘটনা ঘটবে।

ডুক্লো জিজ্ঞাসা করল—মেয়েটিকে আমি দেখতে পারি ?

দেখা হলে তাকে তুমি কী বলবে ?

আমি বলব...আমি বলব...সিলেসটিন ডুক্লোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

সে ভাল আছে ?

তোমার আমার মতই সে ভাল আছে। এখন সে পূর্ণ যুবক।

আবার চুপ ক'রে গেল মেয়েটি ; একসঙ্গে করল তার এলোমেলো চিন্তাগুলিকে ; তারপরে আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করল—নোতর-দ্যম কোথায় যাচ্ছিল ?

মার্সেলিস।

হঠাৎ যেন চমকে উঠলো মেয়েটি—সত্যিই ?

হ্যাঁ ; সত্যি।

তুমি তাকে চেন ?

চিনি।

আবার একটু ইতস্তত ক'রে নীচু গলায় মেয়েটি বলল—ভাল, খুব ভাল।

তার সঙ্গে তোমার কী দরকার ?

শোন। তাকে বলো......না, থাক।

ক্রমশ অস্থির হ'তে লাগল ডুক্লো ; মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা কী তা তাকে জানতে হবে।

তুমি কি তাহলে তাকে চেন ?

না।

তাহলে, তার সঙ্গে তোমার দরকারটা কী ?

হঠাৎ মেয়েটা মনোস্থির করে ফেলল ; দাঁড়িয়ে উঠে যেখানে বারএর মালিকানী বসে রয়েছে সেখানে দৌড়ে গেল, একটা লেমনএর বোতল নিয়ে তার ছিপি খুললো ;

গ্লাসের মধ্যে সবটা ঢাললো; তারপরে সেই গ্লাসে কিছুটা সাদা জল মিশিয়ে তার হাতে দিয়ে বলল—খাও।

কেন?

তোমার মাতলামি কেটে যাবে। তারপরে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব।

সুবোধ বালকের মত সে সেটা খেয়ে ফেলল; হাতের পেছন দিয়ে ঠোঁট দুটো মুছলো, তারপরে বলল—এবারে বল—শুনছি।

আমাকে যে তুমি দেখেছ, অথবা, আমি এখনই তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি সেকথা তোমাকে কে বলেছে তা তুমি তাকে বলবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা কর।

প্রতিজ্ঞা করছি।—এই কথা ব'লে দিব্যি করার ভঙ্গিমায় সে ওপর দিকে হাত তুললো।

ভগবানের নামে দিব্যি করছ?

ভগবানের নামে দিব্যি করছি।

তুমি তাকে বলবে যে তার বাবা মারা গিয়েছেন; মারা গিয়েছেন তার মা, আর ভাই। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে টাইফয়েড জ্বরে তিনজনেই মারা গিয়েছেন—আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে।

এখন ডুক্লোর পালা। এই কথা শুনে শরীরের ভেতর তার রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠলো। শোকে মুহ্যমান হয়ে কিছুক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল। তারপরে তার কেমন যেন সন্দেহ হল; মেয়েটা ঠিক সংবাদ দিয়েছে তো?

তুমি ঠিক বলছ?

ঠিক বলছি।

তোমাকে একথা বলল কে?

মেয়েটি ডুক্লোর কাঁধে একটা হাত রেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—প্রতিজ্ঞা কর—একথা তুমি কাউকে বলবে না?

প্রতিজ্ঞা করছি।

আমি তার বোন।

হঠাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা—ফ্রাঙ্কয়, তুমি?

মেয়েটি একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল; তারপরে নাম-না-জানা একটা ভয়—একটা দুর্দান্ত আতঙ্ক তাকে অভিভূত ক'রে ফেলল। দাঁতে দাঁত চিপে তার কানের কাছে মুখটা নামিয়ে এনে সে জিজ্ঞাসা করল...হায় ভগবান, তুমিই সেই সিলেসটিন?

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা নির্বাক নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

তাদের চারধারে তখন নাবিকদের উদ্দাম হট্টগোল শুরু হয়েছে। টেবিলের ওপরে জোরে-জোরে ঘুষি মেরে বোতল ঠোকার তালে-তালে তারা একসঙ্গে গলা ছেড়ে দিয়েছে। আর তাদের সঙ্গে সমতা রেখে চলার জন্যে মেয়েরাও তারস্বরে চীৎকার করছে।

ডুক্লো তার বোনকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে অন্য কেউ শুনতে না পায় এইভাবে ফিস-ফিস ক'রে বলল—হায় ভগবান, তোমার সঙ্গে কী চমৎকার ব্যবহারই না আমি করেছি।

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটির চোখও জলে ভরে গেল—তাই জন্যে আমি দায়ী নই—তাই না?

হঠাৎ বলে উঠলো ডুক্লো—তাহলে, সবাই মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ, সবাই।

বাবা, মা, ভাই?

সবাই—আর এক মাসের মধ্যেই। পড়ে রইলাম কেবল আমি একা। ওষুধের দোকানের দেনা, ডাক্তারের কাছে দেনা—তারপরে তিনজনের শেষ কাজ করার খরচ! আসবাবপত্র বেচে দিয়ে এসব দেনা শোধ করলাম আমি। তারপরে ক্যাচে-র বাড়িতে ঝি-বৃত্তি করতে গেলাম। সেই বিকলাঙ্গকে তুমি চেন। আমার বয়স তখন পনের। যখন তুমি বেরিয়ে গেলে চাকরি করতে তখন আমার বয়স মাত্র চৌদ্দ। সেই লোকটার সঙ্গে একটা ঝামেলায় পড়লাম আমি। বয়স কম থাকলে মানুষ বোকার মত কাজ করে। তারপরে একজন সলিসিটারের বাড়িতে গেলাম গৃহপরিচারিকার কাজ নিয়ে। সেও আমাকে প্রলুব্ধ করে বার ক'রে নিয়ে এসে হ্যাভারে একটা ঘর ভাড়া ক'রে রেখে গেল। তারই কয়েকদিন পরে সে-ও আসা বন্ধ ক'রে দিল। তিন দিন সেখানে আমাকে না খেয়ে থাকতে হয়েছিল। রোজগার করার মত কাজ না পেয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে আমি একটা নোংরা বাড়িতে হাজির হলাম। আমি এই নোংরা পৃথিবীর অনেক দেখেছি। অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষপর্যন্ত আমি এখানে এসে পৌঁচেছি।

কথা বলতে-বলতে চোখের জল উপছিয়ে তার দুটি গাল বেয়ে শরীরটাকে ভিজিয়ে দিল। তারপরে সে বলল—ভেবেছিলাম, তুমিও মারা গিয়েছ সিলেসটিন।

সিলেসটিন বলল—তখন তুমি এত ছোট ছিলে যে তোমাকে আমি চিনতেই পারতাম না। এখন তুমি কত বড় হয়েছ। কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারলেনা কেন?

একটা হতাশার মত অঙ্গভঙ্গী ক'রে সে বলল—কত লোককেই তো দেখলাম—মনে হয় তারা যেন সব একই রকমের।

প্রচণ্ড মার-খাওয়া শিশুর মত তখনও সে মুহ্যমান হয়ে বসে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তখনও মেয়েটি তার প্রসারিত দুটি পায়ের ওপরে বসে রয়েছে। তার একটি হাত তখনও মেয়েটির কাঁধের ওপরে। সিলেসটিন তাকে নিবিড়ভাবে দেখতে লাগল; তার মনে হল—এটি তার সেই ছোট্ট বোনটিই বটে। সে যখন সমুদ্রের বুকে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল ঠিক সেই সময় এই ছোট্ট মেয়েটি তার বাবা, মা, আর ভাইকে মারা যেতে দেখেছে।

হঠাৎ সিলেসটিন তার বিরাট দুটো হাতের মধ্যে মেয়েটির নতুন করে খুঁজেপাওয়া মুখটাকে ধরে তাকে বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগল।

তারপরে সে ফুঁপিয়ে উঠলো—মনে হ'ল, মৃত্যুপথযাত্রী কোন মানুষ যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।

তারপরে সে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো; ভীষণ গর্জন করতে-করতে দিব্যি করতে লাগল; এত জোরে টেবিলের ওপরে ঘুষি মারতে শুরু করল যে টেবিল উলটে গিয়ে কাঁচের বোতল আর গ্লাস ঝনঝন ক'রে প'ড়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। তিন পা এগিয়ে গেল সে; তারপরে মুখ থুবড়ে মাটিতে প'ড়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

নাবিকরা তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হাসতে লাগল।

একজন বলল—কতটুকুই বা মদ খেয়েছ—এতেই এই!

আর একজন বলল—ওকে শুইয়ে দাও। এই সময় রাস্তায় বেরোলে ওকে পুলিশে ধরবে।

সিলেসটিনের পকেটে টাকা ছিল; সুতরাং রাত্রির মত একটা আশ্রয় পেতে তার কোন অসুবিধে হল না। অন্য নাবিকরা তখন অপ্রকৃতিস্থ—তারা নিজেরাই দাঁড়াতে পারছে না। সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে কোনরকমে তারা ধরাধরি করে তাকে সেই মেয়েটির বিছানায় শুইয়ে দিল। যেখানে কিছুক্ষণ আগেই তারা অপরাধ করেছে, সেই বিছানার পাশে একটি চেয়ারের ওপরে মেয়েটি সারারাত ধরে বসে-বসে কাঁদতে লাগল।

অবশেষে প্রভাত হ'ল একসময়।

ব্যাবেতী

Babette

বৃদ্ধ এবং অথর্বদের সেই আশ্রমটি পরিদর্শন করতে আমার বিশেষ ভাল লাগত না; কারণ, সেখানে গেলেই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক নিজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। এই ভদ্রলোকটি কেবল যে বাচাল ছিলেন তা নয়; পরিসংখ্যান বিষয়েও তিনি বেশ ওস্তাদ। কিন্তু যে মহিলা এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর নাতি সব সময়ে আমার সঙ্গে থাকতেন; এবং এই রকম তথ্য বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ খুশি হ'তেন। নাতিটি মানুষ হিসাবে চমৎকার। তাঁর বিরাট একটি অরণ্য ছিল; সেই অরণ্যে শিকার করার অনুমতি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। সেই জন্যেই তাঁর ঠাকুরমার এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি দেখে আমি যে বিশেষ খুশি হয়েছি এই রকম একটা মনোভাব না দেখানো ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। মুখের ওপরে হাসিটি ফুটিয়ে তত্ত্বাবধায়কের অজস্র কাহিনী আমাকে শুনতে হোত—আর মাঝে-মাঝে তারিফ ক'রে বলতে হোত—বা-বা! কী আশ্চর্য! এসব কথা আপনার মুখ থেকে না শুনলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

কিন্তু তাঁর কোন্ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই রকম মন্তব্য করতাম তা আমার মনে নেই। মনে থাকলে আমি নিশ্চয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম—আচ্ছা, এই ব্যাবেতীটি কে বলুন তো? আপনার আশ্রমের লোকেরা ওর সম্বন্ধে এত কথা বলে যে মানুষটি কে জানার বড় কৌতূহল হয়েছে আমার।

কথাটা সত্যি। প্রায় ডজনখানেক মানুষ, তাদের মধ্যে পুরুষ এবং নারী দু'দলই রয়েছে, তার কথা আমার কাছে বলে যেত; কেউ করত প্রশংসা, কেউ করত তিরস্কার। তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে দেখা হলেই তারা বলত—শুনছেন মঁসিয়ে, আপনার ব্যাবেতী আমার...

তত্ত্বাবধায়কের ভদ্র স্বরটি হঠাৎ উত্তেজনায় মুখর হ'য়ে উঠত—হয়েছে, হয়েছে...শুনেছি...

অন্য সময়ে কোন বৃদ্ধাকে সম্বোধন ক'রে তিনি একগাল হেসে বলতেন—আশা করি আপনি এখানে আনন্দেই আছেন।

কারও কারও মুখে তার প্রশংসা শুনলে তিনি আনন্দে গদ-গদ হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে হাত দুটি জড় ক'রে বলতেন—ব্যাবেতী একটি রমণীরত্ন।

কথাটা মিথ্যে নয়—এরকম একটি নারীকে জানার কৌতূহল কার না থাকে; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয় বুঝতে পেরেই মনের মাধুরী মিশিয়েই তার একটি মূর্তি আমি আমার মনের মধ্যে সৃষ্টি ক'রে ফেললাম। কবরখানার অন্ত্যজ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রভাত সূর্যের কিরণের মত সেই বিষাদময় আশ্রমের মধ্যে একটি সুন্দর কুসুমের মতই তাকে আমার মনে হয়েছিল। তার ছবিটি এমন সুন্দরভাবে আমার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল যে তাকে চাক্ষুষ দেখার ইচ্ছে আমার আর ছিল না। তার কথা বলার সময় লোকের মুখে যে পরিতৃপ্তির ছাপটি আমি দেখেছি তা থেকেই সে আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল; ফলে যে সমস্ত বৃদ্ধারা তার নিন্দা করত তাদের ওপরে আমি রীতিমত বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকেনি; সেটা হচ্ছে তার সম্বন্ধে কোন কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি।

কিন্তু ব্যাবেতীর সম্বন্ধে আমার মনে এই যে ধারণাটা জন্মেছিল—সেটা স্পষ্ট নয়, অস্পষ্ট। কল্পনায় তার একটি সুন্দর মূর্তি আমি গড়ে তুলেছিলাম—এই পর্যন্ত। ওখান থেকে চলে আসার পরে অনেক কথার মত তার কথাও হয়ত আমি ভুলে যেতাম যদি না সেদিন হঠাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেত। কল্পনায় তার যে মূর্তিটি আমি গড়ে তুলেছিলাম তার সঙ্গে তার বাস্তব চেহারার যে পার্থক্য তা দেখেই কেমন যেন আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

পেছনের ছোট একটা উঠোন পেরিয়ে সবেমাত্র আমরা একটি অন্ধকার রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়িয়েছি এমন সময় রাস্তার অন্যপাশে হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল; আর তার ভেতর থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে এল একটি ছায়ামূর্তি। সেটি যে একটি নারীর তা আমরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক কর্কশকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন—ব্যাবেতী, ব্যাবেতী!

এই বলেই তিনি প্রায় ছুটতে শুরু করলেন। আমরাও ছুটলাম তাঁর পিছু-পিছু। যে দরজার ভেতর দিয়ে ছায়ামূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তিনি সেই দরজাটা খুলে দিলেন। দরজার পরেই সিঁড়ি। তিনি আবার চীৎকার করলেন। উত্তরে কেবল একটুকরো চাপা হাসি বেরিয়ে এল তার। রেলিঙ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে আমরা দেখলাম নীচে থেকে একটি মহিলা স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তার মুখের ওপরে কুঞ্চন আর সাদা চুল থেকে বোঝা যায় যে মহিলাটি বৃদ্ধার পর্যায়ে পড়ে কিন্তু তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয় না যে তার অত বয়স হয়েছে। সেগুলি যুবতীর চোখের মত ঢলঢল। তার দৃষ্টিটা যেন সমুদ্রের মত গভীর—বেগুনে নীল—শিশুর চাহনির মত সরল।

হঠাৎ তত্ত্বাবধায়ক চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন—আবার তুমি লা ফ্রিজের কাছে গিয়েছিলে ?

বৃদ্ধাটি কোন উত্তর দিল না; হাসতে লাগল। তারপরে, সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার হাবভাব দেখে মনে হ'ল সে যেন স্পষ্ট ক'রে বলে গেল—তোমার কথা আমি গ্রাহ্যই করিনা।

এই অপমানজনক কথাগুলি তার মুখের ওপরে জ্বলজ্বল ক'রে ফুটে উঠেছিল; সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলাম তার চাহনিটিও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। তার শিশুর মত সরল চাহনির পরিবর্তে ফুটে উঠেছে হনুমানের চাহনি; হিংস্র, একগুঁয়ে বেবুনের চাহনি।

এরপরে আর কোন প্রশ্ন করার ইচ্ছা না থাকলেও তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা না ক'রে পারিনি—ওই বুঝি আপনাদের ব্যাবেতী ?

বৃদ্ধাটির অপমানজনক চাহনির অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি এটা অনুমান ক'রেই তিনি রাগে লাল হয়ে বললেন—হ্যাঁ।

স্বরটাকে বিদ্রূপাত্মক ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—ওইটিই আপনার রমণীরত্ন ?

আমার প্রশ্নে আরও লাল হয়ে উঠল তাঁর চোখ আর মুখ!

পাছে আরও তাঁকে প্রশ্ন করি এই ভয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে-হাঁটতে তিনি বললেন—হ্যাঁ।

কিন্তু তখন আমার কৌতূহল চরমে উঠেছে। তাই আমি বললাম—এই ফ্রিজকে আমি দেখতে চাই। এ কে ?

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—ও কিছু নয়; ও কিছু নয়। দেখার কিছু নেই তার। তাকে দেখে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই।

এই ব'লেই তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। যিনি সবকিছু একটি-একটি ক'রে আমাদের দেখানোর জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন তিনি এখন কোনরকমে শেষ করতে পারলে বাঁচেন।

পরের দিনই ওই অঞ্চল ছেড়ে চলে এলাম আমি; ফিরলাম প্রায় চার মাস পরে—শিকার করার ঋতু শুরু হওয়ার সময়। এই সময়টা বৃদ্ধাটিকে আমি ভুলতে পারিনি। কারণ, একবার যে তার চোখ দুটি দেখেছে তার পক্ষে তাকে ভুলে যাওয়া

কঠিন। সেই জন্য তিনটি ঘণ্টার এই ক্লান্তিকর যাত্রায় আমার একটি সহযাত্রীকে পেয়ে বিশেষ খুশীই হয়েছিলাম; তিনি সারা পথটিই ব্যাবেতীর কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন।

এই সহযাত্রীটি আমার পূর্ব-পরিচিত একজন ম্যাজিস্ট্রেট—বয়সে তরুণ, কিন্তু অভিজ্ঞ-দৃষ্টি—সবকিছু খুঁটিয়ে দেখাই তাঁর অভ্যাস। তাছাড়া, তিনি বুদ্ধিমান। তাছাড়া, আর একটি বিশেষ গুণ তাঁর ছিল। সেটি হচ্ছে বিচারকের কঠোর মনোভাবের সঙ্গে সবকিছু স্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করার শক্তি।

তাঁরই মুখ থেকে রহস্যময়ী এই নারীর কাহিনী শুনলাম।

দশ বছর বয়সে তার বাবা তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে; চরিত্র সংশোধন করানোর জন্যে তের বছর বয়সে তাকে চরিত্রশুদ্ধির আশ্রমে পাঠানো হয়। কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে আশপাশে অনেক বাড়িতেই সে চাকরাণীর কাজ করে; কোন কাজটাই তার স্থায়ী হয়নি; এবং যে-বাড়িতেই সে কাজ করতে গিয়েছে সেই বাড়িরই মনিবের সে রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটিয়েছে। অনেক সংসারকেই সে ধ্বংস করেছে; প্রতিদানে নিজে সে কোন অর্থ পায়নি, বা কোথাও স্থায়ী কাজ যোগাড় করতে পারেনি। তার জন্য একটি দোকানদার আত্মহত্যা করেছে; একটি যুবক চোর-বদমাইশ হয়ে অসামাজিক জীবে পরিণত হয়েছে। দু'বার তার স্বামী মারা গিয়েছে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে সে-ই একমাত্র বারবণিতা বলে পরিচিত ছিল।

নিশ্চয় খুব সুন্দরী ছিল?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

তিনি বললেন—মোটেই না। যৌবনেও যে সে সুন্দরী ছিল একথাও কেউ স্মরণ করতে পারে না।

তাহলে?

ওই যে চোখ দুটি। নিশ্চয় সেগুলি দেখেননি।

বললাম—ঠিকই বলেছেন। ওই চোখ দুটিই সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে। সরল শিশুর মত চাহনি তাদের।

তিনিও বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলে উঠলেন—যে নারীর ওইরকম চোখ রয়েছে সে কোনদিন বুড়ো হ'তে পারে না। ব্যাবেতীর বয়স যদি একশ'ও হয় তাহলেও তাকে সবাই ভালবাসবে—ঠিক এখন যেমন বাসে।

কিন্তু বর্তমানে তাকে কে ভালবাসে?

ওই আশ্রমের সব বৃদ্ধরাই।

তাই কি?

নিশ্চয়। আর সবচেয়ে বেশী ভালবাসে আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক।

অসম্ভব।

আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

আর ওই লা ফ্রিজটি কে?

লোকটি হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত কসাই। ১৮৭০-এর যুদ্ধে ওর পা দুটো বাতিল হয়ে যায়। লোকটা ব্যাবেতীকে ভালবাসে। যদিও লোকটার দুটো পা-ই কাঠের, আর বয়সও প্রায় তিপ্পান্ন, তবুও বেশ বলিষ্ঠ, মুখটাও সুন্দর। তত্ত্বাবধায়ক ওকে বেশ হিংসা করে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা যখন আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখি সবাই বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করছে। আশ্রমের বাসিন্দারা ভীষণ উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে। পুলিশ এসেছে; আর আশ্রমের মালিক তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শুনলাম কেউ খুন হয়েছে। দলে ভিড়ে গেলাম আমরা। লা ফ্রিজ তত্ত্বাবধায়ককে খুন করেছে। খুন করার যে বিবরণ শুনলাম তা বীভৎস। ভূতপূর্ব কসাই দরজার পাশে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। তত্ত্বাবধায়ক ঘরে ঢোকামাত্র তাঁকে জাপটিয়ে ধরে সে মাটির ওপরে ফেলে দেয়। তারপরে তাঁর গলা কামড়িয়ে ধরে এত জোরে কামড় দেয় যে তাঁর করোটিড আর্টারি ছিড়ে যায়; সেইখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ঘাতকের গোটা মুখ দেয় ভরিয়ে।

লা ফ্রিজকে দেখলাম। ধুয়ে ফেলার পরেও তার মুখের ওপরে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। জানোয়ারের মুখের মত বীভৎস তার মুখের চেহারা। আর দেখলাম ব্যাবেতীকে। সে দুটি চোখের চাহনি শিশুর মত নির্মল; সংবেদনশীল।

আশ্রমের মালিক; যাঁর বাড়িতে আমরা গিয়েছি, নীচু গলায় আমাকে বললেন—ওই মেয়েটা বার্দ্ধক্যজনিত স্নায়ুবিকারে ভুগছে। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখার পরেও ওর চাহনি যে ওইরকম তার কারণই হল এই স্নায়ুবিকার।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—তাই কি? মনে রাখবেন, ওর বয়স এখনও ষাট হয়নি। আমার মনে হয় না ও কোন বার্দ্ধক্যজনিত স্নায়ুরোগে ভুগছে; আর এও আমি বিশ্বাস করি, কী ঘটেছে তাও বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছে।

তাহলে ও হাসছে কেন?

হাসছে এই জন্যে যে যা ঘটেছে তাতে ও খুশি হয়েছে।

না, না। তা কী করে হবে?

ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ ব্যাবেতীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন; তারপরে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী ঘটেছে আর কেন ঘটেছে, আশা করি তুমি তা জান?

তার মুখ থেকে সরল হাসিটি মুছে গেল। তার চোখের দৃষ্টি হনুমানের দৃষ্টির মত কর্কশ, ঘৃণ্য হয়ে উঠল। তারপরে হঠাৎ সে তার পেটিকোট ওপরে তুলে তার শরীরের নিম্ন অঙ্গটি সকলের সামনে খুলে দেখাল। হ্যাঁ, ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক কথাই বলেছেন। তার নিম্ন অঙ্গটি দেখে বজ্রাহতের মত আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

লা ফ্রিজ আমাদের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—সব শুয়োর, সব শুয়োর! তোমরাও ওর ওপর অত্যাচার করতে চাও।

এবং আমি দেখলাম ম্যাজিস্ট্রেটের মুখটা সত্যি-সত্যিই বিবর্ণ হয়ে উঠল; তাঁর ঠোঁট আর হাত দুটি কাঁপতে লাগল। মনে হ'ল অন্যায় করতে গিয়ে যেন তিনি ধরা পড়েছেন।

লিলি লালা

Lily Lala

স্বপ্নালু চোখে স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে হাতড়ে-হাতড়ে কী যেন খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলেন লুই দ্য আরাঁদেল; তারপরে বললেন—যখন তাকে আমি প্রথম দেখলাম তখন আমার মনে হয়েছিল বিস্মৃত কোন গায়কের গাওয়া অনেকদিন আগে শোনা আমি একটা মিষ্টি অথচ মন্থর গানের কলি শুনছি। সেই গানের গ্রন্থনায় একটি সুকেশ রমণীর কাহিনী ছিল। এমন সুন্দর তার কেশের বর্ণবিন্যাস যে তার মৃত্যুর পরে তার প্রেমিক সেই কেশগুলি কেটে তাই দিয়ে বেহালার তার তৈরি করেছিল। সেই বেহালার তার থেকে যে সুর সৃষ্টি হোত তাই শুনে শ্রোতারা মৃত্যু পর্যন্ত ভাল না বেসে পারত না।

'তার চোখে আমি অতল জলের ছায়া দেখেছি। সেই অতল জলের মধ্যে সবাই তলিয়ে যেত; তার ঠোঁটের কোণে এমন একটি স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর হাসি উঁকি দিত যে মনে হোত সে বেশ জানে তাকে কেউ জয় করতে পারবে না; নিষ্ঠুর সাম্রাজ্ঞীর মত সে সমস্ত পুরুষের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করবে, শত ব্যভিচারের ভেতরেও তার মনটা থাকবে অপাপবিদ্ধা রমণীর মত।

'স্বর্গের অপ্সরীর মত মাথাটি তার আমি দেখেছি; দেখেছি তার সোনালী রঙের চুলগুলি, তার সেই দীর্ঘ, ছন্দোময় শরীরটি; তার শ্বেতশুভ্র কচি-কচি শিশুর মত আঙুলগুলি; যখন সে বাব্‌লা গাছের সারির মধ্যে দিয়ে হাঁটতো তখন সেই নিঃসঙ্গ নারীটিকে দেখে মনে হোত মানুষের অনন্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসকে সে যে থামাতে পারত না তার জন্যে সে বেশ ক্রুদ্ধা হয়ে উঠেছে। কেউ তখন বিশ্বাস করতে পারত না যে এই রমণীটি অনাবিল জীবন স্রোতে বাঁধন হারা হয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে—শৌর্যের ইতিহাসে লিলি লালা এই অদ্ভুত নামে-সে পরিচিত—আর কেউ একবার তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত নষ্ট না ক'রে কিছুতেই সে ফিরে আসতে পারত না।

'কিন্তু এ-সমস্ত সত্ত্বেও, লিলির স্বরটি ছিল স্কুলের মেয়ের মত নরম, নিরপরাধ। মনে হোত সে এখনও দড়ি দিয়ে স্কিপিং করে, এখনও ছোট জাঙ্গিয়া পরে; তার মিষ্টি হাসি শুনে মনে হোত, বিয়ের ঘণ্টা বাজছে। মাঝে মাঝে আমি আমোদ করার

জন্যে তার সামনে নতজানু হয়ে তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরতাম—একটি সেণ্টএর মত মনে হোত তাকে।

'একদিন সন্ধ্যাবেলা বিয়ারিটজএর সমুদ্রকূলে আমরা বেড়াচ্ছিলাম। প্রচণ্ড উত্তাপে ঝলসে উঠেছিল আকাশ। ভুসোর মত কালো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল সমুদ্রকে; পোর্ট-ভিকস্-এর সমুদ্রোপকূলের বেলাভূমিতে অতিকায় ঢেউগুলি ভেঙে আছড়ে পড়ছিল। এসব দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না লিলির। সে বালির ওপরে অন্যমনস্কভাবে জুতোর গোড়ালি দিয়ে গর্ত খুঁড়ছিল। হঠাৎ সে তার গোপন কথাটি আমার কাছে প্রকাশ করে দিল। মেয়েরা মাঝে মাঝে কী জানি কেন এই রকম আকস্মিকভাবে নিজেদের ধরা দেয়; তারপরেই তারা অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে।

'প্রিয় বন্ধু, সেণ্ট হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই, "গসপেল" বা "গোল্ডেন লিজেনড" নয়; আমার জীবন পূর্ণমাত্রায় নাটকীয়। যতদূর মনে পড়ে বহুপ্রত্যাশিত শিশুর মত জামাকাপড় জড়িয়ে আমাকে ছেলেবেলায় মানুষ ক'রে তুলেছিল সবাই; চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে কোলে ক'রে একজন মেয়েমানুষ ঘুরে বেড়াত। ফলে আদর আর যত্নের বাড়াবাড়িতে আমি একেবারে বয়ে গেলাম।

'সেই সব চুম্বনগুলি এত মিষ্টি ছিল যেন এখনও সেগুলি আমার ঠোঁটের ওপরে লেগে রয়েছে। শৈশবের সেই পারিপার্শ্বটি—সারি-সারি গাছ যাদের দেখে আমি ভয় পেতাম, সেই সব ঝড়ের আর্তনাদ—যা শুনে আমি আঁৎকে উঠতাম—সেই সব পুকুর যাদের জলে হাঁসগুলি সাঁতার কেটে বেড়াত—সেই সব আমার মনে ছবির মত ভেসে রয়েছে। নিজেকে নিছক দেখার জন্যে আজও যখন আমি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন আমার মনে হয় যে মেয়েটি শৈশবে আমাকে চুম্বন করত, যে সকলের চেয়ে মিষ্টি সুরে আমার সঙ্গে কথা বলত আমি যেন তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তারপর?

'আমাদের বাড়ির কোন অসৎ চাকর কি আমাকে গোপনে কোন ভ্রাম্যমাণ সার্কাসওয়ালার কাছে বেচে দিয়েছিল? তা আমি জানিনা; জানতেও পারিনি কোনদিন; কিন্তু আমার শৈশব যে ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দলে জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে কেটেছিল তা আমি জানি। তখন আমি কত ছোট। তারা আমাকে অনেক কঠিন-কঠিন খেলা শেখালো—টানা শক্ত অথবা আলগা দড়ির ওপর দিয়ে শেখালো হাঁটতে। কারণে অকারণে তারা আমাকে মারতো; মাংসের পরিবর্তে শুকনো রুটির টুকরো চিবোতে দিত আমাকে। কিন্তু একবার মনে আছে একটা গাড়ীর তলায় লুকিয়ে আমি একবাটি সুপ চুরি ক'রে খেয়েছিলাম। আমাদের সার্কাসের একটি ভাঁড় তার তিনটি শিক্ষিত কুকুরের জন্যে এই সুপটা তৈরি করেছিল।

'সেখানে আমি ছিলাম নির্বান্ধব। সবচেয়ে নোংরা জঘন্য কাজ আমাকে দিয়ে তারা করাতো। আমার গা খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে তারা টাট্টু চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। সার্কাস দলের মধ্যে যে লোকটা আমার সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করত সে হচ্ছে ম্যানেজার। মনে হোত, আমাকে মারধোর করতে তার বেশ আনন্দ হোত। প্রতিদিনই সে আমাকে

যন্ত্রণা দিত। এই লোকটাই সার্কাসের মালিক। বুড়ো, নোংরা জানোয়ার ছিল লোকটা; আর সেই রকম ছিল যাকে বলে হাড়-কেপ্পন। দলের আর সবাই দুষ্ট ব্যাধির মত তাকে ভয় করতো। লোকটা সব সময় মাদুরের নীচে টাকাগুলো লুকিয়ে রেখে রোজগারপত্তর হচ্ছে না বলে চেঁচামেচি করত; যতটা পারতো দলের লোকদের মাইনে কেটে দিত সেই ছুতোয়। তার নাম হচ্ছে রাফা। আমি ছাড়া অন্য কোন শিশু হ'লে সে আত্মহত্যা ক'রে শহীদ হয়ে যেত; কিন্তু আমি বেড়ে উঠতে লাগলাম। যতই বয়স বাড়তে লাগল আমার—ততই সুন্দরী হ'তে লাগলাম আমি। আমার বয়স যখন পনের তখন সবাই আমাকে প্রেমপত্র লিখতে শুরু করল; খেলার মাঠে দর্শকরা আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল ফুলের তোড়া। আমি যখন দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতাম তখন সবাই আমার সেই জাঙ্গিয়া পরা পীনোদ্ধত চেহারার দিকে তাকিয়ে হইচই ক'রে উঠতো।

'দলের লোকেরাও আমার সঙ্গে সমীহ্ ক'রে কথা বলতে শুরু করল; ড্রেসিং রুমে আমি যখন পোশাক বদলাতাম সবাই তখন আমার সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়াতো। সবচেয়ে ঘায়েল হ'ল মালিক রাফা। আমার সামনে এলে তার বুকটা ধড়ফড় করত। হ্যাঁ, সে আমাকে চুমু খাওয়ার জন্যে রফা করতে আসতো। আমি ঘৃণায় মরে যেতাম। যে লোকটা আমার ওপরে সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করেছে, জর্জরিত করেছে আমাকে, আমার জীবন বিষময় করে তুলেছে, যতদূর সম্ভব তাকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম। নারীজাতির স্বভাবসুলভ চাতুরি, ছলাকলা, মিথ্যাভাষণ—যেগুলির মাধ্যমে জানোয়ারদের মত পুরুষদের আমরা বশ করি, মালিকের ওপরে আমার সেই সব চোখা-চোখা অস্ত্রগুলি ছুঁড়তে লাগলাম আমি।

'সেই লম্পট কামুক ছাগলটা আমাকে সত্যিই ভালবাসতো। নারীজাতিকে লোকটা বিলাসের শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না। বৃদ্ধেরা যেমন যুবতীদের ভালবাসে সেই প্রাচুর্য নিয়েই সে আমাকে ভালবাসতো। ভালবাসার ছলনা দেখিয়ে সেই গর্দভটাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই আমি করিয়ে নিতাম। আমিই এখন দলের ম্যানেজার বনে গেলাম। সেই হতভাগা ব্যর্থ আশায় দিন-দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। তখনও পর্যন্ত সে আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। আমার জুতো আর পরচুলোর ওপরেই সে কেবল চুমু খেত। তার কোনরকম ঘনিষ্ঠতা আমি বরদাস্ত করতাম না। ফলে সে রোগা হ'তে লাগল, হতে লাগল অসুস্থ আর নির্বোধ। সে যখন করজোড়ে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে আমার কৃপা ভিক্ষা ক'রে প্রতিজ্ঞা করত যে আমাকে সে বিয়ে করবে তখন আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়তাম। সে আমাকে কত মেরেছে, কত গালাগালি দিয়েছে, কত অপমান করেছে—সে সব কথা তাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতাম। এবং এইভাবে বিফল হয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে মদের বোতল খুলে প্রাণের জ্বালা মেটানোর চেষ্টা করত। জিন আর হুইস্কি খেয়ে মাতাল হয়ে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ে তার দুঃখ আর কামনা ভোলার চেষ্টা করত।

'আমাকে প্রলুব্ধ ক'রে তার স্ত্রী হওয়ার জন্যে সে আমাকে অনেক গয়না দিল। আমি অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও, সব কাজেই সে আমার মতামত নিতে লাগল। একদিন সন্ধ্যায় তার গালে একটু আদর করে আমি তাকে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উইল করিয়ে নিলাম। এই উইল অনুসারে তার অবর্তমানে তার সমস্ত টাকা, সার্কাস এবং অন্যান্য সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমি হয়ে গেলাম।

'সেবারে আমরা মস্কোর কাছে তাঁবু ফেলেছি। সময়টা শীতের মাঝামাঝি। বরফ পড়ছিল অবিশ্রান্ত ধারায়। শীত থেকে বাঁচার জন্যে সবাই গনগনে স্টোভের ধারে বসেছিল। খেলার পরে বিরাট একটা পাত্রে রাফা খেতে বসল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমরা দু'জনে পানভোজন করলাম। তার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহারই করলাম আমি। বারবার মদের গ্লাস ভর্তি করে তাকে দিতে লাগলাম। আমি তার হাঁটুর ওপরে বসে তাকে চুমু খেলাম। তার প্রেম আর মদের ধোঁয়া মিশিয়ে তার মগজে চড়ে বসল। ক্রমশ মাতাল হয়ে সম্বিত হারিয়ে সে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়ল। মনে হল সে বজ্রাহত হয়ে পড়েছে। তার চোখ দুটো বুজে এল। কথা বলার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলল।

'দলের সবাই তখন ঘুমোচ্ছে। সকলের ঘরের বাতি নেভানো। কোথাও কোন শব্দ নেই, কেবল বরফ পড়ছে অবিশ্রাম। আমি আলোটা নিভিয়ে দিলাম, দরজা খুললাম। তারপরে বস্তার মত মাতালটার পা ধরে টানতে-টানতে বাইরে বরফের মধ্যে ফেলে দিলাম। পরের দিন সকালে রাফার শক্ত প্রাণহীন দেহটা সকলে আবিষ্কার করল। প্রচুর মদ খাওয়ার অভ্যাস যে তার ছিল সেকথা সবাই জানতো। তাই তার মৃত্যুর জন্যে আমাকে কেউ দায়ী করল না। এইভাবে আমি প্রতিশোধ নিলাম; এবং বছরে প্রায় পনের হাজার ফ্রাঁ আয়ের অধিকারিণী হলাম আমি। পৃথিবীতে সৎ হয়ে লাভ কী? গসপেলে যে শত্রুকে ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছে তারই বা অর্থ কি?'

কাহিনী শেষ ক'রে লুই দ্য আরাঁদেল বললেন—আমার ধারণা জীবনে এত বেশী কথা আমি আর কখনও বলিনি। এবারে একটু ককটেল খাওয়া যাক চলুন।

একটি ভবঘুরে

A vagabond

আজ একমাসের ওপরে রাঁদেল কেবল ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে। একটা কাজ যোগাড় করার জন্যে সর্বত্র সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামে কোন কাজ নেই; তাই সে গ্রাম ছেড়েছে। সাতাশ বছরের শক্ত, সমর্থ ছোকরা, পেশায় ছুতোর মিস্ত্রি; কাঠের কাজ সে ভালই জানে। অথচ দু'মাস হল সে বেকার। বাড়ির বড় ছেলে হওয়া

সত্ত্বেও কাজের অভাবে সে সংসারের ঘাড়ে বসে খাচ্ছে। তার দুটি বোন ঠিকে-ঝির কাজ করে, রোজগার করে সামান্য। আর সংসারের সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ জেকিস রাঁদেল কাজের অভাবে বেকার হয়ে অপরের খাবার খাচ্ছে।

টাউন হলে সে কাজের সন্ধানে গেল। মেয়রের সেক্রেটারী বললেন শ্রমিক কেন্দ্রতে সে কাজ পাবে। বাড়তি একজোড়া জুতো, একজোড়া ট্রাউজার, একটা শার্ট, আর কিছু দরকারী কাগজপত্র একটা নীল রুমালে বেঁধে লম্বা একটা লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে। সেই লাঠিটা কাঁধের ওপরে চাপিয়ে সে শ্রমিক কেন্দ্রের দিকে রওনা দিল।

কিন্তু কোথায় সেই রহস্যময় শ্রমিক কেন্দ্র যেখানে গেলে কাজ পাওয়া যায়? সে কেবল হাঁটলো—রোদে-জলে ভিজে দিনরাত্রি কেবল হাঁটতেই লাগল। শ্রমিক কেন্দ্রের দেখা আর পেল না। প্রথমে সে ভেবেছিল ছুতোর মিস্ত্রীর কাজই সে করবে; কিন্তু অনেক ছুতোরের দোকানে শুনল কাজের অভাবে কিছুক্ষণ আগেই সে সব জায়গায় ছাঁটাই হয়েছে। সেই জন্য সে ঠিক করল হাতের কাছে সে যা পাবে তাই করবে। সুতরাং সে যুদ্ধজাহাজে কাজ করল, ঘোড়ার আস্তাবল পরিষ্কার করার কাজ নিল; রাস্তায় পাথর ভাঙলো। মালিকদের প্রলুব্ধ করার জন্যে নামমাত্র মজুরি নিল সে। এতকম মজুরি নিতে তার নিজেরই লজ্জা করছিল। কিন্তু এত ক'রেও মাঝে-মাঝে দু'-তিন দিন ছাড়া স্থায়ী কাজ সে যোগাড় করতে পারল না।

বর্তমানে সপ্তাহখানেক সে বেকার। টাকা পয়সাও তার খরচ হ'য়ে গিয়েছে। রাস্তায় এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে সে একটা পাঁউরুটি ভিক্ষে করে এনেছিল। এখন সে তাই চিবোচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। শরতের শেষ হল ব'লে। ভারি মেঘ জমেছে আকাশে। মনে হল, এখনই বৃষ্টি নামতে পারে। ক্লান্ত পা দুটি টানতে-টানতে পরিশ্রান্ত দেহে সে কোনরকমে হাঁটতে লাগল। রাঁদেলের পেটে তখন ক্ষিদের আগুন জ্বলছে। এই রকম ক্ষিদে পেলেই নেকড়েরা মানুষকে আক্রমণ করে। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বেশী পদক্ষেপ এড়ানোর জন্যে সে লম্বা-লম্বা পা ফেলতে লাগল; কাঁধের ওপরে লাঠিটাকে সে শক্ত করে বাগিয়ে ধরল; মনে হল, প্রথমে যে মানুষটিকে সে দেখতে পাবে এবং মনে হবে সে খাওয়ার জন্যে বাড়ি যাচ্ছে তাঁকেই সে সজোরে লাঠিপেটা করবে। যেতে-যেতে রাস্তার ধারে আল কাটা মাঠের কিছু অংশ তার নজরে পড়ল। বোঝা গেল ওখান থেকে আলু তোলা হয়েছে। কিছু যদি আলু সে সংগ্রহ করতে পারত তাহলে কিছু শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে তাই দিয়ে সে সুন্দর ডিনার তৈরি করে নিত। কিন্তু চাষীরা সব আলু তুলে নিয়ে গিয়েছে, ফেলে রেখেছে কেবল শিকড়গুলো। আগের দিনের মত সেই কাঁচা শিকড়ই সে চিবোতে লাগল।

গত দু'দিন ধরে পদক্ষেপ দ্রুত করার সঙ্গে-সঙ্গে, সে মনে-মনে যা ভাবছিল তাই চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছিল। এতদিন সে ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার সুযোগ পায়নি। তার সমস্ত চিন্তাকে সে তার কাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে বেকার; অজস্র চেষ্টা করেও সে কোন কাজ যোগাড় করতে পারেনি; বার-বার ব্যর্থ হয়েছে; কেউ তার দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, কেউ ঘৃণার সঙ্গে তাকে

দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে; তাকে অকেজো ভবঘুরে বলে অপমান করেছে। এই রকম একটা মানসিক অবস্থায় সে বার-বার নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল—তুমি বাড়িতে থাকলে না কেন? হাতের শক্তি থাকতেও যে কোন কাজ যোগাড় করতে পারছে না; তার আত্মীয়স্বজন—কপর্দকহীন অবস্থায় যারা বাড়িতে বসে রয়েছে তাদের কথা তার মনে পড়ল; এই সব নানা দুশ্চিন্তা প্রতিটি ঘণ্টায়, প্রতিটি মুহূর্তে তাকে উন্মত্ত ক'রে তুলল; আর সমাজের এই জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে সে জেহাদ ঘোষণা করতে লাগল।

পাথরের গায়ে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েই সে গজ-গজ করে উঠল—এরা কেউ মানুষ নয়—সব শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োর। এরা মানুষকে একজন ভাল ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ দিতে পারে না, অনাহারে শুকনো ক'রে মারে। দুটো পেনিও দেয় না এরা। এখন কী করি? বৃষ্টি শুরু হল। সব শালা শুয়োর।

ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসে সে রেগে কাঁই হয়ে গেল। ভাগ্য সব সময়ে একচোখো, নিষ্ঠুর। তাই তার সব রাগ গিয়ে পড়ল মানুষের ওপরে। তারপরে দূরে একটা ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখল। এখন ডিনারের সময়। এই দেখে দাঁতে দাঁত চিপে সে গজগজ করে উঠল—'সব শালা শুয়োরের বাচ্চা!' এবং চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অন্যান্য সামাজিক অন্যায়ের কথা চিন্তা না করেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সে সেই বাড়িটা লক্ষ্য করে এগোতে লাগল—ইচ্ছে হল সেই বাড়ির সবাইকে হত্যা করে সে নিজেই সেই খাবার টেবিলে বসে যাবে। কৈফিয়ৎ দিল—বেঁচে থাকার অধিকার আমার রয়েছে। ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়—তবু আমি কিছু কাজ চাই—শুয়োরের বাচ্চারা তাও আমাকে দেবে না।—আমার বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার রয়েছে—অধিকার রয়েছে নিঃশ্বাস নেওয়ার—এ বাতাস কারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয়—আমাকে খেতে না দেওয়ার কারও কোন অধিকার নেই।

বরফের মত ঠাণ্ডা কনকনে বৃষ্টি নামল বলে। বাড়ি ফিরে যেতে এখনও তাকে মাসখানেক এইভাব হাঁটতে হবে। বর্তমানে সে বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছে। সে বুঝতে পেরেছে বাড়িতে ফিরে যাওয়াই তার পক্ষে নিরাপদ। সেইখানে সে সকলের পরিচিত। ছুতোর মিস্ত্রীরই হোক, শ্রমিকের কাজ হোক—যেকোন কাজই যোগাড় করতে পারলেই তার চলবে। দৈনিক দশটা পেনী রোজগার করতে পারলেই কোনরকমে তার খাওয়া পরাটা চলে যাবে। সে বুঝতে পেরেছে এই বিদেশে অপরিচিত তাকে কেউ কাজ দেবে না—সবাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

বৃষ্টি পড়তে লাগল। বৃষ্টির দাপটে তার জামা কাপড় ভিজে গেল। শীতের কাঁপুনি তার হাড়ের মধ্যে ঢুকে তাকে অস্থির করে তুলল। কোন্ আশ্রয়ে সে তার দেহটাকে রাখবে তা বুঝতে পারল না। এই বিরাট বিশ্বে মাথা গোঁজার মত স্থান তার কোথাও নেই। ধীরে-ধীরে রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবীটা ঢেকে গেল। মনে হল, দূরে মাঠে ঘাসের ওপরে কালো মত কী একটা জিনিস বসে রয়েছে। ওটা একটা গরু। সুতরাং সে খানা পেরিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল। কেন গেল নিজেই সে জানে না। কাছাকাছি

যেতেই গরুটা তার মাথা তুলে রাঁদেলের দিকে তাকালো। রাঁদেল ভাবল—হায়রে, একটা যদি মগও থাকত; তাহলে খানিকটা দুধ দুয়ে নিতে পারতাম। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকাল; তারপরে গায়ের জোরে একটা লাথি মেরে সে বলল—ওঠ।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল গরুটা। দুধে ভরা তার বিরাট বাঁটগুলি বেশ ঝুলে পড়েছে। সে তার পায়ের নীচে বসে হাত দিয়ে বাঁট টেনে-টেনে যতক্ষণ পারল পেট বোঝাই করে দুধ খেয়ে নিল। তারপরে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

গরুটা আবার থপাস করে শুয়ে পড়ল। রাঁদেল তার কাছে বসে গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। বৃষ্টি আবার নামল জোরে। ঠাণ্ডা কনকনে বৃষ্টি। কোথায় আশ্রয় নেবে সেই কথাটাই ভাবতে লাগল রাঁদেল। তারপরে হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পোশাকটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সে গরুটার পেটের নীচে ঢুকে গেল। গরুর গাটা বেশ গরম। তারপরে সে সেইখানে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙলো সকালে। বৃষ্টি আর নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। গরুটা তখনও শুয়ে রয়েছে। সে উঠে পড়ল। পোশাকটা ঠিক ক'রে নিল, জুতো পরল। তারপরে গরুর নাকে একটা চুমু খেয়ে হাঁটতে শুরু করল। টানা দুটি ঘণ্টা একটানা হাঁটার পরে আবার সে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের ওপরে বসে পড়ল। দিনটা ছিল রবিবার। গির্জায় ঘণ্টা বাজছিল। রঙ-বে-রঙের পোশাক প'রে মেয়ে-পুরুষের দল—কেউ হেঁটে, কেউ গরুর গাড়ীতে চড়ে গির্জার দিকে যাচ্ছিল এগিয়ে।

হঠাৎ সে দেখল একটা হৃষ্টপুষ্ট চাষী একপাল মেষ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে রয়েছে পাহারাদার একটা কুকুর। সে কাছাকাছি আসতেই রাঁদেল তার মাথার টুপীটা খুলে বলল—আমি না খেতে পেয়ে মরছি। আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন ?

লোকটি চোখ পাকিয়ে বলল—রাস্তার লোককে আমি কোন কাজ দিইনা।

রাঁদেল ফিরে গিয়ে আবার সেই খানার ধারে একটা পাথরের ওপরে গিয়ে বসে রইল। চুপচাপ বসে রইল। কত লোকই তো তার পাশ দিয়ে এল আর চলে গেল। সব বসে-বসে দেখল সে। তারপরে একজন এলেন। তাঁর সাজ-পোশাক দেখে তাঁকে বেশ সম্ভ্রান্ত বলেই মনে হল। রাঁদেল তাঁর সামনে উঠে গিয়ে বলল—দুটি মাস ধরে আমি কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি। একটা কাজও যোগাড় করতে পারিনি। অথচ আমার পকেটে আধ পেনিও নেই।

সেই ভদ্রলোক বললেন—গ্রামে ঢোকার মাথায় একটা নোটিশ রয়েছে বোধহয় দেখেছ। তাতে লেখা রয়েছে—এই অঞ্চলে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ। আমি এখানকার মেয়র। তুমি যদি এই অঞ্চল থেকে এখনই চলে না যাও তাহলে তোমাকে আমি হাজতে পুরব।

রাগ বাড়ছিল রাঁদেলের; সে বলল—তাহলে আমাকে হাজতেই পুরুন। তাহলে আমাকে অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না।

এই বলে সে যথাস্থানে গিয়ে আবার বসে পড়ল। মিনিট পনের পরে দু'জন পুলিশ ধীর গতিতে তার দিকে এগিয়ে এল। তাদের পোশাক চকচকে। রোদের আলোতে চকচক করছে। উদ্দেশ্য—যেন তাদের সেই চকচকে পোশাক দেখে দুষ্কৃতকারীরা দূরে সরে থাকবে। রাঁদেল জানত ওরা তার জন্যে এসেছে। তবু সে উঠল না। তাদের অগ্রাহ্য করার কেমন যেন একটা গোঁ জন্মে গেল তার। ব্রিগেডিয়ার তার কাছে এসে বলল—তুমি এখানে কী করছ?

বিশ্রাম নিচ্ছি।

কোথা থেকে আসছ?

লা মাঁচি।

ওখানেই থাক?

হ্যাঁ।

দেশ ছাড়লে কেন?

কাজ জোগাড় করার জন্যে।

কোন কাগজপত্র রয়েছে?

রয়েছে।

দেখি, দাও।

পকেট থেকে বার করে রাঁদেল তার সার্টিফিকেট আর ছেঁড়াখুড়া কাগজগুলি বার ক'রে ব্রিগেডিয়ারের হাতে দিল। ব্রিগেডিয়ার সেগুলি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন, তারপরে সেগুলি দিলেন তাকে; তাঁর চেহারা দেখে মনে হল তাঁর চেয়ে বেশী চতুর কোন লোক যেন তাঁর সঙ্গে রসিকতা করেছে।

একটু ভাবলেন তিনি; তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কাছে কোন টাকা-কড়ি আছে?

না।

কিছুই নেই?

কিছুই নেই।

তুমি বেঁচে আছ কী করে?

লোকের দয়ায়।

তাহলে তুমি ভিক্ষে কর?

রাঁদেল এবার বেশ রেগেই বলল—হ্যাঁ, সম্ভব হলে করি বইকি।

আমি রাস্তায় তোমাকে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। জীবিকা নির্বাহ করার মত তোমার কোন সঙ্গতি নেই। সুতরাং আমার সঙ্গে আসতে আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।

চলুন। এই বলে সে উঠে পড়ল। আমাকে হাজতে পুরে দেবেন চলুন। তাহলে অন্তত বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পারব।

গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল তারা; যখন গ্রামের ভেতরে এসে পৌঁছল তখন গির্জায় প্রার্থনাসভা শুরু হয়েছে। চারপাশে লোকে লোকারণ্য। দু'জন পুলিশের মধ্যে রাঁদেলকে দেখে অনেকেই তাদের চারপাশে জড় হল, ঘৃণার সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা যে একজন ক্রিমিন্যাল সে বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তাদের ইচ্ছে গেল তার দিকে ঢিল ছুঁড়তে; তাদের মনে হল লোকটার চামড়া ছিঁড়ে ফেলে, পায়ের তলায় মাড়িয়ে তাকে পিষে ফেলে। লোকটা ডাকাতি করেছে, না খুন করেছে—এই কথাটা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করল তারা। কসাই বলল, লোকটা সৈন্যবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছে। তামাক বিক্রীর দোকানদার বলল, সেদিন সকালেই লোকটা তাকে একটা অচল ফ্রাঁ দিয়ে গিয়েছে। লোহার দোকানদার বলল, লোকটা ম্যালেটএর বিধবাকে খুন ক'রে পালিয়েছিল। ছ'মাস ধরে পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলে সেই মেয়রের সঙ্গে দেখা হল রাঁদেল-এর। তাকে দেখেই মেয়র বললেন—আ; তুমি? তোমাকে যে হাজতে পোরা উচিৎ সে কথা আগেই তোমাকে আমি বলেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার, লোকটার অপরাধ কী?

লোকটার কোন ঘরবাড়ি নেই স্যার; জীবিকা রোজগার করার মতও ওর কোন সংস্থান নেই। ভিক্ষে করছে এরকম অবস্থায় ওকে আমরা গ্রেপ্তার করি। কিন্তু লোকটার ভাল প্রশংসাপত্র রয়েছে; আর যে সব কাগজ রয়েছে সেগুলিও সব খাঁটি।

কাগজপত্র পরীক্ষা ক'রে মেয়র তো অবাক; তারপরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ সকালে রাস্তার ওপরে বসে তুমি কী করছিলে?

কাজ খুঁজছিলাম।

কাজ? বড় রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে?

আপনি কী করে মনে করেন যে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে আমি কাজ পাব?

তারা দু'জনে দু'জনের দিকে ভিন্ন জাতের হিংস্র জন্তুর মত তাকিয়ে রইল। তারপরে মেয়র বললেন—আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি; কিন্তু আর যেন কেউ তোমাকে আমার সামনে হাজির না করে।

আপনি বরং আমাকে হাজতে ক'টা দিন আটকিয়ে রাখুন। গ্রামের পথে ঘুরে-ঘুরে আমি ক্লান্ত।

চুপ কর। ব্রিগেডিয়ার, গ্রাম থেকে দু'শ'গজ দূরে নিয়ে গিয়ে একে ছেড়ে দাও। ও চলে যাক।

রাঁদেল বলল—আমাকে অন্তত কিছু খেতে দিন।

হা-হা করে হেসে উঠলেন মেয়র—তাই বটে! খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

রাঁদেলও নাছোড়বান্দা। বলল—আপনি যদি আমাকে অনাহারের মুখে ঠেলে দেন তাহলে কোন অন্যায় কাজ করতে আমাকে বাধ্য করবেন। ওই দুটি মোটা লোকের কাজ তাহলে বাড়বে।

মেয়রের সেই এক কথা—ওকে নিয়ে যাও।

দুটি পুলিশ তার দুটো হাত ধরে টানতে-টানতে তাকে বার করে নিয়ে গেল। কোন বাধা দিল না রাঁদেল। নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হয়ে ব্রিগেডিয়ার বললেন—দূর হও। আবার যদি আমাদের হাতে পড় তাহলে মজাটা বুঝতে পারবে বাছাধন।

হাঁটতে শুরু করল রাঁদেল। কোথায় যাচ্ছে তা সে জানে না। মিনিট কুড়ি ধরে সে একটানা হাঁটতে লাগল। এতই বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল যে কোন কিছু চিন্তা করার শক্তিও তার ছিল না। একটা ছোট বাড়ির পাশ দিয়ে সে যাচ্ছিল; হঠাৎ সুন্দর খাবারের গন্ধে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল জানালা অর্দ্ধেকটা খোলা রয়েছে। রান্না মাংসের গন্ধ ছাড়ছে ঘরের ভেতর থেকে। ক্ষিদের জ্বালায় সে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে বন্য পশুর মত সে দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় ধাক্কা দিল। কোন সাড়াশব্দ পেল না। চীৎকার করে ডাকল। কেউ উত্তর দিল না। মনে হল, বাড়িতে যেন কেউ নেই। তখন সে খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। তারপরে একলাফে ভেতরে ঢুকে গেল। হ্যাঁ, চমৎকার-চমৎকার খাবার রান্না হচ্ছে। টেবিলের ওপরে দু'জনের খাবার জায়গা করা হয়েছে। নিশ্চয় ওরা গির্জায় গিয়েছে। ফিরে এসে খাবে। এই সুযোগে সে খেতে শুরু করল। প্রথমে রুটিটায় গোগ্রাসে কামড় দিল; সঙ্গে-সঙ্গে গিলে ফেলল। তারপরে মাংস খেল পেট ভরে; তারপরে শেষ করল ক্যাবেজ, ক্যারট আর পেঁয়াজ। বেশকিছুটা খাওয়ার পরে তার তেষ্টা পেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা ব্র্যান্ডির বোতল দেখতে পেল। বোতল থেকে গ্লাসে ভর্তি করে সেই ব্র্যান্ডি ঢক ঢক করে গলায় ঢাললো আর খেতে লাগলো খাবার। মনে হল এবারে তার পেট ফেটে যাবে। তার কপালে ঘাম জমে উঠল। হঠাৎ গির্জায় বেল বাজতে লাগল। প্রার্থনাসভা ভাঙ্গবে এবার। বাকি রুটিটা একটা পকেটে আর ব্র্যান্ডির বোতলটা আর এক পকেটে ঢুকিয়ে জানালা টপকে সে রাস্তার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর নির্জন রাস্তা ছেড়ে সে সোজা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। ভরা পেটে মনের আনন্দে সে মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকল; গাছের ছায়ায় হাঁটতে-হাঁটতে সে ব্র্যান্ডির বোতলটা খুলে চুমুক দিতে লাগল; হালকা মন আর দেহ নিয়ে সে পুরনো একটা গান গাইতে শুরু করল।

হাঁটতে-হাঁটতে সে হঠাৎ একটা নীচু রাস্তার ধারে গিয়ে হাজির হল; দেখল একটি মেয়ে, বেশ লম্বা চেহারা, বোধহয় কোন বাড়ির চাকরাণীই হবে, দুটো দুধের ভাঁড় নিয়ে আসছে। শিকারী কুকুরের মত নীচু হয়ে সে তাকে দেখতে লাগল। কিন্তু মেয়েটি তাকে দেখতে পেল না; রাঁদেল হঠাৎ প্রায় ছ' ফুট নীচে মেয়েটির সামনে লাফিয়ে পড়ল। রাঁদেলকে হঠাৎ তার সামনে লাফিয়ে আসতে দেখে মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল—ওঃ! কী ভয়ই না পেয়েছিলাম।

তার কোন কথাই রাঁদেলের কানে গেল না। সে তখন অন্য ক্ষুধায় বুভুক্ষু, গত দুটি মাস তার যৌনক্ষুধা অতৃপ্ত রয়েছে। সেই ক্ষুধা অন্য ক্ষুধার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র, অনেক বেশী যন্ত্রণা তার। একে সে যুবক, তার ওপর মদে সে তখন চুর হয়ে রয়েছে; তারও ওপরে প্রকৃতিদত্ত ক্ষুধা তাকে অস্থির করে তুলল। তার অর্দ্ধ

উন্মুক্ত মুখ আর প্রসারিত বাহুর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি চমকে উঠল। রাঁদেল তার ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিতেই তার দুধের ভাঁড় দুটি ছিটকে মাটিতে সশব্দে পড়ে গেল। সব দুধ ছড়িয়ে পড়ল। তারা দু'জনেই জড়াজড়ি ক'রে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মেয়েটি চীৎকার করে উঠল; কিন্তু চীৎকার করা অর্থহীন মনে ক'রে এবং সাহায্যের জন্যে কেউ তার ডাকে সাড়া দেবে না এই ভেবে, সে রাঁদেলের আকাঙ্খা পূর্ণ করল। এই কাজে সে খুব একটা রাগেনি; কারণ যুবক রাঁদেলের চেহারা ভালই, আর প্রকৃতির দিক থেকে সে মোটেই গুণ্ডাজাতীয় ছিল না।

উঠে দাঁড়িয়ে দুধের ভাঁড়ের অবস্থা দেখে মেয়েটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল; দুধের দাম তার কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বুঝতে পেরে একখানা আস্ত কাঠের টুকরো সে রাঁদেলের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। রাঁদেল মনে করল এই বলাৎকারের জন্যেই মেয়েটি তার ওপর চটেছে। সে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হ'ল; তারপরে বলাৎকার করার জন্যে ভয় পেয়ে সে ছুট দিল। তাই দেখে মেয়েটি ঢিল ছুঁড়তে লাগল; দু'চারটে ঢিল এসে তার পিঠেও পড়ল।

রাঁদেল অনেকক্ষণ ধরে ছুটে-ছুটে শেষপর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারে বসে পড়ল। কোথায় যাচ্ছে, কী করছে বা কী করবে কিছুই সে বুঝতে পারল না। মাথাটা কেমন তার গুলিয়ে গেল। সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তার ক্লান্তি আর কোনদিনই তাকে এমনভাবে অভিভূত করেনি। আর কিছু ভাবতে পারল না সে। অচিরে সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই দুটি লোকের ঝাঁকুনিতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখল—সকাল বেলাকার সেই দুটি পুলিশ তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার ঠাট্টা করে বললেন—জানতাম, আবার তোমাকে ধরব।

কোন উত্তর না দিয়ে রাঁদেল উঠে পড়ল; তারপরে পুলিশের পিছু-পিছু হাঁটতে লাগল। শরৎকালের সন্ধ্যা ভারি কালো হয়ে আসছিল জনপদের ওপরে। আধঘণ্টার মধ্যে তারা গ্রামের মধ্যে এসে হাজির হ'ল। ঘটনাটা ইতিমধ্যে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের প্রতিটি ঘরের সামনেই লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি পুরুষ মনে করল লোকটি তাদের সম্পত্তি অপহরণ করেছে, প্রতিটি নারী ভাবল, লোকটি তাদের ওপরে বলাৎকার করেছে। অপমান আর গালাগালি দেওয়ার জন্যে সবাই তাকে তাদের কাছে পেতে চায়। বিদ্রূপ করতে-করতে লোকেরা পিছু-পিছু এগিয়ে গেল।

তাকে দেখে মেয়র খুব খুশি হয়ে হাতে-হাত ঘষতে-ঘষতে বললেন—বটে, বটে! আবার এসেছ? তোমাকে রাস্তায় দেখেই সেকথা আমি বলেছিলাম যে এখানেই তোমাকে আসতে হবে। তারপরে আরও খুশি হয়ে বললেন—ওরে নোংরা হতভাগা জানোয়ার, এবার তোকে কুড়ি বছরের জন্যে ঘানি টানতে হবে।

ভাঁড়

The mounte banks

ইডেন রুনিস থিয়েটারের চতুর ম্যানেজার কমপারদি—থিয়েটারের সমালোচকরা ওই নামেই তাকে ডাকতো। কিছুদিন ধরে তার থিয়েটারে লোক হচ্ছিল না। দুর্ভাগ্য তার পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তা সত্ত্বেও, পরের দিনের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই আগামী দিনের চাঞ্চল্যের সাফল্য অর্জন করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করে বসল। প্রায় একটি সপ্তাহ ধরে পরবর্তী অভিনয়ের বিজ্ঞাপন সে চারপাশে ছড়িয়ে দিল—দেওয়ালের গায়ে, দোকানের সামনে, চলন্ত গাড়ীর পেছনে, গাছের ডালে—সর্বত্র এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল। এই বিজ্ঞাপন ছিল দুটি স্বাস্থ্যবান যুবকের। মনে হবে দু'জনেই কুস্তিগীর। এদের মধ্যে যার বয়স কম দেখাচ্ছিল সেই ছোকরাটি হাত দুটি মুড়ে দাঁড়িয়েছিল। পথের ধারে নানারকম ওষুধপত্রের শিশি বোতল ছড়িয়ে ক্যানভাসারেরা যেমন অর্থহীন শূন্য হাসিটি ফুটিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে, ছোকরাটির মুখের ওপরে সেই রকমের একটি অন্তঃসারশূন্য হাসি ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় যুবকটির হাতে একটি রিভলভার। মেকসিকো দেশের ট্র্যাপারের মত সে তার পোশাকটি পরেছে। সব জায়গাতেই বিরাট-বিরাট বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে যে আগামী সোমবার ইডেন রুনিস থিয়েটারে এই দুটি কুস্তিগীরের সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎকার হবে।

গোটা শহর সরগরম হয়ে উঠল; কারণ, জোরাল বিজ্ঞাপনই মানুষকে আকর্ষণ করে বেশী। এই দু'জন মনতিফিয়োররা [যাদের বিজ্ঞাপন অতটা ফলোয়া ক'রে চারপাশে প্রচার করা হয়েছে] অনেকটা ফ্যাশন্যাবল খেলনার মত। কিছুদিন আগে রোজ পিটি নামে যে ভ্রষ্টা নারীটি 'ওসকা ইসকার' নাটকে অভিনয় করতে করতে তৃতীয় আর চতুর্থ অঙ্কের মাঝখানে কেটে পড়েছিল, এরা স্টেজে নেমেছিল ঠিক তারই পরে। প্রেমশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্যে অভিনেত্রীটি সতের বছরের একজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল। এ কাজে যে বিপদ রয়েছে, রক্তপাত এমন কি মৃত্যুরও সম্ভাবনা রয়েছে তা জেনেই তারা পালিয়ে গিয়েছিল। এককথায়, কোন বিপদকেই তারা গ্রাহ্য করেনি। এই বেপরোয়া মনোবৃত্তিটাই মহিলাদের চিরকাল খুশি ক'রে এসেছে। এই রকম একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতিই এক নিষ্ঠুর আনন্দে তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, ভাবাবেগে বিবর্ণ হয়ে পড়ে তারা। ফলে হই-হই করে টিকিট বিক্রি হ'তে লাগল—অনেকদিনের অগ্রিম বুকিংও হয়ে গেল। ম্যানেজার তো আনন্দে ডগমগ! তিল ধারণের আর জায়গা নেই।

কাউনটেস রেজিনা দি ভিলেগবি তাঁর খাস কামরায় সোফার ওপরে শুয়ে শুয়ে অলসভাবে পাখার হাওয়া খাচ্ছিলেন। চারপাশে ঘিরে ছিল তাঁর তিন-চারজন ঘনিষ্ঠ

বন্ধু। তাঁরা হলেন সেণ্ট মার্স মতালর্ভিঁ, টম শ্যেফিল্ড এবং তাঁর সম্পর্কে এক ভাই, আর মাদাম দি রোহেল। শেষোক্ত ভদ্রমহিলা পাখীর গানের মত অবিশ্রাম হাসছিলেন। সন্ধে হয়-হয়। ফুলের বেশ মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। ঘরের মধ্যে তখনও আলো জ্বালা হয়নি। সকলের গল্পগুজব হাসি ঠাট্টায় কামরার মধ্যে একটা তালগোল পাকানো শব্দ গমগম করছিল।

সেণ্ট মার্স উচ্ছৃঙ্খল প্রেমের একটা গল্প শুরু করতে যাবেন এমন সময় কাউনটেস হঠাৎ তাঁর আঙুলে হাত দিয়ে বললেন—চা ঢেলে দাও দেখি। ভদ্রলোক ছোট-ছোট চায়না কাপে চা ঢালতে-ঢালতে জিজ্ঞাসা করলেন—মিথ্যাবাদী খবরের কাগজ যেরকম উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে, মনতিফিয়োররা কি সত্যিই অত ভাল অভিনয় করে ?

টম শ্যেফিল্ড আর অন্য সবাই তৎক্ষণাৎ আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন, এমন সুন্দর অভিনয় আগে তাঁরা দেখেননি।

কাউনটেস রেজিনা চুপচাপ বসে তাঁদের আলোচনা শুনছিলেন এবং একটা গোলাপের পাপড়ি নখ দিয়ে ছিঁড়ছিলেন।

আলোচনা শুনেই মাদাম রোহেলের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তিনি বললেন—ওদের অভিনয় দেখতে কী ইচ্ছেই না আমার যায় ?

ধর্মযাজকের মত গম্ভীর স্বরে কাউনটেস বললেন—আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি বোন যে ওটা এমন একটা জায়গা যেখানে কোন সম্ভ্রান্ত মহিলারই যাওয়া উচিৎ নয়।

সবাই একবাক্যে তাঁকে সমর্থন জানাল। তবু দিন-দুই পরে কাউনটেস রেজিনা নিজেই একদিন ওই অভিনয় দেখতে গেলেন। কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে, কালো ঘোমটা দিয়ে তিনি পেছনের একটা বক্স নিয়ে বসলেন।

কাউনটেস রেজিনার অনুভূতি বলতে কিছুই ছিল না। কনভেণ্ট থেকে পাশ ক'রে বেরোনোর পরেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল ; স্বামীকে তিনি ভালও বাসতেন না ; এমন কি স্বামীকে তিনি ঠিক পছন্দও ক'রে উঠতে পারেননি। রবিবার দিন তিনি যখন প্রার্থনা শেষ করে গির্জার ধাপ দিয়ে নীচে নেমে আসতেন তখন তাঁর সেই শান্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হোত ভদ্রমহিলা একেবারে অনূঢ়া—ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানেন না।

বেশ ভয়ে-ভয়েই তিনি একটু আড়মোড়া ভাঙ্গলেন। কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন একটু ; উদ্দাম সুর-ঝঙ্কৃত বেহালার তারের মত কাঁপতে লাগলেন ; তারপরে হাত দুটো মুঠো করে তিনি সেই বহুপ্রশংসিত দুটি ভণ্ড অভিনেতার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীর দিকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই তাকিয়ে দেখলেন। বেশ ঘৃণা আর দম্ভের সঙ্গে তিনি ওই দুটি স্বাস্থ্যবান মুক্ত আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত জানোয়ারের সঙ্গে রোগা ডিগডিগে কুৎসিত দেখতে ইংরেজ পরিচালকের তুলনা করলেন।

কাউনটেসের স্বামী জেনারেলের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্যে তিনি গ্রামে গেলেন। যেদিন তিনি গ্রামের পথে রওনা হলেন সেদিন সন্ধ্যাতেই

কাউনটেস আবার থিয়েটারে হাজির হলেন। কামনার জ্বালায় দগ্ধ হ'য়ে তিনি ছোট্ট একটা কাগজে দু'ছত্র লিখে ফেললেন। এই সব ক্ষেত্রে মহিলারা সাধারণতঃ যা লিখে থাকে, তিনিও অবিকল সেই ক'টি কথাই লিখলেন—'অভিনয়ের পরে স্টেজের দরজার কাছে একটি গাড়ী আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে।—আপনাকে পূজো ক'রে এমন একটি অজ্ঞাত রমণী।'

তারপরে যে অভিনেতাটি পিস্তল ছোঁড়ায় দক্ষ তার হাতে দেওয়ার জন্যে চিঠিটা তিনি একজন কর্মচারীর হাতে দিলেন। এদের হাতেই বক্সের চাবি-কাঠি থাকে।

হায়রে, সেই দুর্গন্ধময় ঘোড়ার গাড়ির ভেতরে, উদ্দাম আসঙ্গলিপ্সায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে প্রতিনায়কের জন্যে চুপচাপ বসে থাকাটা কি কম কষ্টকর? গাড়ীর ওপরে গাড়োয়ান বসে-বসে ঝিমুচ্ছে; তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিজের বাড়ির ঠিকানা দেওয়াটা কি লজ্জার কথা! জানালার ধারে মুখটা চিপে তিনি বসে রইলেন; অভিনেতাদের "প্রবেশ পথে" যে গ্যাসের আলো জ্বলছিল সেই আলোতে অন্ধকার পথের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। এই পথের ওপর দিয়েই পুরুষেরা পোড়া সিগারেট চিবোতে-চিবোতে অনবরত যাতায়াত করছে।

অভিনেতাটি ব্যাপারটাকে রসিকতা বলে মনে করেছিল। সে গাড়ীর কাছে এগিয়ে এল; কিন্তু কাউনটেস একটি কথাও বলতে পারলেন না; কারণ, অসৎ আনন্দ ভেজাল মদের মতই উত্তেজিত করে মানুষকে। তিনি তার কাছে নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। এই দেখে অভিনেতার মনে হল সে একটি পথচারিণী বারবণিতার সামনে এসে পড়েছে। সারা শরীরে রেজিনার কেমন যেন অদ্ভুত-অদ্ভুত শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তার গা ঘেঁষে বসলেন; তিনি যে কত সুন্দরী এবং লোভনীয়া সেই সংবাদটা তাকে দেওয়ার জন্যেই বোধহয় তিনি মাঝে-মাঝে ঘোমটা তুলতে লাগলেন। মল্লযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে কুস্তিগীররা যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তারাও সেই রকম নির্বাক হয়ে বসে রইল। রেজিনার প্রবল ইচ্ছে হল তাকে জড়িয়ে ধরতে, তার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে; আর সতী স্ত্রী হওয়ার ফলে এতদিন তিনি যে অপরিচ্ছন্নতার স্বাদ পাননি এখন সেই স্বাদটা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে। কামার্ত হরিণের মত হোটেলে কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে কাটানোর পরে পুরুষটি নিজেকে টেনে তুলল; তারপরে অন্ধের মত হাতড়াতে-হাতড়াতে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। রেজিনা হাসতে লাগলেন; তাঁকে দেখে মনে হল তিনি এখন অপাপবিদ্ধা অনূঢ়া তরুণী; প্রার্থনা ভাঙার পরে প্রতিটি রবিবার সকালে যেমন তাঁকে মনে হয় ঠিক তেমনি।

এরপর তিনি দ্বিতীয়টিকে অধিকার করলেন। এই যুবকটি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ; তার মাথার মধ্যে রোমান্স গিজগিজ করছে। যে নারীটি তাকে নিয়ে নিছক খেলা করছে, সে বিশ্বাস করেছিল সেই নারীটি তাকে সত্যিকারে ভালবাসে। ফলে, এই ধরনের চোরা-মিলনে সে মোটেই খুশী হয়নি। এ নিয়ে তাঁকে অনেক প্রশ্ন করেছিল, অনুরোধ করেছিল অনেক; কিন্তু কাউনটেস তাকে নিয়ে কেবল করেছিলেন মস্করা। তারপরে এই দুটি কুস্তিগীরকে তিনি পর্যায়ক্রমে দেহ দিতে লাগলেন। তিনি তাদের বিশেষভাবে

নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এ ব্যাপার নিয়ে তারা যেন তৃতীয় কারও সঙ্গে আলোচনা না করে, অন্যথায় তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দেবেন এই বলেও তিনি শাসিয়েছিলেন তাদের। ফলে, তিনি যে তাদের দু'জনকেই আনন্দ দিচ্ছেন সেকথা তারাও জানতে পারেনি। একদিন রাত্রিতে তাদের মধ্যে অল্প বয়সের ছোকরাটি তাঁর পায়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বলল—তুমি যে আমাকে ভালবাস, আমাকে পেতে চাও—এতে তোমার উদারতাই প্রকাশ পাচ্ছে। ভেবেছিলাম এই ধরনের প্রেম বোধহয় নভেল-নাটকেই দেখা যায়, আর তোমার মত ধনী কাউনটেসরা আমাদের মত ভাঁড়দের নিয়ে চিরকাল রসিকতাই করেন।

রেজিনা তাঁর গৌরবর্ণ ভ্রূদুটি কুঞ্চিত করলেন।

সে বলল—রাগ করো না। আমি তোমার পিছু-পিছু গিয়ে তোমার বাড়ি দেখে এসেছি, তোমার আসল নাম কী তাও আমি জেনেছি, তুমি যে বিরাট ধনী তাও আর অজানা নেই।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে রেজিনা চীৎকার ক'রে উঠলেন—মূর্খ কোথাকার! শিশুদের মানুষ যেমন সহজে বুঝিয়ে দেয় তোমাকেও তারা সেইভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

না; আর ওকে ভাল লাগছে না তাঁর। ছোকরাটা তাঁর নাম জেনে ফেলেছে, এবার হয়ত তাঁর সঙ্গে একটা হিসাব-নিকাশ করতে বসবে। নির্বাচনের আগে কাউনটেরও ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, এদের দু'জনকেই তিনি করায়ত্ব ক'রে ফেলেছেন। ওদের ওপরে তাঁর আর কোন আকর্ষণ নেই। এখন অন্য স্থানে আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করতে হবে তাঁকে।

পরের দিন রাত্রিতে তিনি চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীরকে বললেন—শোন; তোমার কাছে গোপন ক'রে লাভ নেই। আমি তোমার সঙ্গীটিকে পছন্দ করি; তাকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়েছি। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে আর আমি রাজি নই।

আমার বন্ধু!

হ্যাঁ। তাতে দোষটা কী? পাত্র পরিবর্তন করতে আমার ভালই লাগে।

এই কথা শুনে সে উন্মত্ত আক্রোশে ফেটে পড়ল; হাত দুটো মুঠো ক'রে রেজিনার দিকে ছুটে গেল সে। মনে হল রেজিনাকে বোধহয় সে মেরেই ফেলবে। রেজিনা চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললেন। কিন্তু যে দেহটাকে সে এত আদর করেছে তাকে আঘাত করতে সে পারল না; মাথা নীচু ক'রে আহত গলায় বলল—বেশ। তুমি যখন চাও না তখন আমাদের আর দেখা হবে না।

ইডেন রুনিস থিয়েটারে আবার যথারীতি খেলা শুরু হয়েছে। প্রায় বার গজ দূরত্বের মাথায় দাঁড়িয়ে দু'জন কুস্তিগীর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ছোট কুস্তিগীরের মুখের ওপরে ইলেকট্রিকের আলো পড়েছে; সে বেশ বড় সাদা একটি লক্ষ্যের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর অপরজন ধীরে-ধীরে, খুব আস্তে-আস্তে তার ছায়া লক্ষ্য ক'রে বুলেট ছুঁড়ছিল। অদ্ভুত দক্ষতা আর একাগ্রতার সঙ্গে কাঠের বোর্ডের ওপরে গুলির আঘাত হানছিল সে। দর্শকদের প্রচুর করতালির

শব্দে অর্কেস্ট্রার সুর চাপা পড়ে গেল; আর ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ একটা ভয়ার্ত আর্তনাদে প্রেক্ষাগৃহের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ হয়ে গেল। মূর্ছা গেল মহিলারা। বেহালা গেল থেমে। দর্শকরা ছোট-ছোট দলে হইচই করতে লাগল। বয়সে ছোট কুস্তিগীরটি প্রাণহীন অবস্থায় একতাল মাংসপিণ্ডের মত মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়ল। একটা বুলেট তার কপালের ওপরে গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। অন্য কুস্তিগীরটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের ওপরে একটা উন্মত্ত ক্রোধের কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। কাউনটেস তাঁর বক্সের গায়ে হেলান দিয়ে বসে নির্বিকারভাবে হাতপাখা নাড়তে লাগলেন। দেখে মনে হল, তিনি যেন প্রাচীন পুরাণের একটি নিষ্ঠুর দেবী ছাড়া আর কিছু নয়।

পরের দিন বিকাল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কাউনটেস যথারীতি তাঁর জাপানী কায়দায় সুন্দরভাবে সাজানো খাস কামরায় বসেছিলেন। এমন সময় যেরকম উদাসীনভাবে তিনি কথা বললেন তা শুনলে অবাক লাগে—শুনছি নাকি ওই বিখ্যাত ভাঁড়দের একজন হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে—ওই যে মনটা, না, মনতি—কী নাম যেন ওদের?

মনতিফিয়োর, মাদাম।

কুৎসিত

Ugly

সত্যিকথা বলতে কি আধুনিক যুগটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত মানুষের স্বর্ণযুগ; এ যুগে সব মধ্যবিত্তরাই সাম্যবাদে বিশ্বাসী। এডগার এ্যালান পো বলেন, যুগটাই হচ্ছে ঘৃণিত একটি আয়তক্ষেত্রের মত। এই মনোরম যুগে সবাই সাম্যবাদের স্বপ্নে মশগুল। ফলে এখন কোন দেশের প্রেসিডেন্ট আর একটি চাপরাশির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাটা কঠিন ব্যাপার। এই দিনগুলি সুন্দর আগামী একটি দিনের সূচনা করছে—যেদিন পৃথিবীর সব জিনিসই নিরানন্দ হয়ে যাবে, কারও ওপরে কেউ কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না—এই যুগে সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য হবে কুৎসিত হওয়া।

এই বিশেষ গুণটি নিখুঁত প্রত্যয়ের সঙ্গে বাস্তবে রূপায়িত করার অধিকার নিশ্চয় লেবুর ছিল। ভয়ঙ্করতম বীরত্বের সঙ্গে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন। এমন কি আমাদের যুগে যাঁরা কুৎসিত বলে নিজেদের সুনাম কিনেছিলেন আমাদের আন্তনিয়াস লেবু তাঁদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ কুৎসিত বলে পরিচিত করেছিলেন নিজেকে এবং এই কুৎসিত বলে পরিচিত হওয়ার জন্যে জীবনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, যদিও অবশ্য মিরাব্যুর মত ভয়ঙ্কর রকমের কুৎসিত হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।

না; সে সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। কুৎসিত সৌন্দর্য তাঁর ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা হচ্ছে তিনি কেমন কুৎসিত ছিলেন—এককথায় যাকে বলা হয় কুৎসিত রকমের কুৎসিত। তাঁর পিঠে কুঁজও ছিলনা, হাঁটুও বাঁকা ছিল না। ভুঁড়িও ছিল না তাঁর। তাঁর পা দুটো চিমটের মত ছিল না, হাত দুটি খুব একটা বড়ও নয় ছোটও নয়। তবু সাড়া শরীর জুড়েই কোথায় যেন তাঁর একটা অসামঞ্জস্য ছিল। কেবল চিত্রকরের চোখেই নয়, যে-কোন সাধারণ লোকের চোখেও সেটা ধরা পড়ত। রাস্তায় চলার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই ঘুরে না তাকিয়ে যে-কোন লোকই ভাবতে বাধ্য হোত—হায় ভগবান, একখানা চেহারা বটে! কী কদর্য! কী কদর্য!

তাঁর মাথার চুলগুলিও বিশেষ কোন রঙের ছিল না। কিছুটা তামাটে—তার সঙ্গে মেশানো কিছুটা হলুদ রঙ। অবশ্য চুল বলতেও বিশেষকিছু ছিল না তাঁর। তবে তার অর্থ এই নয় যে তিনি টেকো ছিলেন, ওই যা একটুখানি টাক—মাথার চাঁদির কিছুটা অংশ বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল—ঘি রঙের চাঁদি। ঠিক ঘি-ও নয়; নকল মাখনের রঙের মত—তাও বিবর্ণ। তাঁর মুখের রঙটাও ওই ভেজাল মাখনের মত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর মাথার খুলিটিও তথৈবচ। তাঁর মুখটিও তথৈবচ। একেবারে ভয়ঙ্কর রকমের কুৎসিত। তবে ভাববেন না এই ক'টা কথাতেই আমি তাঁকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলাম। তাঁর রূপ বর্ণনায় একটি কথাই কেবল প্রযোজ্য, সেই কথাটি হল তাঁকে বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু আপনারা ভুলে যাবেন না যে আন্তনিয়াস লেবু কুৎসিত; এমন কুৎসিত চেহারার মানুষ আপনারা কোনদিন দেখেছেন বলে মনে করতে পারবেন না। আর সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি যে কুৎসিত তা তিনি নিজেই জানতেন।

এই থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন তিনি মোটেই মূর্খ ছিলেন না, অথবা এই নিয়ে তিনি আক্ষেপ অভিযোগও করতেন না। তবে নিশ্চয় তিনি অসুখী ছিলেন। অসুখী মানুষ সাধারণত তার নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই চিন্তা করে। লোকে তার নাইটক্যাপকে মনে করে মূর্খের টুপী বলে। আবার প্রফুল্লতাকেই মানুষ শ্রদ্ধা করে। আন্তনিয়াস লেবুও সেই রকম সকলের কাছে মূর্খ ব'লে প্রতিপন্ন হলেন—প্রতিপন্ন হলেন বদমেজাজী ব'লে। কুৎসিত বলেই কেউ তাঁকে করুণা দেখাল না।

তাঁর জীবনে কেবল একটিমাত্র আনন্দ ছিল; সেটি হচ্ছে রাত্রিতে সবচেয়ে অন্ধকার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো আর অন্ধকার-পথযাত্রীদের কাছ থেকে শোনা—ও সুন্দর অন্ধকারের মানুষ, তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে এস।

হায়রে, এ আনন্দটাই তিনি সকলের সামনে প্রকাশ করতে পারতেন না; তিনি জানতেন, এটিও ক্ষণস্থায়ী। কারণ, মাঝে-মাঝে আহ্বানকারিণীটি বৃদ্ধা এবং মাতাল হলে কিছুটা লাভবান তিনি হতেন বটে; কিন্তু চিলে-কোঠার ঘরটিতে বাতি জ্বালানোর সঙ্গে-সঙ্গে কেউ তাকে সুন্দর অন্ধকারের মানুষ ব'লে সম্বোধন করত না। তারা তাঁকে দেখামাত্র আরও বৃদ্ধা হয়ে যেত; মাতাল মেয়েদের নেশা কেটে যেত এবং বেশ মোটা রকমের বকশিস হারানোর ঝুঁকি নিয়েও যারা তাঁকে মুখের ওপরে

বলত—তুমি যাচ্ছেতাই কুৎসিত—তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। তারপরে সেই শোচনীয় আনন্দও তাঁকে শেষপর্যন্ত পরিত্যাগ করতে হল যেদিন কোন একটি মেয়ের সঙ্গে তার ঘরে যেতে-যেতে তিনি তার চেয়ে শোচনীয় কথাটাও শুনতে পেলেন—আমার নিশ্চয় আজ ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

হায়রে, ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন তিনিই; হতভাগ্য মানুষ, একটুখানি প্রেম আর ভালবাসা—এ জগতে যার অস্তিত্ব নেই—তাই পাওয়ার জন্যে তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আর তিনি রাস্তার ঘেয়ো কুকুরের মত বাঁচতে চাইলেন না; কুৎসিত চেহারার জন্যে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতেও চাইছিলেন না তিনি। যে-কোন কুৎসিততম নারীকেও তিনি সুন্দরী বলে গ্রহণ করতে পারতেন যদি সেই নারীটি তাঁকে কুৎসিত ব'লে না ভাবত, অথবা ভাবলেও মুখের ওপরে সেই কথাটা স্পষ্ট ক'রে না বলত। ফলে একদিন তিনি একটি বারবণিতার ঘরে গেলেন। মেয়েটার চোখে ছানির মত পড়েছিল; মুখটা ভরা ছিল ব্রণে; মদে চুর হয়ে পড়েছিল মেয়েটা; মুখ দিয়ে লালা ঝরছিল তার, পরনে তার ছেঁড়া আর নোংরা পেটিকোট। বেশ মোটা ধরনের বকশিস পেয়ে মেয়েটা তাঁর হাতে চুমু খেল। এই দেখে তিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন, পরিষ্কার করলেন, যত্ন নিলেন, প্রথমে তাকে চাকরাণী করলেন; তারপরে সংসারের ভার দিলেন; তারপরে করলেন রক্ষিতা; শেষকালে বিয়ে করলেন তাকে।

মেয়েটিও প্রায় তাঁরই মত কুৎসিত, তাঁরই মত নয়; তাঁর চেয়েও ভয়ঙ্করী এবং কদাকার। তবে এই ভয়ঙ্করী মূর্তির সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ নিশ্চয় ছিল, এমন একটা আকর্ষণশক্তি ছিল যা দিয়ে এরা পুরুষদের কুক্ষিগত করে। তাঁকে প্রতারণা করে সে তার নিজের শক্তিটা প্রমাণ করল। এবং আর একজনের অঙ্কশায়িনী হ'য়ে সেই কথাটা সে তাঁকে দেখিয়েছিল।

লোকটা, সত্যিকথা বলতে কি, তার চেয়েও আর একধাপ উঁচুতে। লোকটা কেবল চেহারার দিক থেকে অবর্ণনীয় কুৎসিত নয়, চরিত্রের দিক থেকেও তাই, ভবঘুরে, জেল-কয়েদী; ছোট-ছোট মেয়েদের চুরি করে নিয়ে ব্যবসা চালাতো। নোংরা, ব্যাঙের মত থপথপ করে চলত, বেগুনের মত মুখ, আর কবন্ধের মত যার দুটো নাকের বদলে দুটো গর্ত বসানো। এই লোকটাকে সে মাঝে-মাঝে নিজের ঘরে আগের জীবনে নিয়ে আসত।

সেই হতভাগ্য স্ত্রী-প্রতারিত মানুষটি একদিন তাকে বললেন—তুমি ওই রকম একটা অপদার্থ হতভাগাকে দেহ দিয়ে আমার প্রতি অবিচার করেছ। এবং আমারই বাড়িতে। হতচ্ছাড়া, বদমাইশ—কেন, কেন করেছ? তুমি জান সে আমার চেয়েও কুৎসিত।

মেয়েটা চীৎকার করে বলল—আমি বেশ্যা, নোংরা বেশ্যা। আমাকে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলতে পার। কিন্তু একথা বলো না যে সে তোমার চেয়েও কুৎসিত।

মেয়েটার শেষ ক'টি কথা শুনে ত্রস্ত, বিভ্রান্ত, আর পরাজিত হয়ে তিনি নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেয়েটা শেষ করল তার কথা—কারণ, সে কুৎসিত হলেও বিশেষ রকমের কুৎসিত, আর তুমি অন্য সমস্ত কুৎসিত মানুষের মতই কুৎসিত। তোমার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই; তুমি অতি সাধারণ।

—অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

গুণ

Virtue

বেলা এগারোটা বাজতেই সে প্রতি শুক্রবার আসত। ব্যারাকবাড়ির মত বিরাট বাড়িটার মাঝখানে উঠোনে এসে প্রথমে সে মাথার টুপীটা খুলে রাখত। তারপর গিটারটা হাতে তুলে নিয়ে গান ধরত। আখ্যানমূলক ভাল ভাল গীতি-কবিতা। অপূর্ব তার কণ্ঠের মাধুর্য।

তার গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকের ঘর হতে মেয়েরা জানালা দিয়ে উঁকি মারত। কতজন পয়সা ফেলে দিত তার টুপীটা লক্ষ্য করে।

তার গানের সুরের মধ্যে একটা আশ্চর্য কল্পলোকের ছবি যেন স্পষ্ট ভেসে উঠত। সে ছবি যেন হাতছানি দিয়ে চারদিকের ঘর হতে মেয়েগুলোকে ডেকে বলত, এস, এস তোমরা। সে এক অপূর্ব মায়াময় জগৎ যেখানে সৌন্দর্যের ফুল কখনো শুকোয় না, যেখানে প্রেমের মালা কখনো ছিঁড়ে যায় না।

ঐসব মেয়েরা যে জগতে বাস করত সে জগৎটা ভীষণ নোংরা এবং অবাঞ্ছিত বলেই হয়ত গানের সুরে ভেসে ওঠা সেই কল্পনায় গড়া সুন্দর জগতের ছবিটা এত ভাল লাগত ওদের। তাই বোধহয় তার গানের আবেদনটা এত গভীর হয়ে উঠত ওদের কাছে। ওরা যে প্রেমের স্রোতে পা দিতে পারে না, সেই চিরন্তন ও চিরবাঞ্ছিত প্রেমের এক নিবিড় আশ্বাস যেন স্পষ্ট ফুটে ওঠে ওর গানে।

ওই অন্ধ ভিক্ষুক যখন গান গায় তখন ও দেখতে পায়না সেই সব মেয়েদের চোখে বিদ্যুতের মত চকিতে খেসে যায় এক অলৌকিক প্রেমের আগুন। মেয়েরা বলাবলি করত, লোকটি সত্যিই সুন্দর। সুন্দর সুঠাম চেহারা, সুন্দর চোখ।

প্রতি শুক্রবার ও আসে, গান গেয়ে চলে যায়। পয়সাগুলি সব কুড়িয়ে টুপীতে ভরে নেয়। একদিন ওর যাবার আগে একটি মেয়ে সাহস করে এগিয়ে এসে বলল, তুমি আমার ঘরে এস। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের ঘর হতে অসংখ্য কণ্ঠ জানালা দিয়ে ভেসে এল, আমার ঘরে, আমার ঘরে।

তখন একজন বলল, ওকে বেছে নিতে দাও কার ঘরে যাবে।

কিন্তু গায়ক বলল, আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারো ঘরে যাওয়া। আমি একজনের বা একে একে সবার ঘরে যেতে পারব না।

তখন সেই মেয়েটি বলল, কেন যেতে পারবে না, তার কারণ বল।

গায়ক বলল, তোমাদের দয়া আমি ভুলব না। কিন্তু আমি তোমাদের কারো ঘরেই যেতে পারব না। কারণ আমার ঘরে তোমাদের মত আমার নিজের দুটি মেয়ে আছে।

এই বলে সোনা ও রূপোর মুদ্রাগুলি সব কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল গায়কটি।

চোর

The thief

ডাক্তার সবিয়ার বললেন, আমি মনে করি কোন নিষ্পাপ নির্দোষ তরুণীর শালীনতা নষ্ট করা যেকোন হীন অপরাধযোগ্য কাজের মতই দণ্ডনীয়। মেয়েদের এমন একটা বয়স থাকে যখন তাদের দেহে আসে প্রথম যৌবনের উন্মাদনা আর তার ফলে তাদের দেহ-মন এমনই দুর্বল থাকে যে তারা তখন কোন চতুর পুরুষের প্রলোভন প্রতিরোধ করতে পারে না। তখন অনাঘ্রাত পুষ্পের মত তার কামনাচঞ্চল দেহটি ভীত হরিণশিশুর মত কাঁপতে থাকে। তখন সামান্য উত্তেজনায় সে যেকোন নায়কের মুখের দিকে চুম্বনের জন্য তার অধরোষ্ঠ দুটি বাড়িয়ে দেয়। তখন তার কাজের পরিণাম সম্বন্ধে কোন চৈতন্য থাকে না মনে।

ডাক্তার আরও বললেন, কোন বাড়িতে তালা ভেঙ্গে চুরি করা যেমন অপরাধ, ছলনাময় কথার দ্বারা ধীরে ধীরে কোন নির্দোষ তরুণীকে প্রলুব্ধ করে তার সতীত্ব নষ্ট করাও তেমনি অপরাধ।

অনেকে অবশ্য বলবে, এ সব কাজে মেয়েরাও কম পাপী নয়। অর্থাৎ অনেক সময় মেয়েরাও অগ্রণী হয়ে পুরুষকে বাধ্য করে এই ধরনের পাপকাজে। অনেক সময় অনেক পুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নারীরা তাদের প্রলুব্ধ করে, তাদের ছলনার দ্বারা মুগ্ধ করে কুপথে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রেও আমি পুরুষদের একেবারে নির্দোষ নিরপরাধ সাব্যস্ত করি না। এই সব ক্ষেত্রেও পুরুষেরা একটা দোষ বা দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে পারে না।

কাজটা অবশ্য খুবই কঠিন। ইউলিসেস যেমন তার সমুদ্রযাত্রাকালে সাইরেনদের মায়াময় গান শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল তেমনি পুরুষরাও মেয়েদের না দেখে বা তাদের কথা না শুনে পারে না। সে সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে আপন নীতিবোধ ও যুক্তিবোধের পরিচয় দেওয়া যেকোন পুরুষের পক্ষেই কঠিন কাজ। কোন সুন্দরী নারীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কোন পুরুষ যখন কামনার স্রোতে ভেসে যায় তখন তার অপরাধের গুরুত্ব ও পরিণাম বিচার করে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না তার পক্ষে। আমার মত পক্বকেশবিশিষ্ট বয়োঃপ্রবীণ লোকও হয়ত শেষ পর্যন্ত তা পেরে উঠবে না।

আমি একজনকে চিনি যে এই ধরনের এক কাজে জড়িয়ে পড়ে এক ভয়ঙ্কর পরিণামের সম্মুখীন হয়। আমি যার কথা বলছি সে ছিল বড়ই আমোদপ্রিয় এবং মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে সে বহু টাকা জীবনে নষ্ট করে। আমার থেকে তার বয়স অনেক কম ছিল, তাই আমি তাকে স্নেহ করতাম। প্রেমের ব্যাপারে তার উদ্যমের অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে অসংযত অর্থহীন আতিশয্য দেখেও তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারিনি আমি। অথচ সে নিজেও প্রেম কি জিনিস তার আস্বাদ পায়নি এত মেয়ের সংস্পর্শে এসেও।

একবার সে একটি ভদ্রঘরের তরুণীর সংস্পর্শে এল। তাদের মধ্যে ভালবাসা গড়ে উঠল। যুবকটি এতদিনে বুঝল প্রকৃত ভালবাসা কি জিনিস।

মাঝে মাঝে এখানে সেখানে ক্ষণিকের জন্য মিলন ঘটত তাদের। কিন্তু তাতে তাদের তৃপ্তি হত না। তারা চাইত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কোন নির্জনে বসে অবাধে প্রেমালাপ করতে। তাই মেয়েটি গভীর রাত্রিতে তাদের বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধ করল যুবকটিকে। কিন্তু যাতায়াত করতে হবে গোপনে যাতে বাড়ির কেউ জানতে না পারে। মেয়েটি দরজা খুলে রাখবে। তবে তার প্রেমিককে বাগানের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে অন্ধকারে তাদের বাড়ি ঢুকতে হবে।

যুবকটি প্রথমে এ কাজে রাজি হয়নি। এত বিপদের ঝুঁকি সে নিতে চায়নি। কিন্তু মেয়েটির দ্বারা বারবার প্ররোচিত হয়ে সে ঠিক থাকতে পারেনি শেষ পর্যন্ত।

কিছুদিন সে এইভাবে যাতায়াত করতে থাকে। কিন্তু একদিন গভীর রাত্রিতে এইভাবে চোরের মত বাগানের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে বাগান পার হয়ে বাড়ি ঢুকে একটি ঘরের আসবাবের উপর সে অন্ধকারে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। আসবাবের কাঁচ ভেঙ্গে যায়। সেদিন ঘটনাক্রমে মেয়েটির মা তখনো জেগে ছিলেন। তিনি শব্দ পেয়ে তাঁর স্বামী ও চাকরদের ডেকে তোলেন। যুবকটি তখন ভেবে ঠিক করে, এমত অবস্থায় সে চোর অপবাদ নেবে। নিজের চুরির কথা স্বীকার করবে তবু তাদের প্রেমের কথা বলে তার প্রেমিকাকে লোকচক্ষে হেয় করবে না।

এই কথা ভেবে সে পালানো অসম্ভব দেখে বসার ঘরের ভিতরে একটা পিয়ানোর আড়ালে লুকিয়ে রইল। চাকররা আলো নিয়ে বাড়ির সর্বত্র খুঁজতে খুঁজতে তাকে পেয়ে গেল। তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। যুবকটি থানায় গিয়ে স্বীকার করল সে সত্যিই চুরি করতে গিয়েছিল।

বিচারে যুবকটির কারাবাস হয়। কারাগারেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে সে পুরোহিত ডেকে উইল করে তার অবশিষ্ট সম্পত্তি সব আমাকে দিয়ে যায় আর একটি চিঠি লিখে সমস্ত ঘটনা যথাযথভাবে বিবৃত করে যায়।

আমার ধারণা মেয়েটি হয়ত পরে ভাল জায়গায় বিয়ে করে সতীনারীর আখ্যা পায়, এবং তাদের ছেলেদের সততার শিক্ষা দেয় নিজের অতীত জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে।

শোচনীয় সাদৃশ্য

Unfortunate likeness

যে রংঝরা গোধূলির আলোয় সুন্দরী নারীদের অনাবৃত গ্রীবাদেশ শুভ্র ফুটন্ত ফুলের মত দেখায় সেই রকম কোন এক রংঝরা গোধূলিতে পেসকারেন আমাকে তার জীবনের একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা শুনিয়েছিল।

পেসকারেন বলল, শহরের সবাই জানত আমি মেয়েটির খপ্পরে পড়ে গেছি। কোন কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে কোন পাখিশিকারী যেমন অপরিণামদর্শী পাখিদের ধরে ফেলে তেমনি মেয়েটি আমাকে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তার ছলনার জালে আমাকে ধরে ফেলে। সে জাল প্রথমে ছিঁড়তে পারিনি আমি। কারণ মেয়েটির বিড়ালের মত নরম দেহ, সুন্দর চোখের আবেশজড়ানো স্বপ্নালু দৃষ্টি, তার মিষ্টি হাসি, তার নীল শিরাওয়ালা শুভ্র নিটোল হাত পাগল করে তুলত আমায়। তখন আমার মনে হত তার মত সুন্দরী মেয়ের ভালবাসা পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। কথাটা শুনে তোমরা এখন আশ্চর্য হবে। কারণ এখন আমি তোমাদের বিজ্ঞের মত অনেক নীতি উপদেশ দিই। সাবধান করে দিই তোমাদের প্রেমের ব্যাপারে।

কিন্তু এখন আমি যাই বলি তখন কিন্তু সেই সুন্দরীর রূপলাবণ্যের প্রভাব হতে মুক্ত করতে পারিনি নিজেকে। তার ডাকনাম ছিল লুসি। ভাল নাম পনেল।

থিয়েটারে একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম দিনেই আমি লুসিকে নিয়ে সে নাটক দেখতে গেলাম। তার মাও সঙ্গে গেল। লুসি আর তার মা পাশাপাশি এক জায়গায় বসল। আমি বসলাম ওদের পিছনের একটি আসনে।

আমি লুসির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। মঞ্চের দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। সেদিকে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। মঞ্চের কোন অভিনয়ের কথাও আমার কানে আসছিল না। আমি শুধু লুসিকে দেখছিলাম। তার অনাবৃত গ্রীবা, মাথার চুল, মুখের পার্শ্বদেশ আমি সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল লুসির পাশে বসে থাকা তার মায়ের উপর। দেখে মনে হলো অবিকল লুসি। মনে হলো আসলে লুসিই যেন তার হঠাৎ যৌবন হারিয়ে বয়োপ্রবীণ হয়ে তার মার রূপ ধারণ করেছে।

আমার হঠাৎ মনে হলো লুসি আমাকে ঠকিয়েছে। সে যে রূপের ফাঁদ পেতে আমাকে ধরেছে, লাবণ্যের যে কপট ছলনার দ্বারা মুগ্ধ করে এসেছে তা সব মিথ্যা, তা সব ভুল। আসলে তার ঐ বিগতযৌবনা মার বর্ষীয়সী রূপটাই লুসির আসল রূপ। দু'দিন পরে তার ক্ষণজীবী যৌবনসৌন্দর্যের কপট জালটাকে ছিঁড়ে দিয়ে তার ঐ আসল রূপটাই উপহাস করতে থাকবে আমাদের।

আমি এইভাবে লুসির আসল রূপটাকে তার মার দেহাবয়বের মধ্যে দেখতে পেয়ে তাদের কোন কিছু না বলে ধীরে ধীরে সেই প্রেক্ষাগৃহ হতে বেরিয়ে এলাম।

আমার কথা শুনে এক যুবতী বলেছিল, আমি কখনো আমার মার সঙ্গে কোন থিয়েটারে যাব না।

সাদা গীর্জায় এক রাত্রি

A night in the white chapel

আমি আর আমার বন্ধু নেজাস্তে দু'জনেরই বয়স পঁচিশ। আমরা তখন লণ্ডনে বেড়াতে গিয়েছিলাম দু'জনে। লণ্ডন ভ্রমণ জীবনে আমাদের এই প্রথম।

সেদিন ছিল ডিসেম্বরের এক সকাল। দারুণ ঠাণ্ডা। পথে বরফ পড়ছে। ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। এত ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পারার জন্য আমরা দু'জনেই খুব বেশী করে মদ খেয়েছিলাম। আমরা কেউ কোন কথা বলতে পারছিলাম না। বলার প্রয়োজনও ছিল না। আমরা যে পরস্পরের মুখ দেখে পরস্পরের মনের কথা সব বুঝতে পারছিলাম।

আমরা প্রথমে একটা মদের দোকানে ঢুকেছিলাম। কারণ আমাদের ধারণা ছিল সেখানে আমরা বিভিন্ন রকমের মানুষের আচার আচরণ ও বেশভূষার সঙ্গে পরিচিত হব। কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশ হলাম আমরা।

হতাশ হয়ে আমরা আর একটা দোকানে গেলাম। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। পরে দেখলাম আমরা তার মধ্যে যা যা দেখেছি শুনেছি তার কিছুই মনে নেই। শুধু আমাদের মনের ধোঁয়াটে পটটার উপর অসংখ্য অস্পষ্ট ছবি একের পর এক করে ভেসে যাচ্ছিল।

কুয়াশাচ্ছন্ন পথে আমরা টলতে-টলতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বুকের উপর একটা ধাক্কা লাগায় আমি চমকে উঠলাম। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম আমরা একটা বাড়ির দরজার সামনে এসে পড়েছি। বাড়ির সদর দরজার অর্ধেকটা খোলা আর আধখোলা দরজা দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছিল কুয়াশাচ্ছন্ন প্রায়ান্ধকার পথটার উপর। হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ল একটি মেয়ে আমাদের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, ভাল করে দেখলাম মেয়েটি যুবতীই বটে। তার ছেঁড়া ময়লা পোশাকের ফাঁক দিয়ে স্ফীত বক্ষস্থলটা দেখা যাচ্ছিল। তার গালের চামড়াটা ছিল মসৃণ। সে যখন হাসছিল তখন তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু একটা জিনিস কোনমতে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মেয়েটির চুলগুলো একেবারে সাদা। তবে কি ভিন্ন জাতির রক্তের মিশ্রণে জন্ম হয়েছে ওর? আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়েটির চোখের উপর কোন ভ্রূ নেই। ওর দেহে

যত যৌবনই থাক ওর মাথার চুল আর চোখের দিকে তাকালে ওকে বুড়ী বলে মনে হবেই। মনে হত সুদীর্ঘ দিন ধরে ক্রমাগত দুঃখ দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তা ভোগ করে মেয়েটি এমন এক অকাল বার্ধক্যের মাঝে এসে পড়েছে যে বার্ধক্য আজও ওর দেহটাকে আক্রমণ ও জব্দ করতে না পারলেও ওর মাথার চুলে আর চোখে এক অভ্রান্ত চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আমার বন্ধু লুদান্তেক আর আমি মেয়েটির চেহারা দেখে নানারকম চিন্তা করতে লাগলাম। ওর এই অদ্ভুত চেহারার সম্ভাব্য-কারণ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবলাম। তারপর দু'জনেই একবাক্যে বলে উঠলাম, হায় বেচারী!

তার ছিন্নমলিন পোশাকের দীনতা তার বয়সটাকে যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার পায়ে কোন জুতো ছিল না। মাথায় ছিল বেতের টুপী, গায়ের শেমিজটা ছেঁড়া। তবু মদের নেশার অপরিহার্য নিবিড়তায় আমাদের যুক্তিবোধ এমনই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে আমরা মেয়েটার মোহ থেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না নিজেদের। উল্টে তার হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তার বয়সের কথা ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে। ভুলে গিয়েছিলাম তার দাঁতগুলো ঝকঝকে হলেও তার ঠোঁটদুটো বুড়ো মানুষের মতই মলিন।

আর একটা কথা মনে হলো আমার। মনে হলো মেয়েটি যেন আমাদের থেকেও বেশী মদ খেয়েছে। আমার তবু দুই-একটা কথা বলতে পারছিলাম। কিন্তু মেয়েটা একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি মুখ থেকে। তবু আমরা তার শুধু হাসিটা দেখে আসক্ত ও বেশ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

একসময় থাকতে না পেরে আমরা দু'জনেই দু'দিক থেকে মেয়েটির একটি করে হাত ধরে ফেললাম। কিন্তু মেয়েটা প্রথমে আমাদের কবল থেকে নিজের হাত দুটো একঝটকায় ছিনিয়ে নিয়ে পিছনে চলে গেল কিছুটা। কিন্তু পরক্ষণেই এগিয়ে এসে আমাদের হাত ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল।

কোথা হতে কি ঘটে গেল আমরা তার কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমাদের চেতনার মধ্যে এমন কোন স্বচ্ছতা ছিল না যার দ্বারা সব ঘটনা ও আচরণের তাৎপর্য ঠিকমত বুঝতে পারি। আমরা বুঝলাম একটা ঘরের মধ্যে মেয়েটির সঙ্গে গিয়ে বসে পড়লাম। আমরা দু'জনেই ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাদের বন্দী করে কোথায় নিয়ে এসেছে। তবু আমাদের দুঃখ বা অভিযোগটা কি তার কিছুই জানতে পারিনি।

সেই ঘরেই আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সারা রাত ধরে ঘুমিয়েছিলাম আমরা। ভোরের আলো ফুটে উঠতে লুদান্তেক আমায় ধাক্কা দিয়ে জাগাল। আমি আর মেয়েটা মরার মত পড়ে রয়েছি। তার মাথাটা বালিশ থেকে ঢলে পড়েছে। তার সাদা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। লুদান্তেক বলল, মেয়েটা মরে গেছে। চল আমরা পালিয়ে যাই।

আমি মেয়েটির বিছানায় গিয়ে ভাল করে তাকে দেখলাম। তার মাথাটা বালিশের উপর তুলে দিলাম। দেখলাম সে মরে যায়নি। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার সাদা চকচকে দাঁতগুলো তবু দেখা যাচ্ছিল। তার দাঁত আর বুকের গড়ন দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার বয়স ষোলর বেশী ত হবেই না বরং কম হবে।

আমার মনে হলো লুদান্তেকের নেশা তখনো ছোটেনি। সে আমার একটা হাত ধরে বলল, চল চলে যাই। মেয়েটার পাশে আমি শুয়েছিলাম। ও বুড়ি নয়। আমি আজ রাতেই তিন-চারটে ছেলেমেয়ের জন্ম দান করেছি এবং খুঁজে দেখ এই ছেলে মেয়েগুলো সব এখানেই আছে।

এই বলে এখানে সেখানে কাঁথাঢাকা শুয়ে থাকা ছেলেমেয়েগুলোকে টেনে বার করল লুদান্তেক। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটার ঘুমন্ত দেহের উপর উঠে বসল।

আমি পকেট থেকে একটা মুদ্রা বার করে ঘরের মেঝের উপর ফেলে দিয়ে চলে এলাম ঘর থেকে। লুদান্তেককে বললাম, এই সব ছেলেমেয়েগুলি মেয়েটির ভাইবোন। ও তাদের প্রতিপালন করে।

শেষ চিহ্ন

The relics

বিরাট সমারোহ সহকারে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হলো। এক জাতীয় শোকে যেন ফেটে পড়েছে সমস্ত শহরটা। যে বীর সৈনিক দেশের জন্য আপন জীবন দান করে এক নূতন অধ্যায় সংযোজন করে গেছে সেই বীর সৈনিকের মত সমান মর্যাদা দান করা হলো তাঁকে। তাঁর মৃতদেহটাকে কফিনে করে সমাধিক্ষেত্রে সেই সব সেনানায়কদের সমাধির পাশে রাখা হলো যাদের প্রত্যেকের নাম আর সামরিক কৃতিত্বের একটি করে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা আছে প্রস্তরফলকে।

রাত্রি সেদিন অন্ধকার হলেও আকাশ ছিল উজ্জ্বল। সেই উজ্জ্বল নীল আকাশে নক্ষত্ররা কিরণ দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ছিল দু-একটা নক্ষত্র আর তাই দেখে অনেকে মানবাত্মার দেহত্যাগের কথা ভাবছিল হয়ত। একদল অশ্বারোহী মৃতদেহটির কফিনটি পাহারা দিচ্ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে।

তাঁর নাম ছিল রামেল। তিনি বই লিখতেন। রাজনীতির বই। সে বইয়ে থাকত মানুষের মুক্তির বাণী। সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা—যে তিনটি শব্দ মন্ত্রের মত কাজ করত সাধারণ মানুষের মধ্যে। এক স্বর্ণযুগের সন্ধান দিত সকলকে। সেই তিনটি শব্দের গৌরবময় তাৎপর্যটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতেন তিনি। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলি

ধর্মশাস্ত্রের মত পরিগণিত হল দেশবাসীর কাছে। তাই তাঁর মৃত্যুতে তাঁকে দেওয়া হলো রাষ্ট্রনেতার মর্যাদা।

তিনি একজন বিশুদ্ধচরিত্র চিন্তাশীল দার্শনিকের মত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। জীবনে বিবাহ করেননি অথবা কোন নারীর ছলনার ফাঁদেও কখনো পা দেননি। সাধারণতঃ কোন-কোন নিঃসঙ্গ সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনে এমন এক-একটি ছলনাময়ী নারীর আবির্ভাব ঘটে যারা তাদের চোখে জ্বলন্ত কামনার এক নির্লজ্জ আগুনের অন্ধ আলোয় তাদের অন্তরের নগ্নতাটাকে উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত করে তোলে। তাদের ফাঁদে পা না দিয়ে পারে না সেই সব সাধু সন্ন্যাসীরা।

তবু রামেল অবশ্য একটি ভুল করেছিলেন। সারা জীবনের মধ্যে মাত্র একটি ভুল। রামেল তখন যে আদর্শ তাঁর লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন সারা দেশ জুড়ে সেই আদর্শকে রূপায়িত করতে গিয়ে একেবার নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেন। দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি তখন বাস করতেন ইতালির এক ছোট্ট গাঁয়ে। সেই গাঁয়ের পেপা নামে কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেন রামেল। অকস্মাৎ দেহমিলন হয় তাঁদের আর তার ফলে এক পুত্রসন্তান জন্ম নেয় পেপার গর্ভে।

রামেল কিন্তু এ ঘটনা গোপন রাখেন। পেপাকেও বলতে দেননি। অবশ্য রামেল যখন জাতীয় সরকারে সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত তখন তাঁর সন্তানের ভরণপোষণ ও উপযুক্ত প্রতিপালনের জন্য পেপাকে প্রতি মাসে মোটা রকমের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। পেপা সত্যিই শ্রদ্ধা করত রামেলকে। রামেলকেই সে তার স্বামী বলে জানত এবং পরে আর বিয়ে করেনি। তার সন্তানকে মানুষ করে তোলাই ছিল তার জীবনের ব্রত। রামেলের বই খাতা কলম আসবাবপত্র প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্নগুলি অতি যত্ন করে রেখে দিয়েছিল তার ঘরে। তার ছেলেকে মানুষ করার জন্য মোটা টাকা দিয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করেছিল। দেখাশোনার জন্য দু'-তিনজন চাকর রেখেছিল।

কিন্তু রামেলের পুত্র হয়ে উঠল তার ঠিক বিপরীত। বাল্যকাল থেকে সে হয়ে উঠল যেমন উদ্ধত তেমনি বিলাসী। সে মোটেই মার কথা শুনত না বা মার কাছে বাবার কথা শুনেও তার বাবাকে শ্রদ্ধা করত না।

এত চেষ্টা করেও ছেলেকে কোনরকমে মনেরমত করে গড়ে তুলতে পারেনি পেপা। দীক্ষিত করে তুলতে পারেনি তাকে স্বামীর আদর্শে। যৌবনে পা দিতে না দিতেই পেপা ও রামেলের সাধের সন্তান এমন একটি চটুল প্রকৃতির মেয়েকে ভালবেসে ফেলে যে তার কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়েও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কোন এক রাজকুমারের বাহুবন্ধনে ধরা হয়।

একটি বিচ্ছেদ

A rupture

জেনে রাখ যা তোমাদের বলছি তা সব সত্যি। এই দুটি প্রেমিক প্রেমিকা যারা একদিন কপোতের মত কুজন করত দু'জনে, যারা একদিন কত প্রেমের কথা শোনাত দু'জন দু'জনকে, আজ তারাই গভীরভাবে ঘৃণা করে পরস্পরকে। সত্যিই তাদের মধ্যে ঘটে গেছে পূর্ণ বিচ্ছেদ। অথচ যে কারণে এ বিচ্ছেদ ঘটেছে সেটা অতি তুচ্ছ। সে তুচ্ছতাটা যদি ওরা ধরতে পারত তাহলে ওরা বিচ্ছেদের পরিবর্তে আরো ঘনীভূত করে তুলত ওদের জীবনটাকে।

আসল কথা হলো ঈর্ষা। সেই কুটিল ঈর্ষা যখন একবার কোন মানুষের মনের ভিতর ঢুকে পড়ে তখন সে কি আর কোন কথা শোনে? তার অভিযোগের উত্তরে তার স্ত্রী তখন যাই বলুক সে শুধু বলবে, 'তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি মিথ্য কথা বলছ।' তখন স্ত্রীর কোন কথাই সে গ্রাহ্য করবে না, শুনবে না। এমন কি তার স্ত্রীর কোন কথা বলার সুযোগ দেবে না আত্মপক্ষ সমর্থনে। এমন কি রাগের মাথায় সে তার স্ত্রীকে আঘাত করতে যাবে। সুতরাং এতে তার স্ত্রী অবশ্যই রেগে যাবে। দু'জনের রাগ ধীরে ধীরে চরমে উঠবে। অথচ রাগটা পড়ে গেলেও কেউ যেচে কাউকে কোন কথা বলতে পারবে না। কেউ আগে কথা বলবে না। ছোট হতে চাইবে না কেউ কারো কাছে। কাগজে লিখেও মনের কথাটা জানাবে না। ফলে এমন একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে যার থেকে ওরা কেউ বেরিয়ে আসতে পারবে না। আর তার ফলে বিচ্ছেদ হয়ে উঠবে অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য। আর ঠিক তাই হয়েছিল আমাদের জোসিনে গাজেলেত্তে আর সারভাঁসের ক্ষেত্রে।

এই পর্যন্ত বলে লানী স্প্রিং আমার সামনে বসে তার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। সিগারেটের নীল ধোঁয়ার কুন্ডলীটা তার মুখ আর চুলের চারপাশে যেন খেলা করে বেড়াতে লাগল। তার একটা হাতের ওপর গালটা রেখে সে বলল, সত্যিই ব্যাপারটা বড় দুঃখের।

আমি বললাম, জোসিনে তোমাকে সব কথা বলেছে?

সে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা মজার। তুমি জান সারভাঁসে এমনই একজন লোক যার রসিকতার কোন শেষ নেই। সব সময়ই ঠাট্টা বিদ্রূপ আর রসিকতা করত। একবার শুরু করলে তার আর শেষ হবে না। তার এই রসিকতার ঠেলায় অস্থির ও পাগল হয়ে উঠল জোসিনে। তাকে ভাল করে খেতে বা ঘুমোতে দিত না সারভাঁসে। তবু জোসিনে অসহ্য সারভাঁসেকে একেবারে ছেড়ে যেতে চায়নি। তাদের সম্পর্কটা বজায় রাখতে চেয়েছিল। শুধু বাড়িতে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায় শহরের একটা নির্জন অঞ্চলে একটা ঘর ভাড়া করেছিল। সে সেখানে দিনের বেলায়

প্রায়ই গিয়ে বিশ্রাম করত। প্রাণ ভরে সাধ মিটিয়ে ঘুমোত। ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল সে তার স্বামীর কাছে।

জোসিনে তার ভাড়াবাড়িতে যখন বিশ্রাম করতে যেত তখন তার স্বামীকে বলে যেত সে মফঃস্বলের এক শহরে তার বৃদ্ধা পিসিকে দেখতে যাচ্ছে। তার পিসি নাকি হার্টের অসুখে ভুগছেন। এবং সে ছাড়া তাঁর অন্য কোন আত্মীয় নেই। প্রথম প্রথম কোন সন্দেহ করেনি সারভাঁসে। কিন্তু একদিন দুপুরে বাড়ি ছেড়ে সেখানেই গিয়ে ঘুমিয়ে যায় জোসিনে। তার ঝি তাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয়নি। তার ফলে বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় দুপুর হয়ে যায়। দীর্ঘ নিদ্রার ফলে তার চোখ দুটো লাল হয়ে পড়ে ও ফুলে যায়। তাকে দেখে সন্দেহ হয় সারভাঁসের। তার প্রশ্নের ঠিকমত জবাব দিতে পারছিল না জোসিনে। আসল কথাটা গোপন রাখার জন্য নানা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে হচ্ছিল। কিন্তু তাকে মনে হচ্ছিল সে যেন মদ খেয়ে কোন বেশ্যালয় থেকে আসছে।

পরদিন সারভাঁসে কথাটা বন্ধুবান্ধবদের বলে। বন্ধুরা তখন তাকে জোসিনের বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা অভিযোগ করে। বলে জোসিনের চরিত্র খারাপ। সে তারই কোন অবিবাহিত বন্ধুর ঘরে গিয়ে ফূর্তি করে তার পয়সায়। সারভাঁসে নিজে তদন্ত না করে কোন বিষয়ে খোঁজ খবর না নিয়ে বন্ধুদের কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। একদিন সে স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন জোসিনে রেগে যায়। সারভাঁসেকে আঘাত দেবার জন্য সে মিথ্যা কথা বলে। বলে তার মত স্বামীকে সে ঘৃণা করে এবং সে সত্যিই আর একজনকে ভালবাসে। তখন সারভাঁসে ঘুষি পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলে ওঠে, তার নাম কি বলতে হবে তোমায়।

জোসিনেও মিথ্যে করে বলে, তুমি তাকে ভালভাবেই জান।

আমি যদি ঠিক সেই সময়ে তাদের কাছে গিয়ে না পড়তাম তাহলে ব্যাপারটা চরমে উঠত।

এই ঘটনার পর ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ওদের দু'জনেরই দেহে যৌবন আছে আর এ বয়সে সাথী পেতে বা তা খুঁজে নিতে দেরী হয় না। ওরা দু'জনেই আবার ওদের মনোমত জীবনসঙ্গী খুঁজে নিয়ে ঘর করছে।

প্রমোদ ভ্রমণ

A country excursion

অবশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এসে গেল। আজ মঁসিয়ে দুফোরের জন্মদিন। আজ ওরা প্যারিস থেকে বেশকিছু দূরে গ্রামাঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে কোন এক রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খাবে। এ কথা আজ ওরা প্রায় পাঁচ-ছ' মাস ধরে ভেবে আসছে।

মঁসিয়ে দুফোর একটা ঘোড়ার গাড়ী যোগাড় করলেন। তিনি নিজেই চালিয়ে নিয়ে যাবেন। উজ্জ্বল পোশাক পরে মাদাম দুফোর বসলেন স্বামীর পাশে। তাঁর ছত্রিশ বছর বয়সেও যৌবন ফেটে পড়ছিল তাঁর বলিষ্ঠ দেহে। তাঁদের একমাত্র সন্তান আঠারো বছরের তরুণী যুবতী ম্যাদময়জেল দুফোর বসেছিল তার প্রণয়ী হলদে চুলওয়ালা এক যুবকের পাশে। তার বুড়ি ঠাকুরমাও সঙ্গে ছিল তাদের।

সেন নদীর সেতুর উপর গাড়িটা গিয়ে উঠলে মঁসিয়ে দুফোর তাঁর স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন, এবার আমরা শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে এসে পড়লাম।

সত্যিই দৃশ্যটা সুন্দর, দেখার মত। আবেগে ফেটে পড়লেন মাদাম দুফোর। সেতু পার হয়ে গাড়ি করবিভয়ের পথ ধরল। ডান দিকে সান্নয় পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আর্জেন্তিউল গীর্জা। সারবন্দী পাহাড়গুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শুরু হয়েছে একালে গড়া কর্মেইন দুর্গের সীমানা। সামনে পথের প্রান্তে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে মাঠ আর সবুজ বন।

সকালের সূর্যের নরম রোদটা তখনো গরম হয়ে ওঠেনি। সূর্যের নরম ছটাগুলো যখন তাদের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল তখন তাদের ভালই লাগছিল। পথের ধারে একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত গাঁ দেখল। গাঁটা হয়ত কোন মহামারীতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ভাঙ্গাচোরা বাড়িগুলোর ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। আবার একবার সেন নদীর সেতু পার হতে হলো। সেতুর উপর গাড়িটা উঠতেই ওদের খুব ভাল লাগছিল। সূর্যের আলোয় মুক্তোর মত চকচক করছিল নদীর প্রবাহমান জলধারা। বাতাস এখানে আরো স্বচ্ছ, কোনদিকে কোন চিমনির ধোঁয়া নেই।

পথের ধারে পৌলিন নামে এক রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল। মঁসিয়ে দুফোর তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এটা তোমার পছন্দ?

সকলের পছন্দ হতেই রেস্তোরাঁটার উঠোনে গাড়ি থামানো হলো। পিছনের দিকটা আরো চমৎকার। ঘাসে ঢাকা উঠোন। মাঝে-মাঝে গাছের ছায়া। একদিকে একটা খাল নদীর থেকে বেরিয়ে এসে একটা বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। নৌকাভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। খালের জলে একটা দুটো নৌকা বাঁধা আছে।

এদিকটা নির্জন বলে এখানেই এক জায়গায় বসে খাওয়ার কথা জানিয়ে দিল। একটা গাছের তলায় চেয়ারে বসে দু'জন যুবক খাচ্ছিল। ওরা সেখানে যেতেই ওদের সম্মানে যুবক দুটি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘাসের উপরে বসে খেতে লাগল। কারণ চেয়ারের সংখ্যা কম ছিল।

উঠোনটার একদিকে একটা দোলনা ছিল। তাতে উঠে কিছুক্ষণ দুললেন মাদাম দুফোর। তারপর খাবার তৈরি হতেই খেতে বসলেন। যুবক দুটি গেঞ্জি পরে থাকায় তাদের পেশীবহুল হাতগুলো সব দেখা যাচ্ছিল। ব্যায়াম করা সবল সুগঠিত স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে ভরা ছিল ওদের দেহ। কেমন যেন লজ্জা অনুভব করছিল ম্যাদময়জেল দুফোর। লজ্জায় সেদিকে তাকাতে পারছিল না। কিন্তু মাদাম দুফোর মাঝে মাঝে তাদের সেই অনাবৃত পেশীবহুল সুন্দর হাতগুলোর পানে তাকাচ্ছিলেন। মঁসিয়ে দুফোর

তত আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। কিন্তু মাদাম দুফোর যেচে আলাপ করলেন তাদের সঙ্গে। বললেন, আপনারা কি এখানে প্রায়ই আসেন ?

একটি যুবক বলল, হ্যাঁ, আমরা এখানকারই লোক। আপনারা ?

মাদাম দুফোর বললেন, আমরা বছরে একবার দু'বার আসি।

যুবক দুটি যখন এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের নিখুঁত বিবরণ দিল তখন তা শুনে সত্যি লোভ লাগছিল মাদাম দুফোরের। কারণ জনবহুল প্যারিস শহরের এক ঘিঞ্জী এলাকার একটা দোকান ঘরের মধ্যে সারাদিন আবদ্ধ থাকতে হয় তাঁদের। দোকানটা নিজেদের হলেও সেটা নিজেদেরই দেখতে হয়। সারা বছরের মধ্যে মাত্র একবার কি দু'বার এইভাবে বেড়াতে যান একটা দিনের জন্য।

মাদাম দুফোর একসময় যুবকদের বললেন, সামান্য একটা গেঞ্জি পরে আছ তোমাদের ঠাণ্ডা লাগে না ?

একটি যুবক বুক চাপড়ে বলল, আমরা যেকোন কষ্ট সহ্য করতে সব সময় প্রস্তুত। দারুণ গরম বা শীতে আমরা কখনই কাত হই না। অসম্ভব রকমের পরিশ্রম করতে পারি আমরা।

মঁসিয়ে দুফোর বললেন, তোমাদের স্বাস্থ্য সত্যিই খুব ভাল। ম্যাদময়জেল দুফোর অর্থাৎ হেনরিয়েত্তের হলদে চুলওয়ালা প্রণয়ীর গলায় মদ লেগে যাওয়ায় সে কাশছিল।

ওরা সকলেই বেশীপরিমাণ মদ খেয়েছে। সবশেষে কফি খেল। তখন বেশ বেলা হয়েছে। রোদের তাপ অনেক বেড়ে গেছে। জ্বলন্ত আগুনের মত দেখাচ্ছিল নদীর জলটা। কিছুটা নেশার ঘোর আসছিল ওদের সকলের মাথায়। যুবক দুটি হঠাৎ বলল, আমরা যাচ্ছি। আপনারা যদি কেউ নৌকায় করে খানিকটা বেড়িয়ে আসতে চান তাহলে চলুন আমাদের সঙ্গে।

মাদাম দুফোর খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন কথাটা শুনে। তিনি স্বামীকে ডাকলেন। কিন্তু মঁসিয়ে দুফোর তখন নেশার ঝোঁকে একটা গাছের তলায় বসে ঝিমোচ্ছিলেন। তার পাশে হলদে চুলওয়ালা যুবকটি একরকম ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখন অগত্যা মা ও মেয়ে যুবক দুটির সঙ্গে পৃথক দুটি নৌকায় চেপে জলবিহার করতে গেলেন।

মাদাম দুফোরের নৌকাটা তীরবেগে নিমেষের মধ্যে চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু যে যুবকটি হেনরিয়েত্তের নৌকাটি চালাচ্ছিল সে শুধু বারবার মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে হেনরিয়েত্তেকে দেখছিল। তাই ধীর গতিতে দাঁড় বাইছিল।

হেনরিয়েত্তে কিন্তু তখন ভাবছিল শুধু নিজের কথা। এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে এ ধরনের নৌকাবিলাস এই প্রথম। অভূতপূর্ব এই অভিজ্ঞতার আনন্দে শিহরণ খেলে যাচ্ছিল তার দেহে। এই অজানিত উত্তেজনায় টগবগ করে যেন ফুটছিল তার গায়ের রক্ত।

খালটার দু'ধারেই ঘন বন। খালের শান্ত নিস্তরঙ্গ জলের উপর নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছিল তাদের নৌকাটা। বনের ভিতর কোথায় যেন পাতার আড়ালে একটা নাইটিঙ্গেল পাখি ডাকছিল। যুবকটি বলল, চলুন বনে গিয়ে একটু বসা যাক।

নৌকা থেকে নেমে ওরা বনের ভিতরে চলে গেল। ওদিকে মাদাম দুফোর ও সেই যুবকটিও হয়ত এমনি এক বনভূমির শান্ত সবুজ নির্জনতা উপভোগ করছিলেন। তাদের নৌকাটা চোখে দেখতে পেল না ওরা। যুবকটি হেনরিয়েত্তেকে তার নাম জিজ্ঞাসা করল। হেনরিয়েত্তে তার নাম বলল। ছেলেটি বলল তার নাম হেনরি।

ওদের মাথার উপরে একটা গাছে নাইটিঙ্গেল পাখি গান গাইছিল। পাখিটার কণ্ঠে যেন যাদু ছিল। তবু গানের মধ্যে যেন একটা মধুর আবেশ ছিল এবং সে আবেশে ভালবাসার নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছিল ওদের মনে। ছেলেটি হেনরিয়েত্তের কোমরটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। হেনরিয়েত্তে কিছু বলল না। তখন ছেলেটি হেনরিয়েত্তের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মুখে একটা চুম্বন করল।

এবার হঠাৎ কি মনে করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল হেনরিয়েত্তে। ছেলেটিও লজ্জায় পড়ে গেল। দু'জনেই উঠে পড়ল। ধীরপায়ে এগিয়ে যেতে লাগল নৌকার দিকে। দু'জনেই চুপ; কারো মুখে কোন কথা নেই। যেন এক অঘোষিত শত্রুতা আর ঘৃণার একটা অনতিক্রম্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে ওদের দু'জনের মধ্যে।

বন থেকে বেরিয়ে এসে হেনরিয়েত্তে দেখল তার মাও একটি বনের ঝোপের ভিতর থেকে তাঁর যুবক সঙ্গীটির হাত ধরে বেরিয়ে আসছে। যুবকটির মুখে হাসির ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

ওরা সকলে আপন আপন নৌকায় গিয়ে উঠে বসল। যুবকটি দাঁড় বেয়ে যথাস্থানে ফিরে এল। এসে দেখল মঁসিয়ে দুফোর তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। হেনরিয়েত্তের প্রণয়ী যুবকটি এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠে যাবার আগে কিছু খেয়ে নিচ্ছিল।

মাসদুই পরে হেনরিয়েত্তে যে যুবকটির সঙ্গে নৌকা বিহার করতে গিয়েছিল সেই যুবকটি মাদাম দুফোর বাড়িতে এসে হাজির হলো একদিন। কি কাজে প্যারিসে এসেছিল। তাই খবর নিতে এল। দোকানে তখন মঁসিয়ে ছিলেন না। হেনরিয়েত্তের কথা জিজ্ঞাসা করতে মাদাম দুফোর বললেন সেই যুবকটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

যুবকটি চলে যাচ্ছিল। এমন সময় মাদাম দুফোর কিছুটা লজ্জার সঙ্গে তাকে বললেন, তোমার বন্ধুর খবর কি?

যুবকটি উত্তর করল, ভাল। এই বলে চলে গেল সে।

প্রিয়তমার তকমায়

In his sweet hearts livery

বর্তমানে উনি এক অভিজাত বুদ্ধিমতী মহিলা, নামকরা অভিনেত্রী। কিন্তু ১৮৪৭ সালে অর্থাৎ যখন আমাদের কাহিনীর সূত্রপাত হয় তখন উনি ছিলেন এমনই এক

সুন্দরী তরুণী যার নীতিবোধ খুব একটা দৃঢ় ছিল না। তখন সেই তরুণ প্রতিভাবান হাঙ্গেরীয় কবিটিই প্রথমে ওর যে অভিনয় প্রতিভা আছে তা আবিষ্কার করে। এ বিষয়ে প্রথম সচেতন করে তোলে তাকে।

একটি ছিপছিপে চেহারার সুন্দরী তরুণীর বাদামী রঙের চুল আর নীল চোখ দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল হাঙ্গেরীর কবিটি। সে তখন সত্যিই তাকে ভালবেসেছিল। তার সেই অকৃত্রিম ভালবাসার তাপে তার কুমারী জীবন প্রস্ফুটিত ফুলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

হাঙ্গেরীর রাজধানী ড্যানিয়ুব শহরের একটি ঘরে ওরা তখন থাকত স্বামী-স্ত্রী হিসাবে। কবির আয় খুবই কম ছিল। তবু বিশ্বস্ত নিষ্ঠাবতী স্ত্রী সেই অল্প আয়েই চালিয়ে নিত তাদের ছোট্ট সংসারটা। স্বামীর প্রতিভা ও কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করত।

এমন সময় এল বিপ্লব, এল যুদ্ধ। ওরা ছিটকে পড়ল দু'জনে দু'দিকে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমে পড়ল কবি। তার কোন খবর না পেয়ে কান্নাকাটি করতে করতে কোনরকমে নিজের পথ বেছে নিল তার স্ত্রী। সে আবার বিয়ে করল। এবার তার দ্বিতীয় স্বামীও তাকে বলে যে তার অভিনয় প্রতিভা আছে এবং মঞ্চে গেলে সে সাফল্য অর্জন করবে। ও তখন নতুন নাম গ্রহণ করে ফ্রঁ ভন কুবিনি।

কুবিনি সত্যি সত্যিই মঞ্চে নামল। নামার সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করল এক অপ্রত্যাশিত সাফল্য। হাতে টাকা পেয়ে ওর রূপ যৌবনের জৌলুষ আরো বেড়ে যায়। দিনে দিনে বাড়ে ভক্তের সংখ্যা। কত বড় বড় ধনী ওর কাছে এসে পদানত হয়।

হাঙ্গেরী তখন বিদেশীদের কবলে। এক বিদেশী সেনাপতির হাতে ছিল হাঙ্গেরী শহরের শাসনভার। তার দ্বিতীয় স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে সেই ক্ষমতাশালী বিদেশী সেনাপতিকে বিয়ে করল কুবিনি।

একদিন তার নতুন স্বামী—শহরের সর্বময় কর্তা সেই জেনারেলের পাশে বসে ঘোড়ার গাড়ীতে করে বেড়াতে যাচ্ছিল কুবিনি। হঠাৎ এক সামান্য অস্ট্রীয় সৈনিকের বেশে তার প্রথম স্বামী সেই হাঙ্গেরীয় কবিকে দেখতে পেল কুবিনি। তাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণপণ শব্দে চীৎকার করতে লাগল কুবিনি। কিন্তু কবি তা শুনল না বা বুঝতে পারল না ব্যাপারটা।

তখন সব অস্ট্রীয় সৈনিক সেই জেনারেলের অধীনস্থ। তারা সকলেই বন্দী এবং বন্দী হিসাবে জেনারেলের হুকুমে যেকোন কাজ করতে হতো।

দু'দিন পর কবির ডাক পড়ল জেনারেলের কাছে। জেনারেল তাকে পাঠিয়ে দিল বাড়িতে মেমসাহেবের কাছে। বাড়ির খানসামা তাকে একটা তকমা দিয়ে বলল, এটা হলো মেমসাহেবের তকমা। তুমি হলে মেমসাহেবের খাস খানসামা। তিনি যা হুকুম করবেন তুমি তাই করবে।

এই বলে তাকে একটি ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হলো। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে আর অপেক্ষা করতে হলো না, অল্পক্ষণের মধ্যেই সামনের পর্দাটা সরিয়ে রাণীর বেশে জমকালো পোশাক পরে কুবিনি তার সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কবি বলে উঠল, ইর্মা তুমি?

তার পুরনো নাম শুনে কুবিনিও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কবির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল কবি। তার স্ত্রী আবার বিয়ে করেছে এতে সে এমনকিছু মনে করেনি, কিন্তু একমাত্র দুঃখ এই সব বিলাসব্যসন ও ঐশ্বর্যের লোভে সে এক বিদেশী শত্রুর হাতে সঁপে দিয়েছে নিজেকে।

কুবিনি বলল, এভাবে আমাদের আবার দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।

কবি বলল, দেখা না হলেই ভাল হত।

কুবিনি বলল, আমার কোন দোষ নেই। অনেকদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে চোখের জল ফেলেছি। তারপর কোন খবর না পেয়ে তবে বিয়ে করেছি।

কবি কড়াভাবে বলল, যাই হোক, একদিন তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম। সেইজন্যেই কি আজ আমাকে তোমার তকমা পরিয়ে চাকর সাজিয়ে তোমার হুকুম তামিল করাতে চাও ?

কুবিনি বলল, আমি তোমার সব দুঃখ দূর করতে না পারলেও সে দুঃখের বেশকিছুটা এইভাবে লাঘব করতে চাই।

এই বলে পাশের ঘরে চলে গেল কুবিনি।

জেনারেল যখন স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভোজসভায় বসে তখন কবিকে তাদের খাবার পরিবেশন করতে হতো। একদিন ভোজসভায় খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে কুবিনির চোখে চোখ পড়ায় এবং তার চোখে কেমন যেন এক অজানা বিষাদের ছাপ দেখতে পাওয়ায় সে কেমন আনমনা হয়ে একটা ভুল করে ফেলল। জেনারেল বলল, এ কাজের জন্য ওর জন্ম হয়নি দেখে মনে হচ্ছে।

কুবিনি বলল, কিন্তু সৈনিকের কাজের জন্যেও নয়।

কবি দেখল কুবিনি সত্যিই তার পক্ষ অবলম্বন করে তাকে বাঁচিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তার রাগ হলেও তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাটা তার অন্তরের গভীরে একেবারে অস্বীকার করতে পারল না। একই সঙ্গে ঘৃণা, ভালবাসা ও ঈর্ষার এক গোপন অথচ বিচিত্রজটিল অনুভূতির দোলায় অনুক্ষণ দুলতে লাগল তার মনটা।

এদিকে কুবিনি কোন হুকুম করে না কবিকে। কোন কাজ করতে হয় না তাকে। কখনো-কখনো কুবিনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তার চোখে একটা বিষাদের ছায়া দেখে।

মাস দুই পর একদিন জেনারেল তার অফিসে ডেকে মুক্তি দিল কবিকে। কবি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল প্রথমে। তারপর আমতা-আমতা করে বলল, কিন্তু আমার কাছে কোন টাকা নেই।

জেনারেল বলল, ফ্রঁ ভন কুবিনি টাকা দিয়ে তোমার মুক্তি কিনে দিয়েছে তোমায়।

আনন্দে চোখে জল আসছিল হাঙ্গেরীয় কবির। তার স্ত্রী তাহলে আজও তাকে ভালবাসে। তার কথা ভাবে এত ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও। তার স্ত্রীর সঙ্গে একবার শেষবারের মত দেখা করতে গেল বাড়িতে। কিন্তু প্রধান খানসামা বলল, মেমসাহেব কিছুক্ষণ আগে প্যারিসে চলে গেছেন। দেখা হবে না।

মার্গটের বাতি

Murgat's tapers

মধ্যনিদাঘের কোন এক মনোরম সন্ধ্যায় জীবনে প্রথম ভালবাসার এক মধুর মাদকতার ফাঁকে স্বেচ্ছায় ধরা দিল মার্গট। অন্যান্য যুবকযুবতীরা যখন এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে ঘুরে-ঘুরে নাচছিল মার্গট ফ্রেসকুইন তখন তার প্রেমিক তেন্নুর সঙ্গে এক নির্জন বনপথে হেঁটে চলেছিল হাত ধরাধরি করে। জীবনে আজ প্রেমের প্রথম আস্বাদ গ্রহণ করল মার্গট, এ এক আশ্চর্য অননুভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

মার্গটের বাবার ময়দার কল ছিল। মাসকয়েক আগে সেই কলে একটা চাকরির খোঁজে এসেছিল তেন্নু। সেই প্রথম দিন মার্গটের যৌবনভরা দেহটা একবার দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় সে। তারপর থেকে কতভাবে প্রেম নিবেদন করে তেন্নু। তেন্নুকে যখনি দেখেছে মার্গট তার দু'চোখের তারায় কামনার দুটো ক্ষুধার্ত পশুকে যেন প্রতিফলিত দেখেছে। চাষীঘরের অশিক্ষিত ছেলে। মনের ভাবকে সরলভাবে সাদামাটা ভাষায় প্রকাশ করে ফেলে। কোনকিছু গোপন করতে পারে না তেন্নু।

তেন্নুকে মার্গটেরও ভাল লেগে গেলেও মিল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি এতদিন। বাবার ময়দার কলটায় ভূত সেজে তাকেও কাজ করতে হয়। বাবা বড় কড়া মানুষ। তাই মধ্যনিদাঘের এই উৎসবের সন্ধ্যাটির জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদের নীরবে।

সান্ধ্য বনপথের এই নরম অন্ধকারটাকে কেমন যেন কাঁপিয়ে দিয়ে শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। এই বাতাস আর অন্ধকার দুটোই ভাল লাগছিল ওদের। কিন্তু ওরা শুধু সেই অন্ধকার নির্জন বনপথে হেঁটে চলেছিল ধীর গতিতে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছিল না। ওরা যেন জানে না ওরা কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

হঠাৎ মার্গট বলল, আমরা কি এই জন্যই এসেছি এখানে? আমাকে কি তোমার আর কোন প্রয়োজন নেই?

তেন্নু সংকোচের সঙ্গে বলল, তোমাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু এর বেশী কিছু করতে ভয় হয়। কারণ আমি আমার জন্ম-পরিচয় জানি না। আমার অজ্ঞাতনামা বাবা মা আমাকে পথে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। অপরে মানুষ করে। তোমার বাবা যখন শুনবে আমার মত অজ্ঞাতপরিচয় একটা ছেলে তার মেয়েকে ভালবেসেছে তখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে।

মার্গট তেন্নুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি। আর আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না।

এইভাবে ভালবাসাবাসির সেই আদিম পাপের মায়াজালে জীবনে প্রথম স্বেচ্ছায় জেনেশুনে ধরা দেয় মার্গট ফ্রেসকুইন।

আবার সেই মিলের ভিতর শুরু হয় মার্গটের একটানা বন্দী জীবন। সারাদিনের মধ্যে একটিবারের জন্যও বাইরে আসতে দিত না তার বাবা। মার্গটের ভালবাসার ব্যাপারটা তার বাবা জানত কিনা তা কেউ বুঝতে পারেনি। তবে তার শাসনের কড়াকড়িটা কিন্তু বেড়ে যায় যেন দিনে-দিনে।

সেই উৎসবের সন্ধ্যার পর থেকে আর একটিবারের জন্যও দেখা হয়নি তেন্নুর সঙ্গে। একবারও দেখা না হওয়ার ফলে দেখার বাসনা বেড়ে যায় ক্রমশঃ। তীব্র হয়ে ওঠে আরো দিনে-দিনে। রাত্রিতে শুয়ে ঘুম হয় না মার্গটের। বিছানায় ছটফট করে। তন্দ্রার ঘোরে তেন্নুর নাম করে। বিছানার বালিশ আর চাদরটাকে আঁকড়ে ধরে তেন্নু ভেবে।

এদিকে হঠাৎ যুদ্ধে যোগদানের জন্য তেন্নুর ডাক পড়ে। যাবার আগে মার্গটের সঙ্গে একবার দেখা করতে চায় সে। একদিন সকালে মার্গটের বাবা যখন কলের চাকা মেরামত করছিল তেন্নু কোনরকমে ভিখারির ছদ্মবেশে মার্গটের সঙ্গে দেখা করে। বলে, আজ রাত্রিতে আমি তোমার জন্য সেইখানে অপেক্ষা করব। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। পাঁচ বছর দেখা হবে না আমাদের। আজ যদি তুমি রাত্রিতে সেখানে না যাও তাহলে আমি নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরব।

মার্গটি আবেগের সঙ্গে বলল, তেন্নু, আমি নিশ্চয় যাব।

নিশীথ রাতের অন্ধকারে মার্গটের বাবার ময়দার কল আর তার চার পাশের বস্তিটা যখন জ্বলছিল তখন ওরা দু'জনে সেই জঙ্গলের নির্জন অন্ধকারে বসে ছিল পাশাপাশি। মার্গটি বলল, আমি আজ নিজের হাতে বাতি দিয়ে বাবার মিলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। এ ছাড়া এখানে আসার আমার আর কোন উপায় ছিল না। দেখ, দেখ, এই আগুন দেখে মনে হচ্ছে যেন হাজারটা বাতি একসঙ্গে জ্বলছে। তুমি যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে, যখন আমাদের বিয়ে হবে তখন অত বাতি নিশ্চয় জ্বলবে না।

এই বলে তেন্নুকে জড়িয়ে ধরল মার্গটি। এইভাবে ফ্রেসকুইন দ্বিতীয়বার সব জেনেশুনে স্বেচ্ছায় ধরা দিল ভালবাসার সেই আদিম পাপের ফাঁদে।

—অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

মা স্যাভেজ

The mother savage

ভিরেলোনে পনের বছর আমি আর যাইনি। শরৎকালের একটি দিনে আমার বন্ধু সারভ্যাল এর সঙ্গে শিকার করার জন্যে আবার আমি সেখানে গেলাম। আমার বন্ধুর সেখানে একটি বাগানবাড়ি ছিল। প্রাশিয়ানরা সেই বাড়িটি ধ্বংস ক'রে ফেলেছিল। সেই বাড়িটি আমার বন্ধু আবার তৈরি করেছিলেন।

সারা দেশের মধ্যে এই অঞ্চলটি আমার খুব ভাল লাগত; আমার চোখের ওপরে স্বপ্নের ছোঁওয়া বুলিয়ে দিত। এই জায়গাটির অরণ্য আর আঁকাবাঁকা নদী কী ভালই লাগত আমার। সেই নদীতে আমি মাছ ধরতাম, শিকার করতাম সেই বনে।

সেবারও ছাগলের মত হালকা পায়ে আমি দ্রুত এগিয়ে চললাম; আগে-আগে চলল আমার শিকারী কুকুর দুটি। চলতে-চলতে হঠাৎ ধ্বংসপ্রায় একটা বাড়ির ওপর নজর পড়ল আমার। বেশ মনে আছে ১৮৬৯ সালে আমি ওখানে শেষবারের মত গিয়েছিলাম। তখন বাড়িটি বেশ পরিচ্ছন্ন ছিল। দ্রাক্ষালতায় ছিল ভরা। উঠোনে ঘুরে বেড়াত মুরগীর দল। ধ্বংসপ্রায় ঘরের চেয়ে করুণ দৃশ্য আর কী রয়েছে? এক বাঁশ-বাখারি ছাড়া ওটার এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

আমার বেশ মনে রয়েছে এই বাড়িতে আমি একটি মহিলাকে দেখেছিলাম। একদিন আমি যখন বিশেষ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম তখন তিনি আমাকে এক গ্লাস মদ খেতে দিয়েছিলেন। এই বাড়ির কর্তা পরের জমিতে রাত্রির অন্ধকারে চুরি করে বেড়াতো। একদিন সেপাই এর গুলি খেয়ে সে মারা যায়। তার ছেলেকে আমি কোনদিন দেখি নি। তবে শুনেছি, লম্বা-চওড়া সেই মানুষটি; দুর্দান্ত শিকারী ছিল। লোকে এদের বলত স্যাভেজ।

সারভ্যালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—এরা সব কোথায় গেল?

সারভ্যাল তার কাহিনী শুরু করল।

"যুদ্ধ ঘোষণা করার পরে মাকে একলা বাড়িতে রেখে যুবক স্যাভেজ যুদ্ধে নাম লেখালো। তখন তার বয়স তেত্রিশ। বুড়ীর টাকা পয়সা রয়েছে এটা জানত ব'লেই নিঃসঙ্গ বুড়ীকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। গ্রাম থেকে দূরে বনের ধারে সেই নির্জন বাড়িতে বুড়ীটি একাই থাকতেন। ভয় ব'লে কোন পদার্থ তাঁর জানা ছিল না। কেউ তাঁকে কোনদিনই হাসতে দেখেনি। খেটে-খাওয়া দেহাতি পুরুষদের স্ত্রীরা কোনদিনই হাসতে জানে না; বুড়ীটি ছিল শক্তসমর্থ, দীর্ঘ, রোগাটে এবং ভারিক্কী মেজাজের। কেউ তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামিও করত না।

নিজের বাড়িতে বুড়ীটি যথারীতি বাস করতেন। বাড়িটি বরফে ঢেকে যেত। সপ্তাহে একবার মাত্র তিনি গ্রামের দিকে যেতেন কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে আসতেন। নেকড়ের উপদ্রব হোত বলে তিনি তাঁর ছেলের পুরনো মরচে-ধরা বন্দুকটি কাঁধে চাপিয়ে কুঁজো হ'য়ে হাঁটতেন। মাথার চুল তাঁর সব সাদা হ'য়ে গিয়েছিল।

একদিন প্রাশিয়ানরা হাজির হল। গ্রামের সকলের বাড়িতেই তারা ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানত বুড়ীর টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে। তাই তাঁর ভাগে পড়ল চারটি প্রাশিয়ান, চারটি সুন্দর চেহারার নাদুস-নুদুস যুবক—যুদ্ধেও তাদের স্বাস্থ্যহানি হয়নি। বৃদ্ধার যাতে কষ্ট না হয়, অযথা খরচা না হয় সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল যথেষ্ট। তারা তাঁর রান্নাঘর পরিষ্কার করত, ঘর মুছে দিত, কাঠ কেটে দিত, জামা কাচতো; মনে হোত, বুড়ী-মাকে সাহায্য করার জন্যে চারটি ছেলেই উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে!

বৃদ্ধাটি কিন্তু সব সময়েই তাঁর নিজের ছেলের কথা চিন্তা করতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা তেইশ নম্বর ফ্রেঞ্চ ইনফ্যানট্রি এখন কোথায় রয়েছে তোমরা তা জান? আমার ছেলে ওরই সঙ্গে রয়েছে।

তারা উত্তর দিত—না, জানিনা। সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাও আমাদের নেই।

তাঁর দুঃখ আর উদ্বেগের কথা স্মরণ করে ওই চারটি যুবক তাঁর যথাসম্ভব সেবাযত্ন করত। দেশে তাদেরও মা রয়েছে। বিদেশে এই শত্রুদের দেশে তাঁকেও তারা মায়েরই সম্মান দিয়েছিল। বৃদ্ধাটিও তাদের নিজের ছেলের মত ভালবেসে ফেলেছিলেন। যদিও যুদ্ধে বড়লোকদের চেয়ে দরিদ্ররাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী, যদিও তারা অকারণে বেশী সংখ্যায় মারা যায়, যদিও তাদের উপর দিয়েই ঝড়-ঝাপটা প্রচণ্ড বেগে বয়ে যায়, ধূলিসাৎ করে ফেলে তাদের, তবুও তারা শত্রুদের ঘৃণা করতে পারে না। যুদ্ধবাজ বড়লোকদের সঙ্গে দরিদ্রদের পার্থক্য এইখানেই।

একদিন সকালে তিনি দেখতে পেলেন অনেক দূর থেকে একটা দীর্ঘ চেহারার মানুষ তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি জানতেন এই লোকটিই পাড়ায়-পাড়ায় চিঠি বিলি করে যায়। লোকটি এসে তাঁর হাতে একখানা বন্ধকরা চিঠি দিয়ে গেল। পুরনো একটা চশমা নাকে লাগিয়ে চিঠিটা তিনি পড়লেন—

স্যাভেজের মা, আপনাকে আমি একটি দুঃখের সংবাদ দিচ্ছি। গতকাল কামানের গোলা লেগে আপনার ছেলে ভিক্টর নিহত হয়েছে। আমরা দু'জনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলাম। ভিক্টর আমাকে আগেই বলেছিল তার কিছু হলে আমি যেন আপনাকে সংবাদ দিই।

তার পকেটে যে ঘড়িটা ছিল আমি সেটা রেখে দিয়েছি। যুদ্ধশেষে বাড়ি ফিরে গিয়ে সেটা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব। ইতি—

চিঠিটার লেখার তারিখ তিন সপ্তাহ আগে।

চিঠিটা পড়ে বৃদ্ধাটি চুপ ক'রে রইলেন। চোখ থেকে জলও গড়ালো না, চীৎকার ক'রে কাঁদলেনও না তিনি। পাষাণীর মত চুপচাপ বসে রইলেন। তারপরে ধীরে-ধীরে তাঁর চোখের পাতাগুলি ভিজে উঠল। সেই দীর্ঘদেহী ছেলেটির কথা মনে পড়ল তার। কামানের গোলায় তার দেহটা দু'খণ্ড হয়ে গিয়েছে। সেপাইরা তার স্বামীকে মেরেছে; প্রাশিয়ানরা মারলো তার একমাত্র সন্তানকে। স্বামীর দেহটা তারা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল, ছেলের মৃতদেহটাও যদি তারা পাঠিয়ে দিত।

এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন সেই চারটি যুবক চেঁচাতে-চেঁচাতে বাড়ির দিকে আসছে। তারা একটা খরগোস ধরে এনেছে। তারই আনন্দে তারা মাতোয়ারা।

তাদের আসতে দেখেই বৃদ্ধাটি চিঠিটা ভাঁজ করে বুকের মধ্যে লুকোলেন; চোখের জল মুছে ফেলে আবার শান্তভাব ধারণ করলেন।

খরগোসটি জবাই করে রান্নার জন্যে বৃদ্ধার হাতে তুলে দেওয়া হল। বৃদ্ধা সেটিকে পরিপাটি করে রান্না করলেন। তারপরে সবাই মিলে ডিনার খেতে বসলেন। বৃদ্ধাটি একগ্রাসও খেতে পারলেন না। যুবকগুলি ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে মহা আনন্দে তাদের ডিনার খেতে লাগলেন। বৃদ্ধার মুখটি তখন ভাবলেশহীন।

হঠাৎ তিনি বললেন—আমরা প্রায় এক মাস একসঙ্গে রয়েছি। তবু তোমাদের নামগুলি পর্যন্ত আমি জানলাম না।

বৃদ্ধাটির কথা তারা বুঝতে পেরে নিজেদের নাম বলল; কিন্তু তাতেও হ'ল না। তিনি তাদের দিয়ে তাদের নাম-ধাম, দেশের ঠিকানা সব লিখিয়ে নিলেন। সেই অপরিচিত অক্ষরে লেখা তালিকাটি ভাঁজ ক'রে তিনি বললেন—তোমাদের জন্যে আমি কিছু কাজ করতে যাচ্ছি।

এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তারপরে যেখানে ছেলেরা ঘুমোত সেই ঘরটিতে প্রচুর খড় নিয়ে জমাতে লাগলেন। ব্যাপারটা কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে তারা তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তিনি বললেন ঘরটাকে গরম ক'রে রাখার জন্যেই এই ব্যবস্থা। গরমে তারা বেশ আরামে ঘুমোবে। কথাটা শুনে তারাও তাঁর সঙ্গে খড়-কুটো বয়ে এনে ঘর বোঝাই করতে শুরু করে দিল। পাটাতন পর্যন্ত খড়ে বোঝাই হ'য়ে গেলে সবাই থামল।

রাত্রিতেও বৃদ্ধাটি কিছু খেলেন না দেখে সবাই বেশ মনোক্ষুন্ন হ'ল। বৃদ্ধাটি বললেন—তাঁর শরীর ভাল নয়—হাতে-পায়ে খিল ধরছে।

রাত্রির খাওয়ার পরে তিনি নিজেকে সেঁকতে বসলেন। তারপরে চারটি যুবক সিঁড়ি বেয়ে সেই খড়ে-বোঝাই ঘরের পাটাতনে শুয়ে পড়ল। সত্যিই ঘরটা বেশ গরম হয়েছে। ঘুমটা ভালই হবে। চারপাশে বেশ একটা মিষ্টি সোঁদা-সোঁদা গন্ধ ছাড়ছিল।

সবাই ওপরে উঠে গেলে বৃদ্ধাটি ধীরে-ধীরে মইটা নামিয়ে নিলেন; তার পরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তিনি ঘরের বাইরে এসে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিলেন। খড়গুলি জ্বলতে শুরু করলে সেই জ্বলন্ত খড়গুলিকে চারপাশে ছড়িয়ে দিয়ে ঘরে তালা দিয়ে দিলেন।

ঘরের মধ্যে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠল আগুন। সেই লেলিহান অগ্নিশিখা গোটা ঘরটাকে গ্রাস করে ফেলল। ভেতরে যুবকগুলির মর্মন্তুদ আর্তনাদ শোনা গেল। তারপরে বিকট গর্জন করে ঘরের ছাদ ধ্বসে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সব আর্তনাদ থেমে গেল। তখন কেবল আগুনের গর্জন; ঘরের দেওয়াল, জানালা, দরজা ভস্মীভূত ক'রে লেলিহান অগ্নিশিখা উন্মত্তের মত তখন আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা আকাশ হয়ে উঠেছে লাল।

বৃদ্ধাটি তাঁর ছেলের বন্দুকটি বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন সামনে। উদ্দেশ্য, ওদের মধ্যে কেউ যদি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তাকে গুলি করে মারবেন। সব শেষ হয়ে গেলে, বন্দুকটা তিনি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। দুম্ ক'রে একটা শব্দ হয়ে বন্দুকটা আগুনের মধ্যে ফেটে গেল। সব শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে কয়েক গজ দূরে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে শান্তভাবে বসে রইলেন।

চারপাশ থেকে দৌড়ে এল লোকজন—দৌড়ে এল প্রাশিয়ান সেনানীরা। একটি প্রাশিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ বৃদ্ধার কাছে গিয়ে প্রাশিয়ান যুবকদের কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি আসল কাহিনীটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার

জন্যেই যে চারটি যুবককে তিনি পুড়িয়ে মেরেছেন সে কথা বলতেও দ্বিধা করলেন না। পাছে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর কথাটি বিশ্বাস না করেন এই জন্যে বুকের ভিতর থেকে দুটি চিরকুট বার ক'রে তাকে তিনি দেখালেন। তাদের মধ্যে একটিতে ভিক্টরের মৃত্যু সংবাদ রয়েছে; আর একটিতে রয়েছে চারটি মৃত যুবকের নামধাম—আর তাদের বাড়ির ঠিকানা। চিরকুট দুটি দেখিয়ে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষটিকে বললেন—তোমরা ওদের বাড়িতে সংবাদ দিয়ে দাও যে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আমিই তাদের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছি।

এরপরে সৈন্যাধ্যক্ষের কোনরকম সন্দেহ হয়নি। সে মাতৃভাষায় কী যেন একটা বলল। সঙ্গে সঙ্গে জনকতক প্রাশিয়ান সৈন্য তাঁকে গাছের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলল। কোনরকম ভাবান্তর দেখা গেল না তাঁর। তারপরে কুড়ি গজ দূর থেকে বারজন সেনানী বন্দুক তুলে একসঙ্গে গুলি ছুঁড়লো। বৃদ্ধাটি লুটিয়ে পড়লেন না, মনে হল বসে পড়লেন। একটি গোলা এসে তাঁকে প্রায় দু'খানা করে ফেলেছিল।"

বন্ধুর কাহিনী শেষ হল। আমি কেবল ভাবছিলাম সেই নির্দোষ চারটি যুবকের মায়েদের কথা আর তাঁর কথা যিনি প্রাশিয়ান সৈন্যদের হাতে প্রাণ দিলেন।

খেতাব

The decoration

এ পৃথিবীতে কিছু লোক রয়েছে যারা বিশেষ একটি প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কথা বলার অথবা চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মনে প্রচণ্ড একটা কামনা জাগে।

মঁসিয়ে স্যাক্রিমেন্টেরও ছেলেবেলা থেকে রাজকীয় অলঙ্কারে নিজেকে ভূষিত করার একটা প্রচণ্ড বাসনা ছিল। অন্যান্য ছেলেরা যেমন সেনানীর টুপী পড়তে ভালবাসে তিনি শিশুকাল থেকে "লিজন অফ অনার"এর দস্তার ক্রশ বুকের ওপরে ঝোলাতে ভালবাসতেন।

কিন্তু লেখাপড়া তিনি শিখতে পারেননি। এমন কি একটা প্রাথমিক পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। পয়সাকড়ি তাঁর ভালই ছিল; সুতরাং কী করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একটি সুন্দরী মেয়েকে তিনি বিয়ে ক'রে ফেললেন। উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের মতই তিনি প্যারিসে বাস করতে লাগলেন। সোসাইটিতে না গিয়ে নিজেদের সমাজের ভেতরেই ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। ভবিষ্যতে মন্ত্রী হ'তে পারেন এমন একজন ডেপুটি আর দু'জন স্থায়ী সেক্রেটারীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। এতেই তিনি নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করতেন।

তবুও যে বাসনাটি শৈশবে তাকে অস্থির ক'রে তুলেছিল সেটির হাত থেকে তিনি মুক্তি পেলেন না। সেটি হচ্ছে তাঁর বোতাম লাগানোর ঘরে একটি রঙিন ফিতে—লিজন অফ অনার-এর প্রতীক।

পথে-প্রান্তরে ঘুরে-ঘুরে তিনি কেবল লাল ফিতে জড়ানো মানুষদেরই দেখে বেড়াতেন আর হিংসাতে জ্বলেপুড়ে মরতেন। এই জাতীয় এত লোককে তিনি দেখতে পেলেন যে মনে হল সরকার পাইকারী দরে সব খেতাব ছড়িয়ে দিয়েছেন। খেতাবধারীদের দেখতে-দেখতে একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। তিনি দেখলেন কিছু লোক মাথা উঁচু ক'রে ধরাকে সরাজ্ঞানে হাঁটছে; আর কিছু লোক সাধারণ মানুষের মত হেঁটে চলেছে। প্রথম শ্রেণীর মানুষদের দেখে মনে হল যে তাঁরা সবাই "লিজন অফ অনার" খেতাবধারী। চলতে-চলতে এই জাতীয় মানুষদের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি স্বাভাবিকভাবেই সম্মান দেখানোর জন্যে মাথার টুপীটা খুলে ফেলতেন।

কিন্তু এই সমস্ত খেতাবধারীদের দেখলেই তাঁর মেজাজটা হট ক'রে গরম হয়ে যেত। তখনই তাঁর মন এই সব মানুষদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ঘৃণায় ভরে যেত। উত্তেজিতভাবে তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। অজস্র দোকানে রাশি-রাশি খাবার দেখে দরিদ্র অভুক্তরা যেভাবে কাতরায় তিনিও সেইভাবে বাড়িতে ফিরে বেশ চেঁচিয়েই বলতেন—এই রকম হতচ্ছাড়া সরকারের পতন কবে হবে!

তাঁর স্ত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—তোমার আজ কী হল?

তিনি বলতেন—অনাচার অবিচার দেখে আমি ক্ষিপ্ত হয়েছি।

কিন্তু ডিনারের পর আবার তিনি রাস্তায় বেরোতেন; যে সব দোকানে খেতাব সাজানো রয়েছে সেই সব দোকানের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। কত হরেক রকমের খেতাবই না সে-সব জায়গায় স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। এক-একবার তাঁর মনে হোত, ওই সব খেতাব তিনি বুকে পরে বিরাট একটা শোভাযাত্রার পুরোভাগে কদম-কদম এগিয়ে যাবেন।

কিন্তু হায়, এই খেতাব অর্জন করার মত কোন গুণই যে তাঁর নেই। তিনি নিজের মনে-মনেই বললেন—"লিজন অফ অনার" পেতে গেলে সিভিল সার্ভেন্ট হ'তে হবে। কিন্তু আমি যদি অ্যাকাডেমীর অফিসার হই তাহলে?

অথচ, কেমন ক'রে যে অ্যাকাডেমীর চাকরিটা পাওয়া যায় তা তিনি জানতেন না। স্ত্রীর কাছে প্রস্তাবটা তুলতেই ভদ্রমহিলা ক্ষেপে উঠে বললেন—অফিসার? তোমার কী গুণ রয়েছে যে অ্যাকাডেমীর অফিসার হবে?

তিনিও রেগে বললেন—আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর। কী ক'রে হওয়া যায় সেই কথাটাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। মাঝে-মাঝে তুমি এমন বোকার মত কথা বল...না...

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন—সত্যি! কী বলব তা-ই আমি জানিনা।

তাঁর মগজে হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বললেন—ধর, তুমি এবিষয়ে মঁসিয়ে রোজেলিনের সঙ্গে যদি একবার কথা বল। তিনি ডেপুটি। এবিষয়ে নিশ্চয়

একটা পথ তিনি আমাকে বাতলে দিতে পারবেন। আমি নিজে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি ; কিন্তু সেটা ভাল দেখাবে না। তোমার কথা আলাদা।

ভদ্রমহিলা ডেপুটির সঙ্গে কথা বললেন। তিনি জানালেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে এবিষয়ে তিনি আলোচনা করবেন। তারপর থেকে স্যাক্রিমেণ্টের তাগিদ খেয়ে-খেয়ে একদিন তিনি বললেন—তোমার কী কী যোগ্যতা রয়েছে সেই সব জানিয়ে সরকারের কাছে তোমাকে একটা দরখাস্ত করতে হবে।

কিন্তু বিপদ হচ্ছে তাঁর সত্যিকার কোন যোগ্যতা নেই। যাই হোক, সেই যোগ্যতা অর্জন করার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে তিনি একটি পুস্তিকা লিখতে বসলেন। পুস্তিকার নাম হবে—"শিক্ষায় জনসাধারণের অধিকার।" কিন্তু এবিষয়ে কোন ধারণা না থাকায় লেখা বন্ধ করতে হ'লো তাঁকে। সেটা ছেড়ে আর একটা পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করলেন। এই পরিকল্পনার প্রথমটি হ'ল—"দেখার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা।" কোনরকমে নিবন্ধটি শেষ ক'রে নিজের পয়সায় সেটি ছাপালেন ; দশ কপি পাঠালেন মন্ত্রীর কাছে। পঞ্চাশ কপি প্রেসিডেণ্টের কাছে ; প্যারিসের প্রতিটি সংবাদপত্রে দশটি ক'রে, মফঃস্বল সংবাদপত্রের প্রতিটিতে পাঁচটি ক'রে। এরপরের নিবন্ধটি হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের ওপরে। এই নিবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখলেন—মানুষ আনন্দে মাততে চায়। এবং যেহেতু তারা শিক্ষার খোঁজে যায় না সেইহেতু শিক্ষাকেই তাদের দরজায় পৌঁছে দিতে হবে। ইত্যাদি।

এই সব পুস্তিকাতে কাউকে নড়াতে পারলেন না তিনি। কিন্তু তবু তিনি সরকারের কাছে দরখাস্ত পাঠাতে ছাড়লেন না। অনুসন্ধান ক'রে জানতে পারলেন যে তাঁর প্রস্তাবটি পঠিত হচ্ছে। তিনি খুব আশান্বিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করেও কিছু হ'ল না দেখে তিনি সরকারী অফিসে তদ্বির করতে গেলেন। সরকারী কর্মচারীটি তাঁকে বিনীতভাবে বললেন—আপনার দরখাস্তটি পঠিত হচ্ছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

আবার কাজ শুরু করলেন মঁসিয়ে স্যাক্রিমেণ্ট। মঁসিয়ে রোজেলীন তাঁকে এদিকে যথেষ্ট বাস্তব উপদেশ দিলেন। এর ভেতরে রোজেলীন নিজেই খেতাব পেয়ে গেলেন। কোন্ বিশেষ যোগ্যতার বলে তিনি খেতাবটি পেলেন তা কেউ বলতে পারল না।

মঁসিয়ে রোজেলীন তাঁকে বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত করলেন, নতুন নতুন বিষয়ে লেখার জন্যে উপদেশ দিলেন ; এবং মন্ত্রীর কাছেও তাঁর সম্বন্ধে লিখিতভাবে দরখাস্ত করলেন। একদিন তিনি তাঁর একটি বন্ধুর বাড়িতে লাঞ্চ খাচ্ছিলেন এমন সময় বন্ধুটি তাঁর করমর্দন করে বললেন—"কমিটি ফর হিস্টোরিক্যাল স্টাডিস" তোমাকে একটা কাজের ভার দিয়েছে হে। ফ্রান্সে যত লাইব্রেরী রয়েছে সেই সব জায়গায় তোমাকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

শহর থেকে শহরান্তরে পুরনো বই-এর তালিকা ঘাঁটতে লাগলেন তিনি। ধূলোতে বোঝাই বই-এর স্তূপ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে অভিশাপ কুড়োলেন সকলের। এক সপ্তাহ পরে

মধ্যরাত্রিতে স্ত্রীকে অবাক করে দেওয়ার জন্যেই একদিন তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন। 'ল্যাচ কী' দিয়ে দরজা খুলে নিঃশব্দে তিনি ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঘর ভেতর থেকে বন্ধ দেখে তিনি ডাকলেন—জিনি, দরজা খোল ; আমি এসেছি।

এই ডাকে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তা না হলে তিনি হঠাৎ লাফিয়েই বা উঠবেন কেন আর স্বপ্নের কথাই বা বলবেন কেন ? তারপরে ভদ্রমহিলা তাঁর ড্রেসিংরুমে দৌড়ে গেলেন ; দরজা খুললেন, বন্ধ করলেন ; তারপরে আবার শোওয়ার ঘরে ফিরে এসে দরজায় নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আলেকজাণ্ডার, সত্যিই তুমি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি। দরজা খোল।

দরজাটা খুলে ভদ্রমহিলা স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন—কী আনন্দ, কী আনন্দ।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে ধীরেসুস্থে পোশাক খুলে ফেললেন ; তারপরে একটা চেয়ার থেকে তাঁর কোটটা তুলে নিলেন। কোটটা সাধারণতঃ তিনি হ্যাঙারেই টাঙিয়ে রাখতেন। হঠাৎ সেটা ওখানে এল কি করে তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তার চেয়ে অবাক হলেন কোটের বোতামে একটা লাল ফিতে দেখে। তাঁর স্ত্রী দৌড়ে গিয়ে কোটটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন ; বললেন—না—তুমি ভুল করছ।—ওটা আমাকে দাও।

কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। কোটটা ধরে রইলেন ; বারবার একই প্রশ্ন করতে লাগলেন—কী ?—কেন—কেন—এই কোটটা কার ? এটা তো আমার নয় ; কারণ, এই লাল ফিতেটার ওপরে যে "লিজন অফ অনার" লেখা রয়েছে।

আতংকে অস্থির হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন—শোন, শোন। এটা একটা গোপন কথা। ওটা আমাকে দাও।

উহুঁ। আমি জানতে চাই এটা কার ওভারকোট।

এই কথা শুনে ভদ্রমহিলা চীৎকার করে বললেন—তাহলে শোন—কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর—আসল কথাটা হচ্ছে তুমি খেতাব পেয়েছ।

অ্যাঁ !

হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো এই কোটটা আমি তৈরি করিয়ে আনলাম। কিন্তু কাউকে বলো না ; কারণটা হচ্ছে এটা ঘোষণা করতে এখনও এক মাস থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগবে। মঁসিয়ে রোজেলীনই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না তাঁর—কী বললে—রোজেলীন—ও হো—

এক গ্লাস জল খেলেন তিনি। তারপরেই আনন্দে কাঁদতে শুরু করলেন।

এক সপ্তাহ পরে সরকারী ঘোষণা বেরোল—মূল্যবান কাজ করার জন্যে মঁসিয়ে স্যাক্রিমেণ্টকে "লিজন অফ অনার"-এর খেতাব দেওয়া হল।

সম্পদলাভের উপায়

A way to wealth

আচ্ছা লেরেমির কথা তোমার মনে আছে? তার কি হলো?

সে এখন এক সেনাদলের ক্যাপটেন হয়েছে।

আর পিপসন।

সে এখন সাবপ্রিফেক্ট পদে আছে।

আর রেকোলেত্?

মারা গেছে।

এইভাবে আমরা দুই বন্ধুতে মিলে বন্ধুদের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ পেসেন্সের কথা উঠল। আমার বন্ধু বলল, সেই মহান পেসেন্সের কথা মনে আছে তোমার?

আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনতে চাও তার কথা? তাহলে শোন। মাত্র চার পাঁচ সপ্তাহ আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ইনস্পেক্টরের কাজে আমাকে একবার লিমোজেস যেতে হয়েছিল। আমি ওখানে উঠেছিলাম গ্র্যাণ্ড কাফে নামে একটি হোটেলে। একদিন সন্ধের সময় হোটেলে একা-একা সময় কাটছিল না। একা-একা পথে বেড়াতে গেলেও ভাল লাগবে না। সাধারণতঃ একটা অব্যক্ত বিষাদ নিঃসঙ্গ পথিকদের পেয়ে বসে—এই ভেবে আমি হোটেলেই বসার ঘরে বসেছিলাম।

এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে কড়া গলায় হোটেলের বয়কে ডেকে বলল, বয়, আমার কাগজটা দেখি।

বয় এসে টাইম্স্ পত্রিকাটা তার হাতে দিল। আমি ভাবলাম ভদ্রলোক যখন এমন গুরুগম্ভীর মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পাঠ করছে, তখন নিশ্চয় উনি একজন চিন্তাশীল লোক হবেন।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম আমি। বললাম, আপনি কি আমায় চেনেন?

ভদ্রলোক হঠাৎ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, আরে তুমি কোঁত্রান্ত লার্দোয় নও?

আমি বললাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু আপনি?

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে এসে আমার হাত ধরে বলল, আমি হচ্ছি পেসেন্স। তোমার কলেজবন্ধু সেই রবার্ট পেসেন্স।

পেসেন্স বলল, তুমি এখানে কি কাজে এসেছ?

আমি বললাম, অর্থদপ্তরের পরিদর্শক হিসাবে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয় বিভিন্ন জায়গায়।

পেসেন্স তখন জিজ্ঞাসা করল, তাহলে বেশ ভালই আছ? জীবনে বেশ উন্নতি করেছ।

আমি বললাম, মোটামুটি তা বলতে পার। কিন্তু তুমি কি কর?

পেসেন্স উত্তর করল, আমি ব্যবসা করছি।

আমি তখন তাকে বললাম, তাহলে অনেক টাকা করেছ!

পেসেন্স উত্তর করল, হ্যাঁ, অনেক টাকা করেছি। সত্যিই আমি ধনী। আগামীকাল দুপুরে আমার বাড়িতে খাবে তুমি। তুমি স্বচক্ষে সবকিছু দেখবে। বিয়ে করেছ?

আমি উত্তর করলাম, না।

পেসেন্স বলল, সুন্দরী তরুণীর প্রতি আগ্রহ আছে ত?

আমি বললাম, একেবারে নেই তা ঠিক বলতে পারি না।

পেসেন্স বলল, ঠিক আছে, তাহলেই হবে।

আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি বিয়ে করেছ?

পেসেন্স বলল, দশ বছর হলো বিয়ে করেছি এবং চারটি সন্তানের জনক হয়েছি। আগামীকাল অবশ্য দেখতে পাবে আমার স্ত্রী আর সন্তানদের। আমার বাড়ির ঠিকানা হলো—১৭ নম্বর কক ফি শান্তে স্ট্রীট। কাল দুপুরে আসা চাই।

রাতটা কাটিয়ে সকাল হতেই উন্মুখ হয়ে রইলাম পেসেন্সের বাড়ি যাবার জন্য। অফিসের কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে বসে কিছু কাজ সারলাম সকাল থেকে। তারপর তাকে বললাম, আমার বন্ধু নিমন্ত্রণ করেছে তার বাড়ি যাবার জন্য।

কোষাধ্যক্ষ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে পেসেন্সের বাড়ি পর্যন্ত এসে দেখিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে বিদায় দিয়ে বাড়ির কলিং বেল টিপলাম। একজন মেয়েলোক দরজা খুলে দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম মঁসিয়ে পেসেন্স আছে কিনা। সে বলল আছে।

তারপর আমাকে সঙ্গে করে সে বসার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটার সব দেওয়ালগুলো বড়-বড় ছবিতে ঢাকা। দামী আসবাবপত্রে ভর্তি ঘরখানা। বেশীর ভাগ ছবিই যতসব নগ্ন বা অর্ধনগ্ন মেয়েদের। একটি ছবিতে রয়েছে এক অর্ধনগ্ন নায়িকা তার নায়কের আকস্মিক আবির্ভাবে অপ্রস্তুত হ'য়ে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে। একটি ছবিতে নায়িকা তার গোপনাঙ্গে হাত দিয়ে তার স্বাধিকারপ্রমত্ত নায়ককে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। সমস্ত ঘরখানা নানা রকম সুগন্ধে মাতোয়ারা হ'য়ে আছে। মনে হলো, এ যেন সম্পূর্ণ এক আলাদা জগৎ। বাড়ির পিছনে বাগান। বাগানটা একনজরে দেখার জন্য আমি জানালার ধারে গেলাম। জানালার ভিতর দিয়ে দেখলাম, তিনটি মেয়ে সাদা পোশাক পরে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে দু'জন সুন্দরী যুবতী এবং একজন বয়স্কা।

এমন সময় পেসেন্স ঘরে ঢুকে তার হাতটা দিল আমার দিকে। তারপর আমার মুখপানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বল এখন কি চাও, এই সুসজ্জিত ঘরে বসে গল্প করবে নাকি ঐ বাগানে বেড়াবে অথবা ঐ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে? ওরা হলো আমার স্ত্রী আর দুটি সুন্দরী শ্যালিকা।

—অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

জেরোবোয়াম

Jeroboam

কেউ যদি বলে সেণ্ট স্যাম্পসন চার্চের ভিকার রেভারেণ্ড উইলিয়ম গ্রীনফিল্ড তাঁর স্ত্রী এ্যানাকে সুখী করতে পারেনি তাহলে বলতে হবে সে হিংসুটে। কারণ উইলিয়ম তাদের বারো বছরের বিবাহিত জীবনে তার স্ত্রীকে বারোটি সন্তান দান করেছে। একটা মানুষ তার স্ত্রীকে এর থেকে বেশী আর কি দিতে পারে?

গুণবতী স্ত্রী হিসাবে তুলনা ছিল না এ্যানার। কিন্তু গুণের মত রূপ ছিল না তার দেহে। তার চেহারাটা দেখে মনে হয় চামড়া ঢাকা একটা কঙ্কাল। মনে হয় সে আগে মোটা ছিল এবং অসুখে রোগা হয়ে গেছে। গায়ের রংটা বালির মত তামাটে। মাথায় চুল বেশী নেই। দাঁতগুলোর গায়ে হলদে ছোপ ধরেছে।

অথচ এই দেহের বেদীমূলে রেভারেণ্ড উইলিয়ম দীর্ঘ বারো বছর ধরে বারোবার অর্ঘ্য দান করেছে। বারোটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেছে। তার স্ত্রী একথা অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ বারোটি সন্তানই জীবিত আছে।

কিন্তু আশ্চর্য! আজ চার বছর এই সন্তান উৎপাদনের পবিত্র কর্তব্যকর্ম হ'তে বিরত আছে উইলিয়ম। আর এইটাই হলো এ্যানার দুঃখের একমাত্র কারণ। সে অনেক ভেবে দেখেছে তার স্বামী তাকে পরিপূর্ণ সুখদান করতে পারেনি। এ্যানা যখন তার দ্বাদশ সন্তান প্রসব করে তার কিছুকাল পরে রেভারেণ্ড উইলিয়ম একদিন তাকে ডেকে বলে, দেখ এ্যানা, আমরা ইস্রায়েলের সেই দ্বাদশ জাতির মত বারোটি সন্তান উৎপন্ন করেছি। এর পরেও যদি আমরা দেহসংসর্গে লিপ্ত হই তাহলে সেটা হ'বে ব্যভিচারের সমতুল্য। তুমি কি আমাকে সেই ব্যভিচারের পথে ঠেলে দিয়ে আমার পবিত্র ধর্মজীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাও?

গুণবতী স্ত্রী এ্যানা তা করেনি। এই চার বছর তার স্বামীর সংযম সাধনার ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি সে। কোনদিন কোন অভিযোগ করেনি। শুধু নীরবে নিভৃতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছে ঈশ্বর যেন তার স্বামীর মনে নূতন করে আবার এক দ্বাদশ জাতির উৎপাদনের পবিত্র বাসনা জাগরিত করেন। কিন্তু ঈশ্বর তার স্বামীর মনে এই ধরনের কোন বাসনা জাগ্রত না করায় সে বিচিত্রভাবে সে বাসনা জাগাবার চেষ্টা করে। সে তার স্বামীর জন্য সেই সব উত্তেজক খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থা করে যা সাধারণতঃ ইংরেজদের স্তব্ধ শীতল রক্তকে তপ্ত ও সোচ্চার করে তোলে। উইলিয়মের রক্ত কিন্তু তবু তাও হয় না।

এ্যানার গায়ে আগের থেকে কিছু মাংস জমল। তাকে আগের থেকে বেশকিছুটা মোটা দেখালো। কিন্তু দুঃখে মনটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে লাগল। স্বামীর

যে ভালবাসা সে হারিয়ে ফেলছে জীবনে সে ভালবাসা নূতন ক'রে ফিরে পাওয়াই তার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে উঠল। সে তার স্বামীর যুক্তির কথা মোটেই ভুলতে পারেনি। তার শুধু মনে হয়েছে তার স্বামী মিথ্যা যুক্তি খাড়া করে তাকে এড়িয়ে গেছে। আসলে তাকে আর ভালবাসে না। নিশ্চয় শয়তান ঢুকেছে তার স্বামীর মনের মধ্যে।

হঠাৎ একদিন একটা বুদ্ধি এল এ্যানার মাথায়। সে ঠিক করল প্যারিসে এক প্রদর্শনী দেখতে যাবে। সেখানে আলজীরিয় মেয়েদের কাছে সে একটা কৌশল শিখে নেবে। ব্যাপারটা খুবই নোংরা, তবু নিশ্চয় সেটা তার স্বামীকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফিরে একদিন রাত্রিতে সোজা তার স্বামীর শোবার ঘরে চলে গেল এ্যানা। একে-একে সব পোশাক খুলে ফেলে শুধু একটা অন্তর্বাস পরে নগ্নপ্রায় অবস্থায় কুৎসিতভাবে কোমর দুলিয়ে নাচতে লাগল।

উইলিয়ম হঠাৎ কিছু বুঝতে না পেরে প্রথমে অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার স্ত্রীর দিকে। তারপর শান্তকণ্ঠে বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

তার নগ্ন দেহের কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তার স্বামীকে মুগ্ধ করতে চেয়েছিল এ্যানা। তার স্বামী শুধু একবার বলল, হা ভগবান, আবার বারোটি সন্তান উৎপন্ন করার কথা ভাবাই যায় না।

এদিকে অনেকক্ষণ ধরে নেচে ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল এ্যানা। উইলিয়ম তাকে তখন বলল, তুমি যদি কোন মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাক তাহলেই তোমাকে তোমার এই ঘৃণ্য কাজের জন্য ক্ষমা করতে পারি। যাও ঠাণ্ডা জলে এখনই হাতমুখ ধুয়ে এস।

এ্যানা বলল, হ্যাঁ উইলিয়ম, আমাকে ক্ষমা করো।

উইলিয়ম গম্ভীর গলায় বলল, মনে রেখো, তুমি এখন মিসেস গ্রীনফিল্ড। আমরা এখন যে সংযম দু'জনেই পালন করছি তার থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। ভুলে যেও না তুমি ইসরায়েলদের সেই জিজেবেল।

তার স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়ে তাদের ঝি পলির সঙ্গে প্রেম করতে গেল উইলিয়ম। সে আজ চার বছর ধরে স্ত্রীর সংসর্গ ত্যাগ করে গোপনে ঝি পলির সঙ্গে প্রেম ক'রে আসছে। সে সোজা তখন পলির ঘরে গিয়ে বলল, মিসেস গ্রীনফিল্ডের কাছে সোজা চলে যাও। তোমার সমস্ত পোশাক খুলে তার সামনে নগ্ন দেহে দাঁড়াবে। তাকে এমন শিক্ষা দেবে যাতে সে এভাবে আমার সামনে আর কোনদিন না আসে। আর কোনদিন যেন সে এ কাজ করতে সাহস না পায়।

পলি তার মালিকের কথামত তাই করল। আর তাই দেখে এ্যানা পেল চরম শিক্ষা। তারপর থেকে কোনদিন তার স্বামীকে তার গর্ভে ত্রয়োদশ সন্তান উৎপাদন করতে প্ররোচিত করেনি।

নর্তকীর প্রেম

Virtue in the ballet

ভিয়েনার অপেরা হাউসে যখনি কোন যুবতী নর্তকী আসত এবং যদি যৌবনের সঙ্গে-সঙ্গে তার দেহে একটু লাবণ্য থাকত তাহলে স্থানীয় ধনী অধিবাসীরা যেন পাগল হ'য়ে ছুটত তার পিছনে। সেবার শীতের শেষে একটা খবর প্রচার হ'য়ে গেল, এবার ভিয়েনা অপেরায় এমন একজন সুন্দরী নর্তকী আসছে যার রূপে চোখ ঝলসে যাবে।

নাম তার সাতানেলা। মেয়েটার বয়স খুবই কম এবং সে তার কৌমার্যের শুচিতা আজও হারায়নি। কিন্তু সাতানেলা বড় শক্ত মেয়ে। সে এই বয়সেই এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে। তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনকিছু করানো একটা কঠিন কাজ।

প্রথম দিনেই দর্শকদের মন জয় করে ফেলল সাতানেলা। সারা শহরে জয়জয়কার পড়ে গেল তার। পরদিন সে দেখল শহরের অপরিচিত কত সব ধনী ব্যক্তিরা কত মণিমুক্তার উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রথমে অতসব উপহার গ্রহণ করায় বিপদ আছে। তাই সে তার মাকে বলে দিল এসব উপহার যারা এনেছে, যারা পাঠিয়েছে তাদের সব ফেরৎ দিয়ে দাও। আমি এসব কিছুই নেব না।

তার মা বলল, টাকা পয়সা হাত পেতে না নিলেই হ'লো। উপহার নিতে দোষ কি।

একদিন তাদের বাসায় সোনারূপোর এক বড় ব্যবসায়ীর আগমন ঘটল। তার মা খুব খুশী হ'লো তার উপহারের বহর দেখে। কিন্তু সাতানেলা তার মাকে রেগে বলল, আচ্ছা মা, এসব দামী জিনিস পেলে কোথা হ'তে? তুমি কি কোন লটারির পুরস্কার পেয়েছ?

তার মার কাছ থেকে আহ্বান পেয়েই সোনারূপোর সেই কারবারী রোজ একবার করে তাদের বাসায় আসে। একদিন সাতানেলা তার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করায় সে অস্বস্তি অনুভব করল। এই ধরনের মেয়েরা সাধারণতঃ যে ব্যবহার করে সে তাতেই অভ্যস্ত। এই রকম ভদ্র ও শালীনতাপূর্ণ আচরণ সে প্রত্যাশা করেনি।

কোন লোককে পছন্দ না করার একটা কারণ ছিল সাতানেলার। সে একটি ছেলেকে গোপনে ভালবাসত। একটি যুবক তাকে দিনকতক দেখার পর সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে তার সঙ্গে একদিন আলাপ করে। তাকে দেখে ভাল লাগে সাতানেলার। যুবকটি বলে আমি গরীব, তোমার ঘরে ঐসব বিলাস ব্যসন ও ঐশ্বর্যের মাঝে কেমন করে যাব? সাতানেলা বলল, তাতে কি হয়েছে, তুমি নিশ্চয় যাবে। আমি তোমাকে ভালবাসি।

যুবকটি বলল, কিন্তু তুমি নিশ্চয় কারো অধীনে আছ?

সাতানেলা বলল, আমি কারো হাতে এখনো পর্যন্ত বিলিয়ে দিইনি নিজেকে।

কিন্তু যুবকটিকে দেখে সাতানেলার মা খুশি হ'তে পারল না। তারিফ করতে পারল না তার মেয়ের রুচিকে। কিন্তু যখন শুনল যুবকটি নিজের আসল পরিচয় দেয়নি এবং সে এক কাউণ্টের ছেলে তখন খুশি হলো। যুবকটি একদিন স্বীকার করল সাতানেলার কাছে। বলল, আমি তোমার ভালবাসাকে পরীক্ষা করার জন্যই গোপন রেখেছিলাম আমার পরিচয়।

এদিকে তার প্রেমিক ধনী কাউণ্টের ছেলে জেনে সাতানেলা প্রায়ই তার কাছে নানারকম উপহার চাইতে শুরু করল। তার বাবার কাছে প্রায়ই টাকা চাইত যুবকটি। দামী উপহার কিনতে অনেক টাকার দরকার হোত। একদিন তার বাবার সন্দেহ হ'তে খোঁজ নিয়ে জানল তার বাবা, তার ছেলে এক নর্তকীর প্রেমে পড়েছে। কাউণ্ট তখন সোজা ভাষায় ছেলেকে ব'লে দিল, তাকে যদি ত্যাগ না করো তাহলে বাড়ি ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে।

বাবার কথাটা সোজা গিয়ে সাতানেলাকে জানাল যুবকটি। সাতানেলা বলল, আমি তোমার কোন উপহার চাই না। তোমার কাছ থেকে কোন কিছুই আর চাইব না। আমি শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে আমি কোন কিছুর বিনিময়েই হারাতে পারব না।

তখন বাধ্য হ'য়ে তার বাবাকেই ছাড়ল যুবকটি। বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সাতানেলার বাড়িতে এসে উঠল। প্রথমে সাতানেলা তার বাড়ির দামী আসবাবপত্র ও গয়না বিক্রি করে সংসার চালাতে লাগল। পরে যুবকটি কোন উকিলের অধীনে এক মুহুরির কাজ পেল। এতেই তাদের ভালভাবে চলে যেত। সাতানেলা ঠিক করলো সে আর নাচবে না কোন অপেরায়। নাচের কাজ ছেড়ে দিল।

অবশেষে একদিন কাউণ্টের কানেও উঠল কথাটা। কাউণ্ট খোঁজ খবর নিয়ে, সবকিছু জেনে আশ্চর্য হয়ে গেল। বুঝল, ওদের ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা নিছক ছেলেমানুষি নয়। ওদের ভালবাসার মধ্যে আছে এক আশ্চর্য ঘনিষ্ঠতা আর মহত্ত্ব যাকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

রোজালি প্রুডেণ্ট

Rosalie Prudent

আদালতে রোজালি প্রুডেণ্টের মামলাটা উঠতেই সকলে ঘাবড়ে গেল। তার ব্যাপারটা এমনই রহস্যময় যে বিচারক, জুরি ও সরকার পক্ষের উকিল সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কেউ কোন কূলকিনারা খুঁজে পেল না।

ব্যাপারটা উপর থেকে দেখে খুব সহজ ব'লে মনে হয়। বার্মারত পরিবারে কাজ করত রোজালি। সহসা এক রাত্রিতে সে মালিকপক্ষের অজ্ঞাতসারে এক অবৈধ সন্তান প্রসব করে সেই সন্তানকে হত্যা করে এবং বাগানে ফেলে দিয়ে আসে।

নীতিবাগীশ বার্মারত এই ঘটনায় ভীষণ রেগে যান। তিনি বলে দেন যে রোজালির এই জঘন্য অপরাধের দ্বারা তাদের বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট করেছে সে, এবং রোজালিকে কোনমতেই ক্ষমা করবেন না।

অনেক বড় বাড়ির ঝি এই ধরনের অপরাধ করে থাকে। সেদিক দিয়ে রোজালি অমার্জনীয় এমনকিছু একটা অপরাধ করেনি। কিন্তু রোজালি যে ঘরটায় থাকত সে ঘরটা খানাতল্লাশি করে দেখা গেছে সে তার ছেলের জন্য অনেক কষ্ট করে কতকগুলো কাঁথা তৈরি করে রেখেছিল। আরও একটা ব্যাপার জানা গেল। সে প্রায় তিন মাস ধরে রাত্রিতে ঘুমোয়নি। কতকগুলো পোশাক রোজ কেটেছে আর সেগুলো সারারাত ধরে সেলাই করেছে। যে মুদীর দোকান থেকে সে বাতি কিনেছে দিনের পর দিন সে মুদীও একথা স্বীকার করেছে। আরও একটা কথা জানা গেল, শহরের ধাত্রী রোজালির জন্য পসিতে একটা চাকরিও ঠিক করে রেখেছে। রোজালিই তাকে এই চাকরির কথা বলে কারণ সে জানত এই ঘটনার জন্য বার্মারত পরিবারে তার স্থান হবে না।

আদালতে রোজালিকে হাজির করা হয়েছে এবং বার্মারত পরিবারের কর্তা ও গিন্নী দু'জনে সশরীরে সাক্ষী দিতে এসেছেন। তাঁরা শুধু রোজালিকে মুখে গালাগালি করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁদের ইচ্ছা হচ্ছিল রোজালিকে যেন বিনা বিচারে গিলোটিনে চড়িয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়।

আসামী রোজালিকে সুন্দরী বলা যায়। লম্বা সুঠাম চেহারা। নর্ম্যাণ্ডির নিম্ন অঞ্চলে তার বাড়ি। দাসীবৃত্তির কাজে সবদিক দিয়ে সে পটু। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে শুধু অবিরাম কাঁদছিল। কোন কথার জবাব দেয়নি। বিচারক জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে রোজালি সত্যিই তার সন্তানকে হত্যা করেছে। তবে সে যা করেছে তা ক্ষণিকের এক উন্মাদনা ও তীব্র হতাশার বশবর্তী হয়েই করেছে। তবে রোজালি যাতে নিজের মুখে দোষ স্বীকার করে তার জন্য বিচারক আর একবার চেষ্টা করলেন। আসল কথাটা এখনো জানা যায়নি। আর সে কথা রোজালিই একমাত্র বলতে পারে। রোজালি নিজের হাতে তার সন্তানকে হত্যা করলেও আগে হতে এ হত্যা সে করতে চায়নি। কারণ সাক্ষ্য প্রমাণ হতে জানা গেছে সে তার সন্তানের জন্য কাঁথা ও পোশাক তৈরী করেছে রাত জেগে।

বিচারক অনেক বুঝিয়ে রোজালিকে বললেন, জুরিরা তাকে দয়া করে তার অপরাধ মার্জনা করতে চান। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না যদি সে সব কথা পরিষ্কার করে বলে।

বিচারকের কণ্ঠে করুণার পরিচয় পেয়ে মুখ খুলল রোজালি। বিচারক তাকে প্রথমে প্রশ্ন করলেন, বল কে তোমার সন্তানের জনক ?

রোজালি তার মালিকদের পানে তাকিয়ে বলল, জোশেফ বার্মারত। মালিকের ভাইপো।

বার্মারত ও তাঁর স্ত্রী শুনে চীৎকার করে আপত্তি জানিয়ে বললেন, মিথ্যা কথা।

বিচারক তাঁদের থামিয়ে রোজালিকে সাহস দিয়ে বললেন, তুমি সব কথা বলে যাও। বল, কেমন করে এ ঘটনা ঘটে।

অভয় পেয়ে রোজালি বলল, আমি যে বাড়িতে কাজ করতাম সেখানে একবার জোশেফ বার্মারত গ্রীষ্মের ছুটি কাটাবার জন্য বেড়াতে আসে।

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, মঁসিয়ে জোশেফ বার্মারত কি করেন? তাঁর পেশা কি?

রোজালি উত্তর করল, সৈন্য বিভাগে চাকরি করে। একজন আণ্ডার অফিসার। গত গ্রীষ্মে ছ'মাস সে এই বাড়িতে ছিল। আমার কোনদিকে কোন দৃষ্টি না থাকলেও সে আমার দিকে প্রায়ই তাকাত। তারপর একদিন প্রেম নিবেদন করে আমাকে। সে বলে আমি দেখতে খুব সুন্দরী। আমাকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। তাকে দেখেও অবশ্য আমার পছন্দ হয়েছিল। আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে, আমার প্রতি কেউ সহানুভূতি জানাতে পারে সেকথা আমি জীবনে ভাবতেই পারতাম না। মনের কথা বলার কোন লোক ছিল না আমার—মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধুবান্ধব কেউ না। তাই জোশেফের কথা আমার খুব ভাল লাগত। সে একদিন আমাকে নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যায় সন্ধের সময়। আমার কোমরটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। আমি এসব চাইনি। আমি চীৎকার করে প্রবল আপত্তি জানাতে চাইছিলাম। কিন্তু পারলাম না। মৃদুমন্দ বাতাস আমার সারা গায়ে যেন হাত বুলিয়ে আমাকে চুপ করিয়ে দিল। নীল আকাশ থেকে নদীর জলের উপর ঝরেপড়া চাঁদের স্বচ্ছ আলো যেন আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিল। কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমি জোশেফকে বাধা দিতে পারলাম না। সে আমার দেহটাকে ইচ্ছামত উপভোগ করতে লাগল। এই ভাবে তিন সপ্তাহ চলল। তারপর সে একদিন চলে গেল। তার সঙ্গে আমি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারতাম। কিন্তু সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না। প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। মাস দুই পরে বুঝতে পারলাম আমি মা হতে চলেছি।

এই বলে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রোজালি। বিচারক আবার তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, বলে যাও।

রোজালি আবার বলতে শুরু করল, একথা জানতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে শহরের ধাত্রী মাদাম বোদিনকে বললাম। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলাম। ছেলেটার জন্য রাত জেগে পোশাক বানালাম। আর একটা চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। কারণ আমি জানতাম ওরা আমায় বরখাস্ত করবে। আমার সন্তানকে পালন করার জন্য, কিছু কিছু করে সঞ্চয় করতে লাগলাম। একদিন রাত্রিবেলায় শোবার সময় প্রসব বেদনা উঠল আমার। আমি মেঝের উপর শুয়ে পড়লাম। মাদাম বোদিনের কথামত সবকিছু

করলাম। দু'-তিন ঘণ্টা যন্ত্রণার পর আমার সন্তান ভূমিষ্ট হতেই তাকে বিছানার উপর শুইয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর আবার একবার প্রসব বেদনা উঠল আমার এবং আর একটি সন্তান ভূমিষ্ট হলো। প্রথম সন্তানকে দেখে আমি খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর দুশ্চিন্তায় কালো আর কুটিল হয়ে উঠল আমার মনটা। আমার সব মাতৃস্নেহ উবে গেল কোথায়। মাসে যার মাত্র কুড়ি ফ্রাঁ মাইনে সে দুটি সন্তানকে কেমন করে মানুষ করতে পারে। কেমন করে পালন করতে পারে বলুন? আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল। চোখে সব অন্ধকার দেখতে লাগলাম আমি। একে কলঙ্কের বোঝা, তার উপর অর্থ চিন্তা। আমার কি হলো, আমি ছেলে দুটির উপর বালিশ চাপা দিয়ে তার উপর বসে পড়লাম, শুয়ে পড়লাম, গড়াগড়ি দিতে লাগলাম আর কাঁদতে লাগলাম। এমনি করে কোনদিকে রাতটা কেটে গেল। ভোরের আলো উঁকি মারতে লাগল রুদ্ধ জানালায়। আমি উঠে বালিশ সরিয়ে দেখলাম তারা নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। আমি একটা কোদাল নিয়ে তাদের মৃতদেহ দুটি বাগানের একধারে যতটা সম্ভব খাল করে দু'জনকে দু'জায়গায় কবর দিলাম।

রোজালি যখন তার কথা বলছিল তখন জুরিরা বার-বার চোখের জল মুছছিল। মেয়েরা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। বিচারক রোজালিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর একটি ছেলেকে বাগানের কোনখানে কবর দাও?

রোজালি বলল, কুয়োতলার কাছাকাছি।

এই বলে রোজালি খুব জোরে কেঁদে উঠল। বিচারক তাকে মুক্তি দিলেন।

কয়েকটি সুযুক্তি

Good reasons

সোলে ভিলা, জুলাই ৩০, ১৮৮৩

প্রিয় লুসি,

কোন নূতনত্ব নেই। সেই একঘেঁয়ে জীবন যাপন করছি। এখন বর্ষাঋতু চলছে। প্রায়ই একটানা বৃষ্টি নামে আর জানালা দিয়ে মুখ বার করে তাই দেখি। এছাড়া আর কি করব বল। তবে হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে আর একটা কাজ করি। আমরা আজ কয়েকজন মিলে এক-একটা মিলনান্তক নাটক অভিনয় করি।

কিন্তু নাটকগুলো ভাল নয়। এই নাটকগুলো যারা লিখেছেন তাঁদের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তাঁরা যে সব কথা লিখে আমাদের দেখিয়েছেন তাতে চমক আছে, কিন্তু সে সব কথার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের কোন মিল নেই। আমাদের প্রচলিত জীবনযাত্রার উপর তাঁরা কটাক্ষ করুন, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু

দুঃখের কথা আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁদের সম্যক জ্ঞান নেই। আর এই জ্ঞান অর্জন না করেই তার উপর নাটক লিখতে গেছেন।

আমরা বর্তমানে সত্যিই একটা নাটক মঞ্চস্থ করছি। কিন্তু আমাদের দলে মাত্র দু'জন মেয়ে থাকায় আমার স্বামীকে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে মেয়ের অভিনয় করতে হচ্ছে। আর আমার স্বামী দাড়ি গোঁফ কামানোর জন্য এমনভাবে তার মুখটা বদলে গেছে যে তাকে চেনা যায় না। রাতে শুয়ে মনে হয় সে যেন অন্য মানুষ।

আসল কথা আমার মতে কোন পুরুষের দাড়ি না থাক ক্ষতি নেই, কিন্তু সে যেন কখনো তার গোঁফ না কামায়। আমার সেই তেলপারা মুখখানা দেখে মনে হয়েছিল ঠিক যেন কোন পাদ্রী।

তোকে সাবধান করে দিচ্ছি লুসি, তুই যেন কখনো এমন কোন লোককে চুম্বন করবি না যার কোন মোচ নেই। মোচ না-থাকা পুরুষের চুম্বনে কোন আস্বাদ নেই। কোন রোমাঞ্চ নেই। কোন পুরুষ আমাদের মুখে অথবা ঘাড়ে চুম্বন করার সময় তার মোচের চুলগুলো যখন আমাদের মুখে অথবা ঘাড়ের উপর লাগে তখন এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতির শিহরণ খেলে যায় আমাদের শিরায়-শিরায়। এক-এক সময় ওই মোচের চুলগুলোতে বিরক্ত লাগতে পারে কিন্তু তবু ভাল লাগে।

দাড়ি গোঁফ কামানো কোন পুরুষের মুখ দেখলে আমার বৃক্ষহীন অরণ্যের কথা মনে পড়ে। মনে কর, কোন ক্লান্ত মানুষ অরণ্যসমাচ্ছন্ন কোন পার্বত্য ঝর্ণায় জলপান করতে গিয়ে দেখল কোথাও কোন গাছ নেই যার তলায় বসে বিশ্রাম করতে পারে। তেমনি পুরুষের মুখে যদি দাড়ি গোঁফ না থাকে তাহলে সেই ন্যাড়া মুখে মেয়েরা আশ্রয় পাবে কোথায় ?

তবে আমি দাড়ি রাখার কোন যুক্তি দেখিনা। কারণ মুখে একমুখ দাড়ি থাকলে মানুষের মুখের আসল গঠন বা আকৃতিটাই বোঝা যায় না ঠিকমত। আবেগ অনুভূতির রূপান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মুখের ভাবের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যায়, হর্ষ বা বিষাদকালে যে সব রেখা ফুটে ওঠে মুখের উপর দাড়ি থাকলে তা দেখা যায় না। কিন্তু মোচটা থাকলে এ ধরনের কোন অসুবিধা হয় না। বরং মোচই পুরুষের পুরুষত্বের লক্ষণ। নারীর মুখ থেকে পুরুষের মুখের পার্থক্য নির্দেশ করে এই মোচ।

তাছাড়া সব পুরুষের মোচ আবার এক নয়। আর এই মোচের তারতম্য অনুসারে পুরুষের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বোঝা যায়। যেমন ধর, একধরনের মোচ আছে যা স্বল্প বাঁকা আর লীলায়িত। যারা এই ধরনের মোচ রাখে সেই সব পুরুষরা বড় মেয়েন্যাওটা হয়। তারা বড় নারীলোলুপ হয়। আবার যাদের মোচটা স্বল্প ও সূঁচলো এবং সোজা তারা দুষ্ট প্রকৃতির হয়। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ আর মদ-মাংস ভালবাসে। আবার যাদের মোচগুলি বেশ বড়-বড় এবং ঝুলে পড়ে তারা খুব ভালমানুষ হয়। তাদের চরিত্র ভাল হয়।

যাই হোক, এই মোচ আমাদের জাতীয় লক্ষণ। আমাদের দেশের পূর্বপুরুষরা মোচ রাখতেন। একবার এক যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের কতকগুলি মৃতদেহের মাঝখান থেকে মোচ দেখে ফরাসীদের চিনতে পারা গিয়েছিল। যাই হোক, বিদায়।

গিলেমত পাহাড়

Guillemot rock

গিলেমত শিকারের ঋতু শুরু হয়েছে।

এপ্রিল আর মে মাসে প্যারিস থেকে স্নানার্থীরা দল বেঁধে আসার আগেই ইত্রেতাতের সমুদ্রতীরে হঠাৎ কয়েকজন বৃদ্ধকে দেখা যাবে। তাঁদের পায়ে হিলতোলা জুতো আর গায়ে শিকার করার আটসাঁট পোশাক। হোটেল হ্যাভিলিতে তাঁরা চার-পাঁচ দিন কাটান; তারপরে উধাও হয়ে যান। তিন সপ্তাহ পরে আবার তাঁরা ফিরে আসেন; কয়েক সেকেণ্ড পরে চিরকালের জন্যে চলে যান।

আবার পরের বসন্তে তাঁরা ফিরে আসেন। তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর আগে অনেক শিকারী এখানে আসতেন; এখন আর তাঁদের দেখা যায় না। বর্তমানে এই ক'জনই কেবল সেই ঐতিহ্যের শেষ প্রতিনিধি।

গিলেমত একজাতীয় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বিদেশী পাখি। অদ্ভুত এদের অভ্যাস। সারা বছরই এরা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের আশেপাশে আর সান্ত পেইরী এবং মিকিলন দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। ডিম পাড়ার সময় আটলাণ্টিক পেরিয়ে প্রতিটি বছর তারা একই জায়গায় ফিরে আসে, ডিম পাড়ে, ডিমে তা দেয়। এই বিশেষ জায়গাটির নাম গিলেমত পাহাড়। আর কোথাও তারা বসে না। এইখানেই শিকারীরা তাদের গুলি ক'রে মারে। তবু বছর-বছর ঝাঁকে-ঝাঁকে এইখানেই তারা আসে। তারপরে বাচ্চারা উড়তে শিখলেই তারা উড়ে যায়। আবার ফিরে আসে এক বছর পরে। এদের সংখ্যা বেশী নয়—বড় জোর শ'খানেক। কবে যে এদের বৃদ্ধ প্রপিতামহেরা এখানে প্রথমে এসেছিল তা আমরা জানিনা। তাদের উত্তরাধিকারীরা এখনও সেই স্মৃতি স্মরণ করেই এখানে আসছে।

আর প্রতিটি বসন্তে তাদের সঙ্গে আসছে সেই সব শিকারীর দল। অঞ্চলের দেহাতী মানুষেরা তাদের চেনে তাদের সেই যৌবন থেকে। এখন সেই সব শিকারীরা বৃদ্ধ হয়েছে। তবু এই তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর ধরে তারা তাদের এই বাৎসরিক মিলন অটুট রেখেছে। কোন কিছুর লোভেই এই সুযোগটি তারা হারাতে রাজি নয়।

কয়েক বছর আগে এক এপ্রিল সন্ধ্যার কথা বলছি। তিনজন গিলেমত শিকারী আগেই হাজির হয়েছেন। একজন তখনও আসেননি। তাঁর নাম মঁসিয়ে দ্য আরনেলস। তিনি এঁদের কাউকেই কোন সংবাদ দেননি। অথচ অন্য শিকারীদের মত তিনি মারা-ও যাননি। মারা গেলে, এঁরা সে-সংবাদ পেতেন। অনাগতের জন্যে অপেক্ষা ক'রে-ক'রে ক্লান্ত হয়ে তিনজন খেতে বসলেন। এঁদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় হোটেলের চত্বরে গাড়ী ঢোকার শব্দ হল। তারই সামান্য একটু পরে শেষ শিকারীটি এসে পৌঁছলেন।

হাত ঘষতে-ঘষতে নবাগত মহানন্দে খেতে বসলেন ; বেশ পেট ভরেই খেলেন। তাঁর গায়ে ফ্রককোট দেখে তাঁর একজন সঙ্গী অবাক হয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন—ওঃ জামা পালটানোর সময় পাইনি আমি।

খুব ভোরে ওঠার তাগিদেই তাঁরা ঘুমোতে চলে গেলেন। এই প্রভাত অভিযানের মত আরামের জিনিস আর নেই। তখনও প্রভাতের কোন চিহ্ন থাকে না ; নক্ষত্ররা একটু নিষ্প্রভ হয়ে যায় এইমাত্র। সমুদ্রের ঢেউয়ে পাথরগুলো নড়তে থাকে। বেশ মোটা জামা গায়ে থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ের ভেতরে শিকারীদের কাঁপুনি ধরে যায়।

দুটি নৌকোর ওপরে তাঁরা চড়েন। নাবিকরা নৌকো দুটিকে জোরে ঠেলে দেয়। সেই ঠেলায় নৌকো দুটি ক্যানভাস ছেঁড়ার মত শব্দ করতে-করতে কুঁচো পাথরের ওপর দিয়ে হড়কাতে-হড়কাতে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। ঢেউয়ের ওপরে নাচতে-নাচতে নৌকো দুটি এগোতে থাকে ; পালগুলি বাতাসে কাঁপতে থাকে। তারপরে আধো-আলো-অন্ধকারে নদীর মোহনার দিকে এগিয়ে যায়। ধীরে-ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে—চোখের ওপরে দেওয়ালের মত ভেসে ওঠে শ্বেতবর্ণের দীর্ঘ তটরেখা। ধীরে-ধীরে এগোতে-এগোতে হঠাৎ তাঁরা একটি তটরেখার কাছে এসে পড়েন। এখানে অজস্র সামুদ্রিক চিলেরা ঝাঁকে-ঝাঁকে বসে থাকে। তারই পেছনে গিলেমত পাহাড়।

পাহাড় নয়, পাহাড়ের মাথার ওপরে ছোট একটা ঢিপির মত। তারই ভেতর থেকে পাখিদের মাথাগুলি উঁচু হ'য়ে নৌকো দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। চুপচাপ বসে থাকে তারা—অপেক্ষা করে। উড়ে যেতে সাহস করে না। ঘাড়টাকে উঁচিয়ে প্যাট প্যাট ক'রে তাকিয়ে থাকে তারা। দেখলে মনে হবে অজস্র বোতল বসে রয়েছে। ছোট-ছোট পা দিয়ে যখন তারা হেঁটে যায় তখন মনে হয় তারা গড়িয়ে যাচ্ছে। উড়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তাদের গতিসঞ্চার হয় না। মাঝে-মাঝে টুকরো পাথরের মত তারা ধপাস ক'রে পড়ে যায়। তাদের এই দুর্বলতার কথা তারা জানে; এর মধ্যে যে বিপদ রয়েছে তাও হয়ত তাদের অজানা নেই। এহেন অবস্থায় উড়ে যাবে কি না তা-ও তারা ঠিক করতে পারে না।

কিন্তু জেলেরা হইচই জুড়ে দেয় ; নৌকোর গলুইয়ের ওপরে কাঠ ঠুকে-ঠুকে শব্দ করে। পাখিগুলো ভয় পেয়ে একটা-একটা ক'রে উড়ে ঢেউয়ের ওপরে ভাসতে থাকে। তারপরে জলের ওপরে পাখার ঝাপটা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তীব্র বেগে উড়ে যায়। ঠিক এই সময়েই শিকারীরা তাদের লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ছোঁড়ে।

এক ঘণ্টা ধরে এইভাবে গুলি খেয়ে তারা উড়ে যেতে বাধ্য হয়। কখনও-কখনও মাদী পাখিরা ডিমে তা দিতেই থাকে। এত গোলমালেও তারা উড়ে যেতে রাজি হয় না। ফলে তারাই গুলির পর গুলি খায়। তাদের প্রাণহীন দেহগুলি রক্তে লাল হ'য়ে ওঠে। ডিমের ওপরে তা দিতে-দিতেই তারা মারা যায়।

প্রথম দিনেই মঁসিয়ে দ্য আরনেলস তাঁর স্বাভাবিক উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে শিকার করলেন। কিন্তু বেলা প্রায় দশটার সময় শিকার ক'রে ফিরে আসার পথে তাঁকে কেমন যেন চিন্তাগ্রস্ত দেখা গেল। ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে কেমন যেন অস্বাভাবিক। হোটেলে ফিরে আসার পর কালো পোশাক-পরা চাকর-শ্রেণীর একটি লোক এসে তাঁকে ফিসফিস ক'রে কি যেন বলল। একটু ভাবলেন তিনি ; কিছুটা ইতস্তত করলেন, তারপরে বললেন—না। আগামী কাল।

পরের দিন আবার শিকারে গেলেন ; কিন্তু মাঝে-মাঝে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে লাগলেন তিনি। এমন কি যে সব পাখি তাঁর বন্দুকের ডগায় পড়ল তাদেরও মারতে পারলেন না তিনি। তিনি প্রেমে পড়েছেন, না কোন দুশ্চিন্তা করছেন—বন্ধুরা ঠাট্টার ছলে তাঁকে এই প্রশ্ন করলে তিনি স্বীকার করলেন—হ্যাঁ ; একটা দুশ্চিন্তাই তাঁকে বিমনা ক'রে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন তিনি—আসল কথাটা হচ্ছে, আমাকে এখান থেকেই সোজা চলে যেতে হবে। ভারি বিশ্রী লাগছে। তবুও উপায় নেই।

কী বললে! তুমি চলে যাবে? কেন?

ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী। আমার আর অপেক্ষা করা চলবে না।

লাঞ্চ শেষ হওয়ার পরে আবার সেই চাকরটি এসে হাজির হ্ল। মঁসিয়ে দ্য আরনেলস গাড়ী ঠিক করার নির্দেশ দিলেন তাকে। লোকটি চলে যাবে, এমন সময় তাঁর তিনটি শিকারী বন্ধু তাকে থেকে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। একজন বললেন—তুমি দু'দিন এখানে রয়েছ। সুতরাং তোমার ব্যাপারটা মোটেই জরুরী নয়।

মঁসিয়ে দ্য আরনেলসকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। আনন্দ আর কর্তব্যের মধ্যে কোন্‌টা আগে দেখে মনে হ্ল তিনি তা ঠিক করতে পারছেন না।

কিছুক্ষণ রীতিমত চিন্তার পরে তিনি ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—ব্যাপারটা—মানে—ব্যাপারটা কী জান? আমি একা আসিনি। আমার জামাইও রয়েছে আমার সঙ্গে।

সবাই প্রায় একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলেন—জামাই? কোথায়?

অস্বস্তি আর লজ্জা পেয়ে আরনেলস বললেন—কেন? তোমরা জান না? মানে—মানে—সে রয়েছে ঘোড়ার আস্তাবলে—মানে, তার মৃতদেহটা।

কেউ আর কথা বলতে পারল না।

আরও অস্বস্তির সঙ্গে আরনেলস বললেন—তাকে হারানো আমার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। তার মৃতদেহটা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম। মাঝপথে ঘুরে গেলাম। ভাবলাম—আমাদের এই বাৎসরিক মিলনে যোগ দিয়ে যাই একটু। এখন বুঝতে পারছ তো কেন আমি তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাই?

তখন আর সকলের চেয়ে দুঃসাহসী এক বন্ধু বললেন—কিন্তু—কিন্তু—জামাই তো মারা গিয়েছে—আর একটা দিন সে অপেক্ষা করতে পারে। তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

এই কথা শুনে বাকি দু'জনেরও সৎসাহস ফিরে এল—যথার্থ, যথার্থ।

যেন বিরাট একটা বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল এইরকম একটি দৃষ্টি দিয়ে মঁসিয়ে দ্য আরনেলস ওঁদের দিকে তাকালেন; কিন্তু তবু কিছুটা অস্বস্তির সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমরা সত্যিই তাই মনে কর?

অবশ্য, অবশ্য। জামাই বাবাজীর এখন যা অবস্থা তাতে আরো দুই-একদিনে তার কিছু ক্ষতি হবে না।

পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শ্বশুর মশাই বললেন—এ ক্ষেত্রে আমি বরং পরশু যাব।

—অনুবাদ: সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

স্বীকারোক্তি

The confession

মার্গারেট দ্য খেরলেস মৃত্যুশয্যায়। বয়স তাঁর মাত্র ছাপ্পান্ন; দেখলে মনে হবে কম ক'রে পঁচাত্তর। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে তাঁর। মাঝে-মাঝে তাঁর শরীরটা ভীষণভাবে কাঁপছে। চেহারা বিবর্ণ। চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন। মনে হ'ল, কিছু দেখে যেন তিনি ভয় পেয়েছেন।

তাঁর বড় বোনের নাম সুজেন। এঁর বয়স বোনের চেয়ে ছ'বছর বেশী। তিনি বোনের বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদছিলেন। মরণোন্মুখ মহিলার বিছানার পাশে ছোট একটি টেবিল টেনে আনা হয়েছে। তার ওপরে বসানো রয়েছে দুটি জ্বলন্ত বাতি। পাদরীর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা।

মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জানানোব জন্যে তৈরি হয়েছে ঘরটি। দেখলেই মানুষের মনে একটা আতংকের সৃষ্টি হয়। টেবিলের ওপরে নানা রঙের ওষুধের বোতল, ঘরের এককোণে জড় করা পোশাক-পরিচ্ছদ, মনে হচ্ছে কেউ যেন তাদের লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়েছে। সংসারে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। চেয়ারগুলি বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হবে, প্রাণের তাগিদে তারা খেয়ালখুশিমত ছুটে পালিয়ে গিয়েছে। কারণ, বিজয়ী মৃত্যু সেই ঘরেই নিজেকে লুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করছে।

এই দুটি বোনের ইতিহাস বড় করুণ। সেই কাহিনী শুনে কেউ চোখের জল না ফেলে পারেনি।

সুজেনই বড় বোন। তিনি যৌবনে একটি যুবকের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। যুবকটিও তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তাঁদের বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই যুবক হেনরী হঠাৎ মারা গেলেন।

যুবতী সুজেনের অবস্থা তখন কী মর্মান্তিক! তিনি বললেন জীবনে তিনি আর বিয়ে করবেন না। সে-প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছিলেন। চিরজীবনই তিনি বিধবা হ'য়ে রয়েছেন।

মার্গারেটের বয়স তখন মাত্র বার। সে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলল—দিদি, জীবনে তুমি অসুখী হও তা আমি চাইনা। সারাজীবন ধরে তুমি কাঁদ তাও আমি চাইনি। কোনদিনই আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। চিরদিন আমি তোমার কাছে থাকব। বিয়ে আমি কোনদিনই করব না।

সুজেন তাকে চুমু খেয়েছিলেন। এই শিশুর প্রীতি তাঁকে স্পর্শ করেছিল; কিন্তু তিনি তার কথা বিশ্বাস করতে পারেননি।

কিন্তু ছোট বোনটি তার কথা রেখেছিল। বাবা মায়ের অনুরোধ, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রেমিকদের অনুরোধ বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি তাকে। সারাজীবন ধরেই তারা একসঙ্গে ছিল; কেউ তাদের সরাতে পারেনি। কিন্তু মার্গারেটও যেন বেশ মুষড়ে পড়েছিল; হয়ত, তার এই আত্মবলিদানের জন্যে। তাড়াতাড়ি সে বুড়িয়ে যেতে লাগল; চুল পাকলো তিরিশ বছর বয়সেই। প্রায়ই সে অসুস্থ হ'য়ে পড়ত। মনে হোত, অদৃশ্য কোন জীবানু তার জীবনীশক্তিটাকে যেন কুরে-কুরে খেয়ে ফেলছে।

এখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। দুটি বোনের মধ্যে তিনিই প্রথম মারা যাচ্ছেন।

গত চব্বিশটি ঘণ্টা তিনি কোন কথা বলেননি। ভোরের বেলা তিনি কেবল বললেন—এবার পাদরীকে সংবাদ দাও; আমার সময় শেষ হ'য়ে আসছে।

পরে সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। দরজা খুলে গেল। "কয়ার বয়" এল; তার পেছনে এলেন বৃদ্ধ পাদরী। পাদরীকে দেখেই মার্গারেট শরীরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে হঠাৎ বিছানার ওপরে উঠে বসলেন; ঠোঁট খুলে বিড় বিড় ক'রে কী যেন বলার চেষ্টা করলেন; তারপরে বিছানায় পড়ে নখ ছিঁড়তে লাগলেন; মনে হ'ল হাতের মধ্যে তিনি যেন গর্ত খুঁড়তে চান।

পাদরী তাঁর কাছে গিয়ে কপালে চুমু খেয়ে মিষ্টি ক'রে বললেন—বৎসে, ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন; সাহস সঞ্চয় কর। সময় হ'য়ে এল।

বিছানার ওপরে সারা শরীরটা কেঁপে উঠল মার্গারেটের। তিনি বিড়বিড় ক'রে বললেন—বোস বোন; শোন।

বলতে শুরু করলেন মার্গারেট। গলা থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল। সেই স্বর কর্কশ এবং দুর্বল।

বোন, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তটিকে আমি যে কত ভয় করতাম তা যদি তুমি জানতে।

সুজেন কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—তোমাকে ক্ষমা করার কী রয়েছে বোন? আমাকে তুমি সবই দিয়েছ, তোমার জীবনটা পর্যন্ত। তুমি একটি এনজেল।

মার্গারেট তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—থাম, থাম। আমাকে বলতে দাও, বাঁধা দিয়ো না। হেনরীকে মনে আছে তোমার...আমাকে বুঝতে গেলে আমি যা বলছি তা তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার মনে রয়েছে, আমার বয়স তখন বার—মাত্র বার। কিন্তু আমি একেবারে বয়ে গিয়েছিলাম। আমার মাথায় যা আসত তা-ই আমি করতাম। শোন, প্রথম যেদিন হেনরী আমাদের বাড়িতে এল সেদিন তার পায়ে

ছিল উঁচু চকচকে জুতো। সে আমাদের ঘরের সামনে নেমে তার পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলল—বাবার কাছে একটা সংবাদ নিয়ে সে এসেছে। ...কথা বলো না...শোন।...তাকে দেখে আমি একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। কী সুন্দরই না সে দেখতে। ড্রয়িংরুমের একটা কোণে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি তার কথা শুনছিলাম। শিশুরা কী অদ্ভুত...আর ভয়ঙ্কর...হ্যাঁ, হ্যাঁ...আমি তারই স্বপ্ন দেখেছি...

তারপরে সে অনেকবারই আমাদের বাড়িতে এসেছে। সব সময়ই আমি তাকে চোখ দিয়ে দেখেছি, আত্মা দিয়ে দেখেছি। বয়সের তুলনায় আমার স্বাস্থ্যটা ভালই ছিল ; আর সেই বয়সে যতটা ছলাকলা জানা উচিত বলে মনে হোত, আমার ছলাকলা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী। সে আমার সারা চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ; আমি নিজের মনে বার-বার তার নাম উচ্চারণ ক'রে বলতাম—আমার হেনরী...আমার হেনরী।

তারপর শুনলাম সে তোমাকে বিয়ে করবে। সংবাদটা শুনে আমার কী কষ্টই যে হ'য়েছিল বোন সে আর তোমাকে কী বলব। তিনটি রাত আমি ঘুমোইনি। একটানা কেঁদেছিলাম। ময়দা, মাখন, আর দুধ দিয়ে তুমি তাকে প্রতিদিন কেক তৈরি করে খাওয়াতে। সে কেক খেতে খুব ভালবাসত। সে সব কথা মনে রয়েছে তোমার? তুমি কেমন করে কেক তৈরি করতে তা আমিই কেবল জানতাম। এক-একটা কেক মুখে পুরে এক গ্লাস মদ গলায় ঢেলে দিয়ে সে বলত—আঃ কী চমৎকার!

আমার হিংসে হোত...তোমাদের বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগল। মাত্র পনেরটা দিন বাকি। মনে হোল, আমি পাগল হয়ে যাব। নিজের মনে-মনেই আমি বলতাম—সুজেনকে ও কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না। না, না— এ বিয়ে কিছুতেই আমি হ'তে দেব না। বড় হ'য়ে আমিই ওকে বিয়ে করব। আর কোন পুরুষকেই আমি এত ভালবাসতে পারব না। তারপরে বিয়ের ঠিক দিনদশেক আগে একদিন চাঁদের আলোতে তোমরা বাগানে বেড়াতে বেরোলে...আর...আর সেই বড় পাইন গাছটার নীচে সে তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল...অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রইল তোমাকে। সে কথা নিশ্চয় তুমি ভুলে যাওনি। সেই বোধহয় তার প্রথম চুম্বন...নিশ্চয়...ড্রয়িংরুমে ফিরে আসার পরে তাই সেদিন তোমাকে অত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সেদিন আমি তোমাদের দেখেছিলাম। রাগে আমি একেবারে উন্মাদ হ'য়ে গেলাম। সম্ভব হ'লে সেদিন তোমাদের দুজনকে আমি মেরেই ফেলতাম।—হঠাৎ যেন আমি তাকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম।

তখন আমি কী করলাম জান ?—শোন তবে।—রাস্তার কুকুর মারার জন্যে আমাদের মালি একরকমের ছোট-ছোট গুলি তৈরি করত। পাথর আর কাঁচ গুঁড়িয়ে ছোট-ছোট মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে সেগুলি দিয়ে ছোট-ছোট গুলি তৈরি করত।

মায়ের ঘর থেকে আমি একটা ওষুধের বোতল বার ক'রে হাতুড়ি দিয়ে তাকে গুঁড়োলাম। মিহি চকচকে পাউডার তৈরি হ'য়ে গেল তা থেকে। পরের দিন তুমি কেক তৈরি করার পরেই আমি লুকিয়ে সেই কেকগুলোর পেট ছুরি দিয়ে কেটে

তাদের ভেতরে পাউডার ঢুকিয়ে দিলাম। সে তিনটে কেক খেয়েছিল ; আমি খেয়েছিলাম একটা। বাকি ছ'টা কেক আমি পুকুরে ফেলে দিয়েছিলাম। দুটো হাঁস তিনদিন পরে মারা গিয়েছিল। কথা বলো না—শোন।—কেবলমাত্র আমিই মারা যাইনি। কিন্তু চিরকালই আমি অসুস্থ—সে মারা গেল—শোন—ওটা কিছু নয়—কিন্তু আসল যন্ত্রণাটা আমার শুরু হ'ল পরে—শোন—সারাটা জীবন ধরেই আমি যন্ত্রণা ভোগ করছি—নিজের মনেই আমি বললাম—আমার দিদিকে কোনদিনই আমি ছেড়ে থাকব না ; এবং মৃত্যুর সময় তাকে আমি সব কথা বলে যাব। সেই সময় আজ এসেছে ; তাই সেই কথা আজ আমাকে বলতে হবে।—সেই কথা বলা এখন আমার শেষ হ'ল। কিছু বলো না—কিছু বলো না—কী জ্বালা...কী যন্ত্রণা...উঃ। আমার বড় ভয় হচ্ছে। যদি এখনই তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে যায়? মারা যাওয়ার পরে তার সঙ্গে যদি আমার দেখা হয়? তুমি কি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাও? তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা? ভয় হচ্ছে...কিন্তু দেখা আমার হবেই...আমি মারা যাচ্ছি...শুধু তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ফাদার, ওকে বলো আমাকে ক্ষমা করতে...ওর ক্ষমা না পেয়ে আমি মরতে পারব না...

চুপ করে গেলেন মার্গারেট। হাঁপাতে লাগলেন শুয়ে-শুয়ে ; নখ নিয়ে ছিঁড়তে লাগলেন বিছানার চাদর।

হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন সুজেন। নড়লেন না, চড়লেন না। যে মানুষটিকে তিনি কতই না ভালবাসতে পারতেন সেই মানুষটির কথাই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। কী সুখেই না তাঁরা জীবন কাটাতে পারতেন। সেই অতীত যুগের ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতির পটে আবার তিনি যেন তাঁকে দেখতে পেলেন। হায়রে, সেই চুম্বন...সেই তাঁর প্রথম আর শেষ চুম্বন। সেই স্মৃতিটিই তিনি আত্মার মধ্যে ধরে রেখেছেন...এ জীবনে তিনি আর কিছু পাননি।

হঠাৎ পাদরী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—ম্যাদময়জেল সুজেন, আপনার বোন মারা যাচ্ছেন।

অশ্রুতে ভেজা চোখ দুটি তুলে সুজেন মার্গারেটকে জোরে-জোরে চুম্বন করে বললেন—আমি তোমাকে ক্ষমা করছি...ক্ষমা করছি...বোন...

একটি সামান্য নাটক

A humble drama

বাইরে বেড়াতে গিয়ে চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলে বেশ ভাল লাগে। দেশ থেকে পাঁচশ' লীগ দূরে বেড়াতে গেলে সেখানে যদি কোন প্যারিসবাসীর সঙ্গে, অথবা কোন কলেজের বন্ধু বা দেশোয়ালী লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে

কার না আনন্দ হয়? কোন স্টেজ-কোচে বিনিদ্র অবস্থায় একটি অপরিচিতা নারীর পাশে সারা রাত কাটিয়ে দিতে কার না ভাল লাগে? তারপরে সকাল হয়। সারা রাত্রি ধরে স্টেজ-কোচের খটখটানির শব্দে মাথার ভেতরটা অবশ হয়ে থাকে; জানালার ধারে অবিশ্রান্ত গোলমালে মাথাটা কেমন যেন ঝিম-ঝিম করে ওঠে। সেই অবস্থায় আপনার সঙ্গিনীটি ধীরে-ধীরে চোখ মেলে আপনার দিকে একবার মাত্র উদাসীনতার সঙ্গে তাকিয়ে নিজের বেশ-ভূষাটা একটুআধটু পরিচ্ছন্ন ক'রে নেন—স্কার্ট, জামা, চুল, মুখ একটু এদিক একটু ওদিক ক'রে নিতান্ত অপরিচিতার মত জানালা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকায়। একটি অজ্ঞাতপরিচয় রমণীর পাশে আপনি যে একটা রাত কাটিয়েছেন একথা ভাবতেই আপনার কেমন ভাল লাগে, তাই না?

আপনি ভাবতে শুরু করেন—ভদ্রমহিলাটি কে, কোথা থেকে এসেছেন, যাবেন কোথায়। ইচ্ছে ক'রে হয়ত নয়, তবু হঠাৎ অকারণ পুলকে আপনার মনটা নেচে ওঠে; অনেক কিছু রোমান্টিক কল্পনা করতে শুরু করেন আপনি। নিজেকে মনে হয় সুখী...সুখটা কিসের তা হয়ত আপনি জানেন না, জানার কথাও নয়। মনে হয় মানুষের স্বপ্ন আর বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্যে এইরকম অপরিচিতা একটি সঙ্গিনীরই প্রয়োজন বেশী।

এবং তারপরেই সেই ভদ্রমহিলা যখন গন্তব্যস্থলে বিনা বিদায়ে গাড়ী থেকে নেমে যান—তখনও আপনার খারাপ লাগে; সেই বিদায়দৃশ্যও করুণ, দুঃখজনক। উঁকি দিয়ে আপনি দেখেন—রাস্তার ওপরে একটি ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন; সঙ্গে তাঁর দুটি শিশু, এবং দুটি চাকর। তিনি তাঁকে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেন, গাড়ী থেকে নামার সময় ভদ্রমহিলাকে আদর করে চুমু খান। ভদ্রমহিলা বাচ্চা দুটির প্রসারিত হাত ধরেন; তারপরে দ্বিতীয়বার পেছনে না ফিরে তাদের নিয়ে এগিয়ে যান।

বিদায়! সব শেষ। জীবনে আর হয়ত কোনদিনই তাঁর সঙ্গে আপনার আর দেখা হবে না। যে-রমণীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে আপনি একটি রাত কাটিয়েছিলেন, যাঁকে আপনি আগে কোনদিনই দেখেননি, যাঁর সঙ্গে একটা কথাও আপনি বলেননি। তিনি চলে গেলেও আপনার দুঃখ হবে! মনে-মনে বলবেন—বিদায়!

আমার ভ্রাম্যমান জীবন এই ধরনের দুঃখের, আনন্দের, ভারি, হালকা অনেক স্মৃতিতে জড়িয়ে রয়েছে।

সেবার আমি অভারেন-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ফরাসী পাহাড়গুলির পাদদেশে। এই পাহাড়গুলি বেশী উঁচু নয়, ভয়ঙ্করও নয়; বেশ বন্ধু-ভাবাপন্ন ঘরোয়া পরিবেশ। সাঁসি থেকে নেমে নোতরদামের সাধুসন্তদের একটি সরাইখানায় ঢুকতে যাব এমন সময় দেখলাম একটি বৃদ্ধা একা-একা বসে খাচ্ছেন। চেহারাটা তাঁর অদ্ভুত রকমের। বয়স তাঁর সত্তরের কাছাকাছি; দীর্ঘাঙ্গিনী; অস্থিচর্মসারও বলা যায় তাঁকে। মাথার চুলগুলি সাদা; পোশাক-পরিচ্ছদের ওপরে তাঁর বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নেই। কোনরকমে পরতে হয় তাই পরা। তিনি খাচ্ছেন ওমলেট আর জল।

চোখ মুখের চেহারাটা তাঁর কেমন যেন অদ্ভুত; দৃষ্টি চঞ্চল। দেখলেই মনে হয় জীবনে তিনি সুবিচার পাননি। নিজের অজান্তেই তাঁর দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম। অবাক হয়ে ভাবলাম—ভদ্রমহিলাটি কে? এভাবে তিনি জীবন কাটাচ্ছেন কেন? কেনই বা এই পাহাড়ে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

দাম মিটিয়ে পরিচ্ছদটা ঠিক করে নিলেন তিনি। কাঁধের ওপরে অদ্ভুত ছোট একটা শাল—সেটাকে কাঁধের ওপরে গুছিয়ে নিলেন। পাহাড়ে ওঠার সময় আরোহণকারীরা যেরকম লোহার একটা ছড়ি ব্যবহার করে, কোণ থেকে সেই জাতীয় একটা ছড়ি তুলে নিলেন। মরচে-পড়া লোহার সেই ছড়িটির ওপরে দেখলাম অনেকগুলি নাম খোদাই করা রয়েছে। তারপরে ডাকহরকরার মত লম্বা-লম্বা পা ফেলে সোজা আর শক্ত হয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দরজার কাছে একজন গাইড অপেক্ষা করছিল। দু'জনে চলতে শুরু করলেন।

ঘণ্টাদুই পরে আমি পাহাড়ের ওপরে পঁভি লেকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বড় মনোরম জায়গাটি, চারপাশে পাহাড়ের ক্রমবিস্তার; অসংখ্য গাছ-গাছালি আর ঝোপে বোঝাই। লেকের জল একেবারে কাকচক্ষু, সেই পরিষ্কার জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাটি একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লেকের অনেক নীচে মৃত ভূমিকম্পের যে পাহাড়টি রয়েছে মনে হ'ল সেইদিকে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি। মনে হল, তাঁর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তারপরেই আবার সেই আগের মত লম্বা-লম্বা পা ফেলে তিনি এগিয়ে গেলেন।

সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

পরের দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি একটা সময়ে আমি মুরল দুর্গে হাজির হলাম, দুর্গটি প্রাচীন, কিন্তু ধ্বংসপ্রায়, বিরাট পাহাড়ী উপত্যকার ঠিক কেন্দ্রভূমিতে দুর্গটি তার বিরাট গম্বুজ তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অনেক ধ্বংসপ্রায় পৌরাণিক প্রাসাদের চেয়ে এই দুর্গটি অনেক বিরাট, অনেক ভারিক্কী, অনেকটা বিষণ্ন, এর ঘরগুলির ইঁট-কাঠ ঝরে পড়েছে, সিঁড়িগুলি নড়বড় করছে, আগাছায় ভরে গিয়েছে চারপাশ। অতীত কোন বিরাট একটা জানোয়ারের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না একে।

আমি একাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, একটা ভাঙা দেওয়ালের কাছে অশরীরীর মত সেই বৃদ্ধাটি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চিনতে পারলাম তাঁকে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। একহাতে তাঁর একটি রুমাল।

ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই, লজ্জা পেয়ে তিনি আমাকে ডেকে বললেন—হ্যাঁ; মঁসিয়ে, আমি কাঁদছিলাম...সব সময়ে মানুষ তো কাঁদে না...

কী উত্তর দেব বুঝতে না পেরে আমি বিভ্রান্ত হয়ে বললাম—আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম; আমার বিশ্বাস, নিঃসন্দেহে আপনি কোন দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ-ও বলতে পারেন, আবার না-ও বলতে পারেন; বর্তমানে আমি পথ-হারানো একটি কুকুরের মত।

এই কথা বলেই রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন।

তাঁর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলাম। তিনি তখনই তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে শুরু করলেন; মনে হ'ল, এই দুঃখের বোঝা আর তিনি একা বইতে পারছেন না।

হায় মঁসিয়ে; আপনি যদি জানতেন কী দুঃখে আমার দিন কাটছে...জীবনে একদিন সুখ ছিল আমার...শহর থেকে দূরে নিজের বাড়িতেই থাকতাম আমি; আমার নিজের বাড়ি। সেখানে আর ফিরে যাওয়ার শক্তি আমার নেই। আর কোনদিনই সেখানে আমি ফিরে যাব না—বড় নিষ্ঠুর সেই বাড়ি।

আমার একটি ছেলে রয়েছে...এই সেই—সেই ছেলে। ছেলেরা জানে না—ক'দিনই বা মানুষ বাঁচে? এখন যদি তার সঙ্গে আমার দেখা হয় তাহলে হয়ত আমি তাকে আর চিনতে পারব না। তাকে আমি কত ভালবাসতাম—কত। তার জন্মের আগেই পেটের মধ্যে যখন সে নড়ে বেড়াত তখনই তাকে আমি আদর করতাম, মিষ্টি সুরে ডাকতাম। তার জন্যে কত রাতই যে আমি ঘুমোইনি তা যদি আপনি জানতেন। তার জন্যে আমি পাগল হ'য়ে যেতাম। তার বয়স যখন আট তখন তার বাবা তাকে একটা বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। সেই শেষ। আর সে আমার থাকলো না—পর হ'য়ে গেল। হায় ভগবান! প্রতিটি রবিবার সে আসত। ভাল বলতে কেবল ওইটুকুই।

তারপর, একদিন সে প্যারিসে একটি স্কুলে পড়তে গেল। সে বাড়ি আসত বছরে মাত্র চারবার। প্রতিবারই তার দিকে আমি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতাম। তার চেহারায় কত পরিবর্তন হচ্ছে—আমার চোখের বাইরে সে বেড়ে উঠছে। তার ভালবাসা, তার যৌবন, তার দৈনন্দিন জীবনের আশা, আশঙ্কা, ভয়, বিভ্রান্তি, সাধ, আহ্লাদ—সবকিছু থেকে বঞ্চিত হলাম আমি। আমার অজান্তেই সে একটি ক্ষুদে মানুষ হ'য়ে গেল।

ভেবে দেখুন—বছরে মাত্র চারবার। তার হাসি, ঠাট্টা, আনন্দের আর আমি অংশীদার নই, প্রতিবারই তার মনে, দেহে, চলা-ফেরায় কত পরিবর্তন হচ্ছে। অথচ, আমি তা দেখতে পাচ্ছিনা। শিশুদের পরিবর্তন কত তাড়াতাড়িই না হয়। আর যখন তুমি তা দেখার সুযোগ না পাও তখনই তোমার খারাপ লাগে, তোমার মন বিষাদে ছেয়ে যায়।

একবার সে এল। তার দাড়ি গজিয়েছে। আমি তো অবাক! তাকে চুমু খেতেও সঙ্কোচ লাগল আমার। একি আমারই সেই নধর, তুলতুলে শিশুটি? না, এ অন্য মানুষ। 'মা' বলে ডাকার একটা রীতি রয়েছে বলেই হয়ত সে আমাকে 'মা' বলে ডাকে।

আমার স্বামী মারা গেলেন। তারপরে দেহ রাখলেন আমার বাবা আর মা, দুটি বোনকে হারালাম আমি। মৃত্যু যখন কারও বাড়িতে ঢোকে তখন তাড়াতাড়ি আর যাতে তাকে সেই বাড়িতে ঢুকতে না হয় ওই জন্যে যতগুলিকে পারে সে তাদের নিয়ে চলে যায়। শোক করার জন্যে সামান্য দু'-একজনকেই সে রেখে যায়।

আমি একা। আমার বিরাট শিশুটি অবশ্য তার কর্তব্য করেছিল। আমি ভাবতাম তারই কাছে থেকে আমিও একদিন মারা যাব। তার কাছে আমি গেলাম; রইলামও কিছুদিন। সে তখন যুবক; সে আমাকে পাকে-প্রকারে বুঝিয়ে দিল আমি থাকলে তার অসুবিধে হবে। আমি ফিরে এলাম। আর তার সঙ্গে আমার বিশেষ দেখা হয় নি।

সে বিয়ে করল। খুব আনন্দ হ'ল আমার। আবার আমরা সবাই একসঙ্গে থাকবো। আমার পৌত্র হ'বে। তাদের সঙ্গে ঘর বাঁধব আবার। সে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটি আমাকে পছন্দ করল না। সম্ভবত সে মনে করেছিল ছেলেকে আমি খুব ভালবাসি।

আবার আমি ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আবার আমি একা।

তারপরে সে ইংলণ্ডে চলে গেল। সে তার শ্বশুরদের সঙ্গে রয়েছে। বুঝতে পারছেন মঁসিয়ে? তারাই আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল। তারাই চুরি করে নিয়ে গেল আমার ছেলেকে। সে আমাকে প্রতি মাসেই চিঠি দেয় এখন। প্রথম প্রথম সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। এখন আর আসে না।

চার বছর তাকে আমি দেখিনি; তার মুখে বলিরেখা বেরিয়েছিল, চুল গিয়েছিল পেকে। এও কি সম্ভব! আমার সেই ক্ষুদে শিশুটা অচিরেই বুড়ো হয়ে মারা যাবে? অনেকদিন আগেকার সেই ফুটফুটে শিশুটা। নিশ্চয় আর তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি এখন করি কী? সারা বছরই আমি এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াই—একা একা। আমি এখন ঘরহারা কুকুরের মত। আপনি চলে যান, মঁসিয়ে। আমার কাহিনী বলতে আমার কষ্ট হয়েছে।

পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় দেখলাম বৃদ্ধাটি একটা ভাঙা দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে; পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন—তাকিয়ে রয়েছেন দূর লেক চ্যাম্বনের দিকে।

দেখলাম তাঁর পোশাকের প্রান্ত আর কাঁধের আলোয়ান বাতাসে পতাকার মত উড়ছে।

—অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

প্রস্বর

The accent

অতীত ঐশ্বর্যের একরাশ ব্যর্থ স্মৃতির বোঝা বহন করে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো আমলের বিরাট বাড়িটা। অনেক মৃত্যু অভাব আর অবহেলার সকরুণ স্বাক্ষর স্পষ্ট ফুটে আছে তার প্রতিটি ভগ্ন পাঁজরে। চারদিকে আঙ্গুর আর পাইন গাছের ছায়ায় ঘেরা বাড়িটার ছাদ থেকে সমুদ্র দেখা যায়।

বাইরের মত বাড়িটার ভিতরেও সমান দৈন্যদশা। অসংখ্য সিল্ক ও ভেলভেটের পোশাকের টুকরো আর ভাঙা চেয়ার টেবিল ছড়ানো পড়ে আছে বড়-বড় ঘরগুলোয়। প্রতিটি দেওয়ালে মরচেধরা অসংখ্য পেরেক আজও পোঁতা আছে। বেশ বোঝা যায় একদিন ঐ সব দেওয়ালে এই বংশের পূর্বপুরুষদের বড়-বড় ছবি টাঙানো থাকত। যে ছবিগুলো অভাবে ও দেনার দায়ে সব বিক্রি হয়ে গেছে একে একে। বসার ঘরটাও অগোছালো। ঘরখানার কোণে-কোণে যতসব ভাঙা আসবাবপত্র, ছবি আর একটা ভাঙা পিয়ানো জমা হয়ে আছে।

এই ভগ্ন প্রাচীন প্রাসাদোপম বাড়িটিতেই বাস করেন একদা সুন্দরী মাদাম দ্য মরিলাক। তাঁকে দেখে আজ মনে হয় অনেক হাত ঘোরার পর একটি সুন্দর পুতুল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি নির্জন ঘরের কোণে। আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে এই বাড়িটিতেই বছরের বেশীরভাগ সময় বাস করেন মাদাম মরিলাক।

মঁসিয়ে মরিলাক যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁরা বছরের বেশীরভাগ সময় প্যারিসের বাড়িতেই থাকতেন। অমিত বিলাসব্যসন আর ঐশ্বর্যের মধ্যে দিয়ে কাটত তাঁদের সুখী জীবন। কিন্তু তাঁদের অমিতব্যয়িতার ফলে মঁসিয়ে মরিলাকের জীবদ্দশাতেই তাঁদের অনেক সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যায়। শেষ হয়ে যায় তাঁদের সঞ্চিত অর্থ। পাওনাদারদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন মরিলাক।

মঁসিয়ে মরিলাকের মৃত্যুর পর অবশিষ্ট সম্পত্তির সবটুকুই চলে যেত। কোন সদাশয় উকিলের সাহায্যে অনেক চেষ্টায় দেশের বাড়িটা আর সারা বছর কোন রকমে চলার মত সামান্য কিছু সম্পত্তি বাঁচাতে সমর্থ হন মাদাম মঁসিয়ে মরিলাক।

প্রতি বছর যখন বসন্ত আসত, গাছে-গাছে যখন ফুল ফুটত আর কলি গজাত, আর সেই ফুটন্ত ফুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস ছুটে বেড়াত দিকে-দিকে তখন মাদাম মরিলাক মেয়েকে নিয়ে ছুটতেন প্যারিসে। প্রতি বছর এই সময় কিছু খরচ করতেন। ভাবতেন এবার নিশ্চয় কোন ধনী যুবক প্রেমে পড়ে যাবে তাঁর মেয়ের। পাণিপ্রার্থী হবে তার এমন কি তাঁর নিজেরও হয়ত কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। কারণ তাঁর এখনো সে বয়স যায়নি এবং প্যারিসের ধনী অকৃতদার বা বিপত্নীকের অভাব নেই।

এই সময় প্যারিসে গিয়ে মাসখানেক থেকে সাধ্যাতীত বিলাসবহুল জীবন যাপন করার জন্যে সারা বছর ধরে তৈরি হতেন মাদাম মরিলাক। প্যারিসের অভিজাত সমাজের লোকেদের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করবে তার জন্য মেয়েকে তৈরি করতেন তিনি। একটি বিষয়ে বিশেষ করে যত্ন নিতেন। তিনি মেয়েকে তাদের গ্রামের বাড়ির ঝি চাকরদের সঙ্গে কথা বলতে দিতেন না। কারণ তাঁর ধারণা ছিল গ্রাম্য চাষী লোকদের সঙ্গে কথা বললে তাঁর মেয়ের প্যারিসের অভিজাতসমাজসুলভ উচ্চারণভঙ্গি নষ্ট হয়ে যাবে। তার উচ্চারণভঙ্গিতে গ্রাম্যতাদোষ এসে যাবে। এজন্য মেয়েকে সব সময় চোখে-চোখে রাখতেন তিনি। একমাত্র তাঁর সঙ্গে ছাড়া বাড়ির ঝি, চাকর বা বাগানের মালী, কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে পারত না তাঁর মেয়ে।

অন্যবারকার মত সেবারও বসন্তে প্যারিসে প্রথমে আমেউন অঞ্চলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ও পরে ক্রভিলের সমুদ্রতীরে একপক্ষকাল করে কাটালেন মাদাম মরিলাক। পোশাক আশাকে ও ফ্যাসনের জৌলুস দেখাতে গিয়ে অনেক খরচপত্র করলেন। কিন্তু এবারও কোন ফল হলো না। কোন পাণিপ্রার্থী খুঁজে পেলেন না মেয়ের জন্য।

তিনি তাঁর কন্যা ফেবিয়েনকে নিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। একা-একা এই বিরাট গ্রাম্য বাড়িটাতে বন্দী থাকতে ভাল লাগত না ফেবিয়েনের। একা ভেবে ভেবে তার চোখের চারদিকে একটা কালো বৃত্তাকার দাগ ফুটে উঠেছিল। তার গালদুটোর কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

কোনএক রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মাদাম মরিলাকের। পাশের ঘরেই ফেবিয়েন থাকত। কি মনে হতে মেয়ের ঘরে গিয়ে মাদাম মরিলাক দেখলেন ফেবিয়েন ঘরে নেই। তখন পাগলের মত ফেবিয়েনকে ডাকতে-ডাকতে বাড়ি ছেড়ে বাগানে চলে গেলেন। অন্ধকারে হাতড়াতে-হাতড়াতে একাই এগিয়ে চললেন।

ফুটন্ত ফুলের গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছিল যেন বাগানের বাতাস। মাদাম মরিলাকের কম্পিত কণ্ঠস্বরটাকে যেন বেশীদূর বয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না সে বাতাস। সহসা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মাদাম মরিলাক। তাঁর সামনে একটা গাছের ছায়ায় তাঁর বাগানের মালীর গলাটাকে জড়িয়ে ধরে তাকে প্রেম নিবেদন করছিল ফেবিয়েন। সাধারণ এক গ্রাম্য নারীর উচ্চারণভঙ্গী ছিল তার কণ্ঠে।

পরে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় পাগল হয়ে গেছেন মাদাম মরিলাক, আর ফেবিয়েন সেই মালীকেই বিয়ে করেছে।

খৃস্টোৎসবের সন্ধ্যা

Christmas Eve

খৃস্টোৎসবের সন্ধ্যায় নৈশভোজন? না না, কোনমতেই আমি যাব না সেখানে।

কথাটা এমনভাবে বলল হেনরি তেমপ্লিয়ের যাতে মনে হলো কেউ তাকে এক ভয়ঙ্কর অপরাধের কথা বলেছে। তাই তার কথাটা শুনে আর যারা উপস্থিত ছিল তারা হেসে বলল, তুমি এমনভাবে রেগে যাচ্ছ কেন?

হেনরি বলল, কারণ এই ধরনের এক নৈশভোজের সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে যাতে আমি দারুণ ভয় পেয়ে যাই। নিষ্ফল আনন্দের সেই রাত্রিটি ভয়ে কালো ও কুটিল হয়ে ওঠে আমার কাছে অস্বাভাবিকভাবে।

অন্য সকলে তখন একবাক্যে দাবি করল, তাহলে সব কথা বলতে হবে তোমায়।

হেনরি বলল, ঠিক আছে, যদি শুনতে চাও ত বলি।

তোমাদের হয়ত মনে আছে বছর দুই আগে খৃস্টোৎসবের দিন কিরকম শীত পড়ে। যাদের উপযুক্ত শীতবস্ত্র নেই তাদের পথে মরে যাবার উপক্রম। গোটা সেন নদীর জল বরফ হয়ে জমে গিয়েছিল। শুধু সেন নদী নয়, সারা পৃথিবীটাই মনে হচ্ছিল জমে যাবে।

সেদিন অনেক জায়গায় আমার নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু সন্ধের সময় আমার হাতে প্রচুর কাজ থাকায় আমি কোথাও যাইনি। আমি কিছু খেয়ে নিয়ে আমার ঘরের টেবিলে বসেই কাজ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আশপাশের বাড়িগুলো থেকে এত হৈ হুল্লোড় আর চীৎকারের শব্দ আসছিল যাতে আমার পক্ষে একমনে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা আমি উঠে পড়লাম। আমার রাঁধুনিকে ডেকে বললাম, দু'জনের মত নৈশভোজনের খাবার দাও। আমি একবার বাইরে যাচ্ছি। একজনকে নিয়ে আসছি। কিছুটা আশ্চর্য হয়ে আমার রাঁধুনি তাই করল।

কিন্তু আমি জানি না কাকে নিয়ে আসব, কে আমার সঙ্গে খাবে। পথে বেরিয়ে ভাবতে লাগলাম। সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত প্যারিসের পথের ধারে প্রতীক্ষমানা অনেক গরীব মেয়ে পাওয়া যায়, যারা রাত্রির মত ভাল খাওয়া আর শোয়ার জায়গা পেলে চলে আসবে। এই ধরনের সুযোগ খোঁজে তারা। আমার আবার মোটা-মোটা চেহারার মেয়েদের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। তাই পথের দু'ধারে আমি মোটা চেহারার ও দেখতে ভাল একটি মেয়ের খোঁজ করতে লাগলাম। অবশেষে একটি মেয়েকে দেখে চোখে লাগল আমার। মেয়েটির গায়ে পেশাক ছিল। তাকে বেশ মোটা আর তার বুকটাকে স্ফীত মনে হচ্ছিল। আমি তাকে ঘরে নিয়ে এলাম।

সে আমার সঙ্গে বসে খেল। তারপর পোশাক খুলে চলে গেল আমার বিছানায়। কিন্তু আমি বিছানায় শুতে যাবার আগেই তার একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

এর আগে খাবার সময় আনমনা হয়ে সে কি ভাবছিল। আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় কিছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তখন তার কাছে গিয়ে দেখি যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে বিছানার উপর। বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে হঠাৎ বলল, তার সন্তান হবে। প্রসববেদনা উঠেছে তার।

আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলাম। আমার চীৎকার শুনে দু'-চারজন প্রতিবেশীও এল। আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। কারণ এ ধরনের লজ্জাজনক ব্যাপার সাধারণতঃ ঘটে না। তাছাড়া সকলেই জানে আমি অবিবাহিত।

একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল মেয়েটি। প্রসবকালে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এজন্য দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকতে হলো তাকে। তার সন্তানটিকে মাসিক পঞ্চাশ ফ্রাঁ বৃত্তি দেবার প্রতিশ্রুতিতে এক গ্রাম্য চাষী পরিবারে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রসবের পরেও মেয়েটি দেড় মাস রয়ে গেল আমার বাড়িতে। সে আমাকে ভালবেসে ফেলল। যেতে চাইছিল না। কিন্তু প্রসবের পরে সে রোগা হয়ে গেল। দেড় মাসের পরেও তার চেহারার পরিবর্তন না হওয়ায় আমি তাকে একদিন বাড়ি থেকে বার করে দিলাম। কিন্তু আজও সে আমার জন্য পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে এখানে সেখানে। আমাকে দেখতে পেলেই ছুটে এসে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে। ছাড়তে চায় না। তার জ্বালায় আমি পাগল হয়ে যাব।

এই জন্যই আমি খৃস্টোৎসবের সন্ধ্যাটা আর বাড়ির বাইরে পালন করি না। সেদিনের সমস্ত ঘটনার স্মৃতি আমি কখনও ভুলব না।

মৃতদেহের কাছে পাওয়া চিঠি

Letter found on a corpse

তুমি হয়ত ভাববে মাদাম আমি তোমাকে উপহাস করছি। কারণ একটি মানুষ জীবনে কখনও ভালবাসার আঘাত পায়নি—একথা তুমি বিশ্বাস করতেই পারবে না। কিন্তু বিশ্বাস করো সত্যিই আমি কখনো কাউকে ভালবাসিনি।

কিন্তু এর কারণ কি ? আমি তা বলতে পারবো না। অন্তরের যে সব বিস্ময়ীগন্ধা মাদকতাকে তোমরা ভালবাসা বল আমি তার প্রভাব জীবনে কখনো অনুভব করিনি। কোন একটি নারী দুটি মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবের ও স্বপ্নের উন্মাদনার সৃষ্টি করে আমি তার মধ্যে কখনো পড়িনি। কোন একটি নারীকে পাবার চিন্তায় বিভোর হয়ে অথবা তাকে পেয়ে আমার একথা কখনো মনে হয়নি আমি হাতে স্বর্গ পেয়েছি, মনে হয়নি সে নারী জগতের সকল সুন্দর বস্তুর থেকেও সুন্দর। তার গুরুত্ব সারা জগতের থেকে বেশী। কোন নারীর কথা ভেবে অনিদ্রা বা অতন্দ্র রাত্রি যাপন করিনি। কোন নারীর মিলনাকাঙ্খার অমিত আশায় উন্মত্ত হয়ে উঠিনি আমি, আবার তার বিচ্ছেদকালে বেদনায় কাতর হয়েও উঠিনি।

সত্যি কথা বলতে কি আমি কখনো প্রেমে পড়িনি। এর কারণটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে এর যে সব যুক্তি আমি মনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি তা এমনি সূক্ষ্ম যে তোমরা তা বুঝতে পারবে না। আমার মনে হয় আমি মেয়েদের কোন মোহে ধরা দেবার আগে খুব বেশী বিচার করি। আমার মতে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দুটো সত্তা আছে—নীতিগত ও দেহগত। আমার মনে হয় ভালবাসার ক্ষেত্রে এই দুটো সত্তার মধ্যে একটা সংগতি থাকা দরকার। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা সত্তা অন্য সত্তার উপর প্রভুত্ব করছে। দেহগত সত্তাটাই বেশী প্রভুত্ব করে।

আমরা মেয়েদের কাছ থেকে যে বুদ্ধিবৃত্তি আশা করি তা যেন তীক্ষ্ণ বা কুটিল না হয়। তার মন যেন উদার, সরল, পরিচ্ছন্ন ও সহানুভূতিশীল হয়। তার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা থাকে। তার দেহের মত মনের মধ্যেও থাকে যেন এক সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা।

কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় সুন্দরী মেয়েদের তাদের দেহসৌন্দর্যের তুলনায় অন্তরের কোন সৌন্দর্য নেই। তাদের দেহে ও মনে আকাশ পাতাল তফাৎ। কোন নারীর দেহমনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকলে আমার বড় খারাপ লাগে। অবশ্য জানি ভালবাসা মানেই একধরনের অন্ধত্ব। প্রেমিকের দোষত্রুটির কথা জেনে শুনেও তা বিচার করতে নেই। সেখানে যুক্তি-বিচারের কোন প্রশ্নই উঠবে না।

এই ধরনের অন্ধত্ব আমি কিন্তু মোটেই বরদাস্ত করতে পারব না। তাতে ভালবাসা হোক বা নাই হোক। দেহমনের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমার এমন একটা সূক্ষ্ম ও আদর্শ ধারণা আছে যা কারো সঙ্গে মেলে না। দেখবে এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের দৈহিক সৌন্দর্য ও আত্মিক সৌন্দর্য দুটোই আছে। যাদের দেহ ও মন দুটোই সুন্দর। কিন্তু তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। অর্থাৎ তারা তাদের দেহমনের সৌন্দর্য তাদের আচার আচরণের মধ্যে ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারে না। এসব বিষয়ে আমার দৃষ্টি শিকারী কুকুরের মতই তীক্ষ্ণ। আমার এসব কথা পাগলের প্রলাপ মনে করে হাসতে পার। তবু আমি নিরুপায়।

এসব সত্ত্বেও আমি একদিন কয়েকঘণ্টার জন্য একজনকে ভালবেসেছিলাম। বোকার মত পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রভাবে আমি আমার সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তখন জুন মাস। গ্রীষ্মের মনোরম এক সন্ধ্যা। একটি অতি উৎসাহী মেয়ে আমাকে বলল, আমার সঙ্গে সে নদীবক্ষে নৌকাবিহারে একটা রাত কাটাবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন দেহসংসর্গ হবে না। দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত যে প্রেম একমাত্র কবিকল্পনাতেই সম্ভব সেই কামগন্ধহীন প্রেমের এক বিশুদ্ধ নির্যাস সারারাত ধরে দু'জনে পাশাপাশি থেকে উপভোগ করে যাব আমরা।

নদীর ধারে একটি পান্থশালায় রাতের খাবার খেয়ে একটি ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকায় করে রওনা হলাম আমরা। আমি নিজে দাঁড় বাইতে লাগলাম।

প্রথমে কাজটা বোকামি বলে মনে হলেও আমার চারদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। তাছাড়া আমার সঙ্গিনী মেয়েটিকে আমার ভাল লাগছিল। নাইটিঙ্গেল পাখির ডাকে মৃদুশিহরিত বনজ্যোৎস্নাভরা একটি ছোট্ট দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল আমাদের নৌকা। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল নদীর জলে। কুচো-কুচো অসংখ্য রূপালি ঢেউ চকচক করছিল চাঁদের আলোয়। নদীর তটভূমিতে সেই সব ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ার জন্য একটানা একটা শব্দ হচ্ছিল। রাতপোকা আর ব্যাঙ ডাকছিল চন্দ্রালোকিত সেই নিশীথ রাতের নির্জন নদীবক্ষে, চারদিকের শব্দদৃশ্যের মিশ্রিত জটিল একটি প্রভাব কেমন যেন এক অজানা ভয়ের সঞ্চার করছিল আমাদের মনে।

আমার সঙ্গিনী একসময় বলল, একটা কবিতা আবৃত্তি করো। আমি তখন লুই কুইনেতের একটি কবিতা আবৃত্তি করলাম আবেগের সঙ্গে। কবিতাটির অর্থ হলো এই যে, এমন অনেক কবি আছেন যার সঙ্গে প্রেয়সী না থাকলে বা হৃদয়ে প্রেম না জাগলে প্রকৃতির শব্দদৃশ্যের মাঝে কোন মনমাতানো সৌন্দর্যের যাদু খুঁজে পায় না। কিন্তু যারা প্রকৃত কবি তারা প্রকৃতির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য খুঁজে পায়, তারা স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সব সময়।

আমার আবৃত্তি শুনে আমার সঙ্গিনী বলল, চমৎকার। সে আমার কবিতার অর্থ বুঝতে পেরেছে জেনে খুশি হলাম আমি। এমন সময় আমাদের নৌকাটা তীর ঘেঁষে যেতে-যেতে হঠাৎ একটা উইলো গাছের নুয়েপড়া ডালে আটকে গেল। ঠিক সেই সময় আমার পাশে বসা সঙ্গিনীর কোমরটা জড়িয়ে ধরে মুখটা তার ঘাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করতে উদ্যত হতেই সে বাধা দিয়ে বলল, তুমি কিন্তু বড় স্থূল। বড় অভদ্র। আমার এখন শুধু স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করছে। স্বপ্নময় জ্যোৎস্নায় অমলধবল নিশীথ রাত্রির সুখ এবং সৌন্দর্য যদি এইভাবে মাটি করে দাও তাহলে আমি কিন্তু নৌকাটা উল্টিয়ে দেব। তাছাড়া তুমি একটু আগে যে কবিতাটা আবৃত্তি করলে সেটা কি ভুলে গেলে এরই মধ্যে?

আমি চুপ করে গেলাম। আমার ভুলটা বুঝতে পারলাম। আমার সঙ্গিনী তখন বলল, একটা প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবে?

আমি বললাম, কি আগে তা শুনি।

সে বলল, আমরা পাশাপাশি দু'জনে শুয়ে থাকব। কিন্তু তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না।

আমি তার কথা মেনে নিয়ে নৌকার তলার পাটাতনে পাশাপাশি দু'জনে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। আমি চিৎ হয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে শুয়ে ছিলাম। আমাদের নৌকাটা নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছিল জলের উপর দিয়ে। শুধু আমার অঙ্কশায়িনী সঙ্গিনীকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করার একটা প্রবল দুর্দমনীয় ইচ্ছায়

আবেগ আমার দেহগত অস্তিত্বের গভীর থেকে উঠে এসে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় চেতনাকে, তবু তা করতে সাহস পেলাম না।

আমার সঙ্গিনী বলল, আমরা এখন কোথায় আছি? কোথায় যাচ্ছি? আমার মনে হচ্ছে আমি এই জগৎ ছেড়ে কোন অজানায় চলে যাচ্ছি। তুমি যদি আমায় একটু ভালবাসতে!

কিন্তু আমি তাকে কেমন করে বোঝাব যে আমি সত্যিই তখন তাকে ভালবেসেছিলাম। তার পাশে শুয়ে তার হাতে হাত দিয়ে তার সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলাম। তার প্রতি ভালবাসা ছাড়া আর কোন অনুভূতি তখন ছিল না আমার মধ্যে।

এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল। তবু নিথর নিস্পন্দভাবে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে রইলাম আমরা। আমি বেশ বুঝতে পারলাম ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দের সূক্ষ্ম অথচ বলিষ্ঠতর ও প্রবলতর একটি আবেগে আমার মধ্যে একটু আগে জেগেওঠা দেহমিলনের সেই ইচ্ছার বেগটাকে অবদমিত করে রেখেছে। মনে হলো তাই আমরা এমন শান্তভাবে শুয়ে থাকতে পারছি পাশাপাশি। মনে হলো সে আবেগ প্রকৃত ভালবাসার আবেগ। হয়ত একেই বলে ভালবাসা।

ধীরে ধীরে ঊষার আলো ফুটে উঠল পূর্বাচলে। আমাদের নৌকাটা গিয়ে ঠেকল একটা ছোট্ট দ্বীপের উপকূলভূমিতে। আমি আকাশে মুখ তুলে দেখলাম পূর্বদিগন্তে গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে আর সেই আভায় আমার সঙ্গিনীর চুল, মুখ, গাল সব গোলাপী হয়ে উঠেছে। আমার সঙ্গিনী হঠাৎ তার মুখটা তুলে চুম্বনের জন্য বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমার মনে হলো আমি যেন তাকে চুম্বন করছি না, চুম্বন করছি এমনই একটি স্বপ্ন, স্বর্গসুখ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদর্শকে যা ঐ নারীমূর্তির মধ্যে লাভ করেছে এক অমৃত রূপ। আমার সঙ্গিনী আমার মাথার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার চুলের মধ্যে একটা কাঁকড়া বিছে।

সহসা আমার মনে হলো জীবনে আর আমার কোন আশা নেই।

এইখানেই আমার কাহিনী শেষ। তোমাদের হয়ত মনে হবে এসব পাগলামি। আমার কথাগুলো পাগলের প্রলাপোক্তি। কিন্তু আমার তখন সত্যি-সত্যি মনে হয়েছিল তারপর থেকে আর কাউকে ভালবাসা অসম্ভব হয়ে উঠবে আমার পক্ষে।

(গতকাল বুগিভাল আর মার্লির মাঝখানে সেন নদীর উপর একটি নৌকায় এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার পরিচয়ের জন্য তার পকেট খুঁজে নৌকার মাঝি এই চিঠিটা পায় এবং লেখকের কাছে তা এনে দেয়)

কাঠের জুতো

Wooden shoes

গ্রামের চার্চের বৃদ্ধ যাজক যখন গ্রামবাসীদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছিলেন মঞ্চের উপর থেকে তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মাথার টুপীগুলো খোলা ছিল। চাষী মেয়েদের আপন-আপন ঝুড়িগুলো তাদের পাশে নামানো ছিল।

যাজক মঁসিয়ে লে কুরের বয়স হয়েছে। তাঁর মাথার চুল সব পেকে গেছে। ধর্মীয় উপাসনার কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি গ্রামের খবরাখবরের কথা কিছু বললেন। গ্রামের দু'জন রোগীর আরোগ্য কামনা করে তিনি একটা খবর দিলেন, মঁসিয়ে সিসেয়ার ওমঁতের বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য একটি কর্মঠ মেয়ে দরকার।

লা সেবলিয়ের গ্রামের শেষ প্রান্তে ফুরভিল যাবার পথের ধারে যাজক লে কুরের বাড়িটা। বাড়িতে স্ত্রী আর একমাত্র কন্যাসন্তান এ্যাদিলদে ছাড়া আর কেউ নেই। খাবার টেবিলে বসে স্ত্রীকে খবরটা দিয়ে বললেন কুরে, আচ্ছা মঁসিয়ে ওমঁতের বাড়িতে এ্যাদিলদেকে পাঠিয়ে দিলে হয় না? ওমঁতের টাকা আছে। তাঁর স্ত্রী নেই, পুত্রবধূ তার সেবা-যত্ন করে না। তাই একজন মেয়ের দরকার।

তাঁর স্ত্রী বললেন, আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

তাঁদের মেয়ে এ্যাদিলদের বয়স কুড়িতে পড়েছে সবেমাত্র। গোলগাল পুষ্টল চেহারা। গালগুলো লাল আপেলের মত। কিন্তু একমাত্র ঘরসংসার ছাড়া বাইরের জগতের কোন জ্ঞানই তার নেই। মালিকের মন জুগিয়ে কিভাবে কাজকর্ম করতে হয় পরের বাড়িতে সেবিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন যাজক কুরে। খাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে মঁসিয়ে ওমঁতের বাড়ি চলে গেলেন।

মঁসিয়ে ওমঁতের বয়স পঞ্চান্ন হলেও চেহারাটা বেশ বলিষ্ঠ। তার আচার আচরণের মধ্যে কোন মার্জিত ভাব না থাকলেও তার স্বভাবটা সরল প্রকৃতির। মুখে হাসিখুশি লেগেই আছে। ওমঁত যখন হাসে তখন মনে হয় ঘরের দেওয়ালগুলো কাঁপছে। কথায় কথায় বড় চীৎকার করত সে। মাঝে-মাঝে কাঠের ভারী জুতো পরে সে মাঠময় ঘুরে বেড়াত। নিজের হাতে চাষ না করলেও সবকিছু দেখাশোনা করত। তার অনেক জমি জায়গা আছে। সেই জমির আয় থেকেই তার ভালভাবে চলে যায়।

যাজকের স্ত্রী বললেন, আমার মেয়ে এ্যাদিলদেকে এনেছি। মঁসিয়ে লে কুরে বলছিলেন আপনার একটি মেয়ের দরকার।

ওমঁত বলল, ওর বয়স কত?

যাজকের স্ত্রী বললেন, মাত্র কুড়ি।

ওমঁত একবার এ্যাদিলদের চেহারাটা চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। চলবে। ও খাওয়া বাদে মাসে কুড়ি ফ্রাঁ করে পাবে। কাল থেকেই আসবে। কালই বেলা ন'টায় আমার স্যুপ তৈরি করবে।

পরদিন এ্যাদিলদে যথাসময়ে এলে ওমঁত ওকে বলে দিল, তোমার জুতোটা আমার এই কাঠের জুতোর কাছে রাখবে না। ও জুতো যেন আমার জুতোর সঙ্গে মিশে না যায়। এছাড়া আর কোন বিষয়ে কোন তফাৎ থাকবে না তোমার আমার মধ্যে।

দুপুরের খাওয়ার সময় খাবার টেবিলে বসেই ওমঁত চীৎকার করে উঠল। এ্যাদিলদে ভয়ে ছুটে এল রান্নাঘর থেকে। ওমঁত বলল, তোমার খাবার কোথায়? আমি একা একা খেতে পারি না, তোমার খাবার নিয়ে এস। একটেবিলে একসঙ্গে বসে খেতে হবে। তা না হলে জাহান্নামে যেতে পার।

মালিকের হুকুম বাধ্য হয়ে তামিল করল এ্যাদিলদে। ওমঁত খেতে-খেতে কত গল্প শোনাল। এ্যাদিলদে লজ্জায় মাথা নীচু করে খেয়ে যেতে লাগল। খাওয়ার পর ওমঁতকে কফি দিলে ওমঁত বলল, তোমাকেও খেতে হবে।

ইচ্ছা না থাকলেও কফি ও ব্র্যাণ্ডি দুইই খেতে হলো এ্যাদিলদেকে। তারপর রান্নাঘরের কাজ সেরে শুতে গেল তার ঘরে। এদিকে ওমঁত সারা বাড়িটা কাঁপিয়ে চীৎকার করে ডাকতে লাগল এ্যাদিলদেকে। এ্যাদিলদে তার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই ওমঁত বলল, আমি একা শুতে পারি না। তুমি আমার বিছানায় শীগগির চলে এস। তা না হলে তুমি জাহান্নামে যেতে পার।

যাচ্ছি মালিক। এ্যাদিলদে ব্যস্তভাবে তার মালিকের শোবার ঘরের কাছে যেতেই তাকে কোলে তুলে নিল ওমঁত। এ্যাদিলদের হালকা কাঠের জুতো দুটো তার মালিকের ভারী কাঠের জুতোর সঙ্গে মিলে গেল।

সেদিন থেকে রোজ রাতে মালিকের বিছানায় শুতে হত এ্যাদিলদেকে। ছ' মাস পর এ্যাদিলদে বাড়িতে তার বাবা মার সঙ্গে দেখা করতে যেতেই মঁসিয়ে লে কুরে তাকে দেখেই বললেন, তুমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ। তুমি মালিকের কাছে শুয়েছিলে?

এ্যাদিলদে বলল, সে মালিকের কথামত তার কাছে রোজ শোয়। কিন্তু তার ফল কি হবে না হবে জানত না।

তার মা একথা শুনে চেঁচামিচি শুরু করে দিল। এ্যাদিলদে কাঁদতে লাগল। সে যে অপরাধ করেছে সেকথা প্রথম এবার বুঝল।

যাই হোক, যাজক এসে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। পরের রবিবারই চার্চে ওমঁতের সঙ্গে এ্যাদিলদের বিয়ে হয়ে গেল।

আত্মহত্যা

Suicide

আজকাল এমন একটি দিনও যায় না যেদিন খবরের কাগজে একটা না একটা আত্মহত্যার বিবরণ প্রকাশিত না হয়। সে বিবরণে থাকে, অমুক অঞ্চলের অধিবাসীরা নিশীথ রাতে তাদের পার্শ্ববর্তী এক বাড়িতে বন্দুক বা রিভলবারের আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে ওঠে। তারপর তারা সেবাড়িতে গিয়ে যে ঘর থেকে সে শব্দ এসেছে সেই ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে একটি লোক রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে। তার হাতে তখনো রিভলবারটা ধরা রয়েছে। মৃত ব্যক্তিটির বয়স প্রায় সাতান্ন। সে সঙ্গতিসম্পন্ন, অর্থাৎ জীবনধারণোপযোগী কোন বস্তুরই অভাব ছিল না তার। সুতরাং এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কোন কারণ খুঁজে পায় না তারা।

সে কোন্ গভীর হতাশা বা জ্বলন্ত দুঃখ যা এই সব আপাতসুখী ব্যক্তিদের আত্মহননের পথে ঠেলে নিয়ে যায়? এই সব মৃত্যুর পশ্চাতে আর্থিক অনটন অথবা প্রেমগত ব্যর্থতার কারণ আছে বলে মনে ভাবেন অনেকে। কিন্তু যখন সঠিক কোন কারণ পাওয়া যায়নি আজও পর্যন্ত তখন এই সব আত্মহত্যার ঘটনা আশ্চর্যভাবে রহস্যময় বলতে হবে।

তবে এই ধরনের এক আত্মহত্যার ঘটনায় এক মৃত ব্যক্তির দ্বারা লিখিত একটি চিঠি আমাদের হাতে এসেছে। ব্যক্তিটি আত্মহত্যা করার আগে চিঠিখানি লিখে যায়। অবশ্য তার আত্মহত্যার কারণস্বরূপ সে যা লিখে গেছে সে কারণ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার আত্মহত্যার কারণস্বরূপ সে তার দুঃসহ নিঃসঙ্গতা ও মোহমুক্তি প্রভৃতি যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছে একমাত্র অতিসূক্ষ্ম সংবেদনশীল চেতনাসম্পন্ন মানুষেরাই তার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

চিঠিতে লেখা আছে, 'তখন মধ্যরাত্রি। এই চিঠি লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি নিজেকে শেষ করে ফেলব। কিন্তু কেন? তার কারণ আমি যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করব। অন্য কারো জন্য নয়, এই বিশ্লেষণের দ্বারা আমার সংকল্প আরো দৃঢ় হয়ে উঠবে বলেই আমি তা করছি। আর আমার এই সংকল্প আজ কার্যে পরিণত না হলে অকারণ বিলম্ব ঘটবে শুধু।

আমি এমন এক পরিবারে মানুষ হয়েছি যে পরিবারের মানুষরা সবকিছুতে বিশ্বাস করত। এই সহজাত বিশ্বাসপ্রবণতা আমার মনের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় সহজে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিরাট এক পরিবর্তন দেখা দেয় আমার মনে। যে সব জিনিস আগে আমার ভাল লাগত পরে সে সব জিনিস আর কোন মোহ বা আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারত না আমার কাছে। জীবনের সব সত্য এক কঠোর বাস্তবতার আকারে দেখা

দেয়। প্রেমের আসল সত্য পরিষ্কার হয়ে উঠত আমার কাছে। তার মধ্যে আর কোন কবিসুলভ কল্পনা বা আবেগানুভূতির কোন উৎস খুঁজে পেতাম না আমি।

আমরা যেন সবাই এক মোহিনী মায়ার হাতে খেলার পুতুল। সে মায়ার রঙিন ফুল বারবার শুকিয়ে যায়, আবার বারবার ফুটে ওঠে আমাদের চোখের সামনে।

প্রথম জীবনে এই মায়ার প্রভাবে আমি ধরা দিয়েছিলাম। আশার ছলনায় মুগ্ধ হতাম। পোশাক-আশাকের জৌলুসে আমার বেশ রুচি ছিল। মোট কথা, প্রচলিত অর্থে যাকে সুখ বলে সে অর্থে আমি সুখী ছিলাম। তারপর তিরিশ বছর ধরে সেই এক জীবন যাপন করে আসছি। বৈচিত্র্যহীন, অর্থহীন এক জীবন। এই দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে আমি একই ঘরে বাস করে আসছি। একই আসবাবপত্র দেখে আসছি সে ঘরে। সে ঘরে যতবার ঢুকেছি একই গন্ধ অভ্যর্থনা জানিয়েছে আমায়।

বাইরে যাদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করতাম তাদের সঙ্গও ক্রমে একঘেঁয়ে মনে হতে লাগল আমার কাছে। আমি তাদের কাছে গেলেই বলে দিতে পারতাম তারা কে কি বলবে বা করবে। ফলে মনে মনে বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে উঠতে লাগলাম আমি। নিঃসঙ্গ একাকীত্বের এক বিষাদ দিনে-দিনে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল আমার মনকে। এই একটানা নিঃসঙ্গতাটাকে কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে আমি দেশভ্রমণে বার হতাম। কিন্তু বাইরে গিয়ে আমার নিঃসঙ্গতার বেদনাটা আরো বেড়ে উঠত। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতাম।

আজ রাতে যখন এক ভয়ঙ্কর কুয়াশায় চারদিক ঢেকে যায় তখন আমার হতাশা চরমে ওঠে।

অসহ্য হয়ে ওঠে আমার সমগ্র জীবন। তার উপর আমি বদ হজমে ভুগছিলাম। ঠিকমত হজম না হলে মানুষ বোধ হয় সংশয়বাদী হয়ে ওঠে। আমিও তাই হয়ত হয়ে উঠেছিলাম।

হঠাৎ কি মনে হলো ড্রয়ার খুলে পুরনো চিঠিগুলো পড়তে লাগলাম। তিরিশ বছর ধরে আমার ঘরখানা ভাল করে গুছোইনি। কাগজপত্র চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। ইচ্ছে করেই তা গুছিয়ে রাখিনি। প্রথমেই আমার বিগত অন্তরঙ্গ বন্ধুর চিঠি পেলাম। তাকে শুধু ভালবাসতাম না। বিশ্বাস করে সব কথা বলতাম। আমার মনে হলো আমার সেই বন্ধু যেন হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এরপর আমি পেলাম আমার মার চিঠি। সিল্কের গাউন পরে আমার মা যেন আমার সামনে বেড়াচ্ছেন। যেন বলছেন, রবার্ট, সব সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

আর একটা ড্রয়ার খুলে আমার অতীত দিনের কিছু প্রেমের চিহ্ন পেলাম, যেমন কিছু শুকনো ফুল, কয়েকগাছি মেয়েদের লম্বা চুল, একটা ছেঁড়া রুমাল ইত্যাদি। যে সব মেয়েদের প্রথম যৌবনে একদিন ভালবেসেছিলাম তারা হয়ত এখন বুড়ী হয়ে গেছে। তাদের মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। প্রেমের সেই সব চিহ্নগুলোকে আমি পাগলের মত চুম্বন করলাম। করে বড় বেদনা পেলাম।

হঠাৎ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আর একটা চিঠি পেলাম। দু' লাইনে আমার নিজের হাতের লেখা। আমার বয়স তখন মাত্র সাত। আমি মার কাছে লিখেছিলাম আমার শিক্ষকের নির্দেশে।

হঠাৎ সুদূর শৈশব থেকে বার্ধক্যে চলে এলাম আমি। এই নিঃসঙ্গ বার্ধক্য-জীবনের দুঃসহ বোঝা একা-একা কেমন করে বইব? ক্রমশ যখন দেহের সব শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলব একে-একে তখন কে আমাকে দেখবে, কে আমার সেবা-যত্ন করবে?

রিভলবারটা আমার টেবিলে নামানো রয়েছে। সেটাতে আমি এখন গুলি ভরছি। কেউ যেন পুরনো দিনের চিঠি আর না পড়ে।'

অভিশপ্ত রুটি

The accursed bread

বৃদ্ধ তেইলির কোন পুত্র সন্তান নেই। তাঁর তিনটি মেয়ে—এ্যানা, রোজ আর ক্ল্যারা। বড় মেয়ে এ্যানার কথা প্রায় শোনাই যায় না সংসারে। মেজ মেয়ে রোজের বয়স আঠারো আর ছোট ক্ল্যারার বয়স পনের। তেইলি বিপত্নীক এবং মঁসিয়ে লেব্রুমঁতের বোতাম কারখানায় ফোরম্যানের কাজ করে।

বড় মেয়ে এ্যানা যেদিন বাড়ি থেকে হঠাৎ পালিয়ে যায় সেদিন রাগে আগুন হয়ে ওঠে বৃদ্ধ তেইলি। সেদিন থেকে এ্যানার নাম পর্যন্ত মুখে একবারও উচ্চারণ করেনি। কিন্তু লোকে যখন বলতে লাগল এ্যানা মঁসিয়ে দুবয়ের ঘরণী হিসাবে ভাল আছে, সুখে আছে এবং মঁসিয়ে দুবয় সরকারের বাণিজ্য সংক্রান্ত মামলায় একজন বিচারপতি—যার অর্থ ও প্রতিপত্তি দুইই আছে, তখন সে শান্ত হল।

তেইলি ভাবল সে বছরে মাত্র পাঁচ ছ' হাজার ফ্রাঁর জন্য তিরিশ বছর ধরে চাকরি করে আসছে। তবু সংসারে খাওয়াপরা ছাড়া কোন উন্নতি করতে পারেনি। কোন আসবাবপত্র কিনে ঘর সাজাতে পারেনি। কিন্তু এ্যানার সংসারে আজ কত উন্নতি, কত ঐশ্বর্য।

একদিন সকালে গাঁয়ের ধনী জোতদার তুচার্ডের ছেলে এসে তেইলির কাছে তার মেজ মেয়ে রোজের পাণিপ্রার্থী হয়ে বিয়ের প্রস্তাব করল। তেইলি দেখল এটা তার পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার, কারণ তুচার্ডরা অনেকবেশী সঙ্গতিসম্পন্ন তাদের তুলনায়।

বিয়ের দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গেল। ঠিক হলো বিয়ের পর ভোজসভা হবে মাদার লুসার রেস্তোরাঁয়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে এ্যানা বাপের বাড়ি এসে হাজির। সে এসে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বোনদেরও একে-একে জড়িয়ে ধরল। তেইলি

সানন্দে ক্ষমা করল মেয়েকে। সকলের আনন্দাশ্রুর মাঝে পুনর্মিলন ঘটল। সেই সঙ্গে এ্যানা প্রস্তাব করল রোজের বিয়ের ভোজটা হবে তার বাড়িতে। সে সব দায়িত্ব নিচ্ছে। তার বাবাকে একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না।

তেইলি ও তার মেয়েরা খুশি হলো। কিন্তু সমস্যা হলো তুচার্ডদের নিয়ে। যদি তারা কিছু মনে করে?

রোজ বলল, তুচার্ডদের রাজী করাবার ভার সে নেবে।

মঁসিয়ে দুবয়ের নাম শুনে তুচার্ডরাও রাজী হয়ে গেল।

বিয়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম শেষ হয়ে গেলে এ্যানা অতিথিদের তার বাড়িতে নিয়ে গেল। অতিথির সংখ্যা মোট বারো জন দু' পক্ষ মিলিয়ে। ড্রয়িংরুমটিকে সাজিয়ে খাবার ঘরে পরিণত করা হয়েছে। অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বিচিত্র রকমের সুস্বাদু খাবারের প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা দেখে খেতে-খেতে সম্মানসিক্ত এক অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল অতিথিরা, কারণ তারা এ ধরনের ভোজসভায় কখনো অংশগ্রহণ করেনি এর আগে।

কেমন যেন একটা থমথমে গাম্ভীর্য বিরাজ করছিল বাড়িটাতে। দামী আসবাবপত্র সাজানো ঘরে বসে দামী খাবারের প্রচুর আয়োজন দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল তারা। ফলে ইচ্ছা থাকলেও প্রাণখোলা হাসিখুশিতে ফেটে পড়তে পারছিল না কেউ।

এমন সময় ফিলিপকে তার মা একটা গান করতে বলল। ওর গানের নাকি হাভারের সবাই প্রশংসা করে। ফিলিপ গাইল 'অভিশপ্ত রুটি' গানটি। গানটি তিনটি স্তবকে বিভক্ত। ফিলিপের গলা ভাল। প্রথম স্তবক দুটি শুনে সকলের চোখে জল এল। সৎ বা অসৎভাবে সব মানুষকেই অতি কষ্টে রুটি রোজগার করতে হয়। কিন্তু তৃতীয় স্তবকটি শুনে এ্যানা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গানটির প্রথম চরণে আছে, বৎসগণ, তোমরা যেন অপমানের রুটি গ্রহণ করো না। যে সব মেয়েরা ধর্মের পথ ছেড়ে অধর্ম ও অসম্মানের পথে রুটি রোজগার করে গানটিতে তাদের ধিক্কার দেওয়া হয়েছে।

গানটি শুনে অন্তরে ব্যথা পেল এ্যানা সবচেয়ে বেশী। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভিজে গলায় কোনরকমে তার চাকরদের ডেকে মদ আনতে বলল অতিথিদের জন্য। ভৃত্যেরা যখন সোনালী কাগজে জড়ানো দামী মদের বোতলগুলো খুলছিল তখন অতিথিরা ফিলিপের গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে একসুরে গাইছিল, বৎসগণ, তোমরা যেন কখনো অপমানের রুটি গলাধঃকরণ করো না।

নদীবক্ষে

On the river

গত গ্রীষ্মকালে প্যারিস থেকে কয়েক মাইল দূরে সেন নদীর ধারে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম। সেখানে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। সেই সূত্রে এক নূতন প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। লোকটির বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এমন অদ্ভুত ধরনের লোক জীবনে আমি কখনো কোথাও দেখিনি।

লোকটি ছিল জলের পোকা। নদী আর নৌকা ছাড়া জীবনে যেন সে আর কিছুই জানত না। সব সময় মুখে লেগে ছিল তার শুধু নৌকার কথা।

কোন এক সন্ধ্যায় নদীর ধারে তার সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে তাকে তার জলজীবনের দু-একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে বললাম।

সে বলল, কত বলব? নদী সম্বন্ধে কত কথা মনে ভিড় করে আসছে। তোমরা যারা শহরের মানুষ তাদের নদী সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। কিন্তু কোন জেলেকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে। নৈশ শ্মশান বা কবরখানার মত রাত্রিতে নদীবক্ষে কত অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়, কত অদ্ভুত কথা শোনা যায়। সে সব কথা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। যে নদীর গর্ভে কত লোক কত সময় সলিলসমাধি লাভ করেছে সেই নদীও ত একদিক দিয়ে বিরাট কবরখানা। আমার কিন্তু সমুদ্রের থেকে নদীকে ভয় করে বেশী। অন্ধকার রাত্রিতে নদীর বুকে থেকে মনে হয় নদীর শেষ নেই। অন্ধকার রাত্রিতে যে নদীর জল নিঃশব্দে বয়ে যায় তা মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার জীবন নিতে পারে। সমুদ্র তবুও গর্জন করে ঢেউএর ঘর্ষণে আগুন জ্বেলে সাবধান করে দেয় মানুষকে। কবিরা বলেন সমুদ্রের তলদেশে আছে নীল অরণ্য, আছে কত গুহা। কিন্তু নদীর তলদেশটা কালো-কালো কাদায় ভরা। যাই হোক, তুমি যখন শুনতে চাও, একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা বলি।

ঘটনাটা ঘটে আজ হতে বছর দশেক আগে। আমি তখন থাকতাম মাদাম লাফঁর বাড়িতে। একদিন সন্ধের সময় আমি একা একটা বারো ফুট লম্বা নৌকা নিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ কি মনে হলো নৌকাটাকে কিছুক্ষণ শিকল দিয়ে এক জায়গায় বেঁধে নোঙর করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব ভাবলাম। তীর থেকে প্রায় পাঁচশ' গজ দূরে সেই জায়গাটায় কতকগুলো নলখাগড়া গাছ ছিল।

তখন চাঁদ উঠেছে। আবহাওয়াটা ছিল চমৎকার। চাঁদের রূপালি আলো ছড়িয়ে পড়েছিল নদীর শান্ত নিস্তরঙ্গ বুকের উপর। কোথাও কোন শব্দ নেই। এমন কি ব্যাঙ বা জলপোকার কণ্ঠগুলোও নীরব ছিল একেবারে। চারদিকের এই জমাটবাঁধা স্তব্ধতায় কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছিলাম আমি। আমি নৌকার উপর দাঁড়িয়ে

চারদিকের দৃশ্য দেখতে-দেখতে একটা পাইপ ধরিয়ে খেতে লাগলাম। কিন্তু ধূমপানে কোন আস্বাদ পেলাম না। ক্রমশঃ আমার অস্বস্তিটা বেড়ে যাচ্ছিল। আমি গুনগুন করে আপন মনে গান গাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কণ্ঠ থেকে কোন গান বের হলো না।

কোথায় একটা ব্যাঙ লাফাতেই চমকে উঠলাম আমি। কোন কিছু ভাল না লাগায় নৌকার পাটাতনের উপর শুয়ে পড়লাম চিৎ হয়ে। আকাশের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। সহসা আমার মনে হলো কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমার নৌকাটা দোলাচ্ছে। শুধু দোলাচ্ছে না, একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হলো, বিক্ষুব্ধ ঢেউএর উপর নৌকা যেমন ওঠানামা করে তেমনি আমার নৌকাটা ভীষণভাবে ওঠানামা করছে। ঠিক যেন ঝড় উঠেছে। নানা রকমের অদ্ভুত শব্দ কানে আসতে লাগল আমার। কিন্তু কিসের শব্দ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি উঠে পড়লাম। দেখলাম কোথাও কিছু নেই। আমি আর সেখানে কালক্ষেপ না করে নৌকা ছেড়ে দেবার মনস্থ করলাম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও নোঙরের শিকল খুলতে পারলাম না। মনে হলো কে যেন জোর করে সে শিকল টেনে ধরে রেখে দিয়েছে।

আমি হতাশ হয়ে বসে পড়লাম। ভাবলাম কোন জেলের ডিঙ্গি নৌকা দেখতে পেলেই ডাক দেব তাকে। কিন্তু সহসা সাদা ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল নদীর বুকটা। আমি নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না সে কুয়াশা ভেদ করে। একটা অব্যক্ত অজানিত ভয় ধীরে-ধীরে প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে আমার সমস্ত সাহসিকতাকে আচ্ছন্ন করে দিল। আমি গলা ফাটিয়ে একবার চিৎকার করলাম। কিন্তু দূরে নদীর পারে কতকগুলো কুকুর শুধু ডেকে উঠল। কোন জনমানবের শব্দ পেলাম না। একবার ভাবলাম সাঁতার দিয়ে কূলে গিয়ে উঠব। কিন্তু কুয়াশায় কিছু দেখতে না পাওয়ায় সাহস হলো না জলে নামতে।

কিছু কড়া মদ ছিল নৌকার ভিতরে। আমি তার থেকে কিছুটা মদ খেলাম আর ঝিমোতে লাগলাম। ক'ঘণ্টা এভাবে কেটে গেছে তা জানিনা। সহসা দেখলাম কুয়াশা কেটে গেছে। নদীর বুকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই কুয়াশা সরে গিয়ে নদীর দুই কূলে জমে উঠে দুটো সাদা বরফের পাহাড়ের মত শোভা পাচ্ছে। দু'দিকে দুটো সাদা বরফের বিরাট পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রূপালি জলের চকচকে একটা নদী। চাঁদের আলোয় সমগ্র দৃশ্যটা চমৎকার দেখাচ্ছিল। এখানে সেখানে ব্যাঙ ও জলপোকা ডাকছিল। আমি দেখলাম আমার সে ভয় আর নেই।

ক্রমে দেখলাম ভোর হয়ে আসছে। একটা জেলেডিঙ্গি দেখতে পেয়ে তাকে ডাক দিলাম। সব কথা বললাম। কিন্তু তাতে আমাকে দু'জনে চেষ্টা করেও শিকলটা ছাড়াতে পারলাম না। কিছু পরে আর একটা ডিঙ্গি নৌকা দেখতে পেয়ে আবার ডাক দিলাম। এবার তিনজনে অনেক চেষ্টা করে কোনরকমে নৌকাটাকে শিকলমুক্ত করলাম। যেখানে শিকলটা আটকে ছিল সেখানে গিয়ে দেখলাম একটা বুড়ীর মৃতদেহ। তার গলায় একটা ভারী পাথর। ভিজে ঢোল হয়ে উঠেছে মৃতদেহটা। তার উপর পাথরের ভার।

আমার পঁচিশ দিন

My twentyfive days

হোটেলের যে ঘরটায় আমি উঠেছিলাম তাতে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে গিয়ে সহসা টেবিলের ড্রয়ার খুলে তার মধ্যে একটা পাণ্ডুলিপি দেখতে পেলাম। আমার আগে এ ঘরে যিনি থাকতেন এ পাণ্ডুলিপি নিঃসন্দেহে তাঁর। তার উপর লেখা রয়েছে, 'আমার পঁচিশ দিন।'

যারা জীবনে কোনদিন বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়নি তাদের যদি কোন উপকারে লাগে সেই ভেবে এই লেখাটি যথাযথভাবে তুলে দিচ্ছি আমি। মূল লেখা থেকে একটি বর্ণও বাদ দিইনি। ডায়েরীতে লেখা ছিল : শাতেল গিয়ন, জুলাই ১৫। প্রথম দর্শনে জায়গাটাকে মোটেই মনোরম বলা যাবে না। তবু আমাকে এই জায়গাতেই পঁচিশটা দিন কাটাতে হবে। কারণ আমার লিভার আর পাকস্থলীর অসুখটা সারাতে হলে এছাড়া কোন উপায় নেই।

চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া গৈরিক জলে ভরা একটা পাহাড়ে নদীর পারে একটা উপত্যকার কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে শাতেল গিয়ন নামে এই স্বাস্থ্যনিবাসটা। এখানে হোটেল বলতে আছে একটা। হোটেলটা অবশ্য বেশ বড় আর অভিজাত ধরনের। এই স্বাস্থ্যনিবাসে যারা শরীর সারাতে আসে তারা সেই হোটেলটায় ওঠে। হোটেলটার চারদিকেই বাগান। গাছের ছায়ায় ঘেরা পথ। সেই হোটেলে যারা থাকে তারা সবাই রোগী, তাই সবাই চুপচাপ থাকে। এমন কি তারা যখন হোটেলটার বাইরের বাগানে বা ছায়াঘেরা পথগুলোতে ঘুরে বেড়ায় তখনো তাদের মুখগুলো এক নীরব ও নীরস গাম্ভীর্যে থমথমে হয়ে থাকে। এই জায়গাটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো একটা ছোট উষ্ণ প্রস্রবণ। লোকে বলে রোজ সেই প্রস্রবণের এক গ্লাস করে গরম জল কয়েকদিন পান করলে পেটের সব রোগ সেরে যায়।

প্রথম দিন এসে বেলা দুটোর সময় দুপুরের খাওয়ার পর জায়গাটা ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম বাঁ দিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তার মাঝে একটা মৃত আগ্নেয়গিরিও দেখলাম। তার গায়ে আভাগুলো জমাট বেঁধে আছে আজও। ডান দিকে দেখলাম একটা উন্মুক্ত প্রান্তর একটা উপত্যকার ঢালু পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে সমুদ্রের ধারে পর্যন্ত চলে গেছে। ঘুরে ফিরে উষ্ণ প্রস্রবণ হতে দু'-তিন গ্লাস গরম জল খেলাম।

রাত্রিতে হোটেলে ফিরে যাওয়ার পর ডায়েরী লিখতে বসলাম। হোটেলটা একেবারে চুপচাপ। শুধু রাত্রি নয়, দিনে রাতে সব সময়। এখানে যারা থাকে তারা সবাই

যেন রোগী, সবাই নির্জীব নিরানন্দ। রাত্রির সেই নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে মাঝে মাঝে কুকুর ডাকছিল।

১৬ই জুলাই। আমি আমার নির্ধারিত পাঁচিশ দিনের প্রথম দিন যাপন করলাম। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। সারাদিন পার্কে আর পথে-পথে ঘুরেছি। স্নান করেছি আর দু'-তিন গ্লাস জল পান করেছি।

১৭ই জুলাই। দু'জন সুন্দরী বিধবা নারীকে দেখলাম হোটেলে। তাদের স্নান খাওয়া সব লক্ষ্য করলাম। তাদের কেমন যেন রহস্যময়ী মনে হলো।

১৮ই জুলাই। কিছুই লেখার নেই।

১৯শে জুলাই। সেই বিধবা মেয়েদুটিকে আবার দেখলাম। তাদের বেশ সৌখীন মনে হলো। তাদের মধ্যে এক সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদার ভাব আছে। সেটা আমার ভাল লাগে।

২০শে জুলাই। অরণ্যসমাচ্ছন্ন এক সুন্দর উপত্যকায় অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালাম। সাঁ লুসির আশ্রম পর্যন্ত চলে গেলাম। সবুজ বনভূমির মাঝে-মাঝে এক-একটা গাঁ। পার্বত্য পথে মাঝে-মাঝে খড় বোঝাই এক-একটা গরুটানা গাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। জায়গাটা দেখতে মনোরম হলেও কেমন যেন এক স্তব্ধ বিষাদে ভরা। এই সব উপত্যকার বাতাস বড় নির্মল। তবে গরম পড়লে এবং বাতাসের গতিটা মন্থর হয়ে পড়লে তাতে গোবরের গন্ধ পাওয়া যায়।

২১শে জুলাই। এনভাল উপত্যকায় বেড়াতে গেলাম। একটা খাড়াই পাহাড়ের পাদদেশে জায়গাটা। বড়-বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। হঠাৎ নারীকণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে খোঁজ করে দেখলাম সেই সুন্দরী বিধবা দু'জন বসে গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। ইতস্ততঃ না করে আমি তাদের সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। তারাও আমাকে ভালভাবে কোনরূপ কুণ্ঠা না করে গ্রহণ করল। একসঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে হোটেলে ফিরলাম। প্যারিসের গল্প করলাম। দেখলাম আমি যাদের চিনি এমন দু'-একজনকে তারাও চেনে। বড় ভাল লাগল। বিদেশে এই ধরনের আলাপ বড়ই আনন্দদায়ক। আবার আগামীকাল তাদের সঙ্গে দেখা হবে।

২২শে জুলাই। সারা দিনটাই একরকম সেই সুন্দরী বিধবাদের সঙ্গে কাটল। তারা সত্যিই সুন্দরী। একজনের একটু বয়স হয়েছে। আর একজন যুবতী। তারা বলল তারা দু'জনেই বিধবা। আমি বললাম আগামী কাল আমরা একসঙ্গে রোয়াত বেড়াতে যাব। তারা রাজী হয়ে গেল। আগের থেকে শাতেল গিয়নকে সত্যিই বড় ভাল লাগছে।

২৩শে জুলাই। সারা দিনটা রোয়াতেই কাটল। ক্লারমঁত ফরান্দের কাছে একটা উপত্যকার তলায় জায়গাটা। অনেকগুলো হোটেল আর একটা পার্ক নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট শহরটা। কিন্তু অনেক ভাল-ভাল লোক থাকে। আমি যখন দু'দিকে দু'জন সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে পথে যাতায়াত করছিলাম তখন পথচারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল আমার দিকে। কত লোকের মধ্যে ঈর্ষা জাগছিল। এ জগতে সুন্দরী নারীই হচ্ছে

সবচেয়ে বড় সম্পদ। সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য। কোন মানুষ যখন কোন সুন্দরী নারীর হাত ধরে অসংখ্য মুগ্ধ ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে পথ চলে তখন সে যেন সবাইকে বলতে চায়, এই দেখ সুন্দরী নারীর যে মন জয় করা কত কঠিন কাজ, সে মন আমি জয় করেছি। দেখ কত বড় ঐশ্বর্যে আমি ঐশ্বর্যবান।

২৪শে জুলাই। আমি সেই সুন্দরী বিধবাদের একবারও কাছছাড়া হইনি। তাদের আমি ভালকরে বোঝার চেষ্টা করেছি। তাদের জন্য এই হোটেলে ও গোটা অঞ্চলটাকে বড় মনোরম লাগছে।

২৫শে জুলাই। একটা ঘোড়ার গাড়ীতে করে আমরা তিনজনে তাদেমত লেক দেখতে গেলাম। সেখানে একটা হোটেলে কোনরকমে খাওয়া শেষ করেই আমরা পাহাড় দিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ লেকের ধারে গিয়ে আমি বললাম, 'এই লেকের জলে স্নান করবেন।' তারা বলল, 'মন্দ হয় না। কিন্তু বাড়তি পোশাক কোথায় ?' আমি বললাম, 'এটা একেবারে জনমানবহীন জায়গা। কেউ দেখবে না।'

তারা তখন একে-একে তাদের উলঙ্গ সুঠাম দেহ নিয়ে জলে নেমে পড়ল। লেকের স্বচ্ছ জলে তাদের সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেহগুলো ডুবিয়ে তারা যখন স্নান করছিল আমি তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের পানে তাকিয়ে ছিলাম। সে দৃশ্য জীবনে ভুলতে পারব না।

২৬শে জুলাই। সেই সুন্দরী বিধবাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা দেখে হোটেলের কিছু লোক আমাদের সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। তারা আমায় ঈর্ষা করতে লাগল। তারা আমার কাজটাকে নীতিবিগর্হিত মনে করতে লাগল। কিন্তু তারা জানে না জীবনে যেকোন আমোদপ্রমোদ ও আনন্দ উপভোগের মধ্যেই কিছুটা নীতিবিচ্যুতি আছে। কোন-না-কোন কর্তব্য বা নৈতিক দায়িত্ব হতে কিছুটা বিচ্যুত না হলে পরিপূর্ণভাবে কোন আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ সম্ভব হয় না।

২৭শে জুলাই। আনন্দের কথা। আমার ওজন ৬২০ গ্রাম কমে গেছে। শাতেল গিয়নের জল ভাল বলতে হবে। আমি সুন্দরী দু'জনকে নিয়ে রিয়ন নামে একটা ছোট্ট শহরে ডিনার খেতে গেলাম।

২৮শে জুলাই। দুঃখের বিষয় দু'জন ভদ্রলোক আমার সেই দু'জন সুন্দরী সঙ্গিনীর কাছে এলেন। তাঁদের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দু'জন মহিলাই চলে গেলেন। যাবার সময় আমার নাম লিখে নিল।

২৯শে জুলাই। আবার আমি একা। সেই দুঃসহ নিঃসঙ্গতা। একা-একা এক মৃত আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর দেখতে গেলাম। বড় চমৎকার দৃশ্য।

৩০শে জুলাই। লেখার কিছুই নেই।

৩১শে জুলাই। হাতে কোন কাজ নেই। যতসব জঞ্জাল আর আবর্জনায় এখানকার ছোট-ছোট নদীগুলোর জল নোংরা ও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে আমি অভিযোগ জানালাম স্থানীয় পৌর অফিসে।

১লা আগস্ট। শ্যাটোনকে বেড়াতে গেলাম। সেটাও একটা স্বাস্থ্যনিবাস। সেখানে শুধু বাতের রোগীরা থাকে। শুধু পঙ্গু আর খোঁড়া লোকে ভরা সব পথঘাট। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

২রা আগস্ট। কোন কিছুই লেখার নেই।

৩রা আগস্ট। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি।

৪ঠা আগস্ট। লেখার কিছুই নেই। শুধু ওষুধ আর পথ্য।

৫ই আগস্ট। লেখার কিছুই নেই।

৬ই আগস্ট। শুধু একটানা হতাশা। আমার ৩২০ গ্রাম ওজন বেড়ে গেছে।

৭ই আগস্ট। শাতেল গিয়ন থেকে ছেষট্টি কিলোমিটার দূরে গাড়ীতে করে এক পার্বত্য গাঁয়ে চলে গেলাম। জায়গাটার নারীদের প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ আমি গাঁয়ের নাম করব না। গাড়ী থেকে নেমে কিছু ঘোরাঘুরির পর কাজু বাদামের গাছে ভরা এক জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক নদীর ধারে একটা পাহাড়ী গাঁয়ে গিয়ে উঠলাম। এত কাজুবাদামের গাছ আর কোথাও দেখিনি আমি। সাধারণতঃ পাহাড়ী এলাকার মেয়েদের নীতিবোধ তত দৃঢ় হয় না। সমতল ভূমির মেয়েদের থেকে তাদের মন বড় হালকা হয়। তাদের চুম্বন করা খুব একটা কঠিন কাজ নয় এবং আর একটু সাহসী হলেই যেকেউ আরো কিছু করতে পারে। এই গাঁয়ের মেয়েরাও ঠিক তাই। তবে এখানকার চার্চের যাজক এক নিয়ম করেছেন। এই গাঁয়ের কোন মেয়ে যদি ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত হয় তাহলে তাকে একটি কাজুবাদামের গাছ পুঁততে হবে। এইভাবে বেড়ে গেছে কাজুবাদামের বন। আবার রাত্রিতে এই কাজুবাদামের বনে গা-ঢাকা দিয়ে মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় পথ চিনে নাগরেরা তাদের প্রিয়া-সন্নিধানে যায়। এইভাবে কাজুবাদামের বনের সঙ্গে-সঙ্গে অপরাধও যায় বেড়ে।

৮ই আগস্ট। কিছু নেই লেখার মত।

৯ই আগস্ট। তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার শাতেল গিয়নের হোটেলে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। আগামীকালই আমি প্যারিসে চলে যাব। নীলচে কুয়াশায় ভরা লিমাগনের পাহাড় বন নদীকে বিদায় জানালাম।

এইখানেই ডায়েরী শেষ। আমি একবর্ণও বাড়িয়ে বলিনি।

হটট ও তার পুত্র

Hatat and his son

ধনী চাষীদের বাড়িগুলো যেমন হয় ঠিক সেই ধরনের বাড়িটা। বাড়িটাকে দেখলে অর্ধেক খামারবাড়ি, অর্ধেক বসতবাড়ি বলে মনে হয়। বাড়িটার সামনে আপেলগাছে

বাঁধা কতকগুলো শিকারী কুকুর শিকারের জিনিসপত্র জড়ো করতে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে চিৎকার করছিল। বড় রান্নাঘরটায় খাবার টেবিলের সামনে হুটট, তার ছেলে, মঁসিয়ে বার্মত আর মঁসিয়ে মঁদার্ণ খেতে-খেতে শিকারের কথা বলছিল।

আজ থেকে শিকারের সময় আরম্ভ হচ্ছে। খাওয়ার পরেই ওরা চারজনে শিকারে বার হবে। হুটট তার শিকারে পারদর্শিতার জন্য বড়াই করছিল এবং কিভাবে শিকার পাওয়া যাবে সেকথা গর্বের সঙ্গে তার অতিথিদের শোনাচ্ছিল। হুটট হলো নর্ম্যানবংশীয় হাড়শক্ত বলিষ্ঠ চেহারার এমন এক মানুষ যে আপেলবোঝাই একটা গাড়ী তার কাঁধে তুলে নিতে পারে। আধা চাষী আধা ভদ্রলোক হুটট তার ছেলেকে অল্প বয়সে পড়া ছাড়িয়ে চাষের কাজ শেখাতে শুরু করেছে। সে তাকে খাঁটি চাষী করে তুলতে চায়। তার ভয় ছিল তার ছেলে লেখাপড়া শিখলে চাষের কাজে তার মন বসবে না।

যুবক সেসার হুটটও তার বাবার মতই লম্বা হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার চেহারাটা তার বাবার মত বলিষ্ঠ নয়। বাবার প্রতি আনুগত্য ও ভক্তিশ্রদ্ধা তার অপরিসীম।

বেঁটে মোটাসোটা চেহারার মঁসিয়ে বার্মত জিজ্ঞাসা করলেন, খরগোস আছে ত?

হুটট উত্তর করল, প্রচুর খরগোস আছে পুয়াসভিয়েরের খালগুলোতে।

আঁটআঁট পোশাক পরা মোটা চেহারার মঁসিয়ে মঁদার্ণ বললেন, কখন রওনা হব আমরা শিকারের জন্য?

হুটট উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঐ নীচু জায়গাটা দিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করব। আমরাই প্রথমে পাখিগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

হুটটের দেখাদেখি সকলেই তাদের আপন-আপন বন্দুক পরীক্ষা করে নিল। সঙ্গে একজন চাকর আর শিকারী কুকুর নিয়ে যাত্রা শুরু করল সকলে। খামার বাড়ির সীমানা পার হয়ে খালবিলে ভরা একটা পতিত জমির উপর দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। জায়গাটার মাঝে-মাঝে ঝোপ জঙ্গলও আছে। এক জায়গায় গিয়ে থেমে পড়ল তারা। হুটট ডান দিকে দাঁড়াল, তার ছেলে সেসার হুটট বাঁ দিকে আর তাদের অতিথি দু'জন মাঝখানে দাঁড়াল।

হুটট প্রথমে একটা গুলি করল। সকলে তাকিয়ে দেখল একটা উড়ন্ত বুনো হাঁস চিৎকার করে পড়ে গেল একটা ঝোপেঘেরা খালের মধ্যে। হুটট সঙ্গে-সঙ্গে হাঁসটিকে তুলে আনার জন্য ঝোপের মধ্যে ঢুকল।

সঙ্গে-সঙ্গে আবার একটা গুলির শব্দ হলো। মঁসিয়ে বার্মত খুশি হয়ে বলল, হয়ত ঝোপের মধ্যে একটা খরগোস পেয়ে থাকবে। মঁসিয়ে মঁদার্ণ হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল, তোমার শিকার খুঁজে পেয়েছ হুটট?

কিন্তু কোন উত্তর এল না। কিছুক্ষণ কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে সেসার হুটট তাদের চাকর জোশেপকে বলল, যাও জোশেপ, ব্যাপারটা দেখে এস, আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

জোশেপ সাবধানে ঝোপ ঠেলে খালটায় নেমে গেল। নেমেই চিৎকার করে বলল, শীগ্‌গির আসুন সব, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

তারা সবাই তখন ছুটে গিয়ে দেখল হটট তার তলপেটটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। তার তলপেট থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে ঘাসের উপর। তারা এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। হটটের বন্দুকটায় গুলি ভরা ছিল। সে গুলিভরা বন্দুকটা পাশে ফেলে দিয়ে খালে নামছিল মরা হাঁসটাকে তোলার জন্য। শিকার পাবার আনন্দে গুলিভরা বন্দুকটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু সে যখন খালে নামছিল হেঁট হয়ে, ঠিক তখনই বন্দুকটা জোরে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার থেকে গুলিটা বেরিয়ে তার তলপেট বিদ্ধ করে।

হটটকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে গেল ওরা। তলপেট কাপড় দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ডাক্তার ডাকল। তারা বুঝল আঘাত গুরুতর। তাই তারা পুরোহিতকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

বাবার বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সেসার হটট। ডাক্তার তাকে সাহস দিয়ে বলল, এমন করে কেঁদোনা। এটা খারাপ দেখায়।

ডাক্তার রোগীর ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিলে রোগী তার ঘোলাটে চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে এবার বলল, আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেল।

ডাক্তার তাকে সাহস দিয়ে বলল, না না, দিনকতক বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।

তবু হটট বলল, না আমি জানি, আমার এইখানেই সব শেষ। আমি আমার ছেলের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

সেসার হটট তখনো আকুলভাবে কাঁদছিল।

হটট ক্ষীণ অথচ দৃঢ় গলায় তার ছেলেকে বলল, এখন কান্না থামাও। কান্নার সময় নেই। আমার কাছে বস। তোমাকে কিছু কথা বলার আছে। তোমরা এখন যেতে পার।

অন্য সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হটট বলল, শোন বৎস, তোমার বয়স এখন চব্বিশ। এখন তোমার সবকিছু বোঝার মত সময় হয়েছে। আজ হতে সাত বছর আগে তোমার মার মৃত্যু হয়। আমার এখন বয়স হলো পঁয়তাল্লিশ। আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ছিল মাত্র উনিশ। সুতরাং আজ হতে সাত বছর আগে তোমার মা যখন মারা যায় তখন আমার বয়স ছিল মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে কেউ বিপত্নীক অবস্থায় থাকতে পারে কি?

সেসার হটট আমতা-আমতা করে বলল, হ্যাঁ ঠিক কথা বাবা।

হটট হাঁপাচ্ছিল। যন্ত্রণার তীব্রতায় তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু টেনে-টেনে বলল, মানুষ ঐবয়সে কখনো একা থাকতে পারে না। তবু আমি তোমার মাকে কথা দিয়েছিলাম বলে তার মৃত্যুর পর আর বিয়ে করিনি। বুঝতে পেরেছ?

সেসার হটট বোকার মত উত্তর করল, হ্যাঁ বাবা।

হটট আবার বলতে লাগল, যাই হোক, রুয়েন শহরে আমারও এক রক্ষিতা আছে। ১৮, রু দ্য লেপারন্যান-এ তিন তলায় দ্বিতীয় ঘরটায় মেয়েটি থাকে। মেয়েটি বড় ভাল, যাকে অনুরক্ত বলা যায়। যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে তার প্রতি আমার

কিছু কর্তব্য তার আগেই পালন করে যেতে হবে। আমি বলছি মেয়েটি সত্যিই ভাল। তবু আমি শুধু তোমার মুখ চেয়ে আর তোমার মার কথা স্মরণ করে তাকে ঘরে আনতে পারিনি। তাকে ঘরে এনে তাকে বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি।—দলিল-পত্র বা উইলের কথা তুলো না। মামলা মোকদ্দমার পথে পা বাড়িয়ো না। আমি তা করলে কখনই সম্পত্তি ও ধন সঞ্চয় করতে পারতাম না। বুঝলে বাছা ?

সেসার মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ বাবা।

হটট বলল, শোন তাহলে। আমি কোন উইল করিনি। আমি জানি তোমার মনটা নরম, তুমি লোভী নও। আমি ভাবতাম শুধু আমার মৃত্যুকালে কথাটা বলে যাব তোমায়। বলব মেয়েটির কথা ভুলো না। তার নাম হলো ক্যারোলিন দোনেত। তার ঠিকানা হলো ১৮, রু দ্য লেপারন্যান, তিনতলায় ডানদিকের দ্বিতীয় ঘর। সেখানে সোজা চলে যাবে। দেখবে তার যেন কোন অভাব না থাকে। তোমার প্রচুর আছে। তুমি তাকে কিছু দিতে পার। একমাত্র বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য কোনদিন গেলে তার দেখা পাবে না। সে খোড়াসিনেতে চাকরি করে। তাই আমি শুধু সপ্তায় ঐ একটি দিন তার কাছে যেতাম। গত ছয় বছর ধরে সেখানে যাচ্ছি। ঐদিন সে আমার জন্য পথ চেয়ে বসে থাকে। আমার মৃত্যুর কথা শুনলে বেচারী কত কাঁদবে। আমি তোমার মন জানি বলে একথা তোমাকে বলছি। আর একথা কাউকে বলো না। জানিও না। পুরোহিতকেও একথা বলবে না। এ ধরনের ঘটনা অনেকই ঘটে। কিন্তু সে ঘটনার কথা কেউ বলাবলি করে না। বুঝলে ?

সেসার হটট অনুগত পুত্রের মত বলল, হ্যাঁ বাবা।

আমার কাছে শপথ করে বলছ ?

হ্যাঁ বাবা।

আমার অনুরোধ, তার কথা ভুলবে না। তার কাছে চলে যাবে। তারপর দেখবে সে কি চায়। একথা ভুলবে না। শপথ করে বলছ ত ?

হ্যাঁ বাবা।

এবার তাহলে আমাকে আলিঙ্গন করো। আমি আর বেশীক্ষণ বেঁচে থাকব না। এবার ওদের আসতে বলতে পার।

জীবনে বাবার কথার কখনও অবাধ্য হয়নি সেসার। সে বাবার প্রতিটি কথা মেনে চলে যথাযথভাবে। এবারও তাই করল। বাবাকে আলিঙ্গন করার পর ঘরের দরজা খুলে দিল।

মন্ত্রপূতঃ পবিত্র তেল নিয়ে এসে ধর্মগত শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন পুরোহিত। হটট অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল। আর মুখ খুলতে পারল না। অবশেষে পুত্র, বন্ধুবান্ধব, পুরোহিত ও ভৃত্য পরিবৃত হয়ে মধ্য রাত্রিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল হটট। এর আগে চার ঘণ্টা ধরে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করেছে সে।

রবিবার মধ্যরাত্রিতে মারা যায় হটট। তাকে সমাহিত করা হয় মঙ্গলবার সকালে। কবরখানা থেকে বাড়ি ফিরে সারাদিন চোখে পাতায় করতে পারল না। সকালে উঠে সে ভাবতে লাগল সারা জীবন কিভাবে একা-একা কাটাবে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সে ঠিক করল তার বাবার অন্তিমকালের ইচ্ছানুসারে আগামী কাল সকালেই রুয়েনে গিয়ে ক্যারলিনের সঙ্গে দেখা করবে। সে শুধু সব সময় তার ঠিকানাটা প্রার্থনার মন্ত্রের মত মুখস্থ করে যেতে লাগল।

পরদিন বেলা আটটা বাজতেই বাড়ির ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করতে বলল সেসার হটট। গাড়ি এ্যানভিলের বড় রাস্তা দিয়ে রুয়েনের পথে এগিয়ে চলল। একটা কালো লম্বা কোট আর সিল্কের টুপী ও পায়জামা পরেছিল সেসার।

রুয়েনে গিয়ে তাদের জানাশোনা একটি হোটেলে গিয়ে প্রথমে উঠে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়িটা বার করল সেসার। তারপর কুণ্ঠিত পদক্ষেপে তিনতলায় গিয়ে তার বাবার প্রেমিকার ঘরে ঢোকার আগে একবার থমকে দাঁড়াল। তাদের মত গৃহস্থ সঙ্গতিসম্পন্ন চাষী পরিবারের ছেলেমেয়েদের যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে জানতে পেরেছে সেসার এই ধরনের অবৈধ প্রেমের নায়িকা রক্ষিতারা ভাল হয় না। তাদের নাম শুনলেই তাদের প্রতি একটা ঘৃণা আর অবিশ্বাসের ভাব জাগে মনে। তার উপর তার বাবার প্রেমিকা বলে ক্যারলিন দোনেতের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে রীতিমত লজ্জাও অনুভব করছিল সে।

কলিং বেলের শব্দ শুনেই ঘরের দরজা খুলে সেসারের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল এক সুন্দরী যুবতী। সেসার কি বলবে তা খুঁজে পেল না। তখন যুবতীই তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি চান ?

সেসার বলল, আমি হটটের পুত্র। আমার বাবা আপনাকে একটা কথা বলার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

দরজাটা সেসার নিজের হাতে বন্ধ করে দোনেতের পিছু-পিছু ঘরের ভিতরে গেল। তারপর দোনেতের দেওয়া একটা চেয়ারে বসল। কিন্তু প্রথমটায় কোন কথা বলতে পারল না সেসার। সারা ঘরখানায় চোখ বুলিয়ে দেখছিল সে। সামনের দেওয়ালে তার বাবার ছবি। ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিলটাও হয়ত তার বাবার জন্য সাজানো হয়েছে। স্টোভে রান্না হচ্ছে। দোনেত হয়ত তার বাবার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। ঘরে চার পাঁচ বছরের একটি ছেলে খেলা করছিল।

এবার দোনেত মুখ তুলে বলল, তাহলে মঁসিয়ে সেসার ?

অর্থাৎ কিজন্য সে এসেছে তা যেন সে এবার জানতে চায়। সেসারও সরাসরি সেই সাংঘাতিক কথাটা বলে ফেলল। 'বাবা গত রবিবার একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।'

সহসা মুখখানা সাদা হয়ে গেল দোনেতের। তার সারা দেহটা থরথর করে কাঁপছিল। তারপর বসে পড়ে সে বলে উঠল, না, না, তা হতে পারে না।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল দোনেত। তার মাকে কাঁদতে দেখে খেলা ছেড়ে ছেলেটি এসে তার মায়ের আঁচল ধরে কাঁদতে লাগল। আগন্তুক সেসারই তার দুঃখের

কারণ ভেবে সেসারকে তার ছোট্ট হাত দিয়ে মারতে লাগল। সেসার বুঝল ছেলেটি দোনেতের। তাদের কান্না দেখে সেসারের চোখেও জল এল। সেসার আবার বলল, হ্যাঁ দুর্ঘটনাটা ঘটে রবিবার সকাল আটটার সময়।

দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ দান করল সেসার। তারপর বলল মৃত্যুকালে তার বাবা দোনেতের জন্য কত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে!

কথাটা শুনে খুশি হলো দোনেত। কথা শেষ করে সেসার বলল, আমি বাবার ইচ্ছামত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে চাই। আমার অবস্থা ভাল। আমার অনেক সম্পত্তি আছে। আমি চাই না আপনার কোন কিছু অভাব বা অভিযোগ করার মত থাকে।

দোনেত বলল, অন্য সময় একথা হবে, এখন না। তবে যদি আমি কিছু নিই তা ছেলের জন্যই নেব, আমার জন্য নয়।

সেসার বলল, এই ছেলেটি তাহলে— ?

দোনেত বলল, হ্যাঁ, এ সন্তান তাঁর।

সেসার অন্য একদিন আসবে বলে উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু দোনেত ছাড়ল না, কিছু খেয়ে যেতে হবে।

সেসারকে কিছু খেতে দিয়ে তার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল দোনেত। তার বাবার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল। তারপর একসময় ছেলে এমিলকে কোলে নিয়ে বলল, ছেলেটা এবার অনাথা হলো।

সেসার বলল, আমিও তাই।

সেসার উঠে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, কবে আসব আবার ?

দোনেত বলল, আগামী বৃহস্পতিবার এখানে এসে দুপুরের খাওয়া খাবে।

একটা মাত্র সপ্তা। কিন্তু তাও দীর্ঘ মনে হতে লাগল সেসারের। সময় যেন আর কাটতে চায় না। অথচ আগে তার বাবা বেঁচে থাকার সময় ছায়ার মত সব সময় তার বাবার পিছু-পিছু ঘুরে কাজ করে সময়টা কোনদিকে চলে যেত। প্রতিদিন একবার করে আজও মাঠে বের হয় সেসার, কিন্তু কেবলই মনে হয় মাঠের এক প্রান্তে টুপী মাথায় তার বাবা এগিয়ে আসছে অথবা এখনি এসে পড়বে কোথা থেকে।

ঘুরে ফিরে দোনেতের কথা প্রায়ই মনে পড়তে লাগল সেসারের। তার বাবা ঠিকই বলেছে দোনেত বড় ভাল মেয়ে। সেসার বেশ বুঝতে পারল দোনেত তার বাবাকে সত্যিই বড় ভালবাসত এবং তার বাবার মৃত্যুতে সত্যিই সে বড় রকমের একটা আঘাত পেয়েছে।

বৃহস্পতিবার আসতেই সকাল বেলাতেই রুয়েনে যাবার জন্য তৈরি হলো সেসার। দোনেতের ঘরে গিয়ে দেখল খাবার টেবিল আগেই সাজানো হয়েছে। দোনেত তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। দোনেতের হাতটা নিয়ে করমর্দন করে এমিলকে কোলে তুলে নিল সেসার। তার গালে চুম্বন করল। সেসার দেখল দোনেতের চেহারাটা কেমন রোগা হয়ে গেছে আগের থেকে। তার মুখ চোখ মলিন দেখাচ্ছিল। সেসার

সব ঠিক করে এসেছে। বলল, সে বছরে এমিলের জন্য দু'হাজার ফ্রাঁ করে দেবে। দোনেত বলল, এত টাকার দরকার নেই। সে চাকরি করে। এমিলের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করে দিলেই হবে। কিন্তু সেসার তা শুনবে না। সে এ টাকা দেবেই। উপরন্তু এক হাজার ফ্রাঁ এখনই দেবে শোক পালনের জন্য।

দোনেতের ঘরে এসে বড় ভাল লাগছিল সেসারের। দুঃখের মাঝেও সান্ত্বনা পাচ্ছিল। খাওয়ার পর দোনেত তাকে জিজ্ঞাসা করল, ধূমপান করো?

ধূমপান করে, কিন্তু পাইপটা আনতে ভুলে গেছে সেসার। দোনেত তখন তার বাবার পাইপটা এনে দিল। সেসার তাতে তামাক ভরে সেটাকে জ্বেলে ধূমপান করতে লাগল। তারপর এমিলের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করল। উঠতে মন চাইছিল না। তবু তিনটের সময় উঠে পড়ল সেসার।

দোনেত আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করল, আবার কবে আসবে?

সেসার বলল, যদি চান তাহলে আবার আসব।

দোনেত বলল, তাহলে পরের বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার সময় এখানে এসে দুপুরের খাবার খাবে।

সেসার বলল, অবশ্যই আসব ম্যাদময়জেল দোনেত।

আলুমা

Allouma

আলজিরিয়া বেড়াতে যাবার কথা হতেই এক বন্ধু আমাকে বলে, সেখানে ঘুরতে ঘুরতে আমি যদি বোর্দ এব্বাবা নামক জায়গায় গিয়ে পড়ি তাহলে যেন তার বন্ধু অবেলের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করি। অবেল এখন সেখানেই বসবাস করছে।

আলজিরিয়া ভ্রমণের সময় আমি কিন্তু সেই অবেলের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘুরতে-ঘুরতে ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়।

আলজিয়ার্স হতে চেরশেল ও অলিয়াঁভিল পর্যন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আমি একটা মাস ধরে ঘুরে বেড়াই। সারা অঞ্চলটা পাহাড় প্রান্তর আর ঘন পাইন বনে ভরা। বনের মাঝে-মাঝে এক-একটা নদী বয়ে গেছে। পাহাড়ের পাশে খাদ। সেই সব খাদ আর ছোট-ছোট নদীর উপর বড়-বড় গাছ পড়ায় সাঁকোর মত হয়ে গেছে। আমার কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগল বিকাল বেলায় পাহাড়ের উপর বেড়াতে। শেষ বিকেলের লাল রোদঝরা পাহাড়ের উপর যখন দেখতাম দূরের নীল সমুদ্র থেকে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত মাঝে-মাঝে দেবদারু গাছের ছায়াঘেরা এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর ছড়িয়ে আছে তখন আমি সবকিছু ভুলে যেতাম। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম সেইদিকে।

শেষ বিকেলের বাদামী আলোয় পাহাড়গুলোকে দেখে মনে হত সিংহের চামড়া দিয়ে ঢাকা একটা বিশাল উটের পিঠ।

পাহাড়ের রাজ্যে এলে হয়ত এমনিই মনে হয়। জীবনের সব কথা ভুলে যেতে হয়। একদিন বিকালে পাহাড়ে বেড়াতে-বেড়াতে আমিও সবকিছুই ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর ধীরে-ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে আমি বুঝতে পারলাম আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। পাহাড় থেকে আমি লক্ষ্য করেছিলাম সামনের প্রান্তরের মাঝে মাঝে তাঁবুতে আরব দেশীয় কিছু লোক বাস করত। আমি পাহাড় থেকে কোনরকমে নেমে একজন আরবদেশীয় লোকের সঙ্গে দেখা করলাম। আমি তাকে কোনরকমে বোঝালাম আমি কি চাই। তার কথা আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলাম না। তারপর তার একটা কথা আমার কানে বোধগম্য ঠেকল। সেটা হল বোর্দ এব্বাবা। আমি তাকে সঙ্গে-সঙ্গে দু ফ্রাঁ দেখিয়ে অবেলের বাড়িটা দেখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। সে খুশি হয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। অন্ধকারে পথের উপর ছড়ানো পাথরে মাঝে-মাঝে ঠোক্কর খেতে লাগলাম আমি।

অবশেষে দুর্গের মত এক বিরাট সাদা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। কোন জানালা নেই, সাদা দেওয়াল খাড়াই হয়ে উঠে গেছে। আমরা ডাকাডাকি করতে ভিতর থেকে ফরাসী ভাষায় একজন বলল, কে ডাকে? আমি তখন ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম, মঁসিয়ে অবেল এখানে থাকেন?

মঁসিয়ে অবেল নিজেই দরজা খুলে দিলেন। লম্বা চেহারার সুদর্শন এক ভদ্রলোক। আমি আমার পরিচয় দিতেই দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন আমায়। বললেন, আসুন, নিজের বাড়ি মনে করে আসুন।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ডিনার খেতে বসলাম। আমি অবেলের জীবন-কথার কিছুটা জানতাম। শুনেছিলাম তিনি নারীঘটিত ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয় করার পর তাঁর সব টাকা আলজিরিয়া গিয়ে কিছু জমি কিনে তাতে লগ্নী করেন। আঙুরের চাষ করে আজকাল তিনি প্রচুর লাভ করছেন এবং সুখে আছেন। কিন্তু সব জেনেও আমি বুঝতে পারলাম না একদা প্যারিসবাসী এক শহুরে ভদ্রলোক কিভাবে এই পার্বত্য অঞ্চলে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন এখানে আছেন?

মঁসিয়ে অবেল পাইপ খেতে-খেতে বললেন, নয় বছর।

আমি আবার বললাম, মাঝে-মাঝে একা-একা খুব খারাপ লাগে?

তিনি বললেন, থাকতে-থাকতে সব ঠিক হয়ে যায়। শেষে জায়গাটাকে ভালই লাগে। প্রথম-প্রথম আমাদের মন না চাইলেও এ দেশেও জল, বাতাস, পরিবেশ আমাদের দেহগত জৈব চেতনাকে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করে ফেলে। তারপর, এখানকার জল বাতাসের বিশুদ্ধতা ক্রমশঃ মনটাকে বিশুদ্ধ করে তোলে। এখানকার নির্মল আকাশ থেকে ঝরেপড়া অবাধ স্বচ্ছ উজ্জ্বল সূর্যালোক মনের যতসব কুটিল অন্ধকার অপসারিত করে দেয়।

আমি বললাম, কিন্তু এখানে নারীসঙ্গের ত কোন সুযোগ নেই।

অবেল বললেন, বেশী নয়, নারীসঙ্গের কিছুটা অভাব বোধহয় হতে পারে।

আমি বললাম, তার মানে?

অবেল বললেন, এখানেও কিছু আরবদেশীয় স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এমন কিছু মেয়ে পাওয়া যায় যারা দেশীয় রীতিনীতির সঙ্গে-সঙ্গে ইউরোপীয় জীবনযাত্রার অনেক জিনিস নকল করতে চায়।

আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন লম্বা কালো চেহারার একজন দেশীয় ভৃত্য অপেক্ষা করছিল মালিকের হুকুমের জন্য। অবেল তাকে বললেন, এখন যাও মহম্মদ, দরকার হলে ডাকব।

মহম্মদ চলে গেলে অবেল বললেন, আমি আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলব। যে ঘটনার কথা বলব তাতে মহম্মদের একটা ভূমিকা আছে। ও ফরাসী ভাষা জানে। তাই ওকে যেতে বললাম।

অবেল তাঁর কাহিনী শুরু করলেন, বছরকতক আগের ঘটনা। আমি তখন সবেমাত্র এসেছি। এখানকার ভাষা আমতা-আমতা করে কিছু-কিছু বলতে পারি মাত্র। আমি তখন মাঝে-মাঝে আলজিয়ার্স শহরে যেতাম কিছু আমোদ আহ্লাদ করতে। আমি এখানকার খামারবাড়িটা সব জমি জায়গা সমেত কিনে নিয়ে চাষ আবাদ শুরু করি। এই বাড়িটার বাইরে প্রান্তরের মাঝে তাঁবুতে যে সব স্থানীয় অধিবাসীরা বাস করে তারা আমার ক্ষেতে খামারে কাজ করে। মহম্মদ ওদেরই একজন এবং আমার ব্যক্তিগত ভৃত্য। সে বড় প্রভুভক্ত। আমার জীবনযাত্রা খুবই সহজ। সারাদিন আমি চাষের কাজ তদারক করি। তারপর সন্ধের সময় আমি নিকটবর্তী স্টেশনের কোন অফিসারের বাড়িতে ডিনার খেতে যাই অথবা সেই অফিসার আমার বাড়িতে আসে। আর আমোদ-প্রমোদের কথা যদি বল তাহলে বলব তার জন্য আছে আলজিয়ার্স। একদিন সেখানে অনেক ফূর্তি করেছি। আজকাল সেখানে আর যাই না। আজকাল এখানেই মাঝে-মাঝে একজন স্থানীয় আরব আমাকে চুপি-চুপি বলে কোন মেয়ের দরকার আছে কিনা। কখনো মন হলে আনতে বলি। তবে সাধারণতঃ এড়িয়ে চলি। কারণ তার ঝামেলা আছে। অনেকসময় মেয়ে নিয়ে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়।

গত গ্রীষ্মকালে একদিন সন্ধের সময় মাঠ থেকে এসে মহম্মদের খোঁজে তার তাঁবুর ভিতরে ঢুকে পড়ি হঠাৎ। ঢুকেই দেখি ছেঁড়া ময়লা কাপড় জড়ানো ফর্সা গোলগাল চেহারার একটি যুবতী মেয়ে প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুমোচ্ছে। এখানকার মেয়েদের চেহারা অবশ্য খুবই ভাল। লম্বা, ফর্সা, সুন্দর চোখ মুখ। যাই হোক, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। কিন্তু সেই ঘুমন্ত সুন্দরী যুবতীর কথা ভুললাম না। আমার স্বভাবের মধ্যে সহজাত যে নারীলিপ্সা একদিন ঘুমিয়ে ছিল ঐ ঘুমন্ত মেয়েটির দৃশ্য সে লিপ্সাটাকে জাগিয়ে তোলে। যদিও এই লিপ্সার আতিশয্যের ফলে আমাকে ফ্রান্স ছাড়তে হয় তথাপি এই নবজাগ্রত লিপ্সাটাকে দমন করতে পারলাম না কিছুতেই। সারাদিন ঘুমোতে পারলাম না। মহম্মদের তাঁবুর পানে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

পরদিন মহম্মদ আমার বাড়িতে এলে আমি তাকে বললাম, তুমি কি বিয়ে করেছ?

সে বলল, না।

তখন আমি তাকে তার তাঁবুতে মেয়ে কোথা হতে এল তা জিজ্ঞাসা করলাম। মহম্মদ বলল, দক্ষিণ থেকে একটা খুব সুন্দরী মেয়ে এসে পড়েছে তার তাঁবুতে। আমি তখন তাকে বললাম, এবার এই ধরনের কোন মেয়ে এসে পড়লে আমার ঘরে তাকে যেন পাঠিয়ে দেয়।

যাই হোক, সেদিন সারাদিন ধরে মেয়েটার কথা মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। খাওয়ার পর একবার তাঁবুটার পাশ দিয়ে বেড়িয়ে এলাম। রাত্রি ন'টার সময় বাড়ি ফিরে দোতলায় আমার ঘরে গিয়ে দেখি আমার টেবিলে একটা বাতি জ্বলছে আর তার সামনে একটি চেয়ারে পাথরে গড়া মূর্তির মত একটি মেয়ে বসে রয়েছে। তার হাতে পায়ে গলায় ও কোমরে রূপোর গয়না।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথা হতে এসেছ? কে তোমায় পাঠিয়েছে?

সে বলল, মহম্মদ।

আমি বেশ বুঝলাম, এই সেই মহম্মদের তাঁবুতে ঘুমিয়ে থাকা সুন্দরী যুবতী। মহম্মদ তাকে তার প্রতি আমার আগ্রহ দেখে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার কাছে। তাকে দেখে তার রূপলাবণ্যের প্রতি আমার লালসা জাগলেও তাকে নিয়ে কি করব তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাছাড়া সে কোথা হতে এসেছে, সে কোন্ জাতের মেয়ে, মহম্মদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি এসব জানা আমার দরকার। কিন্তু এত কথা এত প্রশ্ন করার পর সে যা উত্তর দিল তাতে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

অবশেষে আমি তাকে মহম্মদের তাঁবুতে ফিরে যেতে বললাম। কিন্তু সে তাতে হতাশ হয়ে দু'হাত দিয়ে আমার গলাটাকে জড়িয়ে ধরল। তার মুখের উপর এক সকরুণ ভাব থাকলেও তার চোখের তারার মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল এক জ্বলন্ত কামনা আর নারীসুলভ এক গোপন জিগীষা। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। মুহূর্তের মধ্যে এক দৃষ্টিযুদ্ধ হলো আমাদের মধ্যে। এ যেন সেই নারী-পুরুষের শাশ্বত দৃষ্টিযুদ্ধ যা আদিমকাল হতে ঘটে আসছে এবং যাতে চিরকাল পুরুষরাই পরাজিত হয়।

আলুমা তার গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার হাত দিয়ে আমার ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে আমার মুখটাকে তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল। চাপ পড়ায় তার হাতের গয়নাগুলোতে শব্দ হতে লাগল। তার দেহে বন্যজন্তুর মত নিটোল স্বাস্থ্য ও শক্তি। তার চুম্বনে ভিন্ন দেশীয় অচেনা ফলের মত অনাস্বাদিতপূর্ব এক মধুর আস্বাদ। আলুমা আমার কাছে আমার বিছানাতেই শুল।

সকালের আলো ফুটে উঠলে ভাবলাম ওকে এবার যেতে বলব। বললাম, তুমি এবার যেতে পার আলুমা। কিন্তু ও বলল, আমার কোন থাকার জায়গা বা যাবার জায়গা নেই।

আমি তখন ভাবলাম, মেয়েটাকে যখন আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন আমি ওকে বেসরকারী গৃহিণী বা রক্ষিতার মত রেখে দেব আমার এই বাড়িতে।

কিন্তু তার সম্বন্ধে সবকিছু জানা দরকার। তাই তাকে বললাম, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আশ্রয় দেব, কিন্তু কোথা হতে এসেছ তা তোমাকে বলতে হবে।

আমি জানতাম এ দেশীয় মেয়েরা বড় মিথ্যা কথা বলে। তারা তাদের স্বধর্ম সম্বন্ধে খুব বেশী মাত্রায় সচেতন এবং ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার সময় তাদের ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে চায়।

আলুমা বলল, কোন আরবদেশীয় সুলতানের ঔরসে, কোন নিগ্রো ক্রীতদাসীর গর্ভে তার জন্ম হয়। একথার সমর্থন একমাত্র পাওয়া যায় তার নীলচে চোখের তারায় আর ঠোঁটের রঙে। কিন্তু তার গায়ের রঙ ফর্সা, চোখদুটো টানা-টানা। সে যা বলল তা হলো কাঠবিড়ালীর মত গাছের ডাল হতে ডালে, তাঁবু হতে তাঁবুতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ানো বিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এক যাযাবর জীবনের কাহিনী। তার এলোমেলো শিশুসুলভ কথা থেকে আমি তার জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণা খাড়া করতে পারলাম না।

আলুমাকে কেন্দ্র করে একটা কথা না ভেবে পারলাম না। প্রকৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে কী এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়ে তুলেছে। আমরা বিজেতা; আলুমারা বিজিত, আমাদের অধীনস্থ। তবু বিজেতাদের সকল অহঙ্কার আর সাবধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে ওদের মিষ্টি মুখের হাসি আর আপাতশান্ত পরাভব স্বীকারের অন্তরালে এক রহস্যময় স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করে চলেছে ওরা। মনে হলো ওদের আত্মস্বাতন্ত্র্যের অপরাজেয় দুর্গটাকে ধ্বংস করে ওদের মনটাকে টেনে বার করে এনে তার সার্বিক বশ্যতা আদায় করার ক্ষমতা কোন বিজেতার নেই।

সকাল হলেও আলুমা তখনো আমার কাছে শুয়ে ছিল। মহম্মদ যথারীতি ঘরে ঢুকে আবার ঘর গোছাতে লাগল। আলুমা বলল, তার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি মহম্মদকে আমাদের জন্য খাবার আনতে বললাম। আলুমার খাওয়া শেষ হলে আমি তাকে বললাম, তুমি আমার বাড়িতে থাকতে চাও?

আলুমা আগ্রহভরে বলল, হ্যাঁ।

আমি তখন আমার বাড়ির দোতলাতেই তার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট করে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম। তার ফাইফরমাস খাটার জন্য একজন বৃদ্ধা আরব রমণীকে নিযুক্ত করলাম।

একটা মাস বেশ ভালভাবেই কাটল। আমি আলুমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। যখন যেখানে খুশি দিনের বেলায় বেড়াতে যেতে পারবে সে। আমি লক্ষ্য করলাম, সে মাঝে-মাঝে বিকালের দিকে তাঁবুগুলোতে যেত। একদিন পাহাড় দিয়ে বিকালে বেড়াতে গিয়ে দেখি একটা ভাঙা মসজিদে আলুমা একটা প্রাচীন কবরের সামনে প্রার্থনা করছে আর বিড়-বিড় করে কি বকছে। সন্ধের সময় সে আমার জন্য কেকজাতীয় কিছু খাবার নিয়ে এল। আমাকে নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে সে সরে গেল। সে বলল, এটা তাদের রমজানের মাস। সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যার সময় খায় তারা। এ মাসে তাকে স্পর্শ করা যাবে না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আলুমাকে তার ঘরে পাওয়া গেল না। মহম্মদকে তার তাঁবু থেকে ডাকলাম। তার খোঁজ করতে বললাম। চারদিকে লোক পাঠালাম। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। মহম্মদ আলুমার ঘরে ঢুকে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র পরীক্ষা করে বলল, সে চলে গেছে। পালিয়ে গেছে।

আলুমাকে আমি ঠিক ভালবাসিনি। আমাদের মত শহুরে শিক্ষিত লোক আর আলুমাদের মত আদিম সরলতাসম্পন্ন অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে কোন হৃদ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। তাদের লোভনীয় দেহসম্ভারের মধ্যে যে মাদকতাশক্তি আছে সে শক্তি তাদের মনের মধ্যে নেই। তাদের আচরণ ও আবেগানুভূতি খুবই স্থূল। প্রেম বলতে যে সূক্ষ্ম মানসিকতা, যে ভাবসমুন্নতি বোঝায় তাদের দেহগত সান্নিধ্য ও আচার আচরণ তা জাগাতে পারে না আমাদের মধ্যে।

তবু আলুমার অভাব আমি অনুভব করছিলাম এবং আমার মন চাইছিল সে আমার বাড়িতে বাস করুক।

তিন সপ্তা পর একদিন হঠাৎ মহম্মদ এসে আমাকে খবর দিল আলুমা ফিরে এসেছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, কোথায় ?

মহম্মদ জানালা দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে বলল, একটা গাছতলায় বসে আছে। আপনার ভয়ে এখানে আসতে পারছে না। আমি তার সঙ্গে আলুমার কাছে গিয়ে দেখি ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে সে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গিয়েছিলে ?

সে কোন উত্তর দিল না। আমি বারবার তাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে আমতা-আমতা করে বলল, আমি বাড়ির ভিতর একসঙ্গে বেশীদিন থাকতে পারিনা। তাই চেয়েছিলাম—

তার চোখে জল দেখে আমার দয়া হলো। আমি তাকে সঙ্গে করে আমার বাড়িতে দিয়ে এলাম। তার জন্য নির্দিষ্ট সেই ঘরে ঢুকে আলুমা খুশি হয়ে বলল, আবার ফিরে এসেছি। খুব ভাল লাগছে।

আমি বললাম, তোমার যখন কোথাও যাবার ইচ্ছা হবে আমাকে বলবে। আমি তোমাকে অনুমতি দেব।

আমার হাতটা টেনে নিয়ে কৃতজ্ঞতার বশে চুম্বন করল আলুমা। সে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, মাঝে-মাঝে তার ঘর ছেড়ে তার যাযাবরী জীবনে ফিরে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছা জাগে তার মধ্যে। ইচ্ছা হয় সে তাঁবুতে গিয়ে ঘুমোয়। মরুভূমির অনন্তপ্রসারিত বালির উপর ছোটাছুটি করে, গড়াগড়ি দেয়। বুঝলাম, মাঝে মাঝে বাধাবন্ধহীন প্রকৃতির সন্তান হয়ে উঠতে চায় আলুমা। দূর নৈশ আকাশের হলুদ নক্ষত্র আর তার চোখের নীল তারার মাঝখানে স্বচ্ছ বাতাস ছাড়া আর কোন ব্যবধান বা যবনিকার আচ্ছাদন থাক এটা সে চায় না।

আমি দেখলাম আলুমা তার ঘরে ঢুকে বড় আয়নাটার সামনে ছুটে গিয়ে বলল, একটু দাঁড়াও, পোশাকটা পরে নিই।

সিল্কের পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিফলিত মূর্তির সঙ্গে যেন অভিনয় করতে লাগল আলুমা। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ছয় মাস ভালভাবেই কেটে গেল। তারপর একদিন দিনকতকের জন্য ছুটি চাইল আলুমা আমার কাছে। আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত তাকে সানন্দে অনুমতি দিলাম। সে সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল কোন অজানায়। ঠিক তিন সপ্তা পর সে আবার ফিরে এল। আমি তাকে আবার সানন্দে গ্রহণ করলাম। কোন ঈর্ষা জাগল না আমার মনে। জানতে ইচ্ছা করল না এতদিন কোথায় কার কাছে ছিল। কারণ যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে কখনো ঈর্ষা জাগতে পারে না। আমি জানতাম এক অবাধ্য কুকুরকে মারা যা—কোন কারণে আলুমাকে আঘাত করাও তাই।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আলুমা আমাকে না বলেই চলে গেল। মহম্মদ এসে আমাকে একদিন বলল, এবার আলুমা চিরদিনের মত চলে গেছে।

মহম্মদ বলল, আমাদের খামারবাড়ির নতুন রাখালটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

দিনকতক আগে তাকে ভেড়া ও গবাদি পশু চড়াবার কাজে নিযুক্ত করা হয়। আমি মনে করে দেখলাম লোকটা ছিল লম্বা হাড়শক্ত চেহারার এক বেদুইন। তার চোয়ালদুটো উঁচু-উঁচু আর চোখদুটো শেয়ালের মত শয়তানিতে ভরা।

মঁসিয়ে অবেল একটু থেমে বললেন, কিসের সূক্ষ্ম প্রভাব নারীসত্তার গোপন গভীরে লুকিয়ে থেকে তাদের পলাতক মনোবৃত্তিটাকে দুলিয়ে দেয়, তাদের চটুল প্রেমানুভূতির রংটাকে মাঝে-মাঝে বদলে দেয় তা কেউ জানে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আলুমা যদি ফিরে আসে আপনি তাকে গ্রহণ করবেন?

মঁসিয়ে অবেল বললেন, হ্যাঁ।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার রাখালকে ক্ষমা করবেন?

মঁসিয়ে অবেল বললেন, হ্যাঁ। নারীদের ব্যাপারে পুরুষকে চিরদিন ক্ষমা করে যেতেই হবে।

কুমারী লুসি রক

Little Louise Roque

এ অঞ্চলের ডাকপিওন মেন্দারিক রম্পেলকে সবাই মেন্দারি বলেই ডাকে। রুয়্য লে তর্স পোস্টাপিসে সে কাজ করে। কিন্তু চিঠি বিলি করতে তাকে ব্রিন্দেল নদী পার হয়ে কার্ভেলিন গাঁ থেকে শুরু করে অনেকগুলো গাঁ ঘুরতে হয়।

ছোট্ট ব্রিন্দেল নদীটা বড় শান্ত ; এঁকেবেঁকে একটা বনের ধার ঘেঁষে বয়ে গেছে। তার মাঝে-মাঝে আছে কাঠের সাঁকো আর আছে গলার মালার মত বড়-বড় পাথরের ঢিবি। অন্যদিনকার মত আজও সকালে নদী পার হয়ে কার্ভেলিন গাঁয়ে ঢুকল মেন্দারিক চিঠি বিলি করতে। মনে-মনে মুখস্থের মত বলতে লাগল, এই গাঁয়ে প্রথম চিঠি বিলি করব পয়রণ পরিবারে। তারপর মেয়র রেনার্দেতকে। তার গায়ে আছে একটা লম্বা নীল ফ্রক। কোমরটা বেল্ট দিয়ে আঁটা। কাঁধে চামড়ার চিঠিভর্তি ব্যাগ।

গাঁয়ে ঢুকে প্রথমেই পড়ে মঁসিয়ে রেনার্দেতের বিরাট বাগান। মোটা গুঁড়িওয়ালা অসংখ্য প্রকাণ্ড গাছেভরা মস্তবড় বাগানটি বাড়ি থেকে নদীর ধার পর্যন্ত চলে গেছে। বেলা এখন আটটা না বাজলেও রোদটা এরই মধ্যে গরম হয়ে উঠেছে। সেই গরম রোদেভরা মাঠ পার হয়ে এসে এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মেন্দারিক। সে তাই ছায়াভরা বাগানের মধ্যে ঢুকেই কপালের ঘাম মুছে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। হঠাৎ সেই গাছের তলায় একটা ছোট ছুরি আর একটা সূচ রাখার কৌটো দেখতে পেল। সে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ভাবল মেয়রের কাছে জমা রাখবে। কিন্তু তার মনে হলো আরো যেন কোথাও কিছু পড়ে আছে। এদিক সেদিক তাকাতে-তাকাতে সে হঠাৎ দেখতে পেল অদূরে একটা গাছের তলায় বারো তের বছরের একটি মেয়ে চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মোটা দেহটা সম্পূর্ণ নগ্ন; পায়ের কাছে কিছু রক্ত লেগে রয়েছে আর মুখটা রুমাল দিয়ে ঢাকা।

এক তীব্র কৌতূহলের বশে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে মেন্দারিক দেখল মেয়েটি মরে গেছে। এ অঞ্চলের সব ছেলেমেয়েদের সে চিনলেও মেয়েটার মুখে রুমাল থাকায় চিনতে পারল না। হাত পাগুলো নেড়ে দেখল সেগুলো ভীষণ ঠাণ্ডা। পাছে খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এজন্য বেশীক্ষণ মৃতদেহের কাছে না থেকে মেয়রকে খবর দেওয়ার জন্য সে ছুটতে লাগল।

মেয়র মঁসিয়ে রেনার্দেত তখনও অফিসে আসেননি। ঘরের মধ্যে কাগজ পড়ছিলেন। চাকরকে দিয়ে খবর পাঠাতে চাকর এসে মেন্দারিককে সঙ্গে করে নিয়ে গেল মেয়রের ঘরে। মেয়রকে খবরটা দিতেই মেয়র বললেন, তুমি যাও, যথারীতি কাজ করো। আমি চাকর পাঠিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশের কর্তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পোশাক ও টুপী পরে বেরিয়ে পড়লেন মেয়র। অল্প দু'-একজন চাকর নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে গেলেন। চাকরকে দিয়ে মৃতদেহের মুখের উপর হতে রুমালটা তুলতেই সকলে দেখল লুসি রক। এ গাঁয়ের লা রক নামে এক বিধবার মেয়ে। মেয়েটার দেহে যৌবন না এলেও বাল্য থেকে কৈশোরে পা দেওয়ায় দেহটা অনেকখানি পরিণত হয়ে উঠেছিল।

সবাই ভাবল কোন ভবঘুরে বা দুষ্ট প্রকৃতির পথিক মেয়েটাকে বনের ভিতরে একা পেয়ে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করে তাকে গলাটিপে হত্যা করে গেছে। তার ফলে তার জিবটা বেরিয়ে এসেছে এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে।

ডাক্তার ও ম্যাজিস্ট্রেট আগে এল। তারপর পুলিশ এল। ডাক্তার এসে মৃতদেহটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বলল, আর কোন উপায় নেই, সব শেষ। কোন ব্যক্তি মেয়েটির উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর গলাটিপে হত্যা করে চলে গেছে।

মেয়র গম্ভীরভাবে বললেন, হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতেই হবে। এত সাহস কার হলো ?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, মৃতের জামা বা পোশাকগুলো কোথায় গেল ?

মেয়র তাঁর একজন চাকরকে পোশাকের খোঁজ করতে বললেন। চাকর এদিক সেদিক খোঁজার পর এসে জবাব দিল, কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে ডাকপিওন মেন্দারিক চিঠি বিলি করতে গিয়ে গাঁয়ের ঘরে-ঘরে খবরটা দিয়ে দিয়েছে। খবরটা শুনেই সবাই বলাবলি করতে লাগল মেয়েটা লুসি রক, কারণ গতকাল রাত থেকে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। খবর শুনে ওর মা লা রক কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলো।

নগ্নদেহটার ওপর একটা লিনেনের কাপড় চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন মেয়র। লুসির মা মধ্যবয়সী এক মহিলা এসে কাপড়টা তুলে তার মেয়ের বিকৃত মুখটা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল। মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল। কখনো হাত দিয়ে মাটিটাকে আঁচড়াতে লাগল। সহসা দেখা গেল গাঁয়ের লোকেরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে চারদিকে। ওরা কাছে এসে মৃতদেহকে দেখে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল চারদিকে ভিড় করে। তখন মেয়র ওদের তাড়া করে সরিয়ে দিলেন।

মেয়রকে ওরা সবাই ভয় করত। পরে তিনজন পুলিশ আসায় জনতা চলে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট মৃতদেহটি পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু লা রক পাগলের মত বলতে লাগল, আমি আমার মেয়েকে ছাড়ব না। ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই সারা জগতে। আমি বিধবা। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর কত কষ্টে সৎ পথে থেকে ওকে মানুষ করেছি।

যাজক এসে লা রককে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। অবশেষে মেয়র তার কাছে গিয়ে বললেন, আমি কথা দিচ্ছি তোমার মেয়ের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করে তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু ঐ লাস পুলিশ না নিয়ে গেলে হত্যাকারী সম্বন্ধে কোন কিছুই জানা যাবে না। তাই তোমার মেয়েকে ছাড়তে হবে।

এই কথায় শান্ত হলো লা রক। যাজকের সঙ্গে চলে গেল ঘটনাস্থল থেকে। মেয়র, যাজক, ডাক্তার, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারকে তাঁর বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন।

খেতে-খেতে হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনেক কথা হলো। খাবার পর যে যার কাজে চলে গেল। সেদিন আর বিকালে তাঁর বাগান দিয়ে বেড়াতে বার হলেন না মেয়র। সন্ধ্যার পর রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন। কিন্তু রাতে ঘুম হল না।

পরদিন সকালেই তাঁর বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেট এসে হাজির। তাঁর ঘরে ঢুকে বললেন, তুমি এখনো ঘুমোচ্ছ ? খবর আছে।

ব্যস্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন মেয়র। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তোমার মনে আছে, লা রক তার মেয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তার টুপী বা কোন পোশাক চাইছিল পাগলের মত। গতকাল রাতে কে তার ঘরে লুসি রকের দুটো কাঠের জুতো ফেলে দিয়ে গেছে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে হত্যাকারী এ অঞ্চলের লোক। এখন এ অঞ্চলের দাগী কুখ্যাত লোকগুলোকে বাছাই করে দেখতে হবে। দরকার মনে করলে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

মেয়র তখন নিজের নাম থেকে শুরু করে প্রথমে গাঁয়ের বিশিষ্ট লোকেদের নাম করলেন। পরে প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে নীতির দিক থেকে ভাল মন্দ লোকদের নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। অবশেষে কেভাল, ক্লোভিস আর পেকার নামে তিনজন জেলে চাষী ও পশুপালকের নাম করা হলো।

এইভাবে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা ধরে তদন্ত চলল। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের কোন কূল-কিনারা পাওয়া গেল না। হত্যাকারীর কোন হদিশ পাওয়া গেল না। যাদের সন্দেহ করা হয়েছিল তারা তাদের নির্দোষিতার প্রমাণ দেওয়ায় ছাড়া পেল।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ তখন বিরক্ত হয়ে তদন্তকার্যে ইস্তাফা দিল। কিন্তু সমগ্র অঞ্চলে এই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করতে লাগল। কেউ আর মেয়রের বাগান দিয়ে যেত না। আগে প্রতি রবিবার দুপুর বেলাটা গাঁয়ের বহু লোক ঐ বাগানে গিয়ে বসে থাকত, ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করত গাছের তলায়। কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বাগানটাকে পরিত্যাগ করেছে সবাই। একটা থমথমে ভীতিসিক্ত বিষাদ আগের থেকে অনেকখানি কালো করে তুলেছে যেন বাগানের ছায়াটাকে।

একমাত্র মেয়র নিজে আজও রোজ বিকালে হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ছড়ি হাতে বেড়াতে যান তাঁর সেই বাগানে। গাছপালার তলায় একা-একা সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান। কখনো ঘুরতে-ঘুরতে নদীর ধার দিয়ে চলে যান। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এলে বাড়ি ফিরে যান। সারা সন্ধেটা ঘরের মধ্যে একা-একা কাটান। তারপর কোনরকমে খাওয়াটা সেরেই শুয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুমোতে পারেন না ঠিকমত।

অবশেষে গ্রীষ্ম গিয়ে শরৎ আসে। ঘন উইলো বনের পাশ দিয়ে বয়েযাওয়া শীর্ণ ব্রিন্দেল নদীটা সহসা যৌবনবতী নারীর মত হলদে জলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বনের মাথায় আবছা কুয়াশা নেমে এসেছে। বিকালের দিকে অসংখ্য কালো-কালো দাঁড়কাক উড়ে বেড়ায় গাছগুলোর উপরে। কর্কশ চিৎকারে মুখরিত করে তোলে সারা বনভূমিটাকে।

হঠাৎ একদিন সকালে একটা খবর শুনে অবাক হয়ে গেল কার্ভেলিন গাঁয়ের সকলে। মেয়র নাকি তাঁর বাড়ির পিছনদিকের নদীর ধার বরাবর গোটা বাগানটাকে কেটে ফেলছেন। অনেক কাঠুরিয়া নিযুক্ত হয়েছে মোটা-মোটা দাঁড়িওয়ালা আদ্যিকালের

প্রকাণ্ড গাছগুলোকে কাটার জন্য। এ সিদ্ধান্ত মেয়র কেন নিয়েছেন তা কেউ বুঝতে পারল না।

কুড়িজন কাঠুরিয়া নিযুক্ত হলো। একদিন সকাল থেকে শুরু হলো গাছ কাটা। যে গাছটা কাটা হয় তার উপরের ডালে একটা মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর দু'জন কাঠুরিয়া কুড়ুল দিয়ে সেই গাছের গোড়াটা কাটতে থাকে। অনেকটা কাটা হয়ে গেলে অনেকগুলো লোক একসঙ্গে একদিকে দাঁড়িয়ে সেই দড়ি ধরে টানতে থাকে। অবশেষে পতন ঘটে সেই বিরাট মহীরুহের। গাছ কাটার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সর্বক্ষণ লক্ষ্য করেন মেয়র। প্রতিটি গাছের ডালপালাগুলো আগে কেটে নেওয়া হয়। তখন শাখা প্রশাখাহীন বিরাট অর্ধমৃত গাছগুলো এক একটা বিরাট দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকে শেষ পতনের আশায়। এক-একটা গাছ কাটা হয়ে যায় আর তার পরমুহূর্ত হতে আর একটা গাছের পতনের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন মেয়র। যেন কোন এক বিরাট রহস্যের চূড়ান্ত উদ্ঘাটন নির্ভর করছে এই বন উৎসাদনের উপর।

একদিন একটি মজার ব্যাপার ঘটল। একটি গাছ যখন কাঠুরিয়াদের টানাটানিতে মড়মড় শব্দ করে পড়ে যাচ্ছিল তখন ইচ্ছে করে মেয়র যেন চাপা পড়ার জন্য সেই গুঁড়ির দিকে ছুটে যান। কোনরকমে একটুর জন্য বেঁচে যান। কাঠুরিয়ারা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। পরে তাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, কেমন যেন বেশ মজা লাগছিল। ছোট ছেলেরা যেমন অনেক সময় চলন্ত গাড়ি দেখেও রাস্তা পার হয়ে যায়, তেমনি মানুষও অনেক সময় অকারণে বিপদের ঝুঁকি নিতে যায়।

পড়ন্ত যে গাছটার তলায় ছুটে গিয়েছিলেন মেয়র সেটি ছিল সেই বিরাট বীচ গাছ যার তলায় লুসির মৃতদেহটা পাওয়া যায়।

সেদিন সন্ধের সময় নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন মেয়র। দেখলেন মাত্র ছ'টা বাজে। রাতের খাওয়া খেতে এখনও অনেক সময় বাকি। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি। যতদূর সম্ভব গলাটা চেপে কাঁদতে-কাঁদতে রিভলবারটা ড্রয়ার থেকে বার করে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন। আলো পড়ে চকচক করতে লাগল রিভলবারটা। হঠাৎ কি মনে হলো, মেয়র উঠে পড়ে রিভলবারটা হাতে তুলে তার নলটা নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে তার ট্রিগারের উপর আঙুলটা চাপিয়ে রাখলেন। কিন্তু টিপতে পারলেন না শেষপর্যন্ত। অবশেষে রিভলবারটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। চাকর এসে দরজার বাইরে ডাকাডাকি করলে খেতে গেলেন নিচে।

খেয়ে এসে শত চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারলেন না। সারারাত প্রায় জেগে কাটালেন। ভাবতে-ভাবতে তন্দ্রা আসে। আবার জেগে ওঠেন। নানারকমের চিন্তা আসে মনে।

পরদিন সারাদিন ঘরের মধ্যে কখনো বসে কখনো পায়চারি করে কাটালেন। বিকালের দিকে একবার বেড়াতে গেলেন নদীর ধার দিয়ে। প্রায়ই তাঁর মনে হতে লাগল, কে যেন তাঁর পিছু-পিছু আসছে। কার পথ চলার নরম শব্দ হচ্ছে পিছনে। নদীর ধারে সেই জায়গাটার দিকে তাকালেন। সেই জায়গাটা যেখানে উইলো গাছের

ডালগুলো নুয়ে পড়েছে জলের উপর। যেখানে তিনি একা-একা স্নান করতে থাকা লুসির নগ্ন দেহটা দেখে প্রলুব্ধ হন এবং তাকে চেপে ধরেন আর সে প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকলে তাকে টাকা দিয়ে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। স্পষ্ট সব মনে আছে রেনার্দেতের। কিন্তু তিনি ত মারতে চাননি লুসিকে। তাকে বারবার নিষেধ করেছিলেন চিৎকার করতে। কত লোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটা তা শোনেনি আর একটা ছোট্ট মেয়ে পাঁচজনকে বলে বেড়িয়ে তাঁর এতদিনের সুনাম, মান সম্মান সব নষ্ট করে দেবে এটা কোনমতেই সহ্য করে. পারেননি রেনার্দেত। তাই অগত্যা তাকে চুপ করবার জন্য তার গলাটা চেপে ধরেছিলেন। তার কণ্ঠ রোধ করার জন্য ধীরে-ধীরে চাপটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে তার জিবটা বেরিয়ে এসেছিল। তার কণ্ঠটা নীরব হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের মত। তার নিস্পন্দ দেহটা সেই গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেন, তার পোশাকগুলো জলে ফেলে দেন। ফলে শত তদন্ত করেও কোন কিনারা করতে পারেনি পুলিশ।

অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ভয় বাড়ছিল রেনার্দেতের। তিনি ধীর পায়ে বাড়ি ফিরে গেলেন কিন্তু ক্ষণিকের উন্মাদনায় কেন এ কাজ তিনি করতে গেলেন? তার বয়স এখনও কম। তিনি ত বিয়ে করতে পারেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছয় মাস পর্যন্ত দেহ ও মনের দিক থেকে এক পবিত্র নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে এসেছেন তিনি। কোন নারীকে স্পর্শ করেননি।

হঠাৎ মনে হলো রেনার্দেতের তাঁর ঘরের বাইরের দিকের জানালার পর্দাটা নড়ছে। কে যেন আসতে চাইছে। তিনি উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে অন্ধকারে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন। যেখানে লুসির মৃতদেহটা পড়েছিল সেই জায়গাটা দেখার চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না অন্ধকারে। তবু মনে হলো সেখানে যেন একটা ছোট্ট আলোকবিন্দু জ্বলছে। তারপর নিজের জায়গায় এসে বসতেই তাঁর মনে হলো লুসির নগ্ন মূর্তিটা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে এগিয়ে আসছে তার দিকে। রেনার্দেত ছোট ছেলের মত ছুটে বিছানায় গিয়ে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলেন। এইভাবে সকাল হয়ে গেল।

মুখ হাত ধুয়ে নিচে নেমে গেলেন। কিন্তু কিছুই খেতে পারলেন না। দিনের পর দিন অনিদ্রায় তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গেছে। চোখের কোণে কালো দাগ পড়েছে।

আহারনিদ্রা দুটোই গেল রেনার্দেতের। সারাদিনের মধ্যে কোন কাজ নেই। তবু একবারও বিশ্রাম করতে পারেন না। সন্ধে হতেই ভয় করতে লাগল তাঁর। মনে হলো আজ রাতেও যদি লুসি আসে। নগ্ন মূর্তিতে এসে যদি জড়িয়ে ধরে তাঁকে।

সন্ধের কিছু আগে ছাদে উঠে গেলেন রেনার্দেত। হঠাৎ একটা পরিকল্পনা এল তাঁর মাথায়। তিনি ঠিক করলেন আজ রাতে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চিঠি লিখবেন তিনি। তাতে সব কথা জানিয়ে অনুরোধ করবেন এসব কথা যেন কাউকে না বলেন। তারপর কাল সকালে এই ছাদের উপর উঠে এখান থেকে লাফিয়ে

পড়বেন। আত্মহত্যার সহজ উপায় এর থেকে আর কিছু হতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর পর এতে কেউ কিছু মনে করবে না। তাঁর সুনাম' নষ্ট হবে না।

এই বিরাট উঁচু বাড়িটার ছাদ থেকে এ অঞ্চলের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। নদী এঁকে বেঁকে মাঠের ভিতর দিয়ে উইলো গাছের বনের পাশ কাটিয়ে বয়ে গেছে শান্তভাবে। মাঝে-মাঝে ছোট-বড় পাথর ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। কিন্তু কোন কিছু দেখতে ভাল লাগল না রেনার্দেতের।

সন্ধের পর ঘরের ভিতর ঢুকে চিঠি লিখতে বসলেন রেনার্দেত। চিঠি লেখার কাজে মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ল নিবিড়ভাবে। ফলে আজ আর লুসির কোন প্রেতমূর্তি দেখতে পেলেন না। তার কোন কথাও মনে হলো না। ভোরে উঠে চিঠিটা তাঁর নিজের অফিস ঘরের চিঠির বাক্সতে ফেলে দিয়ে এলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধুকে লেখা একটি খাম। তাঁর নিজের হাতে লেখা ঠিকানা।

সেখান থেকে সোজা ছাদের উপর উঠে গেলেন রেনার্দেত। কিন্তু সকালের স্নিগ্ধ আলো-হাওয়ার স্পর্শে আবার বাঁচার আকাঙ্খা জাগল তাঁর মনে। মনে হলো কেন তিনি মরবেন। তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য প্রচুর শাস্তি ভোগ করেছেন সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে। আর না। এবার থেকে মনটাকে শক্ত করবেন। বিয়ে করবেন। আবার নতুন করে বাঁচবেন। ঘর সংসার করবেন।

হঠাৎ নজরে পড়ল ডাকপিওন মেন্দারিক আসছে। এখনি চিঠিগুলো নিয়ে যাবে ডাক ঝেড়ে। চিঠিটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চলে গেলে তিনি সব জেনে যাবেন। তখন আর বেঁচে থাকার কোন অর্থ হবে না। তাই দ্রুত পায়ে নেমে অফিস ঘরে চলে গেলেন রেনার্দেত। গিয়ে দেখলেন মেন্দারিক বাক্স হতে চিঠিগুলো ঝারছে। রেনার্দেত তাকে হঠাৎ বললেন, আমার লেখা একটা চিঠি আমি ফেলেছি ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখা। চিঠিটা আমাকে ফেরৎ দাও মেন্দারিক।

মেন্দারিক প্রথমে ফেরৎ দিতে যাচ্ছিল চিঠিটা বেছে নিয়ে। কিন্তু মেয়রের মুখ চোখের অবস্থা দেখে তার সন্দেহ হলো। ভাবল হয়ত কোন রাজনৈতিক চক্রান্তের কোন গোপন তথ্য আছে চিঠিতে। তাই সে বলল, এ চিঠি আর দেওয়া যাবে না।

রেনার্দেত প্রথমে ভয় দেখিয়ে বলল, জান তোমার চাকরি আমি যেকোন সময়ে শেষ করে দিতে পারি ?

কিন্তু মেন্দারিকের মাথায় জেদ চেপে গেল। সে বলল, আমার কর্তব্যকর্ম আমাকে করতেই হবে।

মেয়র তখন তার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেন্দারিক তার লাঠিটা উঁচিয়ে সাবধান করে দিল মেয়রকে, খবরদার।

মেন্দারিক ব্যাগের ভিতর চিঠিটা ভরে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। মেয়র তার পিছু-পিছু এগিয়ে চললেন। অনুনয় বিনয় করে বললেন, আমি তোমাকে একশো ফ্রাঁ দেব।

তাতে মেন্দারিক রাজী না হওয়ায় বললেন এক হাজার ফ্রাঁ দেব। দরকার হলে এক লক্ষ দেব। আমাকে চিঠিটা ফেরৎ দাও মেন্দারিক।

কিন্তু পিছন ফিরে না তাকিয়ে ছুটতে লাগল মেন্দারিক। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে রেনার্দেত সেই ছাদের উপর উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌতূহলের বশে পিছন ফিরে দেখল মেন্দারিক, মেয়রের চিলেকোঠার ছাদ থেকে একটা লোক দু'হাত বাড়িয়ে শূন্যে সাঁতার কাটতে-কাটতে অবশেষে নদীর ধারে একটা পাথরের উপর গিয়ে পড়ল। ছুটে গিয়ে দেখল মেন্দারিক, মেয়রের মাথাটা পাথরে লেগে থেঁতো হয়ে গেছে।

আমার বাড়িওয়ালী

My landlady

জর্জ কার্ভেলেন বলল, আমি তখন রু দ্য সাঁতে পেরের একটা ভাল বোর্ডিং হাউসে থাকতাম। আমার বাবা যখন ঠিক করলেন আমি প্যারিসে আইন পড়তে যাব তখন আমি সেখানে কোথায় থেকে পড়াশুনো করব তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয় আমার বাবা মার মধ্যে। আমার ভাতা ঠিক হয় বছরে আড়াই হাজার ফ্রাঁ করে। আমার মা বল্লেন আমি যদি কোন হোটেলে থেকে টাকাটা বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিতে থাকি তাহলে খাওয়ার ব্যাপারে আমার টাকা কম পড়ে যাবে। ফলে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা কোন ভাল বোর্ডিং হাউস খুঁজতে লাগলেন।

অবশেষে আমার এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে সন্ধান পেয়ে বাবা মাদাম কার্গেরানকে চিঠি লিখলেন। তাঁর জবাব পেয়ে তাঁর কথামত কোন এক সন্ধ্যায় তাঁর বোর্ডিং হাউসে গিয়ে উঠলাম আমার মালপত্র নিয়ে।

বাড়িটা পাঁচতলা। মাদাম কার্গেরান আর তাঁর চাকর থাকত একতলায়। দোতলায় ছিল রান্নাঘর আর খাবারঘর। ব্রিতানি থেকে আসা চারজন ছাত্র থাকত তিন আর চারতলায়। আমি পেলাম পাঁচতলায় দু'খানি ঘর। জাহাজের সুদক্ষ ক্যাপ্টেনের মত গোটা বাড়িটার একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত সমস্ত ঘরগুলো তদারক করে বেড়াতেন কার্গেরান। প্রতিটা ঘর দিনে দশবার করে ঘুরে দেখতেন। মায়ের মত সকলের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখতেন। সকলেই ভয় করে চলত মাদাম কার্গেরানকে। কিন্তু এবিষয়ে আমিই হলাম একমাত্র ব্যতিক্রম।

তোমরা হয়ত জান ছোট থেকেই আমার একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল। আমি মাদাম কার্গেরানের মুখের সামনে বললাম তার একটা নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য নই। তিনি নিয়ম করেছেন রোজ রাত্রি বারোটার মধ্যে বোর্ডিং-এ না ফিরলে তাকে বাইরে থাকতে

হবে সেই রাতের মত। আমি বললাম, যদি কোন কারণে রাত বেশী হয়ে যায় কারো, আপনি আইনতঃ ঘর খুলে দিতে বাধ্য।

মাদাম কার্গেরান বললেন, তাহলে পুলিশ ডাকব। তোমার কথার সাক্ষ্য রেখে দেব। তুমি ঘর খুঁজে নেবে। আমার এখানে জায়গা হবে না।

অবশেষে আমি জেদ ধরলে মাদাম আমার কথা মেনে নেন। তবে এই শর্তে যে আমি একথা আর কাউকে বলব না এবং এই ব্যতিক্রমটা শুধু আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সেই ঘটনার পর থেকে আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন মাদাম কার্গেরান। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ। বয়স অনুপাতে দেহটা বেশী পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। কিন্তু বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা দু'জনে বন্ধু হয়ে উঠলাম। এক একসময় আমি তাঁকে চুম্বন করতাম আর তিনি আমার কান মলে দিতেন।

একবার সেই সময় একটি তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। পথেই আলাপ। ভালবাসাটা ক্রমশঃ বেশকিছুটা নিবিড় হয়ে উঠলে আমি তাকে একদিন রাতে আমার বোর্ডিংএর ঘরে আসতে বলি। মেয়েটি প্রথমে রাজী হতে চায়নি। পরে আমার পীড়াপীড়িতে রাজী হয়।

বেশী রাতে বোর্ডিং এ ঢোকার জন্য একটি বিশেষ দরজা ঠিক করা ছিল আমার জন্য। আমি সেইদিক দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে ঢুকলাম। অন্ধকারে পা টিপেটিপে নিঃশব্দে পাঁচতলায় উঠে গেলাম। আমার খুব ভয় করছিল। পাছে মাদাম কার্গেরান জানতে পারেন এবং অন্যান্য ছাত্ররা জেনে ফেলে এজন্য প্রতিমুহূর্তে একটা তীব্র উদ্বেগ অনুভব করছিলাম।

যাই হোক, আমরা নির্বিঘ্নে উপরে উঠে গেলাম। সমস্ত বাড়িটা যেন অন্ধকারে ঘুমোচ্ছে নিথর নিস্পন্দ অবস্থায়। আমরা ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আলো জ্বেলে স্পিরিট ল্যাম্পে চা করে দু'জনে খেলাম। তারপর মেয়েটির গা হতে তার সব পোশাক একে-একে খুলে ফেললাম। সে শুধু একটি পেটিকোট পরে রইল। সে বিছানায় চলে গেলে আমি যখন বিছানায় উঠব এমন সময় ভেজানো দরজা হঠাৎ ঝড়ের বেগে খুলে মাদাম কার্গেরান ঘরে ঢুকলো হাতে একটা বাতি নিয়ে। মাদাম কার্গেরানের পরনেও একটা পেটিকোট ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল মেয়েটি। মাদাম কার্গেরান চিৎকার করে বলল, আমার বাড়িটা বেশ্যাখানা নয়। এই মুহূর্তে ওকে পোশাক পরিয়ে বাড়ির বাইরে দিয়ে এস। কোন কথা শুনতে চাই না।

কথা না বাড়িয়ে তাই করলাম। পোশাক পরে চটিতে পাটা ঢুকিয়ে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল এম্মা। আমি তাকে ডাকলেও সে আর পিছন ফিরে তাকাল না।

আমি তাকে বাড়ির বাইরে দিয়ে ফিরে এলাম। মাদাম কার্গেরান তার ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, যৌবনে মানুষ এরকম করেই থাকে মাদাম। তোমার এটা বোঝা উচিত। রেগো না।

মাদাম কার্গেয়ান বললেন, কিন্তু মনে রাখবে আমার বোর্ডিংএর একটা সুনাম আছে। এখানে এসবকিছু হবে না।

সেই থেকে যতদিন সেখানে ছিলাম এই ধরনের কাজ আর আমি করিনি।

ঘণ্টা

Bell

সে জন্মদুঃখী হলেও একদিন তার এত কষ্ট ছিল না। তার মা বাবা, বাড়ি ঘর কোথায় তা সে কখনো জানে না। শুনেছে তাকে নাকি সদ্যজাত এক শিশুরূপে এক খালের ধারে এক যাজক কুড়িয়ে পান। তিনি মানুষ করেন। তারপর পনেরটা বছর তার একরকমভাবে কেটে যায়। তখন কোন-না-কোন একটা কাজ সে করত।

কিন্তু তার বয়স যখন মাত্র পনের তখন বড় রাস্তার উপর এক পথদুর্ঘটনায় গাড়ী চাপা পড়ে তার পা দুটো চলে যায়। তখন সে জীবিকা অর্জনের জন্য কোন কাজ আর করতে পারত না। তাই ভিক্ষা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইল না।

তবে তখন ভিক্ষে করলেও সময়ে-সময়ে ব্যারণপত্নী দাভেরি তাকে দয়া করে কিছু খেতে দিতেন। তাঁর খামারবাড়ির এখানে সেখানে শীতকালে শোবার জায়গা দিতেন। যেদিন কোন ভিক্ষা জুটত না, খাবার কোনকিছু পেত না সেদিন সে ব্যারণপত্নীর কাছে গেলেই তিনি কিছু খেতে দিতেন। কিন্তু সেই দয়াবতী ব্যারণপত্নী আজ আর নেই।

আজ ও দুটো ক্রাচের উপর ভর দিয়ে চলে। এইভাবে চলে বগলের কাছে দুটো খাল হয়ে গেছে। হাত দুটো লম্বা হয়ে গেছে বেশী। এইভাবে সারা গাঁটা ও রোজ ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়ায় ভিক্ষার আশায়। ও এই কারভিল গাঁ ছেড়ে কোনদিন কোথাও যায় না। কারণ ও ভাল করে কথা বলতেও পারে না। পা দুটো যাবার সঙ্গে-সঙ্গে কথা বলার শক্তিও যেন চলে গেছে। কিন্তু দেহ থেকে সব কর্মক্ষমতা চলে গেলেও পেটে ক্ষুধা ঠিকই আছে। জঠরে তার অনির্বাণ এক ক্ষুধার আগুন জ্বলছে যেন দিনরাত। সে আগুন একবারও নেভে না। আর তার জ্বালায় সে শত কষ্ট সত্ত্বেও লোকের অপরিসীম অপমান সহ্য করে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। মাঝে-মাঝে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে দিগন্তজোড়া মাঠের ওপারে অন্য কোন গাঁয়ের পথে পা বাড়াবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পারে না। কারণ সেখানে সত্যি সত্যিই কোন গাঁ আছে কি না জানে না ও।

ফলে আবার গাঁয়ের মাঝেই ফিরে আসে। মাঠের চাষীরা তাকে দেখেই রেগে যায়। ঠাট্টা করে তাকে বলে 'ঘণ্টা আসছে'। ঘণ্টার মতই ওর ক্রাচদুটো নিয়মিত গাঁয়ের পথে-পথে শব্দ করে যায়। ওরা বলে, আর কোন গাঁ নেই? কোন বাড়িতে

ভিক্ষে চাইতে গেলেই মেয়েরা বলে, রোজ-রোজ তোকে ভিক্ষে দিতে হবে এমন কোন কথা আছে?

একটি গাঁয়ে এত লোক থাকা সত্ত্বেও সে যেন কাউকে চিনত না। কেউ তাকে চিনত না। গাঁয়ের কারো সঙ্গে কোন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না তার। সে যেন ছিল মানুষের মাঝে এক অবাঞ্ছিত জন্তু।

একবার পর-পর দু'দিন কোন ভিক্ষে পেল না ঘণ্টা। দু'দিন সে কিছুই খেতে পেল না। সারা গাঁ বাড়ি-বাড়ি ঘুরেও কিছুই যোগাড় করতে পারল না। যে বাড়িতে সে যায় সে বাড়ির মেয়ে পুরুষ সবাই এককথা বলে। বলে, রোজ-রোজ এলে ভিক্ষে পাওয়া যায়? তোকে সারা বছর ধরে আমাদের খাওয়াতে হবে এমন কিছু কথা আছে?

তবু পেটের জ্বালায় সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে একটার পর একটা করে প্রতিটা বাড়ি ঘোরে। আশা করে যদি কিছু পেয়ে যায়।

তখন ডিসেম্বর মাস। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে সারা মাঠময়। তার উপর রোদ নেই। সারা আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি পড়ে। মাদাম আভেরি থাকতে থাকা-খাওয়ার কোন কষ্ট হত না। আজকাল তিনি না থাকায় রাত্রিটা অন্য কোন খামারবাড়িতে চোরের মত লুকিয়ে ঢুকে কোন আস্তাবলে খড়ের উপর শুয়ে থাকতে হয়। তা না হয় শোয়া গেল। কিন্তু আগে কিছু খাওয়াত চাই! তারপর শোয়ার কথা।

বৃষ্টিতে পথের মাটি ভিজে যাওয়ায় ক্রাচদুটো মাটিতে বসে যাচ্ছিল। পথে যেতে কষ্ট হচ্ছিল ঘণ্টার। তারপর অসহ্য ক্ষুধায় একটা দুর্বলতা অনুভব করছিল সারা দেহে। গাঁয়ের সব বাড়ি ঘোরা হয়ে গেলে গাঁয়ের এক প্রান্তে মঁসিয়ে চিকেতের খামারবাড়ির ধারে গিয়ে ক্রাচদুটো পাশে ফেলে রেখে বসল ঘণ্টা। ও জানে এখানে বসে থেকে কিছু হবে না। তবু ও ঠিক করল আর কোথাও যাবে না। ওর যাবার ক্ষমতা নেই। বাস্তব জগতে সব জায়গায় লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ হয়ে মানুষ এক-এক সময় এমন করে মরিয়া হয়ে অলৌকিক ঐশ্বরিক সাহায্যের এক শূন্য প্রত্যাশায় নিজেকে সঁপে দিয়ে বসে থাকতে চায়। কোন দিকে কোন সাহায্য পাবার আশা থাকে না। তবু তার মনে হয় যদি অভাবনীয় কিছু একটা ঘটে যায় এবং কোন মানুষের মধ্য দিয়ে অযাচিতভাবে নেমে আসে ঈশ্বরের দয়া।

ঘণ্টা দেখল তার সামনে মাঠে একদল মুরগীর ছানা খেলা করছে। মাটিতে খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হলো একটা মুরগীর ছানাকে মেরে ফেলতে পারলেই আগুনে কোনরকমে ঝলসে নিয়ে খেতে পারবে। এই মনে করে একটা ঢেলা দিয়ে একটা ছানা মেরে ফেলল ঘণ্টা। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে অন্য ছানাগুলো পালিয়ে গেল। মরা ছানাটা কুড়োতে যাবে এমন সময় একটা প্রবল ধাক্কা খেল সে। দেখল চিকেত স্বয়ং তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে।

তারপর মার। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি। শুধু চিকেত নয়। তার খামারবাড়ির চাকর, গাঁয়ের বহু লোক এসে তাকে মারতে-মারতে আধমরা করে দিল। চোরকে শাস্তি দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল সবাই, ঘণ্টার আর বসে থাকার ক্ষমতা নেই। চিৎ হয়ে সে শুয়ে পড়ল। দু'দিন জল পর্যন্ত পেটে পড়েনি। এমনিতেই উত্থানশক্তিরহিত। তার উপর এই মার।

এই মারের পরও পুলিশকে খবর দিয়েছিল চিকেত। তার খামারে ডাকাতি করতে এসেছিল ঘণ্টা—পুলিশ এসে শহরে নিয়ে গেল তাকে। থানায় নিয়ে গিয়ে আবার মারতে লাগল কিছু বলাতে না পারায়। ওরা বিশ্বাস করতে পারল না ঘণ্টা দু'-তিন দিন কিছু না খেয়ে এবং প্রচুর আঘাত খেয়ে কোন কথা বলতে বা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কোনকিছু বোঝাতে পারছে না। অবশেষে তাকে হাজতে দেওয়া হলো। কিন্তু সেখানেও কিছু তাকে খেতে দেওয়া হলো না।

পরদিন হাজত ঘর খুলে ঘণ্টার খোঁজ করতে গিয়ে পুলিশ দেখল ঘণ্টা মরে পড়ে আছে। ঠাণ্ডা হিম হয়ে আছে তার অসাড় দেহটা।

রাজার ছেলে

A king's son

বসন্তের কোন-এক রংঝরা বিকেলে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। একটা সাদা মেঘের পাশ থেকে অস্তগতপ্রায় সূর্যের লাল আগুনের মত রোদ ঝরে পড়ছিল। সেই আভায় লাল হয়ে উঠেছিল আকাশটা।

পথে যেন জনতার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। একটা কাফের পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন সামরিক অফিসার গল্প করছিল নিজেদের মধ্যে। এই অফিসার দু'জনের জমকালো পোশাক আর দেহসৌষ্ঠব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সকলেই তাদের পানে তাকাচ্ছিল। এমন সময় কোথা থেকে লম্বা চওড়া একজন নিগ্রো পথ দিয়ে যেতে যেতে অফিসারদের দেখে ছুটে এসে চিৎকার করে ডাক দিল, সান্ধ্য নমস্কার লেফটন্যাণ্ট।

অফিসার দু'জনের মধ্যে একজন ছিল লেফটন্যাণ্ট আর একজন ছিল কর্ণেল। লেফটন্যাণ্ট বলল, আমরা তোমাকে চিনতে পারছি না।

নিগ্রো বলল, আমি কিন্তু তোমাকে বেশ চিনতে পারছি। মনে নেই, সেই বেজির অবরোধ, আমার আঙুর খাওয়া?

অবশেষে অফিসার বলে উঠল, ওঃ তুমি টিম্বাক্টো না?

এই বলে লেফটন্যাণ্ট তার হাতটা বাড়িয়ে দিতে টিম্বাক্টো হাতটা ধরে আফ্রিকার প্রথা অনুসারে চুম্বন করল।

অফিসার বলল, চল টিম্বাক্টো, এটা আফ্রিকা নয়। চল দোকানের ভেতরে গিয়ে বসা যাক। তারপর এখানে কেমন করে এলে ?

টিম্বাক্টো বলল, এখানে আমি একটা রেস্তোরাঁ করেছি। অনেক টাকা পাচ্ছি। ভাল খাওয়া পাওয়া যায় সেখানে। প্রুশিয়ার লোকরা সেখানে খায়। একদিন স্বয়ং সম্রাটকে খাবার পরিবেশন করেছিলাম। প্রচুর টাকা পেয়েছি।

টিম্বাক্টো আরও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু লেফটন্যাণ্ট তার আগেই বলল, আজকের মত এই থাক টিম্বাক্টো। আবার আমাদের পরে দেখা হবে।

টিম্বাক্টো চলে গেলে কর্ণেল বলে, এই অসভ্য লোকটা কে ?

লেফটন্যাণ্ট বলল, শোন বলছি এর কথা।

১৮৭৭ সালের যুদ্ধের কথা তোমার মনে আছে। আমরা তখন বেজি শহরে আটকে পড়ি প্রুশীয়রা ঘিরে রাখে শহরটাকে। আমাদের রসদ ফুরিয়ে যায়। আমাদের উপর ওরা গুলি চালাল না। কিন্তু রসদের কোন ব্যবস্থা করতে দিল না আমাদের। হাতে না মেরে এইভাবে আমাদের অনশনে শুকিয়ে মারার ফন্দী আঁটল ওরা।

আমি তখন লেফটন্যাণ্ট ছিলাম। আমার সৈন্যনিবাসে বিভিন্ন জাতের সৈন্য ছিল। একবার এগারো জন আফ্রিকান সৈন্য আমার সেনানিবাস থেকে কোথায় চলে যায়। একদিন তারা আবার ফিরে আসে। আমি দেখলাম তারা কোনদিন কোন নিয়ম শৃংখলার অধীন হয়ে থাকতে পারে না। তারা মদ খায়। কিন্তু তারা খুব সরল প্রকৃতির আর হাসিখুশি নিয়ে থাকত বলে তাদের আমি ক্ষমা করলাম। আমি আরো দেখলাম টিম্বাক্টো নামে একটা নিগ্রো হচ্ছে সেই দলের নেতা।

একদিন সকালে আমি দুর্গপ্রাকারের উপর দাঁড়িয়ে দিগন্তের পানে তাকিয়ে ''মাছি। এমন সময় আমার মনে হলো নিচে আঙ্গুরক্ষেতে চোরের মত কারা সন্তর্পণে ঘোরাফেরা করছে। তারা গুপ্তচর ভেবে নিজে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ধরতে গেলাম তাদের। তখন আঙ্গুর পাকার সময়। পাকা আঙ্গুরে ভরে আছে গাছগুলো। আমি গিয়ে দেখলাম টিম্বাক্টো হাতে পায়ে ভর দিয়ে চতুস্পদ পশুর মত চলছে এবং আঙ্গুর খাচ্ছে। তার মুখভর্তি আঙ্গুর। অত্যধিক মদ খাওয়ার জন্য তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলেও সে দাঁড়াতে পারছিল না। সে খুব হাসতে লাগল। সে সবসময়েই হাসত এবং কোন সমস্যাকে সমস্যা বলে মনে করত না। সে নাকি কোন এক নিগ্রো রাজার ছেলে ছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় দেখলাম টিম্বাক্টো তার দলের নয়জন অনুচর নিয়ে একটা কাঠের দোলার উপর আটটা প্রুশীয় শত্রুর রক্তমাখা কাটা মুণ্ডু চাপিয়ে কোথা হতে নিয়ে আসছে। পরে জানলাম পাশের গাঁয়ের পথে যেতে-যেতে টিম্বাক্টোর দল হঠাৎ ছয়জন প্রুশীয় সামরিক অফিসার আর দু'জন প্রহরীকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পায়। প্রুশীয়রা না পালিয়ে একটি হোটেলে ঢুকলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সকলকে হত্যা করে টিম্বাক্টোর দল। দেখলাম টিম্বাক্টো নিজেও আহত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হাসছিল।

মাঝে-মাঝে শত্রুসৈন্যদের সুযোগ পেলেই হত্যা করত টিম্বাক্টো। কিন্তু সে কোন জাতীয় সম্মান বা সামরিক গৌরবের আশায় এ কাজ করত না। সে এ কাজ করত কিছু-না-কিছু লাভের আশায়। তার পা পর্যন্ত লম্বা একটা বিরাট ঢিলে জামা ছিল। তার পকেট দুটো বিরাট—পাছা থেকে পায়ের চেটো পর্যন্ত লম্বা। সেদিন সেই প্রুশীয় অফিসারদের মেরে তাদের পোশাক ও তকমায় যেসব সোনা তামা প্রভৃতি ধাতু পেয়েছিল সব পকেটে ভরেছিল। তাই দিয়ে সে মদ খেত। এইভাবে সে মদের খরচ জোটাত।

তবে তার মনটা বড় সরল ছিল এবং আমাকে খুব ভালবাসত। একদিন শীতের সময় আমরা কয়েকদিন যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমাদের রসদ ফুরিয়ে যায়। ক্ষুধা ও ক্লান্তির তীব্রতায় দারুণ কষ্ট হচ্ছিল আমার: এমন সময় টিম্বাক্টো আমার কাছে এসে বলল, তোমরা ক্ষুধার্ত। কিন্তু আমার কাছে খাবার আছে।

এই বলে সে আমায় মাংস এনে দিল। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম তখন ছাগল, ভেড়া, গরু বা ঘোড়ার মাংস যোগাড় করা কোনক্রমেই সম্ভব না। হঠাৎ আমার মনে হলো আফ্রিকার লোকেরা মানুষের মাংস খায় এবং যুদ্ধে চারিদিকে সৈন্য মরছে। মৃত সৈন্যের অভাব নেই। সেই কথা ভেবে তার দেওয়া কোন খাবার আমি খেলাম না।

একদিন রাতে বরফ পড়েছিল। ভীষণ ঠাণ্ডা। আমি তখন পাহারায় ছিলাম। শীতে কাঁপছিলাম আমি। হঠাৎ দেখলাম কোথা থেকে এসে টিম্বাক্টো তার ভারী ওভারকোটটা চাপিয়ে দিয়েছে আমার উপর। আমি প্রতিবাদ করে কোটটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, তা হয় না। তুমি নাও। তোমারও প্রয়োজন আছে।

সে তখন একটা ছোরা বার করে কোটটাকে কেটে ফেলতে গেল। আমি তখন সেটা না নিয়ে পারলাম না।

দিনকতক পরে আমাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। আমাদের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যে যেখানে পারল পালাল। সারা শহরে আমাদের কোন লোক ছিল না। এমন সময় একদিন একটা দোকানে টিম্বাক্টোকে দেখলাম। দোকান মানে রেস্তোরাঁ। টিম্বাক্টো বলল, এই দোকানটা আমি করেছি। কারিগর রেখেছি। প্রুশীয়রা খায় এখানে। আমার কোন কষ্ট নেই।

দেখলাম দোকানের সামনে একটা প্লেটে লেখা রয়েছে। সম্রাটের নিকট অভূতপূর্ব খাদ্যপরিবেশনকারী মঁসিয়ে টিম্বাক্টোর দোকান। ন্যায্য মূল্য।

টিম্বাক্টো আমাদেরই শত্রুদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে তাদের মাঝে দোকান করেছে। এটা একধরনের বিশ্বাসঘাতকতাই। মনে কষ্ট হচ্ছিল। তবু তার কথায় না হেসে পারলাম না। এবং এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে সে আমাদের শত্রু প্রুশীয়দের যত কুখাদ্য ও বাজে জিনিস খাইয়ে তাদের উপর অদ্ভুতভাবে প্রতিশোধ নেবে।

সারমেয় পরিবৃত মানুষ

The man with the dogs

তার বাড়িতে তার স্ত্রী যখন তার সঙ্গে কথা বলত তখন তাকে বলত মঁসিয়ে বিস্তদ। কিন্তু খিয়েবেশ শহরের বিশ মাইলের মধ্যে সবাই তাকে বলত কুকুরঘেরা মানুষ। কারণ সে সব সময় চার-পাঁচটা ভয়ঙ্কর ধরনের কুকুর নিয়ে বেড়াত। বিস্তদকে মোটেই দেখতে পারত না এ অঞ্চলের মানুষ। তাকে সবাই ঘৃণা করত।

এর অবশ্য কারণও ছিল। এ শহরের বেশীরভাগ লোক হলো চোরা-চালানকারী। এই মফঃস্বল শহরে গাছপালা ঝোপঝাড় বেশী। আর দিনের বেলাতেও ছোট-ছোট গলিপথগুলো অন্ধকার হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের পথেঘাটে ঝোপেঝাড়ে প্রায়ই চোরাই মাল পাচার হয়। কেনাবেচা হয়। আর এ কাজের একমাত্র হাতিয়ার হলো একধরনের হিংস্র কুকুর। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোর গলায় বা পিঠে চোরাই—মাল বেঁধে চালান করা হত এখানে সেখানে। কোন কাস্টম অফিসার তাদের ধরতে গেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত তাদের উপর, ঠিক যেমন করে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের উপর।

চোরা-চালানকারী এই শিকারী হিংস্র ধরনের কুকুরগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যই বিস্তদকে নিযুক্ত করা হয়েছিল কাস্টম অফিস থেকে। এজন্য বিস্তদও পুষত কতকগুলো হিংস্র জাতের শিকারী কুকুর। সে তাদের এমনভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখত যাতে তারা চোরাইমাল চালানকারী কোন কুকুর দেখলেই তার উপর ঝাঁপ দিয়ে তার গলাটা কামড়ে দিতে পারে। এ কাজে বিস্তদ নাকি ছিল অদ্বিতীয়।

চোরা-চালানকারীরা সবাই তাই ছিল বিস্তদের শত্রু। কিন্তু তার কুকুরগুলোর জন্য কেউ কিছু করতে পারত না তার। আর বিস্তদ একা থাকত না কখনো। দু'পাশে দুটো কুকুর অন্ততঃ দেহরক্ষী হিসাবে সব সময় থাকত তার সঙ্গে।

বিস্তদের চেহারাটা ছিল দেখতে খুবই খারাপ। তার চুলগুলো ছিল কিছু লাল কিছু হলদে। ভ্রূগুলো ঘন। একমুখ দাড়ি। চোখদুটো শয়তানের মত মিটমিটে। দেহটা রোগা-রোগা এবং কেমন বিকৃত ধরনের। কিন্তু তার স্ত্রী ছিল সত্যিই সুন্দরী। তাদের ঘরের কাছে একটা দোকান ছিল। সেই দোকানে তার স্ত্রী বসত আর সে দোকানের একমাত্র খরিদ্দার ছিল যতসব কাস্টম অফিসার।

এ অঞ্চলের লোকেরা বলাবলি করত, বিস্তদ তার কুকুরগুলোর মত বউটাকেও অফিসারদের জন্য পোষে। সে তার বউকে বিকিয়ে দিয়েছে কাস্টম অফিসারদের কাছে। অফিসাররাও বুঝতে পারত না এমন সুন্দরী মেয়ে কি করে বিস্তদের মত কুৎসিত চেহারার লোককে নিয়ে ঘর করছে। বিস্তদের গায়ে সব সময় কুকুরের গন্ধ।

কিন্তু আসল রহস্যটা কেউ জানত না। এই রহস্যময় ব্যাপারটার কথা জানতে পেরে তারা বুঝল বিস্তদের স্ত্রী কেন এত বিশ্বস্ত। ঘটনাটা ঘটেছিল বছরকতক আগে।

বিস্তদ একবার দেখেছিল কোন এক জায়গায় একটা যুবক তার বউকে চুম্বন করছে। সেখানে সে কিছু বলেনি। তারপর তার ঘরে তার স্ত্রীকে ডেকে দুটো শিকারী কুকুরের সামনে বলল, যদি এই কুকুরগুলোকে দিয়ে তোমার পেট থেকে নাড়ীভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে আনতে না চাও তাহলে আমার হুকুমমত হাঁটুগেড়ে বস।

তার স্ত্রী সেইভাবে বসলে বিস্তদ তার চাবুক দিয়ে নির্মমভাবে মারতে লাগল তার স্ত্রীকে। তার গায়ের পোশাক ভেদ করে তার গায়ের চামড়া কেটে গেল। রক্ত ঝরতে লাগল। অবশেষে যখন বিস্তদের হাত ব্যথা করতে লাগল তখন সে থামল। এত মার সত্ত্বেও একটুও চেঁচাতে দেয়নি বিস্তদ। সে একথা করে চাবুক মারছিল আর একবার করে বলছিল, টুঁ শব্দটি করবে না। কোন গোলমাল করবে না।

একথা তার স্ত্রী কাউকে কখনো বলেনি। সেই থেকে সে বিস্তদের কুকুরদের মতই বিশ্বস্ত ছিল তার প্রতি। কিন্তু নীরবে সবকিছু হজম করলেও সে আঘাত ও অপমানের কথা ভুলতে পারেনি সে। শুধু সুযোগ খুঁজছিল তার স্বামীর উপর চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য।

অবশেষে সে সুযোগ পেয়ে গেল বিস্তদের স্ত্রী। একজন সুদর্শন ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে ভাব হলো তার। এই ব্রিগেডিয়ারকে বিস্তদ দিনকতক আগে চারটে কুকুর বিক্রি করে। এই ব্রিগেডিয়ার ছিল কাস্টম অফিসারদের একজন। একদিন সন্ধ্যার সময় দোকানে যখন একা ছিল তখন বিস্তদের স্ত্রী তাকে সোজাসুজি বলল, যদি তুমি আমাকে চাও তাহলে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। আমার স্বামী আমার উপর দুর্ব্যবহার করে, তার প্রতিশোধ নিতে হবে।

এই বলে সে সব কথা খুলে বলে। অফিসার তার কথায় রাজী হয়ে সেই রাতেই চারটে বড়-বড় শিকারী কুকুর নিয়ে বিস্তদের বাড়ি গেল। বিস্তদের স্ত্রী তার সঙ্গে ছিল।

অফিসার গিয়ে বিস্তদকে বলল, তুমি আমাকে ঠকিয়ে বাজে কুকুর দিয়েছ।

বিস্তদ বলল, তার মানে?

অফিসার বলল, তার মানে এই যে এসব কুকুর চোরাইমাল চালানকারী কুকুরদের ঠিকমত কায়দা করতে পারবে না। আর তোমার 'বুড়ো' নামে ঘাতক কুকুরটার সঙ্গেও পেরে উঠবে না।

বিস্তদের স্ত্রী চোখ টিপতেই অফিসার তার চারটে কুকুরকে লেলিয়ে দিল বিস্তদের দেহরক্ষী ভয়ঙ্কর কুকুরটার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে বিস্তদকে মেঝের উপর একঝটকায় ফেলে দিয়ে চেপে ফেলল। কুকুরদের লড়াইয়ে বিস্তদের কুকুরটা মরল আর অফিসারের দুটো কুকুর ঘায়েল হলো। বিস্তদের সামনেই অফিসার তার স্ত্রীকে চুম্বন করল।

বিস্তদ বলল, এর ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে।

বিস্তদের স্ত্রী অফিসারকে বলল, এতে হবে না। তুমি ওই ঘরে গিয়ে ওর পাঁচটা কুকুরকে গুলি করে মেরে এসো। তা না হলে ওই সব কুকুর দিয়ে আমাকে খাওয়াবে।

অফিসার গিয়ে পাঁচটা রিভলবারের গুলিতে পাঁচটা কুকুরকে মেরে ফেলল। কিন্তু এদিকে অফিসারের যে দুটো কুকুর আগে বিস্তদের কাছে ছিল তারা ততক্ষণে বিস্তদকে চিনতে পারল। তারা এখন তাদের নতুন মনিবের বশীভূত হলেও বিস্তদই তাদের লালনপালন করে একদিন। বিস্তদ তাদের হুকুম করল তার স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। অফিসারের অনুপস্থিতিতে কুকুর দুটো বিস্তদের স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা কেটে দিল।

অফিসার ফিরে এসে দেখে যার জন্য এত কাণ্ড তার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। কুকুর দুটোকে নিয়ে বিষণ্ন মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অফিসার। বিস্তদ সেইভাবে বাঁধা রইল।

পরে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। তবে বিচারে বিস্তদ বেকসুর খালাস পায় আর অফিসারের জেল হয়। সেই থেকে বিস্তদ চোরাই চালানকারী কুকুরের কারবার করে। কাস্টম অফিসারদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে সে।

এই ধরনের কাজে বিস্তদের আজও কোন জুড়ি নেই। বিস্তদ আজও মাঝে-মাঝে বলে, পাপিষ্ঠা মেয়েদের কিভাবে শাস্তি দিতে হয় আমি তা জানি। আমার চোখের সামনে আমার সেই কুকুরদুটো যখন সেই বেশ্যা মাগীটার গলাটা কেটে তার মিথ্যাবাদী মুখটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছিল তখন তা দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

স্নায়বিক উত্তেজনা

The spasm

এই স্বাস্থ্যনিবাসের হোটেলটায় রোজ সন্ধের পর এখানকার বাসিন্দারা যখন রাতের খাওয়ার জন্য খাবার ঘরে ঢোকে তখন সকলে পরস্পরের পানে কৌতূহলভরে তাকায়। নতুন কেউ ঘরে ঢুকলেই তার পানে তাকায় আগ্রহভরে। আগন্তুকদের মধ্যে কোন পরিচিত লোক বেরিয়ে পড়ে কিনা দেখে।

সেদিন সন্ধ্যার পর খাবার ঘরে খেতে গিয়ে দু'জন আগন্তুককে ঘরে ঢুকতে দেখলাম। তারা হলো বাপ আর মেয়ে। দু'জনেরই চেহারা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। বাপটির বয়স খুব বেশী নয়। কিন্তু বয়স অনুপাতে তিনি অত্যধিক বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। তাঁর চেহারাটা খুব রোগা হওয়ার জন্য অস্বাভাবিক রকমের লম্বা দেখাচ্ছে। মেয়েটিও খুব রোগা এবং মাথায় একটু ছোট। তাকে দেখে এত দুর্বল দেখাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল সে নড়ে বসতে বা হাত পা নাড়তে পারছে না।

আর একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম। ভদ্রলোক খাবার সময় যখনি হাত দিয়ে কোন পাত্র ছুঁতে যাচ্ছিলেন তখনি তার হাতটা কেঁপে উঠছিল এবং বস্তুটা স্পর্শ করার আগেই হাতটা এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল।

খাওয়ার পর সন্ধ্যার সময় আমি অন্যদিনকার মত সেদিনও বেড়াতে বেরিয়েছিলাম একা-একা। দু'পাশে ছায়াঘেরা পথটা গেছে একটা বিরাট পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সেই শিতেল গুয়নের দিকে যেখানে আগ্নেয়গিরির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

আমি পথে পা বাড়াতেই দেখলাম সেই ভদ্রলোকও তাঁর মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আমি তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি বললেন, ক্ষমা করবেন মঁসিয়ে, এখানে একটু বেড়াবার জায়গা কোথায় আছে বলতে পারেন?

আমি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললাম কথা বলতে-বলতে। স্বাস্থ্যনিবাসে যারা আসে তারা সবাই রোগী এবং আসে কোন-না-কোন রোগ সারাতে। ফলে এখানে খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় বাসিন্দাদের মধ্যে। একটা সহানুভূতির সেতু রচিত হয় পরস্পরের মধ্যে।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নিজের কোন রোগ নেই। আমার মেয়ের জন্যই আসা। কিন্তু তার রোগটা যে কি, তা কোন ডাক্তার ধরতে পারেনি। কেউ বলে তার হার্ট খারাপ, কেউ বলে এটা তার লিভারের রোগ। আবার কখনো বা কোন ডাক্তার বলে এটা তার মেরুদণ্ডের দোষ থেকে হচ্ছে।

আমি বললাম, আপনার মধ্যে মাঝে-মাঝে যে স্নায়বিক উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায় সেটা কি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া?

তিনি উত্তর করলেন, না। একটা ঘটনার পর থেকে এর জন্ম। শুনলে আশ্চর্য হবেন, আমার মেয়েকে একবার জীবন্ত কবর দেওয়া হয়।

একথা শুনে বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না আমার। ভদ্রলোক তার কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

আমার জুলিয়েতের হার্টের রোগ ছিল। একদিন বাইরে গিয়ে সে পড়ে গিয়েছিল। তাকে যখন বাড়িতে আনা হল তখন তার হাত পা সব ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। কোথাও কোন জীবনের উত্তাপ বা স্পন্দন নেই। ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করল। জুলিয়েত আমার একমাত্র সন্তান। সে ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি তার সমস্ত গয়না তার কফিনে দিয়ে দিলাম। বললাম, তার সব জিনিসপত্র কবর দাও তার সঙ্গে। আমার পুরনো ভৃত্য প্রসপার আমাকে এ কাজে সাহায্য করল।

কবরখানা থেকে সোজা ঘরে ফিরে এলাম। অপরিসীম শোকে স্তব্ধ ও অভিভূত হয়ে রইলাম আমি। রাতে ঘুম এল না চোখে। মাঝরাতে হঠাৎ সদর দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম আমি। এত রাতে কে এল। আমি বাতি হাতে নিচে নেমে গেলাম। চাকরেরা কেউ দরজা খোলেনি। আমি নিজের হাতে দরজা খুলে বললাম, কে?

অন্ধকারে প্রথমে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে গেলাম আমি। পরে দেখলাম সাদা একটা আবছা নারীমূর্তি আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বললাম, কে তুমি?

নারীমূর্তি বলল, আমি বাবা।

আমি তখন আমার কম্পিত হাতটা দিয়ে ভয়ে সেই নারীমূর্তিটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। আমি ভয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেলাম। সেই থেকে আমার হাতটা কোন কিছুর দিকে বাড়িয়ে দিলেই কেঁপে ওঠে। আমার মেয়ে তখন বলল, ভয় করো না বাবা। আমি মরিনি। আমার কবর খুঁড়ে একটা চোর আমার গয়না চুরি করতে যায়। আমার আঙুল থেকে একটা দামী আংটি বার করার জন্য সে যখন আমার আঙুলটা কাটছিল তখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আর সেই সময় চোরটা পালিয়ে যায় কবরটা খুলে রেখে।

আমি তখন ভাল করে তার দিকে তাকালাম। তার আঙুলে সত্যিই রক্ত ঝরছিল। আমি তখন হাঁটু গেড়ে বসে আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরলাম। এমন ভয়ঙ্কর সৌভাগ্য কোন মানুষের জীবনে ঘটতে পারে তা আমার জানা ছিল না। আমি তাকে উপরে নিয়ে গেলাম। চাকরদের ডেকে আগুন জ্বালাতে বললাম। তারা সবাই এ ঘটনায় অবাক হয়ে গেল। আমি বুঝলাম আমার পুরনো ভৃত্য প্রসপারই গয়না চুরি করতে গিয়েছিল। তবু আমি তাকে কিছু বললাম না। কারণ তার জন্যই আমি আমার হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়েছি।

তাঁর সব কথা বলে থামলেন ভদ্রলোক। এদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম, চলুন, এবার হোটেলে ফেরা যাক।

ভয়ঙ্কর

The horrible

বাগানবাড়ির বসার ঘরটিতে তখন মেয়েরা বসেছিল। আর সেই ঘরের বাইরে বাগানে কতকগুলি চেয়ারে গোল হয়ে বসে পুরুষরা গল্প করছিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। ওরা একটা দুর্ঘটনার কথা বলছিল। এই বাগানটার সামনে দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে, গতকাল সেই নদীতে এক দুর্ঘটনায় দুজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা ডুবে গেছে। সবাই একবাক্যে বলতে লাগল, কী ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা!

কিন্তু পুরুষের মধ্যে একজন সামরিক অফিসার বলল, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু ভয়ঙ্কর নয়। কোন ঘটনা মানুষের মনে ভয় জাগালে অথবা তার

অন্তরাত্মাকে দুঃখে অভিভূত করে তুললেই তা কিন্তু ভয়ঙ্কর হবে না। এই জন্য কোন যুদ্ধ বা মৃত্যু বা রক্তপাতের ঘটনামাত্রই ভয়ঙ্কর নয়। ভয়ঙ্কর হলো এমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা যা অনভ্যস্ত ইন্দ্রিয়চেতনাকে অভিভূত করে তোলে। ভয়ঙ্কর ঘটনা কাকে বলে তা শোন।

আমি বলছি ১৮৭০ সালের যুদ্ধের কথা। প্রুশীয়দের কাছে হার মেনে আমরা পশ্চাদপসরণ করছিলাম। আমাদের বিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী অনাহার আর পরাজয়ের গ্লানিতে ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা তখন রুয়েন পার হয়ে হাভারের দিকে সেনাবাহিনীকে সুগঠিত করার জন্য যাচ্ছিলাম। প্রুশীয়রা আমাদের তখনো অনুসরণ করছিল। তখন শীত শুরু হয়েছে। নার্ম্যাণ্ডি অঞ্চলে শীত বড় ভয়ঙ্কর। গাছপালায় বরফ পড়তে শুরু করেছে। আমাদের দু'দিন কিছু খাওয়া হয়নি।

ক্ষুধা, তীব্র শৈত্যপ্রবাহ ও তুষারপাত সহ্য করতে না পেরে কিছু সৈন্য পথেই মারা গেল। বাকিরা এগিয়ে চলল। আমি তখন একটি সৈন্যদলের পরিচালক ছিলাম। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে। দিনেরাতে সমানে এগিয়ে চলেছিলাম আমরা।

একদিন দেখলাম দাড়িগোঁফ কামানো একটি বুড়ো সৈনিককে ঘিরে আমাদের একদল সৈন্য জটলা করছে। তারা তাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছে। কথাটা প্রচারিত হতেই আমার বিনা অনুমতিতেই সৈন্যরা তাকে গুলি করে মেরে ফেলল। যেসব সৈন্যরা ক্ষুধা ও দুর্বলতায় দাঁড়াতে পারছিল না তারা সহসা ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠে জিঘাংসা প্রবৃত্তিতে উন্মত্ত হয়ে উঠল। পরে সৈন্যরা শান্ত হলে আমার দু'জন রক্ষীর সাহায্যে মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে দেখলাম সে সৈনিকবেশী এক বৃদ্ধা নারী, তার কোন সন্তানের খোঁজে এসেছিল। তার অসহায় মৃতদেহের পানে তাকিয়ে তার মাতৃহৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা ও বেদনার কথা শুনে চোখে জল এল আমার।

তার কিছু পরেই 'প্রুশীয়' 'প্রুশীয়' বলে চিৎকার করে উঠল সৈন্যরা। দিগন্তে কোথায় কি দেখেছে তারা। সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল ইতস্ততঃ।

বহুদলে বিভক্ত সৈন্যরা যে যেদিকে পারল পালাল। যারা কোনরকমে টিকে রইল তাদের মধ্যে দেখা দিল দারুণ খাদ্যাভাব। নতুন করে খাদ্য ও সৈন্য সরবরাহ আমাদের কাছে পৌঁছতে আরো কয়েকদিন সময় লাগবে।

অবশিষ্ট সৈন্যরা যখন দেখল এবার ক্ষুধার জ্বালায় তাদের পরস্পরের মাংস ভক্ষণ করতে হবে তখন তারা সকলে মিলে একটা নিয়ম খাড়া করল। সকলেই একসঙ্গে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কেউ কারো বন্দুকের গুলির সীমানার মধ্যে আসবে না। সকলেই সাবধানে দূরে-দূরে পথ চলতে লাগল। কেউ যেন হঠাৎ গুলি করে অন্য কাউকে মেরে ফেলতে না পারে।

এমনি করে সারাদিন ধরে তারা পথ চলত। দিনের শেষে কোন নদী বা ঝর্ণার ধারে এসে তারা একজন-একজন করে জল খেয়ে আসত। তারপর আবার পরস্পরের মধ্যে সমান দূরত্ব বজায় রেখে আবার পথ চলতে শুরু করত সেই বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে।

একদিন সকালে দেখলাম ভয়ঙ্কর এক ঘটনা যার থেকে ভয়ঙ্কর আর কিছু হতে পারে না। পথ চলতে-চলতে হঠাৎ একটি সৈন্য নিয়ম ভঙ্গ করে অন্য একটি সৈন্যের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল। তা দেখে সৈন্যটি পালিয়ে না গিয়ে শুয়ে পড়ে তার দিকে এগিয়ে আসা সৈন্যটিকে লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু গুলিটি তার গায়ে লাগল না। তখন সে শুয়ে থাকা সৈন্যটিকে গুলি করে হত্যা করল। তখন চারদিক হতে সৈন্যরা ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরল। হত্যাকারী সৈন্যটি তখন মৃত সৈনিকটির দেহটাকে কেটে খণ্ড বিখণ্ড করে সকলকে ভাগ করে দিল। আবার তারা আগেকার মত সমান দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলতে লাগল। আবার এই ধরনের কোন হত্যাকাণ্ড ঘটলে তারা সবাই এক জায়গায় জড়ো হবে।

এইভাবে দু'দিন তারা মানুষের মাংস অর্থাৎ আপন সহকর্মীর মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে। দু'দিন পর আবার সেই জ্বালাময়ী ক্ষুধা অসহ্য হয়ে উঠল তাদের মধ্যে। তখন যে সৈন্যটি প্রথম একজনকে খাবার জন্য হত্যা করে, সে আবার একজনকে হত্যা করল। সেইভাবে তার মৃতদেহ টুকরো-টুকরো করে সকলকে বিলিয়ে দিল। তারপর পথ চলতে লাগল সেই মানুষখেকোর দল। অবশেষে খাদ্য সরবরাহ এসে পৌঁছল।

এবার আশা করি বুঝতে পারছ ভয়ঙ্কর ঘটনা বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি?

প্রথম তুষারপাত

The first snowfall

ল ত্রয়সেত নদীটা এঁকেবেঁকে দূর দিগন্তে নীল সমুদ্রের মাঝে গিয়ে মিশে গেছে। সেইখানে সেই মোহনার কাছে অভ্রভেদী শৃঙ্গের মুকুট মাথায় পরে দিগন্তটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে এস্তেরেল পাহাড়।

বাঁদিকে এক উপসাগরের মাঝে সেন্ট মার্গারাইত ও সেন্ট অনোরাত দ্বীপ। চারদিকে তার ফার গাছের বন। বাঁদিকে সেই উপসাগর আর ডানদিকে লম্বা পাহাড়টাকে ফেলে রেখে সূর্যের আলোয় যেন ঘুমোচ্ছিল সাদা রঙের বাড়িটা। শুধু একটা না, এখানে পাহাড়টার পা থেকে শুরু করে তার সারা গায়ে অনেক বাড়ি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণের এই অঞ্চলটায় শীতকালেও শীতের তীব্রতা তত অনুভূত হয় না। এসময় এখানকার প্রতিটি বাড়িতে, বাগানে গাছে-গাছে সোনারবরণ কমলালেবু দোল খায়।

লা ক্রয়সেত নদীর ধারে এবং সমুদ্রের কাছে অবস্থিত ছোট্ট একটি বাড়ি থেকে এক যুবতী মহিলা বেরিয়ে এসে বাগানে একটা বেঞ্চের উপর বসল। তার মুখ মৃতপ্রায় কোন মানুষের মতই ম্লান। তার মুখের হাসিটা বড়ই করুণ। সে কয়েক পা এসেই হাঁপিয়ে উঠেছে। সে খুব কাশছে এবং কাশিটা থামাবার এক বৃথা চেষ্টাস্বরূপ সে

মুখের উপর একটি হাত চাপা দিল। সে জানে আর বেশীদিন সে বাঁচবে না। মৃত্যু তার অবধারিত। তবু সে একবার সমুদ্র আর একবার এস্তেরেল পাহাড়টার পানে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, আমি কত সুখী! কী আনন্দ!

সে ভাবল না ক্রয়সেত নদীর মত জীবনের স্রোত আগের মত ঠিক বয়ে যাবে। শুধু সেই অকালে চলে যাবে পৃথিবী থেকে। তবু প্রাণভরে একবার এই বাগানের নির্মল বাতাস থেকে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তার ক্ষয়রোগগ্রস্ত ফুসফুসটাকে পরিপূর্ণ করে তুলল। তারপর সে সেইখানে বসে বসেই দিবাস্বপ্নে ঢলে পড়ল। অতীতের কথা ভাবতে লাগল।

আজ হতে চার বছর আগে কোন এক নর্ম্যান ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বেশ সরল সুগঠিত চেহারা। মুখে অল্প দাড়ি আছে। সব সময় হাসিখুশি নিয়ে থাকে। কিন্তু তার মনটা বড় সংকীর্ণ। অথচ সে নিজে শহরের মেয়ে এবং শহরের আদবকায়দা ও জীবনযাত্রা প্রণালীতে সে অভ্যস্ত। তার মনে কোন সংকীর্ণতা বা অহেতুক কৃপণতা নেই। তবু সে কেন যে এ বিয়েতে মত দিল তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। হয়ত পিতামাতাকে খুশি করতে চেয়েছিল সে। তাঁদের কথার অবাধ্য হতে চায়নি।

যাই হোক, বিয়ের পর তার স্বামী তাদের গাঁয়ের বাড়িতে তাকে নিয়ে আসে। চাষের কাজ তদারকের জন্য বারো মাস সে সেইখানেই থাকে। নর্ম্যান যুগের পাথরের দেওয়ালওয়ালা বড়-বড় পুরনো গাছে ঘেরা এক বিরাট বাড়ি। বাড়িটার সামনেটা একরাশ ফার গাছ জুড়ে রেখেছে। বাড়িটার ডান দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ খামারবাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে।

গাড়ী থেকে নেমে বাড়িটায় প্রথম পা দিয়েই কি ভেবে সে বলেছিল তার স্বামীকে, জায়গাটা ভাল মনে হচ্ছে না।

তার স্বামী হেসে উত্তর করেছিল, থাকতে-থাকতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়িতে কিছু ঝি চাকর ছাড়া কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। সারাদিন সময় কাটতে চায় না। রাত্রি এলে আরো খারাপ লাগে। তার স্বামী সারাদিন মাঠে কাজকর্ম নিয়ে কাটায়। সন্ধের সময় ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে। সারারাত গভীরভাবে ঘুমোয়। তার মুখে হাসি লেগেই আছে। সে চমৎকারভাবে নির্জন গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত।

বসন্ত ও গ্রীষ্মটা একরকম বেশ কাটল তার। সেও এক-একদিন তার স্বামীর সঙ্গে মাঠে যেত। নির্মল বাতাস উপভোগ করতে-করতে ফাঁকা মাঠে ঘুরে বেড়াত। তারপর শরৎকাল এল। তার স্বামী এই সময় রোজ তার কুকুর দুটো নিয়ে শিকারে চলে যেত। সন্ধের সময় শিকারের গল্প করত তার কাছে। সে গল্প তার ভাল লাগত না। তবে মেণ্ডার আর মির্জা নামে কুকুর দুটোকে তার ভাল লাগত। তারা শিকার থেকে ফিরে এলে তাদের যত্ন করত মাতৃস্নেহে।

সবচেয়ে তার মুস্কিল দেখা দিল শীতকাল আসার সঙ্গে-সঙ্গে। এ অঞ্চলের শীত বড় তীব্র। বিকালটা কাক দেখে কাটাত সে। বিকাল চারটে বাজার সঙ্গে-সঙ্গে কোথা

থেকে অসংখ্য কাক এসে তার বাড়ির বাঁদিকে আর ফার গাছে ভিড় জমাত। কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করত। সন্ধে হলে নিজের ঘরে চলে যেত সে। সে আলাদা ঘরে শুত। কিন্তু সারারাত শীত ভাঙত না। ডিসেম্বর মাসে শীত আরো তীব্র হয়ে উঠল। একদিন সে তার স্বামীকে বলল, রাত্রিতে শীতে বড় কষ্ট হয়। বাড়িতে হট এয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করো। এখনো আসল শীত বাকি আছে।

তার স্বামী একথা শুনে হাসতে লাগল। বলল, ঠাট্টা করছ? এরপর বলবে কুকুরগুলোকে খাওয়াবার জন্য রূপোর থালা দরকার! আমরা শহুরে লোক নই। ওসব পাব কোথায়?

সেবার জানুয়ারী মাসে তাকে প্যারিসে চলে যেতে হলো ঘটনাক্রমে। কারণ এক দুর্ঘটনায় তার বাবা মা একসঙ্গে মারা যান। তাই প্যারিসে গিয়ে মাসকতক থাকতে হয় তাকে। তারপর আবার তাকে ফিরে আসতে হলো নর্ম্যাণ্ডির সেই গাঁয়ে। আবার সেই ভয়ঙ্কর শীত এল। সন্ধের পর নিজের ঘরে জ্বলন্ত আগুনের সামনে যখন হাত দুটো বাড়িয়ে আগুন পোহাত, তখন মনে হত তার পিঠের হাড়ের ভিতর শীতের কনকনে হাওয়া ঢুকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে তাকে। রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে শত শীতবস্ত্র সত্ত্বেও শীত যেত না। শীতের তীব্রতার জন্য ঠিকমত ঘুম হত না। একদিন সে তার স্বামীকে বলল, চল, এক সপ্তা প্যারিসে বেড়িয়ে আসি।

তার স্বামী সেকথায় আশ্চর্য হয়ে বলল, প্যারিসে? সেখানে গিয়ে কি করব?

আশ্চর্য মানুষ তার স্বামী! জীবনে কোন পরিবর্তন চায় না। সে সবসময় সুখী। একদিন সে তার স্বামীকে বলল, আমার এখানে ভাল লাগছে না। আমার সর্দি করেছে!

তার স্বামী বলল, এখানে আসার পর তোমার মাত্র একবার সর্দি করেছে।

রাত্রিতে শুয়ে যখন শীতে ঘুম আসছিল না তার তখন হঠাৎ তার স্বামীর সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, তোমার মাত্র একবার সর্দি করেছে। তখন সে ভাবল সে ইচ্ছে করে ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্দি ও কাশি ধরাবে। তার অসুখ দেখে তার স্বামী হট এয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করবে। বিছানা ছেড়ে ঘরের দরজা খুলে অন্ধকারে সে বাগানে চলে গেল। তখন বরফ পড়ছে চারদিকে। সে খালি পায়ে বরফঢাকা মাটিতে হাঁটল। তারপর আবার ঘরে ফিরে এল। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দারুণ জ্বর ও সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হলো সে। ডাক্তার এল। ডাক্তার এসে স্থান পরিবর্তনের কথা বলল। হট এয়ার প্ল্যান্টের কথা বলল। ডাক্তার বলল, রোগী এখানে থাকলে পরের বছর শীত আর তাকে দেখতে হবে না। তাই তার স্বামী হেনরী তাকে দক্ষিণাঞ্চলের এই সমুদ্রতীরবর্তী বাড়িটায় স্থান পরিবর্তনের জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু সেই সর্দি কাশি আজও সারেনি তার।

হঠাৎ স্বামীর একটা চিঠি পেল সে। তার স্বামী লিখেছে—প্রিয়তমা, আশা করি তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ। এখানে কয়েকদিন আগে তুষারঝড় বইতে থাকে। তার ফলে এরপর বরফ পরবে। আমার অবশ্য কোন কষ্ট হয় না তাতে। বরং ভালই লাগে।

তবে তোমাকে আর দুঃখ করতে হবে না। আমি বাড়িতে এবার হট এয়ার প্ল্যান্ট বসাচ্ছি।

আরো কি সব লেখা ছিল চিঠিতে। কিন্তু আর পড়ল না সে। এই খবরটায় মনে তার বড় আনন্দ হলো। কিন্তু এমন সময় তার কাশি এল। যে দুষ্ট কাশি তার বুকের ভিতরটা একটা অবাধ্য জন্তুর মত ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে সেই কাশিটা চাপা দেবার জন্য এক হাত মুখের উপর চেপে রাখল সে।

সব শেষ

All over

তাঁর সাজপোশাক শেষ করে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিফলনটার পানে তাকিয়ে হাসল কাউন্ট লর্মেরিন। অস্ফুট স্বরে আপন মনে বলল, লর্মেরিন তাহলে এখনো বেঁচে আছে।

মাথার চুলে সামান্য পাক ধরলেও লর্মেরিনের চেহারাটা এখনো সুন্দর আছে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, মুখে অল্প মোচ।

প্রসাধনকক্ষ হতে বেরিয়ে সে সোজা চলে গেল বসার ঘরে। সেখানে অনেক চিঠি ও কাগজপত্র অপেক্ষা করছিল তার জন্য। টেবিলের উপর তিনটে খবরের কাগজের সঙ্গে প্রায় একডজন চিঠি পড়েছিল। রোজ এই চিঠিগুলো দেখার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হয় এগুলো ভগবানের কী অদ্ভুত সৃষ্টি। একই সঙ্গে চিঠিগুলোর বহিরঙ্গ এক অস্পষ্ট ভয়, উদ্বেগ এবং এক সানন্দ প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে মানুষের মনে। এগুলোর ভিতর আসলে তখন কি কথা লেখা থাকে তা বোঝা যায় না।

কোন বিশেষ চিঠি খোলার আগে লর্মেরিন আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নেয় চিঠির উপর লেখা ঠিকানাগুলো। কোনটা কার হাতের লেখা তা দেখে কে বুঝতে পারে। একটু দেখেই সে বলে দিতে পারে কার হাতের লেখার ধরন কেমন। অবশেষে একটি খামের চিঠি তুলে নিল লর্মেরিন। খামটা দেখে মনে হলো এই হাতের লেখাটা তার চেনা। কিন্তু অনেকদিন আগের দেখা। বহুদিন এই হাতের লেখা চিঠি ও প্রায়ই পেয়েছে। লর্মেরিনের মনে হলো কেউ হয়ত টাকা ভিক্ষে চেয়েছে তাঁর কাছে। যাই হোক, খামটা খুলে পড়তে লাগল।

প্রিয় বন্ধু, তুমি হয়ত আমায় নিঃসন্দেহে ভুলে গেছ। কারণ আজ হতে পঁচিশ বছর আগে আমাদের দু'জনের মধ্যে শেষ দেখা হয়। আমি তখন যুবতী ছিলাম, এখন বৃদ্ধা। আজ হতে পঁচিশ বছর আগে তোমার কাছ থেকে শেষবারের মত বিদায় নিয়ে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেশে চলে গিয়েছিলাম। আমার সেই বৃদ্ধ

স্বামী যাকে তুমি 'আমার হাসপাতাল' বলে ঠাট্টা করতে। তাঁকে তোমার আজও মনে আছে কিনা জানি না। আজ হতে পাঁচ বছর আগে তিনি মারা যান। এখন আমি এই দেশের বাড়ি থেকে প্যারিসে যাচ্ছি আমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে। আমার একটি মেয়ে আছে। সে সুন্দরী, তার বয়স এখন আঠারো। সে যখন পৃথিবীতে আসে তখন সেকথা তোমায় জানিয়েছিলাম। কিন্তু এরকম একটা তুচ্ছ ঘটনায় তুমি কোন মনোযোগ দাওনি।

তুমি হচ্ছ চিরসুন্দর লর্মেরিন। তোমার সেই লিসে বা তুমি যাকে লিসঁ বলে ডাকতে তাকে আজও মনে আছে কি? যদি থাকে তাহলে আজ সন্ধ্যায় তার কাছে এসে একসঙ্গে খাবে। আজ সে বয়োপ্রবীণা ব্যারণী দ্য ভাঁসে। তোমার একজন অতি বিশ্বস্ত বান্ধবী হিসাবে আজ সে তার অনুরক্ত হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তোমার প্রতি যে হাত শুধু তুমি বন্ধুভাবে জড়িয়ে ধরতে পার, কিন্তু চুম্বন করতে পার না। হে আমার প্রিয় জ্যাকলেত। লিসে দ্য ভাঁসে।

চিঠিখানা পড়ে লর্মেরিনের বুকের ভিতরটা লাফাতে লাগল। তার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে উঠল। সে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ল। চিঠিটা পড়ে রইল তার কোলের উপর। চোখের কোণে জল দেখা দিল। জীবনে যদি কোন মেয়েকে সত্যি সত্যিই একদিন ভালবেসে থাকে তাহলে সে হচ্ছে লিসে দ্য ভাঁসে। কোন এক বাতরোগগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যারণের ছিপছিপে চেহারার সুন্দরী স্ত্রী লিসে। লর্মেরিন তাকে সত্যিই ভালবাসে এবং সেও লর্মেরিনকে ভালবাসে। সেই লিসেই ভালবেসে তাকে আদর করে ডাকত জ্যাকলেত। এ নামটা তারই দেওয়া।

কত কথা ভিড় করে আসতে লাগল মনে। অসংখ্য মিষ্টি স্মৃতির মাঝে একটি বিশেষ দিনের কথা মনে আছে। তখন বসন্তকাল। কোন এক মনোরম সন্ধ্যায় কোন এক ভোজসভা থেকে বাড়ি ফেরার পথে লিসে হঠাৎ তার বাড়িতে চলে আসে। তাকে নিয়ে বেড়াতে যায় বোলনের লেক দিয়ে। তার গায়ের ও পোশাকের মিশ্রিত গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল মৃদু বাতাসে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল লেকের জলে, তার স্পষ্ট মনে আছে আনন্দে তখন কাঁদতে থাকে লিসে। লর্মেরিন এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'তা জানি না।' লর্মেরিন তখন আবেগের সঙ্গে লিসেকে জড়িয়ে ধরে বলে, হে আমার প্রিয় লিসে, তুমি কত সুন্দর!

এত সুন্দর একটি প্রেমের অকালমৃত্যু ঘটল অকস্মাৎ। লিসের বৃদ্ধ স্বামী লর্মেরিনের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ তাঁর সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল তার গাঁয়ের বাড়িতে। আর তার কয়েক মাসের মধ্যে সেকথা ভুলে গেল লর্মেরিন। প্যারিসের কোন অবিবাহিত যুবকের জীবনে কত নারী আসে যায়। তাদের রঙীন স্মৃতিরেখাগুলো বালুচরে জলের রেখার মত ধুয়ে মুছে যায় অতি অল্পদিনের মধ্যে। তবু তার মনের কোণে লিসের জন্য একটুখানি জায়গা আজও রেখে দিয়েছিল লর্মেরিন।

অন্য চিঠিগুলো একবার দেখে নিয়ে লর্মেরিন ঠিক করে ফেলে আজই সন্ধ্যায় লিসের বাড়িতে যাবে। সারাটা দিন উত্তেজনার মধ্যে কাটাল লর্মেরিন। পঁচিশ বছর পর তাকে দেখে কি চিনতে পারবে সে?

প্রসাধন সেরে পোশাক পরে সন্ধের আগেই রওনা হলো লর্মেরিন। লিসেদের বাড়ি গিয়ে তাদের ড্রইংরুমে ঢুকেই দেওয়ালে টাঙানো তার একখানা ছবি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল লর্মেরিন। লিসে তাহলে আজও মনে রেখেছে তাকে। কিছুক্ষণ বসে থাকতে হলো তাকে। তারপর এক বৃদ্ধা নারী ঘরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠল লর্মেরিন। লিসেকে চিনতে সত্যিই কষ্ট হয়। তার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। তবু তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত অনেকক্ষণ ধরে চুম্বন করল লর্মেরিন। তারপর তার মুখ থেকে আপনা হতে বেরিয়ে এল একটা কথা, লিসে তুমি!

লিসে বলল, হ্যাঁ আমি। অনেক দুঃখ সহ্য করে-করে জীবনটা শেষ হয়ে গেছে আমার; অকালে বুড়ো হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি আজও কত সুন্দর আছ!

লিসেকে পাশে বসিয়ে তার হাতখানা অনেকক্ষণ ধরে রইল লর্মেরিন। কিন্তু লিসের বুড়ী ঠাকুরমার মত মুখখানার পানে তাকিয়ে কি বলবে খুঁজে পেল না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর লিসে বলল, আমার মেয়ে রেণীকে ডাকছি।

রেণী এলে তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল লর্মেরিন। এ যেন তরুণী যুবতী লিসের অবিকল প্রতিরূপ। ঠিক যেন আগেকার দিনের সেই লিসে। লর্মেরিন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। লিসে বলল, তোমার আগেকার সেই উচ্ছল ছটফটে ভাব আর নেই।

লর্মেরিন বলল, আগেকার অনেক জিনিসই হারিয়েছি।

কিছুক্ষণ পর উঠে পড়ল লর্মেরিন। বাজারে কিছুটা বেড়িয়ে ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু বাতিটা নিয়ে ঘরের বড় আয়নাটার সামনে যেতেই হঠাৎ মনে হলো লর্মেরিনের তারও যেন বেশ বয়স হয়েছে। তার চুলেও পাক ধরেছে। এমন করে খুঁটিয়ে কোনদিন দেখেনি বলে ধরা পড়েনি। তার মুখেও বার্ধক্যের কিছু-কিছু অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠেছে।

আয়নাটার উপর প্রতিফলিত নিজের মূর্তির পানে হতাশভাবে তাকিয়ে দুঃখিত চিত্তে আপন মনে বলে উঠল লর্মেরিন, হায়, সবকিছু শেষ লর্মেরিন।

—অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

একটি সন্ধ্যা

One evening

স্টীমার ব্রেক্তার গিয়ে থামলো। সামনেই আমাদের 'বাগী গালফ'। সেইদিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। উঁচু পাহাড়গুলি ক্যাবিল অরণ্যানীতে ঢাকা পড়েছে। দূরে হলুদ রঙের বালি সোনালী আভায় নীল সমুদ্রের ধারে চকচক করছে। আর সেই ছোট শহরটির বাড়িগুলির ওপরে সূর্যের তেজ প্রচণ্ড বেগে আগুন ঢেলে দিয়েছে।

উষ্ণ আফ্রিকার মিষ্টি গন্ধ মরুভূমির ওপর দিয়ে আমার নাকে এসে লাগল; এটি হচ্ছে সেই রহস্যময় বিরাট মহাদেশ যার ভেতরে উত্তর পৃথিবীর মানুষেরা খুব কমই প্রবেশ করেছে। গত তিন মাস ধরে সেই বিরাট, অজ্ঞাত মহাদেশের কিনারে-কিনারে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি—এ সেই দেশ যেখানে ঘুরে বেড়ায় উটপাখী, উট, গেজেল, গণ্ডার, গোরিলা, হাতি আর নিগ্রোর দল। আন্দোলিত পতাকার মত আমি এদেশের বাতাসে আরবদের ঘোড়ায় চড়ে ছুটে যেতে দেখেছি। আমি বেদুইনদের লালচে তাঁবুর নীচে ঘুমিয়েছি। এর আলো, ম্যাজিক, আর দীর্ঘায়ত দিকচক্রবালে আমি অভিভূত।

কিন্তু এই ভ্রমণের শেষে ফিরে যেতে হবে ফ্রান্সে, ফিরে যেতে হবে অলস গাল্পগল্পে মুখরা, অতি সাধারণ কর্মচাঞ্চল্যে ভরা, আর বিরতিহীন করমর্দনের নগরী প্যারীতে। এই প্রিয়, এই অভিনব দেশটি ছেড়ে আমাকে চলে যেতেই হবে। দুঃখ হয় এই অল্প পরিচয়ের জন্যে।

অনেকগুলি ছোট-ছোট নৌকা স্টীমারের চারপাশ ঘিরে ভাসছিল। তাদেরই একটার ওপর আমি লাফিয়ে পড়লাম। নৌকার মালিক একটি যুবক নিগ্রো। তারপরে এসে হাজির হলাম প্রাচীন সারাসেন সমুদ্রের উপকূলে। সুটকেসটির পাশে দাঁড়িয়ে আমি যখন পাহাড়-ঘেরা চারপাশের অপরূপ সৌন্দর্য মসগুল হ'য়ে দেখছিলাম এমন সময় আমার মনে হলো একটা ভারি হাত কে যেন আমার ঘাড়ের ওপরে রাখলো।

ঘুরে চেয়ে দেখি একটি বেশ দীর্ঘাঙ্গী ভদ্রলোক নীল দুটি চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ভদ্রলোকের দাড়িগুলি লম্বা, মাথায় স্ট্র হ্যাট, পরনে সাদা ফ্ল্যানেল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার স্কুলের পুরনো সহপাঠী নন?

সম্ভবত। আপনার নামটি কি?

ত্রেমোলিঁ।

আরে, আরে, আরে। তুমি আমার ক্লাসে পড়তে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেই তোমাকে আমি চিনেছি।

সে তার লম্বা দাড়ি দিয়ে আমার গাল ঘষে দিল।

পুরনো সহপাঠীকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আমি তার হাতে মোচড়ের পর মোচড় দিতে লাগলাম।

চারটি বছর স্কুলে সে আমার প্রিয়তম বন্ধু ছিল। তখন সে ছিল রোগাটে, গোলাকার ভারি মাথা। হাঁটার সময় ঘাড়টাকে সে একবার ডানদিকে বাঁকাতো, আর একবার বাঁদিকে। আমাদের ক্লাশে সবচেয়ে বেশী প্রাইজ পেত সে। বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ—এই ছেলেটির মনটা সাহিত্যিকের। সে যে পরে বিখ্যাত কবি হ'য়ে উঠবে সেদিক থেকে কলেজে পড়ার সময় আমাদের কোনরকম সন্দেহ ছিল না। তার বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; তিনি ছিলেন একজন কেমিস্ট। ব্যাচেলার ডিগ্রি পাওয়ার পরে তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

আমি চিৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে তুমি করছ কী?

সে হেসে উত্তর দিল—আমি এখানেই থাকি।

কী ! চাষ-আবাদ করছ এখানে ?

হ্যাঁ।

কী চাষ কর ?

আঙুর। আঙুর থেকে তৈরি করি মদ।

রোজগারপাতি ভাল হয় ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

শুনে খুশি হলাম।

তুমি কি হোটেলে উঠবে ?

অবশ্যই।

তুমি আমার বাড়িতে এস।

কিন্তু।

কিন্তু-টিন্তু নয়। এস।

যে যুবক নিগ্রোটি আমাদের কথা শুনছিল তাকে লক্ষ্য ক'রে সে বলল, আলি, বাড়ি চল।

ত্রেমোলিঁ আমার হাত ধরে এগোতে লাগল। তার বাড়িটা হচ্ছে পুরনো মুরিশ ধাঁচের। ভেতরে উঠোন। রাস্তার ওপর কোন জানালা নেই। আশেপাশের বাড়ি থেকে অনেক উঁচু ; সমুদ্র তীর, অরণ্যানী, পাহাড়তলী, তা ছাড়িয়ে বাড়িটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খুশি হয়ে বললাম, আঃ, কী চমৎকার ! একখানা বাড়ি বটে। প্রাচ্য দেশের সব মোহ আর আকর্ষণ এর মধ্যে জমায়েত হয়েছে। তোমার ভাগ্য ভাল যে এরকম একটা বাড়ি তুমি পেয়েছ। এই বারান্দার উপরে রাত কাটানো কি আনন্দের। তুমি কি এইখানেই ঘুমোও ?

গ্রীষ্মকালে ঘুমোই। আজ সন্ধের সময় আমরা বেড়াতে যাব। মাছ ধরতে ভাল লাগে তোমার ?

কি ধরনের ?

টর্চ লাইট জ্বেলে মাছ ধরা।

হ্যাঁ ; ভালবাসি।

ঠিক আছে। ডিনার সেরেই বেরোব। ফিরে এসে ছাদের ওপরে বসে ঠাণ্ডা কিছু খাব।

তাই হল। উৎকৃষ্ট ডিনার খেয়ে মৎস্য শিকারে বেরিয়ে গেলাম আমরা।

বন্দরের কাছে আমাদের নৌকা অপেক্ষা করছিল। নৌকাতে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে একটি লোক নৌকা বাইতে শুরু করল। ওইখানেই বসেছিল লোকটি ; কিন্তু তার মুখ আমি দেখতে পাইনি। আমার বন্ধুটি আলো জ্বালানোর পাত্রটা হাতে নিয়ে বসল। সে বলল, বর্শা দিয়ে আমি মাছ গেঁথে তুলি। এবিষয়ে আমার দক্ষতা কোন শিকারীর চেয়ে কম নয়।

বললাম, আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

ভাসতে-ভাসতে আমরা সমুদ্রের এমন একটা জায়গায় এসে হাজির হলাম যেখানটা উঁচু-উঁচু পাহাড়ে বোঝাই হয়ে রয়েছে। তাদের ছায়াগুলি জলের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ বুঝতে পারলাম সমুদ্রের জল আলোতে চকচক করছে। দাঁড় ফেলার তালে-তালে আমাদের সামনে সমুদ্রের ওপরে অদ্ভুত আলো জ্বলতে লাগল; তারপর মিলিয়ে গেল জলের ভেতরে। নৌকা চলার সঙ্গে-সঙ্গে যে ঠাণ্ডা আগুন জ্বলতে লাগল সেইসব আলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে আমি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলাম। জল শান্ত হয়ে গেলেই আলো নিভে যায়। অন্ধকারের ভেতরে আলোর স্রোতের মধ্যে দিয়ে আমরা তিনজন ভেসে চললাম।

আমরা চলেছি কোথায়? আমাদের সঙ্গীদের আমি দেখতে পাইনি। দাঁড়ের ঘা খেয়ে জলের ওপরে আলোর যে ছোট-ছোট ঢেউ উঠছিল সেইগুলিই কেবল আমার চোখে ধরা পড়ছিল। প্রচণ্ড গরম, মনে হচ্ছিল অন্ধকারকে যেন উনানের ওপরে তাতানো হয়েছে। দূরে আরবদেশের কুকুর চিৎকার করছে। তাদের রঙ লাল; চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। সমুদ্রের তীর থেকে মরুভূমির অন্তস্থল পর্যন্ত বেদুইনরা যেখানে তাঁবু খাটিয়ে থাকে ওরা তারই পাশে-পাশে প্রতিদিন রাত্রিতে ওইরকম চীৎকার করে। সেই স্বর শুনে শেয়াল, খেঁকশিয়াল আর হায়নারা পাল্টা চেঁচায়। আর নিঃসন্দেহে অনতিদূরে যে অ্যাটলাস পর্বতমালা রয়েছে তাদের ভেতরের কোন জায়গা থেকে নিঃসঙ্গ সিংহও একটা গর্জন করে উঠল।

হঠাৎ দাঁড়ী থেমে গেল। কোথায় এসেছি আমরা? আমার কাছেই একটা খসখস শব্দ শুনলাম। দেশলাই-এর আলোতে একটা হাত চোখে পড়ল আমার। শুধুমাত্র একটা হাত। হাতটা একটা ঝাঁঝরির দিকে একটা ক্ষীণ আলো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই ঝাঁঝরির ওপরে চিতার মত সাজানো একরাশ কাঠ। অবাক হয়ে এই অদ্ভুত বস্তুটির দিকে আমি তাকালাম। দেখলাম সেই ক্ষীণ বাতিটি একমুঠো শুকনো পলকা কাঠের ভেতরে ঢুকে গেল। কাঠগুলো জ্বলে উঠলো। সেই আলোতে দুটি মানুষ আমার চোখে পড়ল—একটি রোগা-প্যাটকা বৃদ্ধ—মাথার চারপাশে একটি রুমাল বাঁধা; আর একজন সাদা দাড়িওয়ালা ড্রেমর্লি—আমার বন্ধু।

ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল নৌকাটি। জ্বলন্ত আলোয় সমুদ্রের তলা পর্যন্ত চোখে পড়ল আমার। জলের তলায় যেসব গাছপালা জন্মায় সেগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। লাল, নীল, সবুজ, হলদে শরগাছের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলাম আমরা। মাঝে-মাঝে শরগাছগুলি জলের ওপরে জেগে উঠল। আমাদের ধীর গতিতে একটুও তারা হেলে পড়ল না।

সমুদ্রের সেই অরণ্যের মধ্যে রোগা-রোগা সাদা মাছগুলি তীব্রবেগে ছুটতে-ছুটতে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কতকগুলি মাছ সেই ঘাসের বনে সুন্দরভাবে ভেসে উঠল। কিন্তু তাদের ধরা গেল না। তারপরে হঠাৎ সমুদ্রের জল আর দেখা

গেল না। বনের আবছায়ায় হারিয়ে গেল। নৌকার আলোতে অস্পষ্ট বিরাট-বিরাট পাথর আর বিবর্ণ সামুদ্রিক লতাগুল্ম ভেসে উঠল আমাদের চোখের সামনে।

নৌকার গলুই-এর ওপরে ছিপের কাঁটা তুলে ড্রেমর্লিঁ ঘাড় নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে সে যেন শিকারের খোঁজে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। হঠাৎ সে তার কাঁটাটাকে এমন তীব্র আর সাবলীল ভঙ্গিতে জলের ওপরে ছুঁড়ে দিল যে বিরাট একটা মাছের গায়ে সেটা বিঁধে গেল। বেচারা আমাদের এড়িয়ে তখন পালিয়ে যাচ্ছিল।

ড্রেমর্লিঁর এই অকস্মাৎ শরীর সঞ্চালন ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করিনি আমি। তারপরেই কানে এল তার অস্পষ্ট বিজয়ধ্বনি। তারপরেই দেখলাম লোহার কাঁটায় গাঁথা একটা বিরাট মাছ ধড়ফড় করতে-করতে ওপরে উঠে আসছে। আলোর সামনে ধরে নিজে দেখে আর আমাকে দেখিয়ে মাছটাকে সে নৌকার খোলের মধ্যে ফেলে দিল। সেই সামুদ্রিক মাছটা পাঁচটা খোঁচা খেয়ে নিজের দেহটা জড়াতে লাগল ; তারপরে আমার পাশে নীচেটায় গর্ত ভেবে আশ্রয় নিতে গিয়েই নৌকোর খোলের মধ্যে যে কালো জল ছিল তারই ভিতরে গুঁড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। সেইখানে মৃতপ্রায় অবস্থায় সে কেবল কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। এইরকম ক'রে রাশি-রাশি মাছ ধরল ড্রেমর্লিঁ। এক-একটা ধরে, আলোর সামনে নিয়ে দেখে, তারপরে খোলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এইভাবে নানা শব্দমুখর অন্ধকার সমুদ্রের জলে ভাসতে-ভাসতে আমি তন্ময় হয়ে বসেছিলাম—হঠাৎ আমার বন্ধুটি চিৎকার ক'রে উঠল—তবে রে ব্যাটা!

বর্শাটা ছুঁড়ে দিল বন্ধু; তুলে আনলো বিরাট একটা মাংসপিণ্ড—লাল দেহটা তার থরথর ক'রে কাঁপছে। লোহার কাঁটাগুলো কাঠের বাঁট পর্যন্ত তার গায়ের চারপাশে বিঁধে গিয়েছে। বস্তুটি হচ্ছে একটি অকটোপাশ—সে তার শুঁড়গুলিকে একবার গুটিয়ে নিচ্ছে আর একবার ছড়িয়ে দিচ্ছে। এইগুলি দিয়েই সে রক্ত চুষে খায়।

বন্ধুটি সেই বিরাট সামুদ্রিক জানোয়ারটিকে শূন্যে তুলে ধরল। দেখতে পেলাম দৈত্যটার দুটো বিরাট চোখ আমার দিকে জুলজুল ক'রে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ দুটি ভয়ঙ্কর; মনে হল, কোটরের ভেতরে দুটি আলু উঁচু হয়ে রয়েছে। নিজেকে মুক্ত মনে ক'রে জানোয়ারটা তার শুঁড়গুলোকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। শুঁড়ের প্রান্তভাগটা সুতোর মত সরু। একটা শুঁড় আমার বসার জায়গাটাকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা শুঁড় ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। সেই সরু-সরু নরম শুঁড়ের কী প্রচণ্ড শক্তি। এই দেখে ড্রেমর্লিঁ তার ছুরি বার ক'রে জানোয়ারটার দুটো চোখের ওপরে প্যাঁট-প্যাঁট ক'রে বসিয়ে দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলার একটা শব্দ কানে এল আমাদের; মনে হল, কতকটা হাওয়া যেন বেরিয়ে গেল। স্থির হ'য়ে গেল অকটোপাশ। মারা গেল না; তবে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেল। আর সে কারও রক্ত চুষতে পারবে না।

আর একটা কাজ করল ড্রেমলিঁ। বর্শার খোঁচা দিয়ে গেঁথে সে জানোয়ারের শক্তিহীন দেহটাকে ওপরে তুলে নিয়ে আগুনের সামনে ধরল; তারপরে তার শুঁড়ের প্রান্তভাগগুলিকে গনগনে আগুনের ওপরে ধরে আচ্ছা করে পোড়ালো। আগুনের সংস্পর্শে এসে তার শুঁড়গুলো কুঁকড়িয়ে-কুঁকড়িয়ে দলা পাকাতে লাগল—জানোয়ারটার সেই যন্ত্রণা দেখে আমার খুব কষ্ট হল। আমি চিৎকার ক'রে বললাম—কী করছ?

তার মনে কোনরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। সে শান্তভাবে বলল—এই রক্তপিপাসু জানোয়ারটার কাছে কোন শাস্তিই নিষ্ঠুর নয়।

এই ব'লে সেই আহত ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিকলাঙ্গ জানোয়ারটাকে সে খোলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। সেইখানে কালো জলের মধ্যে হতভাগ্যটা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মরা মাছগুলির মধ্যে প'ড়ে-প'ড়ে মরতে লাগল।

এইভাবে মৎস্য শিকার করতে-করতে একসময় আমাদের কাঠ শেষ হয়ে আসতে লাগল, নিবু-নিবু হ'য়ে এল আগুন। ড্রেমলিঁ তখন আগুনের চুল্লীটাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল; সঙ্গে-সঙ্গে নিটোল অনার্য একটি অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপরে। তারপরে ধীরে-ধীরে আমরা ফিরে এলাম।

বাড়িতে ফিরে ছাদের ওপরে বিশ্রাম করতে গেলাম আমরা। পাহাড়তলীর পেছন থেকে কাস্তের মত চাঁদ ধীরে-ধীরে উঠতে শুরু করেছে। আফ্রিকার মৃদু উষ্ণ হাওয়া বইতে শুরু করেছে ধীরে-ধীরে। সেই সঙ্গে ভেসে আসছে ফুলের মৃদু সুবাস।

চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম আকাশ, পাহাড়তলী, সমুদ্র আর আশপাশের অজস্র নীচু বাড়ির দিকে, হঠাৎ মনে হল, সারা প্রাচ্যদেশের আত্মাটি যেন ধীরে-ধীরে আমাকে গ্রাস ক'রে ফেলছে। যেসব অজস্র কাহিনী, আর অ্যারাবিয়ান নাইটস্-এর গল্প এই দেশটির প্রাচীন যুগকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিল আমার মন সেইখানে উড়ে গেল। আমি যেন শুনতে পেলাম নারীরা কত আশ্চর্য-আশ্চর্য যাদুকাহিনী বলে বেড়াচ্ছেন, সিল্কের পায়জামা পরে প্রাসাদ অলিন্দে রাজকুমারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা যেন আমি দেখতে পেলাম; দেখতে পেলাম রূপোর বাতিদানে সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে; আর মায়াবী উপদেবতার মত সেই ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

বন্ধুকে বললাম—এমন দেশে থাকতে পেয়েছ তুমি। তুমি সত্যিই সৌভাগ্যবান।

সে বলল—হঠাৎ এসে পড়েছি এখানে।

হঠাৎ?

হ্যাঁ; সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য—দুই-ই বলতে পার।

আমার সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। তার কথার সুর শুনে মনে হল জীবনে সে অনেক দুঃখ পেয়েছে। একটু থেমে সে বলল—আমার দুঃখের কাহিনী তোমাকে বলতে পারি। আমার কষ্টও কিছু কমবে তাতে।

বল।

তাহলে শোন। কলেজে আমি কেমন ছিলাম তা তুমি জান। কেমিস্টের দোকানে আমি মানুষ হয়েছি; কিন্তু মনটা আমার ছিল কবির। বই লেখার স্বপ্ন আমার চিরকালের

স্বপ্ন। কলেজ ছাড়ার পরে সে চেষ্টা আমি ক'রেছিলাম। কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয়নি। একটা কাব্যগ্রন্থ লিখলাম, তারপরে একটা উপন্যাস। কোনটাই বিক্রী হয় নি। শেষকালে লিখলাম একটা নাটক। কোনদিনই তা মঞ্চস্থ হয়নি। তারপরে আমি প্রেমে পড়লাম। প্রেমে পড়ার বিস্তারিত বিবরণ তোমাকে আমি বলব না।

আমার বাবার দোকানের পাশে একটি দর্জির দোকান ছিল। সেই দর্জির মেয়েকেই আমি ভালবেসেছিলাম। মেয়েটি বুদ্ধিমতী; হায়ার স্কুল পরীক্ষায় পাশ করেছিল, সপ্রতিভ—তার দেহের মত মনটাও ছিল পুষ্ট। বয়স তার বাইশ কিন্তু দেখতে পনেরো বছরের কিশোরীর মত। শারীরিক গঠনটাও বেশ সুন্দর; তন্বী, মুখের রঙ চকচকে, মোলায়েম, অনেকটা কমনীয় ওয়াটার-কলার-এর মত। তার নাক, মুখ, চোখ, কান, হাত, তার হাসি, চলন-বলন এত সুন্দর যে তার একমাত্র যোগ্যস্থান ছিল কাঁচের শো-কেস; বাস্তব জগতে ঘুরে বেড়ানোর যোগ্যতা তার কমই ছিল। তা সত্ত্বেও প্রাণময়ী বলতে যা বোঝা যায় সে ছিল তাই; চলনে—চঞ্চলা; এবং অবিশ্বাস্য কর্মঠ। মেয়েটিকে আমি খুব ভালবেসেছিলাম। প্রেমের উন্মাদনা কী জিনিস তা তুমি জান। নারী যখন কোন পুরুষের চিত্তকে অধিকার ক'রে বসে তখন তাকে উন্মত্ত ক'রে তোলে। প্রেমিকার কথা ছাড়া আর কিছুই সে চিন্তা করতে পারে না।

শীঘ্রই আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তাকে জানালাম। আমার সেই পরিকল্পনাকে সে সমর্থন করল না। সে বিশ্বাস করল না যে কবি, ঔপন্যাসিক, অথবা নাট্যকার হ'য়ে আমি কিছু করতে পারব; তারচেয়ে সে ভেবেছিল ব্যবসাপাতি করলে আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। আমাকে অগত্যা সেই পরিকল্পনা ছাড়তে হল; আমার হাতে লেখা পুঁথিগুলি বিক্রী ক'রে দিয়ে আমি একটা বই-এর দোকান কিনলাম। দোকানটার মালিক মারা যাওয়ার ফলে দোকানটা বিক্রী হয়ে যায়। দোকানটা মার্সেলিস-এ। নাম ইউনিভার্সিয়েল লাইব্রেরী।

পরের তিনটি বছর আমাদের ভালই কেটেছিল। দোকানটাকে আমরা একটি পাঠাগারে পরিণত করেছিলাম। শহরের অনেক শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা সেখানে গল্প করতে আসতেন। ক্লাবে যেমন মানুষ যায় সেইভাবেই তারা এখানে আসত। বই নিয়ে আলোচনা করত, কবি—ঔপন্যাসিকদের নিয়ে আলোচনা করত; আলোচনা করত রাজনীতি নিয়ে। বই বিক্রী করার ভার ছিল আমার স্ত্রীর ওপরে। শহরে সে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আর আমি পাশের ঘরে বসে পড়াশুনা করতাম। তাদের গল্প করার শব্দ, হাসি-আলোচনার শব্দ আমার কানে আসত। মাঝে-মাঝে তাদের কথা শোনার জন্যে আমি লেখা বন্ধ ক'রে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকতাম। আমি তখন একটা উপন্যাস লিখছিলাম—সেটা আর শেষ হয়নি।

যারা নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মঁসিয়ে মনতিনা; দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দর চেহারার অবস্থাপন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। কালো চুল; অহেতুক প্রশংসা করতে মানুষটি খুব দক্ষ ছিল। মঁসিয়ে বারবেত আসতেন। তিনি হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট। আসতেন মঁসিয়ে ফসিল, আর লাবারেগ—এঁরা ছিলেন ব্যবসাদার। রয়্যালিস্ট পার্টির নেতা মারকুই

দি ফ্রেচিও আসতেন। ও অঞ্চলের সবচেয়ে গণ্যমান্য মানুষ ছিলেন তিনি। বয়স তাঁর ছেষট্টি।

ব্যবসাপত্র ভালই চলছিল। আমিও খুব সুখী হয়েছিলাম। একদিন বেলা প্রায় তিনটের সময় বিশেষ একটা কাজে আমি এক জায়গায় গিয়েছিলাম; এমন সময় একটা বাড়ি থেকে একটি মহিলাকে আমি বেরিয়ে আসতে দেখলাম। তাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রীর সাদৃশ্য এত বেশী যে আমি যদি তাকে বাড়িতে রেখে না আসতাম তাহলে জোর গলায় আমি বলতে পারতাম ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ নয়।

ভদ্রমহিলা আমার সামনে দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, একবারও তিনি পিছু ফিরে তাকাননি। শুধু অবাক হইনি; রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। তাই কোন কিছু চিন্তা না করেই আমি তার পিছু নিলাম। নিজেকে নিজে বললাম—এ সে নয়। কিছুতেই নয়। অসম্ভব; তার ভীষণ মাথা ধরেছে। তাছাড়া, ওই বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজনটাই বা কী তার?

তবু, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমি তার পিছু-পিছু দ্রুত হাঁটতে লাগলাম, আমি যে তাঁর পিছু নিয়েছি এটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন, অথবা, তিনি আমার পায়ের শব্দ চিনতে পেরেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। হা ঈশ্বর! এতো সে-ই। আমাকে দেখেই একটু লজ্জা পেয়ে সে থেমে গেল; তারপরে একটু হেসে বলল—আরে তুমি!

খুব খারাপ লাগল আমার। আমি বললাম—হ্যাঁ। তুমি তাহলে বাইরে বেরিয়েছিলে? কিন্তু তোমার মাথার যন্ত্রণা?

কমেছে। আমার একটা জরুরী কাজ ছিল।

কোথায়?

দোকানে; কিছু পেনসিলের অর্ডার দিতে।

আমার মুখের দিকে সে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালো। এখন তার মুখের ওপরে লজ্জার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। তার পরিবর্তে মুখ কিছুটা বিবর্ণ হয়েছে। তার সেই ঝকঝকে পরিষ্কার দুটি চোখ, হায়—নারীর চোখ—দেখে মনে হল সে সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু আমার কেমন যেন একটা অস্পষ্ট সন্দেহ হল—সে আমাকে মিথ্যে কথা বলছে। সে যে মিথ্যে কথা বলছে সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম; কিন্তু সেকথা তার মুখের ওপরে বলতে আমি সাহস করিনি। একাজ সে করল কেন? সেবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না। তাই আমি ভাবলাম—শরীর ভাল থাকলে নিশ্চয় তুমি বেরোতে পার। এখন কি তুমি বাড়ি ফিরছ?

হ্যাঁ।

তাকে ছেড়ে দিয়ে একা-একা রাস্তায় বেশকিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমি। ব্যাপারটা কী? তার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি কেমন যেন বুঝতে পেরেছিলাম সে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু এখন আর সেকথা ভাবতে পারছিনা। ডিনারের সময় বাড়ি ফিরে গেলাম। তাকে যে আমি একমুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করতে পেরেছি একথা ভাবতেই নিজের ওপরেই আমার কেমন রাগ হয়েছিল।

তুমি কি কোনদিন হিংসার আগুনে পুড়েছ? যাই হোক, হিংসা আর সন্দেহের প্রথম দোলাটি আমার হৃদয় স্পর্শ ক'রে গেল। স্পষ্ট কোন সন্দেহ তার ওপরে আমার ছিল না। আমি শুধু জানতাম সে মিথ্যে কথা বলেছে। একথা তুমি মনে রেখো, পথে-প্রান্তরে, কাজে-অকাজে যখনই আমরা দু'জনে একলা থাকতাম তখনই তার কাছে আমার মনের সব কথাই খুলে বলতাম। কারণ তাকে আমি ভালবাসতাম। আমার বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা তারই কাছে আমি সমর্পণ করেছিলাম। সন্দেহটা পুরোপুরি কায়েমী হ'য়ে বসার আগে আমি কেমন মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আহার এবং নিদ্রা কোন কিছুতেই আমার আর কোন স্পৃহা ছিল না।

সে আমাকে মিথ্যা কথা বলল কেন? ও-বাড়িতে ও করছিল কী? ব্যাপারটা জানার জন্যে চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারিনি আমি। ওই বাড়িটির দোতলায় যে থাকত তাকে জিজ্ঞাসা করেছি—তিনতলা—চারতলায় যারা থাকত—তাদের কাছেও অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু কোন সূত্রই আমি খুঁজে পাইনি। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত, সে ওই বাড়িটিতে গিয়েছিল, এবং আমার কাছে সেই সংবাদটি সে গোপন করেছে। সুতরাং নিশ্চয়ই ওখানে কোন রহস্য রয়েছে। কিন্তু সে-রহস্যটা কী? মাঝে মাঝে মনে হোত প্রত্যেকেরই ছোটখাট অন্তরঙ্গ নিজস্ব কোন গোপনীয়তা থাকে—আমারও হয়ত তা রয়েছে—যা থেকে বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য নয়—অপরপক্ষ তার যত নিকট সম্বন্ধই হোক না কেন। তোমার যদি কোন যুবতী স্ত্রী থাকে, তাহলে তোমাকে না ব'লে কিছুই কি সে করতে পারবে না? বিবাহের অর্থ কি এই যে দম্পতিরা পরস্পরের কাছে নিজেদের বিলোপ ক'রে দেবে, জলাঞ্জলি দেবে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে? আমার চরিত্রের খুঁটিনাটি সে বেশ ভালভাবেই জানে। সে হয়ত মনে করেছে তার বিশেষ কোন কাজ—সেটা যত নিরপরাধই হোক না কেন—আমার হয়ত তা মনঃপুত হবে না। তার হাতের আঙুলগুলি বড় সুন্দর। হয়ত সে ওই সন্দিগ্ধ বাড়িতে নখ কাটতে গিয়েছিল। পাছে অমিতব্যয়ীতার জন্যে আমি কিছু বলি এই জন্যেই হয়ত আসল কথাটা সে আমাকে বলেনি। নারীহৃদয় স্বভাবতই কিছুটা জটিল এবং কুটিল।

কিন্তু যতই যুক্তি দেখাই না কেন, আশ্বস্ত কিছুতেই আমি হ'তে পারলাম না। একটা নাম-না-জানা দুশ্চিন্তা আর সেই সঙ্গে সন্দেহ আমাকে গ্রাস ক'রে বসল। ওর কি কোন প্রেমিক রয়েছে? ভেবে দেখ একবার ব্যাপারটা, অসম্ভব, অসম্ভব। তা কি কখনও হ'তে পারে...কিন্তু...তবু...

সেই দীর্ঘ, সুবেশ চাটুকার মনতিনার মুখটা আমার মনে সব সময় ভাসছিল। আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম—'তারা নিশ্চয় দোকানে ব'সে কোন প্রেমের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করে। তার পরিণামই হচ্ছে এই।' তাদের হাতেনাতে ধরার জন্যে আমি তলায় রবার দেওয়া জুতো কিনলাম। ছল ক'রে অসংখ্যবার নিঃশব্দে পাশের ঘরে যাতায়াত করলাম। একবার আমি হামাগুঁড়ি দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোকানের

দিকে এগোতে লাগলাম; তারপরে আবার সেইভাবে পিছিয়ে এলাম। একটা নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমার দিন কাটতে লাগল। আমার কাজ গেল, আমার আহার-নিদ্রা গেল, শান্তি গেল। মনের মধ্যে বিরাট একটা যন্ত্রণা নিয়ে অস্থির হ'য়ে বেড়াতে লাগলাম আমি। বাড়ি থেকে কিছুটা বাইরে গেলেই মনে হোত—ওই সে এসেছে। মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে আসতাম আমি। ফিরে এসে দেখতাম—না, কেউ নেই। আবার বেরোতাম। আবার ফিরে আসতাম। না; এখনও সে আসেনি। এইভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

রাত্রিটা আমার কাছে আরও অসহ্য হয়ে উঠল। কড়িকাঠের দিকে মুখ ক'রে আমি চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। পাশে শুয়ে থাকত সে। কখনও ঘুমোত, অথবা, ঘুমোনোর ভান করত। আর মনের মধ্যে অজস্র জ্বালা আর যন্ত্রণা নিয়ে নিজের ভেতরেই ছটফট করতাম আমি। জানতাম, এ রহস্যের সমাধান আমি কোনদিনই করতে পারব না; করার সাধ্য আমার নেই। তার দিকে তাকিয়ে দেখ—সে তার পরিষ্কার নিটোল দৃষ্টি দিয়ে তোমার দিকে ফিরে তাকাবে। কিন্তু সব ভুল, সব ভুল; মাঝে মাঝে মনে হোত তার সেই আপাত নিরপরাধ চোখ দুটির ভেতরে সুঁচ ফুটিয়ে দিই, তার প্রবঞ্চনাকে প্রকাশ ক'রে দিই বাইরে। আমি তার কব্জি দুটো মুচড়ে দিয়ে বলতে পারতাম—অপরাধ স্বীকার কর। করবে না? দাঁড়াও, তোমাকে আমি মজা দেখাচ্ছি। তাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলতে পারতাম; কিম্বা পারতাম আগুনে তার আঙুলগুলি পুড়িয়ে দিতে। এবার বল—সত্যি কথা বল। বলবে না? গনগনে চুল্লীর ওপরে দাঁড় করিয়ে তোমাকে আমি দগ্ধ করব। তখন তুমি বলবে—বলতে বাধ্য হবে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে সে চিৎকার ক'রে তার কাহিনীটি বলতে লাগল। মনে হল, তার সেই চিৎকার শুনে পাশের বাড়িতে ঘুমন্ত নর-নারী জেগে বিছানার ওপরে উঠে বসেছে। আমার কথা যদি বলেন তার সেই কাহিনী শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অন্ধকার চোখের সামনে আমি যেন সেই উদ্দাম, স্বাস্থ্যময়ী, কামনাময়ী, ছলাকলায় বিশেষ পারদর্শিনী সেই কামিনীটিকে দেখতে পেলাম।

শান্তভাবে আমার বন্ধুটি বলে গেল—তোমাকে এসব কথা বলছি কেন তা আমি জানিনা; এ কথা আমি আজ পর্যন্ত কাউকেই বলিনি। তবে গত দু'বছরের মধ্যে বলার মত কাউকেই আমি দেখিনি। কাউকে বলতে না পারায় আমার মনটা চোলাইকরা মদের মত ফুলে-ফুলে উঠছে। তোমার কাছে বলার ফলে আবার মনটা যেন হালকা হয়ে উঠেছে।

তবে আমি একটা ভুল করেছিলাম। ঘটনাটা শোন। তারপরে আমিও একটা চাল চাললাম। বাইরে যাওয়ার ভান করলাম আমি। আমি বাইরে গেলেই আমার স্ত্রী বাইরে লাঞ্চ খেতে যেত। তাদের ধরার জন্য একটি বিশেষ রেস্তোরাঁর ওয়েটারকে আমি যে ঘুষ দিয়েছিলাম সে কথাটা বলাই বাহুল্য।

ঠিক হল, আমাকে ঠিক সময়ে "প্রাইভেট রুমের" দরজাটা সে খুলে দেবে। উপযুক্ত সময়ে হত্যা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গুলিভরা পিস্তল নিয়ে আমি সটাসট ভেতরে ঢুকে যাব। যা যা ঘটতে পারে কল্পনায় সেগুলি আমি একেবারে ছক ক'রে নিলাম। মনে হল, সমস্ত ঘটনাটা ছবির মত আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। গিয়ে দেখব ছোট একটা টেবিলের ওপরে গ্লাস, বোতল, আর খাবারের প্লেট সাজানো রয়েছে। তার একপাশে সে, আর একপাশে মনতিনা। আমাকে দেখে তারা অবাক হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত আমার দিকে ভয়ার্ত নেত্রে তাকিয়ে থাকবে। নড়াচড়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলবে। একটিও কথা না বলে লোকটির মাথা লক্ষ্য ক'রে আমি গুলি করব। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সে একগুলিতেই ধপাস ক'রে পড়ে যাবে। তারপরে আমি আমার স্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়াব। কী ঘটলো, আর কী ঘটতে পারে সেটা যাতে বুঝতে পারে তার জন্যে তাকে এক মিনিট সময় দেব। সহাস্য বদনে দৃঢ় চিত্তে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াব তার সামনে। সে ভয়ে আর্তনাদ ক'রে আমার মার্জনা ভিক্ষা করবে। আমি তাকে একেবারে হত্যা করব না। দগ্ধে দগ্ধে মারব। আমাকে তোমার খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু তুমি কি ভাবতে পার এই ব্যাপারে পুরুষ কত কষ্ট পায়। যে নারীকে সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, যাকে সে তার সর্বস্ব উজাড় ক'রে দিয়েছে সেই মেয়ে তোমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে আর একজনের অঙ্কশায়িনী হবে একথা তুমি ভাবতে পার? যে পুরুষকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব? আমি অবাক হয়ে ভাবি, হত্যা করার নেশা কত কমে গিয়েছে আজকাল। কারণ, যারাই এইভাবে প্রতারিত হয়েছে তাদেরই মাথায় হত্যা করার নেশা জাগে; নিজের ঘরে, অথবা, পথেপ্রান্তরে হত্যার চিন্তায় মসগুল হ'য়ে থাকে তারা।

রেস্তোরাঁয় হাজির হয়ে ওয়েটারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বুঝতে পারলাম দু'জনেই যথাস্থানে হাজির হয়েছে। শক্ত হাতে রিভলবারটি ধরে আমি দৃঢ়পায়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

যথাসময়েই হাজির হয়েছিলাম আমি। তখন তারা পরস্পরকে চুমু খাচ্ছিল। কিন্তু একি! এতো মনতিনা নয়—এ যে সেই ছেষট্টি বছরের বুড়ো জেনারেল ফ্লেচি। মনতিনাকেই যে দেখব সেবিষয়ে আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে বৃদ্ধটিকে দেখে আমার সমস্ত পরিকল্পনা কেমন যেন ভেস্তে গেল। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

তা ছাড়া...তা ছাড়া...এ-ব্যাপার যে কেমন ক'রে ঘটতে পারে তা আমি আজও বুঝতে পারিনি। মনতিনাকে দেখতে পেলে রাগে আমি উন্মত্ত হয়ে উঠতাম ঠিকই; কিন্তু এ যে অন্য ব্যাপার? এই বৃদ্ধ, লম্বোদর, ঝোলা গাল চেহারার লোকটাকে দেখে বিরক্তিতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। আর ওই শিশুটা—দেখতে পনের বছরের কিশোরীর মত—সেই মেয়েটি এই রকম মৃত্যু-পথযাত্রী একটি বৃদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণ করল! কারণ, লোকটা একটা মার্কুই, একজন জেনারেল, গদীচ্যুত রাজাদের আত্মীয় বলে? ওদের দেখে কী যে তখন আমার মনে হয়েছিল সেকথা

আজ আর আমার মনে নেই। একটা বুড়ো মানুষকে আমি মেরে ফেলতে পারিনা। না, না—সে কাজটা মোটেই রুচিসম্মত হবে না। আমার স্ত্রীকে হত্যা করার বাসনা আর আমার রইল না। সব মহিলারাই এই একই গোত্রের। আর কারও ওপরে আমার কোন বিদ্বেষ রইল না। এই চরম বীভৎসতায় জীবন সম্বন্ধে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম।

পুরুষদের সম্বন্ধে যা হয় তুমি ভাবতে পার; কিন্তু মনের দিক থেকে তারা এত নোংরা নয়। এরকম পুরুষ যদি কেউ থাকে তাহলে বিশ্বের উপহাস তাকে কুড়োতে হয়। কোন বৃদ্ধার স্বামী অথবা প্রেমিক চোরের চেয়েও বেশী উপহাসের পাত্র। সত্যি কথা বলতে কি পুরুষরা অনেক সভ্য; কিন্তু মেয়েদের হৃদয় কদর্য—তারা সব বারবণিতার দল। অতি ঘৃণ্য কারণে যুবক অথবা বৃদ্ধ যেকোন মানুষের কাছেই তারা আত্মবিক্রয় করতে পারে—কারণ এইটাই তাদের নেশা, তাদের পেশা—তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপাদান। জাতিগতভাবে এরাই হচ্ছে নির্বিকার বিবেকহীন বেশ্যা—প্রেম বিক্রী করাই এদের একমাত্র কাজ—তা পয়সা নিয়ে কোন বৃদ্ধের কাছেই হোক, অথবা, প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্যে কোন কামার্ত পুরুষের কাছেই হোক।"

প্রাচীন যুগের পয়গম্বরের মত ক্রুদ্ধকণ্ঠে নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার ক'রে উঠলো। মনের আগুনে জ্বলতে-জ্বলতে রাজাদের রক্ষিতাদের সম্ভ্রান্ত লজ্জাকর কাহিনী বর্ণনা করল; যেসব যুবতীরা প্রেমের উজ্জ্বলতায় বৃদ্ধদের বিয়ে করে তাদের সেই ঘৃণ্য কাহিনী বলতেও সে দ্বিধা করল না।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কী করলে?

সে শুধু বলল—আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপরেই আমি এখানে এসেছি।

সেই সন্ধ্যাটি আজও আমি ভুলতে পারিনি।

মাদাম হারমেত

Madame Hermet

উন্মাদরা আমাকে অভিভূত করে। একটা উদ্ভট স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে রহস্যময় জগতে বাস করে তারা। সে-জগৎ দুর্ভেদ্য—বাতুলতার মেঘে ঘেরা। বাস্তব জগতে তারা যা দেখেছে এইখানে বসে তারা সেই সব জিনিসই নতুন চোখে দেখে। তাদের প্রেম, ভালবাসা, প্রত্যয়, সংশয়—বস্তুজগতের সবকিছু অনুভূতিই অদ্ভুতভাবে তাদের মনে ছায়া ফেলে-ফেলে আসে, আবার মিলিয়ে যায়। বাস্তব জগতের কোন চিন্তা দিয়েই তাদের বিশ্লেষণ করা যায় না। এদের কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছু নেই। এদের অভিধানে 'হ'তে পারে না'—এমন কোন শব্দ নেই। অবাস্তব জগৎই এদের

কাছে বাস্তব, অতিপ্রাকৃতই প্রাকৃত। যুক্তিতর্ক যেটা প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সাবলীল কর্মপ্রচেষ্টাকে চিরকাল ব্যাহত ক'রে এসেছে—সেই প্রাচীনতম প্রাচীন যাকে আমরা বিচারবুদ্ধি বলি—আর শুভবুদ্ধি যা আমাদের জীবনের প্রাসাদকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখে—সে সমস্তই তারা ভেঙেচুরে একশা ক'রে দেয়। ফলে বল্গাহীন ঘোড়ার মত সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে কল্পনাকে তারা বেপরোয়া ছুটিয়ে দেয়। তাদের জগতে সবকিছুই ঘটে, আর ঘটতে পারে। কল্পনার যাদুতে মুহূর্তের মধ্যে তারা রাজা-বাদশা হয়ে, দেবতা-দানব হয়; একচ্ছত্র অধিপতি হয় পৃথিবীর। কোন প্রতিবন্ধকতাকেই তারা গ্রাহ্য করে না। বিশ্বের সব আনন্দই তাদের কুক্ষিগত। বিশ্বে একমাত্র তারাই সুখী। কারণ, বাস্তব ব'লে তাদের কাছে কোন পদার্থ নেই। অজানা ঘূর্ণীর উত্তাল তরঙ্গের অতলে ঝাঁপিয়ে পড়ার উত্তেজনা নিয়ে আমি এই সব যাযাবর মনগুলির আশেপাশে দৌড়ে যাই—মিশে যাই তাদের সঙ্গে। এ-তরঙ্গের উৎস কোথায় তা আমি জানিনা, কোথায় এর মহিমা তাও আমার অজানা।

কিন্তু এইসব পাহাড়ী খাদের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কোন লাভ নেই; কারণ এর আদি অন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত। প্রকাশ্য দিবালোকই হোক, অথবা অন্ধকার গুহাই হোক, যেখান দিয়ে এই স্রোত বয়ে যাক না কেন, তা স্রোতই; তার মধ্যে কোথাও কোন ইতর-বিশেষ নেই। তাছাড়া, উন্মাদদের মনের গতি নিরূপণ করার চেষ্টাও ব্যর্থ। কারণ, সেটি কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর মধ্যে কোন যুক্তি নেই। অবশ্য এটা নিঃসন্দেহ যে মাঝে-মাঝে ছোট একটা ঢিল ফেললে সেই স্রোতে কিছু-কিছু ঢেউ ওঠে। তবু তারা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। তাই আমি তাদের কাছে দৌড়ে যাই।

একদিন আমি একটি পাগলাগারদে গিয়েছিলাম। একজন ডাক্তার আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন—আসুন, আপনাকে আমি একটি অদ্ভুত রোগীকে দেখাব।

এই বলে একটা ছোট ঘর তিনি খুললেন। ঘরের মধ্যে একটি মহিলা বসেছিলেন। তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—তখনও দেখতে তিনি সুন্দরী। ছোট একটি আয়নার দিকে তাকিয়ে একটা বেশ বড় আর্ম চেয়ারের ওপরে বসেছিলেন তিনি।

আমাদের দেখেই তিনি উঠে পড়লেন; দৌড়ে পেছনে গিয়ে চেয়ারের ওপর থেকে একটা ঘোমটা তুলে নিজের মুখের ওপরে ঢেকে দিলেন; তারপরে ফিরে এলেন আমাদের কাছে—মাথা নেড়ে আমাদের অভ্যর্থনার জবাব দিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন আজ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—ভাল নয়, ডাক্তার। মানে খুব খারাপ। মুখের দাগগুলো দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে।

উহুঁ। ভুল দেখেছেন আপনি—ডাক্তারের স্বরে দৃঢ় প্রত্যয়।

ভদ্রমহিলা তাঁর সামনে এগিয়ে এসে বিড়-বিড় ক'রে বললেন—না, ভুল দেখি নি। আজ সকালে দশটা নতুন দাগ আমি গুণেছি—তিনটে ডান গালে, চারটে বাঁ

গালে, আর তিনটে কপালে। বিশ্রী, কী বিশ্রী দেখতে। কারও কাছে এই মুখ খুলতে আমার সাহস হয় না; না, না—কারও কাছে নয়—এমন কি আমার ছেলের কাছেও না। আমি শেষ হয়ে গিয়েছি। চিরজীবনের জন্যে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছি আমি।

চেয়ারের ওপরে লুটিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

দেখি, দেখি। আসুন। আমি বলছি, ও কিছু নয়। সামান্য একটু কষ্টিক-লোশন দিয়ে এখনই আমি সব তুলে দিচ্ছি।

ডাক্তারের কথা শুনলেন না মহিলা। আঙুল দিয়ে মুখটাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে আঙুল সরানো বড়ই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। আবার ডাক্তার তাঁকে তোয়াজ করতে লাগলেন—হাতটা সরান, সরান। আপনি জানেন, কতবারই তো আপনার মুখের দাগ আমি মুছে দিয়েছি। হাত না সরালে রোগ সারাবো কেমন ক'রে?

কিন্তু ওই ভদ্রলোককে যে চিনিনা।

উনিও যে ডাক্তার; আমার চেয়ে বড় ডাক্তার।

এই শুনে তিনি ঘোমটা খুললেন। কিন্তু মুখটা দেখানোর জন্যে তিনি লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন। লজ্জায় তিনি মুখটা নামালেন একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে মুখটা ঘোরালেন; তারপরে বিড়-বিড় ক'রে বললেন—আপনাদের আমার এই বিকৃত মুখটা দেখতে দিতে বড় কষ্ট হচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে, তাই না?

অবাক হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এ কি ব্যাপার! মুখের ওপরে তাঁর একটা দাগও তো নেই।

চোখ দুটো নামিয়ে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমার ছেলের শুশ্রূষা ক'রেই এই রোগটা আমার হয়েছে। তাকে আমি বাঁচালাম বটে; কিন্তু আমি বিকলাঙ্গ হ'য়ে গেলাম। সেই হতভাগ্য ছেলেটির জন্যে আমার সৌন্দর্য নষ্ট হল। যাই হোক, আমি আমার কর্তব্য করেছি; আমার বিবেক আজ শান্ত। আমি শান্তি পাচ্ছি কেন তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন।

ডাক্তার তাঁর পকেট থেকে সরু একটা বুরুশ বার ক'রে তাঁর মুখের ওপরে বুলিয়ে দিলেন। মনে হল, মুখের ওপরে ফোঁটা-ফোঁটা রঙ ঢেলে দিয়ে গাল দুটোকে তিনি পালিশ করিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে তিনি বললেন—এবার দেখুন; আর একটা দাগও নেই।

ভদ্রমহিলা আয়নাটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মুখের চারপাশটা দেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—না, নেই। ধন্যবাদ।

আমাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার; তারপরে বললেন—এই মহিলাটির ভয়ানক কাহিনী আমি আপনাকে বলব।

এঁর নাম মাদাম হারমেত। যৌবনে খুব সুন্দরী ছিলেন ইনি; প্রেমের ছলনায় ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। অনেকেই এঁকে ভালবাসত; জীবনকে ভোগ করার আকাঙ্খা ছিল অসামান্য। শরীরকে সুন্দর ক'রে রাখার চেষ্টায়, হাত, মুখ, দাঁতকে পরিচ্ছন্ন

রাখার উন্মাদনায় তিনি একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। একটিমাত্র পুত্র-সন্তান নিয়ে তিনি বিধবা হন। বহু প্রশংসিতা রমণীর মত সেই ছেলেটিও মানুষ হ'য়ে উঠেছিল। ইনি নিজের সন্তানটিকেও বড় ভালবাসতেন।

ছেলেটির বয়স বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে বার্দ্ধক্যের দিকে এগিয়ে গেলেন মাদাম। সেই সংকটময় মুহূর্তটি তাঁর জীবনে এগিয়ে আসছে বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি না তা আমি জানিনা। অন্য সকলের মত তিনিও কি প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন; বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চামড়াও যে ফ্যাকাশে হ'য়ে আসছিল, চোখের কোণে সামান্য কালির ছাপ পড়ছিল, কপালের ওপরে সূক্ষ্ম বলিরেখার আবির্ভাব ঘটছিল সেটা কি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন? আর এগুলিও যে ক্রমশ যত দিন যাবে ততই তাঁর দেহের ওপরে কায়েমী হয়ে বসবে সে-সম্ভাবনার কোন পদধ্বনিও কি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন? অথবা, সেই নিষ্ঠুর অনিবার্য বার্দ্ধক্যের, যে-বার্দ্ধক্যের গতি কেউ রোধ করতে পারে না, বিলম্বিত তির্যক রেখাগুলি তিনি স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলেন? ধীরে-ধীরে সৌন্দর্য বিনাশের যন্ত্রণা তাঁকে কি দগ্ধ করত? তিনি কি আয়নার মধ্যে নিজের দেহটাকে বারবার দেখতেন? ক্রোধে আত্মহারা হয়ে কি সেই আয়নাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন সোফার ওপরে? তারপরে আবার সেটিকে তুলে নিয়ে মুখ দেখতে শুরু করতেন? তাঁর চেহারার ওপরে মহাকালের ছাপ পড়ছে দেখে আর্তনাদ ক'রে উঠতেন? কোন কারণ না দেখিয়ে দিনের মধ্যে হাজারবার কি তিনি ড্রয়িংরুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিতেন? দেহের কোন্ অংশে কাল গভীর রেখাপাত ক'রে তা তিনি জানতেন, কোথায় তার দাঁত গভীর ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়। কালের এই আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন; সেই ভগবানের কাছে, যে ভগবান তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দর ক'রে সৃষ্টি করেন এবং তারপরে তাকে বিনষ্ট ক'রে চরম নির্দয়তার পরিচয় দেন—সেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়ে বসে চোখের জল ফেলতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দেহসুষমা অটুট রাখার জন্যে তিনি কি ভগবানের কাছে আর্জি পেশ করতেন? এই সব মানসিক যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হোত।

তারপরে একদিন (বয়স তখন তাঁর পঁয়তিরিশ) তাঁর পনের বছরের পুত্রটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুখটা তার কী ডাক্তাররা তা ধরতে পারেননি। ছেলেটি শয্যাশায়ী হল। তার শিক্ষক, একজন ফরাসী ধর্মযাজক তার বিছানার পাশে বসে-বসে তার পরিচর্যা করতে লাগলেন। সকাল-সন্ধ্যায় একবার ক'রে সেই ঘরে ঢুকে মাদাম তার খবরাখবর নিতেন।

সকালবেলা প্রসাধনপর্ব সেরে ড্রেসিং গাউন পরে তিনি আসতেন; তারপরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করতেন—জর্জ, আজ একটু ভাল আছ?

সেই সুবেশ দীর্ঘায়ত তরুণটির মুখটা ফুলে উঠেছিল। কৃশ হয়েছিল জ্বরের প্রকোপে। সে বলত—হ্যাঁ, মা; আজ একটু ভাল।

সেই ঘরে সামান্য কিছুক্ষণ তিনি দাঁড়াতেন, ওষুধপত্রের শিশিগুলি বিরক্তির সঙ্গে নাড়াচাড়া করতেন একটু; তারপরে হঠাৎ ব্যস্ততা দেখিয়ে বলতেন—"হাই যা! একটা বেশ দরকারী জিনিস ভুলে গিয়েছি।" এই বলে প্রভাতী প্রসাধনের সুবাস পেছনে ছড়িয়ে তিনি দ্রুত বেরিয়ে যেতেন ঘর থেকে।

সন্ধ্যার সময় সান্ধ্য গাউন চড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে তিনি আসতেন—কারণ এ ঘরে ঢুকতে সব সময়েই তাঁর দেরী হোত; মনে হোত, সকালের চেয়েও তিনি অনেক বেশী ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করতেন—ডাক্তার কী বলেন?

ধর্মযাজকটি উত্তর দিতেন—ভাল নয়। এখনও রোগটা তিনি ধরতে পারছেন না।

এরপরেই একদিন সন্ধ্যায় ধর্মযাজকটি তাঁকে বললেন—মাদাম, আপনার ছেলের বসন্ত হয়েছে।

একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ ক'রে তিনি সেখান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পরের দিন সকালে পরিচারিকা তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলো তিনি জেগে রয়েছেন, ঘুমের অভাবে তাঁর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে; বিছানার ওপরে শুয়ে-শুয়ে তিনি কাঁদছেন।

দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—জর্জ কেমন আছে?

ভাল নেই মাদাম। মোটেই ভাল নেই।

দুপুরের আগে সেদিন তিনি আর বিছানা ছেড়ে উঠলেন না; এক কাপ চায়ের সঙ্গে মাত্র দুটি ডিম খেলেন। মনে হল, তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তারপরে কেমন ক'রে বসন্তের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচানো যায় এই উদ্দেশ্যে জনৈক কেমিস্টের শরণাপন্ন হলেন। ডিনারের আগে সেদিন আর তিনি ফিরলেন না। নিয়ে এলেন এক-গাদা ওষুধপত্র। বসন্তের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজের শরীরটাকে ভিজিয়ে রাখলেন তিনি।

ডাইনিংরুমে ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছে?

ভাল নেই। ডাক্তাররা বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

শুনে মাদাম কাঁদতে লাগলেন; কিছুই খেলেন না।

পরের দিন সকালে সংবাদ কী জেনে পাঠালেন। সংবাদ ভাল নয়, সেদিনটা তিনি আর বাইরে বেরোলেন না। সারা দিন ঘরের মধ্যে নানারকম তীব্র গন্ধদ্রব্য পোড়ালেন—ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার ঘর। তাঁর পরিচারিকার কাছে শোনা যায় সেদিনটা তাঁর ঘর থেকে চাপা গোঙানি শোনা গিয়েছিল।

এইভাবে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। প্রতিটি ঘণ্টায় তিনি সংবাদ জানতে পাঠান। সংবাদ আসে রোগী ক্রমশঃ খারাপের দিকে চলেছে।

এগার দিনের দিন ধর্মযাজক তাঁর ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর থমথমে। বসার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি বসলেন না, বললেন—মাদাম আপনার পুত্র ভয়ানক পীড়িত। সে আপনাকে একবার দেখতে চায়।

মাদাম চিৎকার ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে হাঁটু মুড়ে ব'সে বললেন—হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, আমার ওঘরে যেতে সাহস হচ্ছে না। হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি শক্তি দাও।

যাজক বললেন—মাদাম, ডাক্তারেরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন। জর্জ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঘণ্টা দুই পরে সময় ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে জর্জ আবার তার মাকে ডেকে পাঠালো।

তিনি চিৎকার করে বললেন—আমি পারব না; পারব না। আমার ভীষণ ভয় করছে।

ধর্মযাজক তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু হল না তাতে। বরং উন্মাদের মত চেঁচাতে লাগলেন তিনি। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার এসে সব শুনলেন। নিজে তিনি মাদামের কাছে গিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের কাছে আসার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করলেন। কোন ফল হল না। তিনি তাঁকে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। পারলেন না আনতে। মাদাম ডাক্তারের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—না, না; সে মারা যাচ্ছে না, সে মারা যাচ্ছে না। দয়া ক'রে তাকে বলুন, আমি তাকে ভালবাসি, খুব ভালবাসি।

ছেলেটির সময় ঘনিয়ে এল। এতদিন মাকে দেখতে না পেয়ে সেও সত্যি কথাটা বুঝতে পারল যে বসন্ত রোগের ভয়ে তিনি আসতে ভয় পাচ্ছেন। তাই সে একটা শেষ অনুরোধ জানাল—মা যদি আসতে ভয় পান তাহলে একবার তাঁকে আমার জানালার সোজা বারান্দায় দাঁড়াতে বলুন। তাঁর কাছ থেকে আমি শেষ বিদায় নিয়ে যাই; কারণ এখন আর তাঁকে আমি চুমু খেতে পারব না।

রাজি হলেন মাদাম শেষ পর্যন্ত। গোটা গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে এক বোতল স্মেলিং সল্ট নিয়ে বারান্দার ওপরে তিন-পা এসেই আবার তিনি ভয়ার্ত চিৎকার ক'রে উঠলেন—না, না। ওর দিকে চেয়ে থাকতে পারব না আমি। না, না। আমি লজ্জিত; আমি ভয়ার্ত...না...না...

সবাই মিলে তাঁকে টেনে আনতে চেষ্টা করল; কিন্তু দুটো হাত দিয়ে বারান্দার শিকগুলো এমন শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরলেন যে তাঁকে আর একটি পাও এগিয়ে আনা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ালো। তাঁর সেই মর্মভেদী চিৎকারে রাস্তায় লোক জমে গেল। ব্যাপারটা কী জানার জন্যে ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল তারা।

মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রটি সেইদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল; শেষবারের মত তার মায়ের সুন্দর মুখটি দেখার ব্যাকুলতা হয়ত তার মনের মধ্যে গুমরে-গুমরে উঠছিল; অনেকক্ষণ ব্যর্থ অপেক্ষার পরে রাত্রি নেমে এল। একটি দীর্ঘ করুণ নিঃশ্বাস ফেলে সে পাশ ফিরে শুলো। আর কারও সঙ্গেই সে কোন কথা বলেনি।

রাত্রি শেষ হয়ে প্রভাত হল। ছেলেটি মারা গেল। পরের দিনই মাদাম উন্মাদ হ'য়ে গেলেন।

চিরনিদ্রার ঠিকানা

The putter to sleep

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে সীন নদী সোজা বেরিয়ে গিয়েছে; কোথাও এতটুকু বাঁক নেই। প্রভাত সূর্যের রঙিন আভায় তার জল লালিমাময় হয়ে উঠেছে। রূপোর মত চকচকে জল; মাঝে-মাঝে একটু ঘোলাটে। নদীর ওপারে সবুজ বনানী অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রতিদিন সকালেই আমার খবরের কাগজ আসে। সেদিনও এসেছিল। সেই কাগজটা নিয়ে আমি নদীর বাঁধের ওপরে বেড়াতে বেরোলাম। শান্ত, নির্জন পরিবেশ। খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে হাঁটতে লাগলাম।

খবরের কাগজটা খুলতেই প্রথম যে ক'টি কথা আমার চোখে পড়ল—তা হচ্ছে "আত্মহত্যার হিসাব।" আমি দেখলাম এই বছরে সেই হিসাবমত আত্মহত্যার সংখ্যা হচ্ছে আট হাজার পাঁচশ'।

সেই মুহূর্তে আমি তাদের দেখতে পেলাম। জীবনে বীতস্পৃহ হ'য়ে যে অসংখ্য মানুষ মরিয়া হ'য়ে আত্মহত্যা করছে তাদের যেন আমি চোখের ওপরে দেখতে পেলাম। আমি সেই রক্তাক্ত মানুষদের দেখলাম, তাঁদের চোয়ালগুলি ভেঙে গিয়েছে, গুঁড়িয়ে গিয়েছে তাদের মাথার খুলি, বুলেট বিঁধেছে বুকে। হোটেলের ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ এই মৃত্যুপথযাত্রীদের আর্তনাদ আমি শুনতে পেলাম। নিজেদের ক্ষত আর দুঃখ ছাড়া আর কিছুই তারা চিন্তা করতে পারে না।

কিছু লোককে আমরা দেখলাম—গলাকাটা অবস্থায় তারা প'ড়ে রয়েছে, নাড়িভুঁড়ি তাদের সব বেরিয়ে গিয়েছে। তাদের হাতে তখনও পর্যন্ত রুটি কাটা ছোরা অথবা দাড়ি-কামানো ব্লেড ধরা। আর কয়েকজনকে দেখলাম—লাল চিহ্ন-আঁটা ছোট-ছোট বোতল সামনে নিয়ে বসে রয়েছে। একদৃষ্টিতে সেই গ্লাসের দিকে রয়েছে তাকিয়ে। তারপরে মুখটা বিকৃত করবে তারা—ঠোঁট-দুটোকে কোঁচকাবে। মৃত্যু হওয়ার আগে কতটা যন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে হ'বে তারা তা জানে না। অনাগত সেই ভয়ের ছায়া তাদের চোখের ওপরে ভেসে উঠেছে। তারপরে তারা উঠে দাঁড়াবে, যন্ত্রণাটাকে রুখবার জন্যে পেট চেপে ধরবে, সমস্ত দেহটা ভেতরে-ভেতরে জ্বলে যাবে; তারপরে অচৈতন্য হওয়ার আগে যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে তারা মাটির ওপরে গড়াগড়ি দেবে।

আর কিছু মানুষকে দেখলাম যারা দেওয়ালের পেরেক থেকে লম্বমান হ'য়ে ঝুলছে; অথবা, জানালায় দড়ি বেঁধে, অথবা ভেতরে ছাঁদ থেকে; অথবা গাছের ডালে গলায় শক্ত সুতো বেঁধে অন্ধকারে ঝুলছে তারা। মৃত্যুর আগে, নিশ্চল হ'য়ে যাওয়ার আগে, গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়ার আগে তারা যে অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করত

সে সবই আমি উপলব্ধি করছিলাম। দড়িটা বাঁধার আগে, দড়িটা শক্ত বাঁধা হয়েছে কিনা বোঝার আগে, গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ার আগে, তাদের শেষ দ্বিধার আগে তাদের হৃদয়ে যে নির্মম যন্ত্রণা হয়েছিল সে সবই আমি অনুমান করতে পারলাম। অভুক্ত বৃদ্ধদের মৃতদেহে, ব্যর্থ প্রেমিকার শক্ত মৃতদেহ—আমি বেশ দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম সেই মৃতার ঘরে দগ্ধ কয়লা থেকে যে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তাও।

আরও কাউকে-কাউকে দেখলাম। অন্ধকার রাত্রিতে পরিত্যক্ত নির্জন সেতুর ওপরে পায়চারি করছে। আত্মহত্যাকারীদের তালিকায় এরাই দুর্বৃত্ত শ্রেণীর। মৃদু-মৃদু শব্দ ক'রে পুলের নীচ দিয়ে নদীর স্রোত ব'য়ে চলেছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না তারা; তবে বুঝতে পারছে যে নীচে নদী রয়েছে। ঠাণ্ডা কনকনে জল, এরই মধ্যে তারা ঝাঁপাতে চায়; কিন্তু ভয় পাচ্ছে তারা। দূর থেকে সময় এগিয়ে যাওয়ার শব্দ হচ্ছে। তারপর হঠাৎ সর্বশক্তি সংহৃত ক'রে নিয়ে, চোখ-কান বুজে ঝাঁপ দিল তাবা; ছলাৎ ক'রে শব্দ হল একটা—ভয়ার্ত আর্তনাদ উঠল কয়েকটা—শব্দ হল হাত দিয়ে জল টানার। কখনও-কখনও তা-ও হল না; হল মাত্র একটি ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ। তাদের হাত বা পা ভারি পাথর দিয়ে বাঁধা থাকায় পড়ামাত্র মুহূর্তের মধ্যেই তলিয়ে গেল তারা।

হায়, হতভাগ্য, দুঃস্থ, দুঃখ-জর্জরিত মানবাত্মা, তোমাদের সেই মর্মভেদী আর্তনাদ আমার মর্মে গিয়ে বিঁধেছে; তোমাদের সঙ্গে আমিও মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করছি। তাদের দুঃখ কষ্ট, তাদের ওপরে যে অত্যাচার হয়েছে তা সবই একটি ঘণ্টার মধ্যে আমি ভোগ করছি। যে দুঃখ তাদের এই সব পথে পরিচালিত করেছে তাদের আমি জানি; জীবনের এই অধঃপতন এর আগে আর কোনদিনই আমি এমন ক'রে অনুভব করি নি। এই সব ভাগ্যহত, বিড়ম্বিত মানুষ যারা কোনদিনই প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া সহানুভূতি পায়নি, যাদের আশা মরীচিকার নামান্তর মাত্র। যাদের জীবন নিষ্ঠুর ট্র্যাজিডি ছাড়া আর কিছু নয়, যাদের জীবনে কমেডি কেবল উপহাসমাত্র—তাদের আমি চিনি।

আত্মহত্যা! আত্মহত্যা করার শক্তি তাদেরই থাকে বেঁচে থাকার জন্যে যাদের কোন শক্তি থাকে না। জীবনে যাদের বিশ্বাস নেই, দুর্ভাগ্যকে পরাজিত করার দুর্জয় সাহস যাদের নেই, আত্মহত্যার ওপরে তাদের বিশ্বাস কী অগাধ! হ্যাঁ; এই দুঃখের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র দরজা ওই আত্মহত্যা। এই একটিমাত্র করুণাই প্রকৃতি তাদের ওপরে দেখিয়েছে। আমাদের অন্ধকারায় বন্ধ ক'রে রাখেনি। এই হতভাগ্য মরিয়া মানুষদের, হে ঈশ্বর, তুমি দয়া করো। দুঃস্থ হতভাগ্যদের তুমি মুক্তি দাও, শান্তি দাও। এই জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়ার শক্তি তাদের রয়েছে বলেই ভয় করার কিছু তাদের নেই, বিশেষ ক'রে যখন তাদের পিছনে এমন একটি দরজা রয়েছে যাকে ঈশ্বরও বন্ধ ক'রে দিতে পারেন না।

এইভাবে যারা মৃত্যু কামনা করেছিল সেই বিরাট মৃতের জনতা—বাৎসরিক সংখ্যা যার সাড়ে আট হাজারের কাছাকাছি—তাদের কথা আমি চিন্তা করলাম। মনে হল,

এ-বিশ্বের দরবারে তারা একটি আর্জি নিয়ে হাজির হয়েছে। সেই সমস্ত আহত, নিহত, ছিন্নমস্তা, ছিন্নোদর—সেই সব মৃতেরা যারা বিষের জ্বালায় মরেছে, মরেছে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে, জলে ডুবে মরেছে, গলায় ফাঁস দিয়ে জীবনান্ত হয়েছে যাদের—তারা সবাই দলবদ্ধ হ'য়ে ভয়ঙ্কর চিৎকার ক'রে বলছে—আমাদের অন্ততঃ শান্তভাবে মরতে দাও; তোমরা আমাদের বাঁচতে সাহায্য করনি; মরতে একটু সাহায্য কর অন্তত। আমাদের সংখ্যা কত তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই স্বাধীনতার যুগে, এই দার্শনিক মুক্তি আর সাধারণতন্ত্রের যুগে আমাদের জন্যে কথা বলার অধিকার আমাদের রয়েছে। যারা জীবন পরিত্যাগ করেছে মৃত্যুর করুণা থেকে তাদের বঞ্চিত করো না—এ-মৃত্যু বীভৎসও নয় ভয়ঙ্করও নয়।

স্বপ্ন দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে আমি একটি সুন্দর শহরে পৌঁচেছি। শহরের নাম প্যারিস; কিন্তু কবেকার প্যারিস? বসতবাড়ির দিকে তাকিয়ে, থিয়েটারের দিকে তাকিয়ে, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে তাকিয়ে আমি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছিলাম; হঠাৎ একটা পার্কের মধ্যে বিরাট, সুন্দর একটি প্রাসাদের সামনে হাজির হলাম। বাড়িটার সামনে জ্বলজ্বলে কি লেখা রয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। লেখাটি হচ্ছে—'আত্মহত্যা করার প্রতিষ্ঠান।' অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখাটা কত মধুর! মানুষের আত্মা এই সময়ে অবাস্তব, অথচ, সম্ভাব্য বাস্তবের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কোন কিছুই তাকে তখন অবাক করে না; কোন কিছুই ভয়ানকভাবে ধাক্কা দেয় না তার মনকে।

সামনে এগিয়ে গেলাম। মনে হ'ল ক্লাবের মত একটা জায়গা। সামনেই পায়জামা পরা কয়েকজন দরোয়ান বসে রয়েছে। আমাকে এপাশে-ওপাশে তাকাতে দেখে একজন জিজ্ঞাসা করল—স্যার, আপনি কিছু চান?

এই বাড়িটা কী তাই আমি জানতে চাই।

আর কিছু নয়?

না।

সম্ভবত এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর কাছে আপনি যেতে চান—তাই না স্যার?

একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তিনি বিরক্ত হবেন না?

না, না, স্যার। মোটেই না। যাঁরা কিছু জানার জন্যে এখানে আসেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করাই তো তাঁর কাজ।

বেশ। চল, যাচ্ছি।

একটা বারান্দা দিয়ে সে আমাকে নিয়ে গেল। দেখলাম সেখানে কয়েকটি বৃদ্ধ বসে-বসে গল্প করছেন। তারপরে কালো কাঠ দিয়ে সাজানো বেশ ভারিক্কিগোছের সুন্দর ছোট একটি ঘরে আমরা ঢুকলাম। সেইখানে মেদবহুল স্ফীতোদর একটি যুবক দামী সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে চিঠি লিখছিলেন।

আমাকে দেখেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। অভিবাদন প্রতি-অভিবাদন শেষ হল আমাদের, দরোয়ানটি চলে গেল। তারপরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কীভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি?

বললাম—আমার এই অবিবেচনা আপনি ক্ষমা করবেন, স্যার। এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান আর কখনও আমি দেখিনি। বাড়ির সামনে এই লেখাটি দেখেই আমি অবাক হয়েছি। ওই লেখাটির অর্থ কী?

তিনি একটু হাসলেন; তারপরে আমার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হয়ে নীচু গলায় তিনি বললেন—ব্যাপারটা কী জানেন স্যার? যারা আত্মহত্যা করতে এইখানে আসে তাদের সুন্দরভাবে আর শান্তিতে হত্যা করা হয়; অবশ্য সেই হত্যা যে সুখের সেকথা আমি বলছিনা।

তাঁর কথা শুনে আমি বিচলিত হলাম না। অবাক হলাম, এই কথা ভেবে যে আমাদের এই নিচুমানের বাস্তব জগতে মানুষের সত্যিকার মুক্তিপ্রয়াসী এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কী ক'রে এ সম্ভব হ'ল বলুন তো?

তিনি বললেন—১৮৮৯ সালের প্রদর্শনীর পর থেকে আত্মহত্যার সংখ্যাটি এত তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল যে অনতিবিলম্বে এর একটা ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। পথে-প্রান্তরে, পার্টিতে-রেস্তোরাঁয়, রেলের কামরায়—যত্রতত্র মানুষের আত্মহত্যার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে মেতে উঠল। আমার মত যারা জীবনদরদী একমাত্র তাদের চোখেই যে এই দৃশ্যটা কুৎসিত দেখাল তাই নয়—শিশুদের কাছেও এটা একটা কুৎসিত দৃষ্টান্তে পরিণত হল। সেইজন্য আত্মহত্যাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

হঠাৎ আত্মহত্যার এত হিড়িক পড়ে গেল কেন বলুন তো?

সেবিষয়ে আমার ধারণা বেশ স্পষ্ট নয়। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীটা পুরনো হ'য়ে গিয়েছে। এ জীবনটাকে আর আমাদের ভাল লাগছে না। আমাদের ভাগ্যই বলুন, অথবা সরকারের ভবিষ্যৎই বলুন—দুই-ই এক। আমি বুঝতে পেরেছি সবাই আমাদের ঠকাচ্ছে। সেই জন্যেই আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চাই। যখন দেখি ভগবানও সাধারণ মানুষের মত আমাদের প্রতারণা করছেন—এবং আইনসভার প্রতিনিধিদের মত আমরা যখন তাঁকে অপদার্থ ব'লে সরিয়ে আনতে পারিনা তখন আমরা এই জঘন্য পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে চাই।

বলেন কী?

অন্তত:, এদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতিটা আমাকে বলবেন?

নিশ্চয়। আমাদের সমাজে যাঁরা গণ্যমান্য ব্যক্তি—উচ্চশিক্ষিত, এবং অবিতর্কিত মেধা যাঁদের তাঁরাই এটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তারপরে হো-হো ক'রে হেসে তিনি বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারি মানুষে এটিকে বেশ খুশি মনেই গ্রহণ করেছে। এইখানেই তারা মরতে চায়।

আপনি আমাকে অবাক করলেন।

না-না। অবাক হওয়ার কিছু নেই। মৃত্যুটা কদর্য, ভয়ানক। এখানে যাঁরা নাম লেখান তাঁদের কাছে এটা আদৌ ভয়ানক নয়।

কিন্তু যাঁরা মরতে চায় না তাঁরা কি এখানকার সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়?

সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা এখানে নেই।

কার নির্দেশে এইরকম একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে?

জেনারেল বোলাঙ্গারের নির্দেশে। কারও আর্জিকেই তিনি নাকচ ক'রে দিতে পারতেন না। সত্যি কথা বলতে কি এটাই তাঁর সবচেয়ে ভাল কাজ। প্যারিসের কেন্দ্রভূমিতে ঘৃণ্য মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাঁরা একটি মন্দির গড়তে চেয়েছিলেন সেইসব ভূয়োদর্শী, অকলঙ্ক চরিত্রের নাস্তিক মনীষিরাই এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছেন। প্রথম-প্রথম এখানে কেউ আসতে চাইত না; তাই দেখে উদ্দোক্তারা প্যারিসের মধ্যে যত গণ্যমান্য ব্যক্তি রয়েছেন, যত শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, রাজনীতিবিদ রয়েছেন সবাইকে নিয়ে বিরাট একটি জনসভা ক'রে এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অর্থটি সকলের কাছে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন; বেকির নাটক অভিনীত হল, প্রথমে অবশ্য নাটকগুলি ভাল জমেনি; কিন্তু পরে সেগুলি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করছিল যে অনতিবিলম্বেই সারা প্যারিস শহরটি গম-গম ক'রে উঠল। তারপরে আস্থা এল জনতার, তখনই প্রতিষ্ঠা হল ক্লাবের।

সেই আনন্দোৎসবের ভেতরে কী নারকীয় উপহাস!!

মোটেই না, মোটেই না। মৃত্যুর মধ্যে বিষাদটা কোথায়? মৃত্যুর বিষয়ে সবাই উদাসীন, আমরা মৃত্যুর বোঝা কমিয়ে তাকে প্রস্ফুটিত করেছি। তার গায়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে তাকে সহজ মনোগ্রাহী ক'রে তুলেছি।

মানুষ তা বিশ্বাস করে?

আগে করত না; এখন করে। এখন তারা আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে—গড়-পড়তা রোজ চল্লিশের ওপরে। আজকাল সীন নদীতে মৃতদেহ আর দেখাই যায় না।

প্রথমে কে এসেছিল?

আমাদের ক্লাবেরই একজন সদস্য—জুয়া খেলে-খেলে লোকটা ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে পৌঁচেছিল। দ্বিতীয়টি হল একজন ইংরেজ—কেমন যেন এক-বগ্গা লোকটি। এরপরে খবরের কাগজে আমরা জোরসে প্রচার অভিযান চালালাম। কীভাবে মানুষকে আমরা হত্যা করি সেই প্রক্রিয়াটি লোকের কাছে আকর্ষণীয় ক'রে সবাইকে আমরা জানালাম। তবে এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের বেশীর ভাগই হচ্ছেন ওই নীচু স্তরের।

আপনাদের রীতিটি কী?

ঘুরে দেখতে চান?

দেখালে খুশি হব।

একটার পর একটা ঘর তিনি আমাকে দেখাতে লাগলেন। প্রতিটি ঘরের মধ্যে লোকে আনন্দের সঙ্গে হই-চই করছে। এমন জীবন্ত ক্লাব—এত আনন্দে মুখর ক্লাব আমি খুব কমই দেখেছি।

আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন—মৃত্যুকে উপহাস করার জন্যে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এখানে আনন্দ করতে আসে। একবার এখানে

এসে পৌঁছলে তারা যে ভয় পায়নি সেটা প্রমাণ করার জন্যেই তাদের আনন্দ করতে হয়। সেইজন্যেই তারা হাসি-ঠাট্টা করে, আনন্দ করে, হইচই করে, ভাঁড়ামি করে। বর্তমানে প্যারিসের মধ্যে সবচেয়ে জমজমাট জায়গা হচ্ছে এইটা। মহিলারাও এখানে তাঁদের জন্যে স্বতন্ত্র একটা জায়গা নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন আজকাল।

এবং তা সত্ত্বেও আপনাদের এখানে আত্মহত্যা হয়?

প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। উঁচু তলার মানুষ এখানে কমই আসেন। সবচেয়ে বেশী আসে দরিদ্রদের সমাজ থেকে; মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে যে বেশকিছু আসেনা সেকথা সত্যি নয়।

কীভাবে কাজটা সুসম্পন্ন করেন আপনারা?

শ্বাসরোধ করে।

যন্ত্রটা কী রকম?

আমাদেরই নিজস্ব তৈরি একজাতীয় গ্যাস দিয়ে। এ জিনিসটা যে কী বস্তু তা এক আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। এই বাড়ির অন্যদিকে তিনটে ছোট-ছোট দরজা আছে। সেখান দিয়ে আমাদের মক্কেলরা ঢোকে, কেউ দরজায় ধাক্কা দিলেই আমরা তাকে নানারকম প্রশ্ন করি। তাদের জবাবে খুশি হ'লে তাদের আমরা গ্রহণ করি—এবং প্রায়ই তাদের আমরা উদ্ধার করতে সমর্থ হই।

টাকা আসে কোথা থেকে?

আমাদের নিজস্ব টাকা অনেক রয়েছে। সদস্যদেরও চাঁদার হার খুব বেশী। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে দান করাটাও উন্নত রুচির পরিচায়ক। প্রত্যেকটি দাতার নামই আমরা খাতায় ছাপিয়ে রাখি। তাছাড়া, প্রতিটি ধনীকে আত্মহত্যা করার সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমরা এক হাজার ফ্রাঁ দাবি করি। মাথা উঁচু ক'রেই তাঁরা আত্মহত্যা করেন। দরিদ্রেরা বিনা পয়সায় মরার সুযোগ পায় এখানে।

মানুষ দরিদ্র কিনা তা বোঝেন কেমন ক'রে?

সেটা আমরা অনুমান করতে পারি স্যার। তাছাড়া, তারা যে দরিদ্র সে সম্বন্ধে পুলিশের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেটও আমরা নিই। পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়া যে কী জঘন্য কাজ তা যদি আপনি জানতেন? সেখানে একবার মাত্র আমি গিয়েছিলাম। আর কখনও যাচ্ছিনা। ফাঁড়িটা একরকমই। কিন্তু লোকগুলি!! এইসব দরিদ্রদের যদি আপনি দেখতেন। ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরা, কতদিন খেতে পায়নি কে জানে, কেউ-কেউ হয়ত রাস্তায় ব'সে খায়, অসুস্থ মেয়েমানুষ, পেটের অন্ন তারা সংগ্রহ করতে পারে না। তারা তাদের করুণ কাহিনী বর্ণনা ক'রে বলে—দেখুন, এভাবে বেশী দিন চলতে পারে না। জীবিকা নির্বাহ করার শক্তি আমার নেই। তাদের অবস্থা দেখে কী কষ্টই যে হয়! কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করে—সে-জিনিসটা কোথায়? তাদের আমরা ঢুকিয়ে নিই। তারপরেই তার সব শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু জায়গাটা কোথায়?

আসুন, দেখাচ্ছি।

এই বলে তিনি আমাকে একটা সুন্দর ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন, চারপাশে তার বসার জায়গা। সুন্দর-সুন্দর ছবি দিয়ে দেওয়ালগুলি আঁটা; মেঝেতে জাজিম পাতা; সেখানে রয়েছে সুন্দর-সুন্দর দামী ডিভান, অদ্ভুত সুন্দর পাম গাছ, মিষ্টি গন্ধের ফুল—এসেন্সের শিশি, সিগারের বাক্স—আরও কত কী।

আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমার পথপ্রদর্শক বললেন—এখানে সদস্যরা গল্প করতে আসে কি না তাই ভাবছেন?

কিন্তু এত গন্ধের সমাবেশ কেন?

মৃত্যুকে তারা গন্ধে মাতোয়ারা ক'রে রাখতে চায়—সেইজন্যে। আপনি একটু শুঁকবেন?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—না, না। এখন নয়।

তিনি হাসতে-হাসতে বললেন—কোন ভয় নেই। আমি নিজেও পরীক্ষা ক'রে দেখেছি।

ভীরুর মত একটু হেসে বললাম—ঠিক আছে।

তাহলে এইখানে বসুন। এটার নাম হচ্ছে—চিরনিদ্রার ঠিকানা।

কিছুটা ভয় পেয়ে আমি সেই খানে বসে পড়লাম। তারপরে শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে। শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধে আমার দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনে হল, আমি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি। আমার হাতে জোরে একটা ঝাঁকানি লাগল।—শুনলাম তিনি বলছেন—আপনিও কিন্তু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নের জগতের ডাকে নয়; একটি বাস্তব কণ্ঠস্বরে: নমস্কার স্যার। আশাকরি ভাল আছেন।

স্বপ্ন ভেঙে গেল আমার। সূর্যের আলোতে সীন নদীটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি, সেই পথ দিয়ে স্থানীয় একটি পুলিশ যাচ্ছিল। এ-স্বর তারই!

বললাম—গুডমর্নিং, ম্যারিনেল। চলেছ কোথায়?

জলে-ডোবা একটা মৃতদেহকে মরিলোঁর কাছে তোলা হয়েছে। সেইটাই রিপোর্ট করতে যাচ্ছি। আরও একটা লোক জলে ডুবে মরল। ডোবার আগে লোকটা ট্রাউজার খুলে নিজের পা দুটোকে আচ্ছা ক'রে বেঁধেছিল।

কে জানে?

Who knows?

হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর! শেষ পর্যন্ত এই কাহিনী আমাকেই লিখতে হবে? কিন্তু আমি কি তা পারব? লিখতে সাহস করব? এত অদ্ভুত, এত দুর্বোধ্য, এত জটিল যে তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাই কষ্টকর।

আমি যা দেখেছি তা যে ভুল নয়, আমার চিন্তার মধ্যে যে কোন ভ্রান্তি নেই, ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম আর নির্মম পর্যালোচনার ভেতরে আমার যে কোন ফাঁক নেই—এবিষয়ে যদি আমি নিশ্চিত না হতাম তাহলে আমি ভাবতাম যে আমি যা দেখেছি তা অবাস্তব...সম্পূর্ণরূপে চোখের ভুল—মরীচিকা। অথবা, তাই যে নয় সেকথা কে-ই বা বলতে পারে?

আজ আমি বেসরকারী একটি উন্মাদ আশ্রমে। ভীতির কবলে প'ড়ে আমি যে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি সেটা আমার বিজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। একটিমাত্র জীবন্ত মানুষই আমার এই কাহিনী জানেন; তিনি হচ্ছেন এখানকার ডাক্তার। সেই কাহিনীই এখানে আমি লিখছি। কেন লিখছি তা আমি জানিনা। বুকের মধ্যে এ-কাহিনী গুমরে গুমরে ওঠে; দুঃস্বপ্ন দেখার মত আঁতকে উঠি আমি। এই কাহিনী প্রকাশ ক'রে দিলে ভেতরটা হালকা হয়ে যাবে। সেইজন্যেই এই কাহিনী আমি লিখতে বসেছি।

চিরকালই আমি লৌকিক সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি; মনটা আমার সর্বত্যাগী দার্শনিকের মত। মানুষ বা ভগবান—কারও বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ নেই; চিরকাল অল্পেতেই আমি খুশি। চিরকালই আমি নিঃসঙ্গ; মানুষের সংস্পর্শ আমার ভাল লাগে না—কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি আমি, কেন করি, তা আমি জানিনা; লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে আমার কোন আপত্তি নেই। তাদের সঙ্গে আমি গল্পও করি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হোটেলে ব'সে খাওয়া-দাওয়াও করি। কিন্তু ওই পর্যন্ত—বেশীক্ষণ কারও কাছে ব'সে থাকলেই আমার গা ঘিন-ঘিন করে; এমন কি যারা আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তাদেরও যেন বেশীক্ষণ সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ায়। তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি, নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে চাই নিজেকে।

এই আকাঙ্খাটা নিছক আকাঙ্খা নয়—এটা ছিল অপ্রতিরোধ্য একটি প্রয়োজনীয়তা। যদি তাদের কাছ থেকে সরে আসতে না পারতাম, যদি আমাকে বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে হতো তাহলে মনে হোত এখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটবে আমার। কী রকম দুর্ঘটনা। কে জানে? হয়ত, আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ব, হ্যাঁ। হয়তবা!

নির্জনতার ওপরে আমার এমন একটা টান ছিল যে আমার ঘরে শুয়ে কেউ ঘুমোচ্ছে এটা ভাবতেও আমার অস্বস্তি লাগত। প্যারিসে আমি থাকতে পারিনা, কারণ, সেখানে থাকতে আমার অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। মনে হয় আমার আত্মিক মৃত্যু হয়েছে। মানুষের ভিড়ে সারা শহরটাই গম-গম করতে থাকে। সে-শব্দের যেন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শহরটা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখনও যেন সেই শব্দ বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে। জীবন্ত মানুষের আলাপের চেয়ে ঘুমন্ত মানুষের নির্বাক অস্তিত্ব আমার কাছে অনেকবেশী উপাদেয়। কেন আমাকে বিধাতা এমন ক'রে সৃষ্টি করলেন? কে জানে। এর কারণটা সম্ভবত সহজ। নিজের বাইরে অন্য কারও অস্তিত্ব আমি সহ্য করতে পারতাম না।

পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ রয়েছে। একদল নির্জনতাকে আদৌ সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, নির্জনতা তাদের বুকে পাষাণের মত চেপে বসে—তুষার-প্রবাহের মত বিরাট একটা স্তূপ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপরে। নির্জনতা শ্বাসরুদ্ধ ক'রে দেয় তাদের। আর একদল রয়েছে যারা নির্জনতায় ফিরে পায় নিজেদের, স্বস্তির, মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। আসল কথাটা হচ্ছে—এমনকিছু মানুষ রয়েছে যারা বাইরের জগতে বাস করতে ভালবাসে; আর একদল রয়েছে যারা ভালবাসে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে। আমি সেই দ্বিতীয় জাতের।

ফলে, জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে জড়দেরই আমার ভাল লাগত বেশী। আর সেইজন্যেই আমার বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল আমার জগৎ; আমার ঘরের আসবাবপত্র, ছোট-খাট অসংখ্য জিনিসের সাহচর্য আমার কাছে কাম্য ছিল; তারাই নির্বাক সাহচর্যে আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে ভরাট ক'রে রেখেছিল। বাইরে থেকে দেখতে না পাওয়া যায় এইভাবে ঘরের উঠোনে একটা সুন্দর বাগান তৈরি করেছিলাম আমি। শহর থেকে কাছেই ছিল আমার বাড়ি। প্রয়োজনমত সহজেই শহরে যেতে পারতাম আমি। আমার ঘরের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে দূরে কিচেন-গার্ডেনের পাশে একটা ছোট বাড়ি ছিল। আমার চাকর-বাকররা রাত্রে সেইখানেই ঘুমতো। বাগানের বিরাট-বিরাট গাছের ছায়ার নীচে রাত্রির অন্ধকারে গভীর নিঃসঙ্গতায় আমার বাড়িটি আচ্ছন্ন হ'য়ে আসত। অনেকক্ষণ ধরে সেই নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করতে-করতে আমি বেশ দেরী ক'রেই ঘুমোতে যেতাম।

সেই বিশেষ দিনটির কথা বলছি। স্থানীয় একটি থিয়েটারে সে-রাত্রিতে "সিগার্ড" অভিনীত হল। এত সুন্দর সঙ্গীতমুখর নাটক জীবনে আর আমি শুনিনি। মন আর প্রাণ আমার ভরে উঠেছিল একেবারে। মাথার মধ্যে সুরের সেই ঝঙ্কার নিয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলাম আমি। চোখে তখন আমার স্বপ্নের মাদকতা; অন্ধকার, অন্ধকার! চারপাশে অন্ধকার নেমে এসেছে আলকাতরার মত, এত অন্ধকার যে বড় রাস্তাটাও চিনতে পারা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ফলে, বারবার আমি পথ থেকে নেমে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ছিলাম। টোল-গেট থেকে আমার বাড়ি এক মাইলের কিছু কমই হবে; হাঁটাপথে মিনিট কুড়ির মত; তাও, ধীরে-ধীরে হাঁটলে, রাত্রি তখন হবে একটা কি দেড়টা। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদের স্তিমিত আলো প্রহেলিকার মত ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে। সেই আলোতে দূর থেকে আমার বাড়িটা দেখতে পেলাম আমি। যতই বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম, ততই কী জানি কেন—কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল আমার। চলার গতি কমিয়ে দিলাম আমি। সেই প্রাচীন অসংখ্য গাছপালার মধ্যে মনে হ'ল আমার বাড়িটা কবরের মধ্যে চুপ ক'রে শুয়ে রয়েছে।

গেটের দরজা খুলে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম। দু'পাশে বড়-বড় সাইকামোর গাছের সারি। সেগুলি পেরিয়ে গেলেই আমার বাড়ি; তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য ছায়া, ফুল, আর গাছের খিলান। বাড়ির মুখে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। বিরাট একটা অস্বস্তি নেমে এল আমার ওপরে। কোথাও কোন শব্দ সেই, নড়ছে না গাছের কোন পাতা। মনে-মনে ভাবলাম—কী হ'ল আমার। গত দশটি বছর

ধরে এই একভাবে রাত্রির অন্ধকারে, বৃক্ষ-পল্লবের অন্তরাল দিয়েই তো বাড়ি ফিরছিলাম আমি। কোনদিনই, কখনও কোন অন্ধকারে ভয় পাইনি আমি। কোন লোক অসৎ উদ্দেশ্যে সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে বিদ্যুতের বেগে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতাম না আমি। তাছাড়া, আমার হাতে রিভলবার ছিল। কিন্তু রিভলবার ছুঁলাম না আমি। মনের মধ্যে যে আতঙ্ক উঁকি দিয়ে আমাকে গ্রাস করার জন্যে এগিয়ে আসছিল তারই সঙ্গে একটা মোকাবিলা করার জন্যে আমি প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালাম।

কিন্তু এটা কী? স্বপ্ন, মায়া, না মতিভ্রম? কী এটা? মনের মধ্যে অজানা একটা আতঙ্ক এইভাবে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে কেন? এ সেই রহস্যজনক রাত্রির প্রভাব ধীরে-ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে মানুষকে গ্রাস করে ফেলে! একে তো অগ্রাহ্য করা যায় না—বুদ্ধি দিয়েও বিচার করা যায় না —এইরকম উৎকট অনিবার্য একটা অনুভূতির উচ্ছ্বাস। হয়ত তাই হবে! কে জানে?

এক পা এক পা করে এগোই; আর আমার গায়ের রোঁয়াগুলি খাড়া হয়ে ওঠে। সেই বিরাট বাড়ির দেওয়ালের পাশে একটু দাঁড়ালাম। এর দরজা জানালা সব বন্ধ। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার আগে একটু অপেক্ষা করলাম। আমার ড্রয়িংরুমের পাশে একটা জানালা। তারই পাশে বাগান। সেইখানে বসার একটা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চের ওপরে আমি একটু বসলাম। গাছের ছায়ার দিকে তাকিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম একটু। অস্বাভাবিক কোন কিছু প্রথমের দিকে নজরে পড়ে নি আমার। কানের ভেতরে কেবল ভোঁ ভোঁ ক'রে একটা শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু এরকম শব্দ আমার কানে প্রায়ই হয়। মাঝে-মাঝে মনে হয় ট্রেন চলার শব্দ হচ্ছে, মনে হয় ঘড়িতে সময়জ্ঞাপক শব্দ হচ্ছে—মাঝে-মাঝে মনে হয় অনেক মানুষের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। তারপরেই সেই ভোঁ ভোঁ শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার ভুল হয়েছিল। এই শব্দটা আমার বুক ধড়ফড়ানি শব্দ নয়; ওই শব্দটা আসছিল আমারই ঘরের ভেতর থেকে—একটা অদ্ভুত ঘণ্ড-ঘণ্ড জড়ানো-জড়ানো শব্দ—ঠিক কিসের শব্দ তা আমি বুঝতে পারলাম না। ঠিক শব্দ না ব'লে তাকে আলোড়ন বলাই উচিত—অনেক জিনিস একসঙ্গে টানার শব্দ—মনে হ'ল, কে বা কারা যেন আমার চেয়ার-টেবিল-আলমারিগুলি ধরে টানাটানি করছে।

অনেকক্ষণ ধরে নিজের কানকেই আমি যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু জানালার শার্সির ওপরে কানটা চেপে দিতেই বুঝলাম ঘরের ভেতরে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। ভয় পেয়েছিলাম সত্যি কথা; কিন্তু তার চেয়েও অবাক হয়েছিলাম অনেক বেশী। প্রয়োজন হ'বে না মনে ক'রেই আমি রিভলবারটা বার করলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ মরিয়া হয়ে দরজার মধ্যে একটা চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালাম। জোরে ধাক্কা দিলাম কপাটে।

কপাট খোলার শব্দটা মনে হল কেউ পিস্তল ছুঁড়েছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, যেন তারই উত্তরের প্রতিবাদে দোতলা, একতলা, বাড়ির সবত্র তুমুল একটা হট্টগোল শুরু হল। সেই শব্দ এত আকস্মিক, এত ভয়ঙ্কর, এত তীব্র যে ভয় পেয়ে আমি কয়েক পা পিছু হটে গেলাম; এবং যদিও এখনও মনে করি যে কোন প্রয়োজন ছিল না তবু সেই সময় কোমর থেকে রিভলবারটা খুলে হাতে নিয়েছিলাম আমি।

অপেক্ষা করতেই লাগলাম আমি। কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। এতক্ষণে একটা অদ্ভুত শব্দ আমার কানে এসে লাগল—একটা অদ্ভুত ট্যাপ-ট্যাপ শব্দ সিঁড়ির ওপরে হ'তে লাগল; সে শব্দ জুতো বা চটি পায়ে দিয়ে চলাফেরা করার শব্দ নয়। মনে হল, কাঠের ক্রাচ নিয়ে কে বা কারা যেন হেঁটে-হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারপরে হঠাৎ দেখলাম আমার দরজার সামনে একটা আর্ম চেয়ার, ওই বড় চেয়ারটার ওপরে ব'সে আমি পড়াশুনা করতাম, হেলতে-দুলতে এগিয়ে এল। তারপরে বেরিয়ে গেল সোজা বাগানের দিকে। তাকে অনুসরণ ক'রে বেরিয়ে গেল আমার বসার ঘরের চেয়ারগুলি; তারপরে এগিয়ে এল কুমীরের মত ছোট-ছোট পায়ে ভর দিয়ে আমার নীচু কোচগুলি। তারপরে ছাগলের মত লাফাতে-লাফাতে এল আমার ঘরের অন্যান্য চেয়ার; তাদের অনুসরণ করল শশকের গতিতে আমার বাড়ির টুলগুলি।

আমার মনের অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখুন। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রয়েছি আমি; আর আমার চোখের উপর দিয়ে কদম-কদম এগিয়ে চলেছে আমার ঘরের আসবাবপত্রগুলি। পর-পর চলেছে—চেহারার অনুপাতে কেউ ছুটছে, কেউ বা আবার মন্থরগতিতে। আমার বিরাট পিয়ানোটা পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেরিয়ে গেল; যাওয়ার সময় সুরের আমেজ ছড়িয়ে গেল চারপাশে। ছোট-ছোট জিনিসগুলো পিঁপড়ের মত গড়িয়ে-গড়িয়ে চলতে লাগল। ঘরের পর্দাগুলি অকটোপাশের মত শুঁড় বিস্তার ক'রে ছুটলো। তারপরে চোখে পড়ল আমার লেখার টেবিল। বেশ দামী, তার চেয়েও বড় কথা, আজকালকার দিনে ওইরকম টেবিল একরকম দুষ্প্রাপ্য। ওর ভেতরে আমার অনেক গোপন চিঠি রয়েছে—রয়েছে আমার একান্ত গোপনীয় অনেক কাহিনী, অনেক ফটোগ্রাফও।

আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে পড়ল। চোরকে মানুষ যেমন পাকড়ে ধরে আমিও সেইরকম তাকে আঁকড়ে ধরলাম। সে আমাকে মাটির ওপর দিয়ে ঘষড়াতে-ঘষড়াতে টেনে নিয়ে চলল। তার গতি রোধ করতে না পেরে একসময় মাটির ওপরে পড়ে গেলাম আমি। তার পেছনে অন্যান্য আসবাবপত্র যেগুলি আসছিল তারা আমার দেহের ওপর দিয়ে নির্বিবাদে এগিয়ে গেল। মনে হল পরাজিত কোন সৈনিকের বুকের ওপর দিয়ে বিজয়ী সেনানীরা যেন মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলেছে; ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। তারপরে আবার ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, আমার চোখের ওপর দিয়ে আমার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র নির্বিবাদে বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তারপরে সেই শূন্য ঘরের মধ্যে আর একরকম শব্দ হ'ল—বাড়ির প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে সেই বীভৎস শব্দগুলি প্রতিধ্বনিত হ'ল। সেই শব্দ হচ্ছে জানালা-দরজা

বন্ধ করার শব্দ। প্রচণ্ড শব্দে কে বা কারা যেন বাড়ির অজস্র জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। সব শেষে বন্ধ হল সেই দরজাটা যেটা আমি বোকার মত প্রথম খুলে দিয়েছিলাম।

ভয় পেয়ে শহরের দিকে দৌড় দিলাম আমি; থামলাম একেবারে বড় রাস্তার ওপরে এসে। একটা পরিচিত হোটেলে গিয়ে বেল বাজালাম আমি। হাত দিয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে নিলাম; তারপরে হোটেলের মালিককে বললাম আমার ঘরের চাবিটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। তারা শোওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিল আমার। আমি চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে-শুয়ে সকাল হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম আমি। আমার নির্দেশ ছিল সকাল হলেই যেন আমার চাকরদের জানানো হয়।

সকাল সাতটা নাগাদ আমার দরজায় টোকা পড়ল। চাকরটির মুখ তখন উত্তেজনায় কাঁপছে।

সে বলল—কাল রাত্রিতে ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে স্যার। বাড়ির সব আসবাবপত্র চুরি হ'য়ে গিয়েছে। একরত্তি জিনিস বলতে আর কিছু নেই।

সংবাদটা শুনে আমি খুশি হলাম। কেন? কে জানে? মুখে আমি কিন্তু কিছু প্রকাশ করলাম না; কেবল বললাম—ওই লোকগুলিই তাহলে আমার চাবি চুরি করেছিল। এখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া উচিত। চল, আমিও যাচ্ছি।

পাঁচ মাস ধরে পুলিশের তদন্ত চলল। চোর বা জিনিসপত্র—কোন কিছুরই হদিস হ'ল না। হা ঈশ্বর! আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তা যদি তাদের বলতাম তাহলে ডাকাতকে বাদ দিয়ে আমাকেই তারা গারদের মধ্যে আটকে রাখতো।

আমি চুপ করেই রইলাম। বাড়িতে আর আসবাবপত্র ঢোকাইনি আমি। কী দরকার। আবার তারা ওইভাবে একদিন পালিয়ে যাবে। ওমুখোও আর আমি হইনি।

প্যারিসের একটা হোটেলে আস্তানা নিলাম আমি। ডাক্তারকে সব খুলে বললাম। ডাক্তার আমাকে বিদেশ ভ্রমণ করার উপদেশ দিলেন। আমি বিদেশ ভ্রমণে বেরোলাম।

২

শুরু করলাম ইতালী দিয়ে। সেখানকার সূর্য আমার উপকারই করল। জেনোয়া থেকে ভেনিস, ভেনিস থেকে ফ্লোরেনস্, সেখান থেকে রোম, রোম থেকে নেপলস্—ছ'টি মাস ধরে কেবল ঘুরতে লাগলাম আমি। তারপরে গেলাম সিসিলিতে। দেশটা গ্রীক আর নরম্যান-বিজয়ের প্রচীন ধ্বংস-প্রতীকে বোঝাই। তারপরে গেলাম আফ্রিকাতে।

মার্সেলিস দিয়ে ফিরে এলাম ফ্রান্সে, দক্ষিণ ফ্রান্সের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও, মেঘলা আকাশ আমাকে যেন বিষণ্ন ক'রে তুলেছিল। মনে হ'ল, আমার অসুখ একেবারে সারেনি। ফিরে এলাম প্যারিসে। মাসখানেকের মধ্যেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। তখন শরৎকাল, ঠিক করলাম, শীত আসার আগে আমি নরম্যানডির দিকে যাব। শুরু করলাম রাওয়েন দিয়ে। দেশটির চারপাশে গোথিক কীর্তিগুলি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। সপ্তাহখানেক তাদেরই মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম আমি।

একদিন বিকাল প্রায় চারটে নাগাদ আমি একটি অদ্ভুত রাস্তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই রাস্তার পাশ দিয়ে কালির মত কালো জলের একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। ওখানকার বাসিন্দারা স্রোতটির নাম দিয়েছিল "রোবেক ওয়াটার"। তার চারপাশে পুরোন-পুরোন বাড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলির দিকে হঠাৎ নজর পড়ল আমার। চারপাশে ভাঙা-চোরা টিনের দোকান, টালির ছাদ, ভাঙা ছাদ—তাদের একপাশে গলির মধ্যে কী অপূর্ব জায়গাই না খুঁজে বার করেছে ওরা। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দোকানগুলির মধ্যে নানাজাতীয় জিনিসপত্র, মাটি-পাথরের মূর্তি, গির্জার অলঙ্কার, মন্দির সারি-সারি ছড়ানো রয়েছে। কী আশ্চর্য নয়! সেইসব পরিত্যক্ত আবর্জনা—সংসারে যাদের প্রয়োজন শেষ হ'য়ে গিয়েছে—সেইসব জিনিস দিয়ে দোকানগুলি সাজানো।

এই পুরনো জিনিসের ওপরে আমার ঝোঁক চিরকালের। সেই ঝোঁকটাই হঠাৎ আমাকে ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই পচা তক্তার ওপর দিয়ে আমি স্টলের পর স্টল ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু এ কী! সেই পুরনো আসবাবপত্রের কবরখানার ওপরে কী দেখলাম? দেখলাম, আমার সবচেয়ে সুন্দর একটি "ওয়ার্ডরোভ" চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাঁপতে-কাঁপতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ভয়ে হাত-পা আমার এতই কাঁপতে লাগল যে তার গায়ে যে হাত দেব সে সাহসটুকু পর্যন্ত আমি হারিয়ে ফেললাম। না; এটি আমারই। তৃতীয় লুই-এর আমলের একটি অনবদ্য বস্তু। একবার যে দেখেছে সে-ই একে চিনতে পারবে। বিস্মিত নয়নে এদিকে-ওদিকে চাইতে লাগলাম। ওই...ওই যে আমার আর্ম চেয়ারগুলি; তাদের পেছনে দ্বিতীয় হেনরীর আমলের আমার দুটি টেবিল মিটমিট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এগুলিকে দেখার জন্য প্যারিস থেকে মানুষ আমার বাড়িতে ছুটে আসত।

তখন আমার মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন।

অন্ধকার যুগের নাইটরা যেমন বীরের মত মায়ার রাজত্বে প্রবেশ করতেন আমিও তেমনি বীরের মত আসবাবপত্রের অরণ্যের মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক বিভ্রান্তি নিয়ে ঢুকে গেলাম! হা ঈশ্বর! যত ভেতরে ঢুকে যাই ততই আমার বাড়ির পলায়মান আসবাবপত্রগুলি আমার চোখে পড়ে। আমার সব আসবাব এইখানে এসে জমেছে!

আমি সেই প্রায়ান্ধকার গ্যালারির ওপরে উঠতে লাগলাম। হ্যাঁ, সবই এখানে রয়েছে, একমাত্র আমার সেই খেলার টেবিলটি ছাড়া। তারই ভেতরে আমার চিঠিপত্র ছিল। সেটিকে আমি দেখতে পেলাম না। তাকিয়ে দেখলাম, আমি একা। কেউ কোথাও নেই। আমি চিৎকার ক'রে ডাকলাম। কেউ সাড়া দিল না। সেই বিরাট চৌহদ্দীর মধ্যে আমি একেবারে একা।

অন্ধকার নেমে এল। আমারই একটা চেয়ারের ওপরে আমি বসে রইলাম। ঠিক করলাম ওখান থেকে নড়ব না। মাঝে-মাঝে চিৎকার করে ডাকি—কে হে? কে আছ?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মনে হ্‌ল আমি যেন কার পায়ের শব্দ শুনলাম— খুব আস্তে-আস্তে কে যেন চলাফেরা করছে। কোন্ দিকে তা আমি বলতে পারব না। একবার মনে হ্‌ল পালিয়ে যাই। তারপরে সাহ্‌স ক'রে আর একবার হাঁক দিলাম আমি। দেখলাম পাশের দোকানে আলো জ্বলছে।

কে যেন জিজ্ঞাসা করল—কে ওখানে ?

বললাম—একজন খরিদ্দার।

এইভাবে এত দেরীতে দোকানে !

আমি একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

আগামীকাল আসতে পারতেন।

আগামীকাল এখান থেকে আমি চলে যাব।

আমিও এগিয়ে যেতে সাহ্‌স করলাম না ; সেও সাহ্‌স করল না এগিয়ে আসতে। বললাম—আপনি আসছেন ?

আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

তার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ঘরের মাঝখানে একটা ক্ষুদে রোগা, বীতিকিচ্ছি্‌র চেহ্‌ারার লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লম্বা হলদে দাড়ি; মাথায় একগাছিও চুল নেই; একটা বাতি নিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। সেই আলোতে দেখলাম—তার মুখ কুঁচকে গিয়েছে; ফোলা-ফোলা ; তার চোখ দুটো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না।

তিনটে চেয়ারের জন্যে ওইগুলি—আমারই—দরকসাকসি ক'রে সেইখানেই তাকে অনেকগুলি টাকা দিলাম। নাম বললাম না; শুধু বললাম আমার হোটেলের ঘরের নম্বরটি। ঠিক হ্‌'ল পরের দিন সকাল ন'টার মধ্যে সেগুলি আমার হোটেলে সে পৌঁছে দেবে।

আমি বেরিয়ে এলাম। সে বেশ নম্রভাবেই দরজা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এগিয়ে এল।

বেরিয়ে এসে আমি সোজা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে সব কথা বললাম। পুলিশের কর্তা তক্ষুনি যে বিভাগ চুরির তদারক ক'রে সে বিভাগে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করার জন্যে টেলিগ্রাম করলেন। উত্তরের জন্যে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। ঘণ্টাখানেক পরে যে উত্তর এল তাতে আমি সন্তুষ্ট হলাম। উত্তরটি হচ্ছে—আমি এখনই লোকটাকে গ্রেপ্তার করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম; কিন্তু সম্ভবত, লোকটা কোনরকম সন্দেহ্‌ ক'রে জিনিস-পত্রগুলি নিয়ে কেটে পড়েছে। ঘণ্টা দুই পরে আপনি যদি নৈশভোজ সেরে আমার সঙ্গে দেখা করেন তাহলে আমি তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে এনে আপনার সামনেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব।

নিশ্চয়, নিশ্চয়...ধন্যবাদ।

হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি তাঁর সঙ্গে যথাস্থানে হাজির হলাম। চীফ ইনস্‌পেক্টর আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন—আমার লোকেরা তাকে এখনও ধরতে পারেনি।

বলেন কী!—আমার মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু তার বাড়িটা নিশ্চয় তারা খুঁজে পেয়েছে।

পেয়েছে। সে যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ বাড়িটার ওপরে আমরা লক্ষ্য রাখব। কিন্তু লোকটা কোথাও উঠে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

উঠে গিয়েছে ?

উঠে গিয়েছে। লোকটা একজন কাঠের ব্যবসায়ী। সাধারণত সন্ধের দিকে সে পাশের দোকানে গল্পগুজব করে। পাশের দোকানদারের নাম বিদোইন। সেও ফার্ণিচারের ব্যবসাদার—এক বিধবা বুড়ী।

বুড়ীটা সন্ধে থেকেই তাকে দেখেনি—সেইজন্যে তার কোন সংবাদ সে জানে না। আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

সেদিন রাত্রিতে আদৌ ঘুম হয়নি আমার। মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে আঁৎকে আঁৎকে উঠেছি। কিন্তু বাইরে আমার অস্থিরতা প্রকাশ করতে আমি চাইনি। তাই পরের দিন সকাল দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আমি ইনস্‌পেক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম। ইনস্‌পেক্টর বললেন—সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই আমরা গ্রহণ করেছি। চলুন; আমরা দু'জনে দোকানে যাই। সেইখানে আপনার জিনিস আপনি সনাক্ত করবেন।

তথাস্তু।

পুলিশ আর কামার সঙ্গে নিয়ে আমরা দোকানে হাজির হলাম। দোকান খোলা হল। কিন্তু একি! গত রাত্রিতে এইখানে আমার আসবাবপত্রের ভিড়ে এক-পাও আমি চলতে পারিনি। আজ তার একটাও নেই।

ইনস্‌পেক্টরও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমি বললাম—হা ঈশ্বর! লোকটার সঙ্গে জিনিসগুলিও সব উধাও হয়ে গিয়েছে।

তিনি হেসে বললেন—সত্যি কথা। গতকাল টাকা দিয়ে আপনি ভুল করেছেন। লোকটা সাবধান হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম: গত রাত্রিতে যেসব জায়গায় আমার জিনিসগুলি ছিল আজ দেখছি সেই সব জায়গায় অন্য ফার্ণিচার বোঝাই হয়ে রয়েছে। কেমন করে এ জিনিস ঘটতে পারে তা আমার মাথায় ঢুকছে না।

তিনি বললেন—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সারা রাত ধরেই লোকটা জিনিস সরিয়েছে। যাই হোক, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। যা করার তা আমরা তাড়াতাড়িই করছি। আমরা তার ফিরে আসার পথ বন্ধ করেছি। বদমাসটাকে ধরতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না।

হায়, অশান্ত হৃদয় আমার।

আরও দিন পনের আমি রাওয়েন-এ ছিলাম। লোকটা ফেরেনি। জীবন্ত কোন মানুষ কি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? ষোল দিনের দিন আমার বাগানের মালির কাছ থেকে আমি এই চিঠিটা পেলাম—

স্যার, গত রাত্রিতে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আমাদের কথা দূরে থাক—পুলিশও পর্যন্ত হকচকিয়ে গিয়েছে। আপনার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র ফিরে এসেছে। চুরির রাত্রিতে যেসব জিনিস ছিল—তাদের সব ক'টি—মায় ক্ষুদে জিনিসগুলি পর্যন্ত, এটা হয়েছে শুক্র-শনিবার রাত্রিতে। বাইরে মাটির ওপরে দাগ দেখে মনে হয় কেউ তাদের প্রধান ফটক থেকে ঘসড়ে-ঘসড়ে ভেতরে নিয়ে এসেছে—আপনার ফিরে আসার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি। ইতি,

ভবদীয়
ফিলিপ

না—না—না—! আর ও বাড়িতে আমি কোনদিনই ফিরে যাব না।

চিঠি দেখে পুলিশ ইনস্পেক্টর বললেন—চোরটা ধূর্ত, সন্দেহ নেই। আমাদের যে আর কিছু করণীয় নেই—এইটাই বাইরে আমরা দেখাব। লোকটাকে শীগগীরই আমরা ধরে ফেলব।

না; লোকটাকে আজও তারা ধরতে পারেনি। আমার ভয় হচ্ছে একটা শিকারী জন্তুর মত সে অলক্ষ্যে আমার পিছু-পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোনমতেই খুঁজে পাওয়া গেল না। আর তাকে পাওয়া যাবে না। আর সে তার বাড়ি ফিরে যাবে না। তাতে তার যায় আসে কী? একমাত্র আমি তার মুখোমুখী দাঁড়াতে পারি। কিন্তু আমি তা দাঁড়াব না। না—না—কিছুতেই না।

যদি সে ফিরেই আসে তাতেই বা কী? কেউ কি প্রমাণ করতে পারবে যে আমার ফার্ণিচার তার দোকানে কোনদিন ছিল? তার বিরুদ্ধে সাক্ষী একমাত্র আমিই; আর আমার কথা যে পুলিশেও বিশ্বাস করেনি সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। না, না—এ জীবন আর সহ্য করা যায় না। আমি যা দেখেছি তার গোপন রহস্য আর আমি বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারছিনা।

একজন বেসরকারী ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমি সব খুলে বললাম। অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন ক'রে তিনি বললেন—কিছুদিন আপনি এখানে থাকতে চান?

খুব চাই।

সে সামর্থ্য আপনার রয়েছে?

রয়েছে।

আলাদা ঘর আপনার দরকার?

হ্যাঁ।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে চান?

মোটেই না। ওই রাওয়েনের লোকটা সেই সুযোগে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে আমার ঘরে ঢুকতে পারে।

মাসতিনেক আমি এখানে শান্তিতে রয়েছি। আমার কেবল একটিমাত্র ভয় রয়েছে। সেটি হচ্ছে যদি সেই পুরনো আসবাবপত্রের ব্যবসাদারটি পাগল হয়ে এইখানে আশ্রয় নেয়...কারাগারও আজকাল নিরাপদ নয়।

শশক

The Rabbit

যথাসময়ে, অর্থাৎ সকাল পাঁচটা থেকে সওয়া পাঁচটার মধ্যে, বৃদ্ধ লিকাচির দরজার সামনে বেরিয়ে এলেন। এখন তাঁর লোকজনদের প্রাত্যহিক কাজ শুরু করার কথা। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে ভুঁড়ির ওপরে কোনরকমে কোমরবন্ধনীটা আঁটতে-আঁটতে চিরপরিচিত ফার্মের চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখলেন। খালের ধারে যে বীচগাছের সারি রয়েছে তাদের ভেতর দিয়ে প্রভাত সূর্যের তির্যক কিরণ উঠোনের ওপরে এসে পড়েছে; তাই দেখে আস্তাবলের পাশ থেকে মুরগীগুলি ডাকতে শুরু করেছে; ছাদের ওপরে সুর তুলেছে পায়রাগুলি। সকালের তাজা বাতাসে গোয়ালের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে; গোয়ালের পাশে ঘোড়ার আস্তাবল। তারই ধারে আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘোড়াগুলি ডাকছে।

ধরাচূড়া প'রে লিকাচির প্রথমে মুরগীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সম্প্রতি ডিম চুরি যাচ্ছে ব'লে তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে। ডিম গুণতে হবে তাঁকে।

তাঁকে দেখেই চাকরানীটা হাত তুলে চেঁচাতে-চেঁচাতে তাঁর দিকে দৌড়ে আসতে আসতে বলল—মাস্টার, মাস্টার, কাল রাতে একটা খরগোস চুরি হয়েছে।

খরগোস!

হ্যাঁ। ডান পাশের ওই বাক্সটার ভেতরে যে ধূসর রঙের বড় খরগোসটি ছিল—সেইটা।

দেখি।

সত্যি বাক্সটা ভাঙা দেখা গেল। খরগোসটাও উধাও।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলেন তিনি; তারপরে চাকরানীকে বললেন—পুলিশকে সংবাদ দাও। এখনই আসতে বল তাদের।

স্থানীয় মেয়র ছিলেন লিকাচির; ক্ষমতা আর অর্থের দম্ভে তিনি তাঁর অধিকারটিকে জবরদস্ত দখল ক'রে রেখেছিলেন।

মেয়েটি গাঁয়ের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি কফি খাবার জন্যে বাড়ির দিকে রওনা হলেন; স্ত্রীর সঙ্গেও ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা দরকার ছিল তাঁর। ভদ্রমহিলা তখন হাঁটু মুড়ে বসে উনোন ধরাচ্ছিলেন।

ঘরে ঢুকেই লিকাচির বললেন—একটা খরগোস চুরি হয়েছে।

চট করে মুখ ঘোরালেন ভদ্রমহিলা; বললেন—কী ব্যাপার? খরগোস চুরি?

হ্যাঁ; সেই বড়টা।

কী লজ্জা, কী লজ্জা! কে চুরি করল?

কে চুরি করতে পারে সেবিষয়ে লিকাচির নিজেরই একটা অভিমত ছিল; বললেন—নিয়েছে ওই পোলাইত—আর কে নেবে?

এখন কী করবে ঠিক করেছ ?

পুলিশ ডাকতে পাঠিয়েছি।

পোলাইত একজন শ্রমিক। কিছুদিন এখানে সে কাজ করেছিল ; কিন্তু ঔদ্ধত্যের জন্যে তিনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লোকটা সেনাবাহিনীতে কাজ করত ; আফ্রিকায় থাকার সময় সে লাম্পট্য আর হাতসাফাই দুটোই শিখেছিল। সব কাজেই সে হাত দিয়েছে। কিন্তু কোনটাতেই বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি। তবে কাজের সন্ধানে দেশের নানা জায়গাতেই সে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম দিন থেকেই ভদ্রমহিলা তাকে তেমন দেখতে পারতেন না। সেইজন্যে তিনি নিশ্চিত হলেন যে ওই লোকটাই চুরি করেছে।

প্রায় আধ-ঘণ্টার ভেতরেই লম্বা রোগাটে পুলিশ সার্জেণ্ট একটি বেঁটে মোটা কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন।

তাদের বসিয়ে লিকাচির আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা তাদের বললেন। ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্যে সবাই অকুস্থানে হাজির হল। সেখান থেকে ফিরে এলে গৃহকর্ত্রী পুলিশদের কয়েক গ্লাস মদ দিয়ে বেশ উদ্ধতভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—চোর ধরতে পারবেন ?

সার্জেণ্টের কোমর থেকে খাপে ঢাকা তরোয়াল ঝুলছিল। তাকে চিন্তান্বিত দেখা গেল। অবশ্য চোরকে সনাক্ত ক'রে দিলে তাকে সে অবশ্যই ধরতে পারবে। অন্যথায়, সে যে অপরাধীকে ধরবেই এমন কোন কথা দিতে পারছে না। অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে সে একটা সোজা প্রশ্ন করল—কে চুরি করেছে তা আপনি জানেন ?

গৃহস্বামী বললেন—তা আমি বলতে পারব না ; কারণ, কাউকে আমি চুরি করতে দেখিনি। দেখলে, এক ফোঁটা মদ না দিয়ে হাড়, মাংস, পালক সব তাকে খাওয়াতাম। তবে সেই হতভাগা পোলাইতই যে এ কাজ করেছে সে-সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

সার্জেণ্ট অধঃস্তন সহকারীটির দিকে তাকিয়ে কথার ছলে বলল—মেষপালক সেভারিন-এর বউ-এর বাড়িটা একবার খুঁজে দেখতে হবে আমাদের।

একটু হেসে কনস্টেবল উত্তরে বারতিনেক ঘাড় নাড়ল।

তারপরে মাদাম এলেন এবং মিষ্টি আর বুদ্ধি ক'রে সার্জেণ্টকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। মেষপালক সেভারিন একটি জন্তু, মানুষ নয়। পাহাড়ের চারপাশে মেষ চরিয়েই সে বড় হয়ে উঠেছে। মেষ চরানো ছাড়া অন্য কোন কাজই সে জানত না। তবুও চাষীদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অনুসারে সে কিছু সঞ্চয় করেছিল। সেইসঙ্গে পশুদের চিকিৎসা ক'রেও সে কিছু রোজগার করত। তারপরে একদিন তিন হাজার ফ্রাঁ খরচ করে সে কিছুটা জমি আর একটা কুঁড়ে কিনলো। তারই কিছুদিন পরে সে সরাইখানার একটি ঝিকে বিয়ে করল। মেয়েটির স্বভাবচরিত্র একেবারে যাচ্ছেতাই। গ্রামের ছেলেদের কাছে শোনা যায় সেভারিনের অবস্থা ভাল দেখে মেয়েটা রোজ রাত্রিতে তার বাসায় যেত; তারপর বিয়ে করতে বাধ্য করল ছোকরাটাকে। বিয়ের পরে সে তার নিজের বাড়িতে গেল ; আর সেভারিন আগের মতই তার মেষের পাল নিয়ে দিনরাত্রি পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সার্জেন্ট বলল—পোলাইত গত তিন সপ্তাহ ধরে ওই মেয়েটার ঘরে ঘুমোচ্ছে। হতচ্ছাড়াটার থাকার আর কোন জায়গা নেই।

কনস্টেবল সাহস ক'রে বলল—লোকটা সেভারিনের কম্বলে তাকে নিয়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকে।

বিবাহিতা নারীর এহেন দুষ্কর্মের প্রমাণ পেয়ে মাদাম ক্ষেপে লাল হয়ে উঠে বলল—ওই মেয়েটারই কাজ। আপনি এখনই যান—তাকে ধরুন।

সার্জেন্ট শান্তভাবে বলল—একটু ধৈর্য ধরুন। দুপুরে রোজই ও খেতে আসে। তখন বামালশুদ্ধ তাকে আমরা গ্রেপ্তার ক'রে আনব।

বেলা বারোটা নাগাদ সার্জেন্ট তার সহকারীটিকে নিয়ে বনের পাশে নির্জন ছোট একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল; গ্রাম থেকে এর দূরত্ব পাঁচশ' গজের মত। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে টোকা দিল তিনটে। ভেতর থেকে যাতে কেউ দেখতে না পায় এইভাবে একটা পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল তারা। ভেতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মিনিট দুই অপেক্ষা ক'রে আবার টোকা দিল। মনে হল ভেতরে কেউ নেই; কিন্তু সার্জেন্টের শ্রবণশক্তি বড় প্রখর। সে বেশ বুঝতে পারল ঘরের মধ্যে কে বা কারা যেন নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছে।

হঠাৎ রেগে উঠল সার্জেন্ট। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব যার ওপরে তাঁকে এক সেকেণ্ডের জন্যে অগ্রাহ্য করার অধিকার কারও নেই।

দরজা খোল।

কাকস্য পরিবেদনা!

গর্জন করল সার্জেন্ট—এক্ষুণি না খুললে ভেঙে ফেলব দরজা। আমি হচ্ছি পুলিশ সার্জেন্ট—লিনিয়েন্ট।

কথাটা শেষ করার আগেই খুলে গেল দরজা। দেখা গেল একটি স্থূলবপু মেয়েমানুষকে। তার মুখ লাল, ফোলা গাল, বিধ্বস্ত বিধ্বস্ত বক্ষদেশ, ঝোলা পেট; চওড়া পাছা, আর রুক্ষ চেহারা। মহিলাটি জন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ-ই হচ্ছে মেষপালক সেভারিনের বউ।

সার্জেন্ট বলল—আমি কিছু অনুসন্ধান করতে এসেছি—এখনই।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল সার্জেন্ট। টেবিলের ওপরে খাওয়ার আয়োজন দু'জনের মত। গ্লাসের মধ্যে অর্দ্ধেক মদ থাকায় বোঝা গেল খানাপিনাটা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। চতুর কনস্টেবল তার মনিবের দিকে তেরচাভাবে তাকিয়ে বলল—খাস খুসবাই ছাড়ছে। আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি এটা খরগোসের স্টু ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল—একটু ব্র্যাণ্ডি খাবেন?

না-না, ধন্যবাদ। তোমরা যে খরগোসের মাংস রান্না ক'রে খাচ্ছ আমি তার চামড়াটা চাই কেবল।

হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল মেয়েটি। যেন কিছু বলতে পারছে না—এই রকম একটা ভাব; কিন্তু তার সারা অঙ্গ থরথর করে কাঁপছিল।

কোন্ খরগোসের কথা বলছেন ?

থাক থাক ! তুমি আমাকে নিশ্চয় বোঝাতে চাও না যে এতক্ষণ তোমরা ঘাস খাচ্ছিলে, এতক্ষণ কী খাচ্ছিলে তোমরা ?

আমি ? কিছু না, দিব্যি ক'রে বলছি—সামান্য ; রুটিতে সামান্য একটু মাখন...

রুটিতে সামান্য একটু মাখন ! মরে যাই আর কি। অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাও খরগোসের মাংসে একটু মাখন মাখিয়েছ ? গোল্লায় যাও তুমি। তোমাদের মাখনের গন্ধ একেবারে মাতিয়ে দিয়েছে। নিশ্চয় সেরা মাখন। ঘিয়ের মাখন। মাংস ভাজার মাখন—সাধারণ মাখন এ নয়।

হাসতে-হাসতে কনস্টেবল বলল—না ; সাধারণ মাখন নয়।

সার্জেণ্ট রসিকতা ক'রে জিজ্ঞাসা করল—বলি, মাখনটা রাখ কোথায় ?

আমার ?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমার।

কেন ? মাখন যেখানে থাকে। এই যে !

এই বলে সে একটা কাপ বার ক'রে আনল। কাপটা নোংরা ; তার ভেতরে নুনের পলেস্তারা পড়েছে। তলায় একছিটে মাখন পড়ে রয়েছে। কাপটা শুঁকে সার্জেণ্ট বলল—না ; এ নয়। যে মাখনে খরগোসের গন্ধ ছাড়ছে আমি সেই মাখনটা চাই। এস, লিনিয়েণ্ট—আমরা একটু ঘুরে দেখি। তুমি কুলুঙ্গিটা দেখ ; আমি দেখি বিছানার নীচে।

দরজা বন্ধ ক'রে সে বিছানার কাছে গিয়ে খাটে টান দিল ; কিন্তু সেটা দেওয়ালে এঁটে থাকার ফলে নড়ানো গেল না। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এটাকে কেউ নড়ায় নি। তারপরে নীচু হ'য়ে বসতে গেল সার্জেণ্ট, ফলে তার পোশাক ছিঁড়লো, বোতাম-গুলো খুলে বেরিয়ে গেল। সে বলল—লিনিয়েণ্ট, এদিকে এস তো বৎস। আমি এত লম্বা যে নীচু হ'তে পারছিনা। আমি আশপাশে দেখছি।

মোটা বেঁটে লিনিয়েণ্ট তার মাথার বর্মটা খুলে উপুড় হ'য়ে শুয়ে বিছানার তলায় যে অন্ধকার গর্ত রয়েছে সেইদিকে প্যাট-প্যাট ক'রে তাকালো। তারপরে হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠল—পেয়েছি, পেয়েছি।

কী পেয়েছ ? খরগোস ?—তার ওপরে ঝুঁকে পড়ল সার্জেণ্ট।

না, চোর।

চোর ! টানো, টানো—টেনে বার কর। জোরসে টান দাও।

বিছানার তলায় দুটো হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কনস্টেবলটি প্রাণপণে একটা জিনিস টানতে লাগল, অনেক টানাটানির পরে, সে শেষপর্যন্ত একটা জুতা পরা পা টেনে আনলো। সার্জেণ্ট সেই পা-টা ধরে চিৎকার ক'রে বলল—জোরসে টানো, জোরসে টানো।

হাঁটু মুড়ে ব'সে কনস্টেবল লিনিয়েণ্ট মারো-জোয়ান-হেঁইয়ো ব'লে আর একটা পা টেনে আনলো। কিন্তু বড় কঠিন হচ্ছিল কাজটা। বন্দী বেশ পরিকল্পনার সঙ্গে

লাথি ছুঁড়তে লাগল। সেই সঙ্গে খাটের একটা পা আঁকড়ে ধরার ফলে তাকে বাইরে টেনে আনা বেশ কষ্টকর হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু সার্জেন্টের উৎসাহে মরিয়া হ'য়ে কনস্টেবল যাকে বাইরে টেনে আনলো সে আর কেউ নয়—আমাদের পোলাইত। রাগে আর ভয়ে তার মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছিল।

আর একটা টান দিতেই বন্দীর আর একটা হাত বেরিয়ে এল—সেইসঙ্গে বেরিয়ে এল খরগোসের রান্না মাংসসমেত একটা সস্‌প্যান। হুররে—হুররে ব'লে আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল সার্জেন্ট।

তারা যে চুরি করেছে তার অবিসংবাদিত প্রমাণ খরগোসের চামড়া। সেটা পাওয়া গেল মাদুরের তলায়। বামালশুদ্ধ চোরকে বেঁধে পুলিশ বুক ফুলিয়ে ফিরে এল গ্রামে।

সপ্তাহখানেক পরের কথা। মাষ্টার লিকাচির বিশেষ কাজে মিউনিসিপ্যাল হলে আসছিলেন এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন মেষপালক সেভারিন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে অপেক্ষা করছে। মে'য়রের সঙ্গে দেখা হ'তেই সেভারিন সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতেই লিকাচির জিজ্ঞাসা করলেন—কী চাই তোমার?

গত সপ্তাহে আপনার বাড়ি থেকে একটা খরগোস চুরি হয়েছিল এটা কি সত্যি?

হ্যাঁ, সেভারিন—সত্যি।

কে চুরি করেছিল?

পোলাইত।

বেশ কথা। এটা কি সত্যি যে সেই খরগোসের চামড়া আমার বিছানার তলা থেকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল?

কোন্‌টা?

খরগোস আর পোলাইত দু'জনকেই?

হ্যাঁ। কথাটা সত্যি।

তাহলে কথাটা সত্যি?

হ্যাঁ। তোমাকে একথা কে বলল?

প্রায় সবাই। এবার আমি সব বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আপনি তো অনেকেরই বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের আইনকানুন নিশ্চয় তাহলে আপনার সব জানা রয়েছে? আমি অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

অধিকার বলতে?

এই স্বামী অথবা স্ত্রী—এদের ব্যক্তিগত অধিকার।

হ্যাঁ; তা আছে।

তাহলে পোলাইতের সঙ্গে একবিছানায় শুয়ে রাত কাটানোর অধিকার কি আমার স্ত্রীর রয়েছে?

না—নিশ্চয় নেই।

তাহলে, আর যদি কখনও তাকে এই অবস্থায় আমি ধরতে পারি, তাহলে দু'জনকে খোলাই দেওয়ার অধিকারও কি আমার থাকবে ?

মানে—মানে—নিশ্চয়।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ। —এবার যদি ওদের আমি ধরতে পারি তাহলে একসঙ্গে শুয়ে রাত কাটানোর মজাটা তাদের আমি বুঝিয়ে দেব।

দেনা

The Debt

'ওগো অন্ধকারের পথিক, আমার সঙ্গে এস। দেখতেই পাচ্ছ আমার চেহারা সুন্দর। এস। আর কিছু না পাও, এই শীতের রাত্রিতে আমার ঘরে আরাম পাবে; ঘরে আমি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি।'

এই কথাগুলি বলতে-বলতে সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গিনী তেইশ বছরের যুবতী ফ্যানী রাত্রির অন্ধকারে পথ দিয়ে হাঁটছিল। ডিসেম্বর মাসের সেই কনকনে ঠাণ্ডার রাত্রিতে পথচারীদের সংখ্যা এমনিতেই কম ছিল। ফ্যানী সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল; বৃদ্ধ, মোটা, মাতাল—কারও বিরুদ্ধে সে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব জ্ঞানাল না। কিন্তু কেউ তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করল না, এমন কি অন্ধকারের সুপুরুষ বিশেষণে ভূষিত হ'য়েও না। আর ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই পথ নির্জন হয়ে যাবে; এবং দেরীতে-ফেরা কোন একটা মাতালকেও যোগাড় করতে না পারলে বেচারীকে শেষ পর্যন্ত একলাই ঘরে ফিরে আসতে হবে।

তবু, দীর্ঘাঙ্গিনী ফ্যানী সত্যিকারের সুন্দরী যুবতী। তেইশ বছরের এই প্রাণচঞ্চলা নারীর কাছে এই হতচ্ছাড়া পথের ক্লেদাক্ত পরিবেশের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আরও অনেক ভাল কাজ ছিল। পরের দিনের খরচার জন্যে পাঁচটি ফ্রাঁও সে এখানে রোজগার করতে পারে না। কিন্তু বিপদটা ওইখানেই। প্যারিসের মত জনাকীর্ণ জনঅরণ্যে চিত্রকরদের মত বারবণিতারাও অনেকবেশী বয়স ছাড়া সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত বেশী। আর সেইজন্যেই সুন্দর চেহারা আর যৌবন থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘাঙ্গিনী ফ্যানী—অতীতে যে একদিন প্যারিসের নাট্যজগতে একটি সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী হিসাবে নাম কিনেছিল—সেই ফ্যানী পাঁচটি ফ্রাঁ রোজগারের জন্যে সেই নিষ্ঠুর ডিসেম্বর মাসের একটি রাত্রিতে অসহায়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কাছে তার একটি কপর্দকও ছিল না।

যাই হোক; পথ নির্জন হ'য়ে গিয়েছে। কোন পথচারীর দেখা পাওয়ার আশা আর নেই। অকস্মাৎ ঝড়ো বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না; সেই

বাতাসের কাঁপা গ্যাসের আলো ছাড়া আর কোন আশার আলো পড়ছে না তার চোখে। সেই আলোর শিখাগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে মরণোন্মুখ জোনাকির মত। এখন একা একা বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই তার।

কিন্তু হঠাৎ ফ্যানীর মনে হ'ল পথের মোড়ে ফুটপাতের ওপরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূর্তিটি কোন্‌দিকে যাবে তাই নিয়ে একটু ইতস্তত করছে। লোকটি দেখতে ছোট এবং রোগা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা লম্বা আলখাল্লা দিয়ে ঢাকা।

মেয়েটি নিজের মনে-মনে বলল—'সম্ভবত, লোকটা কুঁজো; এইজাতীয় লোকেরা লম্বা মেয়েমানুষ পছন্দ করে।'

এই বলেই সে সেইদিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল; হাঁটতে-হাঁটতে তার পূর্বোক্ত কথাগুলি বলে গেল—'ওগো, অন্ধকারের মানুষ, আমার সঙ্গে এস।' একেই বলে কপাল। লোকটা পালিয়ে গেল না; বরং তারই দিকে ভীরু পদক্ষেপে এগিয়ে এল সে। তাকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে ফ্যানীও ততক্ষণে তার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে-যেতে সে লক্ষ্য করল লোকটা মাতালের মত টলতে-টলতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে হাঁটছে। ফ্যানী ভাবল...মাতালদের মরণ ওইখানেই। একবার বসে পড়লে আর ওদের ওঠানো যাবে না। সেইখানেই বসে-বসে ঘুমাবে। ও ঢলে পড়ার আগেই যদি ওকে ধরতে পারি তবেই মঙ্গল।

কপাল ভাল বলতে হবে, লোকটা পড়ে যাওয়ার আগেই ফ্যানী তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল; কিন্তু জড়িয়ে ধরার সঙ্গে-সঙ্গে অবাক হল। আর একটু হলেই সে তাকে ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি! মানুষটি মাতালও নয়, কুঁজোও নয়; ওভারকোটে ঢাকা বার কি তের বছরের একটি ছেলে। ছেলেটি কাঁদতে-কাঁদতে করুণ সুরে বলল—আমার কত ক্ষিদে পেয়েছে তা যদি আপনি জানতেন মাদাম; ঠাণ্ডা হাড়ের ভেতরে কাঁপুনি ধরেছে আমার। ওঃ মরে গেলাম।

ছেলেটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ফ্যানী বলল—আহা রে! এই ব'লে সে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল। ছেলেটিকে ক্রমাগত ফোঁপাতে দেখে সে যান্ত্রিকভাবেই বলতে লাগল...কেঁদ না বাছা। ভয় পেয়ো না। আমি কত ভাল তা তুমি দেখতে পাবে। আমার বাসায় আগুন রয়েছে। সেখানে তোমার শরীর তুমি গরম করতে পারবে।

কিন্তু তারা যখন ঘরে পৌঁছলো তখন চুল্লী নিবে গিয়েছে; তবে ঘরটা বেশ গরমই রয়েছে। ঘরে ঢোকামাত্র ছেলেটা বলল—আঃ! কী গরম। রাস্তার চেয়ে জায়গাটা অনেক ভাল। আজ ছ' দিন আমি রাস্তায় রাত কাটাচ্ছি। তারপরে সে বলল—আজ দু'দিন আমি খেতে পাইনি, মাদাম।

ফ্যানী তার কাবার্ডটি খুলে কিছু বিস্কুট বার করল। তারপরে, সামান্য একটু ব্র্যানডি, আর দু'টুকরো চিনির সঙ্গে জল মিশিয়ে এক গ্লাস সরবত তৈরি ক'রে সে তাকে দিল। ছেলেটা গোগ্রাসে তাই খেয়ে ফেলল। খেয়েদেয়ে ছেলেটা তার কাহিনী বলল।

আত্মীয় বলতে তার একমাত্র আপনজন ছিলেন তার ঠাকুরদা। সয়সোঁতে তিনি ঘরবাড়ি সাজানোর কাজ করতেন। মাসখানেক আগে তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার সময় তিনি তাকে বলে যান—একখানা চিঠি রেখে গেলাম। এই চিঠি নিয়ে প্যারিসে তুমি আমার ভাই-এর কাছে যাবে। তিনিই তোমার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। যেমন ক'রেই হোক, তোমাকে প্যারিসে যেতেই হবে, একমাত্র সেইখানেই তোমার চিত্রকর হওয়ার আশা পূর্ণ হ'তে পারে।

বৃদ্ধটি মারা যাওয়ার পরে [তিনি হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন] সে চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্যারিসের দিকে। সঙ্গে তার ছিল মাত্র তিরিশটি ফ্রাঁ; ওইটুকুই ছিল বৃদ্ধের শেষ সম্বল। ঠিকানা নিয়ে বাড়িটা খুঁজে পেল বটে; কিন্তু ভদ্রলোকের দেখা পেল না। মাসছয়েক আগে তিনি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। বেচারা একা। রাস্তা খরচ বাদ দিয়ে যেটুকু তার কাছে ছিল তাই দিয়ে সে কয়েকটা দিন কোনমতে চালালো; তারপরে সে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটু-আধটু শুকনো রুটি চিবিয়ে দিন কাটতে লাগল। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা সে একেবারে অনাহারে রয়েছে।

ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে, ফোঁপাতে-ফোঁপাতে, আর হাই তুলতে-তুলতে সে তার কাহিনী শেষ করল। কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও ফ্যানী তাকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। বরং সে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আজ থাক। তুমি বরং ঘুমিয়ে পড়। আবার কাল শুনব।

শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্যানীও তার পোশাক ছেড়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। কেন কাঁদতে লাগল তার কোন কারণ সে বুঝতে পারল না।

পরের দিন ফ্যানী কিছু ধার ক'রে তাকে নিয়ে বাইরে খেয়ে এল; তারপরে অন্ধকার হয়ে এলে সে ছেলেটাকে বলল—তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমার কাজ শেষ হ'লে তোমার কাছে আমি আসব। অবশ্য সে আগেই ফিরে এল—রাত্রি তখন দশটার কাছাকাছি। তার কাছে বারটা ফ্রাঁ ছিল। ছেলেটার হাতে তাই দিয়ে ফ্যানী হেসে বলল—আমার কপালটা ভাল। মনে হচ্ছে তোমার জন্যেই আমার কপাল আজ ফিরেছে। অস্থির হয়ো না। আমার জন্যে অপেক্ষা করো। আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ তুমি বরং মশলা মেশানো একটু দুধ খাও।

এই ব'লে ছেলেটিকে চুমু খেয়ে ফ্যানী বেরিয়ে গেল। ছেলেটির ওপরে সত্যিই তার একটা বাৎসল্যরস পড়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করার জন্যে পুলিশ ফ্যানীকে গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পাঠিয়ে দেয়।

ছেলেটির আবার সেই ভবঘুরে জীবন শুরু হয়।

পনের বছর পরে একদিন সকালে খবরের কাগজে একটি সংবাদ প্রকাশিত হল। সংবাদটি হল বিখ্যাত অভিনেত্রী ফ্যানী ক্লালিয়েতকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয়েছে।

এই সেই বিখ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রী যার জন্যে তিনজন মানুষ আত্মহত্যা করেছে; যার অর্দ্ধনগ্ন অভিনয় দেখার জন্যে প্যারিসের লোকেরা প্রেক্ষাগৃহের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। রোগটা হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে। রোগটা আর কিছু নয়, সাধারণ পক্ষাঘাত। ফ্যানীর দেনা ছিল অনেক। দেনা শোধ হওয়ার পরে তার যাকিছু সম্পত্তি থাকবে তাতে তাকে অনাথ আশ্রমে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

এই সংবাদটি পড়ে চিত্রকর ফ্রাঙ্কোয় গিরল্যাণ্ড বললেন—'কিছুতেই তা হবে না। ফ্যানীর জীবন ওইভাবে শেষ হবে না।' কারণ, এ সেই ফ্যানী। সেদিক থেকে কোন সন্দেহ ছিল না তার। ফ্যানী তার দুঃস্থ সময়ে তাকে যে একদিন সাহায্য করেছিল তা সে কোনদিনই ভুলতে পারেনি। শিশু অবস্থায় তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও সে কম করেনি। কিন্তু বড় অদ্ভুত জায়গা এই প্যারিস। আর অনেক চেষ্টা এবং কষ্টের পরে তাকেও মানুষ হ'তে হয়েছে; এখন সে বেশ নাম করেছে। সে ফ্যানীকে কেবল দূর থেকে দেখেছে; দেখেছে স্টেজের ওপরে, দেখেছে সে যখন স্টেজ থেকে বেরিয়ে তার সেই রাজকীয় গাড়ীতে উঠছে। সে-সময়ে ফ্যানীর সামনে সে কি এগোতে পারে? সে কি তাকে তখন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে যে তখন তার দাম ছিল পাঁচ ফ্রাঁ। না; নিশ্চয় না। সেইজন্যেই সে তার পিছু-পিছু গিয়ে দূর থেকে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এসেছে।

কিন্তু সেই ঋণ শোধ করার সময় এসেছে আজ। এবং সেই দেনা সে শোধও করল। এখন সে চিত্রকর হিসাবে নাম করেছে সেকথা সত্যি; ভবিষ্যৎও যে তার যথেষ্ট রয়েছে সেকথাও মিথ্যে নয়; তবু সে ধনী নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? সেই ভবিষ্যৎ মর্টগেজ দিয়ে সে একটি আর্ট ডিলারের দোকানে চাকরি নিল। তারপরে সে সেই হতভাগ্য রমণীটিকে একটি বেশ ভাল উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে গেল যেখানে তার সেরা চিকিৎসাই কেবল হবে না, সেবাও হবে যথেষ্ট। কিন্তু হায়রে, পক্ষাঘাত কাউকেই ক্ষমা করে না। মাঝে-মাঝে বিড়ালের মত সে তার শিকারকে একটু ছেড়ে দেয় বটে; তারপরে আবার ভীষণভাবে কামড়িয়ে ধরে। ফ্যানীর অবস্থাও সেইরকম দাঁড়াল। একদিন ডাক্তার তাকে বললেন—আপনি এঁকে নিয়ে যেতে চান? উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আবার এঁকে নিয়ে আসতে হবে। কারণ, এ রোগ সারার নয়। বড়জোর মাসখানেক। তাও যদি মানসিক উত্তেজনা না দেখা দেয়।

দেখা দিলে?

মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া আর কিছু বলার নেই। তবে, আক্রমণ ত্বরান্বিত হোক অথবা না-ই হোক, ফলটা হবে মৃত্যু।

সেদিক থেকে আপনি নিশ্চিত?

একেবারে নিশ্চিত।

ফ্রাঙ্কোয় ফ্যানীকে উন্মাদ-আগার থেকে বার ক'রে নিয়ে এল, তার জন্যে বেশ একটা চমৎকার অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করল; আর তার সঙ্গে থাকার জন্যে উঠে গেল সেখানে। বুড়ী হয়েছে ফ্যানী, মুটিয়ে গিয়েছে বেশ; চুলগুলো সব সাদা হয়ে গিয়েছে।

মাঝে-মাঝে আবোলতাবোল কী সব চিন্তাও করে। অনেকদিন আগে যে শিশুটির ওপরে সে করুণা দেখিয়েছিল তাকেও সে আর চিনতে পারল না। সেও তাকে স্মরণ করিয়ে দিল না। সে তার মনে এই ধারণাই জাগিয়ে দিল যে একটি ধনী যুবক তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। কোন রক্ষিতাকে আজ পর্যন্ত তার প্রেমিক অত ভালবাসেনি। তিন সপ্তাহ পরেই আবার সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হল; আর তাতেই মৃত্যু হল তার; কিন্তু এই তিনটি সপ্তাহই প্রেমিকের ভালবাসা আর অজস্র চুম্বনে সে মসগুল হয়ে ছিল।

সেদিন চিত্রকরদের ডিনারের শেষে ছবিটি নিয়ে সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল। সেই সময় একজন বেশ ঘৃণার সঙ্গে মন্তব্য করল—হ্যাঁ, এই সুদর্শন যুবক ফ্রাঙ্কোয় গিরল্যান্ড।

দ্বিতীয় বক্তা প্রথম বক্তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যটিকে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ ক'রে বলল—ঠিক, ঠিক। এ সেই সুদর্শন ছোকরা গিরল্যান্ড-ই বটে! ওই ছোকরাই একটি রক্ষিতার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল।

একটি নরম্যানডি মস্করা

A Normandy joke

শোভাযাত্রাটি রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছিল। রাস্তার দু'পাশে গাছের ছায়া পড়েছে। দু'পাশের গাছগুলি সারিবন্দী হ'য়ে চড়াই বেয়ে 'ফার্ম' অবধি চলে গিয়েছে। নববিবাহিত দম্পতি চলেছে আগে। তাদের পেছনে চলেছে আত্মীয়-স্বজন; তাদের পেছনে নিমন্ত্রিতের দল; শেষে চলেছে গরীব লোকেরা। সেই সরু রাস্তার চারপাশে মাছির মত যে সব গ্রাম্য ছোকরারা ছড়িয়ে ছিল তারাই কেবল ছোটাছুটি করছিল; শোভাযাত্রাটিকে ভালভাবে দেখার জন্যে তারা শেষ পর্যন্ত গাছের ডালে চ'ড়ে বসল।

বরের নাম জাঁ পাতু; যুবক, সুদর্শন, আশপাশে বর্দ্ধিষ্ণু চাষী ব'লে পরিচিত। সবার ওপরে বেশ ভাল খেলোয়াড়। এই খেলার জন্যে সে পাগল; এই খেলার নেশা চরিতার্থ করার জন্যে সে কুকুর, মালি, আর বন্দুকের ওপরে অজস্র খরচ করত। কনের নাম রোজালি রোসেল। সম্ভাব্য সমস্ত যুবকই তার পাণিপ্রার্থী ছিল। তার কারণ ছিল দুটি: প্রথমতঃ তার হৃদয়গ্রাহী চেহারা; দ্বিতীয়তঃ তার নিজস্ব কিছু সম্পদ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পাতুকেই বেছে নিল। তারও পেছনে কারণ ছিল ওই দুটো; প্রথমতঃ, সে পাতুকেই সকলের চেয়ে বেশী পছন্দ করত; দ্বিতীয়তঃ আর এইটাই ছিল আগের চেয়ে বড় কারণ, বেশ বিচক্ষণ নরম্যান মেয়েদের মতই

সে বুঝতে পেরেছিল পাতুর অবস্থা তার অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছল।

যখন তারা ফার্মের সাদা তোরণের মধ্যে ঢুকে এল ঠিক এমনি সময়ে চল্লিশবার বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ হ্ল। কে বা কারা বন্দুক ছুঁড়লো তা কেউ দেখতে পেল না। বন্দুকধারীরা খাদের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। এই শব্দে পুরুষরা খুশি হ্ল খুব। তারা তাদের বেশ ভাল-ভাল পোশাক পরে এসেছিল। স্ত্রীকে পেছনে ফেলে পাতু দৌড়ে গেল। তার চাকর একটা গাছের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। তার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে সে একবার ছুঁড়ল; তারপরে ঘোড়ার মত মাটিতে পা ঠুকতে লাগল। আপেল ফলে একেবারে নুয়ে পড়েছিল গাছগুলো। তাদের নীচে দিয়ে লম্বা-লম্বা ঘাস মাড়িয়ে শোভাযাত্রাটি আবার এগোতে লাগল। বাছুররা তাদের বড়-বড় চোখ তুলে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভোজনাগারের কাছাকাছি আসামাত্র পুরুষেরা সবাই গম্ভীর হ'য়ে উঠল। তাদের মধ্যে যারা ধনী তাদের লম্বা চকচকে সিল্কের টুপি; অবশ্য ঠিক ওই জায়গায় টুপিগুলি খুবই বেখাপ্পা দেখাচ্ছিল। আর সবাই পুরনো চাদর দিয়ে তাদের মাথা ঢেকে রেখেছে। তার ওপরে চাপিয়েছে টুপি। সব মহিলাদের গায়েই আলগা ক'রে জড়ানো শাল। তাদের সেই রঙচঙে শাল দেখে গোবরের গাদার ওপর থেকে কালো-কালো মুরগীগুলো অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। পুকুরের ধারে হাঁস আর খড়ো-চালের ওপরে পায়রাগুলোও আশ্চর্য হয়নি। বিরাট ফার্মের ঘরগুলি নানারকম সুখাদ্যের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। শোভাযাত্রীরা ধীরে-ধীরে উঠোনের ওপরে এসে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। পরিখার ধারে গ্রামের ছেলেরা আর দরিদ্ররা সারি দিয়ে দাঁড়াল। বন্দুক ছোঁড়া বন্ধ হয়নি। বরং শোভাযাত্রীরা ভেতরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আবার চারপাশ থেকে বন্দুকের গর্জন উঠল, ধোঁয়া আর ধূলোতে ভরে উঠল চারপাশ।

বিরাট ডাইনিং হলে টেবিলের ওপরে খাবার সাজানো হয়েছে। এতবড় ঘর যে একসঙ্গে প্রায় একশ' লোক খেতে পারবে। বেলা দুটোর সময় তারা খাওয়া শুরু করল। রাত্রি যখন আটটা তখনও তারা একনাগাড়ে খেয়ে চলেছে। জামার হাতা তুলে, ওয়েস্ট কোটের বোতাম খুলে, মুখ লাল ক'রে পুরুষেরা গোগ্রাসে গিলছে; মনে হচ্ছে তাদের ক্ষুধা মেটানো একটা অসম্ভব ব্যাপার। পরিচ্ছন্ন এবং লাল গ্লাসগুলিতে সিডারের মদ ঝলসে উঠছে; এবং প্রতিটি ডিশ উদরস্থ করার পরে তারা একগ্লাস ক'রে ব্র্যানডি গলায় ঢালছে। ফলে, উত্তেজনার ঢল নামছে তাদের দেহে; মাথার ভেতরে মূর্খ চিন্তাগুলি সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে। মাঝে-মাঝে এক-একজন অতিথি পিপের মত পেট ফুলিয়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্যে এক-একবার কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছে; তারপরে ফিরে আসছে দ্বিগুণ ক্ষিদে নিয়ে। তাদের স্ত্রীরা কিন্তু স্বামীদের অনুকরণ করছে না। তাদেরও মুখগুলি সব লাল হয়ে উঠেছে; অন্তর্বাসগুলি ফেটে যাওয়ার উপক্রম করেছে। তারপরে হঠাৎ একজনের ভীষণ অস্বস্তি লাগতে সে উঠে একটু বাইরে গেল। তাকে দেখে সব মহিলারাই পিছু-পিছু বাইরে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল তারা ; নতুন মস্করায় গা ভাসিয়ে দিল। বিয়ের রাত্রিটা বর-কনে কীভাবে মধুনিশি যাপন করবে তাই নিয়ে সবাই টেবিলের ধারে বসেই নানারকম ঠাট্টা ইয়ার্কি জুড়ে দিল। তারপর একসময় সেগুলিও সব নিঃশেষ হ'য়ে গেল। গত একশ' বছর ধরে বিয়ের ভোজে এই একই ধরনের রসিকতা চলে আসছে ; তবু প্রতিটি বিয়েতেই অতিথিরা সেই একই রকমের ঠাট্টা-ইয়ার্কি ক'রে চলেছে ; সবাই তাই শুনে আগের মতই গড়িয়ে পড়ছে হেসে।

টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে প্রতিবেশী যুবকরা নবদম্পতিকে নিয়ে কিছু বাস্তব রসিকতা করার পরিকল্পনা আঁটছিল। পরিকল্পনাটা ঠিক কি ধরনের হবে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস ক'রে আলোচনা করছিল আর হাসছিল। হঠাৎ একজন বলে উঠল—এই চাঁদনী রাতে পোকাদেরই পোয়াবারো, তাই না জাঁ? এই কথা শুনে জাঁ, অর্থাৎ বরটি, ঝটিতি তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল—একবার ব্যাটারা আসুক না, তারপরে বোঝা যাবে। অপর যুবকটি হেসে বলল—কিন্তু তাই ব'লে তাদের জন্যে আজকের রাত্রিতে তোমার কর্তব্যে নিশ্চয় তুমি অবহেলা করবে না।

এই কথা শুনে সবাই এমন হো-হো ক'রে হেসে উঠল যে টেবিল কাঁপতে লাগল...ঝনঝন ক'রে উঠল টেবিলের ওপরে রাখা গ্লাসগুলি। কিন্তু ভীষণ চটে উঠল জাঁ। সুযোগ পেয়ে চোরের দল রাত্রিতে তার খেত-খামারে চুরি ক'রে পালাবে এটা সে সহ্যই করতে পারল না। সেও চেঁচিয়ে বলল—ব্যাটারা আসুক না একবার। মজাটা বুঝিয়ে দেব।

অতিথিরা সব বিদায় নিয়ে গেলে নবদম্পতি তাঁদেব ঘরে ঢুকে গেল। এবারে রাত্রির মত বিশ্রাম। বেশ গরম থাকায় জানালাটা খুলে খড়খড়িগুলি এঁটে দিল জাঁ। ড্রয়ারের ওপরে ছোট একটা বাতি জ্বলছিল। কনের বাবা এটি তাদের উপহার দিয়েছিলেন। শয্যা প্রস্তুতই ছিল। এই বিছানার প্রথম শোওয়ার জন্যে সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা যে একটু দ্বিধা করে এদের সেরকম কোন দ্বিধা ছিল না।

যুবতীটি ইতিমধ্যেই তার গলার মালা খুলে ফেলেছে ; খুলে ফেলেছে তার পোশাক ; কেবলমাত্র সায়াটি পরে সে তখন তার জুতোর ফিতে খুলছে আর জাঁ তার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে তির্যকভাবে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। এই দৃষ্টির মধ্যে প্রেমের চেয়ে কামনার উদ্দীপনাই ছিল বেশী। তারপরে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই রকম একটা মেজাজ দেখিয়ে জাঁ তার কোটটা খুলে ফেলে এগিয়ে আসতেই যুবতীটি বলল—যাও ; মশারির মধ্যে লুকিয়ে পড়। আমি আসছি।

মনে হল লুকোতে সে রাজি নয় ; তারপরে একটু ধূর্তের মত চোখের কোণ দিয়ে হেসে সে বিছানার মধ্যে ঢুকে একমাত্র মাথাটা ছাড়া সমস্ত দেহটাই ঢাকা দিয়ে দিল। যুবতীটি হেসে তাঁর চোখ দুটো চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল ; তারপরে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা অস্বস্তি বোধ না করে তারা দু'জনেই বিছানার ওপর ধস্তাধস্তি করতে লাগল। তারপরে ধস্তাধস্তিটা যখন চরমে উঠেছে, এবং জাঁ যখন মেয়েটিকে চুমু খাওয়ার জন্যে মরীয়া হ'য়ে উঠেছে এমন সময় হঠাৎ দূরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'ল।

সন্দেহাকুল হ'য়ে জাঁ বিছানা থেকে উঠে পড়ল; তারপরে সে জানালার কাছে দৌড়ে গিয়ে দুরু-দুরু বুকে শার্সিগুলি খুলে দিল। পরিপূর্ণ চাঁদের আলো এসে পড়েছে উঠোনের ওপরে; আপেলের গাছগুলি কালো-কালো ছায়ার সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে; দূরে মাঠের বুকে পাকা ফসল নেচে-নেচে উঠছে। ব্যাপারটা কী, শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে বোঝার জন্যে ঝুঁকে পড়েছে এমন সময় তার স্ত্রী দুটি নগ্ন হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল—ওসব এখন থাক; তোমার সঙ্গে ও-শব্দের কোন সম্বন্ধ নেই। শোবে এস।

জাঁ ফিরে দাঁড়াল; জড়িয়ে ধরল তার বৌকে; সেই নগ্ন দেহটাকে বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরে তার দেহের উষ্ণতা উপভোগ করল; তারপরে দু'হাতে তাকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই বন্দুকের আওয়াজ! দু'জনেই কান পেতে শুনল। এবার আওয়াজটা যেন খুব কাছেই হ'ল। রাগে ফেটে পড়ল জাঁ। চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল—হায় ভগবান, তুমি কি মনে কর তোমার কাছে থাকার জন্যে ব্যাপারটা কী তা আমি দেখব না? একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনই আসছি।

এই বলেই সে জুতো জোড়াটা পরল; দেওয়ালের গায়ে সব সময়েই তার একটা বন্দুক ঝোলানো থাকতো; সেই বন্দুকটা সে টেনে নিল এবং স্ত্রীর কোন বাধাই গ্রাহ্য না ক'রে জানালা টপকে সে উঠোনের ওপরে লাফিয়ে পড়ল।

রোসেল অপেক্ষা করতে লাগল—এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা। শেষ পর্যন্ত সকাল হয়ে গেল; তবু তার স্বামী ফিরল না। ফিরল না দেখে তার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল; সে চিৎকার ক'রে সবাইকে জাগাল; গত রাত্রিতে জাঁ ক্ষেপে গিয়ে যে পোকাদের পেছনে ধাওয়া করেছে সে-কথাও সবাইকে জানাল। এই সংবাদ শুনেই চাকরবাকররা ছুটলো তাদের মনিবের খোঁজে। ফার্ম থেকে দু' লীগ দূরে তারা মনিবকে খুঁজে পেল। তার হাত-পা বাঁধা; বেচারা রাগের দাপটে অর্দ্ধমৃত প্রায়; তার বন্দুকটা ভেঙে গিয়েছে; ট্রাউজার ওল্টানো; তিনটে মরা শশক তার গলায় ঝোলানো রয়েছে। সেই সঙ্গে বুকের ওপরে একটা প্ল্যাকার্ড লাগানো; তাতে লেখা রয়েছে—যে অপরের পেছনে তাড়া ক'রে সে তার নিজের জায়গা হারায়।

এবং পরে সে যখন তার বিয়ের রাত্রির ঘটনা বলত সে সাধারণত এই কথাটা যোগ করে দিত—ঠাট্টা হিসাবে এটা ভালই। হতচ্ছাড়াগুলো খরগোসের মত আমাকে ধরার জন্যে জাল পেতেছিল। তারা একটা ব্যাগের মধ্যে আমার মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। একবার যদি ব্যাটাদের ধরতে পারতাম তাহলে একবার মজাটা দেখিয়ে দিতাম।

বিয়ের রাতে নরম্যানডিতে লোকেরা এইরকম মজা করত।

আর্টিস্ট

The artist

বৃদ্ধ বাজিকর আমাকে বলল—ব্যাপারটা আর কিছু নয় মঁসিয়ে, অনুশীলন আর অভ্যাস! অবশ্য কিছুটা প্রতিভা চাই। আঙুল নরম হ'লে চলবে না; তবে তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে অভ্যাস, আর অনেক বছর ধ'রে প্রত্যহ অনুশীলন।

তার এই বিনয়নম্র বচন আমাকে অবাক ক'রে দিল; কারণ, যে সমস্ত দাম্ভিক বাজিকরদের খেলা আমি দেখেছি এই বাজিকরটি তাদের সকলের চেয়ে দক্ষ এবং চতুর। তার খেলা আমি প্রায়ই দেখেছি; আমার মতো সবাই দেখেছে—সার্কাস বা অন্যান্য খেলায় সে খেলে। তার খেলাটা হচ্ছে একটা কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে একটি পুরুষ অথবা মেয়েছেলে দু'হাত প্রসারিত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সে দূর থেকে সেই মানুষটির আঙুলের ফাঁকের মধ্যে অথবা তার মাথার পাশে ছুরি ছুঁড়ে বিঁধে দেয়। যদিও ছুরিগুলি বেশ ধারালো, আর দেহ থেকে কিছুটা দূরে কাঠের ওপরে সেগুলি আটকে যায় তবুও কৌশল জানলে কোন খেলোয়াড়ের কাছেই এটা এমন একটা কিছু অসামান্য দক্ষতার ব্যাপার নয়। শুধু ছুঁড়ে দেওয়ার দ্রুততা, আর যে অদ্ধ-বৃত্তাকারে ছুরিটা জীবন্ত মানুষের দিকে দৌড়ে যায়—এই দুটি জিনিসই যে-কোন প্রদর্শনীতে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। তবুও সার্কাসে এটা অতি সাধারণ পর্যায়ের খেলা।

কিন্তু এই খেলার মধ্যে কোনরকম কৌশল নেই, নেই কোন প্রতারণা, দর্শকের চোখে ধূলো দেওয়ারও প্রচেষ্টা নেই কোন। এসব কেবল খেলার জন্যে খেলা; এর মধ্যে ফাঁকি দেওয়ার কোন বাসনা নেই। এই বৃদ্ধ বাজিকরটি খুরের মত ধারালো ছুরিটাকে একেবারে দেহের গা ঘেঁষে কাঠের ওপরে বিঁধে দেয়, ঠিক দুটো আঙুলের ফাঁকে। এইভাবে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মানুষটির মাথার চারপাশে ছুরির পর ছুরি দিয়ে বৃত্ত সাজায়, গলার পাশে ছুরিগুলি গলবন্ধনীর মত এঁটে বসে। তখন করোটিড আর্টারী না কেটে কেউ তাকে বার ক'রে আনতে সক্ষম হবে না; আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাজিকরটি এই দুঃসাধ্য কাজ করে নিজের চোখ দুটো পুরু 'অয়েল ক্লথে' ঢেকে।

স্বাভাবিকভাবেই অন্য সব বড় কলাবিদদের মতই তাকেও কেউ স্বীকৃতি দেয়নি। সবাই বিশ্বাস করত ওটা নিছক কৌশল; ওই মুখোশটা ছিল তাদের কাছে আরও একটা ধাপ্পা...যে ধাপ্পাটা অতি সাধারণ।

তারা বলাবলি করত...লোকটা আমাদের বোকা মনে করে, তাই না? না দেখে লোকটা কী ক'রে লক্ষ্যবস্তুর দিকে অনায়াসে ছুরি ছোঁড়ে?—তারা ভাবত ওই অয়েল ক্লথের ভেতরে খুব ছোট-ছোট ফুটো রয়েছে। খেলা শুরু হওয়ার আগে দর্শকদের

অয়েল-ক্লথটা পরীক্ষা করতে দিয়েও কোন কাজ হোত না। কোন ফুটোই তাদের চোখে পড়ত না; আর পড়ত না ব'লেই তারা বিশ্বাস করত বাজিকর তাদের নিশ্চয় ঠকাচ্ছে। এই সব খেলায় দর্শকদের যে প্রতারিত হওয়া উচিৎ তা কি তারা জানত না?

সেই বৃদ্ধ বাজিকরটির মধ্যে যে কলাবিদটি লুকিয়েছিল আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। তার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র প্রতারণা ছিল না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। সেকথা তাকে আমি খুলেও বলেছিলাম। তার প্রতি আমি যে সুবিচার করছি এটা বুঝতে পেরে সে অভিভূত হয়েছিল। ফলে আমাদের দু'জনের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব জন্মেছিল। জন্মেছিল ব'লেই তার দক্ষতার আসল উৎস কোথায় সে কথাটা সে আমাকে বলেছিল। তার পক্ষে যেকোন কৌশল করা একেবারে অসম্ভব—আমার এই অভিমত শুনে সে আমাকে বলল—নিশ্চয়; এতটা অসম্ভব যে আপনি কল্পনাও করতে পারেন না; কিন্তু কাদের একথা আমি বোঝাবো—কে বুঝবে?

তার মুখ কালো হয়ে গেল; চোখে ভরে এল জল। আর তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আমি সাহস পেলাম না। আমার চোখ-মুখের চেহারা দেখে সে নিজেই বলল—অবশ্য সে কথাটা আপনাকেই বা আমি বলব না কেন? আপনি আমাকে বুঝবেন। তারপরে স্বরটাকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর বিকৃত ক'রে সে বলল—আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক—সে অন্তত বোঝে।

কে?

আমার হতচ্ছাড়া বৌ। হায় মঁসিয়ে, মেয়েটা যে কী ধরনের জঘন্য তা যদি আপনি জানতেন? হ্যাঁ; সে জানত। খুব ভালই জানত আমার কৌশলটা কোথায়! সেই জন্যেই আমি তাকে ঘেন্না করি। আমাকে প্রতারণা করার জন্যে যতটা, তার চেয়ে বেশী এই জন্যে। প্রতারণা করাটা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম; এবং ক্ষমার্হ। কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধটি সাংঘাতিক।

যে মেয়েটি হাত প্রসারিত ক'রে একটা কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, যার মাথার চারপাশে বাজিকর খুরের মত ধারালো অজস্র ছুরি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে বিঁধতো—সেই মেয়েটিই তার স্ত্রী। বয়স তার সম্ভবতঃ চারের কোঠায়; দেখতে ভালই মনে হয়; কিন্তু সেই সৌন্দর্য মানুষের মনে বিতৃষ্ণা জাগায়। তার মুখের আদল ঔদ্ধত্যে মাখা—মুখটা স্থূল জৈব-কামনায় উদ্দাম—এককথায় কুৎসিত। আমি অনেকদিন লক্ষ্য করেছি বাজিকর যখন তার মাথার চারপাশে ছুরির বৃত্ত এঁকে দিত তখন মেয়েটি হাসত; হাসিটা মৃদু; কিন্তু শুনলে মনে হবে এ হাসির পেছনে একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে; অনেকটা ব্যঙ্গের হাসির মত। এই হাসিটিকে আমি সব সময় পরিবেশের উপযুক্ত হাসি ব'লে ধরে নিয়েছিলাম, সেই জন্যে বাজিকর যখন হাসির উদ্দেশ্য আমাকে বুঝিয়ে বলল তখন আমি যথেষ্ট অবাকই হ'য়ে গেলাম—হাসিটা তার শুনলেন? সে আমাকে ঠাট্টা করছে—আমাকে অগ্রাহ্য করে হাসছে। কারণ, সে জানে তার কোন ক্ষতি হবে না। তার আমি যাই করতে চাই না কেন, যত ক্ষতিই তার করা উচিৎ হোক

না কেন—সে জানে শেষ পর্যন্ত তার কোন কিছু করাই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কী তুমি করতে চাও?

যা বাবা! কিছুই আপনি বুঝতে পারছেন না? আমি তাকে খুন করতে চাই।

তাকে খুন করতে চাও—কারণ সে তোমার...?

কারণ সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে? না, না। মোটেই তা নয়। আমি আবার বলছি মোটেই তা নয়। সেজন্যে তাকে আমি অনেকদিন আগেই ক্ষমা করেছি। তাছাড়া, ওটা আমার অভ্যাসও হ'য়ে গিয়েছে। তাকে প্রথম ক্ষমা করার সময় একটা কথা তাকে বলে আমি অন্যায়ই করেছি। আমি তাকে বলেছি একদিন তাকে আমি খুন করব; এমনভাবে করব যে কেউ বুঝতে পারবে না যে আমি তাকে খুন করেছি—সবাই ভাববে নেহাৎই ওটা একটা দুর্ঘটনা।

তাই বুঝি?

অবশ্যই। সেইরকমই বাসনা ছিল আমার। তাকে যে খুন করার অধিকার আমার আছে সেকথা আপনিও স্বীকার করবেন। আর কাজটা কত সহজ, কত লোভনীয়। ভেবে দেখুন; একটু ইতরবিশেষ হলেই ব্যাস্! আধ ইঞ্চি এদিক-ওদিক—ছুরিটা গলা ফুটো ক'রে কণ্ঠনালীটা এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দেবে। তারপরেই সব সাফ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে চারপাশে—তারপরেই সব শেষ। সে মারা যাবে; আমারও চরিতার্থ হবে প্রতিহিংসা।

নিশ্চয়, নিশ্চয়; খুব সত্যি কথা; ভয়ঙ্কর রকমের সত্যি কথা।

আর তার জন্যে আমাকে কোনরকম ঝুঁকি নিতে হবে না। একটা দুর্ঘটনা। দুর্ভাগ্য। আমাদের পেশায় এরকম দুর্ঘটনা দু' চারটে এমন হয়ই। আমাকে তারা দায়ী করবে কী ক'রে? আর করবেই বা কেন? ভুল ক'রে নরহত্যা ছাড়া অন্য কোন অভিযোগই আমার বিরুদ্ধে টিকবে না। আমাকে বরং তারা করুণা দেখাবে। 'আমার বৌ, আমার বৌ' ব'লে আমি চিৎকার করব; বলব, ও আমার এত উপকারী বন্ধু ছিল। রুজি রোজগারের অর্দ্ধেকটাই নির্ভর করত ওর ওপরে। আমার খেলার সাথী। কী বলেন?

নিশ্চয়ই। এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তাছাড়া এই রকম প্রতিহিংসা যে সুন্দর প্রতিহিংসা সেকথাও আপনি স্বীকার করবেন। আর এমন একটা প্রতিহিংসা যা আমি নিরাপদ হয়েই চরিতার্থ করতে পারি।

আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

হচ্ছে তো! অথচ আমার এই মনের বাসনাটা যখন আমার বৌকে বেশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম তখন সে কী বলল জানেন?

বলল, তুমি একটি সৎ বালক; এমন ভয়ানক কাজ মোটেই তুমি করবে না...

থামুন থামুন। আপনি যা ভাবছেন আমি মোটেই তা নই; যদিও বিস্তারিতভাবে আপনাকে ব'লে কোন লাভ নেই, তবু জেনে রাখুন রক্ত দেখে ভয় পাওয়ার বান্দা আমি নই; তার কাছেও প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজনীয়তা আমার ছিল না কারণ সে

ভালই জানত আমাকে। বিশেষ ক'রে একটি বিষয়ে আমার দক্ষতা যে অসাধারণ সেটা জানতে তার বাকি ছিল না।

এবং সে ভয় পায়নি?

উঁহু। সে কেবল বলল আমি যা করব বলে শাসাচ্ছি তা আমি করতে পারব না। বিবেচনা করুন কথাটা। আমি করতে পারব না।

কেন পারবে না?

বুঝতে পারছেন না? কেন পারছেন না? আমি কি আপনাকে বলিনি কী দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য কঠোর অনুশীলন করে চোখ বুজিয়ে ছুরিগুলিকে আমি লক্ষ্যস্থলে বেঁধার অভ্যাস আয়ত্ব করেছি?

বলেছিলে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

কী হয়েছে? আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে কঠোর সাধনার ফলে চোখ বেঁধে ছুরি ছোঁড়ার কৌশলটা আমি আয়ত্ব করেছি সেই সাধনাই যে ভুল করার ইচ্ছে সত্ত্বেও আমাকে ভুল করতে দেবে না সে-কথাটা সে ভালই বুঝেছিল।

এও কি সম্ভব?

আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এর চেয়ে বেশী সত্য আর কিছু নেই। ওই দুর্বিনীতা অবাধ্য মেয়েমানুষটার গলা কাটার জন্যে একটু ভুল করার জন্যে অনেক চেষ্টা আমি করেছি; কিন্তু পারিনি। ফলে, এই বেশ্যাটা সব সময় আমাকে উপহাস ক'রে হেসেছে।

কথা বলতে-বলতে তার চোখ দুটো জলে ভরে এল। সে রাগে গর্‌গর্‌ করতে-করতে দাঁতে-দাঁত চিপে বলল—আপনি আমাকে যতটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি নিজে আমাকে যতটা জানি, ওই মেয়েটা তার চেয়েও অনেক বেশী আমাকে চেনে। ও জানে আমি আর মানুষ নই, নিখুঁত একটা যন্ত্র। এ যন্ত্র কোনদিন বিগড়ে যাবে না। সে জানে ভুল করতে আমি পারব না, পারব না।

কনসারভেটরী

The conservatory

মঁসিয়ে লারবোর আর মাদামের বয়সের মধ্যে বিশেষ একটা হেরফের ছিল না, দু'জনের মধ্যে মঁসিয়ের চেহারাটা একটু কৃশই ছিল; বাইরে থেকে তাঁকে কিঞ্চিৎ ছোটই দেখাত। ছাপানো তুলো বিক্রী ক'রে বেশ বড়লোক হয়েছিলেন মঁসিয়ে; মাঁতিসের গ্রাম্য অঞ্চলে বেশ সুন্দর একটি বাড়ি তৈরি ক'রে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে সেখানে বসবাস করতেন। বাড়িটির চারপাশ ঘিরে ছিল একটি সুন্দর বাগান; উঠোনে একটি মুরগীর খোঁয়াড়, একটি চাইনীজ প্যাভিলিয়ন; আর বাগানের শেষ প্রান্তে ছিল গাছ-পালা প্রতিপালন করার জন্যে একটি সবুজ ঘর—যাকে সাধারণত কনসারভেটরী বলা হয়।

ছোটখাট, বেঁটে মানুষ মঁসিয়ে—খুবই স্ফূর্তিবাজ, নিজের সম্বন্ধে বেশ উৎসাহী। ঠিক বিপরীত ছিলেন মাদাম—রোগা, একগুঁয়ে, খিটখিটে মেজাজের। স্বামীর হাসিখুশি ভাবটা মোটেই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। চুলে তিনি কলপ মাখাতেন; পড়তেন সস্তা ধরনের প্রেমের উপন্যাস; তাতেই অনেক সময় বিভোর হ'য়ে থাকতেন। বাইরে থেকে তাঁকে বেশ কল্পনা এবং ভাবপ্রবণা মহিলা বলে মনে হোত; যদিও কোনদিনই ভাব ব'লে কোন বস্তুই তাঁর মধ্যে ছিল না এতটুকু। কিন্তু স্ত্রীর কথা বলতে মঁসিয়ে একেবারে গদ্‌গদ হ'য়ে যেতেন।

বছর কয়েক ধরে ভদ্রমহিলা স্বামীর ওপরে বড়ই দুর্ব্যবহার করে চলেছেন। মনে হচ্ছে তাঁর মনের গভীরে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে তাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলেছে। ফলটা দাঁড়াল দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি। দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেল। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর তিক্ত বাক্যবাণে সুযোগ পেলেই ভদ্রমহিলা স্বামীকে একেবারে জর্জরিত করতে লাগলেন।

ঝড় শুরু হলেই মঁসিয়ে চুপচাপ মাথাটি নীচু ক'রে দাঁড়াতেন; বিরক্ত হ'তেন নিঃসন্দেহে; কিন্তু বাদানুবাদের দিকে যেতেন না; নিজের রসিকতা দিয়ে সবকিছু অত্যাচারকে লঘু করে নিতেন। কিন্তু স্ত্রীর এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণের কারণটা কী সেইটা খুঁজে বার করতে না পেরে তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন; কারণ এই অপ্রকৃতিস্থতার পেছনে সত্যিকার যে একটা কারণ রয়েছে সেবিষয়ে তাঁর কোনরকম সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আসল রোগটা তিনি কিছুতেই খুঁজে পেলেন না।

তিনি প্রায়ই স্ত্রীকে বলতেন—ব্যাপারটা কী বলত? আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা কী? তুমি যেন কিছু লুকোচ্ছ বলে মনে হচ্ছে।

মাদাম সবসময়ে বলতেন—হবে কী! কিছুই হয়নি আমার। তাছাড়া, যদি কিছু হয়েই থাকে তাহলে কী হয়েছে সেটা তোমারই অনুমান করা উচিৎ। যেসব পুরুষ ম্যাদামারা, যারা কিছুই বুঝতে পারে না তাদের আমি পছন্দ করিনা।

তিনি বেশ অস্বস্তির সঙ্গে বলতেন—বুঝতে পারছি তুমি আমাকে কিছুই বলতে চাও না।

এই বলে নারীহৃদয়ের রহস্য সন্ধান করতে-করতে তিনি বেরিয়ে যেতেন।

বিশেষ ক'রে রাত্রির জীবনটাই তাঁর কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠত। কারণ কথাবার্তা বন্ধ হলেও রাত্রিতে বিছানায় শোওয়াটা তাঁদের বন্ধ হয়নি। এই সময়েই মাদাম তাঁর স্বামীকে তিতিবিরক্ত করে মারতেন। এই সময়েই যত চোখা-চোখা স্বর মাদামের হাতে থাকত তাই দিয়ে স্বামীকে তিনি বেপরোয়া বিঁধে যেতেন। মাদামের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল একটি।—সেটি হচ্ছে স্বামী তাঁর দিন-দিন মোটা হচ্ছেন; ফলে বিছানার প্রায় সবটাই তিনি জুড়ে থাকতেন। স্বামীর গায়ের ঘাম তাঁকে ক্লেদাক্ত ক'রে তুলত। এতে কি তাঁর গা ঘিন-ঘিন করে না?

অতি ছোট-ছোট কারণে মাদাম তাঁকে রাত্রিতে ঠেলে তুলে দেবেন। বলবেন—'নীচের ঘরে খবরের কাগজটা ভুলে ফেলে এসেছি; যাও নিয়ে এস।'অথবা

অরেঞ্জ স্কোয়াসের বোতলটা লুকিয়ে রেখে সেটা খুঁজে আনার নির্দেশ। বেচারা খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে ফিরে এলে মাদাম মুখ ঝাঁকানি দিয়ে বলবেন—'বুদ্ধু কোথাকার! কোথায় রয়েছে তা তোমার জানা উচিৎ।' তারপর সেই নিস্তব্ধ ঘুমন্ত বাড়ির প্রতিটি জায়গায় ঘণ্টাখানেক ধরে ঘুরে-ঘুরে শূন্য হাতে মঁসিয়ে ফিরে এলে মাদাম ধন্যবাদের বাণীতে বলবেন—ঠিক আছে। শুয়ে পড়, তুমি দিন-দিন যেরকম মোটা হচ্ছ—এই ঘোরাঘুরিতে দেহের চর্বি তোমার কিছুটা কমবে।

মাদাম প্রায়ই রাত্রে অভিযোগ করবেন—তাঁর ভীষণ পেট কামড়াচ্ছে। সেই রোগের উপশমের জন্যে ফ্যানেল কাপড়ে ও-ডি-কোলন মিশিয়ে স্বামীকে দিয়ে তাঁর তলপেটটি মালিশ করাবেন। তাঁকে একটু সুস্থ করার জন্যে ভদ্রলোক আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে পরিচারিকা সিলেস্তিকে ডাকার আয়োজন করলেই মাদাম দাঁত খিঁচিয়ে বলতেন—মূর্খ কোথাকার! যন্ত্রণাটা কমেছে। এখন তুমি ঘুমোতে পার; অপদার্থ কোথাকার!

মঁসিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—ভাল লাগছে তো?

মাদাম ধমক দিয়ে বলতেন—নিশ্চয়। এখন দয়া করে ঘুমোতে দাও, কানের কাছে বকবক করো না। অপদার্থ কোথাকার! মহিলাদের তলপেটে একটু মালিশ ক'রে দেবে সে-সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত তোমার নেই।

কিন্তু...

থাক, থাক; আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। এখন থাম।

এই ব'লে দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাদাম শুয়ে পড়েন।

একদিন রাত্রিতে মাদাম অকস্মাৎ এমন জোরে তাঁকে ঝাঁকানি দিলেন যে মঁসিয়ে ধড়ফড় ক'রে বিছানার ওপরে উঠে বসলেন। কাঁচা ঘুম তখনও একেবারে ভাঙেনি তাঁর। জড়িয়ে-জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী...কী...ব্যাপার?

তাঁর একটা হাত জাপটে ধরে আর একটা হাত দিয়ে তাঁকে মাদাম এমন জোরে চিমটি কাটতে লাগলেন যে বেচারা মঁসিয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠলেন। মাদাম ফিসফিস ক'রে বললেন—শব্দ হচ্ছে!

মাদামকে তিনি ভালই চিনতেন; তাই তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মঁসিয়ে বেশ মিষ্টি গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—কী রকম শব্দ বলত?

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে মাদাম দাঁত খিঁচোলেন—কী রকম শব্দ! ঘরের মধ্যে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাই নাকি? আরে না, না! কে বলে মনে হচ্ছে তোমার?

ভয়ে হিম হয়ে গেলেন মাদাম—চোর, আবার কে?

মঁসিয়ে নির্বিবাদে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললেন—কেউ না, কেউ না। তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছ।

ভদ্রমহিলা কম্বল ছুঁড়ে ফেলে খাট থেকে লাফিয়ে মেঝেতে নেমে বললেন—শুধু বুদ্ধুই নও—একেবারে কাপুরুষ। তোমার সাহস নেই বলে কেউ আমাকে খুন করে যাবে তা আমি সহ্য করব না।

এই বলে চুল্লীর পাশ থেকে কয়লা-তোলা একটা চিমটি তুলে নিয়ে বন্ধ দরজার সামনে মাদাম শত্রুর আশায় বীরদর্পে এসে দাঁড়ালেন।

স্ত্রীর এইসব আচরণে কিঞ্চিৎ লজ্জা পেয়ে মঁসিয়ে গজ-গজ করতে-করতে কয়লা তোলা কোদাল নিয়ে তাঁর মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন।

স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে এইভাবে কুড়িটি মিনিট কেটে গেল। আর কোন শব্দ শোনা গেল না। তারপরে মাদাম ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে বললেন—নিশ্চয় ঘরে কেউ ঢুকেছিল।

পরের রাত্রিতেও সেই একই ব্যাপার ঘটলো। সেদিন ঝগড়ার ভয়ে ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে স্ত্রীর মুখোমুখী যুদ্ধং দেহী ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার পরের রাত্রিতেই ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করল। মাদাম মাঝরাতে হাঁপাতে-হাঁপাতে তাঁর স্বামীকে জোরে-জোরে ধাক্কা দিয়ে বললেন—এই, এই। কেউ আমাদের পেছনের দরজাটা খুলল। নিশ্চয়, হ্যাঁ।

মাদামের কথা শুনে ভদ্রলোক ভাবলেন নিশ্চয় মাদাম ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন থেকে তাঁকে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই তিনিও হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলেন—একটা মৃদু শব্দ যেন তাঁর কানেও লাগছে মনে হচ্ছে।

মনে হ'তেই তিনি লাফ দিয়ে উঠে জানালার দিকে দৌড়ে গেলেন; উঁকি দিয়ে দেখলেন—একটি সাদা পোশাক পরা মূর্তি যেন তাঁদের পাশের রাস্তা দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন—হ্যাঁ, একটা লোকই বটে।

তারপরেই তিনি সজাগ হ'য়ে উঠলেন। সাহস ফিরে এল তাঁর। রাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগলেন—তিনি বেশ বুঝতে পারলেন বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। তিনি বিড়-বিড় ক'রে বললেন—দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজাটা। এই ব'লে ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বার ক'রে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

মাদাম ভয়ে তাঁর পেছনে কিছুটা গিয়ে চেঁচাতে লাগলেন—গুসতেভ, গুসতেভ, আমাকে একলা ফেলে যেয়ো না।

কে কার কথা শোনে? তিনি তখন তরতর ক'রে নেমে খিড়কীর দরজা খুলছেন।

মাদাম উপরে উঠে এসে অগত্যা ঘরে খিল এঁটে দিলেন।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট। চুপচাপ বসে রইলেন মাদাম। একটা আতংক এসে আক্রমণ করল তাঁকে। তারা নিশ্চয় গুসতেভকে খুন ক'রে ফেলেছে। রিভলবারের আওয়াজ পেলেও তিনি বুঝতে পারতেন যে গুসতেভ দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করছেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সেই পরিপূর্ণ নিঃস্তব্ধতায় মাদামের সমস্ত শরীর ভয়ে জমাট বেঁধে গেল।

সিলেস্তিকে ডাকার জন্যে তিনি বেল টিপলেন। সিলেস্তির কোন সাড়াশব্দ নেই। মেয়েটা বেঁচে রয়েছে কিনা তাও বোঝা গেল না। এবারে তিনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়বেন। সমস্ত বাড়িটাই থমথম করছে যেন। জানালার উপরে কপালটা চেপে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না। সাড়ে বারটা বাজলো।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত হল তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছেন। আর তাঁকে তিনি দেখতে পাবেন না। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে তিনি হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন।

দরজার ওপরে মৃদু দুটি টোকা পড়তেই মাদাম লাফিয়ে উঠলেন। বাইরে থেকে মঁসিয়ের গলা শোনা গেল—দরজা খোল। আমি এসেছি।

মাদাম দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন; তারপরে ছলছল চোখে কোমরে দুটো হাত দিয়ে চিৎকার ক'রে বললেন—জানোয়ার কোথাকার! ভয়ে আমি মরে যাচ্ছি। আমাকে একলা ফেলে কোন্ চুলোয় গিয়েছিলে শুনি?

দরজা বন্ধ ক'রে মঁসিয়ে হাসতে-হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি! তারপরে হাসির উচ্ছ্বাস সামলাতে না পেরে দুটো হাত দিয়ে তিনি পেট টিপে ধরলেন।

মাদাম অবাক; একেবারে নির্বাক হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

মঁসিয়ের মুখ থেকে পুরো কথা বেরোল না; তিনি আমতা-আমতা ক'রে বললেন—কনসারভেটরীতে সিলেস্তি...সঙ্গে একটা ছোকরা। আমি কী দেখলাম তা যদি তুমি জানতে...

ঘৃণায় বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন মাদাম।

কী বললে! সিলেস্তি... ? আমার বাড়িতে...? আমার...আমার কনসারভেটরীতে? আর ছোকরাটাকে খুন না করে তুমি ফিরে এলে? তোমার হাতে রিভলবার ছিল না?

ভাবাবেগে মুহ্যমানা হ'য়ে মাদাম বসে পড়লেন।

সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মঁসিয়ে ঘুরে-ঘুরে নাচতে শুরু করলেন, জিব দিয়ে ক্লিক-ক্লিক শব্দ ক'রে হাসতে-হাসতে বললেন—তুমি যদি জানতে...তুমি যদি জানতে...

হঠাৎ মঁসিয়ে মাদামকে চুমু খেয়ে ফেললেন।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রাগে কাঁই হ'য়ে মাদাম বললেন—এতবড় আস্পর্দা! আমার বাড়িতে। কালই তাকে দূর করে দেব।

মাদামের কোমর জড়িয়ে সেই আগেকার দিনগুলির মত মঁসিয়ে অজস্র শব্দ ক'রে মাদামকে চুমু খেতে লাগলেন। মঁসিয়ের কাণ্ড দেখে চুপ ক'রে গেলেন মাদাম। মুখ থেকে বাক্যস্ফূর্তি হল না তাঁর, মাদামকে জড়িয়ে ধরে বিছানার দিকে এগোতে লাগলেন মঁসিয়ে।

পরের দিন সকাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত মনিবদের কোন সাড়া না পেয়ে সিলেস্তি আস্তে-আস্তে দরজায় টোকা দিল।

পাশাপাশি শুয়ে মাদাম আর মঁসিয়ে বেশ খুশ মেজাজেই গল্প করছিলেন। অবাক হ'য়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে সিলেস্তি বলল—কফি খাওয়ার সময় হয়েছে মাদাম।

মাদাম মিষ্টি সুরে বললেন—এখানেই নিয়ে এস। কাল রাত্রিতে আমাদের মোটেই ঘুম হয়নি।

সিলেস্তি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মঁসিয়ে মাদামকে কাতুকুতু দিতে-দিতে আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন—তুমি যদি কেবল জানতে, কেবল জানতে...

মাদাম আলতোভাবে মঁসিয়ের চোখে চুমু খেয়ে বললেন—চুপ ক'রে শোও। অত হাসলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

আজকাল মাদামকে আর খিটখিট করতে শোনা যায় না।

সিলেস্তির মাইনে তাঁরা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মঁসিয়ের মেদও কিছুটা কমেছে।

একটি বৃদ্ধ

An old man

সমস্ত খবরের কাগজে নিম্নলিখিত একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হল :

বন্দোলীর নতুন অঞ্চলটি অনেক দিন থাকা অথবা স্থায়ীভাবে বাস করার উপযুক্ত হয়েছে। এর জলের গুণ উৎকৃষ্ট; রক্ত পরিশ্রুত করার মত এত ভাল জল পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তাছাড়া পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে এখানে যাঁরা স্থায়ীভাবে বাস করেন তাঁরা সাধারণত দীর্ঘজীবি হন। এই আশ্চর্য ঘটনার একমাত্র কারণ বোধ হয় পার্বত্য অঞ্চলের ফার গাছের অরণ্যের মধ্যে এই ছোট শহরটির অবস্থান। ঘটনাটি সত্য যে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে স্থানটি দীর্ঘ জীবনের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এরপর সাধারণ মানুষে ছুটতে শুরু করল সেইদিকে।

একদিন সকালে নবাগত মঁসিয়ে দাঁরোর বাড়িতে ডাক্তারের ডাক পড়ল। দিনকয়েক হল ভদ্রলোক এই অঞ্চলে এসে বনের কিনারে একটি সুন্দর বাড়ি ভাড়া করেছেন। বেঁটেখাট মানুষটি; বয়স অষ্টআশী। বেশ স্ফূর্তিবাজ, স্বাস্থ্যবান, এবং কর্মঠ। বয়সটা লুকিয়ে রাখার জন্যে ভদ্রলোক কী মেহনতই না করেন।

ডাক্তারকে বসতে দিয়ে তিনি তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

ডাক্তার, আমার স্বাস্থ্য ভালই। সংযত জীবন যাপন করার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। যদিও আমি এখনও বৃদ্ধের পর্যায়ে পড়িনি; তবু বয়স আমার কম হয় নি। তথাপি রোগমুক্ত বলতে আপনারা যা বোঝেন আমি সেই রকমই। লোকে বলে স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানকার জলবায়ু উত্তম। আমিও তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। কিন্তু এখানে স্থায়ীভাবে বাস করার আগে জায়গাটা যে সত্যিই স্বাস্থ্যকর তার কিছু প্রমাণ আমার চাই। আমি সেই জন্যে চাই সপ্তাহে একবার ক'রে আপনি এখানে এসে আমাকে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি দিয়ে যাবেন।

আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই শহর এবং আশপাশে আশীর ওপরে কত জন লোক বাস করেন। সেই সমস্ত মানুষদের কিছু শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাও আমার জানা দরকার। তাঁদের পেশা কী, নেশা কী, তাঁদের জীবনযাত্রার ধরণ এবং অভ্যাসের সম্বন্ধেও কিছু জানতে চাই আমি। তাঁদের মধ্যে কেউ মারা গেলেই ঠিক কেন মারা গেলেন সে-বিষয়েও আশা করি আপনি আমার কাছে পূর্ণ বিবরণ দাখিল করবেন।

তারপরে তিনি বেশ মিষ্টি করেই বললেন—আমি আশা করি ডাক্তার, আমার পরস্পরের বন্ধু হ'তে পারব। এই বলেই তিনি তাঁর কোঁকড়ানো ছোট হাতটি বাড়িয়ে দিলেন।

মঁসিয়ে দাঁরো সমসময়ে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন। বিপজ্জনক মনে করেই জীবনের সবকিছু আমোদ-প্রমোদই তিনি বর্জন করেছিলেন। তিনি মদ খান না—যে মদ জীবনদায়ী—এই কথা শুনে লোকে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলে তিনি বলতেন—'জীবনের দাম আমার কাছে মদের চেয়ে বেশী।' আমার শব্দটির ওপরে তিনি এমন একটা জোর দিতেন যে মনে হোত তাঁর জীবনের যেন বিশেষ একটি অর্থ রয়েছে। তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে অন্য মানুষের জীবনের যে একটা পার্থক্য রয়েছে সেই ইঙ্গিতটা তাঁর কথার মধ্যে এমনভাবে প্রকাশ পেত যে অন্য সবাই তাঁকে অন্য কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেত না

তিনি অন্য সবাইকেই অপদার্থ বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তারা সবাই শূন্য পৃথিবীটাকে ভরিয়ে রাখার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। এই মনুষ্য সমাজকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেছেন: কোন-কোন মানুষদের তিনি অভ্যর্থনা জানাতেন কারণ কোন বিশেষ কারণে হয়ত তারা তাঁর সামনে এসে পড়েছে; আর কিছু মানুষকে তিনি কোন অভ্যর্থনা জানাতেনই না। কিন্তু এই দুই জাতীয় মানুষই তাঁর কাছে সমানভাবে অবান্তর ছিল।

প্রথম দিন ডাক্তার শহরের সতেরটি বাসিন্দার তালিকা নিয়ে এলেন। এঁদের সকলেরই বয়স আশীর ওপরে। এই তালিকাটি পেয়ে দাঁরোর মন নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে সেই বৃদ্ধদের জন্যে তাঁর মনে একটা কীরকম যেন উদ্বেগও জন্মালো। হয়ত এঁরা একজনের পর আর একজন জীবনপথের ধারে ঝরে যাবেন; আর তাই হয়ত তিনি দেখবেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। প্রতিটি বৃহস্পতিবার ডাক্তার তাঁর বাড়িতে ডিনার খেতে আসতেন। সেই সময় ডাক্তারকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ডাক্তার, যোশেফ পেনকোটে আজ কেমন আছেন? গত সপ্তাহে শুনেছিলাম তাঁর শরীরটা ভাল ছিল না। ডাক্তার পেনকোটের স্বাস্থ্যের বুলেটিন দাখিল করলে তিনি স্বাস্থ্য ভাল রাখার কয়েকটি প্রক্রিয়ার কথা তাঁকে বলতেন এই উদ্দেশ্যে যে, যদি সেই প্রক্রিয়াতে পেনকোটের উন্নতি হয় তাহলে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে নিজেও তিনি সেগুলি পালন করতে পারবেন। এই সতেরটি বৃদ্ধের ওপর দিয়েই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন; এবং এদেরই মাধ্যমে তিনি কিছু শিক্ষাও লাভ করেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় ডাক্তার এসে বললেন—রোজালী মারা গিয়েছেন।

মঁসিয়ে দাঁরো চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কিসে মারা গেলেন ?

ঠাণ্ডায়।

বৃদ্ধটি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপরে বললেন—ভদ্রমহিলা বড় মোটা ছিলেন ; ওজনটাও তাঁর বেশ বেড়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া, নিশ্চয় তিনি বেশী খেয়েছিলেন। তাঁর মত বয়স হলে আমার ওজন যাতে না বাড়ে সেদিকে আমি সাবধান হব। [রোজালীর চেয়ে তিনি ছিলেন দু'বছরের বড় ; কিন্তু বাইরে বলে বেড়াতেন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি।]

মাস কয়েক পরে ডাক এল হেনরী ব্রিসোত-এর। সংবাদটা পেয়ে খুব ঘাবড়িয়ে গেলেন দাঁরো। এবার দেহ রাখলেন একজন পুরুষ ; চেহারাটা তাঁর রোগাই ছিল। বয়সের দিক থেকেও তাঁরা তিন মাসের কাছাকাছি ; তাছাড়া, নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তিনি বেশ সচেতন ছিলেন। সংবাদটা পেয়ে দাঁরো কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না ; ডাক্তার কী বলেন তাই শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

তারপরে তিনিই বললেন—তা'হলে, হঠাৎ মারা গেলেন ? কিন্তু গত সপ্তাহেও তো তাঁর শরীরটা ভালই ছিল। আমার ধারণা ডাক্তার, নিশ্চয় সে কোন বোকার মত কাজ করেছিল।

বেশ আমোদ পেলেন ডাক্তার ; বললেন—আমার তা মনে হয় না। তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে শুনলাম স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

কথাটা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না দাঁরো ; ভয়ে তাঁর বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু, কিন্তু মানুষটা শেষ পর্যন্ত মারা গেল কিসে ?

প্লুরিশীতে।

আনন্দে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাততালি দিয়ে উঠলেন—আমি আপনাকে আগেই বলেছি ডাক্তার, নিশ্চয় তিনি একটা কিছু বোকার মত কাজ করেছিলেন। ডিনারের পরে নিশ্চয় তিনি একটু হাওয়া খেতে বাইরে বেরিয়েছিলেন। তারই ফলে ঠাণ্ডা লেগেছে। ওটা কোন রোগ নয়, দুর্ঘটনা। প্লুরিশীতে কারা মারা যায় ? মূর্খেরা !

তারপরে বেশ স্ফূর্তির সঙ্গেই তিনি ডিনার খেলেন ; যাঁরা বেঁচে রয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

এখন রইলেন পনেরজন। তাঁরা সবাই সুস্থ রয়েছেন, তাই না ডাক্তার ? জীবনটাই তো এইরকম। সবচেয়ে দুর্বলরাই প্রথমে মারা যায়। যারা তিরিশের ওপরে বাঁচে, তাদের ষাট পর্যন্ত বাঁচার সম্ভাবনা থাকে। যারা ষাট ছাড়িয়ে যায়, তারা বাঁচে আশী বছর পর্যন্ত। আর যারা আশীর গাঁট পেরোয়, তারা শতায়ু হওয়ার শক্তি রাখে। তারাই বেঁচে থাকার সবচেয়ে যোগ্য মানুষ।

বছরের মধ্যে আরও দু'জন মারা গেলেন ; একজন ডিসেন্ট্রিতে, আর একজন দম বন্ধ হয়ে।

তিনি মন্তব্য করলেন—ডিসেন্ট্রি হয় তাদের যারা খাওয়ার বিষয়ে সতর্ক নয়। চুলোয় যাক ডাক্তার। এই খাওয়ার ব্যাপারে আপনার সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল।

আর যে মানুষটি দম বন্ধ হয়ে মারা গেলেন ? তাঁর মৃত্যুর জন্যে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতাই দায়ী ; তবে সেই বিকলতার কারণটা কী সেটা কেউ লক্ষ্য করেনি।

কিন্তু একটি সন্ধ্যায়, পল তিমোনেত-এর মৃত্যু ঘোষণা করলেন ডাক্তার। সবাই আশা করেছিল ভদ্রলোক শতায়ু হবেন।

কিসে মারা গেলেন ভদ্রলোক ?

তা জানিনা।—মাথা নাড়লেন ডাক্তার।

জানেন না মানে ? ডাক্তারে জানে না এ হতেই পারে না। স্নায়বিক কোন গোলযোগ ?

না ; তা নয়।

লিভার কিংবা কিডনী সংক্রান্ত কিছু ?

উঁহু।

তাঁর পাকস্থলীটা ঠিক কাজ করছিল কিনা তা কি আপনি দেখেছিলেন ? অনেক সময় বদহজমের জন্যে স্ট্রোক হয়।

মঁসিয়ে দাঁরো বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন ; বেশ উত্তেজনার সঙ্গেই বললেন—তিনি নিশ্চয় কোন-না-কোন একটা অসুখে মারা গিয়েছেন। সেটা কী বলে আপনার মনে হয় ?

ডাক্তার তাঁর হাত দুটি প্রসারিত করে বললেন—কিছুই বুঝতে পারছিনা। তিনি মারা গেলেন বলেই মারা গেলেন। এছাড়া অন্য কোন কারণ আমার চোখে পড়ছে না।

ভাবের আতিশয্যে মুহ্যমান হয়ে দাঁরো জিজ্ঞাসা করলেন—বয়স কত হয়েছিল বলুন তো ?

উননব্বই।

সেই ক্ষুদে চেহারার বৃদ্ধটি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলেন ; তারপরে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন—উননব্বই। সুতরাং মৃত্যুটা যে কারণেই হোক, সেটা নিশ্চয় বার্দ্ধক্য নয়।

প্রবঞ্চনা

A ruse

বৃদ্ধ ডাক্তার এবং তাঁর যুবতী রোগিনী আগুনের ধারে বসে গল্প করছিলেন। ভদ্রমহিলার সত্যিকার কোন অসুখ ছিল না। সুন্দরী মহিলাদের মাঝে-মাঝে যে সব স্ত্রীরোগ জন্মায় তিনিও সেরকম একটা রোগে ভুগছিলেন ; কিছুটা স্নায়বিক দুর্বলতা,

একটু রক্তাল্পতা, অথবা সামান্য ক্লান্তি। প্রেমে পড়ে বিয়ে করার পরে প্রথম মাসের শেষে নববিবাহিত দম্পতিরা সাধারণত এই রকম ক্লান্তিতে ভোগে।

সোফার ওপরে শুয়ে ভদ্রমহিলা বলছিলেন—ডাক্তার, যেসব নারীরা স্বামীদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে আমি তাদের বুঝতে পারিনা। সে তার স্বামীকে ভালবাসতে না পারে, বিয়ের সময় যেসব প্রতিজ্ঞা সে করেছিল সেগুলি সে পালন করতে না পারে, কিন্তু তাই বলে সে কেমন ক'রে অন্য পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে? অন্য লোকের চোখেই বা সে ধূলো দেয় কী করে? মিথ্যাচার আর বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে সে ভালই বা বাসে কেমন করে?

ডাক্তার হেসে বললেন—কোন রমণী যখন সরল ও সংকীর্ণ পথ পরিত্যাগ ক'রে বিপথে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তখন ছোটখাট দ্বন্দ্ব বা আচার-ব্যবহার নিয়ে সে আদৌ মাথা ঘামায় না। আমার বিশ্বাস, বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা আর হতাশার আগুনে না পুড়লে কোন নারীই প্রকৃত ভালবাসার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু এই বিবাহিত জীবনটা কী? কোন একটি বিখ্যাত মানুষের মতে বিবাহিত জীবনটা হচ্ছে দিনের বেলায় নারী-পুরুষের মধ্যে সোচ্চার কলহ, আর রাত্রিতে দুর্গন্ধের ছড়াছড়ি। কথাটা সত্যি; বিয়ের আগে কোন মহিলা কাউকে গভীরভাবে ভালবাসতে পারে না। যদি তাকে একটি বাড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে আমি বলতে বাধ্য যে যতক্ষণ না পর্যন্ত স্বামী-নামক পদার্থটি সেই বাড়ির পালিশ-পলেস্তরা চটিয়ে দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই নারী কামযোগ্যা হয় না।

আর ছলা-কলার কথা যদি বলেন তাহলে এই সব ক্ষেত্রে মহিলাদের কোন ছলা-কলারই অভাব হয় না। যে-সব মহিলাদের অত্যন্ত সাদাসিদে ব'লে আমরা মনে করি তারাই বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়কর মিথ্যাবাদিনী; আর সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে নিজেদের তারা এমন সুন্দরভাবে বার ক'রে আনে যে মনে হবে তাদের মত প্রতিভাময়ী রমণী জগতে খুব কমই রয়েছে।

যুবতীটি বিশ্বাস করতে পারলেন না তাঁর কথা; বললেন—না ডাক্তার; আমার বিশ্বাস, বিপজ্জনক পরিস্থিতিটি সম্পূর্ণ আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার আগে পুরুষের কী করা উচিত ছিল সেকথা কেউ বুঝতে পারে না; আর মেয়েদের কথা যদি বলেন তাহলে তারা এইরকম পরিস্থিতিতে অতি সহজেই মাথা হারিয়ে ফেলে।

ডাক্তার বললেন—'আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার আগে—তাই বললেন না? কথাটা সত্যি যে ঘটনাটা শেষ হওয়ার পরেই পুরুষেরা তাদের কাজ করার শক্তি ফিরে পায়; কিন্তু মহিলারা! শুনুন তাহলে আমার আর একটি যুবতী রোগীর কাহিনী আপনাকে বলছি। আমি সব সময়েই তাঁকে নিষ্পাপ কুসুম বলে মনে করতাম।

'ঘটনাটা ঘটেছিল কোন একটি দেহাতি শহরে। একদিন রাত্রিতে আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম। সেই সময় আমার মনে হ'ল শহরের সব ঘন্টাগুলি একসঙ্গে প্রচণ্ডভাবে বাজতে শুরু করেছে। ভেবেছিলাম, আমি স্বপ্ন দেখছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বুঝতে পারলাম আমার ঘরের কলিঙ বেলটাই উন্মত্তের মত বেজে চলেছে।

আমার চাকরের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আমি নিজেই বিছানার সঙ্গে লাগানো বোতাম টিপে কলিঙ বেলটা বন্ধ করে দিলাম। তারপরেই শুরু হ'ল দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। তারপরে জাকর জাঁ হাতে একটা চিরকুট নিয়ে হাজির হ'ল। চিরকুটটা পড়ে বুঝলাম...মাদাম লেলিইভার তাঁর বাড়িতে এখনই একবার যাওয়ার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন।

'একটু চিন্তা ক'রে নিজেকেই নিজে বললাম—'স্নায়বিক বিকার, হিস্টিরিয়া অথবা, ওই জাতীয় কিছু হবে।' এই অনুমান করে আমি জবাব পাঠালাম—আমি অসুস্থ; তিনি বরং আমার সহকর্মী মঁসিয়ে বোনেতের সঙ্গে দেখা করুন।

'চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে আবার আমি শুয়ে পড়লাম। আধ ঘণ্টা পরে আবার বেল বেজে উঠল। জাঁ এসে বলল—নীচে একজন অপেক্ষা করছেন। এমনভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে আগন্তুক পুরুষ কি মহিলা দেখা দায়। তিনি সরাসরি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চান। তিনি বলছেন দুটি মানুষের জীবন মরণ আপনার ওপরে নির্ভর করছে।

'উঠে বসে দর্শনপ্রার্থীকে উপরে ডেকে পাঠালাম।

'কালো পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢেকে অশরীরির মত একটি মূর্তি জাঁর সঙ্গে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। জাঁ বেরিয়ে গেলে, সে পোশাকটা একটু সরাতেই বুঝতে পারলাম আগন্তুকটি হচ্ছেন মাদাম বার্থা লেলিইভার। ওই অঞ্চলে সবচেয়ে সুন্দরী বলে তাঁর নাম রয়েছে। ভদ্রমহিলা বছর তিনেক হ'ল বিয়ে করেছেন। তাঁর স্বামী শহরের বেশ একটি ধনী দোকানদার।

'অসম্ভব রকমের বিবর্ণ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ভয়ে কাঁপছিলেন তিনি। দু'বার তিনি কথা বলার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। অবশেষে কোনরকমে বলে ফেললেন—তাড়াতাড়ি...তাড়াতাড়ি ডাক্তার...কিছুক্ষণ আগে আমার প্রেমিকটি আমার শোওয়ার ঘরে মারা গিয়েছেন।...কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার স্বামী ক্লাব থেকে ফিরে আসবেন। বলতে-বলতে ভাবাবেগে স্বর রুদ্ধ হ'য়ে গেল তাঁর।

'বিছানা থেকে লাফিয়ে নীচে নামলাম আমি। তাড়াতাড়ি পোশাক প'রে জিজ্ঞাসা করলাম—একটু আগে কি আপনিই এসেছিলেন?

'আতংকে স্থবিরের মত হয়ে তিনি বললেন—না। আমার পরিচারিকাকে পাঠিয়েছিলাম। সে সব জানে। আমি...আমি তার কাছেই বসেছিলাম।...চলুন, চলুন।

'মাদামের গাড়িতে চেপেই রওনা হলাম দু'জনে। অন্ধকার গাড়ির ভেতরে হঠাৎ আমার দুটি হাত তাঁর সুন্দর আঙুলগুলি দিয়ে চেপে তিনি হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন...আমার কী হচ্ছে তা যদি আপনি জানতেন, ডাক্তার। আমি এই ছ'টি মাস ধরে তাকে পাগলের মত ভালবেসেছি।

বাড়িতে আর কেউ রয়েছে?

না, রোজ ছাড়া আর কেউ নেই। সে সব জানে।

'সামনের দরজায় হাজির হলাম আমরা। মনে হল চারপাশের সবাই ঘুমোচ্ছে। 'ল্যাচ কী' দিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে-টিপে আমরা উপরে উঠে গেলাম। দেখলাম একটি বাতি হাতে নিয়ে রোজ সিঁড়ির উপরে চুপচাপ বসে রয়েছে। মৃত লোকটির সামনে থাকতে সাহস হয়নি তার।

'শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেলাম আমরা! বিছানা একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। মনে হল, কিছুক্ষণ আগেই ওর উপরে একটা যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। চাদর পড়েছে ঝুলে; ভিজে তোয়ালে মেঝের ওপরে বেসিনের কাছে পড়ে রয়েছে। সম্ভবত সেই তোয়ালে ভিজিয়েই যুবকটির কপালে কিছুক্ষণ আগে প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল।

'মৃতদেহটি মেঝের উপর লম্বালম্বি পড়ে রয়েছে চিৎ হ'য়ে। মৃতদেহটিকে নানাভাবে পরীক্ষা করে আমি দুটি মহিলাকে বললাম—আপনারা ধরুন। আমি একে বিছানায় শুইয়ে দিই।

'মহিলা দুটি এতক্ষণ আমার পাশে পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ বসেছিল। মৃতদেহটিকে তাদের সাহায্যে আলতোভাবে বিছানার উপরে শুইয়ে আমি তার বুকের উপরে কানটা রেখে শুনলাম; তার জিবের সামনে একটা আরশী ধরলাম; তারপরে বললাম—না; মারাই গিয়েছে। আসুন, তাড়াতাড়ি একে পোশাক পরিয়ে দিই।

'মৃতদেহকে পোশাক পরানো কী কষ্টকরই না কাজ! সেই বিরাট 'ডল' পুতুলটির একটি-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জামা পরাতে লাগলাম। আমি তাকে মোজা পরালাম, আনডার প্যাণ্ট পরালাম, ট্রাউজার পরালাম; তারপরে পরালাম ওয়েস্ট কোট। দু'জনেই এইদিকে অনেক সাহায্য করেছিলেন আমাকে। শেষকালে অনেক কষ্টে কোট পরালাম তাকে।

'পোশাক পরানোর ভয়ঙ্কর কাজ শেষ হওয়ার পরে আমি মৃতদেহটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। বললাম—এবার ওর চুলটা আঁচড়িয়ে দিতে হবে।

'চুল আঁচড়ানো হল। ইতিমধ্যে মাদাম পরিচারিকার হাত থেকে চিরুনীটা ছিনিয়ে নিয়ে গভীর স্নেহে মৃতদেহটির চুল আঁচড়াতে লাগলো। মনে হল, তিনি যেন তাকে আদর করছেন। এইভাবেই প্রেমিকটিকে তিনি হয়ত আদর করতেন।

'অকস্মাৎ চুল ছেড়ে দিয়ে তিনি মৃতদেহটির মাথাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যে মুখ তাঁর দিকে চেয়ে আর কোনদিন হাসবে না তার দিকে তাকিয়ে তিনি ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলেন। তারপরে তার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে উন্মাদের মত তাকে চুমু খেতে লাগলেন। তারপরে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—বিদায় প্রিয়তম, বিদায়।

'ঠিক এই সময় বারটা বাজার শব্দ হল। চমকে উঠলাম আমি। হায় ভগবান! এই সময়ই তো ক্লাবগুলি বন্ধ হয়। মাদাম, আসুন; নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই।

'মাদাম দাঁড়িয়ে উঠতেই আমি বললাম—চলুন, একে আমরা নীচে ড্রয়িংরুমে নামিয়ে নিয়ে যাই।

'ড্রয়িংরুমে তুলে এনে আমি তাকে সোফার ওপরে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম।

'এমন সময় সামনের দরজাটা খুলে বন্ধ হয়ে গেল। স্বামীটি এসে পড়েছেন। বারান্দার ওপর দিয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন বেশ বুঝতে পারলাম। কাছাকাছি আসতেই আমি চেঁচিয়ে বললাম—বন্ধু, এদিকে আসুন। এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

'মুখে সিগার নিয়ে মঁসিয়ে লেলিইভার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন; অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী ব্যাপার? এসবের অর্থ কী?

'তাঁর কাছে গিয়ে আমি বললাম—বন্ধু, আমরা সত্যিই বড় বিপদে পড়েছি। আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে এখানে এসে অনেকক্ষণ আমরা গল্প করছিলাম। হঠাৎ ইনি অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। গত দুটি ঘন্টার আপ্রাণ চেষ্টাতেও এর জ্ঞান ফিরে আসেনি। অপরিচিত কাউকে আমি ডাকতে চাইনি, একে নীচে নিয়ে যেতে যদি আপনি আমাকে একটু সাহায্য করেন তাহলে এর নিজের বাড়িতেই এর চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা যাবে।

'মঁসিয়ে অবাক হলেও ব্যাপারটা মোটেই সন্দেহ করতে পারেনি। তিনি টুপিটা খুলে আমাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন। মৃতদেহটিকে চ্যাংদোলা ক'রে আমরা নীচে নেমে এলাম। মাদাম বাতি ধরে আমাদের আলো দেখাতে লাগলেন।

'বাইরে বেরিয়ে আমরা গাড়ির কাছে দাঁড়ালাম, তারপরে কোচোয়ানের মনে যাতে কোন সন্দেহ না জাগে সেই উদ্দেশ্যে মৃতদেহটিকে আমি সাহস দিয়ে বললাম—এস, এস, কিছুই হয়নি তোমার। নিশ্চয় এখন তোমার ভাল মনে হচ্ছে। একটু চেষ্টা কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

'মৃতদেহটা পিছলে পড়ছিল দেখে গাড়ির মুখে এনে জোরে একটা ধাক্কা দিলাম। মৃতদেহটা গাড়ির ভেতরে ছিটকে পড়ল। তারপরে গাড়ির ভেতরে ঢুকলাম আমি।

'মঁসিয়ে লেলিইভার উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সিরিয়াস কিছু বলে মনে হচ্ছে কি?

'একটু হেসে তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—'না'। মাদাম তাঁর আইনসঙ্গত স্বামীর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে রেখে গাড়িটির অন্ধকার গুহার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন ক'রে কোচম্যানকে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিলাম। তাঁর বাড়িতে পৌঁছে, তাঁর বাড়ির লোকজনদের ডেকে বললাম—'রাস্তায় আসতে-আসতে ইনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।' এই কথা বলে তাদের সাহায্যে তাঁকে আমরা ওপরে তুলে নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি সার্টিফিকেট দিলাম যে ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে; কেবল তাই নয়; বিভ্রান্ত এবং শোকবিমূঢ় তাঁর পরিবারবর্গের সুবিধার্থে আমি আবার নতুন একটা নাটকের অভিনয় করলাম। সব শেষ ক'রে বাড়ি ফিরে বিছানায় এলিয়ে দিলাম নিজেকে; এলিয়ে দেওয়ার আগে বিশ্বের তাবৎ প্রেমিক-প্রেমিকাদের মুণ্ডপাত করতে ভুললাম না।

কাহিনীটি শেষ করে ডাক্তার হাসতে লাগলেন। যুবতীটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলেন—এই ভয়ঙ্কর কাহিনীটা আমাকে শোনালেন কেন?

তখন তিনি খুশিই হলেন। জীবনে সেই প্রথম তিনি নারীর সেবা বেশ আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁদের অস্বস্তির সঙ্গেই বলতেন—এবার বাতে ধরলেই আমি খতম।

ব্যারণ চলে গেলে মাদাম দার্ণেতোত তাঁর মাকে বললেন—ব্যারণের জন্যে আমাদের একটি স্ত্রী সংগ্রহ ক'রে দেওয়া উচিৎ।

সবাই একবাক্যে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এই কথাটা তাঁদের আগে মনে হয়নি কেন? সারা সন্ধ্যাটা তাঁরা কোথায় কোন্ পরিচিত বিধবা রয়েছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসলেন। অনেক আলোচনার পরে মাদাম বার্থা ভাইলারসকে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করলেন। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ; এখনও তাঁকে সুন্দরী বলা যায়; মোটামুটি অর্থশালিনী, সুমেজাজিনী এবং চমৎকার স্বাস্থ্যবতী।

তাঁকে মাসখানেক কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হল। ভদ্রমহিলার বাড়িতে দিন কাটছিল না। সেইজন্যে তিনিও সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ভদ্রমহিলা স্ফূর্তিবাজ এবং জীবন্ত। মঁসিয়ে হেক্টরের চট করে চোখে পড়ে গেলেন তিনি। ভদ্রমহিলাও তাঁকে নিয়ে বেশ আমোদ করতেন; মঁসিয়েকে জীবন্ত খেলনার মত মনে করতেন; আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে খরগোসের অনুভূতি আর শেয়ালের ধূর্তামি নিয়ে আলোচনা করতেন; আর তিনিও বেশ ধৈর্য সহকারে বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেশ গম্ভীরভাবে আলোচনা করতেন।

ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে যেটুকু নজর দিতেন তাতেই ব্যারণ বেশ আনন্দ পেতেন। একদিন ভদ্রমহিলার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যেই তিনি তাঁকে শিকারে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। এরকম প্রস্তাব তিনি অন্য কোন মহিলাকে আর কোনদিন দেন নি। এই আমন্ত্রণটি ভদ্রমহিলার কাছে এমনই কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হল যে তিনি তা গ্রহণ করলেন। তাঁকে শিকারের বেশ পরানোটিই বেশ কৌতুককর হ'য়ে উঠেছিল। এই প্রচেষ্টায় সকলেই যোগ দিয়েছিলেন। সাজানো শেষ হ'লে তাঁকে দেখতে ঠিক আমাজনের মত মনে হল। তারপরে ব্যারণ তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। শিকারে গিয়ে তিনি তাঁকে শিকারের নানা জটিল প্রক্রিয়ার কথা বোঝাতে লাগলেন।

মিডর তার শিকার খুঁজে বার করল, ধীরে-ধীরে তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। ব্যারণ ভদ্রমহিলার পিছনে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় বেতস লতার মত কাঁপতে-কাঁপতে বললেন—সাবধান, সাবধান! এগুলো হচ্ছে তিতির।

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ভীষণ একটা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ হ'ল; আর সেই সঙ্গে এক ঝাঁক পাখি পতপত ক'রে আকাশে উড়তে শুরু করল। বন্দুকের শব্দে বিভ্রান্ত হ'য়ে ভদ্রমহিলা চোখ দুটো বুজিয়ে ফেললেন; তারপরে কাঁপতে-কাঁপতে বন্দুকের দুটো ঘোড়াই টিপে দিয়ে তাল সামলানোর জন্যে পেছনে ঝুঁকে পড়লেন। ধাতস্থ হওয়ার পরে তিনি দেখলেন ব্যারণ উন্মত্তের মত নাচছেন; আর মিডর দুটো তিতির পাখিকে মুখে ক'রে নিয়ে আসছে।

সেইদিনই ব্যারণ বার্থার প্রেমে পড়ে গেলেন।

তাঁর মুখে ভদ্রমহিলার প্রশস্তি শুনে একদিন তাঁর বন্ধু বললেন—তুমি ওঁকে বিয়ে করছ না কেন?

কথাটা শুনে ব্যারণ হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়ে বললেন—আমাকে বলছ...মানে...বিয়ে... ?

তিনি চুপ করে গেলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধুর করমর্দন ক'রে তিনি বিড়বিড় করে বললেন : শুভ রাত্রি, বন্ধু। এই কথা বলে তিনি অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন।

পরের তিনদিন তাঁকে আর দেখা গেল না। তারপরে যেদিন এলেন সেদিন তাঁকে বেশ বিবর্ণ দেখা গেল। অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী চিন্তাগ্রস্ত দেখা গেল তাঁকে। বন্ধুকে আড়ালে ডেকে তিনি বললেন—তোমার কথাটা চমৎকার। দেখ, উনি রাজি আছেন কিনা। সত্যি কথা বলতে কি ওই জাতীয় মহিলাদেরই আমার ভাল লাগে। সারা বছর ধরেই আমরা শিকার করে বেড়াব।

ভদ্রমহিলার কোন আপত্তি হবে না এবিষয়ে নিশ্চিত হয়েই বন্ধুটি বললেন—তুমি নিজেই তাঁকে প্রস্তাবটা দাও না কেন! তুমি কি চাও তোমার হ'য়ে সেই কাজটা আমি করে দেব?

হঠাৎ আমতা-আমতা করতে লাগলেন ব্যারণ—না, না। আমাকে—আমাকে সামান্য ক'টা দিনের জন্যে একবার প্যারিসে যেতে হবে। ফিরে এসেই আমি তোমাকে সঠিক উত্তর দেব।

এছাড়া অন্য কোন কথা তাঁর কাছ থেকে আদায় করা গেল না। পরের দিনই তিনি প্যারিসের পথে রওনা হলেন।

ক'টা দিনের জায়গায় প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। ব্যারণ আর ফিরলেন না। কুরভিলরা ভদ্রমহিলাকে ব্যারণের ইচ্ছাটা আগেই জানিয়েছিলেন। এমত অবস্থায় তাঁরা কী করবেন তা আদৌ বুঝতে পারলেন না। একদিন অন্তর-অন্তর ব্যারণের বাড়িতে তাঁরা লোক পাঠালেন ; কিন্তু তাঁর বাড়িতেও কোন সংবাদ পৌঁছয়নি। তারপরে একদিন সন্ধ্যায় ব্যারণ মুসাফিরের পোশাক পরে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে হাজির হলেন। দেখে মনে হল বয়সটা তাঁর যেন হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র তিনি হঠাৎ তাঁর হাত দুটো ধরে ক্লান্ত স্বরে বললেন—আমি এইমাত্র ফিরছি, বন্ধু ; আর ফিরেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি বড় ক্লান্ত।

তারপরে বেশকিছুটা ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন—সেই কথাটা মানে সেই কথাটা...তোমাকে সোজাসুজিই বলে দেওয়া ভাল। সেটা নিয়ে আর তোমরা এগিয়ো না।

তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বন্ধুটি. বললেন—'এগিয়ো না' মানে? কিন্তু কেন?

না, না। আমাকে কোন প্রশ্ন করো না। কারণটা খুলে বলতে বেশ কষ্ট হবে আমার। কিন্তু নিশ্চিন্ত থেকো আমি ভদ্রভাবেই বলছি। আমি পারব না...আমার কোন

অধিকার নেই...বুঝতে পারছ—ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করার কোন অধিকার আমার নেই। তিনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাই আমি আসিনি। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হওয়াটা আমি সহ্য করতে পারব না। বিদায়, এই কথা বলেই তিনি পালিয়ে গেলেন।

কারণটা কী খুঁজে বার করার জন্যে সবাই মিলে আলোচনা করতে বসলেন। কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে তাঁরা ভাবলেন নিশ্চয় ব্যারণের কোন সন্তান রয়েছে, অথবা কোন মহিলার সঙ্গে পুরনো কোন সম্পর্ক রয়েছে। কারণটা যাই হোক, এই বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চয় কোন সত্যিকার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। মাদাম ভাইলারসকে ব্যাপারটা বোঝাতে তাঁদের বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হ'ল না। মাদাম আগে যেমন বিধবা ছিলেন সেইভাবেই স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

মাসতিনেক পরের কথা। একদিন সন্ধ্যায় পেট ভ'রে ডিনার খেয়ে পাইপ ধরিয়ে ব্যারণ তাঁর বন্ধুকে বললেন—আমি তোমার বন্ধুটির সম্বন্ধে কত চিন্তা করি তা জানলে আমার জন্যে নিশ্চয় তোমার দুঃখ হবে।

কথাটা বলেই ব্যারণ পাইপ টানা বন্ধ ক'রে কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলেন; বললেন—কী যে ঘটে গেল তা আমি ভাবতেই পারিনি।

বন্ধুটি অস্থিরভাবে বললেন—প্রতিটি মানুষেরই সবকিছু ভেবে দেখা উচিৎ।

কাছাকাছি কেউ কোথাও রয়েছে কি না দেখার জন্যে ব্যারণ অন্ধকারে চোখ চিরে-চিরে দেখলেন, তারপরে ফিসফিস ক'রে বললেন—বুঝতে পারছি তুমি আহত হয়েছ। তুমি যাতে আমাকে ক্ষমা করতে পার সেইজন্যে আমি তোমাকে সব খুলে বলছি। দীর্ঘ কুড়িটি বছর আমি কেবল শিকারের জন্যেই বেঁচে রয়েছি। শিকারই আমার একমাত্র ধ্যান ধারণা। শিকার ছাড়া অন্য কোন জিনিসই আমি ভাবতে পারি নি। সেইজন্যেই যখন আমি একটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে এসেছিলাম তখন বিবেক আমাকে দংশন করল। নারীর প্রেম বলতে লোকে কী বোঝে আমি তা জানি না। সুতরাং বিয়ে করার পর...মানে...আমি কী বলতে চাই তুমি তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। বিবেচনা ক'রে দেখ, আজ থেকে ষোল বছর আগে...সেই শেষ...বুঝতে পারছ! তাছাড়া, আরও অনেককিছু করার ছিল আমার। একদিনের ভাল শিকার আমার কাছে অনেক বেশী উপাদেয়। হঠাৎ মনে হ'ল মেয়র অথবা পুরোহিতের কাছে বিয়ের বিষয়ে মন্ত্র আওড়াব কী করে? যদি শেষ পর্যন্ত না পারি? কোন ভদ্রলোকেরই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিৎ নয়। সেইজন্যে নিজেকে ভাল করে বুঝতে আমি প্যারিসে গিয়েছিলাম। প্যারিসে এক সপ্তাহ কাটিয়েও আমার মানসিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি। চেষ্টা যে করিনি, তা নয়। কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। সেইজন্যে আরও দু'তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম। খাওয়া, শোওয়া, আমোদ, প্রমোদ—কিছুই বাদ দিইনি আমি; কিন্তু ফল কিছু হয়নি; তুমি বুঝতেই পারছ এই রকম একটি পরিস্থিতিতে বিয়ে না করাটাই আমার পক্ষে একমাত্র সুবিবেচনার কাজ।

বন্ধুটি ব্যারণের অবস্থাটা বুঝতে পেরে তাঁর করমর্দন করে বললেন—তোমার জন্যে আমি দুঃখিত।

এই বলে ব্যারণকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে এলেন তিনি।

বাড়িতে ফিরে এলে স্ত্রীকে একা পেয়ে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ব্যারণের কথাগুলি বললেন, বলতে-বলতে হাসির চোটে তাঁর পেটে খিল ধরার উপক্রম করল। কিন্তু মাদাম হাসলেন না। সব কথাই তিনি মন দিয়ে শুনলেন। স্বামীর কাহিনী শেষ হলে তিনি বেশ গম্ভীরভাবেই বললেন—ব্যারণ একটি মূর্খ। আসলে উনি ভয় পেয়েছেন। বার্থাকে আমি এখনই লিখে দিচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন চলে আসে।

স্বামী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি বললেন—বোকা কোথাকার! স্ত্রীকে ভালবাসলে সব স্বামীরই ওইরকম ভয় হয়।

ভদ্রলোক অস্বস্তি বোধ করলেন। তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

দুই বন্ধু

Two friends

অবরুদ্ধ প্যারিস শহর; অভুক্ত; একেবারে শেষ অবস্থা তার। চড়াই পাখিরা বাড়ির ছাদ থেকে পালিয়ে গিয়েছে; যা পাচ্ছে তাই মানুষ পেটে পুরছে। জানুয়ারী মাসের একটি সুন্দর প্রভাতে মঁসিয়ে মরিসভ শূন্য উদরে বুলেভার্ডের পাশ দিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিরস বদনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার পেশা ঘড়ি তৈরি করা। বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ মিলিটারী পোশাক-পরা একটি পুরনো বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। বন্ধুটির নাম মঁসিয়ে সভেজ। নদীর ধারে আলাপ হয়েছিল দু'জনের। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে প্রতি রবিবার মরিসভ হাতে একটি বাঁশের লাঠি আর পিঠে একটা টিনের বাক্স নিয়ে খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। আর্জেন্টিউলের ট্রেনে চেপে নামতো কোলেম্বে। সেখান থেকে হেঁটে যেত মারেটি দ্বীপ পর্যন্ত। সেখানে পৌঁছেই সে মাছ ধরতে বসে যেত; মাছ ধরত সেই সন্ধে পর্যন্ত।

সেইখানেই প্রতিটি রবিবার আর একজন মেছোড়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হোত। এরই নাম সভেজ। নতার-দ্যম-দি-লোরেত্তিতে লোকটির ফিতের ছোট একটা ব্যবসা ছিল। দিনের অর্দ্ধেকটা সময়ই তারা জলের ওপরে পা ঝুলিয়ে পাশাপাশি বসে মাছ ধরত।

কোন-কোন দিন একটাও কথা বলত না তারা। আবার কোন-কোন দিন গল্প করত। কিন্তু পরস্পরকে তারা চিনত। একই গোত্রের লোক ছিল তারা। কোন-কোন দিন বসন্তের সকালে প্রায় দশটার কাছাকাছি নদীর বুক থেকে মৃদু কুয়াশার আস্তরণ শূন্যে মিলিয়ে গেলে এই দুটি উৎসাহী মৎস্যশিকারী তাদের পিঠে বসন্তের মৃদু আমেজ উপভোগ করত। তখন মরিসভ বলত—'এই ত জীবন', এই ক'টা কথার মধ্যে

দিয়েই তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত। আর কিছুই বলতে হোত না তাদের। শরতের সূর্যাস্তে নদীর জল লাল হয়ে উঠলে দুটি বন্ধুর মাঝখানে যখন অরণ্যের দীর্ঘায়ত ছায়াগুলি নেমে আসত তখন সভেজ বলত—কী সুন্দর!

সেদিন দু'জনের দেখা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দু'জনকে চিনতে পারল; করমর্দন হল দু'জনের; মঁসিয়ে সভেজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—দিনকাল কী জঘন্যই না হ'ল।

মরিসভ দুঃখের সঙ্গে বলল—আহা, আবহাওয়াটাকেও বলিহারি। সারা বছরে আজকের দিনটাই যা সুন্দর।

ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে-ভাবতে দু'জনেই হাঁটতে লাগল তারা।

মরিসভ বলল—মাছধরার কথা মনে রয়েছে? আহা, কী দিনই না ছিল!

সভেজ বলল—ভাবছি, আবার কবে মাছ ধরতে যাব!

তারপরে তারা ছোট একটা কাফেতে ঢুকে অ্যাবিসিনথ খেল।

অ্যাবিসিনথ খেয়ে তারা আবার বেরলো হাঁটতে।

হঠাৎ মরিসভ থেমে গিয়ে বলল—আর একপাত্র খেলে কেমন হয়?

আমার কোন আপত্তি নেই।

দু'জনেই আবার একটা কাফেতে ঢুকে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর তাদের মাথা টলতে লাগল। খালি পেটে অ্যালকোহল খেলে মাথার অবস্থা ওইরকমই হয়।

মঁসিয়ে সভেজের বেশ নেশা ধরেছে, সেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—চল।

কোথায়?

আবার কোথায়? মাছ ধরতে।

কিন্তু কোথায় যাবে?

কেন? আমরা যেখান যেতাম। কোলেম্ব থেকে ফরাসীদের সৈন্যশিবির বেশী দূরে নয়; কর্নেল ডুমোর্লিঁকে আমি চিনি। নির্বিবাদে তারা আমাদের সেখানে যেতে দেবে।

উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে মরিসভ বলল—বহুৎ আচ্ছা।

মাছ ধরার সরঞ্জাম আনার জন্যে তারা যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল।

ঘণ্টাখানেক পরে প্রধান সড়কের ওপর দিয়ে দু'জনকে পাশাপাশি হাঁটতে দেখা গেল। হাঁটতে-হাঁটতে তারা কর্ণেলের হেডকোয়ার্টারে হাজির হল। তাদের কিস্তুতকিমাকার আর্জি শুনে তিনি একটু হেসে গন্তব্যস্থানে যাওয়ার জন্যে তাদের অনুমতি দিলেন।

জনহীন নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে গেল তারা। নানডারী পর্যন্ত বিরাট সমতল ক্ষেত্রটি একেবারে জনশূন্য; কেবল পত্রহীন চেরি গাছগুলি সেই বিরাট শূন্যতার মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটা উঁচু জায়গার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মঁসিয়ে সভেজ বলল—ওইখানে প্রাশিয়ানরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেই পরিত্যক্ত বনভূমির দিকে তাকিয়ে ভয়ে দু'জনের বুকই কেঁপে উঠল।

প্রাশিয়ান। একজন প্রাশিয়ানও তারা দেখেনি; কিন্তু তাদের অকথ্য অত্যাচারের অজস্র কাহিনী তারা অনেক শুনেছে। সেই বিজয়ী সেনাবাহিনীর ওপরে বিদ্বেষমিশ্রিত একটা কুসংস্কারভরা ভীতি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

মরিসভ আমতা-আমতা ক'রে বলল—ধর, ওদের কারও সঙ্গে যদি আমাদের দেখা হয়ে যায়। আমরা কী করব বলত?

এত বিপদ সত্ত্বেও প্যারিসবাসীদের মুখে যে বিদ্রূপটি প্রচলিত ছিল সেই বিদ্রূপের ভাষায় সভেজ উত্তর দিল—ভেজে খাওয়ার জন্যে আমরা তাকে কিছু মাছ দেব।

কিন্তু সেই অশুভ নির্জনতার ভেতর দিয়ে আর এগিয়ে যাবে কিনা সেই কথাই ভাবছিল তারা। তারপরে সভেজ হঠাৎ মনস্থির ক'রে বলে ফেলল—চল; এগিয়ে যাই। কিন্তু চোখ দুটোকে ঢেকে রেখ।

চারপাশে সন্ত্রস্তভাবে তাকাতে-তাকাতে দ্রাক্ষাকুঞ্জের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল তারা। নদীর ধারে পৌঁছতে গেলে এখনও তাদের কিছুটা ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে এগোতে হবে। তারা দৌড়ে ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে নদীর ধারে হাজির হল; নদীর ধারে ঘাসের বনে লুকিয়ে ফেলল নিজেদের। তারপরে মাটির ওপরে কান পেতে রইল। না; কোথাও কোন শব্দ নেই। কাছাকাছি কোথাও কারও পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তারা একা, একেবারে একা। নিশ্চিন্ত হয়ে তারা মাছ ধরতে শুরু করল। প্রথম মাছ ধরল সভেজ; দ্বিতীয়টি গাঁথা পড়ল মরিসভের ছিপে। এইভাবে তারা একটার পর একটা মাছ ধরে ডাঙায় ফেলছিল। সাদা-সাদা মাছগুলি জলের ওপরে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল চিকচিক ক'রে। অনেকদিন আগেকার আনন্দ আর উত্তেজনা ফিরে পেয়ে তারা একেবারে তন্ময় হয়ে গেল; জলের মধ্যে ঝোলানো থলের ভেতরে তারা সেই মাছগুলি পুরে দিয়ে আবার নতুন উদ্যমে ফতনা ভাসিয়ে দিল জলের ওপরে।

দয়ালু সূর্য তাদের পিঠের ওপর গরম রোদ ছড়িয়ে দিয়েছিল। কোন শব্দই তাদের কানে ঢোকেনি; কিছুই তারা চিন্তা করেনি। পৃথিবীর কথা ভুলে গিয়ে তারা মাছ ধরায় মসগুল হয়ে রইল।

কিন্তু হঠাৎ কামানের গর্জন শুরু হল। বড়-বড় কামান থেকে গোলা বেরিয়ে আসছে চারদিকে। মরিসভ ঘুরে চেয়ে দেখল, দূরে আকাশের গায়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী জট পাকিয়ে ভাসছে। তারপরে দুর্গের চূড়ায়—তারপরেই পরপর অনেকগুলি কামানের গর্জন শোনা গেল। শান্ত আকাশ গর্জনের শব্দে অশান্ত হয়ে উঠল।

মঁসিয়ে সভেজ বলল—আবার শুরু করেছে ওরা।

মরিসভ এতক্ষণ তার ফতনার দিকে তাকিয়েছিল। শান্তিপ্রিয় মানুষটির মন এইসব উন্মত্ত জানোয়ারদের পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় হঠাৎ রাগ আর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল; সে গর্জে উঠে বলল—লোকগুলি বোকা না হলে এভাবে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে?

সভেজ বলল—বোকা নয়; বন্য জানোয়ারদের চেয়েও ভয়ানক।

একটা মাছ ছিপে গেঁথে মরিসভ বলল—যতদিন দেশে সরকার ব'লে কোন বস্তু থাকবে ততদিন এইরকমই চলবে।

সভেজ তাকে সংশোধন করে দিয়ে বলল—রিপাবলিক হলে এ যুদ্ধ বাঁধতো না......

মরিসভ বলল—রাজা থাকলে বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ বাঁধে, রিপাবলিক হলে নিজেদের মাটিতে।

এরপরেই শুরু হল দু'জনের তর্ক। তারপরে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে মানুষের কোনদিন মুক্তি নেই। ইতিমধ্যে ওপাশ থেকে প্রাশিয়ানদের কামান একটানা গর্জন করে চলেছে। তাদের লক্ষ্য ফরাসীদের ঘর-বাড়ি। শ্যেল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে তারা ফরাসীদের বাড়ি-ঘর চূর্ণ ক'রে দিচ্ছে—হতাহত করছে অসংখ্য মানুষকে,—তাদের সুখ, স্বপ্ন, আর আশা বিচূর্ণ ক'রে তাণ্ডবনাদে গর্জন করছে। মঁসিয়ে সভেজ বলল—এইত জীবন।

মঁসিয়ে মরিসভ হেসে বললেন—অথবা, মৃত্যু।

কাছাকাছি কার যেন পায়ের শব্দ পেতেই তারা দু'জনে চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখল ঠিক তাদের পেছনে চারটি সশস্ত্র সৈন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে...চারটি বিরাট চেহারার সৈন্য, মিলিটারী পোশাক তাদের গায়ে; গালে দাড়ি; হাতে রাইফেল।

তাদের হাত থেকে ছিপ দুটো ফসকে জলে প'ড়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই তাদের বেঁধে ধরে নিয়ে গেল সৈন্যরা; তারপরে ফেরী নৌকোতে চড়িয়ে দ্বীপের মধ্যে চালান করিয়ে দেওয়া হল। তারা ভেবেছিল ওইখানে নিয়ে গিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে; কিন্তু একটা বাড়ির কাছে গিয়ে তারা দেখল এককুড়ি জার্মান সৈন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটি বিরাট চেহারার লোমওয়ালা মানুষ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পোরসিলিন-এর পাইপ টানতে-টানতে চোস্ত ফরাসীতে জিজ্ঞাসা করল...:ভদ্রমহোদয়গণ, সারাদিন মাছ তাহলে ভালই ধরেছেন।

ঠিক এই সময় একটি সৈন্য তার পায়ের কাছে পুরো মাছের থলিটা রেখে দিল। আসার সময় সে থলিটা নিয়ে আসতে ভোলেনি।

প্রাশিয়ান অফিসারটি হেসে বলল—বাঃ। অনেক মাছ ধরেছেন তো! যাই হোক; ও নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। ভয় পাবেন না; আমি যা বলছি শুনুন।

আমার বিশ্বাস আপনারা দু'জন গুপ্তচর। আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে আপনারা এখানে এসেছেন। আমি আপনাদের ধরে এনেছি গুলি ক'রে মেরে ফেলার জন্যে। মাছ ধরাটা আপনাদের এখানে আসল কাজ নয়। আপনারা আমার হাতে পড়েছেন। কপাল আপনাদের খারাপ। কিন্তু যুদ্ধ, যুদ্ধ। আপনারা কোন সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে নিশ্চয় আপনাদের এলাকা থেকে বেরিয়েছেন। সেই শব্দটা কী আমাকে বলুন। আমি আপনাদের মুক্তি দেব।

বিবর্ণ মুখে বন্ধু দুটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল। তাদের হাত কাঁপতে লাগল, কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না।

অফিসারটি আবার বলল—কেউ আপনাদের কথা জানবে না। আপনারা নিরাপদেই ফিরে যাবেন। কিন্তু না বললে এখনই আপনাদের মৃত্যু হবে। এখন কী করবেন বলুন ?

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারা। কেউ কোন কথা বলল না।

জলের দিকে ইঙ্গিত করে প্রাশিয়ান অফিসারটি শান্তভাবেই বলল—এখন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনারা ওই নদীর তলায় চলে যাবেন। পাঁচ মিনিট। নিশ্চয় আপনাদের আত্মীয়-স্বজন আপনাদের পথ চেয়ে বসে রয়েছেন।

ওদিকে তখনও কামান ফাটছে।

দুটি বন্ধু তবুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। অফিসারটি নিজের ভাষায় সৈন্যদের কী যেন একটা নির্দেশ দিয়ে চেয়ারটাকে বন্দীদের কাছ থেকে সরিয়ে নিল। কুড়ি পা দূরে বারজন সৈন্য রাইফেলগুলি উঁচিয়ে ধরল।

অফিসারটি বলল—এক মিনিট। এক সেকেণ্ডও বেশী নয়।

কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল তারা।

মরিসভের চোখ দুটো মাছে ভর্তি সেই "নেটের" থলিটার ওপরে গিয়ে পড়ল। প্রচুর মাছ। তখনও তারা লাফালাফি করছে। সূর্যের আলোতে চিকচিক করছে তাদের দেহ। মুহূর্তের জন্যে তার মনে একটা দুর্বলতা এল কিন্তু তাকে সে প্রশ্রয় দিল না। চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠল।

সে আমতা-আমতা ক'রে বলল—বিদায়, মঁসিয়ে সভেজ।

বিদায় মঁসিয়ে মরিসভ।

কাঁপতে-কাঁপতে পরস্পরকে করমর্দন করল তারা।

গুলি কর!—নির্দেশ এল অফিসারের।

একসঙ্গে বারটা রাইফেল গর্জন করে উঠল। মঁসিয়ে সভেজ লম্বা হয়ে মাটির ওপরে পড়ে গেল। দীর্ঘাঙ্গী মরিসভ ঘুরপাক খেয়ে তার বন্ধুর দেহের ওপরে লুটিয়ে পড়ল। আকাশের দিকে মুখ ক'রে প'ড়ে রইল সে; রক্তে তার পোশাক লাল হয়ে গেল।

জার্মান অফিসারটি আবার একটি নির্দেশ দিল।

তার লোকেরা কয়েক-গাছা দড়ি আর পাথর নিয়ে এল। সেই পাথরগুলি মৃত লোকগুলির পায়ে বেশ শক্ত করে বাঁধল। তারপর তারা তাদের টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে গেল। একজন মরিসভের মাথা ধরল; আর একজন তার পা। তারপরে তারা জোরে দেহটাকে ছুঁড়ে দিল নদীর ওপরে। মৃতদেহটা অর্দ্ধবৃত্ত রচনা করে জলের ওপরে গিয়ে পড়ল; তারপরে দ্বিতীয় দেহটাকেও ওই একইভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হল। পাথরের ভারে মৃতদেহ দুটির পাগুলি আগে ডুবে গেল; তারপরে মাথা। জলের মধ্যে তলিয়ে গেল তারা। নদীর জলে আলোড়ন জাগল কিছুটা। তারপরে আবার

সব মিলিয়ে গেল। ছোট-ছোট কয়েকটা তরঙ্গ কেবল তীর পর্যন্ত এগিয়ে এল। শুধু একটু রক্ত কেবল জলের ওপরে ভাসতে লাগল।

অফিসারটির মনে কোন তরঙ্গ উঠল না। পাকা দার্শনিকের মত সে বলল—এবারে মাছগুলোই ওদের বাকিটুকু শেষ ক'রে দেবে।

তারপরে ব্যাগের মাছগুলির দিকে তার লক্ষ্য পড়ল। মাটি থেকে মাছের থলিটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে সে হাসল; তারপরে চিৎকার ক'রে উঠল—উইলহেম।

সাদা পোশাক পরা একটি সেনানী দৌড়ে এল। তার হাতে মৃত দুটি মানুষের শিকার করা মাছগুলি তুলে দিয়ে অফিসারটি বলল—মাছগুলিকে জীবন্ত অবস্থাতেই ভেজে আমাকে দেবে। ওগুলি খেতে বড় চমৎকার।

এই বলেই সে তার পাইপ ধরালো।

কবরখানার বান্ধবী

The graveyard sisterhood

পাঁচটি বন্ধুতে ডিনার প্রায় শেষ ক'রে এনেছিলেন। এঁরা সবাই ধনী, মাঝ-বয়সী; দু'জন অবিবাহিত; তিনজন বিবাহিত। যৌবনের স্মৃতিচারণা করার জন্যে এঁরা মাসে একদিন একসঙ্গে ব'সে গল্পগুজব, খানাপিনা করতেন। প্যারিস শহরের মানুষেরা যে-সব বিষয় নিয়ে গল্প করতে ভালবাসে তাদের কোনটাই এঁরা বাদ দিতেন না।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে হাসিখুশি চরিত্রের ছিলেন জোশেফ দি বার্ডো। ভদ্রলোক বিয়ে করেননি। বয়স তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। চরিত্রটাকে একেবারে জলাঞ্জলি না দিয়ে সমস্ত রকম উচ্ছ্বাসেই তিনি গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। উৎকৃষ্ট সাংসারিক মানুষ বলতে যা বোঝা যায় তিনি ছিলেন সেইজাতীয়। তাঁর বুদ্ধি ছিল কিন্তু গভীরতা ছিল না; জ্ঞান ছিল অনেক; কিন্তু পাণ্ডিত্য ছিল না। নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর ফলে অসংখ্য কাহিনী তাঁর জানা ছিল। সেই কাহিনীগুলি তিনি বেশ সুন্দর ক'রে বলতে পারতেন। সেইজন্যে বন্ধুদের কাছে তিনি যথেষ্ট সুনাম পেতেন। ডিনার শেষ হওয়ার পরে আসর জমিয়ে রাখতেন তিনিই। সেদিনও যথারীতি তিনি গল্প বলতে শুরু করলেন।

সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে তিনি বললেন—কয়েকদিন আগে আমার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন—বল, বল।

তিনি বললেন—খুব আনন্দের সঙ্গেই। তোমরা সবাই জান প্যারিসের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে; অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আমি লোকজন, জিনিসপত্র সব দেখে বেড়াই।

'সেবার সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন বিকালের দিকে পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আমি বেরিয়ে পড়লাম। এইসব দিনে লোকে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যায়, আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে আলাপ করতে যায়; তারপরে নানারকম হিসাব নিকাশ ক'রে যেটা যার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব'লে মনে হয় সে সেইদিকে চলে যায়। আমিও সেইরকম হালকা মনে সিগার ধরিয়ে বুলেভার্ডের দিকে বেরিয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ মনে হল—যাই একবার মন্তমর্তি সিমেট্রির দিকে ঘুরে আসি। তোমরা জান, কবরখানায় যেতে আমার বেশ ভাল লাগে। তারা আমাকে বিষণ্ন ক'রে তোলে—শান্ত ক'রে দেয় আমার উত্তেজিত স্নায়ুগুলিকে। তাছাড়া, ওখানে আমার অনেকগুলি প্রিয় বন্ধুরাও ঘুমোচ্ছে। তাদের দেখতে আর কেউ যায় না। তাই আমি মাঝে-মাঝে ওসব জায়গায় ঘুরে বেড়াই।

'ওই কবরখানাতেই আমার একটি প্রিয়তমা রক্ষিতাকে কবর দিয়ে এসেছি। তাকে আমি খুব ভালবাসতাম, তার মৃত্যুতে আমি কেবল দুঃখই পাইনি, অনুতপ্তও হয়েছি। তার কবরের কাছে গিয়ে তাই আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি।

'কবরখানাগুলিকে আমার ভালবাসার আরও কারণ রয়েছে। স্থানটি বিপুলভাবে জনাকীর্ণ। ভেবে দেখ কত যুগ ধরে প্যারিসের কত অসংখ্য মানুষ ওখানে ছোট-ছোট কুঠরীতে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে জীবন কাটাচ্ছে। মাথার ওপরে তাদের কেবল একটা পাথরের টুকরো আর ক্রশ চিহ্ন। আর তাদের তুলনায় মূর্খ জীবন্ত মানুষেরা কতখানি জায়গা নিয়েই না বাস করে, আর সেই বেঁচে থাকার জন্যে কত হট্টগোলই না তারা করে। তাছাড়া, এই কবরখানাটিতে যেসব সমাধিমন্দির রয়েছে তাদের ভাস্কর্যও কত সুন্দর! সেই নিস্তব্ধ সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে নিছক ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ অথবা বিষাদ তাই আমাকে চিরকালই আকর্ষণ ক'রে এসেছে।

'ধীরে-ধীরে সেই মৃতের রাজত্বে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। এখানে এরা কেউ প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে যায় না, একসঙ্গে কেউ ঘুমায় না, খবরের কাগজ পড়ে না কেউ। ঘুরতে-ঘুরতে সমাধিমন্দিরের ওপরে লেখাগুলি পড়তে লাগলাম। এগুলি পড়তে বেশ আমোদ লাগে; অথবা, এখানকার গদ্যরচনা প'ড়ে আমার ভীষণ হাসি পায়। মৃতদের সঙ্গে স্বর্গে মিলিত হওয়ার কী আকূল আগ্রহই না মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা ওই সব বাণীর মধ্যে লিখে রাখে? মানুষ যে কতখানি কপট তা বোধ হয় তোমরা বুঝতে পারছ। কিন্তু কবরখানার যে অংশটায় সবচেয়ে আমার বেড়াতে ভাল লাগে সেটা হল পরিত্যক্ত অংশ। ওখানে বড়-বড় ইউ গাছ জন্মেছে। ওদিকটায় আর নতুন কবর খোলা হয় না। ওখানে যারা শুয়ে রয়েছে তারা অনেক-অনেক বছর আগে মারা গিয়েছে। আবার একদিন এখানকার বিরাট-বিরাট গাছগুলিকে কেটে ফেলা হবে—নতুন কবরখানার জন্যে খুলে দেওয়া হবে জায়গাটি।

'এইভাবে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পরে মনে হল চিন্তার দিক থেকে আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। ভাবলাম, এখন আমার প্রিয়তমার কবরখানায় যাওয়া উচিত। মেয়েটিকে আমি কী ভালই না বাসতাম! বিষণ্ন ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আমি তার

কবরখানার কাছে হাজির হলাম। কী সুন্দরীই না সে ছিল? কিন্তু এখন যদি তার কবরটা খুলে ফেলা হয়! ভাবতেও গাটা শিউরে উঠল আমার।

'সেই কবরখানার কাছে কয়েকটা মিষ্টি কথা বললাম; সেই সব তার কানে আদৌ ঢুকল না। তারপরে সেখান থেকে চলে আসার জন্যে মুখ ঘোরালাম, এমন সময় দেখি ঠিক উলটো দিকে আর একটি কবরের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে একটি মহিলা মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছেন। মাথার ওপর থেকে ঘোমটাটি খুলে পড়ায় তাঁর মুখটি আমি দেখতে পেয়েছিলাম; সে-মুখ বড় সুন্দর। তাঁর সেই শোকজর্জরিত সুন্দর মূর্তিটি দেখে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

'মনে হল ভদ্রমহিলা একেবারে পাথর হ'য়ে গিয়েছেন; শোকে মূহ্যমান হ'য়ে চোখ বন্ধ ক'রে একমনে মন্ত্রপাঠ করার ভঙ্গীতে তিনি বিড়বিড় ক'রে স্মৃতিচারণা করছেন। সেই অপরূপ দৃশ্য আমি দেখতে লাগলাম। তারপরে মনে হ'ল তিনি ফোঁপাচ্ছেন; প্রথমে ধীরে-ধীরে; তারপরে মনের আবেগ বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কাঁপতে লাগল; অশ্রু বড়-বড় ফোঁটার আকারে গাল বেয়ে গড়াতে লাগল। অশ্রুবিন্দু তো নয়—একেবারে মুক্তোবিন্দু। তারপরেই তিনি ব্যাকুল হ'য়ে চারপাশে তাকাতে লাগলেন। মনে হল, একটা দুঃস্বপ্ন থেকে তিনি যেন হঠাৎ জেগে উঠেছেন। আমাকে তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি একটু লজ্জা পেয়ে দু'হাতে মুখটা ঢেকে দিলেন। ভীষণ উত্তেজনায় শরীরটা তাঁর কাঁপতে লাগল, তারপরেই একটা করুণ আর্তনাদ আমার কানে এসে ঢুকল; এবং ঠিক পরমুহূর্তে তিনি কবরের পাথরের গায়ে মূর্চ্ছাহত হয়ে ঢলে পড়লেন। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললাম। দেখলাম কবরের ওপরে লেখা রয়েছে—

এখানে লুই-থিয়োডোর ক্যারেল শুয়ে রয়েছেন,
মেরিন লাইট ইনফ্যানট্রির ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি,
টনকিনে শত্রুদের হাতে তিনি নিহত হন।
তাঁর আত্মার শান্তি হোক।

কয়েকমাস আগেই ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে। ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট হ'ল। তাঁকে সুস্থ করার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থ হলেন। প্রথম দর্শনেই মনে হল ভদ্রমহিলাটি বেশ শান্ত এবং কৃতজ্ঞ! তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টাটা আমার একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদতে-কাঁদতে তিনি সেই মৃত অফিসারটির কথা আমাকে বললেন। শুনলাম, মাত্র বছরখানেক হ'ল তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। পূর্ব জীবনে একমাত্র বিয়ের যৌতুক ছাড়া তাঁর আর কোন সম্বল ছিল না। এখন তিনি অনাথা।

সান্ত্বনা দিয়ে আমি তাঁকে তুললাম। বললাম—তাই বলে এখানে আপনি থাকতে পারেন না। আমার সঙ্গে আসুন।

কিন্তু আমি যে হাঁটতে পারছিনা।

আমাকে ধরে-ধরে আসুন।

ধন্যবাদ। কার জন্যে শোক করতে আপনি এখানে এসেছিলেন? স্ত্রী?

আমি বললাম—না; রক্ষিতা।

তিনি বললেন—রক্ষিতাকেও মানুষ স্ত্রীর মতই ভালবাসতে পারে। প্রেমের রাজত্বে অস্পৃশ্যতা নেই।

যা বলেছেন, মাদাম।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই তিনি বললেন—মনে হচ্ছে, আমি আবার পড়ে যাব।

কিছু খাবেন?

খেলে মন্দ হয় না।

পাশে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষে মানুষে সাধারণতঃ এইখানে যায় কিছু খাওয়ার জন্যে। সেইখানে এক কাপ বেশ গরম চা খেয়ে তিনি ধাতস্থ হলেন; তারপরে মৃদু হেসে তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি নিঃসঙ্গ হ'য়ে গিয়েছেন। এতবড় বিশ্বে তাঁর আর কেউ নেই। তাঁর সেই করুণ কাহিনী শুনে আমার খুব কষ্ট হল। আর হবে নাই বা কেন; ভদ্রমহিলা যুবতী—বয়স কুড়ির বেশী নয়। আর আমার সাহায্য তিনি বেশ খুশি মনেই গ্রহণ করলেন। তারপরে সন্ধে হয়ে আসছে দেখে একখানা গাড়ি ডেকে তাঁকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিলাম।

গাড়ি থেকে নামার পর তিনি বললেন—চারতলায় ওঠার মত আমার ক্ষমতা নেই। আপনি অনেক করেছেন। আমাকে যদি ওপরে উঠতে একটু সাহায্য করেন তাহলে সত্যিই বাধিত হব।

আমি তো আনন্দে গদগদ। তাঁকে ধরে-ধরে ওপরে নিয়ে গেলাম। দরজার কাছে এসে তিনি বললেন—একটু ভেতরে আসুন। আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর কিঞ্চিৎ সুযোগ দিন আমাকে।

তথাস্তু। ভেতরে ঢুকে গেলাম আমি। দেখলাম ঘরটি আড়ম্বরবর্জিত; দারিদ্র্যের ছাপ রয়েছে বটে কিন্তু বেশ সুন্দর ক'রে সাজানো।

ছোট একটি সোফার ওপরে পাশাপাশি আমরা বসলাম। আমাকে একটু ড্রিঙ্ক দেওয়ার জন্যে তিনি কলিং বেল টিপলেন; কিন্তু কোন পরিচারিকাই সেই ডাকে সাড়া দিল না। সম্ভবতঃ, কেউ তখন সেখানে ছিল না। আমি খুশিই হলাম। তারপর তিনি আমার পাশে বসে কিছুক্ষণ পর তাঁর নিজের জীবনের কাহিনী শুরু করলেন। কাহিনী বলতে-বলতে তিনি তাঁর টুপিটা খুলে ফেললেন। চমকে উঠলাম আমি। এমন সুন্দর মুখ আমি খুব কমই দেখেছি। তিনিও একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি আর লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলাম। তিনি চোখ দুটো নামিয়ে আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় বলতে লাগলেন—না-না...একি...!

মেয়েদের এই "না-না" শব্দের অর্থ আমি জানি। তাই তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে আরও জোরে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম; তারপরে অজস্র চুম্বনে তাঁর চোখ,

চোখ থেকে মুখ, তারপরে বুক ভরিয়ে দিলাম। তিনি খুব একটা বাধা দিলেন না। তারপরে টনকিনে নিহত মৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি অপমানকারী আমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

তারপরে তাঁকে আমার সঙ্গে কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। মৃদু আপত্তি জানালেন তিনি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তারপরে শোকের পোশাক ছেড়ে তিনি ডিনারের পোশাক পরলেন। ডিনারটা জমলো ভালই। শ্যাম্পেন খেয়ে তিনি শোকের ধাক্কাটা ভালভাবেই কাটিয়ে উঠলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমি তাঁর ফ্ল্যাটে ফিরে গেলাম।

কবরখানার বন্ধুত্ব আমাদের তিনটি সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু একটানা সব জিনিসেই মানুষের ক্লান্তি আসে—বিশেষ ক'রে মেয়েদের। বিশেষ জরুরী কাজে বাইরে যাওয়ার ছল ক'রে আমি তাঁকে ছেড়ে চলে গেলাম, চলে যাওয়ার সময় আমি অবশ্য মোটা একটা টাকা তাঁকে দিয়ে এসেছিলাম; এবং তিনিও তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে প্যারিসে ফিরে আসার পরেই আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি যে আমাকে একটু ভালবেসে ফেলেছেন সেকথাও মুখ ফুটে বলতে তিনি দ্বিধা করেননি।

অনতিবিলম্বেই নতুন খেলায় মেতে গেলাম আমি। প্রায় এক মাস কেটে গেল; এর ভেতরে কবরখানার বান্ধবীর সঙ্গে পূর্ব সম্পর্কটা ঝালাই ক'রে নেওয়ার প্রলোভনটা আর আমার মনে দেখা দেয়নি। তারপরে কী জানি কেন হঠাৎ একদিন আমার মনে হল হয়ত তাঁকে মন্তমার্তি সিমেট্রিতে আমি দেখতে পাব। একদিন আমি সেখানেই গেলাম।

ঘুরছি, আর দেখে-দেখে বেড়াচ্ছি। টনকিনের যুদ্ধে নিহত সেই ক্যাপ্টেনটির কবরের কাছে শোকবিদ্ধা কোন রমণীর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল না। শেষ পর্যন্ত দেখা হ'ল, তবে সেটা কবরখানার আর একটি অঞ্চলে। কবরখানার সঙ্কীর্ণ একটি পথ বেয়ে দুটি শোকসন্তপ্ত মূর্তি ধীরে-ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল। হ্যাঁ,...এইত সেই মহিলা।

আমাকে দেখে ভদ্রমহিলা একটু লজ্জা পেলেন; চমকেও উঠলেন। আমি অপরিচিতের ভঙ্গীতে তাঁর গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমার দিকে একবার চট করে তাকিয়ে দেখলেন; মনে হল তিনি যেন বলছেন—আমাকে এখন চিনতে চেষ্টা করো না। তুমি আমার সঙ্গে পরে দেখা করো।

তাঁর সঙ্গীটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; বেশ পদস্থ মিলিটারী অফিসার। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে শোকবিধুরা ভদ্রমহিলা। টনকিনের যুদ্ধে নিহত ক্যাপ্টেনের বিধবা ধীরে-ধীরে হেঁটে বাইরের দিকে যাচ্ছেন। আমি তো অবাক, একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। মেয়েটি কি সত্যিকার একটি বেশ্যা? কবরখানায় শোকসন্তপ্ত শিকার পাকড়ানোর জন্যে ও কি এইভাবে ঘুরে বেড়ায়? এরকম কি আরও অনেক রয়েছে? এটা কি ওর পেশা? রাস্তায় ঘাটে প্রেমিকের হাত ধরে যেসব বান্ধবীরা ঘুরে বেড়ায়

সেইরকমই কি ও কবরখানার মধ্যে প্রেমিকের সন্ধান করে? তার এই পরিকল্পনার নতুনত্বকে প্রশংসা না ক'রে আমি পারলাম না।

সেদিন সে কার বিধবা সেজেছিল জানতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম।

আমার কাকা জুলে

My uncle Jules

সাদা দাড়িওয়ালা একটি দরিদ্র বৃদ্ধ আমাদের কাছে ভিক্ষা চাইলে আমার বন্ধু দব্রাঞ্চে তাকে পাঁচটি ফ্রাঁ দিলেন। তাঁর এহেন বদান্যতা দেখে আমি অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন—বৃদ্ধটিকে দেখে আমার একটা গল্প মনে প'ড়ে গেল। সেটা আমি এখনও ভুলতে পারিনি। গল্পটা শোন:

"আমাদের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। কোনরকমে সংসারটা চলত—এই যা। সেইটুকু চালাতেই বাবা একেবারে হিমসিম খেয়ে যেতেন। আমার বোন ছিল দুটি। সাংসারিক এই দুরবস্থার জন্যে মায়ের ভীষণ কষ্ট হোত; আর সেই নিয়ে বাবাকে তিনি যা-তা বলতে ছাড়তেন না। নিজের অপদার্থতায় বাবাও কম কষ্ট পেতেন না। মায়ের তিরস্কার শুনে কপালে হাত দিয়ে এমন করুণভাবে চুপচাপ বসে থাকতেন যে তাঁকে দেখলে আমার খুব কষ্ট হোত। খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ সবদিক থেকেই আমরা সংযত ছিলাম। আমার বোনেরাও তাদের নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরী ক'রে নিত। খাওয়াটাও ছিল আমাদের অত্যন্ত সাধারণ। কোনরকম বিলাসিতা করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না।

তবে প্রতিটি রবিবার আমরা বেশ ভাল পোশাক প'রে জাহাজ ঘাটের দিকে বেড়াতে যেতাম। ফ্রক কোট, টপ হ্যাট, আর দস্তানা পরে বাবা-মায়ের হাত ধরতাম। সেজেগুজে আমার বোনেরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করত। কিন্তু সব সময়েই শেষ মুহূর্তে বাবার কোটের ওপরে একটা দাগ সকলের চোখে পড়ে যেত। তখন সেই দাগ তুলে ফেলার জন্যে একটা হইচই বেঁধে যেত।

তারপরে বেশ গম্ভীরচালে আমরা বেরিয়ে পড়তাম। আমার বোনেরা হাতধরাধরি করে সামনে যেত। তাদের বিয়ের বয়স হয়েছিল। শহরের মধ্যে ভাল সাজে তাদের ঘুরে বেড়ানো উচিৎ। আমি মায়ের হাত ধরে বাবার পাশে-পাশে চলতাম। এই রবিবারের দিনগুলিতে আমার বাবা-মা বেশ ভারিক্কীচালে হাঁটতেন।

প্রতিটি রবিবারে জাহাজ ঘাটে বিদেশ থেকে বড় কোন জাহাজ এসে লাগলে বাবা বলতেন—হঠাৎ জুলে যদি এই জাহাজে এসে পড়ে তাহলে আমরা সবাই অবাক হয়ে যাব—তাই না?

কাকা জুলে প্রথম জীবনে সংসারের অভিশাপ ছিলেন। তখন বলতে গেলে তাঁরই আশায় আমরা দিন গুণছিলাম। সেই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর নাম আমি এত শুনেছিলাম যে আমার মনে হোত দেখা হ'লে তাঁকে চিনে নিতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। অ্যামেরিকা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি আমি জানতাম। বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর সেই জীবনযাত্রায় আমার বাবা-মা কেউ খুশি ছিলেন না। অন্য কথায়, তিনি সংসারের কিছু অর্থ নষ্ট করেছিলেন। আমাদের মত দুঃস্থ সংসারে এটি অমার্জনীয় অপরাধ; যে-সংসারে পাই-পয়সাটি পর্যন্ত হিসাব ক'রে খরচ করতে হয় সেখানে টাকা, তা সে যত কমই হোক, ওড়ানো একটা অমার্জনীয় অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়।

যাই হোক, বাবা যে অর্থটি নেওয়ার জন্যে চুপ ক'রে বসেছিলেন তার কিছুটা কাকা অনর্থক খরচ ক'রে অন্যায় করেছিলেন। সে যুগে এদেশে একটা রীতি প্রচলিত ছিল। সেটা হল, দেশে কেউ কিছু রোজগার করতে না পারলে তাকে অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হোত। সে দেশে নাকি পথে প্রান্তরে গাদা-গাদা সোনারকুচি ছড়িয়ে রয়েছে। কেবল কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা; কাকাকেও সেইরকম একটা মালবাহী জাহাজে চাপিয়ে নিউ ইয়র্কের দিকে চালান ক'রে দেওয়া হল।

অ্যামেরিকায় পৌঁছিয়ে কাকা কী যেন একটা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তারপরেই তিনি একটা চিঠি দিলেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখলেন—তাঁর কিছু রোজগারপাতি হচ্ছে; এবং তিনি আশা করেন আর কিছুদিনের মধ্যেই বাবার যে অর্থ তিনি নষ্ট করেছেন সেটা পুষিয়ে দিতে পারবেন। চিঠি পেয়ে বাবা-মার আনন্দ আর ধরে না। এতদিন যাঁর নাম তাঁরা ভুলেও উচ্চারণ করতেন না এখন সেই মানুষটাই তাঁদের কাছে বংশের সুযোগ্য সন্তান বলে মনে হল। তাঁর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। একদিন একটি জাহাজের ক্যাপটেনের কাছে শোনা গেল কাকা সেখানে বেশ বড় একটা দোকান ভাড়া নিয়ে ভালই ব্যবসা করছেন।

বছরদুই পরে কাকার দ্বিতীয় চিঠি এল। তিনি লিখলেন—প্রিয় ফিলিপ, আমার স্বাস্থ্যের জন্যে চিন্তা করো না। স্বাস্থ্য আমার ভালই রয়েছে। ব্যবসাও ভাল। আমি আগামীকালই অনেক দিনের জন্যে দক্ষিণ অ্যামেরিকায় যাচ্ছি। সেখানে আমাকে কয়েক বছর থাকতে হ'তে পারে। এর ভেতরে যদি কোন চিঠি নাও পাও তাহলেও ভেব না। অনেক টাকা নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে আমি বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছি। তারপরে আমরা বেশ আরামেই থাকতে পারব...

এই চিঠিটাই আমাদের কাছে মহাপুরুষদের বাণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এই চিঠিটা সবাইকে আমরা দেখিয়ে বেড়াতাম। পরের দশটি বছর কাকার কাছ থেকে কোন সংবাদই আর এল না। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই বাবার আশা বাড়তে লাগল। আর আমার মত প্রায় বলতে শুরু করলেন—জুলে বাড়ি ফিরে এলে আমাদের আর দেখে কে? এই মানুষটাই জানে জীবনে কী ক'রে উন্নতি করতে হয়।

সেই কাকার চিঠির ওপরে নির্ভর ক'রে কত পরিকল্পনাই আমরা করলাম। ইগোভিলার কাছাকাছি একটা জমি কেনার ব্যবস্থাও হ'ল। মনে হ'ল, একটা জমি কেনার জন্যে বাবা কথাবার্তাও শুরু করেছিলেন কিছুটা।

বোনেদের বয়স আঠাশ আর ছাব্বিশে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও পর্যন্ত তাদের বিয়ে হয়নি। এরই জন্যে আমরা কিছু অস্বস্তি ভোগ করছিলাম। শেষ পর্যন্ত ছোট বোনের একটি পাত্র জুটলো। পাত্র একটি কেরাণী, তবে দেখতে ভালই। আমার সন্দেহ হচ্ছে কাকার সেই চিঠিটাই বার-বার পড়ে সেও তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত এই বিয়েতে মত দিয়েছিল। ঠিক হ'ল, বিয়ের পরে সবাই আমরা একসঙ্গে জারসিতে বেড়াতে যাব। জায়গাটা বেশী দূরে নয়—দরিদ্রদের আমোদ-প্রমোদের উপযুক্ত। যদিও সামান্য, তবু তো কিছুটা সমুদ্রযাত্রা হবে। তাছাড়া বন্দরটা ব্রিটিশদের হওয়ার ফলে, বিদেশও বটে—যদিও সমুদ্র-পথে জায়গাটি আমাদের দেশ থেকে মাত্র দু' ঘণ্টার পথ।

তারপরে একদিন আমরা সত্যি-সত্যি জাহাজে চড়লাম ; এবং যথাসময়ে জাহাজ ছাড়লো। জেটি ছেড়ে সমুদ্রের বুকে ভাসতে লাগল জাহাজটা। পরিচ্ছন্ন ফ্রক কোট পরে বাবা ডেকের ওপরে পায়চারি করতে লাগলেন। ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন দুটি কেতা-দুরস্ত মহিলাকে দুটি ভদ্রলোক মহাসমাদরে অয়েস্টার খাওয়াচ্ছেন। আর একটি ময়লা ছেঁড়া পোশাক পরা নাবিক ছুরি দিয়ে ওয়েস্টারের খোলাটা ছাড়িয়ে ভদ্রলোকদের এগিয়ে দিচ্ছে। ভদ্রমহিলারা অত্যন্ত সাবধানে রসটি শুষে নিয়ে খোলাগুলি সমুদ্রে ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

সেই দেখে হঠাৎ আমার বাবার ইচ্ছে হ'ল সমুদ্রের ওপরে আমাদেরও তিনি অয়েস্টার খাওয়াবেন। ব্যাপারটাকে তিনি বেশ রুচিশীল ব'লে মনে করলেন।

প্রস্তাবটা শুনেই খরচের ভয়ে মা আমতা-আমতা করতে লাগলেন, কিন্তু আমার বোন দুটি রাজি হওয়ার ফলে তিনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—ও জিনিস বাপু আমার পেটে সইবে না। তুমি বরং ওদের জন্যে কিছু কিনে দাও। বেশী নয়—বেশী খেলে ওদের পেট খারাপ হবে। আর জোশেফ [অর্থাৎ আমি], তুমি ওসব খেয়ো না, ওসব খেলে ছেলেরা ব'য়ে যায়।

সুতরাং আমার আর যাওয়া হ'ল না। মুখটা চুণ ক'রে আমি মায়ের কাছে রয়ে গেলাম। দেখলাম—দুই কন্যা আর জামাতাকে নিয়ে বাবা বুক ফুলিয়ে গটগট ক'রে সেই বুড়ো নাবিকটির কাছে হাজির হ'য়ে জামা কাপড় নষ্ট না ক'রে কি করে ওয়েস্টার খেতে হয় তাই সবাইকে বোঝাতে লাগলেন ; এবং সেই পদ্ধতিটা বোঝাতে গিয়ে ওয়েস্টারের রস নিজের জামার ওপরেই ঢেলে দিলেন।

কিন্তু তারপরেই বাবার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দু'পা পিছিয়ে এসে তিনি সেই নাবিকটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ; তারপরে আমাদের কাছে এসে বললেন—অবাক কাণ্ড! লোকটাকে দেখতে অবিকল আমাদের জুলের মত।

বলতে-বলতে তাঁর মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠল।

হতভম্ব হ'য়ে মা বললেন—কোন্ জুলে ?

কে আবার ? আমার ভাই...আমি যদি না জানতাম সে অ্যামেরিকাতে ভালই রোজগার করছে তাহলে আমি নিশ্চয় বলতে পারতাম ও-ই সেই জুলে।

তুমি একটি বদ্ধ পাগল। তুমি নিশ্চয় জান এ সে নয়, তবু পাগলের মত বকছো।

বেশ তো। তুমি নিজেই একবার দেখে এস।

মা তাঁর মেয়েদের কাছে উঠে গেলেন। আমিও সেই নাবিকটিকে ভাল ক'রে দেখলাম। একটা বুড়ো মানুষ, ময়লা পোশাক তার গায়ে, বার্দ্ধক্যের ছাপ তার সারা অঙ্গে। সে একমনে তার কাজ করে যাচ্ছে। খদ্দেরদের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে না।

মা ফিরে এলেন। তাঁর হাত-পা তখন কাঁপছে; বললেন—ঠিকই বলেছ, জুলেই বটে। তবু ক্যাপ্টেনকে একবার জিজ্ঞাসা করে এস। সাবধান, আবোলতাবোল বলো না। ওই হতভাগাটাকে আর আমরা ঘরে ডেকে নেব না।

বাবা ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করলেন; একথা সেকথার পরে জিজ্ঞাসা করলেন নাবিকটির কথা। ক্যাপ্টেন বিরক্ত হ'য়ে বললেন—ও একটা ফরাসী বাউণ্ডুলে। গত বছর ওকে আমি অ্যামেরিকায় দেখতে পেয়ে এদেশে নিয়ে এসেছি। শুনলাম লি হ্যাভারে [আমাদের বাড়ি যেখানে] ওর আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। কিন্তু ও বাড়ি ফিরে যেতে চায় না; কারণ ও তাদের কাছে টাকা ধার করেছে। ওর নামটা যেন...কী...জুলে দারমঁচি ওইরকমই কী একটা হবে। একদিন ওর অবস্থা ভালই ছিল...কিন্তু বর্তমানে ওর অবস্থাটা কী হয়েছে তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন।...

বিবর্ণমুখে কাঁপতে-কাঁপতে বিড়বিড় করতে-করতে ফিরে এলেন বাবা; তারপরে বেঞ্চের ওপরে ধপাস ক'রে বসে পড়ে বললেন—এ সেই...সে-ই। আর কেউ নয়।

তারপরে করুণভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কী করি বলত ? হায়, হায়...

মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন—বাচ্চাদের সরিয়ে আনতে হবে ওখান থেকে। জোশেফই ওদের ডেকে আনুক। সাবধান, এ-বিষয়ে জামাই যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে।

বাবা কাতরে উঠলেন—কী বিপদ, কী বিপদ...

মা বলে উঠলেন—আমি চিরদিনই জানতাম চোরটা কোনদিনই কোন কাজে আসবে না। হাজার হোক, ওতো তোমার বংশেরই ছেলে। ওর কাছ থেকে আর আশা কী। জোশেফ ওয়েস্টারের দাম মিটিয়ে দিয়ে আসুক। চল, আমরা সবাই জাহাজের অন্য দিকে চলে যাই। লোকটা যেন আমাদের কাছে ঘেঁষতে না পারে।

দাম মেটানোর জন্যে আমার হাতে পাঁচটা ফ্রাঁ দিয়ে মা সরে গেলেন।

আমি সেই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কত দাম হয়েছে, মঁসিয়ে ?

তাঁকে আমার কাকা বলেই ডাকতে ইচ্ছে হয়েছিল।

বৃদ্ধটি বললেন—আড়াই ফ্রাঁ !

আমি পাঁচটি ফ্রাঁ তাঁর হাতে দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। শোকে দুঃখে হতাশায় বৃদ্ধের মুখটা করুণ হ'য়ে উঠেছে। বার বার আমার মনে হল—এই আমার কাকা, আমার বাবার ভাই।

বৃদ্ধ দামটা কেটে নিয়ে বাকিটা আমাকে ফেরৎ দিলেন। বখশিস হিসাবে আমি দশটি সো তাঁর হাতে দিতেই তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু এর জন্যে মা আর বোনেদের কাছে আমাকে যথেষ্ট কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল।

পাছে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে যায়—এই ভয়ে আমরা অন্য জাহাজে ক'রে ফিরলাম।

তারপর থেকে বাবার সেই ভাই-এর সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

তাই মাঝে-মাঝে কোন বুড়ো ভিখারীকে দেখলেই আমি পাঁচটা ফ্রাঁই দেই।

আঁদ্রের কী হল

The matter with Andre

পার্কের দিকে মুখ ক'রে নোটারীর বাড়িটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির পেছনে বেশ সুন্দর বাগান—অনেকটা জায়গা জুড়ে এর পরিধি। বাগানের শেষে একটা দেওয়াল; তারপরেই পরিত্যক্ত নির্জন একটা রাস্তা। বাগানের এই নির্জন অংশেই ম্যাত্রি মরুর স্ত্রী সর্বপ্রথম ক্যাপটেন সোমারিভকে প্রেম নিবেদন করলেন। ক্যাপটেন বেশ কিছুদিন ধরেই ভদ্রমহিলার করুণা ভিক্ষা করছিলেন।

ভদ্রমহিলার স্বামী এক সপ্তাহের জন্যে প্যারিসে গিয়েছিলেন। সুতরাং এক সপ্তাহের জন্যে তিনি মুক্ত। ভদ্রমহিলা নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে করতেন। স্বামীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর ব্যবসা। সেই কাজেই তিনি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। ফলে, স্ত্রীর ওপরে খুব বেশী একটা নজর দিতে পারতেন না। ক্যাপটেনও তাঁকে মিষ্টি কথা ব'লে, আর অনুনয় ক'রে ক'রে তাঁকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে ফেলেছিলেন। ফলে তিনিও ক্যাপটেনের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে ফেলেছিলেন। ভবিষ্যতে আরও কিছু দেবেন কিনা সেবিষয়ে কোন কিছু চিন্তা করারও অবসর পাননি।

বেশ কিছুদিন ধরে কাব্যিক প্রেম, হস্তমর্দন, দরজার পেছন থেকে চুরি-করা কিছু চুম্বনের পরে ক্যাপটেন ঘোষণা করলেন যে স্বামীর অনুপস্থিতির সময় ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গে সত্যি-সত্যিই বাগানের অন্ধকারে যদি একদিন নিবিড়ভাবে না মেশেন তাহলে তিনি অনতিবিলম্বে বদলি হওয়ার জন্যে দরখাস্ত করবেন।

কী আর করেন ভদ্রমহিলা! প্রেমিককে 'না' বলে ফিরিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা। তাই একদিন তিনি প্রেমিকের সঙ্গে বাগানে গাছের তলায় মিলিত হ'তে রাজি হলেন।

সেদিন তিনি বাগানের দেওয়ালের ধারে সন্ধের অন্ধকারে প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। খুটখাট শব্দ হ'লেই তাঁর বুকটা ধড়ফড় ক'রে ওঠে। ভয়ে তিনি মাঝে-মাঝে বেশ কুঁকড়ে উঠছিলেন, এমন সময় মনে হ'ল কে যেন পাঁচিলের ওপরে উঠে ধপাস করে নীচে লাফিয়ে পড়ল। চমকে উঠলেন তিনি। যদি ক্যাপটেন না হ'য়ে চোর-টোর কেউ হয়? এমন সময় ক্যাপটেনের স্বর শুনতে পেলেন তিনি—মিথিলডি?

ও তুমি! আমি ভেবেছিলাম...

তারপরেই তারা দীর্ঘ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে ঠোঁটের ওপরে ঠোঁট টিপে রইলেন দু'জনে। এমন সময় হঠাৎ ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল; তারপরেই বড়-বড় ফোঁটা।

ক্যাপটেন বললেন—মিথিলডি, প্রিয়তমে—চল, এবারে আমরা ঘরে যাই। এখন অনেক রাত হয়েছে, ভয়ের কোন কারণ নেই আমাদের।

না, না। যদি কেউ দেখে ফেলে!

জোর ক'রে জড়িয়ে ধরে ক্যাপটেন বললেন—তোমার চাকররা থাকে তেতলায়। তুমি থাক দোতলায়। কেউ জানতে পারবে না। তাছাড়া, তোমাকে আমি সর্বশরীর দিয়ে ভালবাসি—মানে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

এই বলে ক্যাপটেন তাঁকে চুমোতে-চুমোতে ভরিয়ে দিলেন। তারপরে তাঁকে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে দোতলায় হাজির হলেন। ঘরে ঢোকামাত্র, মিথিলডি দরজায় খিল এঁটে দিলেন; তারপরে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় তিনি আর্মচেয়ারে ঢলে পড়লেন। ক্যাপটেন তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁকে বিবস্ত্র করতে শুরু করলেন।

মিথিলডি বাধা দিয়ে বললেন—না, না। আমার সতীত্ব নষ্ট করো না। এরপরে তোমাকে হয়ত আমি ঘৃণা করব। তাছাড়া, কাজটা বড় কুৎসিত। দেহ নষ্ট না ক'রে কি আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারিনা?

কিন্তু ক্যাপটেনকে বোঝানো গেল না। তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে প্রেমিকাকে বিবস্ত্রা করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে মিথিলডি বুঝতে পারলেন তিনি একেবারে বিবস্ত্রা হয়ে পড়েছেন, লজ্জায় দৌড়ে তিনি বিছানার মধ্যে আত্মগোপন করলেন। ক্যাপটেনও বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তার আগেই নেহাৎ অসাবধানবশতঃই তাঁর খাপের তলোয়ারটা মেঝের ওপরে বেশ জোরে শব্দ করে ঠুকে গেল।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা তীক্ষ্ণ কচি শিশুর চিৎকার শুরু হল।

মিথিলডি বললেন—আঁদ্রে জেগে উঠেছে। ও আর কিছুতেই ঘুমোবে না।

আঁদ্রের বয়স পনের মাস। তাঁর ঘরের লাগোয়া একটি ঘরেই সে ঘুমোত।

কামাসক্ত এবং উন্মত্ত ক্যাপটেন বললেন—তাতে কী যায় আসে। আমি তোমাকে ভালবাসি, মিথিলডি—তুমি আমার।

আতংকে মিথিলডি বললেন—উঁহু। তার কান্নার শব্দে এখনই নার্স জেগে উঠবে। তখন একটা কেলেঙ্কারী বেধে যাবে। তাকে থামানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে এ ঘরে নিয়ে এসে ঘুম পাড়ানো। দাঁড়াও, সেই চেষ্টাই করি।

ছেলেটার গলা একখানা বটে। ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে ক্যাপটেন উঠে বসলেন। মিথিলডি দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। চুপ ক'রে গেল ছেলেটা।

তারপর মিথিলডি খুব সাবধানে পাশের ঘরে ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ফিরে এলেন। ক্যাপটেন তাঁর আসার অপেক্ষায় বসেছিলেন। মিথিলডি ঘরে ঢোকামাত্র দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বিছানার ওপরে শুইয়ে দিলেন। প্রেমাভিনয় যখন চরমে উঠেছে এবং দু'জনেরই ভাষা যখন রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে ঠিক সেই চরম মুহূর্তে হতচ্ছাড়া বাচ্চাটা আবার চিৎকার করে উঠল।

ক্যাপটেন তো রেগে কাঁই। হতচ্ছাড়াটা কি থামবে না।

মিথিলডির মনে হল দোতলায় কে যেন হাঁটছে। আয়া আসছে ভেবে তিনি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বাচ্চাটাকে নিয়ে এলেন; তারপরে তাকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেওয়ামাত্র সে চুপ করে গেল। পর-পর তিনবার সে একই কাণ্ড করল; বেচারা ক্যাপটেন ভোর হওয়ার একঘণ্টা আগে অভিসম্পাৎ দিতে-দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাঁকে শান্ত করার জন্যে মিথিলডি সেদিন রাত্রিতে তাঁকে আবার আসার জন্যে অনুরোধ জানালেন। অর্থাৎ এলে সুদশুদ্ধ পুষিয়ে দেবেন তিনি।

পরের রাত্রিতেও ক্যাপটেন সাহেব যথারীতি এলেন। সেদিন তিনি একটা হেস্তনেস্ত করতে বদ্ধপরিকর। তলোয়ারটাকে তিনি অত্যন্ত সাবধানে খুলে রাখলেন; চোরের মত সন্তর্পণে খুলে রাখলেন জুতো জোড়া; মিথিলডির সঙ্গে কথা বললেন ফিসফিস ক'রে। তারপরে প্রণয়িনীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করতে যাবেন ঠিক এমনি সময়ে পাশের ঘরে বাচ্চাটা চিৎকার করে উঠল। আঁদ্রে জেগে উঠেছে; শেয়ালের মত হুক্কাহুয়া জুড়ে দিল বাচ্চাটা। ক্যাপটেনকে জোর ক'রে সরিয়ে দিয়ে মিথিলডি পাশের ঘরে দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে এঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলেন। রাগে গর্‌গর্ করতে-করতে ক্যাপটেন শুয়েই রইলেন; উঠলেন না। ধীরে-ধীরে চুপিসারে তিনি বাচ্চাটার গায়ে জোরে চিমটি কাটলেন। বাচ্চাটা চিৎকার করে উঠল। তাতেও থামলেন না ক্যাপটেন। আবার জোরে চিমটি কাটলেন। যন্ত্রণায় আর চিৎকারে বাচ্চাটা ছটফট করতে লাগল। ক্যাপটেন বারকতক এইভাবে রাম চিমটি কেটে বললেন—এবারে ওকে নিয়ে শুইয়ে দিয়ে এস। ও হয়ত এবার ঘুমিয়ে পড়বে।

তাই হল। বাচ্চাটাকে অন্য ঘরে শুইয়ে দেওয়ামাত্র মাঝে-মাঝে একটু-একটু ফুঁপিয়ে সে চুপ ক'রে গেল। রাত্রির বাকি অংশটা ক্যাপটেনের বেশ আরামেই কাটলো। মিথিলডির কাছ থেকে তিনি যা চেয়েছিলেন তাই পেয়ে বিদায় হলেন। পর-পর ক'টা দিনই সেই একই ব্যাপার ঘটলো। যতবার বাচ্চাটা চেঁচালো ততবারই ক্যাপটেন বাচ্চাটাকে চিমটির পর চিমটি কেটে গেলেন। বাচ্চাকে ফিরিয়ে নিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিলেই কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ত। দিনচারেক পরে তার মায়ের ঘরে আসার জন্যে আর বাচ্চাটা কাঁদতো না। ক্যাপটেন বিনা বাধায় প্রিয়তমার দেহ-সুধা পান করতে লাগলেন।

শনিবার রাত্রিতে নোটারী তাঁর গার্হস্থ্যধর্মে ফিরে এলেন; তারপরে রাত্রিতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য সম্পাদনের পরে তিনি বললেন—অবাক কাণ্ড! আজ তো আঁদ্রে কাঁদছে না। ওকে নিয়ে এস, মিথিলডি। আমাদের মাঝখানে ওকে শুইয়ে দাও।

মিথিলডি বাচ্চাটাকে সেই ঘরে এনে বিছানার ওপরে শুইয়ে দেওয়ামাত্র বাচ্চা ভয়ে হিম হ'য়ে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল। নোটারী বাচ্চাটির এবম্বিধ ব্যবহারে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপারটা কী বলত?

মিথিলডি বললেন—কী জানি। তুমি যে ক'দিন ছিলে না সে ক'দিন আমি কিছুতেই এই বিছানাতে ওকে শোওয়াতে পারিনি।

পরের দিন সকালে নোটারী বাচ্চাটার ঘরে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন। বাচ্চাটা খিলখিল ক'রে হাসতে লাগল। নোটারী খুশি হয়ে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। হঠাৎ বিছানার দিকে এগোতেই বাচ্চাটা তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল; বাবার কোলের ওপরে সে ছটফট করতে লাগল। মনে হল, কেউ যেন তাকে মেরেছে।

নোটারী বলল—নিশ্চয় ওর কিছু হয়েছে।

এই বলেই তিনি বাচ্চাটার জামাটা টানলেন; টেনেই অবাক হ'য়ে দেখলেন বাচ্চাটার দাবনা, কোমর, পিঠের সর্বত্র চাকা-চাকা নীল দাগে ভরে গিয়েছে।

—মিথিলডি, দেখ-দেখ—কী ভয়ঙ্কর।

ভয় পেয়ে মিথিলডি দৌড়ে এলেন। তাইত, বড় বড় চাকা-চাকা দাগে বাচ্চাটার নিম্নাংশ একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবাক হ'য়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে কোনকিছু চিন্তা না করেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন—আচ্ছা জানোয়ার বটে।

স্বামী অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী বললে? কে জানোয়ার?

হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন মিথিলডি; আমতা-আমতা ক'রে বললেন—না, মানে বলছিলাম—ও কিছু নয়। বলছিলাম ওর কান্না থামানোর জন্যে নিশ্চয় আয়াই ওকে চিমটি কেটেছে। আহা, বেচারাকে একেবারে জখম করে দিয়েছে।

আয়াকে পাকড়ে এনে নোটারী তো এই মারেন, সেই মারেন। তবু তার ঔদ্ধত্যটা একবার দেখুন। নিজের দোষ সে কিছুতেই স্বীকার করল না। টাউন কাউনসিলে নোটারী তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে এলেন; ফলে, বেচারীর চাকরি পাওয়া একেবারে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল।

অজ্ঞাত রমণী

The unknown woman

আমরা বসে-বসে নানারকম গল্প করছিলাম। জীবনে কে কী লাভ করেছিল সেই সম্পর্কে ঠিক হল সবাই এক-একটা কাহিনী বলবে। রজার দে অ্যানেটি বললেন, প্রেম করতে গেলে সমুদ্রতীরই সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গা।

এতক্ষণ গোঁট্রাঁ কোন কথা বলেনি। সে বলল—প্যারিসই এখনও পর্যন্ত নারী-শিকারের সবচেয়ে সুখের জায়গা। যেখানে কিছুই আমরা আশা করতে পারি নি সেখানে বই-এর মত নারীদের মূল্যও আমরা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দরী রমণী প্যারিসেই পাওয়া যায়।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলল—হায় ভগবান, সত্যিই কী সুন্দরী এরা! যে-কোন বসন্তের সকালে রাস্তায় বেরিয়ে যাও। টাটকা ফুলের মত বাড়ির আশপাশে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফুটপাত থেকে থোকা-থোকা তাজা ভায়লেট ফুলের গন্ধ আমাদের নাকে ভেসে আসে; বসন্তের সকালে সারা শহর রমরমিয়ে ওঠে। হালকা, পাতলা ফ্রকের ভেতর থেকে যুবতীদের দেহসৌষ্ঠভ কী সুন্দরভাবেই না বেরিয়ে আসে! ঘুরতে-ঘুরতে ছোঁক-ছোঁক করতে-করতে এগিয়ে যাও। ঝাঁক বেঁধে সুন্দরী যুবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রকম সকালগুলিই সত্যিকার স্বর্গীয়।

দূর থেকে দেখতে পেলে সে আসছে। একশ' পা দূর থেকে তার সুন্দর চেহারাটা তোমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার টুপির ওপরে একটা ফুল, তার মাথা সঞ্চালনের প্রক্রিয়া, তাঁর বিশেষ অঙ্গভঙ্গী দেখেই তুমি তাকে ঠিক চিনে নিলে। তুমি মনে-মনে বলে উঠলে—দাঁড়িয়ে পড়। সামনে চোখ ফেরাও। তারপরে চোখ দিয়ে তাকে গিলতে-গিলতে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাও।

তন্বীটি কি কোন জিনিস কিনতে দোকানে যাচ্ছে? অথবা, যুবতীটি কি গির্জা থেকে ফিরে আসছে, বা যাচ্ছে তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে? যেখানে খুশি যাক, স্বচ্ছ কাঁচুলির ভেতর দিয়ে তার উঁচু কুচ দুটি দেখা যাচ্ছে পরিচ্ছন্নভাবে। কেবল একটা আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়ার অথবা ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরার অপেক্ষা মাত্র, সে কি ভীরু অথবা সাহসিনী; তার মুখটা কি কালো, না সুন্দর? চুলোয় যাক সে সব কথা। তোমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোমার সারা শরীরে একটা শিহরণ জেগে ওঠে; আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি—এই রকম অন্তত এককুড়ি যুবতীর সান্নিধ্যে আমি এসেছি, আর তাদের কারও একজনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা জন্মালে আমি তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে যেতাম।

কিন্তু মজাটা ওইখানেই। যাদের আমরা পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যাই, তাদের আমরা চিনিনা। তা কি তোমরা লক্ষ্য করেছ? ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত, তাই না?

কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় চকিতের মত। রাস্তায় তাদের দেখে আমি তো তাই রাগে গর্‌গর্‌ ক'রে উঠি। তারা কে? কোথায় থাকে? কোথায় তাদের সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে? প্রবাদই রয়েছে, আমরা যেন সব সময় সুখের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমি এমন সব অপরূপ নারীদের সান্নিধ্যে এসেছি যাদের যে-কোন একজনই তার দেহের সুবাস দিয়ে আমাকে চিরকাল লিনেট পাখির মত আটকে রাখতে পারত।

এতক্ষণ রজার হাসতে-হাসতে তার কথা শুনছিল; এবারে সে বলল—তুমি যা বলবে সব আমি জানি। আমার জীবনে একবার কী ঘটেছিল শোন, বছর পাঁচেক আগের কথা। সেই প্রথম জীবনে আমি এমন একটি দীর্ঘাঙ্গিনী স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে দেখলাম যে আমাকে বেশ মুগ্ধ ক'রে ফেলেছিল। ঠিক মুগ্ধ না ব'লে 'অভিভূত' বলতে পার। তার ঠোঁটের ওপরে গোঁফের আভাস দেখে আমার মন স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। টেবিলের ওপরে একগোছা ফুল দেখলে মানুষ যেমন তার প্রিয় অরণ্যের স্বপ্নে মসগুল হ'য়ে ওঠে এও যেন সেই রকম। নিখুঁত গড়ন মেয়েটির; শক্ত গোল দুটি কুচ; তারা যেন বুক ফুলিয়ে বাজি রেখে মানুষকে প্রলুব্ধ করছে। মেয়েটির দুটি চোখ যেন ঠিক চোখ নয়; মনে হচ্ছে, মাথার পাশে ছায়াচ্ছন্ন দুটি গভীর খাদ। তার ভেতরে মানুষ যেন সোজা তলিয়ে যেতে পারে।

দেখে মনে হয়েছিল সে জু-রমণী; আমি তার পিছু নিলাম; আমার মত আরও অনেকে ঘুরেফিরে তাকে দেখল। তার চলার ধরনে বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল। কিছুটা গিয়ে সে একটা গাড়ি নিল। আমি সেইখানেই স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

পরের তিনটি সপ্তাহ তাকে আমি মনে রেখেছিলাম। তারপরে ভুলে গেলাম তাকে।

মাস ছয়েক পরে রাস্তায় আবার একদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হল। তাকে দেখেই মনের ভেতরে আবার তোলপাড় করে উঠল। মনে হল, আমার এমন একটি প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা হয়েছে যাকে আমি উন্মত্তের মত ভালবাসতাম। তার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার গা ঘেঁষেই সে পেরিয়ে গেল। মনে হল আমি গনগনে একটা আগুনের চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সে চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আমার মুখে চাবুক কসিয়ে দিয়ে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম না। ভয় হল, অনুসরণ করলে হয়ত আমি কোন অন্যায় করে ফেলব।

বারবার তাকে আমি স্বপ্নে দেখতে লাগলাম। এইরকম ভীমরতিগুলি যে কী বস্তু তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ।

প্রায় একবছর পরে আবার একদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হল। আলাপ করার জন্যে তার পিছু নিলাম আমি। তার জন্যে আমি কতটা উন্মত্ত হয়েছি সেই কথাটাই আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। সে আমার দিকে চেয়ে দেখল; দেখলাম সে একটি বাড়িতে ঢুকে গেল। দরজার কাছে দু'টি ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। সে বেরিয়ে

এল না। শেষকালে আমি দারোয়ানকে তার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে আমার কথা বুঝতে পারল না। তারপরে বলল—সম্ভবত, বাইরে থেকে কেউ কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আট মাস পরে আবার তার সঙ্গে দেখা। তারপরে একদিন জানুয়ারী মাসে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমি প্রায় দৌড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম এমন সময় একটা মোড়ের মাথায় একটি মহিলাকে আমি এতজোরে ধাক্কা দিলাম যে তার হাত থেকে একটা পার্শেল ছিটকে পড়ে গেল। ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়েই দেখি— এ যে সেই মেয়েটি!

একমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হতভম্বভাবটা কাটিয়ে উঠে পার্শেলটা তাকে ফিরিয়ে দিয়েই হঠাৎ বলে উঠলাম—আপনার গায়ের ওপরে এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আমি যেমন দুঃখিত হয়েছি তেমনি আনন্দও পেয়েছি, মাদাম। আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে দু'টি বছর ধরে আপনাকে আমি লক্ষ্য করেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে আমি পাগল হ'য়ে উঠেছি? কোথায় যে আপনি থাকেন তা আজও আমি আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি। ক্ষমা করবেন; আপনার সঙ্গে আলাপ করার আমার যে এত ইচ্ছে হয়েছে তার একমাত্র কারণ আপনার সঙ্গে কথা বলার অধিকার যাদের রয়েছে আমি তাদের দলভুক্ত হ'তে চাই। এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনি আমাকে জানেন না। আমি হচ্ছি—ব্যারণ রজার দে অ্যানেটি। আমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলে আপনি জানতে পারবেন আমার মত মানুষকে আপনি স্বচ্ছন্দে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করতে পারেন। তা যদি না করেন তাহলে আমি খুব দুঃখ পাব।

তিনি আমার কথা ভাল ক'রে শুনলেন; তারপরে সেই অদ্ভুত জ্যোতিহীন দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঠিকানা দিন। আমি একদিন আপনার বাড়ি যাব।

অবাক হ'য়ে আমি তাঁকে আমার কার্ডটা দিলাম। তারপরে সাহস সংগ্রহ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—কবে দেখা হ'তে পারে?

একটু ইতস্তত করলেন তিনি। মনে হ'ল, দুরূহ হিসাব-নিকাশ করতে ব্যস্ত আছেন তিনি। তারপরে বললেন—রবিবার সকালে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো?

নিশ্চয় না, নিশ্চয় না।

সারা সপ্তাহ আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম—মেয়েটি কে, কোথায় থাকে। তাকে কি আমার টাকা দেওয়া উচিৎ। উচিৎ হ'লে কত? তারপরে আমি একটা হীরের গয়না কিনে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলাম। সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়ে রবিবার সকালে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দশটার সময় তিনি এলেন। শান্ত ভাব; মনের মধ্যে কোথাও কোন উত্তেজনা নেই। মনে হল আমরা যেন দু'টি পুরনো বন্ধু। আমি তাঁকে বসতে দিলাম; তাঁর টুপিটা খুলে দিলাম। তারপরে কিছুটা সঙ্কোচ ক'রে আমি তাঁকে টিপতে লাগলাম। কারণ নষ্ট করার মত সময় তখন আমার ছিল না।

তিনিও এর বেশী আর কিছু চাননি। কুড়িটা কথাও আমাদের মধ্যে হয়নি, আমি তাঁর পোশাক খুলতে শুরু করলাম। তিনি নিজেই সে কাজে আমাকে সাহায্য করলেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমি কিছুতেই তাঁকে উলঙ্গ করতে পারতাম না।

বন্ধুগণ, উলঙ্গ হওয়ার সময় নারীরা যেরকম নম্রতা আর লজ্জার সঙ্গে একটির পর একটি পরিধেয় উন্মোচন ক'রে ঝরা পাতার মত খসখস করে মেঝের ওপরে ফেলে দেয় তখন কি দূর থেকে তাদের তোমরা লক্ষ্য করেছ? তারচেয়ে চমকপ্রদ মুহূর্ত কি মানুষের জীবনে আসে? নারীর সেই নগ্ন দেহের মধ্যে যে মাদকতা লুকিয়ে রয়েছে তাকে কি তোমরা কেউ মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছ?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম তাঁর কাঁধের খাঁচে একটা কালো দাগ রয়েছে। দাগটা কিসের সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ঠোঁটের ওপরে গোঁফের রেখা দেখেই আমার তা বোঝা উচিৎ ছিল। মনে হ'ল আমি সেই সহস্র এবং এক রজনীর আরব্যোপন্যাসের মায়াবিনীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এ যেন সেই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতিনী যাদুকরী যারা মানুষকে ধ্বংসের অতলান্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করে। রাজা সলোমনের কথা মনে পড়ে গেল আমার। সেবার রাণীর পায়ে খুর আছে কিনা দেখার জন্যে এই সলোমনই একদিন তাঁকে আয়নার ওপর দিয়ে হাঁটিয়েছিলেন।

এবং...তারপরে যখন প্রেমের কথা বলার সময় হল হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোচ্ছে না। অথবা, যে স্বরটা বেরোচ্ছে সেটা আমার নয়, একটা খোজার। আমার স্বর শুনে তিনি খুব বিরক্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বললেন—এর জন্যে আমাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া উচিৎ হয়নি আপনার।

আমি আংটিটা নেওয়ার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান ক'রে দৃঢ়ভাবে বললেন—আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?

এই বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

আমার দুঃসাহসিক কাহিনীর এখানেই শেষ।

কিন্তু আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে কোনদিনই তাঁকে আমি ভুলতে পারিনি। কে ওই মেয়েটি? এখনও পর্যন্ত আমি তা জানিনা। তারপরেও তাঁর সঙ্গে আমার বারদুই দেখা হয়েছে। আমি অভিবাদন জানিয়েছি। তিনি তা গ্রহণ করেননি। আমাকে যে তিনি চেনেন সেটাও তাঁর হাবভাবে প্রকাশ পায়নি। ওই মেয়েটি কে? সম্ভবতঃ, এশিয়াবাসী কেউ। খুব সম্ভবতঃ প্রাচ্যদেশীয় কোন জু-রমণী। হ্যাঁ তাই। সেদিক থেকে আমি নিশ্চিত। কিন্তু কেন? কেন বলত? তা আমি জানিনা।

একটি ঠাকুমার উপদেশ

A grandmother's advice

বনের মধ্যে উঁচু জায়গায় পুরনো একটা বাংলো। চারপাশে বড়-বড় গাছ। সামনের বড় পার্কটি অরণ্যের কিনারা পর্যন্ত প্রসারিত। সেই প্রাসাদের সামনে একটু দূরে বিরাট একটি পাথরের জলাধার। তার ভেতরে মার্বেল পাথরের পরীরা স্নান করছে। অনেকগুলি ছোট-ছোট জলাধার পর-পর একেবারে পাহাড়ের নীচে পর্যন্ত নেমে গিয়েছে; আর ঝরণার জল জলাধারগুলির ওপর দিয়ে উপচে পড়ছে। বাংলো আর তার চারপাশের সমস্ত অঞ্চলটিতে প্রাচীনত্বের সব চিহ্ন বর্তমান। প্রাচীন রীতি-নীতি, বিবর্ণ ঐতিহ্য আর প্রায়-মুছে-যাওয়া বীরত্বের কাহিনীগুলি ছড়ানো রয়েছে চারপাশে।

ষষ্ঠ লুই-এর আমলের ছোট একটি ড্রয়িংরুম। দেওয়ালগুলির ওপরে মেষপালিকাদের কাছে প্রেম-নিবেদনকারী মেষপালকের ছবি আঁকা রয়েছে; আর রয়েছে পেটিকোট-পরা সুন্দরী নারী আর পরচুলা-পরা বীর ভদ্রলোকদের। সেই ঘরে একটি বড় আরাম কেদারায় মৃতপ্রায় একটি বৃদ্ধা মহিলা শুয়ে রয়েছেন। মমীর মত হাতগুলি তাঁর চেয়ারের দু'পাশে ঝুলে পড়েছে। তাঁর চোখ দু'টি ক্লান্তভাবে দূরের চক্রবালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, তিনি যেন তাঁর যৌবনের চত্বরে রোমাণ্টিক দিনগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। মাঝে-মাঝে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে সুগন্ধ বাতাস বয়ে আসছে; সেই বাতাসে তাঁর সাদা চুলগুলি উড়ছে, আর সেই সঙ্গে তাঁর চিন্তার জগতে পুরনো স্মৃতিগুলি একটার পর একটা জেগে উঠছে।

তাঁরই পাশে ঝালর-দেওয়া একটা টুলের ওপরে একটি যুবতী বসে রয়েছে; তার সুন্দর চুলের গোছা ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার চোখ আর মুখের চেহারাটা কেমন যেন বিষণ্ন। বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার আঙুলগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মনের মধ্যে অজস্র চিন্তা গিজগিজ ক'রে উঠছে।

কিন্তু হঠাৎ বৃদ্ধা মহিলাটি তার দিকে মাথাটা ঘোরালেন।

বার্থা, খবরের কাগজটা একটু পড়তো। সম্প্রতি পৃথিবীতে কী ঘটছে একটু জানি।

খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে যুবতীটি দ্রুতগতিতে খবরের কাগজের ওপরে চোখ বুলোতে লাগল। বলল—রাজনীতির কচকচিতে কাগজটা একেবারে বোঝাই। ওগুলো বাদ দিয়ে পড়ব, ঠাকুমা ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাই। প্রেমের কাহিনী কিছু নেই ? আজকাল নারী-ধর্ষণ বা দুর্ধর্ষ নারীঘটিত ব্যাপার বলতে কিছু শোনা যায় না কেন ? তাহলে কি ফ্রান্স থেকে বর্তমান যুগে বীরত্ব জিনিসটা উঠে গিয়েছে ?

যুবতীটি অনেকক্ষণ ধরে খবরের কাগজটা পড়তে লাগল; তারপরে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রয়েছে। একটা প্রেমের নাটক।

থুরথুরে বৃদ্ধা মহিলাটি একটু হাসলেন ; বললেন—পড়।

পড়তে শুরু করল বার্থা। কাহিনীটি হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড ছোঁড়ার। স্বামীর রক্ষিতার ওপরে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে একটি স্ত্রী অ্যাসিড ছুঁড়ে প্রতিনায়িকার চোখ আর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে। অ্যাসাইজ আদালত থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হ'য়ে তিনি ছাড়া পেয়েছেন। জনসাধারণ তাঁকে হাততালি দিয়ে খুব তারিফ করেছে।

বৃদ্ধা মহিলা এই শুনে উত্তেজিতভাবে নড়াচড়া ক'রে অস্থিরতার সঙ্গে বললেন—ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর—একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। দেখ তো, আর কিছু খবর রয়েছে কিনা।

আবার খুঁজতে লাগল বার্থা ; তারপরে পুলিশ কোর্ট রিপোর্টের অংশটা পড়তে-পড়তে একটা জায়গায় এসে সে থামলো ; তারপরে পড়তে লাগল—কী ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিডি। একটি বৃদ্ধা কুমারী একটি যুবকের আলিঙ্গনে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রেমিকটি ছিল অস্থিরমতি ; তার কাছ থেকে যথেষ্ট মাসোহারাও তিনি পেতেন। এরই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সেই বৃদ্ধাটি খুব কাছ থেকে সেই প্রেমিক যুবকের দেহে রিভলভার দিয়ে পর-পর চারটি গুলি করেন। দু'টি বুলেট প্রেমিক যুবকের বুকে ঢুকে যায়, একটি কাঁধে, আর একটি তার দাবনায়। হতভাগ্য যুবকটি চিরকালের জন্যে বিকলাঙ্গ হ'য়ে যাবে। জনসাধারণের মুখর প্রশংসার ভেতর দিয়ে সেই বৃদ্ধা মুক্তি পেয়েছেন। এই সমস্ত মূর্খ কুমারীদের বিপথে টেনে প্রলুব্ধ করার জন্যে সংবাদপত্র যুবকটির প্রচুর নিন্দা করেছে।

এই কাহিনী শুনে ভদ্রমহিলা যথেষ্ট মর্মাহত হ'য়েছেন বলে মনে হল। কাঁপতে-কাঁপতে তিনি বললেন—বলছ কী? আজকাল তোমরা সবাই পাগল হ'য়ে গিয়েছ। তোমরা সব উন্মাদ। ভগবান তোমাদের ভালবাসা দিয়েছেন। জীবনে আকর্ষণ বলতে ওই একটি জিনিসই রয়েছে। পুরুষরা তার সঙ্গে যোগ করেছে তাদের বীরত্ব। আমাদের বৈচিত্র্যহীন অবসরগুলিতে ওইটিই একমাত্র উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আর তার সঙ্গে তুমি সালফিউরিক অ্যাসিড আর রিভলবার মিশিয়ে দিচ্ছ। স্প্যানিশ মদের পাত্রে কাদা ছিটিয়ে দিলে যেমন হয় এও অনেকটা সেইরকম ব্যাপার দাঁড়াল নাকি?

ঠাকুমার কথার বিন্দু-বিসর্গ বার্থার মগজে ঢুকলো বলে মনে হল না। সে বলল—কিন্তু ঠাকুমা, এই ভদ্রমহিলাটি প্রতিহিংসা নিয়েছেন। ভেবে দেখ, তাঁর বিবাহিত স্বামী তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

শিউরে উঠলেন ঠাকুমা ; বললেন—তোমাদের মত আজকালকার মেয়েদের মাথায় কী সব আবোল-তাবোল চিন্তা ঢুকোচ্ছে ওরা?

বার্থা বলল—কিন্তু বিয়েটা পবিত্র জিনিস, ঠাকুমা।

ঠাকুমা বললেন—প্রেমই পবিত্র, বৎসে, আমি তিন যুগের মানুষ দেখেছি ; নর-নারীদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অনেক। আমার কথা শোন। বিবাহ আর প্রেম—এদের মধ্যে মিল এতটুকু নেই। সংসার গড়ার জন্যেই আমরা বিয়ে করি। সংসার থেকেই সমাজ গড়ে ওঠে। সেই সংসার গড়ার জন্যে একই রকমের ধাতুর

দরকার আমাদের হয়। বিয়ে করার সময় প্রচলিত রীতিই আমাদের মানতে হয়; সম্পদকে একসঙ্গে মেশাতে হয়। একই জাতীয় বর্ণ আর শ্রেণীকে সংযুক্ত করতে হয়। এই বিয়ের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ আর সন্তান। আমরা বিয়ে করি জীবনে একবারই; সংসার তাই চায়! কিন্তু জীবনে আমরা বিশবার ভালবাসতে পারি; কারণ প্রকৃতি চায় তা-ই। বিয়েটা হচ্ছে আইন; ভালবাসা হচ্ছে প্রবৃত্তি। এই ভালবাসার জন্যে কখনও আমরা সোজা পথে যাই, কখনও যাই বাঁকা পথে। সেই প্রবৃত্তিকে সংযত করার জন্যে সংসার অনেক আইন তৈরি করেছে; কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি সেই আইনের চেয়েও শক্তিশালী। ভগবানই সেগুলি আমাদের দিয়েছেন; তাই তাদের বেশী সংযত করার চেষ্টা আমাদের না করাই উচিৎ। কারণ আইন তৈরি করেছে মানুষ। শিশুদের ওষুধের সঙ্গে যেমন চিনি মেশাতে হয়; তেমনি জীবনের সঙ্গে প্রেম না মেশালে জীবনকে কেউ গ্রহণ করতে পারবে না।

অবাক হ'য়ে চোখ দুটো বড়-বড় ক'রে তাকাল বার্থা—কী বলছ ঠাকুমা! ভাল আমরা একবারই বাসতে পারি।

ঠাকুমা আকাশের দিকে তাঁর কম্পিত হাত দু'টি তুললেন; মনে হ'ল, শৌর্য-বীর্যের মৃত দেবতার আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার জন্যে তিনি প্রার্থনা করছেন। ঘৃণার সঙ্গে তিনি চিৎকার ক'রে বললেন—তোমরা সব দাসত্ব স্বীকার করেছ; তোমরা সবাই পরিণত হয়েছ অতি সাধারণ মানুষে। বিপ্লবের পর থেকে সমাজকে আর চেনাই যায় না। প্রতিটি কাজকেই তোমরা বড়-বড় বিশেষণে রাঙিয়ে তুলেছ—বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তের কাঁধে তোমরা বিরক্তিকর কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ। তোমরা সাম্যবাদে বিশ্বাসী; বিশ্বাস কর অনন্ত কামনায়। প্রেমের জন্যে মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে এই নিয়ে প্রেমের কবিতা লেখ তোমরা। আমাদের সময়ে কবিতা লেখা হোত অন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। সেই শিক্ষাটা হল, হে পুরুষ, তোমরা প্রতিটি নারীকে ভালবেস। আর আমরা কী করতাম জান? আমরা যদি কোন ভদ্রলোককে পছন্দ করতাম তাহলে তাঁর কাছে চাকর পাঠাতাম। তারপর যখন মাথায় আমাদের নতুন খেয়াল চাপত তখন দুটিকে একসঙ্গে রাখা সম্ভব না হলে প্রথমটিকে আমরা বর্জন করতে সময় নিতাম না।

কেমন যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেল বার্থার মুখ—তাহলে সে যুগে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না?

বৃদ্ধা মহিলাটি রেগে কাঁই হ'য়ে গেলেন—মর্যাদা ছিল না? যেহেতু আমরা ভালবাসতাম—আর সেই কথাটা প্রকাশ করতাম, আর তাই নিয়ে গর্ব করতাম—এই জন্যে? কিন্তু বৎসে, সে যুগে যদি আমাদের মত ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কোন রমণীর কোন প্রেমিক না থাকত তাহলে সারা ফরাসী উচ্চ সমাজ তাকে বিদ্রূপ করত। আর তুমি বোধ হয় ভাবছ, তোমাদের স্বামীরাই তাদের সারা জীবনে কেবলমাত্র তোমাদেরই ভালবাসবে? যেন, এই রকমই সম্ভব। আমি তোমাকে বলছি—সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বিয়ের প্রয়োজন; কিন্তু মানুষ প্রকৃতিগতভাবে এর বিরোধী। বুঝেছ?

জীবনে একটিমাত্র ভাল জিনিস রয়েছে। সেইটি হ'ল ভালবাসা। আজকাল তোমাদের শেখানো হচ্ছে—মাত্র একজনকেই ভালবাসবে। সারা জীবন ধরে কেবল টার্কিই খেতে হবে এই বাধ্যবাধকতার সঙ্গে ওই নীতির কোন পার্থক্য নেই। বছরে যতগুলি মাস রয়েছে প্রতিটি পুরুষের কম করে ততগুলি রক্ষিতা থাকা উচিৎ।

ফুল যেমন প্রজাপতিদের আকর্ষণ করে, প্রতিটি পুরুষের প্রবৃত্তিরই উচিৎ তাকে নারীদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। যেসব হতভাগ্য রমণীরা প্রবৃত্তির কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছে আমাদের কি উচিৎ রাস্তায় বেরিয়ে তাদের গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেওয়া। সেই পুরুষের জন্যে নিজের ওপরে প্রতিহিংসা না নিয়ে ভালবাসার আর ভালবাসা পাওয়ার জন্যেই ভগবান যাদের সৃষ্টি করেছেন প্রতিহিংসা নেব তাদের ওপরে? আর সেই জন্যে তোমাদের বর্তমান সমাজ, তোমাদের বিদূষকদের সমাজ, তোমাদের বুর্জোয়া সমাজ, তোমাদের ঘোড়ার পিঠে চড়া ভিক্ষুকদের সমাজ আমাদের মুক্তি দিয়ে প্রশংসা করবে? তোমাদের সবচেয়ে অগৌরবের বিষয় হচ্ছে ভালবাসা কী তা তোমরা বোঝ না। এইটাই কি তোমাদের বিজ্ঞতা? তোমাদের নীতি? মেয়েরা পুরুষদের গুলি ক'রে চেঁচাবে যে পুরুষরা আজকাল কাপুরুষ হয়ে গিয়েছে?

বার্থা বৃদ্ধার উত্তেজিত হাত দু'টি ধরে বলল—তুমি থাম, ঠাকুমা, থাম।

সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বীরভোগ্যা নারীটি বললেন—খুব সাবধান! এই রকম মূর্খ অর্থহীন কোন চিন্তা যদি মাথার মধ্যে ঢোকাও তাহলে কোনদিনই তুমি সুখী হ'তে পারবে না।

কাদা-খোঁচা পাখি

The Snipe

বিগত চল্লিশটি বছর ধরে ব্যারণ দ্য ব্যাভোটস তাঁর অঞ্চলের সেরা শিকারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। কিন্তু শেষের পাঁচ-ছ'টি বছর প্যারালিসিস হওয়ার ফলে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারেন না। বর্তমানে ড্রয়িংরুমের জানালা অথবা তাঁর ঘরের সামনে যে বিরাট সিঁড়ির ধাপ উঠে গিয়েছে সেখান থেকে পায়রা শিকার করে সময় কাটান। বাকি সময়টা পড়ায় কেটে যায় তাঁর।

মানুষ হিসাবে ব্যারণের স্বভাবটি ছিল বেশ ভাল; বিগত শতাব্দীর সাহিত্যলিপ্সা তাঁর যথেষ্ট ছিল। তিনি টুকরো-টুকরো গল্প শুনতে ভালবাসতেন; বিশেষ করে সেই সব কাহিনীগুলি যদি দুঃসাহসের হয় তো আরও ভাল। পাশাপাশি অঞ্চলে যে-সব ঘটনা ঘটতো সেগুলি শুনতেও তিনি বড় ভালবাসতেন। কোন বন্ধু তাঁর

সঙ্গে দেখা করতে এলেই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন। নতুন কোন খবর আছে নাকি হে?

উকিলের মত কেমন করে মানুষকে ক্রশ-একজামিন করতে হয় তা তিনি জানতেন।

যে সব দিন আকাশ থেকে গরম রোদ ছড়িয়ে পড়তো সেদিন বিরাট আরাম কেদারায় তিনি আরাম করে গা এলিয়ে দিতেন। সেই চেয়ারের সঙ্গে চাকা লাগানো থাকতো। চাকার ওপর দিয়ে ঠেলে চেয়ারটিকে হল-ঘরের দরজার কাছে টেনে আনা হোত। পেছন থেকে একটি চাকর তাঁর বন্দুকটি ধরতো, টোটা পুরতো; তারপরে সেই ভর্তি বন্দুকটি মনিবের হাতে তুলে দিত। আর একটি চাকর লুকিয়ে থাকতো কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে; সেখান থেকে মাঝে-মাঝে সে একটা আধটা পায়রা উড়িয়ে দিত; সেইজন্যে ব্যারণ প্রস্তুত থাকার সুযোগ পেতেন না; আর পেতেন না বলেই শিকারের রীতি অনুযায়ী সারাক্ষণই তাঁকে সজাগ থাকতে হোত।

এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি পাখিদের লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়তেন; কোন পাখি তাঁর চোখে ধূলো দিয়ে উড়ে পালালে ভীষণ বিরক্ত হতেন তিনি; গুলি খেয়ে পাখিটা মাটিতে পড়ে গেলে, অথবা মাটির ওপরে পড়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ডিগবাজি খেলে তিনি হো-হো করে হাসতেন। যে-চাকরটি তাঁর বন্দুকে টোটা পুরে দিয়েছিল হাসতে-হাসতে বন্ধগলায় তাঁকে তিনি বলতেন: যোশেফ, সেই গুলিটাই ওকে ফেলে দিয়েছিল, তাই না? কেমন করে পড়ে গেল তুমি তা দেখলে?

তার উত্তরে যোশেফ একটা কথাই বলতো: নিশ্চয়, নিশ্চয়। ব্যারণ কোন দিনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি।

শরৎকালে যখন শিকারের ঋতু আসতো, আগের মতই বন্ধুদের তিনি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আনতেন; এবং দূরের আকাশ লক্ষ্য করে তাঁরা যখন গুলি ছুঁড়তেন তখন তিনি বেশ খুশিই হতেন। একটি-একটি করে গুলির শব্দগুলি তিনি গুণতেন; এবং সেই শব্দগুলি যখন পর-পর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে হোত তখন তিনি বেশ সচেষ্ট হতেন। দিনের শেষে প্রতিটি অতিথিকে অনুরোধ জানাতেন তাঁর ব্যক্তিগত শিকারের কাহিনী বর্ণনা করতে। শিকারের কাহিনীগুলি বর্ণনা করার সময় অতিথিরা খাবার টেবিলে প্রতিদিন প্রায় তিনটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন।

তাঁরা যে-সব শিকারের কাহিনী বর্ণনা করতেন সেগুলির সবই প্রায় অদ্ভুত এবং অসম্ভাব্য দুঃসাহসিক কাহিনী। এই সব কাহিনী বর্ণনায় বাচাল শিকারীরা বেশ আনন্দই পেতেন। তাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল ঐতিহাসিক কাহিনী; এবং সেগুলির মধ্যে কিছু কাহিনী এইখানেই আরও অনেকবার বিবৃত হয়েছে আগেই। কেমন ক'রে একটি শশক ক্ষুদে চেহারার ভাইকোঁৎ-দ্য-বোরিল-এর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সেই কাহিনীটি প্রতি বৎসরই এখানে নতুন উদ্যমে বলা হোত; এবং সেই কাহিনী শুনে প্রতি বছরই তাঁরা হেসে একেবারে লুটোপুটি খেতেন। প্রতিটি পাঁচ মিনিট অন্তর-অন্তর একটি নতুন বক্তা বলবেন: আমি একটা শব্দ শুনলাম—"বার বার!" আমার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে একটি সুন্দর শশকের দল বেরিয়ে এল। আমি তাদের তাক

করলাম—বন্-বন্ শব্দে বন্দুক থেকে বেরিয়ে গেল গুলি; ব্যাঙ-ব্যাঙ! এক ঝাঁক পাখি আমার নজরে পড়ে গেল। এক ঝাঁকে সাত-সাতটা পাখি।

এই কথা শুনে অতিথিরা সবাই হেসে একেবারে গড়াগড়ি দিতেন, কিন্তু কেউ কারও কাহিনী মিথ্যে বলে নস্যাৎ করে দিতেন না।

কিন্তু এখানে একটা পুরনো গল্পের প্রচলন ছিল; সেটি হচ্ছে: একটি কাদা-খোঁচার কাহিনী। এই পক্ষীরাণীটির আসার সময় হলেই প্রতিটি ডিনার টেবিলের ধারে একই রকমের উৎসব শুরু হোত। এই অতুলনীয়া পাখিটিকে সকলেই পছন্দ করতেন বলে, প্রত্যেক অতিথিই প্রতিটি সন্ধ্যায় একটি করে পাখির সদ্ব্যবহার করতেন, ডিশের ওপরে ফেলে রাখতেন কেবল তার মাথাটা।

তখন ব্যারণ বিশপের ভূমিকায় অবতরণ করতেন। তাঁর সামনে একটি প্লেট নিয়ে আসা হোত। সেই প্লেটের ওপরে থাকতো কিছুটা চর্বি; পাখিগুলির সরু সূঁচের মত শীর্ণ মাথাগুলি আঙুলের ডগায় ধরে তিনি সেগুলিকে মন্ত্রঃপূত করতেন। তাঁর পাশে একটি বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হোত; এবং কোন কিছু স্বর্গীয় প্রত্যাশায় সবাই উদ্বেগের সঙ্গে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন।

তারপরে ব্যারণ একটি আলপিন গাঁথতেন পাখিটির মাথায়, আর একটি ফোটাতেন তার গায়ে। তারপরে দুটি পিনকে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ওপরে তুলে নিতেন।

অতিথিরা সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করতেন: এক—দুই—তিন।

সঙ্গে-সঙ্গে ব্যারণ দক্ষ অঙ্গুলি সঞ্চালনে খেলনার মত মাথাটিকে ঘোরাতে শুরু করতেন।

ঘুরতে-ঘুরতে যার দিকে পাখিটির লম্বা চঞ্চুটি থেমে যেত, সেই অতিথিরই জয় জয়কার। তাঁকেই সমস্ত কাদা-খোঁচার মাথাগুলি দেওয়া হোত; এই রাজকীয় সম্মানে অন্য সব অতিথিদের মনেই বেশ হিংসার উদ্রেক হোত।

তিনি মাথাগুলিকে একটি-একটি করে ধরে বাতির ওপরে সেঁকতেন; আগুনের স্পর্শে এসে চর্বিগুলো গলে-গলে পড়তো; মাংসগুলি ঝলসে যেত; আর সেই অতিথি পাখিগুলির চঞ্চু হাতে ধরে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সেগুলি উদরস্থ করতেন। এবং এক-একটি মাথা চর্বন করার সময় অন্য অতিথিরা মদের গ্লাস তুলে সমস্বরে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন।

শেষ মাথাটি উদরস্থ করার পরে ব্যারণের নির্দেশ মত নিরাশ অতিথিদের ক্ষতিপূরণ করার জন্যে তাঁকে একটি গল্প বলতে হোত।

—অনুবাদ: সুনীলকুমার ঘোষ

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥